CUL-H04251-18-P030243

বঙ্গশ্রী

মাসিক পত্রিকা

বিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড
আষাঢ়—অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯

756.3
.002/3

18

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY, UNIVERSITY.

সম্পাদক
শ্রীঅমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায়,
এম্-এ, এফ্-আর-ইকন-এস (লণ্ডন)

...প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড
...৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

বিষয় ও লেখক-সূচী

প্রবন্ধ

বিষয়	লেখক	
অর্থহীন কর্ত্তব্য	পরিমল গোস্বামী	২০৩
অন্য গ্রহের অধিবাসী (সচিত্র)	প্রভাতকুমার গোস্বামী	৪৩০
অলঙ্কার-দর্পণ	সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়	২২৯
অবনীন্দ্রনাথ ও বাংলার		
আধুনিক জার্ম্মান-সাহিত্যের দুই দিক	অধ্যাপক সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০৭
প্রবন্ধ-সাহিত্য (সচিত্র)	শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন	১
আইরিশ কবি এ, ই ও গান্ধীজী	বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	৩২
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র (সচিত্র)	রণজিৎ কুমার সেন	১৬৬
আমার শিল্প-সাধনা (সচিত্র)	শ্রীসুনীল মাধব সেনগুপ্ত	৫৮৪
আদিম জাতির লোকসঙ্গীত (সচিত্র)	শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র	৪৫৮
উত্তরাধিকার ও সম্পত্তিকর	শ্রীআদিত্য প্রসাদ সেনগুপ্ত	৫৬৩
উপনিষৎ ও গীতা	শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়	৯৩
ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-স্মরণে	শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত	৭৬
কথা ও সুর	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	৪১৯
কবি নজরুল	অরুণ চৌধুরী	২৫
কবি মোহিতলাল	শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	২২৫
কবির ঋদ্ধি ও মন্ত্র	শ্রীসুরেশ চন্দ্র দেব	৫৪০
কাঁকড়া বিছে (সচিত্র)	শ্রীসুরেশ চন্দ্র ঘোষ	১৩৯
কুতব মিনার (সচিত্র)	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়	৫৫৮
চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৩৯
দুঃখী শ্যামদাস ও গোবিন্দমঙ্গল (সচিত্র)	শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী	১৪২
দুর্গত বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চ	শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৬৯
নব্যশিক্ষা ও দেশজ্ঞান	শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	৩৫১
পদার্থের বর্ণ বৈচিত্র্য	চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত	১২৪
পরমাণু রহস্য	অমরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৫৭৭
পার্ব্বতী ও শৈবলিনী	শ্রীসুরজিৎ শাস্ত্রী	২১১
পাশা-স্মৃতি	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ	৪৪৯
প্রথম পারমানবিক বিমান (সচিত্র)	প্রভাত কুমার গোস্বামী	১২২
প্রাচীন বাংলা পুঁথির নক্সা (সচিত্র)	রণজিৎ কুমার সেন	৪৪৬
ভাগীরথীর ভাগ্য	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	১৯১
ভারত ও সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা	শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত	৬৯
ভারত-চীন মৈত্রী ও তুন-হোয়াং গুহার চিত্রকলা	শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশ	৫২৪
ভারতীয় শিল্পসংকটের একটি দিক	শ্রীভবানী সেন	৩৬৫
ভারতীয় নারীর দৃষ্টিতে জীবন	শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়	৪৫৫
মাইকেল ও বিদ্যাসাগর	শ্রীকালিদাস রায়	৬৫
মালয়, আনাম ও বাংলা	চুনীলা[illegible]	[illegible]
মিশ্র অর্থনীতি	শ্রীযত[illegible]	[illegible]
মুঘলযুগে মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্য	শ্রী[illegible]	[illegible]
মোহিতলালের ম[illegible]প্রয়াণ	অধ্যা[illegible]	[illegible]
বর্ণাশ্রমধর্ম্মে মহাপ্র[illegible]	[illegible]	[illegible]
বাংলা সাহিত্যে বিজয়া গান	[illegible]	[illegible]

P 30243

বিষয়	লেখক	
াকুলার রাজা রামচন্দ্র রায়	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৪৩৮
াংলার কাব্য-সাহিত্যে মধুসূদনের প্রভাব	শ্রীকালিদাস রায়	৫১৫
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রসাহিত্য (সচিত্র)		৩০৪
বিষবৃক্ষ	শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪৮৫
ভ্যতার উৎস-সন্ধানে	শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল	৪১১
মাজ-সেবক ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ (সচিত্র)	শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু	১৩০
মালোচক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (সচিত্র)	শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী	২৪১
মালোচনা-পদ্ধতি—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য	ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত	৩০৭
ংবাদিকতার আদর্শ	শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল	১১১
াহিত্যে প্রথম পুরুষের স্থান	মঞ্জু মুখোপাধ্যায়	২৭০
ুল ও ভারত	ডক্টর কালিদাস নাগ	৩৮৯
যাত্রা	চুণীলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৪৯১
রণ ঃ ২২শে শ্রাবণ (সচিত্র)	রণজিৎ কুমার সেন	২৪৯
ইটম্যান ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ (সচিত্র)	শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	৩৪২

গল্প

তৃপ্তি	[illegible]চন্দ্র সেন	১৬২
বিনাশ কম্পোজিটার	[illegible]গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৭৩
াকস্মিক	[illegible]ণজিৎ কুমার সেন	৩[illegible]
খের	অনিল কুমার ভট্টাচার্য্য	১০৭
াহুতি	শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৩
কটি প্রশ্ন	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য	৫৩৩
রুম	(এইচ, ই, বেটস) অনুবাদ— অমিয় কুমার চক্রবর্ত্তী	৪৫১
গল্প	শ্রীপ্রভাত দেব সরকার	৩৪৫
[illegible]	শ্রীমতী রাণী রায়	৩৩০

বিষয়	লেখক	
একটি স্বার্থপরের কাহিনী	মিহির আচার্য্য	৩৫
এপিঠ আর ওপিঠ	শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার	৭১
কবি শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টরাজ	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫১৮
কাগজের টুকরো	নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০৩
কেরাণী উদ্ধার	শ্রীরমাপতি দাস	৫৬৯
গল্প লেখকের গঙ্গা যাত্রা	শ্রীঅখিল নিয়োগী	৯৭
জমি	শ্রীসন্তোষ কুমার দে	৩৯৯
জাল	অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়	১৯৮
জীবিকা	সুভাষ সমাজদার	১২৬
তাবিজ	শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৩৩৭
তিরিশ বছর আগে	শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল	৬
দর্পচূর্ণ	শ্রীশক্তি প্রসাদ রায়শর্ম্মা	৪৬৩
দুরভিসার	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু	৩৫৬
নতুন আকাশ	প্রফুল্ল রায়	২৫২
নোঙর	মানবেন্দ্র পাল	১৪৭
পারফেক্ট মার্জার	অলকা মুখোপাধ্যায়	৪৪৩
পুতুল	শ্রীবিমল কুমার ঘোষ	৪১৬
প্রতিবিম্ব	শ্রীবিজয় রত্ন মজুমদার	৩৮৬
মধুরেণ	কমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৪৮০
মিলনান্ত	শ্রীবিমল মিত্র	২৯৬
মিলিওনিয়ার	নিখিল সেন	২০৫
রক্তক্ষরা	শ্রীরমেশচন্দ্র সেন	৩১১
রাক্ষুসী	শ্রীশ্যামাপদ ঠাকুর	২১৬
বানর নাচের খেল	শ্রীঅখিল নিয়োগী	৩৯২
বেলা শেষে	শ্রীসুরুচি সেনগুপ্তা	৪৩৩
ব্রহ্মচারী (গী দ্য মোপাসাঁ)	অনুবাদ—মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়	৩০
সহযাত্রী	হিমা চক্রবর্ত্তী	২৬৬

উপন্যাস

এই মর্ত্যভূমি	সু[illegible]ঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৬২, ১৫৪, ২৬০, ৪৬৫, ৫৮০
পান্থপাদপ	শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী	১৮, ১১৫, ২৩[illegible], ৪২৪, ৫৪৭

বিষয়	লেখক	
প্রতিবিম্ব	শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার	৩৮৫, ৫৬৫

নাটক

বিদুষী	পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়	৫৪, ১৩৪, ২৫৬

কবিতা

অকারণ	শ্রীআশুতোষ সান্যাল	৩০৩
অনন্যা	শ্রীবটকৃষ্ণ দাস	৪৭২
অন্তরীপ	শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত	৩৬৪
অন্যখানে	মঞ্জু ভট্টাচার্য্য	৪৫০
আজি মোর কৃতার্থ জীবন	শ্রীবীণাদেবী সেন	৩৬৮
আনন্দরূপিনী	শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	৪৩৭
আবার আশ্বিন	শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী	৩১০
আমাদের দিন	অনিলকুমার ভট্টাচার্য্য	৫২৩
একটি উজ্জ্বল তারা	অরুণবরণ চক্রবর্ত্তী	২৪৮
একটি সোনালী স্বপ্ন	সুনীলকুমার নন্দী	৫৯
ঐকান্তিক	শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	৫৪৬
কণিকা	শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ	৪৯৫
কল্পনা	নন্দদুলাল চক্রবর্ত্তী	৪৭৯
কাহিনী	শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী	৩৯১
ক্ষণ বসন্ত	শুদ্ধসত্ত্ব বসু	৬১
গাঁয়ের স্মৃতি	বীণাপাণি ভট্টাচার্য্য	১৫৯
গোধূলী	সন্তোষকুমার অধিকারী	৩৫০
চিরযৌবন	অনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী	৫১৭
চূড়ালা ও শিখিধ্বজ (কাব্য)	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	৩৭৭
জলতরঙ্গ	আনন্দ বাগ্‌চী	৪৭৯
জীবনকে : জিজ্ঞাসা	[illegible]দাস সরকার	২৯
ঢেকে গেছে চাঁদ দূরাশার মেঘে	শ্রীঅপূর্ব্ব কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৪৬২
তিন বিশ্বের স্বপ্ন	বটকৃষ্ণ দে	২২২

বিষয়	লেখক	
তুষারপাত : সিমলা	সুশীল কুমার গুপ্ত	২০[illegible]
নদী	বীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত	৩৬৪
পার হওয়া চাই	লক্ষ্মণ কুমার বিশ্বাস	২৫৫
পাহাড়	সুজিত কুমার নাগ	৫৪৬
প্রথম যৌবন	শ্রীহরিচন্দন মুখোপাধ্যায়	৫০[illegible]
মহারুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য	শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ	৫৬২
প্রেম	হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়	৪৫৬
মা	শ্রীমতিলাল দাস	২৬[illegible]
মানুষ : প্রকৃতি	শ্রীদুর্গাদাস সরকার	৩১[illegible]
মেঘলা দিনে	শ্রীসুধীর গুপ্ত	৪১[illegible]
মোহান্ধ	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৪২[illegible]
যাযাবর হাঁস	সুনীল কুমার নন্দী	৩৫[illegible]
বলদের গাড়ী	গোপাল বটব্যাল	৩[illegible]
বন্দর	আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত	২৭
বসন্তের ফুল	মোহিতলাল মজুমদার	২২
বাইশে শ্রাবণ	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	২৫
বিকেল থেকে সন্ধ্যে	শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	২[illegible]
বিদ্রোহী বঙ্কিম	শ্রীসবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	২[illegible]
ব্যর্থ যৌবনের গান	বটকৃষ্ণ দাস	১৫
শরৎ	সুশীল কুমার গুপ্ত	৩১
স্মৃতি	সুজিত কুমার না[illegible]	[illegible]

আলো[illegible]নী

কলিকাতার পৌর প্রতিষ্ঠান [illegible] কলিকাতাবসী	শ্রীসু[illegible]ন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪[illegible]
গ্রন্থ নির্ব্বাচনে সমালোচকের দায়িত্ব	শ্রীসুধীর ব্রহ্ম	১[illegible]
বাঙালী [illegible]দায়	শ্রীমতী অমিয়া দেবী	[illegible]
শশীদা	শ্রী[illegible]বনীনাথ রায়	৪[illegible]

পুস্তক ও আলোচনা ৮২, ১৭৪, ২৭২, [illegible]

সম্পাদকীয় ৮৩, ১৭৫, ২৭৩ [illegible]

CENTRAL LIBRARY
UNIVERSITY

বিংশ বর্ষ আষাঢ়—১৩৫৯ ১ম খণ্ড—১ম সংখ্যা

অবনীন্দ্রনাথ ও বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্য

অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ও সাহিত্য-সাধক অবনীন্দ্র- একই ব্যক্তি-সত্তার দু'টি বিভিন্ন প্রকাশ। আর ভিন্নই লি কেম্‌ কোরে? অবনীন্দ্রনাথের রেখার সঙ্গে তাঁর র একটা ম-গত ঐক্য আছে। আর সে ঐক্য এতই পষ্ট যে অসতর্ক পা করও দৃষ্টি এড়ায় না।

যাকে আমরা বলি রে জাতির অন্তর-পুরুষের তি, তার অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নতুন কোরে তনের মহিমা-আবিষ্ক র, পুরাতনের পুনঃ-প্রবর্ত্তন Revivalism নয়। ঊ বিংশ শতাব্দীতে, চাত্ত্য া-দীক্ষার ফলে বাংলাদে শ যে নব জা রণ ঘটেছিল, ফলে বাঙালী ভার র সাহিত্য, দ ন, ধর্ম্ম-সাধনা তর মাহাত্ম্য নতুন কো র উপল রেছিল। কিন্তু, সাধনার ক্ষেত্রেও যে ভারতের কটা অসাধারণ , এর ভেতরেও ভারতীয় ংস্কৃতির একটা ফুটে উঠে , সে কালের নীষীরা সে কথা চিন্তা করেন নি অবনীন্দ্রনাথ পরম সর সঙ্গে ন পথে গ্রসর হোয়ে, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান প্রতীচ্য গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ কোরে ভারতীয় শিল্পের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য নতুন কোরে আবিষ্কার কোরেছিলেন। ফলতঃ, ভারতীয় চিত্র-শিল্পের যে নবজন্ম এ যুগে ঘটেছে, তার মূলে ছিল প্রধানত অবনীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ প্রতিভা। কিন্তু তাঁর নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি শুধু শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রেও স্বতন্ত্র পথ আবিষ্কার করেছে। ফলতঃ, অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা চিত্র, সাহিত্য ও সঙ্গীত এই ত্রিধারায় প্রবাহিত হোয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রতিভার একটি বিশেষ দিক নিয়ে আজ আমরা আলোচনা কোর্ব্বো—সেটা হচ্ছে বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্যে তাঁর দান।

গল্প বলার ক্ষেত্রে যেমন, প্রবন্ধ-রচনার ক্ষেত্রেও তেম্নি অবনীন্দ্রনাথের একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি আছে। পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের মত হচ্ছে The style is the man; লেখকের রচনা-শৈলীর ভেতর দিয়েই আমরা পাই মানুষের ব্যক্তি-সত্তার পরিচয়। এ জন্যে কোনো শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনাই

সবই এই ধরণের রচনা। ভূদেব বাবুর 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'বিবিধ প্রবন্ধ', বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ), কালীপ্রসন্নের 'প্রভাতচিন্তা', 'নিভৃত চিন্তা', 'নিশীথ চিন্তা' প্রভৃতি সকলই এই ধরণের প্রবন্ধ-সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নয়। ইংরেজীতে যাকে বলে Personal Essays, কমলাকান্তের দপ্তরের কয়েকটি প্রস্তাব ভিন্ন তার দৃষ্টান্ত বড়ো বেশী মেলে না। অবশ্য এদিক দিয়ে কিছু সার্থক প্রচেষ্টা এ যুগে হোয়েছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে আর এক ধরণের রচনার প্রাচুর্য্য দেখতে পাই যাতে আছে গীতি-কবিতারই মতো গভীর ব্যঞ্জনা আর সেই সঙ্গে কবি বা শিল্পীর সত্য-দৃষ্টির পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ বা অবনীন্দ্রনাথের রচনাবলী dissertation-ও নয়, personal essay-ও নয়, বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সামগ্রী।

তথাপি, অবনীন্দ্রনাথের রচনাবলীর কয়েকটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। আমি আজ তাঁর রচনার দু' একটি বিশিষ্ট গুণের নির্দ্দেশ কোর্ব্বো।

'বাগীশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলীতে' দেখা যায় অবনীন্দ্রনাথ স্থানে স্থানে গল্প বলার ভঙ্গিকে আশ্রয় কোরে রচনাকে সরস কোরে তুলেছেন। অবনীন্দ্রনাথের গল্প বলার ভঙ্গীটি যে অননুকরণীয়, 'রাজ কাহিনী', 'শকুন্তলা' ও 'ক্ষীরের পুতুলের' বা 'আলোর ফুলকির' পাঠকদের কাছে সে পরিচয় নতুন কোরে দেবার প্রয়োজন নেই।

কবি গোল্ডস্মিথ একদা গল্প লেখার প্রসঙ্গে বলেছিলেন—যদি কেউ ছোট মাছ নিয়ে গল্প লেখেন তাকে মনে রাখতে হবে, ছোট মাছের মুখের কথা হবে ঠিক ছোট মাছেরই মতো। কথাটা শুনে ডাক্তার জনসন হাসলেন। গোল্ডস্মিথ তখন বল্লেন—ব্যাপারটি যত সোজা বলে তোমার মনে হচ্ছে, ততটা সোজা মোটেই নয়, ডাঃ জনসন। তুমি যদি ছোট মাছদের দিয়ে কথা বলাও, তা' হোলে মনে হবে প্রকাণ্ড তিমি মাছগুলো কথা বলচে। অবনীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব হচ্ছে এইখানে যে, তিনি ছোট মাছের মুখে ছোট মাছের ভাষা ও বড়ো মাছের মুখে বড়ো মাছের ভাষা বসাতে পারেন।

প্রবন্ধের ভেতর অবনীন্দ্রনাথ যে স্থানে স্থানে গল্প বলার ভঙ্গীটি আশ্রয় কোরেছেন, তার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

(১) যতদিন মানুষ জানেনি, তার নিজের মধ্যে কি চমৎকারিণী শক্তি রয়েছে সৃষ্টি করবার, ততদিন সে তার চারিদিকের অরণ্যানীকে ভয় করে চলছিল, পর্ব্বতশিখরকে ভাবছিলো, দুরারোহ, ভীষণ; বিশ্বরাজ্যের উপরে কোনো প্রভুত্বই সে আশা করতে পারছিল না; তার কাছে সমস্তই বিরাট রহস্যের মত ঠেকছিল; সে চুপচাপ বসেছিল। কিন্তু যেদিন শিল্পকে সে জানলে, সেই মুহূর্ত্তেই তার মন ছন্দোময় বেদময় হয়ে উঠলো, রহস্যের দ্বারে গিয়ে সে ধাক্কা দিলে—সবলে। শুধু এই নয়, ভয় দূরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার এই দুদিনের খেলাঘরে অতি আশ্চর্য্য খেলা—কাণ্ডকারখানা আরম্ভ করে দিলে। আগুনকে সে বরণ করে নিয়ে এলো নিজের ঘরে ঘুমন্ত দেশের রাজকন্যার মতো সোনার কাঠির স্পর্শে জাগিয়ে

অবনীন্দ্রনাথ

তুলে! অমনি সঙ্গে সঙ্গে তার ঘরে বেজে উঠলো লোহার তার আশ্চর্য্য সুরে, মাটির প্রদীপ জেবলে দিলে নূতনতর তারার মালা; মানুষ সমস্ত জড়তার মধ্যে ডানা দিয়ে ছেড়ে দিলে;—আকাশ দিয়ে বাতাস কেটে উড়ে চল্লো, সমুদ্রের পরপারে পাড়ি দিয়ে চল্লো—মানুষের মনোরথ, মনতরী—তার স্বপ্ন তার সৃষ্টির পসরা বয়ে। এই শিল্পকে জানা, মানুষের সব চেয়ে যে বড় শক্তি—সৃষ্টি করার কৃতিত্ব, তাকেই জানা। (শিল্পে অনধিকার)

আবার শুনুন—

মহাজাতি রাজকন্যা ঘুমিয়ে থাকে, মহাকাল দৈত্যের মতো তাকে ধরতে এসে কেল্লার দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলে,

বিষয়টিকে স্পষ্ট কোরে তুলতে পারেন। প্লেটো বলেছেন, মানবশিল্প (Art) হচ্ছে দেবশিল্পের (Nature) অনুকৃতি আর দেবশিল্প হচ্ছে বিধাতার মানস আদর্শের (Archetypes) অনুসরণ। সুতরাং মানবশিল্প হচ্ছে অনুকরণের অনুকরণ (Imitation of imitation). প্লেটোর এই উক্তির বিরুদ্ধে অবনীন্দ্রনাথের যুক্তি কেমন সুস্পষ্ট—

Imitation যদি আর্টের চরম হইত, তবে পৃথিবীতে কবিগণের স্থান হরবোলায় অধিকার করিত,—সঙ্গীতাচার্যের স্থান গ্র্যামোফোন ও নর্ত্তকীগণের আসর কলের পুত্তলিকায় অধিকার করিত। কোকিলের কুহুস্বরটা কবিগণ অপেক্ষা হরবোলা তো আমাদের জলজীয়ন্ত ভাবে শুনাইয়া দেয়। যে বসন্তের ভাব আমাদের মনে আনিয়া দিতে কবিগণ ছন্দের পর ছন্দ, কথার পর কথা গাঁথিয়া চলেন, হরবোলা তো গলার জোরে সেটা সারিয়া লয়, তবে কেননা হরবোলাকে কবির আসন দিই, কেননা তাহাকে True poet বলিয়া ভক্তি করি? ' (মানসচর্চ্চা)

অবনীন্দ্রনাথের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সহজ রসিকতা। বুদ্ধির হঠাৎ আলোর ঝলকানি তার রচনাকে স্থানে স্থানে উজ্জ্বল কোরে তুলেছে। এক্ষেত্রেও তিনি আমাদের পরিচিত অজস্র উপমার ব্যবহার কোরেছেন। কখনো তিনি শব্দের অর্থ নিয়ে খেলা কোরেছেন, কখনো বা বুদ্ধি-দীপ্ত এপিগ্রাম-জাতীয় বাক্যের প্রয়োগ কোরেছেন। উপমা বা দৃষ্টান্তের জন্যে কখনো তাকে মাথা ঘামাতে হয় নি, মা সরস্বতী প্রয়োজনমতো উপমার রাশ টেনে দিয়েছেন। দু' একটি উদাহরণ দিচ্ছি—

(১) শিল্পের সঙ্গে জাতির বিবাহ রাক্ষস-বিবাহ, জাঁতার সঙ্গে মণিমুক্তার বিবাহ দিলে যা ফল হয় সেই রকমের বস্তু হচ্ছে জাতীয় শিল্প; তাতে রস থাকে না, ছাতুর মতো ভারি শুকনো জিনিষ থাকে জাতীয় শিল্পে —অনেকখানি গুড় না হোলে সেই জাতীয় পুষ্টিকর জিনিষ রোচে না একেবারেই। (জাতি ও শিল্প)

(২) কাক এক কৌশলে বাসা বাঁধছে, বক স্বতন্ত্র রকমে বাঁধছে বাসা। এই কৌশল নিয়ে কি কাকে বকে এ জাত ও জাত বলে আপনাদের পরিচয় দিচ্ছে? কোকিল বাসা বাঁধেই না, কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, অথচ তার সন্তান কোকিলই থাকে। আমাদের এই জাতিটা আগে তুলোট নয় তালপাতায় সংস্কৃতে পুঁথি লিখতো, এখন লিখচে বিলাতি কাগজে বিলাতি শ্লেটে ইংরাজিতে—এতেই রচনার জাতিপাত হ'ল. এটা ভাবা ভুল। রচনার প্রাণটি হচ্ছে আসল জিনিষ যা থেকে পরিচয় পাই এটি ভারতীয় না অভারতীয়।

অবনীন্দ্রনাথের রচনায় যেমন প্রতিভার তেমনি পাণ্ডিত্যেরও পরিচয় আছে, কিন্তু কোথাও তাঁর রচনা অনাবশ্যক উদ্ধৃতির দ্বারা কণ্টকিত হোয়ে ওঠে নি। ঋগ্বেদ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি থেকে আরম্ভ কোরে এ যুগের বহু মনীষীর রচনাবলীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, তাঁর লেখার ভেতরেই এর প্রমাণ আছে।

'বাংলার ব্রত', 'ভারত শিল্প' প্রভৃতি গ্রন্থ স্বল্প পরিসরের ভেতর তথ্যবহুল কিন্তু তথ্যের দ্বারা ভারাক্রান্ত নয়। এ ক্ষেত্রেও তাঁর সরস রচনাভঙ্গীর অভাব হয় নি।

নাট্যকার ভবভূতি বলেছেন—'সর্ব্বথা ব্যবহর্ত্তব্যা কুতো হ্যবচনীয়তা', কেননা, 'বাচাং সাধুত্বে দুর্জ্জনো জনঃ'। সাহিত্য-শিল্পীকে বা নটকে সর্ব্বপ্রযত্নে শব্দের প্রয়োগ করতে হয় কিন্তু অনবদ্য বা দোষমুক্ত বাক্য তো কোথাও মেলে না। মানুষ সর্ব্বথা বাক্যের প্রয়োগ করলেও লোকে তার দোষ উদ্ঘাটন কোরে থাকে। কিন্তু অহেতুক নিন্দার কথা নয়, সত্যিই সংসারে অনবদ্য বাক্যবিন্যাস হোতে পারে না। অবনীন্দ্রনাথের রচনাও যে দোষমুক্ত, এ কথা বলা চলে না। তাঁর রচনার একটি দোষ হচ্ছে শিথিল-বন্ধ বাক্যের প্রয়োগ, অপরটি অতিকথন দোষ। এ কথা অবশ্যি অভিযোগ করা হচ্ছে না যে, তিনি মনীষী বেকনের মতো স্বল্পাক্ষরে গ্রথিত, অসন্দিগ্ধ বাক্য-সমষ্টির প্রয়োগ কোরলেন না কেন। অবনীন্দ্রনাথের মতো শিল্পীর কাছ থেকে আমরা এ রকমের মিতাক্ষর-গাঢ়তা আশা করতেই পারি নে। আমরা শব্দবন্ধনের শিথিলতার কথাই বলচি যার ফলে অন্বয়ের দ্বারা অর্থবোধ করা সময় সময় কঠিন হয়ে উঠেছে। অতিকথনও অবনীন্দ্রনাথের রচনার অন্যতম দোষ। তিনি অনেক রচনাকে অকারণে দীর্ঘ কোরেছেন এবং এই জন্যে রচনায় পুনরুক্তি-দোষ ঘটেছে। কিন্তু তাঁর রচনাবলীতে এ রকমের দু' একটি ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, নগাধিরাজ হিমালয়ের সম্পর্কে মহাকবি কালিদাস যা বলেছেন, সেই ভাষায় আমাদের বলতে ইচ্ছে হয়—

অনন্তরত্নপ্রভবস্য যস্য হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্।
একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ
কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ॥

হিমালয় অনন্ত রত্নের আকর, তাই হিম বা তুষার এর সৌভাগ্যকে বিলুপ্ত কোরে দেয় নি। বহু গুণের সমষ্টি যেখানে, সেখানে একটি দোষ চোখেই পড়ে না, যেমন চন্দ্রের সৌন্দর্য্যই আমাদের নয়ন-গোচর হয়, তার কলঙ্ক নয়।

তথাপি, সত্যের অনুরোধে যেমন চন্দ্রের কলঙ্ককে, তেম্নি অবনীন্দ্রনাথের রচনার দোষ-ত্রুটিকেও স্বীকার কোরতে হয়। আবার, তার স্নিগ্ধতা, কমনীয়তা প্রভৃতি গুণকেও অস্বীকার করা যায় না। অবনীন্দ্রনাথকে চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা কর্‌চি কিন্তু আকাশের চন্দ্রের সহিত মর্ত্তের চন্দ্র অবনীন্দ্রনাথের একটা মস্ত বড়ো পার্থক্য রয়েছে। আকাশের চাঁদের আলো নাকি সূর্য্যের কাছ থেকে ধার করা, কিন্তু আমাদের এই মর্ত্তের চন্দ্র রবির কাছ থেকে আলো ধার করেন নি, যদিও রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই অবনীন্দ্রনাথ প্রথম সাহিত্য-সাধনার প্রেরণা লাভ কোরেছিলেন। এই জন্যেই অবনীন্দ্রনাথের রচনার ভেতর দিয়ে তাঁর প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য সহজেই ধরা পড়ে।

তিরিশ বছর আগে

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল

একরাশ পুরোনো কাগজের বাণ্ডিল নিয়ে ব'সেছে হরকালি। কবেকার অকেজো কাগজ—পুরোনো জঞ্জাল-গুলোকে সে বাতিল করতে চায়। তাই সেগুলোকে তন্ন তন্ন ক'রে পরীক্ষা করতে হচ্ছে। সবই অপ্রয়োজনের পুরোনো বস্তা, কোন প্রয়োজনে লাগ্‌বে না, তবুও তারি মাঝে প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার অতীতের জীবন-ইতিহাস। পরীক্ষা ক'রে পড়তে তার বেশ ভালো লাগ্‌চে। বিস্মৃতির অন্ধকার গর্ভ হতে চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠচে কবেকার সব হারানো দিনের ছবি। বহুদূর থেকে যেন ফিরে-যাওয়া অতীতের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সে তন্ময় হয়ে পুরোনো দপ্তর হ'তে এক একখানি কাগজ বের ক'রে পড়চে আর ছিঁড়ে ফেল্‌চে। পড়তে পড়তে কখনো তার মুখখানি আনন্দে দীপ্ত হ'য়ে উঠচে, কখনো বেদনায় ম্লান হ'য়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। সে তার অতীতকে প্রত্যক্ষ করবে এই দপ্তরের মাঝে। পিছন আজ বহুদিন পরে তার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েচে। সে পিছন ফিরে তাকিয়ে আজ তার লুপ্ত জীবনের প্রতি স্মৃতি কণাটিকে খুঁজে বের করবে। সেখানে কত চেনা লোকের মুখ, যারা ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিল। মনের মাঝে যাদের কোন চিহ্নই ছিল না, হঠাৎ তারা বিস্মৃতির অন্ধকার গুহা হ'তে বেরিয়ে এসেচে। এই তো সেদিনের কথা! কতকগুলো রেস্তোরাঁ কার-এর বিল। রামেশ্বর ষ্টেশনের ছাপ, এই তো সেদিন সে হঠাৎ সারা দক্ষিণাপথ ঘুরে এসেছে। নজর পড়লো, তারিখের পানে। অক্টোবর ১৯২৫ সাল! সেদিন মনে হ'লেও পঁচিশ বছর আগেকার কথা। এগুলো ভাইজাগ-এর পিরোজ ম্যানশন-এর বিল। সে ভাইজাগ হ'য়ে রামেশ্বর গিয়েছিল। সঙ্গে ছিল নন্দ বাঁড়ুজ্যে। সে আজ কোথায়? হরকালির অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘশ্বাস বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। এগুলো বিলেতের চিঠি, সুধীর দাশগুপ্ত। লরেন্স-এর বই পাঠিয়েছিল। সুধীর! সে আজো বিলেতে। সেইখানেই সে থেকে গেল। আর দেশে ফিরল না।

এক বাণ্ডিল রেফারেন্স—ডেপুটির চাকরীর জন্যে উমেদারী ক'রেছিল হরকালি। বীটসন-বেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, আরো অনেকে। ১৯১৪ সালের তারিখ। হরকালি অসাধারণ না হ'লেও তাকে সাধারণ গোত্রের লোক বলা চলে না। হরকালি রোগা। সদা হাস্যময় শান্ত চেহারার মাঝে প্রোজ্জ্বল দুটি চোখ। যৌবনে সুশ্রী ও সুপুরুষ ব'লে তার খ্যাতি ছিল। সাধারণ পুরুষের চেয়ে তাকে দুর্বল ব'লেই মনে হতো। দেখলেই তার ওপর মায়া পড়ে, যেমনি সে শান্ত, তেমনি কোমল আর নীরব। আর্থিক অস্বচ্ছলতা তার কোন দিনই ছিল্ না, কাজেই জীবিকা অর্জ্জনের জন্য সে মোটেই ব্যস্ত ছিল না। তবুও সে কাজ ক'রে যেতো। কাজ সে ভালবাসতো আর ভালোভাবেই করতো। কাজ আর লেখাপড়া ছাড়া আর কিছু সে ভালোবাসতো ব'লে মনে হ'ত না। জীবনে তার কোন দারুন সখ বা তীব্র কামনা ছিল না এবং না-পাওয়ার ব্যথাও ছিল না। তাকে সুখী বলেই মনে হতো। আর এই নিঃসঙ্গ নির্জনতার মাঝে সে এম্‌নি অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছিল, যে তাকে দেখলে মনে হতো না যে সে কারুকে চায়। কারুর অভাব তার বুকের মাঝে বিঁধে আছে। কোন না কোন একটা কাজে সে সদাই মগ্ন হ'য়ে থাকতো। ঘণ্টার পর

ঘণ্টা এম্‌নি ভাবে সে কাটিয়ে দিতে পারলেই যেন খুশী থাকে। বেশ ভালো লাগ্‌চে তার এই অতীতের স্মৃতি গুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে। এই তার বিগত যৌবনের ইতিহাস! এই তার যৌবনের আসল রূপ! এই সব নিয়েই সে সুখী ছিল। কাগজের মধ্যে হতে দৈবাৎ তার হাতে এলো একখানা চিঠি, নীল খামের মধ্যে নীল কাগজে লেখা একখানা ছোট্ট চিঠি। চিঠিখানা খাম হ'তে বের করে চোখের সাম্‌নে ধরতেই—চোখ দুটি ভ'রে গেল অপার বিস্ময়ে, মুখে ফুটে উঠল' অস্পষ্ট স্থির হাসি। তার চোখের দৃষ্টি যেন ছিটকে এসে মনের আঁধার গহ্বরকে আলোকিত ক'রে তুললে। অপলক স্বচ্ছ স্থির দৃষ্টি দিয়ে চিঠিখানার পানে সে চেয়ে আছে। মেয়েলি হাতের স্পষ্ট লেখা: হরকালি রুদ্ধশ্বাসে চিঠিখানা পড়লেঃ

—কই তুমিতো এলে না বন্ধু! কোন কিছুই বল্‌লে না, কোন কথাই জান্‌তে পারলুম না। এরা আমায় পথ দেখিয়ে দিল—সেই পথেই আমায় যাত্রা করতে হবে। সেখানে আমার কোন হাত নেই—জান' তো সেখানে আমি কত দুর্বল, কত অসহায়! যাত্রার দিন কিন্তু আসন্ন। তুমি কি আসবে না? কোন কথাই কি জানাবে না? শুধু স্বপ্নই দেখলুম? যদি না আসো, এই আমার শেষ প্রণাম।

ইতি—বিজু

চিঠিখানার ওপর হ'তে তার চোখদুটো যেন নড়তে চায় না। তার দেহের সমস্ত শক্তি যেন সেই দৃষ্টির মাঝে জড়ো হ'য়ে চিঠির প্রতিটি অক্ষরের ওপর ছড়িয়ে পড়েচে। তার সমস্ত সত্তার ছায়া ঐ ছোট্ট চিঠিখানি আঁকড়ে ধরেচে। তার নড়বার শক্তি লোপ পেয়েচে। তার দেহের নীচে বুকখানা কাঁপচে। হৃদ্‌পিণ্ডের সেই ধক্‌ধকানি শব্দ সে শুন্‌তে পাচ্ছে, রক্তের মাঝে অনুভব করচে। শিরায় উপশিরায় রক্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠেচে। বিজু! বিজু! বিজুকে সে কবে হারিয়েচে, বিজুকে সে ভুলে গেছে। সে আজ আবার এই লেখার মধ্যে দিয়ে রূপ পরিগ্রহ ক'রে তার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েচে সুদূর অতীতের অদৃশ্য লোক হ'তে! সে যেন শুন্‌তে চায় তার মনের কথা—তার মুখ হ'তে। কোন কথাই সে জান্‌তে পারেনি, তাই সে জান্‌তে এসেচে। চিঠির প্রতিটি হরফ বিজুর রূপ ধ'রে তার চোখের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে উৎসুক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করবে, ওগো, বলোনা কি বল্‌বে, চুপ ক'রে আছ কেন?

তিরিশ বছর আগে—চিঠিখানা লেখা—যেদিন বিজুনের সঙ্গে তার বিয়ের আগে শেষ দেখা হয় সেদিন ঠিক্‌ এই কথাই সে এম্‌নি ভাবে তার কাছে জান্‌তে চেয়েছিল। কিন্তু মনের ভেতর যে আসল কথা তার পাক খাচ্ছিল, সে কথা সে তাকে জান্‌তে দেয় নি। আজ তার মনের অন্ধকার গহন হ'তে ছায়াছবির মত ফুটে উঠল' বহুদূর অতীতের সেই স্বপ্নরঙীন্‌ দিনগুলি! নিজেদের অজ্ঞাতে তাদের মনের মাঝে একটা গোপন সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল, যে সম্বন্ধ তাদের সংসারের আর সকলের কাছ হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রেছিল। এটা সে মনে প্রাণে অনুভব করতো। বিজনকে একা কাছে পেলেই এম্‌নি একটা অভাবনীয় চিন্তায় তার যৌবনরাঙা রক্তে আগুন ধ'রে যেত অথচ কোন দিন সে মুখফুটে কিছু তাকে বল্‌তে পারতো না। চিরদিনই সে লাজুক, তার বয়সের পুরুষদের চেয়ে সে ছিল দুর্বল। কিন্তু এই দুর্বলতাটুকুই বিজনকে আকর্ষণ করতো. তার মনে মায়া জাগ্‌তো। দিনের পর দিন তারা উৎসুক হৃদয়ের গভীর আকুলতা নিয়ে পরস্পরের পানে এগিয়ে গেছে, কিন্তু মনের আসল গোপন বার্ত্তাটি কেউ প্রচার করতে পারেনি—সাহসে কুলোয় নি। আত্মসম্মানবোধ তাদের মুক ক'রে দিয়েচে। অনুরাগ প্রকাশ পেয়েচে তাদের হাবেভাবে, অন্তরের গভীরে, ইঙ্গিতে ইসারায়, তবু তারা তাদের বক্তব্য মুখ ফুটে বল্‌তে পারে নি, সঙ্কোচ, কুণ্ঠায়। হরকালির জীবনে মেয়ে সঙ্গী এই বিজনই প্রথম ও শেষ। ঐ একটি মেয়েকে সে জীবনে ভালোবেসেছিল, নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে তাকে পেতে চেয়েছিল। পেতেও হয়তো তাকে পারতো—কিন্তু পেলে না নিজের বোকামি ও আত্মম্ভরিতার দরুন। বিজনকে তাকে হারাতে হলো, সেও সত্যিকার পুরুষ নয় বলে।

শেষের দিন বিজন অস্থির আকুল হ'য়ে তার মন জানতে চেয়েছিল। তখন তার বিয়ের সম্বন্ধ চল্‌ছে। সে শঙ্কিত আয়ত কালো চোখদুটি হরকালির মুখের ওপর তুলে ধরে বারবার প্রশ্ন করেচে, ওগো কিছু বলোনা? বলোনা কি বল্‌তে চাইছ, চুপ ক'রে থেকো না। সে শুনতে চেয়েচে, নিজেকে প্রকাশ ক'রে দিতে চেয়েচে। কিন্তু হরকালি তাকে সে অবকাশ দেয় নি—নিজেও মুখফুটে কিছু বলে নি।

তিরিশ বছর পরে আজ হরকালি ভাবতে বসেচে, কি সে বিজনকে বলতে পারতো, কী তার বলা উচিত ছিল, বিজনকে জানালে কী উপায় সে করতো?

বিজন মেয়েটিও ছিল ভীরু ও শান্ত প্রকৃতির। সে হরকালির এই নীরবতায় গভীরভাবে শঙ্কিত হ'য়ে উঠেচে,

তার সমস্ত উৎসাহ গেছে নিভে। নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ও নিরুপায় মনে হ'য়েচে।

শেষে তার বিয়ের ঠিক হ'য়ে গেলে, বিজন তাকে এই চিঠিখানা লেখে। নিতান্ত নিরুপায় হ'য়ে। তখনকার দিনের বাঙালী গৃহস্থের মেয়ের পক্ষে এর চেয়ে স্পষ্ট হওয়া দুঃসাধ্য ছিল। তা ছাড়া বিজনের অন্তরে ছিল তার প্রতি গভীর সশ্রদ্ধ অনুরাগ। নিজের জন্য সে তাকে উৎপীড়িত করতে পারে নি। আর হরকালি এ চিঠির উত্তরে তাকে কিছুই জানায়নি, কোন কিছু বলে নি। কারণ সে তার জীবনে কাঁটা হ'তে চায় নি। কিন্তু আজ তার বারবার চিঠিখানা পড়ে মনে হলো, বিজন তাকে চেয়েছিল, সেই স্বপ্নই সে দেখেছিল, তার স্ত্রী হ'য়ে তার জীবনেই সে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু সে তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে তাকে আসতে দেয় নি, তার জীবনকে ব্যর্থ ক'রে দিয়েচে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনকে সে বিড়ম্বিত ক'রে তুলেচে।

হ্যাঁ! নিজের জীবনকে সে ব্যর্থ করে দিয়েছে, নিজেকে কে বঞ্চিত ক'রেছে। এই দীর্ঘদিন পরে আজ সে উপলব্ধি করলে বঞ্চনার বেদনা। ব্যর্থতার হতাশ্বাসে তার জীর্ণ বুকখানা দুলে উঠ্‌লো। নিজের বিরুদ্ধে তার মনটা বিষিয়ে উঠ্‌লো। একটা গভীর আক্রোশে সে নিজের পানে রুখে দাঁড়ালো।

আজো সে কুমার! পঞ্চান্নটি বৎসরের দীর্ঘ জীবনে সে কোন নারীর সঙ্গলাভ করেনি,—তার শয্যা-সঙ্গিনী হ'য়ে, তার প্রেয়সী হ'য়ে আজো কেউ তার জীবনে আসে নি। সে অধিকার সে কারুকে দেয় নি। কেন দেয় নি? বিতৃষ্ণা না ঔদাসীন্য? হরকালি নিজেকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখ্‌লে। গভীর ঔদাসীন্য তার জীবনকে কালো ক'রে দিয়েচে নিজেকে সে ক্ষয় ক'রেছে। তা না হ'লে বিজনকে তাকে হারাতে হ'ত না। তাকে সে পেয়ে হারিয়েছে। বিজনকে সাথী পেলে তার জীবন সার্থকতায় ভ'রে উঠ্‌তো। ফুলে ফলে তার এই নির্জন বাড়ীঘর রূপায়িত হ'য়ে উঠ্‌তো, তার বংশ লুপ্ত হতো না। এই নিঃসঙ্গ নির্জন পুরীতে যখন তার অন্তিম ঘনিয়ে আস্‌বে, প্রিয়জন কেউ কাছে থাকবে না যে তার জন্য অশ্রু মুছবে—হরকালির অন্তরাত্মা শিউরে উঠ্‌লো, কান্নার আবেগে তার সর্বশরীর ফুলে ফুলে উঠ্‌লো, নিজের অনাগত জীবনকে একটা দুঃসহ বিভীষিকা মনে হল'। কী করেছে সে! কী ক'রেছে! বিজনের চিঠিখানা যেন বিদ্রূপের স্বরে বারংবার প্রশ্ন করছে—কিছুই বললে না, শুধু স্বপ্নই দেখ্‌লে? আবার সে যেন ভ্রূকুটি কুটিল রক্ত চক্ষু পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করছে—কেন তুমি আমাকে নিয়ে এ নিষ্ঠুর খেলা খেল্‌লে, যদি আস্‌বে না জান্‌তে? কেন? কী অধিকার ছিল?

কতবার যে সে চিঠিখানা পড়লে। যে বিজন ছিল তার কাছে অস্পষ্ট ও ঝাপ্‌সা আজ সে দিনের আলোর মতই স্পষ্ট। সে তাকে ভালোবেসেছিল, সে আসতে চেয়েছিল তার জীবনে! হরকালি তাকে বঞ্চিত ক'রেচে, তাকে ঠকিয়েছে। তার সঙ্গে সস্তার প্রেম করতে গিয়েছিল, বিবাহিত জীবনের গুরুভার বহন করবার মত শক্তি ও সাহস তার ছিল না। অনুশোচনায় ও ধিক্কারে তার মনটা তিক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো।

অন্যায়! অন্যায় সে ক'রেচে। বিজনকে তার জীবন হ'তে বিতাড়িত ক'রে সে মহাপাপ ক'রেছে। এর প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতেই হবে। হরকালি সারারাত ঘুমুতে পারলে না।

বিজনের বিয়ে হ'য়েছে, গরীব গেরস্তর ঘরে। হুগলিতে তার শ্বশুর বাড়ী। তার শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গেও হরকালির একটা দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল, পরিচয় ছিল।

হরকালি পরদিন বিজনের শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লো। সেকেলে পুরোনো বাড়ী, জীর্ণ নোনাধরা, সংস্কার অভাবে পোড়ো বাড়ীর মত চেহারা। অনেক ডাকাডাকির পর একটি পনেরো ষোল বছরের ছেলে এসে খবর দিল, বাবা কল্‌কাতা গেছেন।

হরকালি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে বল্‌লে, তোমার মাকে বলগে ভবানীপুর থেকে হরকালি বাবু এসেছেন। তোমার মার সঙ্গে দেখা করবো।

হরকালির সাম্‌নে যে প্রৌঢ়া মহিলাটি হাসিমুখে এসে দাঁড়াল, তার মাঝে বিজনের কোন চিহ্নই নেই। তার মাঝে তার অনন্ত কামনার বিজনকে খুঁজে বের করতে হরকালিকে হাতড়ে মরতে হলো। সে বিস্ময় বিস্ফারিত নিস্পলক দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়ে আছে দেখে বিজন সলজ্জ ভঙ্গীতে বললে, কী চিন্‌তে পারচো না? আমিই বিজন।

তুমিই বিজন? হয় তো সত্যি, কিন্তু হরকালির চোখ যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না। এ যে কাঠামোটা পর্য্যন্ত বদ্‌লে গেছে। আঁটসাট দেহ ঢিলে হ'য়ে এসেছে, রঙ্ জ্ব'লে গেছে, মাথার চুলগুলো পাতলা হ'য়ে এসেছে। দীঘল ঋজু দেহ সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। পান ও দোক্তার রসে দাঁতগুলো কালো হ'য়ে

গেছে। কি দেখে হরকালি তাকে চিন্‌বে? আছে শুধু আয়ত কালো চোখদুটি—তাও জ্যোতি নিবে এসেছে। মুখের মাঝে জেগে আছে ধারালো সোজা নাকটি। অবিন্যস্ত এলোমেলো চুলগুলো শ্রান্তিভরা মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। ঐশ্বর্য্যের মধ্যে হাতে দুগাছি শাঁখা আর কপালে জ্বল্ জ্বল্ করছে দীর্ঘ সিন্দুরের রেখা। পরণে একখানা মিলের থয়ের পাড় শাড়ী, আঙ্গুলের ডগায় হলুদের ছোপ্।

বিজন তার তীব্র সন্ধানী দৃষ্টির নীচে সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠলো, নিজের দারিদ্র্যে হয়তো খানিকটা লজ্জিতও হ'লো। বিজন অপ্রস্তুতের ভঙ্গীতে হাস্‌তে হাস্‌তে বললে, আমি বুঝতেই পারিনি যে তুমি। একটু বসো, আমি রান্না চাপিয়ে এসেচি। কী ভাগ্যি?

বিজন ঘর হ'তে বেরিয়ে গেল। হরকালি স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল। কোথায় গেল বিজনের সেই ক্ষিপ্র চলার ভঙ্গী! এ তো সে নয়। সেই প্রাণ-চঞ্চল, আনন্দময়ী বিজন তো এ নয়। এর মাঝে আলো নেই, এ যেন অন্ধকারের শিখা। এর দেহ হ'তে নারীর মৌলিকত্ব নিঃশেষে মুছে গেছে। সুদীর্ঘ জীবনের বেদনাময় নিষ্ফলতায় এর অতীত যেন অস্পষ্ট হ'য়ে গেছে। হরকালি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে এই ওর নিয়তি, হয়তো ও ফুটতে পায়নি, পাপ্‌ড়ি মেলে জীবনকে অভিনন্দিত করবার আগেই ও শুকিয়ে গেছে। হরকালির মনে হয় উদ্দাম জীবনকে অভিনন্দিত করবার সুযোগ ও সুবিধা তারও কখন মেলে নি।

বিজন এসে ঘরে ঢুক্‌লো। সে যেন পূর্বের চেয়ে একটু গোছাল, মনের মাঝে সাহস ও শক্তি সঞ্চয় ক'রে সে যেন তৈরি হ'য়ে এসে দাঁড়িয়েছে। বিবর্ণ মুখে রক্তের ছোপ্ লেগেছে। হাসিতে মুখখানাকে আর একটু রাঙিয়ে তুলে বিজন প্রশ্ন করলে, তারপর? হঠাৎ আমাদের মনে পড়ল যে?

হরকালি সোজা মুখ তুলে উত্তর দিল, তোমাদের নয়, তোমায়—

ঈষৎ ঠোঁট্ দুটি ফুলিয়ে বিজন বললে, কারণ?

—কারণ আছে বৈকি? আগে কেমন আছো বলো।

বিজন বল্‌লে, চমৎকার। তুমি তো বেশই আছো, মনে হ'চ্ছে।

হরকালি হেসে উঠলো, কিসে বুঝলে? চেহারা দেখে?

ঘাড় নেড়ে বিজন বল্‌লে, হ্যাঁ। তপোবনের মুনি ঋষির মত জীবনটা বেশ কাটিয়ে দিলে।

এতোদিন, তাই মনে হতো। হরকালি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লে।

উৎসুক সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে বিজন জিগ্‌গেস করলে, আর এখন?

—এখন? ব'লে চকিত নিঃশব্দ দৃষ্টিতে বিজনের মুখের পানে চাইল।

তার মুখখানা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। বিজন লক্ষ্য করলে, তার এই ভাবান্তর। সে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠে বললে, এখন কি অনুতাপ হ'চ্ছে?

হরকালি চম্‌কে উঠে বললে, অনুতাপ হ'লেই বা উপায় কি? এখন তো আর সত্যিকার জীবনে ফিরে যাওয়া চলে না।

বিজন মুখ নীচু ক'রে হাসলে। হরকালি সেই খামে ভরা নীল চিঠিখানা পকেট হ'তে বের ক'রে বিজনের হাতে দিয়ে বল্‌লে, দেখো তো এখানা—চিন্‌তে পারো?

বিজন হাস্‌তে হাস্‌তে বললে, তা হলে দাঁড়াও, চশমাটা নিয়ে আসি। আচ্ছা, তোমার চশমাটাই একবার দাও।

হরকালির চশমাটা চোখে দিয়ে বিজন চিঠিখানা পড়তে পড়তে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌ল। তেম্‌নি হাসতে হাসতে বিজন হরকালির মুখের পানে চেয়ে বললে, আঃ গেল! এখানা মাদুলি ক'রে রেখে দিয়েছো কেন?

হরকালি নির্বাক বিস্ময়ে বিজনকে লক্ষ্য করলে,—কৈ তার মুখে তো এতটুকু ভাবান্তর নেই—অতীতের এতটুকু ছায়া নেই! বেশ সহজভাবেই তো গ্রহণ করলে।

বিজন হাসতে হাসতে বললে, বিয়ের ঠিক হ'য়ে গেলে চিঠিখানা লিখেছিলুম। এক যুগ হ'য়ে গেল।

হরকালি বললে, কাল হঠাৎ চিঠিখানা পেলুম, পুরোনো দপ্তর ঘাঁটতে ঘাঁটতে। পেয়ে অবধি এর উত্তর দেবার জন্যে আমি হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিলুম। তাই তো এতো পথ ছুটে এলুম।

—ঢং বুড়ো মিন্‌সের। চিঠির জবাব দিতে এলে তিরিশ বছর পরে।

—হ্যাঁ, ভাবলুম, এখন আমার বয়স পঞ্চান্ন, তোমারও অন্ততঃ পঁয়তাল্লিশ। এখন যদি আমার মনের কথা তোমায় জানাই বা তোমার কথা জান্‌তে চাই, তা হ'লে বোধ হয় কোন অভদ্রতা হবে না, ব'—

সঙ্গে সঙ্গে বিজন সশব্দে হেসে উঠল'। মাথা খারাপ না কি?

হরকালি সোজা প্রশ্ন করলে, না আমি শুনতে চাই বিজু, অপরাধ নিয়ো না।

বিজন তার আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বরে সচকিত হ'য়ে বললে, কী শুনতে চাও? শুনে কি হবে?

হরকালি বল্লে, সেই কথাটিকে জীবনের মূলধন ক'রে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবো—

—কি বলো?

হরকালি প্রশ্ন করলে, তুমি যা আমার মুখ হ'তে শুনতে চেয়েছিলে তা যদি তখন আমি তোমায় বলতুম,—

বিজন উত্তর দিল, তুমি না বল্লেও আমি জানতুম।

—জানতে? জান্তে যদি তবে—

বিজন বাধা দিয়ে বললে, তুমি তো আমায় চাইলে না।

—চাইলে কি করতে?

বিজন হাসলে। বললে, জানি না। যতো বাজে কথা।

আগেকার দিনের আদর করার মত অদ্ভুত কোমল কণ্ঠে হরকালি বললে, বাজে কথা নয় বিজু। তামাশা করিনি। আমার বিড়ম্বিত জীবন ঐ কথা শোনবার জন্যে হাঁপিয়ে উঠছে।

হরকালির কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এলো। বহুদূর হ'তে যেন সংক্ষেপে বিজন বললে, তখন তোমাকে আমার অদেয় কিছুই ছিল না। চাইলে আমাদের জীবনের পথ যেতো বদ্‌লে—

—মা! একটি মেয়ে এসে ঘরের দোরে দাঁড়িয়েছে। বছর সতোরো বয়েস। চমৎকার মেয়েটিকে দেখ্‌তে। মাথায় একমাথা কালো কুচ্‌কুচে ঝাঁক্‌ড়া চুল! অপরূপ উজ্জ্বল দুটি কালো চোখ। শরীরের সুন্দর বাঁধুনি। হরকালির বুকখানা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। এই তো, এই তো বিজন! এতক্ষণ যার সঙ্গে সে কথা বল্‌ছিল, সে তবে কে? এ যে একেবারে হুবহু সেই। অতীতের সেই ছবি। চলার সেই ক্ষিপ্র ভঙ্গী, সেই হাসি, সেই মুখ, চোখের সেই দীপ্তি! এই তো বিজন!

বিজন মেয়েকে কাছে ডেকে ইসারায় প্রণাম্ করতে বললে। মেয়েটি হরকালিকে নত হয়ে প্রণাম করল। হরকালি তার মাথার পশমের মত চুলের ওপর হাত রেখে

—অমলা।

আশ্চর্য্য! সেই কণ্ঠস্বর!

হরকালি মুগ্ধ সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়ে বল্লে, বাঃ খাসা মেয়ে তো! চমৎকার!

বিজন সহসা বললে, মেয়ে তো খাসা, লেখাপড়াও শিখ্‌চে, গান জানে, তবু ভালো পাত্র তো জুটছে না। একটি পাত্র দেখে দাওনা। ভালো ছেলে কেউ নেই?

মেয়েটির মুখখানা আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। সে অস্ফুট প্রতিবাদের কণ্ঠে বললে, মায়ের কেবল ঐ সব।

হরকালি হাসতে হাসতে বললে, আরে দূর্! এ মেয়ের আবার বরের ভাবনা? এমন লক্ষ্মীর মতো মেয়ে—

হরকালি তার চিবুক স্পর্শ ক'রে মুখখানি তুলে ধরে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লে।

বিজন বল্লে, মা লক্ষ্মীকে তো অম্‌নি কেউ নিয়ে যাবে না, আমরা তো একটির বিয়ে দিতেই সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে গেছি।

ভ্রূকুটি হেনে মেয়েটি বলে উঠ্‌লো, মা যেন কি!

বিজন বললে, ওরে, ওর কাছে আমার কোন লজ্জাই নেই। তোরা তো জানিস নি—

বিজন হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে হরকালির পানে তাকাল। ওর চোখে কি ছিল জানি না, কিন্তু ওর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে হরকালির মনে হলো যেন ওর ভেতরকার মানুষটি দুর্ব্বার নিয়তির সঙ্গে লড়াই ক'রে নিতান্ত নির্জ্জীব হ'য়ে পড়েছে।

বিজন বললে, ওইটুকু মেয়ে, সকালে জজ্ সাহেবের মেয়েকে পড়ায়, তারপর সারাদিন কলেজে পড়ে।

—তাতে হ'য়েচে কি মা? মেয়ে প্রতিবাদ করলে।

বিজন বললে, না, তাই বলচি।

হরকালি স্তব্ধ দৃষ্টি দিয়ে কিছুক্ষণ অমলার পানে চেয়ে থেকে দৈবাৎ তাকে কাছে টেনে নিয়ে বিজনকে বললে, বেশ মেয়েটাকে আমায় দিয়ে দাও বিজু। আমি ছোট্ট মা'টিকে নিয়ে গিয়ে আমার শূন্য ঘরে প্রতিষ্ঠা করবো।

অমলার মুখখানি তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, পারবি না মা এই বুড়ো ছেলেটির ভার নিতে?

উৎসুকভরা দৃষ্টিতে বিজন তার পানে চাইলে। হরকালি হাস্‌তে হাস্‌তে বললে, বিশ্বাস হ'চ্ছে না বুঝি? আমার একটি ভাগ্‌নে, তরুকে তো তুমি জান্‌তে বিজু,

তরুণ ছেলে। আমার কাছে থেকেই লেখাপড়া করে। অনার্সে বি-এস্-সি পাশ করেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে বিলেত যাবে। তারই বউ করে নিয়ে যাবো আমার অমলা মাকে।

দৈবাৎ অন্ধকারে একটা তীব্র আলোকরশ্মি দেখে যেমন মানুষ চম্‌কে ওঠে, ঠিক তেমনি ভাবেই বিজন প্রশ্ন করলে, সত্যি?

হরকালি উত্তর দিল, যদি এর বাবার কোন আপত্তি না থাকে।

বাঁকা চোখে ভ্রুকুটি হেনে বিজন বললে, আমাদের দুঃখের সংসারে, তোমার আশীর্ব্বাদে, মতের বিরোধ কোন-দিন ঘটেনি। সে ভয় তোমার নেই।

হরকালি প্রসন্ন হাসিতে মুখভরে চেয়ে দেখ্‌লে, অমলাও মুখ টিপে হাস্‌চে।

মিশ্র-অর্থনীতি

[সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার সমন্বয়]

শ্রীযতীন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

গত মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্প সমিতি সঙ্ঘের (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) রজত জয়ন্তী উৎসব অধিবেশনে, বর্তমান স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক ভারত রাষ্ট্রের অর্থ-নীতির রূপ ও রীতি সম্পর্কে রীতিমত প্রখর আলোচনা ঘটিয়াছিল। এই আলোচনার মূলে ছিল, পরিকল্পনা-বিধান-সমিতির পঞ্চ-বার্ষিক বিবৃতি এবং ভারতীয় বণিক ও শিল্পী সম্প্রদায়ের অভীপ্সিত কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য উন্নয়নমূলক মতবাদের দৃশ্যতঃ বিরোধ। ভারতের নব-জাগ্রত উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রধান প্রধান কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যকে জাতীয়করণের অনুরাগী। পক্ষান্তরে ভারতীয় ধনপতি ও শিল্পপতিগণ বেসরকারী সমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রচেষ্টার অধিকতর প্রসার ও প্রতিপত্তির পক্ষপাতী। ভারতের রাষ্ট্রগত, জাতিগত এবং ব্যক্তিগত উন্নতি সংসাধন উভয় সম্প্রদায়ের মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য। বিরোধ, এই সুমহান উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টায়, সরকারী ও বে-সরকারী অর্থ-সামর্থের বিনিয়োজন এবং দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের অংশ লইয়া। বহুজনহিতকল্পে রাষ্ট্রপতিদের অভিপ্রায়, জাতীয় প্রচেষ্টার প্রসার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। পক্ষান্তরে ভারতীয় ধনপতি ও শিল্পপতিদিগের অভি-প্রায়—বে-সরকারী প্রচেষ্টার ক্রমবর্দ্ধমান বিস্তৃতি। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে একটি আপোষ রফার প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই বিরোধের আশু মূলোচ্ছেদ দৃঢ় অধ্যবসায়-প্রণোদিত হইয়া আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু একটু উগ্রভাবেই বলিয়াছিলেন যে, বে-সরকারী প্রচেষ্টা গণতন্ত্রের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন নহে; অর্থাৎ গণতন্ত্র পূর্ণ জাতীয়করণের আওতায় প্রবৃদ্ধি-লাভ করিতে পারে। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, পরি-কল্পনা-বিধান-সমিতির পঞ্চ-বার্ষিক বিবৃতি, বে-সরকারী অভিযোগ অনুযায়ী, দুঃসাহসিক নহে; বরং বিশেষ মৃদু এবং কিছু দিন পূর্ব্বেকার বে-সরকারী প্রয়াস-প্রসূত বোম্বাই পরিকল্পনা অপেক্ষা অধিকতর বাস্তব গুণসম্পন্ন। তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অনুসৃত পররাষ্ট্র-নীতি, প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মূলধন আমদানীর বিশেষ অনুকূল হইয়াছে; কোনপ্রকারে বৈদেশিক ধনপতি কিংবা শিল্পপতিদিগের প্রকৃষ্ট স্বার্থের প্রতিকূল হয় নাই। ধনপতি ও শিল্পপতিদিগকে তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা যেন সর্ব্বদা সঙ্কীর্ণ স্বার্থের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ষট্‌ত্রিংশত কোটি ভারতের নরনারীর কল্যাণের প্রতি প্রগাঢ় লক্ষ্য রাখিয়া সর্ব্ববিধ উন্নতিমূলক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। যাহারা মূক ও মূঢ়, যাহারা দীন ও দরিদ্র তাহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইবে। এ বিষয়ে অবশ্য কাহারও মতদ্বৈধ নাই; কিন্তু ধনিক, বণিক, শ্রমিক ও পরিচালকবর্গের অকপট ও আন্তরিক সহযোগিতা এবং একনিষ্ঠ অকুণ্ঠিত প্রগাঢ় প্রযত্নশীল প্রচেষ্টা অতীব প্রয়োজন।

অর্থ-নীতি রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত। পরন্তু ইহা রাজনীতির প্রকৃষ্ট অংশ। কূটনীতি অপেক্ষাও গরিষ্ঠ ও বরিষ্ঠ; কারণ সর্ব্ব নীতির মূল অর্থনীতি। অর্থ ব্যতীত জগতে কোন কার্য্যই সংসিদ্ধ হয় না। অর্থনীতি অধুনা পরিপুষ্ট হইয়া বহু শাখাসমন্বিত বিশাল ও বিস্তৃত শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পাঠ্যাবস্থায় রাজনৈতিক অর্থনীতিই আমাদের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন শ্রমে, শিল্পে, ব্যবসায়ে, বাণিজ্যে,—আমাদের সর্ব্ববিধ কর্ম্ম প্রচেষ্টায় অর্থনীতির আসন সর্ব্বোচ্চে। অর্থনীতির মূলতত্ত্ব, মিতব্যয়ের ভিত্তিতে, অর্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার দ্বারা অভাব অনটন বিদূরিতকরণ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রই আমাদের প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ। তৎপূর্ব্বে মহাভারতে প্রাচীন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ পিতামহ ভীষ্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম্ম প্রসঙ্গে রাজকোষের সংগ্রহ, সংস্থান এবং আয়ব্যয় ব্যবস্থা সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তদানীন্তন অর্থনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—প্রজা পালন, অর্থাৎ শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ। ক্ষাত্র শক্তির অবসানে, ইস্‌লামের আবির্ভাবে ও প্রতিপত্তিতে এ নীতির বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। মুসলমান শাসনের অবসানে, বৃটিশ সিংহের আবির্ভাবে ও প্রতাপ-প্রতিপত্তিতে এই নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া শাসন-নীতি শোষণ-নীতিতে পরিণত হয়। ইতিপূর্ব্বে এ দেশের অর্থসম্পদ লুণ্ঠনকারিগণ কিছু কিছু অপহরণ করিয়াছিল বটে; কিন্তু দ্বিশতাব্দীব্যাপী নির্ম্মম ও নিয়মিত শোষণে অপহৃত ও দেশান্তরিত হয় নাই। ভারতের জাতীয় মহাসমিতি ইহার পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছিল, মাত্র কোটিতে নহে,—আমাদের অর্থ পরিমাণ নির্দ্দেশের উচ্চতম সংজ্ঞায়। বহু শতাব্দীব্যাপী পরাধীনতার পরিপীড়নে আমাদের স্বর্ণ-প্রসূ ভারত ভূমি চির দারিদ্র্যের সহিত দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে। দুঃখ-ক্লেশ ও কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা এখন আমাদিগকে অর্থ সৃষ্টি ও বৃদ্ধি, এবং তাহার বিধি সঙ্গত বণ্টন-বিতরণ দ্বারা দেশব্যাপী আপামর সাধারণের সর্ব্ববিধ অভাব-অনটন বিমোচন পূর্ব্বক অন্ন-বস্ত্রের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে হইবে। কঠিন সমস্যা!

অন্যান্য দেশের ন্যায়, আমাদের দেশেও অর্থ সৃষ্টি ও বৃদ্ধির প্রধান উপায়,—কৃষি ও শিল্প। ভূমিলক্ষ্মী-প্রদত্ত সম্পদ্-সম্ভার আহার্য্য-ব্যবহার্য্যে পরিণত করিয়া, দেশাভ্যন্তরীণ সর্ব্ববিধ অভাব-অনটন বিদূরণপূর্ব্বক, উদ্বৃত্ত পণ্য-সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করিয়া, অর্থ-সম্পদ ও সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধিই, অন্যান্য দেশের ন্যায়, আমাদেরও অর্থনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের দেশের ভূমিজ ও খনিজ সম্পদ-সম্পত্তি অন্যান্য দেশের তুলনায় প্রচুর, এবং সর্ব্ববিধ অভাব অনটন বিমোচনের উপযোগী। কিছুদিন পূর্ব্বে পর্য্যন্ত আমাদের দেশের অর্থনীতি, অন্যান্য দেশের ন্যায়, ধনপতিদিগের সম্পূর্ণ আয়ত্তান্তর্গত ছিল। ধনিকদিগের অযথা মুনাফা লাভের লোভে, বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদিগকে নিঃস্ব ও ভোগসুখে বঞ্চিত রাখিবার ফলে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শিল্পনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ, স্বচ্ছল অবস্থাসম্পন্ন বহু ব্যক্তির নিকট হইতে সামর্থ্য পরিমিত উদ্বৃত্ত অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক, অভিলষিত কৃষি কিংবা শিল্প প্রচেষ্টার উপযোগী মূলধনের সংস্থান করিয়া, যৌথ কারবারের সৃষ্টিবিধান করিয়াছে। সমবায় প্রচেষ্টার ফলে, এক-প্রভুক ধনিকদিগের সর্ব্বগ্রাসী অর্থগৃধ্নুতার অক্ষুন্ন প্রভাব প্রতিপত্তির খর্ব্বতা, এবং মধ্যবিত্ত ব্যবসায় বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি ঘটে। ক্রমে ধনপতিদিগের একাধিপত্য খর্ব্ব করিয়া কৃষি ও শিল্পপতিদিগের অভ্যুদয় ঘটে। আধুনিক কৃষি ও শিল্পপতিদিগের কেহ কেহ পূর্ব্বতন ধনপতিদিগের ন্যায় আত্মসর্ব্বস্ব পুঁজিপতি-প্রবৃত্তিপরায়ণ হইয়াছে। এই নিমিত্ত নূতন সাম্যবাদ-নীতি অনুযায়ী রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে; এবং কৃষিপতি ও শিল্পপতিদিগের একচেটিয়া কৃষি-শিল্প প্রচেষ্টার সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্ধ নীতির অবসান কল্পে, শাসন-পালন কর্ত্তব্যের সহিত কৃষি-শিল্প প্রচেষ্টার প্রবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বহুজনহিতকল্পে বহু সংখ্যক কৃষক, শ্রমিক ও শিল্পী কারিগরের পরিশ্রমের উপযুক্ত পরিমাণ মজুরী ও মুনাফার অংশ প্রদানপূর্ব্বক তাহাদের অতি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধ্য জীবনযাত্রা স্বচ্ছল ও স্বচ্ছন্দ করিবার প্রচেষ্টা বহুলাংশে সম্ভব ও সফল হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে নবজাগ্রত প্রজা-শক্তি-সামর্থ্য-সম্পন্ন সোভিয়েট রাশিয়ায় এই প্রচেষ্টার প্রথম প্রবর্ত্তন ও পরিপুষ্টি সাধিত হয়। রাশিয়া অবশ্য জীবন-যাত্রা নির্বাহের সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টা রাষ্ট্র শাসন পরিচালনাধীন করিয়াছিল। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন একাধিপত্য কোন ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যকর নহে। এই নিমিত্ত অন্যান্য সর্ব্ব স্বাধীন রাষ্ট্রে সংরক্ষণ-সংক্রান্ত শিল্প এবং জনসাধারণের হিত-সাধক শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যসংবিধান ও যানবাহন পরিচালন প্রভৃতি প্রচেষ্টা রাষ্ট্রের নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় ত্রুটি-বিচ্যুতিও প্রচুর। রাষ্ট্র পরিচালনা ও বেসরকারী পরিচালনার

তুলনামূলক সমালোচনা সম্ভবপর নহে। দোষ-ত্রুটি উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। কিছুদিন পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়োগক্রমে সিভিলিয়ান মিঃ গোরওয়ালা উভয় প্রয়াস-প্রচেষ্টার তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া, উভয়ের মধ্যে একটি দোষ-গুণের সামঞ্জস্য সংস্থাপনের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতা মনিব সভা (Employers' Association, Calcutta) তাহার একটি তথ্যবহুল পাল্টা জবাব দিয়াছে। সরকারী প্রচেষ্টায় ব্যয় বাহুল্যই প্রধান ত্রুটি।

মানব জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে, সর্ব্বপ্রচেষ্টায় প্রতিযোগিতা উন্নতি ও উৎকর্ষের মূল। প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে উদ্যম, উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং উদ্ভাবনী শক্তির উৎকর্ষসাধনের প্রয়াস সর্ব্বদা উদগ্র থাকে; পরন্তু প্রতিযোগিতাশূন্য ক্ষেত্রে এই সকল বৃত্তির স্ফুরণ, প্রকাশ ও বিকাশের কোন অবকাশ থাকে না। এই হেতু পাশাপাশি উভয় প্রচেষ্টার পরিস্ফুরণ ও পরিপোষণ অতীব প্রয়োজন। রাষ্ট্র ও জনসাধারণের পক্ষে এইরূপ ব্যবস্থাই সমীচীন। বৃটিশ শাসনে আমরা সরকার ও যৌথ-প্রতিষ্ঠান-পরিচালিত রেলপথের আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। কয়লার খনি-পরিচালন ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সরকারী প্রচেষ্টায় দায়-দায়িত্বের গুরুত্ব সত্ত্বেও অপচয় ও অপব্যয় ঘটে প্রচুর। এ ক্ষেত্রে "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন" নীতিই প্রবল। কিন্তু বে-সরকারী ক্ষেত্রে এ নীতি অচল; ফলে, মিতব্যয়িতার প্রতি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। অনুশীলন, অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা ও সমীক্ষণের প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টা প্রবল হয়। নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবনের ফলে, দেশ ও জাতি সমৃদ্ধি লাভ করে। আমাদের স্বাধীনতা অর্জ্জনের প্রারম্ভে সর্ব্ববিধ শিল্প-সম্পর্কীয় প্রচেষ্টা জাতীয়করণের (Nationalisation) একটি অনমনীয় উন্মাদনা আসিয়াছিল। গত কয়েক বৎসর বাস্তবের সংঘাত ও সংস্পর্শের অভিজ্ঞতার ফলে, তাহার শুভ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও তন্নিযুক্ত পরিকল্পনা-পরিষদ (Planning Commision) যে অর্থনীতি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে "মিশ্র অর্থনীতি" (Mixed Economy)—অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে, যুগপৎ সরকারী ও বে-সরকারী প্রয়াস-প্রচেষ্টা। গত এপ্রিল মাসে মহাসভার অধিবেশনে অর্থসচিব এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"গত তিন বৎসরের নীতি অনুযায়ী আমরা (কেন্দ্রীয় সরকার) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের "মিশ্র অর্থনীতি" অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, এবং এই নীতি কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত তদনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করাও প্রয়োজন। আমার মনে হয়, ধনিকদিগকে, তাহারা মাত্র ধনপতি বলিয়া নহে, পরন্তু পরিচালক (Entrepreneurs) হিসাবে, এবং তাহাদের সহিত অন্যান্য যাহাদের উপর আমরা এই "মিশ্র অর্থনীতির" বে-সরকারী বিভাগে উন্নতির নিমিত্ত নির্ভর করি,—তাহাদের সকলকেই কিছুটা সুবিধা (Concession) দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।" প্রতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে—সেই দেশের অর্থ-সঙ্গতির উপর। সুতরাং, ভারতের অর্থসচিবের এই ঘোষণা অতীব আশাপ্রদ। সর্ব্ব দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে বে-সরকারী প্রয়াস-প্রচেষ্টার মূল্য, সরকারী প্রয়াস-প্রচেষ্টা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। রেলপথ ও সেচ প্রভৃতি সর্ব্বজনহিতকর সরকার-পরিচালিত জাতীয় কুশল প্রচেষ্টার সহিত বে-সরকারী প্রয়াস-প্রচেষ্টা-প্রসূত শিল্প-অনুষ্ঠান বহু বর্ষ হইতে ভারতে প্রচলিত আছে। এবং এই মিশ্র অর্থনৈতিক প্রয়াস-প্রচেষ্টা-নীতি অধুনা অন্যান্য সাম্যবাদী, অথবা সমাজতন্ত্রবাদী দেশে অনুসৃত হইতেছে।

আমাদের দেশে যে কোনপ্রকার গুরু উন্নতি প্রচেষ্টায় স্থানীয়, অথবা স্বদেশীয় এবং বিদেশীয়, উভয়বিধ মূলধনের প্রয়োজন। বৃটেনের সহিত মৈত্রী সম্বন্ধ জাতিগুলির সম্প্রতি সিংহলের রাজধানী কলোম্বো নগরে যে মন্ত্রী সম্মেলন ঘটিয়াছিল, তাহাতে সাধারণতন্ত্রান্তর্গত জাতিগুলির পরস্পরের সাহায্যমূলক একটি অর্থনৈতিক চুক্তি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। এই চুক্তির নাম,—কলম্বো পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য শিল্পোন্নতি। তৎসাধনার্থ এই পরিকল্পনায় সহস্র কোটি স্থানীয় অর্থ, এবং আটশত কোটি বৈদিশিক অর্থের বরাদ্দ হইয়াছে। ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, আমাদের দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বর্ত্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী, আমাদের বহুবিধ শিল্পের প্রবর্ত্তন, সমন্বয়ন ও সম্প্রসারণের নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক অর্থের প্রয়োজন। স্বয়ং অর্থসচিব স্বীকার করিয়াছেন যে, কলোম্বো পরিকল্পনায় নির্দ্ধারিত দায়িত্ব, বৈদেশিক সাহায্য ব্যতীত, দুর্ব্বিসহ হইতে পারে। বর্ত্তমানে ধনপতিদিগের ধন বিনিয়োজনের লক্ষ্য হইতেছে—নিরাপদ ধন বিনিয়োজন ক্ষেত্র (Investment market)। এই মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন প্রয়োজন।

সৌভাগ্যক্রমে, কলোম্বো পরিকল্পনার ফলে, এবং আমেরিকার সৌজন্য ও সহৃদয়তার গুণে, আমাদের দেশে বৈদেশিক মূলধনের আমদানী সুরু হইয়াছে। কূটনীতি-সাধনের গূঢ় উদ্দেশ্য প্রণোদিত নহে, এরূপ বৈদেশিক মূলধনের অবাধ লাভজনক বিনোয়জনের আশ্বাস কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছে; এবং ভারতের প্রধান-মন্ত্রী এবং বাণিজ্য সচিব ও অর্থ সচিব পুনঃ পুনঃ মুক্ত-কণ্ঠে তাহার সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। বিভিন্ন দেশের দূত-নিবাসেও (Embassy) মুদ্রিত ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে। নিখিল জগত ধন-ভাণ্ডারের কর্ত্তপক্ষ প্রতিনিধি প্রেরণপূর্ব্বক স্থানীয় অনুসন্ধানে তুষ্ট হইয়া যে ঋণ প্রদান করিয়াছেন ও করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহার ফলেও বহু বৈদেশিক রাষ্ট্রের ধনপতিদিগের মনে ভারতে ধন বিনিয়োজনের নিরাপত্তা দৃঢ়মূল করিয়াছেন। সম্প্রতি মার্কিণের নব-রাষ্ট্রদূতের সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্র প্রদত্ত গমের মূল্য-ভাণ্ডারের অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিয়া যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহাই ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের সাহায্য-ব্যবস্থাও আমাদের প্রভূত উপকার সাধন করিবে। সুতরাং নবনির্ব্বাচিত শাসন-সংসদে আমরা যদি নির্ভরযোগ্য শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তাহা হইলে উদ্বাস্তু সমস্যার প্রচণ্ডতা সত্ত্বেও আমরা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব।

গত খৃষ্টাব্দে জগতের সর্ব্বত্র অর্থনৈতিক সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কোরিয়া সংঘর্ষের সূচনা হইতে নিখিল জগতের অর্থনীতিতে গুরু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কোরিয়া সংঘর্ষের পূর্ব্বে প্রচণ্ড মন্দা বাজারের (Dipression) আসন্নতা সর্ব্বত্র আতঙ্কের সূচনা প্রকট করিয়াছিল। কোরিয়ায় যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। যুদ্ধার্থ অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য বহুবিধ যুদ্ধোপকরণের উৎপাদন হেতু, সংরক্ষণ শিল্প-ক্ষেত্র কর্ম্মতৎপরতার বৃদ্ধি প্রযুক্ত, যুক্তরাষ্ট্রে এবং পশ্চিম য়ুরোপে বেকার সমস্যা প্রশমিত হইয়া, শিল্প প্রসারণ সংঘটিত হয়। কিন্তু শিল্পে অনুন্নত দেশসমূহে বে-সামরিক আহার্য্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির উৎপাদন-হ্রাসের সহিত বেকার সমস্যা প্রবল হয়। বহু ক্ষেত্রে দ্রব্য-মূল্য অযথা বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতার্থ বহুবিধ কাঁচামাল উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া, এই সকল দেশ কথঞ্চিৎ লাভবান হয় বটে; কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব-অনটন ঘটে। শিল্পসমৃদ্ধ দেশে রণসজ্জা প্রস্তুতির ফলে আমরা বহু কাঁচা মালের আমদানী হইতে বঞ্চিত হই; এবং বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার অভাবে শিল্প প্রসারণ ও সমুন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। আমাদের দেশে অতিপ্রয়োজনীয় আমাদের দেশজাত বহু কাঁচামালও রপ্তানী হইয়া যায়। আমাদের অর্থ-সচিব গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত বণিক সঙ্ঘের বাৎসরিক অধিবেশনে এই পরিস্থিতির উল্লেখ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, গত বৎসর নিখিল জগতের সর্ব্বত্র অর্থ-নৈতিক কৃচ্ছ্রতা প্রবল ছিল। কোরিয়ার যুদ্ধ এবং যুক্ত-রাষ্ট্র এবং পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক দেশসমূহে পুনরায় যুদ্ধার্থ অস্ত্রসজ্জা ও উপাদান-উপকরণ প্রস্তুতির তাড়নায় দ্রব্য-মূল্য অযথা বৃদ্ধি পায়, এবং ভারত সরকারের সর্ব্ব-প্রযত্ন সত্ত্বেও বৎসরের শেষ ভাগে ব্যতীত দ্রব্য-মূল্য প্রশমন করিতে পারা যায় নাই। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের দ্রব্য-মূল্যের শঙ্কু সংখ্যা (Index number) ৩৮১·৩, হইতে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ৪১২·৬ অর্থাৎ ৩১ অধিক হয়। তথাপি অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম ছিল। শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত নিখিল ভারত বণিক সঙ্ঘ সমবায়ের সভাপতিও একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন। গত খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দ্রব্য-মূল্যের সঙ্কু-সংখ্যা সর্ব্বোচ্চ ৪৫৭·৫ হইয়াছিল; গত নবেম্বর মাসে এই সংখ্যা অব-নমিত হইয়া ৪৩৫·৬ দাঁড়াইয়াছিল। গত বৎসর কেন্দ্রীয় সরকার দ্রব্য-মূল্যস্ফীতি (Inflation) হ্রাস করিবার নিমিত্ত দুইটি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রথম, মূলধনাত্মক খরচের (Capital expenditure) নির্ব্বাহের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব বাজেটে সুপারিমিত উদ্বৃত্তের (Substantial surplus) ব্যবস্থা; দ্বিতীয়, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যাঙ্কের সুদের হার, শতকরা ৩ অংশ হইতে ৩½ অংশে বৃদ্ধি। ঋণ-প্রদান প্রক্রিয়াকে পরি-মিত করিবার নিমিত্ত ব্যাঙ্কের সুদের হার বৃদ্ধি একটি সর্ব্বজনবিদিত উপায়। মতদ্বৈধের অবকাশ এ ক্ষেত্রেও আছে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি কালে, ঋণ-প্রদান প্রক্রিয়ার প্রসার সময়ে, এই রীতি অবলম্বিত হয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে সাধারণভাবে টাকার সুদের ঊর্ধগতির মুখে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। ব্যাঙ্কের সুদের হার বৃদ্ধির উদ্দেশ্য,—ঋণ-প্রদান ব্যাপার সংযত-করণ। সুদের চলতি-গতিকে সরকারের সমর্থন প্রদান নহে। এ প্রক্রিয়াটি জটিল,—

সাধারণ পাঠকের প্রীতিপদ হইবে না, সুতরাং এ প্রসঙ্গ আমরা পরিত্যাগ করিব।

কেন্দ্রীয় সরকারের অবলম্বিত অর্থনীতির দুইজন প্রতিপত্তিশালী অর্থনীতিবিদ্ তীব্র আলোচনা করিয়াছেন। দুই জনেই কেন্দ্রীয় সরকারের ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব, স্যার সম্মুখম্ চেট্টী ও ডাঃ জন মাথাই। দুই জনেই যে উপায় অবলম্বনের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন,—সম্প্রতি অর্থ-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে, তাহা করিতে সাহস করিতেন কিনা বলা দুঃসাধ্য। চেট্টী মহোদয় শিল্পোন্নতি সম্পর্কে সরকারের কর নির্দ্ধারণ নীতির পুনর্বিবেচনার ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ঋণ-প্রদান প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করিলেই দ্রব্য-মূল্যস্ফীতি নিবারিত হইবে না; সর্ব্বতোভাবে প্রভূত পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। এ তত্ত্ব বর্তমান অর্থসচিব প্রভৃতির অবিদিত নহে। প্রধান মন্ত্রী এবং অর্থ ও শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রীদ্বয় ও ধনপতি, শিল্পপতি ও শ্রমিক-কারিগর প্রভৃতির নিকট পুনঃ পুনঃ এই আবেদন অতি দৃঢ়তার সহিত বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। শিল্প জাতীয়করণ এবং শিল্প সমুন্নয়ন-সম্প্রসারণ ক্ষেত্রে বে-সরকারী প্রচেষ্টার গুরুত্ব সম্পর্কে সরকার সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন; এ বিষয়ে তাঁহাদের কোন অ-সমীচীন, কিম্বা বিপ্লবাত্মক, অভিসন্ধি নাই;—তাহারও সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছেন। দ্রব্যমূল্যস্ফীতি-নিবারণ ও উৎপাদন-বৃদ্ধি; মূলধন-সৃষ্টি-সংস্থান ও দেশবাসীর সঞ্চয়ের সমাহৃতি (Mobilisation), এবং কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য সম্পুষ্টি হেতু বৈদেশিক মূলধন আকর্ষণ—এই ত্রিবিধ প্রচেষ্টাই কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ্য কর্ম্ম। দ্রব্য-মূল্যস্ফীতি অবশ্য অধুনা নিখিল জগদ্ব্যাপী সমস্যা। তবে যুক্তরাজ্যে ও যুক্তরাষ্ট্রে দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে দ্বিগুণ; কিন্তু ভারতের বৃদ্ধি চতুর্গুণ! দ্রুত উৎপাদন-বৃদ্ধিই অবশ্য ইহার একমাত্র উপায়। এ বিষয়ে সরকারের ইচ্ছাকৃত শৈথিল্য নাই। বস্তুতঃ এ ক্ষেত্রে সরকারের আন্তরিক প্রয়াস-প্রচেষ্টার অন্ত নাই; কিন্তু শ্রমিকগণের অসামরিক এবং অসহিষ্ণু দাবী-দাওয়া এবং তৎপূরণার্থ ইচ্ছাকৃত কর্ম্ম-শৈথিল্য কিংবা ধর্ম্মঘট উৎপাদন-বৃদ্ধির বিষম অন্তরায় ঘটাইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, সরকারের শিল্প জাতীয়করণ অভীপ্সাই বে-সরকারী প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিয়া উৎপাদন হ্রাসের মূল কারণ। কিন্তু এ বিষয়ে সরকার তাহার নীতি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। ডিসেম্বর মাসের প্রথমে কলিকাতার বণিক সভায়, এবং শেষভাগে বোম্বাই-এ সাংবাদিক সঙ্ঘে, অর্থসচিব পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বিশ্লেষণকল্পে বলিয়াছেন যে, এই পরিকল্পনার কাঠামো সহযোগিতামূলক অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ক্রমবর্দ্ধমান বে-সরকারী প্রয়াস-প্রচেষ্টাই ইহার উদ্দিষ্ট। সমীচীন রাজনৈতিক কিংবা সংরক্ষণ হেতু ব্যতীত, সরকার কোন কারণে বে-সরকারী উদ্যম-অনুষ্ঠান খর্ব্ব করিবেন না। প্রতিপদে সরকার ধনপতি ও শিল্প-পতিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের সহযোগিতা গ্রহণ করিবেন; এবং সরকার আশা করেন যে, উভয় পক্ষ, স্ব স্ব দায়িত্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত হইয়া, দেশের যথার্থ কল্যাণের প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখিয়া, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সমুন্নতি সাধন করিবেন।

বৈদেশিক মূলধন আমদানীর অন্তরায় সরকারের শিল্প-বাণিজ্য-নীতি নহে। তাহার প্রধান কারণ, বৈদেশিক ধনপতিগণ অধুনা স্ব স্ব দেশে অর্থ-বিনিয়োজন করিয়া এরূপ লাভবান হইতেছেন যে, বিদেশে ধন-বিনিয়োজনে তাঁহাদের পূর্ব্বের ন্যায় আগ্রহ নাই। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিল্প-বাণিজ্য দপ্তর হইতে গত ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের শিল্প-সমুন্নয়ন প্রচেষ্টার একটি অগ্রিম বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ যে, গত পূর্ব্ব ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের তুলনায় গত ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে, উৎপাদন অনুভব যোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের তুলনায় এই বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ২০·৬ অংশ। এই স্থলে চিরস্মরণীয় ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে যে গুরু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহার একটু আভাষ প্রয়োজন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট, সুপ্রাচীন সুবিশাল অতি বিচিত্র পূর্ব্বতন ভারতবর্ষ, বৃটিশের অধীনতা-বিমুক্ত হইয়া, দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে বর্তমানে বিশীর্ণ ভারতের আয়তন ১২ লক্ষ বর্গ মাইল এবং তদঙ্গ-বিচ্যুত পশ্চিম ও পূর্ব্ব পাকিস্তানের আয়তন যথাক্রমে, ৩ লক্ষ ও ৫৪ হাজার বর্গ মাইল। অর্থাৎ সমগ্র পাকিস্তানের আয়তন ভারতের এক-তৃতীয়াংশের কিঞ্চিৎ অধিক। ভারতের বর্তমান লোকসংখ্যা ৩৬ কোটি এবং পাকিস্তানের জনসংখ্যা ৭ কোটি। বর্তমান ভারতে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ ২·১৬ একর, চীন মহাদেশে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ ৬ একর, যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ একর এবং রুশিয়ায় ২৩ একর। বর্তমান ভারতে আবাদী জমির পরিমাণ ২৬ কোটি একর; অর্থাৎ মাথাপিছু তিন-চতুর্থাংশ একরেরও কম। সমগ্র ভারতবর্ষে কৃষিজ, বনজ, খনিজ ও শিল্প সম্পদ ছিল প্রচুর। দ্বিধা-বিভাগের পূর্ব্বে আমাদের দেশজাত পাটের পরিমাণ ছিল

এরূপ যে, আমাদের কলকারখানার প্রয়োজন মিটাইয়া আমরা প্রচুর পরিমাণে কাঁচা পাট রপ্তানী করিয়া যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিতাম। দ্বিখণ্ডনের পর বিশীর্ণ ভারতের উৎপাদন আমাদের পাটকলগুলির প্রয়োজনের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। বাকী দুই-তৃতীয়াংশ আমাদের আমদানী করিতে হয়, আমাদের অঙ্গ-বিচ্যুত পাকিস্তান হইতে। দ্বিধা বিভাগের পূর্ব্বে আমাদের দেশের পাটের উৎপাদন ছিল, আমাদের দেশের কার্পড়ের কলগুলির প্রয়োজনাপেক্ষা অধিক; এবং আমরা কিছু কাঁচা তুলা রপ্তানী করিতাম। পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হইবার পর, আমাদের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের অর্দ্ধ পরিমাণ আমদানী করিতে হইতেছে বিদেশ হইতে। অবশ্য গত চারি বৎসরের মধ্যে আমরা নব-ভারতে পাট ও তুলার চাষ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছি; এবং দুই এক বৎসরের মধ্যেই আমাদের উৎপাদন আমাদের প্রয়োজনের সমপরিমাণ হইবে। হিন্দুস্থান হইতে পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে, যে সকল অঞ্চলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইত, সে-গুলি হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি; এবং ইতিমধ্যে পাকিস্তান হইতে, বিতাড়িত লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগমে আমাদের বিশীর্ণ ভারতের লোক-সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলতঃ এখন আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে বিদেশ হইতে খাদ্যদানা আমদানী করিতে হইতেছে।

দ্বিধা বিভাগের পর ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করিবার নিমিত্ত দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছে। প্রথমতঃ, আমাদের রপ্তানী পণ্যের স্বল্পতা; এবং দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশের কোন কোন কাঁচামালের স্বল্পতা বিদেশ হইতে ঐ সকল দ্রব্যের আমদানী দ্বারা পরিপূরণ। এই হেতু কেন্দ্রীয় সরকারকে আমাদের আমদানী বাণিজ্য এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইয়াছে, যাহাতে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়-সংগতি আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সামঞ্জস্য সংরক্ষণার্থ অধিকতর উপযোগী হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশ ইহাতে উৎপন্ন দ্রব্যের যথা সম্ভব রপ্তানী বৃদ্ধি করিবার প্রচেষ্টা করিতে হইতেছে, যাহাতে আমাদের আমদানী-বাণিজ্য রপ্তানী-বাণিজ্য অপেক্ষা কম না হয়। এই দ্বিবিধ প্রচেষ্টা কি পরিমাণে সফল হইয়াছে তাহার প্রমাণ এই যে, ১৯৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রবাহী বাণিজ্যে আমাদের ঘাটতির পরিমাণ ছিল, ১২০ কোটি টাকা। তৎতুলনায় ১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে আমাদের সমুদ্রবাহী বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়াছিল ২০ কোটি টাকা। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, আমরা যদি কিছু আমদানী করিতে চাই, তাহা হইলে, আমাদিগকে অন্ততঃ তৎসম মূল্যের কিছু রপ্তানী করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত যে কোন উপায় আমরা অবলম্বন করি না কেন, তাহা সাময়িক, অস্থায়ী ও অনিশ্চিত। বৈদেশিক বাণিজ্য জমা খরচে আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনেক সময়, দেশবাসীর স্বাস্থ্য ও সম্পদের হানি ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সত্ত্বেও, অতিপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর রপ্তানী করিতে হয়। বৃটেনকে বর্ত্তমানে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে এবং দেশবাসী জাতীয় অর্থনৈতিক কল্যাণকল্পে প্রশান্তভাবে সর্ব্ববিধ অসুবিধা ভোগ করিতেছে। আদান-প্রদান ব্যতীত কখনও কোন দেশেরই বাণিজ্য চলিতে পারে না; কারণ কোন দেশই সর্ব্ব বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ কিংবা আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে না। এই হেতু বৈদেশিক বাণিজ্য জমাখরচে উদ্বৃত্ত সংস্থান করিতে হইলে, আমাদের উৎপাদন-বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ ধনিক, বনিক ও শ্রমিক—এই তিন সম্প্রদায়ের লোকের তীব্র দেশাত্মবোধের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত অকপট সহযোগিতামূলক ঐকান্তিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া দেশের ও দশের কল্যাণের নিমিত্ত আন্তরিকভাবে সর্ব্বপ্রকার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে। সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে যে একটু বিরোধের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে তাহা অচিরে সমূলে বিনষ্ট করিতে হইবে।

সৌভাগ্যক্রমে গত ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে শিল্পজ উৎপাদনের পরিমাণ অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রাথমিক সংখ্যা-সঙ্কলন হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের উৎপাদনের তুলনায় গত খৃষ্টাব্দের মাসিক উৎপাদনের গড় বৃদ্ধি প্রায় শতকরা ২০ অংশ পরিমাণে হইয়াছিল। গত খৃষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে কাঁচা মালের অনটন ও দুর্ম্মূল্যতা সত্ত্বেও ইস্পাৎ, বয়ন, পাট, বিলাতী মাটি, কাগজ এবং শর্করা প্রভৃতি প্রায় চল্লিশ প্রকার গরিষ্ঠ শিল্পে উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দ্রব্যমূল্যও কিঞ্চিৎ অধোগামী হইয়াছিল। কিন্তু খাদ্যশস্য ক্ষেত্রে উৎপাদন কিংবা সংগ্রহ কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় নাই। ফলে গত খৃষ্টাব্দে আমাদিগকে বহুল পরিমাণে খাদ্যদানা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইয়াছিল। গত খৃষ্টাব্দে মার্কিণ প্রদত্ত খাদ্য-ঋণের বক্রী এক মিলিয়ন টন লইয়া বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দে আমাদিগকে সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ মিলিয়ন টন খাদ্যদানা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে। তথাপি,

১৯৫২ খৃষ্টাব্দ আমাদের পক্ষে শুভপ্রদ হইয়াছিল। বৈদেশিক বাণিজ্য জমাখরচে এই বৎসরই আমাদের অনুকূলে উর্দ্বৃত্ত জমার অঙ্ক ঘটিয়াছিল। সমুদ্র-বাহিত বাণিজ্যের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বৃদ্ধি হেতু জমার ঘরে উদ্বৃত্ত অঙ্ক স্থান পাইয়াছিল; কিন্তু স্থলপথে পরিবাহিত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জমাখরচের অঙ্ক আমাদের অনুকূল হয় নাই। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের একুন রপ্তানী বাণিজ্যের মূল্য ৭০০ কোটি টাকা হইবে। একুন আমদানীর মূল্য, সমুদ্র ও বিমান-বাহিত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, ১০ কোটি টাকা ন্যূন হইবে। পরন্তু, স্থলপথে পরিবাহিত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের বিপুল ঘাটতি ঘটিবে। দ্রব্য-মূল্যের পাইকারী হারের বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রে। একমাত্র খাদ্যদানা বিভাগে দ্রব্য-মূল্যের পরিমাণ শতকরা ৪ অংশ হ্রাস পাইয়াছিল। পরিণত দ্রব্যসামগ্রী এবং শিল্প সংক্রান্ত কাঁচামালের মূল্য-বৃদ্ধি হেতু, জীবনযাত্রা পরিচালনা ব্যয় কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নাই। টাকার বাজারে ব্যবসায় বৃদ্ধি-মুখে ব্যাঙ্ক-সুদের হার শতকরা ৩ অংশ হইতে সাড়ে তিনে বৃদ্ধি হেতু কিছু কৃচ্ছ্রতা ঘটিয়াছিল। কিন্তু গত খৃষ্টাব্দের দ্রব্যমূল্যের উপর তাহার কোন প্রভাব প্রকটিত হয় নাই; যে হেতু এই পরিবর্তন ঘটিয়াছিল—বর্ষশেষে। একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, বৃটেনে ব্যাঙ্ক-সুদ-বৃদ্ধির সহিত ভারতের ব্যাঙ্ক-সুদ-বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক নাই এবং বৃটেনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ভারতে পুনরায় ব্যাঙ্ক-সুদ বৃদ্ধির আশঙ্কা নাই। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক সিডিউল্ড ব্যাঙ্কগুলির ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে ঋণ-দানের পরিসর খর্ব্ব করার ফলে দ্রব্যমূল্যের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। এই দ্রব্যমূল্যের হ্রাস আকস্মিক ঘটনা নহে। কোরিয়ায় যুদ্ধ সংঘটনের ফলে সর্ব্বদেশেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল; এখন তাহার হ্রাস ঘটিতেছে। গত জুলাই মাস হইতে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের ফলে ভারতের দ্রব্যমূল্য অধোগামী হইয়াছে। আমাদের বাণিজ্য সচিব আশ্বাস দিয়াছেন যে, এই মূল্য-হ্রাসকে কখনই প্রাথমিক উৎপাদকদিগের ন্যায্য স্বার্থের প্রতিকূল হইতে দেওয়া হইবে না। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মূল্য স্ফীতি হ্রাস করিবার নিমিত্ত অবলম্বিত উপায়গুলি অবশেষে ফলপ্রসূ হইয়াছে। দ্রব্য মূল্য হ্রাস সম্পর্কে মতদ্বৈধের অবকাশ আছে; কিন্তু সে আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধে নহে।

স্মৃতি

শ্রীসুজিত কুমার নাগ

তোমাকে চিনেছি আমি, এইখানে এই বনছায়েঃ
এখন নামিল সন্ধ্যা, দূরে দেখি পথিকের ডাক,
এখানে ফুটেছে ফুল, উড়ে যায় পাখী এক ঝাঁক।
আকাশে ফুটিছে তারা—নীলাকাশে ধরণীর গায়।
কতদিন দেখেছি তোমাকে—মনে হয় স্বপ্ন সুষমার
সে এক আশ্চর্য্য দিন, আজ মনে হয়—
হয়ত বা চিহ্ন তার—হয়নিকো ক্ষয়,
সেই স্মৃতি নিয়ে আজ মায়ামগ্ন কত আকাঙ্খার,
কতদিন, কতরাত, পার হয়ে আসিলাম বুঝি,
তোমাকে দেখেছি আমি, বিস্মৃতির দিন আজি খুঁজি।

সেই তো হারানো দিন, বালুচরে শুধু নাম লেখা,
সূর্য্য বুঝি অস্ত যায়—এই মাত্র হোল বুঝি দেখা?
অকারণে উদ্ভাসিত, উল্লসিত সেই সব দিন
পেয়েও পাবনা জানি—বাজিবে না সেই সব বীণ।
আজ তুমি কাছে নাই, চলে গেছ দূরে স্মৃতি পারে,
কোন সে বিরহে দূরে, শানাইয়ের লগ্ন বাঁধে ঘর,
রেখেছ স্মৃতির চিহ্ন, হৃদয়ের গোপন মিনারে,
তাই বুঝি ব্যর্থতায়, রিক্ততার ওঠে বুঝি ঝড়।
হঠাৎ কখন হয়ত বা মনে পড়ে রক্তচ্ছটা গোধূলির তীরে
আমারে পড়িছে মনে, হয়ত বা কোন এক জনতার ভীড়ে॥

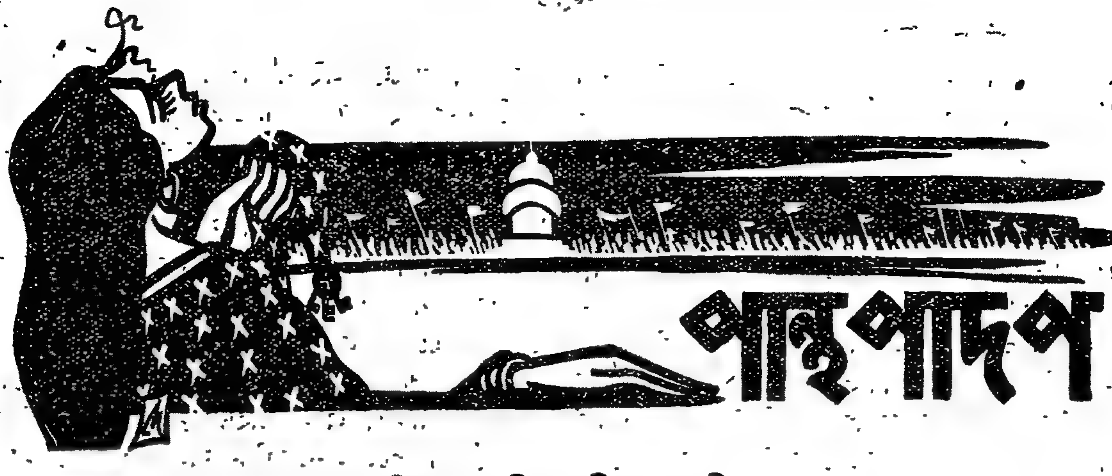

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

সাত

কয়েকটা বৎসর পরের কথা—

ম্যাট্রিকে সকলের প্রথম স্থান গ্রহণ করলে ভারতী।

পিতাকে প্রণাম করে সে, পিতা তার মাথার উপর হাতখানা রাখেন,—একটি শব্দও তাঁর মুখে ফুটলো না—নিঃশব্দে থাকেন তিনি।

পিতার বিহ্বলতা ভারতী লক্ষ্য করে, সে বললে, "কই, কিছু বললে না বাবা?"

"বলব—কিছু বলতে হবে—?"

রতন দত্ত সচকিত হয়ে ওঠেন—"তোমায় আশীর্ব্বাদ করতে হবে? হ্যাঁ, আশীর্ব্বাদ করছি—তুমি মানুষ হও,—হ্যাঁ, সত্যিকার মানুষ হও, সত্যিকার মানুষ—"

ভারতী জিজ্ঞাসা করে, "সত্যিকার মানুষ কাকে বলছো বাবা?"

রতন দত্ত কন্যার মুখের পানে তাকান, ধীর কণ্ঠে বলেন, "যে নিজেকে চিনতে পারে,—আত্মমর্য্যাদা রাখতে যে নিজের প্রাণ বলি দিতে পারে সেই সত্যিকার মানুষ মা।

তারপর কতকটা আনমনাভাবেই বললেন, "হ্যাঁ, সে মানুষ আমি দেখেছি—আমি দেখেছি দুজনকে, একজন তোমার মা, কিন্তু সে নিজের স্বার্থের দিকটাই দেখেছিল, পরের স্বার্থ দেখতে ভুলে গিয়েছিল। সত্যিকার মানুষ ছিলেন আমার মা—তোমার দিদা। হ্যাঁ, আমি আবার তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি ভারতী, আমার যে মাকে আমি হারিয়েছি, অন্যায় অবিচারের প্রতিবিধান করতে যে মা আমার আত্মদান করেছেন, সেই মায়ের মত মানুষ তুমি হও, আমার সেই মাকে তুমি জাগিয়ে তোল তোমার মধ্যে।"

তাঁর কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকে।

সেই মাকে তিনি হারিয়েছেন, ভারতী পরম স্নেহময়ী দিদাকে হারিয়েছে। একজনের বিয়োগে পিতা কন্যা দুজনেরই চোখ জলে ভরে আসে, দুজনেই সেই মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানান।

ভারতী আই-এ পড়বে।

পিতা বাধা দেন না, বরং অত্যন্ত খুসি হন। নিজে তিনি বেশী লেখাপড়া শিখতে পারেন নি। ইংরাজী তিনি অতি সামান্য জানেন, ইংরাজীতে কাজ চালানোর জন্য তাঁকে বেশী বেতন দিয়ে কর্ম্মচারী রাখতে হয়েছে।

ভারতী ইংরাজী পড়ে, অনেক লেখা বাংলায় অনুবাদ করে তাঁকে শুনায়, পিতার খুসির অন্ত নাই।

এ যেন তাঁর কাছে স্বপ্নের জীবন, এ যেন তাঁর কাছে অভিনব জগৎ। নিজেকে মেয়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে আজ তিনি পরম তৃপ্তি লাভ করেছেন, তাঁর উচ্ছৃঙ্খল মন শান্ত হয়ে গেছে।

কলকাতায় তাঁর নিজের বাড়ী আছে শ্যামবাজার অঞ্চলে, নিজে আগে প্রায় সেখানেই থাকতেন, তারপর বহুকাল আর সেখানে যান নি।

ভারতীকে আই-এ পড়বার জন্য তিনি অনেকদিন পরে নিজে নিয়ে গেলেন কলকাতায়, তাকে কলকাতার বাড়ীতে রেখে, কলেজে ভর্ত্তি করে দিয়ে তিনি আবার ফিরে এলেন পলাশডাঙ্গায়।

তাঁকে কলকাতায় রাখবার জন্য ভারতী অনেক চেষ্টা করেছিল, হেসে তিনি বলেছিলেন "তোর খবরদারী করতে কলকাতায় গিয়ে থাকলে আমার এই সব প্রজাদের খবরদারী কে করবে মা? জানিস তো পদ্মদহের বিল নিয়ে কি

কাণ্ডটাই চলছে। গভর্ণমেণ্ট নিয়েছে ওদিকটা,—খাস গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বেধেছে মামলা, এ তো সুখের কথা নয় ভারতী। হতভাগা প্রজাদের ওদের হাতে ফেলে দিয়ে আসা কি আমার পক্ষে উচিত হবে—তুই বল।"

ভারতী আগে না জানলেও পরে শুনেছে; পিতাকে কলকাতায় যাওয়ার জন্য সে আর জেদ করে নি এরপরে।

ঘটনাটা ঘটেছে কিছুদিন আগে।

গ্রামের প্রান্তে বিরাট পদ্মদহ নামে দীঘি, তার এপার ওপার দেখা যায় না—তেমনই মিশ কালো তার জল। জমিদার বাড়ীর ছাদ হতে দূরে দেখা যায় পদ্মদহের জলে স্রোত বইছে। এই বিলের ওদিকে গভর্ণমেণ্টের খাস জমি কিছু ছিল, এ জমিটা বহুকাল এমনই পড়ে ছিল। তারও আগে এই জায়গাটার নাম ছিল রামজলার মাঠ; বর্ষার সময় বিলের জল ছাপিয়ে এসে জমিটাকে উর্ব্বর করতো। এই জমিতে এখানকার কৃষকেরা সোনা ফলাতো একদিন। এখানে যে রকম ধান জন্মাতো এ রকম ধান এ অঞ্চলে কোথাও দেখা যেতো না—বিশেষ করে সেই জন্যই এই রামজলার মাঠ ছিল প্রসিদ্ধ।

হঠাৎ গভর্ণমেণ্ট এই বিরাট রামজলার মাঠ নিজের দরকারে নাম মাত্র মূল্যে কিনে ফেললেন যে জমা নিয়েছিল তার কাছ হতে।

দেশের লোকেরা নাকি ইংরেজ রাজত্বে চালাক চতুর হয়ে গেছে, ইংরেজের আদ্যনাড়ির খবর তারা রাখে। সাদা মুখ আর ইংরাজী কথা শুনলে আর তারা তেমন ভয় পায় না;—অন্যায়ের কৈফিয়ৎ তারা চায়।

বাধ্য হয়ে কৃষকদের জমি ছাড়তে হয়েছে। নালিশ তারা করতে গিয়েছিল কিন্তু কিছুই হয় নি, কারণ যে রক্ষক সেই ভক্ষক—নালিশ করবে কার কাছে, বিচার করবে কে? জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করা চলে না, সেই জন্যই কৃষকরা সরে যেতে বাধ্য হল। তারা হল সর্ব্বস্বান্ত,—নিজের জমি হারিয়ে পরের জমিতে কাজ করে কোন রকমে তারা জীবিকানির্ব্বাহ করতে লাগলো।

পদ্মদহের জল প্রতি বর্ষায় কূল ছাপিয়ে দিগন্ত ব্যাপী ফসলশূন্য মাঠে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, দহের মাছ সেই মাঠে স্বল্প জলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, শৃগাল-কুকুর, চিল-শকুন নির্ভয়ে সে মাঠে বিচরণ করতে লাগলো, মানুষ কেউ যেতে পারলে না, তাদের অধিকার নাই।

এই বারই রতন দত্ত পদ্মদহের বিপুল জলরাশী বাঁধবার প্রয়াস করেছেন, যে দিকটা প্লাবিত হয়, সে দিকটায় তিনি বাঁধ দেবার ব্যবস্থা করছেন। অনেকগুলি বেকার লোকের অন্নসংস্থান হবে, দহের মাছগুলিকেও বাঁচানো চলবে।

এই বাঁধ নিয়েই বেধেছে গোলমাল।

প্রথম অবশ্য একবার সতর্ক বাণী দেওয়া হয়েছিল, তার প্রতিবাদ করে রতন দত্ত আবার একটা আবেদন জানালেন। কিছুদিন অপেক্ষা করে কোন উত্তর না পেয়ে তিনি আবার মজুর লাগালেন।

যারা বাঁধে কাজ করছিল, হঠাৎ একদিন পুলিশ এসে তাদের গ্রেপ্তার করলে ওয়ারেণ্ট দেখিয়ে, তারা বে-আইনী কাজ করছে সেই জন্য।

রতন দত্তের নামে হল নালিস,—আসামী জমিদার রতনমণি দত্ত, ফরিয়াদী গভর্ণমেণ্ট নিজে।

কি অন্যায়, কি অবিচার—

কিশোরী ভারতীর দুইটী চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। কিন্তু প্রতিবিধান করবে কে? আইনের ফাঁক এতে নাই, আইনের প্যাঁচে রতন দত্ত জড়িয়ে পড়েছেন,—মামলা সমান চলছে।

ভারতী বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে, তার পর জিজ্ঞাসা করে, "ওখানে অতখানি জায়গা এ রকম অনাবাদিভাবে ফেলে রাখার বিচার তুমি আমি করতে পারব না বাবা—করবে যাদের অন্ন মারা গেল তারাই। অতখানি জমি নিয়ে এমনভাবে ফেলে রাখার কারণ কি তাই ভাবি।"

রতনদত্ত ম্লান হাসি হাসলেন, বললেন, "নিশ্চয়ই অনাগত ভবিষ্যতে ওখানে কিছু গড়বার মতলব আছে, কোন কারখানা, মিল অথবা সেনানিবাস—"

ভারতী রুক্ষকণ্ঠে বলে "আজ দু' তিন বছর হয়ে গেল কই—কিছুই তো দেখছিনে; এর পর উঠবে মিল, কারখনা কিম্বা সেনা-নিবাস।"

তার কণ্ঠস্বর হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে যায়।

ভারতীর পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে স্নিগ্ধ কণ্ঠে রতন দত্ত বললেন, "জানিস তো মা,—কর্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, কেউ কি তা খণ্ডাতে পেরেছে না পারবে? এ পর্য্যন্ত দেশের এক দল লোক করলে কত আন্দোলন, জাগলো কত বিপ্লব,—আজও জ্বলছে সে বিপ্লবের আগুন, কিন্তু তাতে ওদের মাথার এক গাছি চুল পর্য্যন্ত খসে নি। আসল কথা—ওরা দেশের শাসনদণ্ড হাতে নিয়েছে, আইনও ওদের হাতের তৈরী,—তাই বে-আইনী করতেও ওদের বাধে না। আমাদের একটা কথা মুখ ফুটে বলবার অধিকার ওরা দেয় নি, সব সময় চোখ রাঙিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

তুই জানিসনে ভারতী—জানিসনে চকদীঘি গাঁয়ের কথা, জানিসনে তোর দিদার শেষ কথা—”

হঠাৎ তিনি স্তব্ধ হয়ে যান, তাঁর মুখখানা বিকৃত হয়ে ওঠে; হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি নূতন করে জেগে ওঠে তাঁর মনের মধ্যে, তাঁর চোখ দুইটী কেবল ধক্ ধক্ করে জ্বলে।

দিদা—ভারতীর দিদা,—ভারতী ভুলতে পারে নি দিদার কথা,—কোনদিনই ভুলতে পারবে না তাঁর স্নেহপূর্ণ মুখ, তাঁর ভালোবাসা—।

“তুই কিছু জানিস নে ভারতী, তোকে কিছু জানতে দেওয়া হয় নি,—তবু চকদীঘি গাঁয়ের নামটী তোর মনে থাকতে পারে কারণ এ নাম তুই অনেকবার শুনেছিস। তোর দিদার স্মৃতির মধ্যে চকদীঘি গাঁ মিলিয়ে আছে, সেই জন্যে চকদীঘির নাম ভোলা যায় না।

মুহূর্তে আবার চুপ করেন রতন দত্ত, তারপর আবার বললেন, “হ্যাঁ, আমার মামার বাড়ী চকদীঘি, ওই পদ্মদহের ওধারের সোজা পথ দিয়ে গিয়ে মাইল চার পাঁচ পরে চকদীঘি গাঁ। মস্ত বড় গাঁ, বেশীর ভাগ লোকই চাষী গৃহস্থ। চাকরি ওখানকার কেউ কোনদিন করতে যায় নি, গাঁয়ে থেকে গাঁয়ের উন্নতি তারা করেছে। তারা ওখানে হাইস্কুল, হসপিটাল, পোষ্ট-অফিস সব কিছু করেছে,—ভালো ভাবে চালিয়েও যাচ্ছিল, কিন্তু—”

তিনি থামতে ভারতী জিজ্ঞাসা করলে, “তারপর কি হয়েছিল বাবা—?”

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রতন দত্ত বললেন, “সেই অতি শান্ত গ্রামের বুকে জ্বললো আগুন। পুলিশ সাহেব এসেছিলেন সফরে, তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ক্ষেপে উঠলো দেশের লোক। তারপরে চললো পুলিসী অত্যাচার,—সারা গ্রামে ইতর-ভদ্র, বড়-ছোট কেউ রেহাই পেলে না তাদের হাত হতে। এই তো যেন সেদিনকার কথা,—পরম আরামে শুয়েছিলুম বিছানায়, ঘুমের ঘোরে চোখ মুদেছিলুম, দমকা হাওয়ার মত এসে পড়লেন আমার মা—

“আর যে এ অত্যাচারের কথা শুনতে পারি নে খোকা, যা হয় একটা বিহিত কর—”

চোখের ঘুম কোথায় গেল হারিয়ে, আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম, জিজ্ঞাসা করলুম, “কি হয়েছে মা, কোথায় অত্যাচার হচ্ছে, কে অত্যাচার করছে?”

উত্তর পেলুম মায়ের চোখের জলে—

অত্যাচার করছে শাসক—যার হাতে রয়েছে প্রচুর ক্ষমতা। মায়ের ভাই—আমার মামা ছিল রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, গাঁয়ের লোকদের সেই নাকি বৃটিশের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। সে কোথায় বোম ফেলেছে দলের সঙ্গে কোথায় ট্রেন লুঠ করেছে, গুলি করে কোন সাহেবকে মেরেছে,—তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে পুলিশ। অনেক দিন লুকিয়ে থেকেও সে আত্মরক্ষা করতে পারলে না, একদিন ধরা পড়লো—”

ধরা পড়লো—?”

ভারতী চেঁচিয়ে ওঠে, “কি করে ধরা পড়লো—?”

“কি করে?”

পিতা বিকৃত হাসি হাসলেন—“যেমন করে লোকে ধরা পড়ে। যার কাছে সে আশ্রয় নিয়েছিল, অনেক টাকা পাওয়ার লোভে সেই দিল মামাকে ধরিয়ে—”

এই দেশেরই লোক দিয়েছে তাদের ধরিয়ে যারা দেশের দেশবাসীর দুর্দশা মোচনের জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছিল।

এই সব ছেলেরা ঘরের মায়া তুচ্ছ করে বার হয়ে এসেছে, ঐশ্বর্য্য এদের বাঁধতে পারে নি, মৃত্যুভয়, কারা দণ্ড, অনেক রকম অত্যাচার যাদের জয় করতে পারে নি। তারা কারাগারে দম্ভ করে বলেছে—দেহ তাদের বন্দী করতে পারা যায়, তাদের মন; তাদের চিন্তাশক্তিকে কেউ বন্দী করতে পারে না।

ভারতীর চোখে আগুন জ্বলে।

আট

“তারপর—তারপর কি হল বাবা—?”

পিতা যেন স্বপ্ন হতে জেগে ওঠেন—

তারপর—? তারপর? মায়ের মুখের দিকে চাইতে পারেন নি সেদিনের বিলাসী ভোগী রতন দত্ত,—বাগান বাড়ী নিয়ে ছিল যার কারবার। তিনি এ সব রাজনীতি নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামান নি, এ সব আলোচনা করতেও চান না; শান্ত নির্ব্বিরোধীভাবে দিন কাটাতে চান। বিশেষ পুলিশকে তিনি ভয় করেন যত—ঘৃণাও করেন তত, তাই ওদের প্রাণপণে এড়িয়ে যান।

পুরুষানুক্রমে তারা ইংরেজভক্ত। সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে যে সব সাদা মানুষেরা এ দেশে এসে রাজ্য বিস্তার করেছেন তাঁদের কোন রকমেই ছোট করা যায় না। বরাবর প্রদেশের লোকে শুনে আসছে বৃটীশের রাজত্বে সূর্য্য কখনও অস্ত যায় না সে কি সোজা কথা? যার একটী অঙ্গুলী হেলনে এক একটা রাজ্য ভাঙ্গে আবার গড়ে, সে কি যে সে মানুষ?

ইংরেজ দেবতা—সত্যই সে দেবতা। তার ভ্রূকুটিতে রাজা রাজ্য হারায়, ভিখারী রাজা হয়। এই ইংরেজের

বিরুদ্ধে দাঁড়ানো দূরে থাক, স্তুতি ছাড়া অন্য কোন বাক্যও মুখে উচ্চারিত হতে পারে না।

তাঁর মামা কিশোর, তাঁরই সমবয়স্ক, মহেশ্বরীর কাছেই সে মানুষ হয়েছে। কি করে তার মনের গতি বদলে গেছে কে জানে। এই বৃটীশের বিরুদ্ধে সে করেছে ষড়যন্ত্র,—এই বৃটীশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সে কত কিই না করেছে। রতন দত্ত এদের কাছ হতে বহু দূরে থাকতে চান—এদের তিনি ভয় করেন—।

পুত্রের নিস্পন্দ দেহ মুখের পানে পলকহীন নেত্রে তাকিয়ে রইলেন মহেশ্বরী। ভোগ বিলাসে অত্যন্ত সুখ-পরায়ণ পুত্রকে তিনি চিনতেন, তবু সে যে এতখানি ভীরু কাপুরুষ তা যেন তিনি জানতেন না, সম্পূর্ণ নূতন করে সে পরিচয় তিনি পেলেন।

মহেশ্বরী নিস্তব্ধ নেত্রে পুত্রের পানে তাকিয়ে ছিলেন, নীরব সে দৃষ্টি রতনমণি দত্তের অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত পৌঁচেছিল। খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে জড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন, "কিন্তু কি করে হবে মা,—ইংরেজ দেশের রাজা, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে—"

"থাক থাক—"

মহেশ্বরীর কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে ওঠে—"ও সব কথা থাক খোকা, আমি শুনতে চাই নে। বেশ, যা করবার আমিই করব, তুমি ইংরেজের স্তব করো, পুজো করেই যাও ওদের—"

জ্বলন্ত বহ্নিশিখার মতই মা বার হয়ে গেলেন। রতন দত্ত খবর পান, ষোলজন লাঠিয়াল নিয়ে দুর্দ্দান্ত সর্দ্দার ইসমাইল সেই মুহূর্তে মায়ের শিবিকার সঙ্গে চকদীঘি রওনা হয়ে গেছে।

বিবর্ণ হয়ে উঠলো রতন দত্তের মুখখানা—মাকে তিনি চেনেন;—তাঁর মা সামান্য নারী নন, অসীম শক্তিময়ী তিনি, অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করবার মত শক্তি তাঁর আছে।

কিন্তু কি করবে ইসমাইল?

করবে পুলিসের সঙ্গে মারামারি—?

মনে মনে আতঙ্কিত হয়েও রতন দত্ত নিজের মনকে প্রবোধ দেন—মা যতই আস্ফালন করে যান, তিনি মেয়েছেলে, খুব বেশী এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তাঁর হবে না। যতই সাহস তিনি দেখান, অন্তরে তিনি দুর্ব্বলা, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। দুদিন না যেতে আবার তাঁকে ফিরে আসতে হবে এখানে,—কোথায় তিনি থাকবেন?"

চকদীঘি পিত্রালয় হলেও সেখানে মহেশ্বরীর কেউ নাই, একমাত্র ছোট ভাই কিশোর পলাতক আসামী, তাকে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে, স্বেচ্ছায় সে পুলিশের সামনে আসবে না কাজেই মহেশ্বরীর সঙ্গে তার দেখাও হবে না।

রতন দত্ত নিশ্চিন্ত হন—।

কিন্তু ভুল ভেঙ্গে যায় একদিন—

বৃদ্ধা মহেশ্বরী সমগ্র চকদীঘির অত্যাচারিত জনগণকে এক করেছেন, তাদের বুঝিয়েছেন রাজার রাজত্ব থাকে প্রজাগণের ঐক্যে,—প্রজা-পালনই রাজার ধর্ম্ম। বিদেশী রাজা আমাদের সর্ব্বস্ব নিয়েও শান্ত হয় নি, তারা আরও চায়, আরও নিপীড়ন করে, অত্যাচার করে। নির্য্যাতীত জনগণ, তোমরা জাগো, তোমাদের শক্তি, তোমাদের সাহস তোমরা জাগাও। বল, হয় জীবন নয় মৃত্যু এই তোমাদের কাম্য। বেঁচে থেকে পরাধীন জীবন যাপন এ তোমাদের উদ্দেশ্য নয়। বল—হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু—।

পরাধীন দেশে বাস করে বৃদ্ধা মহেশ্বরী দেখেছিলেন স্বাধীনতার রূপ, তাকে স্বপ্নের মধ্যে তিনি ফেলতে চান নি, তাকে সত্য রূপেই ফুটাতে চেয়েছিলেন।

অত্যাচারিত গ্রামবাসী হল সংঘবদ্ধ, তারা পণ করলে প্রতিশোধ তারা নেবে,—তাতে যায় যাক প্রাণ, লাঞ্ছিত অপমানিত প্রাণ দিতে তাদের দুঃখ নাই। তারা যাওয়ার সময় প্রার্থনা করে যারে—যেন স্বাধীন ভারতের বুকে তারা জন্মায়—তারা মানুষ হয়।

গ্রামের লোক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, তারা ইতস্ততঃ দু'চার জন পুলিশ মেরেছে, ট্রেণ উড়িয়ে দিয়েছে, থানায় আগুন দিয়েছে,—

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলো সশস্ত্র পুলিশ, এবার প্রকাশ্যভাবে পুলিশের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো অত্যাচারিত জনগণ, পুলিশও শেষ উপায় অবলম্বন করলে।

শেষ পর্য্যন্ত বহু লোক হতাহত হল, বন্দী হল।

এর মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেলেন মহেশ্বরী, তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল অসুস্থ অবস্থায়, এক গরীব গৃহস্থের বাড়ীতে তিনি পড়ে আছেন। পুত্রের কাছে ফিরবেন না প্রতিজ্ঞা করেই যেন তিনি বাহির হয়েছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা তিনি রেখেছেন।

চোখের দৃষ্টি সীমা ছাড়িয়ে যেন অতীতে হারিয়ে যায়, রতনমণি দত্ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন, সামনে ভারতীর অস্তিত্বও তিনি ভুলে যান।

"বাবা—"

ভারতী উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, "এতোদিন তো কোন কথা আমায় বলনি বাবা।"

রতন দত্ত শুষ্ক হাসি হাসেন, "তখন যে তুই ছেলেমানুষ ভারতী, জানলেও বুঝবার বয়স তো হয় নি।

ভারতী খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকে, তারপর জিজ্ঞাসা করে—"তুমি তখন কি করলে বাবা?"

রতন দত্ত উত্তর দিলেন, "ইসমাইল তাঁকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল, পারে নি। ইসমাইলের মুখে খবর পেয়ে আমি নিজেই সেখানে ছুটে গেলুম, মাকে ফিরাতে পারলুম না ভারতী। পরের দিনই তিনি মারা যান, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী চকদীঘির শ্বশানে তাঁকে দাহ করে আমি ফিরে এলুম।"

সে কথা ভারতীর মনে আছে।

দশ বৎসরের মেয়ে ভারতী জেনেছিল তার দিদা চকদীঘিতে পাঁচ দিনের জন্য গিয়ে অকস্মাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন, পিতার সঙ্গে সেও অশৌচ পালন করেছিল সে সময়।

দাঁতের উপর দাঁত রাখে ভারতী।

মৃত্যু,—কিন্তু কি গৌরবময় মৃত্যুই বরণ করে গিয়েছেন দিদা।

সরকার বাহাদুর এর পর হতে রতনমণি দত্তের উপর একটু খরদৃষ্টি রেখেছেন বই কি। মা ও মামা বিশেষ করে যে মামার সঙ্গে তিনি একত্রে মানুষ হয়েছেন—সে মামা পলাতক আসামী; তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা বর্তমান সময়ে সরকারের পক্ষে অন্যায় নয়। রাজ্যরক্ষার জন্য আসামীর আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধব যে যেখানে আছে সকলেরই উপর সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। সরকার জানেন তেঁতুল গাছের পাতা ফুল ফল সব কিছুই টক হয়ে থাকে এবং সেই জন্য পিতৃগোষ্ঠী সরকারের একান্ত অনুগত ভক্ত হলেও মাতৃগোষ্ঠীর জন্যই রতনমণি দত্ত চিরকালের মত দাগি হয়েই রইলেন।

রায় বাহাদুর উপাধিটা মরীচিকার মতই কোথায় মিলিয়ে গেল যা পাওয়ার আশায় এ পর্যন্ত রতন দত্ত কত টাকাই না ঢেলেছিলেন, কত তোষামোদই না করেছিলেন।

চকদীঘিতে সাহেবের সফরের আয়োজন করেছিলেন রতন দত্ত, সব কিছুর ভার তিনি নিয়েছিলেন, কিন্তু এত করেও বদনামই রটে গেল। সাহেব রিপোর্ট দিলেন স্বেচ্ছায় জমিদার রতনমণি দত্ত যে তাঁর চকদীঘিতে থাকার ভার গ্রহণ করেছিলেন তার মূলে তাঁর গোপন অভিসন্ধি ছিল।

উল্টা বুঝিলি রাম—

খরচ এবং পরিশ্রম সবই হল ব্যর্থ, সরকারের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তাঁকে অনুসরণ করে ফিরতে লাগলো।

আজ সেই রায় বাহাদুর উপাধি নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টার কথা মনে হলে হাসিই পায়।

সরকার আজ এ উপাধি দিতে এলে—তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবেন এ কথা ঠিক। রতনমণি দত্ত অন্যমনস্কভাবে কোনদিকে চেয়ে থাকেন।

নয়

সামনে দেয়ালে রয়েছে মহেশ্বরীর অয়েলপেণ্টিং।

বৃদ্ধা মহেশ্বরী একমনে মালা জপ করছেন; তাঁর মুখে স্বর্গীয় দীপ্তি, অসীম দৃঢ়তা, প্রচুর সাহস।

তাঁর মুখ দেখে বোঝা যায় কতখানি শক্তি ছিল তাঁর, দেড় বৎসরের শিশুপুত্রকে নিয়ে তিনি বিধবা হয়েছিলেন, তখন হতে কতখানি সংযম নিষ্ঠা, কতখানি দৃঢ়তা শক্তি নিয়ে তিনি পথ চলেছেন, কাজ করেছেন।

তিনি কোনদিন কারও সামনে বার হন নি, বংশের আভিজাত্য তিনি এতটুকু খর্ব হতে দেন নি। পরদার আড়ালে থেকে তিনি সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালিয়েছেন, হুকুম করেছেন, উপযুক্ত বিচার করেছেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল পুত্রকে মানুষ করে তোলা, তার পর তার পৈত্রিক সম্পত্তি তাকে বুঝিয়ে দিয়ে তিনি কিছুদিন তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াবেন।

বড় হয়ে উঠলেন রতনমণি দত্ত। সাবালক হয়ে একদিন মহা ধুমধামে, মহা আনন্দের মধ্যে তিনি পিতার সম্পত্তি অধিকার করলেন।

সেদিন নাবালক জমিদার পুত্রের সাবালকত্ব উৎসবে যোগ দিতে এসেছিলেন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিসের বড় কর্ত্তা, ছোট কর্ত্তা সবাই।

রতন দত্ত আভূমি নত হয়ে সেলাম জানালেন,—সোজা কথা নয়—রাজার জাতি, রাজ প্রতিনিধি, তাদের সম্মান দেখালে উন্নতিই হবে।

সাদা মানুষদের এ দেশের কালো মানুষেরা কত খানি শ্রদ্ধা ভক্তির চোখে দেখে, কেউ কেউ মহাদেবের সঙ্গে তুলনা করে। সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে যে জাতি এসেছে রাজ্য শাসন করতে, তারা কি সাধারণ মানুষ?

মামা কিশোর মুখ মচকে হাসে, রীতিমত বিদ্রুপের হাসি—।

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে সে পড়ে,—সাহেবদের সঙ্গে তার অহোরহ সম্পর্ক। অতীতের ইতিহাসের পাতা সে

উল্টেছে, শুধু উল্টায় নি তার প্রত্যেকটী কথা, সে মনে গেঁথে রেখেছে।

ভারতে সেদিন যারা এসেছিল বণিকরূপে বাণিজ্য করতে, সেদিন দেশের পথে পথে যারা কাঁচের পুতুল মালা প্রভৃতি নিয়ে ফেরি করে বেড়াত, সেই বণিক কৌশলে অধিকার করেছে বাংলার সিংহাসন; সেই বণিক আজ দেশের রাজা, দেশের শাসনকর্ত্তা।

কবি লিখেছেন—

বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে—

দেশবাসীর দুর্ব্বলতা সেদিনকার বণিক ধরতে পেরেছিল, তাই সহজেই সে ভেদমন্ত্র উচ্চারণ করলে, বড় ছোটর পার্থক্য জাগিয়ে দিলে। এতটুকু ছিদ্রপথ আবিষ্কার করে কোন রকমে নাসিকা প্রবিষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে তারা বিরাট দেহ নিয়ে ঢুকে পড়লো। তারপর তারা ফেলে দিলে কাঁচের ঠুনকো জিনিস, তারা তুলে নিলে প্রাণঘাতি অস্ত্র।

হ্যাঁ, সোনার ভারতকে তারা হস্তগত করবেই—তার আগে জয় করলে তারা ভারতের মুকুট মণি সোনার বাংলা দেশ।

সে কত খৃষ্টাব্দে—? ইতিহাসের পাতা উল্টালে চোখে পড়ে—।

আঠারো শো সাতান্ন—

হায় আঠারো শো সাতান্ন। পলাশীর মাঠে ডুবে গেল জাতির জীবন সূর্য্য,—নেমে এলো অন্ধকার—সেই বিরাট বিপুল অন্ধকারে ঢেকে গেল চারিদিক। সেই কালো অন্ধকারের বুকে পা ফেলে চলেছে শ্বেত জাতি, শ্যেনদৃষ্টি তার অন্ধকারে খুঁজে ফিরছে রাজ্য, লিপ্সা তার ধরছে না বুকের মধ্যে।

ইংরাজ দেবতা,—

হাত তার প্রসারিত, দিতে নয়—নিতে।

দাও দাও, সব দাও। যুগ যুগান্তর—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যা তোমরা সঞ্চিত করেছ সব ঢেলে দাও, দাও তোমার সোনা-রুপা, দাও তোমার অন্ন-বস্ত্র, দাও তোমার শক্তি স্বাস্থ্য। তুমি ধ্বংস হও, তোমার সব যাক, সাগর পারের দেশ সমৃদ্ধ হোক।

দেশে আছে কি—? দেশের কবি বড় দুঃখে বলেছেন,

সূচ সুতা পর্যন্ত আসে বিদেশ হতে,
দেয়াশলাই কাঠি, তাও আসে পোতে,
প্রদীপটি জ্বলিতে, খেতে, শুতে বসতে
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।

এর পরও এলো ম্যালেরিয়া—টি, বি, থাইসিস, আরও কত রোগ; শিকড় গেড়ে যারা বসেছে এ দেশের বুকে। দেশে খাদ্য নাই, দুধ নাই; জমিতে প্রচুর ফসল হয় না, যাও বা হয়—তাও চলে যায় ওদের সেবায়,—খোসা ভূষি যা পড়ে থাকে তাই ক্ষুধা মিটায় এ দেশবাসীর।

কিশোর বিদ্রূপ করেন—"আমাদের রতন শ্বেতপদধূলি মাথায় দিয়ে রাজতক্তে বসেছে, ওর আর কোন ভাবনা নেই। শিব স্বয়ং যার সহায় তার আবার ভয়টা কিসের?

রতন দত্ত সঙ্কুচিত হয়ে ওঠেন, উত্তর দেওয়ার মত কথা খুঁজে পান না।

আশ্চর্য্য ছেলে কিশোর। রতন দত্তের সমবয়স্ক কিন্তু জ্ঞানলাভ করেছে অনেক বেশী। অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু দৃঢ় সবল দেহ, দু' দিন জল না খেয়েও সতেজ থাকতে পারে। ছুটির সময় কলকাতা হতে তিনি এখানেই আসেন,—দু' চার দিন থেকে চলে যান। হয় তো একেবারে আসতো না, কেবল মাতৃসমা দিদিমণির জন্যই তাঁকে আসতে হয়।

কিশোরের উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অন্তরের অন্তস্থল পর্য্যন্ত সে দৃষ্টি পৌঁছায়।

তিনি বলেন, "যাই বল রতন, তোমার পিতৃপুরুষের সম্পত্তি তুমি পেয়েছো, নিজের উপর নির্ভর করে চল, সাহেবদের পায়ে তেল দেওয়ার দরকারটা কি তাতো আমি বুঝি নে। ওদের নিত্যি পার্টি দেওয়া, ওদের এত খোসামোদ করা—এ সব না করলেও তো চলে।"

অনেক সময় সময় রতন দত্ত উষ্ণ হয়ে ওঠেন, বলেন, "তোমার তো জমিদারি নেই তাই তুমি বুঝতে পারবে না কিশোর—ওদের খুশি রাখার কতখানি দরকার—"

কিশোর বাধা দেন, "থাক থাক, আমার বাপ পিতামহ যে জমিদার ছিলেন না, তাঁরা যে কথায় কথায় যো হুকুম বলে মাথা নোয়াতেন না সে জন্যে আমি সত্যি তাঁদের কাছে বড় কৃতজ্ঞ। আমি অন্ততঃ পক্ষে এ অহঙ্কার করবো—আমায় কারও কাছে নিচু হতে হয় নি, কারও পায়ে তেল দিতে হয় না।"

রতন দত্তের সুগৌর মুখখানা লাল হয়ে ওঠে, যথাসম্ভব শান্ত সংযত কণ্ঠে তিনি বলেন, "সেটা তোমার অভিশাপ কি আশীর্ব্বাদ তা আমি বলব না, নিজের মনেই তা বুঝে নিয়ো। আমার দিক দিয়ে এ কথা আমি বলব—রাজার প্রতি, সম্রাটের প্রতি আনুগত্য স্বীকার প্রত্যেক ভূস্বামীকে করতে হয়—আমিও সেই আনুগত্য মেনে চলছি।"

কিশোর আবার হাসেন, "কিন্তু একেই কি আনুগত্য স্বীকার বলে? সাহেবদের মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করা

জেলায় নিয়ে বাংলোয় বাংলোয় মাথা লুটিয়ে বেড়ানো সরকার না চাইতেই মোটা মোটা টাকা চাঁদা দেওয়া—

একটু থেমে তিনি আবার বলেন, "রাজা—সম্রাট, চমৎকার কথাটি বলেছো রতন। যে রাজা প্রজার কল্যাণ কামনা কোনদিন করে না, প্রজাকে মেরে যে যথেষ্ট আত্মসুখ উপলব্ধি করে, আইনের পর আইন গড়ে কেবল নির্য্যাতনের জন্য,— প্রজাশক্তি সহজেই তার আনুগত্য মেনে নেবে বলে ভাবো?

রতন দত্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন—"কি যে আবলতাবল বল কিশোর—এ সব বলা তোমারই মানায়, আমার মানায় না। আমি জানি তুমি বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশেছো,—সেই জন্যেই তোমায় মিনতি করছি আমায় তুমি পরিত্রাণ দাও—আমার সংস্পর্শে তুমি এসো না। আমি একা নই, আমার উপর হাজার হাজার প্রজার সুখশান্তি, উন্নতি অবনতি, জীবন মরণ নির্ভর করছে,—তোমার ও পথ আমার নয়, আমায় চিরদিন এমনই ভাবে রাজার অধীন হয়ে থাকতেই হবে।"

কিশোরের মুখে এক অদ্ভুত হাসি ফুটতে দেখা যায়। স্নিগ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন, বেশ, আমি চলে যাব, আর কথা দিচ্ছি—তোমার পথ আমার পথ আলাদা জেনেই আমি এখানে আর আসব না। কিন্তু একটা কথা বলে যাই রতন —তুমি জেনো—অ্যায়সা দিন নেহি রহে গা। জনশক্তি জেগেছে, অবাধ অত্যাচার চালিয়ে তোমার বৃটীশ প্রভু বড় বেশীদিন রাজত্ব করতে পারবে না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি তুমি আমি বেঁচে থাকতেই যেন সেদিন আসে।"

তারপর চলে গেছেন কিশোর, এখানে আর তিনি আসেন নি। নিজেকে তিনি এমনভাবে গোপন করলেন, যাতে তাঁর দিদিমণিও চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

মহেশ্বরী পুত্রকে সন্দেহ করেছিলেন, তাই তিনি এক দিন জিজ্ঞাসাও করেছিলেন, "তুমি কি কিশোরকে এখানে আসতে বারণ করেছো খোকা?"

রতনমণি দত্ত খানিকক্ষণ মাথা নত করে থাকেন, তার পর আস্তে আস্তে উত্তর দেন, "হ্যাঁ, বারণ করেছি মা; জ্বলন্ত আগুন আমি ঘরে রাখতে পারিনে, তাতে আমার ঘর পুড়ে যাবে।"

পলকহীন নেত্রে মহেশ্বরী পুত্রের পানে তাকিয়ে থাকেন, তারপর হাসেন সেই অদ্ভুত হাসি—যেমন হাসি হাসতো কিশোর, তাঁর ছোট ভাই।

ধীর কণ্ঠে মহেশ্বরী বললেন, "কিন্তু এ আগুন কি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে খোকা—দাবানল নিভাবার শক্তি আছে তোমার? এ দাবানলে পুড়বে কত ছেলে কত মেয়ে, কত ঘর, কত রাজত্ব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে; পুড়বে ওই শাসক সম্প্রদায়, বৃটীশ রাজত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে দেশের বুকে; শুধু থাকবে ওদের রাজ্যপ্রাপ্তি এবং রাজ্যশাসনের কলঙ্কময় ইতিহাস মাত্র।"

রতন দত্তের মুখখানা কালো হয়ে যায়।

এর পর আসেন সুশ্বেতা—

সে একটা কাল-বৈশাখীর ঝড়।

তার আসার আশা রতন দত্ত যে করেন নি তা নয়, চেয়েছিলেন তিনি সেই স্ত্রীকে, যে সর্ব্বাংশে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে থাকবে অন্তঃপুরে, সেইখানেই হবে সে একচ্ছত্র রাণী,—

কিন্তু এলো কাল-বৈশাখীর ঝড়।

স্তব্ধ হয়ে থাকেন রতন দত্ত। এ মেয়েকে তিনি তো স্ত্রীরূপে চান নি—এর আসা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। কিশোরের মানসী এ মেয়ে, কিশোর যা না বলতে পেরেছেন, স্ত্রীর অধিকার পেয়ে সুশ্বেতা তা মুক্ত কণ্ঠে বলেছেন।

রতন দত্তের গলা কে যেন অদৃশ্য হস্তে টিপে ধরে।

এ স্ত্রী নিয়ে সংসার করা পোষাবে না তাঁর, এ যে বহ্নিশিখা, এর কাছে যেতেও ভয় করে।

যে স্বামীকে সুশ্বেতা পেতে চান—তিনি সে স্বামী নন। যে রায় বাহাদুর উপাধিটা নেওয়ার জন্য তিনি লালায়িত, সুশ্বেতা সে উপাধি ঘৃণা করে।

দুইটী বৎসরে বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল রতন দত্তের অন্তঃপুর। আশ্চর্য্য, তাঁর মনেও যেন সংশয় জাগছে; সুশ্বেতা যা বলছে এবং কিশোর যা বলে গেছে হয় তো তাই ঠিক, তিনিই হয় তো ভুল পথে—কেবল মাত্র তোষণ করে চলেছেন।

ঝড় এসেছিল—আবার চলেও গেল। কাল বৈশাখীর ঝড়ে কত কি উড়িয়ে নিয়ে যায়—আবার নিয়েও আসে। সুশ্বেতা নিয়ে গেল রতন দত্তের শান্তি, দিয়ে গেলেন সংশয়, রেখে গেলেন তাঁর আত্মজা ভারতীকে।

আজ সংঘাতে সংঘাতে আত্মবিস্মৃত রতনমণি দত্ত। আজ সংশয় সত্যে পরিণত হয়েছে, তিনি বুঝতে পেরেছেন তিনি এ পর্য্যন্ত যা কিছু করেছেন সবই মিথ্যা হয়ে গেছে। জীবনে যারা ছিল তাঁর বড় আপনার জন, অবহেলায় তাদের হারিয়েছেন। হারিয়েছেন জগতে একমাত্র বন্ধু কিশোরকে, হারিয়েছেন প্রিয়তমা স্ত্রীকে, অবশেষে—অবশেষে হারালেন মাকে।

আজ মনে হয়—চকদীঘিতে যদি তিনি যেতেন, তা হলে অত বড় দাঙ্গাটা ঘটতে পারতো না, পুলিশও বেপরোয়া গুলি চালাতো না। তিনি গিয়ে দাঁড়ালে হয় তো প্রজারা শান্ত হতো, পুলিশও ফিরে চলে যেতো, মাও তাঁকে ক্ষমা করে ফিরে আসতেন।

নিজে গেলেন মহেশ্বরী—

তখন তিনি জমিদার রতনমণি দত্তের মা নন, তিনি কিশোরের দিদিমণি, চন্দনীঘির মেয়ে।

আঃ, কত বড় ভুলটাই হয়ে গেছে।

রতন দত্ত কেবল দুই হাতে মাথাটাকে চেপে ধরেন। আজ তিনি শান্তি চান,—কিন্তু শান্তি কই? দুইজন চলে গেছে, কিশোর আজও অজ্ঞাতভাবে কোথায় আছে কে জানে। আজ তার প্রদর্শিত পথে তিনি চলতে চান, মা ও স্ত্রীর আত্মা তাতে হয় তো তৃপ্ত হবে।

ক্রমশঃ

কবি নজরুল

অরুণ চৌধুরী

কোন লেখকের সৃষ্টি-প্রতিভার সার্থক বিকাশের জন্যে যে ক'টি উপাদান অত্যাবশ্যকীয়, তাঁর 'পাঠক হওয়ার' গুণটা হয়ত তন্মধ্যে প্রধান, এই 'পাঠক হওয়ার' গুণে দেশ-বিদেশের বহু স্রষ্টা সার্থক সৃষ্টির পরিচয় দিতে পেরেছেন; আবার অনেকে তাঁদের সুবিরাট কবি-প্রতিভা ও আবেগ-প্রবণ হৃদয়-সত্তা সত্ত্বেও ধুরন্ধর স্রষ্টার সম্মান অধিকার করতে পারেন না। হয়ত বা পারেন সাময়িক কালের জন্যে, পারেন একটা কোন বিশিষ্ট যুগের জন্যে, পারেন একটা সমকালীন চেতনার জন্যে; কিন্তু কিছুদিন পরে তা'তে ভাঁটা পড়ে। কারণ কোনো জীবন-দর্শনই চিরন্তন কালের জীবন-দর্শন নয়; কোনো জীবন-জিগ্যাসাই নয় সনাতন। যুগে যুগে তা' বদলায়, বদলায় সমাজের অগ্রগতির সংগে সংগে, বদলায় সমাজ-বিকাশের আনুসঙ্গিক পরিবর্তনের অবধারিত নীতিদ্বারা তাড়িত হ'য়ে, তবে যে জীবন-জিজ্ঞাসার অন্তর্গামী দৃষ্টি যত বেশী, যত তা'র গভীরতা, তা'র প্রগাঢ়তা, যে জীবন-জিজ্ঞাসা যত বৈজ্ঞানিক, তা'র স্থায়িত্বও তত বেশী। সমকালকে ছাড়িয়েও সে আগামী-দিনের ছাড়পত্র পায়। কাজেই যে লেখক শুধু সমকালের দাবীই পূরণ করেন স্থূলভাবে, তাঁর স্থায়িত্ব সম্পর্কেও প্রশ্ন জাগে দু' দিন পরেই। কোন লেখকের সেই সমকালকে ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের ছাড়পত্র পাওয়ার যে শক্তি, তা' যোগায় তাঁর জীবন দর্শন, তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার স্বরূপ। স্রষ্টার জীবন-দর্শন। পূর্ব্বেই বলেছি যে, কোন জীবন-বাদের মেটল গভীরতা, তার অন্তর্গামীতাই তাকে অধিকদিন বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। সে কথাটাও এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়। তবে এখানকার প্রশ্ন হল লেখকের সে জীবন-দর্শনের উৎস কোথায়? সে জীবন-দর্শনের উৎস যেমনি তাঁর পারিপার্শ্বিক সমাজ-রাজ-অর্থনীতিক পরিবেশ তেমনি তাঁর পঠকত্বও। সমাজ-রাজ-অর্থনীতিক অবস্থা যোগায় প্রেরণা আর পড়াশুনা, বা 'পাঠক হওয়ার' গুণ সংগ্রহ করে শক্তি, দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতা, তার সূক্ষ্মত্ব, আনে তার সুতীক্ষ্মতা।

কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টি বিচার কর্তে গিয়ে এ কথাটি বিশেষভাবে স্মর্তব্য বলেই আমি মনে করি। কারণ শুধু নজরুল ন'ন, তাঁর পূর্বসূরীদের মধ্যেও যে ক'জনের কথা জানি, যে ক'জনের সৃষ্টির অল্প-বিস্তর খোঁজ নেবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, তাঁদের বিষয়েও এ-ই একটি কথাই আমার মনে বারবার জেগেছে। বারবার দেখেছি লেখকের 'পাঠক হওয়ার' গুণটার শক্তি কত প্রবল, কত প্রচণ্ড তার প্রাণ দায়িনী ক্ষমতা। এই 'পাঠক হওয়ার' গুণেই একশো বছর আগেকার দুই স্রষ্টার মধ্যে একজন হলেন সার্থক স্রষ্টা, আরেকজন তার অভাবে করলেন যুগ-ধর্ম্মকে অস্বীকার; এবং যুগধর্ম্মকে অস্বীকার করায় তাঁর সৃষ্টি যুগের জীবন-দর্শনের শক্তি নিয়ে সার্থক হয়ে উঠতে পারল না; তা' সেই পুরানোর অচল অনড় চিন্তাশক্তির জড়তাতেই আটকে রইল। জীবনের স্রোত বইল না তা'তে। আর অন্যজন? শুধু ঐ পাণ্ডিত্য ও পড়াশুনার

গুণেই সে যুগের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টার সম্মান পেলেন। আমি বলছি রঙ্গলাল ও মাইকেলের কথা। অবিশ্যি রঙ্গলালের সঙ্গে নজরুলের তুলনা চলে না। কারণ নজরুল যুগ-ধর্ম্মকে অস্বীকার করেন নি, অস্বীকার করেন নি তা'র প্রচন্ড প্রাণাবেগকে, তার দুর্বার গতিকে, বরংচ সেদিকে তিনি অসহনীয়তার পরিচয় দিয়েছেন তার সৃষ্টির ছত্রে ছত্রে, দিয়েছেন অস্থিরতার ছাপ; কিন্তু যা' পারেন নি তা' হল সে প্রাণাবেগের মধ্যে, সে যুগধর্ম্মের প্রবলতার মধ্যে সূক্ষ্ম অন্তর্গামী শক্তির ইন্ধন যোগাতে, যোগাতে সার্থক জীবন-দর্শনের গভীরতা। তা' যদি পারতেন তা' হলে নজরুল যে কবি-সম্মান পেয়েছেন তা' আরও পেতেন, শুধু তাই নয়, তাঁর জীবদ্দশা সত্ত্বেও যে তাঁর সৃষ্টিতে ভাঁটা পড়ল তা'ও হয়ত হ'ত না। বাংলাদেশ হয়ত বঞ্চিত হ'ত না অতবড় একটা বিরাট কবি-প্রতিভা থেকে, অমন একজন যুগন্ধর স্রষ্টার দান থেকে। বাংলা আরও পেত, বাংলা সার্থক হ'ত, যেমনি হয়েছে মাইকেল-রবীন্দ্রনাথের মাতৃ-ভূমি হিসেবে, ঠিক ততখানি সার্থকতাই বাংলার ভাগ্যে জুটত; কিন্তু জুটল না। প্রথমে লেখকের 'পাঠক হওয়ার' গুণ-বিচারের যে ভূমিকাটুকু দিয়েছিলুম, তা' শুধু এ কথাটি বুঝাবার জন্যেই।

নজরুল সৈনিক-কবি। যুদ্ধক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের সহায়কারী তার তাঁবেদার বাহিনীর একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে, তিনি দেখেছেন যুদ্ধের কী রূপ, দেখেছেন তার অসাড়ত্ব, দেখেছেন তার নির্মমতা, সর্বোপরি দেখেছেন যে যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তা'র স্বার্থ সিদ্ধির তাগিদে সৃষ্টি করেছে, সেই যুদ্ধের এবং সংগে সংগে সেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বীভৎস পাষন্ডরূপ, এ 'দেখা' তাঁকে আঘাত করেছে, তাঁর বুকে জেলেছে বেদনার বহ্নি, 'দুঃখের হোমানল'; কবি-সৈনিক তাতে দগ্ধ হয়েছেন, তাঁর বুক তাতে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে, তাঁর সত্তা পরিশেষে সে দহনে নিজেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। কবি বিদ্রোহী হয়েছেন, তাঁর চেতনায় সৃষ্টি হয়েছে বিদ্রোহের প্রচন্ড গতি-বেগ। আপন সৃষ্টিতে তাকে, সে বিদ্রোহী-চেতনার ও আবেগের স্বরূপকে রূপায়িত করতে বসলেন কবি। কিন্তু কি ভাবে? ঠিক সে সময়েই আরেক জন স্রষ্টা তার সৃষ্টির অপরাহ্ণ বেলায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নয়, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে অবস্থিত বাংলার তথা ভারতবর্ষের বুক থেকে, সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট ওই যুদ্ধ, তার বীভৎসতা, পাষণ্ডতা, তার নির্মমতা, এবং মানবতা-বিধবংসী রূপের বিরুদ্ধে দীপ্তক-তানের ধ্বনি তুললেন, 'দূর হ'তে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন ওরে দীন ওরে উদাসীন', তিনিও ডাক দিলেন দেশবাসীকে, ডাক দিলেন সর্বকালের মানব-সমাজকে, ডাক দিলেন ওর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে 'তবু এরি মাঝে তরী নিয়ে হতে হবে পার কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার, শিরে নিয়ে উন্মত্ত দুর্দিন', ভারতবর্ষে নয়, খাস সাম্রাজ্যবাদের আপন দেশে ইংলন্ডেও এ সময় আরেকজন দাঁড়ালেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে। তিনিও নজরুলের মত একজন সৈনিক, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যোদ্ধা, যুদ্ধ করছেন আরেক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জার্মাণীর বিরুদ্ধে। তবে নজরুল ছিলেন সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্থ উপনিবেশ ভারতবর্ষের বাহিনীতে, সাম্রাজ্যবাদের গোলাম-দেশের গোলাম-যোদ্ধারূপে, সে কবি তা' নন।

এখন দেখা যাক এ তিনের তুলনামূলক একটা আলো-চনা করে। নজরুল, সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট যুদ্ধের বীভৎসতার রূপ দেখে এসে মেতেছেন সৃষ্টিতে। কিন্তু সে বীভৎস-তার রূপ দেখে এলেও, সে নির্মমতা প্রত্যক্ষ করলেও, তিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন না। মানব-জীবনে এ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিষময় ফল যে কী তা' তিনি খুঁজলেন না। খুঁজলেন না সেরূপ, যা' এ যুদ্ধ এনে দিচ্ছিল বিশ্ব-জনীন মানবতার চেতনায়, এনে দিচ্ছিল গোটা বিশ্ব-জীবনে, সাম্রাজ্যবাদ এ যুদ্ধ সৃষ্টি করে কি ভাবে যে বাঁচতে চাইছে এবং বাঁচাতে চাইছে ধনতন্ত্রকে তার সর্বাত্মক সংকট থেকে, ফিরাতে চাইছে তার বিলয়-মুখী গতিকে, তার অন্তিম পর্যায়কে; নিষ্ফলভাবে পাচ্ছে এ প্রয়াস। নজরুল তা' দেখলেন না। নজরুলের দৃষ্টিতে তা' ধরা পড়ল না। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরলেন নজরুল, তার মধ্যে সেযুগে যদিও এটাই ছিল সব চেয়ে অধিকতম সম্ভাবনাপূর্ণ দিক, তবু তা'তে বঞ্চিতই রয়ে গেলেন নজরুল। নজরুল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যা নিয়ে এলেন তা' হ'ল জাতীয়তার চেতনা, জাতীয়তাবাদের মন্ত্র। কিছুটা পেলেন ইসলামের নব-জাগরণ তথা তুর্কী-দের সার্থক বিদ্রোহ থেকে; পেলেন কামাল-পাশার জাতীয়-তার মন্ত্র থেকে; আর কিছুটা লাভ করলেন স্বদেশে তার দুঃখদারিদ্র্য, তার শেষ কংকালরূপ দেখে; বিশেষকরে অগ্রগতির রুদ্ধতায় ক্ষুব্ধ তৎকালীন বাঙালী চেতনা ও জীবনদর্শনই জোগাল নজরুলকে প্রেরণা। নজরুল দেখলেন প্রতিপদে সাম্রাজ্যবাদীর শক্তির শোষণ-লাঞ্ছিত বাংলা, দেখলেন সর্বত্র অগ্রগতিরুদ্ধ বাঙালীর সত্তা, দেখ-লেন শোষণে জর্জর দেশের সর্বত্রই ভাঙন, সর্বত্রই অভাব, দারিদ্র্য, নিপীড়ন এবং এক সুবিস্তৃত অনিশ্চয়তা ও অস-হায়তা। সর্বত্রই এক প্রচন্ড ক্ষোভ। অসন্তুষ্ট, ক্রুদ্ধ বাংলা

তথা ভারতবর্ষ। নজরুলের সৃষ্টির প্রেরণা এই লোক, এই সমাজ, এই বাঙালী জীবন। তাই নজরুল হলেন এ লোকের কবি। এ সমাজের ক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট, ক্রুদ্ধ এই বাংলাদেশের কবি। তাঁর কবিতায়, তাঁর সৃষ্টিতে সর্বত্রই মুখ্য' হয়ে উঠল এই পরিবেশ; সর্বত্র-লাঞ্ছিত অথচ প্রতিষ্ঠা-পিপাসু এই বাঙালী জীবন; তার জীবন-দর্শন, তার ক্রোধ, তার বিদ্রোহ, তার অসন্তোষ, সর্বোপরি তার জাতীয়তাবাদ। নজরুল এ সবকেই রূপায়িত করলেন তাঁর সৃষ্টির মাঝে। তিনি তাই হলেন বাঙালীর জাতীয় কবি; এ আখ্যালাভের সৌভাগ্য তাঁর এ গুণেই হ'ল।

আর রবীন্দ্রনাথ, 'বলাকা'র কবি। তাঁর চিত্ত ব্যথিত হয়েছিল বিশ্ব-জনীন মানবতার সংকট দেখে। তাঁর হৃদয়ে আঘাত করেছিল, তাঁর চেতনাকে খোরাক জোগাচ্ছিল, প্রেরণা দিচ্ছিল বিশ্ব-লোকের বিপদ, বিশ্ব-জীবনের দুর্দিন। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মানবতা-বিধ্বংসী বীভৎসরূপ, দেখলেন তার সর্বাত্মক নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীন পাষণ্ডতা। তাই তিনি আঁৎকে উঠলেন; তাই তিনি সশংকিত হলেন, তাই তিনি বিপদ গণলেন। পরিশেষে দাঁড়ালেন প্রতিবাদের ধ্বজা তুলে। দাঁড়ালেন মানবতা-বিধ্বংসী পাষণ্ড-শক্তির বিরুদ্ধে, দাঁড়ালেন সর্ব-যুগের সর্বকালের অপরাজেয় মানবতার পক্ষ থেকে মানবতার বাণী নিয়ে কণ্ঠে—

'তবু এরি মাঝে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি
ডাকিছে কাণ্ডারী,
এসেছে আদেশ,
নন্দরের বন্ধনকাল এবারের মত হল শেষ।'

এই হ'ল তাঁর সুর। অমঙ্গলের বিরুদ্ধে অকল্যাণের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদের দীপক-তান। তিনি জানতেন জয়ী হবেন, তাঁর এ সুমহান বিশ্বাসের উৎস হ'ল সর্বজয়ী সর্বকালিক মানবতা। এর মধ্যে ছিল না নিষ্ক্রিয় শান্তিবাদীর সুর। ছিল না প্যাসিফিস্টের দৃষ্টিভঙ্গী, সেদিনও তিনি বিশ্বাস করতেন, 'শান্তির ললিতবাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস': এখানেই, এ প্রসংগেই আরেকটা কথা স্মর্তব্য। যেটা পূর্বেই আমি উল্লেখ করেছি, নজরুল ও রবীন্দ্রনাথের এই যে পার্থক্য এর পিছনে কারণ হিসাবে যা' কাজ করছে, তা' হয়ত এ-ই। জীবন-বোধের প্রাচুর্য ও প্রগাঢ়তা-জনিত রবীন্দ্রনাথের কবিত্বশক্তির অন্তর্গামিতা, তার গভীরত্ব, আর অপরদিকে নজরুলের বেলায় তার অভাব।

ইংলণ্ডের যে কবির কথা উল্লেখ করেছিলাম তাঁর কথাও আলোচনা করা যাক্। ইংলণ্ডের সে কবি হ'লেন ওয়েন। তিনি শুধু সৈনিক-কবি নন। তাঁর মৃত্যুও যুদ্ধক্ষেত্রেই। সেদিক দিয়ে তাঁর কবিতাও যেমনি, ব্যক্তি-হিসাবে তিনি নিজেও তেমনি, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী, তবে আমরা বিচার করব তাঁর প্রতিবাদের স্বরূপ কি। তাঁর প্রতিবাদের স্বরূপ হল নিষ্ক্রিয় শান্তিবাদ। যুদ্ধের নৃশংসতা তাঁকে বারে বারে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য করেছেঃ এ যুদ্ধে লাভ কী? তিনি প্রশ্ন করেছেন, এ যুদ্ধের ফল কি? এত শুধু মানবতার ক্ষয়। নজরুলের সঙ্গে ওয়েনের পার্থক্যও এইখানেই। ওয়েন নিষ্ক্রিয় শক্তিবাদের সমর্থক সৈনিক-কবি; তিনি যুদ্ধের মধ্য থেকে লাভ করেছেন নিষ্ক্রিয় শান্তিবাদীর দৃষ্টি, তৎকালীন নব-প্রচলিত খৃষ্টান-মানবতা যার পিছনে অনেকখানি কাজ করেছিল; আর নজরুল যুদ্ধের মধ্য থেকে লাভ করেছেন নতুন যুদ্ধের মনোভাব; সে যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সে মনোভাবের উৎস সম্পর্কে এর আগে আলোচনা করেছি।

নজরুলের সৃষ্টির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল, তিনি বিদ্রোহী, তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে বিদ্রোহের সুর। সর্বত্রই শিকল ভাঙার সক্রিয় প্রচেষ্টা, আর সে-ই বিদ্রোহ করবার প্রচেষ্টায় তিনি তৎকালীন অন্যান্য স্রষ্টাদের প্রভাবকেও কাটিয়ে গেলেন। কাটিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট স্রষ্টার প্রভাবকে। অস্বীকার করলেন তাঁর যুগের প্রভাব প্রচলন করলেন নতুন আঙ্গিক, সহজ সরল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত সাধারণ ভাষার মাধ্যমে সৃষ্টি। তবে তাঁর এই যে বিদ্রোহ, এই আত্মপ্রতিষ্ঠার চমকত্ব, তাঁর প্রবলতা, তাকে তিনি কোনো মানদণ্ডদ্বারা পরিমিত করে নিতে পারলেন না। করে নিতে পারলেন না কোন জীবন-বোধ দ্বারা বলিষ্ঠ, স্বচ্ছ, সূক্ষ্ম, অন্তর্গামী, এবং কিছুটা সংযতও। সে গুণের অভাবে, তাঁর 'বিদ্রোহ' বিদ্রোহই হয়ে রইল। অবিশ্যি বিদ্রোহ যে কার বিরুদ্ধে, বিরুদ্ধে যে কেন, তা' যদিও কিছুটা পরিস্ফুট হ'ল, প্রকাশিত হ'ল বিদ্রোহের আবেগও, তার প্রাণশক্তিও কিন্তু সে বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি তথা সে বিদ্রোহের সার্থক উদ্দেশ্য যে কী তা' তিনি ফুটাতে পারলেন না। তাই বিদ্রোহের হৃদয়টাই বড় হ'ল, বড় হ'ল না তার চিন্তাশক্তির তথা জীবন-বোধের প্রাচুর্য, তার প্রবণতা, গভীরত্ব। এদিক থেকে নজরুলের সঙ্গে আরেকজন স্রষ্টার বিচার চল্‌তে পারে। দু'জনের বহু সৃষ্টিই সম-সাময়িক। দু'জনেই প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা, সনাতনী জীবন-ধারার পঙ্গুতা, ও হৃদয়হীন

নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে সমভাবে ক্ষুব্ধ এবং তার বিরুদ্ধে দু'জনেই বিদ্রোহী। দু'জনেই প্রশ্ন তুলেছেন, এ নিষ্ঠুরতাই কি মানবতা, এ নির্মমতাই কি সনাতন রীতি-নীতি, এহেন হৃদয়হীনতাই কি সমাজের সার্থকরূপ। অভিযোগ করেছেন তাঁরা এর বিরুদ্ধে। সামন্ততান্ত্রিক জঞ্জালে আবদ্ধ, পঙ্গু জীবন ধারাকে পরিশোধিত করবার কথা উল্লেখ করেছেন বারবার। তবে তা' নিছক বিদ্রোহীর দৃষ্টিতেই। তাঁদের এ বিদ্রোহের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতা ও পরিমিতি প্রসূত সূক্ষ্মতা যুক্ত হয় নি। শরৎচন্দ্র ও নজরুল উভয়েরই হৃদয়টা প্রবল। হৃদয়ের আবেগটা মুখ্য, প্রধান নিপীড়িত নির্যাতিত জনসাধারণের জন্যে সমবেদনা জ্ঞান, তাদের সুখ-দুঃখে আকুলতা অনুভব করা। কিন্তু সমবেদনার এ উত্তপ্ত আবেগের সংগে যুক্ত হ'ল না বৈজ্ঞানিক জীবনাদর্শ। জনৈক সমালোচক বলেছিলেন, 'তা' হ'লে নজরুল হয়ত হ'তেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বেকার শ্রেষ্ঠ কবি।' কথাটা ঠিকই।

নজরুলের এ বিদ্রোহের স্বরূপ সম্বন্ধে যা' বল্‌লাম তা' সঠিকভাবে বোঝা যাবে তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতাটি আলোচনা করলেই। কারণ ওই 'বিদ্রোহী' কবিতাটিতেই নজরুলের খ্যাতি সর্বাধিক। আর ওতেই তাঁর বিদ্রোহী মনোভাবের স্বরূপ পূর্ণভাবে ধরা পড়েছে। কিন্তু ওই কবিতাটিতে তাঁর খ্যাতি সমধিক হ'লেও ও কবিতাটি যথেষ্ট সার্থক কি না, সে সম্পর্কে আলোচনা আবশ্যকীয়। জনৈক সমালোচক একবার বলেছিলেন, "মনে হয় যেন আবেগটা যথেষ্ট খাঁটি নয়, কিংবা কবিতাটির আবেগ যত বড়, ততটা গভীর নয়। 'বিদ্রোহী' কবিতার বহু ব্যবহৃত 'আমি' সমাজসম্মত 'আমি' নয়," কথাটা ভেবে দেখবার মত। এবং আমার মনে হয় কথাটার সত্যতা সম্পর্কেও প্রশ্ন তুল্‌বার অবকাশ নেই। 'বিদ্রোহী' কবিতাটিতে নজরুল যে বিদ্রোহের ঝংকার তুলেছেন, তুলেছেন যে বিদ্রোহের আওয়াজ তা' তৎকালীন বাঙালী জীবনের ও বাঙালী চেতনার যে ক্ষুব্ধতা, যে অসহনীয়তা ও অধৈর্য্য, অস্থিরতা তা'তে একেবারে ঠাসা। সাম্রাজ্যবাদীর শোষণে নিপীড়িত বাঙালীর বেদনা, ক্রোধ, এবং পুনঃ পুনঃ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ব্যর্থতায় বাঙালীর জীবনে যে দারুণ হতাশা, যে দারুণ বিক্ষোভ জেগে উঠেছিল, তাই ছিল নজরুলের সম-সাময়িক সমাজ-বেষ্টনী। এই ব্যর্থতার ফলে হ'ল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রসার একদিকে, আরেকদিকে হল গান্ধীজীর নেতৃত্বে চালিত আপোষপন্থী মনোভাবের প্রাধান্য। এ দু'-ই এর টানাপোড়েনে চলছিল তৎকালীন বাঙালী জীবন। যুদ্ধোত্তর অভাব, অনটন, দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা, এবং ধনতান্ত্রিক জগতের পচনশীলতা-জনিত বিকৃত মনোভাব ও বিশৃংখলা, সব কিছুই এর সঙ্গে একত্রিত ছিল। নজরুলের "বিদ্রোহী" কবিতার বিদ্রোহী 'আমি' এরই প্রতিমূর্তি, বাঙালীর এ সত্তার-ই প্রতিরূপ। কাজেই ক্ষোভের যন্ত্রণার সঙ্গে সহনশীলতার অভাব এবং অধৈর্য ও অপরিমিত, অসুস্থ চিন্তার প্রভাবও বেশ কিছুটা বর্তমান র'য়েছে। বিদ্রোহের স্বরূপটা সর্বত্র পরিমিত বিশুদ্ধ চিন্তা ধারার অনুশীলনে চলে নি। তাই কিছুটা আঁশ "অকারণ ও হাস্যকর মনে হয় না," একথাটাই ঠিক।

নজরুল 'সাম্যের' কবি বলেও খ্যাত। তৎকালীন যে জাতীয়তাবাদের দ্বারা বাঙালী চালিত হচ্ছিল, তার সঙ্গে নজরুলের জাতীয়তাবাদের কিছুটা পার্থক্য এক্ষেত্রে রয়েছে। নজরুল যে জাতীয়তাবাদকে অনুসরণ করেছিলেন, তার মধ্যে বাংলার অগণিত নির্বিত্ত জনতার বেদনা, অভাব ও দারিদ্র্যের প্রতি সমবেদনা জনিত ক্ষোভ এবং অভিযোগও ছিল। যদিও সে নির্বিত্ত জনতা তখনও মধ্যবিত্তের চেতনার লেজুরই ছিল; তবু শ্রেণী-চেতনার জাগরণ না হলেও তার মধ্যে কিছুটা অভিনবত্ব ছিল। নির্বিত্ত জনতার জন্যে দরদী চেতনার দ্বারা চালিত হয়েই নজরুল তৎকালীন কৃষক-মজুর পার্টির (১৯২৬) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; এবং তাঁরই সম্পাদনায় চল্‌ত ওই পার্টির মুখপত্র 'লাঙ্গল'। পরবর্তী সময়ে ওই পার্টির কয়েকজনের চেষ্টাতেই গঠিত হয় ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি। তার নেতা কমরেড মুজঃফর আহমেদ ছিলেন নজরুলের বিশিষ্ট বন্ধু। নজরুলের অনুসৃত এ সাম্যবাদী চেতনার পিছনে একদিকে যেমন কাজ করছিল কোরাণের সাম্যবাদী চেতনা, ইস্‌লামের সাম্যবাদ, তৎসঙ্গে কৃষক-মজুর পার্টির বন্ধুদের সাহচর্যও। কোরাণের সাম্যবাদ তাঁর চেতনার সাম্‌নে বিরাট নিদর্শন ও প্রেরণা। কিন্তু নজরুলের অন্যান্য সব কিছুর পিছনেও ছিল যে ত্রুটি, এখানেও তাই। তাঁর সাম্যবাদী-চেতনা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে নি। সেখানে তাঁর চালক রয়ে গেছে নিছক মানবতা এবং তার 'ইউটোপীয়ান' ভাবধারা। তিনি শুধু সাম্যবাদের কল্যাণময় রূপ, তার শ্রেষ্ঠত্ব, তার ঔদার্য্য, এ সবই দেখেছেন, এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন; কিন্তু পাঠক না হওয়ার জন্যে, সে দৃষ্টিকে পাকাপোক্ত করে নিতে পারেন নি। সেখানে প্রাণাবেগের উদ্বেলতার সঙ্গে আন্তর-গভীরতার সৃষ্টি কর্তে পারেন নি।

নজরুলের মধ্যে বিদ্রোহী প্রাণসত্তাটাই মুখ্য। মুখ্য তাঁর আবেগপ্রবণ হৃদয়টা; এবং তার সঙ্গে ইসলামের মানবতা বোধ। তিনি সহ্য কর্তে পারেন নি ভন্ডামিকে, পরধনলিপ্সাকে, আত্মঘাতী হিংসাকে তথা সাম্প্রদায়িক আত্মকলহকে। সর্বোপরি দেশের এ দুঃখদারিদ্র্য, অভাব-অনটন, আত্মকলহ ও সাম্প্রদায়িকতা সব কিছুর মূলেই যে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চক্রান্ত, তাদের শোষণের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র, তাদের পাষণ্ডতা ও নির্মমতা, এ চেতনা দ্বারা নজরুল সর্বত্রই চালিত হয়েছেন এবং আঘাত করেছেন এ সাম্রাজ্যবাদী প্রাচীরকে। এ আঘাত হান্‌তে হান্‌তে ক্লান্ত হয়ে পড়ে কখনো সিনিক্ ভাবের পরিচয় দেওয়াটা স্বাভাবিক। তবু তাঁর সুরে অসীম আশা, আত্মপ্রত্যয়ের সুমহান্ সুর। কবি তাই নতুন প্রাণের বার্তাবাহী ঈদের চাঁদ দেখ্‌তে দেখ্‌তে তন্ময় হয়েছেন—

"সিঁড়ি-ওয়ালাদের দুয়ারে এসেছে আজ
চাষা-মজুর ও বিড়িওয়ালা;
মোদের হিস্‌সা আদায় করিতে ঈদে
দিল যে হুকুম আল্লাতা'লা।
দ্বার খোলো সাততলা-বাড়ী-ওয়ালা, দেখ কারা দান চাহে,
মোদের প্রাপ্য নাহি দিলে যেতে নাহি দেবো ঈদ্‌গাহে
আনিয়াছে নব যুগের বারতা নতুন যুগের চাঁদ,
শুনেছি খোদার হুকুম, ভাঙিয়া গিয়াছে ভয়ের বাঁধ।
মৃত্যু মোদের ইমাম সারথি, নাই মরণের ভয়;
মৃত্যুর সাথে দোস্তি হয়েছে—অভিনব পরিচয়।
যে ইস্‌রাফিল প্রলয়-শিঙ্গা বাজাবেন কেয়ামতে—
তাঁরি ললাটের চাঁদ আসিয়াছে আলো দেখাইতে পথে।"

জীবনকে ঃ জিজ্ঞাসা

শ্রীদুর্গাদাস সরকার

হে জীবন, আমি দেখেছি তোমাকে রজনীগন্ধা বনে;
লক্ষ স্বপ্ন-বীজের বলাকা ছড়ানো তোমার মনে।
নীলচে আকাশ তলে
ভিজিয়ে হৃদয় কুয়াশায় মাখা জোছনার সাদা জলে
দেখেছি তোমাকে দেখতে হলুদ চাঁদ।
সেদিন তোমার উড়ু উড়ু মনে পৃথিবীর সংবাদঃ
হৃদয়-সেতারে বেজেছিল তারি সুর।
হে জীবন তুমি, ভেবেছি তোমাকে, এই পৃথিবীতে সুমধুর সুমধুর।
তোমাকে আবার দেখলাম আজ—হে জীবন তোমাকেই,
তবু একি দেখি জীবনের সাথে জীবনের মিল নেই।।

তোমাকে এখন চৌরঙ্গীর পিচঢালা ফুটপাতে
তোমাকেই ঠিক দেখলাম আজ কান্নায় কাৎরাতে।
তোমার দুচোখে জল,
গৃহহীন তুমি, নিরন্ন তুমি, তুমি নিঃসম্বল।
প্রখর রৌদ্রে নিভেছে মনের সাধ;—
পৃথিবী এখন সুন্দর নয়; চোখে লাগে বিস্বাদ।
হৃদয়ের ভাঙা সেতারে করুণ সুর!
হে জীবন, আমি দেখেছি তোমাকে, দেখলাম আজো। পৃথিবী কী নিষ্ঠুর!
এইখানে নিঃসহায় তোমার অসহ্য অবহেলা;
হে জীবন বলো, দেখলাম একি জীবনকে নিয়ে খেলা।।

তোমাকে একদা দেখেছি আমরা বিয়াল্লিশের ঝড়ে:
নৌবিদ্রোহে ডাক দিয়ে গেছ আমাদের ঘরে ঘরে;
তোমাকে দেখেছি মৃত্যুর মাঝখানে;
পৃথিবীতে ছিল বাঁচবার নেশা অমেয় তোমার প্রাণে।
হে জীবন বলো, রজনীগন্ধা বনে
একক তুমি কি কাটাবে রাত্রি চাঁদের অন্বেষণে?
জীবনের সাথে জীবনের যোগ থাকবে না? দুঃসহ।
হে জীবন তুমি আনতে পারো না পৃথিবীতে বিদ্রোহ?

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ব্রহ্মচারী

গী দ্য মোপাসাঁ ঃ অনুবাদ—মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

অ্যাবে মারিনার নাম 'দ্দে' রাখা খুব অন্যায় হয় নি। লম্বা, রোগাটে, ভীষণ অন্ধ-বিশ্বাসী। উদ্যমে কখনো ভাটা পড়ে না, বিবেকে কোন-রকম শৈথিল্য নেই। তিনি যা বিশ্বাস করেন তার কোন নড়চড় হয় না কোন দিন, অচল-অটল বিশ্বাস দীপশিখার মতই ঋজু। ঈশ্বরের সত্তা, ঈশ্বরের ইচ্ছা সবই তাঁর জানা, তাঁর সৃষ্টির ছকটি পর্যন্ত যেন অ্যাবের নখদর্পণে!

তাঁর সহকারীর বাগানে বেড়াতে বেড়াতে প্রায়ই ভাবেনঃ "এই সমস্ত কাজের পেছনে ভগবানের উদ্দেশ্য কী?" মনে মনে ভগবানকে কল্পনা করে, যুক্তি দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর উদ্দেশ্যটি বের করে ছাড়বেন এম্নি একখানা ভাব! মিনমিনে ভক্তদের মতো ভগবানের কাছে আত্মনিবেদন করে কোনদিনই তিনি বলেন নি, 'হে ভগবান অজ্ঞেয় তোমার রহস্য!' বরং তিনি মনে মনে বিশ্বাস করতেন যে, ভক্ত হিসেবে ভগবানের কাজের যুক্তিগুলো তাঁর জানবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে, সমস্তটা সঠিক জানতে না পারলেও অনুমান তো করতে পারবেন। প্রত্যেকটি প্রশ্নেরই জবাব মিলেছে এতো দিনঃ 'সকাল হয় কেন?' না, জাগবার জন্যে। ফসল ফলাবার, ফসল পাকাবার জন্যে। রাত্রি আসে নিদ্রার জন্যে আর অন্ধকারের দরকার পূর্ণ বিশ্রামের জন্যেই। কৃষিকাজের সুবিধের জন্যে যখন যে ঋতুটির দরকার ঠিক সেই ঋতুটিই আসে। তাঁর পুরুতের মনে এ সন্দেহ একবারও হয় না যে প্রকৃতির কাজে উদ্দেশ্য আরোপ করা যায় না আর বাঁচবার তাগিদেই মানুষ যুগ, জলবায়ু বা জিনিসের সংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে গোড়া থেকে।

মেয়েদের ওপর তাঁর প্রথম থেকেই রয়েছে একটা ঘৃণা আর অবজ্ঞাভাব। যিশুর কথার প্রতিধ্বনি করে তিনিও বলতেনঃ "নারী, তোমাকে আমার প্রয়োজন কী?" তা ছাড়াও মনে মনে বিশ্বাস করতেন ভগবান নিশ্চয়ই নারী সৃষ্টি করে নিজেও কোন আনন্দ পান নি। নারী তাঁর ধারণায়, শিশুর মতো হলেও শিশুর মতো সরল নয়, পুরুষকে লোভই দেখায় শুধু। প্রথম পুরুষ আদমকেও লোভ দেখিয়ে বিপথে টেনে এনেছিলো। আজো সেই একই কাজ করে চলেছে! কাজে বাধা দেয়, কিন্তু বোঝবার উপায় নেই। নারী দুর্বল কিন্তু কাছে গেলেই বিপদ অনিবার্য। তার ঘৃণ্য দেহের চেয়েও বেশী ঘৃণ্য হলো তার প্রেম করার তৃপ্তিহীন আকাঙ্ক্ষা। তাঁর কোন ভয় না থাকলেও নারীদের এইরকম ভালবাসার ক্ষিধে দেখে রাগই হতো। মনে হতো ভগবান এদের সৃষ্টি করেছেন কেবল মাত্র প্রলোভন দেখাতেই, পুরুষকে বাজিয়ে নেবার জন্যে। তাই নারীর কাছে যেতে গেলে তৈরী হয়েই যেতে হবে, প্রলোভনকে পাশ কাটিয়ে আত্মরক্ষা করেই বেরিয়ে আসতে হয়। সত্যিই, নারী ফাঁদই বটে! চুমু খেয়ে আদর করে ফাঁদে আটকায়! ব্রত-পুজো করে যে সব নারী চার্চে তাপসী হয়ে রয়েছে তাদেরই একটু সহ্য করতে পারতেন, তবুও ব্যবহারে রূঢ়তা থেকেই যেতো, কেননা তাঁর অজানা নেই যে, ওদের বিনীত-দাসী হৃদয়ের গোপন অন্ধকারেও দুর্মর ভালোবাসার বীজ গোপনে রয়েছেই, সুযোগ পেলেই খোলস ছাড়বে হঠাৎ! ভক্তি উপচে পড়া ওদের চোখে যে আলো ফুটে ওঠে কই তাপসদের চোখে তো কোনদিন ফোটে না সেরকমটি। যিশুর প্রতি প্রেমে যখন তারা বাহ্য-জ্ঞানশূন্য হয় তখন অ্যাবের রাগই হয় তাদের প্রেমের এই দেহ-সর্বস্বতা দেখে। তাদের নম্রতা-বিনয় তাদের নত-চোখ, তাদের চোখের জল—সব কিছুতেই অ্যাবে দেখতেন সেই প্রেমের ঘৃণ্য প্রকাশ। তাদের আশ্রম থেকে বেরিয়েই তিনি পোষাকটা ঝেড়েঝুড়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বাড়ীমুখো হতেন যেন কোন বিপদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই পালাচ্ছেন!

তাঁর এক ভাগ্নী ছিলো। সে থাকতো কাছেই একটা গ্রামে, বাড়ীতে তার মায়ের সংগে। অ্যাবে এঁচে রেখেছেন তাকে তাপসী করবেন। মেয়েটি দেখতে সুন্দর, তবে একটু বোকা বোকা। অ্যাবে বক্তৃতা আরম্ভ করলেই সে হাসতো আর অ্যাবে বিরক্ত হলে গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতো ছোট মেয়ের মতো। অভ্যেস মতো অ্যাবে তার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলেও মনটা তাঁর পিতৃস্নেহে উঠতো ভিজে। মাঠের পথে বেড়াতে বেড়াতে তাকে ভগবান সম্বন্ধে নানান কথা বলতেন, ভগবানকে উপলব্ধি করাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু মেয়েটি সেদিকে বড় একটা কান দিতো না। সে তাকিয়ে থাকতো আকাশের দিকে, ঘাসের দিকে, কিংবা ফুলেভর্তি গাছগুলোর দিকে। চোখে ভেসে উঠতো প্রাণমাতানো দীপ্তি, ছুটে যেতো রঙীন প্রজাপতি ধরতে। প্রজাপতি ধরে এনে আব্দারভরে বলতোঃ "দেখো, দেখো মামা, কী চমৎকার—চুমু খাই একে?"

এই পোকা-মাকড়গুলো কি লিলাক ফুলের কুঁড়ি যে চুমু খেতে ইচ্ছে করে? এই ইচ্ছের মধ্যে ব্রহ্মচারী ক্ষুব্ধ

বিরক্ত হয়ে দেখতেন মেয়েদের মনের সেই জীবন্ত কামনার ছবি।

একদিন তাঁর সহকারীর স্ত্রী, যে তাঁর গৃহস্থালির কাজকর্ম করে দিতো, চুপি চুপি জানিয়ে গেলো যে, তাঁর ভাগ্নী প্রেমে পড়েছে। অ্যাবে দাড়ি কামাচ্ছিলেন, বিস্ময়ের ধাক্কায় একমুখ সাবান নিয়েই খাড়া হয়ে হাঁপাতে লাগলেন। ভাববার, কথা বলার ক্ষমতা পর্যন্ত লোপ পেলো। একটু সুস্থ হয়ে শুধু বললেন: 'ভুল করেছো তুমি মেলানি।'

বুকে হাত রেখে শপথ করে স্ত্রীলোকটি বলে,—"ভুল আমি করিনি। আপনার বোন শুতে গেলেই ভাগ্নীটি আপনার রোজ রাত্রে নদীর ধারে গিয়ে হাজির হয়। রাত্রি দশটা থেকে বারোটার মধ্যে আপনি নিজে গিয়েই দেখবেন একদিন সত্যি মিথ্যেটা।"

দাড়ি কামানো ছেড়ে অস্থির হয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি আরম্ভ করলেন তিনি।

উত্তেজিত হলে এইরকমই করেন। অর্ধসমাপ্ত ক্ষৌরকার্য আবার আরম্ভ করে মনের ভুলে কয়েকটা জায়গা কেটে রক্তারক্তি করলেন। সারাদিন রইলেন গুম হয়ে। ধর্মযাজক হয়ে প্রেমের হাতে তিনি আজ পরাজিত, একটা এক ফোঁটা মেয়ে কিনা তাঁর মতো নিষ্ঠাবান অভিভাবককে নিয়ে মজা করলো, লোক হাসালো। তাঁর মত নেওয়া নেই, বলা নেই কওয়া নেই একেবারে প্রেমে পড়ে গেলো!

খাওয়া দাওয়া সেরে বই পড়বার চেষ্টা করলেন, একটা বর্ণও বোধগম্য হলো না—ঘণ্টায় ঘণ্টায় রাগ বাড়ছে। দশটা বাজতেই ওকের লাঠিটি নিয়ে, যেটি নিয়ে রোগী দেখতে যান, ক্রুর হেসে শক্ত হাতে চেপে ধরে সেটা বনবন করে ঘুরুতে আরম্ভ করলেন। তারপর দাঁতে দাঁত ঘষে একটা চেয়ারের ওপর এমন এক ঘা মারলেন যে চেয়ারের পিঠটাই খসে পড়ে গেলো মেঝেতে।

বাইরে যাবার জন্যে দরজা খুলতেই চমকে উঠলেন। জ্যোৎস্না বাঁধ ভেঙে উপচে পড়েছে পৃথিবীতে। এমন করে চাঁদ অল্পই হাসে। অ্যাবের কল্পনা ছিলো মধ্যযুগের ঋষি-কবিদের মতো উদার। এই শান্ত, সীমাহীন রাত্রির দীপ্তিস্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সমস্ত বাগানটা চাঁদের আলোয় ফটফট করছে। গাছগুলো ছায়া ফেলেছে পথে পথে। দেয়াল বেয়ে যে ফুলের লতাটি উঠেছে সেটিও যেন প্রাণ পেয়েছে আজ রাত্রে।

চলার বেগ শ্লথ হলো। বিস্ময়ে আনন্দে বিভোর হয়ে গেছেন অ্যাবে। ভাগ্নীর চিন্তা মুছে গেছে মন থেকে। বাড়ী ছেড়েই চোখে পড়লো খোলা মাঠ, শান্ত সমাহিত মোহময় রাত্রি যেন স্নেহের পরশ ঢেলে দিচ্ছে। একটানা ডেকে চলেছে একটা পাখী। পাখীর ডাকে চাঁদের আলোয় মিশে যে অপূর্ব্ব মাদকতার সৃষ্টি করেছে, তাতে যে কোন মানুষের মনই হয়ে ওঠে স্বপ্নাতুর।

আবার হাঁটতে আরম্ভ করতেই তাঁর কঠিন মনও দুর্বল হয়ে পড়লো। ইচ্ছে হলো সেইখানে বসে বসে ভগবানের বিস্ময়কর বিশ্বকে দেখতে আর তাঁকে নমস্কার করতে বার বার। দূরে নদীর ধারে ধারে চলে গেছে পপ্লার গাছের শ্রেণী। নদীর ওপরেও চাঁদের আলো পড়ে করছে ঝকমক। আবার থামলেন ব্রহ্মচারী। খুশির আবেগে মন গেছে ভরে। হঠাৎ মনে প্রশ্ন এলো: (যেমন তাঁর মনে আসে) "কেন এসবের সৃষ্টি? রাত্রি তো নিরবচ্ছিন্ন ঘুমুবার জন্যে—সব কিছু ভুলে যাবার জন্যে। তবে কেন ভগবান এইরকম রাত্রি সৃষ্টি করলেন? কেন রাত্রিকে ভগবান দিনের চেয়েও, সূর্য্যাস্তের চেয়েও সুন্দর করে গড়লেন? কেনই বা চাঁদ এতো মনোরম, সূর্য্যের চেয়েও স্বপ্নালু, যার কেবল দিনের আলোয় অপ্রকাশিত অতি সূক্ষ্ম জিনিসের ওপর কিরণপাত করার কথা, কেন সে সারা রাতের অন্ধকারকে মাতিয়ে তুললো? কেনই বা এতো রাত্রে পাখীগুলো জেগে জেগে এমন প্রাণ-মাতানো গান ধরেছে? এই স্বচ্ছ ঘোমটা নামিয়ে দেওয়া হলো কেন পৃথিবীর ওপর? সব মানুষ তো ঘুমিয়েছিলো, তবে কেন তাদের জন্যে এই সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি? কে দেখবে এই অপরূপ দৃশ্য? কেই বা উপভোগ করবে এই ছড়িয়ে দেওয়া কবিতার টুকরো?"

এই কেনর উত্তর মিললো না ব্রহ্মচারীর। হঠাৎ চোখে পড়লো মাঠের ধার দিয়ে হেঁটে আসছে ছায়ামূর্তি দুটি তরুণ-তরুণী। তাদের মাথার ওপর গাছের চাঁদোয়া। দুজনের মধ্যে ছেলেটি বেশি লম্বা, তার হাত ছিলো সংগিনীটির কাঁধ ঘিরে, মাঝে মাঝে নীচু হয়ে চুমু খাচ্ছে। এদের দুজনার মধ্যে যেন প্রকৃতি ভাষা পেলো, এদের নিয়ে তৈরী করলো স্বর্গীয় পটভূমিকা। দুজনে যেন মিশে গেছে একটি সত্তায়। তারা যতই এগিয়ে আসে ব্রহ্মচারীর ততই মনে হয় এদের জন্যেই তৈরী হয়েছে আজকের রাত্রি। এতক্ষণে পেলেন তাঁর প্রশ্নের জবাব, এই রাত্রির জীবন্ত অর্থ।

আবেগে ব্রহ্মচারীর হৃদপিণ্ড ধ্বক ধ্বক করে উঠলো। সমস্ত কিছুই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে তাঁর। যা দেখলেন নিশ্চয়ই তা পুরাণের কোন স্বর্গীয় দৃশ্য—নিশ্চয়ই আদম ইভের সৃষ্টি মহানাটকের ঈশ্বরের মহান ইচ্ছার পূর্ণতা।

'হয় তো' ব্রহ্মচারী ভাবলেন, 'মানুষের ভালোবাসার ওপর স্বর্গীয় আবরণ দেবার জন্যেই ভগবান এমন রাত তৈরী করেছেন সংসারে।' হাত ধরাধরি করে দুজনে যত এগিয়ে আসে ব্রহ্মচারী তত পিছিয়ে আসেন। ঐ তো তাঁর ভাগ্নী! কিন্তু একি বিপদ? তিনি কি ভগবানের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাবেন? এমন আলোয় যদি তিনি ঢেকে থাকেন মানুষের ভালোবাসা, সে কি ভালোবাসা বারণ করার জন্যে?

বিপর্যস্ত, যেন কোন দেবমন্দিরে অনধিকার প্রবেশ করেছেন এম্নি লজ্জিত হয়ে, ব্রহ্মচারী একরকম ছুটেই পালিয়ে গেলেন সেখান থেকে।

আইরিষ কবি এ. ই. ও গান্ধীজী

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নয়া-দুনিয়ার কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতায় একটা দামী কথা আছে। কথাটা হোলোঃ Produce great persons, the rest follows. সমস্যা হোলো সেরা সেরা মানুষ তৈরীর সমস্যা। কোন দেশের দিগন্তে যখন মহামানব এসে দেখা দেন তখন বুঝতে হবে তার নবজন্মের বিলম্ব নেই। মহম্মদ এলেন, আরবে এলো নূতন প্রাণের বন্যা। বঙ্কিমচন্দ্র এসে 'বন্দে মাতরম' শোনালেন: ভারতে জাতীয়তাবাদের গোড়াপত্তন হোলো। গান্ধীজী দুর্ব্বল জাতির হাতে সত্যাগ্রহের ব্রহ্মাস্ত্র দান করলেন। সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে আমরা পেলাম মুক্তি। দুর্ভাগা সেই দেশ যেখানে জন্মায় নি কোন মহামানব। গ্রীসকে অমর করে রেখেছে হোমার। আফ্রিকায় আজ পর্য্যন্ত জন্মালো না কোন সেক্সপীয়ার অথবা প্লেটো। তার তমসাচ্ছন্ন ইতিহাসে তাই আজও এলো না সভ্যতার নবারুণ জ্যোতি। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ—এঁরা যদি না জন্মাতেন ভারতবর্ষের ঘুম ভাঙতো না। মহাকবিদের কাব্যে তাই যুগে যুগে বিরাট বিরাট আদর্শের বন্দনা-গান। সত্যানুরাগের আদর্শ রামায়ণে পূজা পেয়েছে রামের চরিত্রে। মহাভারতের রচয়িতা যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন ইত্যাদি চরিত্র অঙ্কন করে গুণেরই সমাদর করেছেন। এই সব মহাকাব্যের স্রষ্টারা জনসাধারণের চিত্তে রচনা করতে চেয়েছিলেন আদর্শ—মহামানব বলতে কি বোঝায় তারই আদর্শ। কবিদের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী এই সব মহামানবের আদর্শ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের মনের উপরে প্রভাব বিস্তার ক'রে এসেছে। প্রাচীন সাহিত্যে স্রষ্টারা জানতেন, সেরা সেরা মানুষই হোলো দেশের পরম সম্পদ আর মানুষকে মহৎ হবার প্রেরণা দেবার জন্যই তাঁরা মহাকাব্যের পটভূমিতে আঁকলেন মহামানবদের ছবি। হুইট্‌ম্যান তাঁর Song of the Broad-Axe কবিতায় লিখেছেনঃ

A great city is that which has the greatest men and women,
If it be a few ragged huts it is still the greatest city in the whole world.

সেরা সহর বল্‌তে বোঝায় সেই সহর যেখানে আছে মহত্তম পুরুষ আর নারী,
হোক্‌না সেখানে কতকগুলি পর্ণকুটীর—তবুও বল্‌বো সারা পৃথিবীতে সেই সহরের তুলনা নেই।

সেরা সেরা মানুষ তৈরীর প্রয়োজন দেখিয়েই হুইট্‌ম্যান তাঁর বক্তব্য শেষ করেন নি। শ্রেষ্ঠ মানুষ তৈরীর রহস্যের দ্বারও তিনি উদ্ঘাটন করে গেছেন। তিনি লিখেছেনঃ

Now I see the secret of the making of the best persons,
It is to grow in the open air and to eat and sleep with the earth.

এতদিনে আমি জান্‌লাম কি ক'রে বরণীয় মানুষ তৈরী করা যায় তার রহস্য,
সে রহস্য হোলো মুক্ত বাতাসের মধ্যে বেড়ে ওঠা, মাটির অত্যন্ত কাছাকাছি বাস করা।

খাঁটি মানুষ তৈরীর সমস্যাই যে সমাজের এবং জাতির মূল সমস্যা—এই সত্যটী কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কাছেও ধরা দিয়েছিল। আর সেই জন্যই তিনি মেবার পতনের উপসংহারে লিখেছিলেন, "আবার তোরা মানুষ হ।' বিবেকানন্দেরও এই সুর। সমস্যা হোলো—খাঁটি মানুষ তৈরীর উপায় নিয়ে। এই উপায়ের কথা বলতে গিয়ে হুইট্‌ম্যান

যে-জোর দিয়েছেন মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে জীবনযাপনের উপরে—তার বিশেষত্ব আছে। বর্তমান যুগের আর এক-জন কবি এবং দার্শনিকও হুইট্‌ম্যানের প্রতিধ্বনি করে-ছেন। ইনি হচ্ছেন আয়ার্ল্যাণ্ডের মানুষ আর এঁর ছদ্ম-নাম A. E. এঁর The National Being পৃথিবীর এক-খানা নাম করা বই আর এই বইখানির মধ্যে তিনি খুব স্পষ্ট ভাষায় বলেছেনঃ The creation of a rural civilisation is the greatest need of our time. (আমাদের যুগের সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন হচ্ছে গ্রামীণ সভ্যতাকে তৈরী করা)। কেন? A.E. বলছেন,

"Is not the earth mother of us all? Are not our spirits clothed round with the substance of earth? Is it not from Nature we draw life? Do we not perish without sunlight and fresh air?"

মাটিই কি আমাদের সকলের মা নয়? মাটির সঙ্গে কি আমাদের আত্মা জড়িয়ে নেই? আমরা কি প্রাণরস সংগ্রহ করিনে প্রকৃতির বুক থেকে? রোদ্দুর এবং নির্ম্মল বাতাসের অভাবে আমরা কি জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলিনে?

কিন্তু গ্রামে তো বড়ো লাইব্রেরী নেই, কলেজ নেই, আকাশচুম্বী অট্টালিকা নেই? সেখানে ভালো ভালো দোকান, সিনেমা, বন্দর অথবা জনতার স্রোতই বা কোথায়? A.E. পুনরায় বলছেনঃ

"Is not the return of man to a natural life on the earth a great enough idea to inspire humanity? Is not the idea of a civilisation amid the green trees and fields under the smokeless sky alluring?"

"মানুষ আবার মাটিতে ফিরে গিয়ে প্রকৃতির বুকে তার জীবনের যাত্রা সুরু করেছে—মানবসমাজকে নূতন প্রেরণা দেবার পক্ষে এই আইডিয়া কি যথেষ্ট নয়? নীল-নির্ম্মল আকাশের নীচে সবুজ গাছপালার আর প্রান্তরের মধ্যে নূতনের মধ্যে নূতনতর সভ্যতা রচনার স্বপ্ন কি আমা-দের চিত্তকে আকর্ষণ করে না?"

আমরা স্বীকার করছি—মার্কিণ কবি হুইট্‌ম্যান এবং আইরিষ কবি A.E. মানবসমাজের কল্যাণের যে পথ নির্দ্দেশ করেছেন তা সত্য। স্বীকার করি যে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ উন্মেষের জন্য মুক্ত হাওয়ায় এবং মাটির কাছা-কাছি বাস করবার খুবই প্রয়োজন আছে। কিন্তু মহা-নগরীর তিমিঙ্গিলের উদরে একবার যে বাসা নিয়েছে সে তো গ্রামে সহজে ফিরে যেতে চায় না। সহর তার জীবনের কল্লোলধ্বনি শুনিয়ে গ্রামের লোকদের মনকে ক্রমাগত টান্‌ছে। গ্রামে যে থাকে সে তো গেঁয়ো। শিক্ষিত-সমাজে সে অপাংক্তেয়! বিংশ শতাব্দীতে গ্রাম কোন মূল্যই পাচ্ছে না। মূল্য পাচ্ছে নগরের জীবন। মানুষের মনকে আবার পল্লীমুখী করতে হ'লে দরকার সহরের আর গ্রামের মূল্যের মধ্যে যে তারতম্য রয়েছে তা পাল্‌টিয়ে দেবার। আর মূল্যের এই ওলট-পালট সাধন করা হচ্ছে কবিদের কাজ। মহাকালের বুকে তাঁরা আসেন নূতনতর আদর্শের জয়ধ্বজা উড়িয়ে, মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গিমায় তাঁরা ঘটিয়ে থাকেন আমূল পরিবর্তন, তার চিন্তার ধারাকে বইয়ে দেন নবতর পথে। তাঁরাই হলেন যথার্থ বিপ্লবী—কারণ এক হস্তে পুরাতনকে তাঁরা ভাঙেন এবং অপর হস্তে নূতনকে তাঁরা গড়েন। বর্তমান যুগে উপেক্ষিত পল্লীকে মর্য্যাদা দেবার আহ্বান আমরা শুনতে পেয়েছি হুইট্‌ম্যান, A.E. রবীন্দ্রনাথ এবং আরও কোন কোন কবির কণ্ঠে। মার্কিন মণীষী থোরো (Henry David Thoreau), ইংরেজ ঔপন্যাসিক হাড্‌সন্, রাসিয়ান লেখক টলস্টয়, ইংরেজ কবি এডওয়ার্ড কার্পেণ্টার—এঁদের রচনার মধ্যেও মুক্ত প্রকৃ-তির জয়গান। টলস্টয় তাঁর Cossacks উপন্যাসের নায়কের মুখ দিয়ে বলেছেন, Happiness is to be with Nature, to see her, to hold conversation with her. হাড্‌সন্ তাঁর Idle Days in Patagonia উপন্যাসের এক জায়গায় লিখেছেনঃ

The greenness of earth; forest and river and hill; the blue haze and distant horizon; shadows of clouds sweeping over the sun-flushed landscape—to see it all is like returning to a home, which is more truly our home than any habitation we know.

পৃথিবীর শ্যামলিমা; অরণ্য আর নদী আর পাহাড়; সুদূর দিগন্তের নীল কুহেলী; রৌদ্রালোকিত প্রান্তরের উপর দিয়ে ভেসে-যাওয়া মেঘের ছায়া—এসব দেখলে মনে হয় যেন ঘরের-ছেলে ঘরে ফিরে এসেছি। আর এই প্রকৃতির ঘর আমাদের যতখানি আপনার এমন আপনার বাসস্থান আমরা কোথায় পাবো?

তবুও আমরা বলবো, মানুষকে মাটির কোলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কবিরা, সাহিত্যিকেরা যা করেছেন তা' যথেষ্ট নয়। আরও প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন আছে গ্রামীণ

সভ্যতাকে গ'ড়ে তুলবার জন্য। এই শক্তি সরবরাহ করবার জন্য A.E. আহ্বান করেছেন রাষ্ট্রনেতাদের—

Is there any prophet, any statesman, any leader, who will—as Moses once led the Isrelites out of the Egyptian bondage—excite the human imagination and lead humanity back to Nature, to sun-light, starlight, earth-breath, sweet air, beauty, gaiety, and health?

কোথায় সেই রাষ্ট্রনেতা, সেই জননায়ক, সেই ঋষি যিনি মানবতাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন প্রকৃতির কোলে, সূর্য্যালোকে, তারার আলোয়, মাটির সৌরভে, মধুর বাতাসে, সৌন্দর্য্যে, আনন্দে, স্বাস্থ্যে যেমন ক'রে মুশা ইস্রাইলদের মুক্ত করেছিলেন মিশরীয়দের কবল থেকে?

একথা অবিসম্বাদিত সত্য যে আমাদের জাতি যদি স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য হারাতে না চায় তবে আমাদের দেশের মানুষগুলিকে বেশীর ভাগ সময় বাস করতে হবে সহরে নয়, গ্রামাঞ্চলে।

A.E. যখন মানুষকে প্রকৃতির মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ডাক দিয়েছিলেন রাষ্ট্রনেতাদের—তখনও গান্ধীজীর চিন্তাধারা এবং কর্ম্মধারা দেশে দেশে মানুষের মনকে এমন ক'রে নাড়া দিতে সুরু করে নি। কবির স্বপ্নকে রূপ দেবার জন্য প্রয়োজন ছিলো একজন অনন্যসাধারণ কর্ম্মবীরের। আয়ার্ল্যাণ্ডের কবি ও দার্শনিক যে রাষ্ট্রনেতার প্রতীক্ষায় ছিলেন গ্রামীণ সভ্যতার পুনরুদ্ধারের আশায় সেই রাষ্ট্রনেতাকে আমরা বিংশ শতাব্দীতে দেখতে পেলাম গান্ধীজীর মূর্ত্তিতে। গান্ধীজী সহরকে কোন মূল্যই দিলেন না। তিনি বল্লেন, সহরগুলি আছে গ্রামকে শোষণ ক'রে ফুলে উঠবার জন্য। তিনি আরও বল্লেন, আমার পরিকল্পিত স্বরাজে সহর থাকবে বটে—কিন্তু সহরগুলি থাকবে শুধু পল্লীর পরিচর্য্যা করবার জন্য। গান্ধীজী সেই বিপ্লবী যিনি আমাদের হাতে দিলেন সহর ও গ্রামের মূল্য নির্দ্ধারণের একটা নূতন কষ্টি পাথর। তিনি যেখানে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করেছেন সত্যাগ্রহের অস্ত্র দিয়ে সেখানে তিনি নিশ্চয়ই বিপ্লবী। কিন্তু যেখানে তিনি মানুষের সহরমুখী সভ্যতার ধারাকে উজান বইয়ে তাকে আনতে চেয়েছেন মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে যেখানে আকাশ নীল আর ঘাস সবুজ—সেখানে তিনি আরও বড় বিপ্লবী সন্দেহ নেই। এই শেষোক্ত গান্ধীজীকে এখনও আমরা প্রাণের মধ্যে বরণ ক'রে নিতে পারিনি। বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে গান্ধীজীই বোধ হয় এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি মানুষকে মহানগরীর পাষাণ-মরু থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন সূর্য্যালোকে আর তারার আলোয়, বনমর্ম্মরের আর পাখীর কাকলির মধ্যে।

কিন্তু মানুষ তো শুধু তারার আলো নিয়ে বাঁচতে পারে না। পাখীর কাকলি তার কানে মধু ঢাল্‌লেও মানুষের লজ্জা নিবারণে অক্ষম। ভাত কাপড়ের জন্য মানুষকে কাজ দিতে হবে। এই জন্যই গান্ধীজী গ্রাম্যশিল্পগুলিকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্য জীবনব্যাপী সাধনা ক'রে গেছেন। প্রকৃতির মধ্যে জীবন-যাপন যদি মানুষের কল্যাণের পক্ষে অপরিহার্য্য হয় তবে যাতে সে খেয়ে-প'রে সুখ-স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে তার ব্যবস্থা করা চাই। চরকার ও অন্যান্য গ্রাম্যশিল্পের উপরে গান্ধীজী এত যে জোর দিয়েছিলেন সে মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে মানুষের কল্যাণময় গ্রাম্য জীবনকে সম্ভব করবার জন্য। এই দিক থেকেই A.E. তাঁর The National Being-এর মধ্যে লিখেছেনঃ

I believe it would be an excellent thing for humanity if its civilisation could be based on rural industry mainly and not on urban industry.

মানুষের সভ্যতার ভিত্তি সহুরে শিল্প না হ'য়ে যদি প্রধানতঃ গ্রাম্যশিল্প হোতো—তবে তার দ্বারা মানবসমাজের কল্যাণ হোতো সন্দেহ নেই।

যাঁরা মনে করেন, গান্ধীজী আধুনিক জগতের একজন খাপছাড়া স্বপ্নবিলাসী মানুষ—তাঁদের দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করি অন্যান্য দেশের মণীষীদের চিন্তাধারার প্রতি। হুইট্‌ম্যান, এড্‌ওয়ার্ড কার্পেণ্টার, থোরো, টল্‌স্টয়, এ-ই, —এ'দের লেখার সঙ্গে গান্ধীজীর লেখা মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে তাঁর সগোত্র রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে না থাকলেও কবি, সাহিত্যিক আর দার্শনিকদের মধ্যে বিরল নয়।

একটি স্বার্থপরের কাহিনী

মিহির আচার্য্য

'জানালাটা খুলে দিবি?' হৃদয়নাথ বললে।

ঘরের ভেতর অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। চাপা চার দেয়ালের মধ্যে একটা বোবা গুমোট। অন্ধকারে বন্ধুর বিছানাটা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, বালিশের সংগে হারিয়ে-যাওয়া কপালের নীচে এক জোড়া জ্বলজ্বলে চোখ, ভোরের গ্যাসবাতির স্তিমিত আলোর তুলনা।

হৃদয়নাথ আবার বললে, 'পশ্চিমের জানালাটা একটি-বার খুলে দে না ভাই—'

উঠতে হল। জানালা খোলার সাথে সাথে সন্ধ্যার এক রাশ ভিজে হাওয়া ঘরের মধ্যে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। এক টুকরো আলোর রেশ নিয়ে এল গলির গ্যাসবাতির দাক্ষিণ্য।

এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে হৃদয়নাথের দেহ-কংকালের খশড়া। ধুঁকে ধুঁকে শেষ হয়ে যাওয়া, অর্থহীন অপচয়। জীবনে এত মৃত্যু কেন!

'কী ভাবছিস?' হৃদয়নাথ বিকৃত হাসির রেশ টেনে বলে উঠল।

'এ্যাঁ! না—কিছু নয়—'

'চিঠি পেয়ে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলি, না?'

অবাক হবারই কথা। কিন্তু, অবাকটা চিঠি পাওয়ার পর হয় নি, যতটা হয়েছে বন্ধুকে দেখে। অতীতের পলি-মাটির কবরে কত ঘটনা আর দুর্ঘটনা নিঃশেষে চাপা পড়ে গেছে, দিনের-পর-দিনের প্রাণধারণের প্রচণ্ডতায় বদলে গেছে আমূল জীবনটাই। ছ' বছর পর। হ্যাঁ, এক দীর্ঘ বিরতি।

কিন্তু কী প্রয়োজন ছিল আজ হঠাৎ এইভাবে আমাকে আহ্বান করবার। হৃদয়নাথ যেন আমার নিজের অস্থির জীবনেরই রূঢ় বিদ্রূপ। অন্তত, এইটুকু বিশ্বাসের স্বপ্ন নিয়েও তো কাটিয়ে দিতে পারা যেতঃ বন্ধুদের মধ্যে এক জনও তবু জীবনকে কায়দা করেছে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কেন তার এ স্বপ্ন ভেঙে দিলে হৃদয়নাথ?

'কী ভাবছিস অত? কথা বল্—কথা বল্—' হৃদয়-নাথ খানিক দম নিয়ে নিলে। 'কষ্ট হচ্ছে মরে যাব বলে? কিন্তু...মরে-যাওয়াটা আমার কাছে একটা ঘটনাই নয়। জীবনে বেঁচে থেকে এতবার মরতে হয়েছে, আজ আর মৃত্যুতে বিন্দুমাত্র ভয় নেই।' হৃদয়নাথ এবার চুপ করে থেকে কী স্মরণ করতে চেষ্টা করলে।

সমবগুলো কাটছে ঢিমে তেতালায়। ঘরে-বাইরে সমস্ত পরিবেশ জুড়ে' অদ্ভুত ঝিমুনি ভাব। আর শ্বাস-রোধকারী নিঃশব্দতা। ভয় হয়ঃ নিজের হৃদপিণ্ডটুকুও হয়ত হঠাৎ বিকল হয়ে থেমে পড়বে।

প্রেতের মতো বসে রয়েছি নিঃসাড়ে। এই নিঃশব্দতাকে আঘাত করবার সাধ্য আমার নেই।

মৌনতা ভেঙে হৃদয়নাথের গলার স্বর গভীরভাবে বেজে উঠলঃ 'কী আশ্চর্য্য! মনে পড়ে তোর সেসব দিনের কথা —কী নিবিড় বিশ্বাসে বলতুমঃ জীবনকে গভীরভাবে ভালোবাসলে জীবন কখনো প্রতারণা করে না!...অথচ—সে কথা আমি আজো বিশ্বাস করি। তবে জিগ্যেস করতে পারিস কেন আমি মরে যাচ্ছি। হ্যাঁ, এও এক হাস্যকর ব্যতিক্রম...' থামলে হৃদয়নাথ।

আমার মগজের মধ্যেও যেন একই চিন্তার টানাপোড়েন। জীবনের ওপর এত তীব্র বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও কেন মৃত্যুকে বরণ করে নিতে বাধ্য হল হৃদয়নাথ। কলেজ জীবন থেকে তো দেখেছি ওকে, আর অবাক হয়েছি। আমাদের চলার পথে যখন এত পদস্খলন, এত দ্বিধাদ্বন্দ্ব সেখানে কী নিবিড় জোরালো প্রত্যয়ে সে পা ফেলে আমাদের থেকে অনেক পথ এগিয়ে গিয়েছে। এত শীঘ্র নিঃস্ব হয়ে গেল সে, রিক্ত, মিথ্যা।

হৃদয়নাথ আবার বললে, 'হ্যাঁ। এও এক হাস্যকর ব্যতিক্রম। হয় তো ভুল। জীবন সম্বন্ধে ধারণাটাই আগাগোড়া বিকৃত, অস্পষ্ট।...যাকে ভেবেছিলুম জীবন, আসলে, আজ বুঝতে পারছি সেটা জীবন নয়, কোনো-রকমে টিঁকে-থাকা।' হঠাৎ অপ্রস্তুত কাশির দমকে হারিয়ে গেল তার কথাগুলো। যন্ত্রণায় মাথার মধ্যে ছিঁড়ে পড়-বার উপক্রম করলে। হাঁফাতে লাগলো। একটু থেমে বললে, 'একটু জল গড়িয়ে দিবি?'

উঠলাম। জল খেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে কাটাল সে। নিস্তব্ধতা।

আমি একটু নড়েচড়ে বসলাম। জানালা দিয়ে খানিকটা হাওয়া এসে কী আমার মাথার ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না।

হঠাৎ ঘন হয়ে এল হৃদয়নাথের গলার স্বরঃ 'এ হয় না বুঝলি? জীবনকে একটা মিথ্যা অঙ্কের ওপর বাজি রেখেছিলুম। আজ বুঝতে পারছি আসলে অঙ্কটাই মিথ্যা...'

এতোক্ষণ মনোযোগী শ্রোতা হিসেবে শ্নুনে যাচ্ছিলাম বন্ধ্বর কথা, এবার দমে গেলাম, সমস্ত মনটা কেমন বিশ্রী-ভাবে নাড়া খেয়ে উঠল। অনিবার্য ধারায় ব্বঝতে পারছিঃ কী বিশেষ র্পে নিবে ওর বক্তব্যগ্বলো। আবার এক নতুনত্বহীন বহ্বকথিত জের-টানা প্বরানো গল্পের অবতারণা।

হৃদয়নাথ আমাকে কী তার গল্প শোনাবার জন্যেই ডেকেছিল। কিন্তু ওকে বারণ করব কী করে!

হৃদয়নাথ ম্বখর হয়ে উঠলঃ 'তব্ব এইটেই বোধকরি আমাদের ট্রাডিশনের অহংকার। আমার পিতৃদেব মরেছেন এইভাবে। অথচ মজার ব্যাপার; ভদ্রলোক আম্বত্যু ধারণা করে গেলেন এইভাবে টি'কে-থাকাই ব্বঝি জীবনের সাধনা। বাবার ম্বত্যুর পর আকাশ-ভাঙা দারিদ্র্যের সংগে উত্তরাধিকারস্বত্রে অর্জন করল্বম তাঁর এই ট্রাডিশন। সেইদিন ব্বঝেছিল্বম এইভাবে বাঁচা যায় না। বাবার জীবনধারণের প্রণালীকে আমিই সব চেয়ে ঘ্বণা করতে শিখেছিল্বম। কিন্তু হল কী। ট্রাডিশনের গতান্বগতিক পথকে তো কাটাতে পারল্বম না। এটা একটা অন্ধ পশ্ববৃত্তি বোধহয়, কিম্বা হেরিডিটি. . একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছিঃ বাবার হয় তো শেষ পর্যন্ত আমাদের যোগ্যতার 'পরে তেমন বিশ্বাস ছিল না, তাই তাঁর অবর্তমানে যাতে আমরা কিছ্ব ভুল করে না বসি, তাই বাবা নিজের হাতে মরবার ছ' মাস আগে নিরীহ দাদাকে ধরে বিয়ে দিয়ে দিলেন...' কাশির দমকে কথা আটকে গেল হৃদয়নাথের।

রাত গড়িয়ে চলেছে।

গ্যাসবাতির তির্যক আলোর রেখাটা এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে আধখানা বিছানার ওপর হ্বমড়ি খেয়ে পড়েছে।

হৃদয়নাথের ঠোঁটের কিনারে এক ট্বকরো হাসির আভা। আস্তে আস্তে নিচু গলায় বলতে শ্বর্ব করলে, 'সংখ্যা গরিমায় আমাদের পরিবারটি মধ্যবিত্তের আদর্শস্থানীয়। সংসারে ছোট-বড় অনেকগ্বলি ম্বখ ছিল, ছিল না এতো-গ্বলি খাটবার হাত। সংসারে একমাত্র উপার্জনশীল দাদা। তার মাসিক বরাদ্দ আশি টাকা। কল্পনা করে নিতে পারিসঃ ওই প্বঁজির ওপর আমরা ভাইবোন বৌদি মা মিলে গোটা সাতেক প্রাণীর অবস্থা। দাদার প্রাণান্তক পরিশ্রমের চেহারাটা যেমন সাংঘাতিক তেমনি অর্থহীন। দাদাকে একদিন ডেকে বোঝাতে চাইঃ কী করছ তুমি? এই-ভাবে তোমাদের দ্বজনের জীবনকেও নষ্ট করতে বসেছ, বলল্বম বৌদিকে নিয়ে সরে পড়তে।

'দাদা হাসতে হাসতেই এক কথায় আমাকে স্তব্ধ করে দিলেঃ ছি, তোদের প্রতি আমার কর্তব্য নেই!

'অতএব কর্তব্য করতে গিয়ে দাদা আত্মহত্যা করলে...'

'এ্যাঁ!' আমি আতংকে চিৎকার করে উঠলাম।

হৃদয়নাথ তাড়াতাড়ি সংশোধন করে দিলেঃ 'না না, একেবারে মরে যায় নি। বিয়ের এক বছর ঘ্বরতে না ঘ্বরতে দাদা বিছানা নিলে। ডাক্তারি ভাষায়ঃ প্যারালিসিস। ভারতীয় আদর্শে এক সংগে মরতে পারাটাই প্বন্য কর্তব্য, কিন্তু একা বাঁচবার চেষ্টাটা নাকি স্বার্থপরতা. আত্ম-সর্বস্বতা...' কিছ্বক্ষণ চোখ ব্বঁজে জোরে-জোরে দম নিলে সে। তারপর বললে, 'এর পরের ঘটনাগ্বলো ভেবে নিতে তোর পক্ষে নিশ্চয়ই আর কষ্ট হবে না। সংসার কালা-পানিতে দাঁড়বিহীন, হালহীন ফ্বটো নৌকো ভাসল এবার আমার... .

'মফঃস্বল শহর ছেড়ে রাজধানীতে এল্বম চাকরির সন্ধানে। বড় করে যার আখ্যা দিয়েছিল্বমঃ জীবন সংগ্রাম। থাক মিথ্যে জীবন-সংগ্রামের বাসি রোমান্স আর তোকে শোনাব না...' হৃদয়নাথ চুপ করলে।

রাত বেড়ে চলেছে যথানিয়মে।

সারা ঘরখানা নিশ্চুপ, ম্বত্যুর মতো নিশ্চুপ।

হৃদয়নাথ এখানেই তার কাহিনীর ইতি টানসে কোনো ক্ষতি নেই। আমার নিজের জীবনের প্রাণপণ সংগ্রামের ছেঁড়া ছেঁড়া ঘটনাগ্বলো জোড়া করলেই ওর জীবনকে স্পর্শ করা যাবে।

এবার ওঠা উচিৎ। রাত হয়ে পড়েছে, ফিরতে হবে আস্তানায়। উশখ্বশ করতে লাগলাম আমি। 'এ কী উঠছিস নাকি!' বড় বড় বেমানান চোখ মেলে বলে উঠলো হৃদয়নাথ।

'হ্যাঁ—'

'আঃ বোস, বোস—এখনো যে আমার কোনো কথা বলাই হ'ল না। যে জন্যে ডেকেছিল্বম তোকে।'

বসতেই হল।

'হ্যাঁঃ যে কথা বলছিল্বম তোকে—' হৃদয়নাথ শ্বর্ব করলে আবারঃ 'মরতে আমার এতট্বকু আপত্তি নেই। তব্ব সত্যি বলছি ভাই, আমি মরতে পারছিনে, পারব না।'

স্তব্ধ হয়ে গেলাম বন্ধ্বর কথা শ্বনে। হৃদয়নাথ প্রকৃতিস্থের মতো কথা বলছে তো!

হঠাৎ অসহ্য যন্ত্রণায় বিকৃত আর্তনাদ করে উঠল সে, 'না না, আমি মরতে পারছিনে ভাই, মরবার উপায় নেই আমার...'

'চুপ করো, চুপ করো হৃদয়—' আমি এলোমেলোভাবে তাকে প্রবোধ দেবার ক্ষীণ চেষ্টা করি।

হাঁফাতে থাকে হৃদয়নাথ। সমস্ত শরীর কেঁপে যাচ্ছে তার। সাধ্য থাকলে এখুনি হয়ত তার জীবনকে বদলে ফেলতে পারত সে। কিন্তু হৃদয়নাথ বাঁচবে না, আজ কী কাল মারা যাবে। নিশ্চিত।

হৃদয়নাথ মিনতি-ভরা গলায় বললে, 'আমার একটি অনুরোধ তোকে রাখতে হবে, ভাই। অনুরোধ শুধু নয়, দাবি। বল্, রাখবি তো?'

'কী তোমার অনুরোধ?' আশংকায় কাঁটা হয়ে জবাব দিলাম।

'আমাকে তোর বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তুই তো জানিস আমাদের সংসারের অবস্থা। পংগু দাদা, নাবালক ভাই-বোন, মা বৌদি অতোগুলো লোক চেয়ে রয়েছে আমার মুখের দিকে। আমি চাকরি পাব, টাকা পাঠাব, জীবনের নিরাপত্তা। এতো শীঘ্র ওদের আশাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে লাভ নেই।...তোর কাছে আমি মিনতি জানাচ্ছি ভাই, আমার মৃত্যুর খবর যেন ওদের কানে গিয়ে না পোঁছয়...'

পাথরের মতো বসে রইলাম। অনেকক্ষণ। স্তম্ভিত, হতবাক।

অনেকক্ষণ পরে বললাম, 'এ অসম্ভব হৃদয়। এটা তোমার স্বার্থপরতা!'

'না না এ স্বার্থপরতার কথা নয় ভাই। আমার বেঁচে থাকা না-থাকাটা বড় প্রশ্ন নয়।...তারা চায় একটা আশা... যার ওপর ভর করে তারা বেঁচে থাকবে। জানিস তো আশা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না এক মুহূর্তও। আমার মৃত্যুর খবর তাদের জীবনের পৃষ্ঠা থেকে নিখোঁজ রাখলে কোনো ক্ষতি নেই। ওরা কোনো ক্ষতি করেনি, ওদের ব্যর্থ করে দিয়ে লাভ নেই...'

'কিন্তু কতোদিন?' আমি বললাম, 'ওরা জানতে পারবে একদিন।'

'কতোদিন জানিনে। সে-বলার ভার তোদের।'

রাতের আকাশ কালো হয়ে উঠেছে। সে-আকাশে তারা নেই।

উদ্গত দীর্ঘনিশ্বাস চেপে ধরে হৃদয়নাথকে আশ্বাস দিলামঃ 'তোমার অনুরোধ আমি রাখব।'

বেরোবার মুখে হঠাৎ অদ্ভুত গলায় ডাকলে হৃদয়নাথ।

'শোন—আচ্ছা তোর সান্ত্বনার কথা মনে আছে?' ব্যর্থ-অভিনেতার মতো টেনে টেনে বলতে চেষ্টা করলে সেঃ 'হ্যাঁ আজই একখানা চিঠি পোঁচেছে তার কাছ থেকে। যশিডীতে ইস্কুল-টিচারী করছে। লিখেছেঃ আর অপেক্ষা করবার ধৈর্য নেই ওর, আর এইভাবে জীবনকে বাজে খরচ করতে চায় না সে। ঘর বাঁধবে। লিখেছেঃ প্রাথমিক ঘর-বাঁধবার সমস্ত প্রস্তুতি সে শেষ করেছে, কয়েক মাস কাটিয়ে দেবার মতো যথেষ্ট টাকা জমিয়েছে। আমায় নিমন্ত্রণ জানিয়েছে...আচ্ছা কী করি বল তো ওকে নিয়ে?' থেমে প্রশ্ন করে উঠল সে, 'বলতে পারিস্?'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম মুহ্যমানের মতো। অনেকক্ষণ। হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে বোবা হয়ে গেল সমস্ত অনুভূতি। তারপর দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল দেহের প্রতিটি রক্তকণা, ধক্ করে জ্বলে উঠল চোখের তারা, আর সেই মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করল সামনের ওই স্বার্থপর লোক-টির ওপর, ছিঁড়েখুঁড়ে শেষ করে দিতে ইচ্ছে করল।

কিন্তু কিছুই না-করে কাঁপতে কাঁপতে হিম-শীতল অনুভূতি নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে।

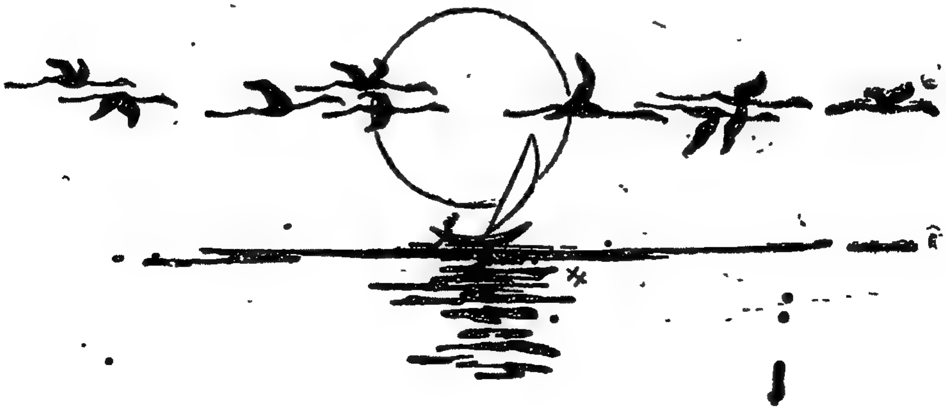

বলদের গাড়ী

গোপাল বটব্যাল

চলে ছই-ঢাকা বলদের গাড়ী, ঘোরে তার দুই চাকা
ধুলো মেখে মেখে গাঁর পথ দিয়ে—কত পথ আঁকাবাঁকা।
দুপাশে বেতস বাজায় ঘুঙুর,
টককুল গাছ, যজ্ঞিডুমুর
ভোরের শিশিরে শির্‌শির্‌ ক'রে নাড়ায় পাতার পাখা,
কোথাও পথেতে পড়িয়াছে নুয়ে বাঁশঝাড় আম শাখা॥

শিয়াল-কাঁটার ছোটো ছোটো তীর রোদে করে চিক্‌চিক্‌,
কাশবন কাঁপে, রুপালী ঝালর আলোকেতে ঝিক্‌মিক্‌।
ক্যাঁচ্‌কোঁচ্‌ চলে গাড়ী ছই-ঢাকা,
ধুলার সাগরে ঘোরে তার চাকা,
বলদে তাড়াতে চালক তাহার মুখে করে টিক্‌টিক্‌,
ফুলেল খোঁপায় গেরোমেয়ে ঘেঁটু শুনে হাসে
ফিক্‌ফিক্‌॥

ফণী মনসার কাঁটাদার ঝোপ কোথাও নাগিনী মত
পথের দু'পাশে ফণা তুলে থাকে,—যেন ফণী শত শত।
কোথাও বটের নামিয়াছে ঝুরি
আদ্যিকালের যেন বুড়ো-বুড়ি,
তলাতে তাহার পাড়ার ছেলেরা হইয়াছে জড়ো যত,
ঘুমভাঙা পাখী কিচ্‌মিচ্‌ করে, ঝগড়াতে অবিরত॥

বাম পাশে বাঁক—মোড় ঘুরে ফের দূরে পথ গেছে চলে,
নদীর বাঁধের পাশ দিয়ে দিয়ে তালতরু কোলে কোলে।
একসারি তাল যেন সৈনিক
বাঁধ পাহারায় থাকে দৈনিক,
কালো ছায়া ফেলে খড়মড়ে পাতা নীল নভে চেয়ে দোলে,
তাদের তলায় লজ্জাবতীরা ভীরু চোখ নাহি খোলে॥

দাগ কেটে কেটে গড়ায় দু'চাকা,—গড়িমসি সেই চাল,
দুইটি বলদ ঝিমিয়েই হাঁটে রেখে যেন তার তাল।
বন-তুলসীর ঝোপ হতে আসে
মিঠে চড়া বুনো গন্ধ বাতাসে,
পাল্‌তেমাদার লাল চেলী পরে লজ্জায় নাজেহাল।
জিওলের শাখে শালিকেরা নাচে, নাচে চড়ুয়ের পাল॥

হাটুরের দল বোঝা লয়ে হাঁটে—ওই পথে হাটে যায়,
বলদের গাড়ী পার হয়ে তারা ছুটে চলে পায়ে পায়।
কেহ ছুটে চলে লয়ে বাঁক ভারী,
কাহারো মাথায় তরি তরকারি,
যেতে যেতে কেহ খেলো হুঁকো ক'রে কড়া তামাকেরে
খায়।
কেহ জোরে হেঁটে, দূরে চ'লে গিয়ে, সাথী লাগি ফিরে
চায়॥

বাঁক পেরিয়েই তাল-পুকুরের পাড় ঘেঁসে চলে গাড়ী।
বউ-ঝিরা ঘাটে জল নিতে আসে—বহুদূরে কারো বাড়ী।
কোনো বধূ দেখে ঘোমটা তুলিয়া
ছই-ঢাকা গাড়ী চলিছে দুলিয়া.
লাজে জড়োসড়ো কোনো নববধূ লয়ে নিজ ভিজা শাড়ী,
কারো ভেজে শাড়ী কলসীর জলে চমকিতে তাড়াতাড়ি॥

হঠাৎ গাড়ীকে চালক থামায়,—ডানপাশ হতে বামে
রাখাল বালক গরুমোষ লয়ে রাস্তায় এসে থামে।
ওইখানে ওরা পথ হয় পার,
উপায় এখন নেইকো যাবার,
ধুলো উড়ে উড়ে আঁধার, যেন বা পথে কোনো মেঘ
নামে!
রাখালের দেহ এতো সকালেই ভিজে গেছে হায় ঘামে॥

আবার চলিল বলদের গাড়ী,—এবার মাঠের মাঝে;
দুইপাশে তার ধানভরা জমি, ঝম্‌ঝমি যেন বাজে!
ধুধু প্রান্তর ভরে গেছে ধানে,
সোনা সোনা সোনা—সোনা সবখানে,
ডগ্‌মগে শীষ তন্বীর মত ঢলে ঢলে পড়ে লাজে;
আলের ওপরে দাঁড়িয়ে কৃষাণ—চোখ তার ফেরে না যে॥

রোদ উঠে আসে—ঝলমলে রোদ পিছলিয়া পড়ে ধানে!
ফলভরে নত গাছগুলি যেন কথা কয় কানে কানে!
দুইপাশে ধান, মাঝে সরু পথ,
সেই পথে চলে নড়বড়ে রথ,
সবুজ শাড়ীর যেন রাঙা পাড় চলে গেছে মাঝখানে।
নীলাভ আকাশ উপুড় হইয়া পড়িয়াছে তার টানে।

চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্প নারায়ণ রায়

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বঙ্গজ কায়স্থগণ বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জেলা বাখরগঞ্জের অন্তঃপাতী চন্দ্রদ্বীপে এক সমাজ স্থাপন করেন। তৎকালে বাখরগঞ্জ জেলার সেলিমাবাদ পরগণা ভিন্ন আর সকল পরগণা চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইত এবং তখন তাহার "বাকলা চন্দ্রদ্বীপ" এই নাম ছিল। আনুমানিক ১৫৭৪ খৃঃ অঃ মুসলমানগণ জেলা বাখরগঞ্জ অধিকার করে।

বাখরগঞ্জের কোন ইউরোপীয় প্রধান রাজকর্ম্মচারী ঢাকার সিভিলসার্জ্জন ডাক্তার জেমস্ ওয়াইজ সাহেবকে চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবাদের কথা লিখিয়াছিলেনঃ

"বিক্রমপুর পরগণায় চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি "ভগবতী" মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। দৈবযোগে এমন ঘটিয়াছিল, তিনি যে কন্যাকে বিবাহ করেন, তাঁহারও নাম ভগবতী। তিনি প্রথমতঃ তাহা জানিতে পারেন নাই। পরে যখন তাহা জানিলেন, তখন চমকিত ও শঙ্কিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, —কি, আমি কি ইষ্ট-দেবতার ব্যপদেশে পত্নীর নাম জপ করিয়া থাকি? লোকে কি আমাকে পত্নী-উপাসক বলিবে? অথবা আমি কেমন করিয়াই বা সেই স্ত্রীকে পত্নী বলি, যে আমার ইষ্টদেবতার নাম ধারণ করে? এইরূপ চিন্তা হেতু তিনি স্থির করিলেন, বরং প্রাণত্যাগ করিব, তথাপি এ দুষ্কর্ম্ম আর করিব না। এইরূপ নির্ব্বেদ পরতন্ত্র হইয়া তিনি নৌকারোহণপূর্ব্বক সমুদ্র-যাত্রা করেন। তৎকালে বিক্রমপুরের দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদ্র প্রসারিত ছিল। দিগন্তবিস্তারিত সমুদ্রে কাহারো সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই; চন্দ্রশেখর একাকী একদিন একরাত্র নৌকা বাহিয়া চলিলেন। পরের দিন প্রত্যুষে তিনি হঠাৎ দেখিলেন, এক ক্ষুদ্রতর নৌকাতে এক ধীবর কন্যা স্বয়ং ক্ষেপণী সঞ্চালন পূর্ব্বক সমুদ্র বক্ষে বিচরণ করিতেছে। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেমন করিয়া কি সাহসে একাকিনী এই অকূল সমুদ্র মধ্যে আগমন করিলে?" কন্যা উত্তর করিল, "আমি আমার ব্যবসায় বশে সমুদ্রোপরি সঞ্চরণ করি, আমার ইহাতে ভয় নাই। কিন্তু আপনি ব্রাহ্মণ ও ভূম্যধিকারী হইয়া কিরূপে এখানে আগমন করিলেন?"

চন্দ্রশেখর তাহাকে অন্তরের ক্লেশের বিবরণ বলিলেন। তৎশ্রবণে কন্যা হাস্যপূর্ব্বক ভর্ৎসনা বাক্যে কহিল, "ব্রাহ্মণ! তুমি কি নির্ব্বোধ ও মূর্খ! তুমি কি জান না যে, শক্তিরূপিনী কালী সকল স্ত্রীর মধ্যে বিরাজ করেন? তবে তোমার স্ত্রীর নামের সহিত কালীর নামের সমতা দেখিয়া এত ভীত হও কেন?" চন্দ্রশেখর সামান্য ধীবরকন্যার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত ও উদ্ভ্রান্ত হইলেন এবং সেই কন্যাকে মায়ারূপিনী ভগবতী জ্ঞান করিয়া স্বীয় যান হইতে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার তরণীতে উঠিলেন। তিনি একেবারে তাঁহার পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কন্যা কিছুক্ষণ আপনাকে ধীবরকন্যা বলিয়াই পরিচয় দিতে লাগিলেন; কিন্তু চন্দ্রশেখর কোন মতে ভুলিলেন না। পরে তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে কন্যা বরদা হইয়া পরিচয় দিলেন, "আমি তোমার ইষ্টদেবতা ভগবতী।" অনন্তর তিনি তাঁহাকে এই বর প্রদান করিলেন যে, এই স্থান শুষ্ক হইয়া দ্বীপ হইবে, তিনি সেই স্থান অধিকার করিবেন এবং তাঁহার নামে সেই দ্বীপের নামকরণ হইবে। এই বর দিয়া ভগবতী অন্তর্হিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থান চররূপে পরিণত হইল।"

আর এক প্রবাদ এই—

চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নামে এক সন্ন্যাসী ছিলেন। দনুজমর্দ্দন দে নামক তাঁহার এক শিষ্য ছিল। তাহার সমভিব্যাহারে তিনি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। এক দিবস রাত্রিতে তিনি নৌকায় নিদ্রিত আছেন, এমন সময় স্বপ্নযোগে কালী দেবী আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, এই জলতলে কতকগুলি দেবমূর্ত্তি নিহিত আছে, তুমি তৎ সমুদয় উদ্ধার কর। তদনুসারে পরদিন তিনি তাঁহার শিষ্যকে তিনবার ডুব দিতে বলিলেন; প্রতিডুবে তিনি এক একটি দেবমূর্ত্তি উত্তোলন করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি চতুর্থবার ডুবিলেন না, তাহা হইলে তিনি লক্ষ্মীর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। লক্ষ্মীর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলে তাঁহার রাজ্যে লক্ষ্মী চিরস্থায়ী হইত। (মাধবপাশার রাজবাড়ীতে ঐ সকল দেবমূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি মূর্ত্তির নাম মদনগোপাল।) চন্দ্রশেখর তাঁহার শিষ্যের নিকট এই ভবিষ্যদ্বাণী বলিলেন যে, ঐ

স্থান শুষ্ক হইয়া চর হইবে এবং তিনি (ঐ শিষ্য) তাহার রাজা হইবেন। তিনি শিষ্যকে ইহাও আদেশ করিলেন যে, ঐ স্থানের নাম তাঁহার (চন্দ্রশেখরের) নিজের নামানুসারে অবধারিত হইবে।*

কোন্ সময়ে এই চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থ সমাজ স্থাপিত হয় ও রাজা দনুজমর্দ্দন দে তাহার অধিপতি হয়েন, তাহা ঠিক জানা যায় না। বোধ হয়, রাজা বল্লালসেনের কিছু-কাল পরেই ইহা সংঘটিত হইয়া থাকিবে। কারণ, দেখা যায়, প্রথমাবধি এ পর্য্যন্ত ১৮ জন রাজা চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিয়াছেন এবং কায়স্থদিগেরও ২২।২৩।২৪ পর্য্যন্ত পর্য্যায় অর্থাৎ বংশ সাধারণতঃ পাওয়া যায়।

বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস মধ্যে চন্দ্রদ্বীপের পদ বা স্থান কিরূপ আছে তাহা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যৎকালে মুসলমানগণ বঙ্গদেশের পূর্ব্বাংশ অধিকার করেন, তৎকালে এদেশে কতকগুলি স্বাধীন রাজা ছিলেন। মোগলকুলরত্ন আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে কয়েক জন রাজ ভূঞা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। গঙ্গা ও ভাগীরথীর পূর্ব্বে ও উত্তর দিকস্থ সমুদায় স্থান সেই ১২ ভূঞার রাজ্য ছিল। এই ১২ জন ভূঞার মধ্যে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি এক ভূঞা ছিলেন। বারভূঞার পরিচয় এই (১) চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়, (২) যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য, (৩) ভুলুয়ার রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য, (৪) বিক্রমপুরের চাঁদরায়, কেদার রায়, (৫) পঃ চাঁদপ্রতাপের চাঁদ গাজি, (৬) ভূষণার মুকুন্দরায়, (৭) খিসরপুরে (খিজিরপুরে) ইসা খাঁ (ইছা খাঁ) মসনদ্ আলি,† (ইছা খাঁর সন্তানগণ জঙ্গলবাড়ী ও হয়বৎনগরে বাস করেন)। (৮) পঃ ভাওয়ালের ফজলগাজি;* (৯) সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ;† (১০) রাজসাহী জেলার অন্তঃপাতী পুটিয়ার রাজা;‡ (১১) রাজসাহী জেলার অন্তঃপাতী তাহিরপুরের রাজা; (১২) দিনাজপুরের রাজা প্রভৃতি।

এ বারজনের সম্বন্ধে নানারূপে আখ্যান প্রচলিত আছে। ফজলগাজির নবম পূর্ব্বপুরুষের নাম পালওয়ান সাহা। ইনি দিল্লী হইতে আসিয়া ভাওয়ালের রাজা শিশুপালকে পরাজিত করিয়া তথাকার জমিদার হয়েন।

সাতৈল—এখন পাবনা জেলার চাটমহল ষ্টেশনের অধীন। নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের পূর্ব্বপুরুষ রাজা রঘুনন্দন উক্ত সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণের সমুদয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। তাহিরপুর রাজবংশের রাজা কংশনারায়ণ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের নিরাবিল পটির নিয়ম বন্ধন করেন। ঐ বংশের শেষ রাজার নাম রাজা শিবপ্রসাদ। দিনাজপুর রাজবংশের রাজা গণেশ রায় বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার অধস্তন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহারা উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন।

এই সকল ভূঞা অথবা রাজা মুসলমানদিগের রাজ্যারম্ভ কালে তাঁহাদের বশীভূত ও কখনও স্বাধীনতাকামী হইতেন। যখন বশীভূত হইতেন, তখন তাঁহারা নবাবকে কিঞ্চিৎ রাজস্ব মাত্র প্রদান করিতেন। কিন্তু রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় সমুদয় ক্ষমতাই তাঁহাদের কর্তৃত্বাধীনে থাকিত। তাঁহাদের সৈন্য, গড়, বিচারালয়াদি রাজত্বের সকল লক্ষণই ছিল। পরে যখন তাঁহারা মুসলমানদিগের একান্ত বশীভূত হইলেন, তখনও তাঁহারা নবাবের পক্ষ হইয়া সৈন্য, গজ, কামান, নৌকা প্রভৃতি দ্বারা নবাবের সহায়তা করিতেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ শাস্ত্র-বিধি অনুসারে বরাবর অভিষিক্ত হইয়া আসিতেছেন।

রাজা চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ব্রাহ্মণদিগকে "নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ" এই পাঠে এবং কুলীন কায়স্থদিগকে "শ্রী অমুক—সানুগ্রহয় পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে" এই পাঠে পত্র লিখিয়া থাকেন। উক্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ উক্ত রাজাকে পত্র লিখিবার সময় "আশীর্ব্বাদ শ্রী অমুক—নিবেদনঞ্চ বিশেষ" এই পাঠে পত্র লিখিয়া থাকেন। কায়স্থগণ রাজসমীপে উপস্থিত হইলে কুর্ণিশ অর্থাৎ ললাট দেশে হস্তস্পর্শ করিয়া রাজাকে অভিবাদন করেন। বহুকাল হইতে এই রীতি প্রচলিত আছে।

চন্দ্রদ্বীপে প্রথমতঃ দে বংশীয় নিম্নলিখিত পাঁচজন পরে পরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১। রাজা দনুজমর্দ্দন দে। ২। রাজা রমাবল্লভ রায়। ৩। রাজা কৃষ্ণবল্লভ রায়। ৪। রাজা হরিবল্লভ রায়। ৫। রাজা জয়দেব রায়।

ইহাদের মধ্যে রাজা দনুজমর্দ্দন দের বিষয়ে আর কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেবল্ম কচুয়াতে

---

* On the Bara Bhuyas of Eastern Bengal—By Dr. James Wise—Dhaka, 1874. See page 203, Kandarpa Narayana Rai of Chandradip. ব্রজসুন্দর বাবু বাখরগঞ্জের যে ইউরোপীয় প্রধান রাজকর্ম্মচারীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন তিনি হইতেছেন— Mr. H. Beveridge, C. S. ডক্টর ওয়াইজও তাঁহার প্রবন্ধের পাদটিকায় লিখিয়াছেন:— "I am indebted to Mr. H. Beveridge, C. S. for these legend regarding Chandradip." এই গল্প দুইটিই।

† ইহার বিষয় আকবর বাদশাহের সময়ে লিখিত "হয়রল মতগবীণ" নামক পারসী ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিখিত আছে।

‡ ইঁহারা সুতকৌশিক গোত্রীয় দে বংশীয় কায়স্থ ছিলেন।

তাঁহার রাজধানী ছিল, ইহাই প্রকাশ আছে। তাঁহার পুত্র রাজা রামবল্লভ রায় ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং বহু দূর রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি কায়স্থদিগকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করেন এবং তাহাদের বিবাহ ও কুল সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম অবধারণ করেন।

এই পাঁচজন যেমন চন্দ্রদ্বীপের রাজা তেমনি তত্রত্য কায়স্থদিগেরও সমাজপতি ছিলেন। রাজা জয়দেবের পুত্র-সন্তান ছিল না। তাহাতে তাঁহার দেহড়গাতি নিবাসী দৌহিত্র কুলীনশ্রেণীস্থ বসু বংশজ রাজা পরমানন্দ রায় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হয়েন। তদবধি উক্ত বংশীয় ৮ জন চন্দ্রদ্বীপের রাজা ও কায়স্থ সমাজপতি হইয়াছিলেন।

রাজা পরমানন্দ রায় তাঁহার আদিপুরুষ পুষাণ বসু হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদিগের নাম এই—১ পুষাণ বসু; ২। দিবাকর বসু; ৩। বাভাট বসু; ৪। তমারপহু বসু; ৫। অহরপতি বসু; ৬। পুরু বসু; ৭। ভাই বসু; ৮। থাক বসু; ৯। কন্দর্প বসু; ১০। মার্কণ্ড বসু; ১১। উষাপতি বসু; ১২। বলভদ্র বসু; —ইঁহার পুত্র ১৩। পরমানন্দ বসু অথবা রাজা পরমানন্দ রায়।

রাজা পরমানন্দ রায় হইতে বসু বংশীয় যে আট পুরুষ চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেন, তাঁহাদিগের নাম এই— ১। রাজা পরমানন্দ রায়। ২। রাজা জগদানন্দ রায়। ৩। রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়। ৪। রাজা রামচন্দ্র রায় (প্রতাপাদিত্যের কন্যা রক্তজাতা। ৫। রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ রায়। ৬। রাজা বাসুদেব নারায়ণ রায়। ৭। রাজা প্রতাপনারায়ণ রায়। ৮। রাজা প্রেমনারায়ণ রায়।

রাজা কন্দর্পনারায়ণ ছিলেন, বারভূঁইয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূঁইয়া। মোগলেরা যখন ইছাখাঁ মসনদ আলি, কেদার রায় প্রভৃতির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তখন কন্দর্পনারায়ণও মোগলের আক্রমণ হইতে রক্ষা পান নাই।

এক্ষণে যাহাকে নিজ বাখরগঞ্জ বলে, তাহার সন্নিকটে কচুয়া নামক যে স্থান আছে, সেই স্থানে রাজা কন্দর্পনারায়ণ পর্য্যন্ত চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ অবস্থিতি করিতেন। রাজা জগদানন্দ রায়ের কন্যা কমলা উক্ত কচুয়াতে এক প্রকাণ্ড পুষ্করিণী খনন করেন। কচুয়া বাউফল থানার অধীন। এখনও সেখানে ঐ পুষ্করিণী বর্তমান রহিয়াছে।

মগদিগের উপদ্রবে নিম্নবঙ্গ বিশেষতঃ ভাঁটি অঞ্চল যখন বিপর্য্যস্ত হইতেছিল, সে সময় রাজা কন্দর্পনারায়ণ ঐ স্থান পরিত্যাগ উচিত বিবেচনা করিয়া বরিশালের পূর্ব্বোত্তর কোণে বাসুরিকাটি গ্রামে এক রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় কিছুকাল বাস করেন। পরে তাহা ত্যাগ করিয়া ঐ জেলার মধ্যে পঞ্চকরণের নিকটবর্তী হোশনপুর গ্রামে এক রাজধানী প্রস্তুত করেন। তাহার পর ক্ষুদ্রকাটি নামক স্থানে এক রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় কিছুকাল অবস্থান করেন। তৎপর তথা হইতে মাধবপাশা নামক স্থানে উঠিয়া যান।

** এই স্থানের অধিপতি ছিলেন গাজী উপাধিধারী একজন মুসলমান, তাঁহার সহিত কন্দর্পনারায়ণের যুদ্ধ হয়, সে যুদ্ধে গাজী পরাজিত ও নিহত হন। * অতঃপর তিনি তথায় এক রাজধানী নির্ম্মাণ করেন, তাহাই এখন বর্তমান আছে। কচুয়াতে প্রাচীন মন্দির ও ভগ্ন ইষ্টকালয় প্রভৃতি পূর্ব্ব রাজধানীর চিহ্ন সকল দৃশ্যমান হয়। বাসুরিকাটিতেও মন্দির ও ইষ্টকালয় বিস্তর ছিল; নদীর ভাঙ্গনে তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হোশনপুরে ঐ রাজধানীর চিহ্ন—কেবল গড় মাত্র আছে। ক্ষুদ্রকাটিতে স্থানে স্থানে ইষ্টক প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তথায় এক প্রকাণ্ড দীঘি আছে। রাজার সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থগণও উক্ত রাজধানী চতুষ্টয়ের নিকটে ও দূরে বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন।

যশোরের প্রসিদ্ধ রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতা রাজা বিক্রমাদিত্য চন্দ্রদ্বীপ হইতে কতকগুলি কায়স্থকে লইয়া যশোরে এক পৃথক কায়স্থ সমাজ স্থাপন করেন।

পরে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা রামচন্দ্রের সহিত রাজা প্রতাপাদিত্যের কন্যার বিবাহ হয়।

কন্দর্পনারায়ণ যখন চন্দ্রদ্বীপের রাজা তখন ইংরাজ পর্য্যটক রাল্‌ফ্ ফিচ্ ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে চাটগাঁ হইতে বাঙ্গলায় আসেন। তিনি বাকলা চন্দ্রদ্বীপ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আমি চাটিগাঁ হইতে বাক্‌লা আসিলাম। বাক্‌লার রাজা হিন্দু। বেশ ভদ্র এবং সজ্জন। কুন্দুক ক্রীড়া তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। দেশটি সুজলা সুফলা এবং শস্যশ্যামলা। এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মে। কার্পাসের চাষ হয় এবং কার্পাস-সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্র, রেশমী

* ঘটক কারিকায় কন্দর্প রায় সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ লিখিত আছে :

"কন্দর্পো গম কন্দর্পো জগদানন্দকাত্মজঃ।
মহারাজনুধরো মানী মহাবথ মহাশূরে॥
অক্ষোহিনীপতির্বীরঃ সব্যসাচিসমোরণে।
যুদ্ধপ্রিয়ো মহাচক্রী যবনারির্মহাবলঃ॥
যবনাধিপতিং গাজিং রণে ব্যাপাদয়ৎকিল।
মহাবীর্য্যং তথা খর্ব্বমহবোৎসজ্ঞপোত্তমঃ॥
অতাড়য়ৎ যবনান্ স হোসেনাখ্য পুরাৎততঃ।
বলিনাঞ্চ রথী শূরঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।

কাপড়ের আমদানীও খুব বেশী। বাক্‌লাতেই এ সমুদয় প্রস্তুত হয়। এখানকার বাড়ী সব বেশ ভালভাবে তৈরী। পথ সুপ্রশস্ত। ইহারা কাপড় কোমরে জড়াইয়া পরে। মহিলারা গলায়, বাহুতে এবং পায়ে রূপার ও তাম্রনির্ম্মিত অলঙ্কার প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে এবং হস্তী-দন্ত দ্বারা নির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক অঙ্গুরীতে পরে।*

কন্দর্পনারায়ণ নিজে বীর পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পদাতিক, অশ্বারোহী, নৌবহর এবং তাঁহার যোগ্য রণদক্ষ সেনাপতি ছিল। কন্দর্পনারায়ণ তিনবার রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। (১) সন্দ্বীপের যুদ্ধ, (২) মাশুম খাঁ কাবুলির সহিত সংগ্রাম, (৩) মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ মুরাদের সহিত সংগ্রাম। এই তিন যুদ্ধেই তিনি বিশেষ বীর্যবত্তার এবং সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পাঠান, মোগল ও মগ এই প্রবল ত্রিশক্তির বিরুদ্ধে তাঁহার সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।

সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীর উভয়েই বারভূঁইয়াদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য যত্নপরায়ণ ছিলেন। ইছাখাঁ মসনদ আলি, কেদার রায় ও মুছাখাঁকে দমন করিবার জন্য যেমন মানসিংহ, মন্ডারায়, কিলমক্, মুরাদ, ইছলাম খাঁ প্রভৃতি মোগল সুবেদার ও সেনাপতিরা প্রেরিত হইয়াছিলেন, তেমনি কন্দর্পনারায়ণের বিরুদ্ধে মুরাদ খাঁ নামক বিখ্যাত সেনাপতি প্রেরিত হইয়াছিলেন। মুরাদ খাঁর সহিত যুদ্ধে কন্দর্পনারায়ণ অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে কন্দর্পনারায়ণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং ভবিষ্যতে আর কখনও মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধাচারণ করেন নাই।* এই রাজবংশের প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটি মাত্র পিতল নির্ম্মিত কামান বিদ্যমান। শ্রীপুর নিবাসী রূপিয়া খাঁ কর্তৃক ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার দৈর্ঘ্য ৭৮ ফিট, বেড় ২১ ফিট, মধ্যভাগের ব্যাস ১৯॥ ইঞ্চি, ঐ কামানের গায়ে বঙ্গাক্ষরে রাজা কন্দর্পনারায়ণের নাম ও '৩১৮' এইরূপ লিখিত আছে। রূপিয়া খাঁ সাং শ্রীপুর লেখা থাকায় তাহাকে বিক্রমপুর শ্রীপুরের অধিবাসী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। এই কামানটি একটি গৃহের ভিত্তি-স্থাপনকালে মৃত্তিকা খননে পাওয়া গিয়াছিল। এই অঙ্কটি বোধ হয় কামানের সংখ্যা হইবে। রাজা কন্দর্পনারায়ণ এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা যে বীর ও যোদ্ধা ছিলেন, এই কামান তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কন্দর্পনারায়ণের রাজত্বকালে ভূঁইয়াদের ভিতর আত্মকলহের ও পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ ও বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সুযোগে মগ ও ফিরিঙ্গীদের (পর্ত্তুগীজ) অত্যাচারে দেশ উৎসন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। তিনি বীরত্বের সহিত মগ ও ফিরিঙ্গীর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, ভূঁইয়াদের মধ্যে আত্মকলহ এ সময়ে প্রবল আকার ধারণ করে, কন্দর্পনারায়ণের খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য, কন্দর্পের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার বালক পুত্র রামচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইলেন।

পরবর্ত্তী প্রবন্ধে রাজা রামচন্দ্রের কথা বলিবার সময় তৎকালীন সমাজ ও শিক্ষার বিষয়ও আলোচনা করিব। এখানে একান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে. আমরা বহু খোঁজ করিয়াও পিতল নির্ম্মিত কামান এবং বিভিন্ন রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত দেবালয়, মন্দির, দাবল দুর্গ ও রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের কোনও আলোক চিত্র সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

* Hacklyyt's voyage vol. II. p. 257. Ralph Fitch.

* In 1574, Bakla or Chandradip was invaded by Murad Khan, one of the generals' of Akbar and annexed to the empire. (Ain-i-Akbori).

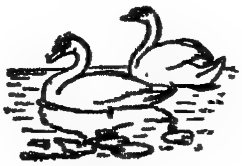

আহুতি

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

[৩]

গুড হোপ কোম্পানী দরাজ হাতে মিস্ নানাকে টাকা দিলেন—সেই টাকার জোরে ঘটা করে তাঁর পক্ষে যাতে মৃদুলা দেবীর ঠিকানা খুঁজে বার করা সম্ভব হয়। সত্যেন নিজেই মিটিংএ প্রস্তাব করে—এ-ব্যাপারে মিস্ নানাকে ব্ল্যাংক চেক্ সহী করে দিতেও তাঁদের আপত্তি নেই। ফলে, সম্ভাব্য স্থানগুলিতে নানাভাবেই নানা সন্ধান চালাতে লাগল। বঙ্গভারতী পত্রিকা আফিসের লোকজন এবং ছাপাখানার প্রিন্টার, জমাদার, কম্পোজিটার প্রভৃতির পিছনে সন্ধানী গোয়েন্দাদের আনাগোনা চলল। তারা লেখিকা মৃদুলা দেবীর সম্বন্ধে কত কি প্রশ্ন করে,—কোথায় থাকেন তিনি, আফিসে নিজে আসেন কিনা, কোথায় গেলে তাঁকে পাওয়া যাবে—এমনি অনেক কথাই। জিজ্ঞাসার সঙ্গে টাকার প্রসঙ্গও তোলে। আফিসের কর্মচারী ও প্রেসের শ্রমিকরা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে—শেষে আফিসের কর্তাকে সব কথা জানায়। সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদক মহাশয় এক নোটিস টাঙিয়ে দেন আফিসের দালানে; তাতে নির্দেশ থাকে—বাহিরের কেউ আফিসের কোন কর্মচারীর কাছে কোন লেখক লেখিকার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলে, তাকে যেন সরাসরি সম্পাদক মহাশয়ের সামনে হাজির করা হয়। ওদিকে মৃদুলা দেবীকেও খবর দেওয়া হয়—তাঁর ঠিকানা নেবার জন্যে হুড়াহুড়ি পড়ে গেছে, তিনিও যেন অবস্থা বুঝে সতর্ক থাকেন।

কিন্তু নানাভাবে চেষ্টা করে, এবং সেই সঙ্গে স্থানে অস্থানে টাকা ছড়িয়েও মিস্ নানা মৃদুলা দেবীর সম্বন্ধে কোন সংবাদই সংগ্রহ করতে পারল না। সে তখন আর এক চাল চেলে বসল; ছদ্ম নামে সন্দেহাতীত ঠিকানা থেকে মৃদুলা দেবীকে উদ্দেশ করে বঙ্গভারতী পত্রিকা আফিসে এই মর্মে এক পত্র লিখল যে,—উক্ত পত্রিকায় মৃদুলা দেবী যেভাবে কালোবাজার ও ভেজাল ওষুধের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছেন, সারা সহরে তাই নিয়ে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেছে। আর, এত বড় একটা অনাচারের কথা সমাজের এক চিন্তাশীলা মহিলার প্রচেষ্টায় প্রকাশ পাওয়ায় মহিলাদের মুখগুলিও গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মৃদুলা দেবী যে-সব কথা লিখেছেন, আরও কিছু নতুন তথ্য দিয়ে লেখিকা তাতে আলোক পাত করতে চান। মৃদুলা দেবীর সম্মতি ও আহ্বান পেলে তিনি তাঁর আলয়ে গিয়ে সাক্ষাতে আলোচনা করতে প্রস্তুত আছেন।

নানা ভেবেছিল, পত্রিকা আফিস থেকে তার পত্র নিশ্চয়ই মৃদুলা দেবীর ঠিকানায় পাঠান হবে; আর খুব সম্ভব, মৃদুলা দেবী নূতন তথ্য সংগ্রহের জন্য তাকে আহ্বান করবেন। কিন্তু তার পরিবর্তে বঙ্গভারতী আফিস থেকে সম্পাদক মহাশয়ের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র এলো লিখিত ঠিকানায়। ক্ষুদ্র পত্র। সম্পাদক খুব সংক্ষেপে লেখিকাকে জানিয়েছেনঃ

শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা মৃদুলা দেবী কাহারও সহিত বর্তমান বিষয়-সম্পর্কে আলোচনায় ইচ্ছুক নহেন। আপনার তথ্য সম্পাদকের নামে পাঠাইতে পারেন; প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইলে অবশ্যই প্রকাশিত হইবে। —বিনীত সম্পাদক।

ইতিমধ্যে বঙ্গভারতী পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত মৃদুলা দেবীর কঠোর প্রবন্ধগুলি অবলম্বন করে অন্যান্য পত্রিকায় আলোচনা আরম্ভ হওয়ায় সমাজের সকল স্তরেই রীতিমত আন্দোলন উপস্থিত হলো—সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ পার্কে কতিপয় জন-সভাও হয়ে গেল। ফলে, সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগেও চাঞ্চল্যের সূত্রপাত হলো। গুডহোপ কোম্পানীর কর্মকর্তারা ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।

কয়েক সপ্তাহ পরে গুডহোপ কোম্পানীর স্ট্রং রুমে পরিচালকদের আর এক গোপন বৈঠকে নানা ভগ্ন কণ্ঠে জানালঃ হোপলেস্; সব দিক দিয়েই আমি বেয়েচেয়ে দেখলাম, কিন্তু কিছুতেই মৃদুলা দেবীকে খুঁজে বার করতে পারলাম না। ইচ্ছা করলে আপনারা আর কারুর উপরে এ-ভার দিতে পাবেন।

মিঃ হক বললেনঃ তুমি যখন হোপলেস্ ব'লে হাল ছেড়ে দিলে, আমরা আর কার উপরে ভরসা করব বলো?

গুপ্ত সাহেব একটু গম্ভীর হয়ে সত্যেনের দিকে অপাঙ্গে চেয়ে বললেনঃ এখন সেন যদি মনে করে—এক দিনেই এই মৃদুলাকে আবিষ্কার করতে পারে।

পাইপটা মুখের একপাশে সজোরে চেপে ধরে বিকৃত স্বরে সত্যেন প্রশ্ন করলঃ এর মানে?

গুপ্ত উত্তর দিলেনঃ মানে হচ্ছে—মিসেস সেন সবই জানেন। নানাকে দিয়ে এত খরচপত্র আর খোঁজাখুঁজির কোন প্রয়োজন হ'ত না—যদি তাঁর কাছেই ধর্ণা দিয়ে পড়া যেত। আমি হলফ্ করে বলতে পারি—মিসেস সেনই একমাত্র মৃদুলা দেবীর খবর দিতে পারেন।

দৃঢ় স্বরে সত্যেন বললঃ মৃদুলার সম্বন্ধে তাঁর কথা

তো আমি প্রথম দিনের বৈঠকেই বলেছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করতে তিনি অকপটেই বলেছিলেন—মৃদুলা দেবীর সব লেখাই তিনি পড়েছেন।

মিঃ হক এই সময় জিজ্ঞাসা করলেনঃ কিন্তু মৃদুলা দেবীর সঙ্গে তাঁর জানাশোনা আছে কিনা—একথা কি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলে, সেন?

অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে সত্যেন উত্তর করলঃ না। তার প্রয়োজনও হয় নি, তার কারণ—মৃদুলার মন্তব্যগুলো তিনি বিশ্বাস করেন কিনা, একথা জিজ্ঞাসা করতে তিনি আমার মুখের উপরেই বলে ওঠেন—মৃদুলা দেবী যখন চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, তাঁকে অবিশ্বাস করবার তো কিছু নেই। তিনি কোনো প্রতিষ্ঠানের নামও করেন নি, যারা সত্যই অপরাধী, ঐ সব কাজ করছে—তিনি তাদের বিরুদ্ধেই লিখেছেন।... তা'হলেই বোঝ, মৃদুলার সম্বন্ধে আর কোন কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারা যায় কিনা—তিনি যখন তাঁর লেখাকে বরাবর সমর্থন করেই চলেছেন।

মিঃ গুপ্ত সত্যেনের কথাগুলি শুনে ঈষৎ অসহিষ্ণু-ভাবেই বলে উঠলেনঃ তুমিই তাহলে ভুল করেছিলে সেন; তাঁর ঐ সমর্থনকেই তখনই তোমার 'ডেন্‌জার সিগ্‌ন্যাল' বলে ধরে নেওয়া উচিত ছিল।

সত্যেন গম্ভীর মুখে বললঃ অর্থাৎ, তুমি বলতে চাইছ—মৃদুলা দেবীর ব্যাপারে আমার স্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ দেওয়াও আমার উচিত ছিল—তিনি তাঁকে সমর্থন করেছিলেন, এই ত্রুটির জন্যে?

গুপ্ত অসঙ্কোচেই এ কথার উত্তরে বললেনঃ আচ্ছা ধর, আমরা যদি জানতে পারি যে, আমাদের কনসার্ণের কোন অফিসার মৃদুলা দেবীর লেখাগুলোকে সমর্থন করে বেড়াচ্ছেন বা তাঁকে বাহোবা দিচ্ছেন, তাহলে আমরা কি করি?

মিঃ হক এ কথার উত্তরে তাড়াতাড়ি বললেনঃ নিশ্চয়ই আমরা আমাদের সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে তার মুখ বন্ধ করে ফেলি। কিন্তু তুমি এখানে ভুল করছ গুপ্ত, আমাদের কনসার্ণের কোন অফিসার, আর সেনের স্ত্রী একই পর্য্যায়ের লোক নয়। 'সিজারের স্ত্রী সর্বদাই সন্দেহের অতীত' একথা তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন?

গুপ্ত একটু কুণ্ঠিতভাবেই বললঃ হয় তো আমি একটু এক্সট্রিমেই গিয়েছিলাম, সেজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু সেনের সামনেই আমি জোর করে বলছি—মিসেস সেন নিশ্চয়ই মৃদুলা দেবীর খবর রাখেন। অবিশ্যি, এই নিয়ে আমি আত্মকলহ করতে চাইনে; কিন্তু আজ আমরা যে গণ্ডীর মধ্যে পড়েছি, তা থেকে সসম্মানে বেরিয়ে আসবার কোন পথই দেখতে পাচ্ছি না। এখন সেন মনে করলে, ব্যাপারটাকে সহজ করতে পারে।

সত্যেন কোন উত্তর করল না, মুখখানা ভার করে নীরবে নিবিষ্ট মনে পাইপ টানতে লাগল। এই সময় মিস্ নানা বললঃ তাহলে আপনি বলতে চান গুপ্ত সাহেব, মিসেস সেন ইচ্ছা করলেই আমাদের মুস্কিল আসান করতে পারেন আপনার এ ধারণা যদি সত্য হয়, আর আগে যদি এ কথার আভাস আমি পেতাম, তা' হলে এতদিন মৃদুলা দেবীর পিছনে বৃথা না ঘুরে আমরা অনায়াসেই মিসেস সেনের...

কিন্তু সত্যেনের সুদৃঢ় কণ্ঠস্বরে মিস নানার মুখের কথা এখানে বন্ধ হয়ে গেল। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে নানার মুখের দিকে চেয়ে সত্যেন তর্জ্জন করে বলে উঠলঃ ডোন্ট্ স্পীক লাইক দ্যাট নানা—স্টপ ইট প্লীজ! মৃদুলা দেবীর ব্যাপারে আমার স্ত্রীকে এভাবে কমবাইন্ড করা আমি খুবই আপত্তিকর মনে করি। আমার ঐ কনফেসান ছাড়া এ-ব্যাপারে কোন প্রমানই তোমরা এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করতে পার নি। এখন, কেসটা তাঁর ওপরে চাপিয়ে সস্তায় কিস্তিমাত করতে চাইছ!

এ কথার পর মিঃ গুপ্তই ব্যগ্রভাবে বলে উঠলেনঃ এর পর আর এ সম্পর্কে কোন কথাই তোলা ঠিক নয়—নানা, তুমি বরং আর এক বার চেষ্টা করে দেখ: আরো ভালো করে মৃদুলা দেবীর সন্ধান কর।

মুখখানা ম্লান করে নানা বললঃ এক্সকিউজ মী প্লীজ! আমি তো আজ প্রথমেই বলেছি—হোপলেস্! মৃদুলা দেবীকে আমি খুঁজে বার করতে পারি নি, আর পারব বলেও কোন আশা করি না।

সত্যেন বললঃ তাহলে আমি বলব, আমাদের আর এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়—এখানেই আমাদের ইমিটেটিং ম্যানুফেক্‌চারার্সগুলো সব বন্ধ করা হোক।

মিঃ হক বললেনঃ তুমি যে দেখছি চোরের ওপর রাগ করে ভুঁয়ে খানা খেতে চাইছ! মৃদুলা দেবী চান আমরা এ ব্যাপার বন্ধ করি!

গুপ্ত বললেনঃ কিন্তু সুধু এই ব্যাপারে আমরা কত টাকা ইনভেস্ট করেছি, সে তো জানো? এই ওয়ারের ব্যাপারে যে-কটা ওষুধ বেরিয়েছে, সত্যই মিরাকেলের মত কাজ দেয়। কিন্তু মেডিসিন-ওয়ালারা কত গুণ চড়া দরে ফাইল বেচছে সে তো জানো?...আর দেশের কটা গরীব বা মিডিল ক্লাসের লোক এ সব ওষুধ অত দরে কেনে বল তো! আমাদের ইমিটেসনের জন্যে ওষুধ-ওলারাই চেঁচাচ্ছে; মৃদুলা দেবীর লেখা বেরুবার পর ওরাই ওটাকে প্রচার করে

বেড়াচ্ছে। কিন্তু যতই করুক, আমরা যেভাবে কাজ করে চলেছি, কারুর সাধ্যই নেই যে, আমাদের এই ট্রিকস্ ধরে ফেলবে। এতদিন তো হুড় হুড় করে টাকাই ছেড়িছি, এখন সে টাকা সুদে আসলে একশো পার্সেণ্ট হোয়ে ফিরে আসছে। আর তুমি এখন বলছ—ও কাজ বন্ধ করে দাও! ক্ষ্যাপা ছাড়া এমন কথা কেউ বলে না।

মিঃ হক বললেনঃ বন্ধ করতে হলে আমাদের ক'জন-কেই সব ছেড়ে ছুড়ে ভেক নিতে হয়। যতগুলো ব্যাপারে আমরা জড়িয়ে পড়েছি, কোন্‌টা অনেষ্ট বলতে পার? স্ত্রীর মুখনাড়া সহ্য করতে না পেরে যখন তুমি ঢাকায় যাও, মিস নানা তোমাকে উপায় বাতলে দেয় টাকা পয়দা করবার, যার দরুণ আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে ওঠ একটা বছরেই—সে সব টাকা কি কালো-রাস্তা দিয়ে ঘরে তোল নি? হাজার হাজার চাষীকে পথে বসিয়ে, মাটির দরে তাদের গোলার পণ্য কিনে সোনার দরে বেচে টাকার আণ্ডিল হয়েছিল কারা? এই সহরের চারদিকে স্বনামে বেনামে হরেক রকমের আড়ৎ খুলে দোকান বসিয়ে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে বাণিজ্য করে চলেছি—এদের আষ্টেপৃষ্টে ডিজঅনেষ্টি জড়িয়ে নেই কি বলতে চাও? সুধু ভেজালের ব্যাপারটা নিয়ে মাথাগরম করে তো কোন লাভ নেই।

সত্যেন বললঃ আমরা কি করেছি, না করেছি—আমাদের কাছে অজ্ঞাত নেই। এর জন্যে হয় তো আমরা গোপনে মনে মনে অনুতাপ কোনদিন করি নি। কিন্তু সত্য কথা কথা বলতে কি, এই মৃদুলা দেবীর প্রকাশের পর থেকেই বোধহয় আমরা প্রথম মনের উপরে আঘাত পেয়েছি! পণ্যের ব্যাপারে আমরা অনেককে বঞ্চিত করে লাভবান হয়েছি সত্য, কিন্তু এখনকার এই ভেজালের ব্যাপারটা তার তুলনায় যেন অনেক বেশী মারাত্মক বলে মনে হচ্ছে। আর এটা মনে করিয়ে দিয়েছে—মৃদুলা দেবীর লেখা মন্তব্যগুলো। নতুবা, এই হাতেই তো আমি নিজে নামকরা ওষুধ, ফুড গুলোর নকল করেছি। তখন কিন্তু মনে হয় নি, এই নকল ওষুধ বা ফুড বিশ্বাস করে আসল জেনে যারা কিনে নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করছে, সেখানে কত বড় ক্ষতির সম্মুখীন তাদের হতে হয়েছে! সত্য বলছি, এখন এই দুশ্চিন্তা যেন আমার সাথী হয়ে উঠেছে। সেই জন্যে আমি ও প্রস্তাব করছি।

গুপ্ত বললেনঃ আসল কথা হচ্ছে, মৃদুলা দেবীর চেয়ে মিসেস সেনের যুক্তির প্রভাবটাই বেশী করে তোমার মনের ওপর পড়েছে। কিন্তু এর জন্যে তুমি যে এই চরম সংকটে একটা ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্ক কাটিয়ে সভয়ে দূরে সরে যাবে, সে হতে পারে না। আমরা তোমাকে এ অবস্থায় ছাড়তে পারি না; আর জেনো যে, এই ভেজালের ব্যাপারে তোমার দায়িত্বই সবার চেয়ে বেশী, তুমিই নিজের পরিকল্পনায় সস্তার ফরমুলা দিয়ে ঐ সব নকল ওষুধ ও ফুড তৈরী করেছ।

মিঃ হক বললেনঃ খ্যাপামী ছাড় সেন! ভাগ্যোদয়ের মুখে স্ত্রীর কথা গ্রাহ্য করনি বলেই আজ তুমি কোটিপতি হয়েছ। এখনো নিজের ওপর নির্ভর করে বিশ্বাস রেখে চলো। এই মৃদুলা দেবীই এখন ধূমকেতুর মত আমাদের ভাগ্যাকাশে উঠেছে; ওটাকে সরিয়ে ফেলা কঠিন হলেও দুঃসাধ্য নয়। পুলিসের লোকের চোখে ধুলো দিয়ে অতি বড় তুখড় ও বাহাদুর লোকেরা লুকিয়ে থাকতে পেরেছে কখনো বলতে পার? শেষ পর্যন্ত ধরা পড়তেই হয়েছে। তেমনি, আমরা সকলে মিলে যদি চেষ্টা করি, সাত দিনের মধ্যেই এই মৃদুলা দেবীকে খুঁজে বার করতে পারব নিশ্চয়ই। তুমি বরং এই দিকেই আর একবার ঝোঁক দাও।

মনে মনে কি ভেবে সত্যেন বললঃ সত্যই, আমার অবস্থা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই—স্বখাদ সলিলে ডুবে মরার মত! তখন ভবিষ্যতের দিকে না চেয়ে তোমাদের উৎসাহে যে কাণ্ড করে ফেলেছি, এখন দেখছি—এ থেকে আমার নিষ্কৃতি নেই। বেশ, একবার শেষ চেষ্টাই করা যাক।

এই সময় ম্লানমুখী নানার দিকে হঠাৎ সত্যেনের দৃষ্টি পড়ল। কিছু আগে নানাকে যে আঘাত দিয়েছিল সে, মনে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপের সঞ্চার হলো। এ অবস্থায় নানার দিকে চেয়ে স্নিগ্ধস্বরে সত্যেন বললঃ আমার কথায় রাগ কর না, নানা। মিসেস সেনের প্রসংগটা ওভাবে তোলায় আমি ঠিক হিসেব করে কথাগুলো বলতে পারি নি। যাই হোক, মৃদুলা দেবীর সন্ধানে যখন আমাকেও কোমর বাঁধতে হয়েছে, তুমিও তফাতে থাকলে চলবে না, আমাকে সাহায্য করতে হবে।

মৃদু হেসে নানা বললঃ সত্যই কি আমার সাহায্য তুমি চাও মিষ্টার সেন? বেশ, তাহলে কথা রইল—মৃদুলার ব্যাপারে আজ থেকে আমরা উভয়েই উভয়কে সাহায্য করব এবং কাজ উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত দুজনের কেউই কোন রকম সন্দেহ রাখব না।

সহাস্যে সত্যেন বললঃ বেশ, আমার তাতে কোন আপত্তিই নেই।

* * *

সুপ্রিয়ার আসার পর থেকে এ বাড়ির গৃহস্থালীর

ব্যাপারে শৃংখলা ও সপ্রতুলভাব প্রত্যেকের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। প্রাতরাশ থেকে মধ্যাহ্ন-ভোজন, বৈকালী জলখাবার, নৈশ-ভোজ এবং ছেলেপুলেদের খাওয়া-পরা—প্রত্যেকটি যেন কলের মতন একইভাবে চলেছে। ঠিক সময়ে সবই প্রস্তুত হয়ে ওঠে, কোন দিকে খুঁত হবার জো নেই, কোন রকম ত্রুটি কারুর চোখেই ধরা পড়ে না। অথচ, আহার্য্যের বিভিন্ন পদের নূতনত্বও সকলকে প্রচুর আনন্দ দেয়। সংসারে সচ্ছলতা থাকলেও এমনভাবে শৃংখলা ও বিচারবোধ সুলভ নয়। কিন্তু সুপ্রিয়ার ব্যবস্থায় এই সচ্ছল সংসারটি সব দিক দিয়েই সর্বাংগসুন্দর হয়ে উঠেছে।

সত্যেনকে ডেকে একদিন গৃহিনী প্রসন্ন মনে বললেনঃ বাবা, তোমার গুণে তোমার ওপর প্রসন্ন হয়ে মা-লক্ষ্মী মুখ তুলে চেয়েছেন মানি; কিন্তু তিনি তো দেখা দেন না, তাই সংসারে সুসার করতে তাঁরই সমস্ত গুণ দিয়ে ছোট বৌমাকে পাঠিয়েছেন। অসচ্ছলের দিনে মা'র আমার আক্কেল-বিবেচনা তো দেখিছি, আবার আজকের এই ভরা সংসারে একাই যেন একশো হয়ে বিরাজ করছেন! জানো বাবা, যে খরচ সংসারে হোত, উনি আসার পর সব হাতে নিয়ে মাসে পাঁচশো টাকা সুসার করেছেন। আমি তো দেখে অবাক! ঐ টাকার অর্দ্ধেক ছোট বৌমার আঁচোলে বেঁধে দিলুম; কিন্তু উনি তখনি হাসতে হাসতে আঁচল থেকে নোটগুলো খুলে আমার হাতে দিয়ে বললেন—আমি টাকা নিয়ে কি করব মা, আমার তো কোন অভাব নেই— আপনিই রেখে দিন মা! কিছুতেই বাছার যদি এতটুকু লোভ আছে! নিজের খাওয়া পরায়ও গ্রাহ্যি নেই! বামুন ঠাকুররা বলে—সবাইকে খাইয়ে তার পর নিজে খেতে বসবেন; তাও খাওয়ার যা ছিরি! চাড্ডি ভাত আর যা হয় একটু তরকারি: কারুর কথায় কান দেবেন না। বললে বলেন—এই আমার রাজ-ভোগ। ভাবি, নিজে গিয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়াব; তা পোড়া ঘুমের তরে হয়ে ওঠে না। তুমি বাবা বুঝিয়ে বলো তো, এমন করলে শরীর টেঁকবে কি করে?

সত্যেন নীরবেই মায়ের মুখে স্ত্রীর গুণকীর্তন শোনে, নীরবেই তার ঘরে চলে যায়। সুধু তার নাক দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। সেও তো দেখছে, স্বামীর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধেও সুপ্রিয়া কি ভাবে সতর্ক ও সচেতন! যেন পান থেকে চুণটুকুও খসতে দেবে না—এই তার সংকল্প।

সন্ধ্যার সময় সতোন প্রসাধনাদি সেরে তার ঘরে এসে বসলে সুপ্রিয়াও যেন কলের পুতুলটির মত নিত্য নিয়মিত ভাবে স্বামীর সামনে তার নির্দিষ্ট কেদারাখানির উপর বসে এবং যথাসম্ভব স্বামীর প্রশ্নের উত্তর দেয়।

সত্যেন সেদিন জিজ্ঞাসা করলঃ শুনছি খাওয়া সম্বন্ধে নাকি কোন লক্ষ্যই তোমার নেই! সবার ব্যবস্থা নিজে কর, অথচ নিজের দিকেই ফাঁক।

মৃদুস্বরে সুপ্রিয়া বললঃ এ খবর কার কাছে পেলে? তুমি কি বলতে চাও, না খেয়েই শরীরটাকে এভাবে টিকিয়ে রেখেছি?

সত্যেন জানালঃ মা-ই বলেছেন। সবার খাবার পর নাকি খেতে ব'স, তাও কোন রকমে দুটি মুখে দিয়েই উঠে পড়। একি ভালো কথা?

সুপ্রিয়া বললঃ মা তো নিজের চোখে দেখেন নি, পরের মুখে শুনেছেন। আমি আর যাই হই না কেন, এমন বোকা মেয়ে কখনই নই যে, না খেয়ে শরীরটাকে নষ্ট করব। তবে খাওয়ার ভাল মন্দ যদি বল, সে কথা আলাদা। নিত্য রাজ-ভোগ না হলে কেউ যদি বলে যে, মানুষের শরীর টিকে না, আমি কখনই সে কথায় সায় দেব না।

সত্যেন একথায় বুঝল, পরণের মত ভোজনের ব্যাপারেও সুপ্রিয়া বাহুল্যতা বর্জন করেছে এবং সাধারণ মেয়েদের মত সাধারণ ভাবেই আহার্য গ্রহণ করে থাকে। মুখখানা গম্ভীর করে সে নীরবে বসে রইল।

আর একদিন কথা প্রসঙ্গে সত্যেন সুপ্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করলঃ একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, ঠিক জবাব আমাকে দেবে?

সুপ্রিয়া সহজভাবেই বললঃ এ কথা কেন? যখনই আমাকে যে কথা তুমি জিজ্ঞাসা করেছ, আমিও তো তখনই জবাব দিয়েছি। তবে?

সত্যেন বুঝল, সুপ্রিয়া সত্যই বলেছে; যখনই তাকে যে প্রশ্ন করেছে সে, জবাব দিতে সে তো কুণ্ঠা করে নি। তবে তার উত্তর হয় তো সত্যেনের অন্তরস্পর্শ সব সময়ে করে নি। একটু থেমে সত্যেন সুধালঃ আচ্ছা, এখন এই যে আমাদের সংসারে পরিপূর্ণ সচ্ছলতা, প্রচুর অর্থাগম, বিপুল প্রতিষ্ঠা—এ সবের তুলনায় আগেকার সেই দুর্দিনের সংসারটিই কি তোমাকে বেশী আনন্দ দিত? বলবে তোমার মনের সত্যকার কথা?

ক্ষণকাল নীরব থেকে তার পর সুপ্রিয়া তেমনি মৃদুস্বরে বললঃ তোমার বোধ হয় মনে আছে, তোমার অনেক প্রশ্নের সমাধান করতে আমি এক একটি গল্প তোমাকে শুনিয়েছি। এ প্রশ্নের পরি, তেমনি একটি গল্প বলছি শোনঃ কুমারী জীবনে আমি বাবার কাছে নবদ্বীপের মহা পণ্ডিত রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের গল্প শুনেছিলাম। আর সকলে শিক্ষার পর রাজার সাহায্য নিয়ে চতুষ্পাঠী খুলে

অধ্যাপনা করতেন। পণ্ডিত রামনাথ রাজ-সাহায্য নেবার ভয়ে বনে গিয়ে টোল খুলে বসলেন; উদ্দেশ্য স্বচ্ছন্দ বন-জাত বস্তু আহরণ করে সংসার চালাবেন। কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শুনে ছাত্ররা সেই বনে গিয়েই তাঁর আশ্রয় নিতে কুণ্ঠিত হলো না। মহারাজ শিবচন্দ্র সে কথা শুনে স্বয়ং তাঁর চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আপনার অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি কিছু আছে কি?' রামনাথ বললেন—'আমি চারখানি চিন্তামণি শাস্ত্রে উপপত্তি করেছি, এখন আর তো কিছুই অনুপপত্তি দেখছি না!' মহারাজ সে কথা শুনে বিস্মিত হলেও রামনাথকে প্রচুর অর্থ দিতে চাইলেন, কিন্তু তিনি সহাস্যে সে অর্থ প্রত্যাখ্যান করলেন। এর পর রামনাথের পত্নীকে প্রণাম করবার ছলে মহারাজ সে অর্থ তাঁকে দেবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। পণ্ডিতজায়া প্রসন্নমনে মহারাজকে আশীর্বাদ করে বললেন—'মহারাজ, আমার স্বামীর পাণ্ডিত্যের তুলনায় আপনার রাজৈশ্বর্য আমি তুচ্ছ মনে করি। স্বামী আমার সমস্ত অভাব মোচন করে বিদ্যমান। অর্থের লোভ আমাকে দেখাবেন না।' এই গল্প শুনে সেই কুমারী জীবনে আমি মনে মনে কামনা করেছিলাম—আমিও যেন এইভাবে বিদ্বান স্বামীর পত্নী হয়ে পৃথিবীর অর্থকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারি!'

শেষের দিকে কথাগুলি বলতে বলতে সহসা বিপুল অশ্রুর আবর্তে সুপ্রিয়ার দুই চোখ ভরে গেল; অমনি ক্ষিপ্রহস্তে আঁচলখানি টেনে তার মধ্যে মুখখানা চেপে সে তাড়াতাড়ি উঠে গেল। সত্যেন স্তব্ধভাবে তার দিকে তাকিয়ে নীরবে বসে রইল।

* * *

সেন-ভিলার বৃহৎ দেউড়ীর ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজবার তালে তালে ঝংকার দিয়ে উঠল মেয়েলী গলায় গানের একটা কলি। বাহির-মহলের পরিচারকরা তখন দিবা-নিদ্রায় নিমগ্ন; দেউড়ীর বিহারী দারোয়ানও ঝিমাচ্ছিল, হঠাৎ পরিচিত গানের সুর কানে বাজতেই তন্দ্রা তার ছুটে গেল; চোখ মেলেই দেখল—সামনেই এক বোর্খাওয়ালী বিশুদ্ধ হিন্দীতে তুলসীদাসের রামলীলা গান ধরেছে। আশ্চর্য্য হয়ে দারোয়ান তাকে সুধালঃ 'মুসলমানী হয়ে তুমি রামায়ণের গান গাইছ যে? বোর্খাওয়ালী বিশুদ্ধ হিন্দীতে জবাব দিলঃ 'আমি মুসলমানী নই: সম্ভ্রান্ত হিন্দু ঘরের মেয়ে; কর্মফলে দেওয়ানা হয়েছি, আর—আব্রু বাঁচাবার জন্যে বোর্খা পরেছি।' দারোয়ান জিজ্ঞাসা করলঃ 'এ মোকামে কি মতলব করে এসেছ?' বোর্খাওয়ালী বললঃ 'এ-বাড়ির বহুরাণীর সঙ্গে মোলাকাত করতে এসেছি—খত আছে।' দারোয়ান জানালঃ 'বহুরাণীর খাস দাসী এই মাত্র তাঁর খত নিয়ে ডাকখানায় গেছে—সে ফিরে আসুক, তার সঙ্গে অন্দরে যাবে। আর, বহুরাণীর কাছে বাইরের কাউকে নিয়ে যাওয়ার এক্তিয়ার ঐ দাসীরই আছে।' বোরখাওয়ালী খুসি হয়ে বললঃ 'তাহলে আমি ততক্ষণ দেউড়ীতে বসে দারোয়ানজীকে একটা ভজন শোনাই।'

ভজনের মধ্যে সুপ্রিয়ার পরিচারিকা সুশীলা ডাকঘরে চিঠি ফেলে ফিরে এলো। দারোয়ানের মুখে বোর্খাওয়ালীর কাহিনী শুনে এবং তার কাছে ভাঁজ করা একখানা কাগজ দেখে সে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল ভিতর মহলে।

এই সময়টা সুপ্রিয়া ঘরের বাহিরে চওড়া দরদালানে বসে পড়াশোনার কাজ করে। সেদিনও নিবিষ্ট মনে বঙ্গ-ভারতীর একটা সংখ্যা পড়ছিল, এমন সময় সুশীলা বোর্খাওয়ালীকে নিয়ে সেখানে এসে বললঃ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—কি খত আছে বলছে।

বোর্খাওয়ালী নীরবে নমস্কার করে হাত বাড়িয়ে সেই ভাঁজকরা কাগজখানি সুপ্রিয়াকে দিল। ভাঁজ খুলে সুপ্রিয়া মনে মনে হাতে লিখা ছত্র কয়টি পড়তে লাগলঃ

পত্রবাহিকা সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা; নাম—যমুনা বাঈ। বর্তমানে বাস্তুহারা ও অনাথিনী; কিন্তু ভিখারিণী নহেন। ইনি হিন্দী ও উর্দু ভাষায় সুশিক্ষিতা। হিন্দী ও উর্দু শিক্ষা দিয়া তাহার বিনিময়ে পারিশ্রমিক চাহেন। সে সুযোগ ইঁহাকে দিলে বিশেষ সাহায্য করা হইবে।

এই বিজ্ঞপ্তির নিম্নে সহরের কতিপয় বিশিষ্ট নেতা নাম স্বাক্ষর করেছেন।

পড়ার পর কাগজখানি ফিরিয়ে দিয়ে সুপ্রিয়া বোর্খাওয়ালীকে অভ্যর্থনা করে বললঃ আপনি, বসুন। আমি শিখব আপনার কাছে।

নাকে সোনার একটা বড় বেসর, কানে মুক্তা বসানো বড় বড় মাকড়ি, কপালে কালো রঙের একটা টিপ! বোর্খাওয়ালী এতক্ষণে মুখের পরদা সরাল। দেখেই মনে হলো, মেঘের কালো পরদার ভিতর থেকে যেন পূর্ণিমার চাঁদ ফুটে বেরুল। যেমন রঙ, তেমনি মুখ, মেনি ভাসা ভাসা চোখ; আগাগোড়া তাতে সুর্মার অঞ্জন দেওয়া। বোর্খাওয়ালী সরল হিন্দীতে বললঃ একটা কথা কিন্তু বলে রাখি আপনাকে, বাঙলা ভাষা আমি একেবারেই জানি না, না পড়তে, না লিখতে, না বলতে।

সুপ্রিয়া এর উত্তরে সাধারণ হিন্দীতেই বললঃ তাতে আমাদের কাজ আটকাবে না। আমি মোটামুটি হিন্দী

বলতে ও পড়তে জানি। আপনার কাছে ভালো করে শিখব। আর আমি হিন্দীতে যে সব কথা বলব, তার ভুলগুলো আপনি সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবেন। তাহলে আমার শিক্ষা সহজ হবে।

বোর্খাওয়ালী সহাস্যে বলল: আপনি খুব চালাক মেয়ে দেখছি—খুব শীগ্‌গীরই আপনি এ ভাষা শিখে নেবেন। আপনি যে কথাগুলো বললেন, ঠিকই হয়েছে—কেবল শেষের কথাগুলোয় কিছু খুঁত আছে আমি শুধরে দিচ্ছি।

এর পর সুপ্রিয়ার কথাগুলির মধ্যে শেষের দিকে কোথায় কি ভুল হয়েছিল, সেগুলো সে সংশোধন করে বলে দিল। সুপ্রিয়া এই মেয়েটির ব্যবহারে খুবই খুশি হলো। এর পর পারিশ্রমিক সম্বন্ধে প্রস্তাব করল যে, দিন কতক কাজ চলুক তো, এর পর দক্ষিণা ঠিক করে দেবে। তবে, এখনি যদি আগাম কিছু চান যমুনা বাঈ, তিনি তাও দিতে প্রস্তুত আছেন।

কিন্তু যমুনা বাঈ ঘাড় নেড়ে বলল: আপনার ব্যবহারে আমি ভারি খুশি হয়েছি। এখনি আমার টাকার দরকার নেই; যদি তেমন বুঝি তো বলব।

সুপ্রিয়া সুশীলাকে বলল: তুমিও আমার সঙ্গে হিন্দী ভাষাটা শিখে নাও সুশীলাদি! চাকর বাকরদের কেউ হিন্দী বললে তো ভিমরী যাও; শিখে ফেল—কাজে লাগবে।

সুশীলা বলল: আমি শিখব শুনে শুনে বৌদি! বাঙলা অ আ লিখতেই বড় শিখেছি! মুখ ছিল, তাই তরে যাচ্ছি।

মুখে মুখেই সেদিন ঘণ্টা খানেক পড়া শোনা হলো। যাবার সময় যমুনা বলে গেল—কাল থেকে আরো একটু আগেই সে আসবে, আর হিন্দী পড়ার বই সে নিজেই আনবে।

সুপ্রিয়া তাকে বই-এর জন্য পাঁচটা টাকা দিতে গেল, কিন্তু যমুনা নিল না, বললে—বই তার বাসাতেই আছে।

* *

দিনমানের এই নিরিবিলি সময়টুকু এর পর হিন্দী শিক্ষাতেই সুপ্রিয়ার অতিবাহিত হয়—এ সময় অখণ্ড অবসর তার। অন্দর মহলে সকলেই সুপ্তিমগ্ন থাকায় এদিকে কেউই বড় একটা আসে না; নির্বিঘ্নেই শিক্ষার কাজ চলতে থাকে। যমুনা বাঈ যে গানেও পটিয়সী, সে খবরও সুশীলার কাছে পেয়েছে সুপ্রিয়া। শিক্ষার পর কোন কোন দিন যমুনার সিদ্ধ কণ্ঠ ছাপিয়ে গানের ঝঙ্কারও ওঠে।

সেদিন যমুনা একটা গজল গাইছে, সুপ্রিয়া ডাকঘরের পুরু একখানা খামের উপর ঠিকানা লিখছে। সুশীলা প্রতীক্ষা করছে চিঠিখানার জন্য, এখনি ডাকঘরে নিয়ে গিয়ে স্বহস্তে ডাকবাক্সে ফেলে আসতে হবে চিঠিখানা।

গান থামিয়ে হঠাৎ যমুনা আব্দারের সুরে বলল: বাঙলা আমাকে শেখাবেন বৌরাণী? ভারি আমার অস্বোয়াস্তি মনে হয়—এত বাঙলা কেতাব সব ছড়িয়ে রয়েছে এখানে, আমি কোন খানার নামটাও পড়তে পারি না। একি কম আফ্‌শোসের কথা?

সুপ্রিয়া লিখতে লিখতেই চোখ তুলে বলল: তুমি তো জানো, কোন ভাষা শিখতে হলে আগে তার অক্ষর চিনতে হয়। বেশ তো, বাঙলা যদি শিখতে চাও, আগে অক্ষর চেন। আমি আজই তোমার জন্যে একখানি বাঙলা ভাষার বর্ণ পরিচয় আনিয়ে রাখব।

হাতের খামখানা সুপ্রিয়া সামনেই টেবিলের উপরে রাখল। যমুনা আড়চোখে খামের উপরে লেখা শিরোনামাটির দিকে একবার তাকিয়েই খপ করে সেটা তুলে নিয়ে তার উপরে চোখ রেখে সুপ্রিয়াকে বলল: এই দেখুন না বৌরাণী, মন্তোর মতন কেমন লেখাগুলি আপনি সাজালেন, অথচ আমি কিছুই জানতে পারছি না সাপ না ব্যাঙ কি এতে আঁকা আছে!... কথার সঙ্গে সঙ্গেই চিঠিখানা যথাস্থানে রেখে দিল। কিন্তু সুপ্রিয়া যদি তার মনের ভিতরটা দেখবার দৃষ্টি পেত, তাহলে তখনি বুঝতে পারত—চিঠির ঠিকানাটি পড়েই বোর্খাওয়ালী এমন উত্তেজিত ও লুব্ধ হয়ে উঠেছে যে, তার মুখে-চোখেও তার আভা এসে পড়েছে।

বাঙলা ভাষায় একেবারে অজ্ঞ অথচ সরল হিন্দী ভাষণে অতি অভিজ্ঞ বোরখাধারিণী এই মেয়েটি ইতিমধ্যেই সুপ্রিয়ার এমন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে যে, তাকে সন্দেহ করবার কল্পনাও তার মনে ওঠেনি; সুতরাং এখানে এই সরলা মেয়েটির মুখের আসল ভঙ্গিটিও সুপ্রিয়ার কাছে অস্পষ্ট রয়ে গেল, এবং তারই কথার পিঠে সুপ্রিয়া সহাস্যে বলল: অজানা জিনিসের ব্যাপারে এমনিই হয়। আবার, জানাশোনা হয়ে গেলে তখন আর অদ্ভুত কিছু মনে হয় না। এই যে কাল তুমি উর্দু লিখে দেখাতেই আমিও এমনি চমকে উঠেছিলাম—সোজা উল্টোও ধরতে পারি নি!

এর পর চিঠিখানা তুলে নিয়ে সুশীলাকে সুপ্রিয়া বলল: এখানা ডাকে দিয়ে এসো সুশীলা দি—কলকাতার বাক্সে ফেলো; এ চিঠি কলকাতার।

যমুনাই সুপ্রিয়ার হাত থেকে খপ করে চিঠিখানা নিয়ে সুশীলার হাতে দিল। মৃদু হেসে সুপ্রিয়া বলল: এই দেখ, ক'দিনেই তুমিও আমাদের কথা বুঝতে শিখেছ!

অস্তরাগ ফোটো—বীরু ভট্টাচার্য্য

দিনান্ত ফোটো—বীরু ভট্টাচার্য্য

যমুনাও হাসি-মুখে হিন্দীতে বলল: বাঙলা কথা আমি বুঝতে পারি বোরাণী, তবে বাঙলা বলতে পারি না, আর হরফও চিনি না—এই যা আফশোষ!

সুপ্রিয়া বলল: এ আফশোষ তোমারও থাকবে না—এর পর বাঙলা বলতেও পারবে, পড়তেও বাধবে না।

'সে আপনার কৃপা' বলেই যমুনা উঠে দাঁড়াল এবং সুশীলাকে লক্ষ্য করে বলল: তোমার সঙ্গেই যাই চল সুশীলা বহিন। শিষ্টভাবে সুপ্রিয়াকে করযোড়ে নমস্কার করে যমুনা মস্ত মুখে পুনরায় জালিদার আবরণটি টেনে দিয়ে সুশীলার পিছনে পিছনে চলল।

* * *

সেন-ভিলা থেকে ডাকঘরের দূরত্ব খুব বেশী নয়—মিনিট সাতেকের পথ। যমুনার সংস্পর্শে সুশীলাও এখন ভাঙা ভাঙা হিন্দী বলতে শিখেছে। সুপ্রিয়া নির্দেশ দিয়েছে—যমুনার সঙ্গে কথাবার্তা সব হিন্দীতেই বলবে, ভুল হলে যমুনা সেটা বলে দেবে; এতে খুব শীগ্‌গীর ভাষাটা শিখতে পারা যাবে—বলতে আর বাধবে না। তাই হিন্দীতেই যমুনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলেছে সুশীলা। যমুনার মন কিন্তু চিঠিখানার দিকেই নিবদ্ধ রয়েছে। সুশীলা যখন চিঠি যমুনার হাত থেকে নেয়, তখনই সুপ্রিয়া ইসারা করে সেটা গায়ের জামার মধ্যে লুকিয়ে রাখতে জানিয়েছিল। সে ইঙ্গিত যমুনার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল সুশীলা তার ব্লাউজের মধ্যে চিঠিখানা তখনি লুকিয়ে ফেলে। তাই যমুনা সেই চিঠির দিকে তার মনটিকে নিক্ষেপ করে সুশীলার গায়ে গায়ে মিশেই পথ চলছিল। তার সারা মুখে তখন উত্তেজনা উদগ্র হয়ে উঠেছে—ব্লাউসের ভিতর থেকে ঐ চিঠি তাকে যেমন করেই হোক হস্তগত করতেই হবে। প্রয়োজন হলে আততায়িণীরূপে রাহাজানি করতেও সে কুণ্ঠিত হবে না!

কিন্তু তার আর প্রয়োজন হলো না, তারই মনের ঠাকুর পথের মাঝেই সুযোগ একটা ঘটিয়ে দিলেন। রাস্তার ধারে একটা মোড়ের মুখে চওড়া ফুটপাথটির প্রান্তভাগে ছোট একটি অটোমেটিক আখের কল বসিয়ে দুই ব্যক্তি রস আহরণের তদ্বির করছিল। একটু পরেই এই পথে লোক চলাচল আরম্ভ হবে, কাছেই ইস্কুল—ছেলের দল ছুটি পেয়ে বেরিয়ে আসবে; তখন আর চাহিদার অন্ত থাকবে না। তাই পূর্ব থেকেই এরা প্রচুর পরিমাণে রস সঞ্চয় করছিল পাশেই একখানা জীর্ণ চাটায়ের উপর এক রাশি মাটির ভাঁড়, একখানা ইটের উপর কয়েক টুকরা নেবু, একটা ভাঙা বাক্সের মধ্যে গুঁড়া মিশানো বরফ।

যমুনা বলল: এই গরমে সরবৎ ভারি তাকতের চীজ; তবিয়ৎ ঠাণ্ডা রাখে, ফায়দা ছাড়া লোকসান নেই। চল বহিন, পিয়ে লিই; খরচ কিন্তু আমার।... সুশীলা মৌখিক আপত্তি করতে গেল, কিন্তু যমুনা তা গ্রাহ্য না করে তাকে ঠেলে নিয়ে ফুটপাথের উপরে তুলল—যেখানে বিহারী দুই বৃদ্ধিমান এই দারুণ গ্রীষ্মে পরমোৎসাহে ইক্ষুরস নিষ্কাষণে ব্যাপৃত। যমুনা মুখের আবরণটি সরিয়ে গম্ভীর ভাবে হুকুম করল: আচ্ছা করে পুরুয়া ধুয়ে আর বরফগুলো ছাতুর মত করে গুঁড়িয়ে বড় বড় দুটো পুরুয়া ভরে সরবৎ বানাও। আচ্ছা হলে বখশিস মিলবে।... সরবতওয়ালারা খুব খুশি, ব্যাপার সুরু হতেই সেরা চাহিদা। ক্ষিপ্রহস্তে দুটি আধসেরা পুরুয়া ভালো করে ধুয়ে নিল; একজন বালতি থেকে এলুমিনিয়মের একটা পাত্রে সঞ্চিত রস ঢালতে লাগল; অন্য ব্যক্তি সিক্ত বস্ত্রখণ্ড আর একবার পরিস্কার জলে ধুয়ে তার মধ্যে বরফ রেখে কাঠের একটা ডাণ্ডা দিয়ে পেসাই করতে লাগল। যে হেতু, হুকুম হয়েছে—বরফ ছাতুর মত গুঁড়া করা চাই। যদিও এ ব্যবস্থায় বরফের দিক দিয়ে সুসার কিছু হবে না—রস কিছু বেশীই যাবে; কিন্তু আগে থেকেই রসের সঙ্গে যে পরিমাণে পানি মিশিয়ে রেখেছে, সে হিসাবে এ ক্ষতি ধর্তব্যই নয়; এর ওপর বখশিস আছে। ইক্ষু রস, চূর্ণ বরফ, লেবুর নির্যাস—পর পর পাত্রে দিয়ে পরিপূর্ণ পুরুয়া দুটি দুই গ্রাহিকাকে দেবার উপক্রম করতেই যমুনা তাড়াতাড়ি একটি পুরুয়া নিজেই হাত বাড়িয়ে নিয়ে একেবারে অপ্রস্তুত সুশীলার মুখের সামনে তুলে ধরল। সুশীলাও তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে পুরুয়াটি ধরতে গেল। কিন্তু এই সময় কি যে হলো, বা কার দোষে যে পুরুয়াটি সুশীলার ঠিক গলার উপরে পড়ে গায়ের ব্লাউসটা ভিজিয়ে দিল, কেউ সেটা বুঝতে পারল না। আর, বুঝবার অবসরও তখন নেই—সুশীলা যেন হকচকিয়ে গেছে। যমুনাও অত্যন্ত অপ্রতিভের মত মুখভঙ্গী করে বলে উঠল: ছি! ছি! ভারি কসুর হলো তো!... পরক্ষণেই সারা মুখে উদ্বেগের ভঙ্গী ফুটিয়ে বলল: আরে বহিন, তোমার জামার জন্যে ভেব না এখুনি শুখিয়ে যাবে, কিন্তু চিঠিখানা যে গোল্লায় গেল। দাও, দাও, দেখি!

চিঠির কথা সুশীলার মনেই ছিল না, সে ব্লাউস সামলাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। যমুনার কথায় তার হুঁস হলো। কিন্তু তার আগেই যমুনা ব্লাউসের মধ্যে হাত চালিয়ে পুরু খামখানা টেনে বার করল—তার উপরটা তখন ভিজে গেছে! যমুনা তাড়াতাড়ি বোরখার কাপড়ের মধ্যে

ভিজা খামখানা রেখে জোরে চাপ দিয়ে বলল: ভেব না বহীন, আমার এই কাপড়ের এমনি গুণ, জল শুষে নেবেই —ব্লটিন কাগজ যেমন করে কালি টেনে নেয়। চিঠি আমি ফেলে দিয়ে আসছি—তুমি ততক্ষণ ঐ পুরুয়াটি নাও। দেও তো জী!

সকলেই বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যমুনার তৎপরতা এ অবস্থায় প্রত্যেককেই যেন চমৎকৃত করল। সুশীলার মুখে কথা নেই, সে নীরবেই যমুনার কথা শুনে চলেছে। কিন্তু এই সময় একজন বিহারী অপর পুরুয়াটি সম্মুখে ধরতেই সুশীলা তাড়াতাড়ি আপত্তির ভঙ্গিতে বলে উঠল: না, না, ও তুমি খাও। আমার আর খেতে ইচ্ছে নেই।

বোরখার বস্ত্রে জড়ানো খামখানির উপর জোরে আর একবার চাপ দিয়ে যমুনা বলল: অমন কথা ব'ল না বহীন, তাহলে বুঝব—আমার কসুরে তুমি রাগ করেছ। দেও জী —দেও। নাও বহীন। আর দেখো জী, আমার জন্যে আর এক পুরুয়া বানাও তো। ঐ ডাকখানায় চিঠিখানা ছেড়ে এসেই আমিও খাব।

সুশীলাকে অগত্যা পুরুয়াটি নিতে হলো। যমুনা এই সময় বোরখার ভাঁজ খুলে খামখানা তুলে বলল: এই দেখ বহীন, বিলকুল পানি শুকিয়ে গেছে। তুমি খাও, আমি চিঠিখানা ছেড়ে দিয়েই আসছি।

সুশীলা তখন স্নিগ্ধ পানীয়ে চুমুক দিয়েছে। পরম একটা তৃপ্তি বোধের সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠল: কলকাতার পেটিতে ছেড়ো বহীন!

'আমি তা জানি।' বলেই মৃদু হেসে এবং সেই সহাস্য মুখখানির উপর আবরণটি টেনে দিয়ে যমুনা দ্রুতপদে ডাকখানার দিকে ছুটল। একটু আগেই আর একটি বড়-রাস্তা—সেই রাস্তায় কয়েক পা গেলেই সামনে প্রকাণ্ড ডাকখানার রুদ্ধ দ্বার ও জানালাগুলি দেখা যায়। কিন্তু ডাকখানার প্রবেশ-দ্বার পাশের গলিটির গায়ে।

এখানে পুরুয়ার স্নিগ্ধ শীতল পানীয়ের আস্বাদ নিতে নিতেই সুশীলা দেখল—যমুনা বড় রাস্তা দিয়ে গলির মধ্যে ঢুকছে এবং ডাকখানার দরোজার একপাশে টাঙানো টিনের নির্দিষ্ট বাক্সটির মধ্যেই চিঠিখানি ফেলছে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই ফিরে এসে যমুনাও পরম তৃপ্তির সঙ্গে পুরুয়ার পানীয়টুকু চেখে চেখে পান করতে লাগল। যাবার সময় একটা টাকা সে সরবৎ-ওয়ালাদের তক্তার উপর ফেলে দিয়ে বলল: খুব বড়িয়া সরবৎ বানিয়েছ ভাইয়া! আট আনা সরবতের দাম, আর আট আনা তোমাদের ইনাম!

সুধু দুই বিহারী সরবতওয়ালা নয়, বাঙালীর মেয়ে সুশীলা পর্যন্ত অবাক হয়ে চেয়ে রইল এই অদ্ভুত বোরখাওয়ালীর মুখের পানে।

* * *

এই ঘটনার খানিক পরে গুডহোপ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে—যে বিশিষ্ট স্থানটিতে উপরওয়ালাদের গাড়ী এসে দাঁড়ায়, সেইখানে একখানি ট্যাক্সী এসে থামল। ট্যাক্সী থেকে নামল বোরখাওয়ালী যমুনা। ট্যাক্সীওয়ালার লোকদের বিস্মিত দৃষ্টির উপরেই সে লিফটের মধ্যে প্রবেশ করল।

সত্যেন সেনের চেম্বারের দরজায় পাশে টুলের উপরে বসে চাপরাসি ঢুলছিল। পদশব্দে সচকিত হয়ে মুখ তুলতেই দেখল—এক বোরখাওয়ালী সাহেবের ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকছে। অমনি তার তন্দ্রা ছুটে গেল; তর্জন করে উঠল: ঠ্যারো।

কিন্তু বোরখাওয়ালী তৎক্ষণাৎ মুখের পরদা সরিয়ে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে চাপরাশীও দুই চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে রইল আড়ষ্টভাবে।

সেই বৃহৎ টেবিলের সামনে গদীআঁটা খুর্সিতে বসে নিবিষ্ট মনে সত্যেন একটা ফাইল দেখছিল। সামনের চেয়ারখানায় খস্ খস্ করে একটা শব্দ উঠতেই সে চোখ তুলে চেয়েই ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে বসে রইল। তার পর সামনের কলিং বেলটার দিকে হাত বাড়াতেই মুখের পরদা সরিয়ে বোরখাওয়ালী পরিস্কার বাঙলায় বলে উঠল: থামো, বোরখাওয়ালীকে দেখে ঘাবড়াবার কিছু নেই।

বিস্ময়ের সুরে সতোন জিজ্ঞাসা করল: ব্যাপার কি? এ বেশ ধরবার প্রয়োজন?

নানা সহাস্যে বলল: মিসেস সেনের জন্য। মনে নেই, একদিন তুমি বলেছিলে—মিসেস সেন হিন্দী শিখতে চান, তাঁকে কোচ করবার জন্যে একজন মিস্ট্রেস চাই।

সত্যেন বলল: হ্যাঁ, মনে আছে। তারপর কথাটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। আমিও ভুলে গিয়েছিলাম।

এক ঝলক তরল হাসি মুখে এনে নানা বলল: কিন্তু আমি ভুলি নি। সেই জন্যেই বোরখাওয়ালী সাজতে হয়েছিল।

সহসা চমকে উঠে সত্যেন বলল: সেদিন মিসেস সেন বলছিলেন বটে, যমুনা বাঈ নামে এক শিক্ষয়িত্রী তিনি

পেয়েছেন; খুব ভদ্র মহিলা, অত্যন্ত তাঁর সম্ভ্রম বোধ, বোরখা পরে আসেন। এখন তাহলে মনে হচ্ছে......

খিল খিল করে হেসে নানা বলল: সেই যমুনা বাঈ এখন এইখানে বসে। সত্যিই, মিসেস সেনের সঙ্গে বোঝা-পড়া করবার উদ্দেশ্যেই যমুনা বাঈ সেজেছিলাম। বোঝা-পড়া শেষ করে এখন আবার স্বমূর্ত্তি ধরছি, তোমার সামনেই।... বলতে বলতেই নানা তার পরণের বোরখা খুলে ফেলল; নাকের বেসর ও কানের মাকড়ীগুলোও খুলে নিয়ে মুখখানাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনল।

সত্যেন জিজ্ঞাসা করল: বোঝাপড়াটা কিভাবে হলো? সেই পুরু খামখানা খোলা অবস্থায় সত্যেনের হাতে দিয়ে নানা সহজ গলায় বলল: পড়ো—তাহলেই বুঝতে পারবে।

খামের লেখা ও নাম ঠিকানা পড়েই সত্যেন পুনরায় আর একবার চমকে উঠল। তাইত...হস্তাক্ষর যে সুপ্রিয়ার। সে এই খামের মধ্যে বঙ্গভারতীর সম্পাদকের নামে চিঠি লিখছে।......কি লিখেছে সুপ্রিয়া! খামখানি খুলে সত্যেন চিঠিখানা পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে তার মাথার ভিতরটা দপ দপ করে উঠল।

* * *

অন্যদিন সন্ধ্যার সময় সত্যেন বাড়ী ফিরে আসে। এদিন যখন বাড়ি ফিরল, তখনো পাঁচটা বাজেনি। কিন্তু তার আসার সঙ্গে সঙ্গেই অন্দর-মহলে একটা আতংক-জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হলো—সে যেন ঝড় একটা তুলেই তারই অবর্ত মাথায় করে বাড়িতে সেঁধিয়েছে।

সুপ্রিয়ার মহলে কিন্তু তখনো তার কোন আভাসই পাওয়া যায় নি। অসময়ে স্বামী তাঁর ঘরে এসেই আহ্বান করেছে শুনে সুপ্রিয়া একটু বিস্মিত হলো। সুশীলা তখন তার চুল বেঁধে দিচ্ছিল—সে কাজ শেষ হয়েছে, এমন সময় আহ্বান। তাড়াতাড়ি পরণের সাড়ীখানা ছেড়ে বৈকালী সাড়ীখানা পরেই সে সত্যেনের ঘরে প্রবেশ করল। সত্যেনের কৌচের সামনেই সুপ্রিয়ার আসনখানিও সু-নির্দিষ্ট হয়ে আছে। সেখানে বসতেই সেই খামখানা তার সামনে রেখে সত্যেন জিজ্ঞাসা করল: এ খাম তুমি আজ ডাকে পাঠিয়েছিলে?

খামখানা দেখেই সুপ্রিয়ার চোখের তারা দুটো যেন স্থির হয়ে গেল। খামখানা তুলে নিয়ে তার ভিতরের পরিচিত কাগজগুলির উপর নিমেষে চোখ বুলিয়ে মৃদুস্বরে সে বলল: হ্যাঁ, এ খাম আমিই আজ সুশীলাকে দিয়ে ডাকে ফেলতে পাঠিয়েছিলাম—তোমার হাতে কি করে এলো?

ব্যঙ্গের সুরে সত্যেন বলল: যেমন করে ওপরওয়ালার হাতে এই ধরণের চিঠি চাপাটি আসে। তাহলে এ লেখা তোমার?

সুপ্রিয়া উত্তর দিল: হ্যাঁ।

সত্যেন পুনরায় প্রশ্ন করল: তাহলে মৃদুলা দেবী সেজে তুমিই বরাবর বঙ্গভারতী কাগজে ঐ সব লিখে আসছ?

সুপ্রিয়া কোন উত্তর দিল না; কিন্তু তার মৌনতাই সম্মতি বলে অনুমিত হলো। সত্যেন এবার সুধাল: তাহলে আমার কাছে কথাটা চেপে রেখেছিলে কেন?

সুপ্রিয়া বলল: তুমি তো আমাকে জিজ্ঞাসা কর নি; যেটুকু যেভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলে, আমি অকপটেই তার উত্তর দিয়েছিলাম।

বিকৃত কণ্ঠে সত্যেন বলল: এখন হাতে নাতে ধরা পড়ে গিয়ে ঐ কথা বলছ!

দৃঢ়স্বরে সুপ্রিয়া জবাব দিল: না, আগেও যদি জিজ্ঞাসা করতে—মৃদুলা দেবী কে, আমি তাকে জানি কিনা—তাহলে এই উত্তরই আমার কাছে শুনতে। কিন্তু ও কথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস তখন তোমার ছিল না।

পূর্ববৎ ব্যঙ্গের সুরে সত্যেন বলল: না—সাহসটাকে তুমিই একচেটে করে ধরে রেখেছিলে! তাই—চোরাবাজার, ভেজাল এ সব ব্যাখানা করেও আশা মেটে নি; যেটা বাকি ছিল—সেই নারী নিয়ে ব্যবসার বিশ্রী ব্যাপারটাও এই চিঠিতে লিখে পাঠাচ্ছিলে! এ রকম সাহস হয় কার জানো—সয়তানীর!

স্বামীর এই শ্লেষের নির্মম আঘাত অকাতরে সহ্য করেই সুপ্রিয়া বলল: কিন্তু এর জন্যে তুমি এত উত্তেজিত হোচ্ছ কেন? আর এত রাগেরই বা কারণ কি? তুমি তো বরাবরই সাফাই দিয়ে এসেছ—অন্যায় কিছু করনি, আর তোমার মত শিক্ষিত ভদ্রলোক এই সব অনাচার করতে পারে বলে কল্পনা করাও অনুচিত। যারা অপরাধী, তাদের বিরুদ্ধেই আমি সাহস করে চ্যালেঞ্জ দিয়েছি।

অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে সুপ্রিয়ার দিকে চেয়ে সত্যেন বলল: বুঝেছি, কিন্তু এ সব আমি পছন্দ করি না। এখন শোন—আধ ঘণ্টার মধ্যে তুমি তৈরী হয়ে নাও; এ বাড়িতে তোমার থাকা আর সম্ভব হবে না। আমি ভিতরে বলে এসেছি—তোমার বাবার কঠিন অসুখ, আমি তোমাকে সেখানে রাখতে চলেছি। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, নিজের মর্য্যাদার দিকে চেয়ে এটা মনে রেখেই কথা বলবে।

অবিচলিত স্বরে সুপ্রিয়া বলল: বেশ, তাই হবে।

বাড়িতে তখন কলরব উঠেছে। শাশুড়ী বলছিলেন—ছোট বৌমা এসে যেভাবে সংসারটাকে গুছিয়ে নিয়েছিলেন, উনি গেলে এর পর কি হবে, কে তাঁর জায়গায় বসে এর হাল ধরবে?

যে-বেশে সুপ্রিয়া এ-বাড়িতে এসেছিল, সেই সাদা-সিথা বেশেই শাশুড়ী ও জায়েদের প্রণাম করতে এলে শাশুড়ী তাকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন: বাপ সেরে উঠলেই চলে আসবে মা, নৈলে সংসার গোল্লায় যাবে।

সুপ্রিয়া তাঁর পায়ের তলায় হেঁট হয়ে প্রণাম করে বলল: যাঁর ইচ্ছায় এ অঘটন ঘটেছে মা, তাঁর ইচ্ছাই সব। আমাদের কি কোন হাত আছে।

গাড়ীতে উঠে জানালার দুদিকে স্বামী-স্ত্রী দুজনে মুখ বাড়িয়ে বরাবর বসে রইল—কেউ কিছুই বলল না। বাড়ির কাছে গাড়ী আসতেই সত্যেন সোজা হয়ে বসে মুখখানাকে শক্ত করে বলল: একটা কথা আছে, সারা জীবন স্বচ্ছলভাবে কাটাতে হলে কত টাকা তুমি প্রয়োজন মনে কর? আমি চেক বই সঙ্গে করে এনেছি, এমাউণ্টটা বলো—লিখে দিই।

মুখখানা ফিরিয়ে স্বামীর মুখের উপর স্বচ্ছ স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সুপ্রিয়া বলল: আশ্চর্য! তুমি এ সময় ঐ তুচ্ছ টাকার কথাটাই তুললে?

রুক্ষস্বরে সত্যেন বলল: হ্যাঁ, যেহেতু আমি মনে করি, সংসারে বেঁচে থাকতে হলে টাকাটাই মস্ত কথা।

কিছুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে ধীরে ধীরে স্নিগ্ধস্বরে সুপ্রিয়া বলল: কিন্তু আমার জীবনে টাকাটাকে যে আমি কোনদিনই বড় করে দেখিনি—তাই, আমার কাছে ওর কোন সার্থকতাই নেই।

ঘ্যাঁচ করে একটা শব্দ তুলে গাড়ী থেমে গেল। সুপ্রিয়া দেখল বাড়ির সামনে গাড়ী এসে থেমেছে। সে এই সময় ক্ষুব্ধ স্বামীর দিকে পুনরায় স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বলল: তোমার কাছে একটি জিনিস শুধু চেয়ে রাখছি; চরম সময়ে যদি প্রয়োজন হয়, সেই দিন তুমি দয়া করে সাড়া দিও।

বলতে বলতে স্বামীর পায়ে হেঁট হয়ে মাথাটি ঠেকিয়ে তারপর সাশ্রুলোচনে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের পানে একটিবার চেয়েই সে গাড়ী থেকে নেমে গেল।

* * *

গুডহোপ কোম্পানীর আফিসে সেদিন আলোচনা হচ্ছিল, মিসেস সেনকে এভাবে সরিয়ে দিয়ে সেন সুবুদ্ধির পরিচয় দেন নি। ওখান থেকে তাঁর পক্ষে কাগজে স্ক্যাণ্ডালিজাম করবার আরো সুবিধাই হবে। ওঁকে বরং সেন-ভিলায় আটকে চোখে চোখে রাখলেই কাজটা ভালো হোত।

কিন্তু এই আলোচনার প্রাক্কালে সত্যেন সেখানে এসে সুপ্রিয়ার একখানা চিঠি দাখিল করল। সে চিঠিতে সুপ্রিয়া লিখেছে—অতঃপর সে অনাচারের বিরুদ্ধে সংবাদ-পত্রে আলোচনায় বিরত হয়ে আত্মিক সাধনা করবে। এর জন্যে সে নিজের দেহ স্বাস্থ্য সুখ সব কিছু আহুতি দিতেও কুণ্ঠিত হবে না।

মিঃ হক বললেন: এ খুব ভাল কথা। গোড়া থেকেই যদি তিনি এইভাবে আধ্যাত্মিক সাধনা করতেন, তাহলে আমরাও বিব্রত হতাম না, তাঁকেও পিত্রালয়ে ফিরে যেতে হতো না।

এর পর হক ও গুপ্ত সত্যেনকে ধরে বসল—আর কেন, এবার মিস নানাকে মিসেস করে নাও। বেচারীকে আর কষ্ট দিও না।

সত্যেন বলল: এখনি সেটা ভালো দেখায় না; তিনটে মাস কেটে যাক, তার পর ভেবে চিন্তে যা হোক একটা করা যাবে। এর মধ্যে সুপ্রিয়ার মনের গতিটাও বুঝতে পারব।

মিস নানা উৎসাহে দিন গণনা করতে লাগল। মিসেস সেন রূপে নিজেকে পরিচিত করবার জন্যে সে যেন আকুল হয়ে উঠেছে।

তিন মাস পূর্ণ হতে আর বড় বেশী দিন নেই: হক ও গুপ্ত প্রতি সপ্তাহেই একবার করে সত্যেনকে কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয়। আফিসে নানা পুনরায় সত্যেনের একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

সেদিন অপরাহ্নে সত্যেনের চেম্বারে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কেই বৈঠক বসেছে। জানা গেছে, সুপ্রিয়া পিত্রালয়ে গিয়ে অবধি সেই চিঠিখানা ছাড়া আর কোন চিঠিই দেয় নি, নিজের প্রয়োজনে কিছুই চায় নি।

গুপ্ত বললেন: তার আশা ছেড়ে দাও, তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই সে রাখবে না।

হক বললেন: তোমাদের ছাড়াছাড়ির ব্যাপারে ডাই-ভোর্স বা তালাক-নামা নেই তো, কাজেই সিভিল ম্যারেজ...

দরজা খুলে এই সময় চাপরাসী এক টেলিগ্রাম নিয়ে এলো, এই মাত্র এসেছে; বাহিরে পিওন খাড়া আছে রসিদের জন্য।

রসিদে সহি দিয়ে চাপরাসীকে বিদেয় করে সত্যেন টেলিগ্রাম পড়তে লাগল গলায় জোর দিয়ে, কিন্তু পড়তে

পড়তে স্বর তার অস্পষ্ট হয়ে এলো। সত্যেন যা পড়ল, তার মর্ম হচ্ছেঃ

৪৭ দিন একটানা সিরিয়াস টাইপের টাইফয়েডে ভুগে সুপ্রিয়া এখন মহাপ্রস্থানের পথে। এই চরম সময় সে তোমার দর্শন প্রার্থিনী।—সুপ্রিয়ার বাবা।

চেম্বারের চারটি প্রাণীই ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে স্ব স্ব স্থানে বসে রইল। একটু পরে সত্যেন উঠে দাঁড়াতেই নানাই সর্বাগ্রে আর্তস্বরে আবেদন জানালঃ দয়া করে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল তুমি!

হক এবং গুপ্ত এ'রাও সত্যেনের সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

* * *

শিবপুরের প্রান্তভাগে ক্ষুদ্র একখানি বাড়ী। ক্ষুদ্র ও জীর্ণ হলেও বাড়িখানি পরিচ্ছন্ন ও ছিমছাম। একখানি প্রশস্ত ঘরে শয্যার উপরে সুপ্রিয়ার কঙ্কালসার দেহ শয্যার সঙ্গে মিলিয়ে আছে। পিতা মাতা ছোট ছোট ভাই বোন ও প্রতিবাসিনীরা শোকাচ্ছন্ন মুখে মরণপথযাত্রিনী সুপ্রিয়াকে পরিবেষ্টন করে আছে—মহাকালের চরম আহবানের বুঝি বিলম্ব নাই।

এমনি সময় একখানি মোটর এসে দাঁড়াল বাড়ীর দরজার সামনে। রামেশ্বর বাবু বললেনঃ বুঝি এসেছে, দেখ তো বিলু।

ছোট একটি ছেলে বেরিয়ে গেল। একটু পরে কয়েক ব্যক্তিকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলো। এ অবস্থায়ও গৃহস্বামী উঠে দাঁড়ালেন অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে। গৃহিনী আর্তস্বরে বললেনঃ আর কি দেখতে এলে বাবা, আমার সোনার প্রতিমার অবস্থা দেখ—একবার সামনে এসে দাঁড়াও, তোমাকে দেখবার জন্যেই প্রাণটাকে......

প্রবল অশ্রুর প্লাবনে শেষ কথাগুলি ভেসে গেল। সত্যেন ধীরে ধীরে শয্যার সামনে এসে দাঁড়াতেই সুপ্রিয়ার আয়ত দুটি চোখ খনিকের মত প্রফুল্ল হয়ে উঠল; শীর্ণ হাতখানি তুলতে গেল, কিন্তু সমর্থ হলো না।

গুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেনঃ ক্লিয়ার টাইফয়েড যখন ক্লোরোমাইসিন দেন নি কেন—তাহলে......

রামেশ্বর হাত বাড়িয়ে পাশাপাশি পাঁচটা ফাইল দেখিয়ে বললেনঃ সব পুঁজি শেষ করে চড়া দামে পাঁচ পাঁচটা শিশি পর পর কিনেছিলাম, কিন্তু কোন ফল হলো না। শেষকালে ডাক্তার দেখে বললেন—করেছেন কি, এ তো আসল ওষুধ নয়—নকল।

নকল!...সত্যেনের সমস্ত দেহটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল কথাটা শুনে। হাত বাড়িয়ে ফাইল কটা তুলে নিয়ে চোখের সামনে তুলে ধরল সে...তাইত! নকলই তো! তাদেরই গুডহোপ কোম্পানীর রসায়নাগারে... বিশ্ববিখ্যাত ঔষধের অনুকরণে...নিজের ফারম থেকে নিজের পরিকল্পনায় সে যে এই নকল ফাইল বাজারে চালু করেছিল; আজ...তারই সুপ্রিয়া এরই মোহে নিজের জীবন দিল... আহুতি!

গৃহিনী চিৎকার করে উঠলেন—ওগো, দেখছ কি—সুপ্রিয়া আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালালো!... মাগো!... এমনি করে অভিমানে প্রাণটাকে তুই আহুতি দিলি রে!

শেষ।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

তৃতীয় অঙ্ক

মহিমের বাড়ীর বসবার ঘর। গৌরী, আনন্দ, বেলা ও কুমারশঙ্কর আসীন।

গৌরী—তাহলে স্থির হয়ে বসে কবিতা শোনা যাক।

আনন্দ—আমি তো উতলা হয়ে পড়েছি।

বেলা—আগ্রহে আমি মরে যাচ্ছি।

গৌরী—কুমারের সব লেখা আমার অদ্ভুত ভাল লাগে।

আনন্দ—কি রস! কি ব্যঞ্জনা!

বেলা—আমার তো কানের ভিতর দিয়ে মরমে মধু ঢালে।

কুমার—আমার এই নবজাত শিশু আপনাদেরই অঙ্গনে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। আপনারা অনুমোদন করে এর মাতৃত্ব গ্রহণ করুন।

আনন্দ—সত্যি, কি অদ্ভুত আপনার কথা বলার ভঙ্গী।

(রাণু প্রবেশ করেই বেরিয়ে যাচ্ছিল)

গৌরী—সে কি, তুই পালিয়ে যাচ্ছিস যে!

রাণু—তোমাদের মধুর আসর নষ্ট করে দিতে চাইনে বলে।

গৌরী—বোস্ এখানে। মন দিয়ে শোন্, ভাল কবিতা বুঝতে শেখ্।

রাণু—ওসব কবিতার রসটস বুঝি না মা। আর অত পাণ্ডিত্য বোঝবার মত বুদ্ধিও আমার নেই।

গৌরী—না-ই-বা থাকল, শুনতে দোষ কি? তা ছাড়া, একটা জরুরী কথা আছে তোর সঙ্গে।

কুমার—(রাণুকে) জ্ঞান-বিজ্ঞান কাব্য চর্চায় তোমার উৎসাহ নেই, তোমার একমাত্র গর্ব তুমি মানুষকে মুগ্ধ করতে জান।

রাণু—দুই-ই আমি সমান বুঝি। তা ছাড়া, আমার প্রবৃত্তিও নেই।

বেলা—(রাণুকে) বোস্ না এসে। নতুন কিছু পাবি এখানে।

গৌরী—আনন্দ, রাধেশ্যামকে ডেকে বলে দে—চা'র ব্যবস্থা করে।

আনন্দ—রাধেশ্যাম!

(রাধেশ্যাম আসতে গিয়ে গালিচায় হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল)

গৌরী—দেখ, হতভাগার কাণ্ড। শুকনো জায়গায় পড়লি কি করে?

কুমার—মেঝে থেকে কার্পেটে উঠতে গ্র্যাভিটেশনের একটু গোলমাল হয়ে গেছে।

আনন্দ—যা, তাড়াতাড়ি চায়ের বন্দোবস্ত কর্ তো।

(রাধেশ্যামের প্রস্থান)

কুমার—ভাগ্যি ওর দেহটা কাঁচের তৈরী নয়, তাহলে টুকরো টুকরো হয়ে যেত।

(নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল)

বেলা—আপনার কি রসের কখনই অভাব হয় না?

গৌরী—এখন পূর্ণপাত্র পরিবেশন কর।

কুমার—আপাতত একটি মাত্র সনেট পড়ব। আপনাদের এতখানি আগ্রহ মিটবে কি তাতে?

বেলা—আপনার কবিতা যতটুকু হয়—

গৌরী—তোমরা যদি কেবল কথাই বলে চল তাহলে ও পড়বে কি করে?

কুমার—একটি ঝরা ফুলের—

বেলা—(রাণুকে) মন দিয়ে শোন্।

কুমার—একটি ঝরা ফুলের উদ্দেশ্যে।

উর্ণনাভ তন্তুজালে ঠিক্‌রে ওঠে শিশির ঝলক
মসীকৃষ্ণ অন্ধব্যোমে ড্রাগনের লেজের ঝাপ্‌টো
হোথা আণ্টার্ক্‌টিকে হাঁটে শ্বেতবক্ষ লক্ষ পেঙ্গুইন
ঘেয়ো কুকুরের লেজে কষ চাটে মক্ষিকার দল!

বেলা—আরম্ভটাই কি অপূর্ব!

আনু—সামান্য জিনিসকে কি অদ্ভুতভাবে সাজাতে পারেন উনি।

গৌরী—আর এমন আঙ্গিক—এলিয়টের কথা মনে করিয়ে দেয়।

আনু—'হোথা আণ্টার্ক্‌টিকে হাঁটে শ্বেত-বক্ষ লক্ষ পেঙ্গুইন'—কি গভীর ব্যঞ্জনা!

গৌরী—আর শেষ লাইনটায় বীভৎস রসের কি রুদ্র প্রকাশ!

বেলা—তারপর?

কুমার—

'চকিতে ককিয়ে ওঠে স্যার্সির মাথার বদ্ধ তরুণ কুমার
সিয়েরা নেভাদার প্রান্তরে মিলায় গোধূলি রক্তশিখা
কঙ্গো অরণ্যের ধারে লোপামুদ্রা থাকে পথ চেয়ে
জমাট ইনিসির কূলে কাঁদে বসে একাকী উর্বশী।

আনু—সমগ্র বিশ্বকে টেনে এনেছে, কি সুদূরপ্রসারী কল্পনা!

বেলা—আমার রীতিমত রোমাঞ্চ জাগছে!

গৌরী—স্যার্সি, লোপামুদ্রা আর উর্বশী—কি অদ্ভুত-ভাবেই না মিলিয়েছেন এঁদের—

আনু—'কঙ্গো অরণ্যের ধারে লোপামুদ্রা থাকে পথ চেয়ে'—কতখানি পাণ্ডিত্য থাকলে এ লাইনটা লেখা সম্ভব হয়!

গৌরী—তারপর?

কুমার—

ঝঞ্ঝার ঝাপটে চলে ঈগলের দৃপ্ত অভিযান
সাভানারোলার আত্মা হেঁকে ওঠে ফ্লোরেন্সের পথে

বেলা, গৌরী ও আনু—মার্ভেলাস! আবার পড়ুন!

কুমার—

ঝঞ্ঝার ঝাপটে চলে ঈগলের দৃপ্ত অভিযান
সাভানারোলার আত্মা হেঁকে ওঠে ফ্লোরেন্সের পথে
শ্লথবস্ত্রে কটাক্ষে ভেনাস ধ্যানরত শিবের সম্মুখে
স্বসমুখ বিসংবাদে বৈভাষিক মেরুর মধুপ।

গৌরী—ভাষার কি প্রসাদ গুণ! আর অনুপ্রাসের কি লালিত্য—স্বসমুখ বিসংবাদে বৈভাষিক মেরুর মধুপ।

আনু—আর চিত্র চয়ন যে কোন শিল্পীকে হার মানিয়ে দেবে।

বেলা—'সাভানারোলার আত্মার চিৎকার যেন আমি শুনতে পাচ্ছি।

কুমার—শেষ দুটো লাইন শুনে ফেলুন!

উগাণ্ডার তৃণক্ষেত্রে অট্টহাসে হায়েনার দল
মরুর উষর শ্বাসে ঝরে পড়ে একটি কুসুম।

গৌরী—কোথায় মেরুর মধুপ, সিয়েরা নেভাদার প্রান্তর, জমাট ইনিসি আর আণ্টার্ক্টিক!

আনু—কি এসোসিয়েসন!

উগাণ্ডার তৃণক্ষেত্রে অট্টহাসে হায়েনার দল
মরুর উষর শ্বাসে ঝরে পড়ে একটি কুসুম।

বেলা—একটি ঝরা ফুলকে উপলক্ষ্য করে অনন্ত স্থান-কাল পরিক্রমা করে এসেছে কবির কল্পনা!

কুমার—ভাল লেগেছে তাহলে আপনাদের—

গৌরী—এমন কবিতা বাংলা ভাষায় আর লেখা হয়েছে কি?

বেলা—(রাণুকে) তোর মনে যেন কোন দোলা লাগেনি—বোকার মত চেয়ে আছিস!

রাণু—মাথা ধরে গেছে আমার।

কুমার—খুব খারাপ লেগেছে বুঝি!

রাণু—শুনিই নি আমি।

গৌরী—আর একটা পড়বে না?

কুমার—এবার আপনার কবিতা শোনান।

গৌরী—আপাতত আমি নতুন কোন কবিতা রচনা করি নি। তবে আমাদের মহিলা সমিতির কর্ম-সূচীর মধ্যে 'সমাজে নারীর স্থান' সম্বন্ধে আমি বিশদ আলোচনা করেছি। মনু থেকে প্লেটো—সবাই নারী জাতির বুদ্ধি সম্বন্ধে যে অন্যায় মত প্রকাশ করেছেন তা' আমি যথেষ্ট যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছি।

কুমার—সে যোগ্যতা আপনারই আছে।

গৌরী—সমগ্র পুরুষ জাতির ধারণা—নারীর বুদ্ধি-বৃত্তি নাকি যাবতীয় তুচ্ছ বিষয়েই আবদ্ধ। এই অজুহাতেই তারা মহান সব কিছুর দরজা আমাদের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। এই হীন মনোভাবের বিরুদ্ধে আমি নারী জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠা করব।

আনু—শাড়ি, ব্লাউজ, গয়না, আলমারি ইত্যাদি ঘরোয়া জিনিসের বাইরে নাকি নারীর বিচার-শক্তি খাটে না। কি অন্যায় প্রচার বলুন তো!

বেলা—এই অপমানকর অবস্থা থেকে আমাদের উপরে উঠতেই হবে। প্রকাশ্যভাবেই মুক্তি দিতে হবে আমাদের মনীষাকে।

কুমার—নারীজাতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা সবাই জানে। তাদের চোখের দীপ্তিকে যেমন আমি ভালবাসি, তাদের বুদ্ধির দীপ্তিকেও তেমনি সম্মান দিয়ে থাকি।

গৌরী—নারী-সমাজও তোমাকে প্রতিদান দিতে কার্পণ্য করে নি। আমাদের মহিলা সমিতি তো তোমাকে প্যাট্রন হিসেবে গ্রহণ করেছে।

কুমার—সে আপনাদের অনুগ্রহ। আমি যথাসাধ্য করব সমিতির জন্য।

গৌরী—এক শ্রেণীর বুদ্ধি-দম্ভী আছেন নিজেদের পাণ্ডিত্যে যাঁরা নারীজাতকে অবজ্ঞা করে থাকেন, তাঁদের আমরা দেখাতে চাই যে, মেয়েরাও প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারে। তাঁদের চেয়েও ভালভাবে সাংস্কৃতিক সমিতি পরিচালিত করতে পারে, বরং পুরুষ যেখানে ভাঙে নারী সেখানে গড়ে, সূক্ষ্মতত্ত্বের সঙ্গে ভাষার মাধুর্য সংযুক্ত করতে পারে নারী। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সত্যকে আবিষ্কার করতে পারে, যে-কোন আলোচনায় নিজের স্বাধীন মতামতও প্রকাশ করতে পারে।

কুমার—এ বিষয়ে লুডুভিসি কি বলেন জানেন?

গৌরী—প্লেটো থেকে লুডুভিসি—সবাই এক কথা বলে।

আনু—কিন্তু সেলমা লেগারলফ্-এর 'গোস্টা বার্লিং'-এ যে অন্তর্দৃষ্টি আছে—

বেলা—কিন্তু সে দৃষ্টিভঙ্গী পুরোণো হয়ে গেছে। জয়েস-এর "ইউলিসিস" আজকের দৃষ্টিভঙ্গী রূপায়িত করছে।

কুমার—কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর চেয়েও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর কদর আজ বেশী। আপ্‌টন্ সিনক্লেয়ার অথবা শোলখভ এদিক দিয়ে অগ্রণী।

আনু—কিন্তু দু'জনেরই কি দৃষ্টিভঙ্গী এক?

গৌরী—নিশ্চয়। বিশেষ করে এ সব বিষয়ে কুমারের সঙ্গে আমার মত একদম মিলে যায়।

কুমার—তবুও আপনার কাছ থেকে আমার অনেক শিখবার আছে। আপনি জানেন না, এমন খুব কম বিষয়ই আছে।

গৌরী—গর্ব করতে চাই নে, কিন্তু আমি ইতিহাসের একটা নতুন ব্যাখ্যা বার করছি—যা মার্ক্সকেও পিছনে ফেলে দেবে।

আনু—আমাদের সমিতিতে সব কিছুর আলোচনা করব—ইতিহাস, সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন, এমন কি বিজ্ঞান পর্য্যন্ত।

গৌরী—দর্শনের ব্যাপারে আমি ভারতীয় আধ্যাত্ম-বাদকে সবার উপরে ঠাঁই দি। বিশেষ করে বৈশেষিক মতবাদকে।

কুমার—এ বিষয়ে আপনার জ্ঞান সত্যি অপরিসীম!

বেলা—বিনয় করছেন বলে আপনার জ্ঞানের পরিমাণ কি আমরা জানি না?

আনু—তা' ছাড়া, আধুনিক সাহিত্যে এমন কতকগুলি বিকৃত রুচি ঢুকে পড়েছে যার বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম চালাব। সাহিত্যের রুচি-বিচার সম্বন্ধে একটা সম্মেলন আহ্বান করব মনে করছি।

গৌরী—তার চেয়ে বড় পরিকল্পনা আছে আমাদের। এই যে গল্পে উপন্যাসে কাব্যে মেয়েদের নিয়ে ছেলেখেলা করা হয়, সব মেয়েই প্রেমে পড়ে, মুখ বুজে সারাজীবন প্রেমের বোঝা বয়ে চলে, পুরুষ-শাসিত সমাজে সাহিত্যের এই দৃষ্টিভঙ্গী আজকের নারী সহ্য করবে না। নারী-জাতির মর্য্যাদা হানি করে যে সব সাহিত্যিক ভাঁড়ামি করে চলেছেন, তাঁরা হাঁকডাকে যতই বড় হোন না কেন তাঁদের একঘরে করবার ব্যবস্থা করব আমরা।

কুমার—আপনার পরিকল্পনা সত্যিই মহান।

বেলা—দেখবেন আমাদের নিয়মাবলী যখন তৈরী হবে।

কুমার—আপনারা যখন করছেন তা' ভালই হবে—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

আনু—এটা আমরা লেখকদের বুঝিয়ে দেবো যে, পাঠক সংখ্যায় মেয়েরাই বেশি। মেয়েদের জন্যেই তাঁদের বইয়ের বিক্রী। নারীসমাজ সচেতন হলে বয়কট হয়ে যাবে তাঁদের মেয়েদের নিয়ে রোমান্স সৃষ্টি করা সাহিত্য।

(রাধেশ্যামের প্রবেশ)

রাধেশ্যাম—(কুমারকে) আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য একজন ভদ্রলোক বাইরে অপেক্ষা করছেন।

কুমার—কি রকম দেখতে বল তো?

রাধে—পরণে গেরুয়া পোষাক, লম্বা চুল আর খুব মিষ্টি করে কথা বলেন। (প্রস্থান)

কুমার—ইনিই আমার সেই মহাপণ্ডিত বন্ধু—যিনি আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য আমাকে বহুবার অনুরোধ জানিয়েছেন।

গৌরী—নিশ্চয়ই। আমরাও আগ্রহান্বিত। নিয়ে আসুন তাঁকে। (কুমারের প্রস্থান)

(অনু ও বেলাকে) পাণ্ডিত্যের সম্মান আমাদের রাখতে হবে। (অদূরে রাণুকে দেখতে পেয়ে) রাণু, এদিকে এসো। (রাণু ভিতরে এল)

রাণু—কেন বল তো? আমার কাজ আছে। (পালাবার চেষ্টা)

গৌরী—কিছুই কাজ নেই তোমার। চুপ্ করে বোস এখেনে।

রাণু—কেন?

আনু—মা বলছেন, বোস্ না! অত্যন্ত অবাধ্য মেয়ে হয়েছিস তুই।

(মহানন্দকে নিয়ে কুমারশঙ্করের প্রবেশ)

কুমার—এই সেই মণীষী, যিনি আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। আপনাদের পাণ্ডিত্যের কথা শুনে ওঁর মনে ইতিমধ্যেই আপনাদের প্রতি আত্মীয়তার ভাব সৃষ্টি হয়েছে।

গৌরী—সে তো আমাদের পরম সৌভাগ্য।

কুমার—এটুকু বলতে পারি যে, এমন একজন প্রকৃত জ্ঞাণী ও সজ্জন এদেশে খুব কমই আছে।

গৌরী—যিনি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন, তাঁর মুখের কথাই আমাদের কাছে যথেষ্ট।

কুমার—ভারতীয় দর্শনে ইনি অসাধারণ পণ্ডিত, বিশেষ করে স্পিরিচুয়ালিজম্-এ এঁর জুড়ি নেই।

গৌরী—স্পিরিচুয়ালিজম্? বলেন কি!

বেলা—বটে! স্পিরিচুয়ালিজম্!

আনু—কি অদ্ভুত!

গৌরী—স্পিরিচুয়ালিজম্ সম্বন্ধে আমার যে কি অপরিসীম আগ্রহ, আমি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।

মহা—কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহে আমি হয় তো আপনাদের কোন পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় বাধার সৃষ্টি করলাম।

গৌরী—পাণ্ডিতের উপস্থিতি যে কোন অবস্থায়ই কাম্য।

কুমার—তা' ছাড়া, গদ্যে ও পদ্যে ওঁর অদ্ভুত দক্ষতা। যদি আমাদের কিছু শোনান।

মহা—লেখকদের প্রধান দোষ হল, তাঁদের রচনা সম্বন্ধে একবার আলোচনা শুরু হলে, তাঁরা রীতিমত বিভীষিকা সৃষ্টি ক'রে বসেন। পথে-ঘাটে, বৈঠকে, আসরে, যত্রতত্র কবিতা শুনিয়ে লোকেদের বিরক্তি ধরিয়ে দেন। এতটুকু তাঁদের ক্লান্তি নেই এতে। আমার কাছে কিন্তু খুব খারাপ লাগে যখন কোন কবি যেখানে সেখানে শ্রদ্ধা ভিক্ষা করে বেড়ান, যাকে দেখতে পান, তারই কর্ণকুহরে আঘাত করেন, যেন ওৎ পেতে বসেছিলেন তারি জন্যে। নিজের কবিতা পড়িয়ে শোনাবার আগ্রহ প্রকাশ করে নিজেকেই অসম্মান করা হয়।

কুমার—কিন্তু আপনার কবিতার মাধুর্য সম্বন্ধে আমরা অবহিত।

মহা—একটি কবিতা আপনাদের শোনাতে পারি. তরুণ প্রেমিকদের জন্য লেখা।

আনু—(জনান্তিকে বেলাকে) ছিঃ, পাণ্ডিতলোক, প্রেমের কবিতা লেখে!

বেলা—(জনান্তিকে আনুকে) আমার কিন্তু শুনেই খুব খারাপ লাগে।

কুমার—জ্ঞাণী ব্যক্তিরা যদি এ যুগে যোগ্য সমাদর পেতেন—

গৌরী—তা' হলে আপনাদের দুজনকেই সরকার থেকে বৃত্তি আর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট দেওয়া হ'ত।

মহা—আপাতত তাহলে আমার কবিতাটি পাঠ করি। আপনাদের সত্যকার মতামত জানতে পারলে খুশি হব।

কুমার—(মহানন্দকে) একটি ঝরা ফুলের উদ্দেশ্যে একটি সনেট—

মহা—হ্যাঁ, কালকেই একটি পত্রিকার আপিসে সম্পাদক আমাকে পড়ে শোনালেন।

কুমার—তার লেখক কে, আপনি জানেন?

মহা—না, তবে এতটুকু বলতে পারি—সেটা কিছুই হয় নি।

কুমার—কিন্তু অনেক সমঝদার সেটিকে অদ্ভুত ভাল বলে মনে করছেন।

মহা—তাতে এ যুগের সমঝদারদের মূর্খতাই প্রকাশ হয়। আপনি যদি সেটি পড়তেন, আমার বিশ্বাস আপনিও আমার মতে মত দিতেন।

কুমার—কিন্তু এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে মত দিতে পারলাম না। এমন একটি কবিতা লেখার মত কবি এ যুগে খুব কমই আছে।

মহা—ভগবান করুন, আপনার হাত দিয়ে যেন সে রকম কবিতা না বেরোয়।

কুমার—আমি জোর করে বলতে পারি, এর চেয়ে ভাল কবিতা হতে পারে না।

গৌরী—কুমারই উটির রচয়িতা।

মহা—আপনি!

কুমার—হ্যাঁ, আমি।

মহা—বুঝতে পারছিনে তাহলে ব্যাপারটা কি ঘটেছে। হয়তো শোনবার সময় আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, অথবা যিনি পড়ে শুনিয়েছিলেন তাঁর পড়ার দোষেই কবিতাটি নষ্ট হয়েছে। যাক, এ প্রসঙ্গ না হয় এখন থাক। আমার কবিতাটি পড়ে শোনাই।

কুমার—আপনার কবিতা অনেকের শিরে আঘাত, একেবারে মেরেছেন।

মহা—কিন্তু কতলোক তার প্রশংসা করেছে জানেন?

কুমার—কিন্তু আমার খারাপ লাগা তাতে আটকায় না।

মহা—আপনার খারাপ লাগাতেই কবিতা খারাপ হয়ে যায় না।

কুমার—হ্যাঁ, একদল মূর্খ এ ধরণের কবিতা পড়ে আহা মরি করে।

মহা—আপনারই শুধু ভাল লাগে না।

কুমার—সবাইকে আপনার মত মনে করলে চলবে না।

মহা—আপনার বুদ্ধির দৌড় আমার মধ্যে আশা করেন কি করে?

কুমার—আর আপনার বুদ্ধির দৌড় তো জানা আছে। পয়ারের ছন্দকে বলেন কবিতা।

মহা—আর আপনি কতকগুলি দুর্বোধ্য শব্দ আর দুরুচ্চার্য অজ্ঞাত নাম দিয়ে বিভীষিকা সৃষ্টি করেন।

গৌরী—ছি ছি, কি করছেন আপনারা!

কুমার—আপনার কবিতা শিক্ষিত সমাজে পড়ে কেউ?

মহা—আর আপনার লেখা তো পোকায় কাটে!

কুমার—তবুও আমার সুনাম প্রতিষ্ঠিত।

মহা—আগামী সংখ্যা 'আর্য সভ্যতা' পত্রিকাখানা দেখবেন একবার।

কুমার—আপনি কি লিখবেন?

মহা—বর্বরদের দেবতা [illegible]—আমি কেমন মানুষ।

কুমার—আর আমার কলম—

মহা—আপনার দুর্বোধ্য বাক্যবিন্যাসকে আমি থোরাই গ্রাহ্য করি।

কুমার—আচ্ছা।

মহা—আচ্ছা। (প্রস্থান)

কুমার—রেগে গিয়েছিলাম বলে আমাকে মার্জনা করবেন। আমার কবিতাকে নিন্দা করার ধৃষ্টতার প্রতিবাদ করে আমি আপনাদের বিচার-বুদ্ধির মর্যাদাই রক্ষা করেছি।

গৌরী—এসব কথা এখন থাক। আপনার কবিতার গুণাবলী সম্বন্ধে আমাদের এতটুকু সন্দেহ নেই। আপাতত অন্য একটা কথা আলোচনা করতে চাই। রাণু, এদিকে এসো।

রাণু—আমি কিন্তু কবিতা বুঝব না মা।

অনু—জ্যেঠামি করিস না, মা'র কথা শোন। (রাণু গৌরীর কাছে এল)

গৌরী—(রাণুকে) অনেক দিন ধরে আমার মনে একটা অশান্তি রয়েছে—তোর মধ্যে একটুকু জ্ঞানের পরিচয় দেখতে পাই নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিলেই বিদ্যে হয় না। তোর যাতে একটু বুদ্ধি হয় সে পথ আমি খুঁজে পেয়েছি।

রাণু—আমার জন্যে মিথ্যে কষ্ট পাচ্ছ মা। তোমাদের ওসব বড় বড় কথা আমি বুঝি না মা। আমি সহজ ভাবে বাঁচতে চাই। যাকে কিছু বলতে হবে, তার মধ্যে বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় ফলবার জন্যে তোমাদের চেষ্টার সীমা নেই। আমার মনে সে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ঠাঁই পায় না। জ্ঞান না হয়েই আমি বেশ ভাল আছি। বড় বড় বাছা বাছা কথার খোঁচা থেকে অতি সাধারণ কথাই আমি বলতে ভালবাসি।

গৌরী—কিন্তু আমার পরিবারে এত বড় কলঙ্ক আমি সহ্য করতে পারি না। সুন্দর মুখের জেল্লা ফুলের মতই দু' দিনে ঝরে যাবে কিন্তু মনের ঐশ্বর্য অকৃত্রিম ও সনাতন। তাই আমি অনেক দিন থেকে উপায় খুঁজছি কেমন করে তোকে সেই সৌন্দর্যে মণ্ডিত করব বয়স বুদ্ধির সঙ্গে যা ঝরে পড়বে না। জ্ঞানের আগ্রহ তোর মধ্যে জাগিয়ে তুলতেই হবে আমাকে। অর্থাৎ আমি যা চাই তা হল—একজন প্রকৃত জ্ঞানীর সঙ্গে তোকে মিলিয়ে দেওয়া। (কুমারকে দেখিয়ে) এই সেই জ্ঞানী পুরুষ যার সঙ্গে আমি তোর বিয়ে দিতে চাই।

রাণু—আমার!

অনু—হ্যাঁ, এখন কর খানিকটা ন্যাকামি।

বেলা—(কুমারকে) আমার অনুমতি চাইছেন? সে অনুমতি দিলাম আপনাকে।

কুমার—আমি এত আনন্দিত যে কি বলব! এতে আমার যে সম্মান—

রাণু—এতটা ব্যস্ত হয়ে পড়বেন না।

গৌরী—এই জবাব কারস তুই? (কুমারকে) ওর বুদ্ধি ঠিক হয়ে যাবে, বরং আমরা এখন ওকে একটু একা থাকতে দিই। আনু না হয় সঙ্গে থাক।

(আনু ও রাণু ছাড়া সকলের প্রস্থান)

আনু—তোর জন্য মা'র কত যত্ন দেখ দেখি। এর চেয়ে ভাল স্বামী হতে পারে?

রাণু—এতই যদি ভাল, তুমি বিয়ে কর না কেন ও'কে?

আনু—তোর জন্য ঠিক করা হয়েছে।

রাণু—কিন্তু আমি যদি অনুমতি দিই!

আনু—তোর যেমন বিয়ের মোহ আছে, আমার যদি তা থাকত—নিশ্চয়ই করতাম।

রাণু—আর তোমার মত বিদ্যের বাতিক যদি থাকত তাহলে আমিও এ মিলনকে আদর্শ মনে করতাম।

আনু—কিন্তু আদর্শের কথা পরে। মাকে তো মেনে চলা উচিত?

(মহিম, অসীম ও রজতের প্রবেশ)

মহিম—(রাণুকে) আমি [illegible] জন্য পাত্র [illegible] রজতের সঙ্গে আমি [illegible] চাই।

আনু—[illegible] হবে।

রাণু—[illegible] উচিত?

আনু—[illegible] নয়।

মহিম—[illegible] কথা [illegible] পারছি নে।

আনু—[illegible] পাত্র—

মহিম—[illegible] সঙ্গে গিয়ে [illegible] উপর কথা [illegible] তোর [illegible] যেন আমার [illegible] করে।

অসীম—[illegible] তো?

মহিম—[illegible] ভিতরে গিয়ে [illegible] (মহিম ও অসীমের প্রস্থান; রাণু, আনু ও রজত পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল)।

[ক্রমশ

একটি সোনালি স্বপ্ন

সুনীল কুমার নন্দী

রাত্রি তুমি আবছা হাতে দিয়েছো এঁকে ঘুম
আকাশ-নীলে তারার চোখে। পৃথিবী নিঝঝুম।
ঘুমের দোলে সবাই দোলে। একা একাই জাগি
আমি শুধুই;—এখনো হায় ফসল বোনা বাকী

মাঠে মাঠে সেই অন্ধকারে [illegible] ধান
ছড়াই [illegible] গান
বাজে, [illegible] বিলে—
রাত্রি তুমি [illegible] দিলে।

রাত্রি তুমি মিনতি শোন, এ-গান ও আহা শেষে
ঘুমের মতো নিও না কেড়ে, তাহলে যাবো ভেসে—
মাটি ও ধান হারিয়ে গেলে কী আছে? মমতার
সোনালি ধান-গন্ধী মন চাইছে না কিছু আর!

মাইকেল ও বিদ্যাসাগর

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "মধুসূদন ধনীর দুলাল আসেন পালকীতে চাপিয়া, দরিদ্র-সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র আসেন মাইল গুণিতে গুণিতে দীর্ঘ পথ পায়ে হাঁটিয়া। কিন্তু এই মায়াপুরী (কলিকাতা) এই দুই আগন্তুক বালকের জীবনে যে প্রতিভার অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করিল তাহার দীপ্ত আলোকে উহাদের বাহ্য বৈষম্য কোথায় বিলুপ্ত, অন্তর্হিত হইয়া গেল।"

দুই জনেই নাগরিকগণের অগ্রগণ্য পাশ্চাত্য সভ্যতার উল্কাবাহী হইয়াছিলেন অতএব বাহ্য বৈষম্য বিলুপ্ত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইঁহারা দুইজনেই মাতৃভাষা সরস্বতীর চরণামৃত পান করিয়া অমর হইয়াছেন। মাইকেল পাল্কীতে আসিয়াছিলেন আজিও তিনি পাল্কীতেই চলিয়াছেন। বিদ্যাসাগর পায়ে হাঁটিয়া আসিয়াছিলেন আজো তিনি বাঙ্গলার ঘরে ঘরে পায়ে হাঁটিয়াই ঘুরিতেছেন।

বিদ্যাসাগরের অসামান্য প্রভাব বাঙ্গলার জাতীয় জীবনে ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত হইয়া আছে, আজ বাঙ্গলার স্বাধীনতা লাভের পরে তাঁহার জীবন চরিত্র ও সাধনাই বাঙ্গালীর আদর্শ। তাঁহার দীর্ঘ চিন্তার্ধন স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠ কর্মজীবন ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজকে সঞ্জীবিত করিয়াছিল। তাঁহার অগতানুগতিক স্বাধীনচিন্তার ধারা জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে অনুসৃত হইয়াছিল বহু মণীষীর দ্বারা, তাঁহার আত্মমর্য্যাদাদৃপ্ত নৈতিক উচ্চাদর্শ ভূমিচুম্বী দাসত্ব হইতে এ জাতির বহু লোককেই রক্ষা করিয়াছিল। আজিও তাঁহার মহাজীবনের প্রভাবকে ইউরোপ হইতে আগত বহু ভাববন্যা আঘাতের উপর আঘাত করিয়া একেবারে নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই।

যে সমাজ সংস্কারের জন্য আজিও প্রচণ্ড চেষ্টা চলিতেছে তাহার রঙ্গভূমির সূত্রধার তিনি, আজি যে শিক্ষাক্ষেত্রের সাধনায় বাঙ্গালী অগ্রসর—সেই সাধনার মূলে তিনিই করিয়াছিলেন জীবনসঞ্চার। যে বাঙ্গলাভাষা আজ ভারতীয় ভাষার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছে, যে বাঙ্গলা ভাষার মহীরুহে প্রত্যেক জ্ঞানশাখার ফল পুষ্প আজ প্রচুর পরিমাণে প্রসূত হইতেছে সেই মহীরুহের শৈশবে তিনিই সাধনাবারির দ্বারা তাহাকে লালন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত গদ্যভাষাই রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে চরম বর্ণাঢ্যতালাভ করিয়াছে। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির অন্তরঙ্গে বিদ্যাসাগরের নামাবলী ঝলমল করিতেছে—আমরা একটু নয়ন মুদিলেই তাহা দেখিতে পাই। তাই বলিতেছি—অমর বিদ্যাসাগর আজিও পায়ে হাঁটিয়া আমাদের অন্তর্জীবনের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছেন।

মাইকেলের কর্ম্মজীবনের কোন প্রভাব এদেশে সঞ্চারিত হয় নাই। মাইকেলও স্বাধীন চিন্তার অগ্রনায়ক। কিন্তু তাঁহার স্বাধীন চিন্তা ভারতীয় সংস্কৃতিধারাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছিল—তাহা জাতীয় জীবনে অনুসৃত হয় না। বিদ্যাসাগরও গতানুগতিক হিন্দু ছিলেন না—তিনি হিন্দুত্বকে তাঁহার জীবনে নবরূপ দান করিয়াছিলেন। মাইকেল হিন্দু ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বর্ব্বরের ধর্ম্ম মনে করিয়া। মিশনারীরা হয়রাণ হইয়া দেশে ফিরিয়াছে—মাইকেলের তথাকথিত ধর্ম্মাদেশ এদেশ গ্রহণ করে নাই। সুখের বিষয় মাইকেলের নৈতিক জীবন অনুসরণীয় বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। সমসাময়িক সাহিত্যে তাহা উপহসিতই হইবে। মাইকেল আমাদের সমাজ ত্যাগ করিয়াছিলেন—কাজেই সমাজ সংস্কারের কথা তাঁহার মনে কখনও জাগে নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন এই সুসভ্য সমাজ বিক্ষিপ্ত হইয়া যাক। মাইকেলের সেই ধ্বংসাত্মক মনোভাব এদেশে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তিনি চরম বিলাতী শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বিদ্যাসাগরের মত লোক-শিক্ষক ছিলেন না। কাজেই শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার দানের কথাই উঠে না। তাঁহার সব চেয়ে বড় অবদান কাব্য-সাহিত্য ক্ষেত্রে। এ অবদানের তুলনা নাই। এ অবদানের জন্যই তিনি অমর।

কিন্তু তাঁহার রচনাভঙ্গী, রসাদর্শ ও ভাবগৌরব সবই তাঁহারই নিজস্ব। তাঁহার কাব্যধারা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয় নাই—দুই-এক জন কবি অনুসরণের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন। তিনি অননুকরণীয়ই থাকিয়া গিয়াছেন। মাইকেল ইউরোপীয় প্রাচীন কবিদেরই অনুবর্ত্তী ছিলেন—ইউরোপেই ঐ প্রাচীন কবিদের প্রভাব অন্তর্হিত হইয়াছিল। যে অভিনব গীতিকাব্য ধারা প্রাচীন কবিদের ধারাকে কাব্যক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়াছিল—সে গীতিকাব্য ধারায় তাঁহার দান ছিল যৎসামান্য। সে জন্য মাইকেলের পুরাতন ধারার অনুসরণে এদেশের কবিদের

আগ্রহও জন্মে নাই। ফলে মাইকেলের প্রত্যক্ষ প্রভাব বঙ্গ কাব্য-সাহিত্যে সামান্যই।

মাইকেলের প্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ এদেশে চলিল না —মিলহীন পয়ারে পরিণত হইল। মাইকেলের কাব্যের ভাবাদর্শ মাইকেলের অনুবর্ত্তী হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রও গ্রহণ করিলেন না, মাইকেলের কাব্যের ভাষাও বাঙ্গালীর দুর্ব্বল কণ্ঠ গ্রহণ করিতে পারিল না। বিশেষতঃ যে ভাষা ছন্দঃ-স্পন্দঘন অমিত্রাক্ষরেরই উপযোগী, অমিত্রাক্ষরই যদি গৃহীত না হয়, তবে সে ভাষা লইয়া কি হইবে?

মাইকেল পয়ার পায়ের বেড়ী খসাইলেন। কিন্তু সনেট রচনায় কঠোরতর বেড়ীর প্রবর্ত্তন করিলেন। বাঙ্গালীর ধাতে দুই-ই সহিল না। রবীন্দ্রনাথ পয়ারে আবার বেড়ী পরাইলেন এবং সনেটের কড়া ও বেড়ী শিথিল করিয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাববন্যা যখন দেশ প্লাবিত করিল মাইকেলের অবদান তখন গগণে আশ্রয় লইল। সেখানে Like a star when only shinning in the sky তাহা বিরাজ করিতেছে। তাই বলিয়াছি এই মোটর ট্রাম বিমানের যুগে মাইকেল আজিও পাল্কী চড়িয়া দূর যুগপ্রান্তর পার হইতেছেন।

ক্ষণ-বসন্ত

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

তবু ত' বসন্ত আছে আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তর ঘিরে,
মোমের মতন মনে ডাক আসে বসন্তের।
কথার ময়ূর আসে ভিড় করে।
পালকের বহু নীচে নরম বুকের থেকে
ভারুই পাখির মন চুরি করে
উপস্থিত হয় এসে অভীপ্সার মেয়ে,
ছায়া ছায়া মেঘ আসে, ঘুম ঘুম স্মৃতি জাগে—
কথার ময়ূর মেলে পাখা,
ভারুই পাখির মন হাওয়ায় হাওয়ায় জোড়ে গান,
চোখের জোনাকি জেলে সেই মেয়ে হাত রাখে:—
আমার হাতের পরে পরম সোহাগে রাখা
সেই স্পর্শে ডুবে যায় প্রত্যহের বিস্তৃত জগৎ!
আমি যেন মধুকর, গুণ, গুণ, গুণ, গুণ, গুঞ্জরণ তুলি।
চারিদিকে ছায়া-মেঘ, ঘুম-স্মৃতি, কথার ময়ূর,
পাখির হৃদয় আর ঈপ্সিত সে মেয়েটীর
হাসি, হাতে হাতঃ
আজ শুধু জীবন উজাড়!
জীবন-উজাড় নয়, বসন্ত-উজাড়!

ডুবে যায় বাস্তবের রূঢ় উপকথা
তুফানের সমুদ্রের মজ্জমান জাহাজ যেমন
অথবা শীতের দিনে অপরাহ্নে নির্জন পাহাড়ে
কুয়াশা যেমন করে ঢেকে দেয় ঘাসের সবুজ,
আমার নরম মন,
পাখির মনের চেয়ে আরো বেশী স্নিগ্ধতর মন—
তেমনি ডুবিয়ে দেয় ক্ষয়-ক্ষতি, লোকসান-লাভ।

ঈপ্সিত মেয়ের চোখে অকথিত বহুভাষা জাগে.
মায়াময়ী, মহীয়সী প্রাণ-কণিকার মতো
জীবন-চৈতন্য নিয়ে উদিত হঠাৎ!.
পরিচ্ছন্ন প্রেমে আর সুনিবিড় স্নেহে
আমাকেই ঘিরে ধরে থাকে।
ছায়া-ছায়া মেঘ আসে, ঘুম ঘুম স্মৃতি জাগে
মুখর ময়ূর আসে অজস্র কথার
ভারুই পাখির মন নরম বুকের থেকে খুলে নিয়ে
মায়াময়ী মহীয়সী প্রেয়সী হাজির,
হাতে হাত রাখে, জানায় সোহাগ।

আজ কোনো কাজ নয়, কথা নয়,
আজ শুধু বসন্ত উজাড়!
আর জীবন উজাড়!!

এই মর্ত্যভূমি

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

শনিবার বিকেল পাঁচটা থেকে লোক আসতে আরম্ভ করলো—অনেক ছেলেমেয়ে—ওদের শোনাবার জন্যে কি গল্প বলবে স্কুমার। কিছুই ভাবা হয় নি যে ছাই, যতই লোক আসে স্কুমার ততই ঘামিয়ে যায়। আজ তার মান-সম্ভ্রম সব যাবে, অত লোকের মাঝে একেবারে বোকা বনে যাবে ও—তার চেয়ে কাজের ছুতো ক'রে কোথাও পালিয়ে গেলে হ'তো।

লাউঞ্জে জমা হ'লো সবাই—স্কুমারও গুটি গুটি এসে কোণায় একটা চেয়ার নিয়ে বসলো—তার পাশে এসে বসলে একটি অল্পবয়সী মেয়ে। আলাপ করিয়ে দেবার কেউ নেই—নিজে খাবার করা নিয়ে ব্যস্ত সবাই। মাঝে মাঝে কেউ না কেউ এসে শুধু ব'লে যাচ্ছে, ব'সে পড় যে-যার—ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আরম্ভ করবো আমরা—

তুমি ছাত্রী? পাশের মেয়েটিকে স্কুমার জিজ্ঞেস করলো।

না, ও হেসে বললো, আমি অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেসে কাজ করি—তুমি ছাত্র বুঝি?

হ্যাঁ।

কিসের?

ইলেক্ট্রিক্যাল এনজিনিয়ারিং।

ও বাবা, কতদিন আছো এদেশে?

মাস তিনেক।

কেমন লাগছে এ দেশ?

তিন মাসে আর কি বলবো? একটু হেসে স্কুমার বললো, তোমাদের জাতকে তিন বছরেও বুঝতে পারবো ব'লে তো মনে হয় না।

খিল খিল করে হেসে মেয়েটি বললো, চেষ্টা কর।

দেখা যাক। পকেট থেকে সিগ্রেট বের করে মেয়েটির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে স্কুমার বললো, খাও।

না, ধন্যবাদ, আমি সিগ্রেট খাই না।

সিগ্রেট ধরিয়ে স্কুমার বললো, আগে তোমাকে তো কখনও এ বাড়ীতে দেখি নি—

না, এরা তো সবে এ বাড়ী কিনেছে, অভ্রিদের আগের বাড়ীতে আমি প্রায়ই যেতাম—আমার মা অভ্রির মা'র বন্ধু ছিলেন।

তোমার মা'ও এসেছেন নাকি আজ?

অনেকদিন আগে আমার মা মারা গেছেন।

আর বাবা?

তারই সঙ্গে থাকি আমি।

কয়েক মিনিট চুপচাপ। মেয়েটি এবার জিজ্ঞেস করলো, কতদিন থাকবে এদেশে?

চার বছর।

ও বাবা, অতদিন থাকতে পারবে?

বরাবর [illegible]?

খুব জোরে হেসে মেয়েটি [illegible] হলে তিন মাসেই আমাদের [illegible], তাহলে তিন [illegible]

হেসে স্কুমার বললো, আমার নাম স্কুমার—তোমার?

পামেলা।

পামেলা কি?

পামেলা স্যুইট।

স্যুইট—বাঃ বেশ মিষ্টি তো।

ওই নাম নিয়ে সবাই আমাকে ঠাট্টা করে।

আমি ঠাট্টা করছি না মোটেই।

তোমার নাম কি বললে যেন?

স্কুমার।

সে অনেক বড় নাম—তুমি মনে রাখতে পারবে না—

হৈ হৈ ক'রে চায়ের সরঞ্জাম [illegible] নিয়ে এলো মারজোরী, ফ্রেডি, [illegible] আর্থার, নোয়েল, পিটার, অভ্রি, [illegible]।

এতক্ষণ পামেলার সংগে আলাপ করতে করতে স্কুমার [illegible] ভুলে ছিল—ওদের আবার গল্প বলবার কথা—কি বলা যায়! ও মাথা নীচু করে ভাবতে লাগলো।

চা খাওয়া আরম্ভ হ'লো—সংগে মাছের স্যাণ্ডউইচ,

কেক্ আরও কত কি, সুকুমার সে-সব খাবারের নামও জানে না। সবাই নানা রকম গল্প করছে—সুকুমারও কথা ব'লে যাচ্ছে। চায়ের পাট চুকতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগলো। তারপর যে-যার গল্প করতে লাগলো—এই হ'লো এদের সোস্যাল।

আর্থার, সুকুমার বললো, দু' একটা রেকর্ড বাজাবো নাকি?

না, বল গল্প, চেঁচিয়ে উঠলো আর্থার, এবার সুকুমার আমাদের ভারতবর্ষের গল্প বলবে—

সুকুমার ভেবেছিল এদের ব্যাপারটা ভুলিয়ে দেবে—কিন্তু একটা না একটা কিছু বলতেই হবে। সবাই চুপ ক'রে অপেক্ষা করছে তার কথা শোনবার জন্যে। পামেলার সংগে অনেক কথা হয়েছে, তবু এত লোকের সামনে কথা বলতে ঘাবড়ে গেলো। মাথা চুলকে, বার করেক ঢোক গিলে সুকুমার আরম্ভ করলো—

একবার কুচবিহারের মহারাজার প্রাসাদে আমি প্রায় আধ ঘণ্টা ধ'রে বাজিয়েছিলাম। বাজনা শেষ হবার পর মহারাজ আমার কাছে এসে হাত ধ'রে বললেন, আমি বহু ভালো ভালো বাজিয়ের বাজনা শুনেছি—

বলুন মহারাজা—বলুন।

আমি স্পেনের শ্রেষ্ঠ গিটার বাজিয়ের গিটার শুনেছি—

বলুন

আমি ইংলণ্ডের নাম-করা পিয়ানো বাজিয়ের পিয়ানো শুনেছি—

তারপর? তারপর? গর্বে আমার বুক ফুলে উঠলো।

আমি আমেরিকান বাজিয়ের ব্যাঞ্জোও শুনেছি—

হ্যাঁ হ্যাঁ

কিন্তু তারা কেউ তোমার মতো—

বলুন মহারাজ

তারা কেউ তোমার মতো এত বেশী ঘামেনি, ব'লেই সুকুমার নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে গড়িয়ে পড়লো। সকলের হাসি থামতে প্রায় পাঁচ মিনিট লাগলো।

এত হাসাতে পার তুমি!

আর একটা, আর একটা—আর্থার চেঁচিয়ে উঠলো, সুকুমার আর একটা গল্প বল—

সুকুমারের ভয় কেটে গেছে, আর্থারের কথা শুনে সে আবার উঠে দাঁড়ালো, আমি ছেলেবেলায় খুব শান্ত ছেলে ছিলাম, কত শান্ত, এ গল্পটা শুনলেই তোমরা বুঝতে পারবে। একবার কাগজে বার হ'লো যে, দিন পনেরোর মধ্যে নাকি কলকাতায় খুব ভূমিকম্প হবে—মা বিশেষ ব্যস্ত হ'য়ে কলকাতার বাইরে আমার এক মাসিমার বাড়ী আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। পনেরো দিন হ'য়ে গেল কিন্তু ভূমিকম্প হ'লো না। তখন মাসি আমাকে লোক দিয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন—আর আমার মাকে দিলেন একটা ছোট চিঠি, তাতে শুধু দু' লাইন লেখা ছিল, ভাবছি সুকুমারের বদলে ভূমিকম্প আমার এখানে পাঠিও—আবার হাসি। আর কারুর দিকে দেখলো না সুকুমার, শুধু দেখলো পামেলা হেসে যেন গড়িয়ে পড়ছে।

সুকুমার, দারুণ লোক তুমি।

গম্ভীর হ'য়ে গালে হাত দিয়ে ব'সে রইলো সুকুমার। সে যেন আজ সন্ধ্যার এই জলসার নায়ক। এবার নানারকম খেলা আরম্ভ হ'লো—কোন খেলাই জানতো না সুকুমার—পামেলার কাছ থেকে সব খেলা শিখে নিলো। কিছুক্ষণের মধ্যে খেলাও ফুরোলো। তখন যে-যার গল্প করতে লাগলো। কেউ কেউ গেল বাড়ীটা ঘুরে দেখতে।

তুমি তো এ বাড়ী দেখ নি পামেলা?

না।

চলো, ঘুরে দেখবে?

আপত্তি নেই।

ওরা দু'জনে উঠে দাঁড়ালো। কেউ দেখছে না কিন্তু ওদের দিকে।

আমার ঘরটাই আগে দেখা যাক্, কি বল?

চল।

সুকুমারের ঘরে এসে পামেলা জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো আলেকজান্দ্রা প্যালেসের দিকে। অন্ধকার জমা হয়েছে আর জ্বলে উঠেছে প্রাসাদের আলোর সারি।

ও বাড়ীটা কি সুকুমার?

আলেকজান্দ্রা প্যালেস—টেলিভিশন হয় ওখানে—ওদিকে কখনও যাও নি তুমি?

না, এদিকে এর আগে আসি নি—ভেতরে যাওয়া যায় নাকি?

হুঁ, আমি যদিও যাইনি এখনো।

কী সুন্দর দেখাচ্ছে না?

আমি রোজ ওর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকি।

যাহোক্, পামেলা মুখ ফিরিয়ে বললো, কই তোমার বেহালাটা দেখি?

বেহালা? অবাক হ'য়ে সুকুমার বললো, বেহালা কোথায় পাবো?

সে কি? এই না বললে মহারাজার সামনে বাজিয়েছিলে—এখানে বেহালা আননি বুঝি?

হো হো ক'রে হেসে সুকুমার বললো, আরে তুমি সেই গল্প সত্যি ভেবেছ নাকি, ও বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত দুটো হাস্য-কৌতুক, হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাই নিজের নামে চালিয়ে দিলাম।

কী মিথ্যাবাদী তুমি!

যাক্‌গে একটু ব'সো—গল্প করা যাক্!

ব'সে প'ড়ে পামেলা বললো, কোথায় ক্লাশ করতে যাও তুমি?

এখনও ক্লাশ খোলেনি—যেতে হবে ফ্যারাডে-হাউসে, রাসেল্ স্কোয়ারে—

আমারও লেখাপড়া করবার এত ইচ্ছে ছিল—

করলে না কেন?

ইচ্ছে থাকলেই সব কাজ তো করা যায় না—আর একদিন বলবো তোমাকে যদি শুনতে চাও—

নিশ্চয়ই, আবার কবে দেখা হবে তোমার সংগে?

শনি-রবিবার আমি লণ্ডনে আসি না—ও দুদিন আমার ছুটি—বাকি দিন লণ্ডনে আসতেই হয়, ন'টা থেকে সাড়ে পাঁচটা অবধি কাজ করি—সাড়ে সাতটা থেকে ফোনে আমাকে যে কোনদিনই পাবে—

বেশ আমি তোমাকে শীগ্‌গীরই ফোন করবো—বল তোমার ফোন-নম্বর?

কই কোথায় লিখবে?

মাথায়, আমি কিছু ভুলি না পামেলা, তুমি বল।

হেসে পামেলা বললো, বড় অহঙ্কার তোমার—আমার ফোন্-নম্বর হ'লো, গ্রীনিচ্ ১১১২—

বাঃ, এতো ভোলবার নয়—গ্রীনিচ্ এগারো-বারো।

ঠিক্!

ঝিলমিল করছে আলেক্‌জান্দ্রা প্যালেসের আলোর সারি। সেইদিকে তাকিয়ে ওরা দুজন অনেকক্ষণ ব'সে রইলো। কেউ কোন কথা বললো না।

শুধু উরস্‌লার সংগে এখনও ভালো ক'রে আলাপ হয় নি সুকুমারের। সে বেচারী কাজ করে অক্সফোর্ডে—শনি-রবিবার এখানে এসে ছেলের সংগে কাটিয়ে যায়। ছেলে ছাড়া আর কেউ যেন থেকেও নেই উরস্‌লার। ওকে দেখলে মায়া লাগে সুকুমারের। এবার এলে ভালো করে আলাপ করতে হবে ওর সংগে। কত লোকের সংগে আলাপ করতে হবে যে।

রবিবার টেলিফোনের সামনে কয়েক মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলো সুকুমার। ঠিক হবে কি? কি ভাববে ও? এখনও পুরো একদিনও হয় নি আলাপ হয়েছে। মন্ত্রচালিতের মতো ও ডায়েল্ করলো, গ্রীনিচ্ এগারো-বারো!

উত্তর এলো, গ্রীনিচ্ এগারো-বারো।

পামেলা?

সুকুমার?

হ্যাঁ।

কেমন আছো?

ভালো—তুমি?

সুকুমার শুধু হাসলো, কি করছ এখন?

লাঞ্চের বন্দোবস্ত করছি।

তারপর?

নিজের কয়েকটা মোজা সেলাই ক'রে বাবার সার্টে বোতাম টাকতে হবে—

তারপর?

তারপর? হেসে পামেলা বললো, কেন সুকুমার?

লণ্ডনে আসবে?

আজ?

না না, তোমার যদি অসুবিধা হয় তা হ'লে—

অসুবিধা কিছু হবে না তবে একটু দেরী হবে—ধ'রো সন্ধ্যে ছ'টা—

ঠিক আছে।

কোথায় দেখা করবো—তোমার বাড়ীতে?

না না, এদের কিছু জানতে দিতে চায় না সুকুমার, ছবি দেখতে যাবো আজ—অক্সফোর্ড সার্কাস টিউব ষ্টেশনে?

বেশ—ঠিক ছ'টায়—

ঠিক ছ'টায়, তারপর আমার সংগে খাবে—বুঝলে পামেলা!

অনেক ধন্যবাদ সুকুমার।

* * *

সুকুমারের ক্লাশ আরম্ভ হ'লো অক্টোবরের প্রথমেই। নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই তার এখন। [illegible]ল বেলা

ব্রেকফাস্ট খেয়ে ২১২ নং বাস ধ'রে ফিন্স্‌বেরী পার্ক টিউব ষ্টেশনে আসে—সেখান থেকে চার পেনির টিকিট কেটে আসে রাসেল স্কোয়ারে। টিউব ষ্টেশন থেকে মিনিট দু'তিন হেঁটে সে আসে সাউদাম্পটন্ রো'র ওপর ফ্যারাডে-হাউসে—এটা হ'লো তার কলেজ। ইণ্ডিয়া-হাউস তার কলেজের খুব কাছে—কিন্তু সেখানে বড় একটা লাঞ্চ খেতে যায় না সুকুমার। ফ্যারাডে হাউসের সামনেই ভিক্টোরিয়া হাউস—সেখানে কাজ করে পিটার—সুকুমার প্রায়ই তার সংগে লাঞ্চ্ খায়। ছোট দিন—ক্লাশ শেষ ক'রে বেরোতে বেরোতেই অন্ধকার নামে—সুকুমার সোজা বাড়ী চলে আসে—সাতটায় ডিনারে হাজির থাকা চাই, যেদিন বাইরে খায় সেদিন কোন বউকে যথাসময়ে ব'লে দেয় আজ খাবো না আর দেরী হলে বলে, খাবার ওভানে রেখে দিও—আজ দেরী হবে ফিরতে।

এতদিন পর সুকুমার বুঝতে পারলো কেন সব সময় ছুটে চলে লণ্ডনের লোক। এক মিনিটও সময় থাকে না—এত কাজ যে লোকের সংগে দেখা করতে হ'লে ঘড়ি-ঘণ্টা দিনক্ষণ ঠিক ক'রে যেতে হয়।

অনেক পড়তে হবে সুকুমারকে। ক'লকাতার অনার্স গ্র্যাজুয়েট হ'য়ে সে ভেবেছিল খুব কঠিন হবে না তার পক্ষে কিন্তু কয়েকটি লেকচার শুনে সে বুঝলো তাকে আরও অনেক পড়তে হবে।

এত পড়তে হবে যে বাইরের অন্যান্য বই পড়বার বড় একটা সময় থাকবে না তার। মহা মুস্কিল—সুকুমার দুঃখিত হ'লো মনে মনে। বেশ ছিল কলেজ খোলবার আগে অবধি—এখন স্বাধীন পড়াশুনো বন্ধ তার। অথচ মাঝে মাঝে পামেলার সংগে দেখা না করলে চলে না—আরও কত কাজ আছে কিন্তু সময় কই? সময় নেই।

সকাল থেকে প্রায় সন্ধ্যে অবধি ক্লাশ—তারপর ছুটে বাড়ী আসা—খাওয়া-দাওয়ার পর পড়াশুনো—কিন্তু সে কতক্ষণই বা! চিঠি লেখার সময় পায় না সুকুমার। কিন্তু তবু যেন খুশীই হলো সে—ভারতীয় হলেও এবার সে ইংরেজের মতোই ব্যস্ত হয়ে উঠতে পেরেছে।

পাসপোর্ট হাতে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায় সুকুমার। সে ছবির সংগে নিজের চেহারা মিলিয়ে দেখে। কী পরিবর্তন হয়েছে তার এই কয়েক মাসে—কত বদলে গেছে চেহারা। মুখে এসেছে দীপ্তি—সমস্ত দেহে কোথাও ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নেই। সিগ্রেটে টান মেরে কিছুক্ষণ আয়নার সামনে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

আর্থার, একদিন রাত্তিরে খাবার সময় সুকুমার বললো, ভালো ইংরেজী শিখতে চাই—

শেখো!

উচ্চারণ ভালো করবো কেমন ক'রে?

হেসে পিটার বললো, খুব সাবধান আমার উচ্চারণ কিন্তু কক্‌নি—

মারজোরী বললো, থাকতে থাকতে সব ঠিক হ'য়ে যাবে সুকুমার—

তুমি তো বেশ ভালো ইংরেজী বল সুকুমার, হেলেন সুপ্-প্লেট এগিয়ে দিল সুকুমারের সামনে। খোসামোদে কে না খুশী হয়—তাই তো হেলেনকে অত ভালো লাগে সুকুমারের।

আমি ইংরেজী আদব-কায়দাও পুরোপুরি শিখতে চাই?

এইবার কথা বললো অড্রি, তা হলে তুমি হতাশ হবে—ওটা আমরা একেবারেই জানি না—

নোয়েল কম কথার লোক। সে শুধু বললো যুদ্ধের পর খুব কম লোক আদব-কায়দা মানে—যারা যুদ্ধে গিয়েছিল তারা তো কোন কিছুরই ধার ধারে না—

তোমরা নাচতে যাও না?

খুব জোরে হেসে হেলেন বললো, সময় কোথায়—ঘরের কাজ ক'রে মেয়ের ঝক্কি ঘাড়ে নিতে হয়—

কিন্তু অড্রি?

পয়সা নেই সুকুমার, বিয়ের আগে অনেক নেচেছি বন্ধু বান্ধবের সংগে, এখন স্বামীর পয়সা জমানো ভালো গৃহিনীর একমাত্র কাজ।

দেশে থাকতে শুনেছিলাম—ডিনারের সংগে তোমরা মদ খাও—

মারজোরী বললো, যারা খুব বড়লোক তারা হয় তো খায়, ঠিক জানি না, আমরা মদ খাই বছরে একবার—বড়দিনের সময়—

সুকুমার চুপ ক'রে ল্যাম্ব্‌রোস্টে ছুরী চালাতে লাগলো। তারপর হঠাৎ মাথা তুলে বললো, আচ্ছা আমার কোন বন্ধু-বান্ধব এখানে দেখা করতে আসতে পারে?

নিশ্চয়ই, আর্থার বললো, আমাদের সকলেরই তো বন্ধু আসে!

সে যদি মাঝে মাঝে চা কিংবা সাপার খায় তার জন্যে আলাদা কত দিতে হবে?

কি বলছো সুকুমার, হেলেন বললো, তোমার বন্ধু—

আর্থার জিজ্ঞেস করলো মুচকি হেসে, বন্ধুটি কে?

সে ইণ্ডিয়ান নয় আর্থার।

পামেলা নাকি?

লজ্জায় মাথা নিচু করলো সুকুমার। যা ভয় করেছিল তাই হয়েছে—এরা সব জানে তা হলে।

তুমি লজ্জা পাচ্ছ কেন? মারজোরী আর্থারকে তাড়া দিল, তুমি কোথায় কি বলতে হয় জানো না আর্থার।

কোন রকমে খাওয়া শেষ ক'রে সুকুমার পালিয়ে এলো নিজের ঘরে।

একটু পরেই আর্থার এসে দরজায় টোকা মারতে মারতে চেঁচাতে লাগলো, হে সুকুমার, হেই সুকুমার, টেলিফোন—গলাটা পামেলার মতো মনে হচ্ছে যেন—

সুকুমারকে আবার নিচে নেমে আসতে হ'লো।

এডওয়ার্ডের বয়েস সতেরো। মা জার্মান বাবা ইংরেজ। দুই জাতের গুণগুলি নিয়ে বেড়ে উঠছে সে—একটি বান্ধবী আছে তার—নাম এলিজাবেথ—এলিজাবেথের বয়স কিন্তু কুড়ি। শনি কিংবা রবিবারে মা'কে চুম্বন ক'রে সতেরো বছরের এডওয়ার্ড যায় কুড়ি বছরের এলিজাবেথের সংগে দেখা করতে। যাবার সময় উরসুলা বেশ জোরে জোরে ছেলেকে বলে, হ্যাভ্ এ নাইস্ টাইম্। এলিজাবেথকে উরসুলাও ভালবাসে খুব। ছেলের সব কিছুই ভালো লাগে তার।

ছেলে ছাড়া আর কে-ই বা আছে তার—তাকে মানুষ করা ছাড়া আর কোন সাধ নেই উরসুলার।

ওর বয়স যখন আট, জানো সুকুমার তখন ওর বাপ আমাকে ছেড়ে যায়।

কেন?

সে এক লম্বা গল্প, শুনবে?

যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে?

না না, আপত্তি থাকবে কেন? কাকেই বা বলি সে গল্প—সিগ্রেট খাবে সুকুমার?

আরে তুমি আমার সিগ্রেট খাও—সুন্দর ছেলে কিন্তু তোমার এড্ওয়ার্ড—

সত্যি ওকে ভালো লাগে তোমার? ওকে বড় ক'রে দিয়েই আমি চোখ বুজবো সুকুমার, আবেশে উরসুলা সত্যি চোখ বোজে।

তারপর সিগ্রেটে দু' একটা টান দিয়েই চোখ জ্বলে ওঠে উরসুলার, অথচ এত বড় বদমাইস ওর বাপ যে ছেলের কথা একবার ভাবলোনা—আমার কথা ভাবা দূরে থাক—এক বার-মেইডকে নিয়ে সব ভুলে গেল, আর জানো সুকুমার, একটু আস্তে বললো উরসুলা, ওর চোখ দু'টো ছিল ঠিক তোমার মতো—

হেসে সুকুমার বললো, তাই নাকি?

দেখ, আমি কিছুই জানতাম না বার-মেইডের সংগে ওর এই নোংরা ব্যাপারের কথা—আমাদের পুরোণো বুড়ো দুধওলা আমাকে বললো, স্বামীকে সামলাও, ভেরোনিকাকে নিয়ে ও পাগল। আইভ্যান্ বললো, ওকে আমি বিয়ে করবো। আমার কথা ভাবলো না, ছেলের কথা ভাবলো না, ভেরোনিকাকে সত্যি ও ভালবাসলো। একদিন ছেড়ে চলে গেল আমাদের—খিল্ খিল্ ক'রে অনেকক্ষণ ধরে হাসলো উরসুলা, তারপর কি হ'লো জানো সুকুমার, ভেরোনিকা গাধাটাকে কলা দেখিয়ে এক ইটালিয়ান হোটেলওয়ালার সংগে চম্পট দিলো—হা-হা-হা—এত বড় নির্লজ্জ যে তখন ও আবার ফিরে এসে বললো, আমি এসেছি—তুমি কি করলে?

দূর ক'রে দিলাম।

স্বামীকে দূর ক'রে দিলে?

স্বামী? মুখ বিকৃত করে বললো উরসুলা, ওর ভাগ্য ভালো যে আমার কাছে তখন পিস্তল ছিলো না—তা হলে সেদিন আমি ওকে গুলি করতাম—উরসুলার মুখ রাগে লাল হয়ে গেল।

এডওয়ার্ডকে মানুষ হ'তে হবে, ওরই জন্যে তো বেঁচে আছি আমি—বড় ভালো ছেলে না সুকুমার—

খুব ভালো ছেলে—ও বড় হবেই—

আহা, তোমার কথা সত্যি হোক্! চোখ বন্ধ করে উরসুলা বোধহয় এড্ওয়ার্ডের ভবিষ্যৎ কল্পনা করছিল।

এ বাড়ীর যে-ঘর এখনও খালি আছে অতিথির জন্যে সে-ঘর আর বেশী দিন খালি থাকবে না। নোয়েলের ফরাসী বন্ধু পলের মাসতুতো বোন ক্লোদ দু' চার দিনের মধ্যেই প্যারিস থেকে এসে পড়বে সে-ঘরে। হাইগেট্ স্কুলে ফরাসী শেখাবে সে—ওখান থেকে চাকরী ঠিক ক'রে আসছে। বছরখানেক লণ্ডনে থাকবে ক্লোদ। বাড়ীর সব ঘরগুলো ভরে যাবে তাহলে। এ বাড়ীতে থেকে সুকুমারের কেবলই দেশের একান্নবর্তী পরিবারের কথা মনে পড়ে।

সাড়ে পাঁচটায় ফ্যারাডে হাউস থেকে বেরিয়ে সাউদাম্পটন রো'র ওপর বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হ'লো সুকুমারকে—এত গাড়ী যায় এ সময় রাস্তা দিয়ে, পার

হওয়া দায়! তারপর ব্লুমস্‌বেরী স্কোয়ারের পাশ দিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে সে এসে পড়লো টটন্‌হ্যাম কোর্ট রোড টিউব ষ্টেশনের কাছে। এইখানে পৌনে ছ'টার সময় আজ আবার দেখা হবে পামেলার সংগে। এত ভীড় এখানে—হাজার হাজার লোক যে যার কাজে যাচ্ছে। পামেলার ছুটি হবে ঠিক সাড়ে পাঁচটায়—সোহো স্কোয়ারে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস্—সেখান থেকে এখানে আসতে বেশী সময় লাগে না—তবে যা ভীড়—টিউবে বেচারীর দম্ বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। বেচারী পামেলা! হলদে জাম্পার আর নীল স্কার্টে এত সুন্দর দেখায় ওকে। ওর রেন্ কোটটিও নীল—পছন্দ আছে পামেলার। টানা টানা চোখ—সব সময় মুখে হাসি—ঠোঁটে অল্প একটু রঙ্—গলায় সরু নেকলেস্—সার্থক নাম ওর —পামেলা সুইট।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো সুকুমার?

এই যে পামেলা!

উঃ যা ভীড়—

চলো এখান থেকে পালাই—চা' খাওয়া যাক আগে—যা তেষ্টা পেয়েছে আমার—

ভীড় ঠেলে সাবধানে ওরা চলতে লাগলো। ওদের দু'জনেরই ভয় পাছে একজন আর একজনকে হারিয়ে ফেলে।

একটা স্ন্যাক্-বারের ভেতরে এসে সুকুমার বললো, কি খাবে কেক্ না স্যান্ডউইচ্?

কিছু না শুধু এক কাপ চা—

কেক খাও একটা—এলে খেটেখুটে—

হেসে পামেলা বললো, আচ্ছা বল একটা স্যান্ডউইচ—

সুকুমার অর্ডার দিলো টু টিজ এন্ড টু স্যান্ডউইচেস প্লিজ—

তারপর দাম চুকিয়ে বললো, চারদিকে ভীড়—বসবার জায়গা নেই—এসো, এই কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি—

কোথায় যাবে আজ পামেলা?

তুমি কি করবে?

আমাদের বাড়ী যাবে?

ও বাবা, অনেক দূর যে, বড় দেরী হয়ে যাবে না?

আচ্ছা, চলো তো এখান থেকে বেরোই তারপর ঠিক করা যাবে কি করবো।

স্ন্যাক্-বার থেকে ওরা আবার টটনহ্যাম্ কোর্ট রোডের ওপর এসে পড়লো। তারপর বাঁ দিকে বেঁকে নিউ অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট ধরে চলতে লাগলো ব্লুমস্‌বেরী স্কোয়ারের দিকে।

শির্‌শির্ ক'রে শেষ শরতের হাওয়া দিচ্ছে। দীর্ঘকালস্থায়ী গোধূলি আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে—শুধু পথিকের পায়ের শব্দ—কণ্ঠস্বর কানে আসছে না। পামেলা খুব আস্তে আস্তে পথ চলছে—প্রত্যেকটি দোকানের সাজানো নানা রকম জিনিস মন দিয়ে দেখতে দেখতে।

চলো পামেলা ব্লুমস্‌বেরী স্কোয়ারে বসে আজ গল্প করি।

চলো।

তারপর আমার সংগে সাপার খাবে?

রোজ রোজ পয়সা নষ্ট করো না সুকুমার—আমি বাড়ী গিয়ে খাবো।

কিন্তু আমি যে বলে এসেছি আজ বাড়ীতে খাবো না।

তা হলে তুমি যা খুশী খেও আমি তোমার সংগে বসে শুধু এক কাপ চা খাবো।

সে কি হয়?

খুব হয়।

ব্লুমস্‌বেরী স্কোয়ারে তখন অল্প অল্প অন্ধকার নামছে। খালি বেঞ্চি খুব কম—ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা বলছে অসংখ্য প্রেমিকের দল। পামেলার সংগে তাদের দিকে তাকিয়ে আজ সুকুমারের হঠাৎ লজ্জা করতে লাগলো। অথচ পামেলার ভ্রূক্ষেপও নেই কোন দিকে।

এই যে সুকুমার, একটা খালি বেঞ্চি দেখতে পেয়ে পামেলা বললো, এসো এখানে বসি—

না না, ওটাতে যাই চলো, স্কোয়ারের মাঝখানে গাছের তলায় আর একটা খালি বেঞ্চি দেখিয়ে সুকুমার এগিয়ে গেল।

অন্ধকার নামলো এবার ব্লুমস্‌বেরী স্কোয়ারে। ওরা দু'জনে পাশাপাশি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো।

শীত লাগছে পামেলা?

একটুও না—তোমার?

আমার শীত লাগে না।

ফেব্রুয়ারী মাস আসুক তারপর দেখা যাবে তোমার দিশি রক্ত কত গরম—

দেখে নিও।

আজ ইচ্ছে করেই ছবি দেখতে কিংবা অন্য কোথাও যায় নি সুকুমার। মাসের শেষ। হাতে টাকা ফুরিয়ে এসেছে প্রায়—এখন একটু সাবধানে চলতে হবে। কিন্তু কিছু লাভ হবে কি তাতে? লন্ডন শহরে রাস্তায় বেরোলেই আট-দশ টাকা বেরিয়ে যায়। আর আজ কোথাও

বসে পামেলার সংগে অনেক কথা বলতে চাচ্ছিল সুকুমার। ওকে খুব ভালো ক'রে জানতে চায় সে। কিন্তু বেচারীর কষ্ট হচ্ছে বোধহয় শীতে। কিন্তু কি কথা বলবে সুকুমার।

আমার সংগে দেখা করতে তোমার ভাল লাগে পামেলা?

তা' না হ'লে দেখা করবো কেন?

আরও বেশী দেখা ক'রো আমার সংগে।

সময় পেলে শুধু তো তোমারই সংগে দেখা করি।

কেন?

আর কেউ নেই আমার দেখা করবার।

তোমার বয়স কত পামেলা?

ঠিক উনিশ—তোমার?

তেইশ।

তোমাকে অনেক ছোট দেখায় কিন্তু।

তোমাকেও।

দূর, সবাই বলে আমাকে অনেক বড় দেখায়।

তারা ভুল বলে।

বড় অহঙ্কার তোমার—ভারতীয়রা এমন অহঙ্কারী হয় বুঝি?

সব ইংরেজ মেয়ে তোমার মতো ভালো হয় বুঝি?

ধন্যবাদ, আজ প্রথম একজন অহঙ্কারী ভারতীয়র মুখে শুনলাম যে আমি ভালো।

আরও ভারতীয় দেখেছ নাকি?

কখনও নয়—তা হ'লে ভারতীয় ছাড়া মিশতাম না।

কেন?

বলবো না তা হ'লে তোমার অহঙ্কার আরও বেড়ে যাবে, বলেই হেসে পামেলা বললো, খুব বুদ্ধি ওদের।

সব ভারতীয়ই সুকুমার নয়—

তার চেয়েও বুদ্ধিমান বুঝি?

বাঃ, আমার সংগে মিশে তোমারও বুদ্ধি খুলছে দেখছি।

তোমার সংগে মিশে মানে? খবরদার আমাকে বোকা ব'লো না।

ওহো ভুলে গিয়েছিলাম, ছেলেবেলায় বাংলায় পড়েছিলাম কানাকে কানা বলো না—খোঁড়াকে খোঁড়া বল না—

উঠে দাঁড়িয়ে রাগের ভান ক'রে পামেলা বললো, আমি চললাম।

তার হাত ধ'রে বসিয়ে দিয়ে সুকুমার বললো, ব'সো খুব বুদ্ধিমতী তুমি—

সুকুমারের গালে বেশ জোরে টোকা মারলো পামেলা।

এইবার একদিন আমাদের বাড়ী চ'লো পামেলা?

মুখ দেখতে চাই না তোমার আর—

বেশ, পেছন ফিরে কথা ব'লো।

বড় দুষ্টু তুমি, পামেলা হাসতে লাগলো।

কবে যাবে বলো?

আসছে শনিবার হবে না—বাবার কয়েকজন বন্ধু আসবে—তার পরের শনিবার—

বেশ—

দাঁড়াও লিখে রাখি—

পামেলা তুমি বড় বেশী ভোলো।

ভুলবো না ব'লেই তো লিখে রাখছি—কিন্তু তোমাকেও একদিন যেতে হবে আমাদের বাড়ী।

তোমার বাবা আমার কথা জানেন?

হ্যাঁ।

শুনে কি বললেন তিনি?

তিনিই তো বললেন তোমাদের খুব বুদ্ধি আর সুন্দর ইংরেজী বল তোমরা।

ঠিক কথাই বলেছেন তিনি—তোমার বাবা কি করেন পামেলা?

ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় চাকরী করেন— কবে যাবে তুমি আমাদের বাড়ী?

আসছে শনিবারের পরের শনিবার তুমি যখন আসবে সেদিন সেটা ঠিক করবো।

না আজই ঠিক করো—আমি লিখে রাখি ডায়রীতে—ধর যে-শনিবার আমি তোমাদের ওখানে যাবো তারপর দিন রবিবারে?

তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে পামেলা।

আরও দুজন এসে বসলো সে বেঞ্চে। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আর তার সংগে এক মহিলা—স্ত্রী কি না কে জানে।

ক্ষিধে পেয়েছে পামেলা?

না—তোমার ক্ষিধে পেলে খেয়ে নাও, আমি তো বলেছি বাড়ী গিয়ে খাবো।

তোমাকে খেতেই হবে আমার সংগে।

না না না।

সুকুমার উঠে দাঁড়িয়ে পামেলার হাত টেনে বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ—ওঠো।

ব্লুমসবেরী স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে ওরা আবার এলো টটনহ্যাম কোর্ট রোডে। লায়নস্ কর্ণার হাউসে সস্তায় বেশ ভালো খাওয়া দেয়।

সে-রাত্তিরে অনেকক্ষণ ঘুম এলো না সুকুমারের। [ক্রমশঃ

ভারত ও সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা

শ্রীআদিত্য প্রসাদ সেনগুপ্ত

সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনার ইতিহাস আলোচনা করলে প্রাচ্যের যে তিনটি দেশের নাম প্রথমেই মনে পড়ে সে তিনটি দেশ হ'ল সিংহল, চীন এবং জাপান। আজ মাঞ্চুরিয়ায় ১৯৪৯ সালের প্রভিশন্যাল লেবার ইন্স্যুরেন্স রেগুলেসন্স্ কার্য্যে পরিণত করা হচ্ছে। রেলপথ, কয়লা খনি, ডাক বিভাগ, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদিতে যাঁরা কাজ কচ্ছেন তাঁদের পক্ষে এই সব রেগুলেসন প্রযোজ্য। রোগ, অক্ষমতা, বার্দ্ধক্য ইত্যাদির জন্য যদি কোন শ্রমিক কাজ করতে না পারেন তাহলে তাঁকে ১৯৪৯ সালের প্রভিশন্যাল লেবার ইন্স্যুরেন্স রেগুলেসন্স্ অনুসারে সাহায্য দেওয়া হয়। জাপানেও নাকি বাধ্যতামূলক accident insurance এবং unemployment insurance-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া ১৯৪৬ সালের ডেইলি লাইফ সিকুরিটি এ্যাক্ট-এর মধ্যেও একটা ব্যাপক সাহায্য পরিকল্পনা সূচিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের ১৯৪৮ সালের The Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act-এর কথা মনে পড়ছে, কয়লা খনিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্য এই আইনটি বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। অবিশ্যি একথা ঠিক যে, এখনও পর্য্যন্ত আমাদের দেশের শ্রমিকদের সামাজিক জীবন সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ হয় নি। এখনও পর্য্যন্ত অশিক্ষা, দারিদ্র্য এবং রোগে জর্জরিত হয়ে এঁরা কর্ম্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলছেন। এঁদের যদি সুস্থ, সবল এবং সক্ষম করে তুলতে হয় তাহলে এমন একটা দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা তৈরী করা দরকার যেটাকে ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী অর্থনৈতিক বিবর্তনের ধাপে ধাপে কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর হবে।

বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে বৃটেন সামাজিক নিরাপত্তার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিচ্ছেন। স্মরণ থাকতে পারে, সোস্যাল ইন্স্যুরেন্স এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে বিবরণী পেশ করবার দায়িত্ব কোয়ালিসন সরকার কর্ত্তৃক স্যার উব্লিউ এইচ বেভারিজের উপর অর্পিত হয়েছিল। স্যার বেভারিজ বিগত ১৯৪২ সালে একটা রিপোর্ট দাখিল করেন, এই রিপোর্টটি জনসাধারণের কাছে বেভারিজ পরিকল্পনা নামে খ্যাত। বিগত ১৯৪৮ সালের ৫ই জুলাই থেকে বৃটেনের শ্রমিক সরকার বেভারিজ পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করে আসছেন। এই সরকারের প্রচেষ্টার ফলে National Insurance Act, 1946, Family Allowances Act 1945 ইত্যাদি আইনে পরিণত হয়েছে। ১৯৪৮ সালের National Assistance Act-এর ফলে যাঁদের বয়স ষোল এবং যাঁদের জীবিকা অর্জ্জনের কোন উপায় নেই তাঁদের আর্থিক সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্যার ডব্লিউ এইচ বেভারিজ বলেন, সামাজিক জীবনের প্রধান শত্রু হ'ল অভাব, ব্যাধি, অজ্ঞতা এবং আলস্য। তাই তিনি এই সব শত্রুকে সরাসরিভাবে আক্রমণ করবার জন্য সুপারিশ করেছেন। অবিশ্যি একথা ঠিক যে, এদের সরাসরিভাবে আক্রমণ করা খুবই কঠিন। তবে মনে হয়, ক্ষতিপূরণ, স্বস্থানে প্রত্যানয়ন এবং নিবারণ এই তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে যদি একটা সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরী করা সম্ভবপর হয় তাহলে সামাজিক জীবনের প্রধান শত্রুগুলোকে সরাসরিভাবে আক্রমণ করা সহজ হবে। ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়ের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখা। স্বস্থানে প্রত্যানয়নের অর্থ হল পুনর্বসতি এবং যাঁরা অক্ষম তাঁদের অক্ষমতা দূর করা। রোগ কিম্বা বেকার অবস্থার ফলে যে উর্ব্বরতা নষ্ট হবার সম্ভাবনা রয়েছে সে সম্ভাবনাকে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে নিবারণ কথাটির অর্থ। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আজ সামাজিক জীবনে যে আপদগ্রস্ততা দেখা যাচ্ছে সেটা বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার অন্যতম কুফল। আজ লক্ষ লক্ষ সক্ষম ব্যক্তি তাঁদের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছেন না। শুধু তাই নয়। যদি তাঁরা কখনও বার্দ্ধক্য কিম্বা আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে অক্ষম হয়ে পড়েন তাহলে তাঁদের আয়ের কোন নিরাপত্তা থাকে না। তাঁদের মৃত্যুর পরে আশ্রিত ব্যক্তিদের ভরণপোষণের জন্য কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয় না। তাই মনে হচ্ছে, প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিককে প্রয়োজনীয় খাদ্য, পরিচ্ছদ এবং আশ্রয় লাভ করবার এমন অধিকার দিতে হবে যার ফলে সে রুগ্ন কিম্বা বৃদ্ধ হলে অসহায় বোধ করবে না, সক্ষম লোকদের শিক্ষা দান করা তার পক্ষে সম্ভবপর হবে, আশ্রিতদের ভাতা দেবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা সহজ হবে, এবং সে নিজে বিশ্রামের সুযোগ লাভ করবে। বেভারিজ পরিকল্পনায় তিনটি জিনিসের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। প্রথম জিনিসটি হল শিশুদের জন্য ভাতা,

দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে জাতীয় স্বাস্থ্য, তৃতীয় জিনিস হল পুনর্বসতি। তাছাড়া পরিকল্পনাটিতে বলা হয়েছে, প্রত্যেকটি লোক যাতে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিস পেতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। তাছাড়া এই মর্ম্মে একটা সুপারিশ করা হয়েছে যে, মিনিষ্ট্রী অব সোস্যাল সিকুরিটির তত্ত্বাবধানে পরিকল্পনাটি কার্য্যে পরিণত করা বাঞ্ছনীয়।

বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ভারতবর্ষে বেভারিজ পরিকল্পনার মত একটা সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। পরিকল্পনাটির উদ্দেশ্য হবে ভারতের সমস্ত অধিবাসীর মঙ্গল সাধিত করা এবং পরিকল্পনাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য মালিক, কর্ম্মচারী এবং সরকারকে বাধ্যতামূলক চাঁদা দিতে হবে। সমস্ত পরিকল্পনাটি কার্য্যে পরিণত করবার দায়িত্ব একজন মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত করা বাঞ্ছনীয় বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করেছেন।

ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, সামাজিক নিরাপত্তার জন্য প্রত্যেকটি সভ্য দেশ আজ সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৪৫ সালের Wagner-Muray-Dingell Bill-এর মধ্যে একটা একীভূত সামাজিক বীমা পরিকল্পনার প্রচেষ্টা রয়েছে। অবিশ্যি একথা ঠিক যে ক্যানাডায় কোন উল্লেখযোগ্য সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরী করা হয় নি। তথাপি একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, সেখানে সমস্ত অধিবাসীকে সামাজিক বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য বিভিন্নপ্রকার পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা হচ্ছে। চিলিতে নাকি আইনের সাহায্যে সকলের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা অনেকটা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পেরুতে যে সব লোকের বয়স ষাটের উপর এবং বাৎসরিক আয় তিন হাজার সোলের নীচে তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া উরুগুয়ে, কিউবা প্রভৃতি দেশে শ্রমিকের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনাগুলোকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। ভারতবর্ষেও স্বাধীনতা লাভের পর থেকে সরকার এবং মালিকদের মনোভাবের মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। সরকারের পরিবর্ত্তিত মনোভাবের সুস্পষ্ট প্রমাণ হল ১৯৪৮ সালের Employers' State Insurance Act. প্রকৃতপক্ষে Employees' Insurance Corporation নামক একটা স্বায়ত্তশাসন-বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান উল্লিখিত আইনে প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটিকে কার্য্যে পরিণত কচ্ছেন। এ ছাড়া আরো দুটো প্রতিষ্ঠান আছে। প্রথম প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি, দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটি হল মেডিক্যাল বেনেফিট কাউন্সিল। মালিক, কর্ম্মচারী, সরকার, যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে চাঁদা এবং সাহায্য নিয়ে Employees' State Insurance Fund গঠন করা হবে। প্রথম পাঁচ বছর কর্পোরেসন সরকারের কাছ থেকে যে গ্র্যাণ্ট পাবেন সে গ্র্যাণ্ট কর্পোরেসনের কার্য্য সম্পাদনের জন্য যে টাকা ব্যয় করা হবে সে টাকার দুই-তৃতীয়াংশের সমান। তাছাড়া ১৯৪৮ সালের আইনের ফলে Employees' Insurance Courts স্থাপিত হয়েছে। এই সব কোর্টের কাজ হল লোকের দাবী সম্বন্ধে রায় দান করা। সুতরাং সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশের সামাজিক নিরাপত্তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।।

এপিঠ আর ওপিঠ

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

গত সংখ্যার পর

কাশী সাহেবের চিত্তে সুখ নাই। আপিসে আসিয়াছে বটে কিন্তু কাজে মন বসিতেছে না। মন যেন ঐ স্ত্রীহীন, খুড়ি—বিপত্নিক চড়ুই পাখীটার মত ফুরুৎ ফুরুৎ করিয়া এ-কার্ণিশ ও-কার্ণিশ করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। ইহারই মধ্যে দু-তিনবার দরোয়ানজীর ঘরে উঁকি মারিয়া আসিয়াছে, বেজায় ভিড়। তদবধি কাশী বড় ভয়ে ভয়ে রহিয়াছে। এ আপিসের সে লেজার-কিপার। আজ লেজার খোলা দূরে থাক্, উপরকার ধূলোও ঝাড়ে নাই। কিন্তু ভয় সে জন্য নয়। স্বাধীনতা যেদিন আসিয়াছে, সেই সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগষ্ট হইতে ভয়, সুঁদোর বনের বাঘের সঙ্গে দেশ-ছাড়া হইয়াছে। ভয়ের আজ বিপরীত বিহার। পে কমিশন, ডিসপিউট্ য্যাক্ট, লেবর ল্ল', ট্রাইব্যুনাল, সর্বোপরি লালঝান্ডা জিন্দাবাদ উপরতলায় ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়ার নাড়ীতে কাঁপুনী ধরাইয়াছে। কাশী সাহেবের ভয় দরোয়ানজীর ব্যাঙ্কের দরজা না বন্ধ হয়। এম্প্লয়িজ ক্রেডিট সোসাইটীর ধারে কাছেও আর ঘেঁসিবার যো নাই—কণ্ঠায় কণ্ঠায় হইয়া আছে। মুদীর দোকান, মাস-কাবার অনেক কাল এদেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে; এখন রেসনের দোকান, ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর? আপিসের বাবু-ভায়াদেরও দাদারও ফলার, ভায়ারও তাহাই। আপদে-বিপদে ভরসা ঐ সবে ধন দরোয়ানজী। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন:—

ঘড়িতে ৫টা বাজে, কাশীপ্রসাদ দাঁড় ছিঁড়িলেন। দরোয়ানজীর ঘরে তখনও ভিড়, কাশীবাবু কুনুই করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। কাতার দড়িবিনির্ম্মিত বংশজ চারপায়াখানির উপরে ভুঁড়িময়দেহ দরোয়ানজী উপবিষ্ট, আহা, যেন প্রয়াগ-তীর্থে তীর্থ-গুরু সুফল বিলি করিতেছেন। কাশী দর্শন মাত্র গোঁফের দুই দিকের দুইটা লেজ মলিয়া উপরের দিকে উঁচাইয়া দিয়া গোঁসাভরে কহিলেন, এ খাঁসি বাবু, তুমি আবার কেন আইলো? সাত মাহিনার সুদ বাকী পড়লো, একঠো দামড়ি ভি আদায় হইলে না। আর কুছুই হামি করতে পারবো না, খাঁসি ঠাকুর, তুমি যাও।

কাশী রাগতভাবে কহিলেন, যাব? ভ্যালা মোর বাপধন রে, যাব্ বললেই হোল? তার চেয়ে বললে না কেন, গরম মসলা মাখিয়ে খাঁসী খাব। ও সব হচ্ছে না হনুমানজী, এক শ'টি টাকা চাই। বড় শালীর বড় মেয়ে সঙ্ঘমিত্রার বিয়ে, শালীপতি-ভাই স্বয়ং নেমন্তন্ন ক'রে গেছেন, পরশু গায়ে হলুদ, তত্ত্ব পাঠাতে হবে।' শালা-শালী-শালির ঝি, বুঝতেই তো পারছো, নইলে তোমাদের এই নধর খাঁসীটিকে শালে কিম্বা শূলে চড়তে হবে। বলি, বাপু রামদাসজী, সেইটে কি ভাল হবে? শালীর জল-জ্যান্ত বোন্ ঘরে আছেন, সে খবর রাখ তো?

দরোয়ানজীর দয়ার শরীর। টাকায় আনা সুদ। বলিলেন, হাঁ হাঁ উ তো জরুর হ্যায়, ঔর জুলুম ভি জবরদস্ত হ্যায়; লেকিন্ হাম তো এক বরিষ মে রিটায়ার করকে চলা যায়েগা, এতনা রুপেয়া পয়সা পড়া রহেগা, আদায় নেহি হোনেসে—

কেয়া! আদায় নেহি হোগা। সীতাদেবীকা বরে তুমি তো চারকাল অমর হ্যায়। তোম মর যানেসে ভি গো-ভূত হো আ কর আ কর হমলোকনকা ঘাড় মট-কায়েগা। জরুর আদায় হো যায় গা।

এ যুক্তিটা দরোয়ানজীর মনে লাগিল। রামজীকা ইচ্ছা, রিটায়ার করিলেও কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার ইচ্ছা তো তাঁহার নাই। এত্তা মজা ঔর কাঁহা মিলেগা? রুপেয়া মে রুপেয়া লাফা ঔর কাঁহা হোগা? লেকিন, দেখিয়ে খাঁসি বাবু, ইসি দফে পাঁচ পয়সা সুদ দেনে পড়ি। উস্‌সে কম হোনেসে বহুৎ লোকসানি পড়তা। দেখিয়ে না বাজার ক্যায়সে টাইট বন্ গয়া। লেকিন, আপকো দরকার গিরা, প'চাশ রুপেয়া লিজিয়ে, পাঁচ পয়সা সুদ আগাম দেনে পড়ি।

কাশী ভাবিলেন চিল পড়িয়াছে, কুটা না লইয়া ছাড়িবে না। ওদিকে, তত্ত্ব না করিয়া নিস্তার নাই, তা ঠিক; তবে এক দমে একশ' টাকা না লাগাইয়া পঞ্চাশ টাকায় সারাই সঙ্গত। হোক কুরুক্ষেত্তর কান্ড। যা রয় সয়, তাই ভাল। ঐ পঞ্চাশ পঞ্চাশটে টাকাই তো জলে। কন্যার বিয়ে, ও হরি; অনেক দেরী, অনেক দেরী। ততদিন বড় মেসো মাসী টেঁসে যাবে। পরকাল থেকে তত্ত্ব পাঠাবে—হয়েছে আর কি। বলিলেন, দেখিয়ে কিস্কিন্ধ্যাজী, ও আপনার কথাও থাক্, আমার [illegible]ও থাক্, মাঝামাঝি রফা হোক্। প'চাত্তর টাকা দিজিয়ে ঔর সুদ সাড়ে চার পয়সা

উসিসে আগাম কাট লিজিয়ে। নেহি নেহি আর বাৎ নেহি, সাগরলংঘনজী, জলদি করিয়ে, লেজার বিলকুস পড়া হ্যায়।

দরোয়ানজী উঠিলেন যেন একটা ভূমিকম্প হইয়া গেল। খট্টাঙ্গ মড় মড় করিল, খড়ম খট্ খট্ খটাং, চাবির গোছা ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ এবং সিন্দুকের চাবি ভুঁড়িঅঙ্গে সংঘর্ষণ—ঝম্ ঝম্—ঝাঁপতাল। ইত্যবসরে এপ্রেন্টিশী দরোয়ানজী সুদ কসিয়া রেডি হইতেছিলেন, দরোয়ানজী হাঁকিলেন, এ রামদেও কেত্তা দেনে পড়ি? তিন মাহিনা সুদ পাকড় লিয়া তো রে?

কাশীপ্রসাদ বাবু রোজই রাত্রি করিয়া বাড়ী ফিরিতেন, আজও তাহাই করিলেন। বাড়ীর সামনে আসিয়া দেখিলেন, কনিষ্ঠ পুত্র নরেশ্বর প্রসাদ রাস্তায় মার্বেল খেলার রিহার্সাল দিতেছে। কাশীপ্রসাদ পকেট হইতে ভুক্তাবশিষ্ট গোটা দুই চীনাবাদাম বাহির করিয়া বলিলেন, নসো, চিনেবাদাম খাবি নাকি রে? খাব, বাবা, খাব, বাবা করিয়া নসো নিকটে আসিতে কাশীপ্রসাদ পুত্রকে দরাজ হস্তে দুটি চীনা বাদাম দিলেন ও একটু দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া গোটা কতক কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সন্তুষ্ট মনে গৃহ প্রবেশ করিলেন। পা টিপিয়া টিপিয়া নিজ কক্ষে ঢুকিয়া অতি সন্তর্পণে সদ্যঃসংগৃহীত নোট কয়খানি সংগোপনে সুরক্ষিত করিয়া "ওরে বিশে, ওমা কঙ্কা, ওগো তোমরা" হাঁকাহাঁকি জুড়িয়া দিলেন।

বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ সর্বাগ্রে আসিয়া কহিলেন, আমার জামা এনেছো বাবা?

"স-ন্-মু-খে শা-ন্-তি-ই-র পা-রা-বা-র" করিতে করিতে কঙ্কার উদয়। "স-ন্-মু-খে"—তুমি তো বেশ লোক বাবা, টাকা রেখে যাও নি, নেত্য-নন্দনের গাড়ী এসে ফিরে গেলো। কাল যেন ভুলো না, বুঝলে? "স-ন্-মু-খে শা-ন্-তি-র পা-রা-বা-র"—কঙ্কা বোধ করি তাহাতে সাঁতার দিতে ছুটিল।

ইত্যবসরে নসো আসিয়া রহস্য ফাঁক করিয়া দিয়াছে। দাদা, দিদি ও জননীর সাক্ষাতে বলিয়াছে বাবার পকেটে ইয়া মস্তো এক ঠোঙ্গা চীনেবাদাম। বাবা আমাকে দিয়েছে। তোরা খাস্ তো—

বৃহৎ পারাবার কোথায় পগার পার হইয়া গেল। কঙ্কাবতী নাকে কাঁদিতে কাঁদিতে পিতৃ সন্নিধানে আসিয়া নসেকে দিলে, বাবা, আর আমি বুঝি কেউ নই করিয়া সটান্ পকেটে হাত পুরিয়া দিল। বিশে গর্জন করিল, আমি দাদা হই, কঙ্কা, মনে থাকে যেন।

রান্নাঘর হইতে খোন্তা হস্তে কাশীশ্বরী ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কঙ্কাবতী পকেটে গড়ের মাঠের বার্তা বিজ্ঞাপিত করিল। নসে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, ধেৎ কানা, ভাল ক'রে দেখ্ না, আছে, আছে, এই তো বাবা আমাকে দিলে।

বিশে জামাটা কঙ্কার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া যথাশাস্ত্র ইনভেস্টিগেট্ করিয়া বলিল, ঘোড়ার ডিম আছে, যে যত পারিস্, নে। এই বলিয়া বিশে জামাটা তালগোল পাকাইয়া নসের দিকে বল্ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, জননী উবাচ, উনুনে ফেলে দিগে যা, উনুনে ফেলে দিগে যা। পোড়ারমুখো মিন্সের নিজে নুকিয়ে নুকিয়ে ভালটা মন্দটা গিলে আসতে গলায় আটকায় না গা? ছেলে মেয়ের জন্যে একদিন এক ছিটে ফোঁটা আনতেও কি হাতে কুড়িকুষ্ঠ হয়?

গাঁজার শীর্ণ, সরু ও লম্বা কলিকার মত কাগজের একটি ঠোঙ্গা চীনা বাদাম তাহার আপিসের টিফিন। দরোয়ানজীর সঙ্গে দাঁও কসাকসি করিবার সময়ে গোটা দুই দানা ধ্বংসপুর হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল, মধ্যাহ্নকালের বিশদ বৃত্তান্ত সংগ্রহের আগ্রহাতিশয্যে দানা দুটি বালক নসের উদার অপব্যয় হইয়া গিয়াছে নতুবা তাহারা পরদিন মধ্যাহ্নকালে যথাশাস্ত্র আত্মোৎসর্গ করিয়া ধন্য হইত। তাহারই আজ বিভ্রাটের হেতু বুঝিয়া নিজের বুদ্ধিহীনতার নিন্দা করিতে করিতে কাশীপ্রসাদ রাত্রির মত মুখে চাবী-কুলুপ লাগাইলেন।

কাশীশ্বরী গৃহকর্ম সমাপনান্তে শুইতে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে ধৈর্যধারণ অসম্ভব হইয়া পড়িল। ঘুম কি ছাই এমনই হাতধরা! কাশীর শিয়রে বিড়ির কৌটা ও দেশলাই বাক্স রক্ষিত ছিল। কাশীশ্বরী ভাবিলেন একটি কাঠি জ্বালিয়া গোঁফের এদিকটায় ধরি না কেন! কিন্তু, পরক্ষণেই মনে পড়িল বালিশ তোষকগুলা তো বাঁচাইতে পারা যাইবে না। সেগুলো পুড়িলে মুখপোড়াকে দিয়া পুনরায় প্রস্তুত করাইতে যে প্রাণান্ত হইতে হইবে। তৈরী তো করিবেই না, হয়ত শীতকালেও মাটিতে শুইয়া মরিবে। কিন্তু, একটা কিছু না করিয়াও থাকা যায় না তো! ভাবিলেন কঙ্কাবতীকে ডাকিয়া আনেন, কঙ্কার নাচ পাইলেও কি পোড়া ঘুম ভাঙিবে না? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও সেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ ভোঁৎ ভোঁৎ ফড়াৎ ফড়াৎ থামাইবার উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া সব রাগ গিয়া পড়িল স্বকীয় পিতামাতার উপর। লোকে বেড়াল ধরিয়া থলেয় পুরিয়া নদীতে নিক্ষেপ করে, পিতামাতা কি তাহাকে

তাহাই করিয়া যান্ নাই? যা থাকে কুলকপালে, একবার মা কালী হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ি না কেন? দূর হ। মড়া মাগী উদ্দাম ষাঁড় হ'লি কি বলে! হ'লোই বা ভাতার, তাই বলে কি কোমরের কাপড় ফেলা যায়?

সামঞ্জস্যের এমন একটি দৃষ্টান্ত দুর্লভ বলিলেও চলে। বাড়ীর মালিক ও কর্তা কাশীবাবু সকাল হইতে এতটা বেলা পর্যন্ত রান্নাঘরের দ্বারের পানে চাহিয়া তীর্থের কাকের মত বসিয়া আছেন—উনুনের ধোঁয়া ধোঁয়াইয়া ধেঁয়াইয়া ফুরাইয়া গেল, সরা হাতা খোন্তার শব্দও ক্রমে নিঃশব্দ হইল, গোয়ালা দুধ দিতে আসিয়া দুগ্ধের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অভ্রান্ত গ্যারাণ্টি মা-কালীর কসম্ খাইয়া সপদদাপে প্রস্থান করিল, অতএব চা আসে-আসে, এমন সময়ে কঙ্কাবতী "বিভব সম্পদ ধন মান কিছু চাই না, শুধু প্রাতে উঠে যেন পাই এক পেয়ালা চা" নাচিয়া বলিয়া গেল, "বাবা, চা ফুরিয়ে গেছে। জল ফুটছে, এক পাউণ্ড চা এনে দাও তো!" কঙ্কা কথা শেষ করিল না, নাচের ফেরতাটা দু' পায়ের দু'টা গোড়ালির গমক বা দমকের সঙ্গে "শুধু এক পেয়ালা চা" বাজাইয়া প্রস্থান করিল।

কাশীবাবু সব বুঝিলেন এবং মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন যে, ইহারা বেড়ায় গাছের ডালে ডালে, জানে না যে আমার বিহার পাতায় পাতায়! কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মা গো, তোমরা ব্যস্ত হয়ো না, মোড়ের দোকান থেকে এক ঢোক চা আমি ধারে খেয়ে নিয়ে বাজার চললুম।

এ যেন সেই বাঁদর-নাচওয়ালার হাত তালির ভেল্কী। যেমন হাত তালি দিয়া বলিল, পাতালপুরীর কেশোবতী রাজকন্যা কই রে! হাড্ডিসার বাচ্ছা বানরটা একটুকরা ছেঁড়া চেলীর ঘোমটা টানিয়া রাজকন্যা বনিয়া নাচ সুরু করিয়া দিল। "লে সখী তো ভর পেয়ালা"—চা হস্তে কঙ্কাবতীর পুনঃ প্রকাশ। কন্যাকে প্রাতর্বাক্যে আশীর্বাদ করিতে গিয়া গলা কাঠ। অথঃ গৃহিনীর আবির্ভাব। তাঁহার আজ যেন প্রথম জামাই-ষষ্ঠি; মনটি হ্যাণ্ডেল।

অমনি কালকের সকালের জন্যে আট গণ্ডায় সেরের দু'সের সন্দেশ আর দশ গণ্ডা সেরের তিন সের ক্ষীরমোহন ব'লে দিয়ে এসো, ৮টার আগে চাই। বড়দি' আটটায় গড়ী পাঠাবেন।

সে আমার বলা আছে। বলা আছে। চার সের, চার সের।

কঙ্কা, আর এক বাটি চা এনে দাও তো মা! একটু বেশী ক'রে চিনি দিও।

তা হ্যাঁগা, কাপড়, জামা, সেণ্ট, আলতাগুলো কি ওবেলা আনবে?

কঙ্কাবতী নকীব ফুকরাইল, বাবাকে তো, আনছি মা! আমার টাকাটা চেয়ে রেখো। দোকুর আনাআনি টানাটানির দরকারটা কি? গাড়ী থামিয়ে মেওয়ালাল আখরোটলালের দোকান থেকে অয়েলম্যান স্টোর নিয়ে গেলেই তো হবে।

চা থাক্, কঙ্কা, চা থাক্।

কঙ্কাবতী বলিল, কেন মা? আমি যে ছেঁকে ফেলেছি মা! "ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসি নে......"

না না, তুই রাখ। আমি আসছি।

তা এসো বাপু, আমি ততক্ষণ এ বাটীটা খাই, কঙ্কা বলিল, এবং "আমারও স্বভাব এই তোমা বই আর জানি নে" গাহিয়া পেয়ালা-হস্ত অমলা শঙ্কর হইয়া পড়িল।

ভীমরথী আর কাকে বলে? বেণারসী কাপড়, পাঁচখানা দেখতে হবে না? বাছতে হবে না? দর করতে হবে না? গাড়ী থামিয়ে যা-হয় একখানা নিলেই হবে, কেমন? সেই যে বলে না—কোনকালে নেই-ক' চাষ, ধানকে বলে মুতো ঘাস।

ভেব না, ভেব না, তাদের বলা আছে, তারা বাণ্ডিল বাণ্ডিল বার ক'রে রেখে দেবে, পছন্দ না হয় পাশের দোকান থেকে আরও দশটা বাণ্ডিল আনিয়ে দেখাবে, যেখানা পছন্দ, সেইখানা নিও। তোমরা ক'টার সময় যাবে, সেইটে ঠিক ক'রে ব'লে দাও, তাহ'লেই হবে। দামের জন্যে আটকাবে না।

আমাদের যেতে—ধরো ৮টায় গাড়ী আসবে, আমরা সকালেই তৈরী থাকবো, সাড়ে ৮টায় দোকানে, বড় জোর ৯টা, তার বেশী দেরী হবে না।

কুছ পরোয়া নেই, তারা ১২টা পর্য্যন্ত দোকান খুলে ব'সে থাকবে বলেছে।

ঠিক তো? তোমার তো যত অখদ্যে অবদ্যে দোকান, হয়ত অত সকালে খুলবেই না!

মেওয়ালাল অখদ্যে অবদ্যে? ওর চেয়ে বড় দোকান কলকাতায় আছে কেউ বলুক দিকিন।

গৃহিনী কতকটা শান্ত হইয়া বলিলেন, তা ভাল বেণারসী থাকে যদি, কঙ্কুর জন্যে একখানা নোব তা আমি ব'লে রাখছি। তুমি তো আর নগদ দাম দিচ্ছ না। কঙ্কু

অনেকদিন থেকে বেণারসী বেণারসী করে। একখানি দিতেই হবে।

কর্তা আজ যেন কল্পতরু। কহিলেন, তা হবে, তা হবে কিন্তু তোমরা যেন দেরী করো না।

ওমা, দেরী করবো কেন আবার। আমরা গেলে তবে গায়ে হলুদ হবে। আর তুমিও তো আমাদের সঙ্গে যাবে, দেরী দেখলে তাড়া দিও।—এই বলিয়া গৃহিনী রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে হাঁকিলেন, কঙ্কু, আলু ক'টা ভাতের হাঁড়ীতে ফেলে দে মা, তোর ইয়ে ভাল বাসে।—পরে এদিকে ফিরিয়া—সেই সবই তো করলে। কাল ওনাদের সঙ্গে কথাটথা ক'য়ে গেলে আমার মুখ থাকতো। বড় জামাইবাবু কি একটা যে-সে লোক! শুনি আপিসের বড় সাহেব গুরুঠাকুরের মত মান্যি করে। কি রকম ক'রে যে চোরের মত পালিয়ে গেলে, লজ্জায় আমি আর মুখ তুলতে পারি নে।

কাল সব শোধ বোধ হয়ে যাবে, কিছু ভাবতে হবে না।

হ্যাঁ গো!—গলাটা প্রথম জামাইষষ্ঠির রাত্রের মতন।

কিগো? কর্তার কণ্ঠও ডিটো—ডিটো!

বলছি কি, জান, কাল তো বাজার টাজার রান্না বান্না নেই, কালকের বাজারের টাকাটা আমাকে দাও না, আমার একটু কাজ আছে। হ্যাঁ গা, দেবে?

আহা, কামধেনু আর কারে কয়? কর্তা তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া বলিলেন, বেশ, সকালে দোব।

ঠিক তো? —সেই রাত্রিই বটে, তবে রাত কিছু বেশী হইয়াছে।

আমার চিৎ করলেও ডোঙ্গা, উপুড় করলেও—। যেন তেন প্রকারেণ ধনঃক্ষয় আমার অদেষ্টের ফের। দোব, আর কি করবো।

তথায় দণ্ডায়মানা কাশীশ্বরী, অল্পদূরে বিধবা ভগিনী, অন্তরালে কাশী-জননী প্রায় এক সঙ্গে একই সময়ে একই দুশ্চিন্তাকবলিত হইয়া সমূহ পীড়া বোধ করিতেছিলেন—কাশীর শরীরটা কি তবে খুবই খারাপ হইয়া পড়িয়াছে? একটি ফুটা পয়সার ব্যাপারেও কাশীর সম্মতি আদায় করিতে রক্তক্ষরণ হয়, সেই কাশী কাল হইতে ছোটখাট দাতা কর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, এ কাণ্ডকারখানাটা কি? তবে কি কাশী মোটা টাকার লাইফ ইন্সিওর করিয়া এই 'যা থাকে কুল কপালে' হইয়া উঠিল! মা'র মন, সদাই কু দেখে। বড় ভয় পাইলেন এবং অবিলম্বে ডাক্তার ডাকা যে বড় দরকার, তাহাও বুঝিলেন; কিন্তু কথাটা কাহাকে বলিবেন! এমন বৌ নয়, এখনই রণরঙ্গিচণ্ডী হইয়া ধেই ধেই নাচিবে।

গিন্নী কিন্তু ইহার ভিতরেও কুবুদ্ধি দেখিতেছিলেন। কাশী বলিলেন, আমি কিন্তু দু'টো তিনটের পর আর বিয়ে-বাড়ীতে থাকতে পারবো না, আমাকে আপিস যেতে হবে। রাত্রে ফিরে, ভাতে পোড়া ভাত নামিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়বো'খন, তোমরা এলে দরজা খুলে দোব। গৃহিনী হুঙ্কারিয়া কহিলেন, এর নাম মুখপোড়া ভাল হয়েছে! দায় পড়েছে ওর ভাল হ'বার জন্যে। এ সব কুবুদ্ধি নয়? দেইজিখাটা কথা নয়? শালীর মেয়ে, সে তো নিজেরই মেয়ে, তার হোল রাত্রে বিয়ে, রাত্রে খাওয়ান দাওয়ান, রাত্রে সব, উনি সেই রাত্রেই সেখানে থাকবেন না, আপিস করবেন। ওঃ কি আমার আপিস রে! সকালে যাবেন, দেখা শুনো করবেন, ফোঁপর দালালী করবেন, আমাদের সাতপুরুষের মাথা কিনবেন আর বিয়ের সময়, যখন দরকার, তখন উনি কিনা আপিস করবেন! ভ্যালা মোর আপিস রে! তোমার আপিস পরকালে সাক্ষী দেবে বুঝি? বলিয়া সন্দিগ্ধ নয়নে বারম্বার আকাশের পানে অর্থাৎ অদৃশ্য পরকালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

আচ্ছা, আচ্ছা, সে কালকের কথা কাল হবে। যাচ্ছি তো সকালে তোমাদের সঙ্গে তারপরে যা হয় করা যাবে। বলিয়া মাছের ন্যাকড়া হস্তে বাজারের উদ্দেশ্যে ধাবমান হইলেন। গৃহিনী ছুটিতে ছুটিতে প্রায় রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া, এক গাল হাসিয়া বলিলেন, ওগো, দেখ দেখ, সন্দেশে গোলাপের পাতা আর ক্ষীরমোহনে বেশী ক'রে আতর দিয়ে দিতে বলো। বুঝলে; ভুলো না যেন।

কাশীবাবুর উত্তর শোনা গেল না বটে তবে কাশীশ্বরীর চোখ-মুখ নাক-কাণ চলন-বলন দেখিয়া ভুলিবার কোন সম্ভাবনাই নাই তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। অকস্মাৎ তাঁহার বয়স যেন চল্লিশ বৎসর কমিয়া গিয়া কঙ্কাবতী ও তিনি দু'টি পিঠোপিঠি ভগ্নী হইয়া পড়িয়াছেন। কঙ্কার তখনকার পোজ্‌টাও তাহাই নির্দেশিত করিতেছে। কঙ্কা গাহিতেছে—"নাচে রে, নাচে বে, মেঘোদয়ে ময়ূরের মত প্রাণ মোর নাচে রে।"

কিন্তু,

বেলা ৮টা বাজিল, ৯টা বাজিল, ১০টা বাজিল, গাড়ীর দেখা নাই। কাশী সাহেবের যেন বয়লার ফাটিয়াছে, বাড়ী তোলপাড়, একবার ঘর একবার রাস্তা দুরমুস—ছুটাছুটি করিতেছেন আর ছিট্‌কাইয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছেন, বরাতের ফের দেখ দিকিন একবার। দশটাকা সের সন্দেশ চার সের চল্লিশ টাকা, ন'টাকা সের ক্ষীরমোহন চার সের ছত্রিশ টাকা, আমার করকরে এক কোঁচড় টাকা ন দেবায়

ন ধর্ম্মায়—একেবারে জলে গেল গা! তাই কি ছাই ঠিকা-নাটা ব'লে গেল যে, লোক দিয়ে পাঠিয়ে দোব। ছিঃ ছিঃ মেওয়ালাল, খোবানীলাল, ডালিমলাল, আখরোটলালই বা কি মনে করলে। রোববার, শুধু আমার খাতিরে দোকান খুলে ব'সে রইলো। ভাবলে আচ্ছা জোচ্চোর যা হোক্। ওদের কাছে মুখ দেখাবো কি ক'রে আমি শুধু তাই ভাবছি।

কাশী যত দাপায়, কাশীশ্বরী তত মিঁউ মিঁউ করেন। হে বড়দিদি, হে বড় জামাইবাবু, হে মা কালী, হে মা দুর্গা, হে মা বিপদবারিণী, হে মা মুখরক্ষেকারিণী! কিন্তু দেবতারা না-হয় হাবা কালা, কথা শোনে না, বড়দিদি বড় জামাইবাবুর এ কি কাণ্ড! গায়ে-হলুদ যাক্, বিয়েও যাক্, এক সাঁজ ভোজও যাক্ কিন্তু এ বাড়ীর এই লোক-টার খোঁটা তো খাইবার নয়। নলরাজার ছিদ্র পাইয়াছে, আর কি কলির ছাড়ান্ ছোড়ন্ আছে?

বাজার হয় নাই, উনানে আগুন পড়ে নাই, গোয়ালাকে আগের দিন বারণ করা হইয়াছিল দুধ আসে নাই। আবার গোদের উপর বিষফোঁড়া, বাজারের টাকাটা অগ্রিম লইয়া গৃহিনী কর্তাকে লুকাইয়া সিলভারের সিঁদুর-কৌটা কিনিয়া ফেলিয়াছেন সংঘমিত্রাকে উপঢৌকন দিবেন। তার উপর ধাগুড়ী কঙ্কাবতীর নাচ-গান অবিরাম চলিতেছে— "আসি ব'লে সে গেছে আমার, আর তো এলো না ফিরে।" গৃহিনীর মাথায় কে যেন আগুনের সরা চাপাইয়া দিয়াছে।

বেলা ২টা বাজিতে কাশীসাহেবকে আর ধরিয়া রাখা গেল না তিনি পোষাক আষাক আঁটিয়া আপিস যাত্রা করিলেন। গৃহিনীর পায়ের কাছে একটা টাকা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, জোচ্চোরের বাড়ীর ফলার, আমি জানি কিনা। দু'বেলা নেমন্তন্ন! নাও, খুব হয়েছে, আটা আনাও, আলুর জলে ভেজাও, বড়দিদি বড় জামাইবাবুর নাম ক'রে ক'রে সরুচাকলী চিবোও ব'সে ব'সে। ভাল ক'রে চিবিয়ো, ডাক্তার বি-সি রায়ের ফরমুলো নাড়ীশুদ্ধ হজম।

গৃহিনীর মুখে কে যেন তালাচাবি আঁটিয়া দিয়াছে, টুঁ শব্দটিও নাই। মহিষমর্দিনী মুষিকনন্দিনী। মা দুর্গার ঘোটকে আগমন পঞ্জিকায় লেখা ছিল, পথিমধ্যে ঘোড়ার ডাক ফেল্ পড়ায় দশভুজা ছইওলা গরুর গাড়ীর ভিতরে গুটিশুটি অকষ্টবদ্ধাবস্থায় বসিয়া আছেন।

কাশী বাবুকে কিছুতেই ঠেকান গেল না। গজ গজ গস্ গস্ করিতে করিতে, লোকসানের লিস্টি আওড়াইতে আওড়াইতে আপিস চলিয়া গেলেন; কাশীশ্বরী তোলা উনুনে আগুন দিয়া ভাতে ভাত রাঁধিয়া দিতে চাহিয়া-ছিলেন, কাশী বাবুর সর্বাঙ্গে ঘা, শুকাইতে বহুদিন লাগিবে, গুণগারের কড়ি অনেক দিন ধরিয়া গুণিতে হইবে, কাষ্ঠ লৌকিকতায় গা আরও জ্বলিয়া গেল, বলিয়া গেলেন, থাক্ থাক্, খুব হয়েছে। আর আদিখ্যেতা করতে হবে না।—জোরে জোরে পা ফেলিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার জ্বালা, তিনি জানেন!

গৃহিনী শয্যা গ্রহণ করিলেন। বিধবা ননদিনী ভাত রাঁধিয়া ছেলেপুলেকে খাওয়াইয়া বৌকে ডাকাডাকি করি-লেন, বহু প্রবোধ বাক্য শুনাইলেন; শাশুড়ী আসিয়া অনেক আশ্বাস দিলেন এবং বিয়েটা আদৌ হইল কিনা ভাবিয়া কুলকিনারা না পাইয়া চোখের জল যখন পড়ি পড়ি হইয়া আসিয়াছে তখন কঙ্কাবতী ডান্স করিতে করিতে আসিয়া সংবাদ দিল, মাঁ, গাড়ী এসেছে, বর ক'নেকে আশীর্বাদ করতে মাসীমা তোমাকে ডেকেছেন।

তুই আর জ্বালাস্ নে বাছা, আমার জ্বর হয়েছে কিছু ভাল লাগছে না। গাড়ী যেতে বলে দে।

ড্রাইভার বাবাজীবন দ্বারপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, আজ্ঞে,-ও পাড়াটায় রেসনিঙের বড্ড কড়াক্কড়ি কিনা তাই বাবু বস্তির আয়োজনটা বন্ধ ক'রে দিলেন! নইলে নাকি বর ক'নে বরযাত্রী কন্যেযাত্রী বরকর্ত্তা কন্যেকর্ত্তা সব-বাইকার জেল হ'তে পারতো। এখন বিয়ে থা চুকে গেছে, বর ক'নে বাসরে ঢুকেছে, মা বললেন আপনাদের নিয়ে যেতে। খাওয়া দাওয়া যদি না চুকে থাকে, সেরে নিন. আমি গাড়ীতে বস্ছি। আশীর্ব্বাদে যত লোক হোক্ না, কেউ কিছু বলবে না। একটু তাড়াতাড়ি সেরে নিন মাসীমা, আরও দু'তিন যায়গার সোয়ারী তুলতে হবে।

গৃহিনী জবাব দিবেন কিরূপে? বিষম জ্বর, অঘোর অচৈতন্য, কম্বলের ভিতর হইতে মোটর বাসের উইণ্ড পাপের মত ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে গ্যাস বাহির হইতেছে। অনেক রাত্রে কাশীপ্রসাদ আসিয়া কম্বলটা একটু ফাঁক করিয়া দিয়া শুইয়া পড়িলেন। "আহা, অত চাপা দেয়? দম বন্ধ হয়ে যাবে যে!"

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-স্মরণে

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত

একশত দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন; বর্ত্তমান ১৯৫২ সালের ২৩শে এপ্রিল তাঁহার মৃত্যুর একশত দুই বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র নানাভাবে তাঁহার মৃত্যু-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বিগত শত বর্ষ ধরিয়া এই ইংরেজ কবির কাব্য ভারতবাসীকে নানাভাবে উদ্বোধিত করিয়াছে; বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন ব্যতীতও এই কবির শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহ আমাদিগের চিন্তার খোরাক জোগাইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের সহিত ভারতের প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের অবসান হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে এই দুই দেশের সাংস্কৃতিক বন্ধন ছিন্ন হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাহার কাব্য ও সাহিত্যে—তাহার সেক্সপীয়ার, মিল্টন ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের অবদানে; এই অবদান আমরা চিরদিন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিব। আবার, এই কবিদিগের মধ্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সঙ্গে যেন কোন্‌খানে ভারতীয় মনের একটা মিল রহিয়াছে। তাই তাঁহার মৃত্যু-বার্ষিকী দিবস উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার কাব্যের সামান্য একটুখানি আলোচনা করিতেছি ও তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন; ১৭৭০ হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি বাঁচিয়াছিলেন। এই আশী বৎসরের মধ্যে প্রায় ৬০ বৎসর তিনি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনার কাল মাত্র দশ বৎসর—মোটামুটি ১৭৯৮ হইতে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই দশ বৎসর কালকে তাঁহার কবি-জীবনের সুবর্ণযুগ বলা যাইতে পারে; ইহার পূর্ব্বে এবং পরে, বিশেষতঃ পরে, তিনি বহু কবিতা রচনা করিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক কবিতাই তাঁহার কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। তাই ম্যাথু আর্ণল্ড দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্য-সমষ্টি poetical baggage রূপ বহু নিকৃষ্ট কবিতার ভারে প্রপীড়িত; তাঁহার কাব্যের প্রকৃত রসাস্বাদন করিতে হইলে তাঁহাকে এই poetical baggage-এর ভার হইতে মুক্ত করিতে হইবে। তাহার পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহার হীরকদ্যুতিতে বিশ্ব-কাব্যভাণ্ডার উদ্ভাসিত হইবে।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির কবি—ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তিনি মানব ও ইতর প্রাণী সম্বন্ধেও কবিতা লিখিয়াছেন; কিন্তু ইহাদিগকে তিনি প্রকৃতিরই অঙ্গরূপে গণ্য করিতেন। তাঁহার নিকট প্রকৃতি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন জড়বস্তুর সমষ্টি মাত্র নয়; ইহা প্রাণবান; বিভিন্ন আপাতো-বিচ্ছিন্ন জড়বস্তুর মধ্য দিয়া একই প্রাণ, একই আত্মা প্রবাহিত। আবার, এই আত্মাই মানব-মনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া প্রকৃতি ও মানব উভয়কে একই সূত্রে বিধৃত করিয়া রহিয়াছে। ইহা যেন কতকটা উপনিষদ্‌ বর্ণিত "সর্ব্বভূতান্তরাত্মা"; সমুদ্রের-পর্ব্বতে, আকাশে-বাতাসে, কাননে-প্রান্তরে, সূর্য্যাস্তের আলোকশোভায় এবং মানব হৃদয়ে সর্ব্বত্র ইহার বাস।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ শৈশব হইতেই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন এবং প্রকৃতির প্রভাবে তাঁহার হৃদয়-মন গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রকৃতি তাঁহার উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ Prelude কাব্যে এবং সংক্ষিপ্ত বর্ণনা Tinteru Abbey কবিতায় পাওয়া যায়। এই বিবরণ হইতে কবির উপর প্রকৃতির প্রভাবের তিনটি স্তর বা যুগ বিশ্লেষণ করা যায়। প্রথম যুগে দেখা যায় যে, বালক কবি আপনমনে নিজ ক্রীড়া-কৌতুকে মগ্ন হইয়া প্রকৃতির মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; কখনও বরফের উপর স্কেট খেলিতেছেন, কখনও নদীতে নৌকা বাহিতেছেন, আবার কখনও পাহাড়ে চড়িতেছেন। এই সময়ে তাঁহার নিকট এই ক্রীড়া-কৌতুকগুলিই প্রধান; প্রকৃতি অপ্রধান—"Secondary to my own pursuits"; কিন্তু কবি অপ্রধান মনে করিলেও প্রকৃতি এই সময় হইতেই অতি সঙ্গোপনে আপন কাজ করিয়া যাইতেছে এবং কবির মনে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তাঁহার ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যেই ক্ষণে ক্ষণে কবি যেন প্রকৃতির ভিতরে কী এক অজানা, অচেনা প্রাণশক্তির আবির্ভাব অনুভব করিতেছেন এবং তাঁহার হৃদয়-মন কী এক অস্পষ্ট ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতেছে। বাল্যকালের এই অবস্থা বর্ণনা করিয়া কবি বলিতেছেন—"I grew up fostered alike by beauty and by fear"; প্রকৃতির সৌন্দর্য্য

এবং প্রকৃতি হইতে সঞ্জাত এক ভয়মিশ্রিত বিস্ময়ের দ্বারা পুষ্ট হইয়া কবি বাড়িয়া উঠিতেছিলেন।

দ্বিতীয় যুগে দেখা যায় যে, এখন আর প্রকৃতি অপ্রধানরূপে কবির মনের উপর কাজ করিতেছে না। প্রথম যুগে যাহা ছিল অপ্রধান, তাহাই এখন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের জন্য কবি নিজেই এখন খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন; স্বীয় অন্তরে প্রকৃতির প্রতি গভীর ও তীব্র ভালবাসা অনুভব করিতেছেন। প্রকৃতিরাণী তাহার অনুপম সৌন্দর্য্য লইয়া কবির হৃদয়-দ্বারে উপস্থিত; তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় দিয়া কবি এই সৌন্দর্য্য পান করিতেছেন এবং প্রকৃতির সহিত তাঁহার হৃদয়ের যোগ অনুভব করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে যাহা কিছু দেখিতেছেন তাহাই তাঁহার প্রিয়; শান্ত স্বচ্ছ সরোবরে আকাশের বর্ণরাজির ন্যায় তাঁহার হৃদয়মুকুরে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরাশি প্রতিবিম্বিত হইতেছে; বাতাসের স্পর্শে বাঁশীর ন্যায় প্রকৃতির স্পর্শে তাঁহার হৃদয়-বীণা বাজিয়া উঠিতেছে। এই যুগে তাঁহার মনের অবস্থা যে ঠিক কিরূপ ছিল কবি তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না; স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের ন্যায় প্রকৃতির তখন তাঁহার উপর অখণ্ড প্রভুত্ব; তিনি যাহা কিছু দেখিতেছেন বা যাহা কিছু শুনিতেছেন সবই যেন তাঁহাকে পাগলের মত নাচাইতেছে। জলপ্রপাতের গর্জ্জনশব্দ তাঁহাকে প্রবল আবেগে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে: তিনি ক্ষুধিতের ন্যায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন কোথায় আছে সুউচ্চ পর্ব্বতমালা অথবা বনসমাচ্ছন্ন অন্ধকার উপত্যকাভূমি—ইহাদের রূপ ও রং তাঁহার ক্ষুধা তৃপ্ত করিতেছে। চোখের দেখা এবং কাণের শোনা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিই তাঁহাকে আনন্দ দিতেছে; এখন পর্য্যন্ত ইহার অধিক আর কিছু দরকার নাই; প্রকৃতির সংস্পর্শে কবির ধ্যানদৃষ্টি এখনও খুলিয়া যায় নাই। কবির জীবনে ইহা ছিল এক হর্ষোন্মত্ততার—"aching joys and dizzy raptures"-এর যুগ।

ইহার পরে তৃতীয় যুগ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মানস-জীবন কিছুকাল এক গভীর নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয়। তখন ইউরোপে ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কবি পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন; দারুণ বিপ্লবের মধ্যে স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়া তিনি কিছুদিন ফ্রান্সে যাইয়া রহিলেন এবং রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কিন্তু কিছুকাল মধ্যেই বাস্তবের রূঢ় আঘাতে কবির সুখ-স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল এবং তাঁহার অন্তর গভীর নৈরাশ্য ও বিষাদে পূর্ণ হইল। তাঁহার মানস-জীবনে এক সঙ্কটকাল উপস্থিত হইল; কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইলেন। Dorothy-র নিকট তাঁহার ঋণ কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে স্বীকার করিয়া কবি বলিয়াছেন—"She gave me eyes, she gave me ears."

এইবারে কবির জীবনে প্রকৃতির সহিত পরিচয়ের তৃতীয় যুগ আরম্ভ হইল। প্রকৃতির সংস্পর্শে এখন আর শুধু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি নহে—শুধু চক্ষু ও কর্ণের আনন্দ নহে; তাহার সহিত যুক্ত হইল মনের আনন্দ, চিন্তার আনন্দ। চক্ষু ও কর্ণের ভিতর দিয়া প্রকৃতি তাহার মর্ম্মে প্রবেশ করিল এবং তাঁহার ধ্যানদৃষ্টি খুলিয়া গেল। এখন তিনি প্রকৃতির মধ্যে যাহা দেখিলেন তাহার অর্দ্ধেক প্রাকৃত, বাস্তব এবং অপরার্দ্ধ তাঁহার মানসী সৃষ্টি। প্রকৃতির প্রশান্তির মধ্যে তিনি দেখিতে পাইলেন মানবজীবনের শোক-দুঃখের ছায়া; প্রকৃতির সঙ্গীতের মধ্যে তিনি শুনিতে পাইলেন এক করুণ, বিষণ্ণ সুর। প্রকৃতির প্রভাবে তাঁহার চিত্তবৃত্তি পরিমার্জ্জিত ও সংযমিত হইল এবং উচ্চ চিন্তা ও উচ্চভাবে তাঁহার হৃদয় অনুপ্রাণিত হইল। আর তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন যে, প্রকৃতি প্রাণ-হীন জড়বস্তুনিচয়ের সমষ্টিমাত্র নহে; ইহার মধ্য দিয়া একটি প্রাণ, একটি আত্মা প্রবাহিত। জলে-স্থলে, আকাশের নীলিমায়, মেঘে-বৃষ্টিতে, বৃক্ষে-লতায়, সাগরে-পর্ব্বতে একই আত্মা বিরাজিত; আবার এই আত্মাই মানবের মনে, পশু-পক্ষীর প্রাণে সর্ব্বত্র প্রবাহিত। নিখিল বিশ্বসৃষ্টি একই ঐক্যসূত্রে গ্রথিত; এই বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে স্বীয় অন্তরের যোগ উপলব্ধি করিতে পারিলেই মানুষ শান্তি ও মুক্তি লাভ করিবে। আপনার চিত্ত বৃত্তিকে সমাহিত করিয়া ধ্যানের দ্বারা প্রকৃতির সহিত মানবাত্মার যোগ উপলব্ধি করিতে হইবে। এইরূপে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আত্মোপলব্ধির এক নূতন পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন; তিনি দেখাইলেন যে, উপাসনা দ্বারা যেমন সাধকের হৃদয়ে ভগবানের উপলব্ধি জন্মে, প্রেমের দ্বারা যেমন প্রেমিকের অন্তরে পরমাত্মার উপলব্ধি হয়, প্রকৃতির ধ্যানের দ্বারাও সেইরূপ মানবের মনে ইন্দ্রিয়াতীত লোকের উপলব্ধি হইতে পারে। প্রকৃতির নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে তাহার সহিত আমাদের অন্তরের যোগ আমরা অনুভব করিতে পারিব এবং এই অনুভূতির কালে এমন এক অদৃশ্য শক্তি আমাদের অধিকার করিয়া বসিবে যে, আমাদের মনে হইবে যেন

সমগ্র দৃশ্যমান জগৎ কোথায় দূরে বিলীন হইয়া গিয়াছে, আমাদের দেহ যেন একেবারে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, রহিয়াছে শুধু আমাদের আত্মা এবং এই আত্মার সাহায্যে আমরা বিশ্বসৃষ্টির অন্তরতম সত্যের সম্মুখীন হইয়াছি। এই আত্মদর্শনের অনুভূতি পরম আনন্দময়—সকল বিরোধের অবসানে এক চরম ঐক্যের আস্বাদন! এই সময় হইতে প্রকৃতি কবির জীবনে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। কবি অনুভব করিতে লাগিলেন যে, প্রকৃতির কাজ শুধু আনন্দ দান নহে—নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দানও বটে। প্রকৃতি তাঁহার পবিত্রতম চিন্তা-সমূহের আশ্রয়, তাঁহার হৃদয়ের ধাত্রী ও পরিচালক এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের অন্তরাত্মা।

উপরে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের জীবনে প্রকৃতির প্রভাবের যে তিনটি যুগের কথা বলা হইল তাহার শেষ যুগটিতেই প্রকৃতপক্ষে কবির কাব্য-রচনা আরম্ভ হয় এবং এই যুগে উপনীত হইতে কবিকে বেশী দিন অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় নাই। তাঁহার জীবনের বাল্যকালেই শেষ হইয়াছে প্রথম যুগ; দ্বিতীয় যুগ চলিয়াছে বাইশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত; তাহার পর তিন বৎসর চলে তাঁহার মানস-জীবনের সঙ্কটকাল এবং আনুমানিক পঁচিশ বৎসর বয়সে তৃতীয় যুগের আরম্ভ হয়; এই যুগ কবির সারাজীবন স্থায়ী হইয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির কবি। তৃতীয় যুগে যে দৃষ্টিতে কবি প্রকৃতিকে দেখিতেন, সেই দৃষ্টি লইয়াই তাঁহার প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতাগুলি রচিত হইয়াছে। প্রকৃতি প্রাণবান্ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক-শিক্ষক—এই মূল কথাটিই কবি নানাভাবে তাঁহার কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। কবি নিজেকে প্রকৃতির পূজারী বলিয়া মনে করিতেন, এবং শ্রদ্ধানম্রচিত্তে প্রকৃতির বিভিন্ন দানের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতি আনন্দময় এবং চারিদিকে আনন্দের আলো বিকিরণ করিতেছে—"joy in widest commonalty spread"; এই আনন্দের ভোজে আমাদের নিমন্ত্রণ; ইহাকে গ্রহণ করিবার জন্য আমাদের হৃদয় প্রস্তুত রাখিতে হইবে; যে তাহা পারিবে না সে নিতান্তই হতভাগ্য! প্রকৃতির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে যাহা অতি সাধারণ বলিয়া মনে হয়, যাহাকে হয়ত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে করিয়া আমরা অবজ্ঞা করি, তাহাও অসাধারণ মহিমায় মহিমান্বিত। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র যে ফুলটি ফুটিয়া ক্ষণকাল পরে ঝরিয়া পড়ে তাহাও গভীর ভাব উদ্রেক করিয়া কবির মন আন্দোলিত করে; কোকিলের গান শুনিয়া তাঁহার মনে হয় যেন এই পৃথিবী একটি পরীস্থানে রূপান্তরিত হইয়াছে; রামধনুর বর্ণশোভা তাহাকে জন্মপূর্ব্বের অভি-জ্ঞতা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

প্রকৃতি-দত্ত শিক্ষার কথা কবি বহু কবিতায় বলিয়া-ছেন। বই পড়িয়া আমরা প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে পারি না; তাহাতে কতগুলি বাঁধা বুলি শিখি মাত্র। প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রকৃতির নিকট যাইতে হইবে; আমাদের হৃদয় মন প্রকৃতির কাছে মেলিয়া ধরিতে হইবে; তাহা হইলে প্রকৃতির চারিদিক হইতে নানা প্রভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে, শক্তিতে পূর্ণ করিয়া তুলিবে—আমাদের অন্ত-রাত্মা উদ্বোধিত হইবে। বসন্ত কালের বনানী হইতে একটি মাত্র প্রেরণা আসিয়া আমাদিগকে পাপ, পুণ্য, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি বিষয়ে এমন শিক্ষা দান করিতে পারে যাহা শত শত বিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। এই জন্য চাই শুধু মানসিক প্রস্তুতি। Lucy নাম্নী বালিকা কিরূপে প্রকৃতির প্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল কবি তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, প্রকৃতির শিক্ষা দ্বিমুখী; একদিকে ইহা মানবের সৎপ্রবৃত্তি-সমূহ উদ্বোধিত করে এবং অপরদিকে তাহার অসৎপ্রবৃত্তি-গুলিকে দমন করে।

ভারতীয় সাহিত্যে বহিঃপ্রকৃতির সহিত মানবাত্মার যোগের বহু চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকে মানব ও প্রকৃতির যেরূপ অন্তরঙ্গ মিলন বর্ণিত হইয়াছে, জগতের কোন দেশের সাহিত্যে তাহার তুলনা মেলে না। ভবভূতির 'উত্তর-চরিতে'ও প্রকৃতির সহিত মানুষের আত্মীয়বৎ সৌহার্দ্য দেখানো হইয়াছে। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকৃতির সহিত মানুষের নিগূঢ় যোগের রসমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠি-য়াছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার কাব্যে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যোগের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা একটু ভিন্ন ধরণের, এই যোগ প্রধানতঃ তত্ত্বমূলক, রসমূলক নয়; প্রকৃতির সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানে কবির মন কিভাবে পুষ্টিলাভ করিয়াছে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আমাদিগকে তাহারই হিসাব দিয়াছেন। ভারতীয় সাহিত্যে প্রকৃতি ও মানবের যুগলমিলনের যে রসধারা প্রবাহিত, ইংরেজ কবির কাব্যে আমরা তাহা পাই না। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকৃতির সঙ্গে মানবের ভাব ও রসের যে গভীর মিলন দেখিতে পাই, সেখানে মানুষের মন বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে

যেরূপ পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ততদূর পৌঁছিতে পারেন নাই। এবং পারেন নাই বলিয়াই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, তাঁহার শেষ বয়সের কবিতায় একটা হতাশার সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। যিনি ছিলেন আজীবন প্রকৃতির পূজারী, যিনি বিশ্বাস করিতেন যে, একমাত্র প্রকৃতির ধ্যানের মধ্য দিয়াই চরম আত্মোপলব্ধি সম্ভবপর—তিনি যেন একটুখানি দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই তাঁহার Evening Voluntaries নামক কবিতাগুচ্ছে তিনি বলিতেছেন যে, ভগবৎ-করুণা ব্যতীত কেবল প্রকৃতিদেবীর উপাসনায় স্থায়ী শান্তি পাওয়া যায় না; প্রকৃতির ধ্যানে ক্ষণিকের বিশ্রাম, ক্ষণিকের শান্তি মিলিতে পারে, কিন্তু একমাত্র ভগবানের করুণাই আত্মার মুক্তি সাধনে সক্ষম।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির কবি; কিন্তু তাহা হইলেও তিনি মানব ও ইতরপ্রাণী সম্বন্ধেও কবিতা লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তাঁহার ইতরপ্রাণী সম্বন্ধীয় কবিতার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার দৃষ্টিতে মানবও প্রকৃতির অন্তর্গত; তাই তিনি প্রধানতঃ সেই সকল মানুষ সম্বন্ধেই কবিতা লিখিয়াছেন যাহারা প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে জীবন যাপন করে। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির ভালবাসা হইতেই তিনি মানুষকে ভালবাসিতে শেখেন; এবং প্রকৃতির সহিত একাত্ম হইয়া যে সকল মানুষ গ্রামে বাস করে—যেমন গ্রাম্য কৃষক ও মেষ-পালক—তাহাদিগের সম্বন্ধেই তিনি কবিতা লিখিয়াছেন। নাগরিক সভ্যতার মলিনতা তাহাদের জীবন কলুষিত করে নাই; সরল, অনাড়ম্বর তাহাদের জীবনযাত্রা; গভীর তাহাদের ধর্ম্মবোধ; ত্যাগে, প্রেমে তাহারা মহীয়ান্‌; সাহসে, কর্ম্মে তাহারা বীর; প্রকৃত মনুষ্যত্বের তাহারা আদর্শস্থল। উত্তেজনাপূর্ণ লোমহর্ষক ঘটনা তাহাদের জীবনে বড় ঘটে না; কিন্তু কবির চক্ষে তাহাদের সহজ সরল জীবনযাত্রার মধ্যেই কাব্য-সৃষ্টির বহু উপাদান ধরা পড়ে; এবং এইগুলি লইয়া তিনি বহু মর্ম্মস্পর্শী কবিতা রচনা করিয়াছেন। Michael বা Margaret-এর হৃদয়-বেদনা, Leech-Gatherer-এর আত্মনির্ভরতা, Simon Lee-র কৃতজ্ঞতা অপূর্ব্ব মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া আমাদের হৃদয় রসধারায় অভিষিক্ত করে।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে উচ্চ চিন্তার সহিত সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনের সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। তাহার Skylark পাখীর ন্যায় স্বীয় জীবনে তিনি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ঐক্য-বন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন। তাহার কাব্যের ন্যায় তাঁহার জীবন ছিল শুচি ও শুভ্র। জীবনের সায়াহ্নে তিনি ইংলণ্ডের রাজ-কবি নিযুক্ত হইয়াছিলেন; তিনি জীবনে কখনও সম্মান খুঁজিয়া বেড়ান নাই; তাই অতি অনিচ্ছার সহিত তিনি এই পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে টেনিসন যখন রাজ-কবি নিযুক্ত হন তখন তিনি শ্রদ্ধাভরে বলিয়াছিলেন যে, যে কবির পরিত্যক্ত সম্মান তিনি গ্রহণ করিতেছেন সেই কবি জীবনে কখনও কোন বাক্য উচ্চারণ করেন নাই। ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় জাতীয় জীবনেও তিনি সর্ব্বদা উচ্চ আদর্শ ও সাধু পথ অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, জাতির মহত্ব আত্মিক শক্তির উপর নির্ভর করে এবং জাতির মুক্তি আত্মিক শক্তি দ্বারাই অর্জ্জিত হইতে পারে; তাই নেপোলিয়নের আক্রমণ-ভীত ইংরেজ জাতিকে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"By the soul only, the Nations shall be great and free." মহাত্মাজীর ন্যায় তিনি আরও বিশ্বাস করিতেন যে, শুধু উদ্দেশ্য সাধু হইলে হইবে না, উপায়ও সাধু হওয়া চাই; অসাধু উপায় অবলম্বনে উদ্দেশ্যের সাধুতাও নষ্ট হইয়া যায়; তাই ভাগ্য-বিড়ম্বিত Dion-এর জীবনী আলোচনা করিয়া কবি বলিয়াছেন যে, সেই ব্যক্তিই সুখ, শান্তি ও দেবতার আশীর্ব্বাদ লাভ করে, "Whose means are fair and spotless as his ends." মানব-সভ্যতা আজ মহা সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিতেছে; দুইটি বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করিয়াও সভ্যতাভিমানী মানবের চৈতন্য হয় নাই; পরমাণু-বোমার পরে আজ উদযান-বোমার জল্পনা-কল্পনা শোনা যাইতেছে। শতবর্ষ পূর্ব্বের এই ঋষি-কবির বাণী আজিকার প্রমত্ত মানবের কর্ণে প্রবেশ করিবে কি?

আলোচনী

বাঙ্গালী ও কন্যাদায়

শ্রীমতী অমিয়া দেবী

রাস্তার ওধারের ভাঙ্গা বাড়ীটায় আজ মহা সোরগোল। সম্মুখের দ্বারের উভয় পার্শ্বে পূর্ণোদক মঙ্গল-ঘট ও কদলী শাখা আগত উৎসবের শুভ সূচনা করিতেছে। মধ্যে মধ্যে বাড়ীর ভিতর হইতে পুরাঙ্গনাগণের সম্মিলিত হুলু ও শঙ্খধ্বনি শোনা যাইতেছে, রাস্তার উপরে বাড়ীর সম্মুখে সুবেশ শিশুর দল কর্ম্মব্যস্ত বয়স্কগণের সহিত পাল্লা দিয়া ছুটাছুটী করিতেছে, তাহাদের আনন্দ কলরবে আকাশ বাতাস মুখরিত। এ বাড়ীর বড় মেয়েটীর আজ বিবাহ, তাহারই জন্য এত আনন্দ, এত আয়োজন।

কিন্তু এই শুভ উৎসবের এত আনন্দ এত আয়োজনের পশ্চাতে রহিয়াছে বাঙ্গলা দেশের সেই চিরাচরিত নৃশংস পণপ্রথা। মেয়েটীর পিতা আজ মাত্র চারি মাস হইল দীর্ঘকাল রোগে ভুগিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সামান্য স্কুল মাষ্টার ছিলেন, জীবিত কালে কায়ক্লেশে সংসার প্রতিপালন করিতেন, মৃত্যুকালে পরিবার বর্গের ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই। সহরের ভদ্রমহোদয়গণ চাঁদা তুলিয়া কিছু অর্থ-সংগ্রহ করিয়া মেয়েটীকে পাত্রস্থ করিতেছেন। প্রতিবেশী ভদ্রলোকগণ মাষ্টার মহাশয়ের অবর্ত্তমানে তাঁহার কন্যার বিবাহে অর্থ সাহায্য করিয়া মহানুভবতার পরিচয় দিতে-ছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যিনি বা যাঁহারা সেই ভিক্ষালব্ধ অর্থ গর্ব্বের সহিত গ্রহণ করিয়া সকলকে 'কৃতার্থ' করি-তেছেন তাঁহাদের উদারতা এবং চিন্তাশীলতা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া যাইতে পারে।

বাঙ্গলা দেশে পণপ্রথা এমনই সংস্কারগত হইয়া গিয়াছে যে কন্যাপক্ষকে পীড়ন করিয়া তাহাদের নিকট হইতে 'যেন তেন প্রকারেণ' কিছু নগদ টাকা, গহনা ও আসবাবপত্র আদায় করার মূলে যে জঘন্য মনোবৃত্তি রহিয়াছে তাহা কাহারও চোখে পড়ে না—না, পাত্রের, না, পাত্রের অভিভাবক-গণের এবং সত্য কথা বলিতে কি, কন্যাপক্ষেরও নয়। ই'হারা সকলেই মনে করেন বিবাহে পণদান এবং পণগ্রহণ যেন একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার, ইহার অন্যথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দেশ যতই তথা-কথিত সভ্যতার দিকে অধিক অগ্রসর হইতেছে মানুষ যতই বাহ্যতঃ ভদ্র এবং শিষ্টাচার-সম্পন্ন হইতেছে, এই ঘৃণ্য প্রথা বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে ততই সুদৃঢ়রূপে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতেছে—সমূলে উচ্ছেদ হওয়া তো দূরের কথা। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বেও এই প্রথা এরূপ সর্ব্বসম্মত হইয়া ওঠে নাই। পিতামহী, মাতামহী-গণের নিকট তাঁহাদের বিবাহের গল্প শুনিতে শুনিতে মনে হয় তাঁহাদের আমলে কন্যার বিবাহ আদৌ এরূপ ভয়াবহ ব্যাপার ছিল না। এখন কন্যার বিবাহের কথা উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই কন্যাপক্ষের পীড়ন সুরু হয়। 'কনে' দেখিবার অজুহাতে পাত্রপক্ষীয়গণ দলবল সমভি-ব্যাহারে বার বার কন্যাগৃহে আসিয়া কন্যার চুল মাপিয়া, মুখ ঘষিয়া, হাঁটাইয়া, নাচাইয়া তাহাকে 'নাকের জলে চোখের জলে' করেন, এবং কৃপা করিয়া কিঞ্চিৎ (?) জল-যোগাদি করিয়া কন্যার পিতাকেও প্রায় তদবস্থ করিয়া তোলেন। আমাদের দিদিমা ঠাকুমাদের কালে নাকি এমনটী ছিল না। পাত্রপক্ষের যে কেহ একদিন আসিয়া 'কনে' দেখিয়া যাইতেন। সে দেখার উদ্দেশ্য ছিল মেয়েটী সুলক্ষণা কি না তাহা জানিয়া যাওয়া। কন্যা বিকলাঙ্গী কিংবা বিশেষ কোন অশুভলক্ষণাক্রান্তা না হইলেই বিবা-হের কোন বাধা থাকিত না। কন্যাপক্ষ খুসীমনে মেয়েকে যাহা দিতেন তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। আজ-কালকার তথাকথিত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ যেরূপ জুলুম করিয়াই হউক বা ভদ্রভাবে কৌশল করিয়াই হউক, কন্যাপক্ষ হইতে নিজের ইচ্ছামত নগদ টাকা ও 'দান সামগ্রী' আদায় করেন সেকালে এরূপ ছিল না।

অনেকে হয়ত বলিবেন পণটা কন্যাদানের দক্ষিণা-স্বরূপ লওয়া বা দেওয়া হয়, ইহা ব্যতীত বিবাহ সুসিদ্ধ হয় না। আমরা জানি শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভার্য্যা-প্রাপ্তির অষ্টবিধ উপায় আছে, যথা—ব্রহ্ম, প্রাজাপত্য, দৈব, আর্ষ্য, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, আসুর ও পৈশাচ। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত চারি প্রকার বিবাহ ধর্ম্ম-বিবাহ বলিয়া উল্লিখিত। ধর্ম্ম-বিবাহের মধ্যে দৈব ও আর্ষ্য বিবাহে কন্যাপক্ষ পাত্র-পক্ষের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দ্রব্যের বিনিময়ে কন্যাদান করিতেন, ব্রাহ্ম ও প্রাজাপত্য বিবাহে বিদ্যা ও সদাচার-সম্পন্ন বরকে সম্মানিত করিয়া তাহাকে সালঙ্কারা কন্যা সমর্পন করা হইত। এই শেষোক্ত দুই প্রকার ধর্ম্ম-বিবাহে কন্যাদানের সহিত আর যাহা কিছু দেওয়া হইত তাহাকে

দাম্ভের দক্ষিণা হিসাবে ধরা যাইতে পারে সত্য, কিন্তু এই দক্ষিণার প্রকার ভেদ; সংখ্যা অথবা পরিমাণের কোন বিশেষ নির্দ্দেশ সংহিতাতে নাই। কন্যার অলঙ্কার স্বরূপ শাঁখা, শাড়ী এবং কন্যাদানের দক্ষিণা হিসাবে হরিতকী ফল দিলেও বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হয়। অতএব অক্ষম পিতার ভিটামাটী বিক্রয় করিয়া অথবা পিতৃহীনা কন্যার বিবাহে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া পাত্রপক্ষের দাবী পূরণ করিতে না পারিলে বিবাহ অসিদ্ধ থাকিয়া যাইবে, কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি এই যুক্তির সমর্থন করিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না।

অনেক সময় দেখা যায় যে, স্বয়ং পাত্র, মাতা বন্ধু অথবা অন্য কাহাকেও মধ্যস্থ করিয়া তাঁহার মারফৎ কন্যাপক্ষের নিকট দাবী জানান্ যে, তাঁহার একটী cycle চাই, একটী gold-band Omega wrist-watch চাই, একটী Sheaffer's কলম চাই, ইত্যাদি ইত্যাদি—মোট কথা যে জিনিষটী তাঁহার অতি আকাঙ্খিত কিন্তু এ যাবৎ কাল অর্থাভাব বশতঃ জোগাড় করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাহাই তিনি বিবাহের সময় কন্যাপক্ষের 'ঘাড় ভাঙ্গিয়া' লইতে ব্যগ্র। ঈদৃশ-মনোবৃত্তিসম্পন্ন যুবকগণই আমাদের দেশের আশা ও গৌরবস্থল! ইহা অপেক্ষা পরিহাসের বিষয় আর কি হইতে পারে?

ঋণ করিয়া অথবা অপরের নিকট হইতে অর্থসাহায্য গ্রহণ করিয়া কন্যার বিবাহ দেওয়া আমাদের আধুনিক সভ্য সমাজে কিছুই নূতন ব্যাপার নহে। কন্যাদায়গ্রস্তদিগকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করা, পুন্য লাভের সহজ উপায়গুলির মধ্যে একটী বলিয়া গণ্য হয়। যিনি সাহায্য করেন তিনি ইহকালে 'দশের' নিকট সম্মান এবং পরকালে স্বর্গসুখ লাভ করেন। পাত্রপক্ষ তো মহাসম্মানিত অতিথি, তাঁহারা দানগ্রহণ করিয়া সকলকে কৃতার্থ করেন, কাজেই এই ঋণ অথবা সাহায্যগ্রহণ ব্যাপারের যাহা কিছু লজ্জা যাহা কিছু হীনতা সব কন্যাপক্ষের স্কন্ধেই অর্পিত হয়। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, লজ্জা কন্যাপক্ষের নয় পাত্রপক্ষেরই। কারণ, অর্থের অভাব কষ্টকর হইতে পারে কিন্তু লজ্জাকর নহে। কিন্তু যাঁহারা সেই অভাবের বোঝার উপর আরও বোঝা চাপাইয়া প্রসন্নমুখে বরবধূ লইয়া বিদায় লন তাঁহাদের সম্মান সম্পদ সকলই থাকিতে পারে, থাকে না কেবল মনুষ্যত্ব। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের অভাব অর্থের অভাব অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক লজ্জাকর একথা বোধ করি সকলেই স্বীকার করিবেন।

আর এক কথা—যাহাকে কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী পদে বরণ করিয়া আনা হইতেছে, যে দুদিন বাদে সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইবে, যাহার গর্ভজাত সন্তান-দত্ত পিন্ড লাভ করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণ তৃপ্ত হইবেন তাহার আত্মীয়বর্গকে শোষন ও পীড়ন করা কি প্রকারান্তরে তাহাকেই পীড়ন করা নহে? বরকেও বলি, তুমি সুস্থ, শিক্ষিত, উপার্জ্জনক্ষম, পরস্বাদায়কারী হইতে তোমার লজ্জা করে না? বিবাহের দুইটা মন্ত্র পাঠের পরেই তোমার সহিত যাহার আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিবে না, মন্ত্র পাঠের দুই মিনিট পূর্ব্ব পর্যন্ত সে কি তোমার কেহই নহে? ঐ যে বেপথুমতী নতমুখী কন্যা চোখের জল মুছিতে মুছিতে আসনে আসিয়া বসিল, বিবাহের মন্ত্র শুনিতে শুনিতে যাহার কেবলই মনে পড়িয়া যাইতেছে বিধবা মাতার নিরাশা-কাতর অসহায় চোখের সজল দৃষ্টি কিংবা অক্ষম পিতার প্রতি কর্ত্তাদাতার রূঢ় কঠোর ভাষণ—তাহার লজ্জা, অপমান, কি তোমার কিছুই নহে? যে সম্পর্কের ভিত্তি পীড়ন ও অপমানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা কি যথার্থ মধুর ও কল্যাণকর হয়?

মাতৃস্থানীয়া গৃহলক্ষ্মীগণ! এই প্রসঙ্গে আপনাদিগকেও দু' একটী কথা বলা বোধ করি অবান্তর হইবে না। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, পণগ্রহণ ব্যাপারে পুরুষাপেক্ষা মেয়েদেরই উৎসাহ অধিক। ছেলের ঘর সাজাইয়া কোন্ কোন্ আসবাব এবং বধূর গা' সাজাইয়া কি কি গহনা লওয়া প্রয়োজন সে সম্বন্ধে পাত্রের অভিভাবক হইতে অভিভাবিকাগণই অধিক সচেতন থাকেন। নিজেরা নারী এবং কন্যার মাতা হইয়াও তাঁহাদের যদি অপর নারী বা অপরের কন্যার প্রতি সহানুভূতি না থাকে তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত হৃদয়হীনতার পরিচায়ক।

বর্তমান যুগে মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙ্গালী সমাজ বহুবিধ কঠিন সমস্যার সম্মুখীন। তাহাকে বাঁচিতে হইলে ক্রমপরিবর্ত্তমান যুগ-ধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সেই সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে হইবে। যে সকল পুরাতন প্রথা ও সংস্কার এই সমাজের কল্যাণ ও প্রগতির পথে একান্ত অন্তরায় তাহাদের মধ্যে পণপ্রথা অন্যতম, সুতরাং এতৎসম্পর্কে বুদ্ধিজীবী বাঙালী মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণীয়।

বনজ্যোৎস্না: কবিতা পুস্তিকা। মণীন্দ্র গুপ্ত। কমলা বুক ডিপো, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা মাত্র।

বারোটি কবিতায় গাঁথা এক গুচ্ছ রোমাণ্টিক কবিতা। কবি তরুণ হইলেও শক্তিমান। নানা ছন্দের অঞ্জলিতে একটি মূল ভাবের প্রতি বিষয়বস্তু নিবেদিত—সেই ভাবটি হইতেছে কাব্যলক্ষ্মী বা মানসী। যেমন—

ঘুমের সমুদ্র থেকে উঠিল মেঘের মত অপরূপ
মুখ পরে এক খণ্ড লঘুপক্ষ পলাতকা হাসির বিদ্রূপ;
কথামাত্র কহিল না: কাঁপিয়া উঠিল শুধু তার
সাগর ফেনায় শুভ্র চিরস্নাত স্তন দুটি স্বর্ণ-বক্ষহার,
নক্ষত্র লুকালো মুখঃ বলাকারো স্তব্ধ হ'লো পাখা
সাগরের পুঞ্জে পুঞ্জে অন্ধ হ'য়ে তরঙ্গেরা পড়িল যে ঢাকা।

এই জাতীয় কবিতার একটি গুণ হইতেছে এই যে, ইহার মধ্যে একটি নমনীয় ভাবালুতা থাকায় মনটাকে আপনিই রসসিক্ত করিয়া তোলে, অত্যাধুনিক টেক্‌নিক সর্ব্বস্ব ও শব্দ-বিড়ম্বিত কাব্যের কঠিন ক্ষুরধারে হৃদয়কে বিদ্ধ হইতে হয় না। তবু বলিব, দীর্ঘকাল অতিরিক্ত বাস্তব-বিমুখ দৃষ্টি লইয়া চলিলে কবি অলীক বিষয়-বস্তুর চাপে অবশেষে অবসন্ন হইয়া পড়িবেন। সহজাত কবিকল্পনার সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠার কিছু সচেতন সংযোগ ঘটিয়া কবি মণীন্দ্র গুপ্তর নতুন পথের স্বর্ণদ্বার খুলিয়া যাক, ইহাই কামনা করি।

যুগ-ঝঙ্কার: উপন্যাস। শ্রীহরিচন্দন মুখোপাধ্যায়। দি নিউ ওরিয়েণ্টাল প্রেস, ঝরিয়া। মূল্য ২৷৷৹ টাকা মাত্র।

বিষয়বস্তু ও ঘটনা প্রবাহের দিক হইতে 'যুগ-ঝঙ্কার' অত্যাধুনিক কালের একটা বিশেষ ইতিহাসকে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিতে অপেক্ষাকৃত দুঃসাহসিকতারই পরিচয় দিয়াছে বটে, কিন্তু রচনার সর্ব্বত্রই লেখক যথোপযোগী মুন্সিয়ানা রক্ষা করিতে পারেন নাই। গ্রন্থখানিকে আরও অন্ততঃ কয়েকবার সংস্কার ও পরিমার্জ্জন করিয়া প্রকাশ করিলে লেখক ভালো করিতেন। বাংলার বাহিরে সুদূর মফঃস্বলে থাকিয়া বাংলা সাহিত্যের প্রতি লেখকের যে ঐকান্তিক সাধনা, তাহা একদিন সার্থকতায় শ্রীমণ্ডিত হইবে, আলোচ্য গ্রন্থে লেখকের সেই প্রতিশ্রুতি আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। বিষয়-বৈচিত্র্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রকাশব্যঞ্জনায় তিনি আরও অধিক সংযমী হইলে তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টি সার্থক হইবে।

শিক্ষাব্রতী: রবীন্দ্র সংখ্যা। সম্পাদক শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক। ১৫এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য এক টাকা মাত্র।

বাংলা দেশে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা অসংখ্য হইলেও তাহার মধ্যে একটা বিশেষ আত্মবৈশিষ্ট্য লইয়াই বিগত তিন বৎসর যাবৎ 'শিক্ষাব্রতী' নিয়মিত প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। বাংলাদেশে এতকাল শিক্ষা সংক্রান্ত সাময়িক পত্রের একেবারেই অভাব ছিল, সম্প্রতি কয়েকজন শিক্ষা-ব্রতীর উদ্যোগে কিছু কিছু এই জাতীয় পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক সম্পাদিত 'শিক্ষাব্রতী' তাহাদের অন্যতম।

আলোচ্য সংখ্যাটি বৃহদাকারে এবং বর্দ্ধিত মূল্যে রবীন্দ্র-সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এ সংখ্যার কয়েকটি সূচী হইতেই ইহার সার্থকতা উপলব্ধি হইবে, যথা—'শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী', 'রবীন্দ্রনাথের কথা-সাহিত্যে শিক্ষক চরিত্র', 'লোকশিক্ষায় রবীন্দ্রনাথ', 'শিক্ষা-ব্রতী রবীন্দ্রনাথ', 'সমাজ-শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথঃ শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষালয়' প্রভৃতি। প্রত্যেকটি রচনাই বিশেষ উৎকর্ষধর্ম্মী। রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুশীলনকারী-দের পক্ষে এই সংখ্যাটি অত্যন্ত উপকারে আসিবে। অন্যান্য প্রবন্ধ ও কবিতাবলীও আপন আপন রচনা সৌকর্য্যে উজ্জ্বল। সঙ্কলনটির আর একটি প্রধান আকর্ষণ—রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কালের ও বিভিন্ন বয়সের আলোক-চিত্র সংগ্রহ। আগাগোড়া সুদৃশ্য আর্ট কাগজে লাইনো অক্ষরে মুদ্রিত এই সংখ্যাটির জন্য সম্পাদক ও প্রকাশক উভয়েই প্রশংসার্হ।

সম্পাদকীয়

বঙ্গশ্রীর বর্ষারম্ভ

বর্তমান আষাঢ় সংখ্যার সঙ্গে বঙ্গশ্রী বিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। বাঙালী আজ শ্রীভ্রষ্ট, দ্বিধা-বিভক্ত; বাংলার সংস্কৃতি আজ বিপন্ন। আবার দুর্ভিক্ষের মৃত্যু-লীলা সুরু হইয়াছে বাংলার মাটিতে। ইহার জন্য কে বা কাহারা দায়ী, তৎসম্পর্কিত আলোচনার স্থান অন্যত্র রহিয়াছে; কিন্তু বুদ্ধিজীবী বাঙালীমাত্রের কাছেই আজ সব চাইতে বড় কর্ত্তব্য হইতেছে এই শ্রীভ্রষ্ট, দ্বিধাবিভক্ত, ও বিপন্ন সংস্কৃতির প্রলয়সাগর হইতে স্বদেশ-লক্ষ্মীকে উদ্ধার করিয়া দুর্ভিক্ষের মৃত্যু-মহোৎসব হইতে দেশ-ভ্রাতৃবৃন্দকে রক্ষা করা। বঙ্গশ্রী চিরকাল ইহারই জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে, আজও এই বিংশ বর্ষের প্রথম ঊষা-লগ্নে দাঁড়াইয়া বাঙালীর সুপ্ত চেতনার দ্বারে বঙ্গশ্রী সেই সংগ্রামের আহ্বানই ঘোষণা করিতেছে। চাই সুস্থ সবল মানুষ, চাই আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,—একটি দেশের ইহাই তো শ্রীর লক্ষণ, কল্যাণের লক্ষণ। বাঙালী-জীবনে বঙ্গশ্রীর যদি কিছুমাত্রও সেই কল্যাণকর দান থাকে তবেই তাহার সার্থকতা।

নানা সঙ্ঘাতের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে দৃপ্তপদ-ক্ষেপে ক্রমাগত সামনের পথে অগ্রসর হইয়া চলিতে হইতেছে। আশা—

> 'ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত
> আমরা আনিব রাঙা প্রভাত';

তারপর সেই প্রভাতের তোরণদ্বারে বসিবে একদা আমাদের ভ্রাতৃ-সম্মেলন। জীবন-সংগ্রামের অত্যুগ্র চাপে বাঙালী তাহার বৈঠক ভুলিয়াছে, আড্ডা ভুলিয়াছে, দাবার আসরের চাইতে দাবার ঘুঁটি হইয়া ক্রমশঃই সে অপরের হাতের ক্রিড়ণকে পরিণত হইতেছে। কোথায় তাহার সেই আত্ম-বৈশিষ্ট্যসম্পৃক্ত সম্মেলনের পরিবেশ রচনা, কোথায় সেই বৈঠক—যেখান হইতে একদা সন্ধ্যার মধুর মাটির প্রদীপের শিখায় শিখায় বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িত তাহার চিরকালের চির ঐতিহ্যের ধারা! ইহা কি শুধু তাহার অতীতেরই বিস্মৃত ইতিহাস? তাহা নয়। কাল-পরি-বর্ত্তনে তাহার জীবনে জাগতিক প্রবাহের আঘাত আসিয়া লাগিলেও আজও সে হৃত-সর্ব্বস্ব হয় নাই। বিস্মৃত যুগের বিভ্রান্তির মধ্যে তাহার বোধিকে শুধু জাগাইবার প্রয়োজন, তবেই তাহার জীবন-সত্তায় আবার বসন্তের কোকিল গাহিয়া উঠিবে; তবেই তাহার সাংস্কৃতিক প্রাণ-স্পন্দনে আবার যৌবনের অগ্নি-বীণা বাজিয়া উঠিবে, রাঙা প্রভাতের উজ্জ্বল আলোয় তবেই আবার আলোকিত হইয়া উঠিবে তাহার অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ। বঙ্গশ্রীতে সেই রাঙা প্রভাতের উজ্জ্বল আলোর বন্দনাই মুখরিত। নানা সঙ্ঘাতের মধ্য দিয়া আমরা ক্রমে সেই আলোর পথেই যাত্রা করিতেছি, আমরা যে অমৃতের সন্তান! মৃত্যুর মহা-শ্মশানের বুক ঠেলিয়া তাইতো আমাদের অন্তরের প্রার্থনা প্রতি মুহূর্তে যাইয়া পৌঁছিতেছে অমৃতরূপের কাছেঃ 'অসতোমা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যুর্মা-মৃতংগময়।'

বিগত ঊনবিংশ বর্ষের নানা মৃত্যু-সঙ্ঘাতকে পশ্চাতে রাখিয়া আমরা আজ শুভ নববর্ষের নবীন ঊষালগ্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। আজ যাহা কিছু মৃত্যুরূপী পাপ ও বিভীষিকা, সবকিছুকে বর্জ্জন করি, যাহা কিছু প্রাণ-রূপী পুণ্য ও শুভ, তাহাই গ্রহণ করিয়া দেশ-ভ্রাতৃবৃন্দকে হৃদয়ের সম্ভাষণ জ্ঞাপন করি। সকলের শুভ ও কল্যাণের মধ্যে ভগবান আমাদের মঙ্গল করুন।

ভারত সরকারের ১৯৫২-৫৩ সালের চূড়ান্ত বাজেট

কিছুকাল পূর্ব্বে আমরা ভারত সরকারের অন্তর্ব্বর্ত্তী বাজেট লইয়া যে আলোচনা করিয়াছিলাম, তাহাতে কর ও বহির্ব্বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলি পরবর্ত্তী পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ কালে চূড়ান্ত আলোচনা সাপেক্ষ বলিয়া আমরা তৎকালীন আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত পরিবেশেই সমাপ্ত করিয়াছিলাম। সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ ১৯৫২-৫৩ সালের চূড়ান্ত কেন্দ্রীয় বাজেট নবনির্ব্বাচিত লোক-সভার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। পূর্ব্বে আশা করা গিয়াছিল—এবারে স্বভাবতই বাজেটে কিছু বৈচিত্র্য

ঘটিবে, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে দেখা গেল—বৈচিত্র্যের পরিবর্ত্তে পূর্ব্ব ব্যবস্থাকেই বরং কিছু আকার-বিভেদ করিয়া নতুনভাবে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাজেট বক্তৃতা কালে অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী ১৯৫২-৫৩ সালে মোট ঘাট্‌তির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৭৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা এবং মোট আয় হইবে ৪০৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা; পক্ষান্তরে এই খাতে মোট ব্যয় হইবে ৪০১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। কাজেই ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা রাজস্বখাতে উদ্বৃত্ত হইবে। মূলধনখাতে মোট ঘাট্‌তির পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ৭৯ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। ইহাতে সর্ব্বসাকুল্যে ঘাট্‌তি দাঁড়াইবে ৭৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। অর্থমন্ত্রী বলেন যে, বাজেট বৎসরের শেষে কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাবে ৮৩ কোটি ৮ লক্ষ টাকা জমা থাকিবে; তম্মধ্যে আনুমানিক ৪০ কোটি টাকা হইল বৈদেশিক সাহায্য খাতে প্রাপ্ত অব্যয়িত অর্থ।

খাদ্য বাবদ অর্থ সাহায্য-দান ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্ত্তন করার বিষয়ে অর্থমন্ত্রী কোনোরূপ প্রতিশ্রুতিই দিতে পারেন নাই। তবে রাষ্ট্রপতির ঘোষণা অনুযায়ী জনগণের দুর্গতি প্রশমনকল্পে সরকার সচেষ্ট থাকিবেন বলিয়া বাজেটে বলা হইয়াছে। শ্রীদেশমুখ জানান যে, বর্ত্তমান কর-ধার্য্য-পদ্ধতির কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত হইবে না। ইহা দ্বারা ইহাই পরিষ্কার বুঝায় যে, যেমন করভার লাঘব করা হইবে না, তেমনি কোনোরূপ নূতন করও ধার্য্য হইবে না। মোটামুটি বাজেটের আটটি মূল বৈশিষ্ট্যকে আমরা এইভাবে পাই, যথাঃ (১) **কর-সংগ্রহ পদ্ধতি অপরিবর্ত্তিত থাকিবে; (২) অন্তর্ব্বর্ত্তী বাজেটে রাজস্বখাতে আয়ের পরিমাণ ১৮ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা হইতে কমিয়া ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইবে; (৩) বহির্বাণিজ্যের শুল্কখাতে ২৫ কোটি টাকা আয় হ্রাস পাইবে; (৪) খাদ্য বাবদ সাহায্যদানের পরিমাণ ২৫ কোটি হইতে হ্রাস করিয়া ১৫ কোটি টাকা করা হইবে; (৫) সেচ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা খাতে ২১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি করা হইবে; (৬) মূলধন খাতে বাজেটের ঘাটতির পরিমাণ ৭৫ কোটি ৮ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা হইবে; (৭) মোট ঘাট্‌তির পরিমাণ ৫৬ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইবে, এবং (৮) ১৯৫২-৫৩ সালের শেষে ভারত সরকারের হিসাবে ৮৩ কোটি ৮ লক্ষ টাকা জমা থাকিবে।**

পূর্ব্ব বৎসরের হিসাবে অন্তর্ব্বর্ত্তী বাজেট ধরিয়া এ পর্য্যন্ত বিচার করিলে একটি ক্রমিক অবণতিই স্বভাবত লক্ষ্যে পড়িবে। যেমন রাজস্বখাত; ১৯৫১-৫২ সালে এই খাতে আয় হইয়াছিল ৪১৮ কোটি টাকা; ১৯৫২-৫৩ সালের অন্তর্ব্বর্ত্তী বাজেটে উক্ত খাতে আয় অনুমান করা হয় ৪২৫ কোটি টাকা। সেই স্থলে আলোচ্য চূড়ান্ত বাজেটে আয় ধরা হইয়াছে মাত্র ৪০৫ কোটি টাকা। চূড়ান্ত বাজেটে অবশ্য ব্যয়ও হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ক্রমিক অবণতির চিহ্নই স্পষ্ট লক্ষ্যে পড়ে। বিগত বৎসর ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য-ক্ষেত্রে স্বচ্ছল দিনেরই আভাষ দেখা গিয়াছিল। আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক খাতেও তেমনি ভারত সরকারের প্রচুর আয় হইয়াছিল। এই বৎসরের চূড়ান্ত বাজেটে উক্ত আয় দাঁড়াইয়াছে ১৬৫ কোটি টাকা। আলোচ্য বৎসরের ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য ব্যাপারে শ্রীদেশমুখ মোটেই আশা পোষণ করিতে পারেন নাই। অন্তর্ব্বর্ত্তী বাজেটে ধার্য্য আয়কর অপেক্ষা বর্তমান চূড়ান্ত বাজেটে প্রায় ৫ কোটি টাকা অধিক লক্ষিত হয়। আভ্যন্তরীণ শুল্কের পরিমাণ অবশ্য চূড়ান্ত বাজেটে হ্রাস পায় নাই। স্বভাবতঃই এই কারণে উৎপাদন হ্রাস পাইবার আশঙ্কা অর্থমন্ত্রীর মনে ঠাঁই পায় নাই। তিনি স্পষ্টতঃই বলিয়াছেনঃ 'বর্ত্তমান অবস্থাতেও শিল্পজ দ্রব্যের উৎপাদন এবং কৃষির উৎপাদন মোটামুটি অব্যাহতই থাকিবে। পণ্যমূল্য হ্রাসের ফলে কোনো কোনো শ্রমশিল্প সঙ্কটের সম্মুখীন হইবে সন্দেহ নাই, তবু আমি আশা করি, কিছুকালের মধ্যেই পণ্যমূল্য স্থিতাবস্থা লাভ করিবে এবং তাহাতেই সংশ্লিষ্ট শ্রমশিল্পগুলি সঙ্কট কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হইবে।'

ভারত-সরকারের আয় হ্রাসের মূলে রহিয়াছে বহির্ব্বাণিজ্যক্ষেত্রে আকস্মিক মন্দাভাব। রপ্তানী বাণিজ্যক্ষেত্রে তাহার বিপর্য্যয়কর অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহাকে রপ্তানীযোগ্য দ্রব্যসমূহের উৎপাদন-ব্যয় কমাইয়া সঙ্গে সঙ্গে উহার উৎকর্ষ বাড়াইতে হইবে। ইহা দীর্ঘমেয়াদী এবং সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা অবলম্বন সাপেক্ষ। পণ্যমূল্য হ্রাস সম্পর্কে শ্রীদেশমুখ যেরূপ আশা পোষণ করিয়াছেন, তাহাতে দেশবাসী মাত্রেরই তিনি ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। দুর্গতির দুঃসহ অবস্থার মধ্যে পড়িয়া জনসাধারণ নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ সম্পর্কে একরূপ নিরাশ হইয়াই পড়িয়াছিল। পণ্যমূল্য হ্রাসের আশার পথ খুলিয়া দিয়া অর্থমন্ত্রী তাই জনসাধারণের তাপদগ্ধ মরুচিত্তে কথঞ্চিৎ ওয়েসিসেরই সঞ্চার করিয়াছেন। তবে দেখিতে হইবে, ইহার সুযোগ লইয়া যেন শ্রমশিল্পের

মালিকগণ উৎপাদন হ্রাস করিতে না পারেন কিম্বা আশঙ্কা-জনক বেকার-সমস্যাকে জটিল ও ভারবাহী করিয়া না তোলেন। এইদিকে ভারত সরকারের সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন হইবে।

ভারত-মার্কিন কারিগরী সহযোগিতা চুক্তি

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের কারিগরী সহযোগিতার ডিরেক্টার মিঃ ক্লিফোর্ড এইচ্ উইলসন এবং ভারতের অর্থদপ্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারী শ্রী পি সি ভট্টাচার্য্য গত ৩১শে মে ভারত-মার্কিন কারিগরী সহযোগিতার এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তির বিষয়গুলি হইতেছেঃ (১) সমাজ-উন্নয়ন কার্য্যসূচী, (২) লৌহ ও ইস্পাত সরবরাহ, (৩) সার সরবরাহ, (৪) পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণ, (৫) সামুদ্রিক মৎস শিকার ক্ষেত্রের উন্নয়ন, (৬) নলকূপ বসান, (৭) মৃত্তিকা সম্বন্ধে গবেষণা এবং (৮) সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের জন্য গ্রাম্য কর্ম্মীদিগকে ট্রেনিং দেওয়া।

চুক্তির উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মনোনীত অঞ্চলসমূহে গ্রামোন্নয়নের জন্য ৫৫টি পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা। এই কর্ম্মসূচীর ক্ষেত্র ক্রমশঃ এরূপ সম্প্রসারিত করা হইবে যেন কতিপয় বৎসরে সমগ্র দেশ উহার অধীনে আসে। বর্ত্তমান অবস্থায় এই পরিকল্পনাধীন প্রত্যেক এলাকায় প্রায় ২ লক্ষ লোক ও দেড় লক্ষ একর চাষের জমি বিশিষ্ট প্রায় ৩ শত গ্রাম থাকিবে। এই পরিকল্পনায় সেচের ব্যবস্থা, সার প্রয়োগ, কৃষিকার্য্যের সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা ও শিক্ষা থাকিবে। ৫৫টি পরিকল্পনার মধ্যে ৬টিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠা, ছোট সহর নির্ম্মাণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা থাকিবে। এই পরিকল্পনায় মোট ৩৮ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে; তন্মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্ট ৮৬ লক্ষ ৭১ হাজার ডলার অর্থাৎ প্রায় ৪ কোটি টাকা এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট ৩৪ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা দিবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

এই চুক্তি অনুযায়ী প্রদত্ত অর্থের কতক অংশ রাজ্য গভর্ণমেণ্টের দেয় ঋণ বলিয়া গণ্য হইবে। ভারতের সামুদ্রিক মৎস শিকার ক্ষেত্রসমূহের সম্প্রসারণ ও উন্নতি সাধনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্ট ২৪ লক্ষ ৬২ হাজার ডলার অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট ৬৮ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা দিবেন।

আর একটি চুক্তিতে ভারতের মৃত্তিকার উর্ব্বরতার অবস্থা নির্দ্ধারণের জন্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য ও যন্ত্রপাতি দেওয়ার, ভারতের মৃত্তিকায় বিভিন্ন সারের ক্রিয়া নিরূপণের এবং কৃষিজীবীদের জন্য মৃত্তিকা পরীক্ষক দল গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতে মৃত্তিকা সম্বন্ধে ২০টি অঞ্চল আছে। এই সমস্ত অঞ্চল ৬টি মণ্ডলিতে বিভক্ত হইবে। পুণা, দিল্লী, কাণপুর, নাগপুর, কোয়েম্বাটুর ও সাবুরে ঐ সমুদয়ের কেন্দ্র থাকিবে, এবং প্রত্যেক কেন্দ্রে মৃত্তিকার নমুনা পরীক্ষার জন্য একটি মৃত্তিকা পরীক্ষক দল গঠিত হইবে।

যাহাতে সমাজ উন্নয়ন কার্য্যসূচী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বহুসংখ্যক শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মী পাওয়া যাইতে পারে, তজ্জন্য পল্লীকর্ম্মী ট্রেনিং চুক্তি অনুযায়ী ২৫টি ট্রেনিং কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারত গভর্ণমেণ্ট আমেরিকার ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের অর্থ-সাহায্যে বোম্বাই, উত্তর-প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও মহীশূর এই পাঁচটি রাজ্যে পাঁচটি ট্রেনিং কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই পাঁচটি কেন্দ্রে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্ম্মীদের সংখ্যা ৫৫টি পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার পক্ষে উপযুক্ত নয়। আরও ২৫টি কেন্দ্র খোলা হইলে প্রতি ছয় মাসে প্রায় ১৭ শত কর্ম্মী ট্রেনিংপ্রাপ্ত হইবে।

নলকূপ বসাইবার ব্যবস্থায় আগামী দুই বৎসরের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, পেপ্সু ও বিহারে দুই হাজার নলকূপ খনন করানো হইবে। ভারত-আমেরিকা কারিগরী সহযোগিতা চুক্তি অনুযায়ী উভয় গভর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ঐ সকল নলকূপ বসাইতে মোট প্রায় ১০ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। উহার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৩,৭০০,০০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা সাহায্য করিবেন। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন যে, চুক্তি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে যে ৫ কোটি ডলার প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা হইতেই আলোচ্য ১৩,৭০০,০০০ ডলার প্রদত্ত হইবে।

চুক্তিপত্রে বলা হইয়াছে যে, ভারতের অনেক স্থানে ভূগর্ভে পর্য্যাপ্ত জল থাকিলেও বৃষ্টিপাতের অভাবে মাত্র বর্ষার শেষে একবার ফসল জন্মে। আলোচ্য দুই সহস্র নলকূপের মধ্যে ৭৫০টি সার্ব্বজনীন উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্গত অঞ্চলে বসানো হইবে। ঐ সকল নলকূপের জল স্বল্পমূল্যে কৃষকদের নিকট বিক্রয় করা হইবে।

প্রধানতঃ পরিকল্পনার ব্যয় নির্ব্বাহ এবং নলকূপের মেরামতের খরচ মিটাইবার জন্যই ঐরূপ মূল্য ধার্য্য হইবে।

এই জাতীয় চুক্তি সম্পর্কে আমাদের আজ আর নতুন করিয়া কিছু বলিবার নাই; ভারত সরকারকে শুধু একটা প্রশ্ন করিঃ যেভাবে ক্রমশঃই ডলারের চাপ আসিয়া তাঁহাকে ন্যুব্জপৃষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে, তাহা হইতে কি অবশেষে সহজ পরিত্রাণের পথটি তাঁহাদের সুগম হইবে?

ভারতীয় লোক-গণনার রিপোর্ট

১৯৪১ হইতে ১৯৫১ সাল পর্য্যন্ত বিগত ১০ বৎসরে ভারতের লোকসংখ্যা শতকরা ১২·৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া লোকগণনার কমিশনার শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার এক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তদনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যা বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে ন্যূনাধিক ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষ। প্রায় ৩৬ কোটিই বলা চলে। একমাত্র এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারাই ভারতের গণজীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত অবস্থার কিছু একটা সঠিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়, তাহার জন্ম ও মৃত্যুহারের তারতম্যটাও সেই সঙ্গে দেখিবার প্রয়োজন। গত দীর্ঘকালের মধ্যেও ভারতবর্ষ অধিকতর অকালমৃত্যু বা শিশুমৃত্যুর হাত হইতে মুক্তি পায় নাই, এমন কি এখন পর্য্যন্ত তাহা কোনোরূপ আশ্চর্য্যরকম কম হয় নাই। জন্ম ও মৃত্যুহারের তারতম্য হইতেই ভারতের মোটামুটি স্বাস্থ্যগত অবস্থার কিছু একটা পরিচয় পাওয়া সম্ভব। কিন্তু গত দুইশত বৎসরেরও অধিককাল হইল ভারতবর্ষ প্রায় পুরোপুরিই স্বাস্থ্যহীন হইয়াছে। অভাব অনটনের মধ্য দিয়াই ভারতবর্ষকে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া চলিতে হইতেছে। তদুপরি বর্ত্তমানের খাদ্যসমস্যা ভারতীয় জনসাধারণকে রীতিমত বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধিহারের সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সামঞ্জস্য না ঘটিলে জাতির জীবনে যে জটিল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তাহারই একটি তথ্যগত ইঙ্গিত শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গারের রিপোর্টে উল্লিখিত লোকগণনার হিসাবে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্ট আগামী কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হইবার কথা আছে। এদিকে নাকি জাতীয় উন্নতির জন্য পঞ্চবার্ষিকী অথবা ষষ্ঠ-বার্ষিকী পরিকল্পনা রচনার কাজ প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। জনসংখ্যাবৃদ্ধির হিসাবের প্রতি কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক। জনসংখ্যানুযায়ী খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধিকে যদি সম্ভব করিয়া তোলা না হয়, তবে যে ভারতকে পুনরায় মহতী বিনষ্টির পথে নামিয়া যাইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

লোকগণনার হিসাব অনুযায়ী আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহা হইতেছে নারী ও পুরুষের সংখ্যানুপাতিক হার। বর্ত্তমান হিসাবানুযায়ী নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা প্রায় এক কোটির অধিক দাঁড়াইয়াছে। এই বৈষম্য অবশ্য ভারতের সর্ব্বত্রই সমভাবে বিস্তৃতিলাভ করে নাই, তথাপি নর-নারীর এই বৈষম্য সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রেই যে বৃহত্তর সমস্যা সৃষ্টির সহায়ক, সে সম্বন্ধে দ্বিমত থাকিবার কারণ নাই। জাত গোষ্ঠী বা শ্রেণীগত হিসাবে বিবাহবিধি হইতে সুরু করিয়া নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাগত মর্য্যাদা প্রভৃতি প্রকারভেদে নির্ণীত হইয়া থাকে। বিভিন্ন রাজ্যের সামাজিক সমস্যাও তেমনি বিভিন্ন ধরণের। ভারতের পক্ষে ইহা যে একটা গুরুতর সমস্যা, তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গারের রিপোর্টে যে তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সমগ্রভাবে সর্ব্বভারতীয় সমস্যার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

ভারতীয় জনসাধারণের জীবিকার্জ্জনের সূত্রটিও প্রসঙ্গক্রমে রিপোর্টে স্থান পাইয়াছে। তদনুসারে দেখা যাইতেছেঃ 'কৃষিই ভারতীয় জনজীবনের এখনও প্রধান অবলম্বন। প্রায় ২৫ কোটি লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং ১০ কোটির কিঞ্চিদধিক লোক অকৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ভূমিবান এবং ভূমিহীন কৃষিজীবীর জনসংখ্যার পার্থক্যটিও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১৬ কোটি ৭০ লক্ষ লোক নিজের জমিতে চাষ করে এবং সাড়ে সাত কোটিরও অধিক সংখ্যক লোক পরের জমিতে চাষ করে। কৃষিকার্য্য না করিয়াও শুধু ভূমিস্বত্বের অনুগ্রহে কৃষিজাত সম্পদ উপভোগ করে, এইরূপ নিষ্কর্ম্মা ভোগীর সংখ্যাও ৫৩ লক্ষের উপর। অথচ, কৃষিকার্য্যে নিছক মজুর হইয়া যাহারা খাটে, তাহাদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চারি কোটি।' রিপোর্টে উল্লিখিত এই হিসাব অনুযায়ী ভারতের ভূমিব্যবস্থার জটিলতা, অসামঞ্জস্য ও বৈষম্যই বিশেষ ভাবে প্রতীয়মাণ হয়। সাম্প্রতিক 'ভূমিদান যজ্ঞ' এবং 'জমিদারী উচ্ছেদ' দ্বারা এই অসামঞ্জস্য ও বৈষম্য বিদূরিত হইলে মঙ্গলের কথা।

রিপোর্ট অনুযায়ী আরও দেখা যায় যে, সহর ও গ্রামের পারস্পরিক তুলনায় ন্যূনাধিক প্রায় ৩০ কোটি লোক এখনও গ্রামে বাস করে এবং মাত্র ৬ কোটির মতো লোক সহরবাসী।

ভারতীয় জীবনকে স্বভাবতঃই তাই পল্লীগত বলা যায়। কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় পল্লীর বহুমুখী ভাঙনের উপর সহরগুলি বাড়িয়া উঠিতেছে। অথচ পল্লীর ভাঙন যে সারা ভারতের প্রাণশক্তিরই ভাঙন, ইহা আজ আর নতুন করিয়া বলিবার কিছু নাই। পল্লীকে সমৃদ্ধ করিতে না পারিলে, গ্রামীন সভ্যতার দিকে মানুষকে আবার ফিরাইয়া লইতে না পারিলে যে ভারতের আত্মা শুকাইয়া যাইবে, ইহা নিশ্চিত। জনসংখ্যার সাম্প্রতিক বর্দ্ধিত হারের দিক হইতেই তাই ভারতের ব্যাপক কল্যাণকর কার্য্যসূচী পরিকল্পনা কমিশনকে গ্রহণ করিতে হইবে। এ সম্পর্কে আমরা ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

উন্মাদ-আধিক্য ও তাহার প্রতিকার

যান্ত্রিক সভ্যতার আজ চরম সঙ্কটক্ষণ উপস্থিত। একদিকে মানুষের উদয়াস্ত জীবিকা-সংগ্রাম ও সেই সংগ্রামজনিত মানসিক চাপ ও ক্লান্তি, অন্যদিকে উপযুক্ত খাঁটি আহার্য্যের অভাবে অপুষ্টি ও ভেজালজনিত প্রতিক্রিয়া,—ইহার ফলে দেশে আজ অন্যান্য রোগ ও অকালমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উন্মাদের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতেছে। ক্রমাগত জীবনীশক্তি হ্রাসের এই সমস্যা মানসিক বিকৃতির রূপ লইয়া যেভাবে দেখা দিতেছে, তাহাতে পরবর্তী প্রজন্ম ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হইবে বলিয়াই আশঙ্কা হয়। বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের মধ্যেই এই রোগের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করিয়া গত ১৪ই মে সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসরের এতদ্বিষয়ক এক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার মাধ্যমে বলিয়াছেনঃ অপুষ্টির ফলে পেশীজাল ও আভ্যন্তরীণ গ্রন্থিসমূহের উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়া থাকে; তাহাতে শরীরের অভ্যন্তরে অবাঞ্ছিত পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। ইহাই পরিশেষে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করিয়া ফেলে। মধ্যবিত্ত লোকেদের অপুষ্টির মূলে রহিয়াছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা; এইগুলিই তাহাদের চিত্তবৃত্তির উপর নিদারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতেছে; এবং এই কারণেই বর্ত্তমানে মানসিক ব্যাধি এত বেশী বিস্তারলাভ করিতেছে। অথচ এই অবস্থার আকস্মিক প্রতিকার একান্ত প্রয়োজন।

অথচ কিভাবে যে ইহার আশু প্রতিকার সম্ভব, জনসাধারণ সে বিষয়ে একরূপ অজ্ঞ। এ ক্ষেত্রে প্রতিকারের দায়িত্ব একমাত্র দেশীয় সরকারের। কিন্তু তাঁহারাও এ বিষয়ে উদ্যোগি বলিয়া মনে হয় না। একটি স্বাধীন দেশের সরকারের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিৎ—জনসাধারণের মধ্যে কেহ যাহাতে বিশেষ একটা রোগগ্রস্ত না হয়। তজ্জন্য ইউনিট ভাগ করিয়া প্রতি ইউনিটে সরকারী পর্য্যবেক্ষণাধীনে চিকিৎসক নিযুক্ত করা আবশ্যক। অথচ তাহার কোনো সম্ভাবনাই এদেশে নাই। এখানে রোগ হইলে তবেই তাহার জন্য ডাক্তারের দরজা খোলা রহিয়াছে, সুস্থ মানুষ যাহাতে রোগগ্রস্ত না হয়, তজ্জন্য সরকারের তরফ হইতে কোনো ডাক্তারী ব্যবস্থা নাই। দ্বিতীয়তঃ, যেসব কারণে এই মানসিক রোগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে, তৎসম্পর্কে উক্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মহোদয় একেবারেই মিথ্যা ভাষণ দেন নাই। এক্ষেত্রে দুইটি উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন। প্রথমতঃ মানুষকে উপযুক্ত গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া অপুষ্টিকর ও ভেজালজনিত খাদ্যসামগ্রীর প্রচলন রোধ করিয়া খাঁটি বস্তুর সরবরাহ করা এবং দ্বিতীয়তঃ যাহারা রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, উপযুক্ত হাসপাতালের অনুকুল পরিবেশে রাখিয়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা অবিলম্বে তাহাদিগকে আরোগ্য করিয়া তোলা। এই দুইটি কাজই কঠিন এবং দুইটিই সরকারী ব্যবস্থা ভিন্ন সম্ভব নয়।

জনসাধারণের কাছে হাসপাতাল-সমস্যাও আজ একটা গুরুতর সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। যে কোনো রোগীর পক্ষেই আজ আর কোনো হাসপাতালই সহজগম্য কেন্দ্র নয়। সর্ব্বত্রই অসম্ভব ভীড়। ফলে চিকিৎসাও কোনো ক্ষেত্রে সুচিকিৎসার পথ ধরিয়া চলিতেছে না। রাঁচীর মানসিক ব্যাধি চিকিৎসালয়ে পশ্চিমবঙ্গের মাত্র ৭টি বেড আছে। এই বেডগুলি কোনো সময়ই ফাঁকা যায় না। কলিকাতায়ও একটি মানসিক ব্যাধি পর্য্যবেক্ষণ কেন্দ্র আছে, উহাতে মাত্র ৩০ জন রোগী থাকিতে পারে। সম্প্রতি যদিও বেডসংখ্যা সামান্য বাড়ানো হইয়াছে, তথাপি ইহাও এই ব্যাপক মানসিক রোগগ্রস্ততার পক্ষে মোটেই পর্য্যাপ্ত নয়। উহা দ্বারা এতবড় সমস্যার কতটুকুই বা সমাধান হইতে পারে? উক্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মহোদয় অবশ্য কলিকাতার নিকটে পাঁচশত বেড সমন্বিত একটি হাসপাতাল ও জেলা-হাসপাতালসমূহে উহার শাখা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের সরকারী কর্তৃপক্ষের কর্ম্মতৎপরতায় তাহা কতখানি ফলপ্রসূ হইবে, ইহাই প্রশ্ন। সাধারণ রোগীদের সুচিকিৎসা ও সুব্যবস্থার জন্যই সরকারী কর্তৃপক্ষ এ পর্য্যন্ত প্রয়োজনানুরূপ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তদুপরি কোনো নতুন স্কীমের

কথা কর্ণগোচর হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের বিরক্তির কারণ হইবে। কিন্তু ইহা যে আদৌ বিরক্তি বা অবহেলার বিষয় নয়, এ কথা কে বুঝাইবে। তাঁহাদের কর্ম্মোন্মাদনার ক্ষেত্রটি হয়ত উন্মাদাগার হইলে কথা ছিল না. কিন্তু একথাও ঠিক যে অধিককাল এ বিষয়টি সম্পর্কে উদাসীন থাকিলে তাঁহাদের উন্মাদনাও উন্মাদগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। অতএব অবিলম্বে তাঁহারা ইহার অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া জাতীয় অধঃপতন ও মৃত্যু হইতে দেশকে রক্ষা করুন, ইহাই আমাদের বক্তব্য।

পশ্চিমবঙ্গে দুর্ভিক্ষের ছায়া ও খাদ্যসমস্যা

সম্প্রতি দুর্ভিক্ষের কালো ছায়ায় পশ্চিমবঙ্গের আকাশ আবার মসীলিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। নদীয়া ও ২৪ পরগণার কয়েকটি অঞ্চল হইতে গত এক মাসে সহস্র সহস্র অনশন-ক্লিষ্ট মানুষ কলিকাতার রাজপথের দিকে ছুটিয়া আসিয়াছে। তাহাদের ধারণা—নিভৃত গ্রামের অনিশ্চিত জীবন-যাত্রার গ্লানি হইতে বাহির হইয়া পাষাণপুরি কলিকাতার পথে গিয়া একবার দাঁড়াইতে পারিলেই সরকার ও জনসাধারণের আনুকূল্যে তাঁহাদের জীবিকাসংস্থান কোনোভাবে ঘটিয়া যাইবেই। কিন্তু কলিকাতার দৈনন্দিন জীবন-যাত্রাও যে রেশন-ব্যবস্থার চাপে আজ মফঃস্বল অপেক্ষা অধিক সুখকর নয়, এ সম্পর্কে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে কে? এখানে কে সাহায্য করিবে কাহাকে? যে রেশন-পরিমিত খাদ্যবস্তুর উপর সহরবাসীদের নির্ভর করিতে হয়, তাহা তো তাহাদেরই পক্ষে যথেষ্ট নহে। তাহা হইতে ভাগ দিয়া এক একটা গোটা উপবাসী পরিবারকে তাহারা কেমন করিয়া রক্ষা করিবে? এতকাল কেবল কাগজ-পত্রে যে সমস্যা ও সঙ্কটের আভাষ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এবারে তাহা বাস্তবে মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দিল। ইহার প্রতিকার কি?

১৩৫০-এর মন্বন্তরের ইতিহাস আমরা ইতিমধ্যেই ভুলিয়া যাই নাই। সেদিনও দলে দলে অনাহারক্লিষ্ট মানুষ মফঃস্বলের বিভিন্ন জনপদ হইতে প্রাণের আশায়, খাদ্যের আশায়, আশ্রয়ের আশায় কলিকাতার রাজপথে আসিয়া ভিড় করিয়াছিল। তখন ছিল বৃটিশ শাসন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যজ্ঞহুতাগ্নিতে চারিদিক জ্বলিয়া উঠিয়াছে। একদিকে মুদ্রাস্ফীতিজনিত মুষ্টিমেয় এক শ্রেণীর মানুষের লীলাবৈচিত্র্য, আর একদিকে লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্ট মানুষের মৃত্যুকান্না। কলিকাতার রাজপথ সেদিন নরকঙ্কালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। কিছু লঙ্গরখানা, কিছু সেবায়তনের সাহায্য সেই ব্যাপক দুর্ভিক্ষের পক্ষে আদৌ পর্য্যাপ্ত ছিল না। আজ যদিও মহাযুদ্ধ উত্তীর্ণ, দেশ স্বাধীন, মুদ্রাস্ফীতি একেবারেই সঙ্কুচিত, তথাপি ব্যাপক দুর্ভিক্ষের সাহায্যে কলিকাতার সহায়তা সেদিনের মতই পর্য্যাপ্ত নয়। সেদিন দেশের মানুষের হাতে তবু কিছু অর্থ ছিল, আজ তাহারাও নৈরাশ্যের অন্ধকারে মূহ্যমান।

এবারে প্রধানত সুন্দরবনকে কেন্দ্র করিয়া এই দুর্ভিক্ষ গড়িয়া উঠিলেও অতঃপর পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অদ্যাবধি যাহারা দুর্গতির চরম সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহারা প্রধানত নিম্নবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ—যাহাদের একটা বৃহত্তর অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে কৃষক-সমাজ। তিলে তিলে তাহারা এই চরম সঙ্কটের পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বস্তির বিষয় যে, অবস্থা এখনও আয়ত্বের বাহিরে গিয়া দাঁড়ায় নাই। সুন্দরবনের খাদ্যসঙ্কটের গুরুত্ব সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারকেও যথাসময়েই অবহিত করা হইয়াছে। লোকসভায় ইহার প্রতি সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে এবং সরকারও সঙ্গে সঙ্গেই ইহার তদন্তকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন এবং দুর্গত অঞ্চলের জন্য অধিকতর খাদ্যবরাদ্দ মঞ্জুর করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই যে প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট হইবে না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। ভারত সরকারের সংগৃহীত মজুদ খাদ্যশস্যের সাম্প্রতিক যে অবস্থা, তাহাতে একদিকে অধিক ব্যয় করিতে গিয়া অন্যদিকে টান পড়া অস্বাভাবিক নয়। অতএব মাপিয়া জুকিয়া কতখানি সাহায্য দেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব হইবে, তাহাও বিবেচনার বিষয়। দ্বিতীয়তঃ এক্ষেত্রে সাময়িক সাহায্যটাই যথেষ্ট নয়। দুর্ভিক্ষের মূল কারণগুলি অনুসন্ধান করিয়া তদ্বিষয়ে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনও আশু প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সহরে দিন দিনই চাউলের মূল্য যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা অচিরেই রোধ করিতে না পারিলে অতঃপর হয়ত গোটা পশ্চিমবঙ্গকেই দুর্ভিক্ষের শ্মশানে বসিয়া মৃত্যুসাধনা করিতে হইবে! নদীয়া ও ২৪-পরগণার মতো বাঁকুড়া জেলাও ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষ অধ্যুষিত হইয়া পড়িয়াছে। কোথাও আজ আর চাউলের মূল্য মণ প্রতি ৫০ টাকা হইতে ৬৮ টাকার নিচে নাই। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা—এই মূল্য অচিরে আরও বৃদ্ধি পাইবে। এদিকে অবশ্য ভারত সরকার দ্রব্যমূল্য হ্রাসের

উপর জোর দিয়াছেন, কিন্তু অবস্থা পারম্পর্যে মনে হইতেছে, তাহা কার্য্যকরী হইতে দীর্ঘমেয়াদী সময় লাগিবে। এই সময়ের মধ্যে দেশের মানুষের কি অবস্থা দাঁড়াইবে, তাহাই প্রশ্ন। কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বে চাউলের রেশন তুলিয়া দিবার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্গত সময়ে চাউলের রেশন-প্রবর্ত্তন চালু না থাকিলে যে অরাজকতার সৃষ্টি হইতে পারে, সেদিকেও চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। কথা রেশন প্রবর্ত্তন লইয়া নয়, বরাদ্দ লইয়া। মাথাপিছু চাউলের যে বরাদ্দ বাঁধা রহিয়াছে, তাহাতে কোনো একটি মানুষও সুস্থভাবে বাঁচিতে পারে না। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষাবস্থার সৃষ্টি হইলে খাদ্যশস্য পরিবেশন সংক্রান্ত যে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়, তাহাতে অন্পভোজি ব্যক্তিদিগকে গমজাত দ্রব্যে অভ্যস্ত হইয়া উঠিবার ইঙ্গিত ছিল, কারণ শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আজ চাউলের ঘাটতি দেখা যাইতেছে। অতএব প্রয়োজন হইলেই যে বিদেশ হইতে চাউল রপ্তানী করা সম্ভব হইবে তাহা নয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের বর্ত্তমান অসন্তোষের তিনটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন, যথাঃ (১) চাউলের অভাব ও উচ্চ মূল্য, (২) গমজাত দ্রব্য ভোজনে জনসাধারণের অনিচ্ছা, এবং (৩) রাজনৈতিক দলসমূহের প্ররোচনার ফলেই বর্ত্তমান অসন্তোষ দেখা দিয়াছে।

সরকারী বিবৃতির ৩নং অনুচ্ছেদটি যে একেবারেই মূল্যহীন, ইহা প্রকাশ করিয়া যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজেব উপরেই কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। একটা রাজ্যের দুর্ভিক্ষের যে ইহাই একমাত্র কারণ হইতে পারে না, ইহা বোধ করি সরকারী কর্তৃপক্ষ নিজেরাও উপলব্ধি করিবেন। আজ এই রাজ্যে যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার আশু সমাধানের দায়িত্ব প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহারা এ বিষয়ে খুব বেশীদূর অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। দুর্ভিক্ষের গতিবেগকে অবিলম্বে রোধ করিয়া অধিবাসীদের জীবনযাত্রা সাবলীল অবস্থার মধ্যে ফিরাইয়া আনিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম দুইটি কাজ নির্ব্বাহ হওয়া সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজন। প্রথমতঃ, যে সমস্ত অনশনক্লিষ্ট মানুষ ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া খাদ্য ও আশ্রয়ের আশায় কলিকাতার দিকে অনবরত আসিয়া ভিড় করিতেছে, তাহাদিগকে উপযুক্ত খাদ্য এবং রোগীদিগকে উপযুক্ত সুশ্রূষা ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাহাদের নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরাইয়া লইয়া স্ব স্ব স্থানে পুনর্প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে হইবে; অন্যথায় কলিকাতার নাগরিক জীবনও ভাঙিয়া পড়িবে। দ্বিতীয়তঃ, তাহাদের মধ্যে যাহারা বেকার ও সহায়হীন, তাহাদের জীবিকার্জ্জনের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া পুত্র পরিবার সহ তাহাদের বাঁচিবার পথকে প্রশস্ত করিয়া দিতে হইবে। এ কাজ কঠিন হইলেও অনিবার্য্য প্রয়োজন। আশা করি এই প্রয়োজনের পথে নামিয়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে দুর্ভিক্ষোত্তীর্ণ সুস্থ ও সাবলীল অবস্থার মধ্যে অবিলম্বে ফিরাইয়া আনিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদের চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না।

পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রিসভা

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গত ১১ই জুন পশ্চিমবঙ্গের পুরাতন মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন এবং কংগ্রেসদলের নেতা বিদায়ী মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। উক্ত দিবস সায়াহ্নে রাজভবন হইতে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বর্তমান বিদায়ী মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র পেশ, রাজ্যপাল কর্তৃক ডাঃ রায়কে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান, ডাঃ রায় কর্তৃক রাজ্যপালের নিকট নূতন মন্ত্রিসভার তালিকা পেশ এবং রাজ্যপাল কর্তৃক উহা অনুমোদনের কথা ঘোষণা করা হয়। ১৪ জন মন্ত্রী এবং ১৬ জন উপমন্ত্রী লইয়া এই নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করা হইয়াছে। উক্ত ১৪ জন মন্ত্রীর মধ্যে বিদায়ী মন্ত্রিসভার ৭ জন মন্ত্রী আছেন, বাকী ৭ জনকে নূতন গ্রহণ করা হইয়াছে। মন্ত্রিমণ্ডলী নিম্নোক্তরূপে গঠিত হইয়াছেঃ

(১) **ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়**, মুখ্যমন্ত্রী, তৎসহ স্বরাষ্ট্র, উন্নয়ন, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য, অর্থ, বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প; (২) **শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা**, কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প; (৩) **শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর**, মৎস এবং বন; (৪) **শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জ্জি**, সেচ ও জলপথ; (৫) **শ্রীশ্যামাপদ বর্ম্মণ**, আবগারী; (৬) **শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত**, পূর্ত্ত ও ভবন নির্ম্মাণ; (৭) **শ্রীরাধাগোবিন্দ রায়**, উপজাতি কল্যাণ; (৮) **শ্রীঈশ্বরদাস জালান**, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন; (৯) **শ্রীমতী রেণুকা রায়**, উদ্বাস্তু সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন; (১০) **শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন**, খাদ্য, সাহায্য ও সরবরাহ; (১১) **ডাঃ আর আমেদ**, কৃষি ও সমবায় ঋণ; (১২) **শ্রীপান্নালাল বসু**, শিক্ষা; (১৩) **শ্রীকালীপদ মুখার্জ্জি**, শ্রম; এবং (১৪) **শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু**, বিচার ও বিধান।

উপমন্ত্রিদের মধ্যে রহিয়াছেনঃ (১) **শ্রীসতীশচন্দ্র রায় সিংহ**, পরিবহন; (২) **শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক**, প্রতিরক্ষা; (৩) **ডাঃ জীবনরতন ধর**, কারা; (৪) **শ্রীগোপিকাবিলাস সেন গুপ্ত**, প্রচার ও সংযোগ; (৫) **শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ**, উপনগর নির্ম্মাণ; (৬) **ডাঃ অমূল্যধন মুখার্জ্জি**; (৭) **শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র**; (৮) **শ্রীতেঞ্জিং ওয়াংদি**; (৯) **শ্রীযুক্তা মীরা দত্তগুপ্তা**, সাহায্য; (১০) **শ্রীবীজেশচন্দ্র সেন**, পুনর্ব্বাসন; (১১) **শ্রীঅমরজিৎ ব্যানার্জ্জি**, খাদ্য; (১২) **শ্রীরজনীকান্ত প্রামাণিক**, সরবরাহ; (১৩) **জনাব আব্দুস সুকুর**, কৃষি; (১৪) **শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়**, সমবায় ঋণ; (১৫) **শ্রীযুক্তা পূরবী মুখার্জ্জি**, নারীশিক্ষা; এবং (১৬) **শ্রীশিবকুমার রায়**।

বর্ত্তমান বিদায়ী মন্ত্রিসভায় মোট ১৩ জন মন্ত্রী ছিলেন। কোনো উপমন্ত্রী ছিলেন না। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার কর্ম্মক্ষেত্রে উপমন্ত্রী ছাড়াও কিছু সংখ্যক পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত করিবার কথা আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫২ সালের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫২ সালের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল সম্প্রতি গত ২রা জুন প্রকাশিত হইয়াছে। এ বৎসর আই-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণের হার শতকরা ৩০·৩৭ জন এবং আই-এস্-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার শতকরা ৩২·৭৬ জন। গত বৎসর এই হার ছিল যথাক্রমে ২৯·৩ এবং ৩২·৫ জন। উত্তীর্ণের হার হইতে যদিও দেখা যায় যে, এ বৎসর পাশের সংখ্যা স্বল্পসংখ্যক বৃদ্ধি পাইয়াছে, তথাপি ইহাকে ঠিক বার্দ্ধিত হার বলা যায় না। প্রতি একশো জনে ৬৮ হইতে ৭০ জন ছাত্রের প্রতি বৎসর এই অকৃতকার্য্যতার পরিণতি সমাজজীবনের কোন্ পর্য্যায়ে গিয়া দাঁড়াইবে, ইহাই প্রশ্ন। গত কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার এই রূপ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়ার ইতিহাস আরও উদার পন্থার উপর ভিত্তিশীল ছিল। স্যার আশুতোষের স্বপ্ন ছিল—বাংলার ঘরে ঘরে তিনি গ্র্যাজুয়েট তৈরী করিবেন। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তৃতি ছিল সমগ্র বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম পর্য্যন্ত। আজ তাহার বিস্তৃতিও যেমন সংক্ষুব্ধ, তাহার শিক্ষাক্ষেত্রও তেমনি বিপর্য্যস্ত।

বাংলার সাধারণ অভিভাবক শ্রেণী কায়ক্লেশে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সন্তানদের স্কুল-কলেজে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আশা—দুই দিন বাদে পাশ করিয়া বাহির হইয়া অর্থনৈতিক জীবনে প্রবেশ লাভ করিয়া পরিবার-পরিজনের ভার গ্রহণে সে সক্ষম হইবে। কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার বর্ত্তমানে যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে ছাত্রদের অপেক্ষা অভিভাবক শ্রেণীর উপরেই চাপটা অত্যধিক পড়িয়াছে। প্রতি বৎসর যদি শতকরা ৬৮ হইতে ৭০ সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়, তবে তাহাদের মধ্যে কয়টি ছাত্রের পক্ষে পুনরায় কলেজে ভর্ত্তি হইয়া অধ্যয়ন তপস্যায় মনোনিবেশ করা সম্ভব? বর্ত্তমান বাংলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সূত্রেই এই প্রশ্ন আসে। এই সব ছাত্রদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। মধ্যবিত্ত অভিভাবক শ্রেণীর দুঃখ, দুর্দ্দশা ও লাঞ্ছনার চিত্র আজ আর নতুন করিয়া তুলিয়া ধরিবার প্রয়োজন নাই। এইসব দিকে বিবেচনা করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে ছাত্রকৃতি সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নেই সতর্ক হওয়া উচিৎ।

পরীক্ষার ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করিয়া এবারে দেখা যাইতেছে অকৃতকার্য্য ছাত্রদের অধিকাংশই ইংরেজিতে ফেল করিয়াছে। ইংরেজি উচ্চ-শিক্ষার বাহন হইলেও স্বাধীন ভারতে ইহাকে 'সেকেণ্ড ল্যাঙ্গোয়েজ' বলিয়া গ্রহণ করিয়া হিন্দিকেই রাষ্ট্রিয় ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও ইংরেজি-ফেলের সংখ্যাকে এত অধিকভাবে ধরিয়া লইয়া পরীক্ষার ক্ষেত্রে এইরূপ ছাত্রনিধনের প্রয়াস কেন? ইতিপূর্ব্বে কথা উঠিয়াছিল—ইণ্টারমিডিয়েটে ইংরেজি প্রশ্নপত্র তিনখানির যায়গায় দুইখানি করিয়া বাংলা প্রশ্নপত্র একখানির স্থলে দুইখানি করা হইবে। অর্থাৎ ইংরেজি ও বাংলার পুরাপুরি প্রশ্নপত্রের নম্বর ১০০+১০০=২০০ হইয়া দাঁড়াইবে। ইহাতে একদিকে ছাত্রদের মাতৃভাষার উপর যেরূপ জোর দেওয়া হইত, ইংরেজি প্রশ্নকে সংক্ষিপ্ত করিয়াও ইংরেজি-সাহিত্য সম্পর্কে তেমনি তাহাদিগকে সচেতন করিয়া তোলা সহজ হইত। কিন্তু এ বৎসরও তাহার কোনো কার্য্যকারিতা দেখা গেল না। বরং ইংরেজি সম্পর্কে আরও অধিক কড়াক্কড়ি স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

বিশ্ববিদ্যালয় অভিযুক্ত করিবেন ছাত্র-সমাজকে। তাহারা যদি মন দিয়া পড়াশুনা করে, তবে তাহারা অকৃতকার্য্য হইবে কেন? কথাটা সর্ব্বৈব অস্বীকার্য্য নয়। আমরাও দেখিয়াছি—দুর্নীতির আশ্রয় লইয়া ছাত্র-সমাজ আজ কি ভাবে নীতিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। হুজুগ পাইলে তাহাদের আর নান্যপন্থা। গৃহ হইতে পরীক্ষার

ইহা পর্য্যন্ত তাহাদের ভয়ে অভিভাবক, গার্ড ও অধ্যাপক-শ্রেণীকে সর্ব্বদা আজ সন্ত্রস্ত হইয়া চলিতে হয়। মাত্র দশ বৎসর পূর্ব্বেও এ অবস্থা ছিল না, প্রাচীন ভারতের কথা এখানে নাইবা তুলিলাম। কিন্তু এমন দুর্নীতি অকস্মাৎ এভাবে মাথা চাড়া দিয়া জাগিয়া উঠিল কেমন করিয়া? ইহার জন্যও কি পূর্ব্বসূরিরা দায়ী নহেন? অর্থাৎ আমাদেরই পাপে আমাদের যুবক তথা ছাত্র-সমাজের এই পরিণতি। বিশ্ববিদ্যালয় কোনোদিনই তাহাদের সামনে এমন কোনো সুমহান আদর্শ তুলিয়া ধরিতে পারেন নাই—যাহা দ্বারা অধ্যয়নের মাধ্যমে তাহাদের মানবিক চরিত্রের বিকাশ ঘটিতে পারে। শুধু পুঁথিগত বিদ্যার জোরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ছাপ আঁটিয়া দিয়া এতকাল ছাত্র-সমাজকে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে জীবনের বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে। ফলে শিক্ষাতেও যেমন তাহাদের ভেজাল থাকিয়া গিয়াছে, জীবনের ক্ষেত্র হইতেও তেমনি তাহারা পিছাইয়া পড়িয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্রদিগকে যথোপযুক্তভাবে পড়ানো হয় না; এতদ-সম্পর্কিত প্রশ্নে কোনো অধ্যাপককে এমন কথাও আমরা বলিতে শুনিয়াছি যে, তাঁহাদিগকে এমন নয়শো পঞ্চাশ কি মাহিয়ানা দেওয়া হয়—যাহার জন্য অধিক পরিশ্রমে অধিক যত্ন লইয়া তাঁহারা অধ্যাপনা কার্য্য সমাধা করিবেন? বস্তুতঃ ইহা কোনো যুক্তি হইতে পারে না। অধ্যাপকেরা সর্ব্বত্র 'এ্যাপয়েন্টমেন্ট' লইয়াই স্বেচ্ছায় অধ্যাপনাকার্য্যে যোগদান করেন। মাহিয়ানা তাঁহাদের পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। সেই মাহিয়ানাকে স্বীকার করিয়া লইয়া যে-অধ্যাপক কলেজি-শিক্ষকতায় যোগদান করেন, ছাত্রদিগকে উপযুক্তভাবে গড়িয়া তুলিবার দায়িত্বও যে তখন হইতেই তিনি গ্রহণ করিয়া লইলেন। ইহাতে ব্যত্যয় ঘটিলেই তাঁহার অযোগ্যতা প্রমাণিত হইবে। তবে কি বিশ্বাস করিব যে, পশ্চিমবঙ্গ আজ অযোগ্য অধ্যাপকে ভরিয়া গিয়াছে! ইহা বলিলে যে গোটা শিক্ষা বিভাগকেই অপমান করা হয়! শিক্ষকের অপমান আমরা অবশ্য সহ্য করিব না? আমাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে, কলেজগুলিতে উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে ছাত্রদের পরীক্ষার পাশের হার আজ এই রূপ মর্ম্মান্তিক অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইত না। ইহার পিছনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবশ্যই ঔদাসীন্য ও অবহেলা রহিয়াছে, সেই ঔদাসীন্য ও অবহেলা দূর করিতে হইবে, ইহার জন্য প্রয়োজন বোধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর বিশ্ববিদ্যালয়কে অবশ্যই চাপ দিতে হইবে, এবং আবশ্যক হইলে সরকারী কর্তৃপক্ষের হাতও এক্ষেত্রে প্রসারিত করিতে হইবে। কারণ দেশের শিক্ষার উত্থান-পতনের সঙ্গে দেশের জাতীয় সরকারও আজ সমভাবেই সুখে দুঃখে জড়িত।

আর একটি কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিষয়টি সম্পর্কে গতবারই আমরা কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। তাহা হইতেছে পরীক্ষার পাশের হারের সঙ্গে জীবিকা-র্জ্জনের বিষয় লইয়া। সরকারী তরফ হইতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট এমন একটি আবেদন তুলিয়া ধরা অযৌক্তিক নয় যে, পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যানুপাতে আজ কি শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে, কি সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে এমন সুযোগ নাই যাহাতে প্রত্যেকের জীবিকাসংস্থান করিয়া দেওয়া সম্ভব। ছাত্রদের অনেকেই পাশ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া জীবিকা সংস্থানের জন্য চেষ্টিত হইয়া ওঠে। প্রতি বৎসর যদি এইরূপ অধিক সংখ্যক ছাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গণ্ডি ছাড়িয়া জীবিকা সংগ্রামের প্রতিযোগিতায় আসিয়া দাঁড়ায়, তবে কোথায় তাহাদের কি ব্যবস্থা হইতে পারে! অতএব বিশ্ববিদ্যালয়কে পাশের হার সঙ্কুচিত করিবার প্রয়োজন।—কিন্তু সুষ্ঠু একটা সমাজ-দেহের পক্ষে ইহা যে কত বড় ব্যাধিস্বরূপ, তাহা কি একবারও কেহ তলাইয়া দেখিয়াছেন? যদি অনুরূপ বিষয়ও দাঁড়ায়, তবে জাতীয় সরকারকেই ইহার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে হইবে। তাই বলিয়া শিক্ষা ও পাশের মান নিম্নাভিমুখী হইবে কেন?

বিষয়গুলি সম্পর্কে আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা সরকারী কর্তৃপক্ষকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলি।

মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড-পরিচালিত প্রথম স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষার ফল

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত প্রথম স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এবারে পরীক্ষার্থী ছিল ৪২,৭২৭ জন। তন্মধ্যে শতকরা ৫০·১ ভাগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহা আশা এবং আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। উত্তীর্ণ ছাত্র-বর্গের মধ্যে কলিকাতার স্কটিশ চার্চ্চ কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র শ্রীদীপঙ্কর চক্রবর্ত্তী প্রথম এবং বালিগঞ্জ গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের ছাত্র শ্রীসুশীল চৌধুরী ও নিউ আব্দুল এইচ-ই স্কুলের ছাত্র শ্রীভীষ্মদেব ভট্টাচার্য্য দ্বিতীয় স্থান

অধিকার করিয়াছে। ছাত্রীদের ক্ষেত্রে কলিকাতার সেণ্ট জন্স ডায়োসেশান গার্লস্ হাই স্কুলের ছাত্রী শ্রীমতী অমিতা মজুমদার প্রথম এবং আদি মহাকালী পাঠশালার ছাত্রী শ্রীমতী যূথিকা ধর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

গত ১৯৫১ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বাধীনে যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা চলিয়া আসিতেছিল, এ বৎসর হইতে তাহার পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিল। স্বতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া উক্ত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা 'স্কুল ফাইনাল এগ্‌জামিনেশন' নামে এই পরিষদের কর্তৃত্বাধীনেই এই বৎসর হইতে পরিচালিত হইতে আরম্ভ হইল। পরিষদ-পরিচালিত এই প্রথম পরীক্ষার ফল বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালিত পূর্ব্ব বৎসরগুলির ফলাফল অপেক্ষা যে উন্নত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা যদি নিতান্তই বিশ্ববিদ্যালয়কে টেক্কা মারিবার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে—মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ ক্রমিক যত্নের দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিকতর স্বাবলম্বন ও কীর্ত্তির পরিচয় দিতে সক্ষম হইবেন।

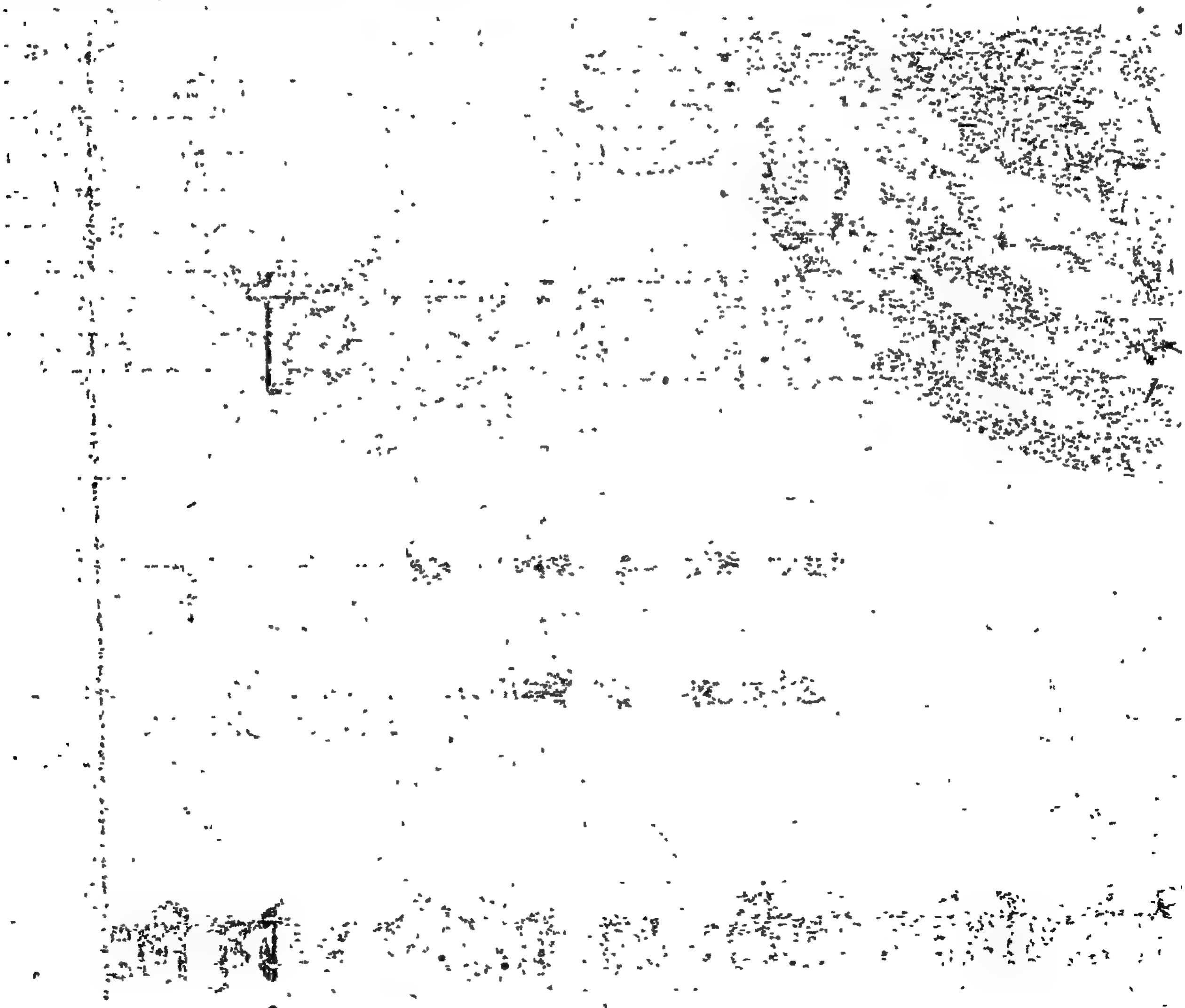

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড
৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

CENTRAL LIBRARY. UNIVERSITY

বিংশ বর্ষ — শ্রাবণ—১৩৫৯ — ১ম খণ্ড—২য় সংখ্যা

উপনিষৎ ও গীতা

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় আর্য্য হিন্দুর বেদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। বেদ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব এই ৪ ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বেদে পৃথক পৃথক সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ-সমূহ দৃষ্ট হয়। বেদের ৪টী উপবেদ, ৬টী বেদাঙ্গ ও ৪টী উপাঙ্গ আছে। উপবেদ যথাঃ (১) আয়ুর্ব্বেদ, (২) ধনুর্ব্বেদ, (৩) গান্ধর্ব্ব বেদ, (৪) অর্থশাস্ত্র। বেদাঙ্গ যথাঃ (১) শিক্ষা, (২) কল্প (শ্রৌতি, গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্র), (৩) ব্যাকরণ, (৪) নিরুক্ত, (৫) ছন্দ ও (৬) জ্যোতিষ। উপাঙ্গ যথাঃ (১) পুরাণ, (২) ন্যায় (গৌতমীয় ও বৈশেষিক), (৩) মীমাংসা (কর্ম্ম বা পূর্ব্ব মীমাংসা এবং ব্রহ্ম ব উত্তর মীমাংসা) এবং (৪) ধর্ম্মশাস্ত্র। ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মধ্যে স্মৃতি, মহাভারত, রামায়ণ, সাংখ্য দর্শন, পাতঞ্জল দর্শন, পাশুপত দর্শন, বৈষ্ণব দর্শনাদি সন্নিবিষ্ট। বেদের মোট শাখা ১১৮০টী, প্রতি শাখায় একখানি হিসাবে উপনিষৎ আছে। এই উপনিষৎসমূহের মধ্যে ১০৮খানি উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। এই উপনিষৎ-গুলির মধ্যে মুক্তিক উপনিষৎ মতে মুমুক্ষুর পক্ষে মাণ্ডুক্য উপনিষৎ-ই যথেষ্ট। যাঁরা মাণ্ডুক্য উপনিষৎ পাঠে ঐ উপনিষদোক্ত দর্শন সম্যক আয়ত্ব করতে পারবেন না, তাঁদের জন্য ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, ও বৃহদারণ্যক এই ১০খানি উপ-নিষদের আলোচনা প্রয়োজন। এই ১০খানি পাঠে জ্ঞান না হ'লে ৩২খানি নচেৎ সমগ্র ১০৮খানি উপনিষৎ পাঠ করার প্রয়োজন। এই ১০৮খানি উপনিষদের মধ্যে ঋগ্বেদের অন্তর্গত ১০খানি, শুক্লযজুর্বেদের অন্তর্গত ১৯খানি, কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত ৩২খানি, সামবেদের অন্তর্গত ১৬খানি ও অথর্ব বেদের অন্তর্গত ৩১খানি। উপনিষৎ অতি মহান শাস্ত্র। ইহা পাঠে মানুষের বাসনা, ভাবনা প্রভৃতি দূর হ'য়ে যায়, জ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভ হয় ও অন্তে মানুষ মুক্তিলাভ করেন। অতএব উপনিষৎসমূহই সমস্ত বেদের সার। আরুণিক উপনিষৎ বলেন মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ স্বরূপ ধর্ম্ম প্রতিপাদক ঋগাদি চতুর্বেদের মধ্যে আরণ্যক ভাগ পাঠ করবে, উহারও কর্ম্ম-বিষয়ক অংশ ত্যাগ ক'রে জ্ঞান প্রতিপাদক উপনিষৎ আলোচনা করবে। অমৃত-

নাদ উপনিষৎ বলেন—যতদিন আত্মজ্ঞান লাভ না হয় ততদিন ব্রহ্মবিদ্যা উপার্জ্জনের উপায়স্বরূপ উপনিষৎ অধ্যয়ন ত্যাগ ক'রবে না।

পূর্ব্বে আমরা দেখেছি বেদের উপাঙ্গের মধ্যে আছে পুরাণ, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র। পুরাণসমূহের মধ্যে কোন কোন খানিতে উপনিষদে উক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় উপদেশগুলি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় দেবী ভাগবত পুরাণের অন্তর্গত দেবী গীতা ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত অধ্যাত্ম রামায়ণ। এইরূপ অন্যান্য পুরাণেও আছে। মীমাংসার মধ্যে উত্তর মীমাংসা গ্রন্থখানি উপনিষদোক্ত সত্যসমূহের একটী শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ। ইহা সূত্ররূপে মহর্ষি বেদব্যাস কর্তৃক রচিত। এই সূত্রগুলির প্রকৃত মর্ম্ম নির্দ্ধারণ করা এক দুরূহ ব্যাপার। বিভিন্ন সম্প্রদায় ঐ-গুলির নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুকূল ব্যাখ্যা করেছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে রামায়ণ ও মহাভারত। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণখানি ঋষি প্রণীত এবং ইহাতে সর্ব্ব উপনিষদের সার দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই গ্রন্থখানি আকারে খুবই বড়, তবে ইহা বড়ই উপাদেয় গ্রন্থ। গীতা গ্রন্থখানি মহাভারতের অন্তর্গত। ইহাও সমুদয় উপনিষদের সার এবং ইহা আকারে বেশ ছোট। গীতার ভূমিকায় একটী শ্লোক আছে তাহা হ'তে বেশ বুঝা যায় যে গীতাখানি সমগ্র উপনিষদের নির্য্যাসস্বরূপ। শ্লোক যথাঃ—

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসর সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

বেদান্তের পণ্ডিতগণের মতে উপনিষৎ-ই বেদের অন্তভাগ ব'লে উহাই বেদান্ত। তাঁরা বলেন শাস্ত্র, অবশ্য ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শাস্ত্র প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে নিবদ্ধ। প্রস্থানত্রয় যথাঃ (১) শ্রুতি প্রস্থান—উপনিষৎমালা, (২) ন্যায় প্রস্থান বা বেদান্তদর্শন বা উত্তর মীমাংসা, (৩) স্মৃতি প্রস্থান বা গীতা।

এইবারে আমরা প্রবন্ধোক্ত বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। উপনিষৎগুলির মধ্যে তত্ত্বগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে আছে। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দজী বলেছেন, বন কাটতে কাটতে যেমন এক স্থানে একটী উত্তম ফুলের গাছ বা জলের ঝরণা পাওয়া যায়, সেইরূপ উপনিষদের নানা কথা আলোচনার মধ্যে একটী উচ্চাঙ্গের তত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু উপনিষৎ আকর গ্রন্থ এই জন্য উপনিষদের আলোচনা অপরিহার্য্য। যদি ধৈর্য্যসহকারে উপনিষৎ আলোচনা করা যায় তো সমুদয় অধ্যাত্ম বিদ্যাই করায়ত্ব হয়। মুমুক্ষুগণ যদি এই মহামূল্যবান আকর গ্রন্থের সহিত পরিচিত হ'তে পারেন তো ঐ শাস্ত্রেরই প্রতিধ্বনিস্বরূপ অপরাপর শাস্ত্র আলোচনার পণ্ডশ্রম তাঁহাদের আর করতে হয় না। তবে উপনিষদের সংখ্যাও বড় কম নয় এবং একই বিষয় বিভিন্ন উপনিষদে আলোচিত হ'য়েছে দেখা যায়। এই কারণে মনে হয়—কয়েকখানি উপনিষৎ বাছাই ক'রে নিয়ে সেইগুলি আলোচনা করলেই সমগ্র উপনিষৎ ভাণ্ডারে কি আছে তা জানা যাবে এবং পরিশ্রমেরও কিছু লাঘব হবে। লেখকের মনে হয়—মণ্ডুক, মাণ্ডুক্য, কঠ, তৈত্তিরীয়, এবং শ্বেতাশ্বতর, বহ্বৃচ, অন্নপূর্ণা, বরাহ, রামরহস্য, পৈঙ্গল, মহানারায়ণ ও ত্রিপুরা এই ১২খানি উপনিষৎ পাঠে সমগ্র উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব, মায়া ও শক্তি, প্রণব, সৃষ্টিতত্ত্ব, গুরুবাদ, সন্ন্যাস ও সমাধি প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে যা যা আলোচিত হয়েছে তা সবই জানা যাবে।

এইবার আমরা গীতার কথা কিছু বলব। গীতায় একটী নতুন বিষয় দেখতে পাওয়া যায় যা উপনিষদে স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। এই বিষয়টীর নাম অবতার বাদ। অবশ্য উপনিষদে উক্ত হয়েছে যে, ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। যখন মানুষ সমুদয় জাগতিক ব্যাপার হ'তে তাঁর স্বরূপে অবস্থিত হন, যখন তাঁর কাছে আর মায়ার পর্দ্দা থাকে না, যখন তিনি প্রজ্ঞাবান হন, অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব বিধায়িনী বুদ্ধি সম্পন্ন হন এইরূপ ব্রহ্মবিদ্বরিষ্টই একরূপ গীতোক্ত অবতার কল্প পুরুষ। তবে গীতার বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে পূর্ণাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, তিনি নিজ মায়াশক্তিকে আশ্রয় ক'রে জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৪।৬
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৪।৮

যে মহাশক্তি উপনিষদে বলছেন, অহং ব্রহ্মস্বরূপিনী। মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগৎ ইত্যাদি; সেই মহাশক্তি শ্রীকৃষ্ণরূপে নরবপুধারী হয়ে গীতায় বলছেন—অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ ৭।৬॥ উপনিষদে বা অন্যান্য শাস্ত্রে যে যে বিষয় অলোচিত হ'য়েছে তার সারসংক্ষেপ গীতাতে দেখা যায় এই জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেব গীতাকে সকল শাস্ত্রের সার বলেছেন। উপনিষদের ভাষা অপেক্ষা গীতার ভাষা তুলনায় সহজ, বিভিন্ন উপনিষৎ

পাঠে যে যে বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করা যায়, একমাত্র গীতা পাঠে তাহা সম্ভব হয় অধিকন্তু গীতার বিষয়গুলি পর পর সাজান আছে ইত্যাদি বিবেচনা করলে গীতার প্রতি অনুরাগী না হ'য়ে পারা যায় না। যাঁরা শ্রুতিপ্রস্থান উপনিষৎ ও ন্যায়প্রস্থান বেদান্তদর্শন পাঠে অক্ষম, তাঁদের পক্ষে স্মৃতিপ্রস্থান গীতাই একমাত্র অবলম্বনীয়। এবং ইহাও স্থির সিদ্ধান্ত যে উপনিষৎ, বেদান্ত পাঠে যে ফল লাভ হয় একমাত্র গীতা অনুশীলনেও সেই ফল লাভ হয়। গীতা যেমন উপনিষদের সার, সেইরূপ ইহা বেদান্তদর্শনেরও অর্থ পুস্তকস্বরূপ। স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত গীতার প্রামাণ্য কোন প্রশ্নই উঠে না। অধ্যাত্ম বিদ্যা সম্বন্ধে ইহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য চরম সিদ্ধান্ত। গীতা সম্বন্ধে আর একটী বিষয় ব'লে নিয়ে গীতা ও উপনিষদের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে। দেখা যায় গীতার বিভিন্ন টীকা ভাষ্য প্রভৃতি আছে এবং নিজ নিজ সম্প্রদায় হিসাবে উহারা সকলেই উত্তম, আমরা কোনটীরই বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে ইচ্ছা করি না, তবে গীতা যেমন কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের সমন্বয়মূলক গ্রন্থ, বাঙ্গালী স্যান্নাসী, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, পরমবেদান্তবিৎ মহাত্মা মধুসূদন সরস্বতী মহোদয়ের গূঢ়ার্থ-দীপিকা নাম্নী টীকা ও সেইরূপ জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়মূলক টীকা। এই কারণে গীতার অন্তরতম রহস্য বুঝতে হ'লে আচার্য্য মধুসূদনের টীকা যে বিশেষ সহায়ক ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই টীকার আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে এই টীকাটী সম্পূর্ণ শ্রুতি অনুযায়িনী। অতএব গূঢ়ার্থ-দীপিকা সহায়ে গীতা পাঠ করলে শ্রুতি ও গীতার সারমর্ম্ম অবগত হওয়ার পক্ষে আর কোন প্রতিবন্ধক থাকবে না।

আমাদিগকে নিয়ত স্মরণ রাখতে হবে যে, গীতা উপনিষদের সার। এই কারণে উভয় শাস্ত্রে তত্ত্বগুলির সামঞ্জস্য দেখানর চেষ্টা করা যাচ্ছে। কর্ম্ম সম্বন্ধে উপনিষৎ বলেন ঐহিক বা স্বর্গীয় সুখ কর্ম্মলভ্য এবং ক্ষণস্থায়ী। সকাম কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয়। গীতাতেও বলা হ'য়েছে—

ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্য সত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান॥ ২।৪৫

এখানে বেদ অর্থে কর্ম্মকাণ্ডাত্মক সকামফলদায়ক বেদত্রয়। কৈবল্য উপনিষৎ বলেন বেদবিহিত ও স্মৃতি-বিহিত কর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হওয়া যায় না। কামনা-প্রসূত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল জীবাত্মাকে নানা দেহ ধারণ করায়।

মুক্তিক উপনিষদে আছে যে নাস্তিক, কৃতঘ্ন, দুরাচার-পরায়ণ, ভক্তিহীন ও শাস্ত্রতাৎপর্য্যবোধহীন ব্যক্তিকে কখনও উপনিষৎ দেবে না। গীতাতেও এই বাণীর প্রতিধ্বনি দেখতে পাওয়া যায়—১৮শ অধ্যায়ের ৬৭ শ্লোকে।

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষতে বাচং ন চ মাংযোঽভ্যসূয়তি॥

কঠোপনিষৎ বলেন—এই সংসার অশ্বত্থবৃক্ষ তুল্য অনিত্য। এই বৃক্ষের মূল আদিকারণ ব্রহ্ম। এই বৃক্ষ অনাদি কাল হ'য়ে রয়েছে। জ্ঞানরূপ কুঠার দ্বারা ইহা ছেদন করা যায়। ইহার অনুরূপ বাণী গীতার ১৫শ অধ্যায় প্রারম্ভে দেখা যায়।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ সবেদবিৎ॥

উপনিষৎ বলেন যেরূপ ঘটের বিনাশে ঘটস্থ আকাশের বিনাশ হয় না; সেইরূপ দেহরূপ উপাধির বিনাশে জীবের বিনাশ হয় না। ঘট যেমন পুনঃ পুনঃ নির্ম্মিত হয় ও বিনষ্ট হয়, দেহও সেইরূপে বার বার বিনষ্ট হয়। যেরূপ তিলের মধ্যে তৈল ও দুগ্ধ মধ্যে ঘৃত থাকে, সেইরূপ দেহের মধ্যে শুদ্ধব্রহ্ম অবস্থিত আছেন। গীতাও বলেন অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্য স্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়,
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২।২২

কঠোপনিষৎ বলেন—আত্মার জন্মমৃত্যু নাই, দেহ নষ্ট হ'লেও আত্মার নাশ নাই। আত্মা কাহাকে কখনও হনন করেন না, এবং কখন হত হন না। কঠোপনিষদের যে শ্লোকের ইহা অর্থ সেই শ্লোকটী গীতার ২য় অধ্যায়ের ২০শ শ্লোকের প্রায় অনুরূপ। যথাঃ—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো,
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

উপনিষৎ বলেন ব্রহ্মকে আশ্রয় ক'রে অনাদি মায়ার অনন্ত সৃষ্টিরূপ খেলা চল্‌ছে। এই প্রপঞ্চ মহামায়ার বিলাস। (মহানারায়ণ) গীতাও বলেন—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৯।৮

উপনিষৎ যেমন বলেন যে সগুণব্রহ্ম বা প্রকৃতিকে যিনি অতিক্রম করেন তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম। ইনি কোন কার্য্যের

কারণ নন। যিনি কারণ তিনি সগুণ ব্রহ্ম। (মুণ্ডক) গীতাও সেইরূপ বলেন—

অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥ ১৩।১২
ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। ১৪।২৭

অর্থাৎ নির্গুণব্রহ্মরূপ আমি ব্রহ্মের অর্থাৎ সগুণ-ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। শারীরক উপনিষদে যেমন সাত্বিকব্যক্তিঃ গুণাবলীর বিষয়ের উল্লেখ আছে গীতার ১৬শ অধ্যায়েও সেইরূপ দৈবী আদি সম্পদের উল্লেখ আছে।

দৈবী সম্পদ যথাঃ নির্ভীকতা, সত্ত্বসংশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান লাভে নিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয় দমন, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দা বর্জ্জন, দয়া, লোভরাহিত্য, মৃদুতা, লোকলজ্জা ত্যাগ, চপলতাশূন্যতা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, লোকমান্যাকাঙ্খা ত্যাগ।

আসুরী বা রাক্ষসী সম্পদ যথাঃ— দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অবিবেক, শৌচাচার হীনতা, নাস্তিকতা, মান, মাদমত্ততা, কাম, আশা, লোভ, অহঙ্কার ও ঐহিক সুখস্বতা।

স্কন্দ উপনিষদে উক্ত হয়েছে—ভক্তিযোগে কোন বিঘ্ন নাই। ইহা হ'তে মুক্তি হয় ও তত্ত্বজ্ঞানও লাভ হয়। ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিকে মোক্ষলাভের সকল প্রকার বিঘ্ন হ'তে রক্ষা করেন ও তাহাকে মোক্ষ দান করেন। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলছেনঃ—

ক্লেশোহধিকতরস্তেষাম ব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥
যে তু সর্ব্বানি কর্ম্মানি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ। মষ্যাবেশিত চেতসাম॥

বরাহ উপনিষৎ বলেন—

মচ্চিন্তনং মৎকথনমন্যোন্যং মৎ প্রভাষণম্।
মদেক পরমো ভূত্বা কালংনয় মহামতে॥

অনুরূপ বাণী গীতাতে দেখা যায়। যথাঃ—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিতং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ১০।৯
মাঞ্চ যোহব্যভিচারেন ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ১৪।২৬

ইহাই ভক্তি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান বা মোক্ষ লাভ।

এইবার জীবন্মুক্ত, স্থিরপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে উপনিষৎ ও গীতায় যা উক্ত হয়েছে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত ক'রে প্রবন্ধের উপসংহার করা যাচ্ছে। উপনিষৎ বলেন—

সাধুভিঃ পূজ্যমানেহস্মিন্ পীড্যমানেহপি দুর্জ্জনৈঃ।
সমভাবো ভবেদ্ যস্য স জীবন্মুক্তো ইষ্যতে॥

যাঁহা হ'তে লোক উদ্বিগ্ন হয় না এবং যিনি লোক হ'তে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, যিনি হর্ষ, ঈর্ষা, ভয় ও উদ্বেগ হ'তে মুক্ত তিনিই জীবন্মুক্ত। গীতাও বলেনঃ—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগ ভয় ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ২।৫৬
বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ৫।১৮
সর্ব্বভূতস্থমত্মোনং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈষাতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ৬।২৯
মানপমানয়োস্তুল্যোস্তুল্যো মিত্রারি পক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্চতে॥ ১৪।১৫

উপনিষৎ, বেদান্ত ও গীতারূপ মোক্ষশাস্ত্রের আলোচনা আমাদের দেশে যত হয় ততই আমাদের দেশের ও জাতির মঙ্গল। বেদের জ্ঞানকাণ্ডাত্মক উপনিষৎ অপৌরুষেয় এবং গীতাও স্বয়ং শ্রীভগবানের মুখপদ্ম বিনিঃসৃত, এই কারণে উপনিষৎ এবং গীতা মানবীয় অসম্পূর্ণতাজনক ত্রুটী ও ভ্রান্তি হ'তে মুক্ত। যাঁরা শাস্ত্ররসিক, অথচ বহুরকম মতবাদপূর্ণ বহুশাস্ত্র পাঠদ্বারা চিত্তবিভ্রান্তি ঘটাতে ইচ্ছুক নন, তাঁদের পক্ষে উপনিষৎ ও গীতা পাঠই পর্য্যাপ্ত এবং প্রয়োজনীয়। যে আকর হ'তে গীতা গৃহীত হ'য়েছে, স্বাধ্যায়শীল সাধকের পক্ষে সেই আকররূপ উপনিষৎ পাঠ বিশেষ প্রয়োজন, আবার উপনিষদ-বিদ্যার রহস্য অবগত হ'তে হলে উহার সার ও অর্থস্বরূপ গীতা পাঠও বিশেষ প্রয়োজন। এই কারণে বলা যায় একমাত্র উপনিষৎ ও গীতা পাঠ দ্বারা ভারতীয় আর্য্য জাতির সেই সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগের সুউচ্চ ও অতুলনীয় চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হওয়া যাবে এবং পাঠকের জ্ঞানর্জ্জনস্পৃহারও পরিতৃপ্তি হবে। ইহাই উপনিষৎ ও গীতার সার্থকতা। উপনিষৎ পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং গীতাও অতি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ হ'লেও উহা চিরকাল ধরে চির নূতনই থাকবে। উহাদের আলোচনাই আমাদের জাতীয় চরিত্রকে সবল ক'রে তুলবে এবং সেই সুপ্রাচীন যুগের কৃষ্টির সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখবে।

গল্প লেখকের গঙ্গাযাত্রা

শ্রীঅখিল নিয়োগী

শেষ রাত্তিরে ঘুম নেমে এলো গল্পলেখক গঙ্গাধর গায়েনের দু'টি চোখে!

ক্রমাগত ছ'টি মাস বিনিদ্র-রজনী যাপন করে গঙ্গাধর গায়েন এই মাত্র একটি বাস্তুহারা মেয়ের করুণ কাহিনী শেষ করেছেন! এই বাস্তব গল্পটির রূপ দিতে গিয়ে তাঁকে বেনাপোল অঞ্চলে বহুকাল ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে, সংবাদপত্রের রিপোর্টারের শ্যেন দৃষ্টি নিয়ে বিভিন্ন আশ্রয় শিবির পরিদর্শন করেছেন, অহেতুক বাস্তুহারাদের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে চরিত্রহীন ধনী ব্যবসায়ীদের আড়-কাঠি বলে গালাগাল খেয়েছেন... কিন্তু কিছুতেই দমে যান নি আমাদের বাস্তবের নিষ্ঠুর পূজারী গঙ্গাধর গায়েন।

এমন একখানি বই তাঁকে লিখতে হবে—যা প'ড়ে ভবিষ্যৎ সমাজ সমস্বরে বলতে পারে—হ্যাঁ, একখানি "ডকুমেন্টারী নভেল" হয়েছে বটে।

দিনের পর দিন বাস্তুহারা মেয়েদের সঙ্গে মিশতে দেখে বন্ধুরা টিট্‌কিরি দিয়েছে, পুলিশ সন্দেহ করেছে, গৃহের গৃহিনী বাপের বাড়ী চলে যাবেন বলে শাসিয়েছেন কিন্তু দমেন নি আমাদের সাহিত্য-স্রষ্টা গঙ্গাধর গায়েন। ছেলেবেলায় ইস্কুলে তিনি পদ্য (তখনকার দিনে কবিতা বলা হত না) মুখস্ত করেছেন—

"জলে না নামিলে কেহ শেখে না সাঁতার
হাঁটিতে শেখে না কেহ না খেয়ে আছাড়!"

কাজেই আশে পাশের এই সব উপদ্রব ও অসুবিধাকে তিনি আমলেই আনেন নি। সাধনা করতে গেলে বিঘ্ন ত' আসবেই। তাকে দেখে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে কেন?

বুদ্ধদেব যখন সিদ্ধি লাভের আশায় বোধিদ্রুমের তলায় বসে পড়ে বলেছিলেন—এইখানে আমার শরীর শুকিয়ে যাক্... কিন্তু সিদ্ধিলাভ না করে উঠ্‌ছি না... তখনই মারের প্রলোভন এসেছিল!

করুক বন্ধুবান্ধবেরা উপহাস, লাগুক পুলিশ পেছনে ফেউয়ের মতো, যাক্ চলে গৃহিনী অভিমান করে পিত্রালয়ে... সব ঠাণ্ডা করে দেবেন একদিনে যদি তার উপন্যাস সত্যি বাস্তব ধর্ম্মী হয়।

আজ শেষ রাত্রে সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন গঙ্গাধর গায়েন। বোধিদ্রুমের তলায় বুদ্ধদেব কি তার চাইতে শান্তি লাভ করতে পেরেছিলেন? রামকৃষ্ণদেব সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ের অন্তর্নিহিত কথা আবিষ্কার করে কি তার চাইতেও গর্ব্ব অনুভব করেছিলেন? নিউটন মাধ্যাকর্ষণের মূল সূত্র পেয়ে কি তার চাইতেও খুশী হয়েছিলেন? কিম্বা কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার ক'রে তার অপেক্ষা খ্যাতিমান হ'তে পেরেছিলেন?

পরম নিশ্চিন্তে আর অসীম আরামে গঙ্গাধর একটি বিড়ি ধরিয়ে সুখ-টান দিলেন।

তিনি মানস চক্ষে দেখতে পেলেন—তাঁর লেখা এই "বাস্তুহারা বালিকা" বাঙ্‌লা সাহিত্যে বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে! কাগজে কাগজে উচ্ছ্বসিত সমালোচনা, ক্লাবে-সমিতিতে জ্বালাময়ী আলোচনা, শহরের দেয়ালে-দেয়ালে উদ্ধৃত প্রাচীর-পত্র সকল সংশয়বাদীকে নস্যাৎ করে দিয়েছে! প্রাচীর পত্রের কথায় বিজলী চমকের মতো মনে এলো সিনেমার রূপালী ঝলক!

তাই তো! 'বাস্তুহারা মেয়ে' যদি সিনেমায় রূপান্তরিত হয় তবে রাতারাতি বিখ্যাত হবার আর বাকি রইল কি? গায়েন মশায়ের পাশের বাড়ীতে এক বিশ্ব-বখাটে ছেলে থাকে, নাম তার ঝলমল মালাকার। সে নাকি কোনো কোনো বাঙ্‌লা ছবিতে হাসির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দর্শকবৃন্দের বত্রিশ পাটি দাঁত বিকশিত করবার কাজে সাহায্য করে থাকে। সিনেমা জগতের বহু স্বনামধন্য পরিচালকের সঙ্গে নাকি তার ওঠা-বসা।

এই ঝলমল মালাকারের স্মরণাপন্ন হয়ে সিনেমারাজ্যে প্রবেশের 'পাসপোর্ট' সংগ্রহ করতে হবে। বিড়ি টানতে টানতে ঠিক করে ফেল্লেন গঙ্গাধর গায়েন।

পরের দিন সকালবেলা ঝলমল সব কথা শুনে বল্লে, আপনার লেখা বই গঙ্গাধরদা! তবে তো আমাকে একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে। আপনি খুব ভালো সময়ে এসেছেন। পরিচালক প্রভঞ্জন খাসনবীশ একটি অভিনব কাহিনী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আপনার "বাস্তুহারা বালিকা" নিশ্চয়ই তাঁকে খুশী করতে পারবে। আজ সন্ধ্যেবেলা যাবেন আমার সঙ্গে। সব ব্যবস্থা করে দেবো।

এত সহজে যে কার্যোদ্ধার হবে গঙ্গাধর গায়েন তা ধারণাই করতে পারেন নি। মনে মনে বাড়ী ও গাড়ীর নক্সা ছকতে ছকতে ঘরে ফিরে এলেন এবং কোন্ দেবী তার "বাস্তুহারা মেয়ে"র রূপদান করবেন সেই কথা ভেবে দিবা-স্বপ্ন দেখ্‌তে সুরু করলেন।

ঝলমল মালাকারের সময় জ্ঞান আছে বল্‌তেই হবে। সন্ধ্যের ঠিক মুখেই এসে সে গায়েন মশায়ের বাড়ীর কড়া নাড়তে সুরু করে দিলে।

ঝলমল উপদেশের সুরে সুরু করলে, জানেন তো গঙ্গাধরদা, মহাজনের মুখের মহাবাণী—

—"আগারী দর্শন ধারী
পিছারী গুণ বিচারী"

তাই বল্‌ছিলাম কি, একটু নিউ-টেক্‌নিকে সাজ-পোষাকটা সেরে নিন। আপনি যে নতুন ভাবে চিন্তা করেন, অভি-নব কিছু সিনেমা-জগতে দান করতে পারেন... এতদিন ইচ্ছে করেই এ রাজ্যে উঁকি ঝুঁকি মারেন নি... এমনি একটা "কেয়ার ফ্রি" ষ্টাইল আর কি! সঙ্গে অ্যাটাচি কেস নিতে ভুলবেন না। তাতে থাকবে নানারকম 'রেফারেন্সের' নোট। হক্‌চকিয়ে দিতে হবে পরিচালককে... বুঝলেন না? তারপর রয়েছে আমার সিদ্ধবাক্ রসনা...... এমনভাবে পরিচয় করিয়ে দেবো যে, আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন না— কোন্ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের কথা বল্‌ছি।

ঝল্‌মল্ মালাকারের কথা বল্‌বার ধরণ দেখে গঙ্গাধর গায়েন উল্লসিত হয়ে ওঠেন। এই রকম একটি মুরুব্বি যদি থাকে তবে চিত্র-জগতের বৈতরণী পার হতে আর বেশী বেগ পেতে হবে না।

শিস দিয়ে গান করতে করতে গায়েন মশাই তার রুক্ষ চুলের মধ্যে চিরুণী চালাতে থাকেন।

সন্ধ্যেটা সবে উৎরে গেছে—এমন সময় ঝল্‌মল্ গঙ্গা-ধর গায়েনকে নিয়ে এলো পরিচালক প্রভঞ্জন খাসনবীশের খাস কামরায়।

মালাকারের সুপারিশে পরিচালক মশাই আগাগোড়া গল্পটি পাঠ করতে বল্লেন লেখক মশাইকে। কাজটা সোজা নয়। তবু ভবিষ্যতের স্বর্ণোজ্জ্বল রজনীর মধুর স্বপ্নের কথা কল্পনা করে গঙ্গাধর গায়েন পাতার পর পাতা পড়ে যেতে লাগলেন।

কাহিনী যখন শেষ পাতায় এসে পৌঁছুলো—তখন বহু প্যাকেট সিগারেট ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেছে, অনেক কাপ চা উদরে প্রবেশ করেছে, অনেক হাই উঠেছে কারণে অকারণে এবং স্রষ্টা গায়েন মশায়ের মুখে গ্যাঁজলা বেরি হয়েছে!

অর্ধনিমিলিত নয়নে পরিচালক মশাই ফতোয়া জারি করলেন, হ্যাঁ, আইডিয়াটা মন্দ না! Scanty dress-এর মারফৎ "বাস্তুহারা বালিকা" বেশ খানিকটা 'Sex appeal' এর সৃষ্টি করতে পারবে। আমি বাঙ্‌লার সিনেমা জগতে নতুন "Bird of Paradise"-এর সৃষ্টি করবো।

'কম্‌প্লিমেণ্ট' শুনে গল্পলেখক গায়েন মশাই আঁৎকে উঠলেন যেন! ভয়ে ভয়ে মন্তব্য করলেন, আজ্ঞে, আমার 'বাস্তুহারা বালিকা' তো ঠিক সে স্টাইলের বই নয়, সম্ভ্রম রক্ষার জন্যেই তো সে জীবন দেবে...

একটি সবজান্তা হাসি হেসে পরিচালক প্রভঞ্জন খাস-নবীশ বাঁকা ঠোঁটে ব্যক্ত করলেন, আরে মশাই, 'বাস্তুহারা মেয়ে' যখন আপনার কলম থেকে আমার পোর্টফোলিওতে ঢুকবে... তখন তার চেহারা বেমালুম বদ্‌লে যাবে। জানেন তো বিয়ে দিয়ে দিলে শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে মেয়ের চেহারা কেমন রাতারাতি পাল্‌টে যায়... হেঁ-হেঁ-হেঁ! ও আপনি কিছু ভাব্‌বেন না আমি সব ক্লিন ম্যানেজ করে দেবো। হ্যাঁ, তবে একটি চিন্তা করার বিষয় আছে—'বাস্তুহারা মেয়ে'র রোলটা করবে কে?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কপালের ওপর তর্জ্জনী দিয়ে তিনটে টোকা মেরে পরিচালক মশাই উৎফুল্ল কণ্ঠে উদ্গার করলেন, ঠিক হয়েছে! ইউরেকা! বাঞ্ছিতা দেবীকেই 'বাস্তুহারা মেয়ের' পার্টে মানাবে ভালো!

গল্পলেখকের আশঙ্কার পারদ ক্রমশ ঊর্দ্ধগামী হচ্ছে। গঙ্গাধর গায়েন ভয়ে ভয়ে বল্লেন, কিন্তু ওঁর বয়েসটা একটু বেশী হয়ে যাবে না? আমার বাস্তুহারা মেয়ের বয়েস সতেরো বছরের বেশী নয়। কিন্তু মাফ্ করবেন, শুনেছি বাঞ্ছিতা দেবী চল্লিশের কম হবেন না।

গল্প লেখকের কথা শুনে পরিচালক প্রভঞ্জন খাশনবীস যেন রাগে একেবারে ফেটে পড়লেন,— বয়েস! আপনি কোন যুগের লোক মশাই? আর্টিষ্টের আবার বয়েস থাকে নাকি? উর্ব্বশীর নাম শুনেছেন? আপনাদের রবীন্দ্রনাথ যাঁর নামে কবিতা রচনা করে গেছেন? তাঁর কত বয়েস ছিল আপনি অনুমান করে বল্‌তে পারেন? পরে গলাটা একটু খাটো করে পরিচালক মশাই বল্লেন দেখুন মশাই, আপনাকে একটা সৎ পরামর্শ দি; ও সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। কথায় বলে,

"যার কর্ম্ম তারে সাজে—
অন্য লোকে লাঠি বাজে।"

আবার একটা সিগারেট মুখে গুঁজে দিয়ে তিনি মিটি-মিটি হাসতে লাগলেন!

বেশী টানা-হ্যাঁচড়া করলে পাছে দড়ি একেবারেই ছিঁড়ে যায় এই ভয়ে গঙ্গাধর গায়েন মশাই আর খুব উচ্চ-বাচ্য করলেন না!

সেদিনকার মতো আলোচনা ওইখানেই শেষ হল এবং পরিচালক মশাই জানালেন, আপনার পাণ্ডুলিপিটা আমার কাছে রেখে যান, রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে ওর Picture value ভাবতে হবে কিনা!

তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বল্লেন, ওসব টেক্‌নিক্যাল ব্যাপার আপনারা বুঝ্‌বেন না মশাই; have it to me.

সেই সঙ্গে খানিকটা দেঁতো হাসি!

গল্প লেখক গঙ্গাধর গায়েন—সাহিত্য-জগতে নতুন নন, তাঁর বহু গল্প সংগ্রহ ও উপন্যাস একাধিক সংস্করণের গৌরব অর্জ্জন করেছে... কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর গা বেয়ে ঘাম ঝরতে লাগ্‌লো! বেশ অনুধাবণ কবতে পারলেন যে, সিনেমা-রাজ্যি বড় সহজ ঠাঁই নয়!

ঝল্‌মল্‌ মালাকারকে সঙ্গে নিয়ে গায়েন মশাই চলে এলেন।

পথে ঝল্‌মল্‌ তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্লে, আপনি কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না গঙ্গাধরদা! বইটা তো আগে ডিরেক্টারকে গছিয়ে দিন, কিছু মোটা টাকা আগাম আদায় করুন তারপর আমি তো রয়েছি। কথায় বলে না—ওস্তাদের মার শেষ রাত্তিরে! সেই শেষ রাত্তিরের খেল্‌ দেখাবো আমি... এই ঝল্‌মল্‌ মালাকার!

এই বলে সে নিজের বুকে তিনটি টোকা মেরে দিলে! বাসে উঠে বেশ আমেজ করে বসে মালাকার বল্লে, আমার আসল কথাটাই কিন্তু বলা হয় নি দাদা!

গায়েন মশাই তার দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইতেই সে ও'র দুটি হাত ধরে ফেলে কাতর কণ্ঠে নিবেদন করল, দাদা, আপনার ওই বাস্তুহারা মেয়ের একটি রসালো প্রেমিক জুটিয়ে দিতে হবে। তার কথায় কথায় থাকবে হাসির ফোয়ারা। আর সে পার্ট করবো আমি। দেখ্‌বেন হাউস কেমন নেয়।

লেখক মশাইকে তখনো অবাক হয়ে তাকিয়ে থাক্‌তে দেখে ঝল্‌মল্‌ বল্লে, না-না, আপনি ডিরেক্টারের জন্যে কিচ্ছু ভাববেন না— সব আমি ম্যানেজ করে নোবো'খন।

গঙ্গাধর গায়েন কিন্তু এজন্যে আরো বেশী ভাবিত হয়ে পড়লেন! এরা সবাই একযোগে 'ম্যানেজ' করতে চায়... শেষ পর্য্যন্ত যে শ্রাদ্ধ কোন পর্য্যন্ত গড়াবে সেইটেই হল তার মস্ত বড় ভাবনা!

তবু মনে এই আশা যে, একখানি বই যদি সিনেমায় রূপলাভ করে তবে অকস্মাৎ খ্যাতির সপ্তম স্বর্গে উঠে যাবেন—গায়েন মশাই, স্তুতির মালিকা স্তূপীকৃত হবে তাঁর দুই চরণ ঘিরে; গাড়ী-বাড়ীর একটা অর্ধোচ্চারিত আশা সবার অলক্ষ্যে তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকবে; আহ্বান আস্‌বে নানা চিত্র প্রতিষ্ঠান থেকে; কাগজে কাগজে মুদ্রিত হবে তার আলেখ্য!

এই সুখ-স্বপ্নের মূল্য বড় কম নয়। কয়েকদিন ধরে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে থাকেন গল্পলেখক গঙ্গাধর গায়েন।

চার-পাঁচ দিন পর একখানি চিঠি এলো স্বয়ং প্রডিউ-সারের কাছ থেকে। তিনি লেখকের সঙ্গে দেখা করে একবাব আলোচনা করতে চান।

ঝল্‌মল্‌কে সাথী করে গঙ্গাধর রওনা হলেন প্রডিউ-সারের গৃহের উদ্দেশ্যে।

ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছে। সারা জীবন সুগন্ধী তিল তেলের কারবার করে বেশ কিছু পয়সা জমিয়েছেন। তাঁর শ্যালকের পিড়াপিড়িতেই তিনি এই ছবিখানি তুলতে সম্মত হয়েছেন। আসল কথা হচ্ছে, ছবি তুলতে যে টাকা খরচ হবে—তার চার গুণ যাতে ফিরে আসে সেই রকম জোরদার করে গুছিয়ে গল্প লিখ্‌তে হবে।

গঙ্গাধর গায়েন বল্লেন, দেখুন মশাই—ভদ্রলোক তাঁকে থামিয়ে সংশোধন করে দিয়ে উত্তর করলেন, আমার নাম হচ্ছে—শ্রীশিবশম্ভু সরখেল—। কাজেই বুঝ্‌তেই পারছেন যতবার আমার নাম উচ্চারণ করবেন আপনারই পুণ্যি হবে। আমার বাপ-মা অনেক ভেবে চিন্তে এই নামকরণ করে-ছিলেন! আচ্ছা এইবার কি বল্‌ছিলেন বলুন—

গঙ্গাধর গায়েন উত্তর করলেন, দেখুন শিবশম্ভু বাবু, —সরখেল মশাই উৎসাহিত হয়ে বল্লেন, ঠিক! ঠিক! এই-রকম ভাবে আমার নাম উচ্চারণ করে কথা বল্‌বেন। তাতে আপনারও পরকালের কাজ হবে আর আমারও দেবতার নাম শোনা হবে।

গঙ্গাধর গায়েন মনে মনে বল্লেন, কত রকম মানুষই যে এই দুনিয়ায় আছে! যাক্‌ সিনেমা জগতে এসে আর কিছু না হোক, নতুন নতুন চরিত্র দেখে অনেক কিছু অভি-জ্ঞতা সঞ্চয় হচ্ছে। আসলে এইটেই লাভ। সাহিত্য সৃষ্টির কাজে পরে এগুলো কাজে লাগ্‌বে।

গঙ্গাধর গায়েনকে মুখ ফুটে আর বেশী কিছু বলতে হল না। কেন না শিবশম্ভু সরখেল মশাই একাই একশ!

অনেক ভনিতার পর নিজেই সুরু করলেন তাঁর বক্তব্য। বল্লেন, দেখুন গায়েন মশাই, আপনারা লেখাপড়া জানা লোক, বাস্তুহারা মেয়ের গল্প লিখেছেন—সে গল্প আমি শুনেছি—পরিচালক প্রভঞ্জন খাসনবীশের কাছে। গল্প সম্বন্ধে বলবার আমার কিছুই নেই। কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন—লাখখানেক টাকা ফেল্‌বো এই ব্যবসায়ের পেছনে। তাই ভেবে চিন্তে পা বাড়াতে হবে তো! শুনুন—

আজ্ঞে বলুন!

আমরা স্বামী-স্ত্রীতে প্রতি রোববার সিনেমা দেখে থাকি। লোকে কি চায় বলুন দেখি—?

গঙ্গাধর গায়েন এইবার উৎসাহিত হয়ে উত্তর করলেন, আজ্ঞে ভালো গল্প। যে গল্প মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশে আছে। তারই সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথা।

শিবশম্ভু সরখেল মাথা দুলিয়ে উত্তর করলেন, সে তো ঠিকই। সে তো নিশ্চয়ই। তবে কি জানেন, সাধারণ মানুষ তো পয়সা দিয়ে ছবি দেখবে, আপনি এক কাজ করুন, আধ আউন্স সুরাইয়ার হাসি, সাড়ে তিন আউন্স মধুবালার চাউনী, চার আউন্স কাক্কুর নাচ আর সাড়ে পাঁচ আউন্স গীতাবলীর গান বেশ করে মিশিয়ে আপনার বইয়ের নায়িকাকে তৈরী করে ফেলুন। আপনার ওই বাস্তুহারা মেয়েকে দেখ্‌তে সারা কল্‌কাতা শহরের লোক হুমড়ি খেয়ে পড়বে। তখন আমায় আপনি এসেই বলবেন যে, হ্যাঁ, শিবশম্ভু বাবু একটা কথার মতো কথা বলেছিলেন বটে!

প্রডিউসারের কথা শুনতে শুনতে গল্পলেখক গঙ্গাধর গায়েনের চোখ প্রায় আলুচেরা হয়ে উঠেছে! শিবশম্ভু বাবু আন্দাজ করে নিলেন যে, তার কথাটা কাহিনীকারের মনে ধরেছে। তাই উত্তেজনায় আরো উৎফুল্ল হয়ে বলে ফেল্লেন, দেখুন, আরো একটি কাজের কথা আপনার সঙ্গে কয়ে নি। নায়িকা বাঞ্ছিতা দেবীর সঙ্গে ইতিমধ্যেই আমার কথাবার্ত্তা পাকা হয়ে গেছে। দশ হাজার টাকা তাঁকে আমি আগাম দিয়ে দিয়েছি। তিনি একটি সুন্দর কথা বলেছেন। এই বাস্তুহারা মেয়ের দুটি প্রেমিক রাখবেন—; তার একজন পূর্ব্ববঙ্গের এবং আর একজন পশ্চিমবঙ্গের। তাদের দুজনের থাকবে ডুয়েট্‌ গান। সেই গান শুনতে যে লোকের ভীড় হবে—ট্র্যাফিক্‌ পুলিশ তা ম্যানেজ করতে হিম্‌সিম্‌ খেয়ে যাবে—। আমার কথাগুলি দামী কিনা আপনিই ভেবে দেখ্‌বেন। আরে মশাই সুগন্ধী তিল তেলের ব্যবসা করে এত বড় হয়েছি। কার সঙ্গে কি মেশাতে হবে সেটা বেশ ভালো করেই জানি!

একটা উদ্গার তুলে শিবশম্ভু সরখেল বল্লেন, আজ ভোজনটা বড্ড বেশী হয়েছে। গিন্নি নিজে হাতে রান্না করেছিলেন কিনা—তাই ভাব্‌ছি গঙ্গার ধারে একটু বেড়াতে যাবো। আচ্ছা, তা হলে আপনি বেশ করে ভেবে গল্পটা চট্‌পট্‌ বদ্‌লে ফেলুন।

এই বলে সরখেল মশাই তাঁর বিশাল দেহ তুলে ফেল্লেন। গঙ্গাধর গায়েনও ঝল্‌মলের কাঁধে ভর দিয়ে কোনো রকমে বাড়ী ফিরে এলেন।

পরদিন সকালবেলা ঝল্‌মল্‌ মালাকার ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। বল্লে, কেল্লা মাৎ!

গায়েন মশাই শুধোলেন, ব্যাপার কি?

ঝল্‌মল্‌ মালাকার বল্লে, আজ থেকেই আপনার বইয়ের শ্যুটিং সুরু হচ্ছে। পরিচালক মশাই গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন। এক্ষুনি আপনাকে নিয়ে ষ্টুডিওতে হাজির হতে হবে।

তাহলে সুদিন কি সত্যি ফিরে এলো? কৈলাশের অধিপতি শিবশম্ভু তা হলে মুখ তুলে চেয়েছেন!

দুর্গানাম জপ করে গায়েন মশাই মালাকারের সঙ্গে রওনা হলেন। গায়েন গৃহিনী পাঁচটা পয়সা কপালে ছুঁইয়ে কুলুঙ্গীতে আলাদা করে তেলসিঁদুর মাখিয়ে চিহ্নিত করে রেখে দিলেন। সময় মত সিন্নির ব্যবস্থা করতে হবে।

ষ্টুডিওতে পেঁাছুতেই পরিচালক প্রভঞ্জন খাসনবীশ ছুটতে ছুটতে এলেন।

এই যে গায়েন মশাই এসে পড়েছেন। আমি আপনার জন্যেই হা-পিত্যেশ করে বসে আছি। দেখুন, আজকেই আপনার 'বাস্তুহারা মেয়ের' শেষ দৃশ্যটা তুলে ফেল্‌ছি। মানে মিলনাত্মক বই করে দিলাম। আপনার বিয়োগান্ত বই কি আর লোকে নেবে মশাই? এম্‌নিতেই তো লোকে না খেতে পেয়ে চিঁচিঁ করছে! তারপর আর কত কাঁদুনী সইতে পারে দর্শকদল? তাই দিলাম একেবারে যুগল-মিলন করিয়ে। হ্যাঁ, যে কথা বল্‌তে যাচ্ছিলাম! "চাঁদ-চকোরে" গোছের একটা উজ্জ্বল দৃশ্য করতে হবে। আপনার বাস্তুহারা মেয়ে আর হিন্দুস্থানী ছেলে ভুলুয়া দোল্‌নায় উঠে দুল্‌বে। 'সিন্‌সিনাকি বুব্‌লাবু' কিম্বা 'মিল্‌ গিয়া' 'মিল গিয়া' এই জাতীয় একটী হাল্‌কা গান এক্ষুণি রচনা করে দিন তো! সঙ্গীত পরিচালক আপনার জন্যে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসে আছে। এক্ষুণি রেকর্ডিং হয়ে যাবে—Quick—Please.

পরিচালক প্রভঞ্জনের মূল্যবান উপদেশাবলী শ্রবণ করে গল্প লেখক গঙ্গাধর গায়েনের মনে হল—ভূমি নেই—আমি নেই—কর্তা নেই—কর্ম নেই—সারা পৃথিবীটা একটা পয়সার মতো ফুটো কিম্বা ধোঁয়ার মতো আবছা!

হায়! কি কুক্ষনেই তিনি বাস্তুহারা মেয়েকে সৃষ্টি করেছিলেন! বাঙলার সঙ্গে হিন্দি 'ব্লেন্ড্' করে তাকে প্রেমের গান রচনা করতে হবে! কিসের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কে জানে!

পৃথিবীর মতোই তাঁর গোটা মাথাটা ঘুরতে লাগ্‌লো! তাই তো! সেট্ ঘুরছে... আকাশের পূর্ণ চন্দ্র ঘুরছে, পরিচালক ঘুরছে—নায়ক নায়িকা ঘুরছে...

গল্প লেখক গঙ্গাধর গায়েন নিজের গল্পেরই তাল সাম্‌লাতে না পেরে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন! ছুটে এলেন প্রযোজক, পরিচালক, ডাক্তার, বৈদ্য, রিপোর্টার আর ভক্ত পাঠক-পাঠিকার দল!

পরদিন কল্‌কাতার নামজাদা দৈনিক কাগজগুলিতে মোটা হরফে খবর ছাপা হলঃ

গল্প লেখক গঙ্গাধর গায়েন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ গল্প "বাস্তুহারা মেয়ে" রচনা করে অতি উত্তেজনায় হার্টফেল করেছেন! সৃষ্টি যখন স্রষ্টাকে ছাড়িয়ে যায় তখন এমনি অসম্ভব ঘটনাই ঘটে থাকে। গায়েন মশায়ের এই গল্প চিত্রে রূপ লাভ করছিল—তারই চরম সার্থকতা উপলব্ধি করে গঙ্গাধর গায়েন মশাই আত্মহারা হয়ে আত্মবিসর্জ্জন করেছেন। এই মহান আত্মোৎসর্গ বঙ্গ-সাহিত্যে অভিনব। দেশের মনীষীবৃন্দ একে "Swan Death dance"-এর সঙ্গে তুলনা করছেন।

ধন্য গঙ্গাধর গায়েন! ধন্য তার গল্প লেখা!

সহজিয়ার গান

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

থাক্ অনটন, শতেক বেদন,
দ্রব্য মূল্য যাক্ বেড়ে,
অদল বদল হোক না যতই,
আমার শ্রোতা থাক্‌বেরে।
অর্দ্ধাসন কি হোক অনশন,
বাস্তুহারার পুনর্বাসন,
দেশে যে দল হোক না প্রবল,
যে দল যাবে যাক্ হেরে।
গানের শ্রোতা থাক্‌বেরে।

২

গীত, কবিতার নয় এ সময়,
তর্কে যতই জাল পাতো।
প্রেম চিরদিন তেমনি নবীন
চল্‌ছে সমান ব্যবস্থা তো।
রয়েছে, নয় মিথ্যা কথা—
সেই সে আদিম চঞ্চলতা,
ফুল তেমনি উঠ্‌ছে ফুটে
গুঞ্জরি ভ্রমর ফেরে
গানের আদর থাকবেরে।

৩

অনাগতের নবাগতের
আসরে ভিড় জম্‌ছে ভাই
তোমার কথায় এমন দিনে
কেমন করে গান থামাই!
উঠ্‌তি পড়্‌তি দর যে হেমের,
দরটি বাঁধা ভক্তি প্রেমের,
আমার এ গান সব বসন্তে
সবার ভাল লাগবে রে।
গানের আদর থাকবে রে।

৪

কালজয়ী প্রেম থাকবে যদিন,
যৌবন এবং কৈশোর ও,
বাঁধো তোমার সাধের সারঙ
গান ধরো ভাই গান ধরো।
এলো প্লাবন ক'দিন রবে?
এতেই তরী বাইতে হবে,
ওই নদীতেই আবার মধুর
কণ্ঠধ্বনি জাগবে রে।
গানের শ্রোতা থাকবে রে।

দুঃখী শ্যামদাস ও গোবিন্দমঙ্গল

শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

'মেঘৈর্মেদুরম্বরং বনভুবঃ শ্যামস্তমাল দ্রুমৈ নক্তং' ইহারই মাঝখানে 'ভীরুবয়ং' শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া জয়দেব বাংলা সাহিত্যে প্রাণ সঞ্চার করিলেন। বাংলা সাহিত্যের জীবন-বেদ,—ধর্ম এবং ইহার প্রাণপুরুষ, শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বাংলা সাহিত্যে কৃত গ্রন্থ যে রচিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মনোধর্মী আর্যদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ, 'পুতনা-বিনাশী গোবর্দ্ধনধারী কংসনিসূদন মহাভারত নাটকের সূত্রধার; আর যখন তিনি প্রাণধর্মী অনার্য্যের দেবতা তখন তিনি গোপীকান্ত, মাতুলানীর রূপে মুগ্ধ হইয়া আত্ম-বিস্মৃত।' এই আর্য এবং আর্যেতর সংস্কৃতির মিলনের ফলেই যে বাংলা সাহিত্যের শ্রীকৃষ্ণ, মানব মনে শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসার মধুর স্থানটিও অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং এই উভয় সংস্কৃতির মিলন যে মুখ্যতঃ তুর্কী আক্রমনের ফলেই ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। নবোৎপন্ন মিশ্র-সংস্কৃতির প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন হিসাবে 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' কাব্যকে অভিনন্দিত করা যায়। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' মুখ্যতঃ ভাগবতকে অনুসরণ করিয়া রচিত হইলেও ইহাতে লৌকিক সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট দেখা যায়, কারণ, ইহার দানলীলা ও নৌকালীলা, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি হইতে জন্মলাভ করে নাই,—ইহা অনস্বীকার্য।

পরবর্তীকালে, মালাধর বসুকে আদর্শ রাখিয়া এই মিশ্র-সংস্কৃতির আশ্রয়ে ভাগবতের সংখ্যাতীত অনুবাদ রচিত হইয়াছিল। এই অনুবাদের ফলে বাংলা সাহিত্য যে বহু পরিমাণে সমৃদ্ধ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণ-লীলার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—শ্রীমদ্ভাগবত। তাই কৃষ্ণলীলা বর্ণনায় ভাগবত অপরিহার্য গ্রন্থ। সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' যে ধারার জন্ম দিল, পরবর্তী প্রায় দুই শতাব্দী পর্যন্ত সেই ধারা পূর্ণমাত্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল বলা যায়। ঐরূপ কাব্যধারার মুখ্য উপজীব্য ছিল, মধুর রস নিস্যন্দী শ্রীকৃষ্ণের লীলা, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। সাধারণতঃ এই কাব্যগুলি,—শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, শ্রীকৃষ্ণমংগল, গোবিন্দমঙ্গল, গোবিন্দ বিজয়, প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত।

কৃষ্ণ-কাব্য-ধারায়, আলোচ্য 'দুঃখী শ্যামদাস' ও তাঁহার রচিত 'গোবিন্দমঙ্গল' আপাতঃদৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্ব লাভের অধিকারী না হইলেও, ভক্ত কবি দুঃখী শ্যামদাস ও তাঁহার 'গোবিন্দমঙ্গল'-এর বিষয় কিছু নূতন তথ্য প্রকাশ করিবার যে দায়িত্ব আমার অন্তরে অনুভব করিতেছি, তাহারই প্রাথমিক আয়োজন হিসাবে এই প্রবন্ধের জন্ম।

দুঃখী শ্যামদাসের একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'গোবিন্দ-মঙ্গল'। কাব্যটি স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের সম্পাদনায় 'বঙ্গবাসী কার্যালয়' হইতে প্রকাশিত। শ্রদ্ধেয় বসু মহাশয় অনুসন্ধানের সাহায্যে দুঃখী শ্যামদাসের যে জীবন-কথা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাকে প্রামাণ্য বলিয়া না স্বীকার করার হেতু নাই। তিনি বলেন, "মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত 'কেদার-কুন্ড' পরগণার মধ্যে 'হরিহর পুর' নামে এক গ্রাম আছে। এই গ্রাম মেদিনীপুর নগর হইতে প্রায় আট ক্রোশ পূর্ববর্তী। এই গ্রামে দুঃখী শ্যামদাসের বাস ছিল। ইনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় দে-বংশীয় কায়স্থ।" 'গোবিন্দমঙ্গল' কাব্যের মধ্যে কবির কোন আত্ম-পরিচয় বা কালনিরূপক কোন শ্লোক প্রভৃতি কিছুই জানা যায় না তবে ভনিতার সাহায্যে এইটুকু মাত্র জানিতে পারি যে তিনি 'শ্রীমুখের নন্দন' ছিলেন এবং তাঁহার মাতার নাম ছিল 'ভবানী'।

সম্প্রতি দুঃখী শ্যামদাস রচিত 'গোবিন্দমঙ্গলের' "ব্রজ-বিনোদ সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত," দুইখানি হস্ত-লিখিত পুঁথি দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। দুইটি পুঁথিই মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমায় খাজাপুর গ্রামে আছে। পরবর্তী আলোচনায়, একটি পুঁথিকে 'খ' এবং অন্যটিকে 'গ' রূপে ধরা হইবে।

'খ' পুঁথিটির অনুলিপি কাল,—'সন ১১২৪ সাল বি তারিখ ৮ই শ্রাবণ, রোজ মংগলবার, তিথি শুক্লাদ্বাদশী, দিবা এক প্রহর।' পুঁথিটি সম্পূর্ণ এবং আয়তন ১৩½" × ৪½"। তুলোট কাগজে লেখা।

'গ' পুঁথিটির অনুলিপি কাল,—'সন ১২৫৭ সাল, ৪ঠা আষাড়।' প্রথম পৃষ্ঠার বিভিন্ন অংশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন তবে পুঁথিটি সম্পূর্ণ। ইহা ১৪½" × ৫"। তুলোট কাগজে লেখা।

'গ পুঁথি' অপেক্ষা 'খ পুঁথিটি' অধিকতর প্রাচীন। 'গ পুঁথি' অপেক্ষা 'খ পুঁথিতে' কয়েকটি নূতন বন্দনা-পদ ও আখ্যানমূলক কাব্যাংশ বেশী আছে। 'খ' ও 'গ'

পুঁথিতে যাহা আছে তাহার সহিত প্রকাশিত গোবিন্দ-মঙ্গলের সার্বত্রিক মিল নাই। ইহা ছাড়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথিশালায় যে 'গোবিন্দমঙ্গল' (পুঁথি-সংখ্যা—৬১৩৬) রহিয়াছে, তাহার সহিতও প্রচুর অমিল রহিয়াছে। এ সম্পর্কে নিম্নে একটি তালিকা দেওয়া হইল। তালিকার 'ক' এবং 'ঘ' পুঁথি যথাক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি এবং প্রকাশিত 'গোবিন্দ-মঙ্গল' কাব্য।

'ক-পুঁথি' [পুঁথিটি অসম্পূর্ণ থাকার জন্য লিপিকাল দেওয়া হয় নাই]	'খ-পুঁথি' [সন ১১২৪ সালে অনুলিপিকৃত। পুঁথিটি সম্পূর্ণ।]	'গ-পুঁথি' [সন ১২৫৭ সালে অনুলিপিকৃত। পুঁথিটি সম্পূর্ণ।]	'ঘ-পুঁথি' [বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।]
১। বিষ্ণু-বন্দনা			
২। সৃষ্টি-প্রকরণ ও দশ অবতার বর্ণন	গুরু-বন্দনা চৈতন্য-বন্দনা	গুরু-বন্দনা বিষ্ণু-বন্দনা	বিষ্ণু-বন্দনা সর্বদেব-বন্দনা
৩। —	বিষ্ণু-বন্দনা	সর্বদেব-বন্দনা	অবতার বর্ণন সৃষ্টিপ্রকরণ ও দশ
৪। —	সর্ব্বদেব বন্দনা	সৃষ্টিপ্রকরণ ও দশ অবতার বর্ণন	—
৫। —	শ্রীরাম-বন্দনা	—	—
৬। —	বৈষ্ণব-বন্দনা	—	—
৭। —	মন মাহিত্ম্যের বিবরণ	—	—
৮। —	ত্রিলোচন বন্দনা বা শিব-বন্দনা	—	—
৯। —	রাগ-মালা	—	—
১০। —	গঙ্গার জন্ম	—	—
১১। —	সৃষ্টিপ্রকরণ ও দশ অবতার বর্ণন	—	—

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রকাশিত 'গোবিন্দমঙ্গল' ব্যতীত 'গোবিন্দমঙ্গলে'রই 'গুরু-বন্দনা', 'চৈতন্য-বন্দনা' ও 'শ্রীরাম-বন্দনা', কোন কোন হস্ত লিখিত পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানে 'খ-পুঁথি'টিতে 'গোবিন্দ-মঙ্গলে'র অপ্রকাশিত কয়েকটি নূতন অংশের সন্ধান দিল; যথাঃ— 'বৈষ্ণব-বন্দনা', 'মন মাহিত্ম্যের বিবরণ', 'শিব-বন্দনা', 'রাগ-মালা' ও 'গঙ্গার জন্ম'।

নূতন কাব্যাংশগুলি যে প্রক্ষিপ্ত নয় এবং এগুলি দুঃখী শ্যামদাসেরই রচনা, এরূপ কোন মন্তব্য প্রকাশ করার সময় এখনও আসে নাই। ইহা একমাত্র সেই সময়েই বলা সম্ভব যখন অন্য কোন গোবিন্দমঙ্গলের পুঁথি হইতে ইহার সমর্থন মিলিবে। তথাপি এ সম্পর্কে কিছু বলিবার আছে। 'গোবিন্দমঙ্গল', গীতিকাব্য আকারে রচিত হয়। প্রাচীন বাংলা কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণতঃ যাহা দেখা যায়, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই,—অর্থাৎ, বহু গায়ক ইহা গান করিত। গায়কেরা তাহাদের নিজেদের ইচ্ছানুসারে কাব্যের পরিশোধন, পরিবর্জন এবং পরিবর্ধন করিত। কৃষ্ণমঙ্গল বা গোবিন্দমঙ্গল কাব্যগুলি যে মনসা, শীতলা প্রভৃতি পালাগুলির ন্যায় প্রাচীনকালে গীত হইত, তাহার প্রমাণ আজিও লুপ্ত হয় নাই। বন্দনা অংশ বা মূল কাহিনীর সহিত যে সকল আখ্যান বিশেষভাবে জড়িত নয়, সেইগুলি গায়কদের পক্ষে শ্রম লাঘবের জন্য পরিবর্জন করা অসম্ভব নয়। আমার মনে হয়, এই কারণেই অপেক্ষা-কৃত কম বয়সের পুঁথিগুলির সহিত প্রাচীন পুঁথির এই প্রভেদ।

'খ-পুঁথির' অপ্রকাশিত কাব্যাংশের মধ্যে রচনাকাব্যের সহজ কবিত্ব শক্তির সুন্দর অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, সমগ্র কাব্যটির মধ্যে একটি বৈষ্ণব-ভাবধর্মী কবি মনের প্রকাশ বড় স্পষ্ট। কারণ, ভক্তি-সরোবর হইতে এই কাব্যের জন্ম, প্রেমিক বৈষ্ণবের নয়নজলে ইহার প্রকাশ এবং আনন্দের চিন্ময় রাজ্যে ইহার পরিনতি;—তাই, 'গোবিন্দমঙ্গল' কাব্য বহুর মধ্যেও একক এবং স্বয়ং-সম্পূর্ণ। বিশ্লেষণের সাহায্যে কবি-মনের পরিচয় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়, তাই, 'খ-পুঁথি'র অপ্রকাশিত অংশ হইতে কয়েকটি পদ নিম্নে উধৃত করিয়া দিলাম।

। শ্রীরাম বন্দনা ।

॥ রাগ মঙ্গল ॥

প্রনমোহং প্রভুরাম নবদূর্ব্বাদল শ্যাম
দক্ষিণে লক্ষ্মণ ধনুধারী।
রত্নসিংহাসনোপর বিরাজিত রঘুবর
বামে শোভে জনক কুমারী॥
কনক মুকুট শিরে পুজে...............
কুঙ্কুম তিলক ভালে সাজে।
মকর কুণ্ডল জ্যোতিঃ দেখি অপরূপ অতি
দিনমনি ভঙ্গ ভেল লাজে॥
নয়ন মদন ফান্দ কোটীবিধুমুখ চান্দ
আজানুলম্বিত দুই কর।
গলে মণি দীপ্তমান পীতাম্বর পরিধান
পদ সেবে পবন কুমার॥
ডাহিনে ভরত বীরে চামর ঢুলায় শিরে
বামে শত্রুঘন ছত্র ধরে।
রিক্ষকপি পুন্যজন পুটপানি অনুক্ষণ
সেবে প্রভু গুণের সাগর॥
জনক সনক মুণি বাল্মিকী বশিষ্ঠ আনি
শ্রীরামে করিলে বরণ।
গুণনিধি রাম রাজা দেখি উলসিত প্রজা
ঘরে ঘরে দুন্দুভি ঘোষণ॥
শ্রীরামচন্দ্রের যশে সলিলে শিখর ভাসে
কোথাও না শুনি হেন কথা।
গুণনিধি প্রভুরাম ত্রিভুবনে অনুপাম
গৌতম নারীর মোক্ষদাতা॥
নিবারিয়া নিশাচর ....
কৌশল্যা নন্দন রঘুবীর।
উলসিত ত্রিভুবন পুষ্পবৃষ্টি অনুক্ষণ
দেবরাজ পুলক শরীর॥
সর্ব্বজীব তারিবারে রামরূপে অবতারে
ভানু বংশে জানকী জীবন।
শ্রীরাম চরণ মনে দুঃখী শ্যামদাস ভনে
তার হরি কমল লোচন॥

। চৈতন্য বন্দনা ।

বন্দোহং চৈতন্য অবতার চূড়ামনী।
কলি......বিমোচনে বিহার অবনী॥
পতিত পাবন প্রভু ।
বৈকুণ্ঠ তেজিল প্রভু জীব দুখে দুঃখী॥
দয়ার সাগর প্রভু গুণের নিধান।
নয়নে প্রেমের বন্যা নাহিক বিরাম॥
শচী ঠাকুরাণী কত কামনার ফলে।
পুত্র ভাবে চুম্ব দেই বসাইয়া কোলে॥
ধন্য ধন্য গৌড় দেশ নদীয়া নগর।
ধন্য ভাগীরথী তীর গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
সার্ব্বভৌমে দয়া করি দিল পরিচয়।
নিজরূপ দেখি স্তুতি করিল বিনয়॥
কেশব ভারতী গুরু করি গোরা চান্দে।
দেখিয়া বৈরাগ্যরূপ জগজন কান্দে॥
লক্ষ্মীর বিলাস তেজি জীবের লাগিয়া।
সৃজিল কীর্ত্তন মধু পারিসদ লয়্যা॥
প্রকাশিল অবতার অবনীর মাঝে।
উদিত নিতাই গদাধর সঙ্গে সাজে।
সুন্দর গৌ পণ্ডিত গোসাঞি।
প্রধান গোপাল গোরা সঙ্গতি রামাঞি॥
ছত্র নব দণ্ড গোরা তেয়াগিয়া দূরে।
সন্ন্যাসীর বেশদণ্ড কুমণ্ডল করে॥
কাশ বাস পরিধান গলে নামাডোর।
সুর নদী জিনি আঁখি নিজ নামে ভোর॥
উ চাঁদ বদন দেখি পারিসদগণে।
শ্রাবণ জিনিঞা ঝরে সভার নয়নে॥
অখিল মজিল দেখি গৌরাঙ্গের খেলা।
যেদিগে বিহরে গোরা সেই দিগে......॥
স্থাবর জঙ্গম কীট জলজন্তুগণ।
প্রেম জলে .... সকল ভুবন॥
হেন অবতার দেখি যেবা নাঞি মজে।
ভজন ॥
শুন সাধুজন হরি নামে কর আশ।
চৈতন্য চরণে মজে দুঃখী শ্যামদাস॥

। বৈষ্ণব বন্দনা ।

॥ রাগ করুণা ॥

অনেক প্রণতি স্তুতি বপু লোটাইয়া ক্ষিতি
বন্দো বন্দো বৈষ্ণব-চরণ।
সদাই আনন্দ ভোর গলে দোলে নাম ডোর
হরির সে পুলক... ....॥
শান্ত সদাশএ কেবল করুণামএ
সর্ব্বভূতে ... . করি।
সভাকারে দেই কোল .... নেহারি বোল
নয়নে পুর্ণিত প্রেমবারি॥

বিচিত্র তিলক ভালে গলাএ তুলসী মালে
ক্ষীণ কৌপীন পরিধান।
অক্রোধ আবর্গ বাণী জীতেন্দ্রিয় তত্ত্বজ্ঞানী
অদোষ দরশি দয়াবান॥

খেলে গাএ গেলে নাচে অকিঞ্চনে প্রেম যাচে
কান্দে সে জীবের দুঃখ দেখি।
অধর ... কভু পরম পুরুষ প্রভু
প্রেমভরে ছলোছল আঁখি॥

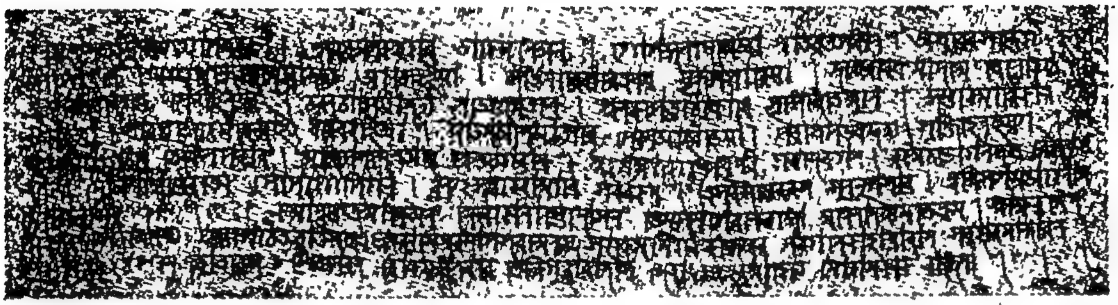

'খ' পুঁথির পাণ্ডুলিপির শেষাংশ

সেই স্থান ধন্য লোকে যে দেশে বৈষ্ণব থাকে
ধরণী ধরিয়া হরষিত।
হরি নাম সুধারাশি যথা শান্তজ্ঞান বসি
তথা সর্ব্ব তীর্থ উপনীত॥
বৈষ্ণব গভীর আভা অনুভাব সর্ব্বশোভা
নিন্দা স্তুতি ভেদ নাঞি করে।
দুখে সুখে ঔদাসীন্য শত্রুমিত্র নাহি ভিন্ন
সমভাব কিবা আত্মপরে॥
হরস সরস মতি যে পথে বৈষ্ণব গতি
দরশনে পাপ তাপ হরে।
.... সানন্দভাবে জিনি ...... বৈষ্ণব সেবে
সে জন সংসার ঘোরে তরে॥
ভক্তি গতি যেই ঠাঞি তথা ...... নাঞি
শশীপতি সুর দিবাকর।
যোগীন্দ্র চতুরানন আদি যত দেবগণ
তথা যাইতে নারে ॥
বৈষ্ণব সদয় মনে কৃপা করে যেই জনে
সে জন পরম পদ পাএ।
বৈষ্ণবে যে দয়া করে গোবিন্দ উদ্ধারে তারে
পুষ্পরথে বৈকুণ্ঠে সে জাএ॥
বৈষ্ণব দয়ার সিন্ধু গোবিন্দ যাহার বন্ধু
ভক্ত সঙ্গে বুলে প্রেম লাগি।
..... যথা পরমানে ....
... . অনুরাগী॥
বৈষ্ণব পরম দাতা জন্ম মৃত্যু ভয় ত্রাতা
... . গতির কারণ।
বৈষ্ণব পরম গুরু নিষ্কাম কল্পতরু
.... পতিত তারণ॥
বৈষ্ণব চরণাম্বুজে ....
তাহার তুলনা দিতে নাঞি।
এ কলি কলুষ গ্রাসে দুঃখী শ্যামদাস ভাসে
পার কর বৈষ্ণব গোসাঞি॥

'গোবিন্দমঙ্গলে'র সংগীত রসধারা শ্রোতা বা পাঠকের অন্তরে যে নব-বৃন্দাবন সৃজন করে তাহাকে অস্বীকার করে কাহার সাধ্য? জীবন-রসিকা শ্রীরাধিকার মর্মভেদ হয় যে বিরহাগ্নিতে, তাহারই অনুপম প্রকাশ ঘটিয়াছে দুঃখী শ্যামদাসের ভাষায়। কৃষ্ণ বিচ্ছেদ, শ্রীরাধিকার অসহ্য মনে হয়; তাই, তাঁহার নিকট—

নয়ন নিমিখে কত যুগ বহি যায়।
অবিচ্ছেদ পিরীতি এমন দুঃখ তায়॥

অবশ্য রাধার এই ব্যাকুলতার কারণ আছে,—

আসিব বলিয়া গেলা সত্য এ বচন।
পুনরপি বন্ধুয়া না আইল বৃন্দাবন॥
তার নব অনুরাগ আগুনের ঘর।
কহিতে তোমারে যত দগধে অন্তর॥

শ্রীরাধিকার অন্তরবাণী উদ্ধবের নিকট বেদনার রসে ঝরিয়া পড়ে—

আমি এক অভাগিনী আর তাহে অনাথিনী
অপরাধী অনেক জনমে।
আশা কৈল যার তরে বিধাতা না দিল মোরে
আত্মঘাতী হইব সঙ্গমে॥

তপনতনয়া তীরে ত্রিভঙ্গ মূরতি ধরে
তিরশ্চ চাহিয়া হরে প্রাণ।
তেয়াগিয়া গৃহ পতি তার পদে দিয়া মতি
ত্বরিতে যৌবন দিনু দান॥
তা বিনে না জানি আন্ তার গুণে পুড়ে প্রাণ
তবু প্রভু গেল তেয়াগিয়া।
তার বিনু কার নাহি তোমাকে বিনয় কহি
পদাম্বুজে জানাইবে গিয়া॥
থাকি আমি গৃহে বসি স্থির নহে তার বাঁশী
স্থান স্থিতি না বুঝিয়া ডাকে।
থর থর করে তনু স্থির নহে ভেটবিনু
উপহাস করে যত লোকে॥
স্থিতি কৈনু যার পায় যদি সে ছাড়িয়া যায়
থুব প্রাণ আর কার লাগি।
থাল দন্ড করি হাথে থাকিব সন্ন্যাসী পথে
শ্যাম নামে হইব বৈরাগী॥

শ্রীরাধিকার অন্তরে 'বৈরাগিনীর জীবন' অধিকতর সুখদায়ক, কারণ, তাঁহার বারো মাসের দুঃখ গাথা আরো মর্মান্তিক। নিদর্শনরূপে এই মর্মান্তিক বেদন-গাথার কয়েকটি অংশ উধৃত করিলাম।—

মাঘেতে মাধব সঙ্গে এ মণি মন্দিরে।
মহারঙ্গে রমির মানস নিরন্তরে॥
মাধবী মল্লিকা লতা কুঞ্জের ভিতরে।
মনে না জানিল হরি যাবে মধুপুরে॥
উদ্ধব হে! মরি হে ঝুরিয়া।
মনে করি মরিব মাধব স্মঙরিয়া॥

চৈত্রেতে চাতক পক্ষী ডাকে মন্দমধু।
সচেতন না রহে অঙ্গ না দেখিয়া বঁধু॥
চিত্ত নিবারিব কত বিরহ ব্যথায়।
চিতা যেন দহে দেহ বসন্তের বায়॥
উদ্ধব! চিত্ত ছল ছল করে।
চঞ্চল চড়ুই যেন পড়িয়া পিঞ্জরে॥

আষাঢ়ে আঙিনা রসে আছিনু শুতিয়া।
আমার শিয়রে আসি শ্যাম বিনোদিয়া॥
আলিঙ্গন দেই মুখে বুলাইয়া হাত।
উঠিয়া আকুল হৈনু কোথা প্রাণনাথ॥
উদ্ধব! অনেক যন্ত্রণা।
অধিক আশের দোষে এত বিড়ম্বনা॥

কৃষ্ণ-চরণ-রেণু-প্রার্থী দুঃখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দ-মঙ্গল' এক দিকে যেমন ভক্ত-হৃদয়ের অমল অঞ্জলী, অন্য দিকে, কাব্যের মহিম্ন শতদলও বটে। দুঃখী শ্যামদাসের পরিচয়, একদিকে কৃষ্ণভক্ত বলিয়া, আবার তিনি কবিও। এই ভক্ত ও কবির একত্র রূপ যদি দেখিতে হয়, তবে তাহা 'গোবিন্দমঙ্গল' ছাড়া অন্যত্র নাই; এই কারণেই, 'গোবিন্দ-মঙ্গল'—ভক্তিকাব্য।

'গোবিন্দমঙ্গল' কাব্যের কবি দুঃখী শ্যামদাস কোন্ শতাব্দীর লোক সে বিষয়ে মতভেদ আছে। স্বর্গীয় ঈশান-চন্দ্র বসু মহাশয়ের মতানুসারে, দুঃখী শ্যামদাস 'দুই শত বৎসর পূর্বের লোক', অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক তিনি। এই মত যে সমর্থন যোগ্য নয় তাহা বলাই বাহুল্য। পূর্বোক্ত 'খ-পুঁথি'র লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর দুই-এর কোঠায়। এই কাব্যের প্রচার কাল যদি এক শতাব্দী ধরা হয় তবে এই গ্রন্থ সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের—তাহাতে সন্দেহ নাই*। মোটকথা, কবি যে চৈতন্য পরবর্তীকালের মানুষ তাহাতে সন্দেহ নাই। গোবিন্দমঙ্গল' কাব্যের প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠা বৈষ্ণব প্রভাবে ধন্য। যাহা হউক, স্বর্গীয় বসু মহাশয়ের কাল নিরূপণ যে প্রামাণ্য নয়, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

'গোবিন্দমঙ্গল' ছাড়া দুঃখী শ্যামদাস রচিত অন্য কোন গ্রন্থ নাই বলিয়াই বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসকারগণ স্থির করিয়াছেন। সম্প্রতি 'গুরু-দক্ষিণা' নামধেয় একখানি ছোট পুঁথি পাইয়া এই প্রচলিত সিদ্ধান্তের উপর আমার সন্দেহ জন্মিতেছে। যাহা হউক, 'গুরু দক্ষিণার' কবি শ্যামদাস সম্পর্কে প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে, বর্তমানে দুঃখী শ্যামদাস ও গোবিন্দমঙ্গলের আলোচনা সংক্ষিপ্তভাবে এইখানেই শেষ করা গেল।

---

* এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর সুকুমার সেন (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খন্ড) ও ডক্টর তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত (প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস) মহাশয়দ্বয়ের মতামত উল্লেখযোগ্য কারণ দুঃখী শ্যামদাসের কাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উভয়েই তাঁহাকে ষোড়শ শতাব্দীর লোক বলিয়া মনে করেন।

আখের

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

সত্যপ্রিয় বাবুর কাছে বড়বাবুর কথা বহুবার শুনেছি। দয়ার অবতার তিনি। বড়বাবু হাতে থাকতে চাকরির আবার অভাব?

সত্যপ্রিয়বাবুর একথা নিছক গাল গল্প নয়। সত্যিই দয়ার অবতার আমাদের এই বড়বাবু। 'জীবে প্রেম'—বৈষ্ণব মহাপুরুষের এই আদর্শের তিনি হচ্ছেন জীবন্ত প্রতীক! রোজই অফিসে এসে সহকর্মীদের তিনি উপদেশ-বাণী বিতরণ করেন—স্বার্থ নিয়ে বেঁচে থাকার মধ্যে শুধু পশুত্বই আছে; তাতে মনুষ্যত্বের কোন বিকাশ ঘটে না। মানুষে আর পশুতে যে প্রভেদ আছে আজকের সমাজ তা ভুলতে বসেছে। অফিস সাধনার মন্দিরে বড়বাবু আমাদের আচার্য। পরম গুরুর মতন তিনি আমাদের নিত্য ধর্ম-উপদেশ দান করেন। বলেন—'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই! মানুষকে ভালোবাসার নামই হচ্ছে মানবতা।'

চেলা চামুণ্ডার অভাব নেই তাই বড়বাবুর। অফিসে ছেলে-ছোকরার দলই কেবল তাঁকে দেখতে পারে না। বলে—বেটা ভণ্ড, ভক্তবিটেল! মুখে পরমার্থের ভান করলে কি হয় স্বার্থ ছাড়া এক পাও চলে না।

কিন্তু প্রবীনের দল তাঁর খুব ভক্ত। বড়বাবুর জন্যেই চাকরির গদিতে উপবিষ্ট তাঁরা। বিশেষ করে তাঁর হেড-এ্যাসিসটেণ্ট সত্যপ্রিয়বাবু। সত্যপ্রিয়বাবু বড়বাবু বলতে অজ্ঞান। চল্লিশ বছর কেরাণী-জীবনে তিনি অনেক বড়বাবু দেখেছেন, কিন্তু এঁর মতন এমন একজন নিরহঙ্কারী পরম বৈষ্ণব, এমন সংসার নির্লিপ্ত মানুষের পরিচয় তিনি আর দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে পান নি। কেরাণী থেকে আজ যে তিনি সিনিয়র এ্যাসিসটেণ্ট, এ শুধু বড়বাবুর অনুগ্রহের ফল।

ছোকরার দল ঠাট্টা করে সত্যপ্রিয়বাবু সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করে—ভাবি-বড়বাবু। অর্থাৎ বড়বাবুর উত্তরাধিকারী। প্রতি যুগেই বড়বাবুরা এমনি একজন ক'রে উত্তরাধিকারী সৃষ্টি ক'রে যান যাতে অফিসে বড়বাবুর আদর্শ বজায় থাকে।

বড়বাবুর দয়াতেই আমার চাকরি হ'ল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী হয়ে এই অফিসে প্রবেশাধিকার লাভ করলাম। সত্যপ্রিয়বাবু আমার কথা আগেই বলে রেখেছিলেন বড়বাবুর কাছে।

এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটারখানি হাতে করে বড়বাবুর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। শ্রদ্ধাভরে পদধূলি গ্রহণ করতেই পুরু চশমার কাঁচের ফাঁক দিয়ে তিনি আমার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন—কল্যাণ হোক!

সত্যপ্রিয়বাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন—আমার শ্যালক। এবারে বি-এতে ডিস্টিংশন পেয়েছে।

কপালে তিলক কাটা বেঁটে ছোটখাটো গোলগাল মানুষটি আবার বললেন—কল্যাণ হোক!

সত্যপ্রিয়বাবু আর্জি জানালেন—আমাদের সেকশনেই নিচ্ছি স্যার!

তথাস্তু!

বড়বাবুর ভক্ত গোষ্ঠীর মধ্যে আমিও নাম লেখালাম। সদ্য কলেজের শিক্ষা এবং যৌবনের দৃষ্টি যদিও আমার অন্তরায় তবুও সত্যপ্রিয়বাবুর উপদেশ শিরোধার্য ক'রে নিয়েছি।

—অমন অনেক বি-এ, এম্-এ ফ্যা ফ্যা ক'রে বেড়াচ্ছে! জীবনটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগার নয়। এখন থেকেই আখের গুছিয়ে নাও। বড়বাবু আমাদের স্বজাতি—তিনি প্রসন্ন থাকলে এক বছরেই সুপারভাইজারি পোষ্ট পেয়ে যাবে।

সত্যপ্রিয়বাবুর এই অমূল্য উপদেশ মনে প্রাণে গ্রহণ করেছি। তাই অফিসে ঢুকেই সর্বপ্রথমে মহামানব বড়বাবুর পদধূলি গ্রহণ করি। তাঁর উপদেশবাণীকে শাস্ত্রবাণী বলেই মেনে নেই। ঠাট্টা বিদ্রূপের খোঁটায় অবিশ্যি অতিষ্ট হ'য়ে যে উঠি না এমন নয়, কিন্তু পেটে খেলে পিঠে সয়। বাইরের রাজপথের উত্তপ্ত হাওয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আজন্ম দরিদ্র আমি—দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম আমার প্রতিদিনের। তাই সত্যপ্রিয়বাবুর অমূল্য উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করি—জীবনটা শুধু শিক্ষা সংস্কৃতির নীতির বেড়া দিয়ে ঘেরা নয়। বড়বাবুকে তুষ্ট রেখে জীবনের আখেরটাকে গুছিয়ে নিতে হবে।

চিঠির ফাইল নিয়ে বড়বাবুর কাছে গিয়েছিলাম। করেসপণ্ডেন্সের কাজ বড়বাবু আমাকে দিয়েই করান আজকাল। আমার ইংরাজি লেখা তাঁর বেশ মনঃপূত হয়। আমিও তাতে চরিতার্থ।

বড়বাবু বললেন—বুঝলে হে সত্যেন, পৃথিবীতে

খেয়ে পরে সবাই তো বেঁচে থাকে; কিন্তু তার ওপরে আর এক বেঁচে থাকার মার্গ—তার সন্ধান প্রকৃতপক্ষে ক'জন জানে?

বিনীত ভাবে বলি—আজ্ঞে হ্যাঁ, সে কথা তো ঠিকই!

বড়বাবু বল্লেন—সে পথের সন্ধান যদি প্রকৃতই পাও তবেই জেন জীবনটা ধন্য!

ভাবাবেগের ভঙ্গিতে আমি তাকিয়ে থাকি অফিস-আচার্য বড়বাবুর দিকে।

ভনিতার পালা শেষ ক'রে বড়বাবু বলেন—সত্যেন, তোমাকে একটা কথা বলবো?

পরম আপ্যায়িত হ'য়ে আমি বলি—বিলক্ষণ! আপনার অনুগ্রহই তো আমার সম্বল।

বড়বাবু বললেন—বড় ছেলেটা এবার ক্লাশ-প্রমোশন-পায় নি। তার জন্যে ভালো একটা মাষ্টার দেখে দাও দিকি!

বললাম—এ আবার এমন কথা কি বড়বাবু? আজকালের ভেতরই আমি ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। বড়বাবু সংসার নির্লিপ্তের ভঙ্গী প্রকাশ ক'রে বললেন—চিরকালটাই ইহলোক ইহলোক ক'রে গেলাম। আর কেন? তুমিও যেমন! 'তুমি কার, কে তোমার, ব'লে জীব ক'রো না ক্রন্দন!'

বড়বাবুর কথার মাঝখানে আমি জের টানি—'তবুও এটাও তো আপনার কর্তব্য!'

বড়বাবু চোখের কোণে আমেজের স্পর্শ টেনে বললেন—হ্যাঁ, সত্যেন্দ্র, ঠিকই ব'লেছো—তবুও কর্তব্য! আর এই কর্তব্যের জন্যেই সংসারে আসা-যাওয়া আমাদের।

বড়বাবুকে প্রশ্ন করলাম—ছেলে আপনার কোন ক্লাশে পড়ে?

—তাই তো হে, এযে বড় মুস্কিলে ফেললে তুমি আমাকে। রসো, হিসেব করি। আমাদের সময়ে ছিল ওটা তোমার গিয়ে সেকেণ্ড ক্লাশ। অর্থাৎ আমরা তখন ব'লতাম প্রিপারেটারি বা প্রিম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশ। আজকালকার হিসেবে হ'চ্ছে তোমার—

বড়বাবুর শ্রম লাঘব করিয়ে দিই আমি। বলি—ক্লাশ নাইন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ ক্লাশ নাইন। খুশী হ'য়ে ওঠেন বড়বাবু আমার কথায়।

আজকাল সবই উলটো; বুঝলে হে সত্যেন—সবই উলটো। উলটো পথেই চলেছি আমরা—হেসে ফেটে পড়লেন বড়বাবু।

সাহেবের ঘর হ'তে ডাক আসাতে হাসির প্রবাহকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বড়বাবু দুর্গা নাম জ'পতে জ'পতে সাহেবের ঘরের দিকে অগ্রসর হলেন।

ওৎ পেতে ব'সেছিলেন সত্যপ্রিয়বাবু। বড়বাবু সাহেবের ঘরে ঢুকতেই তিনি আমার পিঠ চাপড়ে ব'ললেন—গোল্ডেন অপারচুনিটি! সদ্ব্যবহার করো হে সত্যেন, সদ্ব্যবহার করো।

হতবিস্ময়ে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই সত্যপ্রিয়বাবু ব'ললেন—বড়বাবুর ছেলেকে পড়ানো মানেই তাঁর ক্লোজ টাচে থাকা।

আমি ব'ললাম—কিন্তু আমি তো তাকে পড়াচ্ছিনে।

কেন? ডিস্‌টিংশনে বি-এ পাশ ক'রেছো, আর একটা স্কুলের ছেলেকে পড়াতে পারবে না?

তা পারবো না কেন? কিন্তু উনি তো আমাকে পড়াতে বলেন নি। উনি একজন ভালো মাষ্টার ঠিক ক'রে দিতে ব'লেছেন। আমার এক ক্লাশ-ফ্রেণ্ডকে ঠিক ক'রে দেবো মনস্থ ক'রেছি।

আমার নির্বুদ্ধিতায় সত্যপ্রিয়বাবু হতাশ্ হ'য়ে গেলেন—অর্থাৎ নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ ক'রবে আর কি? সুপারভাইজার হ'বে তোমার বন্ধু; আর তুমি পড়ে থেকো এই কেরাণীর গোয়ালে।

কিন্তু অফিসের কাজের সঙ্গে বড়বাবুর গৃহ-শিক্ষকের সম্পর্ক কী?

আমার কথা শুনে সত্যপ্রিয়বাবু ব'ললেন—সেইটেই তো বুঝিয়ে দিতে চাই তোমাকে। তাতে তোমারই কল্যাণ হবে।

বড়বাবু সাহেবের ঘর হ'তে ফিরে আসতেই সত্যপ্রিয়বাবু তাঁর টেবিলের সামনে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন।

—কী ব'ললেন স্যার বড় সাহেব?

সত্যেনের ফাইল চেয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলেন—কেমন কাজ করছে?

পরম আপ্যায়িত হ'য়ে সত্যপ্রিয়বাবু বড়বাবুকে আবেদন জানালেন—অল্প বয়েসে বাপ-মা হারিয়েছে স্যার! নিজের চেষ্টায় এই এতখানি লেখাপড়া শিখে শেষে আপনার অনুগ্রহে এখানে এসেছে।

বড়বাবুর কণ্ঠে পুনরায় আত্ম-নির্লিপ্তের সুর ফুটে উঠলো—সবই তাঁর ইচ্ছা, বুঝলে সত্য! পৃথিবীতে কে কার কি ক'রতে পারে বলো?

সত্যপ্রিয়বাবু ব'ললেন—তবুও তো নিমিত্তের প্রয়োজন

হয়। সেই নিমিত্তের মধ্যেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ লুকিয়ে থাকে!

সত্যপ্রিয়বাবুর কথা লুফে নিয়ে বড়বাবু ব'ললেন—হ্যাঁ, নিমিত্ত, নিমিত্ত মাত্র। তাই তো বড় সাহেবকে ব'ললুম হে—'এ প্রমিশিং ইয়ং চ্যাপ!'

সত্যপ্রিয়বাবুর ইঙ্গিতে আমি এগিয়ে এসে বড়বাবুকে প্রণাম ক'রতেই বড়বাবুর কণ্ঠ হ'তে আশীর্বাণী উচ্চারিত হ'ল—'কল্যাণ হোক'।

সত্যপ্রিয়বাবুর শেখানো বুলি তোতাপাখির মতন গিয়ে অ'ওড়ালাম বড়বাবুর বাড়ি গিয়ে—আজ্ঞে, আপনার ছেলেকে অপর কারুর হাতে ছেড়ে দিতে মন সায় দিচ্ছে না। আপনি আমার অন্নদাতা।

ভাবে গদগদ হ'য়ে বড়বাবু ব'ললেন—বিলক্ষণ; এতো উত্তম প্রস্তাব সত্যেন্দ্র!

ব'ললাম—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই ওকে পড়াবো।

বড়বাবু পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে ব'ললেন, আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম।

তিনি ছেলেকে ডেকে আমার হাতে সমর্পণ ক'রলেন।

আমি আশ্বাস দিলাম—'আমার যত্নের ত্রুটি হবে না বড়বাবু'।

বড়বাবু ব'ললেন—সবই তাঁর ইচ্ছা।

সত্যপ্রিয়বাবুর কথা স্মরণ ক'রছিলুম—নব্বই টাকার কেরাণী থেকে দেড়শো টাকার সুপারভাইজার। দেড়শো টাকা থেকে তারপর সাড়ে তিনশো টাকার গ্রেড। বড়বাবুর কল্যাণে আমার তা অচিরেই করতলগত হবে। জীবনের আখের এমনি ক'রেই গড়ে তুলতে হয়। সাড়ে তিনশো টাকা গ্রেডের জন্যে সত্যিই কত এম্-এ, বি-এ ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কল্যাণী এ কথা শুনলে খুবই খুশী হবে। সাড়ে তিনশো টাকার গ্রেডে আমাদের দু'জনের জীবন-তরণীতে ভাঁটার টান বড় বিশেষ দেখা দেবে না। আর কল্যাণীও একেবারে অকর্মন্যা নয়। আসছে বছর সেও বি-এ পাশ ক'রে আমার সংসার-লক্ষ্মী হ'য়ে আসবে। সাড়ে তিনশো টাকা গ্রেডের শিক্ষিত সুপারভাইজারকে কন্যা সম্প্রদান ক'রতে কল্যাণীর বাবা নিশ্চয়ই আপত্তি প্রকাশ ক'রবেন না; কল্যাণীর মা যখন আমাকে সুনজরেই দেখেন আর কল্যাণীর নিজস্ব ইচ্ছার দাম যখন কল্যাণীর বাবা দিতে কুণ্ঠিত নন তখন আর বাধা কোথায়? খুশীর বন্যায় শরীর আমার দুলে উঠলো। পরম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করলাম সত্যপ্রিয়বাবুকে। সত্যপ্রিয়বাবু আমার মাসতুতো বোনের স্বামী; কিন্তু এতবড় হিতৈষী আত্মীয় ত্রিভুবনে নিজের ভগ্নীপতিরাও হ'ন কিনা সন্দেহ!

বড়বাবুর বাড়ি থেকে ফিরে সেই দিনই কল্যাণীর কাছে গেলাম। কল্যাণীকে ব'ললাম জীবনের পরম কল্যাণময় শুভবার্তা!

অফিসে ছেলে-ছোকরার দল ঠাট্টা বিদ্রুপে ভরিয়ে তুললে আমাকে—কন্‌গ্রাচুলেশনস্!

বললাম—মানে?

—ন্যাকা আর কি? ভাজা মাছটি উল্‌টে খেতে জানেন না?

নির্বোধের মতন ফ্যাল ফ্যাল ক'রে সহকর্মীদের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সুপারভাইজার হচ্ছো হে! বড়বাবু খুব ভালো নোট দিয়েছেন তোমার সম্পর্কে।

সহকর্মীদের কথায় চুপ ক'রে রইলাম। ঈর্ষাকাতরতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার মতন মনোবৃত্তি নেই ব'লে।

কিন্তু কিসের বিনিময়ে জানো?

ব'ললাম—পরিষ্কার ক'রে বলো না, ব্যাপারটা কী?

টাইপিষ্টবাবু আমার কথায় খেঁকিয়ে উঠলেন—আহা, কিছুই যেন জানো না। জামাই হ'চ্ছো হে। বড়বাবুর ঘর-জামাই। জামাইকে তো আর কেরাণী রাখা যায় না। তাই সুপারভাইজারের পোষ্টে তোমাকে রেকমেণ্ড ক'রেছেন তিনি।

জল ঘোলা ক'রে আর লাভ নেই। স'রে এলাম ওদের কাছ থেকে।

নিজের সীটে এসে ব'সতেই সত্যপ্রিয়বাবু এগিয়ে এলেন। খুশীর দীপ্তিতে উজ্জ্বল তিনি আজ। বড়বাবুর অফিস নোটটি আমার চোখের সামনে মেলে ধ'রে তিনি ব'ললেন—কেমন ব'লেছিলাম যা, ঠিক তাই ঘ'টলো তো? সাড়ে তিনশো টাকা গ্রেডের সুপারভাইজার। সন্দেশ খাওয়াও এইবার আমায়।

খুশী আমিও হ'য়েছিলাম বটে। বড়বাবুর বদান্যতায় অন্তর আমার ভ'রে যাওয়ারই কথা। আর আমার পরম হিতৈষী আত্মীয়কে পেটভ'রে সন্দেশ খাওয়ানো—এ আর এমন কী ব্যাপার? কিন্তু মনের মধ্যে কোথায় যেন কাঁটা বিঁধছিলো। সত্যপ্রিয়বাবু ব'ললেন—এ যুগে বড়বাবুর মতন লোক আর দেখা যায় না। ও'র ছেলেকে পড়িয়ে তুমি টাকা নাও না, তাই তো তোমাকে উনি প্রতিদান দিলেন সাড়ে তিনশো টাকার গ্রেডের সুপারভাইজারি।

মনের উদ্বেগকে প্রকাশ ক'রে ব'ললাম—আর কোন সর্ত নেই তো এতে?

সত্যপ্রিয়বাবু একথা শুনে ব'ললেন—তার মানে? অফিসে যা কাণাঘুষা শুনছি?

অত্যন্ত সহজভাবে সত্যপ্রিয়বাবু ব'ললেন—আরে সেইটাই তো বড় আখের। আর পাঁচ বছর পরে সুপারভাইজারি থেকে একেবারে সিনিয়র এ্যাকাউন্টেন্ট! চারশো টাকা থেকে আটশো টাকার গ্রেড!

এত বড় প্রলোভনের কথা শুনেও মাথায় যেন আকাশ ভেঙে প'ড়লো। নাকে নাকছাবি ঘন কৃষ্ণ শ্যামাঙ্গিনী স্থূলকায়া বড়বাবুর কন্যা ভাবিরক্সী অফিসারের স্ত্রী!

সত্যপ্রিয়বাবু পিঠ চাপ্ড়ে ব'ললেন—এমন আখের নষ্ট করো না হে সত্যেন। অর্দ্ধেক রাজ্য আর রাজকন্যা। বৃহস্পতির তুঙ্গী যাকে বলে হে!

কিন্তু বি-এ পড়া সুগৌর তনু লাবণ্যময়ী বিদুষী কল্যাণী? কল্যাণী স'রে দাঁড়াবে আমার জীবন-পথ থেকে?

মনের কোণে ঝড় উঠেছে আমার। কালো ঘন মেঘের আবরণে হৃদয়-আকাশ পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে।

সত্যপ্রিয়বাবু ব'ললেন—বড়বাবুর মেয়েটি একটু কালো। অর্থাৎ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ যাকে বলে হে। তুমি তো তাকে দেখেছো? কি বলো সত্যেন?

ঝড়ের ঘূর্ণী হাওয়ায় মনের কথা ওলোটপালট হ'য়ে যায়।

সত্যপ্রিয়বাবু দৃঢ় আশ্বাস দিয়ে বলেন—ওসব কিছু না সত্যেন; কিছু না। মনে কোন সংশয় রেখো না। সুন্দরী মেয়েকে কী তুমি ঘরের শো-কেশে সাজিয়ে রাখবে? পয়সা থাকলে স্ত্রীর রং সোণার মতনই উজ্জ্বল মনে হয়। এমন আখের নষ্ট করো না—আটশো টাকার সিনিয়র এ্যাকাউন্টেন্ট।

সাহেবের ঘর থেকে ডাক এলো আমার। সত্যপ্রিয়বাবু ব'ললেন—বড়বাবুর নোট পেয়েই সাহেব ডেকেছে। তোমাকে দেখতে চায়। বেশ স্মার্টলি যাবে।

বড়বাবুর নোট পেয়েই সাহেব ডেকেছে আমায়; কিন্তু অন্য নোটে। আমাকে দেখেই ক্রুদ্ধ গর্জনে গর্জে উঠলো সাহেব—দিস্ ইজ সিরিয়স্ এ্যালিগেশন এগেনষ্ট ইউ।

বিস্মিত নেত্রে সাহেবের দিকে তাকিয়ে ব'ললাম—বেগ্ ইয়োর পার্ডন স্যার।

দি ফিগারস্ আর অল রট্! স্টেটমেন্টের সিটটি আমার দিকে ছুড়ে দিলে সাহেব।

কিন্তু এর জন্যে আমার অপরাধ কোথায়? ব'লতে গিয়েও কথাটা গলায় আমার আটকে গেল।

সাহেব মন্তব্য প্রকাশ করলে—ভেরি ব্যাড অফ ইউ! এ রকম কাজ হ'লে চাকরি থাকবে না। বড়বাবু হ্যাজ্ মেড সেভারেল কম্প্লেনস্ এ্যাগেনষ্ট ইউ। —সাহেবের এ কথায় আকাশ থেকে পড়লাম।

তা হ'লে সবই মিথ্যে সবই ধাপ্পাবাজী। সুপারভাইজারীর নোট ভাঁওতা।

সাহেব বললে—গো, সি বড়বাবু এ্যান্ড রেক্টিফাই দি এরারস।

সাহেবের ঘর থেকে বড়বাবুর কাছে আসতেই পরম বৈষ্ণব কপালে তিলক কাটা বেঁটেখাটো লোকটি পুরু চশমার কাঁচের ফাঁক থেকে আমার দিকে দৃষ্টি মেলে আপ্যায়িতের সুরে ব'ললেন—তোমার কথাই ভাবছিলাম সত্যেন্দ্র! জীবনটা শুধুই ফাঁকি। আর এই ফাঁকির পশরা মাথায় নিয়ে আমরা চলেছি।

রাগে বারুদ ফাটা হ'য়ে উঠি আমি—ব্যাটা ভণ্ড, বেইমান!

কিন্তু ক্ষোভ প্রকাশের পূর্বেই সত্যপ্রিয়বাবু এসে সামলান আমাকে।

বড়বাবুকে উদ্দেশ ক'রে তিনি বলেন—সত্যেনকে ব'লেছি স্যার। আপনার ছেলেকে পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকেও দেখাশুনা ক'রবে ও।

খুশী হ'য়ে বড়বাবু বলেন—তা একটু দেখো তো সত্যেন। আজকালকার ছেলেরা আবার লেখাপড়া জানা মেয়ে চায় বিয়ে ক'রতে। কী দিনকাল বলো দেখি। আরে ওই বিদেশী শিক্ষা মেয়েদের জীবনে কী মূল্য আছে ওর?

এরপরও বড়বাবুকে চ'টাতে পারলাম না। চাকরি জীবনের আখের বড়বাবু। দে'তো হাসি হেসে বললাম—কালের হাওয়া বড়বাবু। গদ গদ কণ্ঠে আমার পিঠ চাপ্ড়ে বড়বাবু বলেন—ঠিক বলেছো সত্যেন, কালের হাওয়া। কালের হাওয়াই বটে!

আমার হাতে স্টেট্মেন্টের ফিগার দেখে বড়বাবু ব্যস্ত হ'য়ে বলেন—ওকি, ডেলি ফিগার তোমার হাতে কেন? সাহেব বুঝি দিয়েছে? তা তোমাকে কেন? ওটা তুমি আমার টেবিলে রেখে দাও—ও আমি ঠিক ক'রে দেবোখন।

বড়বাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম—চশমার পুরু কাঁচের অভ্যন্তরে গভীর চোখ দু'টিতে অতল রহস্যের ছায়া।

সাংবাদকতার আদর্শ

শ্রীমন্মথ নাথ সান্যাল

পরাধীন জাতির ও স্বাধীন জাতির সংবাদপত্রসেবার আদর্শে যে পার্থক্য, তা মৌলিক ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমরা যদি সেই পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন না হই, পরিবর্তিত পরিবেশের অনুরূপ দায়িত্ববোধ যদি আমাদের মধ্যে জাগ্রত না হয়, জাতি সংগঠনের নবপ্রভাতে আমরা যদি উদ্বোধক সামগানে দেশবাসীর অন্তর ঝঙ্কৃত ক'রে তুলতে না পারি, তা হ'লে আমরা নিজেরাই যে শুধু কর্তব্যভ্রষ্ট হব—তা নয়, দেশের অপরিমিত অহিত সাধন আমরা ক'রবো এবং তার জন্যে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের অভিশাপ ও ধিক্কার ভাজন হ'তে হবে। এ কথা আমাদের উপলব্ধি ক'রতে হবে যে, পরশাসনে লাঞ্ছিত জাতিকে বন্ধনশৃঙ্খল-ছেদনের জন্য সংবাদপত্র যে বাঁধনছেঁড়া উন্মাদনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং সেই উন্মাদনা সৃষ্টির মধ্যে যে বেপরোয়াভাব বিদ্যমান থাকে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সেই মনোভাব নিয়েই অগ্রসর হ'লে তা আত্মহননেরই নামান্তর হ'য়ে দাঁড়ায়।

ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর মহাপ্রয়াণের স্বল্পকাল পূর্বে—ইংরেজ ভারতবর্ষকে কি অবস্থায় ফেলে যাবে—কল্পনায় তার এক বাস্তব চিত্র এঁকে দেশবাসীর সামনে উপস্থাপিত ক'রেছিলেন। তিনি ব'লেছিলেন—

> 'ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ ক'রে যাবে। কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হ'য়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিসহ নিষ্ফলতাকে বহন ক'রতে থাকবে।'

ইংরেজ সত্য সত্যই পিছনে সহস্র-সমস্যা-কণ্টকিত এক আবর্জনাস্তূপ পরিত্যাগ ক'রে গেছে। দীর্ঘকালের পরাধীনতা জাতিকে শুধু পার্থিব সম্পদেই নিঃস্ব ক'রে ফেলেনি, আত্মিক, মানসিক ও নৈতিক সম্পদেও দীন ক'রে গেছে। স্বাধীনতা লাভের পর সেই দীনতার বীভৎস মূর্তি আমাদের চারদিকেই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। জীবনের এই গ্লানিকে মুছে ফেলে, পরাধীনতার দুর্দিনে পুঞ্জিত আবর্জনাস্তূপকে অপসারিত ক'রে সুস্থ স্বাভাবিক সমুন্নত সুন্দর জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনা করাই আমাদের—শুধু আমাদের কেন—ভারতের প্রত্যেক সন্তানেরই প্রধানতম কর্তব্য। জাতির জীবনকে সেই বাঞ্ছিত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে—ধ্বংস নয় সংগঠন, বিভেদ-বিরোধ নয়—সহযোগিতা, উত্তেজনা-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি নয়—আত্মস্থ হওয়ার শিক্ষা, অক্ষমের অধীরতা নয়—কর্মযোগীর স্থৈর্য, বক্তৃতা ও ধ্বনি নয়, নিরলস কর্মসাধনাই শুধু আমাদের সহায়ক হ'তে পারে।

এদিক দিয়ে সংবাদপত্রের যে কি অপরিসীম দায়িত্ব, তা ব্যাখ্যা ক'রে না বোঝালেও চলে। জনমতকে গ'ড়ে তুলতে সংবাদপত্রের প্রভাব যে কত বিস্তৃত ও প্রবল, সে-কথা প্রায় সকলেরই অল্প-বিস্তর জানা আছে। পরশাসন-মুক্ত ভারতে শিক্ষা ও রাজনীতিক চেতনার ক্রমবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এর প্রভাব অনিবার্যভাবেই প্রবলতর হ'য়ে উঠবে। সংবাদপত্রের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকগণের দায়িত্ববোধও স্বভাবতই বর্ধিত হবে, প্রত্যেক সুস্থবুদ্ধি মানুষ এ আশা নিশ্চয়ই পোষণ ক'রবে। স্ব স্ব কর্মস্থলের এক স্বল্প পরিসর কক্ষে কাগজে আঁচড় কেটে যে কথা আমরা লিখি, সেই কক্ষের বাইরের বৃহত্তর জগতে অগণ্য নরনারী বাল-বৃদ্ধ যুবার উপর তার প্রভাব কি হ'তে পারে, দেশের কতটা মঙ্গল বা অমঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা তাতে নিহিত থাকে, তার একটা চিত্র মনের সামনে রেখে যদি আমরা আমাদের কর্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হই, তা হ'লে আমাদের দায়িত্ব আমরা সুষ্ঠুভাবেই পালন ক'রতে পারবো ব'লে আমি বিশ্বাস করি। কারণ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্বজাতি ও স্বদেশের অনিষ্টসাধন করা যার বুদ্ধি বিকারগ্রস্ত হয়েছে, একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব; সাংবাদিক কেন, কোনো সুস্থবুদ্ধি মানুষের পক্ষেই তা সম্ভব ব'লে আমি মনে করি নে। এই প্রসঙ্গে আমি মহাত্মা গান্ধীর দু'একটা উক্তি স্মরণ ক'রছি। কথাগুলো মনে মুদ্রিত ক'রে রাখলে

আমাদের চলার পথ সুগম হবে, সুস্থতর দৃষ্টিলাভে আমরা সমর্থ হব ব'লে ভরসা করি; গান্ধীজী ব'লেছেন—

> 'The sole aim of journalism should be service. One of the objects of a newspaper is to understand the popular feeling and give expression to it; another is to arouse among the people certain desirable sentiments; and the third is fearlessly to expose popular defects.'

তিনি যেমন সাংবাদিকের আদর্শ সম্বন্ধে ইঙ্গিত ক'রেছেন, তেমনি অসংযত লেখনী পরিচালনায় যে কি অপরিমেয় অনিষ্ট সাধিত হ'তে পারে, সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছেন। তিনি ব'লেছেন—

> 'The newspaper press is a greater power, but just as an unchained torrent of water submerges whole country sides and devastates crops, even so an uncontrolled pen serves but to destroy.'

ক্ষণকালের জন্যও একথাটা যেন আমরা না ভুলি যে, মানুষের দুষ্প্রবৃত্তিকে উস্কিয়ে তোলা যত সহজ, তার মধ্যে সম্বুদ্ধির উদ্বোধন করা তত সহজসাধ্য নয়; তাকে অধঃপতনের পথে সহজেই ঠেলে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাকে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করার কাজ শুধু সুকঠিন নয়, দীর্ঘ সময়সাপেক্ষও বটে। প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাও এই সাক্ষ্যই আমাদের দেয় যে, উঁচু থেকে গড়িয়ে নীচে পড়া যত সহজ, উঁচুতে ওঠার কাজটা তত সহজে সম্পন্ন করা যায় না।

এ কথাও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, মানুষের হীন প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলে সস্তায় বাজিমাৎ, স্বার্থসিদ্ধি বা উদ্দেশ্যসাধন যাঁরা ক'রতে চান, সাময়িকভাবে অদের বাজিমাৎ হয় তো হয়, কিন্তু আখেরে তাঁদের নিজেদেরও যে মাৎ হ'তে হয়, ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। স্বার্থসিদ্ধি বা উদ্দেশ্যসিদ্ধিও ওপথে না হয় তা নয়, কিন্তু পরিণামে বৃহত্তর মহত্তর সিদ্ধি থেকে বঞ্চিত হ'য়ে মরুভূমির শূন্যতা ও ব্যর্থতার মধ্যেই এ পথের পথিকদের ভবিষ্যৎ বিলীন হ'য়ে যায়, এরূপ উদাহরণও তো আমাদের অপরিজ্ঞাত নয়।

জনমত সংগঠনে সংবাদপত্রের প্রভাব যে অপ্রতিহত, একথা পূর্বেই ব'লেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে যদি একথা না বলি যে, সংবাদপত্রকে কল্যাণকর পথে অগ্রসর হ'তে সবল সুস্থ জনমতই সহায়তা করে, তা হ'লে সত্যের অপলাপ করা হবে। যে সংবাদপত্র স্বার্থসিদ্ধির বা অসদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য জনমতকে বিভ্রান্ত ক'রতে চেষ্টা করে, দেশের বা জাতির স্বার্থকে ক্ষুদ্র স্বার্থের কাছে বলি দিতে উদ্যত হয়, জনমতের সুদৃঢ় অভিব্যক্তি সেই সংবাদপত্রের শুভবুদ্ধির উদ্রেকে কম কার্যকর হয় না। সাধারণভাবে জনসাধারণ ও সংবাদপত্র সহযোগিতার পথে, গীতার ভাষায় 'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ং পরম বাপ্স্যথ।' পরস্পরের ভাবনাদ্বারা উভয়েই পরম মঙ্গল লাভ করে।

জানি, এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে যে, বর্তমানকালে সংবাদপত্র যখন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে উঠেছে, তখন বেতনভোগী সাংবাদিকদের পক্ষে অবাধে মত ব্যক্ত করার স্বাধীনতা থাকা কি সম্ভব? আজকের দিনে সংবাদপত্রের মতনিয়ন্ত্রণে শুধু পরিচালকগণের কেন, বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রভাবও খুব উপেক্ষণীয় নয়। কারণ বিজ্ঞাপনহীন সংবাদপত্র পরিচালনা আদর্শের দিক থেকে সমর্থনীয় ও বাঞ্ছিত হ'লেও বাস্তবক্ষেত্রে তা অসম্ভব হ'য়েই দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া আধুনিক প্রতিযোগিতার যুগে স্বল্প মূলধনে সংবাদপত্র পরিচালনার আশাও প্রায় কল্পনাবিলাসে পরিণত হ'তে চ'লেছে। তিমিঙ্গিল যেমন ক্ষুদ্রতর সমস্ত জলচর প্রাণীকে গ্রাস করে, বৃহত্তর প্রতিযোগিতা তেমনি এই সব ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে জীর্ণ ক'রে ফেল্ছে। এ সব সত্ত্বেও একথা আমি ব'ল্বো যে, সঙ্কল্প যদি শুভ হয়, মহৎ আদর্শের প্রেরণা যদি সত্যই আমাদের উদ্বোধিত করে, তা হ'লে সামঞ্জস্যের পথে মত অভিব্যক্ত করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব হয় না।

এতক্ষণ যেকথা আমি আলোচনা ক'রেছি, তা সাধারণভাবে সকল শ্রেণীর সাংবাদিক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এই সূত্রে মফঃস্বল বা পল্লী অঞ্চলে যে সমস্ত সাংবাদিক র'য়েছেন, তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধেও এখানে দু'এক কথা উল্লেখযোগ্য। তাঁদের প্রায় সকলেই রাজধানী কল্কাতার সংবাদপত্রসমূহের correspondent বা সংবাদদাতা। দেশবাসী আমাদের এই সাংবাদিক ভ্রাতৃবর্গের কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত কিনা, সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ যে তীব্র আলোক চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, সরব আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে যে কর্ম আত্মপ্রকাশ করে, মানুষ

তাতে স্বভাবতই বিস্মিত হয়, উৎকর্ণ হ'য়ে ওঠে। কিন্তু গৃহকোণের যে ক্ষুদ্র দীপটি ঘরের অন্ধকার দূরীভূত করে, যে কর্ম নীরবে নিভৃতে সমাজ-জীবনের ভিত্তি গড়ে তোলে, সে সম্বন্ধে তাদের সচেতনতা বড়ই কম। কিন্তু সাধারণের ঔৎসুক্য এসব সম্বন্ধে কম থাক্‌লেও এঁদের কাজের মহত্ত্ব ও গৌরব যে কোনো আড়ম্বর-কোলাহল-মুখরিত কাজের থেকেই কম নয়, একথা অকুণ্ঠভাবেই স্বীকার ক'রতে হবে। তাঁদের সাধনা ও কর্মধারা নীরবে নিভৃতে সাধিত হয় বটে, কিন্তু গুরুত্বে ও গৌরবে তা যে কোনো মহৎ কর্মের সঙ্গেই তুলনীয়। আমি আমার এই সাংবাদিক ভ্রাতাদের নগর ও পল্লীর, সহরের জীবন ও গ্রাম-জীবনের মিলনসেতুরূপে, যোগসূত্ররূপে দেখে থাকি। সহজ, সুস্থ জাতীয় জীবন গড়ে তোলার কাজে এই মিলন-সেতুর এই যোগসূত্রের প্রয়োজনীয়তা যে কত, তা ব'লে শেষ করা যায় না।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে নগরের অসম্ভব, অস্বাভাবিক স্ফীতি সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, এখনও এদেশের শতকরা প্রায় ৭০ জন মানুষ পল্লীকে আশ্রয় ক'রে টি'কে আছে। নগরের সাড়ম্বর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস ও প্রচার সত্ত্বেও স্বাদে বর্ণে গন্ধে মধুময় জাতীয় সংস্কৃতি পল্লীতেই বিধৃত হ'য়ে আছে, নগরের স্বার্থবহুল জটিল জীবনের সদম্ভ আস্ফালন সত্ত্বেও মানবধর্মপোষিত সুস্থ সামাজিক জীবন বট-অশ্বত্থ-আম্রকুঞ্জে ঘেরা ছায়াস্নিগ্ধ পল্লীর মধ্যেই স্বাভাবিক আশ্রয় বেছে নিয়েছে। এই পল্লী-জীবনের সঙ্গে নগর-জীবনের যদি বিচ্যুতি ঘটে, তাতে পল্লীর ক্ষতি হবে না—তা নয়, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি হবে নগরের, তার স্বাভাবিক প্রাণধর্ম বিকাশের। কাজেই পল্লী ও নগরের যোগসূত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে সাহায্য ক'রে তাঁরা সমগ্রভাবে জাতীয় জীবনের যে কল্যাণ সাধন ক'রছেন, তা সকলেরই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত। সেই সঙ্গে একথাও আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, নূতন ভারতের নবতর পরিবেশে তাঁদের দায়িত্ব যে অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, সে সম্বন্ধে তাঁরা সকলেই সচেতন আছেন।

স্বাধীন ভারত সংগঠনের সাফল্য বেশী পরিমাণেই নির্ভর ক'রবে পল্লীসংগঠনের উপর। পল্লী ব'ল্‌তে আমি আমাদের দেশের ছোট সহরগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিচ্ছি। কারণ কলকাতার মতো বৃহৎ নগরীর পল্লীর সঙ্গে যে বিচ্ছিন্নতা, ছোট সহরের সঙ্গে পল্লীর সে বিভেদ গড়ে ওঠেনি। পল্লী যেন সেখানে পরম সখ্যে সহরের সঙ্গে গলাগলি ধ'রে অবস্থান ক'রছে।

যে সব সংবাদপত্র সম্পাদনের দায়িত্ব এই সব মফঃস্বল বা পল্লী অঞ্চলের সাংবাদিক ভ্রাতৃবর্গের উপর ন্যস্ত আছে, সেগুলির সাহায্যে পল্লী চাষীদের মধ্যে তাঁরা যদি উন্নত-কৃষি, পশুপক্ষী পালন, স্বাস্থ্য, ধর্মবোধ, সমাজ-বিজ্ঞান, উৎসবানুষ্ঠান, বৃক্ষ-রোপণ, জল নিকাশ, কুটির শিল্প, পশুখাদ্য, সব্জী উৎপাদন, সমবায় নীতি, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, বয়স্কদের শিক্ষা, পথ নির্মাণ, জল সরবরাহ প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান প্রচারে ব্রতী হন, তা হ'লে পল্লীকে যে নানা দিক থেকেই উন্নত ক'রে তোলার সহায়ক তাঁরা হ'তে পারেন, সে কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। পল্লীগীতি, পল্লীর কাহিনী ও ইতিহাস, ব্রতকথা, রূপকথা, উৎসব, শিল্প-পরিচয়, প্রবাদ প্রবচন প্রভৃতি সংগ্রহ ক'রেও তাঁরা জাতীয় সংস্কৃতির ভাণ্ডার সমৃদ্ধতর ক'রে তুল্‌তে পারেন। এ কাজ তাঁদের পক্ষে যত সহজসাধ্য, নগরের বৃহৎ সংবাদপত্র-সমূহের পক্ষে যে তত সহজ নয়, সে কথা নিশ্চয়ই সকলে উপলব্ধি ক'রবেন। অবশ্য সে-সমস্ত সংবাদপত্রকে পল্লী-সচেতন করাও মফঃস্বলের উক্ত সাংবাদিক ভ্রাতৃবর্গের অন্যতম মহৎ কর্তব্য ব'লে আমি মনে করি।

বৃহৎ কারখানার মতো আমাদের দেশের বৃহৎ সংবাদ-পত্রগুলিতেও এত কর্মবিভাগের সৃষ্টি হ'য়েছে যে, এক বিভাগের লোকের পক্ষে অন্য বিভাগের কাজ সম্বন্ধে কৃতিত্ব অর্জনের সম্ভাবনা বা সুযোগ দুইই কম। কিন্তু মফঃস্বলে যাঁরা সংবাদপত্র সম্পাদন করেন, তাঁদের সর্বাত্মক কৃতিত্ব অনেক সময় বিস্ময়েরই সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে, একজন বা দুইজন সহকারীর সাহায্যে একই ব্যক্তি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও মন্তব্য লেখা, সংবাদ নির্বাচন ও পরিবেশন, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ, মুদ্রিতব্য লেখা কম্পোজ, প্রুফ দেখা হিসাব দেখা প্রভৃতি সমস্ত কাজই একা ক'রে যাচ্ছেন। এরূপ কর্মশক্তি সত্য সত্যই বিস্ময়জনক। যাঁরা সাংবাদিকতাকে জীবিকার পন্থা হিসাবে নির্বাচন ক'রতে চান, তাঁরা যদি মফঃস্বলের কোনো সংবাদপত্রে প্রথম হাতে খড়ি দেন, তা হ'লে সংবাদপত্র সম্পর্কিত সর্বাত্মক জ্ঞানার্জনে যে তাঁদের অনেক সহায়তা হবে এবং বৃহত্তর সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও যে তাঁরা সুষ্ঠুতররূপে কর্তব্য সম্পাদন ক'রতে পারবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমরা এক পরম গৌরবময় সভ্যতার অধিকারী। অতীতে আমাদের মহিমময় পূর্বপুরুষদের সাধনে-

শ্বর্যে যে বিশ্ব-সভ্যতা সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত হ'য়েছিল, সে কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত। সাময়িক দুর্দিনের অবসানে যে শুভদিনের সন্ধান আমরা পেয়েছি, তাতে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে আমরা যদি সমুন্নত আদর্শ নিয়ে অগ্রসর হই, তা হ'লে এক মহত্তর ভবিষ্যতের সৃষ্টি ক'রতে আমরা নিশ্চয়ই সমর্থ হবো। ভারতের প্রতিভায় আমি বিশ্বাসবান। অনুকূল পরিবেশে সে প্রতিভা আগামী প্রভাতে সহস্রদল পদ্মের মতো অপূর্ব সৌরভে ও রূপৈশ্বর্যে বিকশিত হ'য়ে উঠবে। আমাদের সাংবাদিকবৃন্দকে সঙ্ঘশক্তিতে উজ্জীবিত মহতী আশাদীপ্ত সেই আগামী প্রভাতের পথে অগ্রসর হ'তে হবে। বর্তমান যুগে সঙ্ঘশক্তিই প্রকৃত শক্তি। তাই বৈদিক ঋষির ভাষায় প্রার্থনা ক'রছি—

সমানী বঃ আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।

গোপন কথা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

চুপে চুপ্ একটী কথা
তোমারেই কণে বলি,
দেখো ভাই! আর কাহাকেও
বোলো না কৌতূহলী।

শ্যামলী সেই যে বালা
বাদলের মেঘলা কালো
চোখে তা'র ঊর্মি মালা
চোখে মোর লাগ্‌লো ভালো।

নিদালি চাউনিখানি
সে যেন অলস মাখা
বুঝি তার মর্মবাণী
লুকানো সরম ঢাকা।

কখনো চোখের তারা
আকাশের আশিস যাচে
কখনো শালিক ফিঙে
চটকের ছন্দে নাচে।

কখনো ব্যথার ভারে
বুঝি চোখ তুলতে নারে
বেদনায় চোখের কাজল
বক্ষে গড়ায় বারবারে।

তারি মন বুঝতে গিয়ে
নিজেরেই বুঝতে নারি
ভাবি তায় ব'লবো প্রিয়ে
আহা ছাই! কই তা' পারি?

ভারী তো একটী ফোঁটা
সদ্য ফোটা ছোট্ট মেয়ে—
তবু তার উদয় রাগে
অরুণ হবো লজ্জা পেয়ে!

কি যে তার কেমন প্রভাব
সেই ক্ষণিকের আবির্ভাবে
বিরহী বর্ষ রহি—
যক্ষ যেন মোক্ষ পাবে।

যে-প্রিয়ার দৌত্য পথে
মেঘের রথে বার্ত্তা বাহি
সে-প্রিয়ার উদয় হতে
হায়রে মুখে বাক্য নাহি।

তুমি মোর নর্ম সখা
তোমারেই মর্ম বলি
আমার এই গোপন কথার
মূল বারতা সেই শ্যামলী।

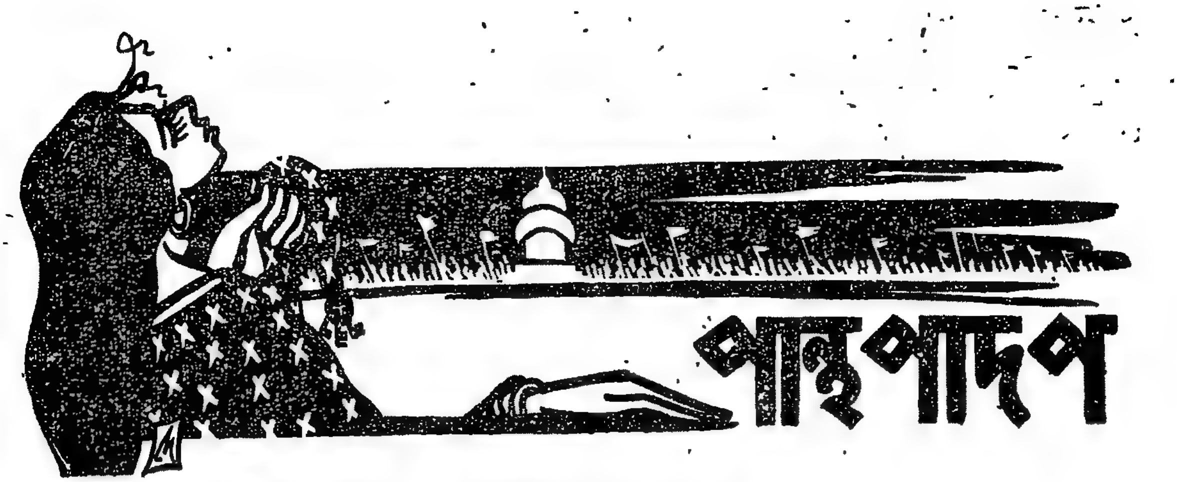

পান্থপাদপ

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

দশ

অথই কালো জল পূর্ণ পদ্মদহ নিয়ে চলেছে ভীষণ কাণ্ড।

সকাল বেলায় বার হয়ে রতনদত্ত ফিরে এলেন বেলা শেষে; সমস্ত দিনটা অনাহারে কেটে গেছে।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ভারতী বললে, "এ রকম সন্ধ্যে পর্যন্ত কিছু না খেয়ে থাকলে তোমার অসুখ হতে পারে বাবা—বয়স তো হচ্ছে।"

রতন দত্ত একটু হাসলেন, বললেন, "বয়স হলেও মনের শক্তি তো কমে নি মা মণি, তোর বাবার যৌবন আবার ফিরে আসছে যে।"

ভারতী পিতার কেশ-বিরল মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, "তা আসুক,—অন্ততঃ পক্ষে তোমার ছেলে-বেলাটা ফিরে আসুক বাবা, তখন তুমি যখন যা পাবে তাই খেয়ে যাবে,—হজমও হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। মনের শক্তি বাড়লেও দেহ যে চিরদিনের অভ্যাস মতই চলছে বাবা, দেহ তো এতটুকু কষ্ট বা অনিয়ম সইতে পারবে না।"

রতন দত্ত বললেন, "কিন্তু বিশ্বাস কর ভারতী, সে অভ্যাসও হয়ে যাবে। একেবারে নয়—আমি অল্প অল্প করে অভ্যাস করছি দেখছিস তো। চিরদিন শুধু ভোগ বিলাসেই কাটিয়েছি কিনা, জানি নি যে এরকম ক্ষণ আসতে পারে—আসবেই, আজ এই এতক্ষণ থাকলুম, কাল আবার দেখবি রাত পর্যন্ত—"

বাধা দেয় ভারতী, "কাল আবার রাত পর্যন্ত অনাহারে থাকবার ইচ্ছে করছো বুঝি? না না, ও সব আব্দার চলবে না বাবা, কাল আমি নিজে তোমার জন্যে কুকারে করে যা হয় ভাতে ভাত করে দেব, খেয়ে নিয়ে তবে বার হতে পারবে। আটটার মধ্যে তোমায় খাইয়ে দাইয়ে রেডি করে দেব, না খাইয়ে কাল আর পাঠাচ্ছি নে।"

রতন দত্ত ভারতীর মুখখানা দেখবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে পিছনে থাকায় দেখা গেল না।

শুষ্ক হাসির রেখা তাঁর মুখে জেগে উঠে মিলিয়ে যায়—আঃ এই সময়টুকু না খেয়ে আছি তাতেই তুই অত ভাবছিস। আর আমাদের কিশোর—তোর দাদু কিশোর, সে জল পর্যন্ত না খেয়ে দু' তিন দিন কাটিয়ে দিয়েছে। এই দেশের কাজ নিয়ে কতদিন সে খেতে পায় নি, কত রাত ঘুমাতে পায় নি সে সব জানিস? দু' চার দিন পরে হয় তো কোথাও খেতে বসবে—এমন সময় খবর এলো পুলিশ আসছে; অমনি সেই মুখের ভাত ফেলে রেখে দৌড়েছে। সে কি দৌড় তা একবার ভেবে দেখ ভারতী—"

তিনি হাসতে থাকেন, অপর্য্যাপ্ত টুকরো টুকরো হাসি, জোর করে টেনে আনা হাসি।

বিষণ্ণ চোখে ভারতী শুধু চেয়ে থাকে।

তরুণ উচ্ছৃঙ্খল রতনমণি দত্তের মৃত্যু হয়েছে, এ রতন দত্ত কিশোরের বন্ধু, সুশ্বেতার স্বামী, মহেশ্বরীর পুত্র। আর এ ভারতী সুশ্বেতার আত্মজা, মহেশ্বরীর হাতে তৈরী ভারতী মহেশ্বরী নিজের সর্ব কিছু দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছেন। কে জানে এই কোনদিন হবে ভবাণী পাঠকের দেবী চৌধুরাণী, ব্রজেশ্বরের স্ত্রী প্রফুল্লের ছায়া তাতে থাকবে না। এ দিনের এই সব দেবী চৌধুরাণীরা বেপরোয়া মোটর চালাবে, বন্দুক, মেসিন-গান ছুঁড়বে, এরোপ্লেনে যাবে দিগ্বিজয় করতে।

ভারতীর কথা-বার্ত্তায়, গাম্ভীর্য্যে ভেসে ওঠেন মহেশ্বরী, মহেশ্বরী একেবারে যান নি, ভারতীর মধ্যে তিনি জেগে আছেন।

অন্যমনস্ক হয়ে যান রতন দত্ত।

চিনতে পারেন নি তিনি সুশ্বেতাকে।

মনে পড়ে প্রথম রাত্রির কথা—

ফুল-শয্যার রাত্রি। বাইরে অনাবিল চাঁদের আলো ফুটেছে, বাতায়ন পথে ঘরের মেঝেয় ছড়িয়ে পড়েছে। ফুল দিয়ে ঘরখানাকে সুসজ্জিত করা হয়েছে, নানা জাতীয় ফুলের গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

রাত বাড়ছে।

কোথায় একটা নাম না জানা পাখী ডাকছে,—তার মিষ্ট সুরটা ভেসে আসছে ঘরের মধ্যে, সুসজ্জিত পালঙ্কে শুয়ে রতন দত্ত একখানা কি বই পড়বার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তাঁর চোখের ব্যাকুল দৃষ্টি পড়েছিল দরজার উপর।

ভেলভেটের পরদা সরিয়ে প্রবেশ করলেন সুশ্বেতা।

মার্ব্বল পাথরে তৈরী একখানি প্রতিমা যেন। অত্যন্ত সাদাসিধা লালপাড় মোটা একখানি খদ্দরের শাড়ি তাঁর পরণে, পাড়টা তার কালো চুলের উপর জ্বল জ্বল করছে। শ্বেত শুভ্র ললাটের মাঝখানে একটী সিন্দুর বিন্দু।

মনে মনে আহত হন রতন দত্ত।

আজকের দিনে সুশ্বেতার সুসজ্জিতা হয়ে আসা উচিত ছিল, জীবনে ফুলশয্যার রাত্রি একবারই আসে, এ রাত্রিটা সজ্জার, এ রাত্রিটা সারা জীবনের পূর্ব্বাভাষ।

বইখানা পাশে রেখে তিনি উঠে বসলেন, স্পষ্টই অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বললেন, আজকের এই রাতটায় তোমার কি ভালো কাপড় পরা উচিত ছিল না শ্বেতা?"

সুশ্বেতা থমকে দাঁড়ালেন, তাঁর মুখখানা শক্ত হয়ে উঠলো। কি যেন তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই রতন দত্ত নীরস কণ্ঠে বললেন, "বলবে ও সব পরা অভ্যাস নেই, পরতে তাই লজ্জা করছে। সে কথা আমি মেনে নিচ্ছি শ্বেতা, কারণ তোমার—

সুশ্বেতা পলকহীন নেত্রে স্বামীর মুখের পানে তাকিয়ে ছিলেন, সে চোখের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই রতন দত্ত চুপ করে গেলেন, কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না। স্থির কণ্ঠে সুশ্বেতা বললেন, "হ্যাঁ, যা বলেছো সব সত্যি। আমার গরীব বাপের ঘরে এ রকম দামী শাড়ি আর জড়োয়া গহনা নাই বলেই চোখে দেখতে পাই নি। অভ্যাস নেই বলেই আমি পরতে পারি নি—এ কথা আমি আপনাকে আগেই জানিয়ে রাখছি।"

রতন দত্ত কুঞ্চিত মুখে বললেন, "কিন্তু এখানে থাকলে আমার মর্য্যাদা তোমায় রাখতে হবে। তোমার মনে রাখা উচিত তুমি এখন একজন সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীর স্ত্রী—তোমায় এ রকমভাবে থাকা চলবে না।"

সুশ্বেতা দৃঢ়কণ্ঠে কেবল মাত্র বললেন, "না, আমি পারব না—"

ধীর পদে তিনি ঘরের বার হয়ে গেলেন, তারপর সারা-রাত কোথায় রইলেন রতন দত্ত সে খোঁজ নেন নি, নেওয়ার দরকার মনে করেন নি।

নিজের জিদ ছাড়েন নি সুশ্বেতা—।

তিনি বরাবর খদ্দর পরে গেছেন—পূজার্চ্চনার সময় মটকা গরদ বা তসর পরেছেন। মহেশ্বরীর কাছে তাঁর এই একটী মাত্র আবদার ছিল—তাঁকে খদ্দর আনিয়ে দিতে হবে।

বধূর উজ্জ্বল মুখখানার পানে তাকিয়ে কি বলতে গিয়ে থেমে যান মহেশ্বরী, বিনা প্রতিবাদে তিনি বধূর আরজি মঞ্জুর করলেন।

মিলনের প্রথম রাত্রেই সুশ্বেতার দৃঢ়তার যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, রতন দত্ত তার মর্য্যাদা দিতে পারেন নি। স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে ব্যবধান হয়ে দাঁড়াল দেশ-মাতৃকা, দেশের জনসাধারণ। রতন দত্ত স্ত্রীর দিক হতে ফিরলেন, স্ত্রীর উপর রাগ করেই তিনি নেমে গেলেন অধঃপতনের পথে।

সামাজিক নিয়মে পাশাপাশি স্বামী স্ত্রী দাঁড়ালেও মিলন তাঁদের কোন দিনই হয় নি।

সেই সুশ্বেতাকে আজ রতন দত্ত দেখতে পান ভারতীর মধ্যে, সেই দৃঢ় অনমনীয় দেহ মন, সেই সকল বিষয়েই নিস্পৃহ ভাব,—কিছুই তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। পিতা ভাল শাড়ি, অলঙ্কার এনে দেন, ভারতী হাতে করে নেয়, উল্লাসও দেখায়, কিন্তু সে যে কেবল তাঁর মন রাখার জন্য তা বুঝতে পারেন রতন দত্ত।

এক একদিন হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যায় ভারতীর শাড়ির দিকে—নিতান্ত সাদাসিধা একখানা শাড়ি পরেছে সে,—অজস্র পাউডার স্নো ক্রিম থাকাতেও সে কোনদিন সে সব ব্যবহার করে না।

দ্বিধাপূর্ণ কণ্ঠে পিতা জিজ্ঞাসা করেন—"তোকে তো কোনদিন একখানা ভাল শাড়ি পরতে দেখলাম না মা মণি, শাড়িগুলো আছে তো—না বিলিয়ে দিয়েছিস?"

ভারতী তাঁকে আশ্বস্ত করে—"সব আছে বাবা—কিছু নষ্টও করি নি—বিলাইও নি।"

রতন দত্ত পলকহীন চোখে খানিক তার পানে তাকিয়ে থেকে চোখ ফিরান, বল্লেন, আর স্নো, পাউডার এ সবগুলো তো জমা করে রাখবার জন্যে দেই নি ভারতী; তোকে ব্যবহার করবার জন্যে দিয়েছিলুম।"

ভারতী হাসে, পিতার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে বললে, "কিন্তু ওগুলো মাখলে আমার মনে হয় বাবা, আমি যেন অদ্ভুত রকম কি একটা সেজেছি, আর সব লোক যেন আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। সেই জন্যেই ওগুলো মাখি নে বাবা. ভালো লাগে না।"

বলতে বলতে তার মনে পড়ে যায়, তাদের বাড়ীতে পূজা উপলক্ষে যাত্রা হয়েছিল। কালো কালো ভুতো লোকগুলো এমন অদ্ভুত পেন্ট করেছিল মুখে—যা দেখে তখনকার দিনের শিশু ভারতী একেবারে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল। খড়ি মেখে মানুষ এমন বিশ্রী সাজ করে, তার চেয়ে তাদের স্বাভাবিক রং কি ভালো নয়?

তারপর একদিন কোথায় যেতে সাহেব মেম দেখে সে মোটে বিশ্বাসই করতে চায় নি এরা রং মাখেনি। আজও পেন্ট করাকে সে দারুণ ঘৃণার চোখে দেখে। ওদিকে পদ্মদহ নিয়ে চলছে জোর মামলা—

গভর্ণমেন্টের সঙ্গে মামলা—সোজা ব্যাপার নয়। সেই রতন দত্ত—যিনি একদিন প্রজাদের দিকে ফিরেও তাকান নি, তিনি আজ তাদের জন্য সমস্ত সম্পত্তি পণ করেছেন।

মামলা চলবার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মদহের ওদিকটায় আরম্ভ হয়েছে ঘর বাড়ী, কল কারখানার প্রতিষ্ঠা, এক কোম্পানী নাকি গভর্ণমেন্টের কাছ হতে দীর্ঘ দিনের মেয়াদে লীজ নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

রতন দত্তের উকিল খোঁজ নেন—সে কোম্পানী দেশী নয়, বিদেশী কোম্পানী।

ভারতী শূন্য কণ্ঠে বলে—"ওখানে মস্ত বড় সহর গড়ে উঠবে বাবা—"

অন্যমনা রতন দত্ত কেবল উত্তর দেন—"হুঁ—"

ভারতী শেষবার বলে, "ছেড়ে দাও না বাবা, আর আমাদের ও সব রেখে ভেজাল বাড়িয়ে লাভ কি?"

রতন দত্ত তার পানে তাকালেন, শুষ্ক হাসি হেসে বললেন, "এ সব তুই বুঝবি নে মা মণি, এর মধ্যে তুই মাথা দিস নি। যা চলছে তা চলুক,—দেখাই যাক না কত-দূর কি হয়। ডুবেছি যখন—একেবারেই ডুবব, এতটুকু আর শেষ থাকে কেন?"

ভারতী আর কথা বলতে পারে না।

পিতার অনুমতি নিয়ে দ্বারোয়ান ও দাসী লেবুকে সঙ্গে করে ভারতী সেদিন গিয়েছিল পদ্মদহের ধারে গ্রাম দেখতে।

এই সব গ্রামবাসী, নিজেদের রক্ষা করতে গিয়ে তারা আজ বিপদাপন্ন, কত লোক গ্রেপ্তার হয়েছে, কত লোকের বিরুদ্ধে মামলা চলছে, যাদের বাঁচাতে গিয়ে তার পিতা আজ বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়েছেন।

কি দৃশ্যই দেখলো ভারতী! আজও সে কথা মনে করতে গেলে তার চোখে জল আসে।

গ্রামে প্রবেশ করবার মুখে নবাই মণ্ডলের ঘরখানা আগে চোখে পড়ে। উঠানের একপাশে গত বৎসরের খড় গাদা করা ছিল, এ বৎসরে ঘরখানা নূতন করে ছাইতে হবে—এই ছিল তার উদ্দেশ্য। পুলিশের লোক সেই খড়ের গাদায় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে; ঘরের চালায় খোঁচা দিকে এতখানি করে ফাঁক করেছে। হয় তো এ বে-আইনী হওয়ার জন্যই ঘরের চালায় আগুন লাগায় নি—অথবা গণ্ডগোলের জন্যই হয় তো।

কিন্তু লাগালেও কিছু হতো না। আইন যারা তৈরী করছে, তারাই ভাঙ্গছে। যে রক্ষক—সেই হয় ভক্ষক—এ তো চিরাচরিত প্রথা। শাসনকর্তা যা খুসি করতে পারেন—মারা বা বাঁচানো তাঁর খুসিতে সমাপ্ত হয়।

পাড়াকে পাড়া, গ্রামকে গ্রাম, সর্ব্বত্রই অত্যাচারের চিহ্ন প্রকটিত। ঘরে ঘরে হাহাকার, রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্যে জর্জ্জরিত দেশ।

রতন দত্তের কন্যা জেনে তাকে ঘিরে ফেললে শিশু ও নারীর দল। কত ফেললে তারা চোখের জল—এক করলে সে জলে হয় তো নদী সৃষ্টি হয়ে যায়। কত যে দীর্ঘশ্বাস,—তাতে কি কাল-বৈশাখীর ঝড় সৃষ্টি করতে পারে না?

কি সান্ত্বনা দেবে সে এদের, কার চোখের জল সে মুছাবে? কেঁদে সেদিন ফিরে এসেছিল সে, তার চোখের জল সেদিন ওই সব শিশু ও অনাথার চোখের জলের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল।

রতনমণি দত্ত মামলায় পরাজিত হলেন,—

জেলে যেতে হল তাদের যাদের বাঁচাবার জন্য তিনি যথাসর্ব্বস্ব পণ করেছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত বিচারে তাঁরও শাস্তির ব্যবস্থা হল—

হয় টাকা নয় জেল—

জরিমানা—ফাইন—?

রতন দত্তের মুখখানা কঠিন হয়ে ওঠে,—তিনি অদূরে উপবিষ্টা ভারতীর পানে তাকালেন।

"তুই কি বলিস মা মণি,—টাকা দিয়ে জেলের লাঞ্ছনা কষ্ট হতে বাঁচব?"

ভারতী উঠে দাঁড়াল, শক্ত কণ্ঠে বললে, "না বাবা।"

রতন দত্তের মুখখানা দৃপ্ত হয়ে ওঠে—

ভারতী বললে, "যাদের জন্যে তুমি দাঁড়িয়েছিলে আজ তারা তাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলকে ছেড়ে গেল জেলে, —তারাও তোমার জন্যে অনেক কিছু করেছিল বাবা। আজ তোমার কর্তব্য তাদের সঙ্গে মিশে তাদের কষ্টের অংশ নেওয়া—সেটাও হবে তাদের পক্ষে সান্ত্বনা বাবা।"

"ঠিক কথা বলেছিস মা—"

উৎসাহিত হয়ে ওঠেন রতন দত্ত।

এক মাসের জন্য জেলে থাকতে হবে প্রথম শ্রেণীর বন্দী হয়ে—একটা মাস তাঁকে কাটাতে হবে ভারতীকে ছেড়ে, নিজের বাড়ী ছেড়ে।

জমিদার রতনমণি দত্ত গেলেন জেলবাস করতে— ভারতী সঙ্গে সঙ্গে গেট পর্য্যন্ত গেল,—হাসিমুখে পিতাকে বিদায় দিয়ে যখন সে ফিরলো তখন তার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়লো, অবাধ্য অশ্রুকে কিছুতেই সে দমন করতে পারলে না।

ভারতী ফিরলো গ্রামে, ফিরলো পিতৃহীন বাড়ীতে। শূন্য বাড়ী, শূন্য ঘর,—পিতৃহীন বাড়ী খাঁ খাঁ করছে।

মহেশ্বরী দেবীর তৈলচিত্রের কাছে লুটিয়ে পড়লো ভারতী,—

দিদা, আজ কোথায় দিদা, তোমার যে পুত্রকে তুমি ধিক্কার দিয়ে গিয়েছো, দেখ, সে তোমার মর্য্যাদা রক্ষা করেছে। তুমি যাদের রক্ষা করতে গিয়ে কয়েক বছর আগে সরকারের আদেশে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছো, আজ তোমার পুত্রও তাদের জন্য সরকারের জেলখানা বরণ করে নিলে।

ঠাকুরবাড়ীতে ভারতী কেবল পূজা পাঠিয়েই ক্ষান্ত হল না, নিজেও পূজার অংশ গ্রহণ করতে যায়।

তারপর সে গিয়ে দাঁড়ালো সেই সব অনাথ অনাথাদের মাঝখানে, যারা হারিয়েছে স্বামী, পুত্র, পিতা ও ভ্রাতাকে। আজ তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার কথা সে পেয়েছে, সে অধিকার তার হয়েছে।

লোকে বলে—মেয়েটা পাগল হয়ে গেছে।

তারা বলে—অল্প শোকে কাতর
আর বিস্তর শোকে পাথর।

হাজার হোক, সুখে মানুষ তো, শোক দুঃখের বার্তা তো কোন দিন পায় নি, পাগল হওয়াটা বিচিত্র নয়, পাগল না হলে, অমন যে রাজা বাপ জেলে গেল আর মেয়ে পাঠালো ঠাকুরের কাছে পূজা?

ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার রামময় বোস এলেন সান্ত্বনার বাণী নিয়ে। এ সান্ত্বনা দিতে আসার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তাঁর ছিল এর পিছনে একটা মস্ত বড় উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য ভারতীকে পুত্রবধূ করে নিজের বাড়ী নিয়ে যাওয়া। ভারতী রিক্ত হস্তে তাঁর ঘরে আসবে না, আসবে রতনমণি দত্তের বিপুল অর্থ সম্পদ নিয়ে।

ভারতী সমীরকে চেনে, কতদিন পিতার সঙ্গে সে এ বাড়ীতে এসেছে। লাজুক ও নম্র প্রকৃতির ছেলে— কলকাতায় আগে সে পড়তো। বি-এ ডিগ্রি নিয়ে কিছু-দিন আগে সে পুলিসের কাজে যোগ দিয়েছে, সম্প্রতি সে আই-বি ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে।

পুলিশে কাজ করতে করতে মানুষ বদলে যায় একথা মিথ্যা নয়। লাজুক প্রকৃতির স্বল্পভাষী সমীরকে যারা আগে দেখেছে তারা এখন আশ্চর্য্য হয়ে যায় তাকে দেখে।

পুত্রের কাজে যোগ দেওয়ার বৎসর দুই পরে সুমথ মিত্রকে নিজের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে রামময় বাবু চলে গেছে। এখান হতে মাইল তিন-চার দূরে ধর্ম্মপুরে নিজের পৈত্রিক ভিটায় তিনি জীবনের শেষ দিন কয়টা কাটিয়ে দেবেন— এই তাঁর অভিপ্রায়।

রামময় বোসকে ভারতী সম্বর্দ্ধনা করলে, রতন দত্ত না থাকলেও তাঁর আদর যত্নের অভাব হল না।

একমাত্র রতন দত্তের অবর্তমানে বাড়ী যেন শূন্য হয়ে গেছে। ভারতী ম্লান হাসি হাসে—"বাবা এই কদিন মাত্র গেছেন, বাড়ীতে সব থাকতেও যেন কেউ নেই—কিছু নেই। আমার কলেজ খুলে গেছে, কলকাতায় যাওয়ার উপায় নেই। এবার বাবা ফিরলে আমি তাঁকে নিয়ে যাব, এখানে আর থাকতে দেব না ভেবেছি।"

রামময় বোস গম্ভীর ভাবে বললেন, "কিন্তু তুমি নিয়ে যেতে চাইলেই কি তিনি যাবেন মা? ওই যে কথায় বলে না—সে বড় কঠিন ঠাঁই গুরু শিষ্যে ভেদ নাই। তুমি আমি যতই যা বলি না—তাঁর সামনে একটী কথা বলবার সাহস হবে? এই যে বাড়ী, কি মোহ যে আছে এতে জানিনে, কিছুতেই যদি এ বাড়ী ছেড়ে দু'-পাঁচ দিনের জন্যও কোথাও যান?"

ভারতী আস্তে আস্তে বললে, "পিতৃ পুরুষের ভিটের মোহ আছে বই কি জেঠামণি? আমিই কোথাও গিয়ে টি'কতে পারি নে, সর্ব্বদা এই বাড়ীখানার কথা মনে হয়। এই বাড়ীতে বাবার চৌদ্দপুরুষ কাটিয়েছেন—কত স্মৃতি-মাখা রয়েছে এ বাড়ীর প্রতি জায়গায়, এ সব ছেড়ে কোথাও যাওয়া যায়—না থাকা যায়?

কেশ বিরল মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে রামময় বললেন, "সবই বুঝি, সবই জানি; চিরকাল—এতটুকু বেলা হতে তোমাদের এখানে কাজ করে মাথার চুল পাকালুম, আমি না জানি কি বলতো মা? তোমার বাবা যে ইচ্ছে করে শাল এনেছেন। ওই যে বলে—

খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে
কাল হল তাঁতির এঁড়ে গরু কিনে

এ হয়েছে ঠিক তাই। ভিটেকে রতন বড় ভালোবাসে, সেটা কি আমিও জানি নে—তোমার চেয়ে আমি যে বেশী চিনি তাঁকে। এ সবই বরাত মা—সব বরাত, নচেৎ পথের বিপদ ঘরে টেনে আনে কেউ? ওই বারোভূতের মামলায় জড়িয়ে পড়ে অর্থ গেল, সামর্থ গেল, সম্মান গেল, শেষ পর্য্যন্ত অমন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী জমিদার রতন দত্ত গেলেন কিনা জেলবাস করতে? হায় হায় হায়, কালে কালে কতই দেখালে হরি—আরও কি দেখাবে?"

ভারতী তাঁর মুখের উপর দৃষ্টি রাখে, বললে, "কিন্তু এ কথা তো সত্যি জেঠামণি, বাবা অন্যায় কিছু করেন নি।

রামময়ের চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে—তিনি মাথা দুলান—"ও কথা বলো না ভারতী, অন্যায় করেন নি এ কথা বলা চলে না। অন্যায় করেছেন—আর রীতিমত অন্যায় করেছেন।"

ভারতীর চোখ জ্বলে ওঠে, কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব সংযত করে সে বললে, "কি অন্যায় করেছেন আপনি বলতে চান জেঠামণি?"

রামময় বললেন, "তুমিই বল ভারতী, তাঁর কি দরকার ছিল এই সব লোকদের নিয়ে এ সব কাণ্ড করবার? ওরা চিরদিন এ সব সইতে অভ্যস্ত—ভগবান ওদের মাথায় যে বোঝা চাপিয়ে পাঠিয়েছেন সে বোঝা ওদের বইতেই হবে। তোমার বাবা কেন ওদের ঘরে জন্মান নি—জন্ম জন্ম দারিদ্র্য অভিশাপ বহন করে আসেন নি—সে কথাটা একবার ভেবে দেখো। যাদের যা বংশগত ধারা তারা তা রাখছে—রাখবেও, ওরা ওদের বংশধরের জন্যে আবার এই দারিদ্র্য রেখে যাবে—ধারা কোন দিনই বদলাবে না।"

ভারতী বাধা দিল—"বদলাবে জেঠামণি, বর্ত্তমানে যে দিন এসেছে এদিনে সব ভেঙ্গে যাবে—সেই ভাঙ্গার পরে আবার নূতন বিশ্ব গড়ে উঠবে। বংশ জাতি বর্ণ কিছুই থাকবে না—সব এক হয়ে যাবে।"

রামময় একটু হাসলেন, বললেন, "হয় তো হতে পারে, কিন্তু তা হলেও রক্তের ধারা বইবেই তো। তুমি বলবে তাও থাকবে না, পরস্পর বিবাহ চলবে—তাতে আমাদের উত্তর বংশীয় যারা আসবে তারা অনেক মার্জ্জিত হবে। হতে পারে—আমি একথা অস্বীকার করছি নে। ভগবান করুন—সেদিন আমি যেন বেঁচে না থাকি, সেই ভাঙ্গন আর নূতন সৃষ্টি দেখবার আগে আমি যেন চলে যেতে পারি।"

তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন।

শান্ত কণ্ঠে তিনি আবার বললেন, "তিনি জমিদার—জমিদার হয়ে প্রজাদের পাশে দাঁড়াতে যাওয়াই যে তাঁর প্রথম আর প্রধান অন্যায় হয়েছে। এতে করে হল কি—তাঁর সকল মর্য্যাদা নষ্ট হয়ে গেল, ছোটলোক প্রজারা এর পর আর তাঁকে জমিদার বলে মানবে কি?"

ভারতী শুষ্ক কণ্ঠে বললে, "বাবা বলেন—এতে তাঁর মর্য্যাদা বাড়বে।"

"মর্য্যাদা বাড়বে—" রামময় আবার হাসলেন।

"আর একটা দিক জানো মা, গভর্ণমেণ্ট তাঁকে বিপ্লবী বিদ্রোহী বলে জানলে। চিরদিন সরকারের কাছে মাথা উঁচু করে ছিলেন তিনি, জেলার যে কোন কাজে আগে ডাক আসতো রতনমণি দত্তের, কিন্তু এখন হতে সরকার জানলো তিনি রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন—এ বড় কম কথা নয়। গভর্ণমেণ্টের বিষ দৃষ্টিতে পড়লেন তোমার বাবা—এটা—"

ভারতী বাধা দিলে, "গভর্ণমেণ্টের বিষ দৃষ্টি পড়বার হেতু তো কিছু নেই জেঠামণি; আমার বাবা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন—এ ছাড়া আর তো কিছু করেন নি।"

রামময় বললেন, "ওই এক কথাই তোমরা বার বার বলছো। বল দেখি—তোমার বাবা কি গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়ান নি। সরকারের খাস জমিতে হাত দিতে যাওয়ার কি দরকার ছিল তাঁর। ও জায়গাটা ইজারাও নিয়েছে একজন সাহেব কোম্পানী, তারা বসাবে কারখানা, মিল—যা খুসি করুক না—তোমার বাবার তাতে বাধা দেওয়ার কি হেতু ছিল? তুমি তো জানো না ভারতী, এ সরকার বোকা নয়—অত্যন্ত ধূর্ত, তোমার বাবাকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রেখেছে। তোমার ঠাকুরদার কথা তুমি নিশ্চয়ই জানো। তিনিও প্রজাদের উত্তেজিত করেছিলেন, বৃটীশের বিরুদ্ধে

প্রবল জনমত গঠন করে তুলছিলেন—অবশ্য তিনি সেই সময়ে মারা যান, নইলে আরও কি হত কে জানে।

ভারতীর কপালের শিরাগুলা শক্ত হয়ে উঠেছিল— দাঁতের উপর দাঁত রেখে সে নির্ব্বাকে শুধু শুনে গেল।

রামময় বলে যান, "তাঁর বিপ্লবী ভাই—তোমার এক দাদু আজও পলাতক,—আজও সে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কাজ করছে, তবু তাঁকে ধরা যাচ্ছে না। তাকে যে ধরে দিতে পারবে বা যে তার সন্ধান দিতে পারবে, তাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে—এ ঘোষণা করা হয়েছে। সরকার সন্দেহ করেন—সে তোমাদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে আসে, তোমার বাবাকে দিয়ে সেই এ সব কাজ করাচ্ছে।"

ভারতী গর্জ্জে ওঠে—"মিথ্যে কথা—সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা।"

রামময় বললেন, "সেটা তুমি জানলেও রাজ সরকার মানবে না। রাজনীতি বড় জটিল মা, তুমি এর কিছু বুঝবে না। মোট কথা জেনো—তোমার ঠাকুর মা আর সেই দাদুর সূত্র নিয়েই তোমার বাবাকে পুলিশ আজ জেলে দিয়েছে।—মূলটা ওই খানেই কিনা; নচেৎ সামান্য পদ্মদহ নিয়ে বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট এতখানি মাথা ঘামাতো না।"

ভারতী ধীর কণ্ঠে বললে, "কিন্তু আমি জানি জ্যেঠামণি,—বিশ্বস্তসূত্রে আমি খবর পেয়েছি—আপনার ছেলে আমার বাবার নামে অনেক কিছু লিখে পাঠিয়েছেন—সোজা কথায় রিপোর্ট দিয়েছেন।"

"আমার ছেলে—মানে সমীর—" রামময় হেসে ওঠেন। "হাসালে মা, তুমি হাসালে। তৃণাদপি ক্ষুদ্র সমীর, সে করবে প্রতাপশালী জমিদার রতনমণি দত্তের নামে রিপোর্ট, আর বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট তার সেই রিপোর্ট নিয়ে এত বড় একটা ব্যাপার ঘটিয়ে যাবে, এ কথা বললেই বা বিশ্বাস করবে কে?"

ভারতীর কণ্ঠস্বর শক্ত হয়ে ওঠে, সে বললে, "বিশ্বাস করবে বই কি, আর কেউ না করুক বৃটীশ সরকার করবে। আজকালকার দিনটা যা চলছে, তাতে বাবার পরে দৃষ্টি রাখাই স্বাভাবিক, কারণ আমার দিদা ঠিক এমনই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলেন।"

রামময় বললেন, "মিথ্যে খবর তুমি পেয়েছো ভারতী, সে পুলিশে কাজ করে বলেই তার মাথায় এই মিথ্যে অপবাদটা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, সে আই-বি ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে, আজকের দিনে এই সব খবর তাদের সংগ্রহ করতে হয়, সে তা করতে বাধ্য, কিন্তু তাই বলে চিরদিন যার আশ্রয়ে থেকে মানুষ হয়েছে, তাঁর নামে কিছু বলতে পারবে না এ জানা কথা। তুমি অন্ততঃ পক্ষে বিশ্বাস করো ভারতী, আমার ছেলে এত ছোট কাজ করে নি—করতে পারে না।"

এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন, "এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা উচিত, আর তোমায় সেই পরামর্শ দিতেই আমি এসেছি। আমার ছেলের রিপোর্টে তোমার বাবার যদি জেল হতো—আমি কখনই আসতাম না এটা জেনে রাখো।"

ভারতী নত মুখ উঁচু করে বললে, "আমি তাই জানতুম জ্যেঠামণি; যাক ও কথা যেতে দিন, যার জন্যেই হোক বাবার বিরুদ্ধে অনেক কিছু অভিযোগ উপরে গেছে এবং বাবা সম্পূর্ণ ন্যায় পথে চলেও আজ জেলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। আপিল বাবা করবেন না—কাজেই এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। আর কি দরকারই বা আপিল করার,—বাবা জেলে গেছেন, এ ভালো হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে জ্যেঠামণি।"

"ভালো হয়েছে—?"

রামময় একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে যান—"ভালো হয়েছে—তুমি বলছো কি ভারতী। একজন বিখ্যাত ধনী জমিদার অন্যায় না করেও জেলে গেলেন তবু তুমি বলবে—ভালো হয়েছে? এ কথা বলতে পারছো?"

ভারতী মলিন হাসি হাসে, বললে; "যা সত্য তা চিরকালই সর্ব্বজন স্বীকৃত জ্যেঠামণি। এতো গৌরবের কথা—আমার বাবা চুরি ডাকাতি বা কারও পরে অত্যাচার করে জেলে যান নি। ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করতে তিনি গিয়েছেন,—তিনি গিয়েছেন কতকগুলি বুভুক্ষুর ক্ষুধা দূর করবার চেষ্টায়, কিন্তু পারলেন না কিছুই, রাজা তার এতটুকু ক্ষতি সইতে পারলে না। মানুষ মরে মরুক রাজার রাজ্য অক্ষুন্ন থাক এই তো রাজার অধিকার। আমি জানি আমার বাবা চিরদিন বড় সুখী, এতটুকু কষ্ট তিনি কোনদিন সহ্য করতে পারেন নি, তিনি আজ জেলের কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে নিলেন।"

তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে,—চোখেও বুঝি জল এসে পড়ে, ভারতী তাড়াতাড়ি মুখ ফিরায়, রামময়ের কাছে সে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করে।

রামময়ের মুখখানা বিকৃত হয়ে ওঠে—

মুহূর্ত্তে তিনি নিজেকে সামলে নিলেন, সান্ত্বনার সুরে বললেন, "আমি সব জানি মা; বহুকাল আমি এ সংসারে কাটিয়েছি, কাউকে চিনতে আমার বাকি নেই। তোমার

ঠাকুরমা শুধু তোমার দিদাই ছিলেন না, তিনি আমারও মা ছিলেন। আমি যখন আসি তোমার বাবা তখন তরুণ একটি ছেলে,—সাংসারিক বুদ্ধি তার সেদিন ছিল না,—আজও যে হয়েছে তা আমি বলব না, কারণ তা হলে সে নিজেকে সামলে চলতে পারতো। যাক, আপিল তোমরা করবে না শুনলুম, একটা মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে, তোমার বাবা আর কয়টা দিন পরে ফিরে আসবেন। তবে এবার হতে সাবধান থেকো—এ রকম ভাবে বে-আইনী কাজ তিনি যেন আর না করতে যান। বলবে—তিনি গরীবকে রক্ষা করতে গেছেন, দেশের কাজ করতে আবার হয় তো যাবেন,—কিন্তু তাতেই বা দরকার কি? এই যে একটা ঢেউ উঠেছে দেশের কাজ করতে হবে যেহেতু দেশ আমাদের মা—যত সব গাঁজাখুরী কথা। মাটি সে চিরকালই মাটিই থাকবে, মায়ের আসন তাকে কে দেবে—তার মূর্তি কই? দেশের কাজ করছে ছেলেরা—তার মানে উত্তেজনার মুখে যাতে সরকারের ক্ষতি হয় সেই কাজই করে যাচ্ছে তারা। কোথাও সাহেব মারছে, কোথাও লুটপাট করছে, কোথাও আগুন লাগিয়ে সব ছারখার করছে। এতে যে কি দেশের কাজ হচ্ছে তাতো বুঝিনে। লাভে হতে ধরা পড়ে নিজেরা যাচ্ছে জেলে, যাচ্ছে দ্বীপান্তরে, মরছে ফাঁসিতে গুলিতে।"

ভারতী কি বলবার জন্য মুখ তোলে,—পরক্ষণেই মনে হয় এ লোকের কাছে কথা বলে কোন লাভ নাই। দাসবৃত্তি যার মজ্জাগত, স্বাধীনতার বার্তা সে জানবে কি?

রামময় বলে যান—"এটা তো সত্য কথা, বৃটীশ রাজত্বে আমরা পরম সুখ শান্তিতে আছি। যত বিপদই হোক, ওরা নিজেদের বুক পেতে নিচ্ছে, আমাদের গায়ে একটী আঁচড় লাগতে দিচ্ছে না। আজ আমাদের খাওয়া পরা বেড়ানো—কোন দায়ীত্ব আমাদের বইতে হয় না, পিতার অধিক স্নেহে আমাদের তারা রক্ষণ করছে। আমরা রাজভক্তের জাত, রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো কেবল বে-আইনীই নয়, আমাদের ধর্ম্ম বিরুদ্ধও বটে।"

ভারতীর মুখে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটে উঠে তখনই মিলিয়ে যায়।

ভারতীকে নিজের মতে আনতে পেরেছেন জেনে রামময়ের মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি দেখা যায়। যাই হোক—শিক্ষিতা মেয়ে তো বটে, কথা বুঝিয়ে বললে বুঝতে পারে, যা তা তর্ক করে না।

খুসি হয়ে ওঠেন রামময়—

এরপর ভারতীকে আশীর্ব্বাদ করে তিনি বিদায় নেন।

[ক্রমশঃ

অবশেষ

সন্তোষ কুমার অধিকারী

আলোটুকু মুছে গেলে আকাশের নীলচোখ থেকে
তখনও কি লেগে থাকে দিনান্তের গোধূলির মোহ?
উৎসবের শেষরাত্রে কতটুকু বলো, সমারোহ?

হৃদয়কে স্তব্ধ হ'তে দিই যবে বেদনার জলে
যখন নির্বাক মনে নামে শুধু বৈরাগ্য মৌনতা,
কামনার অবলোপে ক্লান্ত মন কাঁপে থরোথরো
তখনও কি থাকে ক্ষোভ চরম ব্যর্থতা?
কিম্বা অনুভূতি কোন বিগত দিনের?

অন্ধকারে বসে বসে স্তব্ধ জীবনের
পাতা নিয়ে নাড়াচাড়া করি;
কোথাও প্রলেপ নেই বিস্মৃত বিক্ষত কাহিনীতে,
জীবনের ছিদ্রপথ অভিমান বাষ্পে দিই ভরি।

প্রথম পারমাণবিক বিমান

প্রভাতকুমার গোস্বামী

হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা যেদিন বিস্তীর্ণ নরককুণ্ড সৃষ্টি করলো সেদিন সমগ্র জগৎ আতঙ্কে কেঁপে উঠেছিল। এই যে অস্ত্র মানুষের হাতে এসেছে এ যেমন ভয়ানক তেমনি শক্তিশালী। ধ্বংসসাধনের মত বহু জিনিস এ পর্যন্ত মানুষের হাতে এসেছে; কিন্তু পারমাণবিক বোমার সঙ্গে কোনটার তুলনাই হয় না। ঠিক একইভাবে বলা চলে যে পরমাণুর যে শক্তি মানুষের হাতে এসেছে তার সঙ্গে কোনও শক্তির তুলনাই হয় না। এই পদ্ধতি নিয়েই গোলযোগ। পারমাণবিক শক্তি বিজ্ঞানের একটী মহান অবদান। এই অবদানকে শ্রেণীগত প্রভুত্বের জন্যে মারণাস্ত্র মারফৎ ব্যবহার করছে যারা তাদের আচরণ নিন্দনীয়। কিন্তু বিমানপোতের দ্বারা বোমাবর্ষণ করা হয় বলেই যেমন বিমানপোত নিন্দনীয় নয়, তেমনি পারমাণবিক শক্তিকে বোমা মারফৎ ধ্বংস সাধনে নিয়োগ করা যায় বলেই সেই শক্তি নিন্দনীয় নয়; যেহেতু উভয়েরই কল্যাণকর দিক রয়েছে। ডিনামাইটের কথাই ধরা যাক। এই অস্ত্রটী

ভাবীকালের পারমানবিক বিমানপোত ঠিক এইরূপ বৃহদাকার হবে এবং জলেও তার চল্‌বার সামর্থ থাক্‌বে।

শক্তিকে সৃষ্টি ধ্বংসের কাজে যেমন নিয়োগ করা চলে, তেমনি সভ্যতার জয়যাত্রার ক্ষেত্রেও এর অবদান হতে পারে অসাধারণ। মানুষ এই শক্তির ধ্বংসের দিকটাই শুধু দেখেছে—এর কল্যাণকর দিকটা দেখবার সুযোগ আজও কারও হয় নি। বৈজ্ঞানিকদের কল্যাণমুখী প্রচেষ্টার অন্ত নেই। একদিকে এই জন্যেই আজকার জড়বিজ্ঞানের ওপরে লোকে চটে যাচ্ছে। দু' একজন বৈজ্ঞানিক পর্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে বলেছেন যে, "এই সব অপদার্থ বৈজ্ঞানিককে (যাঁরা পারমাণবিক শক্তি নিয়ে গবেষণা করছেন) কি কেউ থামিয়ে দিতে পারে না? এদের বস্তাবন্দী করে নির্বাসনে পাঠাবার মত কি কেউ নেই?" অথচ এই সমস্ত সমালোচকেরা যদি স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করেন তবে দেখতে পাবেন যে, পারমাণবিক শক্তিকে নিন্দা করবার কিছুই নেই, এর প্রয়োগ প্রধানতঃ ধ্বংস সাধনেই কি নিয়োগ করা হয় নি? কিন্তু এই শক্তির যে কল্যাণকর দিক আছে তা আজ আর অবিদিত নেই, অন্য দিক ছেড়ে দিলেও প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাজে সহায়তা কি ডিনামাইট করে নি?

তাই আজ যখন সাধারণ মানুষ পারমাণবিক শক্তির ধ্বংসকারী ক্ষমতার আতঙ্কে বিহ্বল; যখন একদিকে পারমাণবিক বোমার উন্নতির চেষ্টা চলেছে, অন্য দিকে ঠিক তেমনি চেষ্টা চলেছে, কেমন করে এর কল্যাণকর প্রয়োগ সম্ভব।

পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে রেল-ইঞ্জিন চলবে, জাহাজ চলবে, মোটরগাড়ী চলবে, এরোপ্লেন চলবে—এমনি কত কি কল্পনা করে আজকার মানুষ। এর কোনটাই আজ আর অলীক কল্পনা নয়—এই কল্পনার রয়েছে বাস্তব

ভিত্তি এবং আশা করা যায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই তা সফল হবে।

প্রথম পারমাণবিক বিমানপোতটীর পরিকল্পনা ইতি-মধ্যেই করা হ'য়ে গেছে। এই বিমানপোতটী শুধু আকাশেই উড়ে চলবে না—জলেও নামতে পারবে। এর ডানা থাকবে চওড়া, কিন্তু পাতলা। সাধারণ পোতগুলিতে জ্বালানী রাখার ট্যাঙ্ক থাকে—এতে তার মোটেই দরকার হবে না। কারণ অতি সামান্য পরিসরের মধ্যে অনেক বেশী শক্তিকে ধরে রাখা যাবে। এই বিমানপোতটী পৃথিবীর এক পাশ থেকে অন্যপাশে উড়ে গিয়ে ঘুরে আসবে—এর মধ্যে জ্বালানী পুরবার প্রয়োজনই হবে না। অন্যদিকে আজকার বিমান একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্বে পৌঁছাবার পরই তাতে নূতন করে তৈল পুরতে হয়। পরিকল্পনা-কারীরা তো মনে করছেন এই বিমান অনায়াসে পৃথিবী থেকে অন্য গ্রহে চলে যাবে।

অর্ধ আউন্স ইউরেনিয়াম অথবা প্লুটোনিয়ামের সাহায্যে এই বিমানপোতে এমন শক্তি উৎপাদন করা যাবে যে শক্তি উৎপাদন করতে ১৭,০০০ গ্যালন পেট্রোলের প্রয়োজন। তখন ২ দিনে পৃথিবীটা এক চক্কর দিয়ে আসতে এক পাউণ্ডেরও কম ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম প্রয়োজন হবে।

এই নূতন বিমানপোতের বহু যন্ত্র থাকবে স্বয়ংক্রিয়। প্রথমেই এই বিমানপোতে পূর্ণশক্তি সংযোজিত করা চলবে না, কারণ তা হ'লে বিমানটী উড়তে অসুবিধা হবে। যখন পূর্ণশক্তি সংযোজিত হবে তখন এই বিমান উড়বার জন্যে সুদীর্ঘ রাণওয়ে-এর প্রয়োজন হবে। কারণ এর গতিবেগ এত বেড়ে যাবে যে বড় রাণওয়ে ছাড়া দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা। অবশ্য বিমানপোতটী একবার আকাশে উঠতে পারলে আর কথা নেই; তখন বেশ সুন্দরভাবে এটী উড়ে চলবে।

এখন এই নূতন ধরণের বিমাণ কবে প্রথম আকাশে উড়বে সেই প্রশ্ন। বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন ১৯৬০ সালে এই পারমাণবিক বিমান আকাশে উড়তে পারবে। ১৯৪৫ সাল থেকে NEPA (Nuclear Energy for the Propulsion of Aircraft) মার্কিন বিমানবহরের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে এই বিমানপোত তৈরীর চেষ্টা করছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে মার্কিন আণবিক শক্তি কমিশন ঘোষণা করেছেন যে, এই চুক্তি তারা পূর্ণ করেছেন। এই ঘোষণার অর্থ এই যে, পারমাণবিক বিমানের ইঞ্জিন তৈরী করে দেখান হয়েছে; কারণ চুক্তিতে এই ভারই NEPA-এর ওপরে অর্পণ করা হয়েছিল।

এর পরেই জেনারলে ইলেকট্রীক কোম্পানী বলছেন যে, ওহিওস্থিত লকল্যাণ্ডে তাঁদের জেট্ নির্ম্মাণ কেন্দ্রে বিমানপোতের জন্যে পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন প্রচেষ্টার অনেক উন্নতি সাধন হয়েছে। এই লকল্যাণ্ডেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত পিষ্টন ইঞ্জিন স্থাপন করা হয়েছিল।

মার্কিন বিমানবহর Consolidated Vultee Aircraft Corporation-কে পারমাণবিক শক্তির দ্বারা চালিত হবার উপযোগী বিমানপোত তৈরীর নির্দেশ দান করে। উপরোক্ত কোম্পানী B-36 নামক বৃহদাকার বিমানপোত নির্ম্মাণ করে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দান করেছিল। পারমাণবিক শক্তির দ্বারা যে বিমান চালিত হবার কথা, সেটীও নিঃসন্দেহে বৃহদাকার হবে। যে কোম্পানীর বৃহদাকার বিমানপোত তৈরীর অভিজ্ঞতা রয়েছে, এই জন্যে সেই কোম্পানীকেই পারমাণবিক বিমানপোত তৈরীর নির্দেশ দেওয়া হয়। এ ছাড়া এ সম্পর্কে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না, তবে উপরোক্ত তথ্য থেকে এটা বেশ বুঝতে পারা যায় যে, এই ধরণের বিমানপোত তৈরীর আর বেশী দেরী নেই। অবশ্য প্রথমটায় পরীক্ষামূলকভাবেই একখানা এই নূতন ধরণের বিমানপোত তৈরী হবে।

এই ধরণের বিমান তৈরী করেই অবশ্য বৈজ্ঞানিকরা ক্ষান্ত থাকবেন না, তাঁরা আণবিক শক্তিতে চালিত স্বয়ংক্রিয় বিমান নির্ম্মাণের পরিকল্পনাও করেছেন। বর্ত্তমানে বোমারু বিমানে ব'য়ে নিয়ে আণবিক বোমা ছাড়তে হয়। কিন্তু এমন দিন আসছে যখন আণবিক রকেট বোমা বেতার চালিত হয়ে হাজার হাজার মাইল দূরে গিয়ে পড়বে। তবে সেটা ১৯৮০ সালের আগে সম্ভব নয়। অবশ্য এর আগেই যে পারমাণবিক শক্তিচালিত যাত্রীবাহী বিমান নির্ম্মাণ সম্ভব তা আগেই বলা হয়েছে। পারমাণবিক শক্তির দ্বারা চালিত সেই বিমানে ঘণ্টায় হাজার মাইল বেগে চলা তখনকার দিনে সাধারণ ব্যাপার বলেই মনে হবে। এখনই নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডন একদিনে যাতায়াত করা সম্ভব। কিন্তু পারমাণবিক যুগে পয়সা খরচ করতে পারলে কলকাতা থেকে সকাল ১০টায় খেয়ে বেরিয়ে বোম্বাইতে ১১টায় অফিস করা যাবে।

পদার্থের বর্ণ-বৈচিত্র

চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত

পরীক্ষা কোরে দেখা গেছে যে, স্বচ্ছই হোক কি অস্বচ্ছই হোক যে কোন রঙিন পদার্থের নিজস্ব কোন রং নেই। তাদের রং নির্ভর করে তিনটি জিনিষের ওপর। প্রথমতঃ আপতিত আলোর ওপর, দ্বিতীয়তঃ আপতিত আলোর যে অংশ পদার্থটী শোষণ কোরে নেবে তার ওপর এবং তৃতীয়তঃ যে অংশ শোষিত হয় না সেই অংশ চোখের ওপর কি রং-এর অনুভূতি দেবে তার ওপর। সূর্য্যালোকের রং সাদা, কারণ তার ভেতর সব রকম রং-এর প্রয়োজনীয় পরিমাণ বর্তমান; কিন্তু তথাকথিত কৃত্রিম সাদা আলো বাস্তবিকই কিছু সাদা নয়। সাদা আলোর উপাদানের কিছু না কিছু অংশ তার ভেতর অবর্তমান থাকে। যেমন বৈদ্যুতিক বাতির আলোর ভেতর লাল ও কমলা রং-এর অংশ বেশী থাকে এবং নীল ও বেগুনি অংশ কম থাকে। গ্যাসের আলো অনেকটা লাল ঘেঁসা পীতবর্ণ এবং তার ভেতর নীল অংশ অনেক কম। কাজেই নীল রং-এর পোষাক কৃত্রিম আলোর ভেতর কালো দেখাবে। বৈদ্যুতিক আর্কের আলো প্রায় দিনের আলোর মতনই সাদা। কাজেই আপতিত আলো নিজেই যদি রঙিন হয়, তাহোলে পদার্থের রংও বিভিন্ন হবে।

কোন অস্বচ্ছ পদার্থের ওপর আলো পোড়লে, তার খানিকটা অংশ প্রতিফলিত হয়, খানিকটা পদার্থের ভেতর ঢুকে গিয়ে আবার অংশতঃ ফিরে আসে এবং খানিকটা পদার্থদ্বারা সম্পূর্ণ শোষিত হয়। কাজেই অস্বচ্ছ পদার্থের রং নির্ভর কোরবে কি ধরণের আলো এসে পোড়ছে এবং কোন আলো শোষিত হোচ্ছে তার ওপর। সুতরাং পদার্থটি যে রং-এর আলো প্রতিফলিত কোরছে, সেই রং-এ রঙিন হবে। যেমন, সাদা আলোর ভেতর একটি লাল ফুল আমাদের চোখে লাল বোলে মনে হয়, কারণ ফুলটি সাদা আলোর সব উপাদানকে শোষণ কোরে নিয়ে শুধু লাল-রশ্মিকে প্রতিফলিত করে। কোন পদার্থের রং সাদা তার কারণ পদার্থটী সাদা আলোর কোন অংশ শোষণ না কোরে সব উপাদানকেই প্রতিফলিত করে। আবার কোন পদার্থ কালো হবে তখনই যখন সে সাদা আলোর সব উপাদানকে শোষণ কোরতে পারবে। কাজেই আপতিত আলোর সংগে কিছু যোগ দিয়ে প্রতিফলিত আলোর রং হয় না বরং তা থেকে কিছু বাদ দিলেই হয়।

যে কোন একটি পদার্থকে বর্ণালীর বিভিন্ন অংশের ভেতর দিয়ে নিয়ে গেলে এই বর্ণতথ্য প্রমাণিত হবে। সাদা ফুল সাদা আলোর ভেতর সাদা বোলেই মনে হবে কিন্তু লাল আলোর ভেতর আনলেই তার রং হোয়ে যাবে লাল অথবা সবুজ আলোর ভেতর সবুজ। আবার একটি লাল-ফুলকে বর্ণালীর লাল অংশের ভেতর রাখলে গাঢ় লাল দেখাবে কিন্তু অন্য কোন অংশ রাখলেই তার রং কালো হোয়ে যাবে কারণ ফুলটি অন্য সব রং-এর রশ্মিকে শোষণ কোরে নেবে। বিশুদ্ধ রং-সম্পন্ন পদার্থ কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়—কাজেই প্রতিফলিত আলোর রংও কদাচিৎ বিশুদ্ধ হয়। কাজেই কোন পদার্থকে বর্ণালীর এক অংশে রাখলে হয়ত উজ্জ্বল দেখাবে—কিন্তু পাশের অংশে রাখলে হয়ত সম্পূর্ণ কালো দেখাবে না কারণ তার থেকে কিছু কিছু আলো হয়তো পদার্থটী বিশুদ্ধ রং-সম্পন্ন নয় বোলে প্রতিফলিত কোরতে সমর্থ হবে।

কোন স্বচ্ছ পদার্থের ওপর আলো এসে পোড়লে পদার্থটী আলোর খানিকটা উপাদান শোষণ কোরে নেয়—বাকীটা বেরিয়ে আসে। এবং এই বেরিয়ে আসা আলোর ওপরই স্বচ্ছ পদার্থটীর রং নির্ভর করে। এক টুকরো লাল রং-এর কাঁচ লাল মনে হয় কারণ লাল রং-এর আলো ছাড়া অন্য সব আলোকেই সে শোষণ কোরে নেয়। ঐ কাঁচটিকেই অন্য কোন রং-এর আলোর ভেতর রাখলে কালো বোলে মনে হবে।

বিভিন্ন রং-এর রঙিণ কাঁচগুলোর রংও অনেক সময় বিশুদ্ধ নয়। পীতবর্ণের কাঁচের ভেতর দিয়ে শুধু পীত আলো নয় খানিকটা সবুজ এবং কমলা রং-এর আলোও বেরিয়ে আসে। আবার নীল কাঁচের ভেতর দিয়ে নীল, ঘননীল, এবং সবুজ আলোও অতিক্রম কোরতে পারে। জল এবং কাঁচের মত খুব স্বচ্ছ পদার্থও খানিকটা পরিমাণ আলো শোষণ কোরতে পারে—যে ব্যাপারটা খুব পাতলা স্তরের বেলাতে দেখতে পাওয়া যায় না কিন্তু গভীর হোলেই প্রতীয়মাণ হয়। যেমন সাধারণ গভীর জলের রং সবুজ কিন্তু জল খুব গভীর হোলেই রং কালো হোয়ে যায়। পুকুরের জল এবং সমুদ্রের জলের রং-এর তুলনা কোরলেই এই তারতম্য সহজে বোঝা যাবে।

কোন পদার্থ যদি গুঁড়ো অবস্থায় থাকে, তা হোলে তার রং পাত্‌লা বোলে মনে হয়, কারণ বিভিন্ন স্তরস্থ অসংখ্য কণা দ্বারা আপতিত আলো বার বার প্রতিফলিত হবার দরুণ বেশী দূর ভেদ কোরে যেতে পারে না—কাজেই শোষিতও হয় না। যদি গুঁড়ো খুব সূক্ষ্ম হয় তাহোলে কোন রকম শোষণই হবে না এবং বিক্ষিপ্তালোক চারিদিকে প্রতিফলিত হবার জন্য গুঁড়োর রং সাদা দেখাবে।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সার আইজাক নিউটন দেখিয়েছিলেন যে সাদা আলোকে বিশ্লেষণ কোরে যে সাতটি বিভিন্ন রং-এর বর্ণালী পাওয়া যায় তাদের আর কোনরকম বিশ্লেষণ চলে না অর্থাৎ তারা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। কিন্তু এই বর্ণালীর ভেতরই আবার তিনটি রং যথা লাল, সবুজ ও নীল এদের ভেতর ঠিক ঠিক পরিমাণ মিশ্রণ ঘটাতে পারলে জগতের সব রকম রং তৈরী কোর্‌তে পারা যায়। এই জন্যে এদের বলা হয় প্রাথমিক রং। বর্ণালীর ভেতর যে কোন দুটী রংকে মিশিয়ে যদি সাদা রং পাওয়া যায় তাহোলে সেই দুটী রংকে পরিপূরক বলে। যথা নীলাভ সবুজ ও লাল, পীত ও নীল প্রভৃতি পরিপূরক।

যদি লাল ও সবুজ আলো মেশান যায়, তাহোলে মিশ্রণের ফলে পীতবর্ণের আলো পাওয়া যাবে। এই পীতবর্ণের আলোর সাথে বর্ণালীর পীত আলোর কোনরকম তফাৎ চোখে ধরা পোড়বে না। কিন্তু স্পেক্‌ট্রোস্কোপ্‌ যন্ত্র দ্বারা দেখলেই তফাৎ এক মুহূর্তে ধরা পোড়বে। কারণ বর্ণালীর পীতবর্ণের আলো স্পেক্‌ট্রোস্কোপের ভেতর পীতবর্ণই দেখাবে কিন্তু লাল ও সবুজের মিশ্রণের ফলে যে পীত আলো সেটা স্পেক্‌ট্রোস্কোপের ভেতর ভেঙ্গে গিয়ে লাল ও সবুজ দেখাবে। এথেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যই আলোর রং নির্ধারণ করে—রং-এর ওপর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিশেষ নির্ভর করে না।

যখন আলোক তরঙ্গ কোন পদার্থের ওপর এসে পড়ে, তখন সাধারণতঃ পদার্থটি উত্তপ্ত হোয়ে ওঠে। এদ্বারা এই বোঝায় যে, পদার্থটী ক্ষুদ্র আলোক তরঙ্গ শোষণ কোরে নেয় এবং সেগুলিকে বড় তাপ তরঙ্গে রূপান্তরিত করে। এরকম পদার্থও পাওয়া যায় যেগুলি একরকম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোকে শোষণ কোরে সম্পূর্ণ অন্য তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো নিঃসরণ কোরে দেয়। অনেক সময় দেখা গেছে যে বিশেষ একটি পদার্থকে কোন আলোর ভেতর রাখলে পদার্থটি স্বপ্রভ হোয়ে ওঠে এবং অন্য এক রকমের আলো নিঃসরণ কোরতে থাকে। এই পদার্থগুলি এক রকম রং-এর তরঙ্গকে শোষণ করে যথা, বেগুনি কিন্তু নিঃসরণ করে সম্পূর্ণ অন্য রং-এর তরঙ্গ যথা, নীল। এই ব্যাপারটীর নাম দেওয়া হোয়েছে প্রতিপ্রভা বা ফ্লুরেসেন্স এবং এই ধরণের পদার্থগুলিকে বলা হয় প্রতিপ্রভ পদার্থ। এই ব্যাপারটী পদার্থের ওপরকার স্তরে নিবদ্ধ থাকে এবং যতক্ষণ তার ওপর আলো ফেলা হয়, ততক্ষণই টিঁকে থাকে। একটা কথা এখানে মনে রাখা উচিত যে যদিও ব্যাপারটা ওপরের স্তরে নিবদ্ধ থাকে তাহোলেও এটা কোন প্রতিফলনের ব্যাপার নয় কারণ নিঃসারিত আলোর রং সম্পূর্ণ অন্যরকম—যেটা প্রতিফলনের বেলাতে হোতে পারে না। আবার এমন কতগুলি পদার্থ আছে যেমন হীরা, ক্যালসিয়ম্‌ সালফাইড্‌ প্রভৃতি যেগুলিকে সূর্য্যালোকে কিছুক্ষণ রেখে যদি অন্ধকারে আনা যায় তাহোলেও জ্বল্‌তে থাকে। এই ব্যাপারটাকে বলা হয় অনুপ্রভা বা ফস্‌ফোরেসেন্স্‌। এই প্রতিপ্রভা বা অনুপ্রভা তৈরী কোরতে বেগুনি ও অতি-বেগুনি রশ্মি খুব কার্য্যকরী।

জীবিকা

সুভাষ সমাজদার

সকালে ঘুম ভাঙলো। টেবিল ক্লকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সাড়ে ছয়টা। আর মাত্র এক ঘণ্টা। এর মধ্যে বাজার, স্নান, খাওয়া শেষ করেই ছুটতে হবে। ডেলি-প্যাসেঞ্জার—তাঁতের মাকুর মত একঘেয়ে ক্লান্তিকর জীবনের বোঝা কি মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে! নাঃ, আর পারা যায় না। বুকটা ভারী হয়ে ওঠে। জানালার বাইরে বহুদিনের পরিচিত পৃথিবীটা তখন কাঁচা সোনার মত রোদে ঝলমল করছে। উঁচু বাড়ীটার পাশে নিমগাছের কচি পাতায় সবুজ জীবনের আভাষ।

এমন সময় দূরে দিগন্তের কালো মেঘের মতই ঘন কেশরাশি উন্দাম করে আমার ঘরে এলেন এক তরুণী। ভাবলাম এই অসময়ে কে এই দেবী। তার মুখে পূজার্থিনীর পবিত্রতা। এখনো যায় নি মিলিয়ে তার সদ্য ঘুম-ভাঙা কালো টানা দুটি চোখে রাত্রিশেষের সুমধুর স্বপ্নের রেশ। কিন্তু যে দেবীর কথার সুরে মুক্তা ঝরবে বলে মনে হয়েছিল হঠাৎ সে যেন বড় মাটির ভাঁড়ে মুখ লাগিয়ে বীভৎস চীৎকার করে উঠলো রাক্ষসীর মত—'কৈ গো ওঠ, বেলা যে হয়ে গেল অনেক। বাজারে যেতে হবে না? চা তৈরী কোরেছি, চা খেয়ে বাজারে যাও—নিশ্চিহ্ন হয়ে উড়ে গেল ঘুমের জড়তা। তার কর্কশ স্বরে কানের পর্দাটা ফাটে আর কি। চোখদুটো দু' হাত দিয়ে ভাল করে রগড়ে নিয়ে তাকিয়ে দেখলাম—দেবী নয়, মানবী। আমারই তরুণী স্ত্রী—গৌরী। সংসারের অসংখ্য চাহিদা আর শত-সহস্র বাসনা দুষ্ট ব্রনের কালো ক্ষতচিহ্নের মতই ফুটে উঠেছে তার সুন্দর মুখে। মেয়েছেলে এত কুৎসিত হতে পারে এই প্রথম মনে হলো। বাইরে জীবিকার জন্য অবিরাম লড়াই আর ঘরে স্ত্রীর অসংখ্য দাবী—সুরু হলো জীবনের উপর এই সাঁড়াশী অভিযান।

চিন্তার ভারে মাথাটা ঝিম ধরে উঠলো। বাজার কোরতে হবে...... কি দিয়ে হবে বাজার। দশ টাকা মাত্র সম্বল। এখনও মাস শেষ হতে পনেরো দিন বাকী। নিরন্তর অর্থাভাবে ক্লিষ্ট জীবনের দিনগুলো যেন কাটতে চায় না।

বি-এ পাশ করে তিন তিনটি বছর বেকার বসে থাকবার পর বড়বাজারের এক ব্যবসায়ীর গদিতে হিসাব লেখার একটি কাজ পেয়েছি। মাইনে—একশো টাকা। আরও কিছু উপরি আছে—মালিকের হলদে দাঁতের বীভৎস হাসি আর সময়মত না আসতে পারলে চাকরী থেকে বরখাস্তের ভয়। কোলকাতায় মাথা গুঁজবার স্থান কোরতে পারি নি—তাই আমাকে ডেলী-প্যাসেঞ্জারী কোরতে হয় হুগলী থেকে। পাঁচটি বছর কাটিয়েছি এইভাবে।

হুগলী স্টেশন থেকে আমাকে ধরতে হবে আটটা বারো'র লোক্যাল—না হলে এগারোটার মধ্যে হাজিরা দিতে পারবো না। আমি পেঁাছলাম স্টেশনে আটটা এগারোয়—সমাজ-সংসার এবং নিজের ভাগ্যের উপর মর্মান্তিক অভিসম্পাত দিতে দিতে ছুটে এসে ট্রেনে উঠলাম। ট্রেন চলতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ভেসে এলো। হাওয়াটা যেন আমার ব্যর্থ জীবনের মৃত আশা আকাঙ্খার শ্মশানভূমি থেকে হু হু করে এসে কাঁপিয়ে দিল আমাকে।

কামরার ভিতরে সহযাত্রীদের দিকে তাকালাম। প্রায় সবাই আমারই মতো ডেলি-প্যাসেঞ্জার। হাতে রেশন ব্যাগ, একেবারে বাজার করে ছ'টার গাড়ীতে ফিরবে। পান চিবোচ্ছে আর খবরের কাগজের খবর নিয়ে জাবর কাটতে কাটতে চলেছে। পানের পিকটা ফেলে নিয়ে একজন তার পাশের সহযাত্রিকে বল্লেন—দেখেছেন মশায়! রেশন আরো কমিয়ে দিল। এরা আর বাঁচতে দেবে না।

বেঞ্চের এক কোণ থেকে এক বৃদ্ধ বলে উঠলেন—এক একটা জাতির এক একটা কাল আসে মশায়, দুঃখ আর কষ্ট তখন দুর্গ্রহের মতই পঙ্গু করে দেয় জীবনটাকে।

—ওসব কাল-টালের কথা বাড়ীতে গিয়ে নাতি-নাতনীদের বলবেন দাদু। পেটের ক্ষিধের কাছে কোন নীতিকথা খাটে না। ঐসব বুজরুকি আর আকণ্ঠ লোভের চিন্তায় ঠাসা মাথাগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে। দেখেছেন তো 'ফার-ইষ্টে'র দেশগুলোর কাণ্ড—ভীষণ প্রতিবাদ করে এক তরুণ চীৎকার করে উঠলো। গুটানো আস্তিনটা টেনে তুললো আরো উপরে।

কামরার সবাই সমস্বরে সমর্থন করলো যুবককে—ঠিক বলেছেন মশাই—ঠিক বলেছেন। ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। চাল নেই। বাজার থেকে উধাও হয়ে গেল কাপড়। দিতে পারবে না কিছু, গদীর উপর বসে বসে কেবল দেবে স্তোক বাক্য—

—দেখুন আপনাদের একটা কথা বলতে চাই, মনে কিছু কোরবেন না—ধীর স্বরে বল্লেন শান্ত সৌম্য-স্বভাবের এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। বেশ একটা মণীষা আর মাধুর্য্যের মিলন যেন প্রতিভাত হচ্ছে তার বড় বড় দুটি চোখে। কামরার সমবেত কলরব স্তব্ধ হয়ে গেল ভদ্রলোকের তেজোদীপ্ত গলার স্বরে। তিনি বল্লেন, 'আপনারা প্রায়ই একটা কথা ভুলে যান যে শাসকবর্গের কাছে আপনি যেমন দাবী কোরছেন—তেমনি আপনারও আছে দেশের প্রতি রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য। অভাব-অভিযোগ পূরণের জন্য হা-হুতাশ আর নেতাদের প্রতি বিষ উদ্গীরণ করা ছাড়া দেশের মঙ্গলের জন্য কোনও দিন কিছু কোরেছেন?

—জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি পড়ে গেল বারুদের স্তূপে। কামরার প্রত্যেকের চোখে ঝিলিক মেরে উঠলো প্রতিবাদের ফুলকি। সবাই তুমুল চীৎকার কোরতে সুরু কোরল দাদা কি স্কুল-মাষ্টার নাকি?...... না কোন মন্ত্রীর ভাই!......... পার্বালিসিটি অফিসারও হতে পারেন—......কত টাকা পান দাদা......অজস্র কটূক্তিতে লাল হয়ে উঠলো ভদ্রলোকের কপালটা। সূঁচ ফুটিয়ে দেওয়া রবারের বেলুনের মতই চুপ্‌সে গেলেন তিনি। মানকুণ্ডু স্টেশনে গাড়ী থামলো। তারস্বরে চীৎকার করছে অসংখ্য ফেরিওয়ালা...... চাই কচি শশা...... আম, লিচু...... অব্যর্থ দাদের ওষুধ, চিরুণী, আল্‌তা......যেন দুনিয়ার সব জিনিস নিয়ে এই প্ল্যাটফরমে জুটেছে দুনিয়ার সব ক্যানভাসার। গম্ গম্ কোরছে জায়গাটা। কামরার মধ্যে তখনও চলেছে সেই ছাদফাটানো চীৎকার।

হঠাৎ আমার মনে হলো, বাইরের আর ভিতরের চীৎকারের মধ্যে একটা অদ্ভুত অদৃশ্য যোগাযোগ আছে। আমার সহযাত্রীরা সবাই চলেছে জীবিকার তাগিদে। খানিক বাদেই পৌঁছে যাবে কর্মস্থলে। ঘড়ির কাঁটার দিকে করুণ চোখে চেয়ে ঘুরিয়ে যাবে ঘানির চাকা। নিদারুণ আর্থিক অভাব অনটনে ক্লিষ্ট জীবন এদের। রাজনীতির কচকচি এদের প্রাণের জিনিস নয়। তা হতে পারে না। কিন্তু মানুষের জৈবিক মনে যেখানেই ভয়ঙ্কর উগ্র হয়ে উঠেছে জঠরের আগুন, সেইখানেই অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে রাজনীতি। রাজনীতির চীৎকার উদরেরই আর্তনাদ। আর প্ল্যাটফরমে এই দারুণ কাঠফাটা রৌদ্রে গলদঘর্ম হয়ে ট্রেনের দুয়ারে দুয়ারে এই যে অগুনতি ক্যানভাসার ঘুরছে কিছু বিক্রীর আশায়—তার মূলে ঐ পেটেরই তাড়না। আমিও ঐ পেটের জন্যেই চলেছি দাসত্ব কোরতে। এই জঠরকে কেন্দ্র করেই সারা দেশের মানুষ উন্মাদের মত বৃত্তাকারে ঘুরছে। সহযাত্রী বৃদ্ধের কথাটা কানে বেজে উঠলো......এক একটা জাতির এক একটা কাল ......এটা কি সত্যিই বিধির বিধান? নিয়মিত অনাহারে জীর্ণ অন্তঃসারশূন্য কাঙালিনীর মত দেশের এই অবস্থার জন্য কেউই কি দায়ী নয়?

ট্রেন আবার ছুটতে সুরু কোরেছে। গাড়ীর ঝাঁকুনি আর ভাতের রসে ঝিমোচ্ছে সবাই। থিতিয়ে এসেছে তাদের কথাবার্তার তোড়। জানালার বাইরে দিয়ে দেখা যায় দূরে ধূধূ মাঠের শেষে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি তালগাছ। রক্তিম গুঞ্জন জেগেছে লাইনের পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছে। আমার বেঞ্চের কোণে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। তার হাতঘড়ির দিকে দৃষ্টি পড়লো। দশটা। আর এক ঘন্টার মধ্যে পৌঁছাতে পারবো কি আমার মালিকের গদীতে। ট্রেন যদি লেট-টেট করে যদি লাইন ক্লিয়ার না থাকে—কিছু শুনবে না বা বুঝবে না আমার অন্নদাতা। সুরু কোরবে লাল ভাঁটার মত দুটো চোখ নিয়ে বরখাস্তের হুম্‌কি। কী দুঃসহ জীবন। হীন দাসত্বে ভরা জীবিকা। বুকের মাঝখানটা মোচড় দিয়ে উঠলো একটা ব্যথা। পূর্ব আর পশ্চিম। উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু। পাহাড় আর সমুদ্র। জীবন আর জীবিকা। কোন মিল নেই, কোন আপোষ নেই এঁদের মধ্যে। জীবনটাকে একেবারে পাথরের মতই জড় আর নির্বিকার করে দেয় এদের বিরোধ। শনিগ্রহের মত।.......... মাননীয়গণ, আপনাদের গোটাকতক কথা বলতে চাই—আচম্‌কা চেঁচিয়ে উঠলো একজন। ছিন্ন হয়ে গেল আমার চিন্তাসূত্র। তাকিয়ে দেখি—কামরার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে একটি যুবক। তারুণ্যের তেজে জ্বল জ্বল কোরছে তার প্রশস্ত কপালটা। বুদ্ধিদীপ্ত ঝকঝকে দুটো চোখ। তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলে চলেছে সেই সুদর্শন যুবা...... মাননীয়গণ, আপনারা শিক্ষিত লোক, অনেক জানেন আপনারা। আপনারা নিশ্চয়ই চিন্তা করে থাকেন —দেশের এই নিদারুণ বেকার সমস্যার কথা। সহস্র সহস্র যুবক লেখাপড়া শেষ করেই খুঁজতে বেরোয় চাকরী। চাকরী, পরের গোলামী ছাড়া আর যেন অন্নসংস্থানের কোন উপায় নেই। সমস্যা আরও তীব্র হয়ে উঠেছে দেশ ভাগের পর। কচুরীপানার মত লাখে লাখে পূর্ববঙ্গ থেকে আসছে অসংখ্য শিক্ষিত লোক—গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থার আশায় 'এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে'র দুয়ারে ধর্ণা দিচ্ছে—ঠিক যেমন কামনাপূরণের জন্য মাথা খোঁড়ে বাবা তারকেশ্বরের দরজায়.........

......বাঃ, বেশ বলছে তো ছেলেটা...... পেটে কিছু আছে বোঝা যাচ্ছে...... একজন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মন্তব্য কোরলো—এ বেটাও কোন ক্যানভাসার হবে নিশ্চয়ই। পকেটে হাত দেবার আগে ঐসব মুখরোচক বুলি আওড়াচ্ছে —নাঃ, মশায় এত স্পষ্ট নির্ভুল উচ্চারণ আর এমন গুছিয়ে বলার কায়দা ঐ ক-অক্ষর গোমাংস ক্যানভাসারদের হয় না ......আমার তো মনে হচ্ছে ইলেক্‌সান 'প্রোপাগ্যাণ্ডা'...... কোন 'পার্টি'র লোক...... অসংখ্য মন্তব্য আর আরোহীদের মৃদু গুঞ্জনের ঢেউ বয়ে গেল কামরার এক দিক থেকে আরেক দিক পর্যন্ত...... তখনও সাবলীল ভঙ্গীতে বলে চলেছে সেই ভদ্রলোক...... দেশ স্বাধীন হয়েছে বটে, কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্রী বা কারখানা-ফ্যাক্টরী একটাও গড়ে ওঠে নি দেশে। আর অফিস?...... অফিসে তো দেশভাগের বহু আগে থেকেই তিল ধারণের স্থান নেই......তাই আমাদের দেশের ছেলেরা সব বি-এ, এম-এ পাশ করে হীন, নীচমনা, অশিক্ষিত ব্যবসায়ীর অধীনে ষাট-সত্তর টাকা মাইনেয় সামান্য চাকরী কোরছে আর বিসর্জ্জন দিচ্ছে নিজের ব্যক্তিত্ব আত্মমর্য্যাদা শিক্ষা...... সব কিছু...... এইভাবে সমাজের বুকে থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাচ্ছে এক কালের সংগ্রামী ইতিহাসের নায়ক এই নির্ভীক মধ্যবিত্ত যুব-সম্প্রদায়...... আমার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো। কে যেন সপাং করে চাবুক মারলো আমার পিঠে......ছেলেটা বলছে কি...... ব্যক্তিত্ব আর আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন......আবার মনে হলো ......কেন অন্যায় তো কিছু বলছে না...... সঙ্গে সঙ্গে কানে বেজে উঠলো আমার মালিকের কর্কশ কণ্ঠ......একটু সকাল সকাল আসবার চেষ্টা কোরবেন, না হলে আমাকে অন্য ব্যবস্থা...... সব কিছু বিকিয়ে দিয়ে কিছু উপার্জ্জনের জন্যই তো নাকে মুখে গুঁজে ছুটে চলেছি। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে যুবকটির প্রশস্ত কপালটার মাঝখানে। চোখ দুটো যেন কিসের প্রেরণায় জ্বল জ্বল কোরছে। ব্যথা ভারাক্রান্ত সুরে বলছে...... বন্ধুগণ! বছরখানেক ধরে দাস সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান ডালহৌসি আর 'এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে' ঘুরে ঘুরে কয়েক জোড়া জুতো নষ্ট করেছি। দরখাস্ত কোরেছি গাদা গাদা। সক্ষম হই নি জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা কোরতে। কিন্তু আজ আমি দু'বেলা পেটপুরে খেতে পাই—বিকিয়ে দিতে হয় নি আমার ব্যক্তিত্ব, আমার সত্তা। স্বাধীন জীবিকা গ্রহণ কোরেছি। আমি আপনাদের সকলের ঘৃণিত, অবহেলিত ক্যানভাসার —বলেই বেঞ্চের নীচ থেকে একটা ছোট্ট কালো সুটকেশ সকলের সামনে তুলে ধরলো। যারা উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল তাদের মুখে এতক্ষণ পর ফুটে উঠলো বিরক্তির চিহ্ন। কিন্তু ক্যানভাসারের মুখে এত প্রাঞ্জল বক্তৃতা ব্যাণ্ডেল-কোলকাতা লোকালে কেউ শোনে নি—তাই ঘনীভূত হয়ে উঠলো কৌতুহল আরোহীদের মনে। বর্ষিত হলো অজস্র প্রশ্নবান সেই যুবকের উপরে চতুর্দ্দিক থেকে—

দাদার কোথায় বাড়ী?

—ফরিদপুরে—মুখে একটা অমায়িক হাসি যেন লেগেই আছে।

—এখানে থাকেন কোথায়?

—উত্তরপাড়ায়।

পড়াশুনা কোরেছেন কতদূর?

—১৯৪৮ সালে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে বি-এ পাশ কোরেছি। তারপর বহু চেষ্টা কোরেও কিছু না কোরতে পেরে একটা দেশী কোম্পানীর ক্যানভাসারী নিয়েছি—

—কি রকম 'পার্সেণ্টেজ' থাকে?

—মন্দ হয় না। চলে যায় একরকম—

বি-এ পাশ ছেলে ক্যানভাসারী কোরছে শুনে সহানুভূতির রসে অনেকেরই মনটা ভিজে উঠলো। কেউ কেউ কয়েক ফাইল 'এ্যাসিড সেলিসেলিক' কিনে ফেললো। পদ্মমধুও বিক্রী হলো কিছু। পয়সা থাকলে আমিও এক ফাইল কিনে ওকে সাহায্য কোরতাম। মাসের শেষ। পকেটটাও ক্ষয়িষ্ণু, অতএব নীরব সমবেদনা ছাড়া উপায় নেই......

সেওড়াফুলি স্টেশনে গাড়ী থামলো। আমার কামরায় উঠলো এক দম্পতি। চেহারায় আর পোষাকে কেমন একটা গ্রাম্য বোকা বোকা ছাপ। ছেলেটির বয়স ২৭।২৮ হবে। বেশ বোঝা যায় নতুন বিয়ে হয়েছে। লাল তাঁতের শাড়ীতে জড়ানো পুঁটলীর মত জবথব হয়ে আমার বেঞ্চের এক কোণে বসলো তার স্ত্রী। দীর্ঘ ঘোমটার নীচ থেকে কৌতুহল-ভরা চোখে জুল জুল করে তাকিয়ে রইলো সেওড়াফুলি সহরের পুরাণো ইঁটের বাড়ী আর রাস্তার মোটর, লরী, বাস, রিক্সার দিকে। ট্রেন চলতে সুরু কোরেছে হু হু করে। জ্যৈষ্ঠ মাস। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। জানালার বাইরে দেখা যায়—প্রখর রৌদ্রে পুড়ে যাচ্ছে আদিগন্ত মাঠ। পৃথিবীর অশ্রুহীন নীরব কান্নায় স্তম্ভিত হয়ে আছে দূরদিগন্তের বনানী। নীল আকাশের সঙ্গে মিশে যাওয়া শ্যামল সবুজের রেখাটাকে ফুঁড়ে উঠেছে অগণিত কালো কালো চোঙ। কাপড়ের কল। পাটের কল। স্নিগ্ধ প্রকৃতির বুকে কালো কলঙ্ক চিহ্ন

রচনা কোরেছে ঐ চিমনীগুলো। মানুষের অন্তহীন লোভ আর দম্ভ যেন মাথা উঁচু করে উঠেছে। তার উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের আঁচে পুড়ে যাচ্ছে আশপাশের নবীন বৃক্ষ-শ্রেণী। আমার মনে হলো—বাংলার আদি সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র গঙ্গার এই দুই তীরকে যারা পরিণত কোরেছে বাণিজ্যিক কেন্দ্রে, তারা যুগের প্রয়োজনকে হয়তো কিছুটা সার্থক কোরেছে, কিন্তু নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি কোরেছে অনেক অনেক বেশী। অগাধ ঐশ্বর্য্যের জন্য সাহারার মত তাদের তৃষ্ণা শুষে নিচ্ছে দেশের অযুত-কোটি মানুষের বুকের রক্ত। দেশব্যাপী মানুষের জঠরের আর্ত্তনাদের জন্য এরাই কি দায়ী নয়?

—বাবু! এ বছর আর বৃষ্টি হবে না, না?— কণ্ঠে অজানা ভয়ের সুর। প্রশ্ন করলো আমাকে সেই দেহাতী যুবকটি। ভরসা দিয়ে বল্লাম— খবরের কাগজে তো বলছে আগামী সপ্তাহের শেষেই হবে— কেন তোমার কি জমি-টমি কিছু আছে না কি?

—হ্যাঁ বাবু, জমিই তো আমাদের একমাত্র ভরসা। চাষ-বাস করি আমার নিজের কয়েক বিঘে জমি—আর আধিও আছে কিছু। বৃষ্টি না হলে একেবারে সবসুদ্ধো না খেয়ে মরতে হবে আর কি—ভারী হয়ে ওঠে তার কথার সুর। ভাবতে লাগলাম—জীবনটা কি সত্যিই দুখের সমুদ্র? উত্তরপাড়া স্টেশন এসে গেল। এগারোটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকী। কুড়ি মিনিটের মধ্যে পৌঁছাতে হবে মালিকের গদীতে......পারবো কি? না পারলেই সেই...... 'ওগো দেখ আমাকে কিন্তু একটা কলেজ-পাড় শাড়ী কিনে দিতে হবে—ঐ পাশের বাড়ীর কুন্তি যেমন একখানা কিনেছে সেই রকম। আর কোলকাতায় তো এই প্রথম যাচ্ছি তাই যাদুঘর, চিড়িয়াখানা সব কিন্তুক দেখাতে হবে বুঝলে—চাপা গলায় ফিস ফিস করে বলছে গ্রাম্যযুবকটির তরুণী স্ত্রী। বায়না ধরেছে। স্ত্রীর আব্দার শুনে কুণ্ঠিত হয়ে ওঠে যুবকটির কপালের ত্রিবলী রেখাগুলো—কিন্তু একটু পরেই তা মিলিয়ে গিয়ে মুখে দেখা গেল ম্লান হাসি। নরম সুরে বল্লে—আচ্ছা আচ্ছা, সেসব হবে চল তো—কথার ভাবে বোঝা যায় যুবকটির মনে কোথায় যেন খচ খচ কোরছে একটা ব্যথা। ব্যথাটা নিশ্চয়ই অক্ষমতার ব্যথা! দারিদ্র্যের ব্যথা। নবযৌবনা কিশোরী পত্নী। উচ্ছল ঝরণা-ধারার মত উদ্দাম তার বাসনা। জীবনের সবটুকু রস সে নিঙড়ে পান কোরতে চায়। কিন্তু আনন্দ আর সখের সব উপকরণই যে কিনতে হয় টাকা দিয়ে। টাকা...... দুঃখী কৃষক সে। হয়তো দশ টাকা সম্বল করে সে বেরিয়েছে বাড়ী থেকে। তবুও সে পারবে না উপেক্ষা কোরতে প্রিয়তমা স্ত্রীর অনুরোধ। জীবন-সংগ্রামের বোঝা পিঠে নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে মানুষ। বোঝার চাপে শরীরটা সামনের দিকে হেলে পড়েছে—তবুও পথের পাশে ফুটে থাকা সুন্দর ফুল কিন্তু তার দৃষ্টি এড়ায় না। দুর্নিবার তার আকাঙ্খা। দুরন্ত তার প্রাণের লীলা। আনন্দকে তার পেতেই হবে। এই বোধ হয় মানুষী প্রকৃতি। গাড়ীর জানালা দিয়ে দেখা যায় ধুসর মধ্যাহ্ন বিশ্রাম নিচ্ছে বাঁশবন আর কলাগাছে ঘেরা বিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তর। চোখের সামনে ভেসে উঠলো—আমার স্ত্রী গৌরীর মিষ্টি মুখখানা। বিয়ে হয়েছে আজ চার বছর হলো। আমাকে বরণ কোরেছে। তার সঙ্গে বরণ কোরেছে জীবনব্যাপী দুঃখকে। শাড়ী কিনে দেওয়া তো দূরের কথা, বোধহয় একদিনও তাকে সিনেমাতেও নিয়ে যেতে পারি নি। কোন দাবী নেই, আমোদ নেই, স্ফূর্ত্তি নেই—মুখ বুজে সংসারের চাকা ঘুরিয়ে যাচ্ছে কলের মত।... বালি স্টেশন পেরিয়ে গেলাম। ক্রমশঃ নিকটবর্তী হচ্ছে আমার উদয়াস্ত পরিশ্রমের কর্মস্থল—বড়বাজারের গদী। মজুরী একশো টাকা। লাল রক্তের রুপালী প্রকাশ। হায় সেক্সপীয়র আর ব্রাউনিং পড়া সুমধুর কলেজ জীবন...... অভিসারিকার মত জীবনে কেন এসেছিলে? দুপুরের এই পুড়ে-যাওয়া রোদে তোমাকে মনে হচ্ছে যেন রাত্রিশেষের স্বপ্ন। কানে ভাসছে বি-এ পাশ ক্যানভাসারের কথা...... নির্লজ্জ কাঙালীপনার বদলে মুখের ভাত...... স্বাধীন স্বাবলম্বী জীবন...... বিদ্যুতের মত ঝিকিয়ে উঠলো মনে —পরের গোলামী না করার চিন্তা...... আবার মনে হলো ব্যক্তিত্ব আর আত্মসম্মানের চেয়ে বাঁচা কি বড় নয়? বাঁচা তো বিড়ম্বনা...... না তবুও বাঁচতে হবে। শত দুঃখ কষ্টেও মানুষ যে অপরাজেয়......

ধীরে ধীরে গাড়ীটা ঢুকে পড়লো হাওড়ার প্ল্যাটফরমে।

সমাজ সেবক ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

স্বর্গত ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র এম-বি মহাশয় কলিকাতার একজন বিখ্যাত চক্ষু-চিকিৎসক ছিলেন। অস্ত্রোপচারেও তাঁহার সবিশেষ দক্ষতা ছিল। শুধু চিকিৎসা কার্য্যের দ্বারা নহে, সর্ব্বপ্রকারে সমাজের সেবা করা তিনি জীবনের অন্যতম ব্রত বলিয়াই মনে করিতেন। সমগ্র ভারতে এবং বিদেশে ডাঃ মৈত্র একজন অক্লান্তকর্ম্মী সমাজ-সেবকরূপেই সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

বাল্যকালে পিতৃ বিয়োগের পর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ও তদীয় অগ্রজ সুরেন্দ্রনাথের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রধাণতঃ তাঁহারই যত্নে এবং নিজেদের অধ্যবসায়ের বলে মৈত্র ভ্রাতৃদ্বয় ভবিষ্যতে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিলেন। উভয়েই শাস্ত্রী মহাশয়কে পিতার অধিক শ্রদ্ধা করিতেন।

যখন চিকিৎসক হিসাবে ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ যশের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত সেই সময়, ১৯১৫ সালের জানুয়ারীর প্রথম ভাগে আচার্য্য শিবনাথ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বেদী হইতে এক উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায়, ব্রাহ্ম যুবকগণকে সমাজ সেবার কার্য্যে অগ্রসর হইতে অতি আবেগভরে আহবান জানান। দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন এবং আচার্য্যের সেই আহবানে অন্তর মধ্যে বিশেষ অস্থিরতা অনুভব করেন। বক্তৃতার অন্তেই তিনি শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, নিজেকে সমাজ সেবার কার্য্যে উৎসর্গ করিতে চাহেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার পরম-স্নেহাস্পদ দ্বিজেন্দ্রনাথকে বিষয়টীর গুরুত্ব বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন এবং কার্য্যে আত্মনিয়োগের পূর্ব্বে সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলেন।

এই ঘটনার পর প্রায় পক্ষকাল ধরিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজের অন্তরের অস্থিরতাকে নিরোধ করিতে পারেন নাই। যখন মন কতকটা স্থির হয়, তখন তিনি এই সংকল্প গ্রহণ করেন, যে, জাতি, ধর্ম্ম ও সমাজ নির্ব্বিশেষে দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমাজ সেবায় নিজেকে নিয়োগ করিবেন—কোন সামাজিক ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে কার্য্যে আবদ্ধ থাকিবেন না।

১৯১৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী (১২ই মাঘ ১৩২১) তারিখে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরে অনুষ্ঠিত একটি আলোচনা সভায় প্রস্তাবিত হয় যে, লোকহিতসাধন বর্ত-মান সময়ে আমাদের প্রধান কর্তব্য; ইহার অনুষ্ঠান এখনই এই স্থানেই আরম্ভ হউক এবং জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে একটী মণ্ডলী গঠন করিয়া কার্য্য আরম্ভ হউক। প্রস্তাব সকলেরই মনোমত হয় ও বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী গঠিত হয় এবং প্রস্তাবক ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র সম্পাদক নিযুক্ত হন।

ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র

ইহার পর জনসাধারণের অবগতি ও এই কার্য্যে তাঁহাদের যোগদান প্রার্থনা করিবার জন্য একটি উদ্বোধন সভা আহূত হয়। তাহার নিমন্ত্রণপত্র এইরূপঃ—

ওঁ

সবিনয় নিবেদন

বঙ্গদেশে সর্ব্ববিধ জনহিতকর কার্য্যের ক্ষেত্র সুবিস্তৃত; অথচ তদনুরূপ চেষ্টা বা কার্য্য সম্যকরূপে

সম্পাদিত হইতেছে না। আংশিকভাবে নানাস্থানে লোক-হিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলেও, সমগ্রভাবে ইহার আদর্শ উপলব্ধ ও বিবিধ ক্ষেত্রে ইহার কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই। দেশবাসী সকলকে জ্ঞানে, চরিত্রে ও স্বাস্থ্যে উন্নত করিতে হইলে এইরূপ এক সর্ব্বাঙ্গীন অনুষ্ঠান যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বর্তমান সময়ে সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে-ছেন।

এই আদর্শে সম্প্রতি একটী হিতসাধন মণ্ডলী এই নগরীতে গঠিত হইয়াছে। তাহার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে জনসাধারণের অবগতির জন্য ও এই কার্য্যের সহিত তাঁহা-দের সহানুভূতি ও যোগদান প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত, এই মহদনুষ্ঠানের উদ্বোধনস্বরূপ—

আগামী ১লা ফাল্গুন ১৩২১ (১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৫) শনিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরে একটি প্রারম্ভিক সভা আহূত হইয়াছে। এই সভায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বক্তৃতা করিবেন।

মহাশয়ের ন্যায় জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সাহায্যের ও উৎসাহদানের উপর এইরূপ সদনুষ্ঠানের সফলতা বিশেষ ভাবে নির্ভর করিতেছে। অতএব উক্ত সময়ে সভাস্থলে আপনার উপস্থিতি ও উৎসাহ দান বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি।

৬৭-এ, স্ট্রাণ্ড রোড, নিবেদক
(মেও হস্পিটাল) কলিকাতা। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র,
৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫। সম্পাদক,
হিতসাধন সমিতি, কলিকাতা।

যথা সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে 'বঙ্গীয় হিত-সাধন মণ্ডলী'র উদ্বোধন সভার অধিবেশন হয়। যে কয়-জন দেশবরেণ্য মণীষীর বক্তৃতার কথা নিমন্ত্রণপত্রে বিজ্ঞা-পিত হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল, অনেককে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যাইতে হয়। সভায় তিন শতেরও অধিক নারী উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। সভায় প্রথমে ও শেষে সেবাভাবোদ্দীপক (১) "আনন্দধ্বনি জাগাও গগণে", (২) "তোমারি সেবক করহে আজি হতে আমারে" ও (৩) "দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ কাজে হে", এই তিনটি সঙ্গীত গীত হয়। কবি সত্যেন্দ্র-নাথ দত্ত এই শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্বরচিত 'সেবা-সাম' শীর্ষক এক দীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন। তাহার প্রথম কয়েক ছত্র এখানে উদ্ধৃত হইলঃ—

আলগ্ হ'য়ে আল্‌গোছে কে আছিস্ জগতে
জগন্নাথের ডাক এসেছে আবার মরতে।
তফাৎ হ'য়ে তফাৎ ক'রে নাইক মহত্ত্ব,
দশের সেবায় শূদ্র হওয়াই পরম দ্বিজত্ব।
পিছিয়ে যারা পড়্‌ছে তাদের ধরে নে ভাই হাত,
মিলিয়ে নেব কণ্ঠ আবার চল্‌ব সাথে সাথ;
জগন্নাথের রথ চলেছে, জগতে জয় জয়.
একটি কণ্ঠ থাক্‌লে নীরব অঙ্গহানি হয়;
সাথের সাথী পিছিয়ে রবে,— কাদবে নাকি মন?
এমন শোভাযাত্রা যে হায় ঠেক্‌বে অশোভন।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রথম বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতায় "মানুষ হওয়া" সম্বন্ধেই বিশেষ করিয়া বলেন। দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা, মানুষের আত্মীয়ত্ব, পরস্পরের সাহায্য, আধ্যাত্মিক কল্যাণ, সেবার ক্ষেত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, "বর্তমান যুগের সেবা-আদর্শ সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা" বলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রধানতঃ "হিতসাধন" সম্বন্ধে বলেন। তিনি সেবা-ধর্ম্ম বিষয়ে ভাগবতের শিক্ষা ও উপনিষদের উপদেশ এবং প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে ভগবানের সজীবরূপ উপলব্ধি করিতে বলিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতার মূল কথা ছিল "কর্ম্মযজ্ঞ"। এ যজ্ঞ যে কিরূপে উদ্যাপন করিতে হয়, তাহাই তিনি নিজস্ব অননুকরণীয় ভাষায় ও ভঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ভাষণে প্রসঙ্গক্রমে বলেন, অদ্য যে হিতসাধন মণ্ডলী স্থাপিত হইল, তাহার কার্য্যক্ষেত্র অতি বিস্তৃত। এই মণ্ডলীর আলোচ্য বিষয় সকলের মধ্যে দেশের লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতির উপায় বিধান একটি প্রধান বিষয়। বহু সংখ্যক লোকে বহুদিন ধরিয়া একার্য্যে রত থাকিলে সুফল দর্শিতে পারে। তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের স্বাস্থ্যহীনতা ও দীর্ঘজীবিতাহ্রাসের জন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি উপসংহারে এই মণ্ডলীর উদ্যোগ-কারিগণকে, লোকহিতার্থে আরও যে সকল সভা-সমিতি আছে, তাঁহার সভ্যগণের সহিত বৎসরে অন্ততঃ দুই কি তিন বার পরামর্শ করিয়া কার্য্য পরিচালনা করার নিয়ম প্রবর্তিত করিতে উপদেশ দেন।

সভাস্থলে মণ্ডলীর যে "আদর্শ ও উদ্দেশ্য" পত্র বিতরিত হইয়াছিল, তাহাও নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

আদর্শ ও উদ্দেশ্য

১। নিরাশ্রয় ও সহায়হীন বা পতিত ও নিগৃহীত পুরুষ ও নারীদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা বা জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থাদির দ্বারা আত্মনির্ভরশীল ও কার্য্যক্ষম করা এবং বিপন্ন ব্যক্তিদিগের সাহায্য করা (যথা, আতুরাশ্রম, অনাথাশ্রম, শিল্পসমিতি ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবনাদি বিপদে সাহায্য দান)।

২। নানাবিধ সহজ ও সুলভ উপায়ে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার (বক্তৃতা, পুস্তিকা প্রচার, আলোকচিত্রাদি প্রদর্শন, পাঠাগার ও নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন, ইত্যাদি)।

৩। শারীরিক সুস্থতা ও স্থানীয় জলবায়ুর বিশুদ্ধতা রক্ষা বিষয়ে ও নানাবিধ ব্যাধির নিবারণ ও প্রতীকার কল্পে শিক্ষা ও সাহায্য দান।

৪। অনুন্নত ও অশিক্ষিত শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে যথাযোগ্য শিক্ষার দ্বারা প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে উন্নত ও অগ্রসর করা।

৫। সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতি বা কুপ্রথাদির নিবারণ ও সংশোধন চেষ্টা।

৬। বিশুদ্ধ আমোদ প্রসঙ্গাদির প্রবর্তন।

৭। সর্ব্ববিধ সামাজিক অবনতি ও দুর্ব্বলতার কারণ অনুসন্ধান ও তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা এবং সমাজকে উন্নত ও শক্তিশালী করিবার উপায় নির্দ্ধারণ ও অবলম্বন।

যে কয়জন মণীষী ডাঃ মৈত্র প্রতিষ্ঠিত দেশের এই মহামঙ্গলকর অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার কথা অগ্রেই বলিয়াছি। এখন উদ্বোধনে উপস্থিত সুধীমণ্ডলী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনের মাত্র নাম উল্লেখ করিয়া সভার কথা শেষ করিব। মাননীয় স্যার এস্ পি সিংহ (পরে লর্ড সিংহ), শ্রীযুক্ত এস্ আর দাস, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ পাল, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য; ডাঃ হরিধন দত্ত, ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ, রেভারেণ্ড বি এ নাগ, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সেদিন সভাস্থলে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র কর্তৃক "বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী"র প্রতিষ্ঠায় সে-সময় বাঙ্গলা দেশে দেশ-সেবার ক্ষেত্রে বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। দেশের জনসাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সকলেই ইহার শুভ কামনা করেন। উদ্বোধনে একমাসের মধ্যেই হিতসাধন মণ্ডলীর সভ্যগণের একটি সাধারণ সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত কমিটি ও কর্ম্মচারীগণ মনোনীত হন।

সভাপতি—মাননীয় স্যার বিজয়চন্দ্র মহতাব, মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, বর্ধমান।

সহঃসভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধনাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।

কার্য্যনির্বাহক সভার সদস্যগণ—মাননীয় স্যার সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ, শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, মাননীয় ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ হরিধন দত্ত, ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসু।

সম্পাদক—ডাঃ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র।

পরামর্শ সভায় ছিলেন—মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় সৈয়দ হাসান ইমাম, নবাব সিরাজুল ইসলাম, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ ডাঃ চুণীলাল বসু প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

পরে পরামর্শ-সভায় কলিকাতার লর্ড বিশফ, রেভারেণ্ড অনাগারিক ধর্ম্মপাল, মাননীয় স্যার আব্দুর রহিম, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লা প্রভৃতিও যোগদান করেন।

ডক্টর কালিদাস নাগ অন্যতম সহকারী সম্পাদক মনোনীত হইয়াছিলেন।

মোট কথা, অক্লান্ত কর্ম্মী ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ নব-প্রতিষ্ঠিত "বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী"র প্রতি তৎকালীন বঙ্গের প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরই সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মস্থল মেও হাসপাতালেই মণ্ডলীর প্রথম সম্পাদকীয় কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল।

দেশ সেবার এই বিরাট প্রচেষ্টা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রায় দুই বৎসরকাল প্রস্তুতির সমাধানে কাটিয়া যায়। কার্য্যালয় ৩নং বিডন ষ্ট্রীটে ডাঃ মৈত্রের আবাসে স্থানান্তরিত হয়।

সমাজ-সেবার প্রধাণতঃ দুইটি দিক। একটি রিলিফ বা সঙ্কটত্রাণ ও অপরটি কনষ্ট্রাক্টিভ বা সংগঠন। ১৯১৭ হইতে ১৯২২ এই পাঁচ বৎসর উত্তরবঙ্গে বন্যা. পূর্ব্ববঙ্গে সাইক্লোন, উত্তরবঙ্গে দ্বিতীয়বার বন্যা, বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ, ব্রাহ্মণবেঁড়িয়ায় বন্যা, বীরভূমে বন্যা, মেদিনীপুরে বন্যা, পুরীতে দুর্ভিক্ষ, বোলপুরে অগ্নিকান্ড, ফরিদপুরে দুর্গতদের ত্রাণ ইত্যাদিতে বঙ্গীয় হিতসাধন মন্ডলী অক্লান্তভাবে সেবা করিয়া থাকে। কিন্তু এই সকল সেবা-কার্য্যকে দ্বিজেন্দ্রনাথ আদর্শ সেবা বলিয়া মনে করেন নাই।

পূর্ব্বোক্ত সঙ্কটত্রাণ কার্য্যসমূহের পর ডাঃ মৈত্র সংগঠন কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া, ৭০নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ভবনে কার্য্যালয় স্থানান্তরিত করেন। এইখানেই প্রথম শিল্পশিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। জনশিক্ষার (বয়স্কদের শিক্ষা) ব্যবস্থাও এখানে করা হয়। এই সময় ডাঃ মৈত্র বাংলার গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে লোকশিক্ষা প্রচার কল্পে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সেবামূলক অসংখ্য বক্তৃতা (ছায়াচিত্র সহযোগে) প্রদান করেন।

১৯৩১ সালে রাজারবাজারে কলিকাতা কর্পোরেশন প্রদত্ত একখন্ড জমিতে বঙ্গীয় হিতসাধন মন্ডলীর প্রথম নিজস্ব ভবন নির্ম্মিত হয়। সাধারণ প্রদত্ত চাঁদা ব্যতীত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে এই জন্য আট হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছিল। তিনি স্বরচিত "ফাল্গুনী" নাটকের প্রথম অভিনয় লব্ধ সমস্ত অর্থই মন্ডলীকে দান করেন। ১/৬, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটস্থ এই ত্রিতল ভবনটী নির্ম্মাণে বিশ হাজার টাকা ব্যয় হয়, ইহার জন্য ডাঃ মৈত্রকেও অনেক টাকা দিতে হইয়াছিল। পরে চারিতলার অংশটি তিনি সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়েই নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বাড়িটীর নামকরণ হয় "জগত্তারিণী হোম"—ডাঃ মৈত্রের মাতার নামে। পিতৃদেবের স্মৃতিরক্ষাকল্পে নীচের সুবৃহৎ হলটীর নাম দেওয়া হয়—"লোকনাথ হল"।

লোকনাথ হলে শিক্ষামূলক স্থায়ী প্রদর্শনী এবং এক-তলার অন্য অংশে বস্তীবাসীদের কল্যানার্থে 'মেটারনিটি ও চাইল্ড ওয়েলফেয়ার ক্লিনিক' খোলা হয়। দ্বিতলে ইন্ডাষ্ট্রিয়েল স্কুল (চরকা, তাঁত, বেতের ও চামড়ার কাজ এবং অন্যান্য কুটীর-শিল্প শিক্ষার জন্য) স্থাপনা করা হয়। ডাঃ মৈত্র এইখানেই নারীদের জন্য 'জুনিয়ার ট্রেনিং' শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করেন। ত্রিতলে ছাত্রাবাস স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র সমাজ বিজ্ঞান বা 'Social Science' পাঠ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই এখানে স্থানলাভ করেন। পঁচিশ জনের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

গত দুর্ভিক্ষের সময় গভর্ণমেন্টের অনুমোদনে অর-ফ্যানেজ ও ওয়ার্কার্স্' ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয়। পথ হইতে অনাথ বালক-বালিকাদের আনিয়া কেবল খাওয়া-পরা দেওয়া নয়, অভিজ্ঞ লোকেদের দ্বারা তাহাদের মানুষ করারও ব্যবস্থা করা হয়। বাঙ্গলাদেশের বিভিন্ন স্থানের অনাথ-আশ্রমে আজও এখানকার শিক্ষিতা মহিলা সেবিকারা দায়িত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত আছেন।

১৯৪৩ সালে ডাঃ মৈত্র স্ত্রী-শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন এবং ভবানীপুরে নিজ বাটীতে "শ্রীনন্দা" বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। কলিকাতার বহু বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী তাঁহার এই কার্য্যে বিশেষ সহায়ক ছিলেন। এই বিদ্যা-লয়ের উপযোগিতা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে কার্য্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়।

ঐ সালে একই কারণে রাজারবাজারের বাড়ি পরিত্যাগ করিতে হয় এবং সমাজ-সেবার সমস্ত কাজ বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় ডাঃ মৈত্র নিজেও পুনঃ পুনঃ পেটের বেদনায় আক্রান্ত হইতে থাকেন এবং কিছুকাল তাঁহাকে হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

১৯৪৮ সালের শেষভাগে ডাঃ মৈত্র আমেরিকায় যাইবার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে ঐ বেদ-নার জন্যই তাঁহাকে যাত্রা স্থগিত রাখিতে হয়। যাত্রা ব্যবস্থার প্রাক্কালে ডাঃ মৈত্র সমাজ-সেবা কার্য্যের সমস্ত ভার শ্রীযুক্ত অমল হোমের উপর অর্পণ করেন।

১৯৪৯ সালের ১১ই জানুয়ারী মারাত্মক 'থ্রম্বোসিস্' রোগে ডাঃ মৈত্র প্রথম আক্রান্ত হন। ইহার পর হইতে তাঁহাকে অতি সাবধানে অধিকাংশ সময় শয্যাশায়ী থাকিয়া কাটাইতে হয়। কিন্তু সামান্য একটু ভাল বোধ করিলেই তিনি পুত্রের সাহায্যে সামাজিক ও সাহিত্যিক অনুষ্ঠানে যোগদান হইতে নিজেকে বঞ্চিত করেন নাই। শেষবার আক্রমণের ফলে ২৬শে নভেম্বর ১৯৫০ সালে তিনি দেহ-ত্যাগ করেন।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

চতুর্থ অঙ্ক

[মহিমের বাড়ীর ড্রইং রুম। গৌরী ও আনন্দ আসীন।]

আনন্দ—মাকে মেনে চলার আগ্রহ ওর অসীম। নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও তা গ্রহণ করেছে। বাবার ইচ্ছা তামিল করার চেয়েও মায়ের হুকুম অমান্য করতে ওর বেশি সঙ্কোচ।

গৌরী—আমি তাকে বুঝিয়ে দেবো, বাপ মা আত্মীয় স্বজন সবার উপর যুক্তি ও বুদ্ধির স্থান। দেহের চেয়েও মনের দাবি বেশি।

আনন্দ—তোমার জামাই হবার জন্য রজত তো ক্ষেপে গেছে।

গৌরী—অথচ আমাকে ও চিরদিন অবহেলা করে এসেছে। আমি লেখিকা, এ জেনেও ও কোনদিন আমার লেখা সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ করে নি।

আনন্দ—কিন্তু ছেলেটি ভাল মা।

গৌরী—তার যে তোর প্রতি একটা টান আছে এ আমি লক্ষ্য করেছি। তবুও ওকে আমি বরদাস্ত করতে পারি না। তা ছাড়া, চালচুলো নেই, কি সামান্য কাজ করে।

(অজ্ঞাতে রজতের প্রবেশ ও অন্তরালে অবস্থান)

আনন্দ—ওই লোকটা রাণুর স্বামী হবে, এ আমি কোন মতেই বরদাস্ত করতে পারব না। তোমার প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধার ভাব পাই নি কখনও ওর মধ্যে।

গৌরী—একটা আহাম্মক!

আনন্দ—তোমার সম্বন্ধে যখনই কোন প্রশংসাসূচক আলোচনা হয়েছে, ও একেবারে বরফের মত কঠিন হয়ে গেছে।

গৌরী—একেবারে অভদ্র।

আনন্দ—অন্তত বিশ বার আমি তোমার কবিতাগুলো তাকে পড়ে শুনিয়েছি। যে কবিতা নাকি কুমারশঙ্কর পর্য্যন্ত এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন তা ওর ভাল লাগে না।

গৌরী—সব কোথাকার!

আনন্দ—এ নিয়ে আমার ওর সঙ্গে অনেক কথা কাটা-কাটি হয়েছে। আর তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না মা, কি অসভ্য—

(রজত এগিয়ে এসে)

রজত—সত্যি কথা আপনার কাছে আশা করি। কি ক্ষতি করেছি আমি, কি অপরাধ আমার? এই যে আপনি মা'র কাছে আমার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে চলেছেন, বলুন আপনার রাগ কিসের? আপনার মা-ই না হয় এর বিচার করুন।

আনন্দ—রাগ কিসের? জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা হচ্ছে না তোমার? নিজেই ভেবে দেখ দেখি।

(নিঃশব্দে গৌরী বেরিয়ে গেল)

প্রথম প্রেমের যে আবিষ্কার, সেই তো সত্যি। একটু অসুবিধা হলেই প্রেমের পাত্রী পরিবর্তন করার চেয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করা ভালো নয় কি? প্রেমের মর্যাদা যে রক্ষা করতে চায় না, সে কি মানুষ, না আর কিছু!

রজত—আপনি আমাকে অকারণ গাল দিচ্ছেন। আপনার মিথ্যে আদর্শবাদের জন্যই কি আমি একাজ করতে বাধ্য হই নি? এর জন্য যদি কারুর অপরাধ থাকে তো সে আপনার। আপনার মোহে আমি দু বছর দগ্ধ হয়েছি। হৃদয় বিলিয়ে দিয়েছি আপনাকে—কিন্তু ফল কি হয়েছে তাতে? আমার প্রতি আপনার বিদ্বেষই বেড়েছে। আপনি নিজে যা গ্রহণ করতে রাজী হন নি, তা যদি আমি আর কাউকে দিয়ে থাকি, তা হলে তা কি আমার চপলতা, না আপনার ঔদ্ধত্য? আমি আপনাকে ত্যাগ করেছি, না আপনি আমাকে তাড়িয়েছেন?

আনু—তোমার দৃষ্টিভঙ্গী আর আমার দৃষ্টিভঙ্গী যদি এক না হয়, তা কি আমার ঔদ্ধত্য? হাজার রকম বন্ধন, বিবাহও তার আনুষঙ্গিক—এই সব স্থূল দেনা-পাওনার হিসেব না থাকলে তোমার প্রেম মরে যায়, সেই বিকৃত রুচির বিরোধিতা করে আমি যদি প্রেমের প্রকৃত মাধুর্য্য রক্ষা করে থাকি, তা কি আমার অপরাধ? আমার যে প্রেম তাতে ইন্দ্রিয়ের ঠাঁই নেই, অদৃশ্য শিক্ষা অন্তরে অন্তরে বন্ধন সৃষ্টি করে। আর সব কিছু সেখানে অবান্তর। সে প্রেমের শিখা স্বর্গের দীপশিখার মত স্বচ্ছ ও পবিত্র। তার প্রকাশ শুধু নিষ্পাপ দীর্ঘনিশ্বাসে। নোংরামির সেখানে ঠাঁই নেই। সে প্রেমের একমাত্র লক্ষ্যই হল প্রেম, আর কিছু নয়। মনই সেখানে সব, দেহের অস্তিত্ব সেখানে ভুলে যেতে হবে।

রজত—কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য কি জানেন? আমি সব সময়ই অনুভব করি যে আমার মনের সঙ্গে একটা দেহ আছে। আর দেহটাকে বাদ দিয়ে মনটার থাকার ঠাঁই নেই কোন। এ দুটিকে আলাদা করে দেখার কৌশলটুকু আমার জানা নেই। ভগবান আমাকে দার্শনিক দৃষ্টি দেন নি, হয় তো আপনার কথাই ঠিক। কেবল মন নিয়ে যে প্রেম, স্থূল ইন্দ্রিয়ের দেনাপাওনা-বর্জিত হৃদয়ের যে মিলন তার চেয়ে মধুর এবং পবিত্র হয় তো আর কিছুই নেই, কিন্তু আমার বুদ্ধি যদি আপনার মত সূক্ষ্ম না হয়, রুচি যদি হয় একটু স্থূল, আমি যদি আমার সমগ্রতা দিয়ে সমগ্র মানুষটিকে ভালবাসতে চাই, তাহলে তা এমন কিছু অপরাধ নয়। আপনাকে অসম্মান করতে চাইনে। তবুও একথা মানতেই হবে যে, দুনিয়ায় আমার প্রেমই প্রচলিত রীতি। মধুর এবং সম্মানজনক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য বিবাহই একমাত্র সর্বজন স্বীকৃত ব্যবস্থা।

আনু—(নিরুত্তর)

রজত—কি, কথা বলছেন না যে?

আনু—বেশ। তোমার স্থূল কামনা যদি আত্মতৃপ্তির জন্যই ব্যস্ত হয়ে থাকে, আমার কথা যদি না-ই মানা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়, তোমার অন্তরের একনিষ্ঠতা রক্ষার প্রয়োজনে যদি জৈব বন্ধনের প্রয়োজন থাকেই, বিবাহ যদি অপরিহার্য হয়ে ওঠে, মা'র নির্দেশ পেলে আমি বরং তাতেই রাজী হব।

রজত—বড় দেরী হয়ে গেছে না? আর একজন সে শূন্য আসন ইতিমধ্যেই দখল করে বসে গেছে। আপনার নিষ্ঠুর আঘাতে আমি যখন নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি তখন যে হৃদয় আমাকে সস্নেহে প্রশ্রয় দিয়েছে তার প্রতিদান কি আমি এমনি করেই দিতে পারি?

আনু—কিন্তু তুমি স্বপ্নেও ভেবো না, তোমার অপর বিবাহে মা মত দেবেন। জেনে রেখো যে রাণুর জন্য আর একজন পাত্র তৈরী। (গৌরীর পুনঃপ্রবেশ)

রজত—আমাকে যত অপমান করতে হয় করুন কিন্তু দোহাই আপনাদের, ওই কুমারশঙ্করের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড়ানর অপমান থেকে আমাকে রেহাই দিন। বিদ্যা বুদ্ধির প্রতি আপনাদের আগ্রহ জানি। সেই জন্যই হয় তো আপনারা আমাকে ঠেলে দিতে চান। কিন্তু আমার বদলে আসবে কুমারশঙ্কর? ধাপ্পা দিয়ে অনেকেই মিথ্যে পাণ্ডিত্য ও বাহবা নিয়ে থাকে কিন্তু কুমারশঙ্কর এবাড়ীর বাইরে আর কাউকে ধাপ্পা দিতে পারে নি। সমাজে ও ন্যায্য অবহেলাই পেয়ে থাকে। কিন্তু আমার আশ্চর্য লাগে কি জানেন, যে কবিতা আপনার নিজের রচনা হলেও আপনি নিজের বলতে লজ্জিত হতেন, সেই-সব ওছা পদ্যগুলিকে কি বলে আপনারা মাথায় করে নাচেন?

গৌরী— তার কবিতা সম্বন্ধে তোমার ও আমাদের মতের প্রভেদ হলেই তাঁর কবিতা বাতিল হয়ে যায় না।

(কুমারশঙ্করের প্রবেশ)

কুমার—(গৌরীকে) আপনাকে একটা দারুণ খবর দিতে এসেছি; আমরা সকলে একটা ভীষণ দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গিয়েছি। বহু দূরলোক থেকে একটি গ্রহ কেন্দ্রচ্যুত হয়ে

আমাদের পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছিল, একটুর জন্যে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। এ দুটির মধ্যে যদি সংঘর্ষ ঘটত তবে আমাদের পৃথিবীটা কাচের মত টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যেত।

গৌরী—এ আলোচনা অন্য সময়ের জন্য থাক। এই যে এঁকে (রজতকে) দেখছ ইনি এতটুকু রস পাবেন না এতে। অজ্ঞতা এবং মূর্খতাই এঁর গর্ব। জ্ঞান এবং বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করাই এঁর আনন্দ।

রজত—আমি শুধু সেই জ্ঞান বুদ্ধিকেই ঘৃণা করি যা মানুষের ক্ষতি করে। জ্ঞান ও বুদ্ধির মূল্য কে অস্বীকার করতে পারে? তবে এক শ্রেণীর লোকের মত পণ্ডিত হওয়ার চাইতে মূর্খ হওয়া আমি ভাল মনে করি।

কুমার—আমি আপনার কথা মানতে পারলাম না। বিদ্যায় কখনও কারুর ক্ষতি হতে পারে না।

রজত—আমি কিন্তু দেখেছি বিদ্যার ঠেলায় অনেক হস্তিমূর্খ তৈরি হয়।

কুমার—এটা আপনার মনগড়া কথা।

রজত—প্রমাণ আমি দিতে পারি—যুক্তি দিয়ে বোঝাতে না পারলেও উদাহরণের অভাব নেই।

কুমার—আপনি যাই বলুন না কেন, আপনার কথা প্রমাণ হবে না।

রজত—উদাহরণের জন্যে আমাকে কিন্তু বেশী দূর যেতে হবে না।

কুমার—আমি তো দেখতে পাচ্ছি না।

রজত—আমি কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

কুমার—আমি চিরদিন বিশ্বাস করে এসেছি, অজ্ঞতাই মানুষকে নির্বোধ করে।

আনু—আমিও।

গৌরী—প্রমাণ রয়েছে সামনে (রজতকে দেখিয়ে)।

রজত—আমি মূর্খ ঠিকই, কিন্তু অজ্ঞমূর্খের চেয়ে পণ্ডিতমূর্খ ঢের বেশী মারাত্মক।

কুমার—এ আপনার কোন্ দেশী কথা হল? অজ্ঞ মূর্খ তো পরস্পর প্রতিশব্দ।

গৌরী—ভাষাজ্ঞানটুকুও নেই, অথচ কথা বলতে চায়।

রজত—বেশ, কথাটা আমি একটু ঘুরিয়ে বলি, অর্থাৎ মূর্খ এবং পণ্ডিতম্মন্য।

কুমার—একজনের মূর্খতা সহজাত।

রজত—আর একজনের বেলায় কেতাবীবিদ্যায় মূর্খতা বাড়ে—এই তো?

আনু—কিন্তু পড়াশুনার কোন দাম নেই বলছ তুমি?

কুমার—অদ্ভুত কথা সব!

রজত—পড়ার দাম থাকবে না কেন? মূর্খের বেয়াদবি বাড়ায়।

গৌরী—বেয়াদবি করছ তুমি।

কুমার—অজ্ঞতার প্রতি এঁর যেন একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ।

রজত—কিছু কিছু দেখেছি কি-না, তাই।

কুমার—কিন্তু সেই সব পণ্ডিতরাই যদি বিচারক হয়।

আনু—আমি বলতে চাই—আমার মত মূর্খ লোকের বিরুদ্ধে এতবড় একজন বিজ্ঞ প্রতিদ্বন্দ্বী একাই তো একশো। আপনার সাহায্যে ওঁর কোন প্রয়োজন আছে কি?

গৌরী—কিন্তু তুমি যে ধরণের কথা ব্যবহার করছ—

রজত—আপনারা সবাই একদল হলে আমি কি করে পারব বলুন?

গৌরী—তা বলে তুমি ওঁকে আঘাত দিয়ে কথা বলবে?

রজত—কথায় ওঁর জুড়ি লাখে একটা খুঁজলে মিলবে না। আমি ওঁকে আঘাত দিব? তা ছাড়া অনেক কঠিন আঘাতে ইনি অভ্যস্ত এবং হাসিমুখেই তা সহ্য করে থাকেন।

দেখছিস আনু, হিংসের জ্বলে মানুষ কেমন মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলে? গুণী ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই বিষোদ্গার আমি কিছুতেই সহ্য করব না। (বটুকে) তোমার মনিবকে গিয়ে বল যে, তাঁর উপদেশকে আমি কতটা দাম দি তার প্রমাণ হিসেবে আজই আমার মেয়ের বিয়ের পাকাপাকি ব্যবস্থা করে ফেলব। (আনুকে) আনু, তুমি পুরুত মশাইকে ডাকিয়ে পাঠাও, আর তোমার বোনকেও তৈরী হতে বল। আজই আশীর্বাদ সেরে ফেলব।

আনু—বোনকে খবর দেওয়ার ভার রজতই নিতে পারবে। শুধু ছুটে গিয়ে তাকে খবর দিয়েই ক্ষান্ত হবে না সে, তোমার মতের বিরোধিতা করবার জন্যে তাকে উসকিয়েও দেবে।

কুমার—ও'র সঙ্গে আমি একাই যুদ্ধ করব—অজ্ঞতার পক্ষে অস্ত্র ধারণ করে যদি ইনি অজ্ঞতা দেখান, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

রজত—আমার উপর একটু বেশী অবিচার করে ফেলছেন। তর্কযুদ্ধে নিজেরা অসুবিধায় পড়লে পাণ্ডিতের দল বিপক্ষের অজ্ঞতাকেই দায়ী করে থাকেন। কিন্তু আমার নিবেদন, আমি যত মূর্খই হই না কেন, সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে সব কিছু বিচার করি। আর রুচি আমার যত খারাপই হোক না কেন, পণ্ডিতম্মন্যদের রুচির কাছে আমার রুচি লজ্জা পায়।

কুমার—তা পাবেই তো। সুরুচি তৈরী হয়নি তো কোনদিন।

রজত—আমার মধ্যে কুরুচির সন্ধানটা পেলেন কোথায়?

কুমার—দেখুন, সব পাণ্ডিতই পাণ্ডিত্য জাহির করে বেড়ান না। এই ধরুন মহিমারঞ্জনবাবু, সত্যকিঙ্করবাবু, এ'দের পাণ্ডিত্য দেশের গৌরব। কিন্তু তাঁদের কথা কে জানে বলুন তো?

রজত—আপনার রাগের কারণ বুঝলাম। তবুও আপনার বিনয় বলতে হবে যে তাঁদের নামের সঙ্গে আপনার নিজের নাম যোগ করে দেন নি। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞসা করতে পারি কি, এ'দের পাণ্ডিত্য দেশের কোন কাজে আসছে? এ'দের বইগুলি সরকার থেকে ছেপে দেওয়া উচিত, আর সরকার থেকে এ'দের মাসোহারাও দেওয়া উচিত এমন দাবি করবার মত পণ্ডিতমূর্খ এদেশে নেই, তা নয়, কিন্তু বলুন তো, যে কথা বহু লোকে ইতিপূর্বে বহুবার বলেছেন সেই কথাই ইনিয়ে বিনিয়ে বলে দেশের কোন্ কাজটা করছেন তাঁরা? পরের পর রাত জেগে মনুসংহিতা আর উপনিষদের পোকা বেছে কি দিয়েছেন তাঁরা সমাজকে? জ্ঞানের সঙ্গে যাঁরা মত্ত, শুধু গোলমেলে কথা কওয়া ছাড়া আর কি সৎ কাজ হতে পারে তাঁদের দিয়ে? সাধারণ বুদ্ধিটুকুও খুঁজে পাওয়া যায় না তাদের কথায়, অথচ প্রকৃত জ্ঞান এবং বুদ্ধিকে শ্লেষ করাতেই তাঁদের আনন্দ।

কুমার—আপনার সব লম্বা লম্বা বক্তৃতা চুপ হয়ে যাবে, আমি কাল রাত্রে যে শ্লেষাত্মক কবিতাটি লিখেছি সেটি যদি আপনি শোনেন।

রজত—কোন শখ নেই।

গৌরী—আমরা নিশ্চয় শুনব সে কবিতা।

কুমার—ভুলে ফেলে এসেছি, এখুনি গিয়ে নিয়ে আসছি। গাড়িতে যাব আর আসব। (প্রস্থান)

(বটুর প্রবেশ)

বটু—আমার বাবু আপনাকে এ চিঠিখানা পাঠিয়েছেন।

গৌরী—তা বলে তুমি সোজা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে আসবে?

বটু—ঘাট হয়েছে মা-ঠাকরুণ।

গৌরী—(পত্র পাঠ) কুমারশঙ্কর দম্ভভরে বলিয়া বেড়াইতেছেন যে তাঁহাকে আপনি জামাতৃপদে বরণ করিতেছেন। আপনাকে অবহিত করা কর্তব্য মনে করিতেছি যে, তাঁহার দার্শনিক আবরণের পশ্চাতে যাহা রহিয়াছে তাহা আপনার বিষয়ের প্রতি লোভ। আমি সম্প্রতি তাঁহার সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছি, আগামী সংখ্যার 'আর্য-সভ্যতা' মাসিকে সেটি না পড়া পর্যন্ত যদি আপনি এ বিবাহ স্থগিত রাখেন, তাহে আপনার পরম মঙ্গল হইবে। সেই প্রবন্ধের মধ্যে আমি কুমারশঙ্করের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করিয়াছি। আপাতত আমি আপনাকে বঙ্গভাষায় কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ পাঠাইলাম, তাহার কোন্ কোন্ অংশ চুরি করিয়া কুমারশঙ্কর আপনাদের নিকট কবিখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তাহা গ্রন্থগুলিতে চিহ্নিত করিয়া দেওয়া আছে।"

গৌরী—আমি দেখে নেবো, তার ঘাড়ে কটা মাথা। আমি নিজেই যাচ্ছি। (প্রস্থান)

আনু—বুক ফেটে যাচ্ছে না? যা ভেবেছিলে সব ভেস্তে গেল।

রজত—তার জন্যে আপনার যাতে দুঃখ করতে না হয়, সে ব্যবস্থা আমি করছি।

আনু—কিন্তু দুঃখের বিষয়, সুবিধে বিশেষ কিছুই হবে না।

রজত—আমি বলছি, আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই।

আনু—বটে!

রজত—আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত, তা ছাড়া আপনার উপরও ভরসা করি কিছুটা।

আনু—তাই বুঝি?

রজত—সে উপকারের মূল্য আমি দেবো।

আনন্দ—তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করি নে, ঠগ কোথাকার! (প্রস্থান)

(মহিম ও অসীমের প্রবেশ)

মহিম—এই যে রজত! কি খবর?

রজত—খবর আপনি জানেন না? কুমারশঙ্করের সঙ্গে রাণুর বিয়ের আশীর্বাদ করবার জন্যে পুরুত ঠাকুরকে ডেকে পাঠান হল?

মহিম—ব্যাপার কি হে অসীম?

অসীম—বৌদি ক্ষেপে গেলেন দেখছি।

রজত—আজ সন্ধ্যেয়ই, আশীর্বাদ সেরে ফেলবেন বলেছেন।

মহিম—আজই সন্ধ্যেয়?

রজত—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মহিম—আমিও ভেস্তে দিচ্ছি সব। দেখি কতখানি জারিজুড়ি তার খাটে। তুমি চলে যেয়ো না রজত। আশীর্বাদ যদি হয়ই আজ, সে পাত্র তুমি।

অসীম—বৌদি তো পুরুত ডাকতে পাঠিয়েছেন।

মহিম—তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন, আর আমি নিজে গিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসছি।

রজত—তা ছাড়া, দুজনে মিলে রাণুকে কত করাণো হচ্ছে।

মহিম—আমি কেউ নই! রাণু! রাণু!

[ভিতর থেকে "যাই বাবা!" বলে রাণুর প্রবেশ]

আমি হুকুম দিচ্ছি—সংসারের কর্তা হিসেবে—রজতের সঙ্গে তোর বিয়ে। এ বাড়ীতে আমার উপর হুকুম দেওয়ার মালিক কে আছে, আজ তা প্রমাণ হয়ে যাক। আমরা এখ্‌খুনি ঘুরে আসছি। রজত, তুমি চলে যেয়ো না। আর তুইও যা হুট করে কিছু করে বসিস নে। অসীম, আমার সঙ্গে এসো। (উভয়ের প্রস্থান)

রজত—বাবা যতই ভরসা দিন, তোমার উপরই সব নির্ভর করছে।

রাণু—সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

রজত—তা হলে আর আমি কোন ভয় করি নে।

রাণু—আমি কিছুতেই পিছ-পা হব না।

রজত—ঈশ্বর তোমাকে বল দিন।

[আগামীবারে সমাপ্য

প্রকাশ

অনাথ চট্টোপাধ্যায়

রাত্তিরের বিছানায় শুয়ে শুয়ে শোনা গল্পটির
রহস্যের জোটগুলো খুলে গেল কিছুটা আগেই।
পরিচিত পথ শেষ—শেষ হয় বাঁধন মাটির
নিশ্চয়ের বিশ্বাসেই বলে উঠি— আর ভয় নেই।
এই মন রাজকন্যা মরে আছে কাজের তাড়ায়
রুটিন-রুপোব কাঠি-দেহ ছুঁয়ে পড়ে আছে পাশে।

দিন তাই একঘেয়ে রঙ চটা ফ্যাকাশে দেখায়
বোশেখের রোদ জ্বলে আধপোড়া অগণন ঘাসে।
বহু রাজপুত্তুরেরা ছুটে যায় যেই পায় ফাঁক
খোঁজ পড়ে যুগে যুগে হারানো সে রুপোর কাঠির।
আসে দেখি লোকালয়ে দুরান্তের অহোরহ ডাক
জাহাজের ধুকধুকি হয়ে ওঠে চলায় অধীর।

তারপর একদিন জেগে ওঠে প্রায় মরা মন
দুটি হাত এক হয়, ভাল লাগে জীবন তখন।

কাঁকড়া বিছে

শ্রীসুরেশ চন্দ্র ঘোষ

প্রায় ৩৫০ প্রকার কাঁকড়া বিছে পৃথিবীতে রহিয়াছে। উষ্ণ এবং নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলে ইহারা বাস করে। নিউজীল্যান্ডে এই প্রাণী আদৌ নাই। ভারতবর্ষে প্রায় ৮৫ রকম কাঁকড়া বিছে দেখা যায়। 'বুথাস টামুলাস' বা সাধারণ লাল কাঁকড়া বিছেই এ দেশে বেশী। সিন্ধু এবং পাঞ্জাবের বিরল বারিপাত শুষ্ক অঞ্চলসমূহে এবং উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ ভাবতের প্রায় সর্বত্রই ইহাদিগকে দেখা যায়। কেবল দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণতম অঞ্চলে এই প্রাণী দৃষ্ট হয় না। সাধারণ লাল কাঁকড়া বিছের দেহকান্ডের বর্ণ লোহিতাভ বাদামী, পুচ্ছ এবং পাগুলি পীতাভ। মনুষ্যের বাসস্থানে ইহারা প্রায়ই প্রবেশ করে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাদিগকে সংক্ষেপে 'বুথাস' আখ্যায় অভিহিত করেন। ভূমধ্যসাগরের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হইতে চীন পর্যন্ত প্রসারিত প্রকান্ড

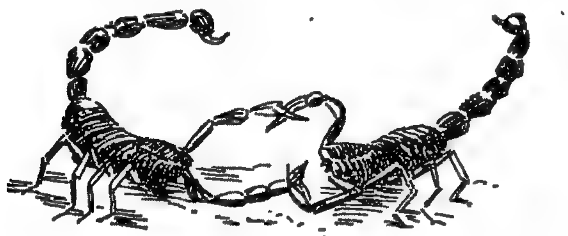

পুরুষ ও স্ত্রী কাঁকড়া বিছের পরস্পর প্রণয়-নিবেদনের বিচিত্র ভঙ্গী। এই সময় উভয়ে এই বিচিত্র ভঙ্গীতে নৃত্য করে।

ভূখন্ডের প্রায় সর্বত্রই 'বুথাস' জাতীয় নানাপ্রকার কাঁকড়া বিছে বাস করে।

সাধারণ লাল কাঁকড়া বিছে ছাড়া ভারতবর্ষে আর এক শ্রেণীর এই প্রাণী দেখা যায় যাহাদিগকে সাধারণ পাহাড়ী কাঁকড়া বিছে বলা চলে। পাহাড়পূর্ণ অঞ্চলেই ইহারা অধিক। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাদিগকে 'প্যালামনিয়াস সোয়ামেরদামি' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। ইহাদের জ্ঞাতিস্বরূপ আফ্রিকাবাসী এক প্রকার কাঁকড়া বিছেকে বাদ দিলে সাধারণ পাহাড়ী কাঁকড়া বিছেরাই পৃথিবীর বৃহত্তম কাঁকড়া বিছেব পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়ে। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ এবং ইহাদের দেহে একপ্রকার লোম বিদ্যমান। ইহাদের দেহের দৈর্ঘ্য ৮ ইঞ্চি পর্যন্ত হইতে দেখা যায়। ভারতবর্ষ এবং সিংহলের সর্বত্রই ইহারা দৃষ্ট হয়। অবশ্য পার্বত্য প্রদেশে ইহাদের সংখ্যা অনেক অধিক। সমতল বাঙ্গালাদেশে এই জাতীয় কাঁকড়া বিছে নাই বলিলেই হয়, অথচ বাঙ্গালার পার্শ্ববর্তী ছোটনাগপুর অঞ্চলে ইহারা প্রচুর। এই জাতীয় কাঁকড়া বিছের প্রত্যেকটিই কৃষ্ণকায় নহে। ইহাদের ভিতর কৃষ্ণাভ নীল এবং কৃষ্ণাভ বাদামী শ্রেণীর বৃশ্চিকও বিদ্যমান আছে।

সাধারণ লাল কাঁকড়াবিছেরা সাধারণতঃ প্রকান্ড প্রকান্ড প্রস্তরখন্ড বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাসমূহের তলদেশে পিপীলিকা প্রভৃতি ভূগর্ভবাসী প্রাণীদের প্রতিবেশীরূপে বাস করিয়া থাকে। যে অঞ্চলে প্রস্তর বা শিলাখন্ড নাই সেখানে বালুকা বা মৃত্তিকার নিম্নে ইহারা গর্ত খুঁড়িয়া অবস্থান করে। প্রস্তরপূর্ণ প্রদেশে ইহাদের বক্ষে বাস করা অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক। যেখানে শুধু বালুকা বা মৃত্তিকা সেখানেই গর্ত খুঁড়িয়া আশ্রয় প্রস্তুত করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সিন্ধু বা রাজপুতানার বালুকাপূর্ণ মরুপ্রান্তরে উপরকার

কাঁকড়া বিছে আড়শুলা ধরিয়াছে

বালুকাগুলিকে সরাইয়া এক প্রকার আশ্রয়স্থল তাহারা পা ও পুচ্ছ এবং সাঁড়াসিবৎ দাঁড়ার সাহায্যে যেভাবে প্রস্তুত করিয়া লয় তাহা কৌতুকজনক। প্রথম ও চতুর্থ পা জোড়ার উপর উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া, সম্মুখের সাঁড়াসিবৎ দাঁড়া ও পশ্চাতের পুচ্ছের উপর ভর করিয়া, অন্যান্য পাগুলির দ্বারা লাথি মারিয়া বালুকাসমূহকে সরাইয়া অল্পক্ষণের মধ্যে আশ্রয়স্থল প্রস্তুত করার দৃশ্য আমরা দেখিয়াছি। ইন্দুর ও খরগোসেরাও অনেকটা এইরূপ প্রণালীতেই গর্ত প্রস্তুত করিয়া থাকে। গর্ত প্রস্তুত হইবার পর ইহারা দেখে সেখানে

থাকিলে আহার্য্য-প্রাণী বা আক্রমণকারী তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে কি না। কোন বাধা থাকিলে তাহাকেও সে সরাইয়া ফেলে। প্রধানতঃ পুচ্ছের দ্বারা গর্ত্তের চারিদিকে বিরাজিত দৃষ্টিপথের বাধাস্বরূপে বালুকারাশিকে অপসৃত করে। পরে নিজের কর্মশক্তি ও কৌশলে সন্তুষ্ট বৃশ্চিকটি সেই গর্ত্তে সানন্দে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে আরম্ভ করে।

চলিবার সময় লাল কাঁকড়া বিছে এই জাতীয় অন্যান্য শ্রেণীর ন্যায় পায়ের উপর ভর করিয়া উঁচু হইয়া দাঁড়ায় এবং লেজটিকে গুটাইয়া পিঠের উপর রাখে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। তবে যখন দ্রুতবেগে চলিবার দরকার হয় তখন পুচ্ছটিকে পিঠের উপর না রাখিয়া পশ্চাতে লম্বমান বা

সাধারণ লাল কাঁকড়া বিছে

প্রসারিত রাখে। বৃহদাকার কৃষ্ণকায় কাঁকড়া বিছে দেখিতে যতই ভয়ঙ্কর হোক তাহারা সেরূপ দ্রুতগতিতে চলাফেরা করিতে পারে না, একপ্রকার জড়তা তাহাদের স্বভাবে দৃষ্ট হয়। চলিবার সময় তাহাদের পেট প্রায়ই মাটিকে স্পর্শ করিয়া থাকে এবং বৃহৎ পুচ্ছটিকে টানিয়া লইয়া যায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কাঁকড়া বিছে সম্পূর্ণরূপে হিংস্র মাংসাশী প্রাণী। নানা-প্রকার কীট-পতঙ্গ তাহাদের আহার্য্য। বোম্বাই-এর প্রাণি-বিজ্ঞান সমিতি হইতে যে সাময়িক পত্রিকা বাহির হইয়া থাকে তাহাতে কাঁকড়া বিছের ভক্ষ্য প্রাণী শিকার সম্বন্ধে একটি কৌতুকজনক ঘটনা উল্লিখিত রহিয়াছে। লেখক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই বর্ণন করিয়াছেন। একটি উইঢিবির অভ্যন্তর হইতে পক্ষবান শ্বেত পিপীলিকা বা উই দলে দলে বাহির হইয়া আসিবার সময় ঢিবির মুখের চারিপার্শ্বে সজ্জিত সেনাদলের ন্যায় দণ্ডায়মান অনেকগুলি কাঁকড়া বিছের দ্বারা আক্রান্ত ও ভক্ষিত হইতেছিল। লেখক গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন কাঁকড়া বিছের সংখ্যা ২৮টি অপেক্ষা বেশী হইবে, কম নহে। যেটি বৃহত্তম সেটি প্রায় ৮ ইঞ্চি দীর্ঘ। ছোটগুলি এক ইঞ্চি বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী হইবে। উইদের নির্গমণ স্থানের নিকটে আসিয়া সাঁড়াসিবৎ দাঁড়ার দ্বারা উইগুলিকে ধরিয়া ধরিয়া বদনবিবরের ভিতর অতি-দ্রুতগতিতে প্রবেশ করাইতেছিল। এক সঙ্গে কতকগুলিকে ধরিয়া জীবিত অবস্থাতেই মুখের ভিতর ভরিতেছিল। পক্ষবান উইগুলির বাঁচিবার জন্য ব্যর্থ প্রয়াস এই সকল ক্ষুদ্রকায় রাক্ষসের মুখগুলিকে অতি বীভৎস দৃশ্যের অভিনয়ভূমি করিয়া তুলিয়াছিল বলা যায়। উইগুলির নির্গমণ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই রাক্ষসগুলিও একে একে আপন আপন আশ্রয়স্থলে চলিয়া গিয়াছিল।

উক্ত সমিতির যাদুঘরে কয়েকটি বৃহদাকার কৃষ্ণকায় কাঁকড়া বিছে এবং লাল কাঁকড়া বিছেও রক্ষিত ছিল। লাল কাঁকড়া বিছেগুলি আঁড়শুলা ও মক্ষিকা ধরিয়া খাইত। ভোজ্য সম্বন্ধে সকলের রুচি সমান নহে। বিভিন্ন রুচি-সম্পন্ন মানুষের মত কাঁকড়া বিছেরাও বিভিন্ন কীটপতঙ্গ ভক্ষণ করিতে ভালবাসে। কেহ কেহ আঁড়শুলা কিছুতেই খাইবে না, মাকড়সা দেখিবা মাত্র আক্রমণ ও ভক্ষণ করিতে চেষ্টা করিবে। যাদুঘরের কোন কোন কাঁকড়া বিছে কখনও কখনও সম্পূর্ণরূপে প্রায়োপবেশন করিত। কোন ভোজ্যই তখন তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারিত না। কিছুদিন প্রায়োপবেশনের পর কেহ কেহ রাক্ষসী বুভুক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্রকায় স্বজাতীয়-দিগকেই ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইত এবং সক্ষম হইলে খাইয়াও ফেলিত।

আঁড়শুলার মত পক্ষশালী, উড্ডয়নশীল প্রাণী কাঁকড়া-বিছের কবলে পড়া আমাদের বিস্ময় উদ্রিক্ত করিতে পারে। আমরা কাঁকড়া বিছে ও আঁড়শুলা উভয়কে একটা কাঠের বাক্সে রাখিয়া পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারিব, পাখা ও

উড়িবার ক্ষমতা থাকিলেও আঁড়শ্‌লার বুদ্ধি অত্যন্ত অল্প। তাহারা নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই কাঁকড়াবিছের কবলে পতিত হয় সে বিষয়ে আমাদের সংশয় থাকে না। বেকুব আঁড়শ্‌লা কৌতূহলী হইয়া কাঁকড়া বিছের গায়ের উপর গিয়া পড়ে এবং সম্মুখের অনুভবযন্ত্র সুদীর্ঘ শুন্ডদ্বয়ের দ্বারা উহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করে। মাংসাশী কাঁকড়া বিছে এরূপ সুযোগ পরিত্যাগ করিবে কেন? সে তাহার ভয়াবহ বাহুদ্বয়ের দ্বারা আঁড়শ্‌লাকে চাপিয়া ধরে এবং তাহাকে সম্পূর্ণ অসাড় করিবার জন্য পুচ্ছের সূক্ষ্মাগ্র বিষাক্ত হূলটি তাহার অঙ্গে প্রবেশ করাইয়া দেয়। ভোজ্য প্রাণী পিপীলিকা বা উই-এর ন্যায় ক্ষুদ্রকায় হইলে এই বিষাক্ত অস্ত্র ব্যবহার দরকার হয় না। আঁড়শ্‌লা বা ঐরূপ কোন বৃহদাকার কীটকে মৃতপ্রায় করিবার জন্যই ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কীট-পতঙ্গের অনুভবযন্ত্র প্রায়ই মস্তকের উভয় পার্শ্বে সূত্র বা শুন্ডাকারে প্রসারিত থাকে। কাঁকড়া বিছের অনুভবযন্ত্র সেপ্রকার নয়। ইহাদের দেহকান্ড এবং বাহুদ্বয় একপ্রকার লোমে আচ্ছাদিত। এই লোমগুলিই কাঁকড়া বিছের স্পর্শানুভূতির উৎস। দেখিলে লোমগুলিকে অলঙ্কার বলিয়া মনে হইবে কিন্তু তাহা নহে, কাঁকড়া বিছের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে ইহারা পরম-প্রয়োজনীয়। আর এক প্রকার স্পর্শানুভূতিমূলক প্রত্যঙ্গ বৃশ্চিকের দেহে বিদ্যমান আছে। চিরুণীর ন্যায় আকার-বিশিষ্ট এই প্রত্যঙ্গ ইহাদের উদরপ্রদেশের ঊর্ধ্বদেশে অবস্থিত। এই প্রত্যঙ্গের সকলকার্য্য বা রহস্য এখও জানা যায় নাই। তবে প্রাণিতত্ত্ববেত্তা প্রভৃতিদের বিশ্বাস বৃশ্চিকদের যৌন জীবনের সঙ্গেও ইহার সম্পর্ক আছে। পুরুষ কাঁকড়া বিছের দেহে এই প্রত্যঙ্গ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। কোন কোন শ্রেণীর স্ত্রী-বৃশ্চিকদের এই প্রত্যঙ্গ শুধু ক্ষুদ্র নয়, একটু অন্যরকমও বটে।

ভ্রমণ কালে এই প্রত্যঙ্গের দ্বারা ইহারা ভূমির প্রকৃতি অনুভব করিতে পারে বলিয়াও প্রাণিবিজ্ঞানবিদ পন্ডিতরা অনুমান করেন। প্রায় সর্ব্বশ্রেণীর বৃশ্চিকেরাই ইহার সহায়তায় ভূমির প্রকৃতি পরীক্ষা করিতে করিতে ক্রমশঃ আগাইয়া চলে। কৃষ্ণকায় পাহাড়ী কাঁকড়া বিছেদের (হাটিবার সময় যাহাদের উদর প্রায়ই ভূমিস্পর্শ করে)। এই চিরুণীবৎ প্রত্যঙ্গ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও খর্ব্ব। উদরের দ্বারা ভূমির প্রকৃতি অনুভব করিতে পারে বলিয়াই বোধ-হয় তাহাদের এই অনুভবযন্ত্র পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্তির প্রয়োজন হয় নাই। যাহারা সম্পূর্ণরূপে পায়ের উপর ভর করিয়া উঁচু হইয়া চলে তাহাদের এই প্রত্যঙ্গ পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয় এবং উহা প্রায়ই ভূমি স্পর্শ করে।

সম্মুখস্থ সাঁড়াসির ন্যায় বাহুদ্বয় কর্কট বা কাঁকড়ার দাঁড়ার ন্যায় বলিয়াই এই জাতীয় বৃশ্চিকগণ কাঁকড়া বিছে আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে সে বিষয়ে সংসয় নাই। কাঁকড়া বিছের পুরোভাগে প্রসারিত এই সাঁড়াসিবৎ অঙ্গটি সত্য সত্যই সকল প্রকারে বাহুর কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। এই বাহুবৎ অঙ্গের শেষ সন্ধিস্থলটি বিস্তৃত হইয়া ঠিক দুইটি অঙ্গুলি বিশিষ্ট হস্তের আকার ধারণ করিয়াছে বলা যায়। একটি অঙ্গুলি হাতের সহিত এমনভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে যে উহা ইচ্ছানুযায়ী সঞ্চালন করিতে পারে না। অন্য অঙ্গুলিটি ইচ্ছানুসারে সঞ্চালন চলিতে পারে। অঙ্গুলির সাঁড়াসির মত অগ্রভাগটিতে সরু সরু দাঁতের মত প্রত্যঙ্গ থাকায় শস্ত্র হিসাবে উহারা অধিকতর কার্য্যকর ও ভয়ঙ্কর হইয়া পড়িয়াছে। এই সাঁড়াসির দ্বারা ইহারা যাহা চাপিয়া ধরিবে তাহার পক্ষে অব্যাহতি অসম্ভব। বাহুদ্বয়ের সর্ব্ব-নিম্ন সন্ধি বদনবিবরের তন্তুসমূহের সহিত এরূপভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে যে ইহাদের পক্ষে প্রত্যেক ভক্ষ্য প্রাণীকে সাঁড়াসির দ্বারা পিষ্ট করিয়া গলাধঃকরণের উপযোগী করিয়া তুলা সহজ।

কাঁকড়া বিছে যেমন বাহুদ্বয়েব দ্বারা শিকারটিকে চাপিয়া ধরে অমনই পুচ্ছটি তাহাকে সাহায্য করিতে সবেগে উদ্যত হয়। পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায়, উদর প্রদেশই ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া পুচ্ছের আকার পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রত্যেক পুচ্ছে পাঁচটি সন্ধিহূল আছে। এই সন্ধিগুলির জন্য ইহাদের পক্ষে পুচ্ছকে ইচ্ছা মত বেঁকাইয়া উপরে বা পরোভাগে সঞ্চালন করা আদৌ কঠিন নহে। পুচ্ছের সর্ব্ব-শেষ অংশটি কতকটা গোলাকার কৌটা বা থলের মত। এই অংশের প্রান্তটি ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও বক্র হইয়া সেই হলাহল-বর্ষী হূলে পরিণত হইয়াছে যাহার জন্য এই ক্ষুদ্রকায় প্রাণীও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের মনে সুগভীর ভীতির সঞ্চার করিতে সমর্থ হয়। এই গোলাকার আধারের ভিতর দুইটি ত্রিকোণাকৃতি গরলগ্রন্থি বিদ্যমান। গ্রন্থিদ্বয়ের চতুর্দিকে বহুসংখ্যক পৈশিক তন্তু আবরণরূপে বর্তমান। এই গ্রন্থিগুলির আভ্যন্তরীণ কুঞ্চিত প্রাচীরগাত্রে অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কোষগুলির অভ্যন্তরভাগে সেই সুতীব্র বিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে যাহা দষ্ট ব্যক্তির দেহে দুঃসহ যন্ত্রণা জন্মাইতে সক্ষম। দংশন-জনিত যন্ত্রণার তীব্রতার দিক দিয়া বিচার করিলে কাঁকড়া-বিছেকে বিষধর সর্পের পরেই স্থান দিতে হইবে। আমরা

বহু বলশালী পুষ্টকায় যুবককে কাঁকড়াবিছের কামড়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া করুণ কণ্ঠে ক্রন্দন করিতে করিতে ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় ধূলিতলে বিলুণ্ঠিত হইতে দেখিয়াছি। একটি সূক্ষ্ম নলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত এই বিষ অবশেষে

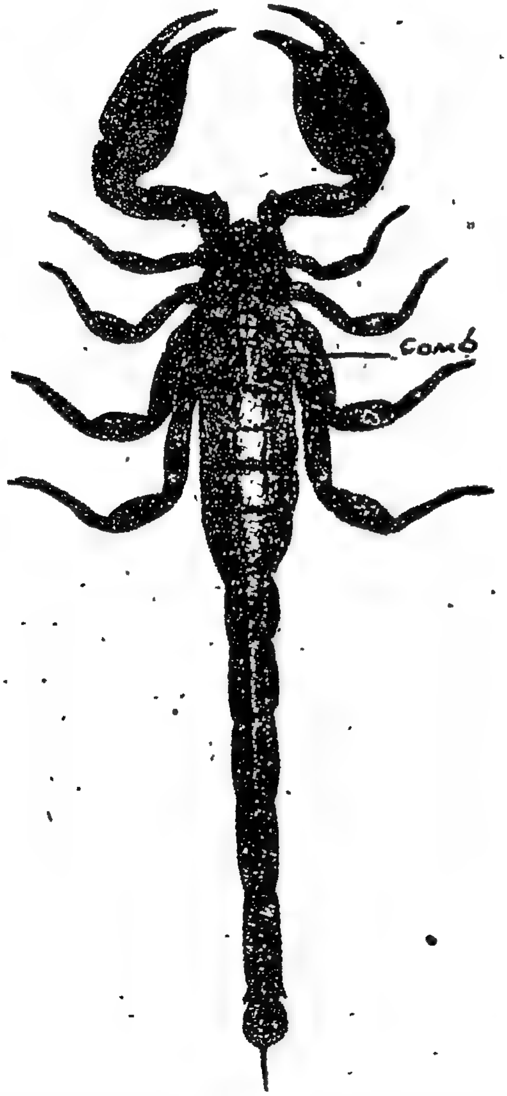

কৃষ্ণকায় পাহাড়ী কাঁকড়া বিছে (পেটের দিক) চিহ্নিত স্থানটি চিরুণীর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট অনুভূতি যন্ত্র

হুলের মুখের একটি অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে বাহির হইয়া দষ্ট স্থানে প্রবিষ্ট হয়।

কাঁকড়াবিছে উহার পুচ্ছকে পূর্ণরূপে প্রসারিত করিলে হুলের অগ্রভাগটি নীচের দিকে থাকে, কিন্তু যখন উহা আত্মরক্ষায় বা আক্রমণে উদ্যত হয়, তখন পুচ্ছকে কুঞ্চিত করিয়া পিঠের ঊর্ধ্বদেশে রাখে বটে, কিন্তু হুলের অগ্রভাগটিকে তখনও উহারা উহাদের লক্ষ্য বস্তু অর্থাৎ শত্রু বা ভক্ষ্য-প্রাণীর দেহের ঠিক উপরে এমনভাবে রাখিয়া থাকে যেন ইচ্ছামাত্র বিদ্যুৎ গতিতে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। যদি কেহ সাহসী হইয়া শেষ সন্ধি-স্থলটিকে বাদ দিয়া কাঁকড়া বিছের পুচ্ছের অন্য অংশগুলি চাপিয়া ধরিতে পারে তাহা হইলে সে দেখিবে হুলের ছিদ্র-পথ দিয়া বিন্দু বিন্দু বিষ ঝরিয়া পড়িতেছে।

ভক্ষ্য বা শিকার বাহুদ্বয়ের দ্বারা আক্রান্ত বা ধৃত হওয়া মাত্র পুচ্ছটি তড়িদ্বেগে পিঠের ঊর্ধ্বে আনীত হয় এবং উহার প্রান্তবর্তী হুল স্বকার্য্য সাধন করে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভক্ষ্যপ্রাণী ক্ষুদ্রকায় হইলে হুলবিদ্ধ করা প্রয়োজন হয় না, করা সম্ভবও হয় না। আঁড়শুলো বা ঐরূপ কোন কীট-পতঙ্গ হইলে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া বিষের দ্বারা অসাড় ও অভিভূত করিয়া তুলা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। হুলবিদ্ধ ও বিষাক্ত হইয়া পড়িলে বৃহদাকার কীট-পতঙ্গের পক্ষেও আর পলায়ন সম্ভব হয় না। তখন কাঁকড়া বিছে অনায়াসে উহাদিগকে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিতে পারে। ক্ষুদ্র প্রাণীকে ইহারা সরাসরি মুখে পুরিয়া দেয়। বৃহত্তর ও সহজে আয়ত্ত করা যায় না এইরূপ ভক্ষ্য প্রাণীর জন্যই বৃশ্চিকের হুলে হলাহল রহিয়াছে। ইহারা অতি সতর্কতার সহিত হুল ব্যবহার করে। যখন তখন এবং যেখানে সেখানে ইহা ব্যবহার করে না।

কাঁকড়াবিছের পুচ্ছে একপ্রকার লোম রহিয়াছে। এই লোমও ইহাদিগকে ভক্ষ্য বা শিকারের শরীরের আকার-প্রকার অনুভব করিতে সাহায্য করে। বাহুদ্বয়ের দ্বারা আহার্য্য প্রাণীকে ধরিয়া এই লেজের সহায়তায় উহার দেহের কোন কোন অংশ বাছিয়া লইয়া তথায় হুল বিদ্ধ করিয়া দেয়। কঠিন অংশে হুল বিদ্ধ করিলে উহা ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। হুল ভাঙ্গিয়া যাইলে আত্মরক্ষার এবং ভক্ষ্য আহরণের সর্ব্বপ্রধান অস্ত্র হইতে সে বঞ্চিত হইল। সুতরাং যাহা সহজে বিদ্ধ করা যায় না এরূপ কঠিন পদার্থের বক্ষে হুলের শক্তি পরীক্ষা করিতে ইহারা কখনও চেষ্টা করে না। হুলটি যাহাতে কঠিন মাটিতে ঠেকিয়া ভাঙ্গিয়া না যায় সে বিষয়েও ইহারা সর্ব্বদা সতর্ক। এই জন্য ইহারা দ্রুতবেগে চলিবার সময় পিঠের উপর পুচ্ছটিকে গুটাইয়া রাখে।

পশু-পক্ষীর প্রখর নখরের মত ধারালো চোয়ালের দ্বারা কাঁকড়া বিছে তাহার ভক্ষ্য বস্তুটিকে চাপিয়া ধরিয়া

ক্ষুদ্র মুখ-গহ্বরের সম্মুখে আনিবার পর খর্ব্বতর আর এক জোড়া চোয়াল ঐ পদার্থটি খণ্ড খণ্ড করিতে চেষ্টা করে। প্রথমে একটি চোয়াল এবং পরে দ্বিতীয়টি এই চর্ব্বন বা পেষণ ক্রিয়া আরম্ভ করে। এই চোয়াল দুটি ভোজ্য প্রাণীর পরিত্যজ্য অংশগুলিকে বাহির করিয়া দেয় এবং গ্রহনীয় অংশগুলিকে উদর প্রদেশে প্রবেশ করিতে সাহায্য করে। পরে পাকস্থলী উহাদিগকে টানিয়া লইয়া যায় বলিলেও চলিতে পারে। কর্কট বৃশ্চিকদের আহার গ্রহণক্রিয়া অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলে। একটা বড় আঁড়-শুলা উদরস্থ করিতে একটা সাধারণ লাল কাঁকড়াবিছের প্রায় দুই ঘণ্টা লাগিয়া যায়। রাক্ষসী বুভুক্ষা সত্বেও বৃশ্চিকদের দীর্ঘকালব্যাপী অনশন সহ্য করিবার শক্তি আমাদের বিস্ময় উদ্রিক্ত করিতে পারে।

অনুভূতিসমূহের মধ্যে ইহাদের স্পর্শানুভূতিই সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র। শ্রেণীভেদে দৃষ্টি ও শ্রুতি শক্তির বিভিন্নতা বিদ্যমান। এক ব্যক্তি তাঁহার স্নানকক্ষে একটি বৃহৎ কৃষ্ণকায় কাঁকড়া বিছে দেখিতে পান। তিনি ঐ বৃশ্চিককে কোনরূপে ধরিয়া ঐ স্নানকক্ষেই একটি জলপূর্ণ কাঁচের গ্লাসের ভিতর রাখিয়া দেন। তিনি যতবার স্নানকক্ষে প্রবেশ করিতেন, কাঁকড়া বিছেটি তাঁহার পদশব্দ শুনিয়া ততবারই আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইত। প্রায় সাড়ে ছয় ঘণ্টা জলের মধ্যে থাকিলেও বৃশ্চিকটি মরে নাই, কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। জল হইতে তুলিবামাত্র এই দৌর্ব্বল্য ও অবসন্নতা দূর হইয়াছিল।

সকল শ্রেণীর বৃশ্চিকের শ্রুতিশক্তি এইরূপ প্রখর নহে। কোন কোন জাতীয় কাঁকড়া বিছের শ্রবণেন্দ্রিয় অতি-অল্পই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। নিম্ন বা উচ্চ (তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চারিত) কোন রকম শব্দেই তারা কোনপ্রকার সাড়া প্রদান করে নাই। এ বিষয়ে "হান্টিং স্পাইডার" বা "শিকারী মাকড়সা"দের সহিত কাঁকড়া বিছের বিশেষ সাদৃশ্য বিদ্যমান। উচ্চ চীৎকারেও এই জাতীয় মাকড়সাদের কোন প্রকার চাঞ্চল্য না দেখিয়া পণ্ডিতরা অনুমান করেন ইহাদের শ্রবণেন্দ্রিয় আদৌ পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। অন্যদিকে অন্যান্য অনেক মাকড়সা সামান্য শব্দ শুনিবা মাত্র দ্রুত বেগে পলাইতে চেষ্টা করে।

শ্রুতিযন্ত্র বা কর্ণ সম্বন্ধে যাহাই হোক, কাঁকড়াবিছের দর্শনেন্দ্রিয় বা চক্ষুর অভাব নাই। বিধাতাপুরুষ কর্ণাভাবজনিত ক্ষতি চক্ষুর প্রাচুর্য্যের দ্বারা পূরণ করিতে চাহিয়াছেন বলিলে মিথ্যা বলা হয় না। শরীরের সম্মুখ ভাগে মস্তক ও বক্ষস্থলকে ব্যাপ্ত করিয়া একপ্রকার শুল্গাকার প্রত্যঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ত্ববেত্তারা ইহাকে 'ক্যারাপেস' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। এই ক্যারাপেসের গাত্রে ছয়টি হইতে দশটি পর্য্যন্ত চক্ষু সারি সারি বিরাজিত। মধ্যস্থলে খুব কাছাকাছি দুইটি চোখ।

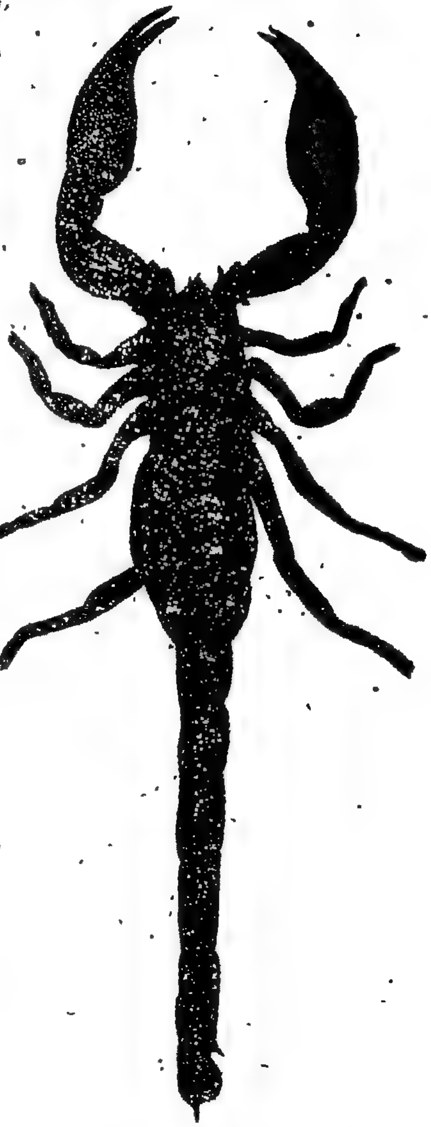

কৃষ্ণকায় পাহাড়ী কাঁকড়া বিছে (পিঠের দিক)

অন্যগুলি এই প্রত্যঙ্গের পুরোভাগে কোণাকুনি অবস্থিত। এতগুলি চোখ আছে বলিয়া কাঁকড়া বিছের দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর ইহা যেন কেহ মনে না করেন। একটা বিচরণশীল আঁড়শুলা তিন বা চার ইঞ্চি দূরে থাকিলেই ইহারা তাহাকে

দেখিতে পাইবে। ব্যবধান ইহার অধিক হইলে দেখা সম্ভব হইলেও দৃষ্ট বস্তুর আকৃতি প্রকৃতি উপলব্ধি করা ইহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না।

ইহাদের প্রধান অস্ত্র বা অবলম্বন সম্মুখের সাঁড়াসিবৎ বাহুদ্বয়। বাহুদ্বয়ের গাত্রে লোমবৎ স্পর্শানুভূতিমূলক প্রত্যঙ্গের সাহায্যেও ইহারা তাহাদের দিকে কে আসিতেছে তাহা বুঝিতে পারে, বলিয়া পণ্ডিতদের অনুমান। সঞ্চরণশীল কোন বস্তু কয়েক ইঞ্চি দূরে থাকিলেও উহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে বটে কিন্তু স্পর্শ না করা পর্য্যন্ত সেই বস্তুর প্রকৃতি উপলব্ধ হয় না। যে সকল কাঁকড়া বিছে আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই তাহাদের জীবনযাপন প্রণালী সম্বন্ধেও আমাদের বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা নাই। কোন কোন অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ বা পরীক্ষার সাহায্যে ইহাদের জীবনযাপন পদ্ধতি সম্বন্ধে যাহা জানিয়াছেন তাহাই আমাদের প্রধান অবলম্বন। প্রসিদ্ধনামা ফরাসী প্রাণিতত্ত্ববেত্তা হেনরী ফেবার কয়েক শ্রেণীর ইউরোপীয় কাঁকড়া বিছের জীবনযাপন প্রণালী পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক তাহার বৃত্তান্ত তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রবল প্রযত্নের ফলে তাঁহার একটি উদ্যান বৃশ্চিকদের বিরাট উপনিবেশে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার উদ্যানের অধিবাসী বৃশ্চিক কুলের জীবনযাপন পদ্ধতি তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাহাদের জীবনযাত্রার পক্ষে যাহা কিছু প্রয়োজন সমস্তই তিনি সরবরাহ করিয়াছিলেন। উদ্যানটিকে শুধু প্রস্তরাকীর্ণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, উহার মৃত্তিকাকে কাঁকড়া বিছেদের জীবনযাপনের অনুকূল করিবার জন্যও প্রযত্ন করিয়াছিলেন।

বৃশ্চিকদের যৌন জীবনের দিকেও ফেবার বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। বিধাতাপুরুষ সৃষ্টির প্রসার সাধনের জন্য প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই যৌন মিলনাকাঙ্খায় প্রবল পাবক প্রজ্বলিত করিয়াছেন। এই আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক প্রাণীই নানাপ্রকার বিচিত্র ভাব-ভঙ্গী ও কার্য্যাবলী দ্বারা ব্যক্ত করিয়া থাকে। এই আকাঙ্খার বশে কাঁকড়া বিছের ন্যায় ক্ষুদ্রকায় প্রাণী যে সকল কার্য্য করিয়া থাকে, যে সকল ভাব-ভঙ্গী অভিনয় বা অভিব্যক্ত করে তাহা সত্য সত্যই আশ্চর্য্যজনক। যৌন মিলনের সময় পুরুষ ও স্ত্রী বৃশ্চিক পরস্পর যেরূপ বিচিত্র ব্যবহার করে তাহা ফেবার বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

পুরুষ ও স্ত্রী বৃশ্চিক পুচ্ছ উত্তোলন করিয়া পরস্পর (একজন আর একজনকে ঘিরিয়া) পরিক্রমণপূর্ব্বক মুখোমুখী দাঁড়ায় এবং পরে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হয়। সাধারণতঃ পুরুষ বৃশ্চিকই স্ত্রী-বৃশ্চিকের চারিদিকে চক্রাকারে বিচরণ করে। তদনন্তর বহুক্ষণ ব্যাপিয়া এক প্রকার প্রণয়-নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষ বৃশ্চিক স্ত্রী-বৃশ্চিকের বাহুদ্বয়কে নিজের বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া ক্রমশঃ পিছাইতে পিছাইতে এই বিচিত্র নৃত্যাভিনয় সম্পন্ন করে। স্ত্রী-বৃশ্চিক এ বিষয়ে কোন আনন্দ প্রকাশ করে না। সে পুরুষ বৃশ্চিকের বাহুপাশে সাগ্রহে ধরা দেয়। এক ঘণ্টা বা তদপেক্ষাও অধিককাল এই নৃত্য চলে। নৃত্য শেষ হইবার পর পুরুষ বৃশ্চিক শিলাখণ্ড বা এইরূপ কোন আশ্রয় খুঁজিয়া তাহার নীচে গর্ত্ত খুঁড়িতে আরম্ভ করে। স্ত্রীবৃশ্চিক বাহুপাশে আবদ্ধই থাকে, পায়ের দ্বারা গর্ত খননক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। গর্ত্ত প্রস্তুত হইলে উহার ভিতর উভয়ে প্রবেশ করে এবং প্রকৃত যৌনসম্মেলন তথায় লোকচক্ষুর অন্তরালে সম্পাদিত হইয়া থাকে। গর্ত্ত খুঁড়িবার সময় মুহূর্ত্তের জন্যও পুরুষ-বৃশ্চিক তাহার বাহুবন্ধন শিথিল করে না। এই যৌন সম্মেলন পর্য্যন্তই ইহাদের দাম্পত্য জীবন। এই সম্মেলন সমাপ্ত হওয়া মাত্র স্ত্রী-বৃশ্চিকের দ্বারা পুরুষ-বৃশ্চিক ভক্ষিত হওয়ার বীভৎস দৃশ্য ফেবার দেখিয়াছেন। এরূপ প্রথা ইউরোপীয় কাঁকড়া বিছেদের মধ্যেই প্রচলিত। যৌন জীবন বা দাম্পত্য মিলনের এরূপ ভয়াবহ পরিণতি ভারতবর্ষীয় বৃশ্চিক সমাজে দৃষ্ট হয় না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। যৌন মিলন সমাপ্ত হইবার পর স্ত্রীর দ্বারা পুরুষ ভক্ষিত হইবার দৃশ্য মাকড়সাদের মধ্যেও দেখা গিয়া থাকে। মাকড়সা ও কাঁকড়া বিছে উভয়ের জ্ঞাতিত্ব সম্পর্ক সম্বন্ধে সংশয় করিবার কোন কারণ নাই। পরে আকারগত পার্থক্য জন্মিলেও, একই পিতৃপুরুষ হইতে উভয়ে উদ্ভূত বলিয়া প্রাণিতত্ত্ববেত্তাদের মত।

নব-জাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃশ্চিক শিশুদের শরীরে কঠিন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আদৌ নাই। পদদলিত হইলে উহারা সম্পূর্ণরূপে পিষ্ট হইয়া যাইতে পারে। বয়সের সহিত ইহাদের শরীর কাঠিন্য লাভ করে। জন্মের পর ইহারা জননীর পৃষ্ঠদেশকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। প্রায় সপ্তাহকাল ইহাই তাহাদের একমাত্র আশ্রয়। ইহার পর ইহাদের উপবকার আবরণ বা খোলস উঠিয়া যায় এবং কঠিন অংশগুলি ক্রমশঃ গঠিত হইতে আরম্ভ করে। বৃশ্চিক-সন্তান তখন সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রসমূহে ক্রমশঃ সজ্জিত হইয়া জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়।

নানাপ্রকার বীভৎস প্রথা এই ভীষণদর্শন বিষাক্ত প্রাণীদের মধ্যে প্রচলিত। ইহারা অপর প্রাণীকে হত্যা তো করেই, তাহা ছাড়া শুধু স্বজাতীয় নয়, একান্ত আত্মীয়কেও হত্যা করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। কেবল পত্নী পতিকে ভক্ষণ করে তাহা নহে, জনক-জননীও স্নেহ-মমতা জলাঞ্জলি দিয়া পুত্রকন্যাগণকে নির্ব্বিকার চিত্তে গলাধঃকরণ করে। ইহা ছাড়া অবস্থাবিশেষে আত্মহত্যা করিতেও ইহাদের দ্বিধা নাই। কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববেত্তা আফ্রিকায় মরুবক্ষবাসী কাঁকড়া বিছেদিগকে আত্মহত্যা করিতে দেখিয়াছেন। কেহ কেহ কহেন ইহা আত্মহত্যা নহে, মরুভূমির প্রচণ্ড উত্তাপে মৃত্যু। কাহারও কাহারও মতে এই প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া ইহারা আত্মহত্যা করে। এই প্রাণী আদৌ উত্তাপ সহ্য কবিতে পারে না। এই জন্য গ্রীষ্মকালে কোন শীতল স্থান ইহারা অন্বেষণ করে। প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে ইহারা অনেক সময় মৃতপ্রায় হইয়া যায় এবং পরে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিয়া শুশ্রূষা করিলে পুনরায় জীবনীশক্তি ফিরিয়া পায়। অধ্যাপক বুর্ণ ও মেচিনস্ককের মতে হলাহলবর্ষী হুলের দ্বারা আত্মহত্যা সম্ভব নহে, কারণ ইহাদের বিষ অপর প্রাণীর পক্ষে যেরূপ কার্য্যকর নিজেদের পক্ষে তাহা নহে। বৃশ্চিকের বিষ বৃশ্চিকের শরীরে সঞ্চারিত করিয়া দেখা গিয়াছে বিশেষ কোন বিষ-ক্রিয়া প্রকাশিত হয় নাই।

ডক্টর রুবেন আফ্রিকার মরুবক্ষ পর্য্যবেক্ষণকালে বৃহদাকার কৃষ্ণকায় কর্কট বৃশ্চিকগণকে পরস্পর প্রচণ্ড সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে একদল বৃশ্চিকের সহিত আর একদলের তুমুল সঙ্ঘর্ষ সঙ্ঘটিত হইয়াছে। একটি স্ত্রী-বৃশ্চিককে লইয়া দুইটি পুরুষ-বৃশ্চিকের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ রুবেন প্রত্যক্ষ করেন। একটি পুরুষ-বৃশ্চিক তাহার মনোনীত স্ত্রী-বৃশ্চিককে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া প্রণয় নিবেদন কবিবার কালে অকস্মাৎ আর একটি বৃশ্চিক আসিয়া ঐ স্ত্রী-বৃশ্চিকটিকে করায়ত্ত কবিতে চেষ্টা করে। পূর্ব্বের বৃশ্চিকটি অবশেষে স্ত্রী-বৃশ্চিকটিকে ছাড়িয়া দিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে সবেগে আক্রমণ করে। সংগ্রামে শেষোক্ত বৃশ্চিকটির পরাজয় ঘটে। সে বালুকারাশির বক্ষে মৃতপ্রায় পড়িয়া রহে এবং প্রথমোক্ত বৃশ্চিকটির প্রণয় নিবেদনের অভিনয় পুনরায় আরম্ভ হয়। যতক্ষণ সংগ্রাম চলিতেছিল ততক্ষণ স্ত্রী-বৃশ্চিকটি বিজয়ীকে বরণ করিবার জন্য তথায় স্থিরভাবে অপেক্ষা করিতেছিল। শেষোক্ত বৃশ্চিকটি মরে নাই। রুবেন তাহার শুশ্রূষা করিলে প্রায় আধঘণ্টা পরে সে চেতনা ও চলৎশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছিল। এই আফ্রিকাবাসী কৃষ্ণকায় কাঁকড়া বিছেরা এই জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে বৃহত্তম বলিয়া রুবেন মত প্রকাশ করিয়াছেন। এক পথচারী ইহাদের দ্বারা দষ্ট হওয়ার ফলে দুঃসহ যন্ত্রণায় উন্মাদের মত হইয়া পড়ার দৃশ্য দেখা গিয়াছিল।

কাঁকড়া বিছে দংশন করিলে দষ্ট স্থান চুষিয়া বিষ বাহির করিয়া ফেলাই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় উপায় পার্মাংগানেট অফ পোটাশিয়াম দিয়া ক্ষত স্থান ধুইয়া ফেলা। গরম জলের দ্বারা বার বার ধুইয়া ফেলিলেও যন্ত্রণার উপশম ঘটে। এমোনিয়া, ষ্ট্রিকনিয়া বা এলকোহল কাঁকড়া বিছের বিষ বিনষ্ট করিতে সমর্থ নহে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

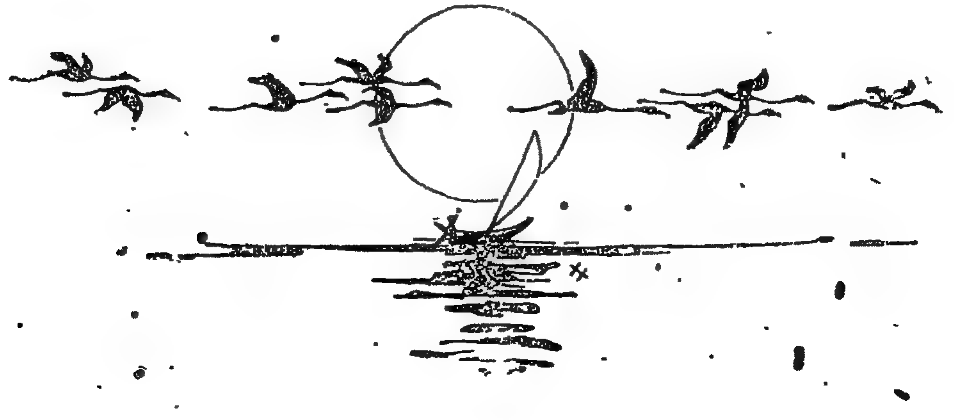

জীবন-বেদ

শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী

পুরুষ ও নারী এক না কখনো,
এ দুয়ে অনেক ভেদ ;
রচিতে বাসনা পুরুষ-নারীর
যুগ্ম জীবন-বেদ।
পুরুষ যখন ধরণীতে এলো
তখন ছিলো না নারী,
ছিলো নাকো তার সংসার-জ্বালা—
একাকী সে পথচারী।
দোসর বিহীন ধূসর জীবন
ঊষর মরুর প্রায়
পুরুষ যেদিন বুঝিলো মর্মে
সানন্দ বেদনায়,
বিধির সৃষ্টি আদিম পুরুষ
পূর্ণ স্বয়ম্ভর
নারীরে গড়িলো ভাঙিয়া আপন
বক্ষের পঞ্জর।
একক পুরুষ দুই ভাগ হয়ে
হোলো নর আর নারী;
পুরুষ সাজিলো বৈরাগী আর
নারী হোলো সংসারী।
ধরার ধুলায় নারীর সৃষ্টি
পুরুষের প্রয়োজনে
কথায় না হোক, প্রতি কাজে নারী
এ কথাটি মানে মনে।
পুরুষের চোখে সুন্দর হতে
যতো আয়োজন তার—
দেহ-সজ্জারে ঘিরে তাই শোভে
লজ্জা-অলঙ্কার।
ভোগেরে ঘিরিয়া নারীর কামনা
ঘুরে মরে নানা ছলে,
নরের সাধনা শুরু হয় এসে
ত্যাগের দেউল তলে।

পুরুষ ছড়ায়, নারী তা কুড়ায়
নর কাছে নারী ঋণী.
আকাশের কাছে ধরণী নিত্য
আলোকের কাঙালিনী।
উদাসী আকাশ করে বারি দান
খেয়ালী পুলকে মেতে,
সাবধানী মাটি তাই শুষে নিয়ে
ফসল ফলায় ক্ষেতে।
পুরুষ সৃষ্টি, পুরুষ প্রলয়,
পুরুষ আকাশচারী,
নারীর মায়ায় স্বভাগ-বিরাগী
নর সাজে সংসারী।
পুরুষ সবল, তাই সে মানে না
আইনের শৃঙ্খল,
নারী দুর্বলা, কাজে ও কথায়
পদে পদে তার ছল।
নারীরে না হলে চলে পুরুষের,
আছে আরো কাজ তার;
পুরুষ না পেলে নারীর জীবনে
দীনতার হাহাকার।
নারীর স্বপ্ন—স্নেহ-প্রেম-ঘেরা
ছোটো এক সংসার,
পুরুষের বুকে মরণ-বিজয়ী
দিগ্বিজয়ের ভার।
পুরুষ চাহেনা কারো মুখ পানে
নারী চায় নির্ভর,
প্রেমে পড়ে তাই ঘর ভাঙে নর,
নারী বেঁধে তোলে ঘর।
পুরুষ ছুটেছে বিশ্বজয়ের
দুরন্ত অভিযানে,
চোখে জল আর মুখে হাসি নিয়ে
নারী তারে পিছু টানে।

নোঙর

মানবেন্দ্র পাল

বাণীপীঠে আজ পর্যন্ত যত হেডমিস্ট্রেস এসেছেন সুলতা রায়ের মতো মেয়েদের এত অপ্রিয় আর কেউ ছিলেন না। সুলতা রায়কেও মেয়েরা 'বড়দি' বলে—যেমন বলত আগে অন্য হেডমিস্ট্রেসদের। কিন্তু 'বড়দি' বলতে তাদের যেন কোনো আন্তরিকতা নেই।—যে আন্তরিকতা একদিন অকৃপণভাবে পেয়ে গিয়েছে সুমিত্রা নাগ, শেফালি দত্ত, মঞ্জু বোস। সেই আদর আন্তরিকতাকে স্মরণ করে আজও মাঝে মাঝে দূর দূরান্তর থেকে সুমিত্রা নাগের চিঠি এসে পৌঁছয় বাণীপীঠে,—শেফালি দত্ত সংবাদ নেন কোলকাতা থেকে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য মেয়েদের, বাণীপীঠের এই ধারাবাহিক ঐতিহ্য ভঙ্গ করে কোথা থেকে এসে জুটল এই সুলতা রায়।

আশ্চর্য হয় মেয়েরা।—সুলতা রায়ের বয়েস বেশি নয়, ছাব্বিশ পেরিয়ে হয়তো সাতাশ। কিন্তু এই বয়েসেই এত গম্ভীর—এত নীতিবিৎ—এত কঠোর—এত একগুঁয়ে মেয়েলোক তারা জীবনে দেখে নি।

সুলতা রায়ের বয়েস যেমন বেশি নয়—তেমনি বেশি নয় তাঁর রূপের জৌলুস। ঘষে মেজে রুচিসম্মত কাপড় চোপড়ে জড়িয়ে মোটের ওপর যা দাঁড়ায় তাতে ভদ্রমহিলাকে কুৎসিৎ বলা চলে না—এই যা।

শরীরের গড়ন মোটা—রঙ ময়লা—গলার স্বর পুরুষের মতো ভারি। ক্লাশে ঢুকে নেস্‌ফিল্ডের গ্রামার নিয়ে যখন বসেন তখন ক্লাশ টেনের মেয়েদেরও বুক দুরু দুরু কেঁপে ওঠে —হেসে গল্পকরার সাহস তো কোন্ ছার।

অথচ একদিন ঐ আসনে তো সুমিত্রা নাগও বসেছিলেন। কী অমায়িক ব্যবহার—কী মধুর হাসি—দেহে মনে কী অপূর্ব মাধুর্য! না হেসে তিনি কখনো মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতেন না।

এমনও হয়েছে কত দিন,—এক এক রবিবারে ওরা এসেছে সুমিত্রার কোয়ার্টারে। জোর করে বড়দিকে তারা ধরে নিয়ে গিয়েছে বেড়াতে। তাতে সুমিত্রা নাগ বরঞ্চ খুশিই হয়েছেন।

কিন্তু সৃষ্টিছাড়া জীব এই সুলতা রায়। হার্ডপাম্প দেওয়া পাঁচ নম্বরের ফুটবলের মতো মুখখানা নিয়ে যখন সুলতা রায় কেটে কেটে কথা বলেন তখন রাগে ঘেন্নায় মেয়েদের সর্বশরীর রি-রি করে ওঠে।

সুলতা রায়ের প্রতি এই ঘৃণা নানা ঘটনায় মেয়েদের মনে দৃঢ়মূল হয়ে উঠছিল।

একদিন মনে যথেষ্ট বল সঞ্চয় করে রেখা উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে,

—বড়দি, এটা কিন্তু বড়ো অন্যায় হল।

—হোয়াট? সুলতা রায় গ্রামারখানা উপুড় করে রেখে রেখার দিকে অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করলেন।

রেখার বুক কেঁপে উঠল।

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই পেছনের বেঞ্চি থেকে এক সঙ্গে কতকগুলো মেয়ে বলে উঠল—অন্যায় হয়েছে—সত্যিই অন্যায় হয়েছে আপনার।

—হোয়াট? হেডমিস্ট্রেস সুলতা রায় এবার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। সর্বশরীর কাঁপছে থর থর করে। কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে উঠল উত্তেজনায়—আমার কোন্ অন্যায়ের কথা বলছ তোমরা স্পষ্ট করে বলো।

রেখার বুকে তখন অমিত সাহস। ক্লাশের মধ্যে ফার্স্ট-হওয়া মেয়ে—পেছনে তার বিপুল সমর্থন।

গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বললে—গৌরীর অপরাধ এমন অমার্জনীয় নয়, যার জন্যে তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল।

সুলতা রায় উত্তরে কোনো কথা বল্‌লেন না। একে একে প্রত্যেক মেয়ের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। তারপর একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটিয়ে নিঃশব্দে চেয়ারে বসলেন।

সমস্ত ক্লাশে একটা অখণ্ড নিস্তব্ধতা। ক্লাশের তিরিশটি মেয়ের বিস্ময়ভরা দৃষ্টি সুলতা রায়ের ওপর।

সুলতা রায়ের ঠোঁটের ফাঁকে ঐটুকু হাসিও তারা কোনোদিন্ দেখে নি। ছোট মেয়েটির মতো কী রকম আনমনা বসে নোখ খুঁটছেন। আশ্চর্য্য!

প্রায় সাত মিনিট কেটে গেল। সুলতা রায় বই মুড়ে ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মুখটা আবার কঠোর হয়ে উঠেছে। গলাটা গম্ভীর।

সুলতা রায় কথা বললেন—আমি হেডমিস্ট্রেস। কোন্ মেয়েকে কি শাস্তি দেওয়া দরকার তা আমি জানি। তার কৈফিয়ৎ হয়তো স্কুলের সেক্রেটারীকেও আমি দেব না। তবু তোমরা বড়ো হয়েছ—অন্তত বড়ো হতে চলেছ। আমি ভয় পাই, হয় তো-বা গৌরীর সংক্রামক ব্যাধি তোমাদের ভেতরও ছড়িয়ে পড়েছে। পড়াটাই স্বাভাবিক। তাই তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি।

হেডমিস্ট্রেস একটু থামলেন। তারপর গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন—এককালে পনেরো বছর বয়েসে মেয়েরা স্বামী-পুত্র নিয়ে সংসার সুরু করত। আজও অনেক জায়গায় করে। সব মেয়েদের কাছে এই পনেরো বছর বয়েসটা তাই রোমান্সে ভরা। এটা আমিও বুঝি। কিন্তু ছাত্রাবস্থায় যারা সংসার করতে পারবে না—অন্তত স্কুলের খাতায় তাদের নাম যতদিন থাকবে, ততদিন রোমান্সের কোনো আতিশয্য এখানে চলবে না। পনেরো বছর বয়েস বলেই আমার কাছে তার কোনো ক্ষমা নেই।

কথা শেষ করে অকস্মাৎ অসময়েই সুলতা রায় ক্লাশ থেকে চলে গেলেন।

* * *

স্কুলের সংলগ্ন ছোট্ট কোয়ার্টারের নির্জন ঘরে ইজিচেয়ারে শুয়ে সুলতা রায় কত সন্ধ্যা চুপটি করে চোখ বুজে কাটিয়ে দেন।

সামনে ছোট্ট একটা টেবিল। ওপাশে দেরাজ। টেবিলের এক পাশে খুব যত্ন করে সাজানো রয়েছে মোটা মোটা বই। এগুলি তাঁর নিত্য ব্যবহারের। দেওয়ালে পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো রবীন্দ্রনাথ থেকে শ। একটি বাস্ট ফোটো—তাঁর নিজের সতেরো বছর বয়েসের।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্ত শরীরটা এই ইজিচেয়ারে ছড়িয়ে দেন। উত্তরের জানালাটা দিয়ে দূরে গঙ্গার চর দেখা যায়—ধু ধু করছে।

খুব ভালো লাগে একমনে সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে—যতক্ষণ না সন্ধ্যার অন্ধকার তাঁর দৃষ্টি রুদ্ধ করে দেয়। তারপর অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ঝি এসে হ্যারিকেন জেবলে দিয়ে যায়—ঘরের আনাচে কানাচে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেয়—ধুনো দেয়। সুলতা রায় তখন টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে হয় খাতা দেখেন না হয় পড়াশোনা করেন।

সুলতা রায়ের অতীত জীবনে কোনো ব্যর্থতার আঘাত নেই। যে আঘাতগুলো আছে সেগুলোকে তিনি ব্যর্থতার পর্য্যায়ে ফেলে তাদের মর্য্যাদা লঘু করতে চান না। তিনি বোঝেন—অতীত যাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রশ্রয় দিয়েছে, ভবিষ্যত তাদের দেখে দূর থেকে অনুকম্পার হাসি হেসে যায়। এ বড়ো অসহনীয়। তার চেয়ে তাঁর অতীত কালের দুঃখ দারিদ্র্য, অসময়ে পিতৃবিয়োগ, তেরো বছরের ভাইটিকে মানুষ করার দায়িত্ব, অনুপম মিত্রের দুরভিসন্ধি, বাজারের দেনা এ সবই—ভাবতে গেলে সুলতা রায়ের আজ ভালোই লাগে, এসবই তার আজ সম্পদ।

এই বাধা বিঘ্ন-ভরা ক্ষত-বিক্ষত মুহূর্তগুলো অতিক্রম করে কবে যে তার তেরো থেকে বিশ এই সাতটা বছর কেটে গেছে আজ ভাবতে গেলে স্বপ্ন বলে মনে হয়।

তবু সুলতা রায় এক এক সময়ে আশ্চর্য হয়ে পড়েন। তিনি জানেন, মেয়েদের কাছে তিনি আজ কত অপ্রিয়।

'আনসোস্যাল'—মেয়েরা কত দিন তারই ঘরের পাশ দিয়ে আলোচনা করতে করতে গিয়েছে।

সুলতা রায়—মনে মনে হাসেন। আর আশ্চর্য হয়ে ভাবেন,—সত্যি এত বড়ো পরিবর্তন কবেই বা এল আর কবেই বা এমনি দৃঢ়ভাবে আসন পেতে বসল।

অথচ—সুলতা রায়—একবার নিজের মধ্যে ডুব দিয়ে দেখেন, তাঁর সমস্ত কলেজ-জীবনটা তো এমনি দুর্বিসহভাবে কাটে নি।

সুলতা রায় আনসোস্যাল।—হাসি পায়—। আজ যদি মিনতি কিম্বা সোমা এসে পড়ত হঠাৎ আর শুনত তার ছাত্রীদের মন্তব্য, কী বলত তারা?

অথচ সে সময়ে সুলতা রায়ের চারিপার্শে সর্বনাশের চক্র ঘুরছে। —বাবা মৃত্যুশয্যায়—ঋণভারে ক্লান্ত। ছোটো ভাই অপু স্কুলে মাইনে দিতে না পেরে লজ্জায় স্কুল বন্ধ করেছে। সামান্য টুইশানি করে আর পুঁজি ভেঙে সুলতা রায় একমনে এগিয়ে চলেছে।

তখন?

তখন সে জানত—সবাই গেলেও শুধু ঐ ভাইটির জন্যে তাকে বাঁচতে হবে—মানুষ হতে হবে।

সেই সব গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তেও সুলতা রায় হেসেছে—মিনতি-সোমাকে নিয়ে বোটানিক্সে গিয়ে পিকনিক করেছে—লাইট হাউসে সিনেমা দেখেছে। আর প্রাণভরে ঠাট্টা করেছে মিনতির একনিষ্ঠ প্রণয়ী তাপসরঞ্জনকে নিয়ে।

নিজেকে নিয়ে আর এই 'অলস খেলা বৈশিক্ষণ' চলল না। টেবিলের ওপর ছোট্ট টাইমপীসটা হঠাৎ দম ফুরিয়ে গিয়েছে—সময়ের হুঁস ছিল না তাই সুলতার।

হঠাৎ ঠং ঠং করে নীচের তালা বন্ধ অফিস-রুমের দেওয়াল-ঘড়িতে আটটা বেজে গেল। সুলতা রায় ব্যস্ত

হয়ে উঠে বসলেন। এক গাদা খাতা জমে রয়েছে। সে-গুলো দেখে দিতেই হবে আজ রাত্তিরে। চেয়ারটা টেনে নিয়ে সুলতা রায় বসলেন। মুখের ওপর আবার নেমে এল গাম্ভীর্য।—মেয়েরা বলে হার্ডম্যাপ দেওয়া পাঁচ নম্বরের ফুটবল।

কিন্তু খাতা দেখা হল না। মনে পড়ল তার চেয়েও বেশি জরুরি কাজ একটা রয়েছে—অপুর চিঠির জবাব দেওয়া।

সুলতা রায় অপুর পোস্টকার্ডখানা আর একবার পড়লেন। এক জায়গায় নীল পেন্সিলে দাগ দিলেন। এইটেই আসল বিষয়।

ছোট্ট করে ভাইকে জবাব লিখলেন সুলতা রায়,,

—তোমার পরীক্ষার ফী আমি যত শিগ্গির পারি পাঠাবার চেষ্টা করছি। মুস্কিল হয়েছে, এ মাসের মাইনে এখনো পাই নি। দেখি যদি অন্য কোনো উপায় ইতিমধ্যে স্থির করতে পারি।......

অসময়ে স্কুলের ঝি আবার ফিরে এল।

—ওহো বড়ো ভুল হয়ে গেছে গো বড়দি। কথা বলতে বলতে ঝি ভিজে হাতের জল বাঁচিয়ে কাপড় থেকে আলগা করে একটা রঙিন খাম বের করে দিল।

—কার চিঠি?

ঝি বললে, বিকেলের ডাকে এসেছিল।

সুলতা রায় আলোর কাছে এগিয়ে গিয়ে চিঠিটা দেখলেন। বিয়ের চিঠি। তাঁরই নামে।

কার আবার বিয়ে? একটু আশ্চর্য হয়ে সুলতা রায় তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলে পড়তে লাগলেন।

—মিনতির বিয়ে সেই তাপসরঞ্জনেরই সঙ্গে! স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সুলতা রায়। কী আশ্চর্য সেই মিনতিটা শেষে সত্যিই বিয়ে করলে!

অথচ একদিন ক্লাশে বসে এই তাপসরঞ্জনকে নিয়ে সুলতা কত ঠাট্টাই না করেছে।

মিনতি সেদিন বারে বারে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে—যা, যা, কী যে বাজে বকিস্। মানুষের সঙ্গে আলাপ থাকাটাও কি অপরাধের?

মৃদু চিম্‌টি কেটে সুলতা বলেছিল—অপরাধ বৈকি। এত পুরুষ মানুষকে বাদ দিয়ে তোমার সমস্ত আলাপের আতিশয্যটা যে পুরুষ-বিশেষের ওপর পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে উঠেছে।

মিনতি হেসে ফেলেছে। বলেছে—তোর দৃষ্টি বড়ো সাংঘাতিক তো!

সুলতা সেদিন ঠাট্টা করতে গিয়ে অকস্মাৎ ক্ষোভ প্রকাশ করে ফেলেছিল—সেই জন্যেই বোধ হয় কোনো দিন শুভ-দৃষ্টির সুযোগ ঘটবে না। কিন্তু পরক্ষণেই সুলতা নিজেকে সামলে নিয়েছিল। পরক্ষণেই মুখে হাসির ফোয়ারা ছিটিয়ে বলেছিল,—কিন্তু ভাই মিনতি, আমার কথা মনে রাখিস, বিয়ে তোদের হবেই একদিন। ভুলিস না যেন তখন আমায়।

না, মিনতি তাহলে সত্যিই ভোলে নি। কিন্তু মিনতি ভুলে গেলেই বোধহয় ভালো করত। আজ সে উৎসাহ যে আর নেই, কিম্বা—

সুলতা রায় আজ যে বেশ অনুভব করতে পারেন—দিনে দিনে আর একটা নির্মম সত্য তাঁকে যেন ক্রমশ পিছিয়ে দিচ্ছে;—দুর্বল করে দিচ্ছে তাঁর আত্মবিশ্বাসকে,—বোধহয় মৃত্যু ঘটিয়েও দিয়েছে তাঁর প্রাক্-শিক্ষয়িত্রী-জীবনের মাধুর্যের। আজ তাই বোধহয় তিনি মিশতে পারেন না প্রাণখুলে। সেই সংশয় আজও তাঁকে যেন স্পষ্ট দেখিয়ে দিচ্ছে—মিনতি তাপসের সামনে তাঁর আবির্ভাব কী নিদারুণ প্রহসন হয়ে দাঁড়াবে। হয়তো তিনি কোনো কথাই বলতে পারবেন না—কিম্বা হাসাতে। হয় তো মিনতিই বলে ফেলবে তাপসরঞ্জনেরই সামনে—কীরে তুই এতো 'আনসোস্যাল' হয়ে পড়েছিস!

সুলতা রায়—অপমৃত্যুকে ভয় করেন না, ভয় করেন অপবাদকে।

কিন্তু তবু সুলতা রায়কে যেতে হল। সমস্ত দুর্বলতা উপেক্ষা করে বারে বারে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল মিনতির সেই পাতলা হালকা হাসিখুশিতে ভরপুর মুখখানা—মানুষের মনে কি আলাপ থাকাটাও অপরাধের?

আজ অনেক দিন পর আবার সেই কথাটা মনে করে সুলতারও হাসি পেল।—না, অপরাধের নয়। একবার দেখা হলে হয়। সুলতা রায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—না যেতেই হবে।

পরের দিন স্কুলের মেয়েরা তো অবাক। এও কি সম্ভব! নতুন 'বড়দি' ছুটি নিচ্ছেন! আশ্চর্য! অথচ এই 'বড়দি'ই জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে এসে ক্লাশ নিয়েছেন। —বোর্ডে লিখে এ্যানালিসিস বুঝিয়ে দিয়েছেন। তবু ছুটি নেন নি। রেখা বললে—ব্যাপার কি রে, বড়দি হঠাৎ সেজেগুজে চল্‌ল কোথায়?

বীথিকা বললে—কে জানে? আহা কী অপরূপই না মানিয়েছে!

সোমা বল্‌লে—জন্মের মতো যায় না? হাড়ে বাতাস লাগে তা হলে।

আজ মিনতির বিয়ে।

সন্ধ্যে থেকে সুলতার আজ আর সময় কাটে না। বিয়ে বাড়ির হৈচৈ-র বাইরে সুলতা রায় একটু জায়গা বেছে নিয়েছেন। মিনতির জন্যে আনা প্রেজেণ্টেসানগুলো এখনো মিনতিকে দেওয়া হয় নি। শুধু দূরে থেকে চোখের দেখা হয়েছে মাত্র। মিনতি তো কণে-সাজ ফেলে ছুটে আসতে চাইছিল—কিন্তু মেয়েরা ছাড়ে নি। অবস্থা বুঝে সুলতা নিজেই সরে এসে অপেক্ষা করছে।

এই অল্প আলো-আঁধারিতে বসে অনেক কিছুই জল্পনা কল্পনা করতে ভালো লাগছে সুলতার।

—সত্যি ভারি সুন্দর লাগল তো মিনতিকে। অথচ এতো ফর্সা ও নয়, কিম্বা চোখের চাউনিটা এত সলজ্জ ওর কোনো দিনই ছিল না। আজ হঠাৎই যেন ওকে কি রকম কণে-কণে লাগল।

হঠাৎ আপন মনেই হাসি পেল সুলতার। মনে হল—গৌরীরও একদিন হয়তো এমনি কণে সাজার পালা আসবে। সেদিন ওর হয় তো শুভ-দৃষ্টি হবে ঐ বখাটে ছেলেরই সঙ্গে—যার নীল কাগজে লেখা প্রেম-পত্র নিয়ে গৌরী ধরা পড়েছিল সুলতার হাতে। গৌরী মনের আনন্দে একদিন হয় তো ওরই গলায় পরাবে মালা।

হঠাৎ সুলতা রায় শঙ্কিত হয়ে উঠলেন—সেই শুভ-দিনে গৌরী আবার তাকে নেমন্তন্ন করে বসবে না তো?

বিয়ে শেষ হতে একটু রাত হয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়ার পর সুলতার খোঁজ পড়ল। মিনতি নিজেই এক-রকম টেনে নিয়ে গেল সুলতাকে।

তুই আসবি সত্যিই ভাবতে পারি নি।

সুলতাও হাসল—দেখছিস তো ভুলিনি আমি কাউকেই।

—আহা, একদিনও তো চিঠি দিয়ে খোঁজ নিস না। হ্যাঁ রে, সোমাটার খবর কি রে? ওর তো ঠিকানাই পেলাম না।

—কী জানি। সুলতা রায় যেন কেমন অস্বোয়াস্তি অনুভব করছেন। কেবলি যেন মনে হচ্ছে মিনতির সঙ্গে ঠিক আগের মতো মিশতে পারছেন না প্রাণখুলে। এই দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে কোথা থেকে যেন এক রাস সংকোচ এসে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

—সুলতা রায় আনসোস্যাল।

বারে বারে তাঁর দুর্বল মন তাঁকে চাবুক মেরে সজাগ করে দিচ্ছে যেন—আনসোস্যাল—আনসোস্যাল!

মিনতি আশ্চর্য হয়ে বল্‌লে—তোর হল কি বল তো? মনে যেন সে স্ফূর্তি নেই!

সুলতা রায় একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন—না, শরীরটা তেমন ভালো নেই। তা ছাড়া আজ রাত্তিরের ট্রেনেই আবার ফিরে যেতে হবে। চল একবার ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে আসি।

—তুই আজই যাবি!

সুলতা রায় বল্‌লেন—তা ছাড়া উপায় নেই। মেয়েদের একগাদা খাতা জমে রয়েছে। বুঝতেই তো পারছিস দায়িত্ব কম না।

মিনতি আলাপ করিয়ে দিল—সুলতা, এ ভদ্রলোকের আর নতুন পরিচয় কি দেব—

সুলতা একটু হাসলেন তাপসের দিকে তাকিয়ে।

মিনতি এবার তাপসের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—আর ইনি হচ্ছেন সুলতা রায়, হেড্‌মিস্ট্রেস—

হঠাৎ একটা আঘাত যেন লাগল সুলতার বুকে। এক মুহূর্তে তাঁর মুখখানা কিরকম বেদনায় বিকৃত হয়ে গেল। তবু ছোট্ট নমস্কার করে বললেন—খুশি হলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে।

কিন্তু বুকে তাঁর আঘাত বিঁধে রইল। এটা সত্যি আশা করতে পারেন নি—মিনতির কাছ থেকে।—হেড্‌-মিস্ট্রেস—মিনতির কাছেও তিনি হেডমিস্ট্রেস—তাপসের কাছেও, বোধহয় বিশ্ব-সুদ্ধ লোকের কাছে তাঁর এই পরি-চয়টুকুই সম্বল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস লুকিয়ে ফেললেন সুলতা রায়। বুঝলেন, বাঁচবার জন্যে যেটুকু অবলম্বন সেইটুকুই হল আসল পরিচয়—নিজের সত্তার চেয়ে—অন্তরের চেয়ে—বন্ধুতার চেয়ে। আশ্চর্য! তবু হাসতে হল সুলতা রায়কে কিন্তু হাসাতে পারলেন না। মোটামুটি দু'চারটে কথা-বার্তা হল।

তাপসরঞ্জন জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় কাজ করছেন?

সুলতা উত্তর দিলেন—কালনায়।

—এ্যালাওয়েন্স ট্যালাওয়েন্স কি রকম দেয়?

—মোটামুটি একরকম।

—আপনি এম-এ-টাও পড়ে নিলেন না কেন?

—ইচ্ছে ছিল কিন্তু সম্ভব হয় নি।

—কেন এখনো তো আপনার বয়েস রয়েছে—এনার্জিও আছে বলে মনে হয়। এম-এ-টা দিয়ে দিতে পারলে ভবিষ্যতে এ লাইনে আরও উন্নতি করতে পারবেন।

সুলতা রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। মাথাটা কিরকম ঝিম ঝিম করছে। আর ভালো লাগছে না তাপসের সঙ্গে কথা বলতে। এখন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে চান—একটু বিশ্রাম।

তাপসরঞ্জন বললে—বড়ো সুন্দর লাগে আপনাদের এই স্বাধীন জীবনযাত্রা। ইচ্ছে রইল ছুটি পেলেই একদিন আমরা দুজনে আপনার কোয়ার্টারে বেড়াতে যাব। কি বলুন?

সুলতা রায় এ কথায় যেন একটু থমকে গিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে তাঁর সমস্ত অন্তর ছেয়ে খুশি আব উৎসাহের বন্যা নেমে এল। সমস্ত লোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে চঞ্চল হয়ে জেগে উঠল রোমাঞ্চ। হাতের মুঠোয় হাল্‌কা ভ্যানিটি ব্যাগটা বহুদিন পর আবার মৃদু দোলায় দুলে উঠল। এ উত্তেজনা ছিল বহুদিন আগে তাঁর কলেজী জীবনে।

সুলতা রায় হেসে বল্‌লেন—বেশ তো. যদি যান আপনারা তা হলে সত্যিই খুশি হব। কিন্তু—

—কিন্তু কি?

সুলতা রায়ের কণ্ঠ হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে গেল। লজ্জা—শুধু লজ্জা। এত লজ্জা যে কোথায় এতকাল চাপা ছিল কে জানে? কণ্ঠরোধ করে লজ্জা এসে রঙ বদ্‌লালো সুলতা রায়ের মুখের।

ফিস ফিস করে মিনতির কানে কানে বল্‌লেন—কিন্তু এখন নয়। নেমন্তন্ন আমি নিজেই করব একদিন আমার নতুন সংসারে। হঠাৎ বলতে গিয়ে যেন কিরকম বেধে গেল। একটা ঢোঁক গিলে তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করে নিলেন সুলতা রায়—অবশ্য যদি কোনো দিন তোদের মতো সংসারী হতে পারি।

তোমাকে

আনন্দ বাগচী

তুমি নারী মহিয়সী, এ-জীবনে শক্তির উচ্ছ্বাস,
শান্তির প্রবাহ আর সমৃদ্ধির উত্তুঙ্গ শিখর,
যুযুৎসু জীবনে মোর তুমি হবে অমর নিশ্বাস
এই তো ক'রেছি আশা, কথা মোর ক'রেছে নিথর
আজ দেখি, তোমারি বধির প্রত্যাখ্যান,
বৃথাই ক'রেছি আশা, তুমি হবে মৃত্তিকার গান।

তুমি যে আমার ঘরে এক মুঠো প্রাণের বিলাস
একদা কখনো হবে, একথা কখনো ভাবি নাই,
শয্যাব সমৃদ্ধি হবে, রমোন্যাস রাত্রির সমাস
বাঁধবার প্রয়োজনে, আজ আমি মর্মাহত তাই!
আমার সমস্ত সত্তা, শক্তি আর সব সম্ভাবনা
একেবারে মুছে দিল সংরম্ভিত তোমার ঘোষণা!

কেন আমি বীর্যহীন, কেন আমি ভীরু পরাঙ্মুখ
ভেবেছ কখনো প্রিয়া, আমার এই অপমৃত্যু কেন?
হীন-স্বার্থ পলাতক, কেন আমি সংগ্রাম বিমুখ?

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে মহাপ্রভু

শ্রীজনরঞ্জন রায়

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিঃ" ইত্যাদি, চৈতন্য-চরিতামৃতে মহাপ্রভু কথিত একটি শ্লোক আছে। তাহার অর্থ—আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব বা শূদ্র নই...... আমি গৃহী, যতী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীও নই, আমি গোপীভর্ত্তার (শ্রীকৃষ্ণের) পদকমলের দাসের অনুদাস।

—মহাপ্রভুর এই উক্তি হইতে মনে হয় তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্মকে স্বীকার করেন নাই। আবার ঐ চৈতন্য-চরিতামৃতেই রায় রামানন্দ সংবাদে অন্যপ্রকার উক্তি আছে। রায় রামানন্দ বলিতেছেন—"বর্ণাশ্রমাচাররতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্, বিষ্ণুরারাধ্যতে নান্যত্তত্তোষকারণম" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ)। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—'রায় কহে স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়, প্রভু কহে ইহবাহ্য আগে কহ আর'। সরলার্থ এইরূপ—বর্ণাশ্রম-আচারবান পুরুষই পরম-পুরুষ বিষ্ণু আরাধিত হন, বিষ্ণুর তুষ্টিবিধানের অন্য কোন উপায় নাই।

—উপরোক্ত শ্লোক বর্ণাশ্রম সমর্থক।

সুতরাং স্ববিরোধী এই দুইটি উক্তি।

পুরীতে অভুজ্যান্ন কেহ নিমন্ত্রণ করিলে মহাপ্রভুর জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ 'বন্ধনী' ছিল। অর্থাৎ পাঁচগণ্ডা কড়ি মূল্যের দাইল, তরকারী ও অন্ন প্রভৃতি। কিন্তু ভুজ্যান্ন বিপ্র নিমন্ত্রণ করিলে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ কিঞ্চিৎ ও ঘরে ভাত রান্না হইত। ইহা হইতে বুঝা যায় ভুজ্যান্ন বিপ্রের হস্তেই মহাপ্রভু আহার করিতেন। ভিক্ষা (আহার) সম্বন্ধে মহাপ্রভু এই আচরণ সর্বত্র পালন করেন। এমন কি তীর্থযাত্রায় সঙ্গীও ব্রাহ্মণ।

সব কাঠই বাহাদুরী কাঠ নয়..... গোবরে পদ্মফুল ফোটে না—ভুক্তভোগীরা জানেন সদাচার ব্রাহ্মণের মধ্যেই প্রধানভাবে দেখা যায়। তবে 'চণ্ডালোপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ' হইতে পারেন 'হরিভক্তি পরায়ণঃ' হইলে। এইরূপ চণ্ডলকে 'তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং'—অর্থাৎ হরিভক্তি পরায়ণ চণ্ডালকে (ব্রাহ্মণের মতন) দান করিবে এবং তাঁহার দান লইবে, শাস্ত্র বলিয়াছেন।

তথাপি মহাপ্রভুর চরিত্রে বিরুদ্ধ ভাব ও রসের সমাবেশ আছে। তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

সনোরিয়া ব্রাহ্মণের হাতে মথুরা দেশে কেহ খায় না। মাধবেন্দ্র পুরীর আনুগত্যে মহাপ্রভু তাঁহার গৃহে ভোজন করেন। সনোরিয়া (সনাঢ়) হইলেও তিনি তো বিপ্র ছিলেন।

মহাপ্রভুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সনাতন গোস্বামীও বলিতেন— "বিপ্রগৃহে স্থূলে ভিক্ষা কাহা মাধুকরী" (চৈঃ চঃ)। মহাপ্রভুর পার্ষদগণের সদাচার রক্ষার এই দৃষ্টান্ত বৈষ্ণবগ্রন্থ সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছেন।

কোন দিন কোন (ব্রাহ্মণ) ছাত্রের কপালে তিলক না দেখিলে মহাপ্রভু বলিতেন—আজ বুঝি তোমার সন্ধ্যা বন্ধ্যা হইয়াছে?...... সন্ধ্যা করিয়া এসো (চৈতন্য ভাগবত)। 'ব্রাহ্মণের কপালে যদি তিলক নাহি থাকে, শ্মশান সদৃশ হয় বেদে বলে তাকে'। এইরূপে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মর্যাদা স্থাপন করেন মহাপ্রভু।

গয়া গমন কালে মন্দারে মহাপ্রভুর সঙ্গিগণ (ছাত্রগণ) একটি দুরাচার ও কদাকার ব্রাহ্মণের প্রতি কটাক্ষ করেন। সঙ্গীদের শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু নিজ দেহে জ্বর প্রকাশ করেন। সঙ্গিগণ প্রতিকারের চেষ্টায় বিফল হইলে মহাপ্রভু সেই বিপ্রটির পাদোদক পান করেন এবং তাহাতে তাঁহার জ্বর-মুক্তি হয়।—এখানেও তিনি সপ্রমাণ করেন শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি "মামকী তনুঃ" প্রভৃতি, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের দেহ ভগবৎ তনুর সমান।

এক স্থানে দেখি একটি উড়িয়া রমণী পুরী মন্দিরে গরুড় স্তম্ভে একটি পা দিয়া মহাপ্রভুর স্কন্ধে অন্য একটি পা রাখিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছে! গোবিন্দ ঐ রমণীকে নিষেধ করিলেন এরূপ করিতে। মহাপ্রভু বলিলেন—"আবিবেশ্যা এ স্ত্রীকে না করো বর্জন, এত আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা"। আবার অন্য স্থানে আছে—একটি উড়িয়া স্ত্রীলোক জয়দেবের গীতগোবিন্দ গুর্জ্জর রাগিনীতে গান করিতেছে, মহাপ্রভু সুরে আকৃষ্ট হইয়া সিজের কাঁটা ভাঙিয়া দৌড়িতেছেন... গোবিন্দ ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন গান গাহিতেছে একজন স্ত্রীলোক যে! সম্বিৎ পাইয়া মহাপ্রভু বলিলেন—"স্ত্রী পরশ হইলে মোর হইত মরণ"...... তুমি আমাকে বাঁচাইলে গোবিন্দ (চৈঃ চঃ)।

এইরূপে হেগেল বর্ণিত থিসিস্‌ ও এন্টিথিসিস্‌ মহাপ্রভু চরিত্রে একত্রে সমাবেশিত ছিল। এই ভেদাভেদ যেখানে একত্র হইয়াছে সে চরিত্র অতি মহান। বিরুদ্ধ ভাব ও রসের সমাবেশ ছিল বলিয়াই তিনি মহা-প্রভু। উপনিষদে আছে—"নামরূপে বিহায়"। অর্থাৎ সমুদ্রে গিয়া যত নদনদী পড়ে তাহারা নাম ও রূপ সমুদ্রে বিলীন (immerge) করে, কোন ভেদচিহ্ন থাকে না...... একীকরণ হয় তাহাদের সমুদ্র মধ্যে। মহাপ্রভু চরিত্রে বর্ণাশ্রম সমর্থক ও বর্ণাশ্রম-বিরোধী বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। স্ত্রী স্পর্শনে জীবন যাইবে নিজেই বলিলেন, তথাচ একটি ক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শন-রত স্ত্রীলোকের স্পর্শনের বিরোধিতা করেন নাই।

এইরূপ বিরোধী রসের সমাবেশ মহাপ্রভুতেই সম্ভব হইয়াছিল।

ব্যর্থ যৌবনের গান

বটকৃষ্ণ দাস

এ-যৌবন ব্যর্থ হ'লো। দিনান্তের চিতাগ্নি শিখায়
চৈত্রের পলাশ জ্বলে! ম্রিয়মাণ দিগন্তের গায়
জ্বলে লাল কৃষ্ণচূড়া! এইবার আকাশে ধূসর
সন্ধ্যার পায়ের শব্দ; রাত্রির নির্জন কণ্ঠস্বর!

অনেক দিয়েছো তুমি। কাছে এসে নীরবে, নিভৃতে
বিনামূল্যে মহামূল্য জীবনের গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে
তোমার দানের পাত্র লীলায়িত চিত্তের হরষে
প্রতিদিন পূর্ণ ক'রে রূপে, রঙে, রসে
দিয়েছো আমার হাতে। দিয়েছো যৌবন,—
অগাধ সমুদ্র-স্বপন,—বিস্ময়ের অরণ্য-কূজন
জীবনের চারিদিকে; পরম আগ্রহে
আদিগন্ত কুহকের মুগ্ধ সমারোহে
আমাকে নিয়েছো টেনে। হে অনন্যা, হে আমার পরমা
গৃহিনী
আমার চাওয়ার আগে দিলে সব,—তাই আমি সবচেয়ে ঋণী।

সেই ঋণ প্রতিদিন আমার ভাঁড়ারে
জমেছে বিপুল হ'য়ে! ইন্দ্রনীল দিগন্ত-বিস্তারে'
সমুদ্রের কলোচ্ছ্বাসে, অরণ্যের অস্থির বিদ্রোহে,
গ্রীষ্মের দুঃসহ তাপে, বর্ষার মন্থন-মন্ত্রে,
ফাগুনের দুর্বিনীত মোহে
সে-ঋণের বোঝা নিয়ে তবু এই যৌবনের তীব্র-উন্মাদনা
অগস্ত্য-তৃষ্ণার তীর্থে জীবনের পাদপীঠে রক্তের আল্পনা
অজস্র অক্ষরে লিখে,—বারবার ব্যর্থ-হতাশ্বাসে
ফিরেছে বিদীর্ণ হ'য়ে। কামনার কারুশিল্পে,
চৈত্রের পলাশে
অবশেষে সন্ধ্যা এলো; এলো রাত্রি কান্নায় মলিন,
কামনা যাওয়ার আগে ঝ'রে গেল কামনার দিন।

তবুও দিয়েছো তুমি। দিয়েছো উজ্জ্বল দিন, আর তারপর
দিলে রাত্রি; দিলে এই বেদনার জ্বর,
ক্লান্ত, নীল অন্ধকার। ভস্মীভূত চৈত্রের পলাশে
শেষ-গোধূলির নদী আরক্তিম স্বপ্নের আকাশে
তবুও দিয়েছো জ্বেলে। হে অনন্যা, এইবার বলো,—
নক্ষত্রের পদশব্দে এই ম্লান, অশ্রু-ছলোছলো
রাত্রি কি দেবে না ভরে? দেবে না কি এই চেতনার
অন্ধকার রুদ্ধদুর্গে বন্দী-বেদনার
সব দ্বার খুলে আজ? দেবে না কি হায়
আমার স্বপ্নকে মুক্তি রাত্রির অতল কবিতায়?

এই মর্ত্যভূমি

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

আজ আর কিছুতেই পড়তে ইচ্ছে করছে না। বার কয়েক চেষ্টা করে ক্যাল্‌কুলাসের বই বন্ধ করলো সুকুমার। সিগ্রেট খেতে খেতে কিছুক্ষণ পায়চারী করলো। দোতালায় ঘর সুকুমারের—তার পাশেই হেলেন-নোয়েলের ঘর। সুকুমার আস্তে আস্তে তাদের দরজায় টোকা মারলো।

এসো।

সুকুমার ভেতরে ঢুকে দেখে দুজনে মুখোমুখী চুপ ক'রে বসে বই পড়ছে।

মণিকাকে দেখতে এলাম—ও জেগে আছে হেলেন?

না—কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই ধড়্‌মড়্ করে খাটের ওপর উঠে বসলো মণিকা, সুকুমার চকলেট প্লিজ্—

ছিঃ মণিকা, লজ্জায় মুখ লাল হয়ে গেল হেলেনের, ও রকম ক'রে চকলেট চাইতে হয় না।

হেসে নোয়েল বললো, ওকে নষ্ট ক'রে দিচ্ছ সুকুমার—খালি চকলেট দিয়ে দিয়ে লোভ বাড়িয়ে দিয়েছ।

ওদের কারুর কথায় কান না দিয়ে মণিকাকে আদর ক'রে সুকুমার বললো, কাল তোমাকে এক বাক্স চকলেট দেব মণিকা—

ঠিক দিও—ভুলো না কিন্তু।

ঠিক দেব।

ছি ছি, মণিকা কী ভীষণ অসভ্য হয়েছে দেখছ নোয়েল—শোন সুকুমার।

শুনছি, হেসে সুকুমার বললো, ও শুধু আমার কাছেই চায় আর কারুর কাছে চায় না—আমি ওর বয়-ফ্রেন্ড্ কি-না!

এবার হাসতে আরম্ভ করলো স্বামী-স্ত্রী।

বাড়ীতে, সুকুমার লক্ষ্য করেছে নোয়েলকে সবাই বেশ সমীহ করে। এদের মধ্যে তার অবস্থা সব চেয়ে ভালো—মাসিক আয় তার নাকি দেড় হাজার টাকা। সেই জন্যে হেলেনেরও খাতির এ বাড়ীতে একটু বেশী। নোয়েল চার্টার্ড একাউন্টেন্ট—তাই বাড়ীরও হিসাব-পত্র সেই রাখে। সংসার খরচের সমস্ত টাকা প্রত্যেকে সপ্তাহে সপ্তাহে তার হাতেই দেয়। সুকুমারকেও ভাড়া দিতে হয় নোয়েলকে। মোটা একটা খাতা করেছে নোয়েল—সেখানে লেখা আছে এদের সকলের নাম।

ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে তেতলায় উঠলো সুকুমার। এ-তালার দুটো বড় বড় ঘর—একটাতে অড্রি—পিটার অন্যটাতে আর্থার মারজোরী আর জন—চার্লস।

দরজায় টোকা মেরে সুকুমার বললো, আসতে পারি অড্রি? দুজনে একসংগে ব'লে উঠলো, এসো এসো সুকুমার।

এঘরেও একটা রেডিও আছে। পশমের কি একটা বুনতে বুনতে অড্রি তাই শুনছে। আর খবর কাগজ খুলে চুপ করে বসে পিটার মুচকি-মুচকি হাসছে।

কি সুকুমার, কক্‌নি উচ্চারণে পিটার বললো, আজ পড়াশুনো নেই তোমার?

ইচ্ছে করলো না।

অত পড়না সুকুমার, অড্রি বললো, একটু রোগা হ'য়ে গেছ যেন!

ও কিছু না, স্মার্ট হচ্ছি।

কলেজ কেমন লাগছে তোমার?

ভালো, কিন্তু জানো অড্রি, এত কাজ এদেশে—এতো দেখবার যে পড়াশুনো করবার সময় বড় কম—

পিটার তো তো ক'রে বললো, আমি তো এখানে কিছুই দেখিনি—অথচ এতদিন আছি এদেশে—

আঃ থামো তুমি—তোমার মতো কুনো মানুষ হয় নাকি? বাড়ী থেকে বেরোবার নামে ওর জ্বর আসে—

সুকুমার পিটারের পক্ষ নিয়ে বললো, বেচারা সারাদিন বাইরে থাকে কি-না তাই একটু সুযোগ পেলেই ঘরে থাকতে চায়—

বল তো, বল তো সুকুমার—আমার মনের কথাটা ব'লে দিলে তুমি?

একথা শুনে অদ্রি জিজ্ঞেস করলো, তুমি হাত দেখতে জানো সুকুমার?

খুব ভালো, গণক সাজবার লোভ দমন কবতে পারলো না সুকুমার।

দেখনা আমার হাতটা একটু?—

অদ্রির হাত চেপে দিয়ে সুকুমার বললো খুব নরম তোমার হাত।

হাসতে লাগলো পিটার, বাঃ বেশ বলেছ তুমি সুকুমার।

না না সত্যি ভালো ক'রে দেখ—তোমাদের দেশের লোক খুব ভালো হাত দেখতে জানে শুনেছি।

এবার খুব গম্ভীর হ'য়ে সুকুমার মন দিয়ে অদ্রির হাত দেখতে লাগলো, আলোর ঠিক তলায় এসো—সব রেখাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না—সুকুমার আড়চোখে একবার পিটার আর অদ্রিব মুখের দিকে তাকিয়ে নিল। পিটার অদ্রির চেয়ে বয়সে অনেক বড়। পিটার কুৎসিৎ—অদ্রি অপূর্ব রূপসী। ম্ভবত এদের বিয়ে বেশী দিন প্রেম ক'রে হয়নি আর বিয়েতে একটু পারিবারিক গোলযোগও বেধেছিল নিশ্চয়ই। পদার্থ বিজ্ঞানের মাথা সুকুমারের—এ হিসেবে নিশ্চয়ই তার ভুল হবেনা। চোখ বুজে ঢিল ছুঁড়ে দেখা যাক্‌না কি হয়।

তোমাদের বিয়ের কোনই ঠিক ছিল না—হঠাৎ হুপ ক'রে হ'য়ে যায়—

ঠিক বলেছ সুকুমার—আরও বল।

কিন্তু, হাসতে হাসতে পিটার বললো, আমি যেন তোমাকে সাউদাম্পটন্ বোতে লাঞ্চ্ খেতে খেতে কথাটা বলেছিলাম মনে হচ্ছে—

সুকুমার তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিয়ে বললো, বলেছিলে নাকি, কই শুনিনি তো—

আঃ তুমি চুপ কর পিটার—নাও আরো বল সুকুমার?

তোমাদের বিয়েতে অদ্রি, তোমার বাড়ীর লোক খুব রেগে যায় আর—

ঠিক বলেছ, সুকুমার, মা বাবার সংগে আজও আমার মিটমাট হয় নি।

হবে হবে—ঘাবড়িও না।

হবে? কবে মিটমাট হবে সুকুমার?

খুব শীগ্‌গিরই—

তবু কবে?

পিটার সিগ্রেটে একটা টান মেরে বললো, খুব সাবধান সুকুমার তারিখ বলতে যেওনা তাহ'লে বিদ্যে ধরা পড়ে যাবে।

ইচ্ছে করলেই বলতে পারি. মাতব্বরী চা'লে সুকুমার বললো, তবে তাহ'লে হোম্ করতে হ'বে।

অধৈর্য্য হ'য়ে অদ্রি বললো, তাই তুমি কর—কিন্তু হোম্ কি?

হাসি চেপে সুকুমার বললো, হোম্ কি সেকথা বলা বড় মুস্কিল—আর সেটা করায় হ্যাঙ্গাম অনেক—খরচও বড় বেশী।

ঠিক বলেছ সুকুমার, কাগজ নামিয়ে রেখে পিটার বললো, বেশ চালাক ছেলে তুমি—

তুমি ঘাবড়িও না. অদ্রি, শীগ্‌গিরই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

তোমার কথা সত্যি হোক্ সুকুমার!

অদ্রি-পিটারের ঘরের সামনেই আর্থার-ম্যারজোরী। সেখানে এসে সুকুমার দেশের গন্ধ পেল যেন। আর্থার জনকে ঘুম পাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে আর মারজোরী দিশেহারা হ'য়ে কি ক'রে চার্লসের চিল-চীৎকার থামাবে তাই ভাবছে।

ক্ষমা ক'র সুকুমার, এই হট্টগোলে কিছু মনে ক'রোনা, মারজোরী একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে তাকে বসতে বললো।

এখন তোমরা ব্যস্ত—আমি বরং পরে আসবো।

ব'সো, আর্থার তার হাত ধ'রে তাকে বসিয়ে দিল, লিবারেল্ দলের লোক সব সময় ব্যস্ত—দেশের চিন্তায় তাদের নিশ্বাস নেবার সময় নেই।

তাই নাকি?

নিশ্চয়ই।

আর্থার-মারজোরী লিবারেল। অদ্রি-পিটার লেবার। হেলেন-নোয়েল কনজারভেটিভ। আর সতেরো বছরের এডওয়ার্ড কম্যুনিষ্ট্—তাই চোখ বুজে উরসুলাও কম্যুনিষ্ট—ছেলে যা বলে সবই সত্যি। খাবার টেবিলে যখন তর্ক হয়—সে এক শোনবার জিনিষ। সুকুমারকে প্রত্যেকেই নিজের দলে ভেড়াতে চায়। কিন্তু সুকুমার বলে, দাঁড়াও আগে ভালো ক'রে হাল চাল বুঝি।

সতেরো বছরের এডওয়ার্ড বলে. তুমি নিঘাত কনজারভেটিভ সুকুমার।

কাঁটা দিয়ে আলু বিঁধতে বিঁধতে নোয়েল আস্তে আস্তে বলে, স্থির-মস্তিষ্কের লোক মাত্রেই কনজারভেটিভ।

চেঁচিয়ে বলে সতেরো বছরের এডওয়ার্ড, আর বুদ্ধিমান মাত্রেই কম্যুনিষ্ট্।

লিবারেল আর্থার হেঁকে ওঠে, আর যাদের বুদ্ধি আছে আর মাথাও ঠাণ্ডা তারা হ'লো লিবারেল্।

যার যা' খুশী হও, তো তো ক'রে পিটার বলে, দু'দিন পরে সবাইকে লেবারে নাম লেখাতেই হবে—

মারজোরী হঠাৎ বলে ওঠে, এই রে চার্লসটা আবার কাঁদছে—যাও শীগগিরই আর্থার দেখ কি হ'লো—

লিবারেলের জয়, লিবারেলের জয়—আর্থার ছুটে বেরিয়ে যায়।

উরসুলা নিজের থেকেই কথা ব'লে যায়, আমি জার্মান জানো সুকুমার—তবু আমার কোন সংস্কার নেই, ইংরেজকে আমি ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলাম—আর ইংলণ্ডকে আমি ভালোবাসি খুব।

আমিও ইংলণ্ডকে ভালোবেসেছি উরসুলা।

যুদ্ধ আমাদের যতই ক্ষতি করুক না কেন—অনেক লাভও হয়েছে আমাদের—ধরো আমরা সকলে একসংগে এক বাড়ীতে যে-ভাবে আছি যুদ্ধের আগে সেটা কেউ কল্পনাও করতে পারতো না।

অথচ তোমাদের মতামত একেবারে আলাদা।

তবু আমরা মানুষ—যুদ্ধ আমাদের সেটা ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছে—আর এভাবে থাকলে কত কম খরচে—কত সুখে থাকা যায়—এভাবে না থাকলে, আমি অক্সফোর্ডে কাজ করি—কে এডওয়ার্ডের দেখা শোনা করবে—হস্টেলের খরচ আমার দেবার ক্ষমতা নেই। আর মারজোরীকে দেখ, নিজের ছেলে নেই তার—হবেও না বোধ হয় অথচ কী ভালোবাসে ওই নিগ্রো ছেলে দু'টোকে—যুদ্ধের আগে নিগ্রো পুষ্যি নিলে আত্মীয়দের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ বেরিয়ে যেতো, তারপর একটু থেমে বললো, তুমি কম্যুনিষ্ট হ'য়ে যাও সুকুমার আর দেরী ক'রো না—এডওয়ার্ডএর বয়স সতেরো হ'লে হবে কি, ও যা বলে একেবারে খাঁটী কথা—অমন ছেলে হয় না, কি বল সুকুমার?

তা ঠিক!

যথাসময়ে প্যারিস থেকে ক্লোদ এসে পৌঁছলো। ফরাসী ছেলে কিংবা মেয়ে আজ অবধি দেখে নি সুকুমার—তাই ক্লোদের দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলো। অবশ্য দেখবার বিশেষ কিছুই নেই— ক্লোদকে দেখেই তার ভারতীয় মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল—তার মুখ লাবণ্যে ভরা। আজ তাড়াতাড়ি সাপার খেয়ে সবাই বেরিয়ে গেল ছবি দেখতে—ক্লোদ ক্লান্ত তাই গেল না—আর সুকুমার বললো, পড়তে হবে। আসলে তার হাতে পয়সা নেই—মাসের শেষ। তাই ইচ্ছে থাকলেও এদের সংগে যেতে পারলো না। খাবার ঘরেই রেডিও খুলে খবর শুনতে শুনতে ক্লোদের সংগে কথা বলতে লাগলো।

তুমি ইণ্ডিয়া থেকে আসছো?

চেহারা দেখে তোমার অন্য কিছু মনে হচ্ছে নাকি?

ইণ্ডিয়ান আমি কখনো দেখিনি

আমিও ফরাসী কখনও দেখিনি।

তোমার দুর্ভাগ্য।

মানে ফরাসী মেয়ে দেখে—

হেসে ক্লোদ বললো, কি শিখতে এসেছ এখানে?

রসিকতা করবার ইচ্ছে হ'লো সুকুমারের, বললো, ম্যাজিক।

কি?

ম্যাজিক শিখতে এসেছি।

বল কি, ম্যাজিক জানো তুমি?

জানলে আসবো কেন, শিখতে এসেছি, একটু-একটু শিখেওছি।

একটু দেখাবে?

নিশ্চয়ই, সুকুমার উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ঘাবড়ে যেওনা যেন—বলে রেডিও বন্ধ করলো, আলো নিবিয়ে দিল।

এই, ভয়ে ব'লে উঠলো ক্লোদ, কি করবে তুমি?

আঃ, বিরক্তির ভান ক'রে সুকুমার বললো, বললুম ম্যাজিক দেখাচ্ছি ঘাবড়ে যেও না—চুপ ক'রে থাকো। ক্লোদ চুপ ক'রেই রইলো অগত্যা।

তারপর চেঁচিয়ে উঠলো সুকুমার, Let there be light ব'লেই সুইচ্ টিপলো। আলো জ্বলে উঠলো।

দেখলে? সুকুমার বললো, দেখলে ম্যাজিক? আলো ছিল না—যেই বললাম, অমনি আলো হ'লো।

এ আবার ম্যাজিক নাকি? এতো সবাই পারে।

এখন পারে—আগে পারতো না—এই শিখতেই এসেছি আমি।

অবাক হ'য়ে ক্লোদ বললো, এ আবার শিখতে হয় নাকি?

খুব হয়, ওহে মুর্খ ফরাসী মেয়ে আমি ইলেক্ট্রিক্যাল এনজিনীয়ারিংএর ছাত্র।

য়্যাঁ, এতক্ষণ পর রসিকতা উপলব্ধি ক'রে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ক্লোদ বললো, তুমি খুব বুদ্ধিমান।

তাই তো এদেশে আসা সম্ভব হ'লো।

আমি কিন্তু এসেছি শেখাতে—শিখতে নয়।

শেখাবে বটে তুমি—

তার মানে জানো আমার এগ্রাগ্যাসিও ডিগ্রি আছে।

কোথাকার?

ও ডিগ্রি প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না।

প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়? হা হা ক'রে হেসে সুকুমার বললো, শোন একটা মজার গল্প তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে—আমাদের দেশে এক ভদ্রলোকের ফরাসী ডিগ্রি আছে—ধরো তার নাম ডাঃ সেন। তার সেই ডিগ্রি তিনি কেমন করে পেলেন জানো? শোন তবে মজার গল্প। তিনি যখন প্যারিসে ছিলেন তখন তাব একটা ঘোড়া ছিল—ঘোড়াটাকে ভয়ানক ভালবাসতেন তিনি। একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে যখন তিনি ঘোড়ায় চ'ড়ে বেড়াচ্ছেন তখন দেখলেন কাছেই কাগজ-কলম-কালি নিয়ে গাছের তলায় একটি লোক চুপ ক'রে বসে আছে। ডাঃ সেনের ভয়ানক কৌতূহল হ'লো। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে লোকটার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার জানতে পারি?

আমি ডিগ্রি বিলোবার জন্যে ব'সে আছি।

সে কি, কি ডিগ্রি?

ডক্টরেট—চাই নাকি একটা?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি পেতে পারি কি?

নিশ্চয়ই, তোমার মতো লোকের জন্যেই তো আমি ডিগ্রিগুলো নিয়ে ব'সে আছি—নাম বল তোমার? নাম শুনে লোকটা খস্ খস্ ক'রে ডিগ্রিতে লিখে বললে, এই নাও—ধরো!

বাঃ, ধন্যবাদ, এবার আমি নামের পরে ডাক্তার লিখতে পারি?

আ হা হা, পরে কেন, নামের আগেই ডাক্তার লেখার অধিকার আমি এইমাত্র তোমায় দিলাম।

অনেক ধন্যবাদ—অনেক ধন্যবাদ। খুশী হ'য়ে ডাঃ সেন ঘোড়ার কাছে ফিরে এলেন। হঠাৎ তার কি মনে হ'লো আবার লোকটার কাছে ফিরে গিয়ে বললেন দেখুন—

হ্যাঁ, কি হ'লো?

দেখুন, আমি আর একটা ডিগ্রি পেতে পারি?

আবার কি, এই তো দিলুম তোমায় একটা—

না না, আমার জন্যে নয়, আমার জন্যে নয়—আমার ঘোড়াটার জন্যে—ওকে আমি খুব ভালবাসি কি-না—

লোকটি বিনীতভাবে বললো, আমি খুব দুঃখিত ডাঃ সেন—তোমার ঘোড়ার জন্যে ডিগ্রি দিতে পারলাম না, কেন না আমার ডিগ্রি শুধু গাধাদের জন্যে, ঘোড়াদের জন্যে নয়—

গল্প শেষ ক'রে সুকুমার খুব জোরে হেসে উঠলো। ক্লোদ কিন্তু একেবারেই হাসলো না। ছল ছল ক'রে উঠলো তার চোখ, ম্লান মুখে শুধু বললো, প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে তোমাদের দেশের লোকের এই ধারণা বুঝি, ছি ছি ছি—জানো ওটি হ'লো পৃথিবীর একটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়—

ওকে আবার বিশ্ববিদ্যালয় ব'লে নাকি? যে যায় সেই তো ডক্টরেট ডিগ্রি পায় শুনি—

না, অত সোজা নয়—দু' রকম ডক্টরেট ডিগ্রি আছে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের—একটার নাম হ'লো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট—সেটা সবাই পায়—বেশীর ভাগ বিদেশীরা, আর একটাকে বলে ষ্টেট্ ডিগ্রি—সেই ডিগ্রি পাওয়া রীতিমত কঠিন।

প্যারিসের আবার শক্ত ডিগ্রি—ওদের পড়াশুনো করবার সময় কোথায়—নাচ গান আর হৈ-হল্লা নিয়েই তো আছে ওরা—

এবার এক কাণ্ড হ'লো। ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেললো ক্লোদ, যা ভাবো তা নয়—তোমরা বিদেশীরা প্যারিসকে—সমস্ত ফ্রান্সকে বড় ছোট ক'রে দেখ কিন্তু গেলে বুঝতে পারবে—আমাদের দেশ যা ভাবো তা নয়—তা নয়—তা নয়—

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সুকুমার। ঠাট্টা করতে করতে এ কি ক'রে বসলো। বেচারী এসেছে আজ প্রথম দিন। বাড়ীর লোক শুনলে কি ভাববে সুকুমারকে। বড় ফাজিল হ'য়ে গেছে সে—কাণ্ডজ্ঞান নেই একেবারে—জিবের রাশ দমন ক'রতে হবে এবার থেকে।

ছি ছি, ক্লোদ তুমি কাঁদছো, আমি ঠাট্টা করছিলাম তোমার সঙ্গে—আমি কি এতই বোকা যে তোমাদের দেশ সম্বন্ধে কিছুই জানি না—ফ্রান্সের গৌরবময় ইতিহাস কোন্ জাত না জানে—

তবু থামেনা ক্লোদ। সুকুমার আস্তে আস্তে উঠে রেডিও খুললো—তারপর কাঁটা ঠিক জায়গায় এনে ধরলো প্যারিস ষ্টেশন।

ও কি গান হচ্ছে ক্লোদ?

এবার ও চোখের জল মুছে কথা বললো, অনেক পুরোনো রেকর্ড ওটা—

গানের কথাগুলো কি?

পার্লে মোয়া দ' আমুর।

তার মানে কি ক্লোদ?

আমাকে প্রেমের কথা বলো।

কি মিষ্টি সুর, ঠিক আমাদের বাংলা গানের মতো?

সে-গান সত্যি ভালো লাগলো সুকুমারের!

বড় চেঁচায় সতেরো বছরের এডওয়ার্ড, এই সুকুমার চীজের প্লেটটা এগিয়ে দাও—যাঃ ছুরি গেল পড়ে—কই আরও রুটি নিয়ে এসো হেলেন—চুপ ক'রে দেখছ কি এলিজাবেথ্—আর এক কাপ্ চা চাই নাকি তোমার—আহাহা পামেলা ওই বড় কেকের টুকরোটা আমাকে দাও—

বাড়ন্ত ছেলে তাই ওর হাঁ একটু বড়, আস্তে আস্তে বলে কুড়ি বছরের এলিজাবেথ।

সুকুমার মনে মনে ভাবে, একটু নয় বেশ বড় হাঁ। খেতে পারে বটে সতেরো বছরের এডওয়ার্ড।

আজ টেবিল বেশ ফাঁকা। উরসুলা আসতে পারেনি অক্সফোর্ড থেকে এ-শনিবার। ক্লোদ গেছে কোন বন্ধুর বাড়ী। মণিকা আর জনকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে গেছে নোয়েল। হেলেন যায়নি কেন না আজ বিকেলের চা করবার পালা তার। অব্রি-পিটার, মারজোরী-আর্থার গেছে কোন দূরে সস্তায় কার্পেট কিনতে। চার্লসকে প্যারেম্বুলেটারে শুইয়ে হেলেন চোখ রেখেছে।

আজ পামেলার চা খাবার কথা—তাই সুকুমার যায়নি কোথাও। সতেরো বছরের এডওয়ার্ডের কুড়ি বছরের এলিজাবেথকে এই প্রথম দেখলো সুকুমার। বেশ দেখতে সে—কোন অপিসে টাইপিস্টের কাজ করে।

হেলেন জিজ্ঞেস করলো, আর কি নেবে পামেলা?

কিছু না ধন্যবাদ—আমার খাওয়া হ'য়ে গেছে।

সুকুমার?

চা আছে আর?

নিশ্চয়ই, একটু দাঁড়াও, গরম জল ঢেলে দি আরও—

হেঁকে উঠলো সতেরো বছরের এডওয়ার্ড সুন্দর টার্ট করতে পার তুমি হেলেন—দাও দেখি আমাকে আরও গোটা দুই-তিন?

হেসে পামেলা টার্টের প্লেট এডওয়ার্ডের দিকে ঠেলে দিয়ে বললো, সবগুলিই তুমি খেয়ে নাও—আর কেউ খাবে না বোধ হয়—

কেউ নয়, পামেলার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো সুকুমার।

ঘরের কি অবস্থা ক'রে রেখেছ সুকুমার—বড় অগোছাল তুমি, খোলা বইগুলো বন্ধ ক'রে গুছিয়ে রাখতে রাখতে পামেলা বললো, এখনও বিছানাটা করবারও সময় পাওনি?

শনি-রবিবার এরা ঘর পরিষ্কার করে না।

কিন্তু তুমি নিজে তো ক'রে নিতে পারো—কি করছিলে এতক্ষণ?

ঘরের এ অবস্থার জন্যে আমি খুব দুঃখিত পামেলা, বড় ব্যস্ত ছিলাম আজ সারাদিন—বাস্তিরে পড়া হবে না ব'লে দিনের বেলা—

পরীক্ষা কবে তোমার?

তিন মাস অন্তর পরীক্ষা—প্রথম ডিসেম্বরে—ভালো রেজাল্ট করতে চাই।

বিছানা ক'রে পামেলা বললো, ঠিক করবে, যা বুদ্ধি তোমার!

কিছুই বলা যায় না—বড় শক্ত কোর্স।

আমি প্রার্থনা করবো তোমার জন্যে।

হেসে সুকুমার বললো, ভগবানে বিশ্বাস কর তুমি?

করি বৈকি—তুমি?

না, ভুলে যেওনা আমি বিজ্ঞানের ছাত্র।

তাই বলে ভগবানে বিশ্বাস না করবার কি আছে?

সর্বনাশ, আজ কি তুমি আমার সংগে ধর্ম আলোচনা ক'রে সময় নষ্ট করবে?

ধর্ম আলোচনা করলে সময় নষ্ট হয় না।

সেটা রবিবারে করাই ভালো—আজ শনিবার।

ওতো সিগ্রেট খেওনা সুকুমার, দাও এগুলো আমি নিয়ে যাবো—আর খেতে পাবে না তুমি—

আরে রে রে কর কি, কাল রবিবার কোথাও সিগ্রেট কিনতে পাবো না—

কাল তো আমাদের বাড়ী যাচ্ছ?

বলেছি না, আমি কিছু ভুলি না, কখন যাবো?

পাঁচটা-ছ'টায় গিয়ে পৌঁছিও—ডিনার খাবে আমাদের সংগে—

ধন্যবাদ—কেমন ক'রে যাবো বলে দাও?

চেয়ারিং ক্রস্ থেকে সাদার্ণ রেলওয়ে নেবে—মিনিট পনেরো-কুড়ি লাগবে ব্ল্যাক্‌হিথ্ ষ্টেশনে পৌঁছতে, সেখান থেকে যে কোন বাস্—কিংবা হেঁটেও আসতে পারো—বাড়ীর নম্বর ৩৫ সুটারস্ হিল্ রোড—লিখে নাও সব—

আমার নাম সুকুমার—আমি সব মাথায় লিখে নিয়েছি।

ঘরে মরবে কাল, যা' খুশী হবো আমি তাহ'লে—ব'সো পামেলা, খাটের ওপর পামেলাকে পাশে বসিয়ে সুকুমার বললো, আমি জব্দ হ'লে তুমি খুব খুশী হও না?

না গো না, সুকুমারের একটা হাত কোলে নিয়ে পামেলা

বললো, কী সুন্দর তোমার আঙুলগুলো! নখ্ পরিষ্কার কর না কেন?

রূপচর্চা করবার আমার সময় নেই পামেলা।

কত ব্যস্ত লোক তুমি। আমি শুধু তোমার সময় নষ্ট করি, না সুকুমার?

ও হাসলো, আমার মূল্য আরও বাড়িয়ে দাও!

আমি কি আর দিতে পারি তোমায়?

তাতে জানি না কিন্তু—

বল—

ওই দেখ পামেলা—

জ্বলে উঠেছে আলেকজান্দ্রা প্যালেসে সারি সারি আলো। সমস্ত প্রাসাদ ঝলমল করছে আর আস্তে আস্তে যেন কাছে স'রে আসছে।

চল একদিন দুজনে গিয়ে দেখে আসি কেমন ক'রে জ্বালায় ওরা অত আলো।

চল—আজ যাবে সুকুমার?

আজ নয়—আজ দূর থেকে—পা-মে-লা—

না না—

জীবনে প্রথম চুম্বনের স্বাদ পেল সুকুমার। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কে দরজায় টোকা দিল, টক্ টক্ টক্। লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে সুকুমার ক্লোদকে দেখলো।

আমি খুব দুঃখিত—পামেলাকে দেখে ও বললো, আমি পরে আসবো—

এসো ক্লোদ—পামেলা সুইট—আমার বন্ধু—আর ক্লোদ—আমাদের অতিথি—

ওরা কথা বলতে লাগলো। আর সুকুমার তাকিয়ে রইলো প্যালেসের সেই মুখর আলোগুলির দিকে। অনেকক্ষণ জানলার পর্দা সে ইচ্ছে করেই টানলো না। তার রক্ত যেন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে—আবেশে কাঁপছে সমস্ত শরীর—এ শিহরণ কেমন ক'রে থামাবে সে! [ক্রমশঃ

গাঁয়ের স্মৃতি

বীনাপাণি ভট্টাচার্য্য

ফাগুন সন্ধ্যার উদাস হাওয়া
দোল্ দিয়ে গেল বুকে,—
বাতায়ন পাশে বসিনু যদিও
মন সে স্বপ্নালোকে।
ছেড়ে আসা সেই গ্রামখানি মোর
'কংস' নদীর তীরে,
হাতছানি দিয়ে ডাকে যেন আজো
আয় আয় আয় ফিরে।
সাত পুরুষের স্নেহ দিয়ে ঘেরা
আমার প্রতিটি ধূলি,
কোন্ সে সুখের মোহের পরশে
বাঁধন দিলিরে খুলি!
'সুনাই গাঙের' ঢেউ তোলা জলে
কচুরীর ফুল নাচে,
হেলে দুলে ওই 'পানিফল' লতা
কার বা সোহাগ যাচে!
নদীর চরের সেই খেলামাঠ
শিয়াল কাঁটার গাছে
ভরে গেছে আজ, খুঁটী দুটী শুধু
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।

দূর বনানীর পরপারে ওই
পলে পলে ডুবে রবি,
আপনার তেজে জ্বলিয়া আপনি
ক্লান্ত করুণ ছবি।
পাল তুলে তরী চলে বুক চিরে
নাই ভাটিয়ালী গান,
সব আছে তবু কিছু যেন নাই.
সব যেন হীনপ্রাণ।
ফাগুনের 'হোলি' বরষার 'বাচ্'
শরতের 'উৎসব',
আসে বারবার যায় যেন কেঁদে
কোথা গেলি তোরা সব!
পশরা সাজায়ে বসে আছি আজো
ল'য়ে বুক ভরা স্নেহ,
মরমের ব্যথা উঠে গুমরিয়া
বুঝিতে পারে না কেহ।
পারি না জানাতে নাই ভাষা মোর
বুক ফাটা ব্যথা হায়!
হারায়ে তোদের কাঙালিনী আমি
আয় তোরা ফিরে আয়!

মালয়, আনাম ও বাঙলা

চুণীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

মালয় উপদ্বীপ ও বাংলা

খৃষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হতে মালয়-উপদ্বীপে আর্য-পূর্ব হিন্দু-সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে বাঙালী বণিকগণের লব্ধ-জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গ্রীক পণ্ডিত টলেমী মালয়-উপদ্বীপ সম্বন্ধে বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাম্রলিপ্তের স্বার্থ-বাহকগণ মালয় ঘুরে অথবা কটাহ-রাজ্য হয়ে শ্যাম-আনাম-কাম্বোডিয়ায় গমনাগমন করতেন। উভয় পথেই পূর্ব ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরিবেশনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

মালয়ে প্রাপ্ত এক 'শাসনে' মহানাবিক বুধগুপ্তের নাম জানা যায়। বুধগুপ্ত ছিলেন বাঙলার মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণের অধিবাসী। 'কেডা' (প্রাচীন নাম কাটা) নামক স্থানের ধ্বংসপ্রাপ্ত হিন্দু-মন্দির হতে দুর্গা-গণেশ-নন্দী প্রভৃতি অনাম দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। পেরাক নামক স্থানে বাহন গরুড় সমেত একটি স্বর্ণ-নির্মিত বিষ্ণু-মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। কেডা ও পেরাকে প্রাপ্ত দেব-দেবীর মূর্তি গঠন প্রণালীতে বাঙলার প্রভাব সুস্পষ্ট।

চৈনিক ইতিহাস হতে জানা যায় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-শতাব্দী পর্যন্ত মালয়ে কটাহ নামক হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। পুরাণে মালয় ও কটাহ রাজত্বের উল্লেখ আছে। মালয়ে প্রথমে শৈবধর্ম এবং পরবর্তী কালে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণ-ভারতীয় শৈব ও বৌদ্ধগণের দ্বারা মালয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। চীনের সুঙ বংশের ইতিহাস হতে জানা যায় মালয়ের পাহাঙ-রাজ্যের হিন্দুরাজা সারিপাল বর্মা চীনের দরবারে প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলেন। মালয়ের পূর্ব ও দক্ষিণ-ভারতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু ও বৌদ্ধ উপ-নিবেশগুলি খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। চতুর্দশ শতকে মালয় জাভার মজপ-হিট রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে মালয় উপদ্বীপ আরবদের দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল। আরবের মুসলমানগণ মালয়বাসীদের হিন্দু বলেই অভিহিত করে গেছেন।

অষ্টম শতাব্দীতে সমগ্র মালয় উপদ্বীপ ও দ্বীপময় ভারত শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। জাভায় প্রাপ্ত এক 'শাসন' হতে প্রমাণিত হয়, শৈলেন্দ্রবংশ-তিলক নৃপতি 'সবভূমিপাল' অষ্টম শতকে শ্যাম-আনাম-কাম্বোডিয়া জয় করে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের আয়তন বিশেষভাবে বৃদ্ধি করেছিলেন। বাঙলার গৌড়ের রাজগুরু কুমার ঘোষ সবভূমিপালের রাজত্বকালে শৈলেন্দ্র-রাজ্যে এক মঞ্জুশ্রী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নালন্দায় প্রাপ্ত এক 'তাম্র-শাসনে' প্রমাণিত হয় নবম শতকে বাঙলার নৃপতিকুল-তিলক পরম সৌগত দেবপাল দেবের সময়ে সবভূমিপালের পৌত্র বালপুত্রদেব নালন্দায় এক বৌদ্ধ-বিহার নির্মাণ করে-ছিলেন। দেবপাল দেব বিহারের ব্যয়-নির্বাহার্থ পঞ্চগ্রাম প্রদান করেছিলেন। বঙ্গের পালবংশের সংগে দক্ষিণ-এশিয়ার শৈলেন্দ্র বংশের সুদৃঢ় সখ্যতা স্থাপিত ছিল। তাম্রলিপ্তের বাঙালী বণিক ও নাবিকগণের সংগে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় সংযোগ সংস্থাপিত ছিল। বিশ্ব-বিখ্যাত 'বারবুদরের' (বড়ভূদরের) মন্দির নির্মাণ শৈলেন্দ্র সম্রাট-গণের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। বারবুদরের শিল্প-স্থাপত্যে বাঙলার পালযুগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বাঙলার বরেণ্য কবি সত্যেন দত্ত তাই গর্বভরে গেয়ে গেছেন—'স্থপতি মোদের স্থাপনা দিয়েছে বড়ভূদরের ভিত্তি'।

নবম শতকে জাভা ও কাম্বোডিয়া শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। দশম শতকের চৈনিক ও আরবীয় বিবরণ হতে জানা যায় দুইটি প্রধান ভূভাগ হস্তচ্যুত হলেও শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য পরবর্তী কালেও সবিশেষ শক্তিশালী ছিল। একাদশ শতকে চোল-সম্রাট রাজেন্দ্র চোল শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য আক্রমণ করে সাময়িকভাবে মালয় ও সুমাত্রার অংশ-বিশেষ অধিকার করেছিলেন। দক্ষিণ-ভারতের চোল-রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়াতে শৈলেন্দ্র-সম্রাট হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়েছিলেন। ত্রয়োদশ শতকে শৈলেন্দ্র-নৃপতি 'চন্দ্র-বাহু' সিংহল আক্রমণ করে পরাজিত হবার পরে শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্য কালসাগরে তলিয়ে গিয়েছিল। শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্য চারশো বছর পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র-শক্তিরূপে বিরাজিত ছিল। ডাঃ রমেশ মজুমদারের মতে শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল মালয় উপদ্বীপের কোনো স্থানে। শৈলেন্দ্র-সম্রাটগণের আদি নিবাস সম্বন্ধে একদল পণ্ডিত বলেন—শৈলেন্দ্র বংশ আদিতে উৎকলবাসী ছিলেন, অপর দল বলেন—শৈলেন্দ্র-সম্রাটগণের আদি নিবাস

ছিল রাঢ়-বঙ্গে। শৈলেন্দ্র-নৃপতিগণের সংগে দক্ষিণ-ভারতের শত্রুতা সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল। বাঙলার পাল-সম্রাটগণের সংগে শৈলেন্দ্র-সম্রাটগণের সখ্য ও প্রীতি পরিলক্ষিত হয়। ইতিহাস বিশ্লেষণে প্রতিপন্ন হয় শৈলেন্দ্র-নৃপতিগণের হৃদয় ছিল বঙ্গ-মুখী। শৈলেন্দ্র-সম্রাটগণের বঙ্গ-মুখী মনোভাবের কারণ তাঁদের রক্তের মধ্যে নিহিত ছিল কি না নিশ্চিত করে বলা যায় না। যাই হোক শৈলেন্দ্র-সম্রাটগণের আদি বাসভূমি যে পূর্ব-ভারতেই কোনো স্থানে ছিল সে বিষয়ে কোনো ঐতিহাসিক কোনো সন্দেহ পোষণ করেন না।

মালয় উপদ্বীপে আজো বহু ব্রাহ্মণের বসবাস। মহাকাব্য রামায়ণ মালয়ে 'হিকায়ৎ-ছেরিরাম' নামে প্রচারিত। রামায়ণের উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংস্করণে রামচন্দ্র কর্তৃক দেবী দুর্গার পূজা অথবা কুশ দ্বারা বাল্মিকী কর্তৃক কুশের পুনর্জন্মের কাহিনী উল্লেখিত নয় কিন্তু বাঙলার কৃত্তিবাসী সংস্করণে এবং মালয়ের "হিকায়ৎ-ছেরিরামে' লিপিবদ্ধ আছে। তাই মালয়ের অধ্যাত্মিকতায় আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের প্রভাব প্রমাণিত হয় না, হয় বাঙলার প্রভাব পরিলক্ষিত।

জাভা-বালি-শ্যাম-সুমাত্রা-আনাম-কাম্বোডিয়ার আদি বঙ্গ-উপনিবেশের সংগে প্রাচীন মালয়ের নিকট সম্বন্ধ ছিল। প্রাচীন মালয়ের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজ পর্যন্ত লিখিত অথবা সংগৃহীত হয় নি। ১৯২৭ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত মিঃ ইভনসের রচনা হতে জানা যায়, মালয়ের অধিবাসিগণ শ্রেণীহীন হিন্দুধর্মের ধারক ছিলেন। ডাঃ বেনেস বলেন—বহু শতাব্দী পর্যন্ত মালয় উপদ্বীপে পূর্ব-ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কালের আবর্তনে আবার সেদিন ফিরে আসবে যেদিন সৎ-সভ্যতার বাহক ও শুভ-সংস্কৃতির সাধক বাঙালী-আত্মার সুমহান সাধনায় মানুষের ইতিহাসের সফল নতুন পাতা লিখিত হবে। অতীতের মহানাবিক বুধগুপ্ত হতে আজকের ভারত-রাষ্ট্রের রণতরী নায়ক চক্রবর্তী মশায়ের সাগরের প্রতি প্রণয় অহেতুক নয়, অহেতুক হয়নি, অহেতুক হতে পারে না।

আনাম ও বাঙলা

বর্তমান আনামের অতীত নাম চম্পা। তাম্রলিপ্তের নৌ-বন্দর হতে বঙ্গসাগর পাড়ি দিয়ে বাঙালী বণিকগণের বাণিজ্য জাহাজ ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের দেশ হতে দেশে, দ্বীপ হতে দ্বীপে বাণিজ্যের বাজার বিস্তারের জন্য গমনাগমন করত। বৌদ্ধ-জাতকমালায় এই বিস্তৃত সত্যের স্বীকৃতি আছে। মনসা-মংগলেও বিক্ষিপ্ত-ভাবে উল্লেখ আছে। মালয় হতে মেক্সিকোর শিল্প-স্থাপত্যে দেব-দেবীর উপাসনায় ও মূর্তিগঠন প্রণালীতে এই বিস্মৃত সত্যের বিস্ময়কর প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিকদের মতে খৃষ্টীয় প্রথম শতকে একদল বাঙালী বণিক কর্তৃক আনামে বাঙলার স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। আনামের বাঙালী উপনিবেশিকগণ মালয় উপদ্বীপ ও দ্বীপময়-ভারত হয়ে আনামে গিয়েছিলেন। তাঁরা স্বদেশের প্রধান প্রধান স্থানের নামের অনুকরণে তাঁদের উপনিবেশের নামকরণ করেছিলেন। নদীয়া, দেবগ্রাম, বিক্রমপুর নামে বিভিন্ন উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। সম্ভবত আনামের নাম চম্পা হয়েছিল বাঙালী-বণিক শৈব চাঁদসদাগরের বাণিজ্য-কেন্দ্র চম্পাই নগরের নাম হতে। আজকের আনাম অথবা অতীতের চম্পা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গ-সংস্কৃতির পীঠভূমি ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকে চীন দেশীয় আনামদের দ্বারা চম্পা আক্রান্ত ও অধিকৃত হয়েছিল। তেরোশো বছর পর্যন্ত চম্পায় বঙ্গ-সভ্যতা সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

আনামের অধিবাসিগণ চ্যাম্ নামে পরিচিত। চম্পা শব্দ হতেই চ্যাম শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। চ্যামেরা 'অষ্ট্রীক' মানব-শাখার 'মনমের' প্রশাখার মানব-গোষ্ঠী। বাঙালীদের ধমনীতে অষ্ট্রীক রক্তই প্রবলভাবে প্রবহমান। অষ্ট্রীক-বাঙালী এবং অষ্ট্রীক-মনমের শোণিতের সংমিশ্রণে চ্যাম জাতির সৃষ্টি হয়েছে। বাঙলা ভাষা ও বাঙালীর উচ্চারণের সংগে চ্যাম্-ভাষা ও চ্যাম্ উচ্চারণের বহু সৌসাদৃশ লক্ষিত হয়। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণের অবতারণা করা গেল:—

বাঙলা	চ্যাম্
পূব্	পূব্
উত্তর	উৎ
দখিন	দখ্
সোম	থোম
বুধ	বুথ

বাঙালীর রাজত্বকালে ইন্দ্রপুর (বর্তমান ডঙ্গডুয়ঙ্গ), চম্পানগরী (বর্তমানে ট্রাকিউর) প্রভৃতি সহর নির্মিত হয়েছিল। সহরগুলিতে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের সুন্দর সুন্দর স্মারক নির্মিত হয়েছিল—শ্রী ও বিষ্ণু, শিব ও শিবাণী, গণেশ প্রভৃতির প্রভূত মূর্তি প্রাপ্তি থেকে প্রতীয়মান হয়

আনামের অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু ছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে হিন্দু-সম্রাট ভদ্রবর্মণ মন্দিরময় সুবিখ্যাত 'মাইসম' সহর স্থাপন করেছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে চম্পায় বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করেছিল। দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধ-নৃপতি ইন্দ্রবর্মণ কর্তৃক ইন্দ্রপুরের বিখ্যাত বৌদ্ধ-বিহার নির্মিত হয়েছিল।

বাঙালীর শিল্প-স্থাপত্য সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের প্রতীক। দাক্ষিণাত্যবাসীদের মত বিরাট বিরাট মন্দির-গঠনের পক্ষপাতী বাঙালীগণ নন। আনামের প্রাচীন মন্দিরগুলির কারুকার্য অপূর্ব। আনামের মন্দিরগুলির আয়তনও বিরাট নয়। আনামের মন্দিরগুলির নির্মাণ-প্রণালী ও শিল্প-স্থাপত্য সম্পূর্ণভাবে দক্ষিণ-ভারতীয় প্রভাবমুক্ত। আনামের মন্দিরগুলির মধ্যে 'লিঙ্গরাজ-মন্দির' বিশেষ বিখ্যাত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে বাঙালী-শিল্পিগণ লিঙ্গরাজ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক যখন কণৌজ পর্যন্ত আর্যাবর্তে বাঙলার বিজয় পতাকা উড়িয়ে ছিলেন, তখন বাঙালী উপনিবেশিক-গণ আনামে লিঙ্গরাজ মন্দির তৈরী করেছিলেন। সেদিন বাঙালী জলে ও স্থলে দুর্জয় ছিল, সেদিন বাঙালী বাঙালী ছিল।

চ্যামেরা আজো শিব-মন্দিরগুলিতে পূজা করেন। পূজা পদ্ধতি বাঙালীর পূজা পদ্ধতির মত। চাল-কলা, পান-সুপারী পূজার অপরিহার্য উপকরণ। বাঙলী ছাড়া আর কোনো ভারতীয় জাতি শিবপূজার সময়ে শিবের শির হতে বস্ত্র সরিয়ে রাখেন না। চ্যামগণ আজো শিবপূজার সময় শিবের শির হতে বস্ত্র সরিয়ে রাখেন।

মালয় হতে মেক্সিকো পর্যন্ত বাঙালীর বিস্মৃত জীবন-সাধনা পরিবেশনের চ্যামেরা অতি উজ্জ্বল দীপশিখা ঐতিহাসিকদের কাছে। আবার বাঙালীর প্রাণ-প্রবাহে প্রাচীন-প্রাচী ভেসে চলুক শুভ আগামীর পানে। আবার বাঙলায় তৎ প্রভাব আসুক, সুপ্রভাত আসুক এশিয়ায়।

অতৃপ্তি

শ্রীচারুচন্দ্র সেন

মহামায়া দেবীর চীৎকারে সমস্ত পাড়াটি মুখরিত হইত। তাঁহার কড়া শাসনের দরুণ ঐ বাড়ীতে রাঁধুনী-ঠাকুর চাকর এবং ঝি কেহই এক মাসের বেশী তিষ্ঠিতে পারিত না। লক্ষ্য করিতাম নূতন লোক নিযুক্ত হইতে এবং কিছুদিন পরেই চলিয়া যাইতে। স্বামী তাঁর উপার্জ্জনক্ষম আলিপুরের উকিল। প্রাতে ৭টা হইতে বেলা ১০টা এবং সন্ধ্যার পর ৮টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত তিনি থাকিতেন আপিস ঘরে ব্যস্ত মক্কেলদের সঙ্গে। সংসারের কাজ দেখিবার অথবা সে বিষয়ে চিন্তা করিবার অবসর অথবা তাঁহার অভিপ্রায় কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। বাড়ীতে কি হইতেছে না হইতেছে, সাপ্তাহিক রেশন গৃহে আসিল কি না, ভৃত্যের অভাবে দৈনিক বাজার হইল কি না, কাপড়ের দোকানে কন্ট্রোলের ধুতি, শাড়ি বিলি হইবে কি না, কিছুতেই তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে দেখি নাই। সব কিছুর ভার মহামায়া দেবীর উপর ন্যস্ত করিয়া তাঁহার নিজের ব্যবসা লইয়াই তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। নিঃসন্তান মহামায়া দেবী কেবল গৃহস্থালীর কাজ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। স্বামীর যত্ন হইতে আরম্ভ করিয়া এই দুর্দ্দিনে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের খুঁটিনাটি সব ব্যবস্থাই তিনি করিতেন। আর উকিল অনাদিবাবু ব্যস্ত থাকিতেন মক্কেলের মামলা বুঝিতে এবং সাক্ষীদের তাহা বুঝাইতে। যে টাকার আবশ্যক তাহা তিনি নিঃশব্দে এবং বিনা প্রশ্নে দিয়া যাইতেন।

বয়স তখন আমার ১২ বৎসর। আমার শিশু-মনের নিকট মহামায়া দেবী ছিলেন প্রহেলিকা। আমি তাঁহাকে সেদিনও বুঝি নাই এবং আজও চিন্তা করিয়া ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তবে সেদিন না বুঝিলেও আজ এইটুকু বুঝিয়াছি যে, স্ত্রী চরিত্রের সবটুকু বিশেষত্ব তাঁহার মধ্যে ছিল। বাহিরে রুক্ষতার আবরণ এবং অন্তরে কোমলতা। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের সময়ও তাঁহার প্রাচুর্য্যের মধ্যে দারিদ্র্যের জন্য ছিল না কিছুমাত্র সহানুভূতি এবং দয়ামায়া। বুভুক্ষু ভিক্ষুকের দল যখন ভাতের ফেনের জন্য চীৎকার করিয়া ফিরিত, তখন দেখি নাই তাঁহাকে

দরজা খুলিয়া একমুষ্টি ভিক্ষা দিতে। বাড়ীর ভৃত্যেরা যদি বা কোন কারণে দরজা খুলিত, তিনি চীৎকার করিয়া বলিতেন দরজা বন্ধ করিতে। পাড়ার ছেলেরা যখন মুষ্টি-ভিক্ষার ঘট বাড়ী বাড়ী বসাইল, তখন তিনি তাহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, ইহাতে কিছুই হইবে না কেবল মাত্র সাগরে শিশিরবিন্দু। তবে কিনা তিনি সপ্তাহান্তে ঘটটি ভরিয়াই চাল দিতেন। মুস্কিল আসান অথবা শীতলা পূজার মাগনের লোক দরজায় ঘা দিলে চীৎকার করিয়া বলিতেন "কিছু হবে না"। আর চাকরকে বলিতেন, "খবরদার, দরজা খুলো না।" আবার পাঞ্জাবী গণক আসিলে বাবু কাছারীতে গেলে বাহিরের ঘরে তাহাকে লইয়া বসিয়া গুণাইতেন এবং সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিতেন।

একদিন দ্বিপ্রহরে তিনি কমলা কিনিতেছিলেন। আমি দশ হাত দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম, আমাকে বলিলেন, "হাঁ করে দেখছিস কি? তোর বাপ তো আর কমলা কিনে খাওয়াতে পারে না। আয়, নিয়ে যা।" আমার শিশু-মন লজ্জায় ভরিয়া গেল, আমি সরিয়া আসিলাম। সুরু হইল চীৎকার "নিয়ে যা না। নিয়ে যা না রে"। আমি নিকটে যাইতেই তিনি ২০।২৫টা কমলা আলাদা করিয়া ছুড়িয়া দিলেন আমাকে লক্ষ্য করিয়া। আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কুড়াইয়া লইতে বাধ্য হইলাম। তখন আমাদের গরমের ছুটী। জানালার নিকট দাঁড়াইয়া রাস্তার লোক দেখিতেছিলাম। মহামায়া দেবী আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে ভ্যাবলা, আমার চাকরটা চলে গেছে। ঝিও আসেনি। তুই আমার রেশনটা এনে দিবি? আয় টাকা আর কার্ড নিয়ে যা।" আমি আর কখনও তাঁহার সহিত ঠিকভাবে কথা বলি নাই, আবশ্যকও হয় নাই। কে যেন আমাকে টানিয়া তাঁহার বাড়ীর দিকে লইয়া গেল। টাকা ফেলিয়া দিলেন, রেশনের থলে দিলেন। কিছু না বলিয়া টাকা, থলে আর কার্ড লইয়া চলিয়া গেলাম। ঘণ্টাখানেক পরে রেশন আনিয়া নামাইয়া দিতেই তিনি বলিলেন. "বাসনি, খেয়ে যা।" আমি ভাবিলাম "তাই তো এ আবার কি!" নানা রকমের ফল ও মিষ্টিসহ রেকাবখানা আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "চেয়ারে বসে খা"। নিজে বসিলেন মাটিতে।

সেদিন হঠাৎ ছয় মাস পর সংবাদ রটিল কণ্ট্রোলে কাপড় পাওয়া যাইবে। সমস্ত পাড়া যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। মেয়ে পুরুষ সবাই ছুটিল কাপড়ের দোকানে। শনিবার আমার স্কুল ১১৷৷টায় ছুটি হইয়াছিল, আমাকে দেখিয়া মহামায়া দেবী বলিলেন, "ওরে ভ্যাবলা, চলনা একবার কণ্ট্রোলে যে কাপড় দিচ্ছে দেখে আসি"। আমি কোন উত্তর করিলাম না। তখন তিনি আরও জোর গলায় বলিলেন, "ওরে ভ্যাবলা চুপ করে আছিস যে। একটা রিকস নিয়ে আয় না। কাপড়ের দোকানটায় ঘুরে আসি।" আমি নিঃশব্দে রিকস লইয়া আসিলাম এবং গেলাম কাপড়ের দোকানে মহামায়া দেবীর সহিত। সেখানে যাহা কিছু করার তিনিই করিলেন, কাপড় কিনিলেন, টাকা দিলেন এবং আবার আমাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। রিকস বিদায় করিয়া বলিলেন, "ভিতরে আয়।" কাপড়ের পুটলিটা লইয়া ভিতরে গেলাম। মহামায়া দেবী বলিলেন "বোস্"। এক থালা খাবার আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "নে খা, এসব খাবার তোদের জোটে না। আর জুটবে কোথা থেকে। তোর বাপ তো তোর মা মরার পর আবার বিয়ে করে শিয়াল-কুকুরের মত ছেলে-মেয়ে সৃষ্টি করেছে। তোদের আর খাওয়াবে কোথা থেকে।" আমার গলা দিয়া মিষ্টি আর যাইতেছিল না। কোন রকমে খাইয়া উঠিয়া পড়িলাম। ভয় ছিল যদি আবার কোন একটা কাজের ফরমায়েস মহামায়া দেবী করেন। এক জোড়া কাপড় আমার দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, "নিয়ে যা, পরবি। তুই তো বাড়ীতে কেচে কেচে কাপড় পরছিস। আর কাপড় হলেই বা কি হবে। ধোপা-বাড়ী দেওয়ার পয়সা কোথায়? আচ্ছা আমিই ধুইয়ে দেব।" আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, ত্রস্তে উঠিয়া পড়িলাম।

পাড়ার সবুজ সঙ্ঘ মাতিয়া উঠিল সার্বজনীন দুর্গা-পূজার জন্য। বাড়ী বাড়ী চাঁদা সংগ্রহ করিতে লাগিল। আমাকে বলিল মহামায়া দেবীর নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিতে। প্রমাদ গণিলাম। একদিন হঠাৎ তাঁহার বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইতেই বলিলেন, "কি রে ভ্যাব্‌লা, কি চাস্? ক্ষিদে পেয়েছে নাকি?" আমি বলিলাম "না। সবুজ সঙ্ঘ দুর্গাপুজো করবে কিনা। তারা বলছে আপনার কাছে চাঁদা চাইতে।" তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, এই প্রথম আমি তাঁহার মুখে হাসি দেখিলাম, "ও তাই নাকি। কত টাকা দিতে হবে।" আমি উত্তর করিলাম "তা কিছু বলেনি।" তিনি এবার বলিলেন ছেলেদের আসিতে। সেই দিন বিকালে ছেলের দল

আসিতেই তিনি বলিলেন "যত টাকা চাঁদা সংগ্রহ করতে পারবে আমি তত টাকা দেব।" ছেলের দল হইতে কে একজন উঠিয়া বলিল, আমি দলের পশ্চাতে ছিলাম, "আমরা ৩০০্ সংগ্রহ করে ফেলেছি। আমাদের লাগবে ৮০০্। আর ১০০্ আদায় করে আপনার কাছে আসব।" তিনি এবার দৃঢ়ভাবে জবাব দিলেন "তা নয়। পাড়ার সব বাড়ীতে যাবে এবং কে কি দিয়েছে তা আমি দেখব। আমার কাছে আসবে পূজার সাত দিন আগে।" ছেলের দল উঠিয়া গেল। আমিও উহাদের সঙ্গে ফিরিতেছিলাম কিন্তু মহামায়া দেবী বলিলেন. "ভ্যাব্‌লা, তুই সামনে দাঁড়া।" সবাই উঠিয়া গেল, আমি অপেক্ষা করিলাম। তিনি বলিলেন "হ্যারে ভ্যাব্‌লা. তোব জুতো জামা কেনা. হয়েছে?" আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি ২ খানা দশ টাকার নোট আমার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন, "এই নে, যা জুতো জামা কিনে এনে আমায় দেখা। ওরে হাবা, ঠকিসনা যেন।"

নিঃশব্দে টাকা লইয়া চলিয়া আসিলাম।

যথাসময়ে সবুজ সঙ্ঘের ছেলেদের সার্ব্বজনীন দুর্গা-পূজা সমাধা হইল। মহামায়া দেবী চাঁদা দিয়াছিলেন ৪০০্। এ যেন তাঁহার নিজের পূজা। প্রাতে উঠিয়া পূজামণ্ডপে যাইতেন, বেলা ১২টায় গৃহে ফিরিতেন। ছেলেদের দল তাঁহাকে কেহ দিদি, কেহ মাসীমা বলিয়া সম্বোধন করিতে সুরু করিয়াছিল। পাড়ার লোকেরাও একটু অবাক হইল। কেহ কখনও এই মহিলাটিকে কোন ব্যাপারে যোগদান করিতে দেখে নাই। দাম্ভিকা ও গর্ব্বিতা এই নারীটি হইয়া পড়িলেন পাড়ার লোকের একটি আলোচনার বস্তু। পূজামণ্ডপে কাহারও সহিত আলাপ অথবা কথাবার্তা বলিতেন না। চাল-চলনে মনে হইত তিনি নিজেকে একটু ব্যবধানে রাখিতে চাহিতেন এবং নিজে যে সবচেয়ে বেশী বুঝেন অথবা বুঝাইতে পারেন, তাঁহার আচরণে সব সময়ে এই ভাব পরিলক্ষিত হইত। ছেলেদের সহিত কথা বলিয়া এবং পূজার ব্যবস্থা করিয়া পূজার আরম্ভ হইতেই তিনি গৃহে ফিরিতেন। অঞ্জলি দিতে তাঁহাকে কেহ দেখে নাই অথবা আরতির সময়ও তিনি পূজামণ্ডপে যাইতেন না। নিজের ঘরে চুপচাপ বসিয়া থাকিতেন। পূজামণ্ডপের হল্লা, মাইকের চীৎকার অথবা লোক চলাচল কখনও বা ছাদ হইতে দেখিতেন, তাও ক্বচিৎ কদাচিৎ।

বিজয়ার দিন লরী করিয়া প্রতিমা লওয়ার সময় সবুজ সঙ্ঘের ছেলেরা কত বাজনা এবং হল্লাই না মহামায়া দেবীর বাড়ীর সম্মুখে লরী থামাইয়া করিল, কিন্তু তাঁহাকে দেখা গেল না। প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর ছেলের দল আবার তাঁহার বাড়ী চড়াও করিল। কিন্তু উকিল বাবু বাড়ী ছিলেন, তাই ছেলের দল সরিয়া পড়িল। হঠাৎ রাত্রি ১১টার সময় মহামায়া দেবীর ঝি আসিয়া খবর দিল যে তিনি আমাকে ডাকিতেছেন। আমি গিয়া দেখি তিনি ধান দুর্ব্বা লইয়া বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "কি রে ভ্যাব্‌লা তুই প্রণাম করতে এলি না যে?" আমি ভয়ে ভয়ে প্রণাম করিতেই তিনি আমার মাথায় ধান-দুর্ব্বা দিলেন। এক রেকাব মিষ্টি দিয়া বলিলেন, "খা। তোর বাপ আর এসব কিছু আনেনি। আনবে কোথা থেকে। ভাত জোটাই কঠিন।" আমাকে খাইতে হইল বটে কিন্তু জলপান করিয়া কতক্ষণে উঠিব তাই ভাবিতেছিলাম।

হঠাৎ হইল ধাঙড় ধর্ম্মঘট। ময়লার উপর ময়লা, আবর্জ্জনার উপর আবর্জ্জনা স্তূপ হইতে লাগিল। দুর্গন্ধে টেকা যায় না। সবুজ সঙ্ঘের ছেলেরা আসিয়া উপস্থিত হইল মহামায়া দেবীর বাড়ীতে। কিছুতেই তিনি আর বাহিরে আসেন না দেখিয়া ছেলেরা আমাকে বাড়ীর ভিতরে পাঠাইল। এবার আসিলেন মহামায়া দেবী বাহিরের ঘরে এবং অতি রুক্ষ ভাবে ছেলেদের বলিলেন, "কি চাই তোমাদের?" তাহারা আবেদন জানাইল যে, ব্লিচিং পাউডার, ফিনাইল, ঝাড়ু ইত্যাদি কিনিতে তাহাদের টাকার দরকার। তাহারা নিজেরাই রাস্তার ময়লা পরিস্কার করিবে। কিছু না বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন এবং বলিলেন, "ভ্যাব্‌লা আয় তো। টাকা নিয়ে যা।" ৩০্ টাকা আমার হাতে দিলেন এবং বলিলেন ওদের দিতে কিন্তু আমাকে নিষেধ করিয়া দিলেন যে, আমি যেন ঐ ময়লা পরিস্কারের ব্যাপারে না যাই।

পাড়ায়, বস্তিতে কলেরা লাগিতেই তিনি মেয়ে ইন-কুলেটারের সঙ্গে যাইয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া যতটুকু পারি-লেন ইনকুলেশন দেওয়াইলেন। সেইদিন বিকালে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "খাচ্ছিস তো ঘাস পাতা। তোদের বাবা যে শেয়াল কুকুরের মত ছেলেমেয়ে বানিয়েছেন, তোদের কলেরার ইনজেকশন দিয়েছেন তো?" আমি "না" বলিতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তা ছাড়া কি।. দুটো একটা মরলেও তো তার ভাল। ভাতের ভাবনা কমবে।" তখনি

আমাকে লইয়া রিকস করিয়া গেলেন পাড়ার করপোরেশন আফিসে এবং আমাকে ইনজেকশন দেওয়াইয়া বাড়ী ফিরিলেন। মহামায়া দেবীকে দেখিলে আমার ভয় হইত। হঠাৎ তিন চারদিন পর দেখি মহামায়া দেবীর বাড়ীতে ডাক্তারের আগমন। জানিবার ইচ্ছা হইল কি ব্যাপার। পরে শুনিলাম যে মহামায়া দেবী কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছেন। আমি গেলাম তাঁহাকে দেখিতে। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "ভ্যাব্‌লা, আমাকে দেখতে এসেছিস? ভোরবেলা খেয়েছিস তো? তা না হলে চলে যা। খালি পেটে কলেরা রোগীর কাছে আসতে হয় না।" আমি কোন উত্তর করিলাম না। তিনি তাঁহার স্বামী অনাদিবাবুকে বলিলেন "ভ্যাব্‌লাকে ৫টা টাকা দাও। ও যেন রোজ খেয়ে আমাকে দেখতে আসে। ওর বাপ তো ভাত ডাল ছাড়া কিছুই দিতে পারে না।" আমাকে নিকটে যাইতে বলিলেন। আমি নিকটে যাইতেই আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "আমায় মা বল, বলনা।" আমি তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকার পূর্ব্বেই তিনি চোখ বুজিলেন। সবাই বুঝিল সব শেষ। উকিলবাবু একটি চীৎকার করিয়া চুপ করিলেন। আমি আর থাকিতে না পারিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ মা, আমি যে তোমায় মা বলেই ডাকছি, সাড়া দিচ্ছনা কেন? ওমা, মাগো, মা যে আমায় ৪ বছরের রেখে চলে গিয়েছিলেন। তুমি যে আমায় আবার মাতৃহীন করলে।"

হে ভারত

যেখানে কেবল প্রতাপের প্রকাশ, বলের বাহুল্য, যেখানে কেবল বেত-চাবুক, জেল-জরিমানা, পুনিটিভ্ পুলিশ ও গোরা গুর্খার প্রাদুর্ভাব, সেখানে ভীত হওয়া নত হওয়ার মতো আত্মাবমাননা, অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের অবমাননা আর নাই। হে ভারতবর্ষ, সেখানে তুমি তোমার চিরদিনের উদার অভয় ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে এই সমস্ত লাঞ্ছনার ঊর্দ্ধে তোমার মস্তককে অবিচলিত রাখো—এই সমস্ত বড় বড় নামধারী মিথ্যাকে তোমার সর্ব্বান্তঃকরণের দ্বারা অস্বীকার কর, ইহারা যেন বিভীষিকার মুখোস পরিয়া তোমার অন্তরাত্মাকে লেশমাত্র সঙ্কুচিত করিতে না পারে। তোমার আত্মার দিব্যতা, উজ্জ্বলতা, পরম শক্তিমত্তার কাছে এই সমস্ত তর্জ্জন-গর্জ্জন, এই সমস্ত উচ্চপদের অভিমান, এই সমস্ত শাসন-শোষণের আয়োজন-আড়ম্বর, তুচ্ছ ছেলেখেলা মাত্র—ইহারা যদি তোমাকে পীড়া দেয়—তোমাকে যেন ক্ষুদ্র করিতে না পারে। যেখানে প্রেমের সম্বন্ধ, সেইখানেই নত হওয়া গৌরব—যেখানে সে সম্বন্ধ নাই, সেখানে যাহাই ঘটুক, অন্তঃকরণকে মুক্ত রাখিয়ো, ঋজু রাখিয়ো, দীনতা স্বীকার করিও না, ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়ো। নিজে যাহা করিতে পারো, নীরবে নিভৃতে তাহার প্রতি সমস্ত মন প্রয়োগ করিয়ো; তাহার আরম্ভ সামান্য হইলেও তাহাকে অবজ্ঞা করিয়ো না—নিজের প্রতি অক্ষুণ্ণ আস্থা রাখিও। কারণ, নিশ্চয়ই জগতে তোমার একান্ত প্রয়োজন আছে—সেই জন্য বহু দুঃখেও তুমি বিনাশপ্রাপ্ত হও নাই। অন্যের বাহ্য অনুকরণের চেষ্টা করিয়া তুমি যে এতকাল পরে একটা ঐতিহাসিক প্রহসন রচনা করিবার জন্য এতদিন বাঁচিয়া আছ, তাহা কখনই নহে, তুমি যাহা হইবে, যাহা করিবে—অন্য দেশের ইতিহাসে তাহার নমুনা নাই—তোমার যথাস্থানে তুমি বিশ্বভুবনের সকলের চেয়ে মহৎ। হে আমার স্বদেশ, মহা পর্ব্বতমালার পাদমূলে মহাসমুদ্র পরিবেষ্টিত তোমার আসন বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, এই আসনের সম্মুখে হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টান-বৌদ্ধ বিধাতার আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া বহুদিন হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে, তোমার এই আসন তুমি যখন পুনর্ব্বার একদিন গ্রহণ করিবে, তখন আমি নিশ্চয়ই জানি, তোমার মন্ত্রে কি জ্ঞানের, কি কর্ম্মের, কি ধর্ম্মের অনেক বিরোধ মীমাংসা হইয়া যাইবে এবং তোমার চরণপ্রান্তে আধুনিক নিষ্ঠুর পলিটিকাল-কাল-ভূজঙ্গের বিশ্বদ্বেষী বিষাক্ত দর্প পরিশ্রান্ত হইবে। তুমি চঞ্চল হইও না, লুব্ধ হইও না, তুমি 'আত্মানং বিদ্ধি' আপনাকে জানো, এবং উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত, ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'—উঠ, জাগো—যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই পাইয়া প্রবুদ্ধ হও, যাহা যথার্থ পথ, তাহা ক্ষুরধার-শাণিত দুর্গত দুরত্যয়—কবিরা এইরূপ বলিয়া থাকেন'।

—রবীন্দ্রনাথ।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

রণজিৎ কুমার সেন

ভারতীয় বিজ্ঞানের জনক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। কিন্তু বিজ্ঞানের রহস্যজালের মধ্যেই শুধু তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নাই, সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তিনি তাঁহার অনবদ্য দান রাখিয়া গিয়াছেন। সমাজের মূল ব্যাধিকে উদ্ঘাটন করিয়া দরদী চিকিৎসকের মতই তিনি তাহার নিরাময় করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বাংলার চির উপেক্ষিত পল্লীসমাজকে জ্ঞানালোকে উদ্দীপ্ত করিয়া তিনি চাহিয়াছিলেন বাঙালীকে এক নবজীবনের পথে পরিচালিত করিতে। সে জীবন হবে স্বাবলম্বনের পথে উন্নত, বিবেক-বুদ্ধি পরিচালিত নিয়মানুবর্তীশীল। নিজের চিন্তাধারাকে তিনি ছাত্রদের চিন্তাশক্তির সঙ্গে একত্রে যুক্ত করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই যুবক-ভারতের হৃদয়ে তাঁহার আসন ছিল সর্বশীর্ষে। হিন্দুশাস্ত্রের নানা ব্যাখ্যার দ্বারা কুসংস্কারকে জয় করিয়া উঠিতে তিনি শিক্ষা দিয়াছিলেন দেশকে। তাঁহার চিন্তাপ্রসূত নবতর বিজ্ঞানরসে এক অমিয় মাধুর্য্যে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি পাড়ি দিয়াছিলেন দুর্লঙ্ঘতাকে। জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন অপরিহার্য্য।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেনঃ '...আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত ক'রেছেন—কেবলমাত্র তাঁকে জ্ঞান দেননি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে সে নিজেকে পেয়েছে।—বস্তুজগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্বোধিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য্য প্রফুল্ল তার চেয়ে গভীর প্রবেশ করেছেন কত যুবকের মনোলোকে, ব্যক্ত ক'রেছেন তার গুহাস্থিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি। সংসারে জ্ঞান-তপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়া-প্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান ক'রতে পারেন—এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়। ......আচার্য্যের এই শক্তির মহিমা জরাগ্রস্ত হবে না। তরুণের হৃদয়ে হৃদয়ে নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে। দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে জয় ক'রবে নব নব জ্ঞানের সম্পদ। আচার্য্য নিজের জয়কীর্ত্তি নিজে স্থাপন ক'রেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে।......'

প্রফুল্লচন্দ্রের কর্মমুখর জীবন-ইতিহাসের মধ্যেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এই অমিয় বাক্যের সার্থকতা নিহিত রহিয়াছে।

অধুনাতন পূর্ব-পাকিস্থান রাষ্ট্রের খুলনা জেলার অন্তর্গত কপোতাক্ষী তীরবর্তী বাড়ুলী গ্রামে ১৮৬১ সালের ২রা আগষ্ট এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত সালেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর জন্ম হয়। এই কারণে উক্ত সালটি ভারতীয় ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া আছে।

প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হরিশচন্দ্রের ইংরেজি সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, এতদ্ব্যতীত আরবি, পার্শি এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতিও তিনি অনুরাগী ছিলেন। সমাজ-সংস্কারে ছিল তাঁহার অদম্য উৎসাহ। সংস্কারমুক্ত হইয়া তিনি সর্বদাই স্বীয় বিচার-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইতে চেষ্টা করিতেন। অতি শৈশবকাল হইতেই এই সুযোগ্য পিতার প্রভাব আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। পিতা হইতে পুত্রকে যেমন সাধারণতঃ দূরে থাকিতে দেখা যায়, প্রফুল্লচন্দ্রের ক্ষেত্রে

তাহা ছিল ব্যতিক্রম। এক সরল সৌহার্দ্যপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে পিতা-পুত্র ছিলেন পরস্পর-সান্নিধ্য। প্রফুল্লচন্দ্রের আত্মস্বীকৃতির মধ্যেই ইহার যাথার্থ্য লক্ষ্য করা যায়ঃ "বই পড়া অপেক্ষা পিতার সঙ্গে কথা বলিয়া আমরা অনেক বিষয় বেশী শিখিতাম। তাঁহার নিকটে গিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে ও গল্পাদি করিতে তিনি আমাদের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ দিতেন। যখন আমার বয়স মাত্র ৯ বৎসর, সেই সময়ে ইতিহাস ও ভূগোলের প্রতি আমার অনুরাগ ছিল। একদিন পিতার ভূগোলের জ্ঞান পরীক্ষা করিতে আমার মনে ইচ্ছা হইল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সিবাষ্টপুল কোথায়?' তিনি বলিলেন, 'কি, সিবাষ্টপুলের কথা বলিতেছ? ইংরাজেরা ঐ সহর কিরূপে অবরোধ করিল, তাহা আমি যেন চোখের সম্মুখে দেখিতেছি।' এই উত্তর শুনিয়া আমি নীরব হইলাম।"

শিশুকাল হইতেই বিদ্যানুশীলনের প্রতি তাঁহার বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। ক্রমে তিনি অপরের সাহায্য ব্যতীতই ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষা আয়ত্ব করেন।

১৮৭০ সালে পিতা হরিশ্চন্দ্র সপরিবারে কলিকাতা আসেন। উক্ত বৎসরেই প্রফুল্লচন্দ্রকে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তিনি অধ্যয়নের প্রতি আশানুরূপ মনোনিবেশ করিতে পারেন না। মাঝখানে কিছুকাল গৃহে অধ্যয়ন করিয়া অতঃপর তিনি এলবার্ট স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং বিদ্যালয়ের ব্রাহ্ম শিক্ষকগণের সাহচর্যে তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইয়া ওঠেন। এই বিদ্যালয়ের প্রধান কর্ণধার ছিলেন তখন ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্র সেনের অনুজ কুঞ্জবিহারী সেন। ক্রমে প্রফুল্লচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৯ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান কলেজে এক উচ্চ শিক্ষাভিলাষি ছাত্র হিসাবে প্রবেশ করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন এই কলেজে অধ্যাপনা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার দুর্নিবার অভিলাষেই বিশেষভাবে তিনি এই কলেজে ভর্ত্তি হন। এই সময়ে বিজ্ঞান চর্চ্চার সুবিধার জন্য তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞান শ্রেণীতেও যোগদান করেন এবং বাহিরের ছাত্র হিসাবে এখানে তিনি পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ পান।

১৮৮২ সালে প্রফুল্লচন্দ্রের কলেজ অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। উক্ত বৎসরেই তিনি গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি লাভ করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। কঠোর সাধনা ক্রমান্বয়ে তাঁহাকে কৃতকার্যতার পথে টানিয়া নেয়। ১৮৮৭ সালে রসায়নশাস্ত্রে গবেষণার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডি, এস, সি, উপাধি লাভ করেন। তাঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধটি সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় তিনি 'হোপ প্রাইজ' নামক সম্মানজনক পুরস্কার লাভ করেন। এই পুরস্কারের মূল্য ছিল পঞ্চাশ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ছয় শত টাকা। এডিনবরায় বি, এস-সি পরীক্ষার সময়ে তিনি 'India before and after the mutiny' শীর্ষক এক প্রবন্ধ রচনা করিয়া উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। ইহার দ্বারা তাঁহার প্রথম জীবনেই ভারতের ইতিহাস এবং সাধারণ রাজনৈতিক চিন্তাধারায় প্রফুল্লচন্দ্রের সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন 'ভারত ও বৃটিশ শাসন' নামেও তিনি আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই উভয় গ্রন্থই বিলাতে বিশেষ সমাদৃত হয়। নিজের কৃতকার্য্যতার কারণ সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্র বলেনঃ এক সময় একটিমাত্র কাজে হাত দেওয়া এবং তাহাই যত্নের সঙ্গে সুসম্পন্ন করা—এই একনিষ্ঠাই জীবনের সকল সফলতার কারণ।

১৮৮৮ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি কর্ম্মপ্রাপ্তির আশায় বাংলা গভর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করেন। সুখের বিষয় যে, অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাকে প্রাদেশিক শিক্ষা-বিভাগে গ্রহণ করা হয় এবং অতঃপর মাসিক ২৫০্ টাকা বেতনে প্রফুল্লচন্দ্রকে প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নশাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করা হয়। দিন অতিক্রান্ত হইতে থাকে, ক্রমে চাকুরী-জীবনে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে থাকেন তিনি। পরবর্ত্তী বৎসরে প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানাগারে প্রবেশ করিয়া সাদরে তিনি টেষ্টটিউবকে বরণ করিয়া লন; জীবনের অপরাহ্ণ বেলা পর্য্যন্ত এই টেষ্ট-টিউবই ছিল তাঁহার প্রধান সাথী। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেনঃ 'বিজ্ঞানাগারই আমার শান্তি ও কর্ম্মের স্থল। সেখানে টেষ্ট-টিউবের সহিত আলাপে আমি আমার বার্দ্ধক্য ভুলিয়া যাই।'—একথা এতটুকুও অতিরঞ্জিত ছিল না। তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত আবিষ্ক্রিয়া বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যাণ্ড ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠা ও হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস-সঙ্কলন প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানাগারেই সম্ভাবিত হইয়াছিল। এখানে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়াই তিনি 'মার্কিউরাস নাইট্রেইট' সম্বন্ধে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া বৈজ্ঞানিক জগতে এক বিস্ময় সৃষ্টি করেন।

বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অভাব দেখিয়া তিনি 'প্রাণীবিজ্ঞান' সম্বন্ধে একখানি প্রাথমিক গ্রন্থ লেখেন।

সঙ্গে সঙ্গে 'নেচার ক্লাব' নামে একটি ক্লাবও তিনি স্থাপন করেন। বাঙালীর স্বাস্থ্যহীনতার মূলে যে তাহার খাদ্যের গলদই বিশেষভাবে দায়ী, এ বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিয়াই তিনি খাদ্যপ্রাণ সম্পর্কে গবেষণা আরম্ভ করেন। এ কাজে তাঁহার প্রায় তিন বৎসর ব্যয় হয়। ১৮৯৪ সালে তাঁহার এই গবেষণার ফল 'জার্নাল অব্ দি এশিয়েটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী বৎসরে গন্ধকদ্রাবক প্রস্তুত করিবার যন্ত্রপাতি (Sulphuric Acid Plant) সংস্থাপিত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের কার্য্যারম্ভ হয়। দুঃখের বিষয় যে, এই বৎসরই তাঁহার স্নেহময় পিতাকে হারাইতে হয়। এইভাবে নানা সুখ-দুঃখ, হর্ষ ও বিষাদের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার স্থির লক্ষ্যের দিকে তিনি ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকেন।

এই সময়ে ১৯০১ সালে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য মহামতি গোখ্‌লে কলিকাতায় আসেন। উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্দের জন্য প্রায়ই তিনি প্রফুল্লচন্দ্রের বাসস্থানে আসিতেন। ইতিমধ্যে উক্ত বৎসরের শেষাশেষি মহাত্মা গান্ধী গোখলের অতিথিরূপে কলিকাতায় আসিলে গান্ধীজীর সহিত প্রফুল্লচন্দ্রের পরিচয় হয়। পরবর্ত্তীকালে গান্ধীজী প্রফুল্লচন্দ্র সম্পর্কে বলেনঃ '১৯০১ সালে যখন গোখ্‌লে আচার্য রায়ের প্রতিবাসী ছিলেন এবং আমি গোখলের রক্ষণাবেক্ষণে ছিলাম, তখন আমি প্রথম আচার্য রায়ের সহিত পরিচিত হওয়ার অধিকার লাভ করি। ইহা বিশ্বাস করা কঠিন ছিল যে, সাদাসিধে ভারতীয় পোষাক পরিহিত এবং তদপেক্ষা সরল চালচলন বিশিষ্ট ব্যক্তি এতবড় বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাপক। আমি যখন শুনিলাম যে, তিনি তাঁহার উচ্চ বেতন হইতে মাত্র কয়েক টাকা নিজের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত টাকা জনসাধারণের হিতের জন্য বিশেষতঃ দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যের জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন, তখন আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলাম। ৩০ বৎসরে (১৯৩১ সালেও) ভারতের এই মহান ও বিশ্বস্ত সেবকের কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই। আচার্য রায় অবিরাম কাজ, উৎসাহ ও আশাবাদের যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য আমরা গর্ব্ব অনুভব করিতে পারি।'

এ গর্ব্ব সমগ্র বাংলার গর্ব্ব, সমগ্র ভারতবাসীর গর্ব্ব।

প্রেসিডেন্সী কলেজের রাসায়নিক যন্ত্রাগারের উন্নতিকল্পে ১৯০৪ সালে বাংলা গভর্ণমেণ্ট প্রফুল্লচন্দ্রকে ইউরোপের প্রধান প্রধান যন্ত্রাগার পরিদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। ক্রমে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মানী ঘুরিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহাতে প্রেসিডেন্সী কলেজের রাসায়নিক যন্ত্রাগারের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

তিনি যখন দেশে ফিরিলেন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তখন সমগ্র বাংলাদেশ জাগিয়া উঠিয়াছে। লর্ড কার্জ্জনের অবিমৃষ্যকারী নীতি প্রফুল্লচন্দ্রকে বিশেষভাবে আঘাত করে। বাংলার এই কার্জ্জন-বিরোধী আন্দোলন হইতে তিনি দূরে সরিয়া থাকিতে পারিলেন না। আত্মজীবনীতে তিনি লিখিয়াছেনঃ 'লর্ড কার্জ্জন সাম্রাজ্যবাদের দূতরূপে শঙ্কিত হৃদয়ে দেখিলেন, বাংলাদেশের জাতীয় ভাব দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে। বাংলাদেশের মানচিত্র তাঁহার চোখের সম্মুখে ছিল এবং এমন একটি ভীষণ অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তিনি বাঙালী জাতির উপর নিক্ষেপ করিলেন, যাহার আঘাত সামলাইতে তাহার বহুদিন লাগিল। এমন ব্যবস্থা করিলেন—যাহাতে উত্তর-পূর্ব্বভাগে মুসলমান-সংখ্যাধিক্য হয়। তিনি তাঁহার মোহমুগ্ধ নির্ব্বোধ পারিষদবর্গের সাহায্যে মুসলমান জনসাধারণের, বিশেষতঃ তাঁহাদের নেতাদের সম্মুখে নানা প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন—যাহাতে তাঁহারা হিন্দুদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশে তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিনায়কত্বে কয়েকজন শক্তিমান নেতা ছিলেন। দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদের প্লাবন বহিয়া গেল এবং দিন দিন উহা ক্রমেই বিরাট আকার ধারণ করিতে লাগিল। সরকারী কর্ম্মচারী হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলনে যোগ দিবার অধিকার আমার ছিল না, কিন্তু গবেষণাগার হইতে আমি এই আন্দোলনের প্রতি লক্ষ্য করিলাম। বলা বাহুল্য যে, এই আন্দোলন আমার হৃদয় স্পর্শ করিল।'

ইহার অব্যবহিত কাল পরেই ভারত সচিবের পুনর্গঠন ব্যবস্থায় প্রফুল্লচন্দ্র শিক্ষা-বিভাগের নির্দ্দিষ্ট গ্রেডে স্থান লাভ করেন। ইতিপূর্ব্বে চাকুরী গ্রহণের প্রথম দিকে এই গ্রেড সম্পর্কে তিনি তদানীন্তন শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর ক্রফ্‌ট্ সাহেবের নিকট আবেদন জানান; উত্তরে ক্রফ্‌ট্ সাহেব বলেনঃ 'চাকুরী ভিন্ন জীবনে আরও অনেক কাজ করবার আছে, কে তোমাকে চাক্‌রী নিতে সাধাসাধি করছে?' ('There are other works in life, who asks you to accept service?') দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে তবু তাঁহাকে চাকুরীতে বহাল থাকিতে হয়; তাঁহার একমাত্র

লক্ষ্য ছিল—সাধনার দ্বারা সিদ্ধি। এবং সেই সিদ্ধিলাভ করিতে তাঁহার বিলম্ব ঘটে নাই।

মাত্র ৮০০্ (আট শত) টাকার মূলধন লইয়া তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন। নিজের জীবন দিয়া ব্যবসা-বিমুখ সমগ্র বাঙালীকে তিনি এই শিক্ষাই দিয়াছেন—মন হইতে সম্মানের বালাই ঝাড়িয়া ফেলিয়া কি ভাবে স্বল্পতম পুঁজিতে ব্যবসায় নামিয়া জীবনকে পরিপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যশীল করিয়া তোলা যায়। দেশের 'অন্ন-সমস্যা' শীর্ষক আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেনঃ 'ব্যবসায়ে চাই কি? চাই ধৈর্য্য, চাই সাধুতা। আরম্ভ সামান্যভাবে হবে বটে, কিন্তু এই সামান্যের মধ্যে সফলতার বীজ নিহিত আছে। কর্ণেগী বাল্যকালে সর্ব্বপ্রথম রাস্তায় খবরের কাগজ বেচ্‌তেন।......মাড়োয়ারী এক পয়সার ছাতু খেয়ে পিঠে কাপড়ের বস্তা ফেলে ব্যবসায়ে প্রথম চেষ্টা আরম্ভ করে। পরে তারাই লক্ষ্যপতি হয়ে দাঁড়ায়।.. ... আমি যখন বেঙ্গল কেমিক্যাল আরম্ভ করি, তখন কুলীর মতো খেটেছিলাম। কয়েক বৎসরের মাহিনা থেকে ৮০০্ টাকা জমিয়ে বেঙ্গল কেমিক্যাল আরম্ভ করি,—আজ তার মূলধন পঁচিশ লক্ষ টাকা।'

বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠার দ্বারা তিনি জাতীয়-শিল্পের আশাতীত উন্নতি বিধান করিয়া গিয়াছেন। শিল্পোন্নতির জন্য তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কাহিনী উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক।

১৯১২ সালে প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্মেলনে যোগদানের জন্য তৃতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন। এই সময়ে ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে ডি এস্-সি উপাধী দেওয়া হয় এবং গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি আই ই উপাধী দেন।

১৯১৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের এককালীন বিপুল দানে বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্ত্তী বৎসর প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রসায়ণশাস্ত্রের পালিত-অধ্যাপকরূপে বিজ্ঞান-কলেজে যোগদান করেন। দীর্ঘকাল এই দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকিয়া ১৯৩৭ সালের জুন মাসের পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

১৯১৯ সালে প্রফুল্লচন্দ্রকে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে 'নাইট' উপাধীতে ভূষিত করা হয়। ইহার পর দুই বৎসর অতিবাহিত না হইতে ১৯২১ সালে তিনি পুনরায় বিলাত যাত্রা করেন। সময়টা—ভারতবর্ষে প্রথম গান্ধী-প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনের বৎসর। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি জনসেবকরূপে দাঁড়াইলেন দেশবাসীর সম্মুখে। ১৯২১ সালের খুলনার দুর্ভিক্ষে, ১৯২২ সালের উত্তরবঙ্গের বন্যায় এবং ১৯৩১ সালের পূর্ববঙ্গের বন্যায় আর্ত ও দুর্গতদের সেবায় তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ-ভাবে বিলাইয়া দিলেন। এই সময় হইতে তিনি দেশময় খদ্দর প্রচারে বিশেষ উৎসাহী হইয়া ওঠেন। বিজ্ঞান-সাধনা ও সমাজসেবার এমন অপূর্ব্ব সমন্বয় বিরল। ১৯৩৩ সালে তাঁহার সভাপতিত্বে 'বঙ্গীয় সঙ্কটত্রাণ সমিতি' (Bengal Relief Committee) স্থাপিত হয়। বিভিন্ন সাহায্য সমিতির মারফৎ তিনি প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া সেবাকার্য্যে ব্যয় করেন।

এই সেবাধর্ম্মের প্রধান অংশ জুড়িয়া ছিল তাঁহার দানশীলতা। জীবনে যখনই যাহা কিছু তিনি রোজগার করিয়াছেন, নিজের জন্য না রাখিয়া অকুণ্ঠচিত্তে তাহাই তিনি দান করিয়াছেন। ভারতে এমন দানবীরও বিরল। প্রধানতঃ তাঁহার এই দানের অর্থেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানবিভাগ নানা ভাগে সম্প্রসারিত হইতে পারিয়াছিল। দধিচীর ন্যায় ছিল তাঁহার অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ, এই ত্যাগের দ্বারাই তাঁহার আত্মা মহত্বের উচ্চশীর্ষে আরোহন করিতে পারিয়াছিল।

বাংলা ভাষার সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্যও তাঁহার দান ছিল অপরিসীম। প্রফুল্লচন্দ্র বিশেষভাবে বাংলাভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেবার পক্ষপাতি ছিলেন। স্যার আশুতোষ চৌধুরীর অবর্তমানে তাঁহাকেই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের (National Council of Education) সভাপতি করা হয়। তদানীন্তন মুসলীম লীগ-শাসিত বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে তিনি রোগশয্যা হইতেও কঠোর প্রতিবাদ জানাইতে দ্বিধাবোধ করেন্ নাই।

গ্রামোন্নয়ন ট্রাষ্টের ট্রাষ্টি-বোর্ডের সভাপতি থাকা কালীন হরিজন সেবক সঙ্ঘ ও কুটীর-শিল্পের উন্নতিকল্পে তিনি প্রভূত কার্য্য করেন। বাংলার কুটীরশিল্পের পুনরুজ্জীবনকারীরূপে তাঁহার আসন কম উচ্চে ছিল না। বাঙলীর মস্তিষ্কহীনতা, অন্নসমস্যা, সমাজ-সংস্কার, পাতিত্য সমস্যা, জাতিগঠন, বাংলার সাধনা ও সিদ্ধি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক সমস্যা, বাংলার পাঠাগার, জাতীয় বিদ্যালয়, ভাষাতত্ত্ব, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন—সমাজ

ও দেশের এমন দিক ছিল না—যেদিকে না তাঁহার মরমী দৃষ্টি ছিল! সংস্কার ও শোধন—এই ছিল তাঁহার মূল লক্ষ্য। শিক্ষা ও চরিত্রের নৈতিকতা সম্পর্কে তিনি বলেনঃ 'শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষ তৈয়ারী করা, অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বৃত্তিগুলি যথোচিতরূপে পরিস্ফুট করিয়া তোলা।......দিনের পর দিন পরোপকার, চিত্তের পবিত্রতা রক্ষা ও ভগবচ্চিন্তা প্রভৃতি কয়েকটি সৎ অভ্যাস পালন করা হইলে কালক্রমে আদর্শচরিত্র গঠিত হইয়া থাকে।'

দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া তিনি বলিলেনঃ 'আজ আমি সকলের নিকট যুক্তকরে প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের মাতৃভূমির অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া পুনরায় তাহাকে প্রাচীনকালের মতো জগদ্বরেণ্য করিবার জন্য প্রত্যেকে অকাতরে নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করুন। তবেই আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে।'

আমরা কি আচার্যের এই আবেদনে আজও সাড়া দিতে পারিয়াছি?

তাঁহার অমর আত্মা ইহজগতের সীমার উর্ধ্বে অমৃত-লোকে গিয়া অমরত্বলাভ করিয়াছে। ১৯৪৪ সালের ১৬ই জুনঃ বাংলার তথা বিশ্ববাসীর দরদী বন্ধু, ভারতের নিঃস্বার্থ-দানশীল বিজ্ঞান-জনক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র চির-নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। দেশবাসীর জন্য রাখিয়া গেলেন তাঁহার সুদীর্ঘ ৮৩ বৎসরের অমর সাধনার অমৃত ফল। আজ আমরা কবিগুরুর বাণী উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়া শুধু বলিঃ

'প্রেম-রসায়নে ওগো সর্ব্বজনপ্রিয়
করিলে বিশ্বের জনে আপন আত্মীয়।'

আগামী ভাদ্র সংখ্যার কয়েকটি বিশেষ রচনা

* ভাগীরথীর ভাগ্য — শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
* অর্থহীন কর্ত্তব্য — শ্রীপরিমল গোস্বামী
* বিদ্রোহী বঙ্কিম — শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী আশ্বিন সংখ্যা বঙ্গশ্রী
বর্দ্ধিত কলেবরে শারদীয়া সংখ্যারূপে আত্মপ্রকাশ করিবে। বাংলার বিশিষ্ট খ্যাতনামা লেখক-লেখিকা ও চিত্রশিল্পীর মনোজ্ঞ রচনা ও চিত্রে এই সংখ্যাটি সমৃদ্ধ হইবে।
সহৃদয় বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পূর্ব্বাহ্নেই এই সংখ্যার জন্য স্ব-স্ব বিজ্ঞাপন বুক করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।
এই সংখ্যার জন্য বর্ত্তমানে কোনো নতুন রচনা গ্রহণ করা হইবে না।

বিনীত
কর্ম্মাধ্যক্ষ ঃ বঙ্গশ্রী

আলোচনা

গ্রন্থ নির্ব্বাচনে সমালোচকের দায়িত্ব

শ্রীসুধীর ব্রহ্ম

জনশিক্ষার সহায়ক হিসাবে গ্রন্থাগার আজ সর্ব্বত্র আদৃত। আমেরিকা ও ইউরোপের গ্রন্থাগারগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপর্য্যায়ে উন্নীত এবং সম্মানিত। উপন্যাস লইয়াই আমাদের দেশের অধিকাংশ গ্রন্থাগার সৃষ্ট হইয়াছে। শতকরা ৯০ জন পাঠক উপন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট। বস্তুতন্ত্রবাদের নামে যে শ্রেণীর গ্রন্থ বাজারে চলিতেছে, পাশ্চাত্যের সমাজ চিত্র বিকৃত করিয়া 'মোঁপাসাঁর' অনুকরণে গ্রন্থ লিখিবার আগ্রহ ও এদেশের ছাঁচে ঢালিবার প্রচেষ্টা যেমন প্রবল তাহাতে পাঠকদের রুচি এমনই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রায় ২০০ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত, সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক প্রথা ও প্রণালী অবলম্বনে পরিচালিত করিবার কোন ব্যবস্থা আজও কর্পোরেশনের নাই। কাজেই সমাজের কল্যাণকর এবং উন্নতি-বর্দ্ধক গ্রন্থের অভাব পরিলক্ষিত হয়। উপন্যাস ব্যতীত উচ্চাঙ্গের শিক্ষণীয় অধিকাংশ গ্রন্থ আলমারির শেল্‌ফে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে। সেগুলিকে নাড়াচাড়া করিবার পর্য্যন্ত সময়াভাব এবং লোকাভাব। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"লাইব্রেরিকে ব্যবহার্য্য করতে হলে লাইব্রেরির পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হওয়া চাই। শেল্‌ফের উপরে গুছিয়ে বই সাজিয়ে হিসেব রাখলেই, লাইব্রেরির দায় শেষ হয় না। যে হেতু তার বই আছে সেই হেতু সে বইগুলিকে পড়িয়ে দিতে পারলেই তবে সে ধন্য।" জনসাধারণের রুচি ও মানসিক অবস্থা গ্রন্থনির্ব্বাচনের কাজের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। কোন পুস্তক ভাল লাগা বা না লাগা প্রধানতঃ তিনটি কারণের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, ব্যক্তির মনন শক্তি—মননশক্তি বলিতে শিক্ষা এবং চিন্তার উৎকর্ষও বুঝায়,—রুচি এবং মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। একজনের নিকট যে বস্তু কুৎসিৎ, অপরের চোখে তাহাই হয়ত সুন্দর, একটা জিনিষ যে সকলের চক্ষে ভাল লাগিবে, তাহার কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নাই—অবশ্য এমন কতকগুলি বস্তু আছে যাহা সকলকেই আনন্দ দেয়; যেমন জ্যোৎস্না, রাত্রি বা প্রস্ফুটিত গোলাপ। আষাঢ়ের যে মেঘ সেদিন রামগিরির শিখরে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছিল, সেদিন ময়ূর-ময়ূরী আনন্দে কে-কা রব করিয়াছিল, কিন্তু বিরহী যক্ষের মনে ঠিক সেই মুহূর্তেই হয়ত অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস ঘনাইয়া উঠিয়াছিল। কবি, ঔপন্যাসিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, অভিনেতা—ইহারা করেন সৃষ্টি; সমালোচক করেন সেই সৃষ্টির ব্যাখ্যা। সমালোচককে তাই ভাষ্যকার বলিলে অন্যায় হয় না। বস্তুতঃ, সমালোচনাই বিভিন্ন সৃষ্টির সহিত মানুষকে পরিচিত করে। সমালোচনার উৎপত্তি কবে হইতে, তাহার সন তারিখের কোন প্রয়োজন নাই। একথা স্বচ্ছন্দেই বলা যাইতে পারে, সমালোচনা মানুষের প্রকৃতিগত বিশেষ এক ধর্ম্ম এবং ইহা গ্রন্থ নির্ব্বাচনের প্রধান সহায়ক। নূতন বই প্রকাশিত হইলেই সমালোচক তার বিবরণ নিজে জানিয়া পাঠকদের জানাইয়া দিবার উপায় করিয়া দেন। যে কোন বিষয়ে ভালো বই আসিবামাত্র তার ঘোষণা হওয়া চাই। প্রত্যেক লাইব্রেরির অন্তরঙ্গ-সভ্য-রূপে একটি বিশেষ পাঠকমণ্ডলীর সঙ্গে লাইব্রেরির মর্ম্মগত সম্বন্ধ স্থাপনের সহায়তা করে এই পুস্তক নির্ব্বাচনের ব্যাপারটি। যদি লাইব্রেরির এই যাচাই বিভাগের কোন ব্যক্তি তাহাদের নিকট হইতে বিশেষ পাঠ্য প্রবন্ধগুলিকে শ্রেণী বিভক্তভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া একটা তালিকা পাঠ-গৃহের দ্বারের কাছে ঝুলাইয়া রাখেন, তাহা হইলে সেগুলির পাঠের সম্ভাবনা নিশ্চিত বাড়ে। গ্রন্থনির্ব্বাচনের কাজটি অক্রিয় না হইয়া সক্রিয় ভাবে পাঠকদের ডাক দেয়। নতুবা গ্রন্থাগারে গ্রন্থগুলি অপঠিত ভাবে স্তূপাকারে জমিয়া উঠে—লাইব্রেরির স্থান ক্ষয় ও ভার বৃদ্ধি করে। লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকদের সচেষ্টভাবে পরিচয় করাইয়া দেওয়া, গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজটি গৌণ হইলেও তাহার অঙ্গীভূত আমাদের লাইব্রেরিতে কী কী বই সংগ্রহ করা কর্তব্য, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল ভাল বই প্রকাশিত হইতেছে, তাহা যথাসম্ভব বিবরণ ও সমালোচনা পাঠে অবগত হইতে পারি। ভারতবর্ষের দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকাগুলি কি ভাবে গ্রন্থ নির্ব্বাচনে সাহায্য করে তাহাও এই সূত্রে আলোচ্য। মডার্ণ-রিভিউ, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ষ্টেটসম্যান, প্রভৃতি সাময়িক ও দৈনিক

পত্রিকাগুলিতে নূতন গ্রন্থ সম্বন্ধে বহু সংবাদ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে কোন বিষয়বস্তুর ধারাবাহিক গ্রন্থ-বিবরণী আজও প্রস্তুত না হওয়ায় দেশীয় লেখকদের প্রণীত দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের গ্রন্থ ক্রয় করিতে আমাদিগকে যথেষ্ট পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয়।

নূতন পুস্তক প্রকাশ হইলে উক্ত দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকাগুলিতে সেই পুস্তক সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা দেখা যায়। গ্রন্থ কাটতির জন্য প্রকাশকেরা পুস্তক সম্বন্ধে যে বিবরণী দেন তাহা গ্রন্থ নির্ব্বাচনের সহায়ক। সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রচনাদির সন্ধান পাইবার কোন ভাল ব্যবস্থা না থাকিলে অনেক মূল্যবান পুস্তকের অস্তিত্বের কথা লোকের গোচরেই আসে না। সাময়িক পত্রসমূহে পুস্তকের ও সাময়িক পত্রের প্রকাশিত আলোচনা পাঠে বহু ভাল পঠিতব্য জিনিষের সন্ধান পাওয়া যায়। যে সকল লেখা সুলিখিত নয় বা পঠিতব্য নয়—সেগুলির নিন্দা প্রকাশিত হইলে লেখকও ভবিষ্যতে লিখিবার সময় সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারেন। পুস্তকের সমালোচনা গ্রন্থ নির্ব্বাচনের যেমন সহায়ক ঠিক তেমনই লেখকের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করার সুযোগ দেয়। পুস্তক সমালোচনায় দোষ ত্রুটি দেখানো হইলে ক্রুদ্ধ বা বিমর্ষ হওয়ার কোন কারণ নাই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে বা শরৎচন্দ্রকে প্রথম জীবনে কত বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছিল; সে কথা স্মরণ করিলে মনে হয় লেখকরা অপকৃত না হইয়া বরং উপকৃতই হইবেন। কিন্তু প্রকৃত সমালোচনায় সমালোচকের মানসিক অবস্থার ছায়াপাত হওয়া নিষিদ্ধ। তাঁহার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ বা বিদ্বেষ ঈর্ষা যদি সেই সমালোচনার কোন অংশে প্রভাব বিস্তার করে, তাহা হইলে সমালোচনার অনেকখানি ত্রুটি হইবে। তাই প্রকৃত সমালোচনা দুরূহ, সহজপ্রাপ্য নহে। জগতে অসংখ্য প্রসিদ্ধ কবি, ঔপন্যাসিক, শিল্পী ও অভিনেতা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু হেজ্‌লিট বা ম্যাথু আর্ণল্ডের মত সত্যকার সমালোচক প্রচুর জন্মগ্রহণ করেন নাই।

আলোচ্য বিষয়ের সহিত যদি সমালোচকের ব্যক্তিগত লাভক্ষতি জড়াইয়া যায়, তবে তাঁহার দ্বারা প্রকৃত সমালোচনা সম্ভব হয় না। তাঁহার দৃষ্টি থাকিবে বৃহত্তর স্বার্থের দিকে। প্রকৃত সমালোচক, বিশেষ কোন দলভুক্ত হইবেন না। যেখানে যাহা কিছু সুন্দর, তাঁহার প্রতি তিনি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন; যেখানে অসুন্দর এবং অসত্য, তাহার মূলে করিবেন কুঠারাঘাত।

কিন্তু প্রকৃত সমালোচনা বা সমালোচক সকল সময়ে অতি অল্পই দেখা যায়। অধিকাংশ ব্যক্তিই সমালোচনা করিতে বসিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ, চিন্তা এবং মানসিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া পড়েন। অধিকাংশ সমালোচনা কি-প্রকার হইয়া থাকে, তাহার দুই একটি উদাহরণ লওয়া যাক। কোন লেখক একটি নীতি-গর্ভ পুস্তক রচনা করিয়া সমালোচনার জন্য পাঠাইয়াছেন, সমালোচকের সহিত লেখকের এককালে বন্ধুত্ব ছিল, পরে—কোন কারণে তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সমালোচকের ভাল লাগিল কিন্তু সত্যই যদি প্রকাশ্যে সেটিকে ভাল বলা যায়, তবে লেখকের কিছু আর্থিক লাভ হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এইরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হইল,—"পুস্তকের মধ্যে অনেকগুলি ভাল ভাল কথা আছে। অনেকগুলি কথামালা বা হিতোপদেশের মত। সত্যই যদি এগুলি কার্য্যে পরিণত করা যায়, তবে দেশের ও দশের উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, লেখক কি স্বয়ং কোন দিন এগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন?"

বলা বাহুল্য শেষের প্রশ্নটির সহিত পুস্তকের কোন সম্পর্ক নাই। যেহেতু লেখকের সহিত সমালোচকের আর সৌহার্দ্য নাই, তাই এরূপ লিখিত হইয়াছে। প্রত্যেক দেশের ৬০ ভাগ সমালোচনা এইরূপ। আর এক প্রকার সমালোচনার নমুনা দেখুনঃ—

কোন লেখক একখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। পুস্তকটি ভাল হয় নাই, কিন্তু সমালোচক লেখক কর্তৃক অনেকবার উপকৃত হইয়াছেন। সুতরাং তাহার সমালোচনা হইল এইরূপঃ

"এই পুস্তকের লেখক জীবনে বহু পুণ্য কাজ করিয়াছেন। আজ তিনি পুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন দেখিয়া বাস্তবিক সুখী হইলাম। এইরূপ সচ্চরিত্র ব্যক্তির পক্ষে লেখনী ধারণ করা সত্যই প্রয়োজন হইয়াছে। পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই চমৎকার"।

বলা বাহুল্য, পুস্তকখানি সত্যই কিরূপ হইয়াছে, সে সবন্ধে সমালোচক একেবারেই নীরব এবং আরও মজার কথা এই যে, পুস্তকের মধ্যে কোথাও হয়ত উচ্চ নীতিজ্ঞানের পরিচয় নাই। নাই বা থাকিল,—উপকারীকে খুশী করা হইল তো! এইরূপ সমালোচনা শতকরা ৩৬টি, বাকি ৪টি প্রকৃত। ইহা কোন বিশেষ দেশের কথা নয়, প্রত্যেক দেশেই এই প্রকার সমালোচনা নিত্য-নিয়ত বাহির হইয়া থাকে। যদিও এইগুলি 'সমালোচনা' নামেরও অযোগ্য।

শুধু যে সাহিত্যেই এইরূপ হয়, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। শিল্প, বিজ্ঞান এবং বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক বিষয়েও ঠিক এই ভাবেই সমালোচনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই প্রকার লেখা সমালোচনাই নহে; যিনি প্রকৃত সমালোচক, তিনি ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি, হিংসা-বিদ্বেষের অনেক ঊর্দ্ধে। সমালোচকের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা অনেক, ইচ্ছা করিলে তাঁহারা—সাদাকে কি ভাবে কালো করিতে পারেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পাঠক সাধারণ অধিকাংশ সময়ে সমালোচকের কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লয়, এবং তাঁহার কথামত ভাল রচনা পাঠ করে না, মন্দ পুস্তক কিনিয়া আনে; ভাল পুস্তক সম্বন্ধে তাহার মনে মন্দ ধারণা জন্মে, মন্দকে ভাল বুঝে। রাজনীতি এবং সমাজ-নৈতিক বিষয়ে এই কাজ যে কতখানি ক্ষতিকর, তাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু একথা অতি বড় সমালোচকও অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, পক্ষপাতদুষ্ট সমালোচনা ব্যক্তির ও সমাজের ক্ষতিই করে।

সমালোচক ভাষ্যকার। যে বস্তু সাধারণের অবোধ্য বা অজ্ঞাত, তাহা বুঝাইয়া দেওয়াই তাঁহার কর্তব্য। কিন্তু সে কর্তব্য কয়জন পালন করে? হেজ্‌লিট্‌ বলিয়াছেন,—"প্রকৃত সমালোচনার উদ্দেশ্য নিন্দা করাও নহে, প্রশংসা করাও নহে, যাহা সত্য সেইটুকু অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রকাশ করা।" এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া কয়জন সমালোচক সমালোচনা করেন?

প্রকৃত সমালোচনা যে কতদূর সুফল প্রসব করিতে পারে, এইবার সেই কথাই উল্লেখ করিব। এমন একদিন ছিল, যখন পাশ্চাত্যে সেক্সপীয়রের রচনা লোক-চক্ষুর অগোচরে থাকিত। সেক্সপীয়র রঙ্গালয়ের প্রয়োজনে নাটক লিখিতেন। নাটক অভিনীত হইত, কিন্তু প্রকাশিত হইত না। রঙ্গালয়ে নাটকগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া সম্প্রদায়ের সুবিধামত—অভিনীত হইত। কর্তৃপক্ষ সেগুলি প্রকাশ করিতে রাজী ছিলেন না। পরে কতকগুলি ব্যক্তি প্রত্যেক অভিনয় রাত্রে উপস্থিত থাকিয়া, অভিনয় হইতে নাটকগুলি অংশতঃ লিখিয়া আনিতেন। এই উপায়েই সেক্সপীয়াবের মৃত্যুর পর সেগুলি ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। নাটকগুলি প্রকাশিত হইবার পরও জনসাধারণ তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারিল না। তখন বিভিন্ন সমালোচক সেক্সপীয়ারের রচনার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন এবং তাহারই ফলে সেক্সপীয়ার আজ পৃথিবী-বিখ্যাত। কিন্তু সেরূপ আগ্রহ, উৎসাহ ও সততা বর্তমান কালের সমালোচকদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় কি?

কোন ব্যক্তি বিশেষের বিদ্বেষ না লইয়া, কোন বিশেষ মতবাদ বা সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন না হইয়া গ্রন্থ নির্ব্বাচনের কাজে অগ্রসর হওয়া উচিৎ। কাজেই এই জাতীয় কল্যাণকর কার্য্যে যথোচিত সাহস, ধীরতা এবং সংযম অবলম্বন করা কর্তব্য। সেইজন্য গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ ড্রুরি সাহেব গ্রন্থ নির্ব্বাচন ব্যাপারে কতকগুলি পদ্ধতি অবলম্বন করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। গ্রন্থ নির্ব্বাচন কার্য্যে গ্রন্থাগারিকের প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয় (১) পাঠক, (২) গ্রন্থ, (৩) অর্থ।

প্রথম লক্ষ্য হইতেছে—কোন শ্রেণীর পাঠক গ্রন্থাগার ব্যবহার করিবে, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে তাহারা কতদূর অগ্রসর? এতদ্ব্যতীত পাঠকদের রুচি এবং চাহিদার প্রতিও সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ কোন্ কোন্ বিশেষ বিষয়ের গ্রন্থ পড়িবার জন্য পাঠকরা অতিমাত্রায় আগ্রহশীল এবং কোন্ গ্রন্থ ক্রয় বা সংগ্রহের জন্য পাঠক লিখিত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থাগারে রক্ষিত গ্রন্থগুলি পাঠকদের চাহিদা ও ক্ষুধা মিটাইতেছে কিনা। তৃতীয়তঃ অর্থের পরিমাণ অনুযায়ী গ্রন্থ ক্রয়ের ব্যবস্থা। প্রতি বৎসর কেবল মাত্র ইংলণ্ড হইতেই প্রায় চৌদ্দ হাজার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহা ব্যতীত আমেরিকায় বহু সহস্র গ্রন্থ প্রতি বৎসর মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে। কাজেই অর্থ বাজেটের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিভিন্ন গ্রন্থের বিবরণ ও সমালোচনা পাঠ করিয়া গ্রন্থ তালিকা প্রস্তুত করা বিধেয়।

তরল আলতা

বললে বোঝায় সুপ্রসিদ্ধ পি, সি, দাসের "সুবাসিত তরল আলতা" বহু-শত বৎসর ধরে সুনাম অক্ষুন্ন রেখে সমভাবে চলে আসছে! মাত্র একবার ব্যবহারেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান হয় — কারন তারপর আর কোন আলতায় মেয়েদের মন ভরে না--------

আলতা-সিন্দুর-স্নো-ক্রীম

সকল সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠানেই পাওয়া যায়।

জীবন-রহস্যঃ সচিত্র নিবন্ধ সঙ্কলন। শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। বসুমতী সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা, মূল্য এক টাকা মাত্র।

বর্তমান নৈতিক অবনতির যুগে আলোচ্য গ্রন্থের মাধ্যমে লেখক মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে উদ্ঘাটিত করিয়া একটি শাশ্বত সত্য প্রতিষ্ঠার অবকাশ পাইয়াছেন। চারিটি মূল অনুচ্ছেদে গ্রন্থখানি রচিত। লেখকের মূল বক্তব্য হইতেছে এই যে—'মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সত্য; দ্বিতীয় সম্পদ সৌন্দর্য্য; তৃতীয় সম্পদ সাহিত্য, চতুর্থ সম্পদ সঙ্গীত। এই চারিটি সম্পদকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত এবং উপভোগ করিতে পারিলে মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হইতে পারে।...... সত্যে ধর্ম্ম; সৌন্দর্য্যে সুখ; সাহিত্যে শান্তি; সঙ্গীতে মুক্তি। ধর্ম্ম, সুখ, শান্তি, মুক্তি—এই চারিটি ঐশ্বর্য্য ব্যতীত মানব জীবনে অভীষ্ট আর কি থাকিতে পারে?' এই চারিটি মূল বিষয়-বস্তুর মধ্য হইতেই প্রবীণতম লেখক জীবন-রহস্যের কয়েকটি পাতা পাঠক-সমাজের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু সেই সত্য রহস্যের ঘেরাটোপে বন্দী হইয়া থাকিলেই কাজ হইবে না, ব্যবহারিক জীবনে তাহাকে বাস্তবানুগ করিয়া তুলিতে হইবে। সেকেণ্ডারি এডুকেশন বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় যদি তাঁহাদের বাংলা সাহিত্যে 'জীবন রহস্যের' নিবন্ধগুলিকে পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করিয়া ছাত্র-সমাজের কাছে তুলিয়া ধরেন, তবে ছাত্রবৃন্দের নৈতিক আদর্শের দিক হইতে গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তুগুলি অনেক কাজে আসিবে।

জেলখানা-কারাগারঃ নিকুঞ্জ সেন। গণ-দীপায়ন পাব্লিশার্সঃ ১৭০-এ, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা মাত্র।

দেউলী জেলের বাস্তব ঘটনা লইয়া আলোচ্য গ্রন্থখানি রচিত। রাজবন্দী হিসাবে লেখক দেউলীতে কারারুদ্ধ হইয়া প্রাত্যহিক জীবনে যাহা কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, মনোরম কাহিনীর মাধ্যমে সেই প্রাত্যহিক বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই তিনি সুললিত ভঙ্গীতে রূপ দিয়াছেন। তাহাতে জেল-সুপার, ক্যাপ্টেন হইতে সুরু করিয়া নিম্নতন মুসলমান কয়েদী ক্ষুদু—সকলেই আত্ম-স্বকীয়তায় বিশেষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। লেখকের সদম্ভ উক্তিতে কোথাও কোনো একটি কাহিনীই কণ্টকিত হইয়া ওঠে নাই, বরং অপ্রিয় সত্যের অভিব্যক্তিতে স্থানে স্থানে অত্যধিক রস সঞ্চার ঘটিয়া মূল বক্তব্যকে আরও রসালো করিয়া তুলিয়াছে।

কারারুদ্ধ জীবনের সার্থক কাহিনী আমরা প্রথম লাভ করি টলষ্টয়ের একাধিক রচনায় এবং বিশেষ করিয়া মাইকেল ডষ্টয়েভ্স্কির 'দি ডেড্ হাউসে'। বাংলা সাহিত্যেও এই জাতীয় গ্রন্থ এই নতুন নয়। কৃষ্ণ হাতী সিংয়ের 'রুদ্ধ-কারার দিনগুলি,' বীণা দাসের 'শৃঙ্খল-ঝঙ্কার' এবং অমলেন্দু দাশগুপ্তের 'বক্সা ক্যাম্প' এই কারাজীবনেরই বাস্তব কাহিনীতে সমৃদ্ধ। স্ব স্ব অভিজ্ঞতা লইয়া বিভিন্ন লেখক বন্দীজীবনের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। প্রতি ক্ষেত্রেই ইতিহাস উপন্যাসের মতো রস-সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। 'জেলখানা-কারাগার' সম্পর্কেও সেই একই কথা। মনোরম প্রচ্ছদপট ও পরিচ্ছন্ন ছাপার জন্য গ্রন্থখানি আরও আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে; অথচ সেই তুলনায় মূল্য অধিক হয় নাই।

সম্পাদকীয়

রাজ্যপালের ভাষণ

পশ্চিমবঙ্গের নূতন বিধানসভা ও পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে গত ৬ই জুন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি এক দীর্ঘবিলম্বিত বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐতিহাসিক তাৎপর্য্যের দিক হইতে বক্তৃতাটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলামঃ

রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জি

'বিধানসভা ও পরিষদের সদস্যবৃন্দ, ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত বিধানসভা ও পরিষদের প্রথম ঐতিহাসিক অধিবেশনে আমি আপনাদিগকে আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিতেছি। এই রাজ্যের ইতিহাসে নূতন যুগের সূত্রপাত হইয়াছে এবং পুরাতন ব্যবস্থাপরিষদের বিলোপসাধনের সঙ্গে পূর্ব্বতন শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির সহিত শেষ যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হইল। এক্ষণে আমরা নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত হইয়া যাত্রারম্ভ করিতেছি। যে জনসাধারণ আপনাদিগকে প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছে এবং যাহারা রাজ্যের কল্যাণ-সাধনের কর্তব্যভার আপনাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছে, আমরা তাহাদের কল্যাণ ও সমৃদ্ধিসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি নিশ্চিত, আপনারা তাহাদের ন্যস্ত বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন। আমি আপনাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি; আশা করি এই রাজ্যের জনসাধারণের বৈষয়িক ও নৈতিক শ্রীবৃদ্ধিকল্পে আপনারা অবিরাম কর্ম্মতৎপর থাকিবেন।'

উপমন্ত্রী নিয়োগের যৌক্তিকতা

'আমার সরকার এই ব্যাপারে তাঁহাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অনবহিত নহেন। এই রাজ্যের উন্নয়নের ব্যাপারে নীতি ও কর্ম্মসূচী বিন্যাসে তাঁহারা আপনাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা যেমন প্রত্যাশা করিয়া থাকেন, তেমনি তাঁহারা সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব রূপায়ণে মন্ত্রীদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় শক্তি সঞ্চার করিবার উপযোগিতা সম্পর্কেও সজাগ। এতদনুযায়ী কয়েকজন উপমন্ত্রী নিয়োগ করা হইয়াছে; তাঁহারা শুধু কয়েকটি দপ্তরে আমার মন্ত্রিগণকে সহায়তাই করিবেন না, তাঁহাদের তরফে তাঁহারা উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যাপারে তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণও করিবেন। আমার উপমন্ত্রিগণকে সযত্নে নির্ব্বাচন করা হইয়াছে; তাঁহারা শুধু কঠোর শ্রম করিতেই প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা স্থানীয় সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। তাঁহারা আমার সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে অমূল্য যোগসূত্র হিসাবে কাজ করিবেন। তাঁহারা সাধারণের অভিপ্রায় ও প্রস্তাব আমার সরকারের গোচরে আনিবেন; তদনুযায়ী রাজ্যের প্রজাসাধারণের প্রকৃত প্রয়োজন অনুযায়ী সমুদয় শাসন ঘটিত নীতি ও কর্ম্মসূচী ভবিষ্যতে নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে। আমাদের জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র এক্ষণে বহুমুখী উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় রত। আমার উপমন্ত্রিগণ শাসন পরিচালনার ব্যাপারে অন্তর্দৃষ্টিলাভ করিবেন এবং দৈনন্দিন কাজকর্মে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবেন। ইহার

ফলে যথাসময়ে তাঁহারা অধিকতর দায়িত্বভার গ্রহণে নিজ-দিগকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে পারিবেন।'

দপ্তর পুনর্গঠন ও সৃষ্টি

'এই একই উদ্দেশ্যে কয়েকটি দপ্তরের পুনর্গঠন করা হইয়াছে। কুটীর ও ছোটখাটো শিল্প দপ্তর নামীয় একটি নূতন দপ্তর সৃষ্টি করা হইয়াছে। কুটীর ও ছোটখাটো শিল্পের প্রয়োজনীয়তা তেমনভাবে আমরা উপলব্ধি করি নাই। বৃহৎ শ্রমশিল্পের কঠোর প্রতিযোগিতা, মূল কাঁচা-মালের অভাব, মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে স্বল্প সুযোগ এবং যথোপযুক্ত মাল বিক্রয়ের অব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে এই সব শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে। এই মূল অসুবিধা দূর করা, প্রচলিত কুটীর ও ছোটখাটো শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং অনুকূল পরিবেশ অনুযায়ী নূতন শিল্পে উৎসাহ দান করাই হইবে এই বিভাগের উদ্দেশ্য। সুসম পরিকল্পনা অনুযায়ী এই ব্যবস্থা করা হইবে। রাজ্যের শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কিত যে কোনো পরিকল্পনায় এতদনুযায়ী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে সমতাসাধন করা হইবে।'

—'খণ্ডজাতি উন্নয়ন সম্পর্কিত একটি নূতন দপ্তর সৃষ্টি করা হইয়াছে। একজন উপমন্ত্রীর সহায়তাপুষ্ট আমার জনৈক মন্ত্রীর উপর এই বিভাগের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে "মন-স্তাত্ত্বিক দিক হইতে সমগ্র ভারতের একাত্মতা সাধনের" প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করিয়াছেন। "ইহার ফলে যে ঐক্য-বোধের সৃষ্টি হইবে, তাহা প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও অন্যান্য বিভেদবাদের অবসান ঘটাইবে।" খণ্ড জাতি ও ভারতের অবশিষ্টাংশের লোকজনের মধ্যে "সৌহার্দ্য ও বুঝাপড়ার সংযোগসূত্র" রচিত হওয়া উচিৎ।—যাহাতে একই ধরণের বিষয় একটি দপ্তরের অধীন হইতে পারে, এমনভাবে অন্যান্য কয়েকটি দপ্তরের মধ্যে কাজকর্ম বণ্টন করা হইয়াছে।'

'নূতন দপ্তরসমূহের মধ্যে উন্নয়নদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ। উহা বিবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয়সাধক সংস্থা হিসাবে কাজ করিতেছে। ইহা ছাড়া, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা রূপায়ণের ভারও উহার উপর ন্যস্ত, যথা—সমাজ-কল্যাণমূলক সমবায় পরিকল্পনা, কল্যাণী উপনগর নির্মাণ পরিকল্পনা এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা নির্মাণবোর্ড সরকারের বিভিন্ন বিভাগের তরফে জরুরী নির্মাণকার্য্য রূপায়ণের ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত দপ্তর ইহার উপরও তদারকী করিবে।'

সমাজ কল্যাণমূলক সমবায় উন্নয়ন পরিকল্পনা

'আমাদের গ্রামোন্নয়ন ও উপনগর নির্মাণের উদ্দেশ্যে আমার সরকার বিভিন্ন এলাকায় সমাজকল্যাণমূলক সমবায় উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্য্যকর করার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে রাজ্যের আটটি অঞ্চল নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। অনুমান ৫ হাজার লোকের উপযোগি একটি গ্রামাঞ্চলীয় উপনগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ একশতটি গ্রামের একটি ভূখণ্ড লইয়া প্রত্যেকটি এলাকা গঠিত হইয়াছে। এই কর্মসূচীতে সহুরে লোকজন ও গ্রামবাসীদের পারস্পরিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। যদিও কৃষির উন্নয়নের উপরই সর্ব্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইবে, তথাপি উপনগরে ছোটখাটো ও মাঝারি ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণও ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইবে। এইসব অঞ্চলে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকেন্দ্র এবং সমবায় সমিতি প্রভৃতি স্থাপনের ব্যবস্থাও হইবে। জনৈক উন্নয়ন কমিশনারের অধীনে একটি বিশেষ সংস্থা গঠন করা হইয়াছে। তিনি এইসব পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবেন।'

অধিক খাদ্যোৎপাদন পরিকল্পনা

'অধিক খাদ্যোৎপাদন পরিকল্পনা সম্পর্কিত নীতিরও পুনর্বিন্যাস করা হইয়াছে। আমার সরকার স্থির করিয়াছেন যে, অল্প পরিমাণ বীজ ও সার বিস্তৃত অঞ্চলে বিতরণ না করিয়া স্বল্প পরিসরযুক্ত অঞ্চলে ব্যবহার করা হইবে। এইভাবে অল্প জমিতে বেশী ফসল ফলাইবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।'

সেচ পরিকল্পনা

'আমার সরকার এতদরাজ্যে সেচ পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যাপারে বিশেষ বৈজ্ঞানিক ও কৃষকের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হইয়াছে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ যাহাতে কৃষকগণ পাইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে বহু কর্মচারী কাজ করিতেছেন।'

কৃষি কলেজ

'বাংলা বিভাগের পর হইতে একটি কৃষি-কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে আমার সরকার টালিগঞ্জে একটি ডিগ্রী কলেজ স্থাপন করিয়াছেন। আগামী সেসন হইতে উহাতে পড়াশুনা আরম্ভ হইবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আবহাওয়ার অবস্থা খারাপ থাকায় গতবার আমনের ফসল কম হইয়াছে, ইহার ফলে খাদ্যশস্যের প্রচুর ঘাটতি হইয়াছে।'

২৪-পরগণা, নদীয়া ও হাওড়ার বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ্যাবস্থা

'২৪-পরগণা, নদীয়া ও হাওড়ার বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ্যাবস্থা সেখানকার জনসাধারণের অশেষ দুর্গতির কারণ হইয়াছে। আমার সরকার এই সমস্ত অঞ্চলের জন্য প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার মণ চাউল ছাড়িয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ১৫৲ টাকা মণ দরে তাঁহারা ১০ হাজার টন চাউল ও ১০ হাজার টন আটা অথবা গম বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। চাউলের ক্ষেত্রে যে সাহায্য দেওয়া হইতেছে, তাহা রাজ্য-সরকার এবং গম ও আটার ক্ষেত্রে যে সাহায্য দেওয়া হইতেছে, তাহা ভারত সরকার বহন করিবেন।'

দুর্গত অঞ্চলে সাহায্য ব্যবস্থা

'দুর্গত অঞ্চলসমূহে সাহায্য কার্য্য সংগঠনের জন্য ইতিমধ্যে আমার সরকার প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতেছেন। ২৪-পরগণা জেলা অত্যন্তই দুর্দ্দশাগ্রস্ত। এই জেলাটিতে বৃদ্ধ ও অক্ষম এবং যাহারা পরিশ্রম করিয়া জীবিকার্জ্জনে শারীরিকভাবে অসমর্থ, তাহাদের মধ্যে খয়রাতি সাহায্য বণ্টন করা হইতেছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে সাহায্য হিসাবে বণ্টনের জন্য ৫ হাজার মণ চাউল ও ৫ হাজার মণ আটা ছাড়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ধুতি, শাড়ী ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পোষাক বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রচুর পরিমাণে গুঁড়া দুধও বিতরণ করা হয়। টেষ্ট রিলিফ কেন্দ্রও খোলা হইয়াছে। দুর্গত অঞ্চলসমূহে রাস্তাঘাট ও বাঁধ সংস্কারের কাজও আরম্ভ করা হইয়াছে। যে সমস্ত স্থানে টেষ্ট রিলিফের কাজ চলিতেছে, সেইসব স্থানে সাহায্য-ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে।'

খাদ্যাবস্থার তীব্রতা হ্রাসের আশা

'আউস ফসল এবার ভালো হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। সেই সঙ্গে আমরা সংবাদ পাইয়াছি যে, ভারত-বর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে গমের উৎপাদনও এবারে অত্যন্ত সন্তোষজনক। এই কারণে আশা করা যায়, খাদ্যাবস্থার তীব্রতা শীঘ্রই হ্রাস পাইবে।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু আগমন

'দুর্ভাগ্যের বিষয়, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পুনরায় উদ্বাস্তু আগমন আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের খাদ্যাবস্থা খারাপ বলিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি। খাদ্যাভাবজনিত দুর্দ্দশাই বর্তমানের এই স্থানত্যাগের জন্য অনেকাংশে দায়ী। নবাগত উদ্বাস্তুদের জন্য কলিকাতার নিকটে নূতন কয়েকটি সাময়িক-আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ইঁহাদের পুনর্ব্বাসনের সমস্যা স্বভাবতঃই আমার সরকারের পক্ষে উদ্বেগের কারণ হইয়াছে।......'

রাজ্যপালের এই ভাষণ লইয়া রাজ্য-পরিষদ ও বাহিরে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিতর্ককারীদের যুক্তিগুলি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তাঁহাদের আসল বক্তব্য হইতেছে এই যে, 'ইহাতে পশ্চিমবঙ্গের নূতন সরকারের শাসননীতি কি হইবে, তাহার কোনো বিস্তারিত আলোচনা নাই। রাজ্যের বর্তমান অবস্থা কিরূপ, তাহার আংশিক বর্ণনা এবং নূতন শাসনকার্য্যে কি কি দায়িত্ব লওয়া হইয়াছে, তাহারই মাত্র বিবৃতি আছে। এতদ্ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গ শাসনের নামে যে একগাদা উপমন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে, ভাষণের প্রথমেই তিনি (রাজ্যপাল) সেইটি বিশেষভাবে সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন।' আসলে বিষয়টি রাজ্যপালের ভাষণে স্থান পাইবার উপযুক্ত বলিয়াই কেহ মনে করিতে পারেন নাই। উপমন্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারটিও তাহাই। রাজ্যপালের এই জাতীয় উক্তি নিশ্চয়ই মুখ্য-মন্ত্রী মহোদয়ের অভিমতের দ্বারা প্রভাবিত, বিতর্ককারীদের এইরূপ যুক্তিও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত পরিকল্পনার কথা রাজ্যপাল তাঁহার ভাষণে উল্লেখ করিয়াছেন—ফিরিস্তি হিসাবে তাহার উপযোগিতা বিবেচিত হইলেও—পরিকল্পনা কি ভাবে কার্য্যকরী করা যাইবে তাহার কোনো গঠনমূলক কর্মপন্থা স্থান পায় নাই। পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের কাছে আজ দুইটি সমস্যা ভারী হইয়া উঠিয়াছেঃ প্রথমতঃ খাদ্যসমস্যা, দ্বিতীয়তঃ উদ্বাস্তু সমস্যা। ইহার উল্লেখ করিলেও ইহার কোনোটিরই সমাধানের ইঙ্গিত রাজ্যপালের ভাষণে পাওয়া যায় নাই। বস্তুতঃ এই দুইটি সমস্যার যদি আশু সমাধান না হয়, তবে যে অন্য সমস্ত পরিকল্পনাই ইহার চাপে নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহাতে সংশয় কি! এই দুইটি প্রধান সমস্যার গুরুত্বের প্রতি রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জির দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে প্রবল উত্তেজনায় রাজ্যপরিষদে ও বাহিরে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অবশ্য সম্প্রতি প্রশমিত হইয়াছে; কিন্তু প্রশমিত হইলেও সমস্যার আদৌ

অবসান হয় নাই। আমরা সসম্ভ্রমেই সেই সমস্যাগুলি সম্পর্কে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং পশ্চিমবঙ্গের জীবনে আশু করণীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে তাঁহাকে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি

গত ১৩ই জুন পশ্চিমবঙ্গের ১৪ জন মন্ত্রী ও ১৬ জন উপমন্ত্রী শপথ গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত হন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একাই পাঁচটি গুরুত্ব-পূর্ণ-পদের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ইহা পশ্চিম-বঙ্গের রাজ্যপাল কর্তৃক অনুমোদিত, সন্দেহ নাই, কিন্তু বিধান পরিষদের বিরোধী দল বা পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ কেহই এই মন্ত্রী-আধিক্যকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখার্জি গত সাধারণ নির্ব্বাচনে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও কৌশলে তাঁহা-দিগকে পুনরায় নূতন মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা পশ্চিমবঙ্গবাসীর অনুমোদন লাভ তো করেই নাই, বরং বিষয়টি এমনই বিস্ময়কর যে, ভাবিতে গেলে সাংস্কৃ-তিক রুচিতে বাধে। সরকারী দপ্তরের নিভৃতে যখন এই নির্ব্বাচন কার্য্য সুসম্পন্ন হইল, নদীয়া ও ২৪-পরগণা জেলা জুড়িয়া তখন দুর্ভিক্ষের হাহাকার উঠিয়াছে। দলে দলে লোক গ্রাম ছাড়িয়া সহরে, সহর ছাড়িয়া রাজধানীর পথে ছুটিতে সুরু করিয়াছেঃ তবু যদি খাদ্য ও আশ্রয়ের কিছু সন্ধান মেলে। সরকারী দপ্তর হইতে এতবড় ঘটনাকে কিন্তু পুরাপুরি প্রায় অস্বীকার করাই হইল। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী জনাব রফি আহমদ কিদোয়াই আসিয়া পশ্চিমবঙ্গের দুর্গত অঞ্চলসমূহে ঘুরিয়া খাদ্য ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘোষণা না করিলে পশ্চিম-বঙ্গের এই দুর্গত মানব-সমাজের অনশন বা অর্দ্ধাশনের ইতিহাস হয়ত চাপাই পড়িয়া থাকিত। কারণ সরকারী দপ্তরের তখন নয়া-মরশুমি উৎসব। এই উৎসবের তালে তাল দিয়া যাহারা চলিতে পারিল না—মন্দ ভাগ্য লইয়া তাহারা সরকারী দপ্তরের উষ্মা ভাজন হইল। কিন্তু উষ্মাভাজন হইলেও মানুষ কিছু অন্ধ বা মুর্খ নয়। ভালোকে ভালো বলিবার এবং মন্দকে মন্দ বলিবার মতো চিত্তবৃত্তি এখনও তাহাদের নষ্ট হয় নাই। সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গবাসী যখন এই মন্ত্রী-আধিক্যের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, বুভুক্ষু দেশবাসীর প্রতি উদাসীন থাকিয়া অধিক অর্থব্যয়ে এতসংখ্যক মন্ত্রী নিয়োগ ঘোরতর অপরাধ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইহা স্বজন-পোষকতারই নামান্তর মাত্র, তখন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। সদম্ভ উক্তিতে তিনি এই অধিক সংখ্যক মন্ত্রিনিয়োগের একটা আত্মপক্ষ-গত যুক্তি খাড়া করিয়া সকলের মুখ বন্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন। উক্তিটি ঐতিহাসিক, অতএব এখানে উল্লেখ-যোগ্য। আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি ঘোষণা করেনঃ

'বর্তমান মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, আমি স্বয়ং অনেকগুলি দপ্তরের ভার গ্রহণ করিয়াছি এবং এইগুলি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর; দ্বিতীয়তঃ, আমি অনেকগুলি মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী গ্রহণ করিয়াছি। আমি মনে করি, আমার এই উভয় কার্য্যই যে সঙ্গত হইয়াছে, তাহা প্রতিপাদন করিতে হইবে। যাঁহারা বলিতেছেন যে, আমি অনেকগুলি দপ্তরের ভার লইয়াছি; তাঁহারা সম্ভবতঃ জানেন না যে, গত কয়েক মাস হইল এই সমস্ত দপ্তরেরই কার্য্যাবলী আমি তত্ত্বাবধান করিতেছি। ইহার সহিত গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন সাহায্য ও পুনর্বসতি দপ্তরও আমার তত্ত্বাবধানে ছিল। যে সমস্ত বিষয়ের ভার আমি নিজে গ্রহণ করিয়াছি, সেইগুলির জন্য আমি ছয়জন উপমন্ত্রী গ্রহণ করিয়াছি। যদিও তাঁহারা আপাততঃ প্রধান দপ্তরের কোনও একটি দপ্তরের ভার লইবেন, তথাপি তাঁহারা যখনই অনুভব করিবেন যে, তাঁহারা আরও গুরুদায়িত্ব গ্রহণে সমর্থ, তখনই আমি যথাসম্ভব দ্রুত দায়িত্বভার ত্যাগ করিব। **এইরূপ মানবিকতাবোধ আমার আছে।** ইহাতে আমি শ্রম ও উদ্বেগ হইতে অব্যাহতি পাইব। শাসনকার্য্য পরি-চালন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনে আমি এই সমস্ত উপ-মন্ত্রীকে পরিচালনা করিতে পারিব বলিয়া গর্ব্ববোধ করি-তেছি।......আমি ব্যক্তিবিশেষকে বা কয়েক ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছি— সম্ভবতঃ এই ধারণা হইতেই এরূপ সমালোচনা করা হইতেছে যে, আমি বেশী উপমন্ত্রী গ্রহণ করিয়াছি। আমি দৃঢ়তার সহিত জানাইতেছি যে, এরূপ ধারণার মূলে কোনো সত্য নাই।— সহকর্মীদের সাহায্যে আমি রাজ্যের উন্নতির জন্য সতর্কতার সহিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছি। **মন্ত্রিসভায় যত সংখ্যক সদস্য আমি গ্রহণ করিয়াছি, তাহার জন্য আমি কোনো কৈফিয়ৎ দিতে চাই না।** শাসনকার্য্যের বিভিন্ন বিভাগে উন্নতিসাধনের জন্য আমি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে কাজ করিয়াছি এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি ইহা অনুভব করি যে, **আমি সঙ্গত কার্য্যই করিয়াছি। আমি যাহা করি, তাহার পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করি। এই নূতন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ**

দায়িত্ব আমার। আমি বিশেষভাবে আশা করি যে, এই মন্ত্রিসভা বর্তমানে এই প্রদেশ যে অবস্থায় আছে, তাহা অপেক্ষা ইহাকে অধিকতর বাসযোগ্য করিয়া তুলিবেন। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে আমরা সকলেই সুখী হইব।'

উপসংহারে মাত্র এইটুকু বলিয়া সমাপ্তি টানিলেই বোধ করি যথেষ্ট হইবে যে, ডাঃ রায়ের প্রভূত মানবিকতা-বোধ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার কার্য্যের জন্য জনসাধারণের নিকট তিনি প্রয়োজনমতো কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য বৈ কি! ইহা চিকিৎসা-বিজ্ঞান নয়, ইহা রাষ্ট্র-বিজ্ঞান। রাষ্ট্র-নায়কের দায়িত্ব যেমন অনেকখানি, জনসাধারণের নিকট তিনি দায়ীও তেমনি ততখানি। অতএব শুধু তিনি কেন, যে কোনো রাষ্ট্রনায়কই যদি মনে করিয়া থাকেন যে, তাঁহার যাহা খুশী তাহাই করিবেন, তবে মস্ত বড় ভুল করিবেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গে সে-ভুল পূর্ব্বেও হইয়াছে, এখনও হইতেছে। শুধু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ক্রমাগত এই ভুলের উপরেই এ রাজ্যের সরকারী দপ্তর ভাগ্যক্রমে টিকিয়া যাইতেছেন। নতুবা পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় একটি খণ্ড দ্বীপসদৃশ রাজ্য-শাসনে ৩০ জন মন্ত্রীর কতখানি প্রয়োজন ছিল? অবিভক্ত বঙ্গে সাত হইতে নয় জন মন্ত্রীও কোনোকালে সুষ্ঠুভাবে —অন্ততঃ বর্তমানের তুলনায় সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন—এমন ইতিহাসের নজির রহিয়াছে। আজ মাত্র ছয়আনী সদৃশ এই রাজ্যে সেখানে ৩০ জন মন্ত্রীর এই গদি-প্রাধান্য দেখিয়া আমাদের শুধু 'বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচির' কথাই মনে পড়িতেছে। সারা ভারতে এমন দেশটি আর কোথায়?

পশ্চিমবঙ্গের নবনিযুক্ত মন্ত্রিবর্গের বেতন ও ভাতা

পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীবর্গের মাসিক বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া রাজ্য-বিধানসভার অধিবেশনের প্রারম্ভেই বহু-নিন্দিত একটি বিল উত্থাপিত হয়। বিরোধীদল প্রবল-ভাবে এই বিলের বিরুদ্ধে সংযুক্ত ও সুসংগঠিত অভিমত ব্যক্ত করেন এবং এমন কি অসংখ্য বুভুক্ষু জনতা পরিষদ ভবনের বাহিরে সমবেত হইয়া এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, দেশের লোককে অনাহারে রাখিয়া মন্ত্রীদের এইরূপ অহেতুক বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি কিছুতেই হইতে পারে না। কিন্তু সেদিকে কংগ্রেসী দল বা সরকারী পক্ষ কেহই ভ্রূক্ষেপ করেন না। পুলিশি শাসনের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বরং সমবেত বুভুক্ষু জনতার উপর পুলিশ-ব্যাটালিয়নের লাঠিচার্জ্জ করা হয়। পরিষদে বিরোধী-দল কোনো সময়ের জন্যই অবশ্য নিরস্ত ছিলেন না। কিন্তু স্ব-মতকে ভোটের দ্বারা জিতাইয়া লইতে প্রধানমন্ত্রী ডাঃ রায় পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত ব্যবস্থা করাইয়া রাখিয়াছিলেন। ফলে দীর্ঘ পাঁচ দিনের তুমুল বিতর্কের পর গত ২৭শে জুন সরকারপক্ষীয় কংগ্রেসী দলের ভোটের জোরে বিলটি পাশ হইয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মন্ত্রিসভার বেতন ও ভাতা সম্পর্কিত চলতি আইনে মন্ত্রিগণের বাস-ভবন-ভাতার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু নূতন আইন অনুসারে অতঃপর মন্ত্রিগণ এবং এইবারের সর্ব্বপ্রথম নিযুক্ত উপমন্ত্রীবর্গের প্রত্যেকের জন্য কলিকাতায় বাস-ভবন অথবা বাসভবন-ভাতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পুরাতন মন্ত্রীবর্গের বেতন ও ভাতার স্কেল এবং নূতন আইন অনুসারে অতঃপর মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীবর্গের বর্দ্ধিত বেতন ও ভাতার স্কেলের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান এখানে উল্লেখ করা অযৌক্তিক হইবে না। পরিসংখ্যানটি এইরূপ, যথাঃ

	মুখ্যমন্ত্রী		মন্ত্রী		সহকারী মন্ত্রী		উপমন্ত্রী		পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী	
	বর্ত্তমান স্কেল	নূতন স্কেল	বর্ত্তমান স্কেল	নূতন স্কেল	বর্ত্তমান স্কেল	নূতন স্কেল	বর্ত্তমান স্কেল	নূতন স্কেল	বর্ত্তমান স্কেল	নূতন স্কেল
বেতন	৭৫০৲	১২৫০৲	৭৫০৲	১০০০৲	×	৮৫০৲	×	৭৫০৲	৫০০৲	৫০০৲
আপ্যায়ন ভাতা	৫০০৲	৫০০৲	২৫০৲	২৫০৲	×	১৫০৲	×	×	×	×
মোটরগাড়ী অথবা যানবাহন ভাতা	২৫০৲	৩০০৲	২৫০৲	৩০০৲	×	২৫০৲	×	২৫০৲	×	×
বাসভবন ভাতা	×	৩৫০৲	×	৩৫০৲	×	৩০০৲	×	২০০৲	×	×
মোট	১৫০০৲	২৪০০৲	১২৫০৲	১৯০০৲	×	১৫৫০৲	×	১২০০৲	৫০০৲	৫০০৲

উপরোক্ত বর্দ্ধিত বেতন ও ভাতা ছাড়াও সাম্প্রতিক নূতন ব্যবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রিগণ কলিকাতায় বাসভবন অথবা বাসভবনের পরিবর্তে মাসিক ৩৫০্ টাকা করিয়া অথবা হোটেলের সমুদয় ব্যয় পাইবেন। সকল মন্ত্রীর বাসভবনই সরকারী ব্যয়ে সুসজ্জিত হইবে এবং বাসভবনগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ও সরকারই বহন করিবেন।

বিরোধীপক্ষের ভোট গণনার দাবীতে বিলটি ১৩৯-৭৫ ভোটে গৃহীত হয়। অতঃপর মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ১৯৫২-৫৩ সালের বাজেট উত্থাপন করিয়া বক্তৃতা করেন। উহা আমরা বাজেট আলোচনা কালে উল্লেখ করিব। সরকারী কর্তৃপক্ষ যতই ঢাক-ঢোল পিটান না কেন যে, সরকারী দপ্তরে স্বজন-পোষকতার কোনো স্থান নাই, তাহা যে আজ আর বুদ্ধিজীবী জনসাধারণের কিছুমাত্রও কর্ণবিদার করিবে না এ কথা বোধ করি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীরও অজ্ঞাত। নতুবা নিজের স্বার্থে 'আমার কাজের জন্য কাহাকেও আমি কৈফিয়ৎ দিতে প্রস্তুত নই' বলিয়া এতসংখ্যক মন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী তথা পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীর নিয়োগ ও তাঁহাদের বিশেষতম সুবিধার্থে অধিক বেতন, ভাতা ও বাসস্থানের জন্য অকাতরে অর্থব্যয়ের প্রয়াসকে ভোটের জোরে জিতাইয়া লইবার জন্য তিনি এমন প্রাণান্ত সাধনা করিবেন কেন? সমগ্র দেশ আজ যেখানে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসিয়া মৃত্যুপণ গ্রহণ করিয়াছে—সেখানে দেশের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার মতো সরকারী ভবনে বসিয়া এমন মন্ত্রিত্ববিলাস যথার্থই অভিনব বৈকি! মুখ্যমন্ত্রীর এই অভিনবত্ব ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া আরও অভিনব হইয়া উঠিয়াছে। অভিনবত্ব না ঘটিলে মুখ্যমন্ত্রী বোধ করি ইহার পরেও এই বলিয়া নতুন উক্তি ব্যবহার করিতে পারিতেন না যে, বাংলাকে তিনি নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিবেন। সৃষ্টির কালটাই যৌবন-কাল। ডাঃ রায় তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে নিজেই বলিয়াছেন—তাঁহাকে এখনও বাহাত্তরে পায় নাই; তিনি মাত্র সত্তর, অর্থাৎ সত্তর বৎসরের যুবক। যুবাসদৃশই উক্তি বটে। তবে গঠন কর্মের যে পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র মন্ত্রী ভিন্ন অতঃপর আর কেহ টিঁকিলে হয়!

মন্ত্রীদের বেতন ও ভাতা যে অন্যায় মত স্থির করা হয় নাই তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দেখাইয়াছেন যে আয়ের হার অনুযায়ী ব্যয়বৃদ্ধি সমর্থন করা যুক্তিযুক্ত। এ বিষয় তুলনামূলক হিসাবে তিনি ব্যবসায়ীদের আয় ও ব্যয়ের হারের মূলতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বিস্মিত হই যে ডাঃ রায়ের মত বিজ্ঞ ব্যক্তি কি করিয়া বিস্মৃত হইলেন যে ব্যবসায়ীদের আয়ের হার তাহাদের কর্মক্ষমতার পরিচায়ক কিন্তু সরকারের ট্যাক্সবৃদ্ধি করিয়া বিবর্দ্ধমান আয়ের হার কেবলমাত্র মন্ত্রীমণ্ডলীর অক্ষমতারই পরিচায়ক হইয়া থাকে?

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট

ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার রাজ্য-পরিষদে সাম্প্রতিক কালের যে

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

বাজেট পেশ করেন, যথাসময়ে তৎসম্বন্ধে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম। অবশেষে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হইবার পর অর্থদপ্তরের ভার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া বিধান সভায় পশ্চিমবঙ্গের ১৯৫২-৫৩ সালের বাজেট নতুন করিয়া উপস্থিত করেন। নতুন করিয়া উপস্থিত করিলেও বাজেটে নতুন কিছু উল্লিখিত হয় নাই। মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীযুক্ত সরকারের বিষয়বস্তুরই প্রায় পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। কেবল গত মার্চ মাসে উত্থাপিত বাজেটে রাজ্য সরকারের বর্তমান বৎসরে রাজস্বখাতে যে ঘাটতি অনুমিত হইয়াছিল, ডাঃ রায় কর্তৃক উত্থাপিত নতুন বাজেটে বর্তমান

বৎসরে রাজ্য সরকারের তদপেক্ষা ৪৭ লক্ষ ৮ হাজার টাকা অতিরিক্ত ঘাট্‌তি হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সরকার তাঁহার বাজেটে বর্তমান বৎসরে রাজস্ব খাতে ৫,২০,২৮,০০০, টাকা ঘাট্‌তি ধরিয়াছিলেন। ডাঃ রায় তাঁহার বাজেটে তৎপরিবর্তে ৫,৬৭,৩৬,০০০, টাকা ঘাট্‌তি দাঁড়াইবে বলিয়া হিসাব দিয়াছেন।

মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বাজেটে দেখা যায়, বর্তমান বৎসরে রাজস্বখাতে ৩৬,৩৭,০৫,০০০, টাকা আয় এবং ৪২,০৪.৪১,০০০, টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সরকার তাঁহার বাজেটে বর্তমান বৎসরে ৩৫,৯১,০৬,০০০, টাকা এবং ৪১,১১,৩৪,০০০, টাকা ব্যয় ধরিয়াছিলেন। রাজস্ব ও মূলধন—উভয় খাত মিলাইয়া শ্রীযুক্ত সরকারের বাজেটে মোট ৫,৮৫,২০,০০০, টাকা ঘাট্‌তি ধরা হইয়াছিল। ডাঃ রায় কর্তৃক উত্থাপিত বাজেটে উভয় খাত মিলাইয়া বর্তমান বৎসরে ৬,৪২,২৮,০০০, টাকা ঘাট্‌তি হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই ঘাট্‌তি হইতে বর্ষারম্ভের তহবিলের ২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা বাদ দিয়া বর্তমান বর্ষশেষে রাজ্য-সরকারের নীট ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা ঘাট্‌তি দাঁড়াইবে বলিয়া ডাঃ রায়ের বাজেটে অনুমিত হইয়াছে।

আশার কথা এই যে, ডাঃ রায় বাজেটের ঘাট্‌তি পূরণার্থ নূতন কোনোরূপ কর ধার্য্যের প্রস্তাব করেন নাই। তিনি প্রায় ৮০ মিনিটকাল তাঁহার ২৬ পৃষ্ঠাব্যাপী বাজেট বক্তৃতায় প্রসঙ্গক্রমে বলেনঃ 'আমরা মূলধন ব্যয়সাপেক্ষ কয়েকটি উন্নয়ন-পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংস্থানের নিমিত্ত এ বৎসরও বাজার হইতে ২ কোটি টাকার ঋণ সংগ্রহ করিতে চাই।' তিনি জানান—উহার ফলে বর্ষশেষে বাজারে রাজ্য-সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। তিনি পূর্ব্বের বাজেটই প্রায় সম্পূর্ণতঃ ঠিক রাখিয়াছেন। কেবল দুইটি খাতে ঐ বাজেটের বরাদ্দ অর্থের তিনি পরিবর্তন করিয়াছেন। একটি হইতেছে দুর্ভিক্ষখাতে অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থবরাদ্দ; মার্চ মাসের পর হইতে ২৪-পরগণা ও অন্যান্য কয়েকটি জেলায় যে দুর্গত অবস্থা চলিয়াছে, তদ্দৃষ্টে ইহা করা হইয়াছে। অপরটি হইতেছে সমাজ সংগঠন পরিকল্পনা বাবদ অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ। প্রসঙ্গত উন্নয়ন পরিকল্পনার যে ফিরিস্তি ডাঃ রায় তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে আছে—রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা, হরিণঘাটা পরিকল্পনা, মৎস্যোৎপাদনের সুব্যবস্থা, কল্যাণী সহর নির্ম্মাণ, উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, গ্রাম্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন পরিকল্পনা, সর্ব্বার্থ সাধক উন্নয়ন পরিকল্পনা, এবং এইরূপ আরও অনেক কিছু। পরিকল্পনাগুলির কিছু কিছু কার্য্যপ্রসূতা দেখা গেলেও সর্ব্বত্রই সাফল্য ঘটে নাই। যে বিপুল অর্থ-ব্যয়ে উক্ত পরিকল্পনাসমূহের কাজ অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে কার্য্যপ্রসূতা কতটা বৃদ্ধি পাইল একথা সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তা করা কি উচিত হইবে না? রাজস্বের ঘাট্‌তি অনুযায়ী স্বল্প অর্থব্যয়ে বৃহত্তর ফললাভের ইতিহাস কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইতিপূর্ব্বে যেমন কলিকাতার ভূগর্ভে ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা হইতে পারে কি না পরীক্ষার জন্য বৈদেশিক ইঞ্জিনীয়ার আনিয়া কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করা হইল, অবশেষে ইঞ্জিনীয়ার ইহার অসম্ভাব্যতাই ঘোষণা করিয়া গেলেন। এইরূপে নানাদিকের অনেক বাজে কাজেই পশ্চিমবঙ্গের রাজস্বহানি হইয়াছে। এইরূপ রাজস্বহানি ঘটিবার আর উপায় না থাকে এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে স্বভাবতঃই নিজের ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, ২৪-পরগণায় অন্নাভাব দেখা দিবার ফলে সরকার যে সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং ভারত-মার্কিন চুক্তি অনুসারে যে সর্ব্বার্থ-সাধক উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহার বাবদ বরাদ্দ—এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে সরকারী উদ্যোগ দেখা যাইতেছে—তাহার কোনোটির জন্যই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ কোনো কৃতিত্ব নাই। উক্ত দুইটি পরিকল্পনাই কার্য্যকরী করার প্রেরণা আসিয়াছে কেন্দ্র হইতে। তাহাকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবারই মাত্র দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের।

এতদ্ব্যতীত, কেন্দ্র সম্পর্কেও কিছু বলা এখানে প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি তাঁহাদের অবিচারও একেবারে কম নয়। আয়কর এবং পাট রপ্তানী-কর খাতে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য সম্পর্কে তাঁহারা দীর্ঘকাল হইতেই শোচনীয় ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় তাঁহার বাজেট-বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'অর্থ কমিশন' পশ্চিমবঙ্গের দাবীদাওয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আসিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে এই রাজ্যের দাবীগুলি যথাযথরূপে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। অর্থ-কমিশন যদি পশ্চিমবঙ্গের দাবীসমূহ বিচার করিয়া তাহার প্রাপ্য অর্থের বরাদ্দ বৃদ্ধি করেন, তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার

জন্য অত্যাবশ্যক অর্থ অধিক পরিমাণে পাইবেন আশা করা যায়। কিন্তু আশা মরীচিকা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদের নিজেদের গলদ ও অক্ষমতার জন্যই এইভাবে নিজেদের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্রমাগত ভিক্ষার হাত পাতিয়া কেন্দ্র হইতে অর্থ আনিয়া নানা খাতে জলের ন্যায় ব্যয় করিয়া চলিয়াছেন। শাসনযন্ত্রের প্রয়োজনানুরূপ সংস্কার ভিন্ন এই গলদ-উদ্ধারের আর দ্বিতীয় পথ কি আছে! এ সম্পর্কে আমরা ডাঃ রায়েরই দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

ভারত সরকারের নবতন 'পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা'

ভারত সরকার 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলন সম্পর্কে তদন্ত এবং এই আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী করা সম্পর্কে উপায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণমাচারীর সভাপতিত্বে এক কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি উক্ত কমিটি 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলনকে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে পরিচালন এবং পল্লীজীবনের সকল দিকের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনারূপে গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন। বর্তমানে এই আন্দোলনকে 'পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনা' নাম দেওয়া হইয়াছে। জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি, পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করার জন্য বেসরকারী নেতৃত্বকে ব্যবহার, চাষিদের প্রেরণা জোগাইবার জন্য কৃষিজাত দ্রব্যের সর্ব্বনিম্ন মূল্য সম্পর্কে সরকারের প্রতিশ্রুতি, ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার উপর অধিক মনোযোগ দান এবং খাদ্য ও কৃষি বিভাগের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে, তদ্‌তিরিক্ত ছোট ছোট সেচের কাজের জন্য বৎসরে আরও ১০ কোটি টাকা উক্ত বিভাগের জন্য নির্দ্ধারণ করিতে বলা হইয়াছে।

এই কমিটির সভাপতি পরিকল্পনা কমিশনেরও সদস্য। তিনি ব্যতীত কমিটিতে আছেন—পণ্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গব, ডাঃ মনোমোহন দাস, শ্রী টি এন্ সিংহ, ডাঃ ভি কে আর ভি রাও এবং বিহারের মন্ত্রী শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ। কমিটি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য গ্রামপ্রতি ৩০০৲ টাকা প্রয়োজন হইবে। ইহার মধ্যে ১২৫৲ হিসাবে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট দিবেন। কৃষিঋণ সম্পর্কে কমিটি বলিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এ জন্য দীর্ঘমেয়াদী এবং নাতিস্বল্প মেয়াদী ঋণ দিবেন। কমিটি ছোটখাটো সেচ পরিকল্পনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এজন্য কেন্দ্রিয় গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন রাজ্যকে ১০ কোটি টাকা ঋণ দিবেন বলিয়া কমিটি অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

'অধিক খাদ্য ফলাও' বা 'Grow more food' আন্দোলনটি আজকের নয়, ইহার উৎপত্তি গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজ-পরিচালিত ভারত-সরকারের অধীনে। যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তায় যখন দেশের রসদ নিঃশেষিতপ্রায়, তখন শাসকশ্রেণীর পক্ষে এমনই একটা আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল, আন্দোলন তখন আন্দোলনেই পর্য্যবসিত হইলেও তদাবধি দেশের উৎপাদন অবস্থার কিন্তু আর পরিবর্তন ঘটিল না। দেশ-বিভাগের ফলে সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিল। দেশ স্বাধীন হইয়া জাতীয় সরকার গঠিত হইলেও উক্ত আন্দোলনটি কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত ছাড়িয়া এ্যাট্‌ল্যাণ্টিকের তীরে গিয়া সীমাবদ্ধ হইল না। ভারতের জাতীয় সরকার তাহা ইংরেজি শাসন-পদ্ধতির উত্তরাধিকার-সূত্রেই গ্রহণ করিলেন। কিন্তু গ্রহণ করিয়াও কর্ম্মপ্রসূতা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। গান্ধীজী একদিন দেশের সামনে যে আঠার দফা পরিকল্পনা তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে পল্লী উন্নয়ন একটি বড় দফা। তিনি তখনই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—পল্লীকে অবহেলা করিয়া দেশের সমৃদ্ধি কখনও বাড়াইয়া তোলা সম্ভব নয়, অতএব 'Back to village', পল্লী চলো। কিন্তু আজিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষ বিভ্রান্তচিত্তে ছুটিয়াছে নগরের দিকে। পল্লীমুখীতাকে গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সেই নগরমুখী মননশীলতা মানুষের জীবন হইতে দূরীভূত হইতে পারে না যতক্ষণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন না ঘটে। ফলে দেশের শুধু খাদ্যোৎপাদনই ব্যহত হয় নাই, ব্যাহত হইয়াছে তাহার কৃষ্টি ও সভ্যতাও। কারণ একমাত্র কৃষির উপরেই দেশ ও জাতির সমস্ত ঐতিহ্য, সমস্ত সম্পদ নির্ভরশীল। যেখানে এই নির্ভরশীলতা, সেখানেই যদি সবচাইতে বড় ফাঁকি জমিয়া ওঠে, তবে দেশের যে অবস্থা হওয়া উচিৎ, আজ তাহাই হইয়াছে।— ভারত সরকার এতকাল 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলন লইয়া বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু আন্দোলনকে ফলপ্রসূ করিয়া তুলিতে পারেন নাই। যে কংগ্রেসী আন্দোলন হইতে দেশে জাতীয় সরকারের সৃষ্টি, সেই কংগ্রেসকর্মীরা পর্য্যন্ত এতকাল আত্মস্বার্থের খাতিরেই মাত্র গান্ধীজীর নামের ঝুলি বহিয়া বেড়াইয়াছেন, কিন্তু গান্ধীজী-নির্দ্দিষ্ট কৃষ্ট-কল্পিত পথে বিন্দুমাত্র পা বাড়ান নাই। এতকাল পর সম্ভবতঃ পাপের

প্রায়শ্চিত্তের খাতিরেই 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলনটিকে 'পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনায় রূপান্তরিত করিয়া ভারত-সরকার মুক্তিস্নান করিয়া দেহশুদ্ধি ঘটাইবার প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি না হইলে যে দেহের অপবিত্রতা ঘুচিবার নয়, ইহা স্মরণে রাখা আবশ্যক। ভারত সরকার এ পর্য্যন্ত পরিকল্পনা কম করেন নাই, কিন্তু কোনোটাই খুব বেশী কাজে আসিয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। মাঝখান হইতে শুধু জলের মতো কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে, এবং প্রয়োজনের সময় রাজস্বের ঘাটতি দেখিয়া ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির কাছে সাহায্যের হাত বাড়াইয়া দ্বারস্থ হইয়াছেন। 'পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা' যদি নিছকই ফাইলে আবদ্ধ না থাকিয়া যথোপযুক্তভাবে কার্য্যকরী হয়, আনন্দের কথা; কিন্তু যদি দেখা যায়—অন্যান্য অনেক পরিকল্পনার মতো এই পরিকল্পনাটিও শুধু অর্থব্যয়ের পরীক্ষার মধ্যেই পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে—তবে ভারত সরকার পুনশ্চ এমন ভুল করিবেন, যাহা দেশবাসীর ক্ষমার অযোগ্য হইবে। ভারত সরকার তথা পরিকল্পনা কমিটির সদস্যবৃন্দকে প্রসঙ্গত শুধু এই কথাটি স্মরণ করাইয়া দিলাম।

জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ডাঃ জে. সি. ঘোষ

ভারতসরকার নিযুক্ত 'জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন' সরকারের সমগ্র সঙ্গতির কথা বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে ৩৬০০ কোটি টাকার কাজে হাত দেওয়া অবাস্তব হইবে; কারণ ঐ টাকা সংগ্রহ করা যাইবে না।

এই তথ্যটি উদ্ঘাটিত করিয়া উচ্চতর কারিগরী শিক্ষায়তনের ডিরেক্টর ডাঃ জে সি ঘোষ গত ২৯শে জুন কলিকাতার মহারাষ্ট্র মণ্ডলে অনুষ্ঠিত এক সভায় বলেন যে, অর্থ নিয়োগের কাজ যদি ঠিকমতো পরিচালিত হয়, তবে আগামী ৫ বৎসর ধরিয়া সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নের জন্য ১৫০০ হইতে ১৮০০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। এই টাকা ঋণ করিয়া ও করধার্য্য করিয়া তুলিতে হইবে।

কমিশনের পরিকল্পনাটি বর্তমানে খসড়া অবস্থায় আছে; আশা করা যায়, এক মাসের মধ্যেই ইহা চূড়ান্ত হইয়া যাইবে। কোন্ খাতে কত টাকা খরচ হইবে, তাহার এক হিসাব দিয়া ডাঃ ঘোষ বলেনঃ যখন যুদ্ধাবসান হইল, তখন ভারত-সরকারের হাতে ছিল ৫০০ কোটি টাকা এবং ইহার অধিকাংশই ছিল নাশিকে। তখন মনে করা গিয়াছিল যে, ঐ টাকাটা যখন আছে, তখন পরিকল্পনার কাজে হাত দেওয়া যাইবে। কিন্তু অবস্থার অত্যন্ত অধোগতি ঘটে। দেশ বিভাগের পর হইতে পাকিস্তানের সহিত অপ্রীতিকর সম্বন্ধ হেতু দেশরক্ষা বাবদ অতিরিক্ত ৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে। খাদ্য ও সাহায্য বাবদ বৎসরে ১০০ কোটি টাকা ব্যয় ঘটিতেছে। এই সব ঘটনা এমনভাবে আবর্তিত হইয়াছে যে, ভারতসরকারের যে ৫০০ কোটি টাকা মজুদ ছিল, তাহা উড়িয়া গিয়াছে। ভারত সরকার তাই মনে করিলেন যে, মূল পরিকল্পনাটি সঠিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পরিবর্তন করা দরকার। এই জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে। শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণ সম্বন্ধে সরকারী মনোভাবের কথা উল্লেখ করিয়া ডাঃ ঘোষ বলেন যে, সিন্ধ্রি কারখানাটি সরকারের টাকায়, কিন্তু এক স্বতন্ত্র মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করিয়া প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। সরকার এখন ঘোষণা করিয়াছেন যে, পরিণামে কারখানাটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে দাঁড়াইয়া গেলে ঐ কারখানায় নিযুক্ত সরকারী পুঁজির খানিকটা ছাড়াইয়া লইয়া উহা সর্ত্তাধীনে অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করা হইবে। ডাঃ ঘোষ বলেনঃ শিল্পনীতি ক্ষেত্রে সরকারের সুপারিশগুলি নৈরাশ্যজনক। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এই সব করিতে পারে—সরকারের এই যে ধারণা, তাহা ইঙ্গ-মার্কিন রীতিদ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, সিন্ধ্রি কারখানায় সার উৎপাদনের পরিমাণ ৩৫০০ টন হইতে ১০ লক্ষ টন বৃদ্ধির যে মূল পরিকল্পনা ছিল, তাহা কার্য্যতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে। সরকার মনে করেন, সরকারের ৩৫০০ টন লইয়াই সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ এবং মাদ্রাজ, নাগপুর ও পশ্চিম ভারতে একটি করিয়া বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠা দরকার।

ভারতবর্ষে শতকরা ৮৪ জন কৃষিজীবীর পোষ্য। ভারতবর্ষকে যদি বরাবর খাদ্য অথবা পাট ও তুলার মতো মূল উপাদান বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়, তবে দেশের সর্ব্বনাশ স্বতঃসিদ্ধ। অতএব এ বিষয়ে দেশকে স্বাবলম্বী হওয়া প্রয়োজন। ভারতে প্রতি বৎসর আনুমানিক পঞ্চাশ লক্ষ শিশুর জন্ম হয়। বর্তমান খাদ্য অনটনের পরিমাণ বৎসরে ত্রিশ লক্ষ টন। সুতরাং পরিকল্পনা এমন হওয়া উচিৎ যাহাতে ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ৬০ লক্ষ টন খাদ্যোৎপন্ন হয়।

ডাঃ ঘোষ বলেনঃ এদেশে বর্তমান কাপড়ের কলগুলির ৪৫ লক্ষ গাঁইট তুলা দরকার; সেই ক্ষেত্রে এদেশে ২৮ লক্ষ

গাঁইট তুলা উৎপন্ন হয়। পাটকলগুলিকেও পাটের জন্য পাকিস্থানের উপর নির্ভর করিতে হয়। ভারত সরকার চাহেন, ভারতবর্ষকে যেন পাকিস্থানের ছোট আঁশের তুলার উপর নির্ভর করিতে না হয়, এবং পাটের জন্যও কুড়ি লক্ষ একর ধান্য-জমিকে পাটের জমিতে রূপান্তরিত করিবেন, স্থির করিয়াছেন।

ভারতের ইস্পাত উৎপাদন আর একটি বৃহৎ ব্যাপার। ডাঃ ঘোষ বলেনঃ ইস্পাত বিনিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে দেশে ২৫ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধি দরকার। আগামী ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে উপরিউক্ত পরিমাণ ইস্পাত উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু সরকার এক্ষণে ১০ লক্ষ হইতে ১৫ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন করিতে রাজি হইয়াছেন। যদি অর্থ সংগ্রহ করা যায়, তবে বাকী ইস্পাত উৎপাদন করা হইবে। বর্তমানে ৫ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের জন্য সরকার টাটা কোম্পানী ও স্কব কোম্পানীকে প্রায় ৩০ কোটি টাকা দিয়া সাহায্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কৃত্রিম পেট্রোল, দামী ইলেক্‌ট্রিক ও র‍্যাডার যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব সরকার পরিত্যাগ করিয়াছেন। যদি এ দেশে যথেষ্ঠ পরিমাণ ইস্পাত উৎপাদন করা হয়, তবে কেবল যে ইস্পাত শিল্প সমৃদ্ধশালী হইবে, তাহা নয়, উহা বিদেশে চালান দিয়াও আমরা খাদ্যশস্য আমদানী করিতে পারিব। এক্ষণে ১৫ লক্ষ টনেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। কঠিন শ্রম ব্যতীত দেশ কখনও সমৃদ্ধশালী হইবে না। পরিকল্পনাকে যদি সাফল্যমণ্ডিত করিতে হয়, তবে জনগণের মধ্যে স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন, কঠিন শ্রম ও মিতব্যয়িতার মনোবৃত্তি জাগ্রত করিতে হইবে।

ডাঃ জে সি ঘোষ তাঁহার নাতিদীর্ঘ বিবৃতি দ্বারা ভারত সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার স্বরূপ তথা 'জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন'-এর সিদ্ধান্ত উদ্ঘাটন করিয়া জনসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার বিবৃতির দুই একটি বিষয় সম্পর্কে কিছু আলোচনা হইবার প্রয়োজন। বিবৃতির গোড়াতেই তিনি টাকার অংক উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেনঃ 'এই টাকা ঋণ করিয়া ও কর ধার্য্য করিয়া তুলিতে হইবে।' উচ্চতর কারিগরী শিক্ষায়তনের ডিরেক্টর হিসাবে একথা তাঁহার নিশ্চয়ই অপরিজ্ঞাত নয় যে, ঋণে ঋণে ভারত সরকার আজ প্রায় আমেরিকার হাতের ক্রিড়নকে পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছেন, ইহার পরও বিদেশের নিকট যদি ঋণের জন্য তাঁহাকে হাত পাতিতে হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের যে কি অবস্থা দাঁড়াইবে, তাহা সর্ব্বজনবোধ্য। দ্বিতীয়তঃ করধার্য্য। করভারে ভারতবাসী আজ প্রায় নুব্জদেহ হইতেই চলিয়াছে। ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ভারত সরকার তাঁহাদের নূতন বাজেটে কোনো নতুন করের প্রবর্তন করিতে সাহসী হন নাই। যতদিন পর্য্যন্ত না ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রাণী তাঁহাদের প্রাত্যহিক অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থানের সমস্যাকে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত নতুন কর বা অন্য কিছু প্রবর্ত্তন করিলে তাঁহাদিগকে পুরাদস্তুত শোষণ করাই হইবে; শোষণ মানেই মৃত্যু। ভারতবাসীর এমন মৃত্যু বোধ করি ভারত সরকার চাহিবেন না।

ঋণ-গ্রহণ ও কর-বৃদ্ধি করা ব্যতীতও ভারত সরকারের এই কার্য্য পরিচালনা করিবার উপায় রহিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে জাপান এই উপায় গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট ফললাভ করিয়াছিলেন। এই উপায়ের প্রথম পন্থা অর্থনীতির পরিবর্তন দ্বারা দেশের মধ্যে অর্থমান এরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে যে দেশের প্রত্যেক কর্মী তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভ করিতে পারেন এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে সরকার বিশেষভাবে নজর দিবেন যাহাতে প্রত্যেক কর্মী স্ব স্ব কর্ম দ্বারা দেশের নানাবিধ উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারেন।

বাধ্যতামূলকভাবে এই উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিলেই ভারত সরকারের স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে চলিবার কোনো অসুবিধাই থাকিবে না। অপরপক্ষে তাঁহার বিবৃতি অনুযায়ী ভারত সরকার যদি সত্য সতাই পাটের জন্য কুড়ি লক্ষ একর ধান্যজমিকে পাটের জমিতে রূপান্তরিত করিতে স্থির করিয়া থাকেন, তবে বলিব যে, ভারত সরকার স্বেচ্ছায় নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারিবেন। চাউল উৎপাদনের সমস্যা লইয়াই সারা ভারতে ক্রমেই দুর্ভিক্ষের আভাষ ছড়াইয়া পড়িতেছে। কি ভাবে এই চাউল সংগ্রহ করিতে পারা যায়, ভারত সরকারের নিকট ইহাই আজ সব চাইতে বড় প্রশ্ন। আগামী কয়েক বৎসরেও যে এই সমস্যা হইতে তাঁহারা উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন, এরূপ আশা করা যায় না। দেশের এই যেখানে অবস্থা, সেখানে কুড়ি লক্ষ একর ধান্য-জমিকে পাটের জমিতে রূপান্তরিত করা প্রহশনে পর্য্যবশিত হইবে যদি সঙ্গে সঙ্গে জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া ভারত সরকার চাউলের ঘাটতি প্রতিরোধ করিবার জন্য চেষ্টা না করেন।

খাদ্য নিয়ন্ত্রণ

খাদ্যনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সম্প্রতি গত ১লা জুলাই ভারতীয় লোকসভায় ভারতের খাদ্যমন্ত্রী জনাব রফি আমেদ কিদোয়াই তাঁহার এক বিস্তৃত ভাষণ প্রসঙ্গে বলেনঃ

'বর্তমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ক্রেতাদের নিকট ব্যয়বৃদ্ধির কারণ বলিয়া আমি উহার অবসান ঘটাইতে চাই। নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং ব্যবস্থা খাদ্যশস্যের মূল্য শতকরা ২০ হইতে ৪০ ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধির জন্য দায়ী।'

খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দের দাবী লইয়া লোকসভায় বিতর্কের সৃষ্টি হয়। উহার উত্তরদান প্রসঙ্গে জনাব কিদোয়াই বলেনঃ 'বেসরকারী ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছি। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আমরা অত্যাবশ্যক দ্রব্য আইন অনুসারে এই মর্মে একটি বিল পেশ করিব অথবা আদেশ জারী করিব যে, পাইকারী অথবা খুচরাই হউক, প্রত্যেক খাদ্যশস্য-ব্যবসায়ীকে নাম রেজিষ্ট্রি করিতে হইবে এবং খাদ্যশস্য ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব রাখিতে হইবে এবং সেই হিসাব পরীক্ষা করিতে দিতে হইবে। আমরা এই মর্মেও আদেশ জারী করিব যে, কোনো বিশেষ এলাকার খাদ্যশস্যের মূল্য ক্রেতাদের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গেলে সরকার যে মূল্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করেন, সেই মূল্যে এবং তদুপরি সামান্য মুনাফা ধরিয়া দিয়া বেসরকারী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে সমস্ত মজুদ শস্য গ্রহণ করিবেন এবং ন্যায্য মূল্যের দোকানের মারফৎ তাহা ক্রয় করিবেন। এই পরিকল্পনা যদি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবে রূপায়িত হয়, তবে আমরা যে কোনো অবস্থার সম্মুখীন হইতে পারিব এবং আমাদের বর্তমান বিনিয়ন্ত্রণনীতি সাফল্যমণ্ডিত হইবে।'

ঐ একই দিনে উত্তর প্রদেশে মোদিনগরের এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নেহেরু ব্যবসায়ী মহলকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে, ব্যবসায়ীগণ যদি কোনো অঞ্চলে খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সরকার তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের নিজেদের দোকান খুলিয়া বাজারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন। সরকারের হস্তে সেইরূপ যথেষ্ট খাদ্যশস্য মজুদ আছে। তিনি বলেনঃ 'আমি আপনাদের স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে, খাদ্যবিনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সরকার অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতেছেন। ১৯৪৮ সালের প্রথমে খাদ্যনিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার হওয়ার পর যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ব্যবসায়ীগণ যে কোটি কোটি টাকা মুনাফা কামাইয়াছিল, আমি তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে দিতে চাই না।'

কিন্তু যেরূপ আইন আছে, আইনের তেমনি ফাঁকও আছে। যেখানে এই ফাঁক যত বেশী প্রশস্ত, সেইখানেই কালোবাজারিদের ততবেশী সুবিধা। কালোবাজার যদি বন্ধ না হয়, তবে কোনো প্রচেষ্টা বা পরিকল্পনাই কার্য্যকরী রূপ পাইবে না। ভারতীয় জনসাধারণের বিশেষতঃ মাদ্রাজ ও পশ্চিমবঙ্গের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে অবিলম্বে শক্ত হাতে কালোবাজারকে বন্ধ করিয়া খাদ্যনিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করিয়া তুলিবার প্রয়োজন। এ বিষয়ে খাদ্যমন্ত্রী জনাব কিদোয়াই এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নেহরু—উভয়েরই সতর্ক দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়।

ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন

ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন সম্পর্কে সম্প্রতি ভারতীয় লোকসভায় প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায় বিশেষ করিয়া মাদ্রাজ এবং পশ্চিমবঙ্গবাসীর কিছু আশ্বস্থ হইবার কারণ ঘটিয়াছিল। মাদ্রাজ এবং পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বাত্মক সমস্যা আজ প্রায় একই খাত বহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহরুর উক্তিতে দুইটি রাজ্যের কোনো পক্ষেরই মানসিক-স্বস্তির কিছুমাত্র হেতু ঘটিল না। শ্রীযুক্ত নেহরু বলেন যে, গভর্ণমেণ্ট বর্তমান সময়ে সামগ্রিকভাবে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি অনুমোদন করিবেন না। যদি সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ একমত হন, তাহা হইলে কোনো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁহারা এই নীতি অবলম্বন করিবেন।— অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত নেহরু বলেনঃ 'ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির পুনর্গঠন করা বিপজ্জনক। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর এক সঙ্কটকাল সমুপস্থিত। কাল কিম্বা পরশু কি ঘটিবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। এইরূপ সঙ্কটকালে ঐক্যকেই আমাদের সর্ব্বাধিক গুরুত্ব দিতে হইবে।'

ইহার সঙ্গে হায়দরাবাদের প্রশ্নটিও বিজড়িত। ভারত সরকার কোনোক্রমেই হায়দরাবাদের সংহতিকে নষ্ট হইতে দিতে রাজি নহেন। কোনো উন্মাদ ভিন্ন কোনো রাজ্যের সংহতি নষ্ট হইতে দিতে বোধ করি কেহই রাজি হইতে পারে না। কিন্তু তাহার সঙ্গে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের সমস্যাকে অনুমোদন করিতে বাধা কোথায়, আমরা জানি না। শ্রীযুক্ত নেহরু বলিয়াছেন—সরকার সর্ব্বভারতীয় ভাবে বিষয়টিকে গ্রহণ করিতে এবং সমগ্র ভারতবর্ষকে ভাষার ভিত্তিতে গঠন করিতে প্রস্তুত নহেন। তবে বিশেষ কোনো রাজ্যের কথা উঠিলে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে যথেষ্ঠ পরিমাণ মতৈক্য থাকিলে সে বিষয়ে তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিতে প্রস্তুত। মীমাংসার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে সম্মত আছেন।

বিষয়টিকে প্রায় নাকচ করিয়া দিয়াই নিজের বক্তব্যকে অত্যন্ত কৌশলে সমস্যাবলীর উপরে খাড়া করিয়া রাখিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নেহরু প্রয়াস পাইয়াছেন। বস্তুতঃ ভাষা-ভিত্তিক প্রদেশ গঠনের প্রশ্নটি আজকের নতুন নয়। অসহ-যোগ আন্দোলনের সময় হইতেই কংগ্রেস কর্তৃক এই প্রশ্নটি অনুমোদিত হইয়া আসিয়াছিল। আজকের প্রধানমন্ত্রী সেদিন জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব লাভ করিয়া প্রশ্নটির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। আজও তিনি শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, ভারতীয় কংগ্রেস কমিটিরও তিনি সভাপতি, সুতরাং তাঁহার উক্তিকে আমরা দুইদিক হইতেই গ্রহণ করিতে পারি। আজ তাঁহার নিকট এই সমস্যাই প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনে জাতির সংহতি নষ্ট হইতে পারে! বস্তুতঃ সংহতির পুনরুজ্জীবনের আভাষও যে ইহার মধ্যে রহিয়াছে, তাহা তিনি ভাবিয়া দেখিবার সময় পান নাই।

বিশেষতঃ, পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা আজকের নতুন নয়। ১৯০৫ সালে এই সমস্যার উৎপত্তি। আজ সর্ব্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা যেখানে সবচাইতে অত্যুগ্র, সেখানে তাহাকে যদি সিংভূম, ধলভূম, মানভূম, পূর্ণিয়া প্রভৃতি অঞ্চলগুলি ফিরাইয়া দেওয়া হইত, তবে ভারত সরকার তথা ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন যে, শক্তিশালী পশ্চিমবঙ্গ সর্ব্বভারতীয় সমস্যাবলীর সমাধানে অনেকখানিই সহায়ক হইয়াছে। ইহাতে সংহতি নষ্ট না হইয়া বরং নতুন করিয়া বর্দ্ধিত হইত।

বিশেষ কোনো রাজ্যের সমস্যা সম্পর্কে ভারত সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন বলিয়া শ্রীযুক্ত নেহরু তাঁহার বক্তব্যের উপসংহার টানিয়াছেন। বাংলার সমস্যা সব চাইতে প্রাচীন সমস্যা। আমরা আশা করিব, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে ঔদাসীন্য বর্জ্জন করিয়া তাহার আলোচ্য সমস্যার আশু সমাধানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নেহরু অগ্রসর হইবেন এবং ভারত সরকার কাজটিকে ত্বরান্বিত করিয়া শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, সমগ্র ভারতেরই কল্যাণ সাধন করিবেন।

মাইকেল মধুসূদন ও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

বাংলার দুইটি অপূর্ব্ব বিস্ময়ঃ মাইকেল মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্র। বাংলা সাহিত্য তথা সংস্কৃতির শিশু-শৈশবে একদিন তাঁহারা আবির্ভূত হইলেন অভিভাবকত্বের ঐশ্বর্য্যশালী শক্তি লইয়া। কালবিচারে যুগধর্ম্মের পার্থক্য ঘটিলেও মূলগত ধর্ম্মের ক্ষেত্রে উভয়ের সাধনাই একটি বিশেষ রীতিপদ্ধতির খাত্ বহিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। এতদসত্ত্বেও উভয়ের সাধনায় কিন্তু একটা আকাশ-পাতাল পার্থক্য রহিয়া গেল। আত্মোন্নতির উন্মাদনায় মাইকেল বিধর্ম্মী হইলেন, ইংরেজ-রমণী বিবাহ করিয়া ইংরেজি সাহিত্যের পথে অগ্রসর হইলেন, লিখিলেন 'ক্যাভ্টিভ্ লেডী', নিজের উচ্ছৃংখল ও সংযমহীন জীবনে দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া প্রতীচ্যের মাটি ত্যাগ করিয়া একদা আবার ফিরিয়া আসিলেন তিনি স্বদেশে। পরম সুহৃদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরম স্নেহশীলতা তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া গেলেও তাঁহার চরিত্রকে উদ্বোধিত করিতে পারে নাই। চারিত্র ধর্ম্মের এই দীনতা থাকিলেও সৃষ্টি-ধর্ম্মে কিন্তু সম্রাট হইয়াই তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্য—বিশেষতঃ বাঙালী সমাজে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া গেলেন। বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের তিনি জনক। ছন্দের এই বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি অননুকরণীয়ই থাকিয়া গেলেন। তাঁহার 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক', 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদ বধ কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য', 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' প্রভৃতির ছন্দবৈচিত্র্যকে অনুকরণ করিয়া এদেশে আর কিন্তু দ্বিতীয় কাব্য গড়িয়া উঠিল না। অননুকরণীয় প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙালী সমাজকে তিনি বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো বিস্ময়-সাগরে ভাসাইয়া দিয়া গেলেন। আজ হইতে ১২৮ বৎসর পূর্ব্বে তিনি বাংলার সাগরদাঁড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৯ বৎসর পূর্ব্বে এদেশেরই মাটির বুকে শেষ নিশ্বাস রাখিয়া তিনি লোকান্তরিত হন। দুঃখের বিষয়, বাংলা সাহিত্যে এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে মাইকেল সম্বন্ধে তেমন বিশেষ কোনো আলোচনা গড়িয়া ওঠে নাই। গত ২৯শে জুন তাঁহার মৃত্যু-তিথি উদ্যাপন উপলক্ষ্যে এই কথাটিই বিশেষভাবে আলোচনার বিষয় ছিল। সংবাদপত্রের মাধ্যমে বাংলার কৃতি সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস এই বিশেষ দিনটির উপলক্ষে মাইকেল সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য প্রকাশ করিয়া বাংলার প্রিয় কবি সম্পর্কে বাঙালীসমাজকে যেভাবে সচেতন করিয়াছেন, তাহা সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই গর্ব্বের বিষয়। প্রতিবৎসর পার্ক-সার্কাস কবর-কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া মাইকেল-স্মৃতিফলকে মাল্যপ্রদান করিলেই জাতির দায়িত্ব সমাধা হইবে না, মাইকেল-কাব্য ও নাটক সম্পর্কে আজ আবার নতুন করিয়া ভাবিবার দিন আসিয়াছে। স্বাধীন ভারতে স্বাধীন চিন্তা-নায়ক মাইকেল মধুসূদনকে আজ নতুন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য-বিচারের মধ্য দিয়াই তাঁহার প্রতি জাতির শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শিত হইতে পারে।

জাতির পক্ষে তেমনি সম্মান প্রদর্শনের দায়িত্ব রহিয়াছে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কেও। 'বন্দেমাতরম'-মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র—ইহাই শেষ কথা নয়। একদিকে তাঁহার 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত যেমন সারা ভারতকে অগ্নি-মন্ত্রে দিক্ষা দিয়াছিল, তেমনি প্রায়শ্চিত্ত বা আত্মশুদ্ধির সাধনাও আনিয়া দিয়াছিল দেশকে। আনন্দমঠের সন্তান-ধর্ম্মের মধ্য দিয়া সমগ্র দেশেরই চিৎ-চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু সেই চেতনা জাতির জীবনে এখনও আসে নাই বলিলে খুব কমই বলা হয়। বঙ্গদর্শন প্রকাশ করিয়া তিনি তাঁহার সাধনলব্ধ বাংলাকেই জ্ঞানে ধর্ম্মে শিক্ষায় চরিত্রে ও মানবিকতায় জাগ্রত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার হিন্দুত্বের গোঁড়ামীকে একশ্রেণীর মানুষ উপহাস করিলেও যুগধর্ম্মের প্রয়োজনে যে-সমাজ-ব্যবস্থার ক্ষুরধার পথে একদিন তাঁহাকে স্বয়ং-শক্তিতে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, তাহা বিস্মৃত হইলে তাঁহার প্রতি জাতির অবহেলাই পাহাড়-সদৃশ উত্তুঙ্গ হইয়া উঠিবে। মানব-মনের বৃত্তিগুলিকে বঙ্কিমচন্দ্র নানা ভাগে ভাগ করিয়া মানুষের বোধিকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। জাতির জীবনে সাংস্কৃতিক চিকিৎসকের ন্যায় দেশের ব্যাধিনিরাময়ের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি। সেই ব্যাধি হইতেছে দেশের হীনতা ও অধোগামীতা। বঙ্গভূমিকে কেন্দ্র করিয়াই বঙ্কিম-মানস গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাঙালীর ইতিহাস-রচনায় জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাই তিনি তাঁহার আজন্মসাধনলব্ধ মাতৃভূমি বঙ্গভূমির বন্দনায় এমন করিয়া 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। যুগের ক্রম-পরিবর্তনে বঙ্কিম-সাহিত্যের নানা আলোচনা হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু বঙ্কিম-কালকে অতিক্রম করিয়া যে বঙ্কিমচন্দ্র নন্ —একথা বিস্মৃত হইলে আলোচনাকারীরা মস্তবড় ভুল করিবেন। সম্প্রতি গত ১৩ই আষাঢ় কাঁটালপাড়ায় তাঁহার জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কবি শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের মধ্যে এই প্রশ্নটিই বিশেষভাবে আলোচিত হওয়ায় অনেকখানি আশ্বস্ত হইবার কারণ রহিয়াছে।

কাঁটালপাড়া সমগ্র ভারতবাসীর কাছে তীর্থভূমি-স্বরূপ। বঙ্কিম-স্মৃতি রক্ষার জন্য ভারত সরকারকেই বহু পূর্ব্বে অগ্রণী হওয়া উচিৎ ছিল; সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম-সাহিত্য-সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছেন দেখিয়া দেশবাসী অনেকখানি আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু বঙ্কিম-জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা এ বৎসর কাঁটালপাড়ায় গিয়া উক্ত সংগ্রহশালাটি দর্শন করিয়া সুখী হইতে পারি নাই। বঙ্কিম-বাসভবনটিরও যেমন সংস্কার হয় নাই, সংগ্রহশালাটিও তেমনি কোনোভাবে নৈবেদ্যের চাউল-কলার ন্যায় দীনতার অক্ষমতা লইয়া লজ্জা ঢাকিয়া চলিয়াছে। সরকারী কর্তৃপক্ষ হইতে কতদিনে এ কাজ সংসাধিত হইবে, তাহা আমাদের জানা নাই, কিন্তু জনসাধারণও তো অন্ধ নহেন! তাঁহারাও কি জাতীয় সংস্কৃতি ও মুক্তি আন্দোলনের পুরোধা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহসংস্কার তথা রচনা-সংগ্রহশালাটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়া জাতীয় কর্তব্য পালন করিতে পারিতেন না? এখনও সময় আছে; ভারতীয় জনসাধারণের সেই শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইলে দেশের সংস্কৃতিগত দীনতার লজ্জা অনেকখানি অপনোদিত হইবে, সন্দেহ নাই।

মাইকেল মধুসূদন ও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করি।

কাশ্মীর প্রসঙ্গ

কাশ্মীর সম্পর্কিত প্রশ্নটি আজ একেবারেই নতুন আকার ধারণ করিয়াছে। ধারণ করিয়াছে অবশ্য কাশ্মীরের আত্মস্বকীয়তার ভিত্তিতেই। এতদসম্পর্কে ভারতীয় জনসাধারণের মনে সম্প্রতি যে প্রশ্ন এবং সংশয় দেখা দিয়াছে, ভারতীয় সংসদে এক বিতর্ককালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নেহরু তাহা নিরসনের একটা চেষ্টা করিয়াছেন। মূল প্রশ্নটি হইতেছে ভারত এবং কাশ্মীরের প্রকৃত সম্বন্ধটি সম্পর্কে এবং মূল সংশয়ও হইতেছে কাশ্মীরের গণ-পরিষদ এবং তথাকার নেতৃবর্গের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্পর্কে। কাশ্মীর রাজ্যের নিজেদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রপতাকা, কাশ্মীরের রাজ পরিবারের বংশানুক্রমিক শাসনের অবসান, ক্ষতি-পূরণের কোনো ব্যবস্থা ব্যতীত জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করিয়াই জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল যে, এই সমস্ত কিছু করিবার অধিকার একক কাশ্মীরের নিজস্ব অধিকার বলিয়া স্বীকার করা চলে কিনা! ভারত এবং কাশ্মীরের প্রকৃত সম্বন্ধটি স্পষ্টভাবে বিবৃত হইলেই উক্ত প্রশ্নের যথোচিত উত্তর পাওয়া সহজ হইত, কিন্তু সমস্ত প্রশ্নগুলিকে মিলাইয়া শ্রীযুক্ত নেহরু শুধু একটি মাত্র জবাবেই বক্তব্য শেষ করিতে চাহিয়াছেন যে, 'কাশ্মীর সম্বন্ধে কাশ্মীরের জনসাধারণের ইচ্ছাই সার্ব্বভৌম।' আসলে ইহা কিন্তু প্রশ্নের যথাযথ উত্তর হইল না; খুব বেশী বলিলে বলা যাইতে পারে যে, ইহা বড়জোর ভারত সরকারের নীতি ও মনোভাব মাত্র।

কিন্তু ভারতীয় সংসদে বিরোধী পক্ষের শ্রীযুক্ত এন্ সি চ্যাটার্জি বিষয়টিকে নিতান্ত আইন ও সংবিধানের দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন, (বস্তুতঃ মহাসভার সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টিতে নহে)। কাশ্মীর সম্পর্কিত তাঁহার বক্তব্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট। তাহা হইতেছে এই যে, 'ভারতীয় রিপাব্লিকের মধ্যে কাশ্মীর আর একটি রিপাব্লিক তথা স্বতন্ত্র সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র হইতে পারে না। এই কারণে কাশ্মীরের নিজস্ব কোনো রাষ্ট্রপতাকাও থাকিতে পারে না। কাশ্মীরকে রিপাব্লিকরূপে স্বীকার করা এবং কাশ্মীরের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় পতাকা মানিয়া লওয়ার অর্থ, ভারতের সংবিধানের বিরুদ্ধাচরণ করা। আর কাশ্মীরের মহারাজাকে কাশ্মীরের সমস্যার জন্য সম্প্রতি দায়ী করিবার কোনো অর্থই হয় না, কারণ নিজাম এবং অন্যান্য রাজপ্রমুখের ন্যায় কাশ্মীরের মহারাজাও আজ নামে মাত্র রাজ্যপ্রধান।' শ্রীযুক্ত চ্যাটার্জির এই সংবিধানগত যুক্তির অনুকূলে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও নিজস্ব মত ব্যক্ত করেন। উত্তরে শ্রীযুক্ত নেহরু শুধু বলিয়াছেনঃ 'ভারতের সংবিধানে যাহাই থাকুক না কেন, তাহাতে কিছু যায় আসে না; যদি কাশ্মীরের জনগণ ভারতের সংবিধান না চায়, তবে ইহা সেখানে কখনও প্রবেশ করিতে পারিবে না।' বলা প্রয়োজন যে শ্রীযুক্ত নেহরুর এই বক্তব্যে কাশ্মীর ও ভারতের আইন ও সংবিধানগত সম্পর্কটি কিন্তু বিশেষ পরিষ্কার হয় নাই।

আসলে কাশ্মীর ভারতের অপরাপর রাজ্যের ন্যায়ই ভারতীয় রিপাব্লিকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিণত হয়, ইহাই ভারতীয় সর্ব্বসাধারণের একমাত্র কামনা। শ্রীযুক্ত নেহরু অবশ্য পরে দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে বলিয়াছেন যে, সমস্যাটি কম জটিল নয়, সুতরাং ধীরে সুস্থে অগ্রসর হইতে হইবে। কথাটা যুক্তিযুক্ত হইলেও শেখ আব্দুল্লা কিন্তু অত ধীরে সুস্থে অগ্রসর হন নাই। ভারত সরকারের সঙ্গে যুক্তি না করিয়াই তিনি অগ্রসর হইতেছেন। ইহারই প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ভারত সরকারের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করিতে চাহিয়াছিলেন! কিন্তু তৎসম্পর্কিত শ্রীযুক্ত নেহরুর উত্তরটি আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে এক সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীযুক্ত নেহরু বলিয়াছিলেন যে, কাশ্মীর ভারতরাষ্ট্রেরই অন্যতম অঙ্গ ও অংশ। এই নীতির ভিত্তিতেই এতকাল ভারত সরকার কাশ্মীরে তাঁহাদের পূর্ণ অধ্যবসায় ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন। এ সম্পর্কে শেখ আব্দুল্লা ও তাঁহার গভর্ণমেণ্টকে অবহিত হওয়া কর্তব্য। কাশ্মীরের গণ-পরিষদ এবং নেতৃবর্গের উপর নেহেরু-সরকার যে দায়িত্ব ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন—সে সম্বন্ধে কাশ্মীর গণপরিষদ সচেতন হইলেই মঙ্গলের কথা। আশার কথা এই যে, দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর শেখ আব্দুল্লা তাঁহার গত ঈদ-ভাষণে আশানুরূপ একটি প্রতিশ্রুতির আভাষ দিয়া সমস্যাটির অনেকখানি সমাধানের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি দিল্লী আসিয়াছেন; ইহা নিশ্চয়ই বর্ষা-সফর নয়, পলিটিকাল-সফর। এবারে একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাওয়াই-তো যুক্তিযুক্ত। আমরা অধীর প্রতীক্ষায় পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

ততঃ কিম্

সংখ্যালঘুদের প্রতি পাকিস্তান সরকারের আচরণ সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত যেমন বহু তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তেমনি সংবাদপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নানা সাহিত্য-পত্রের পৃষ্ঠায়ও উহার নানা দিক সম্পর্কে অজস্র লেখালেখি হইয়াছে। বিপদ হইতেছে এই যে, এই জাতীয় লেখালেখিকে কেন্দ্র করিয়া এযাবৎ কোনো একটি নির্দ্দিষ্ট মতবাদ গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। অনেকে ইহাকে পাকিস্তানের প্রতি অহেতুক উষ্মা প্রকাশ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, অনেকে বা এই জাতীয় লেখনীকে যুদ্ধোন্মাদী বলিয়া অপরাধী করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারাও যে আসল সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, এমন নয়। এই সংশয়বাদী বিপদ হইতে এবারে অনেকখানি উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন ভারতের সংখ্যালঘু মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সি সি বিশ্বাস। গত ২৮শে জুন লোকসভায় সংখ্যালঘু ও অন্যান্য দপ্তরের ব্যয়-বরাদ্দের দাবী সংক্রান্ত বিতর্কের জবাব প্রসঙ্গে তিনি বলেন—নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে পাকিস্তানে কারারুদ্ধ সংখ্যালঘু নেতাদের বিষয়ে যাহাতে পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখা হয়, অথবা আদালতে যাহাতে তাঁহাদের বিচারের ব্যবস্থা করা হয়, তজ্জন্য তিনি যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি বলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের অপেক্ষা ভারতবর্ষের মুসলমানগণ অনেক বেশী স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাবোধ লইয়া এখানে বসবাস করেন। তাঁহার মতে অবস্থার এখন আরও অবনতি ঘটিয়াছে। তিনি স্পষ্টই ঘোষণা করেন, 'পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা কিছুকাল পূর্বেও যতখানি ভালো ছিল, এখন আর তত ভালো নয়। ১৯৫০ সালে দিল্লী-চুক্তি নিষ্পন্ন হইবার পর অত্যন্তই ভালো ফল পাওয়া গিয়াছিল। চলাচলের স্বাধীনতা ও ভ্রমণকালীন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এবং ভ্রমণকালে কাহাকেও যাহাতে হয়রাণি করা না হয়, তাহার ব্যবস্থা করাই ছিল চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য। তাহার পরেও অভিযোগ

পাওয়া গিয়াছে বটে, তবে পূর্ব্বের তুলনায় স্যাম্প্রদায়িক অপরাধের মাত্রা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। পাকিস্তান কর্ত্তৃক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহা লঙ্ঘন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু আশ্বাস আমরা দিতে পারি যে, ভারতস্থ মুস্‌লীম সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিৎ, তাহার কোনোটিই বাকী রাখা হয় নাই। পাকিস্তান যতই অস্বীকার করুক, পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের অপেক্ষা ভারতের মুসলমানগণ অনেক বেশী স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাবোধ লইয়া বসবাস করিয়া থাকেন।'

ইহার উপর বিস্তৃত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তবে তাঁহার এই উক্তি শুনিয়া পাকিস্তানের সংখ্যালঘু মন্ত্রী মিঃ আজিমুদ্দীন আহমেদ কিন্তু নীরব থাকেন নাই। শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের উক্তিতে তিনি যুগপৎ বেদনা ও বিস্ময় বোধ করিয়াছেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের যাতায়াতের হিসাব তুলিয়া তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা এতই স্বাভাবিক ও মাইনরিটির বসবাসের পক্ষে এতই অনুকূল যে, নূতন হিন্দু তো চলিয়া আসিতেছেই না বরং অধিক সংখ্যায় হিন্দু ফিরিয়া যাইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীনও ইহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া লাহোরের সাংবাদিকগণকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে হিন্দু ভারতে চলিয়া আসিতেছে, ইহা সত্য কথা নহে; বরং ইহাই সত্য যে, হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গে ফিরিয়া যাইতেছে; মাইনরিটির উপর অত্যাচারের কাহিনী মিথ্যা।

ইহা আদৌ আমাদের জনসাধারণ বা পত্র-পত্রিকার ভাষা নয়, একদিকে ভারতের সংখ্যালঘু মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সি সি বিশ্বাস, এবং অন্যদিকে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু মন্ত্রী মিঃ আজিমুদ্দীন আহমেদ ও পূর্ব্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীনের মুখনিঃসৃত উক্তি! ইহার মধ্যে কে বাদী আর কে আসামী—তাহা লইয়া আমাদের ন্যায় উলুখড়দের কোনো মন্তব্য না করাই ভালো, সত্য ও সত্যের অপলাপ লইয়া রাজায় রাজায় পরোক্ষে বাক্-যুদ্ধ, দেখিয়া শুনিয়া আমরা কেবল আতঙ্কে অস্থির। কিন্তু এই দেখাশোনার ব্যাপারেই আমরা আর একটি বিষয় চিন্তা করিয়া এখন হইতেই শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছি। বিষয়টি হইতেছে যাতায়াত সম্পর্কিত ছাড়পত্রের ব্যাপার। ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে ইহা লইয়া সম্প্রতি দীর্ঘমেয়াদী বৈঠক হইয়া গেল এবং উভয় সরকারই অনেক বিষয়ে একমত হইয়াছেন। পাকিস্তান কর্ত্তৃক ছাড়পত্র প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে আনুমানিক আগামী সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি হইতে। আপাত দৃষ্টিতে উভয় সরকারের মতামত হইতে এইরূপই দেখা যাইতেছে যে, যাতায়াত বা অন্যান্য কাজ-কারবার সম্পর্কে জনসাধারণকে মোটেই বেগ পাইতে হইবে না; কিন্তু আবেগের আতিশয্যে যে চুক্তি সদ্য সম্পন্ন হইল—অতঃপর এই চুক্তির ইতিহাসও যদি ১৯৫০ সালের চুক্তির ফলাফলের ন্যায় পুনরাবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়, তখন উভয় সরকারের মধ্যে আবার অনুরূপ কিছু বাক্-যুদ্ধের কারণ ঘটিবে না তো? পণ্ডিত ব্যক্তিরা ঘটনার পশ্চাতে অনুশোচনা না করিয়া ঘটনার সূচনাতেই ইষ্ট অনিষ্ট চিন্তা করিয়া কর্ম্মে অগ্রসর হইয়া থাকেন। দেখিয়া শুনিয়া তাই স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগেঃ 'ততঃ কিম্?' অতঃপর আর কোন্ মায়া-পথ খোলা রহিল?

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড
৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

CALCU
CENTR
LIBRAI
UNIVER

বিংশ বর্ষ ভাদ্র—১৩৫৯ ১ম খণ্ড—৩য় সংখ্যা

ভাগীরথীর ভাগ্য

শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব সেচ-সচিব ভূপতি মজুমদার বলিয়াছিলেন—পলি পড়িয়া যে ভাবে ভাগীরথী "মজিয়া" যাইতেছে, তাহাতে অনেকের বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে ভাগীরথীর বর্ত্তমান জল-প্রবাহ আর থাকিবে না এবং কলিকাতার বন্দর বর্জন করিতে হইবে। এমন যে কখন হয় নাই, তাহা নহে ; সরস্বতী নদীর দুর্দশাহেতু বাঙ্গালার পুরাতন সমৃদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রাম ত্যক্ত হইয়াছিল, বহু জনাকীর্ণ কর্ম্মকোলাহল-মুখর সপ্তগ্রাম জনশূন্য ও জঙ্গলাবৃত হয়। কিন্তু ভাগীরথীর প্রবাহই পশ্চিমবঙ্গের জীবন-ধারা। সেই জন তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। বর্তমানে বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির ব্যবস্থা পরিবর্তন করা যায়। আমেরিকায় মিসিসিপি নদীর মোহানা বিস্তৃত ও গভীর করা অসম্ভব হয় নাই। ভাগীরথী রক্ষা করিবার জন্য মুর্শিদাবাদ জিলায় ফরাক্কার নিকট গঙ্গায় বাঁধ দেওয়া প্রয়োজন।

তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, ভারত সরকার ও পশ্চিম বঙ্গ সরকার একযোগে ঐ বাঁধ নির্মান সম্বন্ধে সকল বিষয়ের অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়াছেন ও করিতেছেন। সে জন্য প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বহু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে এবং, বোধ হয়, শীঘ্রই গবেষণাফল প্রকাশ করা হইবে। তিনি আশা প্রকাশ করিয়াছেন, ভারত সরকার আর বিলম্ব না করিয়া, বাঁধ নির্মাণ কার্য আরম্ভ করিবেন।

ইহাতে স্বতঃই লোকের মনে হইয়াছিল, গবেষণায় বিশেষজ্ঞগণ এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন যে, ফরাক্কায় বাঁধ নির্মাণ প্রয়োজন।

তাহার পরে প্রস্তাব হয়, যে বাঁধ নির্মিত হইবে, তাহাই সেতুর কার্যেও ব্যবহার করিলে আকাঙ্ক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে পশ্চিম বঙ্গে গঙ্গার উপর প্রয়োজনীয় একটি সেতু নির্মিত হইতে পারে।

এই প্রস্তাবে বিহার হইতে আপত্তি উত্থাপিত হয় এবং বলা হয়, পশ্চিম বঙ্গে গঙ্গার উপর তিনটি সেতু আছে, সুতরাং চতুর্থ সেতু নির্মাণে অর্থব্যয় না করিয়া বিহারে গঙ্গার উপর সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা করা হউক। প্রস্তাবকারী কিন্তু জানেন না, পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গার উপর একটিও

সেতু নাই—পশ্চিম বঙ্গের ব্যবসার প্রয়োজনে কলিকাতায়, বালীতে ও নৈহাটীতে যে তিনটি সেতু নির্মিত হইয়াছে, সে কয়টিই হুগলী নদীর উপর।

ভারত সরকার স্যার বিশ্বেশ্বরায়কে বাঁধ ও সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা পরীক্ষা করিতে দেন। তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন, মোকামায় (বিহারে) গঙ্গার উপর সেতু নির্মিত হউক। আর—

ফরাক্কায় বাঁধ ও সেতু নির্মাণের যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা এখনও গ্রহণযোগ্য অবস্থায় উপনীত হয় নাই। তাহার কার্যারম্ভের পূর্বে আরও পরীক্ষা প্রয়োজন। সম্ভাব্যতার ও আর্থিক ফলের দিক হইতে পরিকল্পনা বিবেচনা করিয়া তবে সে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। যদি এঞ্জিনিয়ারিং ও আর্থিক হিসাবে পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়, তবে আর বিলম্ব না করিয়া কার্য আরম্ভ করা সঙ্গত।

বিহারের প্রয়োজন থাকিলে তথায় সেতু নির্মাণে কাহারও আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু ফরাক্কার বাঁধ ও সেতু নির্মাণ সম্বন্ধে সার, বিশ্বেশ্বরায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ভূতপূর্ব সেচ-সচিব যাহা বলিয়াছেন, তাহা নির্ভরযোগ্য নহে; তাঁহারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা এখনও পরীক্ষা সাপেক্ষ। তবে এত দিনের পরীক্ষা ও গবেষণা কি ব্যর্থ হইয়াছে? না—ভুল হইয়াছে?

বর্ষাকালে যখন গঙ্গায় জল-বৃদ্ধি হয়, তখন কয় সপ্তাহ ব্যতীত গঙ্গার মূল জলধারার সহিত ভাগীরথীর জলধারা বিচ্ছিন্ন থাকে অর্থাৎ গঙ্গার জল আর ভাগীরথীতে প্রবেশ করিতে পারে না। তথাপি যে ভাগীরথীর ধারা প্রবাহিত, তাহার কারণ ময়ূরাক্ষী, অজয়, জলাঙ্গী, (খড়িয়া), চূর্ণী (মাতাভাঙ্গী) প্রভৃতি নদীর জলে ভাগীরথী পুষ্ট হয়। ভাগীরথীর ঊর্ধ্ব ভাগ এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, তাহাতে জাহাজ চলাচল বন্ধ করিতে হইয়াছে; নিম্ন ভাগে কলিকাতা পোর্ট ট্রাস্টের মাটীকাটা কল সর্বদা সতর্কতা-সহকারে ব্যবহৃত না হইলে জাহাজ চলাচল বিপদজ্জনক হইত। ডায়মন্ডহারবার অঞ্চলে নদীর উপর কূলে বাঁধ দিয়া নদী রক্ষা করিতে হয়; বাঁধ ভাঙ্গিলে প্রায় সমগ্র মহকুমা জলমগ্ন হয়। নদীর ঊর্ধ্বাংশে জল ক্রমে-লবণাক্ত হইতেছে; উপর হইতে প্রবাহিত জলের অভাবই ইহার কারণ। যদি আবশ্যক উপায় অবলম্বন করিতে বিলম্ব হয়, তবে ভাগীরথীর যে অবস্থা ঘটিবে তাহাতে পরে আর তাহার সংস্কার-সমস্যা সমাধা করা সম্ভব হইবে না।

ভাগীরথীর অবস্থার ক্রমাবনতি বহুদিন হইতেই লক্ষিত হইতেছে। তাহার বর্ত্তমান অবস্থার জন্য প্রাকৃতিক কারণ যেমন, মানুষের প্রকৃতির কার্য্যে হস্তক্ষেপও তেমনই দায়ী। প্রাকৃতিক কারণ, সমতল ক্ষেত্রে নদীর গতি মন্থর হয় এবং তাহার ফলে যে পলি স্রোতের বেগে বাহিত হইয়া যাইত, তাহা নদীগর্ভে জমিতে থাকে—নদীগর্ভ উচ্চ হইলে নদী তাহার গতি পরিবর্ত্তন করে। হরিদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া খাল কাটিয়া গঙ্গার জল অন্য পথে প্রবাহিত করায় মূল খাতে জল ও জলের বেগ হ্রাস পাইয়াছে—জল যত কমিয়াছে, স্রোতের গতি তত মন্থর হইয়াছে। নদীর মোহানার দিকে সুন্দরবনে বাঁধ দিয়া জমী "হাশিল" করায় জোয়ারের সময় জল আর কূল ছাপাইয়া দুই পার্শ্বে জমীতে (যাহাকে ইংরাজীতে spill area বলে) ছড়াইয়া পড়িতে পারে না—অধিক পলিও বাহির হইয়া যায় না। তদ্ভিন্ন নানা স্থানে নদীর উপর সেতু নির্মাণে নদীর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। এমন কি কোন কোন স্থানে (বিশেষ কলিকাতার সান্নিধ্যে) ছাই প্রভৃতি ফেলিয়া যে নদীর অনিষ্ট করা হইয়াছে, তাহাও অস্বীকার করা সম্ভব হয় নাই। মোহানার কাছে দুই কূলে বাঁধ দিয়া রক্ষা করায় জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল উপরের দিকে অধিক দূর অগ্রসর হইয়া জল লবণাক্ত করে এবং স্রোত প্রবল না থাকায় সেই লবণাক্ততা সহজে হ্রাস পায় না।

পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী-সমস্যা যে পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রধান সমস্যা তাহাতে সন্দেহ নাই। নেহরু সরকারের বহুবিঘোষিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে এই সমস্যার উল্লেখ নাই, তাহাতেই সেই পরিকল্পনার ত্রুটি সপ্রকাশ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিকল্পনাকারীদিগকে ভাগীরথীর সমস্যার গুরুত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না, তাহা তাঁহারা বলেন নাই। অথচ অনিশ্চিত ও বহু ব্যয়-সাধ্য দামোদর জল-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার তুলনায় যে ভাগীরথীর জলধারা রক্ষার প্রয়োজন অনেক অধিক—ভাগীরথী-সমস্যা যে পশ্চিমবঙ্গের জীবন-মরণ সমস্যা তাহা বলা বাহুল্য।

ভাগীরথীর অবস্থার অবনতি যে অল্প দিন মাত্র, পূর্বে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে, তাহাও নহে। ভৈরব, কপোতাক্ষী প্রভৃতির মত ভাগীরথীও যে "মজিয়া" যাইতেছে লোক তাহা লক্ষ্য করিয়াছে; কিন্তু প্রতিকার করিবার ক্ষমতা তাহাদিগের ছিল না; কারণ, দেশ তখন পরাধীন। ইংরেজও তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল এবং লক্ষ্য করিয়া চিন্তিতও হইয়াছিল; কিন্তু তাহার চিন্তার কারণ—কলিকাতা

বন্দরে, যদি কলিকাতা পর্যন্ত বড় জাহাজ আসিতে না পারে তবে তাহার বাণিজ্যের ক্ষতি হইতে পারে। সেই জন্য ইংরেজ সাগর হইতে কলিকাতা পর্যন্ত ভাগীরথীর খাত জাহাজ চলাচলের উপযোগী রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে; নদীগর্ভে মাটি কাটিয়া তাহা আবশ্যক গভীর রাখিয়াছে।

আমরা দেখিতে পাই, কলিকাতার নিম্নবাহী ভাগীরথীর (ইহা হুগলী নামে পরিচিত) অংশের অবস্থা যে উত্তরোত্তর শোচনীয় হইয়া আসিতেছে এবং নূতন জাহাজের যাতায়াতের জন্য গভীর জলের প্রয়োজন হেতু হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আর বড় জাহাজ কলিকাতা বন্দরে আসিতে পারিবে না—এই আশঙ্কায় বিষয়টি বিবেচনা করিবার জন্য বিশেষজ্ঞ সমিতি নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু তখন অনেকের বিশ্বাস ছিল, মানুষের চেষ্টায় নদীর অবস্থা-পরিবর্তন করা যায় না।

সেই সমিতির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে স্যার উইলিয়ম হাণ্টার লিখিয়াছিলেন:—

প্রাচীর প্রাকৃতিক অবস্থা যে, যে কোন সময়ে মানুষের ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিতে পারে, কলিকাতা তাহাতে বিচলিত হয় নাই। সেই জন্য সে পূর্বাহ্নে বিপদ্‌বারণ জন্য দুই দিকে দুইটি রেলপথ স্থাপিত করিয়াছে—একটি নদীর যে স্থানে জেমস অ্যাণ্ড মেরী চোরাবালু আছে, তাহার নিকট পর্যন্ত, আর একটি মাতলা পর্যন্ত। প্রয়োজন হইলে এই দুইটি রেলপথে সামুদ্রিক বাণিজ্য অব্যাহত থাকিতে পারিবে।

এই চোরাবালু সম্বন্ধে এই স্থানে কিছু বলা প্রয়োজন। নদীর মোহানায় এক স্থানে এই চোরাবালু কতকটা চড়ার মত অবস্থিত দেখা যায়। ইহা অতি বিপজ্জনক—যদি কোন জলযান ইহাতে সংলগ্ন হয়, তবে তাহার উদ্ধার লাভের আশা সুদূরপরাহত হয়। চারি দিক হইতে দ্রুত আগত বালুরাশির মধ্যে তাহা মগ্ন হইয়া অন্তর্হিত হয়। সেই চড়া আবার একই স্থানে থাকে না—প্রায়ই স্থান-পরিবর্তন করে। সেই কারণে যে স্থানে চোরাবালু থাকে তথায় এক দল লোক যেরূপ ছোট নৌকায় অগভীর জলে যাইতে পারে—চড়ায় ঠেকিয়া "বানচাল" হয় না—সেইরূপ নৌকায় প্রতিদিন চড়ার স্থান লক্ষ্য করে এবং জাহাজ আসিলে তাহার চালককে সেদিন চড়া কোথায় তাহা জানাইয়া দেয়। সে জন্য তাহারা পারিশ্রমিক পায়। এই সকল লোককে "আড়কাঠি" বলা হয়।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে নিযুক্ত অনুসন্ধান সমিতি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাতে সরকার বিস্মিত না হইলেও কতকগুলি চতুর ব্যবসায়ী তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া লাভবান হইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কলিকাতা বন্দরে, অদূর ভবিষ্যতে, আর বড় জাহাজ আসিতে পারিবে না—এই রব তুলিয়া তাঁহারা মাতলায় বিদেশ হইতে আগত জাহাজের জন্য বন্দর রচনার পরিকল্পনা করিলেন। তাঁহারা প্রথমে মাতলায় ক্যানিং বন্দর (পোর্ট ক্যানিং) করিবার জন্য সরকারকে তথায় মিউনিসিপ্যাল কমিশন নিয়োগ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং কমিশন যখন তথায় বন্দর নির্মাণের জন্য ২০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রার্থনা করিলেন, তখন বাঙ্গালার ছোট লাট তাহার জন্য ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঋণ মঞ্জুর করিলেন। সরকারের এই কার্যের ফলে বহু লোক এই পরিকল্পনায় আকৃষ্ট হইলেন। ঐ চতুর ব্যবসায়ীরা কলিকাতায় এক বৃহৎ গৃহ নির্মিত করেন—তাহা বাজার হইবে এবং কল্পিত বন্দর হইতে লোক শিয়ালদহ রেল ষ্টেশনে আসিয়া ঐ বাজারে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করিবে। পরিকল্পনা যখন পরিত্যক্ত হয়, তখন ঐ গৃহ সরকার লইয়া উহাই ক্যাম্পবেল (বর্তমান নীলরতন সরকার) হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ গৃহ পোর্ট ক্যানিং কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের কাজ করিয়াছিল। সেই জন্য বহু দিন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতাল যেমন "ফিভার হাসপাতাল" নামে অভিহিত হইত, এই হাসপাতাল তেমনই "ফিস মার্কেট হাসপাতাল" নামে পরিচিত ছিল।

সময় বুঝিয়া ব্যারিডেল শিলার কোম্পানীর ব্যারিডেল প্রস্তাব করেন, কতকগুলি সর্তের সুযোগ লাভ করিলে তিনি "ক্যানিং বন্দরের" উন্নতি সাধন জন্য "পোর্ট ক্যানিং ল্যাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট রিক্লামেশন অ্যাণ্ড ডক কোম্পানী" গঠিত করিয়া যে জন্য ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার "ডিবেঞ্চার" ঋণ দিতে প্রস্তুত আছেন, বাঙ্গালার ছোট-লাট সে প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং কোম্পানী সোৎসাহে কার্যে প্রবৃত্ত হয়েন।

লোক মনে করিতে লাগিল, ক্যানিং বন্দর সত্য সত্যই বন্দররূপে কলিকাতার স্থান অধিকার করিবে। কোম্পানীর "অংশের" দাম বাড়িতে লাগিল—এমনও হইল যে, ক্রেতার সংখ্যাবৃদ্ধিতে মূল্য বিস্ময়কররূপে বর্দ্ধিত হইল; ক্রেতার ভীড় জমিতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া চতুর ব্যবসায়ী অংশীদাররা অনেকেই চড়া দামে আপনাদিগের "অংশ" বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। ফলে জনকয়েক লোক প্রভূত লাভবান ও বহু লোক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। ইহাই

কলিকাতার কোন বিখ্যাত ধনি-পরিবারের ভাগ্যোদয়ের কারণ।

দেখা গেল, সরকার নানারূপ সুবিধা দিলেও ১৮৬৭ ও ১৮৬৮ দুই বৎসরে মাত্র দুইখানি জাহাজ কলিকাতা বন্দরে না যাইয়া ক্যানিং বন্দরে গিয়াছিল—সে-ও স্বেচ্ছায় নহে, ঝড়ের জন্য—বাধ্য হইয়া। আবার ক্যানিং, কলিকাতার তুলনায়, সমুদ্রের নিকটবর্তী; সুতরাং তথায়, ঝড়ের সম্ভাবনা অধিক। সব বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালা সরকার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন এবং ভারত সরকারকে সকল বিষয় জানাইলেন। তখন ভারত সরকার দূরস্থ ছিলেন না—কলিকাতাই তখন ভারতের রাজধানী এবং ভারত সরকারের কাজ কেবল গ্রীষ্মকালে শিমলা শৈলে নির্বাহিত হইত—অবশিষ্ট সময় কলিকাতায়। বর্তমান "রাজ-ভবন" তখন বড়লাটের কলিকাতাস্থ বাসভবন এবং বারাকপুরের লাট-প্রাসাদ তাঁহার বাগানবাড়ী; বাঙ্গালার শাসক—ছোটলাট আলিপুরে "বেলভেডিয়ার" ভবনে বাস করিতেন। ১৮৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে সরকার ক্যানিং সহরে বন্দর বন্ধ হইল—ঘোষণা করিয়া তথা হইতে বন্দরের কর্মচারীদিগকে সরাইয়া লইলেন। ক্যানিং কোম্পানী জমীদারীর অধিকারী থাকিলেন। নদীর ভাগ্য-বিপর্যয় লক্ষিত হইল না বটে, কিন্তু বহু লোকের ভাগ্য-বিপর্যয় হইয়া গেল।

ইহার অব্যবহিত পরবর্তী উল্লেখযোগ্য প্রধান ঘটনা—খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, পূর্বে যে চোরা বালুর উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে ঠেকিয়া একখানি জাহাজ বালুতে অন্তর্হিত হয়। ফলে কিছুদিন ঐ পথে জাহাজ চলাচল বিপজ্জনক—এমন কি প্রায় অসম্ভব হয়। কয়খানি জাহাজে ডায়মণ্ডহারবারে মাল (রেলে পাঠাইয়া) বোঝাই করা হয় এবং কয়খানি জাহাজ পণ্য লইয়া আসিলে ডায়মণ্ডহারবারেই মাল "খালাস করা" হয়; কোন কোন জাহাজের কতক মাল তথায় নামাইয়া লওয়া হয়—হাল্কা হইয়া জাহাজ কলিকাতায় আসে। এই সব ব্যবস্থায় ব্যয়-বাহুল্য হেতু বণিক সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে সরকারকে অবহিত হইতে বলিলে কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া উপদেশ দিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে বিশেষজ্ঞ ভার্ণন হার্কোর্ট নামক এক ব্যক্তিকে কলিকাতায় আনেন। তিনি আরও অনেক বিদেশী বিশেষজ্ঞ যাহা করিয়াছেন,—তাহাই করেন—বিশেষ অজ্ঞতার পরিচয় দেন। স্থানীয় অবস্থা না জানিয়া তিনি ব্যবস্থা দিলেন,—দুইটি চড়া কাটিয়া অপসারিত করা হউক! পোর্ট ট্রাষ্টের দুই জন কর্মচারী তাঁহার প্রস্তাব অসম্ভব বলিয়া মত প্রকাশ করিলে তিন বৎসর পরে আমেরিকা হইতে লিণ্ডন বেটস্ নামক একজন এঞ্জিনীয়ার আনা হয়। তিনি "ফলতা পয়েণ্ট" কাটিয়া বাদ দিতে বলিলেন। তাঁহার পরামর্শ অনুসারে মাটি-কাটা কল-ও ক্রয় করা হইল। কিন্তু দেখা গেল, সে কল যে কাজের জন্য ক্রয় করা হয় তাহার উপযোগী নহে। তবে তাহা অন্য কাজে ব্যবহৃত হইয়াছিল; কাজও ভাল হইয়াছিল।

এদিকে বর্ষা আসিয়া পড়িল এবং নদীর ধারা পুষ্ট ও স্রোত প্রবল হইয়া ঐ চড়ার মধ্য দিয়া নূতন খাত করিয়া লইল। আর জাহাজ চড়ায় লাগিবার সম্ভাবনা রহিল না। মানুষ যাহা করিতে পারে নাই, প্রকৃতি তাহা করিয়া দিল। বিপদ দূরে হইলে যেমন হয়, তেমনই হইল—আন্দোলন নিবৃত্ত হইল; পূর্ববৎ জাহাজ চলাচল হইতে লাগিল—বাণিজ্যে বাধা পড়িল না। কলিকাতা শ্রীহীন হইল না।

ভার্ণন হার্কোর্ট মন্তব্য করিয়াছিলেন—বর্ষার সময় জল বাড়িলে গঙ্গা হইতে যে জল ভাগীরথীর খাতে আসিয়া পড়ে ভাগীরথীর অস্তিত্ব তাহার উপরেই নির্ভর করে এবং যাহাতে সেই জল আবশ্যক পরিমাণে পাওয়া যায়, সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আজ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সচিব যে বলিতেছেন, বর্ষাকালে কয় সপ্তাহ ব্যতীত অন্য সময় ভাগীরথী গঙ্গা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা বহুদিন পূর্বেই হার্কোর্ট বলিয়াছিলেন এবং তাহা সরকারের সেচ বিভাগের অজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে। আশাকরি, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের রিপোর্ট বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে আবার ভাগীরথী "মজিয়া" যাওয়ার কথা উঠে। এ দিকে পোর্ট ট্রাষ্ট নদীগর্ভে সঞ্চিত পলি তুলিয়া ফেলিয়া সাগর হইতে কলিকাতা পর্যন্ত নদী-গর্ভের গভীরতা বড় বড় জাহাজ গতায়াতের উপযোগী করিয়া রাখিতেছিলেন। তবে দেখা গিয়াছে, আরও প্রায় ৩০ বৎসর পরে আমেরিকা হইতে পর্যটকরা বড় জাহাজে আসিলে—যদি জাহাজ কলিকাতা পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব না হয় সেই আশঙ্কায়, ডায়মণ্ডহারবারে জাহাজ রাখা হইত এবং তথায় তাঁহাদিগের জন্য "জেটি" নির্মিত হইত।

সরকার স্থির করেন, পোর্ট ট্রাষ্ট কলিকাতা হইতে নবদ্বীপ পর্যন্ত প্রায় ৮০ মাইল নদী-পথ লক্ষ্য করিয়া ভাগীরথীর অবস্থা-পরিবর্তন পরীক্ষা করিবেন। কারণ, যদি জল-পথের অবনতি ঘটে, তবে তাহা নদীর উপরের অংশে—অর্থাৎ যে স্থানে ভাগীরথী গঙ্গা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহার অব্যবহিত পরের অংশে সহজেই

বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু দীর্ঘ ৮০ মাইল পথ পরীক্ষাধীন রাখা পোর্ট ট্রাস্টের পক্ষে একরূপ অসম্ভব এবং তাহার অনেক ভাগই পোর্ট ট্রাস্টের হদ্দার বাহিরে। কাযেই ফল উল্লেখযোগ্যরূপ হয় নাই। কিন্তু যে স্থানে ভাগীরথী গঙ্গা হইতে বাহির হইয়াছে, তাহার পরে যে ভাগীরথীর অবস্থা দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না—মুর্শিদাবাদের নিম্নে ভাগীরথীর অবস্থাই তাহার প্রমাণ।

কিছুকাল এইরূপে অতিবাহিত হইবার পরে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সরকার আবার ভাগীরথীর অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠেন এবং ঐ বৎসর ২রা নভেম্বর মেজর হার্স্টকে ভাগীরথীর অবস্থা সম্বন্ধীয় রিপোর্ট অভিমত প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দিবার কার্যে ৩ মাসের জন্য নিযুক্ত করেন। তাঁহাকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে নির্দেশ দান করা হয়ঃ—

(১) ভাগীরথীর উপরাংশে জলের স্বল্পতাহেতু কলিকাতা বন্দরের কিরূপ অবস্থার উদ্ভব হইতেছে;

(২) হাওড়া সেতু হইতে সাগর পর্যন্ত যেসকল জলধারা হইতে ভাগীরথীতে জল আসিয়া থাকে—জলযান চলাচলের জন্য সে সকলের উন্নতি সাধন সম্ভব কি না;

(৩) দেশের স্বাস্থ্য;

(৪) সেচ-ব্যবস্থা।

মেজর হার্স্ট তাঁহার নির্দিষ্ট কার্য ৩ মাসে শেষ করিতে পারেন নাই; ২০ মাস পরে তিনি এক বিস্তৃত রিপোর্ট দাখিল করেন। তিনি মত প্রকাশ করেন—ভাগীরথী ক্রমেই "মজিয়া" আসিতেছে এবং তাহার জল লাভের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। সে অবস্থা হইতে অব্যাহতি লাভ নিম্নলিখিত দুইটি উপায়ে সম্ভব—

(১) যদি প্রাকৃতিক পরিবর্তনে অর্থাৎ নদীর গতি-পরিবর্তনে নদীর জল অধিক পরিমাণে ভাগীরথীতে প্রবেশ করে; অথবা

(২) যদি চেষ্টার দ্বারা গঙ্গা হইতে অধিক পরিমাণ জল ভাগীরথীতে আনা যায়।

মেজর হার্স্ট রিপোর্ট পেশ করিবার ৪ মাস পরে—১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর সরকার ঐ রিপোর্ট সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বলেন, ভাগীরথীর অবস্থা সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করা হইবে এবং সে জন্য তাঁহারা "কর্মকুশল" লোক লইয়া একটি সমিতি গঠিত করিবেন; সেই সমিতি সরকারকে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে পরামর্শ দিবেন—

(১) ভাগীরথী ও তাহার সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য নদীর পরিবর্তন সম্বন্ধে নিয়মিত উপায় অবলম্বন করা;

(২) সম্ভব হইলে, কি উপায়ে ঐ সকল নদী জল-যান গতায়াতের উপযোগী ও ভাগীরথীর নিম্নাংশে জল-প্রদানকারী রাখা যায়, তাহা স্থির করা।

দেখা যায়, ভাগীরথীর নিম্নাংশ সম্বন্ধেই সরকার অধিক অবহিত ছিলেন; অর্থাৎ কলিকাতা বন্দর কিরূপে রক্ষা করা যায়, তাহাই তাঁহাদিগের চিন্তার বিষয় ছিল।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সরকার উল্লিখিত কমিটী গঠিত করেন। সেই কমিটীর রিপোর্ট ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে দাখিল হয়। রিপোর্টে বলা হয়, বর্ষাকাল ব্যতীত গঙ্গার প্রবাহের সহিত ভাগীরথীর বিচ্ছেদ বহুদিনের। কারণ—

(১) ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে পর্যটক টেভার্ণিয়ার দেখিয়াছিলেন, গঙ্গা ও ভাগীরথীর সংযোগস্থলে জল নাই;

(২) তাহার শত বৎসর পরে রেনেল বলেন, গ্রীষ্মকালে ঐ সংযোগস্থান বন্ধ হইয়া যাইত বা তাহাতে ২ ফিটেরও কম গভীর জল থাকিত;

(৩) ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে দেখা গিয়াছিল, বৎসরের সকল সময় ভাগীরথীতে জলযান চলাচল প্রায়ই সম্ভব হইত না।

ঐ রিপোর্টে বলা হয়—

ভৈরব, জলাঙ্গী, চূর্ণী প্রভৃতি জল-পথে কতকটা অবনতি লক্ষিত হয়। যাহাতে বর্তমান "মিঠা" জলের সরবরাহ অব্যাহত থাকে এবং কলিকাতা বন্দর রক্ষার পক্ষে যে সকল উপায় আশু প্রয়োজন সে সকল অবিলম্বে অবলম্বিত হয়, তাহা করিতে হইবে। ভাগীরথীর যে অংশ হুগলী নামে পরিচিত—অর্থাৎ যে অংশ কলিকাতার তলবাহিনী তাহাতে অধিক পরিমাণ পলি আসিতে না পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।*** যাহাতে ভাগীরথীর জল অনায়াসে হুগলীতে আসিতে পারে সে জন্য একটি পথ পরিষ্কার রাখিতে উপযুক্ত মাটি-কাটা কল ব্যবহার করা প্রয়োজন।

এই কমিটী ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মত উদ্ধৃত করিয়া মেজর হার্স্টের মত কতকাংশে খণ্ডিত করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। তাঁহারা এডামস্ উইলিয়মসের মতের সমর্থনলাভও করেন। যাহাতে জোয়ারের জল স্বচ্ছন্দে ভাগীরথীতে অগ্রসর হইতে পারে, তাহার প্রয়োজনের উল্লেখ করিয়া কমিটী বলেন, কলিকাতার উত্তরে কতকগুলি কারণে নদীর অবনতি ঘটিয়াছে। নৈহাটীতে যে সেতু নির্মিত হইয়াছে, তাহার ফলে নদীর অবনতি হইয়াছে কি

না সে বিষয়ে হয়ত সন্দেহের অবকাশ আছে, কিন্তু নদী-কূলের একাধিক কলকারখানার "জেটি" নির্মিত হইয়াছে ও নদীগর্ভ বুজাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে—তাহাতে যে নদীর অবনতি অনিবার্য হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহার পরে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়ম উইলকক্সের বাঙ্গালায় আগমন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমতল ভূমিতে প্রবাহিত নদীর সম্বন্ধে তাঁহার মত বিশেষজ্ঞ আর কাহাকেও বলা যায় না। তিনি মিশরে নীল নদের জল-প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিয়া যে অসাধ্যসাধন করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। মিশরে তাঁহার কার্যফলে বিস্মিত হইয়া তুরস্কের সরকার তাঁহাকে ইরাকের বিলুপ্ত সেচ-ব্যবস্থার পুনরুদ্ধারসাধন জন্য ব্যবস্থা করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। বাইবেলে বর্ণিত প্রাচুর্য-রাজ্য নন্দন-কানন এই ইরাকে (মেসোপোটেমিয়ায়) টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিশ নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে। কিন্তু পুরাতন সেচ-ব্যবস্থা নষ্ট হওয়ায় সেই দেশ এখন মরু-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সেই জন্য তুর্কী সরকার—মিশরে সার উইলিয়মের কার্যফল দেখিয়া, ইরাকে আবার পুরাতন ও বিলুপ্ত সেচ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপায় করিতে তাঁহার মত লইয়াছিলেন। তিনি যে উপায় নির্দেশ করিয়াছিলেন তাহার ব্যয় (৩০ কোটি টাকা) নির্বাহ করা তুর্কী সরকারের সাধ্যাতীত ছিল। সেই জন্য সে উপায় অবলম্বিত হয় নাই। সার উইলিয়ম ৭৬ বৎসর বয়সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একবার এদেশে আসিয়া পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের দুরবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। তাঁহার কার্যে বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ডক্টর বেণ্টলী তাঁহার সহকর্মী হইয়াছিলেন। সার উইলিয়ম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, সেচের জলের অভাবেই পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গ ম্যালেরিয়ায় জর্জরিত এবং তাহার জমীর উর্বরতা ক্ষুণ্ণ। তিনি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ কলিকাতায় জমীদার সভাগৃহে বাঙ্গালার পুরাতন সেচ-ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধ তখন সংবাদপত্রাদিতে বিশেষভাবেই আলোচিত হইয়াছিল। তাহার পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে অনুরোধ করিলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ বিষয়ে কয়টি বক্তৃতা প্রদান করেন এবং সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

সার উইলিয়ম যে বাঁধ নির্মাণ করিয়া ভাগীরথী রক্ষা করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, আজ পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই কথাই বলিতেছেন। সার উইলিয়ম বলিয়াছিলেন, কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট নদীর নিম্নাংশের (কলিকাতা হইতে সাগর পর্যন্ত) রক্ষায় মনোযোগ দিয়া আসিতেছেন—তাহাতেই অর্থব্যয় করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা যদি ভাগীরথী যে স্থানে গঙ্গা হইতে বাহির হইয়াছে তথায় মনোযোগদান ও অর্থ ব্যয় করেন, তবে অল্প চেষ্টায় নদীর নিম্নাংশ সুরক্ষিত হয়, কলিকাতার উত্তরেও দীর্ঘ স্থানে নদীর সহিত সংলগ্ন জলপথগুলিতে বৎসরের সকল সময়েই প্রচুর জল থাকে।

সার উইলিয়ম উইলকক্স যখন এই কথা বলিয়াছিলেন দেশ তখন বিদেশীর শাসনাধীন। বিদেশী শাসকগণ তাঁহাদিগের স্বদেশীয়দিগের বাণিজ্যের সুবিধা সম্বন্ধেই অধিক অবহিত থাকিতেন এবং লর্ড কার্জন স্বীকার করিয়াছিলেন, ভারতে ইংরেজ-শাসনের দুই দিক—শাসন ও শোষণ। সেই জন্য তাঁহারা কলিকাতা বন্দর রক্ষায়ই অধিক আগ্রহশীল ছিলেন। যে এঞ্জিনীয়ার এডামস্ উইলিয়মসের নাম পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি "গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক কেনাল" পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া বহু অর্থের অপব্যয় করিয়াছিলেন এবং কার্যের অনুপযোগী যে মাটি-কাটা কল সরকারকে দিয়া ক্রয় করাইয়াছিলেন, তাহার কলঙ্ক অপনীত হইবার নহে।

তাহার পরে বহু বৎসর অতীত হইয়াছে। দেশ আর বিদেশীর শাসনাধীনে নহে; দেশ সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিভক্ত হইয়াছে। সেই ভাগ্যের বিষয়, যে স্থান হইতে ভাগীরথীতে গঙ্গার জল আসিয়া থাকে, সে স্থানটি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। সুতরাং তথা হইতে ভাগীরথীতে আবশ্যক জল আনিবার ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু দামোদরের জলনিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য ভারত সরকারের ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে আগ্রহ লক্ষিত হইতেছে, ভাগীরথী রক্ষায় সে আগ্রহের অভাব অনুভূত হইতেছে। সরকার যে এ বিষয়ে উদাসীন, তাহা নহে; ভূতপূর্ব সেচ-সচিব বলিয়াছিলেন, অনুসন্ধানে ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে—হয়ত আরও টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। কিন্তু কার্য আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই।

গত প্রায় শত বৎসরে ভাগীরথীর অবস্থা সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা প্রদান করিলাম।

এই সময়ে যে বাঙ্গালার জলপথ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। ভৈরব, জলাঙ্গী, কপোতাক্ষী, চূর্ণী, ইছামতি প্রভৃতি জলপথসমূহের অবস্থা

কিরূপ হইতেছে, এবং তাহাদিগের অবস্থার উন্নতিসাধন সম্ভব কি না, সে বিষয় অনেকে বিবেচনা করিয়াছেন। যে সকল নদী সরকার "নদীয়া নদী" বলিয়া অভিহিত করেন, সে সকল সম্বন্ধে স্বতন্ত্র অনুসন্ধানও হইয়াছে।

সার উইলিয়ম উইলকক্স পর্যটক বার্ণিয়ারের মতের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, বাঙ্গালায় রাজমহল হইতে সাগরসঙ্গম পর্যন্ত যে বহু খালের উল্লেখ বার্ণিয়ার করিয়াছিলেন, সে সকল বাঙ্গালার লোক জল পানের, জলযান গতায়াতের ও সেচের জন্য বহুশ্রমে খনন করিয়াছিল এবং সেই সকলই নদীতে পরিণত হইয়াছিল। সে মত সম্পূর্ণ ভাবে অভ্রান্ত কি না, তাহা বিচার্য। তবে তাঁহার মত বিশেষজ্ঞের মত সহসা উপেক্ষা করাও সঙ্গত নহে।

বাঙ্গালা নদীমাতৃক ব-দ্বীপ। বাঙ্গালা নদী-মাতৃক বলিয়াই কালিদাস 'রঘুবংশে' বাঙ্গালীদিগকে নৌসাধন-তৎপর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একদিন যে বাঙ্গালার অর্ণবপোত বিদেশে পণ্য লইয়া গতায়াত করিত, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। সিংহবাহুর সিংহল-বিজয়, বাঙ্গালীর নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন—এ সকলের প্রমাণ সাহিত্যে ও শিল্পে রহিয়াছে। মোগল সম্রাটদিগের শাসনকালে বাঙ্গালার রাজস্ব আংশিকরূপে নৌকায় প্রদত্ত হইত।

বঙ্গালার নদীর গতি-পরিবর্তনও সর্বজনবিদিত। সার উইলিয়ম হাণ্টার বলিয়াছেন, বাঙ্গালীরা এক সময়ে সমুদ্র লঙ্ঘন করিত—সমুদ্রলঙ্ঘন সম্বন্ধে সংস্কার হেতু ও নদী "মজিয়া" যাওয়ায় পরবর্তী কালে তাহারা সমুদ্রে গতায়াত-বিমুখ হইয়াছে।

বাঙ্গালা যে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাঙ্গালার নদীসমূহই তাহার কারণ।

পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্য যে নদীর দুর্দশাসঞ্জাত, তাহাও অবশ্যস্বীকার্য।

যে সকল কারণে ভাগীরথীর অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে, সে সকল আজ আর কাহারও অজ্ঞাত নহে। এই অবস্থার প্রতীকার প্রয়োজনও বহু দিন হইতে অনুভূত হইয়া আসিতেছে। সে অবস্থায়ও যে ভারত সরকারের বহুবিঘোষিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভাগীরথী সংস্কারের উল্লেখও নাই, তাহা পরিতাপের বিষয়। ইহাতে সন্দেহের অবকাশ ঘটে যে—

(১) ভারত সরকার যাঁহাদিগকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনার ভার দিয়াছেন, তাঁহারা হয় সে ভারের উপযুক্ত নহেন, নহে ত পরিকল্পনা রচনায় আবশ্যক মনোযোগ দান করেন নাই—পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ও প্রয়োজন যেমন বিবেচনা করেন নাই, তেমনই ভাগীরথী সম্বন্ধে শত শত বৎসরে যে সকল রিপোর্ট সরকারের দপ্তরে সঞ্চিত হইয়াছে সে সকলও অধ্যয়ন করেন নাই—সে সকলের আলোচনা ও সমালোচনা সন্ধান করেন নাই।

(২) পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গের জীবন-মরণ সমস্যা ভাগীরথী-সংস্কার সম্বন্ধে হয় আপনারা অবহিত নহেন, নহে ত অযোগ্যতা বা অক্ষমতা বশতঃ ভারত সরকারকে সে বিষয়ে অবহিত করিতে পারেন নাই।

(৩) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ-বিভাগ এ বিষয়ে কর্তব্য পালন করিতে পারেন নাই। কারণ যাহাই হউক না—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, দামোদরের জল-নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষাও ভাগীরথীর সংস্কার-সাধন অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজন। সেই সংস্কার-কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন এবং কার্যে বিলম্ব করিলে তাহা অসঙ্গত হইবে।

সার বিশ্বেশ্বরায় যে বলিয়াছেন, ফারাক্কায় বাঁধ ও সেতু নির্মাণ আরও বিচারসাপেক্ষ, সে সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি বলিবেন? তাঁহারা—ভারত সরকারের সহযোগে যে বিচার করিয়াছেন, তাহা যে নির্ভরযোগ্য নহে তাহা কি তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন?

জাল

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

পুরনো কাগজের টুকরোটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন শশীকান্ত। কপালে কোঁচকানো ভাঁজগুলো আরেকটু কুঁচকে গেল। চোখের তারা দুটো জ্বল জ্বল করে উঠলো একবার। সদ্য ছানি-কাটা চোখের দৃষ্টি। চোয়ালের শিথিল চামড়ায় একটা শিহরণ উঠে থেমে গেল। মৃদু মৃদু মাথা নেড়ে দুমিনিট কি ভাবলেন শশীকান্ত।

পুরু কাচের চশমাটা পাশেই ছিল। চশমাটা নিয়ে কাপড়ের খুঁটে রগড়াতে লাগলেন ধীরে ধীরে। তারপর নাকের ডগায় চশমাটা চাড়িয়ে তির্যক চোখে তাকালেন। সাপের মতো শাণিত-তীক্ষ্ম দৃষ্টি—মর্মকেন্দ্র বিঁধে ফেলতে পারে যেন।

'হ্যাঁ, সব দেখলাম।' কথা বললেন শশীকান্ত।

'কি? কি দেখলেন? নেবেন তো কাজটা?'

শশীকান্তর মুখের দিকে মাছরাঙার মতো তাকিয়ে দয়াল বললে। রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে প্রতিটি মুহূর্ত এতক্ষণ অতিবাহিত করছিল সে। যেন দম আটকে আসছিল তার।

'হ্যাঁ, নেব তোমার কাজ। তবে কিনা—' কাগজটা হাতে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলেন শশীকান্ত, 'তবে কিনা ঝামেলা অনেক। লেখাগুলো সব অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। কালির আঁচড়গুলো রঙচটা হয়ে গেছে।'

'সে আপনার একটু বেশি পরিশ্রম হবে হয়তো পণ্ডিত মশাই, তা তো গোড়াতেই আপনাকে বলেছি।' হাত কচলাতে লাগলো দয়াল। দাঁত বার করে বললে, 'কিন্তু উপরি পরিশ্রমটা আপনার ভালো মতোই পুষিয়ে দেবো এও বলে রাখছি, এই নিন আগাম এই কয়টি টাকা।' কয়েকখানা নোট খস্ খস্ করে উঠলো দয়ালের মুঠোয়।

বিনা বাক্যব্যয়ে নোট ক'খানা তুলে নিলেন শশীকান্ত। কাগজখানা সটান মেলে চাপ দিয়ে ধরে বললেন, 'দেখতেই তো পাচ্ছো, একি চাট্টিখানি কাজ? কি অমানুষিক খাটতে হবে আমাকে। তাই বলছিলাম।'

পরিতৃপ্তিতে খুসী খুসী দেখা যাচ্ছে দয়ালের মুখ। বললে: 'তা আর বলতে পণ্ডিত মশাই, যাক, কাজ আপনি নিলেন, এখন নিশ্চিন্ত আমি।'

'তুমি তো নিশ্চিন্ত হলে। কিন্তু কাজটা শেষ করে তোমার হাতে তুলে না দেয়া পর্যন্ত দুশ্চিন্তার বোঝা হয়ে রইলো আমার।' শশীকান্তর মুখেও হাসি। কোঁচকানো কপালে, শিথিল চোয়ালে ঢেউ খেলে যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

উঠলো দয়াল। আর বসে থাকবার কোন প্রয়োজন নেই। বললে, 'তা হলে কবে আবার আসবো পণ্ডিত মশাই? জানেনই তো কতো জরুরী ব্যাপারটা।'

'ঠিক আছে, পরশুই এসো তুমি, দুপুরের দিকে।' চশমাটা খাপে পুরে বললেন শশীকান্ত।

'তাই আসবো। আপনার ওপরই কিন্তু সবকিছু ছেড়ে দিয়েছি পণ্ডিত মশাই। আপনার ওপরই নির্ভর করছে আমার সমস্ত ভাগ্য ভবিষ্যৎ।' আবেগে বললে দয়াল। বলে ফেলে কিন্তু নিজের কাছেই কেমন বাহুল্য ঠেকলো কথাটা। শশীকান্ত কি মনে করলেন কিছু? তার কর্মক্ষমতার ওপর কি একটু অবিশ্বাস করা হলো না? আজ পর্যন্ত কেউ তো ব্যর্থকাম হয়নি এসব ব্যাপারে শশীকান্তর সহায়তা নিয়ে—তাঁর ওপর নির্ভর করে। কিন্তু, মনের অস্থিরতায় দয়ালের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে কথাটা।

শশীকান্তর মুখের দিকে তাকালো দয়াল। না, কোন ভাবান্তর নেই তাঁর মুখে। কোঁচকানো ভ্রূর নীচে তখনো হাসির আমেজ মাখানো একজোড়া চোখ চক্ চক্ করছে। ঘোলাটে ধূসর মেঘের মাঝে ঝিলিক দিয়ে উঠছে বিজলীর রেখা।

না, আর দেরী করবার কোন মানে হয় না। দরজার কাছে হেলানো ছাতাটা তুলে নিয়ে দয়াল বললে, 'আচ্ছা, তা হলে এখন চলি পণ্ডিত মশাই।'

কথা বললেন না শশীকান্ত। ঘাড় নাড়লেন শুধু।

দরজা ঠেলে বেরিয়ে যেতে যেতে শশীকান্তর দিকে আরেক পলক তাকালো দয়াল। পাথরে খোদাই একখানা মুখ নিস্পলক তাকিয়ে আছে। কঠিন-অচঞ্চল বলয়-রেখা ফুটে উঠেছে গালে কপালে। ধূসর চোখ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আতসী-উজ্জ্বল দৃষ্টি। শাণিত ফলকের মতো দৃষ্টি।

এক পলক তাকিয়েই মুখ ফেরালো দয়াল। দরজাটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে পড়লো তাড়াতাড়ি।

অমাবস্যার রাত্রি নয়। তবু ঘুটঘুটে অন্ধকার।

আকাশে কিছুক্ষণ আগেও নক্ষত্রের আসর জেগে ছিল। কিন্তু একটা নিকষ-কালো মেঘ কোথা থেকে উঠে এসে ঢেকে দিয়েছে নক্ষত্রের সমারোহ। অন্ধকার—নিপাট, নিঃসীম অন্ধকার।

দাওয়ায় পাইচারি করছিলেন শশীকান্ত। রাত্রি মধ্য প্রহরের আগে আজকাল ঘুম আসে না তাঁর। কোন কোন দিন ঘুমই আসে না সারা রাত্রিতে। বিছানায় শুয়ে কি সব ভেবে চলেন কেবল। একটা ভাবনার সূত্র ধরে চলে যান অসংখ্য চিন্তাসূত্রে। চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়েন। অসংলগ্ন অকারণ চিন্তা সব—কথা আর ঘটনার স্তূপ। কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারেন না শশীকান্ত চিন্তা-জাল থেকে। এইসব অর্থহীন চিন্তা মস্তিষ্কের অপকারক—দৈহিক-মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিকূল। ভাবতে ভাবতে একেক সময় হয়তো সচেতন হতে পারেন তিনি। কিন্তু সেই সচেতন মুহূর্তেই স্মৃতির গুহা-পথেই আবার কখন হাটতে সুরু করেন। ফেলে-আসা দিনের চলমান জীবনের অনেক তুচ্ছ-নগণ্য ঘটনা নতুন কোন মানে নিয়ে হাজির হয়। আর এইসব চিন্তার ভেতর দিয়ে একটা ভবিষ্যতের পথে যেয়ে যেন দাঁড়ান শশীকান্ত। শুনতে পান ভবিতব্যের ইঙ্গিত। স্পষ্ট, অনতিক্রম্য ইঙ্গিত।

পাইচারি করছিলেন—আর ভাবছিলেন শশীকান্ত।

সামনে একটা হাসনুহানার ঝোপে কয়েকটা জোনাকি জ্বলছে নিবছে। দূরের নিত্যবহমান শীর্ণ নদীর বুকে দেখা যাচ্ছে স্তিমিত কয়েকটি আলোক-বিন্দু। জেলে-নৌকোর আলো। শির-শিরে একটা বাতাস উঠে আসছে নদী থেকে। হাসনুহানার নেশাড়ী গন্ধ জড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসে।

'চণ্ডী, চণ্ডী।' দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের সঙ্গে শশীকান্ত উচ্চারণ করলেন। গম্ভীর ধ্বনি আছড়ে পড়লো নিস্তব্ধতার বুকে। একটা প্রতিধ্বনি জেগে উঠলো বুঝি কোথায়।

ঘরে এসে ঢুকলেন শশীকান্ত। প্রহর পেরিয়ে রাত্রির নিস্তব্ধতা আরো নিবিড় হয়েছে। নিশাচর পাখীর ডাকও শোনা যায় না আর।

বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলেন শশীকান্ত। রেড়ীর তেলের প্রদীপটা নিভিয়ে দিলেন ফুঁ দিয়ে।

প্রায় পঁচিশ বছর ধরে এই কাজ করে আসছেন শশীকান্ত। জমি-সম্পত্তির হাত-বেহাতের ব্যাপারে উইল—দলিলপত্র জাল করবার একটা আশ্চর্য দক্ষতা আছে তাঁর। অবশ্য তাঁর এই দক্ষতার খবর মুষ্টিমেয় লোকই বিশেষ করে জানে। বিত্তবান জমিদার শ্রেণীর লোকই তাঁর সহায়তার প্রার্থী হয়েছে বরাবর। দিনকে রাত রাতকে দিন করে দিয়েছেন শশীকান্ত। অনিবার্য সাফল্যের উৎসাহে দরাজ হাতে তাঁকে পারিশ্রমিক দিয়েছে সেইসব ব্যক্তি-পুরুষরা। তবু তাঁর এই ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার খবর সাধারণের মধ্যেও একেক সময় ছড়িয়ে পড়ে। চাপা আলোচনাও চলে তাঁকে নিয়ে। কিন্তু তা শুধু নিতান্ত সাময়িক। এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না কেউ। এ-অঞ্চলের একচ্ছত্র পুরোহিত শশীকান্ত। জমিদারদের দুর্গাপূজো থেকে সুরু করে সাধারণের ছোটখাটো পূজা-পার্বন তাঁর দ্বারাই সমাধা হয়। অমায়িক ব্যবহার তাঁর। দীর্ঘ গৌরবর্ণ দেহে বার্ধক্যের আশ্চর্য শুচিতা। নিয়মিত শুদ্ধাচারের স্বাক্ষর কথায় কলেবরে। এমন লোক সর্বপ্রকার সন্দেহের অতীত। এমন লোকের সম্বন্ধে কোনপ্রকার হীন চিন্তা মনে জাগলে বরং আত্মগ্লানির সঞ্চার হয়। শশীকান্তর গোপন কার্যক্রম তাই সাধারণের মধ্যে কখনো কখনো জানাজানি হলেও কোন সন্দেহ অবিশ্বাসের হাওয়া সৃষ্টি হয়নি এখনো। শশীকান্তর প্রতি এখনো শ্রদ্ধাকুণ্ঠ হতে পারেনি সাধারণ লোক।

কিন্তু কি আর প্রয়োজন এই অসৎ উপার্জনে? তিনকূলে আপন বলতে তো আর কেউ নেই তাঁর। একমাত্র ছেলে ছিল—ছেলের বউ ছিল। তারা তো তাঁর মায়া কাটিয়ে চলে গেছে চিরদিনের জন্যে। বৃদ্ধ বয়সে পুত্র আর পুত্রবধূ হারিয়েছেন তিনি—যা স্বাভাবিক নয়, সচরাচর যা দেখা যায় না। কিন্তু তবু তো শোকে একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন না শশীকান্ত। অবশ নির্জীব হয়ে পড়লেন না। ইদানীং দৃষ্টিশক্তি একটু আড়ষ্ট হয়ে এসেছিল চোখে ছানি পড়ে। কলকাতায় যেয়ে ছানি কাটিয়ে এসেছেন সম্প্রতি। দৃষ্টিশক্তি ঠিক আগের মতো না হলেও অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে আবার। কিন্তু দলিল-উইলের জাল প্রতিলিপি আঁকবার জন্যেই কি চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলেন শশীকান্ত? এই প্রবঞ্চনা কতদিন করে যাবেন তিনি? এই দুঃসাধ্য কাজে ব্যাপৃত থাকবেন? প্রশ্নের সারি এসে দাঁড়ালো শশীকান্তর মনে। আর তখুনি সেই অন্ধকার ঘরের মাঝেও তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো ম্লান অসহায় একটি বিধবার মুখ। দয়ালের বিধবা ভ্রাতৃবধূ কনকলতার মুখ। এই বিধবার বিরুদ্ধেই উঠে পড়ে লেগেছে দয়াল। দয়ালের ছোটভাই মারা গিয়েছে আজ কয়েকমাস হয়। ছেলে মরবার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো এককড়িও বিছানা নিলে। মাসখানেক পরে সেও চোখ বুজলো। বিষয়-সম্পত্তি বুড়ো দুই ছেলের নামে সমান অংশে ভাগ করে

একখানা উইল করে রেখেছিল আগেই। পারিবারিক বিপর্যয়ের সুযোগে উইলখানা কি করে আত্মসাৎ করেছে দয়াল। সম্পত্তি থেকে কনকলতাকে বঞ্চিত করার জন্যে নানান ফন্দি-মতলব আঁটছে। দয়ালের মতলব একটু-আধটু বুঝতে পেরেছে কনক। সহায়-মুরুব্বি তেমন নেই তার। গাঁয়ের জোতদার কানাই ঘোষ কিন্তু হঠাৎ অত্যন্ত শুভানুধ্যায়ী হয়ে উঠেছে কনকের। কনককে সে সহায়তা করছে তলে তলে। কিন্তু দয়াল যে কতো গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তা হয়তো কল্পনাও করতে পারেনি কনক। দয়ালও সদ্য গড়ে-ওঠা জোতদার। সে আশ্রয় নিয়েছে শশীকান্তর। উইলের সর্ত পাল্টে দিয়ে একেবারে নিখুঁত জাল উইল তৈরী করাবে দয়াল।

অন্ধকারের মাঝে কনকের মুখখানা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

'কি প্রয়োজন আর এই অসৎ উপার্জনে? এই অপরিমেয় উপার্জনে?' কনকের দিকে তাকিয়ে এ-প্রশ্নটাই সেদিন জেগে উঠেছিল শশীকান্তর মনে।

ধান্য-পূর্ণিমার ব্রত উদ্‌যাপন করছিল কনক। পুরোহিত শশীকান্ত স্বয়ং। গম্ভীর স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করে যাচ্ছিলেন তিনি। আর পাশে একান্ত মনোনিবেশে শুনছিল কনক।

ব্রতের শেষে শশীকান্তকে খড়ম জোড়া এগিয়ে দিয়ে বলেছিল কনক, 'আপনাকে ছাড়া আর কাউকে দিয়েই এই ব্রতের কাজ করাতে মন সায় দেয় না পণ্ডিত মশাই।'

খড়ম পায়ে দিয়ে তসরের চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিলেন শশীকান্ত। একটু হেসেছিলেন শুধু।

ঠিক সেই মুহূর্তে দয়ালের প্রস্তাবটা তাঁর মনের কোথায় যেন খচ করে বিঁধে উঠেছিল: যে প্রস্তাব নিয়ে দয়াল ঘুরঘুর করছিল তাঁর পেছনে।

কিন্তু মুহূর্তের জন্যে শুধু। বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে হেসে বলেছিলেন শশীকান্ত, 'ব্রত-পার্বনে ভক্তি থাকা ভালো মা। আজকাল তো এর তাৎপর্য মানতেই চায় না অনেকে।' শিক্ষিতা মেয়ে কনক। অথচ ব্রত-উপাসনায় কেমন নিষ্ঠা। তাই একটু অবাক না হয়ে পারেননি শশীকান্ত।

আবার বলেছিল কনক, 'আমার খোকার অন্নপ্রাসনও কিন্তু আপনিই করাবেন পণ্ডিত মশাই। একটা দিন ঠিক করে দিন না অন্নপ্রাসনের। ওর ছ'মাস তো পূর্ণ হলো এইবার।'

'আচ্ছা, দেব, দেব। অতো অস্থির হয়ো না মা। আমি তোমার বাড়ী বয়ে এসে সব ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব।' সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বলেছিলেন শশীকান্ত।

কনকের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেছিলেন শশীকান্ত। আর নিজের মনকেও সেদিন প্রশ্ন করেছিলেন তিনি।

অন্ধকারের মাঝেই আবার মিলিয়ে গেল কনকের মুখ। উঠে বসলেন শশীকান্ত। ঘেমে উঠেছে সমস্ত শরীর। চিন্তার সূত্র জট পাকিয়ে যাচ্ছে। খেই হারিয়ে ফেলছেন শশীকান্ত।

কিন্তু দয়ালকে যে কথা দিয়েছেন তিনি। চুক্তিবদ্ধ হয়ে পড়েছেন দয়ালের সঙ্গে। প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গতে অভ্যস্ত নন শশীকান্ত। এই দীর্ঘ জীবনে কখনো তিনি কাউকে কথা দিয়ে কথা ফিরিয়ে নেননি। আর আজ বার্ধক্যের এই প্রান্তসীমায় উপনীত হয়ে বিসর্জন দেবেন আজীবনের সংস্কার—চরিত্রের অনড় দৃঢ়তা?

'চণ্ডী, চণ্ডী।' স্বগতোক্তি করলেন শশীকান্ত।

বিছানায় আবার শরীর এলিয়ে দিলেন তিনি। শিয়রের জানালা দিয়ে দেখা যায়—অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়েই এসে উপস্থিত হলো দয়াল। একমুখ পান চিবুতে চিবুতে এসে হাজির। ফিক্ করে একটু পানের পিক্ ফেলে ঘরে ঢুকলো। তক্তাপোষের একপাশে বসে বললে, 'তারপর, জিনিসটা হয়ে গেছে পণ্ডিত মশাই?'

আজ একাদশীর উপবাস শশীকান্তর। নির্জলা উপবাস। কাত হয়ে শুয়ে একটা বাঙলা খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। খোলা দরজার পথে দয়ালের আগমন আগেই লক্ষ্য করেছিলেন তিনি। বললেন, 'হ্যাঁ, একরকম হয়েই গেছে বলতে পারো, পুরনো উইলে আর আমার দরকার নেই। ওটা তুমি নিয়ে যাও।' উঠে একটা ছোট হাতবাক্স থেকে দুখানা উইল বার করে আনলেন শশীকান্ত। সুতো দিয়ে বাঁধা পুরনো উইল। আর তাঁর প্রস্তুত-করা উইলখানা পাতলা কাগজে মোড়ানো।

পুরনো উইল দয়ালের হাতে দিয়ে বললেন, 'নাও, এটা তুমি নিয়ে যাও। একেবারে পুড়িয়ে ফেলো এটা। দেখো সাবধান।' চশমার পেছনে চোখ দুটো চক চক করে উঠলো তাঁর।

হাত বাড়িয়ে উইলটা নিলে দয়াল। কৃতজ্ঞতার ছাপ তার মুখে।

'আর সামান্য একটু কাজ বাকী শুধু।' নতুন উইলটা কাগজের মোড়ক থেকে খুলে বললেন শশীকান্ত, 'কাগজের

রঙটা আরো পাল্টাতে হবে। ঠিক পুরনো কাগজের মতো দেখানো চাই তো।' আর সবই ঠিক আছে। মিলিয়ে দেখো না।' নতুন উইল দয়ালের সামনে ধরলেন তিনি।

উইলটা নিয়ে তক্তাপোষের উপর বিছালো দয়াল। পাশে মেলে ধরলো পুরনো উইলটা। আশ্চর্য, হুবহু একরকম হস্তাক্ষর—একই রকম স্বাক্ষর। বিষয়বস্তুতে যা তফাৎ —ঠিক যেমনটি চেয়েছিল দয়াল। বিস্মিত-আনন্দে একবার উইলের দিকে আরেকবার শশীকান্তর দিকে তাকালো সে।

'কেমন, ঠিক আছে তো?' তির্যক হাসির ঢেউ খেলছে শশীকান্তর মুখে।

'অদ্ভুত কাজ করেছেন পণ্ডিত মশাই—অদ্ভুত।' উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছে দয়াল।

'হ্যাঁ বাকী কাজটুকু শেষ হলে দেখবে—তখন আরো অদ্ভুত মনে হবে।' নতুন উইলটা তুলে নিয়ে পাতলা কাগজে মোড়াতে লাগলেন শশীকান্ত, 'দুদিন পরেই পেয়ে যাবে এটা। এর মধ্যেই আমার কাজ হয়ে যাবেখন। আর তোমার মামলা সুরু হতেও তো কয়েকদিনই বাকী আছে এখনো।'

'তা আছে পণ্ডিত মশাই। উইলটা আপনি দু'চারদিন পরে দিলেও ক্ষতি নেই। আপনার উপরই তো আমার সব নির্ভর।' কৃতজ্ঞতায় আবার বাহুল্য কথা বলে ফেললে দয়াল।

মহকুমা হাকিমের আদালতে মামলা উঠলো।

কনকও তৈরী ছিল কিছুটা। একজন উকিল ধরিয়েছে সে। কানাই ঘোষও সঙ্গে এসেছে।

কিন্তু যত উকীলই ধরাক কনক দয়ালের চালের কাছে সবকিছু প্রচেষ্টা ভেস্তে যাবে। কোন প্রমাণপত্র নেই কনকের—কোন সাক্ষী-সাবুদ নেই। যে কয়জন গ্রাম্য মোড়লের সামনে উইল করেছিল, এককাড়ি টাকা ঢেলে তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে দয়াল। কনকের প্রস্তুতি তাই সে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না।

'না না সব মিথ্যে কথা—সব মিথ্যে। আমার শ্বশুর উইল করে রেখেছিলেন। সম্পত্তির অর্ধেক অংশীদার আমার স্বামী।' স্থান-কাল ভুলে চীৎকার করে উঠলো কনক হাকিমের দিকে চেয়ে। উকিলকে বলতে না দিয়ে নিজেই উঠে দাঁড়িয়েছে সে।

'কিন্তু কোন প্রমাণ আছে তার? আমি তো উইলে দেখতে পাচ্ছি সম্পত্তি তিনি তাঁর বড় ছেলে দয়াল চক্রবর্তীর নামেই লিখে রেখে গেছেন। ছোটছেলের দুর্ব্যবহারে তিনি তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন—এও লেখা আছে উইলে।' তীক্ষ্ণচোখে কনকের দিকে তাকালেন হাকিম। দয়ালের দেয়া উইলখানা তাঁর হাতে।

'মিথ্যে কথা—মিথ্যে এই উইল। ওই মোড়লদের জিজ্ঞেস করুণ, ওরা সমর্থন করবে আমার কথা।' সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো মোড়লদের দিকে তাকালো কনক।

জিজ্ঞেস করলেন হাকিম। মোড়লরা একবাক্যে কনকের কথার সত্যতা অস্বীকার করলো।

একদিকের বেঞ্চিতে বসেছিল দয়াল। অপাঙ্গে একটা কুটিল দৃষ্টি সে হানলো কনকের দিকে।

'তবু আমি বলছি ও-উইল মিথ্যে।' আবেগকম্প্র-স্বরে বললে কনক। মরিয়া হয়ে উঠেছে সে।

'তার প্রমাণ কি? প্রমাণ দেখাতে পারেন?' উত্তর চাইলেন হাকিম।

'পারি,' দুমিনিট ইতঃস্তত করলো কনক। কানাই ঘোষ আর উকীলের দিকে তাকালো একবার। তারপর বললে, 'আমায় লেখা শ্বশুর মশায়ের পুরো সই-করা কয়েকখানা চিঠি আছে আমার কাছে। চিঠির সইয়ের সঙ্গে এ-উইলের সই মিলিয়ে দেখবেন।'

'আনতে পারেন চিঠিগুলো?'

'হ্যাঁ, পারি, সঙ্গেই এনেছি আমি। এই নিন।' হাকিমের এজলাসের কাছে এসে চিঠি ক'খানা দিলে কনক।

মনোযোগ দিয়ে চিঠি আর উইল দেখতে লাগলেন হাকিম।

সরে এসে আবার কানাই ঘোষের দিকে তাকালো কনক। দেখলো একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ছে কানাই ঘোষ। রুমাল দিয়ে কপাল মুছছে। আর ওদিকে দয়াল তার দলবলদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করছে। চাপা গুঞ্জন ওদিকে।

'মামলার তারিখ আমি পিছিয়ে দিচ্ছি। পনের দিন পর আবার শুনানী বসবে।' মন্তব্য করলেন হাকিম। চিঠিগুলো আর উইলখানা গুছিয়ে নিয়ে ফাইলে বাঁধলেন।

পনের দিন না পুরতেই কিন্তু একটা সংবাদ শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল সবাই।

শশীকান্তর বাড়ী ঘেরাও হয়েছে লাল পাগড়ীতে। সংবাদটা বাতাসের আগে সবার কানে যেয়ে পৌঁছাল। এক

এক করে গ্রামবাসীরা এসে জমায়েত হতে লাগলো শশীকান্তর বাড়ীর কাছে। সবার কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে সংবাদটা। বিস্ময়ের চেয়েও দুর্বার কৌতূহল জেগে উঠেছে সবার।

সত্যি, পুলিসের লোক ঘেরাও করেছে শশীকান্তের বাড়ী।

উইলখানা আর চিঠিগুলো ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন হাকিম। তাঁরা সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন—নিঃসন্দেহে এ-উইল জাল।

দয়ালও নিস্কৃতি পায়নি। তাকেও কিছুক্ষণ আগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সবই শুনলেন শশীকান্ত—দেখলেন সব। ঘরের জিনিসপত্র সব তচনচ করে ফেলছে পুলিস। দরজায়, বাইরে দাওয়ায় কড়া প্রহরী।

হঠাৎ এ-ভাবে পুলিসের আগমনে প্রথমে ভয়ে আর বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধবাক হয়ে গেলেন শশীকান্ত। চারদিকের আকাশ গাছপালা সবকিছু যেন মুছে গেল তাঁর চোখের সামনে থেকে। কয়েক মিনিট বোধহয় সম্বিত ছিল না তাঁর।

আত্মস্থ হলেন পুলিসের কণ্ঠস্বরে, 'আপনার ঘরটা সার্চ করবো আমরা।'

'স্বচ্ছন্দে করুন।' শশীকান্তর গলা থেকে কথাটা বেরিয়ে এলো তখুনি। একপাশে সরে দাঁড়ালেন তিনি।

টের পেলেন শশীকান্ত অচল স্নায়ু-শিরায় এবার উত্তপ্ত প্রবাহ বইছে তাঁর। পরিস্কার দেখতে পাচ্ছেন পরিবেশ। দেখতে পাচ্ছেন সমবেত গ্রামবাসীদের ব্যগ্র কৌতূহল নিয়ে যারা ভিড় করেছে বাড়ীর আঙিনায়। কিন্তু শুধু কি কৌতূহলী তারা? চাপা কোলাহল শোনা যাচ্ছে তাদের। উপহাস আর ঘৃণা ছড়িয়ে দিচ্ছে ইসারা-ইঙ্গিতে। মনে হলো শশীকান্তর অজস্র বিদ্রূপ-শাণিত চোখের তলে একটা ঘৃণিত জীবের মতো দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

'কিছু মনে করবেন না, আপনাকে আমরা গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছি। পরোয়ানা আছে আপনার নামে।' তল্লাসী শেষ করে বললে পুলিসের লোক।

'আমি তো তৈরী হয়েই আছি।' হাসির রেখা ফুটে উঠলো শশীকান্তর মুখে। কোঁচকানো কপাল আর শিথিল চোয়ালে শিহরণ জেগে উঠেছে। একটু থেমে বললেন, 'শুধু একটিমাত্র অনুরোধ আছে আপনাদের কাছে।'

'অনুরোধ? কি বলুন।' তাচ্ছিল্য করলো লোকটি।

'তেমন কিছু নয়। কনকলতাকে একবার আনিয়ে দিতে পারেন? ওর সঙ্গে গোটাকয় কথা আছে আমার। আপনাদের সামনেই বলবো।' অনুনয়ের মতো শোনালো শশীকান্তর কণ্ঠস্বর। আর তাই অস্বাভাবিক।

আপত্তির কোন কারণ দেখলো না পুলিস। কনকলতাকে আনবার জন্যে লোক পাঠালো তারা।

'কি প্রয়োজন আর এই অসৎ উপার্জনে?' সেই প্রশ্নটা শশীকান্তর রন্ধ্রে রন্ধ্রে সহস্রবার দংশন করে উঠলো আবার। প্রয়োজন নেই—কোন প্রয়োজনই ছিল না। এক অতর্কিত মুহূর্তে কনকের মুখের দিকে তাকিয়ে যে প্রশ্ন জেগেছিল সে-প্রশ্নটা কিছুতেই মন থেকে অপসৃত করতে পারেননি শশীকান্ত। নানান ভাবনার মাঝেও কখন কোন সূত্রে কনকের মুখখানা ভেসে ওঠে সামনে। নিজেরই রক্তে গড়া, স্বপ্নে গড়া কেউ একজন ছিল যে হৃদয়ের একটা দিক শূন্য করে দিয়ে চিরদিনের জন্যে চলে গেছে। আর তারই জায়গায়—হৃদয়ের সেই শূন্য প্রান্ত-সীমায় ধীরে ধীরে কখন নেমে এসেছে আরেক জন। স্নিগ্ধতা-নম্রতার মূর্তিমতী কনকলতা। কেন এমন হয়? কেন এমন বিহ্বল হয়ে পড়েন তিনি?

হঠাৎ ক্ষুব্ধ হিংস্রতায় জ্বলে উঠলেন শশীকান্ত। লম্পট লালসা-কাতর জোতদার কানাই ঘোষ। কেন সে কনকের পিছু নিয়েছে তা কি জানেন না তিনি? অপরিণত-বুদ্ধি কনক বুঝতে পারছে না সেই লম্পটটার অভিসন্ধি। এ-সম্বন্ধে যে কনককে অবহিত না করলেই নয়—না বলে থাকতে পারছেন না শশীকান্ত।

কিন্তু কোথায় কনক? এতক্ষণ লাগছে কেন আসতে ওর?

ভিড় ঠেলে কখন কনক সামনে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল ছিল না শশীকান্তর। শিশুটিকে কোলে নিয়েই এসেছে কনক। হঠাৎ নজরে পড়তেই দু' পা এগিয়ে গেলেন তিনি। নিস্পলক তাকিয়ে রইলেন।

কয়েক মিনিট কেটে গেল। তবু কোন কথা বলছেন না শশীকান্ত।

'হ্যাঁ, আমি এসেছি। আপনি না ডাকলেও আসতাম। দেখে যেতাম, আজীবন যে ভণ্ডামির মুখোস পরেছিলেন তা খসে পড়েছে কিনা।' কনকই কথা বললে প্রথম। পুঞ্জিভূত ঘৃণায় লাল হয়ে উঠেছে তার চোখ-মুখ।

কথা নেই তবু শশীকান্তর। পাথরে খোদাই একখানা মুখ। কিন্তু কঠিন-অচঞ্চল বলয়রেখা নেই আর মুখে। চোখে নেই শাণিত ফলকের দৃষ্টি।

'দেখে গেলাম। আপনার সঙ্গে আর কোন কথা বলবার প্রবৃত্তি নেই আমার।' শশীকান্তর মুখের ওপর কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে ফিরে দাঁড়ালো কনক। এক মুহূর্ত দাঁড়ালো না। ভিড়ের মাঝে পথ কেটে বেরিয়ে গেল।

'যেও না মা, একটা কথা শুনে যাও।' হঠাৎ ডেকে উঠলেন শশীকান্ত। বিকৃত ভগ্ন কণ্ঠধ্বনি। আর সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি নিজেরই কানে ফিরে এলো শুধু—নিজেকেই ব্যঙ্গ করলো যেন।

অর্থহীন কর্তব্য

পরিমল গোস্বামী

কয়েক বছর আগে একজন ব্যবসায়ীকে জানতাম, তিনি প্রতিদিন সকালে ধর্মের ষাঁড়কে কয়েক পয়সার জিলিপি খাওয়াতেন। তাঁর ব্যবসা ছিল বিদেশী গুঁড়ো দুধের। গো-জাতির প্রতি তাঁর কর্তব্যের এটি একটি দৃষ্টান্ত।

একবার শিয়ালদা স্টেশন থেকে দিল্লী এক্সপ্রেসে বাইরে যাচ্ছিলাম। আমার সহযাত্রীদের মধ্যে এক অপরিচিত যুবক ছিলেন। তিনি পকেট খুঁজে একটি আনি বের করে আমার কাছ থেকে সেটি ভাঙিয়ে নিলেন, এবং নেবার সময় বললেন—গঙ্গার পুল পার হবার সময় একটি পয়সা গঙ্গায় ফেলতে হবে।

প্রশ্ন করে জানলাম, গঙ্গাকে তিনি বড়ই মান্য করেন, তাই যতবার গঙ্গা পার হন, পুলের উপর থেকে একটি করে পয়সা ছুঁড়ে দেন জলে। আমি যুক্তি দিয়ে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, পয়সাটা গঙ্গায় না দিয়ে কোনো মানুষকে দিলেও পুণ্য হত। তিনি অবশেষে স্বীকার করলেন কথাটা, হয় তো ট্রেন ততক্ষণে দক্ষিণেশ্বরের কাছাকাছি এসে পড়েছে বলেই। লক্ষ্য করলাম গঙ্গা পার হবার সময় আমাকে আড়াল করে কর্তব্য কাজটি তিনি সমাধাই করলেন।

স্কুলের ছেলে পরীক্ষায় রচনা লিখছে 'ছাত্রের কর্তব্য'। ছাত্র বা শিষ্য হিসাবে আরুণির নিষ্ঠা, ক্ষেতে জলের গতি রোধের জন্যে জীবন বিপন্ন করে শুয়ে থাকার কথা লিখছে। প্রকৃত শিক্ষা পেতে হলে গুরুর প্রতি এইরকম নিষ্ঠা থাকা উচিত তা খুব ফলাও করে লিখছে। লিখছে ছাত্র জীবনের সততার কথা। কিন্তু লিখছে বই থেকে টুকে। মরীয়া হয়ে এসেছে সে। না টুকে লিখলে পাস করতে পারবে না, যদি কেউ বাধা দেয় তাকে উচিত শিক্ষা দেবে সে জন্যেও সে প্রস্তুত আছে।

তিনটি কর্তব্যের দৃষ্টান্ত দিলাম। অর্থাৎ কর্তব্যের ছদ্মবেশের দৃষ্টান্ত। লক্ষ্য ভুলে শুধু যান্ত্রিক নিয়মে কাজ করে যাওয়া। এই কর্তব্যের দুটি পরকালের পুণ্যের জন্যে, একটি ইহলোকের সুবিধার জন্যে। আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেত কিন্তু দরকার নেই।

কর্তব্য অর্থে যা করণীয় বা করা উচিত। মূল লক্ষ্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক। এই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে শুধু কর্তব্য করে যাওয়া অনেক সময়েই ক্ষতিকর। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সে জন্যে অনেকগুলো কর্তব্যের চেহারারও পরিবর্তন হওয়া দরকার। কিন্তু মানুষের মনে সব সময় সে সাহস জাগে না। মনে হয় মানুষের মনের মধ্যেই এমন একটা ধর্ম বাসা বেঁধেছে যে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও তার অভ্যাসটা সে ছাড়তে পারে না—বিশেষ করে অভ্যাসটা যদি প্রাচীন হয়। মানুষ হিসাবে আমাদের যতগুলো কর্তব্য আছে তা মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়। সামাজিক কর্তব্য এবং পারিবারিক বা ব্যক্তিগত কর্তব্য। ব্যক্তিগতভাবে নিজের সুখ-সুবিধার জন্যে যা করণীয় তা মানুষ সবসময়েই প্রায় নিজের জ্ঞান বিশ্বাস বা বুদ্ধির পথে করে। তাই এই কর্তব্য সময়ের দাবী অনুযায়ী লোকে সহজেই পরিবর্তন করে থাকে; তার উপরে সমাজের হাত খুব থাকে না। কিন্তু মানুষের আর একটি সম্পর্ক হচ্ছে সমাজের সঙ্গে। এইখানে যে কর্তব্য, তার সঙ্গে সবার জ্ঞান বুদ্ধি বা ইচ্ছার যোগ সব সময় থাকে না। তার কারণ যখন সামাজিক শাসন বিধি রচিত হয়েছিল তখন আপামর জনসাধারণকে তা পালনে প্রবৃত্ত করা হয়েছিল পুণ্যের লোভ দেখিয়ে। এটা নিশ্চয় তখনকার দিনে দরকার ছিল। ভুলও হয়েছিল এইখানে। এই জাতীয় বিধানে মানুষের

বুদ্ধি বিবেচনার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়; ফলে কর্তব্যটা অন্ধ অভ্যাসে পরিণত না হয়ে পারে না। সকল সমাজেরই প্রায় এই একই ইতিহাস। মানুষ যে বহুদিনের অভ্যাস ছাড়তে পারে না, ভয় পায়, এটা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। প্রকৃতিরই এটি একটি নিয়ম। প্রকৃতি এত সাবধান যে সে নিজেও বহুক্ষেত্রে অন্ধভাবে কর্তব্য পালন করে যায়। যখন কোনো অবাঞ্ছিত জিনিস আমাদের দেহকে আশ্রয় করে, তখন দেহ প্রাণপণে তাকে তাড়াতে চেষ্টা করে। এই বিতাড়ন ক্রিয়ার ফলে অবাঞ্ছিত জিনিসটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও অনেক সময় বিতাড়ন ক্রিয়াটি চলতে থাকে। যেমন কলেরা বীজাণু। কলেরার যে সব লক্ষণ, তা হচ্ছে ঐ বীজাণু বিতাড়নের ক্রিয়ার লক্ষণ। কলেরা-বীজাণুর ক্রিয়া আরম্ভ হতেই দেহ তার কর্তব্য আরম্ভ করল উন্মাদের মতো। ফলে বীজাণু-বিষ সম্পূর্ণ ধুয়ে বেরিয়ে গেল, কিন্তু দৈহিক ক্রিয়া চলতেই থাকল। আর দরকার নেই, তবু চলছে বিতাড়ন ক্রিয়া। এবং সম্পূর্ণ দোষ-মুক্ত রোগী তারই ফলে শেষ পর্যন্ত মারা পড়ে। এরকম ক্রিয়াকে ইংরেজীতে বলা হয় reflex ক্রিয়া। অনভ্যস্ত নাকে এক কণা নস্যি ঢুকলে; নাক হাঁচির সাহায্যে তা বের করে দেবার চেষ্টা করে—হয় তো দুতিনটি হাঁচিতেই নস্যের চিহ্নও থাকে না নাকে, কিন্তু সাবধানী নাক তা শোনে না, সে ক্রমাগত হাঁচতে থাকে। মূল কারণ দূরীভূত, কিন্তু অভ্যাসটা চলছে। এই ধর্মই ঢুকেছে আমাদের মনে।

উদ্দেশ্য ও অর্থ-ভুলে-যাওয়া কর্তব্য যে আমাদের কত করতে হয় তা যে কোনো পাঁজি খুললেই দেখা যাবে। প্রতি পদক্ষেপে নানা বিধিনিষেধ। কিন্তু কেন তা জানি না। যদি প্রশ্ন করি আজ একটা-ছাব্বিশ গতে কেন যাত্রা নাস্তি? এর জটিল উত্তর পাওয়া যায়, কিন্তু সদুত্তর পাওয়া যায় না। বর্তমান সময়ে যখন লোকের জীবন-দর্শন বদলে গেছে, সকল মানুষ প্রায় ঘর ছাড়া হয়েছে, যখন তখন বিদেশ যাত্রা করতে হচ্ছে, তখন পাঁজির 'যাত্রা নাস্তি' সবার পক্ষে মানা সম্ভব নয়, মানেও না অধিকাংশ লোকে। হয় তো পাঁজিই দেখে না। পাঁজি দেখে চললে বর্তমান জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এইটি কল্পনা করেই রবীন্দ্রনাথ প্রায় বাল্যকাল থেকে এ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে আসছেন। ছোট ছোট বিধি-নিষেধের ডোরে আমরা যেন বাঁধা না পড়ি এ প্রার্থনা জানিয়েছেন তিনি। 'সারবান সাহিত্য' নামক ব্যঙ্গ নাটিকার ইঙ্গিতও অতি স্পষ্ট। 'অচলায়তন' নাটকেও এই ইঙ্গিত। সারবান সাহিত্যের দ্বিতীয় অঙ্কের নির্দেশে আছে—"বক্ষ্যমান অঙ্কে পার্বতী মধুর সম্ভাষণে মহেশ্বরের নিকট হইতে বর্ষফল জানিয়া লইতেছেন।...... অবশেষে আয়কেশ ফল, কুড়বেশ ফল এবং গোটিকাপাত ফল নামক সুখশ্রাব্য প্রসঙ্গে এই অঙ্কের সমাপ্তি।" পরবর্তী দু অঙ্কে "বারবেলা, কালবেলা, পরিখযোগ, বিষ্কম্ভযোগ, অসৃকযোগ, বিষ্টি ভদ্রা, মহাদগ্ধা...ববকরণ, বালবকরণ, তৈতিল করণ, কিস্তুঘ্নকরণ, ঘাতচন্দ্র, তারা প্রতিকার, গোচর ফল প্রভৃতির বর্ণনা আছে।"

বর্তমানে—অর্থহীন করনীয় বা কর্তব্যের এমন তালিকা, তবু তা এটি সংক্ষিপ্ত। এ সবের অধিকাংশই আমাদের জীবনকে পঙ্গু করে রেখেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। পূর্বের তিনটি আধুনিক দৃষ্টান্ত আবার স্মরণ করছি। গো-সেবা কর্তব্য। তার উদ্দেশ্য ছিল গো-জাতির উন্নতি। কিন্তু এই শিক্ষা সাধারণ লোকের জীবনের অঙ্গীভূত হতে পারেনি, তাই এখন কেউ বিশেষ গোরুকে প্রণাম করেই কর্তব্য করছে, কেউ ধর্মের ষাঁড়কে দু পয়সার জিলিপি খাওয়াচ্ছে। জিলিপি খাওয়ালে যে ধর্মের ষাঁড়ের উপকার হয় না, এমন নয়; কিন্তু প্রণাম নিবেদনই হোক বা জিলিপি খাওয়ানই হোক—ও দুটিই তো অর্থহীন কর্তব্য পালন। গঙ্গার প্রতি ভক্তিবশতঃ যে গঙ্গায় পয়সা ফেলে, তার জানা উচিত যে সচল গঙ্গার চেয়ে সেই পয়সাটি অচল কোনো মানুষকে দিলে বেশি কাজ হয়, হয় তো পুণ্যও বেশি হয়। যে ছেলে পরীক্ষায় বই টুকে লেখে তাকে হয় তো এ জন্যে সমর্থন করা চলে যে সে ছাত্র-ধর্মকে কালোপযোগী করার চেষ্টা করছে, এবং হিংসার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ছাত্র-ধর্মকে ক্ষাত্র-ধর্মে রূপান্তরিত করতে চাচ্ছে। কিন্তু ভুল হচ্ছে গোড়ায়। অর্থাৎ যেখানে ব্যক্তিগত কর্তব্য-কাজে ব্যক্তিগত রুচিতে কেউ আপত্তি করে না, সেখানে সে সমস্ত ছাত্র সমাজের কর্তব্যে ব্যক্তিগত রুচি প্রকাশ করছে।

এইভাবেই চলে আসছে অর্থহীন কর্তব্যের অভ্যাস। কালের সঙ্গে আপনা থেকেই কতকগুলো বিলীন হচ্ছে বটে, কিন্তু নতুন করে অনেক convention বা প্রথার সৃষ্টি হচ্ছে। উপায় নেই কোনো দিকেই।

মিলিওনিয়ার

নিখিল সেন

হল-ঘরের বড় দেয়াল-ঘড়িটাতে দশটা বাজিল।

নিত্য অভ্যাস মত মিলিওনিয়ার সার সোমেশ্বর প্রসাদ আপনার চটি জোড়াটি পরিয়া লইলেন। কাল বুঝি কয়েক মিনিট দেরী হইয়া গিয়াছিল। আজিও তার পুনরাবৃত্তি হইতে চলিলে আপিসের ডিসিপ্লিন বজায় থাকে না। তিনি হইলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। শত শত কর্মচারী তাঁহার অধীনে কাজ করিতেছে। তাঁহাকেই সকলে অনুসরণ করিবে। সময়-নিষ্ঠ না হইয়া তিনি পারেন না। খবরের কাগজের প্রভাতী সংস্করণগুলো তিনি টেবিলের উপর ছুড়িয়া দিয়া উঠিয়া পড়িলেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই তাঁহার মনে পড়িলঃ আজ তো আর আপিস নাই! আপিসের সকল কর্মভার তিনি কাল বুঝাইয়া দিয়াছেন মিষ্টার সান্যালকে!

সার সোমেশ্বর প্রসাদ যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। জীবনে বুঝি এই প্রথম অবসর মিলিল। আজ তাঁহার নিজেকে ভার-মুক্ত মনে হইল। তিনি আজ স্বাধীন। কর্তব্যের অবহেলার জন্য কোন কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না আপনার বিবেকের নিকট। হেড্ আপিসে তাঁহাকে আর আপনার চেম্বারে যাইতে হইবে না। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আপন মনে কাজ করিয়া যাইতে হইবে না। কাজের ভিড়ে এতদিন তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন নিজেকে। দিবারাত্রি কেবল খাটিয়া আসিয়াছেন যন্ত্রের মত। যন্ত্রও বিগড়াইয়া যায় মাঝে মাঝে। কিন্তু সার সোমেশ্বর প্রসাদ বিগড়ান নাই। কোনদিন অসুখ-বিসুখ হইয়াছে কিনা তাঁহার মনে পড়ে না। খালি একবারই বুঝি নিজের চেম্বারে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। জেনারেল বডি মিটিং ছিল সেদিন। সারাদিন গিয়াছে কঠোর মানসিক পরিশ্রম। ব্লাড্-প্রেসারটা তাই বাড়িয়া গিয়াছিল। ডাক্তারদের অনুরোধে তাঁহাকে তখন বিশ্রাম নিতে হইয়াছিল দিন কয়েকের জন্য।......

আজ মনে পড়িলঃ মাত্র কুড়ি বৎসরের অপরিণত বয়সে তিনি নামিয়াছিলেন এই ব্যবসাক্ষেত্রে।......

সে আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। কাপড়ের একমাত্র পুঁটলিটা বগলে করিয়া তিনি তাঁহাদের গাঁ ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন। বিধবা দিদি, অবিবাহিত বোন আর মায়ের নীরব অশ্রু তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল অহর্নিশ। সোমেশ্বর প্রসাদকে তাই পড়া স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল এন্‌ট্রান্স ক্লাশেই। অর্থ-সন্ধানে বাহির হইতে হইয়াছে।

কলিকাতায় প্রথম আসিবার সময় পাড়ার কেষ্ট খুড়ো তাঁহাকে একখানি পরিচয়পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন যাত্রামোহনবাবুর নিকট। যাত্রামোহনবাবু তখন মেসার্স্ ম্যাকেঞ্জি কোম্পানির বড়বাবু। তাঁহাদের গাঁয়েরই লোক। কিন্তু তিনি তাঁহাকে কোন সুবিধা করিয়া দেন নাই চাকরীর। শুধু বড় বড় উপদেশ্ শুনাইয়াছিলেন। কমমুখর মহানগরীর অগণিত জনতার মধ্যে আপনার বলিতে তখন কেহই ছিল না সোমেশ্বর প্রসাদের। কলিকাতায় আসিবার সময় কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া দেওয়া মায়ের শেষ-সম্বল টাকা কয়টাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। দুর্যোগময়ী তখনকার সেই রাত্রির কথা মনে পড়িলে সার সোমেশ্বর প্রসাদের চোখ দিয়া এখনও তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়ে।... সেই কোন সকালে পাইস-হোটেল হইতে চারিটা ভাত নাকে মুখে গুঁজিয়া আসিতেন। ক্ষুধিত একদল নেকড়ে বাঘ বুঝি পেটের নাড়িভুঁড়ি সব টানিয়া টানিয়া খাইতে সুরু করিত। অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি লালদীঘির বেঞ্চির উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িতেন। চোখে নামিয়া আসিত হতাশার নিবিড় অন্ধকার।......

সার সোমেশ্বর প্রসাদ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরের মধ্যে তিনি পায়চারী করিতে লাগিলেন। এটা তাঁহার স্টাডি ঘর। বাহিরের শত কর্মমুখরতার ফাঁকেও তিনি এই ঘরের চারিটা দেয়ালের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে ভালবাসেন। এ-ঘরে তিনি বিশ্রাম দেন শরীরের; পুষ্টি সাধন করেন মনের। ঘরটার মেঝেতে পুরু কাশ্মীরী কার্পেট পাতা আর চারিটা দেয়ালে বই সাজান সারি সারি। পৃথিবীতে জন্মিয়া অবধি সার সোমেশ্বর প্রসাদ শুধু চিনিয়াছেন টাকা। রৌপ্যের এই চক্‌চকে চাকতিগুলি ছাড়া তিনি বুঝি আর জানেন না কিছুই। জীবনে তাঁহার একমাত্র কাম্য এই রজতখণ্ডগুলি সংগ্রহ করা। সুখ বল, স্বাচ্ছন্দ্য বল, শান্তি বল—নাম, যশ সকল কিছুই তোমার মিলিবে ঐ রৌপ্যমুদ্রাগুলির বিনি-

মেয়ে। তাই যে সকল মণীষী ঐ রজতখণ্ডের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন, সে সব দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সার সোমেশ্বর প্রসাদ মহামূল্যে ক্রয় করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন তাঁহার বিরাট লাইব্রেরী ঘরে।

কাঁচের আলমারীতে সাজান বইগুলির উপর অন্যমনস্ক ভাবে চোখ বুলাইয়া যাইতে যাইতে সোমেশ্বর প্রসাদ এক জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। এখানে বই নাই, আছে এনলার্জ করা একখানা বড় ফটোগ্রাফ। রিমলেশ চশমাখানা তিনি নাকের উপর বসাইয়া লইলেন। হ্যাঁ, তাঁহারই ফটো। টাউন হ'লের এক বিরাট জন-সভায় নাগরিকেরা মানপত্রদ্বারা অভিনন্দন জানাইতেছেন নিজেদের প্রধান নাগরিককে।

মিলিওনিয়ার পাশ কাটিয়া গেলেন। জীবনে তিনি নাম-যশ প্রচুর পাইয়াছেন। রাস্তার সামান্য হকাররূপে তিনি প্রথম কর্ম-জীবন শুরু করেন। সৌভাগ্য-লক্ষ্মী যাহার প্রতি একবার সুপ্রসন্ন হইয়াছেন তাহাকে ঐশ্বর্যান্বিত করিয়া যান সকল দিক দিয়া। তাঁহার আগাগোড়া জীবনের কথা ভাবিয়া তিনি নিজেও অবাক হইয়া যান। রীতিমত এ যেন একখানা উপন্যাস। একটি লোক স্বীয় আত্ম-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া জীবনে কী-ই না করিয়া গেল! কর্মবীর সার সোমেশ্বর প্রসাদ ঠিক করিলেন, তিনি তাঁহার আত্ম-চরিত লিখিয়া যাইবেন।

এমন সময় পুরু পর্দা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল কায়দা-দুরস্ত একটি যুবক। সার সোমেশ্বর প্রসাদ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

'কিছু বলবে, সেন?'

সুশান্ত তাঁহার সেক্রেটারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-করা ছাত্র। 'ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট' ইকনমিক্স-এর। সুশান্ত ছাড়াও তাঁহার সেক্রেটারী আছে আরও জনা দুই। রয় স্টিনোগ্রাফার। পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি এখন দলীয় রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। প্রাদেশিক মন্ত্রি-সভার তিনি একজন ভারী পায়া। মন্ত্রি-সভার টেকা-না-টেকা তাঁহারই মর্জির উপর নির্ভর করে বহুলাংশে। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রগুলি দেশের জনমত বিভ্রান্ত করিতে, দলে টানিতে সাহায্য করে অনেকখানি। স্টিনো না হইলেও তাঁহার চলে না এক মুহূর্ত।

সুশান্ত কহিলঃ

'সার এখন কি একটু সময় করতে পারবেন? মিস্টার চক্রবর্তী এসেছেনঃ আজ তাঁর আসার কথা ছিল।'

সার সোমেশ্বর প্রসাদ মুখ তুলিয়া চাহিয়া রহিলেন। মিস্টার চক্রবর্তীকে তাঁহার মনে করিয়া রাখিবার কথা নয়; তাহা সম্ভবও নয় তাঁহার পক্ষে। সুশান্ত আবার কহিলঃ 'আমাদের 'গুড উইল' নিয়ে মিস্টার চক্রবর্তী একটা ব্রাঞ্চ খুলতে চান জলপাইগুড়ীতে। আপনার সঙ্গে তাই একটু—।'

সার সোমেশ্বর প্রসাদ তাঁহার স্প্রিং-এর চেয়ারে হেলান দিয়া বসিলেন। হাত দুটি সোজা প্রসারিত করিয়া টেবিলের কিনারায় রাখিলেন। কহিলেনঃ

'আজ ও'কে যেতে বলো, সেন। একটু যেন ক্লান্তি বোধ করছি। পরে ও'কে জানাবো'খন।'

কথাটা যেন সুশান্তর বিশ্বাস হইল না। সে মুখ তুলিয়া তাকাইল। সার সোমেশ্বর প্রসাদকে সে জানে অনেক দিন হইতে। কিন্তু কর্তব্যে গাফিলতি করিতে দেখিলেন বুঝি এই প্রথম। কহিলঃ

'হ্যাঁ সার, ও'কে এখন যেতে বলি।'

সুশান্ত কয়েক পা গিয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল, একটু থামিয়া কহিলঃ

'রয়কে একবার পাঠিয়ে দেবো সার? প্রেসের স্টেট্‌মেণ্টটা ওবেলা আবার নিতে আসবে।'

সোমেশ্বর প্রসাদ টেবিলের উপর আঙুলের গোটা-কয়েক মৃদু টোকা মারিলেন। কহিলেনঃ

'না। তোমরা যা' হোক একটা কিছু পাঠিয়ে দিও। পঁয়ত্রিশ বছর তো খেটে এলাম একটানা, আর কেনো? আমাকে এবার ছুটি দাও সেন, ছুটি দাও একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।'

কর্মমুখর জীবনের দীর্ঘ পথক্লান্তিতে সার সোমেশ্বর প্রসাদ আজ যেন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তাই আজ জীবনের উপান্তে পৌঁছিয়া একটু বুঝি অবসর খুঁজিতেছেন।

কিন্তু সার সোমেশ্বর প্রসাদের জীবনে ছুটি কোথায়? অবসর গ্রহণ করিয়াও নিষ্কৃতি নাই। সারা জীবনই তিনি কেবল একটানা কাজ করিয়া আসিলেন। দীর্ঘ ঋজু দেহ তাঁহার সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। মাথার শুভ্র কেশ বিরল হইয়া আসিয়াছে। জীবনের দিনগুলি সব একে একে কখন ঝরিয়া গেল, তিনি টেরও পাইলেন না। শুধু কাজ—একটানা শুধু কাজ ছাড়া তাঁহার অভিধানে বুঝি লেখা নাই আর কিছু।.........

ছবির মত সেদিনের কথাটা আজ তাঁহার মনে পড়ে। ঘোরতর অমন সমস্যার সম্মুখীন তিনি বুঝি জীবনে আর কোনদিন হন নাই। সোমেশ্বর প্রসাদ তখন ধীরেন বাবু-

দের বাড়িতে থাকিতেন। ধীরেনবাবুর ছোট ছেলেটাকে পড়াইতেন। তাঁহার ঘরখানি ছিল বাহিরের দিকে। পিছনে খানিকটা জায়গা জুড়িয়া একখণ্ড বাগান। তারপর শুরু হইয়াছে অন্দরমহল। একদিন সকালে শম্ভুকে খানকয়েক আঁক কশিতে দিয়া তিনি নিজে মাতিয়া গিয়াছিলেন অর্থনীতি শাস্ত্রের জটিল তত্ত্বে। এক সময় তাঁহার মনে হইল ঃ ছাত্র আঁক না কষিয়া কার সঙ্গে যেন গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। তিনি মুখ তুলিয়া দেখিলেন। অনুমান তাঁহার মিথ্যা নয়। আঠার কি উনিশ বছরের একটি মেয়ে বাগানে দাঁড়াইয়া কি যেন বলিতেছে শম্ভুকে। ধরা পড়ায় মেয়েটা চলিয়া গেল অপ্রতিভ হইয়া।

এ বাড়ির অনেককে তিনি অবশ্য চিনেন না। কিন্তু এই মেয়েটাকে পূর্বে কখনও দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। জিজ্ঞাসা করিলেনঃ

'কে রে, শম্ভু?'

'সান্ত্ব মাসী, মাষ্টার মশাই। মা ডাকেন পাগলী। হাজারীবাগ থেকে বেড়াতে এসেছে।'

এর পর আর অধিক কৌতূহল দেখান শোভা পায় না। তিনি আপন পড়ায় মন দিলেন। শম্ভুও আপন মনে আঁক কষিতে লাগিল। এক সময় সে হঠাৎ প্রশ্ন করিল ঃ

'আচ্ছা মাস্টার মশাই, রবি ঠাকুরের "শেষের কবিতা" বইখানা কবিতার বই না? জানেন, সেদিন সান্ত্ব মাসী আমার সঙ্গে কি তর্কই না জুড়ে দিলে। বললেঃ তুই কিচ্ছু জানিস না। আচ্ছা বলুন তো, গল্পের বইয়ের কি অমন নাম হয় কখন?'

তিনি মহা বিপদে পড়িলেন। জীবনে এরূপ অপ্রস্তুত বুঝি কখনও হন নাই। রবি ঠাকুর? হ্যাঁ, তিনি নাম শুনিয়াছেন বই কি রবি ঠাকুরের। উনিশ শ' তেরো সালে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন ইংরেজী কবিতা লিখিয়া। রবি ঠাকুরের কবিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৌলতে ছাড়া পড়িবার তাঁহার আর অবসর কোথায়? ছাত্রের হইয়া তিনি রায় দিলেনঃ

'হ্যাঁ। উনি কিছু জানেন না, তাই।'

শম্ভু খুশী হইল। কহিলঃ

'জানেন মাস্টার মশাই, সেদিন দুপুরে সান্ত্ব মাসী আপনার ঘরে ঢুকে বইপত্রগুলো সব ঘাঁটছিল। বললে কি জানেন মাস্টার মশাই, বললে তোর মাস্টারটা একটা ইয়ে—একখানাও কবিতার বই নেই টেবিলে।'

তিনি মৃদু একটু হাসিলেন। একে তো বাঙালী জাতটার ভাবপ্রবণ বলিয়া দুর্নাম আছে বাজারে। তার উপর ভাবালুতা করিবার তাঁহার অবসর কোথায়? ছাত্রকে তিনি ধমকাইয়া কহিলেনঃ

'হ্যাঁ হয়েছে, এখন আঁক কষো তো দেখি।'

তারপর কিছুদিন গিয়াছে। বহু রাত জাগিয়া তাঁহাকে প্রত্যহ ব্যাঙ্কের অসম্পূর্ণ কাজ করিয়া যাইতে হইত। সেদিনও তিনি আপন মনে 'ডেবিটে'র হিসাব মিলাইয়া যাইতেছিলেন। বাহিরে তখন শ্রাবণের বর্ষণমুখর আকাশ হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ঝরিতেছে। ঝড়ের দাপটে ঘরের একখানা কপাট বুঝি খুলিয়া গিয়াছিল। খোলা দরজা দিয়া আলোর একটা ক্ষীণ রেখা সমান্তরালভাবে আসিয়া পড়িয়াছিল বাগানে। মুখ তুলিয়া তিনি আশ্চর্য হইয়া গেলেন। দেখিলেন, একখানা নীল শাড়ি পরিয়া নিঃশব্দে চৌকাটের উপর দাঁড়াইয়া আছে সান্ত্বনা। কালো চোখ দুটিতে তাহার এক বিহ্বল অপ্রকৃতস্থ দৃষ্টি। সে তাঁহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিলঃ

'এসো।'

সোমেশ্বর প্রসাদের কেমন বাঁধা লাগিল। নিজের চোখকে তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। দুহাতে তিনি চোখ দুটি একবার কচলাইয়া লইলেন। না, সান্ত্বনাই। আর একদিনের কথা তাহার মনে পড়িল, সেদিন দুপুরে তাঁহাকে কেন যেন বাড়ি ফিরিতে হইয়াছিল—হ্যাঁ, 'ক্রেডিট্ বুকের' খাতাখানা তিনি টেবিলের উপর ভুলে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া তিনি আশ্চর্য হইয়া গেলেন। টেবিলের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে সান্ত্বনা আর আপন মনে তাঁহার খাতাপত্তরগুলির মধ্যে দুর্লভ কি যেন খুঁজিয়া মরিতেছে। ধরা পড়িয়া কি যেন একটা কৈফিয়ৎ দিয়া মহা অপরাধীর মত বাহির হইয়া গিয়াছিল সান্ত্বনা।......

সোমেশ্বর প্রসাদ চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেনঃ

'কোথায় যাবো?'

'চল বেড়িয়ে আসি বাগানে। দেখছো না, কেমন বৃষ্টি পড়ছে ঝুপ ঝুপ করে? ঘরে বসে থাকতে আর ইচ্ছে হোল না।'

হো হো করিয়া তিনি হাসিয়া উঠিয়াছিলেন তখন।

'আচ্ছা পাগল! এতো রাত্রে জলে ভিজলে নিমোনিয়া হ'বে নির্ঘাৎ।'

'হোক গে নিমোনিয়া।'

সে একটা ঝাঁকুনি দিল হাতে। তারপর তাঁহারা দুজনে বাগানে গিয়া বসিল পাশাপাশি। কথা কহিয়া রাত্রির মৌন নীরবতা ভাঙিতে কাহারও বুঝি সাহস হইল না।

পরের দিনও তিনি আশা করিয়াছিলেন, সান্ত্বনা আজ রাত্রেও আসিবে। পাশাপাশি দুজনে গিয়া বকুল গাছটার নীচে বসিবেন। দরজাটা তাই তিনি খোলা রাখিলেন। কিন্তু সান্ত্বনা আসিল না। পরের দিনও কাটিল ব্যর্থ প্রতীক্ষায়। টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া তিনি সেদিন বুঝি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। শাড়ির খসখস শব্দে জাগিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, সতর্ক পা ফেলিয়া সে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। আলোটা নিবাইয়া দিল সে এক সময়। ফিসফিস করিয়া কহিলঃ

'চুপ, কথা কয়ো না।'

তারপর সে তাহার একান্ত সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার বুকে সান্ত্বনার তপ্ত নিঃশ্বাসের ঝড় বহিতে লাগিল।

'জানো, দিদি সব টের পেয়েছে সেদিন।'

সে একটু থামিল। সোমেশ্বর প্রসাদের কাঁধের উপর বুঝি হাত দুটি রাখিতে যাইতেছিল। পরমুহূর্তে আবার কি মনে করিয়া টানিয়া লইল। কহিলঃ

'চল, এখান থেকে আমরা পালিয়ে যাই, হাজারীবাগে তো কেউ আমাদের কিছু বলতে আসবে না।'

তিনি কি জবাব দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। তাঁহার চাকরীর কি হইবে? নতুন চাকরীর? কহিলেনঃ

'আমার চাকরীর যে—।'

'তোমার আবার চাকরীর কি দরকার? বাবার কী টাকার অভাব?'

সোমেশ্বর প্রসাদ উভয় সংকটে পড়িলেন। একদিকে সান্ত্বনা—তাহার ভরা যৌবন, বাপের দেদার টাকা আর অপর দিকে—তাঁহার অটুট আত্ম-বিশ্বাস, ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন! কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে চাহিবেন? সান্ত্বনা না চাকরী? না, চাকরীই। সান্ত্বনাকে তাঁহার ছলনাময়ী বলিয়া মনে হইল। উন্নতির সোপান হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে আসিয়াছে, আসিয়াছে ভুলাইতে। তিনি এক পা পিছু হটিয়া আসিলেন। কহিলেনঃ

'না, তা হয় না সান্ত্বনা।'

সান্ত্বনা ইহা প্রত্যাশা করে নাই। সে স্তব্ধ হইয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

হাত বাড়াইয়া তিনি আলো জ্বালিলেন। যাক, বাঁচা গেল; চলিয়া গিয়াছে সান্ত্বনা। কিন্তু একটু পরেই সে আবার ফিরিয়া আসিল। অবাক হইয়া তিনি তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। মাথার খোঁপাটা সে চূর্ণ করিয়া ভাঙিয়া দিয়াছে মুখের উপর। ঘন কেশারণ্যে মুখখানা তাহার ঢাকিয়া গিয়াছে একাকার হইয়া। মুখের উপর হইতে চুলগুলি বুঝি তিনি সরাইয়া দিতে গিয়াছিলেন। সান্ত্বনা বাধা দিল।

'না-না, অবগুণ্ঠন তুমি আমার খুলো না, আমার আর মুখ দেখো না।' একটু থামিয়া সে আবার কহিলঃ 'যা হবার নয়, তার উপর আমি আর জোর দিতে চাই না।'

হাতের আংটিটা খুলিয়া সে তখন তাঁহার আঙুলে পরাইয়া দিয়াছে। তারপর যেমন করিয়া আসিয়াছিল তেমনি করিয়া নিঃশব্দে আবার চলিয়া গিয়াছে।

অসুবিধার অজুহাত দেখাইয়া তিনি তারপর দিনই চলিয়া আসিয়াছিলেন ধীরেনবাবুদের বাড়ি হইতে। তারপর তাঁহার পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহু পাণি-প্রার্থিণীর অভিভাবক ভীড় করিয়াছেন তাঁহার দ্বারে আসিয়া। বিদায় দিয়াছেন তিনি সকলকে। বিবাহ করিবার তাঁহার আর সময়ই হয় নাই।......

এই কি মানুষের জীবন? জীবনের অর্থ কি কেবল একটানা কাজ করিয়া যাওয়া? এতদিন যাহা হউক কাজকে অবলম্বন করিয়া কাটিল, এখন তাঁহার অবসর সময় কাটে কি করিয়া? শুধু টাকা—শুধু টাকা লইয়া তিনি কি করিবেন? লোকে কি কেবল টাকার জন্য টাকা উপার্জন করিয়া থাকে? তাঁহার এই বিপুল ঐশ্বর্য—অগাধ টাকা এখন ভোগ করিবে কে?......

ঘরে পায়চারী করিতে করিতে সার সোমেশ্বর প্রসাদ শুধাইলেন নিজেকে।

...কেন? টাকা—টাকা লইয়া লোকে আবার কি করে? আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া তাঁহার কি লাভ? মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যদি সব ফুরাইয়া গেল তবে পরকালের জন্য মাথা ঘামান বোকামী নয় কি?......

মিলিওনিয়ার সার সোমেশ্বর প্রসাদের নিকট তাঁহার বিপুল এই ঐশ্বর্য, বিরাট এই রাজপ্রাসাদ, কর্মমুখর নিজের এই জীবন আজ অত্যন্ত দুর্বিসহ বোধ হইল। আজ তাঁহার মনে হইলঃ নিজেকে তিনি আগাগোড়া ফাঁকি দিয়া আসিয়াছেন, প্রতারণা করিয়া আসিয়াছেন নিজেকে, নিজের কাছে—মনকে চোখ ঠারিয়া আসিয়াছেন এতদিন। জীবনের অর্থ শুধু টাকা নয়—টাকাই জীবনের অর্থ নয়।

ঘর হইতে তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। সাহেবকে অসময়ে বাহির হইতে দেখিয়া তকমা-আঁটা চাপরাসীর দল মহা বিব্রত হইয়া উঠিল। কিন্তু সার সোমেশ্বর প্রসাদ তাহাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া লনের লাল সুরকি-পাতা রাস্তায় নামিয়া আসিলেন। পথের দু' পাশেই অর্কিড্ আর টবে নানান জাতির পাম-এর সারি। তারপর কিছু

দূরে পাশাপাশি অনেকগুলি গ্যারেজ ঘর। ফটক পার হইয়া তিনি রাজপথে আসিয়া পড়িলেন। সামনেই পার্ক। রাস্তা ও পার্ক দুটিই তাঁহার নাম বহন করিতেছে। অন্যমনস্ক হইয়া তিনি পার্কে ঢুকিয়া পড়িলেন। শীতের সকাল। পার্কটি তখনও জনশূন্য হইয়া পড়ে নাই। নানান বয়সের বহু ছেলে-মেয়ে ছুটোছুটি করিয়া খেলিতেছে। এক জায়গায় আসিয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। পরিত্যক্ত একখানা বেঞ্চির উপর বসিয়া আছেন এক তাঁহার মত প্রৌঢ় ভদ্রলোক আর তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া ফ্রক্-পরা একটি মেয়ে চোখদুটি বৃদ্ধের টিপিয়া ধরিয়াছে। আরও গুটি-কয়েক ছেলে-মেয়ে বেঞ্চি ও আশপাশের ঝোপের আড়ালে গিয়া লুকাইয়াছে।

সার সোমেশ্বর প্রসাদ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে তিনি চিনেন। তাঁহারই প্রতিবেশী। কর্ম-জীবন হইতে এখন বুঝি অবসর লইয়াছেন। ছেলের চাকরীর সুপারিশের জন্য বহুবার আসিয়া ধর্ণা দিয়াছেন তাঁহার নিকট। তিনি আগাইয়া আসিলেন। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ

'কি খুকু, তোমরা চোর-চোর খেলছো বুঝি?'

কিন্তু ছেলেমেয়েদের অত হাসি-খুশি এক মুহূর্তে কোথায় যেন মিলাইয়া গেল। ভয়ে জড়সড় হইয়া তাহারা ঠাকুরদাদার হাঁটুদুটি আঁকড়াইয়া ধরিল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক-টিও তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ছেলে-মেয়েদের ধমকাইয়া বলিয়া উঠিলেনঃ

'সাহেবের সামনে অমন চেঁচামেচি করতে আছে, এ্যাঁ, পাজী হতভাগা সব? বাড়ি যাও, মাকে গিয়ে সব বলবো'খন। মেরে আজ হাড় সব গুঁড়ো করবে, মজা তখন টের পাবে।'

তিনি এবার সার সোমেশ্বর প্রসাদের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। করজোড়ে বলিলেন ঃ

'মাপ করবেন সার, ছেলেমানুষ সব—তাই অমন চেঁচা-মেচি করছিল আপনার সামনে।'

মহা অপরাধীর মত ছেলে-পিলেদের লইয়া তিনি তার-পর সরিয়া পড়িলেন সেখান হইতে।

মিলিওনিয়র সার সোমেশ্বর প্রসাদ কিছুক্ষণ তাহাদের পিছনে তাকাইয়া রহিলেন শূন্যচোখে। তারপর এক সময় সেই বেঞ্চিটার উপর বসিয়া পড়িলেন ধপ করিয়া। কই, পিছন হইতে কেহ আসিয়া তাঁহার চোখদুটি তো টিপিয়া ধরিল না!

তুষারপাত ঃ সিমলা

শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত

সারারাত্রি তুষারের বৃষ্টি ঝরে সিমলার বুকে,—
নেমে আসে চারিদিকে বিস্মৃতির মৃত্যু-গাঢ় ঘুম;
সময়ের স্রোত রুদ্ধ; কোলাহল নিস্তব্ধ নিঝুম;
আতঙ্কের প্রেতচ্ছায়া অসহায় আকাশের মুখে।

পরিচিত ইতিহাস, বহু চেনা-মুখ, শোনা নাম
কোথায় হারিয়ে যায়। জীবনের অজ্ঞাত অধ্যায়
অকস্মাৎ সুরু হয়। ত্রস্ত মনে ছায়া ফেলে যায়
মৃত্যুর রহস্য-রূপ। স্তব্ধতার কান্না অবিরাম।

হে সিমলা, তুলে দাও তুষারের মৃত্যু-যবনিকা;
হানো রৌদ্র-অসি, আনো জীবনের প্রবল আশ্বাস;
বলে দাও কোথা' লুপ্ত পদচিহ্ন, সুপ্ত কলরব;
শ্যামল দূর্ব্বার কাব্য, নীলিমার হোমাগ্নির শিখা,
পাইন শাখার প্রেম-আলিঙ্গনে বিমুগ্ধ আকাশ,
আকাঙ্ক্ষার গিরিবক্ষে ঝর্ণা-নৃত্যে প্রাণের উৎসব।

বিদ্রোহী বঙ্কিম

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত আসবাবপত্র

তখনও আঁধার ছিল, মহারণ্যে অবলুপ্ত পথ,
সূর্য্যালোক প্রতিহত, ভয়ঙ্কর শ্বাপদ সঙ্কুল,
ক্রূর সর্প সন্ত্রাসিত সুগোপন গুহার গহ্বরে
হিংসা-লালায়িত জিহ্বা, বিষদন্তে প্রচ্ছন্ন প্রদাহ।

তখনও আঁধার ছিল, শ্মশানের ধূমাঙ্কিত কালি
নির্মেঘ আকাশময় পুঞ্জ পুঞ্জ কলঙ্ক ছড়ায়
জাতির কলঙ্ক নহে, শাসনের অপকীর্ত্তি কথা,
কঙ্কালে কঙ্কালে ওঠে নির্লজ্জ নিষ্ঠুর পরিহাস
পরিহাস জীবনের, পরিহাস আত্মবিস্মৃতির।

মোহমুগ্ধ দুর্গদ্বারে কে তখন হানিবে আঘাত
তখনও আঁধার ছিল মনে মনে ঘরে ও বাহিরে,
আঁধারে নিশ্চিহ্ন পথ, সে পথের দিশারী কে হবে?

সে আঁধার বিদারিয়া জ্বলে ওঠে জ্যোতিস্ক নূতন
শতসূর্য সমপ্রভ ললাটের প্রতিভা তিলক,
ভ্রূকুটি লাঞ্ছিত দৃষ্টি ওষ্ঠে মৃদু হাস্যের মাধুরী
অন্তস্থলে দাবদাহ, সর্বাঙ্গের শুচিতা নির্মল
কঠোরে মধুরে যেন মেঘময় শ্রাবণ গগন।

সমাহিত চিত্ততলে তপস্যার চরম প্রস্তুতি—
সেই সে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর পথের দিশারী
"বন্দেমাতরম" মন্ত্র সমুত্থিত কম্বু কণ্ঠে যাঁর।

কবি বঙ্কিমের কণ্ঠে শুনিলাম মাতৃনাম গান
ঋষি বঙ্কিমের ধ্যানে জাগিয়া উঠিল সত্য পথ,
মায়ের মন্দির চূড়া দেখা দিল বালার্ক কিরণে
দেখা দিল সেই দিন, জাতির সে পরম প্রভাত।

উষার মঙ্গল শঙ্খে অন্ধকার মিলাইল দূরে
আনন্দমঠের সৃষ্টি সেই দিন নিরানন্দ দেশে।

শত সন্তানের কণ্ঠে শুনিলাম মায়ের বন্দনা
স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমি দেবীর আসনে
মূর্ত হয়ে উঠিলেন; বঙ্কিমের লেখনীর মুখে
সমগ্র জাতির আশা, ভাষাময় অপূর্ব ধ্বনিতে,
পদচিহ্ন গ্রাম হতে গ্রামান্তরে প্রতিধ্বনি তার
সেদিন উঠিল বঙ্গে বিদ্রোহের অগ্নিশুদ্ধ হোমে
বাঙালীর মর্মে মর্মে সে বিদ্রোহ আবেগগম্ভীর,
সে বিদ্রোহ সন্তানের মঠরক্ষী বৈষ্ণবী সেনার।

অত্যাচার অবিচার উৎপীড়ন প্রতিরোধ তরে
গ্লানি ও বিক্ষোভে ভরা ক্ষুধার্ত্ত সে আত্মার বিদ্রোহ
বঙ্কিমের মাতৃপূজা, বন্দেমাতরম মন্ত্র তাঁর
আনন্দমঠের নিষ্ঠা সঞ্চারিত ভবনে ভবনে।

সে মন্ত্রে বঙ্কিমচন্দ্র দীক্ষা দিতে সমগ্র জাতিরে
আনিলেন নবযুগ, জাতির সে মহাসন্ধিক্ষণ।
একসূত্রে গাঁথিবারে ছিন্নভিন্ন লাঞ্ছিত জীবন
মাটির প্রদীপ জ্বালি দেখালেন স্বরূপ মায়ের।

সে দিন তাঁহার মন্ত্রে যে দীক্ষা লভিনু মোরা সবে
যে সঙ্কল্প প্রতিজ্ঞায় প্রাণপন করিল সন্তান
নিস্ফল হয়নি কভু, মাতৃপূজা-মন্ত্র আহুতির
গৃহে গৃহে আজও জ্বলে আহিতাগ্নি সম বহ্নিমান।
সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ দেশধর্ম মুক্তির সাধনা

মৃত্তিকার লোভে নহে, দেশের দেবতা জ্ঞান করি
আনন্দমঠের সেনা, মুক্তিকামী-সন্তানের দল
নিষ্কাম স্বদেশ-প্রেমে জাগাইল প্রথম বিদ্রোহ;
সে বিদ্রোহ বঙ্কিমের, সে বিদ্রোহ বাঙালি জাতির।

অন্ধকার মোচনের নবপ্রভাতের উদ্বোধন
বঙ্কিম উদ্‌গাতা তার বন্ধনমুক্তির মন্ত্রগুরু
তাঁহার উদ্দেশ্যে দেশ যুগে যুগে জানাবে প্রণতি।

আমি কবি এ যুগের শুনিয়াছি শৃঙ্খল ঝনঝনা
শুনিয়াছি কারাগৃহে অবরুদ্ধ বন্দীর বন্দনা
পাষাণ প্রাচীর ভাঙ্গে, শৃঙ্খলে ফুটায় শতদল
আমি কবি দেখিলাম আনন্দমঠের সেই সেনা
সংকট উত্তীর্ণ হয়ে চলে আজি মুক্তির মিছিলে।

কন্ঠে কন্ঠে সমুত্থিত ঋষি বঙ্কিমের মন্ত্রগান
"বন্দেমাতরম" যেন যুগজয়ী কালের যাত্রায়।
আমি কবি এ যুগের, সে যুগের বিদ্রোহী কবির
চরণ বন্দনা করি অর্ঘ্য দিই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

মুদ্রণালয় : এখানেই সর্ব্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' মুদ্রিত হয়।

পার্ব্বতী ও শৈবলিনী

শ্রীসুরজিৎ শাস্ত্রী

শরৎচন্দ্রের দেবদাস পড়িতে পড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর মনে পড়ে। পার্বতীর পার্শ্বে শৈবলিনী, দেবদাসের সঙ্গে প্রতাপকে দেখিতে পাই। পার্বতীকে প্রথম দেখি পাঠশালে। তাহার সহাধ্যায়ী, তাহার ক্রীড়াসঙ্গী দেবদাস যখন 'এক কোনে ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া শ্লেট হাতে লইয়া চক্ষু চাহিয়া বুজিয়া পা ছড়াইয়া হাই তুলিতেছিল' "পার্বতী তখন নিবিষ্টচিত্তে নিরতিশয় ধৈর্যের সহিত সুপ্ত পণ্ডিতের প্রতিকৃতি বোধদয়ের শেষ পাতাটির উপর কালি দিয়া আঁকিতেছিল এবং দক্ষ চিত্রকরের ন্যায় নানাভাবে দেখিতেছিল যে, তাহার বহু যত্নের চিত্রখানি আদর্শের সহিত কতখানি মিলিয়াছে। বেশী মিল না থাকিলেও ইহাতে যথেষ্ট আনন্দ এবং আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছিল।"

"দেবদাস অবশেষে হঠাৎ খুব চিন্তাশীল হইয়া উঠিয়া নিমেষে স্থির করিয়া ফেলিল এই পরম রমণীয় সময়টিতে মাঠে মাঠে ঘুড়ি উড়াইয়া বেড়ানোর পরিবর্তে পাঠশালায় আবদ্ধ থাকাটা কিছু নয়। সে সময় টিফিনের ছুটি হইলেও টিফিনের ছুটি সে পায় নাই। কেননা গোবিন্দ পণ্ডিত মহাশয় অনেকবার দেখিয়াছেন একবার পাঠশালা হইতে বাহির হইয়া পুনরায় প্রবেশ করাটা সে নিতান্ত অপছন্দ করে। সে সর্দার পোড়ো ভুলোর জিম্মায় ছিল।" তাহার উর্বর মস্তিস্কে একটা বুদ্ধি গজাইল। সে শ্লেট-হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং ভুলোর উদ্দেশ্যে বলিল, অঙ্ক হয় না।" "ভুলো শ্লেট দেখিতে মনোনিবেশ করিয়াছে এই সুযোগে দেবদাস তাহাকে হাত-পা ভাঙ্গা বেঞ্চি হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। সে পণ্ডিত মহাশয়ের বহু দিনের সঞ্চিত চুণের গাদার উপর পড়িয়া হাত-পা ছুড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া পার্বতী ভয়ানক উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।"

"পথে যাইতে যাইতে দেবদাসের বাড়ীর চাকর ধর্মদাসের সহিত দেখা হইলে বলিল, দেখ ধর্ম, দেবদা— হি-হি-হি একেবারে চুণের গাদায় হি-হি-হি—"

শৈবলিনীকে প্রথম দেখি ভাগীরথীতীরে আমকাননে। ভাগীরথীর সান্ধ্যজলকল্লোল-শ্রবণরত বালক প্রতাপের পদতলে নবদূর্বাশয্যায় শয়ন করিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া আছে। সে পাপিয়ার তানের অনুকরণ করিয়া আম্রকানন কম্পিত করিতেছে।

বন্যকুসুমের মালা গাঁথিয়া প্রতাপের গলায় পরাইতেছে। খুলিয়া আপনার করবীতে পরিতেছে। আবার প্রতাপের গলায় পরাইতেছে। সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া নিকটবর্তী

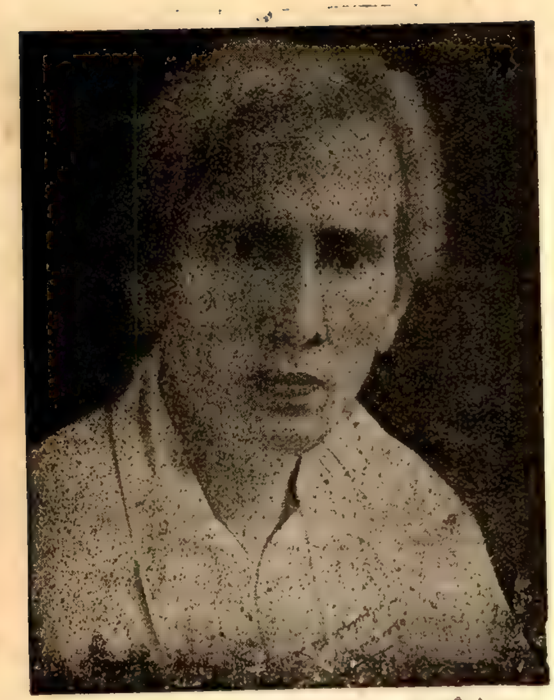

পার্ব্বতীর চরিত্রকার শরৎচন্দ্র

একটি গাভীর শৃঙ্গে পরাইল। তাহার পরে শৈবলিনী পাল্লা দিয়া তারা গণিতে লাগিল। প্রতাপকে হারাইবার জন্য মিথ্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া বলিতে লাগিল। তাহার পর তারা গণা ছাড়িয়া বাজি রাখিয়া নৌকা গণিতে লাগিল। শৈবলিনী গণিতে জানিত না। ভুল হইল।

শৈবলিনী চপলা, পার্বতীও চঞ্চলা। তখন শৈবলিনীর বয়স আট বৎসর। সে কথা গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন। ষোল বৎসরের নায়ক আট বৎসরের নায়িকা। বালকের ন্যায় কেহ ভালবাসিতে জানে না।

পার্বতীর আট বৎসর মাত্র বয়স। দুইটি বালক-বালিকার আল্হাদের সীমা নাই। সমস্ত দিন ধরিয়া রোদে রোদে ঘুরিয়া বেড়ায়। পাড়াময় অত্যাচার উপদ্রব করিয়া বেড়াইতে দুইজনেই যথেষ্ট।

শৈবলিনী মনে মনে জানিত প্রতাপের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। প্রতাপ জানিত হইবে না। শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতিকন্যা।

পার্বতী উন্মনস্কা। বাল্যচাঞ্চল্যের মধ্যে দেবদাসকে পাইয়া সুখী। ইহার বেশী আর সে আশা করে নাই। পার্বতী তেরয় পা দিতে অকস্মাৎ তাহার শারীরিক পরিবর্তন দেখিয়া ঠাকুরমায়ের হুঁস্ হইল। তাই বধূ পুত্রকে তাগাদা করিয়া যখন কিছু হইল না তখন তিনি দেবদাসের মাতার কাছে কথা পাড়িলেন। তহাতে দেবদাসের মা কেনা বেচা চক্রবর্তী বামুনের মেয়ে, বিশেষত বাড়ীর পাশে কুটুম্ব বলিয়া আপত্তি থাকায় মিষ্ট কথায় প্রত্যাখ্যান করিলেন। একথা জানিতে পারিয়া পার্বতীর পিতা মাকে তিরস্কার করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন এক সপ্তাহের মধ্যেই সম্বন্ধ স্থির করিবেন। তাহা শুনিয়া পার্বতীর মাথায় বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ছেলেবেলা হইতে তাহার ধারণা ছিল দেবদাসের উপর তাহার একটু অধিকার আছে। পার্বতী তাহার সেই একঘেয়ে গ্রাম্য জীবনের মধ্যে শুধু তাহাকেই ধ্যান করিয়া আসিয়াছে। তাই বিবাহ হইতে পারে না এই সংবাদটা পার্বতীর হৃদয়ের সমস্ত আশা আকাঙ্খা তাহার বুকের ভিতর হইতে যেন ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল।

"কিন্তু দেবদাস সম্বন্ধে এই কথাটা ঠিক খাটানো যায় না। তখন কে ভাবিত বিবাহের কথা, কে জানিত বিবাহের কথা। কে জানিত এ কিশোর বন্ধন বিবাহ ব্যতীত কোনো মতেই চিরস্থায়ী করিয়া রাখা যায় না।"

শৈবলিনী বুঝিল প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই। বুঝিল এ জীবনে তাহাকে পাইবার সম্ভাবনা নাই। তখন দুইজনে পরামর্শ করিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে গেল। অনেক দূর গিয়া প্রতাপ বলিল, শৈবলিনী এই আমাদের বিয়ে।

শৈবলিনী বলিল—আর কেন, এইখানেই।

প্রতাপ ডুবিল।

শৈবলিনী ডুবিল না। ভয় হইল। ভাবিল কেন মরিবে? প্রতাপ আমার কে?

পার্বতী তাহা করিল না। সে রাত্রে ম্লান জ্যোৎস্নায় আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়া রামায়ণ পাঠরত বৃদ্ধ দারোয়ান কিষণ সিংহের চক্ষে দাসী প্রত্যয় জন্মাইয়া দেবদাসের গৃহে আসিল। নিজেই দেবদাসকে বিবাহ করিতে ইঙ্গিত করিল। দেবদাস পিতামাতার অমত জানাইয়া আপত্তি করিল। পার্বতী কিছুই শুনিল না। বাপমায়ের অবাধ্য হইতে বলিল। দেবদাস নিরুত্তর রহিল। পার্বতী নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

দেবদাস কলিকাতায় চলিয়া গেল। পার্বতী আশা করিতেছিল দেবদাস আবার আসিবে।– আবার আমাকে ডাকিয়া বলিবে পারু, তোমাকে আমি সাধ্য থাকিতে পরের হাতে দিতে পারিব না।

কিন্তু তাহা হইল না। দেবদাস কলিকাতায় গিয়া

পার্বতীকে পত্র লিখিল ঃ পিতামাতাকে আঘাত দিয়া তোমাকে বিবাহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

পার্বতীর পিতা অন্যত্র পার্বতীর বিবাহ স্থির করিয়া আসিলেন। সেই সময় দেবদাস বাড়ী আসিল। পার্বতী দ্বিপ্রহরে যেমন বাঁধে জল আনিতে যায় সেইরূপ গিয়াছিল। দেবদাস দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া বিবাহে তাহার সম্মতি জানাইল। পার্বতী রুক্ষ্মভাবে প্রত্যাখ্যান করিল। অনেক বিতর্ক হইল। শেষে দেবদাস সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ছিপের বাঁট্ দিয়া পার্বতীর মাথায় আঘাত করিল। তাহার কপাল চিরিয়া গেল। সমস্ত মুখ রক্তে ভাসিয়া গেল। পার্বতী মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। বলিল, দেবদা কর্‌লে কি?

এ আঘাত শুধু পার্বতীকে নয়। যে সমাজ চক্রবর্তী ঘরের মেয়েকে মুখুজ্যের ঘরে বিবাহ করিতে নিষেধ করে সেই সমাজের মস্তকে পড়িল।

দেবদাস লজ্জিত হইয়া পার্বতীর সুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল।

কয়েক দিন পরে পার্বতীর বিবাহ হইয়া গেল।

এখন দেখা যাউক উভয়ের দাম্পত্য জীবন।

ভীমপুষ্করিণী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শৈবলিনী দেখিল স্বামী চন্দ্রশেখর পুঁথি পড়িতেছেন। শৈবলিনীর শঙ্কা হইতেছিল এতরাত্রি হইল স্বামী কি বলিবেন। কিন্তু চন্দ্রশেখর কিছু বলিলেন না। তখন তিনি অধ্যয়নে ব্যস্ত। শৈবলিনী হাসিয়া উঠিল। চন্দ্রশেখর বলিলেন, আজ এ অসময়ে বিদ্যুৎ কেন!

শৈবলিনী বলিল, আমি ভাবিতেছি না জানি তুমি আমায় কত বকিবে।

চন্দ্র। কেন বকিব?

শৈ। আমার পুকুরঘাট হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে।

চন্দ্র। বটেও ত—এখন এলে নাকি? বিলম্ব হইল কেন?

শৈবলিনী বিলম্বের কারণ বলিল। চন্দ্রশেখর অন্যমনস্কে বলিলেন, আর আসিও না।

শৈবলিনী পূর্ব নির্দেশ মত স্বামীর আহার্য তাঁহার নিকট রাখিয়া আহার করিয়া শয়ন করিল।

রাত্রি অধিক হইয়াছে জানিতে পারিয়া চন্দ্রশেখর গ্রন্থ রাখিয়া দাঁড়াইলেন। মুক্ত বাতায়নপথে সমাগত চন্দ্র কিরণ সুপ্ত শৈবলিনীর মুখের উপর পড়িয়াছে। তিনি অতৃপ্ত নয়নে তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

শৈবলিনীর চরিত্রকার বঙ্কিমচন্দ্র

তিনি অনুতপ্ত হইলেন। হায় কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিলাম। এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত। আমি সুখী হইয়াছি কিন্তু আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া নবযুবতীর কি সুখ? আমার যে বয়স তাহাতে শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব। রমণী-মুখ-পদ্ম কি জীবনের সারভূত করিব? ছি ছি, তাহা পারিব না।

এ দিকে পার্বতী স্বামীগৃহে আসিয়া দেখিল স্বামী নিজেই জমিদারির কাজকর্ম দেখেন। স্বহস্তে শালগ্রাম পূজা করেন। ব্রত, নিয়ম, উপবাস, ঠাকুরবাড়ী, অতিথিশালায় সাধু সন্ন্যাসীর পরিচর্যা এই সব কাজ করিতে সকাল হইতে রাত্রি দশটা এগারটা পর্যন্ত কাটিয়া যাইত। নূতন বিবাহ করিয়া কোনো প্রকার আমোদ আহ্লাদ তাহাতে প্রকাশ পাইল না। রাত্রে কোনো দিন ভিতরে আসিতেন, কোনো দিন বা আসিতে পারিতেন না। আসিলে অতি সামান্যই কথাবার্তা হইত। শয্যায় শুইয়া পাশ বালিসটা টানিয়া লইয়া চোখ বুজিয়া বড়জোর বলিতেন—তা তুমিই হলে বাড়ীর গৃহিণী। সব দেখে-শুনে বুঝে-পড়ে নিয়ো!

পার্বতী মাথা নাড়িয়া বলিত—আচ্ছা। নিকটে আসিয়া টাকের উপর মৃণালহস্ত রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিত, তোমাকে ভাব্‌তে হবে না।

বৃদ্ধ পার্বতীর মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিতেন—তোমার ভাল হবে। তুমি সুখী হবে। ভগবান তোমাকে দীর্ঘায়ু করবেন।

তারপর হঠাৎ কি মনে করিয়া বলিলেন, আহা আগে কি জম্‌কালো সংসার ছিল, তারপর অন্ধকার শ্মশান।

কাঁচাপাকা গোঁফের দু'পাশ ভিজিয়া, বালিশ ভিজিতে সুরু করিত। পার্বতী কাতর হইয়া মুছাইয়া দিয়া কহিত, মহেনের কেন বিবাহ দিলে না?

বুড়া বলিতেন, তাইত ভেবেছিলাম ও কিছুতেই বিয়ে কর্‌লে না। তাইতেই ত—

কথা শুনিয়া পার্বতীর দুঃখ হইত। বৃদ্ধ বলিতেন, তোমাকে এখানে সাজে না।

পার্বতী হাসিয়া উঠিয়া বলিত, খুব সাজে। আমাদের আবার সাজাসাজি কি?

পার্বতীর পিতা পার্বতীকে আনিতে গেলে পার্বতী বলিল, বাবা বড় অগোছল সংসার, আর কিছুদিন পরে যাব।

পার্বতীর সনির্বন্ধ অনুরোধে বড় ছেলে মহেন্দ্র ক্রুদ্ধা অভিমানিনী মেয়ে যশোদাকে লইয়া আসিল। পার্বতী পূর্বাহ্ণেই একগা গহনা পরিয়া বসিয়াছিল। যশোদাকে দেখিয়া হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া কাছে বসাইয়া বাতাস করিতে করিতে বলিল—মা, মেয়ের উপর কি রাগ করেছ?

পার্বতী সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া যশোদাকে পরাইয়া দিল। নিরাভরণা পার্বতী কহিল—তোমার বাপের বাড়ী কত দাস-দাসী; আমি একজন দাসী বইত নয়। তুচ্ছ দাসীর উপর কি তোমার রাগ করা সাজে? কত দীনদুঃখী তোমাদের বাড়ী প্রতিপালিত হচ্ছে।, আমিওত মা তাদেরই একজন।

পার্বতীর পূজা-আহ্নিক করিতে বসিয়া উদ্দেশ্যহীন হতাশ মনটা চট্‌ করিয়া একবার তালসোনাপুরের, বাঁশ-ঝাড়, আমবাগান, পাঠশালার ঘর, বাঁধের পাড় ঘুরিয়া আসে। একফোঁটা চোখের জল টপ্‌ করিয়া কোশার জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়।

বিবাহিত হইয়াও শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিতে পারে নাই। প্রতাপ যখন ফষ্টারের বজরা হইতে শৈবলিনীকে উদ্ধার করিলেন, চাকর রামচরণ তাহাকে প্রতাপের গৃহে প্রতাপের শয়নকক্ষে আনিয়া রাখিল। প্রতাপ শয়ন করিতে গিয়া দেখিলেন, পালঙ্কে শয়ানা শৈবলিনী। তিনি জ্বালিত দীপালোকে দেখিলেন যে, কে নির্মল কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। দেখিয়া প্রতাপ সহসা চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। সৌন্দার্যমুগ্ধ হইয়া বা ইন্দ্রিয় বশ্যতা প্রযুক্ত যে তাঁহার চক্ষু ফিরিল না এমত নহে। কেবল অন্যমন বশতঃ তিনি বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। অনেক দিনের কথা তাহার মনে পড়িল।

শৈবলিনী নিদ্রা যায় নাই। প্রতাপ বন্দুকটি রাখিতে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে শৈবলিনী চাহিলেন। প্রতাপকে দেখিতে পাইলেন। শৈবলিনী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এ কি এ? কে তুমি?"

এই বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

প্রতাপ জল আনিয়া মূর্চ্ছিতা শৈবলিনীর মুখমণ্ডলে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। সে মুখ শিশিরনিষিক্ত পদ্মের মত শোভা পাইতে লাগিল। শৈবলিনী সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া বলিল, কে তুমি? প্রতাপ? না কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়াছে?

প্রতাপ বলিলেন, আমি প্রতাপ।

প্রতাপ চলিয়া যাইতেছিলেন, শৈবলিনী বলিলেন, যাইও না।

প্রতাপ অনিচ্ছায় দাঁড়াইল।

শৈবলিনী বলিলেন, কেন তোমরা আমাকে এখানে আনিলে?

প্রতাপ বলিল, তোমাকে ম্লেচ্ছের হাত হইতে উদ্ধার করিলাম। তুমি বলিতেছ কেন আনিলাম? তোমার মরণ মঙ্গল।

শৈবলিনী কাঁদিয়া বলিল—তুমি আমায় একথা বলিও না। আমার এ দুর্দশা কাহা হইতে? তোমা হইতে। কে আমার জীবন অন্ধকার করিয়াছে? তুমি।

প্রতাপ কহিল, আমি তোমার কি করিয়াছি?

শৈবলিনী কহিল, তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি তোমার অতুল্য দেবমূর্তি লইয়া আমায় দেখা দিয়েছিলে? দেখিলাম ত পাইলাম না কেন? তুমি কি জান না, তোমার রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? যদি কখন তোমায় পাইতে পারি এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি। নইলে ফষ্টর আমার কে?

গলষ্টন ও জন্‌সন যখন প্রতাপের গৃহে আসিয়া প্রতাপকে লইয়া গেল, তখন দলনী ও কুলসমকে দেখিতে পাইয়া তাহাদেরও লইয়া গেল। তখন শৈবলিনী একাকিনী চিন্তা করিতে লাগিলেন, এখন কি করি? আশা থাকিতে মরিতে পারি নাই। আজ মরিবার দিন বটে। তবে প্রতাপের কি হয়, তাহা না জানিয়া মরিতে পারি না। যাই হউক না আমার কি? প্রতাপ আমার কে?

শৈবলিনী অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভাবিতে

লাগিলেন, মনে করিয়াছিলাম গৃহের বাহির হইলেই প্রতাপকে দেখিব—কটাক্ষজাল পাতিয়া প্রতাপ-পক্ষীকে ধরিব।

নবাবের নিকট ছলনা করিয়া স্বামী-পরিচয় দিয়া প্রতাপের উদ্ধারের জন্য নবাবের নিকট হইতে ছিপ, দাসী, দেহরক্ষী, অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া গমন করিল। শৈবলিনী উন্মাদিনী সাজিয়া কৌশলে প্রতাপের বন্ধন মুক্ত করিয়া গঙ্গা সাঁতরাইয়া পলাইয়া আসিল।

সাঁতার দিতে দিতে দুইজনে যে সমস্ত কথা হইল তাহাতে প্রতাপ শপথ করাইয়া তাহাকে ভুলিতে বলিল।

শৈবলিনী বলিল, আমার মত দুঃখী কে আছে প্রতাপ? তোমার ঐশ্বর্য আছে, বল আছে, কীর্তি আছে, বন্ধু আছে, ভরসা আছে, রূপসী আছে, আমার কি আছে প্রতাপ? ভাবিয়া দেখ আমার সর্বস্ব লইতেছ! তোমাকে চাই না, তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব?

শৈবলিনী প্রতাপের প্রস্তাবিত শপথ করিল। আজি হইতে আমার সর্বসুখে জলাঞ্জলী। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।

চন্দ্রশেখর যখন শৈবলিনীকে রামানন্দ স্বামীর প্রদত্ত দৈব ঔষধ সেবন করাইয়া যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা নিদ্রাভিভূত করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি ফষ্টরের সঙ্গে গেলে কেন?

শৈব—প্রতাপের জন্য।

চন্দ্র—প্রতাপ কি তোমার জাড়?

শৈব—ছি, ছি।

চন্দ্র—তবে কি?

শৈব—এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল ফুটিয়াছিলাম, ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়াছিলে কেন?

তৎপর যুদ্ধ গমোনোদ্যত অশ্বারোহী প্রতাপকে দেখিতে পাইয়া শৈবলিনী ডাকিল। প্রতাপ বলিল, আশীর্বাদ করি তুমি সুখী হও। প্রতাপ অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল।

শৈব—আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই। এ জন্মে তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও না।

অগ্নি পরীক্ষা

প্রতাপ ও দেবদাসের অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে দুই দুই বার। প্রতাপ ও শৈবলিনী যখন গঙ্গায় সাঁতার দেয় তখন শৈবলিনী প্রণয়প্রার্থী জানিয়াও শৈবলিনীকে প্রতাপ শপথ করাইয়াছিলেন তাঁহাকে ভুলিবার জন্য। তদপেক্ষাও কঠোর পরীক্ষা হইয়া গেল প্রতাপ শৈবলিনীকে নিজশয়ানকক্ষে নির্জনে দেখিয়াও তিরস্কার করিয়া প্রত্যাখ্যান করিল।

এদিকে পার্বতী তাহার পিতা যখন বিবাহের সমস্ত ঠিক করিয়াছেন তখন পার্বতী রাত্রে দেবদাসের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেবদাসকে বিবাহ করিবার জন্য প্রার্থনা করিল। তখন দেবদাস তাহাকে সসম্ভ্রমের সহিত প্রত্যাখ্যান করিল।

আর যে দিন পার্বতী বিবাহের পর পিত্রালয়ে আসিয়া ধর্মদাসের নিকট দেবদাসের অধঃপতনের কথা শুনিল, দেবদাসকে সৎ হইবার জন্য শপথ করিতে বলিল। কথায় কথায় রাত্রি নয়টা বাজিল। গাঢ় অন্ধকার ঘরে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। দেবদাস পার্বতীকে স্পর্শ করিয়া শপথ করিল পার্বতীর বাড়ী যাইবে।

শৈবলিনীর শেষ পরিণতি গ্রন্থকার কিছুই করেন নাই। প্রতাপের মৃত্যুর পর সে কিভাবে চন্দ্রশেখরের ঘর করিতে লাগিল তাহা অনুমেয়।

আর দেবদাসের মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া পার্বতী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর একবার মাত্র একটি কথা বলিয়া নীরব হইল। তাহার পর কিভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিল তাহা গ্রন্থকার অপ্রকাশিত রাখিয়াছেন।

প্রতাপ স্বেচ্ছায় শৈবলিনীর কল্যাণের জন্য মরিল রণক্ষেত্রে রামানন্দ স্বামীর আশীর্বাদ লইয়া।

আর দেবদাস মরিল পার্বতীর নিকট তাহার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য পীড়িত শরীর লইয়া পার্বতীর শ্বশুরালয়ের সম্মুখে বৃক্ষতলে অসহায় অবস্থায়। গ্রন্থকার তাহার মত হতভাগ্যের জন্য পাঠকের নিকট সহানুভূতি চাহিয়াছেন।

শৈবলিনী ব্যাপিকা। দরবারে যাইয়া প্রতারণা করিতে রক্ষীর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া ইংরাজের কবল হইতে পলাইতে পটু।

পার্বতীর স্বভাব গ্রাম্যবধূ-সুলভ সংবৃতা, সংকোচ পরায়ণা। দেবদাসকে আনিতে যাইয়া সে কলিকাতা গিয়াছে জানিয়া ফিরিয়া আসিল। শৈবলিনী হইলে হয়ত কলিকাতায় যাইত এবং দেবদাসকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিত। যেমন চন্দ্রমুখী করিয়াছিল।

প্রয়োজন হইলে শৈবলিনী মিথ্যার আশ্রয় লইতে সংকুচিত হয় না। নবাবের নিকট বলিয়াছিল, প্রতাপ আমার স্বামী। এবং উন্মাদ আরোগ্য হইলেও কিছু দিন ভাণ করিয়াছিল।

পার্বতী চরিত্রে সেরূপ দেখা যায় না। একবার মাত্র দেবদাস কপাল ফাটাইয়া দিলে ঠাকুরমাকে বলিয়াছিল, ঘাটে পড়িয়া গিয়া কাটিয়াছে। সে অপরিণত বয়সে এক-দিন।

শৈবলিনী আবাল্য আত্মসুখপরায়ণা। বিবাহ হইবে না জানিয়া দুইজনে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল; তখন প্রতাপ ডুবিল। শৈবলিনী ভাবিল প্রতাপ আমার কে? ডুবিল না।

প্রতাপের কক্ষে শৈবলিনীকে তিরস্কার করিয়া প্রতাপ চলিয়া গেলে শৈবলিনী ভাবিল—প্রতাপের যাই হোক না, আমার কি? প্রতাপ আমার কে?

প্রতাপ রণক্ষেত্রে যাইবার সময় শৈবলিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিয়াছিল, তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই।

নারীত্বে শৈবলিনী অপেক্ষা পার্বতী বড়।

এখন তুলনা করা কঠিন প্রতাপ ও দেবদাসের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। আপাত দৃষ্টিতে প্রতাপ অপেক্ষা দেবদাসকে চরিত্রহীন মনে হয়। দেবদাস অসংযমী হইলেও তাহার মধ্যে বিশেষত্ব আছে। গ্রন্থকার নিজেই দেবদাসকে অসংযমী পাপিষ্ঠ বলিয়াছেন। দেবদাসের মদ্যপান ও চন্দ্রমুখীর সংস্পর্শে আসা ভিন্ন অন্য দোষ নাই। তাহাও ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য নহে; পার্বতীকে ভুলিয়া থাকিবার জন্য। সে বলে—"চন্দ্রমুখী, এখানে থাক্‌ব বলে মদ খাই। তোমাকে ছুঁতে পারি না আমার বড় ঘৃণা করে। বড় দুঃখে মদ ধরেছি। আমার বিপদের দুঃখের বন্ধু। আমি যে তোমাকে কত ঘৃণা করি। চিরকাল ঘৃণা করব তবু আস্‌ব। না হলে যে উপায় নাই। তা কি তোমরা কেউ বুঝবে। কিন্তু তাকে যে মনে পড়ে।"

চন্দ্রমুখীকে এত ঘৃণা করিলেও একদিন সে তাহার অন্তরে পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। জীবনের শেষ ক্ষণে জননীর কথা মনে করিয়া আর একখানি মুখ নিরতিশয় পবিত্র হইয়া দেখা দিল। সে চন্দ্রমুখীর।

প্রতাপ ও দেবদাসের মধ্যে কে মহৎ তাহার বিচারের ভার পাঠকের উপর দিয়া আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

রাক্ষুসী

শ্রীশ্যামাপদ ঠাকুর

জয়ন্তীর বিয়ে হ'য়ে গ্যালো হঠাৎ আর অদ্ভুতভাবে। কী একটা পর্ব উপলক্ষে সেদিন ছুটী ছিল। মিত্র ম'শায় ভোরে উঠেই নিজের সখের বাগান তদারকে লেগেছেন—বাগানখানা দুভাগে ভাগ করা—ডান হাতে দিশী আর বাঁ হাতে বিলিতী ফুলের মরশুম—দেখলে মনে হ'বে এটা একটা নার্শারী। মিত্র-গিন্নী বাঁ-হাতিটার নাম দিয়েছেন 'সতীন বাগ'—কর্তার না কি ওটাতেই টান বেশী।

আদুড়গায়ে খাটো কাপড় পরে মিত্র মশায় মাটি খুঁড়-ছিলেন রাস্তার দিককার পাঁচিলে পিঠ রেখে—কোলের কাছে কাঁচিখানা, জলের ঝাড়িটা সুমুখে। জয়ন্তী বাবাকে সাহায্য করছিল গাছের গোড়া পরিষ্কার ক'রতে, বাড়তি পাতা কাঁচি দিয়ে ছাঁটতে, নালা কেটে জল ঢালতে।

ভেতর থেকে পিসীমা ডাকলেন—"জয়া, তোরা চা-খাবার খেয়ে যা।"

জবাব দিলেন মিত্র মশায় একটা আগাছা টেনে তুলতে তুলতে—"মুনিকন্যা আজ আলবালপূরণে নিযুক্তা—অতএব সোমরস আজ আশ্রমাবাসেই প্রেষিত হোক"—নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন বাগান কাঁপিয়ে।

জয়ন্তীও বাপের সঙ্গে যোগ দিয়েছে............আদরে কাদামাখা হাতেই বাবার গলা আলগোছে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো—"কিন্তু বাবা, আশ্রমমৃগ?"

"হ'বে মা হ'বে, মৃগ আসবে বৈকি! কাশে কাটা কষে তুই ইঙ্গুদী তেল লাগিয়ে দিবি—দুষ্যন্তের বাড়ী যাবার সময় সে তোর আঁচল ধরে টানবে"—আবার একদফা প্রাণ-খোলা আপনভোলা হাসিতে ফেটে পড়লেন তিনি।

"যাঃও, তুমি ভারী ইয়ে"—আদর-মাখা চোখের একটা ধমক দিয়ে বাগানের ইট কোনাচে ক'রে তৈরী রাস্তা দিয়ে ভেতরে চলে গেল জয়ন্তী।

বাবার আর নিজের চা-খাবার ছোট একটা ট্রেতে সাজিয়ে সবে এসে জয়ন্তী সিঁড়ির একটা ধাপ নেমেছে—নিঃশব্দে প্রকাণ্ড একখানা দুধেসাদা ঝক্‌ঝকে মোটর এসে দাঁড়ালো ওদের বাগানের গেটটার কাছে.........এতো বড়ো

গাড়ী কার এলো? কোথায় ঠিক এই গাড়ীখানাই না দেখেছে ও!......গাড়ী থেকে নামলেন বছর পঞ্চাশ বয়সের প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক—পেছনে পেছনে মাখনের মত নরম চেহারার সতেরো-আঠারো বছরের একটি তরুণ—বাঁ-হাতে চশমাটা ঝুলিয়ে ডানহাতে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে। ভদ্রলোক গাড়ীটা কোথায় রাখতে হ'বে ড্রাইভারকে সেই নির্দেশ দিচ্ছেন—ছেলেটি গেটের কাছে এসে গ্যাছে......ঝনাৎ ক'রে জয়ন্তীর হাত থেকে ট্রেটা পড়ে গিয়ে খাবারগুলো গ্যালো ছিটকে—পিরিচ পেয়ালাগুলো হ'য়ে গ্যালো খান খান।

মিত্র মশায় একবার চোখতুলে দেখলেন ওর দিকে—শিকড়শুদ্ধ একটা গাছ তুলে সবে সেটাকে আবার পুঁততে যাচ্ছিলেন তিনি—"শকুন্তলে, তোমার এ অহেতুক বৈক্লব্যের হেতু কি মা? দুষ্যন্তের রথধ্বজা কি তোমার দৃষ্টি পথে-পতিত হ'য়েছে?"—আবার একপশলা হাসি বৃষ্টি হ'লো। পিসীমা "কি হ'লো" বলে দরজাটা পেরিয়েছিলেন—কারা এসেছেন দেখে গেলেন ফিরে—ষাট, জয়ার কিছু হয় নি—

ভদ্রলোক ততক্ষণ গেটের কাছটায় এসে গ্যাছেন—"বাঃ"! অজান্তেই ছোট্ট কথাটি মুখ দিয়ে বেরিয়ে গ্যালো—দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি—দেয়াল-বেয়ে ওঠা লতানে গাছটায় এক্ফালি বন-জ্যোৎস্না যেন ফুটে উঠেছে......

কোত্থেকে এক ঢেউ লজ্জা এসে আছড়ে পড়লো জয়ন্তীর চোখে-মুখে—কপালে ফুটে উঠলো বিন্দু বিন্দু ঘাম......ছিঃ ছিঃ! কী মনে করলেন ও'রা। এক ঝলক কাঁচা রোদের আবিরে ছোপানো রাঙা মুখে ট্রেটা তুলে নিয়ে ত্রস্ত পায়ে ভেতরে চলে গ্যালো ও।

ভদ্রলোক যেন আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের দেশ থেকে মাটিতে নেমে এলেন...... হাসির মালিককে উদ্দেশ্য ক'রে ব'ললেন—"শিবশঙ্কর বাবু আছেন?"

"আজ্ঞে হাঁ, আসুন"—মিত্র মশায় উঠে দাঁড়িয়ে গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন—হাতে তাঁর তখনও কাঁচিখানা ধরা রয়েছে—"আসুন, আসুন"—

ছবির পর্দ্দায় একের পর এক ছবি যেন ভদ্রলোকের চোখের ওপর ভেসে উঠছে......চমৎকার—গেরীমাটি রঙের পাথরের নুড়ি দিয়ে বাঁধানো সরু রাস্তাটা বাগানের বুক চিরে বাড়ীতে উঠবার সিঁড়ি অবধি এগিয়ে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছে—দুপাশে ঠিক সমান ব্যবধানে বেড়ে উঠেছে পামের তরুণ ঋজু চারাগুলো—ওগুলোকে সাধারণতঃ বলা হয় সাবুদানা গাছ—দুপাশে দিশী বিলীতি ফুলের হাসিতে বাগানখানা ঝলমল করছে। ও'রা উঠলেন বৈঠকখানায়—অল্প ক'টী ফার্ণিচারে চমৎকার সাজানো। টেবিলের ওপর ফুলদানীতে ছোট্ট একটি স্তবক সদ্য-তোলা ফুলে বাঁধা। দেয়ালে শোভা পাচ্ছেন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ আর মহাত্মাজী—দু'কোণে দু'টো আলমারী বই-এ ঠাসা।

"চমৎকার বাড়ীখানা আপনার—তার চাইতেও চমৎকার আপনার রুচিবোধ।"

মিত্র ম'শায় স্বভাবসিদ্ধ হাসিতে হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন—

"আমার পোষাক পরিচ্ছদটা কি খুব রুচিকর পরিচয় দিচ্ছে?"—ভদ্রলোকও এবারে না হেসে পারলেন না।

"আমি হচ্ছি মশাই বাগানের মালী—বাগান যার সে হ'চ্ছে—"জয়া, ইদিকে আয় তো মা একবার।"

"যাই বাবা"—ভেতর থেকে কম্পিত মৃদুকণ্ঠে জবাব এলো। জয়ন্তী বেশী দূরে যেতে পারেনি—বাইরের ঘরের ওদিককার বারান্দায় দাঁড়িয়ে কী একটা হারিয়ে যাওয়া কথা হাতড়ে বেড়াচ্ছিল বুকের ভেতর......সাড়ীটা ঘুরিয়ে পরে মুখখানা মুছতে মুছতে আরও লাল ক'রে কুণ্ঠিত পায়ে দুরু দুরু বক্ষে এসে দাঁড়ালো বাবার পাশে—মৃণাল বাহু তুলে ছোট্ট একটি নমস্কার জানালো ভদ্রলোককে হাত দু'টী জুড়ে। মেয়ের মাথাটা ডান হাতে বুকের কাছে টেনে নিয়ে মিত্র মশায় সবভুলে আপন মনে ব'লে উঠলেন—"কিন্তু আর ক'দিন মা, তোকে আর ক'দিন ধরে রাখতে পারবো?"—নিজের অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস গাঢ় হ'য়ে বেরিয়ে গ্যালো—"কণ্বমুনি শকুন্তলাকে ব'লেছিলেন বুড়ো হ'য়ে আশ্রমে ফিরে আসতে—কিন্তু আমি বাপ হ'য়ে তোকে তা বলতে পারি কই?"

জয়ন্তীর অবাধ্য চোখের একটা ইসারা এরই ফাঁকে চুরি ক'রে ফিরে এলো কার এক ঝলক দেখা মুখের একখানা ছবি—নাঃ এতো নয়—সে যেন আরও সুন্দর—আরও মধুময়—মুখের ছাঁদ কিন্তু ঠিক এই।

"এতোক্ষণ নিজের কথাই ব'লে যাচ্ছি—আপনার কোন কথাই শোনা হয়নি"—মিত্রমশায় অপ্রস্তুতের হাসি হাসলেন। "যাও তো মা—আমাদের জন্যে চা-টা নিয়ে এসো।"............

ভদ্রলোক এসেছিলেন কোন্নগরের বিখ্যাত উকীল সুরেন বসুর নিমন্ত্রণ নিয়ে—উনি ও'দের বড়ো জামাই—সঙ্গে ছেলেটি সুরেন বাবুর দ্বিতীয় এবং ছোট ছেলে।

মিত্র মশাই ধাঁধাঁয় পড়লেন—"আজ্ঞে, আমি তো ঠিক ...." আমতা আমতা ক'রলেন তিনি।

ও'র মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে ভদ্রলোক ব'ললেন—"আজ্ঞে, তিনি আপনাকে বিলক্ষণ চেনেন—কিছু ভাববেন না—আপনার কোনো অসুবিধে হ'বে না—তৈরী হ'য়ে নিন। আমরা গাড়ীতে যাবো, আবার এই গাড়ীতেই পৌ'ছে দেবো আপনাকে।

চায়ের ফাঁকে ফাঁকে টুকিটাকি আলাপ চললো—কিন্তু ভদ্রলোক কিছুতেই খুলে বললেন না কারণটা। মিত্র-মশায় যেন থই পাচ্ছেন না—মাথা চুলকে চুলকে কয়েক গাছি চুলই ছিঁড়ে ফেললেন—কোথায় সা-পুর আর কোথায় কোন্নগর। মনে পড়লো তিনি কোন্নগরে জীবনে একবার গিয়েছিলেন ছেলেবেলায় কার বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে আর বারকতক ওদিকে ট্রেণে যেতে কোন্নগর ষ্টেশনের সঙ্গে চাক্ষুস পরিচয় হয়েছে মাত্র———একেবারে গাড়ী পাঠিয়ে নেমন্তন্ন তাঁর মতো সামান্য লোককে! ভদ্রলোক একবার যেন কথায় কথায় বলেছিলেন 'নির্বন্ধ'—তবে কি জয়ার বিয়ের প্রস্তাব? কিন্তু বাংলাদেশের মেয়েকে কে আর কবে যেচে এসে বিয়ে ক'রে নিয়ে গ্যাছে?......তবে জয়ার মতো মেয়েই বা বাংলাদেশে কটা আছে? হ'তেও পারে এটা লাগসই.........

সন্ধ্যে নাগাদ বাড়ী ফিরে মেয়েকে নিয়ে পড়লেন মিত্র-মশাই—মুখখানা ও'র চাপা হাসিতে ফেটে পড়ছে—

"তোমার পেটে পেটে এতো বিদ্যে?—কলেজের চৌকাঠ মাড়াতে না মাড়াতেই এই? একেবারে ইন্দুমতীর স্বয়ংবর!"

"কী যা-তা বলছো"—ধমক দিলেন জয়ন্তীর মা—তুমি না বাপ? কী হয়েছে খুলে বলো।"

"আরো খুলে ব'লতে হ'বে? তুমি তো ধমকাচ্ছো আমাকে—যেন দোষ আমারই! এদিকে তোমার মেয়ে যে স্বয়ংবর হ'য়েছে।"

"হে'য়ালী রেখে কথাটা পরিস্কার ক'রে বলো দিকি দয়া ক'রে"—জয়ন্তীর মার গলায় অধীরতা ফুটে ওঠে।

"থাকতো কালিদাস বে'চে—শকুন্তলার নতুন সংস্করণ লিখতে পারতো। সোজা কথায় ব'লতে হয় তোমার মেয়ে সুরেন বাবুর ছেলের প্রেমে পড়েছে—যাকে বলে প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম—আমি আর কি করি—পাকা কথা দিয়ে এলাম।"

"আচ্ছা বাপ যা হোক—মুখে কিছু বাধে না।"—হেসে ফেলে আরো কী যেন ব'লতে যাচ্ছিলেন জয়ন্তীর মা—পাড়ার রাধামাধবের মন্দিরের সন্ধ্যারাতির শাঁখ-ঘন্টা বেজে উঠতে গলায় আঁচল দিয়ে কার উদ্দেশ্যে প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে মনের আকুল প্রার্থনা নিবেদন করলেন—'ঠাকুর, আমার জয়া যেন সুখী হয়।...........

জয়ন্তীর মন তা' হ'লে মিথ্যে বলে নি। যে মধুকর এতোদিন ধরে পুঞ্জ পুঞ্জ মধু সঞ্চয় ক'রে সাজিয়ে তুলেছিল জয়ন্তীকে আজ ক'দিন ধরে সে যে-না-শোনার বাঁশীর গুঞ্জরণে ওকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলেছিল তা তা হ'লে মিথ্যে নয়! সে দিনই হ'য়ে গ্যাছে ওদের দুজনকার শুভদৃষ্টি যে শুভলগ্নে জয়ন্তী গিয়েছিল বাবার সঙ্গে প্রথম কলেজে ভর্তি হ'তে। ও-ও এসেছিল ওই গাড়ীখানা চড়ে ওই কলেজেই ভর্তি হ'তে বাবার সঙ্গে। জয়ন্তীর বুকে ছবিটা এখনও শতদলে ফুটে আছে—ক্যামন লজ্জায় রাঙা হ'য়ে ফিরিয়ে নিয়েছিল মুখখানা যখন দেখতে পেলো যে, সুরেন বাবুও মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছেন ওদের দুজনকার দৃষ্টি বিনিময়। সুরেন বাবু নাকি জয়ন্তীর মতো অমন সুলক্ষণা মেয়ে দ্যাখেন নি—কাজলপারা চোখে অমন নরম ভিজে চাউনি—অমনদুধে-আলতা রং, চলন, গড়ন, শ্রীছাঁদ—সবকিছু অপূর্ব লেগেছে তাঁর চোখে। কলেজ থেকেই নাম-ধাম জেনে নিয়ে আজ তাই কথাটা পাকাপাকি ক'রে ফেললেন। মিত্রমশাইও মেয়ের এমন অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে আত্মহারা হ'য়ে পাকা কথাই দিয়ে এসেছেন। কতো বড়োলোক ও'রা—কোন্নগরে বিরাট বাড়ী, গাড়ী—প্রকাণ্ড উকীল সুরেন বাবু নিজে। ছেলেটি মোটে বি-এ ক্লাশে ভর্তি হ'য়েছে—কাঁচ ফুটফুটে দুধের চেহারা—জয়ন্তীর ভারী হাসি পেলো কথাটা শুনে—বয়স আর কতো হ'বে—বছর কুড়ির বেশী নয়—নামটীও চমৎকার—রজতশুভ্র।

কীসের উত্তেজনায় সারারাত ঘুমুতে পারলো না জয়ন্তী—জানলার ধারে শুয়ে জেগে দেখলো ভাঙ্গা মেঘের আড়ালে চাঁদের লুকোচুরি......... রজতশুভ্র! ....কী চমৎকার নামটী! ঠিক যেন চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে রাখা! রূপোর মতোই উজ্জ্বল—চাঁদের আলো ঠিক্‌রে পড়া রূপ!......নেহাৎ একবার আপত্তি না ক'রলে ক্যামন দ্যাখায়—জয়ন্তী তাই বাবাকে শুনিয়ে মায়ের কাছে আপত্তির একটা ক্ষীণ সুর তুলেছিল—"আমার পড়াটা মাটি ক'রে দিলে তোমরা! বেবী ইলারা কী ব'লবে?"

মা আলগোছে হেসে কী ব'লতে যাচ্ছিলেন—উত্তর দিলেন মিত্রমশাই—"ব'লবে, জয়ন্তী ডবল প্রোমোশন পেয়ে একেবারে বিয়ে পাশ ক'রেছে!"—বাবার হাসির তোড়ে জয়ন্তীর ক্ষীণকণ্ঠ ডুবে গিয়েছিল।.........

......সেই জয়ন্তী মা হ'তে চলেছে বিয়ের বছর না পেরোতেই। সুখবরটা এলো এক চমৎকার সকালবেলায় কোন্নগর থেকে। জয়ন্তীর মা বাগানে পুজোর ফুল তুলছিলেন—উত্তেজনায় সাজিখানা বাগানে ফেলে রেখেই ছুটে এলেন ভেতরে—

"শুনছো?"

মিত্রমশায় সবে দাড়িতে ক্ষুর বসিয়েছেন—স্ত্রীর অস্বাভাবিক কান্না মেশানো গলা শুনে চমকে চাইতে খ্যাঁচ ক'রে গালের মাংসের ভেতর ঢুকে গ্যালো ক্ষুরের খানিকটা অংশ ....জয়ার মার চোখের কোল থেকে টলটলে দুটো ফোঁটা আলগোছে ঝরে পড়লো—

মিত্রমশাই শুকিয়ে উঠলেন ভয়ে—"কী হ'য়েছে?"—

"জয়ার না-কি খোকা হ'বে"।

'বেশ!'—বাজপড়া ধড়ে সম্বিত ফিরে পেলেন মিত্রমশাই—হো-হো শব্দে হাসিতে ফেটে পড়লেন তিনি—...... "এক বেটী রাক্ষুসী নিশ্চয়ই আসছে, নইলে আসতে না আসতেই এতো ভালো বেসে দাদুর দাড়িতে চুমু খেয়ে রক্ত বার ক'রে".........হাসি যেন তাঁর থামতেই চায় না......

"বেশ আক্কেল যা হোক—আগেই বলছো মেয়ে হ'বে!"

"অমনি হিংসে হ'লো?......... তা' তুমি ছিঁচ্-কাঁদুনীর মতো কেঁদে ফেল্লে ক্যানো?

"কাঁদলাম আবার কোথায়?"—আঁচল দিয়ে চোখের কোণ মুছে বল্লেন জয়ার মা—"কিন্তু ওইটুকুন মেয়ের ছেলে হ'বে?...... দূর—তা'কি হয়?"

"নাঃ তা হ'বে ক্যানো?"—মিত্রমশাই মুচকি হাসেন—"নিজের কীর্তি কারখানা ভুলে গ্যাছো বুঝি?"

"তুমি পণ্ডিতমশাই থামো তো! হাতগুণতে জানেন কি না?......আমার বয়স তখন অনেক বেশী!"—ভ্রূ নাচিয়ে বলেন জয়ার মা—নতুন বউয়ের লজ্জা-রক্তিম দিনগুণোয় ফিরে গিয়ে রাঙিয়ে ওঠেন তিনি অকারণেই—মনে পড়ে কী লজ্জাতেই কেটেছিল ক'টা দিন কথাটা জানাজানি হ'তে...

"তা' বই কি!"—খুনসুটী ক'রতে ছাড়েন না মিত্রমশাই—"কোলে করেই এসেছিলে যে!"

"খুব বাপ যা হোক!"—কৃত্রিম কোপে বড়ো বড়ো চক্-চকে চোখে ধমকে দ্যান জয়ার মা—হাসিটা মুখে লেগেই থাকে—"কথার কী ছিরি! এতোটুকু লাগাম নেই মুখে!"

"ক্লাশের বন্ধুরা তো ওই ব'লেই ক্ষ্যাপাতো আমাকে।"

"যাঃ-ও".........

সত্যি—এই সে দিনের কথা! মনে পড়ে কী লজ্জাতেই পড়েছিলেন মিত্রমশাই—যেদিন গীতা, সতী, মঞ্জশ্রী—আরো কারা যেন কিছু না ব'লে ক'য়ে হঠাৎ একদিন বিকেলে ও'দের তখনকার বৌবাজারের ভাড়া বাড়ীতে এসে হাজির। স্কটিশে পড়েন তখন তাঁরা। ছেলেবেলাতেই বিয়ে হ'য়েছিল মিত্রমশাইয়ের মায়ের জেদে—ক্লাশের বান্ধবীরা কার মুখে শুনেছিল ও'র ছেলে হবে— না বলে কয়ে ওরা তাই সদলবলে এসে হাজির হয়েছিল কথাটা সত্যি কি না পরখ ক'রতে। মনে পড়ে মুখরা গীতা ও'দের দুজনকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে মিত্র-জায়াকে বলেছিল—"দেখি, খুকি তোমার মুখখানা।"

টিপ্পনী কেটেছিল সতী—"চোখে তোর টেলিভিশন আছে নাকি গীতা, কোন খুকীর মুখ দেখতে চাস তুই?" ......সে কী হাসি—কী হুল্লোড়েই সমস্ত বিকেলটা কেটেছিল সেদিন।......ছোট বোন বাণী আবার শয়তানী ক'রে ব'লে দিয়েছিল যে, মিত্রমশাই বউকে পাশের ফ্লাটে লুকিয়ে রাখার ফন্দী এ'টেছিলেন—শুনে হাসির বান ডেকেছিল... সেই বছরেই জয়ন্তী এসেছিল মা'র কোলে—এই তো সেদিনের কথা সব।......সেই জয়ন্তীরও ছেলে হ'বে!

মা'র তর সইলো না—বিকেলে মিত্রমশাইকে নিয়ে কোন্নগরে এলেন তিনি.........জয়ন্তীকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেও যেন বিশ্বাস হয় না—"হ্যাঁরে, সত্যি?"—বুকভরা প্রতীক্ষার আগ্রহ নিয়ে মেয়ের মুখের দিকে চান তিনি।

"জনি না, যাঃ-ও"—লজ্জায় লাল হ'য়ে মায়ের বুকে মুখ লুকোয় জয়া—

মা ভুলে যান যে জয়া তাঁরই মেয়ে—ও'রা যেন পরস্পর সখী—বিয়ের পরে এই বয়সের মেয়ে আর মা অনেকটা তাই হয়ে পড়ে। জয়ার মাথাটা নিবিড়ভাবে চেপে ধরে বলেন মা—"নাঃ, তা তুমি কেমন ক'রে জানবে?"

"মা যেন কী"— লজ্জা-মাখা হাসিতে রাঙিয়ে ওঠে জয়ন্তী।............

মায়ের মন ভালো খবর যেন বিশ্বাসই হ'তে চায় না।

"হ্যাঁরে, জামাইকে দেখছি নে?"

"তোমাদের খোকন জামাই তোমাদের আসতে দেখে পালিয়েছে বাড়ী থেকে"—জয়ন্তী হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে।

"কী ছেলেমানুষি দ্যাখো তো?" মা-ও হাসি চাপতে পারেন না.........সত্যি ভারী লাজুক ছেলেটী.........

......"আহা, ভারী লাজুক! লজ্জাবতী লতা!......... তুমি পালালো ক্যানো মা আসবে শুনে?"—রাত্রে উত্তেজনার আনন্দে জয়া জিজ্ঞাসা করে রজতকে।

"মা এসেছিলেন হবু-ছেলের মাকে দেখতে—আমাকে নয়।"

"ক্যানো, তুমিও তো হবু-ছেলের বাবা।"

"ছেলে না হাতী, হবে তো একটা মেয়ে"—জবাব দেয় রজত।

লজ্জা ভুলে যায় জয়ন্তী—"দেখো, ঠিক ছেলে হবে—নাম রাখবো জয়ন্ত।"

"ও ব্‌বাবা! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি!"—রজতের হাসির জোয়ার লজ্জা ছিটিয়ে দেয় জয়ার মুখে চোখে...... "ঠিক মেয়ে হ'বে দেখে নিও—আর নাম হ'বে 'রাক্ষুসী।' আবার প্রচণ্ড হাসি।

রাক্ষুসী! কী অলুক্ষুণে নাম! কীসের ভয়ে হঠাৎ ফ্যাকাশে হ'য়ে যায় জয়ন্তী...... বুকের ভেতরে ক্যামন খামচাতে থাকে...... "কী হ'লো?"—রজত ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি দুহাতে ধরে ফ্যালে জয়ন্তীকে...... জয়ন্তী সামলে নেয়—"কিছু নয়"—মুখে ফুটে ওঠে শীতের সন্ধ্যার ম্লানিমা।

"বাবাঃ, তুমি যা ভয় খাইয়ে দিয়েছিলে।"......

কিন্তু সত্যিই ভয়ের কারণ ঘটলো মাঝরাতে..........., জয়ন্তীর কিছুতেই ঘুম আসছে না.........মনে হচ্ছে কারা যেন ওকে ঘিরে ভেসে বেড়াচ্ছে—ফিস্‌ফাস্‌ কথা ব'লছে অজানা ভাষায়......কতগুলো অশরীরী প্রেত যেন হাঁ ক'রে মুখ বাড়িয়ে অন্ধকারে গিলতে আসছে ওকে.........বাইরে জমাট বাঁধা আঁধারের বুকে জ্বলছে হাজার হাজার ক্ষুদে রাক্ষুসে চোখ......জানলার বাইরে চোখ রেখে তাই দেখতে দেখতে একসময় ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে চীৎকার ক'রে জাপটে ধরলো রজতকে......সবাই এসে জড়ো হয়েছে.........ভারী লজ্জা পায় জয়ন্তী—একে বউ-মানুষ তায় এই অবস্থা—মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারে না......রজত নানান্‌ গাল-গল্পে ভুলিয়ে রাখতে চায় ওকে—নানা রকমে ভরসা দেয়—কিন্তু কোনো আশ্বাসই বুকে ভরসা জাগিয়ে তোলে না ......আর থাকতে না পেরে শেষে একদিন এমনি নিঝুম রাতে কেঁদে ফ্যালে জয়ন্তী—"আমাকে মার কাছে নিয়ে চলো—এখানে থাকলে আমি বাঁচবো না।" বাধ্য হয়েই সাপুরে পাঠিয়ে দিতে হয় জয়ন্তীকে।.........

প্রথম ছেলে হ'বে......ঠিক হ'লো মা'র কাছেই থাকবে জয়া—একেবারে ছেলে কোলে ক'রে যাবে কোন্নগরে......

জয়ার মা'র দুপুরগুলো এখন আর দীর্ঘ নয়—কতো কাজ তাঁর—রকম রকম কাঁথা সেলাই, জামা সেলাই, বিছানা তৈরী—আরো কতো কী!......

দিন এগিয়ে আসে—নানান্‌ জল্পনা হয়—জয়ার মা বাবার মধ্যে—হাসপাতালে না গিয়ে বাড়ীতে ছেলে হ'লেই যেন ভালো হয়;—কিন্তু একে আজকালকার রেওয়াজ—তায় দিনকাল খারাপ—ভগবান না করুন—তেমন যদি কিছু হ'য়েই পড়ে—হাসপাতালে সে সব দিক দিয়ে নিশ্চিন্দি—তা' ছাড়া কোন্নগরের ওদেরও সবাইকার মত হাসপাতালেই পাঠানো——জয়াকে তো রাখা হবে কেবিন ভাড়া ক'রেই—ডাক্তারও সব থাকবে বড়ো বড়ো—ভয় কী!

'সাধ' খেয়ে খেয়ে মিষ্টিতে ঘেন্না ধরে গ্যাছে জয়ার—বাক্স বোঝাই কাপড় জমে উঠেছে......থালা থালা মিষ্টি মা পাড়ার মেয়ে বউদের ডেকে খাওয়ান—"দেখো মা, তোমরা আশীর্বাদ ক'রো জয়ার যেন শুভেলাভে চাঁদপানা খোকা হয়"—

'নিশ্চয় হ'বে কাকীমা"—উত্তর দেয় ওরা—"আমাদের আশ মিটিয়ে সন্দেশ খেতে হ'বে না" সবাই হাসে, জয়াও হাসে—শুক্লা পঞ্চমীর ম্লান পাণ্ডুর চাঁদের আভা ফুটে ওঠে ওর মুখে। একান্তে টেনে নিয়ে যায় ওপাড়ার রমেনদা'র বউকে—

"হ্যাঁ, বউদি, ব'লো না কী হ'বে—বড্ডো ভয় লাগছে, আমার।"

ওর অধীরতায় হেসে ফেলে বউদি "হ'বে আর কী? নিজেই টের পাবি"...... একটা পাষাণ যেন ঠেলে ওঠে জয়ার বুকে—ওর নিঃশ্বাসের পথ বন্ধ হ'য়ে যাবে না কি! কিছু ভালো লাগে না ওর—না খেতে—না পরতে—না বসতে—না শুতে......

মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বারে বারে জিজ্ঞাসা করেন জয়ার কী খেতে সাধ...... নিজের মনে তলিয়ে দ্যাখেন জয়া হ'বার সময় তাঁর কী কী খেতে ইচ্ছে যেতো—জয়া যে ও'রই মেয়ে। মায়ের রকম দেখে জয়া হাসে মনে মনে—ওর কী জানি ক্যানো কেবলি মাংস খেতে লোভ হয়......

সেদিনও জয়া বায়না ধরেছে মাংস খাবে ব'লে—

"কিন্তু মা, এই অবস্থায় আর এই গরমে রোজ রোজ মাংস খাওয়া কী ভালো?"

"আমার কী দোষ—পেটে যে রাক্ষস এসেছে"—নিজের অজান্তেই কথা ক'টা বলেই জয়া যেন ক্যামন হ'য়ে যায়!

"ঠাকুর ঝি"—মা'র ভয়ার্ত চীৎকার শুনে ছুটে আসেন পিসীমা...... জয়া ততক্ষণে সামলে নিয়েছে...... "ছিঃ মা, অমন অলুক্ষুণে কথা ব'লতে নেই—পেট থেকে না পড়তে কি বিশ্বাস আছে?"...... মা মনে মনে শঙ্কিত হ'য়ে ওঠেন —মা কালীর দোরে জোড়া বলি মানত করেন।

হঠাৎ এর পরে ক্যানো যেন ক্ষেপে গ্যালো জয়ন্তী রজতের জন্যে—রজতকে সব সময় ওর কাছে থাকতে হ'বে ......সে কাছে না থাকলেই যেন বিভীষিকাগুলো নেচে বেড়াতে সুরু ক'রে দ্যায় ওকে ঘিরে......

"তুমি এমনধারা বেহায়াপনা সুরু ক'রে দিলে ক্যানো বলো তো?"—রজত একটা আদরের চিহ্ন এঁকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

"আমার বড্ডো ভয় করে—তুমি কাছে না থাকলে কেবলি মনে হয় আর বুঝি তোমাকে দেখতে পাবো না!...... আচ্ছা আমি যদি মরে যাই, তুমি খুব কাঁদবে তো?"

"ছিঃ—আবার পাগলামো করে!......ও কথা বলতে নেই।"—জয়ন্তীর কোঁকড়া চুলের রাশির মধ্যে আঙ্গুল ক'টা ডুবিয়ে দিয়ে বলে রজত।

"না গো না, আমি মরে গেলে তোমার যে কষ্ট হ'বে—সে আমি সইতে পারবো না!......তোমাকে ছেড়ে থাকতেই পারবো না আমি।"

রজত এ প্রসঙ্গ চাপা দিতে চেষ্টা করে—। "তোমাকে আজকাল যা চমৎকার দেখতে হ'য়েছে! দিদিমা সেদিন ব'লছিলেন—'মেয়ের মা না কি সুন্দরী হয়।"

"ক্যানো? দিদিমা কিচ্ছু জানেন না। ছেলে হ'তে হ'লে মাকে কুচ্ছিৎ হ'তে হ'বে এমন কোনো নিয়ম আছে না কি?"

সত্যি, মাতৃত্বের গৌরবে কী সুন্দরীই না হ'য়েছে জয়া —ঠিক যেন বিকচোম্মুখ একটি শতদল!

দিন ঘনিয়ে আসে—দুশ্চিন্তায় মা ওঠেন শুকিয়ে। ঘুম পালিয়েছে তাঁর চোখ থেকে......রাত্রে বারে বারে জেগে দ্যাখেন জয়া ঠিকভাবে শুয়ে আছে কি না—ছেলের বুকের ধুক্ ধুক্ শব্দ কাণ পাতলে শুনতে পাওয়া যায় কি না ......জয়া কোনো কোনো দিন জেগে পড়ে—অনুযোগ দ্যায় —"ক্যানো মিথ্যে জেগে রাত কাটাচ্ছো মা?' মেয়ের কাছে ধরা পড়ে লজ্জা পান তিনি—"আগে মা হ'—তখন টের পাবি।"

......আজ ক'দিন থেকেই জয়ার শরীর ভালো যাচ্ছে না —ভেতর থেকে কে যেন খামচে ধরে বারে বারে—মুচড়ে ওঠে ওর সর্বশরীর—ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে মাকে জড়িয়ে ধরে জয়া —"ভয় কি মা, এই তো রয়েছি আমি"—জয়ার মাথায় অভয় বুলিয়ে দেন মা—"তুমি তখন আমার কাছে থাকবে তো?—মাকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করে জয়া—মা'রও বুকে একটু একটু ক'রে কে যেন পাষাণ চাপিয়ে দ্যায়।......

সেদিন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয় হয়—রজতের আসবার সময় পেরিয়ে গ্যাছে অনেকক্ষণ—অথচ তার দ্যাখা নেই। জয়ন্তী ছটফট ক'রতে লাগলো......কিছু হয় নি তো?...... বুকের ভেতরটায় ধড়াস ধড়াস ক'রতে লাগলো ওর...... দুশ্চিন্তার বোঝা সইতে না পেরে উঠে এলো ছাদে রাস্তা দিয়ে রজতের গাড়ী আসছে কি না তাই দেখতে...... আলসেতে আলগোছে ভর দিয়ে জয়ন্তী চেয়ে আছে রজতের পথের দিকে অধীর আগ্রহে...... ওপারে একতলা বাড়ীটার পেছনে এলিয়ে পড়ে আছে ধু ধু করে মাঠ...... সূর্য্য পাতাল প্রবেশ ক'রছে মাঠের মাটি ফুঁড়ে—একখণ্ড ধূসর মেঘের কালো মুখে বিদায়ী সূর্য্য আবির ছড়িয়ে দিয়েছে—আকাশ উঠেছে রাঙিয়ে...... জয়ন্তী কতোক্ষণ চেয়েছিল একদৃষ্টিতে খেয়াল নেই......চমক ভাঙ্গলো রূপালী আলোর একটা ঝলক আকাশের বুক চিরে পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসতে......আকাশের কোণে দ্যাখা সেই মেঘের মেয়ে—এলিয়ে দিয়েছে তার কালোবরণ চুল দেখতে দেখতে ঢেকে গ্যালো আকাশের শ্যাম-মুখ...... আবার একঝলক আলো...... চমৎকার লাগছে জয়ন্তীর...... কৃষ্ণ প্রতিপদের চাঁদ সোণার থালায় শরতের স্নিগ্ধতা পরিবেশন ক'রতে উঠবে কিছুক্ষণ বাদে...... মেঘে মেঘে চলেছে কোলাকুলি—ফুটে উঠছে হাসির আলো...... জয়ন্তী চোখ ফেরাতে পারছে না—কী সুন্দর মুখখানা ভেসে উঠেছে মেঘের কোলে—একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে...... ও কি! ......দেখতে দেখতে অমন সুন্দর মুখখানায় ফুটে উঠলো ভ্রূকুটির কুটিলতা......কষের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এলো বর্শার ফালের মতো দুটো দাঁত......আলুথালু চুলগুলো ফেঁপে ফুলে সাপের মতো ফুঁসছে.........জয়ন্তীর বুকের রক্তে তুফান লাগলো—একটা তাড়কা রাক্ষুসী হাঁ ক'রে ছুটে আসছে আকাশের পথ দিয়ে আলুথালু বেশে পাগলের মতো—জয়ন্তীকে গিলে খাবে বুঝি...... ওর খলখল হাসিতে ফেটে পড়ছে বিদ্যুতের রাশি—দাঁতের কড়মড়িতে খান্ খান্ হ'য়ে ভেঙে পড়ছে আকাশের নীলিমা...... জয়ন্তী সম্মোহিত হ'য়ে চেয়ে আছে...... হঠাৎ আকাশটা বুঝি রাক্ষুসীর বীভৎস রূপ দেখে ভয়ে কালীমেরে গ্যালো —চীৎকার ক'রে লুটিয়ে পড়লো টুকরো টুকরো হ'য়ে মাটির পৃথিবীর বুকে......

মা এদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন জয়াকে—নীচে কোথাও না দেখতে পেয়ে তাঁর বুক উঠেছে কেঁপে—দ্যাখো দেখি পাগলী মেয়ের কাণ্ড—নিশ্চয়ই ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—এই দুর্য্যোগে আর এই অবস্থায় কেউ ছাদে যায়—

"জয়া—জয়া"—মা'র গলা উঠে আসছে সিঁড়ি দিয়ে

"কী মেয়েই যে হ'য়েছে...... জয়া—"—কোনো সাড়াশব্দ নেই! ওদিকে চলেছে প্রকৃতির উন্দাম তাণ্ডবলীলা! বুক-ভরা উৎকণ্ঠা বেরিয়ে আসছে মা'র গলা ঠেলে—প্রায় ছুটে এলেন তিনি......

"ঠাকুরঝি, ঠাকুরঝি! শীগ্‌গির দ্যাখোসে কী সর্ব্বনাশ হ'য়েছে"......

ভয় পেয়ে ছুটে এলেন পিসীমা......

"কে'দে কী ক'রবি? মাথার দিকে ধর...... একেবারে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই ভালো।"..... ট্যাক্সী ছুটেছে...... মা'র কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে জয়া—নিথর নিস্পন্দ......মা'র দু'চোখ বেয়ে নেমেছে বাঁধভাঙ্গা অশ্রুর বন্যা......একটা অস্বস্তির পাহাড় জমে উঠেছে যেন ট্যাক্সীটার ভেতরে—কারু মুখে কথা নেই। সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে সুরু হ'য়েছে একটা অশরীরী প্রেতের নাচন...... জমাটবাঁধা হিমশীতল অন্ধকার শুয়ে আছে রাস্তা জুড়ে ......দূরে রেল লাইনের ওপারে জ্বলছে শয়তানের একজোড়া লাল চোখ...... আবার একটা প্রচণ্ড আর্ত্তনাদ ক'রে বিশ্বপ্রকৃতি চুরমার হ'য়ে ভেঙ্গে পড়লো ঠিক যেন ট্যাক্সীটারই মাথার ওপর—

"বউ, বউ—দ্যাখ কী হ'য়েছে"—পিসীমার চাপা চীৎকারে চমকে উঠলেন মা—ইস্!...... হাউমাউ ক'রে কে'দে উঠলেন তিনি......

"নে, কান্না রাখ"—ধমক দিলেন পিসীমা—"জয়াকে সামলা"...... "এ রাক্ষুসী ঠাকরুণ মা'কে এখন না খায়...... কী চমৎকারই না দেখতে হ'য়েছে!......কিন্তু এটা কাঁদে না ক্যানো—গ্যালো না তো?"......

ক্লেদাক্ত জয়াকে নামানো হ'লো ষ্ট্রেচারে ক'রে—সারা দেহ পাথরের মতো হিম......নার্স ডাক্তাররা বকাবকি সুরু ক'রলেন—বকুনি নয় সইবে—জয়াকে এখন ফিরে পেলে হয়......

কিন্তু জয়া আর ফিরে এলো না—......

এক ফোঁটা মেয়েটাকে বুকে চেপে ধরে হুহু ক'রে কাঁদেন মা—পিসীমা ক্যানো যেন দেখতে পারেন না ওটাকে—

"ও রাক্ষুসীকে আবার অতো আদিখ্যেতা ক্যানো?"

..."না—না '—মা আরও নিবিড়ভাবে বুকে চেপে ধরেন প্রাণের পুঁটুলিটাকে......' ও যে জয়ার চিহ্ন—সেই নাক—সেই মুখ—সেই চোখ......জয়া-ই যে আবার ছোট্টটি হ'য়ে ফিরে এসেছে তাঁর কোলে......

তিন বিশ্বের স্বপ্ন

বটকৃষ্ণ দে

সাহানা সেন ঃ

সাহানা সেনের নাম শুনেছো নিশ্চয়,
আমার কাছেই! তাকে কোনো দিন আমার হৃদয়
দিয়েছি একান্ত করে। কামনায় থরোথরো বুক
ভেবেছে, জ্যোৎস্নার জল শিশিরের সুর নিয়ে
ঝরুক, ঝরুক!.........
তারপর রাত্রি শেষ; ঝরো ঝরো দিন; স্বপ্নহীন চোখ;
হঠাৎ হারালো যেনো সাহানা সেনের চোখে
জ্বলে-ওঠা রাতের আলোক!

বিশাখা বসু ঃ

বিশাখা বসু, তোমাকে ভালোবেসেছি কোনোদিন
সকালে আলো, বিকেলে সোনা ছড়িয়ে মুখে-চোখে
তোমাকে নিয়ে অনেক দূরে, রঙের মেঘলোকে
গিয়েছিনু আমি; তাজায় এ'কে নরম নভোনীল
নির্জ্জনতা, নীল-ঝরানো নিবিড় আশ্লেষে,—
তুমিও, আহা, হাওয়ার দেশে হারালে অবশেষে!

হৃদয়ী দে ঃ

এই যে এখনো একা-একা আমি একান্তে আঁকি নাম,
কার নাম? হায়, জানি না কী-রং-এ রাঙা হ'য়ে উঠলাম
আজকে; কে আর নীল-সবুজের জয়-জয়ন্তী রাগ
বাজাবে, ধূসর ঝরা-পাতা-ভরা চৈত্রের অনুরাগ
কে আর ভোলাবে, কোমল কুঁড়ির অনুলিপি আঁকে সে?
রিক্ত চৈত্রে চিত্রকর সে হৃদয়, হৃদয়ী দে!!

বসন্তের ফুল

মোহিত লাল মজুমদার

[১]

বসন্তের ফুল আর বসন্তের পাখী;
একটি সে ঝ'রে যায় খরসূর্য্যতাপে,
দু'টি পৌর্ণমাসী শুধু শাখা-বৃন্তে যাপে
মদির মাধবী নিশা। বিস্ময়-বিস্ফার আঁখি
ক্ষণেক দাঁড়ায় কাল; দিতে নারে ফাঁকি
তবু তারে দুদণ্ডের বেশী—প্রাণ কাঁপে
থরথরি', রূপ-মধু-সৌরভের পাপে
লভে মৃত্যু, ধূলিতলে শীর্ণতনু ঢাকি'।
ফুলের পেলব প্রাণ পলকে ফুরায়;
বর্ষ সাথে আয়ুঃশেষ—সে যে শুধু রূপ!
আলোকে আঁধারে বোনা বর্ণ-রেখা-স্তূপ!
কুজ্ঝটি-অম্বরে; সে যে ফেন-বিম্ব প্রায়
হরিত-সায়রে ফুটি' তখনি মিলায়,
মধু শেষে ভোলে তারে মানস-মধুপ।

[২]

বসন্তের পাখী, সে ত' মৃত্যু নাহি জানে,
উড়ে যায় দেশান্তরে ঋতু অনুসারি'—
সে জানে কালের ছন্দ, পক্ষ মুক্ত করি'
ধায় নব-জীবনের মাধুরী-সন্ধানে।
পুষ্পসম রহে না সে মৃত্তিকার ধ্যানে
মমতার বৃন্ত-বন্ধে আপনা সম্বরি';
রূপ নয়, দেহ নয়—ঊর্দ্ধাকাশ ভরি'
ভাবের অবাধ-ধারা ঢালে গানে গানে।
গন্ধ আর বর্ণ যার প্রাণের পশরা,
মর্ম্মমূলে বহে শুধু মৃত্তিকার রস,
নিমেষে ফুরায় তার আয়ুর হরষ;
ধরার ধূলার ফাঁদে দেয় না যে ধরা,
দেশ-কাল নাই তার, নাই ফোটা-ঝরা—
অনন্ত বসন্ত তার, অনন্ত বরষ!

[৩]

সেই মত আমি কবি—একদা হেথায়
ধরণীর ধূলিতলে বিছায়ে আপনা
রূপ-মধু-সৌরভের স্বপন-সাধনা
করিনু মাধবী মাসে; ইন্দ্রিয়-গীতায়
রচিনু তনুর স্তুতি; প্রাণ-সবিতায়
দিনু অর্ঘ্য, অঞ্জলিয়া প্রীতি নির্ভাবনা—
নিষ্ফল ফুলের মত অচির-শোভনা
সুন্দরের কামনারে গাঁথি' কবিতায়।

বসন্তের পাখী নই, বসন্তের ফুল,
ফুটে ঝ'রে গেছি তাই নীরস নিদাঘে;
ক্ষণিকের হোলি-খেলা ফাগুনের ফাগে—
মরণের হাসি ভরা জীবনের ভুল!
মোর স্মৃতি নিদ্রাভঙ্গে স্বপন-সমতুল—
ডুবে গেছি চেতনার অতল তড়াগে।

[বঙ্গশ্রী—১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৯]

[জন্মঃ ১২৯৫, ১১ই কার্ত্তিক—মৃত্যুঃ ১৩৫৯, ১০ই শ্রাবণ]

মোহিতলালের মহাপ্রয়াণ

অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

বাংলা দেশ, বাঙালী জাতি, বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যাঁর জাগ্রত ধ্যান ও নিদ্রার স্বপ্ন ছিল ,সত্য ও সুন্দরের আরাধনা যাঁর জীবনের ব্রত ছিল, অসত্য, অশিব ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে যাঁর বজ্র নিয়ত উদ্যত ছিল, বঙ্গবাণীর সেই একনিষ্ঠ সাধকের কণ্ঠ আজ মূক, লেখনী স্তব্ধ;— জীবনে যাঁকে অমৃত ও হলাহল উভয়ই আকণ্ঠ পান কোরতে হয়েছিল, সাহিত্য-সংগ্রামে যিনি সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত-চিহ্ন-অলঙ্কার ধারণ কোরেছিলেন, আজ তিনি সেই লোকে মহাপ্রয়াণ কোরেছেন, যেখানে প্রশস্তি বা গ্লানি মানুষকে স্পর্শ কোরতে পারে না।

যিনি 'সত্যসুন্দর দাস' এই সার্থক ছদ্মনাম ধারণ কোরেছিলেন, তিনি সাধনার আদি পর্ব্বে প্রধানত সুন্দরের আরাধনায় নিমগ্ন ছিলেন এবং উত্তর পর্ব্বে প্রধানত সত্যের উপাসনায় আত্মনিয়োগ কোরেছিলেন। 'মা ব্রুয়াৎ সত্যম-প্রিয়ম্' এই নীতিবাক্য তিনি চিরদিন লঙ্ঘন কোরেছেন, তাই জীবনে তাঁর বার বার বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটেছে। সত্যের অখণ্ড রূপটি তিনি দর্শন বা ধ্যান কোরেছেন কি না, তা' নিয়ে তর্কযুদ্ধের অবকাশ আছে কিন্তু এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, তাঁর মন, মুখ ও ব্যবহারে কোনো বিরোধ ছিল না; ভেতরের মানুষ ও বাইরের মানুষে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। তাঁর ভেতর রূঢ়তা ছিল, কিন্তু কপটতা ছিল না, আত্মাভিমান ছিল, কিন্তু বিনয়ের অভিনয় ছিল না। তাঁর কাঠিন্যের আবরণ ভেদ কোরে যাঁরা 'আসল মানুষটির' সন্ধান পেয়েছেন, তাঁরা যেমন তাঁর প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব কোরেছেন, তেম্নি যাঁরা সে আবরণ ভেদ কোর্‌তে পারেন নি অথবা তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হোয়েছেন তাঁরা তাঁর প্রতি তেম্নি প্রবল বিদ্বেষ অনুভব কোরেছেন। সাহিত্যের কমলবনে যখনি তিনি মত্ত হস্তীকে প্রবেশ কোর্‌তে দেখেছেন, তখনি অঙ্কুশের আঘাতে তাকে জর্জ্জরিত কোরেছেন। মধু-বঙ্কিম-বিবেকানন্দের ভাবধারার উত্তরাধিকারী মোহিতলালকে যাঁরা প্রাচীনপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে উপেক্ষা কোরেছেন, তাঁরা তাঁর সম্যক পরিচয় পান নি, আবার যাঁরা তাঁকে আধুনিকতার অগ্রদূত বলে প্রচার কোরেছেন, তাঁরাও তাঁর ব্যক্তি-সত্তার সমগ্র পরিচয়টি লাভ করেন নি। ফলত, এ যুগের সাহিত্যিকদের ভেতর মোহিতলালকে নিয়ে যত ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হোয়েছে, এমন আর কাউকে নিয়ে হয় নি।

মোহিতলাল দেহবিলাসী কবি কিন্তু ভোগ-সর্ব্বস্বতার কবি নন। অক্ষয় বড়ালের মতো তাঁর কবিতায় তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা আছে, সত্যেন দত্তের মতো তিনি অনুবাদের দ্বারা ও আরবী ফার্সি প্রভৃতি বৈদেশিক শব্দের চয়নের দ্বারা বাংলার কাব্য-লক্ষ্মীকে অলঙ্কৃত কোরেছেন। তিনি আত্ম-সচেতন শিল্পী, শব্দচয়নে তাঁর দৃষ্টি সর্ব্বদা সজাগ, তাই তাঁর কবিতা নির্ঝরিণীর মতো স্বতউৎসারিত হয় নি। কিন্তু তিনি এমন কয়েকটি কবিতা রচনা কোরেছেন যা' তাঁর নিজস্ব ভাব-কল্পনায় সমৃদ্ধ, এগুলো বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ হোয়ে থাক্‌বে।

মোহিতলালের জীবিতকালেই কবি মোহিতলালের একরূপ মৃত্যু হোয়েছিল কিন্তু তিনি সমালোচক মোহিত-লালরূপে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ কোরেছিলেন। এই পুনর্ভবত্ব বাঙালীর পক্ষে পরম সৌভাগ্যেরই কারণ হোয়েছিল। বাঙালীর দুর্ভাগ্য, সমালোচনা সাহিত্যে তাঁর আরব্ধ কর্ম্ম অসমাপ্ত রয়ে গেল। অবশ্য, সমালোচক মোহিতলাল নিতান্ত প্রাক্তন সংস্কারের বশেই মাঝে মাঝে কবিতা-রচনা ও অনুবাদ কোরেছেন। বিদেশী ছোট গল্পের অনুবাদ প্রভৃতি সাহিত্য-কর্ম্মও তিনি কোরেছেন, কিন্তু সেখানে তাঁর সত্যিকার পরিচয় মেলে না। কাব্য-বিচারে তিনি যে শ্রদ্ধা ও গভীর সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যিই বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। এ দিক দিয়ে তিনি অনাগত যুগের সমালোচকদের আচার্য্যস্থানীয় হোয়ে থাকবেন। সবাই জানেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী-প্রতিভার একটা সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটেছিল এবং তারি ফলে বাংলার সাহিত্যও অভাবনীয় সমৃদ্ধি লাভ কোরেছিল। এই শতাব্দীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি—বিদ্যাসাগর, মধু-সূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দের অন্ত-র্জীবন বিশ্লেষণে যে মোহিতলাল গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, একথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কোর্ব্বেন। তাঁর 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', 'কবি শ্রীমধু-সূদন', 'বঙ্কিম-বরণ', 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ বাংলার সমালোচনা-সাহিত্যে অক্ষয় সম্পদ হোয়ে থাকবে।

কাব্য-বিচারে তাঁর দৃষ্টি হয়তো সর্ব্বত্র নিরপেক্ষ নয়, কোথাও কোথাও তিনি বিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রামেও অবতীর্ণ হোয়েছেন কিন্তু তাঁর রচনায় সর্ব্বত্র এমন একটা বলিষ্ঠ পৌরুষ ও নির্ভীকতার এবং দৃষ্টিভঙ্গীর এমন একটা স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় মেলে, যা' অন্যত্র দুর্লভ।

আজ বাংলাদেশে মোহিতলালের গুণমুগ্ধ শিষ্যের সংখ্যা বিরল নয় কিন্তু তিনি যে দুরূহ তপস্যায় প্রবৃত্ত হোয়েছিলেন, তার কোনো উত্তরসাধক আজো বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন নি। মোহিতলালের মহা-প্রয়াণে বাংলা-সাহিত্যের যে সিংহাসন শূন্য হোলো, কতো দিনে তা' পূর্ণ হবে, কে জানে?

কবি মোহিতলাল

শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলাসাহিত্যের দারুণ দুর্দ্দিনে মাত্র ৬৪ বৎসর বয়সে তাহার একজন দিক্‌পাল চলিয়া গেলেন। বাঙালী তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান দিলে হয়ত' আরও কিছুদিন বাঁচিতেন। অভাব অনটনের মধ্যে তাঁহার দিন কাটিয়াছে কিন্তু তপস্বীর মতো সে সব তুচ্ছ করিয়া বঙ্গবাণীর হাসিটি পান করিয়া তৃষ্ণা মিটাইয়াছিলেন। খুব বড় কবি ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় খুব বড় সমালোচক হইতে পারিয়াছিলেন। একজন বিখ্যাত ইংরাজ কবি ও সমালোচক বলিয়াছেন—

"Poets are themselves the most proper, though I conclude, not the only critics."

কবিরা স্রষ্টা, সৃষ্টির ব্যাখ্যার দ্বারা আর যে এক নূতন সৃষ্টি করেন তাহাই যথার্থ সমালোচনা।

ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ইহাতে রাগ-দ্বেষ নাই, 'পলিসি' নাই, কাঞ্চন-সংস্পর্শে ইহা কলুষিত নহে। সাধারণে সৃষ্টির যে সৌন্দর্য্যটুকু সহজে ধরিতে পারে না, সমালোচক প্রেরণা ও দিব্যদৃষ্টির বলে সে সৌন্দর্য্যের রসরূপ উদ্‌ঘাটিত করেন। কবি মোহিতলালের ঐ প্রেরণা ও দিব্যদৃষ্টি ছিল।

এই দুইটি তাঁহার কবিতার প্রধান পরিচয়, তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য। সাহিত্যে সুরুচির প্রতিষ্ঠা তাঁহার অন্যতম শিল্পকর্ম্ম; এই বিষয়ে তাঁহার চেষ্টা সফল হইতেছে কি না তাহা দেখিবার অবসর তাঁহার ছিল না—তিনি সংস্কারকের অগ্নিতেজে লিখিয়াই চলিয়াছেন, বলিয়াই চলিয়াছেন—তাঁহার লক্ষীভূত লেখকেরা বিপুল পুলকবোধ করিতেছে, সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই।—

...."he went on refining,
And thought of convincing, while they thought of dining."

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার কবিতা ও সমালোচনার সামান্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যমাত্রের উল্লেখ সম্ভবপর; বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার বিরাট অবদান তাঁহার বিভিন্নমুখী প্রতিভার পরিচয়।

ইংরাজী ও সংস্কৃতসাহিত্যে, ভাষাতত্ত্বে ও ছন্দবিজ্ঞানে সুপণ্ডিত মোহিতলালের আধ্যাত্মিক মনোভাব, ঈশ্বরপ্রীতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, সুগভীর সহানুভূতি, তাঁহার কবিতা ও গদ্য-রচনায় পরিস্ফুট। স্থানে স্থানে তাঁহার ভাষা তত্ত্ব-গন্ধী ও অস্পষ্ট হইত, ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। Coleridgeও নিজের একটি রচনা (Ancient Mariner) সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"Your poem must eternal be,
Dear Sir! it cannot fail,
For 'tis incomprehensible
And without head or tail."

মোহিতলাল বঙ্গসাহিত্যে সমালোচনার আদর্শ ও পদ্ধতির অভাব খুঁজিয়া চেষ্টা করিয়াছেন—এমন একটি তত্ত্বকে ও এমন একটি আদর্শকে দৃঢ়রূপে স্থাপনা করিতে "যাহার সাহায্যে সর্ব্বকালের সকল কাব্য ও সর্ব্ববিধ কবিমানসকে একই প্রমাণে প্রমাণিত করা সম্ভব হয়।"

ইহা ব্যতীত একটি নূতন তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠায় দুঃসাহস করিয়াছেন—তাঁহার ভাষায়—"আমি খাঁটি আর্ট ও খাঁটি কাব্যসৃষ্টির মধ্যে একটা স্পষ্ট ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছি—এ দুঃসাহস এ পর্যন্ত কেহ করে নাই।" তাঁহার সহিত অনেকেই স্বীকার করিবেন, 'নিছক আর্টকর্ম্মকে কবিকর্ম্ম হইতে পৃথক না রাখিলে কাব্যবিচার সমস্যাজটিল হইয়া পড়ে; যে রূপ-কর্ম্মকে আমরা বাণীরচনা বলি, এবং যাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলিতে জীবন ও জগতের বিশিষ্ট রূপকেই রসোজ্জ্বল হইতে দেখি—তাহার মূল্য ও কাব্যের সেই বিশেষ অধিকারটিকে অগ্রাহ্য করিতে হয়।"

তাঁহার অধিকাংশ রচনার মুখ্য অভিপ্রায় রসনির্ণয়, তত্ত্ববিচার নহে। এই উপলক্ষ্যে দেশী-বিদেশী তুলনামূলক কাব্যসাহিত্য আলোচনা, নানাবিধ সৃষ্টিকর্ম্মের সাক্ষাৎ রস-সন্ধান এবং বহু লেখকের ব্যক্তিগত প্রতিভার পরিচয় দ্বারা তিনি বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

যে পাণ্ডিত্যকে তিনি সাহিত্য-রসবোধের জ্ঞাতি-শত্রু বলিয়াছেন, সে পাণ্ডিত্যের প্রভাব হইতে নিজেকে সম্যক্ মুক্ত করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার রচনার অপূর্ব্ব বাণী-লাবণ্য উচ্চ-শিক্ষিত সমাজের আনন্দ বর্দ্ধন করিত, অল্প-শিক্ষিত বা সমাজের নিম্নস্তরের লোকের মনকে দোলা দিত না।

Cheap popularity তিনি কামনা করেন নাই, সর্ব্ব-সাধারণের উপভোগ্য গল্প, উপন্যাস বা কবিতা তাঁহার নাই, 'স্বদেশী'র প্লাবনে তাঁহার প্রতিভার তরী ভাসান নাই—তথাপি তাঁহার বহু রচনায় দেশাত্মবোধ ও বঙ্গভারতীর প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা, বঙ্গসাহিত্যের অবমাননার প্রতি জ্বালাময় ঘৃণা, অন্যায়ের প্রতি ক্রোধ বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। রাজনীতিকে তিনি দূরে পরিহার করিয়া নৈষ্ঠিক সাহিত্যিক ঋষির ন্যায় শুধু সাহিত্য লইয়াই ছিলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টির দ্বারা তিনি এ যুগের বাঙালীর জাতিগত বৈশিষ্ট্য—ভাব ও ভাবনার কয়েকটি প্রধান লক্ষণ ধরিতে পারিয়াছিলেন। খ্যাত ও অখ্যাত কবিগণের রচনার মাধুর্য্য ও দোষগুণ নিরপেক্ষতার সহিত নির্ণয় করিয়া বাংলায় সমালোচনা-সাহিত্যের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের রচনার বিশ্লেষণে তাঁহার অনুপম সাহিত্য-সৃষ্টি কবি ও সাহিত্যিকগণের বিস্ময়স্বরূপ হইয়া থাকিবে। বঙ্কিম তাঁহার অন্যতম সাহিত্য-গুরু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জীবন-সন্ধ্যায় তাঁহাকে বঙ্কিম সম্বন্ধে বক্তৃতার জন্য নির্ব্বাচিত করিয়া গুণের আদর করিয়াছিলেন। মধুসূদনকে অনুশীলন করিতে করিতে তিনি মধুসূদনের ভাষা ভাব ছন্দ এমন কি শব্দচয়ন ও শব্দসৃষ্টির ইন্দ্রজালে ধরা দিয়াছিলেন। ঐ 'কবিপুরুষের' আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বঙ্গসাহিত্যকে নব নব সম্পদে ভূষিত করিয়া নিজে কবিপুরুষ হইয়া গিয়াছেন।

"অনুখন মাধব মাধব গোঙরিতে
সুন্দরী ভেল মাধাই"

উক্ত তিন মনীষীর বিশেষতঃ মধুসূদন সম্বন্ধে এইরূপ অপূর্ব্ব সমালোচনা শুধু যুক্তি ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা সম্ভব হয় নাই—ইহার মূলে ছিল ভাগবতী প্রেরণা। Coleridge সম্বন্ধে Shelleyর সুবিখ্যাত সমালোচনার সমতুল—

"You will see Coleridge : he who sits obscure
In the exceeding lustre and the pure
Intense irradiation for a mind
Which, with its own internal lightning blind,
Flags wearily through darkness and despair—
A cloud—encircled meteor of the air,
A hooded eagle among blinking owls"

মোহিতলাল দার্শনিকের মন ও কবির প্রাণ লইয়া বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সাহস ও অকপটতা, সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও প্রচণ্ড ভাবাবেগ ছিল তাঁহার বৈশিষ্ট্য। ভাষার উপর অগাধ অধিকার থাকায় গভীর হৃদয়-বেদনাকে অনির্ব্বচনীয় রূপ দিতে পারিয়াছেন।

দার্শনিক সন্ন্যাসী Schopenhauer-এর উদ্দেশ্যে "পান্থ" কবিতায় তাঁহার নিজের দুঃখজয়ী মনের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই—

"তোমারে স্মরিণু আজ জীবনের সায়াহ্ন বেলায়,
হে বিরাগী! হিন্দু বলি' পরিচয় দিলে বার-বার—
তুমি চিরমৃত্যু-লোভী; মোর ভয়—দেহের ভেলায়
কবে ডুবি, পারাপার করিতে এ জন্ম-পারাবার!

জানি না হিন্দুর কথা,—জানি শুধু, প্রাণের খেলায়
দুঃখেরে ডরে না কেহ, দুঃখে তবু হাসিছে সংসার!
তুমিও বলেছ তাই। হে উদাসী! তাই তোমা করি
নমস্কার।"

প্রকৃতি ও মানবতার উপাসকরূপে মোহিতলালকে তাঁহার কবিতার অন্তরালে দেখা যায়। মানবের প্রতি তাঁর কী

গভীর বিশ্বাস, Swinburne-এর মানব-বন্দনা এমন কি ছন্দ পর্যন্ত তাঁহাকে পুলক বিস্ময়ে আকৃষ্ট করিয়াছে।

অন্ধকারের রূপ অপরূপ বাণী-লাবণ্যে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে—

"—দিবা নিশা—দুই ভগিনীর
একজন স্বর্ণসূত্রে করিছে বয়ন
ধরার বরণবাস আলোক-দুকূলে!

অপরা সে, অস্তাচল-শিখর-শায়িনী,
জেগে থাকে নির্ণিমেষ—নিত্য খুলে দেয়
অসংখ্য সে তারকার সূচীমুখ দিয়ে
দিবসের সুদীর্ঘ সীবন!—অন্ধকার!
সান্দ্রস্তব্ধ সুগম্ভীর স্নিগ্ধ অন্ধকার!"

মোহিতলাল যাচনা মিনতির বিপক্ষে ছিলেন তাঁহার সুস্থ সবল মন ভয়কে জয় করিয়াছিল; মৃত্যুকে তিনি কবি-গুরুর মতোই দেখিতেন; "মরণেরে বাসি আমি ভালো।"

এ ভব-ভবনে আমি অতিথি যে তাহারি উৎসবে!
জন্ম-মৃত্যু—দুই দ্বারে দাঁড়াইয়া সে করে বন্দনা!"

পিতার আদেশে সশরীরে যমপুরে আগত নচিকেতা যখন যমের স্বরূপ দেখিতে চাহিল, শত প্রলোভনেও যখন অন্য-কোনও বর প্রার্থনা করিল না, মৃত্যুর স্বরূপ ও বিভীষিকার বিবরণ শুনিয়াও ভয় পাইল না—বরং দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—......প্রাণবলে, নহে নহে—

এক নহে মৃত্যু আর মরণ দেবতা"
মৃত্যু—সে যে সুনিশ্চিত দেহ-পরিণাম,
তাহারি শাসনতরে দণ্ডধর তুমি,
মৃত্যু হয় কালে কালে, তুমি মহাকাল!"

তখন আরও বহু পরীক্ষার পর, যম তাহার চিত্তে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার পূর্ণশ্রদ্ধা জাগিয়াছে দেখিয়া, বেদোক্ত অগ্নি-হোত্র বিধি সহজে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন—

—এই বার কহি শুন
আমার স্বরূপ—হে ব্রাহ্মণ! কহি তোমা
সেই বাণী—নিহিত যা' গহন গুহায়।
কহিয়াছি কিছু আগে অগ্নিহোত্র-বিধি—
সেই অগ্নি জ্বলিছেন দিব্যজ্ঞানরূপী
তোমারি অন্তরে! ওই দেহ চিতি তার,
প্রাণ হবিঃ, আমি তার সুচির-আহুতি।

বলবান, আত্মবান, প্রজ্ঞাবান যেই—
আপনারে আপনি সে দেয় বলিদান
জগতের যজ্ঞধূপে, মহোল্লাসে মাতি'।

বিশ্বপ্রাণে বিলাইয়া নিজ প্রাণধন
ভুলে' যায় হর্ষ শোক—চির উপরতি
লভে বীর, সুমহান আত্মার আলয়ে।—
আমি যজ্ঞ, আমি সেই অপরূপ হোম।

যেই অগ্নি সেই সোম!—কহি আরবার,
ওই দেহ সোমের কলস! যজমান
করে সোমযাগ—করে পান আপনি সে
আপনারে, আনন্দই হবিঃশেষ তার।

সে আনন্দ—সেই মৃত্যু—অমৃত-সোপান!
এই যজ্ঞ করেছিনু আমি, নচিকেতা,
তারি ফলে লভিয়াছি ধ্রুব অধিকার
যমলোকে; এই যজ্ঞ করে যেই জন
মৃত্যুঞ্জয়ী হয় সেই নিঃশেষে মরিয়া।

করি' স্নান যজ্ঞশেষে, সর্ব্বগ্লানিহারা
আশ্বিনের অভ্রসম, শুভ্র সুনির্মল,
মিশে যায় মহানভোনীলে!

মৃত্যুর রহস্য-কথা শুনিতে শুনিতে নচিকেতার নেত্র হইতে মায়াজাল খসিয়া পড়িল, চিত্ত নির্বিকার হইল এবং মুহূর্তে সংশয়মুক্ত হইয়া 'অন্তরে-বাহিরে সে মৃত্যুর স্বরূপ-রূপ দেখিতে পাইয়া 'চিরতরে মরিল'। যম তাহার উদ্দেশে যে প্রশস্তি জানাইলেন তাহা সৌন্দর্যে, মাধুর্যে, ভাবাবেগে ও ভাষার মনোহারিত্বে বাংলা কবিতার একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইয়া রহিবে।

"জীবনের অন্ধকার-দুয়ার খুলিয়া
এলে তাই মৃত্যুপুরে, স্বপ্নাতুর আঁখি,
সত্যের সন্ধানে! স্বপ্নশেষে এইবার
সুষুপ্তি-সাগর,—উদিবে তাহারি কূলে
সেই জ্যোতির্লোক,—চন্দ্রতারকার ভাতি
ম্লান যেথা, দ্যুতিহারা বিদ্যুৎ-বল্লরী!
অগ্নি যেথা চিত্রবৎ—নিষ্প্রভ মলিন!

হে ব্রাহ্মণ! হেরিলাম তোমার মাঝারে,
দেহজয়ী, কালজয়ী, মৃত্যুজয়ী সেই
পুরাণ-পুরুষে! যাঁর মহা-মহিমায়
ঊর্দ্ধ হ'তে মহানিম্নে পশিছে আলোক,

নিম্ন হ'তে ঊর্ধ্বে উঠে আহুতির ধূম—
স্বর্গে-মর্ত্ত্যে রহিয়াছে নিত্য-পরিচয়।
অমৃতের পুত্র তুমি—হে মর্ত্ত্য-বান্ধব।
মৃত্যুপুরী তীর্থ আজ তোমার পরশে,
তোমারি প্রসাদে আমি চির জ্যোতিষ্মান্।”

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মোহিতলালের কাব্য ও সমালোচনা-সাহিত্যের বিস্তৃত সমালোচনামূলক থীসিস্ আহ্বান করিলে তাঁহার গ্রন্থপঞ্জী ও জীবনীর বহু জ্ঞাত অজ্ঞাত উপকরণ, সমসাময়িক বহু কৃতবিদ্য লেখকের ও তাঁহার বন্ধু ও শিষ্যগণের প্রদত্ত উপাদান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতে পারে।

৩

স্মরণ

মোহিতলাল ছিলেন একজন আদর্শ বাঙালী। তিনি তাঁহার বলিষ্ঠ মন ও অফুরন্ত শক্তি লইয়া আমৃত্যু কবি-কর্ম্ম ও সাহিত্য-কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সমালোচক হিসাবে তিনি স্বকীয় বলিষ্ঠ চিন্তা ও অনুভূতি-দ্বারা বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক আলোকিত করিয়াছেন। —ডাঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত

মোহিতলালের অধ্যাপনার ধারা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতি অল্পদিনের মধ্যেই ছাত্রদের মধ্যে তাঁর প্রভাব সঞ্চারিত হইত। তাঁহার অমায়িক পক্ষপাতিত্বহীন ব্যবহার মুসলমান ছাত্রগণের হৃদয় বিশেষরূপে মুগ্ধ করিয়াছিল।

—অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

সাহিত্যাচার্য্য মোহিতলাল মজুমদার একদা সত্যসুন্দর দাস—এই নামে কাব্যসাধনা ও সাহিত্যালোচনা করিতেন। সত্যসুন্দর দাস তাঁহার ছদ্মনাম ছিল না; ঐ ছিল তাঁহার অন্তরের নাম। এই নাম তিনি অন্তরের প্রেরণা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সত্য ও সুন্দরের উপাসনাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র তপস্যা। এতবড় গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্যের তপস্যা সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্য-সাধকের ইতিহাসে একান্ত বিরল। এই সাধনাবলেই তিনি সাহিত্য-জগতে আচার্য্য। এই আচার্য্যের সান্নিধ্যে একদা অনেক শিখিয়াছি, অনেক বুঝিয়াছি। আজ তাঁহার তিরোভাবে তাই আমি আচার্য্য-বিয়োগের বেদনা অনুভব করিতেছি। শুধু আমি নই, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই এই বেদনা অনুভূত হইবে।' —তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি মোহিতলাল মজুমদার রবীন্দ্র-যুগে স্বীয় বলিষ্ঠতাগুণে বিশেষত্ব অর্জ্জন করেছিলেন। যেমন তাঁহার কাব্যে, তেমনি তাঁহার সমালোচনায় একটা নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী লক্ষ্যিত হইত। তিনি আজীবন শুধু সাহিত্যসেবা করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য তাঁহার প্রাণ ছিল। সাহিত্যিকরাই তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধু ছিলেন। একান্তভাবে বঙ্গভারতীর সেবা করিয়া তিনি লক্ষ্মীর বরলাভে সমর্থ হন নাই বটে, দেশের সাহিত্যরসিকদের হৃদয়ে স্থিরস্থায়ী আসন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা অপূরণীয় থাকিয়া যাইবে।

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

[সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত]

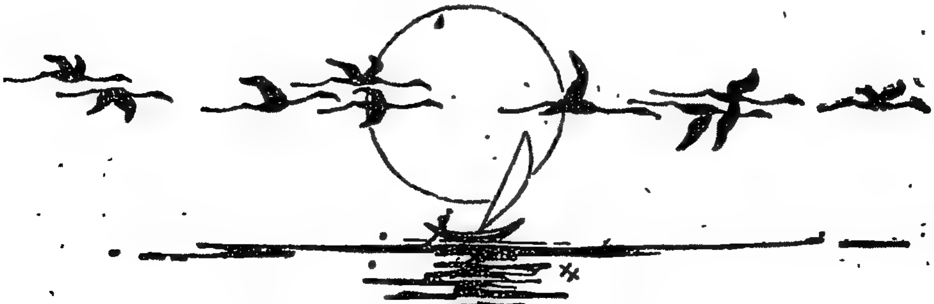

অলঙ্কার দর্পণ

অধ্যাপক সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়

অনুনাম প্রাপিকা :—(onomatopoeia) আমাদের নামন্ শব্দের গ্রীক প্রতিরূপ onoma, আর poieo ধাতুর অর্থ to make। অলঙ্কারের ইংরেজী নামটির আক্ষরিক রূপ যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া বাংলায় এই অলঙ্কারটির নাম আমি দিলাম অনুনাম প্রাপিকা। ধ্বনিবৃত্তি বা ধ্বন্যস্থি বলা বোধ হয় অসঙ্গত, কারণ অলঙ্কারশাস্ত্রে ধ্বনি কথাটির অর্থ—বাচ্যার্থাতিশায়ী ব্যঙ্গার্থ বোধক কাব্য।

যে অলঙ্কারে 'নাম' ভাব্‌কে পাইতে সহায়তা করে শব্দের ভিতর যেখানে মিলে ভাবের সন্ধান, অতনু ভাব যেখানে নামের ভিতর পায় তনু, সেই অলঙ্কারকে বলা যাক অনুনামপ্রাপিকা।

সংস্কৃত অলঙ্কারিক আচার্যেরা কোন নাম না দিলেও বর্ণ, শব্দ ও বাক্যের ভাবানুরণন শক্তি সম্পর্কে নানা দিক হইতে নানা রকম বিচার করিয়া গিয়াছেন। সর্ব শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের লেখায় যে ধর্ম নিয়ত প্রত্যক্ষ করা যায়, তার একটি স্বতন্ত্র নাম থাকাই বোধ হয় ভাল। বাঁশীর সুরে ভাষা নাই, তবু তাহাতে থাকে বংশীবাদকের আকুতি। বাক্য বা বাক্যাংশের বর্ণ যোজনাও শ্রোতারা বাঙ্ময় জগৎ হইতে ভাবময় জগতে পোঁছাইয়া দিতে পারে। বর্ণযোজনার এই বৈশিট্যই অনুনামপ্রাপিকা।

ঘনঘোর ধূম ঘুরিয়া ঘুরিয়া
ফুলিয়া ফুলিয়া উড়িল।
দেখিতে দেখিতে হু হু হুঙ্কারি
ঝলকে ঝলকে উল্কা উগারি
শত শত লোল জিহ্বা প্রসারি
বহ্নি আকাশ জুড়িল। —রবীন্দ্রনাথ

অগ্নির প্রচণ্ডবেগ ছন্দের দ্রুততালে আসিয়া পড়িতেছে আমাদের অনুভূতির ভিতর। তাহার বিস্তার, তাহার শক্তি বর্ণযোজনার ও শব্দের গাঁথুনিতে প্রত্যক্ষের চেয়েও যেন বেশী স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বর্ণযোজনায় ও শব্দবিন্যাসে বাঁধা পড়িয়াছে ভাব, তাই অলঙ্কার অনুনামপ্রাপিকা।

চটাৎ করি বরফ ফাটে, গোমরায় আর গরজায়।
আর কাঁদে হাহারবে যেন উন্মাদ উভরায়।।

ভাবের প্রতিধ্বনি এখানেও উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে শব্দের ভিতর বর্ণযোজনায়।

"গুরুগুরু মেঘ গুমরি গুমরি, গরজে গগনে গগনে।"
—রবীন্দ্রনাথ

বর্ণবিন্যাসের ভিতর দিয়া মেঘের গুরুগুরু গর্জনটাই যেন কানে আসিতেছে।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যাম-গম্ভীর সরসা।

নববর্ষার মুখরবর্ষণের শব্দ কানে আসিতেছে। তার বড় বড় ফোঁটা যেন আমাদের কানের কাছে ঝরিয়া পড়িতেছে। বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যেই যেন তাহার উৎকট ভীষণ আনন্দের একটা রেশ পাইতেছি।

পূজা শেষ হয়, আরতি ফুরায়—
তখনি দাঁড়াই ফিরে;
অলকের মণি ঝলকিয়া উঠে
বুকের কলস ছলকিয়া উঠে
গুরু উরু দোলে নাচি তালে তালে
মুখরিত মঞ্জীরে! —মোহিতলাল

দেবদাসীর বুকের মণিহারেব দীপ্তি, লাবণ্যভরা দুটি কণককলসের ছলকানি, গুরু দুটি উরুর দোলনি অধীর মুখর মঞ্জীরের শিঞ্জন এখানে ধ্বনিময় হইয়া উঠিয়াছে।

'চরকার ঘর্ঘর পল্লীর ঘর ঘর
ঘর ঘর ঘীর দীপ আপনার নির্ভর।।—সত্যেন্দ্রনাথ

অনুভূতির রাজ্যে 'ঘী'র দীপ' জ্বালাইয়া কারা যেন ঘরে ঘরে ঘর্ ঘর্ ধ্বনি করিয়া চরকা ঘুরাইতেছে।

ওগো পবনে গগনে সাগরে আজিকে কী কল্লোল,
দে দোল্ দোল্।
পশ্চাৎ হতে হাহা ক'রে হাঁসি'
মত্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি,
যেন এ লক্ষ যক্ষশিশুর অট্টরোল।
আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে হট্টগোল।
দে দোল দোল।।
—রবীন্দ্রনাথ

মত্ত ঝটিকার 'হা হা হাসি' যেন সত্যই কানে আসিতেছে। 'পবনে গগনে সাগরে' যেন শোনা যায় লক্ষ যক্ষ শিশুর অট্টরোল। নানা ঢঙের অনুপ্রাস ও শব্দের গাঁথুনিতেই যেন পাগলে ও মাতালে তুলিয়াছে হট্টগোল। মনের সন্ত্রাস উল্লাস যেন আঁখরে আঁখরে ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিতেছে।

অনুপ্রাস, রসানুকূল বর্ণের বাহুল্যে, যে সব শব্দের বর্ণঝঙ্কারের ভিতর প্রচ্ছন্ন আছে বস্তুজগতের কোন ধ্বনির অনুরণন, তাহাদের যথাযথ বিন্যাস, এই সব হইতেই অনুনামপ্রাপিকার উদ্ভব।

ভান বা পরনামসমতা (Pun বা Paranomasia)

যে সব বর্ণযোজনায় শব্দের উদ্ভব, অনেকক্ষেত্রে দুটি কি তার বেশী শব্দে তাহাদের ভিতর হুবহু মিল দেখা যায়। অভিধানে ও চলতি ভাষায় ভিন্নার্থক এমন বহু শব্দ নজরে পড়িবে। অর্থ যেখানে ভিন্ন, সেখানে শব্দের ভিতর আকৃতিগত সাম্য থাকিলেও শব্দও যে ভিন্ন, বিবেচক মাত্রেই তাহা স্বীকার করেন। ঐ রকম শব্দ লইয়া নানা কৌশলে কবিরা অনেক সময় পাঠক ও শ্রোতার মনে বিস্ময় জাগান। ইংরেজী অলঙ্কারশাস্ত্রে এই জাতীয় সব রকম কৌশলের সাধারণ নাম Pun বা Paranomasia। ভান বা পরনামসমতা নাম দুটির বাঙলা আক্ষরিক অনুবাদ হইতে পারে। এই কৌশলের উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের আছে দুইটি অলঙ্কার, যমক ও শ্লেষ। ইংরেজীতে এই অলঙ্কার প্রয়োগ করা হয় সাধারণতঃ কৌতুক সৃষ্টি করার জন্য। মনকে সামান্য একটু কাতুকুতু দেওয়া ছাড়া ইহার আর অপর বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নাই।

যমক

অর্থ থাক, চাই না থাক, থাকিলে যেখানে এক হওয়ার কোনরকম সম্ভাবনা নাই, সেখানে যদি স্বরসমেত অনেক বর্ণের আবৃত্তি হয়, তবে তাহাকে বলে যমক। নিরর্থক স্বর-ব্যঞ্জনসংঘাতের আবৃত্তিকে আজ আর আমরা যমক বলি না। বাঙলাভাষা সংস্কৃত নয়, চেষ্টা করিলেও সংস্কৃতের সব বৈচিত্র্য বাঙলায় আনা যায় না। অর্থ আছে বলিয়া সংশয় জাগার যেখানে সম্ভাবনা, সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা সেই খানেই শুধু যমক স্বীকার করিতেন। এরকম সংশয় বাঙলায় কচিৎ জাগে।

বাঙলায় যমক সাধারণতঃ সার্থক শব্দের ভিন্নার্থে পুনরাবৃত্তি। লাটানুপ্রাসে অর্থ এক, ভেদ শুধু তাৎপর্যে; যমকে বাচ্য অর্থই ভিন্ন।

বাঙলায় যমক সাধারণতঃ চার প্রকার: আদ্য, মধ্য, অন্ত্য ও সর্ব।

আদিযমক :— 'বামা বামা হ'লে জ্বালে সংসারে অনল।' বামা— (১) নারী, (২) বিরুদ্ধাচারিণী।

মধ্যযমক :— 'যার মনোনন্দন নন্দন অঙ্কে, চন্দন দেখে সেই সংসারপঙ্কে।' (নন্দন—(১) আনন্দময়ী (২) পুত্র)

অন্ত্যযমক :— 'ঐ রবি ডুবে, ঘনায়ে আসিছে সন্ধ্যা।
আনে সরযূর জল এবে করি সন্ধ্যা।।
(সন্ধ্যা—(১) সময়, (২) সন্ধ্যাবন্দনা)

সর্বযমক :— ডাক্‌ তার নেয়ে খেয়ে রোগী বাড়ি যায়।
ডাক্তার নেয়ে খেয়ে রোগী বাড়ি যায়।।

ডাক্তারের ডাক ছিল যেন খেয়ে নিয়ে রোগী দেখতে যায়। ডাক্তার নাবিক কিন্তু রোগী পর্যন্ত খেয়ে অর্থাৎ সাবাড় ক'রে তবে বাড়ি ফিরল।

(১) দুহিতা যদি না আনিয়া দেহ। (দাও)
এখনি আমি সে ত্যাজিব দেহ।। (শরীর)
—ভারতচন্দ্র

(২) **শমনতাতের তাতে** বলি তাতে ভাই।
তাতে যদি পড়ে পদ আর রক্ষা নাই।।
—ঈশ্বরগুপ্ত

শমন-তাত = শমনের পিতা সূর্য, (১) তাতে = তপ্ত হয়, (দ্বিতীয়) তাতে = তাহার উপর।

(৩) 'সাঁতার আমি শিখি-নি যে
নইলে আমি যেতেম নিজে।।' —রবীন্দ্রনাথ

(৪) আকাশে উঠিছে **তারা** কি যে গান গায় **তারা**
কি যে হাসি হাসে
সেগান কি শুনিয়াছি, সে হাসি কি দেখিয়াছি
কখনো আভাসে?

(৫) সেদিন যেন আমায় কৃপা করেন ভগবান্।
মেশিন-গানের সম্মুখে গাই বুইফুলের
এই গান।। —রবীন্দ্রনাথ

(৬) সেদিন **প্রভাতে** অমল **প্রভা-তে** উঠিলেন
দিবাকর।

(৭) কুসুমের বাস ছাড়ি কুসুমের বাস
বায়ুভরে এসে করে নাসিকায় বাস।
—ঈশ্বরগুপ্ত

(বাস=গন্ধ, বাস=আবাসস্থল)

(৮) মাতৃ-**অঙ্কে** জীবননাট্যে প্রথম **অঙ্ক** কাটে।
(অঙ্ক=ক্রোড়, অঙ্ক=নাটকের অংশবিশেষ)

(৯) লোকোত্তর উত্তর উত্তর দিকে চায়।
কতগুণ গুণ তার গুণে বোঝা যায়।।

(উত্তর=(১) অসাধারণ, (২) বিরাটরাজার পুত্র, (৩) দিক্-বিশেষ। গুণ=(১) গুণনফল, (২) উৎকর্ষ, (৩) ধনুকের ছিলায়)

(১০) কর্তা বাড়ির তত্ত্ব রাখেনা সৃষ্টিতত্ত্বে ডুবি।
জামাই বাড়িতে তত্ত্ব গেলনা সবই দেখি
আজগুবি।।

(তত্ত্ব=(১) সংবাদ, খোঁজ, (২) মতবাদ, (৩) উপঢৌকন

(১১) কাঠ কাট্ মাটি কাট্ সারা দিন রাত খাট
খাট ছেড়ে আয় তোরা উঠে।
ধনী ধনই থাক নিয়ে টাকা টাকাদের দিয়ে
আমরা বুঝাব এক জোটে।।

খাট=(১) পরিশ্রম কর, (২) খট্বা।

(১২) দন্ড পেয়ে দন্ডখানেক কাঁদে।
তারপর চায় চাঁদ ধরিতে ফাঁদে।।

দন্ড=(১) শাস্তি, (২) কালবিভাগবিশেষ।

(১৩) ছিল হেলে ধরতে এল হেলে।
রাগ যায় না ওদের দুঘা খেলে।।

হেলে=(১) কৃষক, (২) সর্পবিশেষ।

(১৪) কান্তার আমোদ পূর্ণ কান্ত-সহকারে।
কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে।।

প্রথম চরণের অর্থ—কান্তার (প্রণয়িণী প্রিয়ার) আমোদ (আনন্দ) কান্তসহকারে (প্রিয় সঙ্গে) আজ পূর্ণ। আর দ্বিতীয় চরণের অর্থ—কান্তার (কানন) ও আজ কান্তসহকারে—কান্ত (মুকুলগন্ধে মনোহর) সহকারে (আম্রতরুতে) আমোদপূর্ণ (গন্ধমদির)।

(১৫) রাজারে কাটে না কাটিছে পোকায় মোর লেখা
যত বই।
বিধাতা বিমুখ কোন মুখে মুখ দেখাব যমেরে
বই।।

(১৬) 'যত বাছা কাঁদে বলি 'সর-সর'
আমি অভাগিনী বলি 'সর সর'।
বক্ষেম নাহি অবসর
কোথা পাব সর?
আমার সে স্বর শুনে গোপাল ধুলায় লুটাবে।'
—কৃষ্ণকমল

একটুখানি হাস্যকৌতুক সৃষ্টি করা যেখানে বক্তার লক্ষ্য সেখানে ইংরেজি মতে Pun বা Paranomasia (ভান বা পরনামসমতা) বলা চলে। লক্ষ্য যাই হউক অর্থভেদ সত্ত্বেও শব্দসাম্য থাকিলেই যমক।

নিরর্থক বর্ণসঙ্ঘাতের আবৃত্তিকে যমক বলিলে মাঝে মাঝে অনুপ্রাস না যমক সন্দেহ হয়। সমান ধ্বনি কানে আসার সঙ্গে ভিন্ন অর্থ আছে বলিয়া যদি মনে সন্দেহ হয় তাহা হইলে যমক আর তা না হইলে অনুপ্রাস; একবার আবৃত্তির স্থলে ছেকানুপ্রাস আর বেশী বার আবৃত্তির স্থলে বৃত্ত্যনুপ্রাস। শ্লেষও Pun বা Paranomasia (ভান বা পরনামসমতা)-র ভিতর পড়ে। এই অলঙ্কারের মূলেও একাধিক শব্দের অভিন্নরূপ ও ভিন্ন অর্থ।

ভিন্নার্থক অভিনবরূপ শব্দের একবার মাত্র ব্যবহারে বিভিন্ন অর্থের বোধ হইলে হয় শ্লেষ। শ্লেষ মানে আলিঙ্গন। এই অলঙ্কারে বিভিন্ন শব্দ যেন পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া এক হইয়া যায়; একতনু হইয়া তাহারা আপন আপন কাজ করে। যমকে শব্দগুলি পৃথক থাকে। শ্লেষের দুইটি প্রধান ভেদ, শব্দশ্লেষ আর অর্থশ্লেষ। শব্দপরিবর্তন করিলেও যদি বৈচিত্র্যের হানি না হয় তবেই অর্থশ্লেষ; আর যদি শব্দ বদলাইলে বৈচিত্র্যও চলিয়া যায়, তবে হয় শব্দশ্লেষ। অর্থশ্লেষ অর্থালঙ্কার।

শব্দশ্লেষের দুইটি বড় ভেদ—সভঙ্গ ও অভঙ্গ। সভঙ্গশব্দশ্লেষ বাংলাভাষার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। একই শব্দকে বাংলায় ইচ্ছামত সুবিধানুযায়ী ভাঙা গড়া যায় না। সভঙ্গশ্লেষের প্রকৃতি বোঝার জন্য নিবিড় শ্লেষের একটি প্রাচীন নিদর্শন দিলাম। ওজাতের রচনা বাংলায় অচল।

(১) আজ ভূষিতসকলপরিজন
বিলসংকরেণু সুগহন
পৃথুকার্তস্বরভাজন
তোমার আমার গেহ দোঁহাকার শুনহে
বৈরিনিসূদন।।

মহারাজ, তোমার আত্মীয় পরিজন সবাই (নানা অলঙ্কারে) ভূষিত, তোমার বাসভবন তাই 'ভূষিত সকল পরিজন।' আমার সকল পরিজন ভূ, অনাবৃত ভূপৃষ্ঠে উষিত (বাস করিতেছে), তাই আমারও ভবন ভূষিতসকল পরিজন। আরও দেখ রাজন্, গেহ তোমার বিলসংকরেণুসুগহন। বিলসং (ক্রীড়াচঞ্চল) করেণু (গজবধূরা) দল বাঁধিয়া তোমার ভবনাঙ্গনে আসিয়া ভিড় করে। আমার কুটীরখানিও বিলসংক-রেণুসুগহন। বিলসংক (বিল অর্থাৎ বিবরবাসী কুৎসিত) মূষিককুল আমার মেঝে খুঁড়িয়া যে ইঁদুরমাটির স্তূপ সৃষ্টি করে, তাহাতে বেশ ভরিয়া আছে। তোমার ঘরও পৃথুকার্তস্বরপাত্র, আমার ঘরও

তাই; তোমার ঘরে পৃথু (বিপুলকায়) কার্তস্বর অর্থাৎ সোনার পাত্র; আমার ঘরে পৃথুকেরা (শিশুরা) আর্তস্বরে (পেটের জ্বালায়) চিৎকার করিতেছে। তাই আমার ঘরখানিও পৃথুকার্তস্বরপাত্র। মহারাজ ইহাতেই আমার আনন্দের অবধি নাই, ইহাতেই আমি করতালি বাজাইয়া নৃত্য করি।

অর্থ বুঝিলে পাঠক নিশ্চয় একটু কৌতুকের হাসি হাসিবেন। তাই একটি Pun বা Paranomasia (ভান বা পরনামসমতা)। শব্দকে ইচ্ছামত ভাঙ্গা গড়ার জন্য আমাদের সভঙ্গশ্লেষ। না বলিয়া দিলে বাংলায় এমন রচনার অর্থ বোঝা মুস্কিল। কথার লক্ষ্য শ্রোতার হৃদয়। সেখানে যে কথা না পৌঁছায় সুধীসমাজে সেকথা বাতিল। এরকম শ্লেষে যত কৌশলই থাক উহার আদর রসিকের পক্ষে সম্ভব নয়।

(২) "সালকানন শোভিনী বাতাহতা
উদ্যান মালিকা যেন চঞ্চলা বালিকা।"

উদ্যানমালার শোভা সাল-কানন আর বালিকার শোভা তার কুঞ্চিত, চঞ্চল কুন্তলজাল। এখানেও সভঙ্গশ্লেষ। এখানেও শব্দগাঁথায় মুন্সিয়ানা আছে।

(৩) 'সবার সর্বস্ব হর
ত্বরা গ্রন্থিচ্ছেদ কর
হে আমার নয়নের মণি।"

শিবমন্দিরে শিবপ্রতীকের সামনে বসিয়া চোরের বাপ সমবেত জনগণের সাক্ষাতে তাহার চোর ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে, "হে আমার নয়নের মণি পুত্র, সবার সর্বস্ব হরণ কর; যত সত্বর সম্ভব কর গ্রন্থিচ্ছেদন (গাঁট কাট)। দেশকালের উপযোগী বাচ্যার্থ গ্রহণ করিয়া লোকে বুঝিবে যে, শিবভক্ত শিবকে বলিতেছে যে, তিনি সবার সর্বস্ব; নয়নের মণি সেই শিবকে মায়াগ্রন্থি ছেদন করার জন্য সে জানাইতেছে তাহার কাতর অনুরোধ। এখানে শব্দ ভাঙ্গিয়া ভিন্ন অর্থ বুঝিতে হয় না। তাই এখানে বলিব অভঙ্গশ্লেষ।

কয়েকটি অতি প্রচলিত উদাহরণ—

(১) কে বলে ঈশ্বরগুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর,
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর? ঈশ্বরগুপ্ত

ঈশ্বর=(১) ভগবান, (২) এই কবিতাংশের বিখ্যাত কবি, গুপ্ত=(১) অপ্রকাশ (২) বর্ণবোধক উপনাম, প্রভাকর=(১) সূর্য, (২) ঈশ্বরগুপ্তের সাময়িক পত্রিকা।

(২) "অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।।
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।।
—ভারতচন্দ্র

অতিবড় বৃদ্ধ=(১) থুরথুরো বুড়ো (২) সৃষ্টিরও পূর্বের, সিদ্ধি=(১) ভাঙ (২) অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি, কোন গুণ নাই=(১) গুণহীন (২) ত্রিগুণাতীত; কপালে আগুন=(১) কপালপোড়া (২) যাহার ললাট দেশে বহ্নি বিরাজমান, কু কথা=(১) গালাগাল (২) পৃথিবীর কথা, পঞ্চমুখ=(১) খোলা মুখ, বাচাল (২) পঞ্চানন, কণ্ঠভরা বিষ=(১) নিতান্ত কটুভাষী (২) বিষপানে নীলকণ্ঠ, দ্বন্দ্ব=(১) কলহ (২) নিরন্তর মিলন।

বক্রোক্তি

বক্তার অভীষ্ট অর্থ এড়াইয়া শ্রোতা শ্লেষ বা কাকুর সাহায্যে অন্য অর্থ কল্পনা করিলে বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়। কাকু কথার অর্থ কণ্ঠধ্বনির স্বতন্ত্রতা (ভেদ)। তবেই বক্রোক্তির দুইটি ভেদ, **শ্লেষ বক্রোক্তি** ও **কাকু বক্রোক্তি**।

(১) **বক্তা**:—'কোন গুণ তোর নাই।'

প্রতিবক্তা:—গুণাতীত হব এমন পুণ্য করে কি করেছি ভাই?' বক্তা বলিতে চান যে প্রতিবক্তার প্রশংসার যোগ্য কোন রকম সদ্গুণের বালাই নাই। প্রতিবক্তা বুঝিলেন তাহাকে বলা হইতেছে ত্রিগুণাতিত, জীবন্মুক্ত, তাই বুঝিলেই তার উত্তরটিও সঙ্গত হয়।

(২) 'নিত্য সাথি আনন্দ তোমার'
'আমি তবে বুদ্ধ অবতার।'

'সব অবস্থাতেই তুমি থাক আনন্দে।' বক্তা এই কথা বলিলে শ্রোতা কৌতুক করিয়া আনন্দ শব্দের অর্থ বুদ্ধের নিত্যসহচর ধরিয়া বলিতেছেন, "তবে বল আমি অভিনব বুদ্ধ।" এগুলিও Pun বা Paranomasia (ভান বা পরনামসমতা)। অজ্ঞাতনামা কবির নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি শ্লেষবক্রোক্তির চমৎকার উদাহরণ।

(৩) "প্রশ্ন—দ্বিজরাজ হ'য়ে কেন বারুণী সেবন?
উত্তর—রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন।
প্রঃ—বলি এত সুরাসক্ত কেন মহাশয়?
উঃ—সুর না সেবিলে তার কিসে মুক্তি হয়?
প্রঃ—মধুর সঙ্গমে কেন এমন আদর?
উঃ—বসন্তকে হেয় করে সে কোন পামর!"

প্রশ্ন করা হইল—'বামুন হ'য়ে মদ খাওয়া কি সমর্থন-যোগ্য?' প্রশ্নটির অন্য অর্থ ধরিয়া সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, "চাঁদ কেন পশ্চিম দিকে ডুবে যায়?' উত্তরটিও অনুরূপ। অন্য শব্দের সাহায্যে গোড়ার প্রশ্নটিকে আরও পরিষ্কার করা হইবে, "বলি মশায়, এত সুরাসক্ত অর্থাৎ মদ্যপায়ী কেন?" মদ্যপ এই বোঝার ভান করিল যে তাহাকে শুধান হইতেছে, সে কেন দেবদেবীর এত অনুরক্ত; তাই নিজের মনের মত পাল্টা প্রশ্ন করিল, 'দেবসেবা না করিলে মুক্তির উপায় কি?' অবুঝকে বোঝাইবার জন্য নূতন শব্দে সেই পুরাতন প্রশ্ন আবার করা হইল, 'মধুর সঙ্গমে কেন এমন আদর?" মধু অর্থ মদ। ধৃষ্ট মদ্যপ মধু অর্থে বসন্ত ধরিয়া বেশ হৃদয়গ্রাহী অথচ অবান্তর উত্তর দিয়া বসিল, "বসন্তকে হেয় করে সে কোন পামর?" এমন রকম উক্তি-প্রত্যুক্তিতে একটুখানি মজা অবশ্য পাওয়া যায়। ইহাও ইংরেজির Pun বা Paranomasia (ভান বা পরনামসমতা)।

(৪) বক্তা—'মহাজন বট তুমি।'
প্রতিবক্তা—'তেজারতি ক'রে জমাইনি টাকা
করি নাই জোতজমি।'
বক্তা—'তুমি অতি সহৃদয়।'
প্রতিবক্তা—'হার্ট ফেল ক'রে মরিনি এখনো
নাই কোন সংশয়।'

এইরূপ উক্তি-প্রত্যুক্তি বাঙলা সাহিত্যে কম মিলে।

(৫) "রাজা। তোমাদের অক্ষরের ছাঁদটা সুন্দর, কিন্তু বোঝা শক্ত। একি চিনা অক্ষরে লেখা নাকি?
নটরাজ। বলতে পারেন অচিনা অক্ষরে।"
রবীন্দ্রনাথ

চিন দেশের অক্ষর অতি জটিল আর চিনা অর্থ পরিচিত।

কাকু বক্রোক্তি

'ভিন্নকণ্ঠধ্বনিধীরৈঃ কাকুরিত্যভিধীয়তে।' পণ্ডিতেরা ভিন্ন কণ্ঠধ্বনিকে কাকু বলেন। বাক্যের তাৎপর্য কণ্ঠধ্বনির ভেদে বদলাইয়া যায়। বক্তার উচ্চারণের ঢঙ, বাক্যগত স্বরাঘাত বা ঠেস (Stress) একটু পালটাইয়া দিলেই অর্থ যে ভিন্ন হইয়া যায়, তাহা আমরা নিয়ত অনুভব করি। শ্রোতা অনেক সময় বক্তার কথাকে এই কৌশলে অন্য তাৎপর্যে গ্রহণ করিয়া কখনও করেন ব্যঙ্গ কখনও করেন নির্মল কৌতুক। কাকুটুকুই ভিন্নার্থের মূলে থাকে বলিয়াই এই রকম স্থলে বলা হয় কাকু বক্রোক্তি। যেমন—

বক্তাঃ—'ডাকাত সে নয় অতি সাধু পুরুষ।'
প্রতিবক্তাঃ—ডাকাত সে নয় অতি সাধু পুরুষ!'

বক্তা সরলভাবে ব'ললেন, 'লোকে যে তাকে 'ডাকাত' বলে সে কথা সর্বৈব মিথ্যা; প্রকৃতপক্ষে সে অতি সাধু পুরুষ।'

বক্তার কথাই অন্য ঢঙে উচ্চারণ করিয়া প্রতিবক্তা বলিতে চান, "ঠিক্ ঠিক্ ডাকাত তিনি হ'তেই পারেন না, সাধু পুরুষ হিসাবে তাঁর কি আর জুড়ি মেলে!!!" এখানে কণ্ঠধ্বনিতে তীব্র বিদ্রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাই এটি কাকু বক্রোক্তি।

সংস্কৃতের অনুবাদ করিয়া একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

প্রথমা সখীঃ—

'কোকিল কাকলি মুখরিত আজিকার এ মধু যামিনী
সহকার গন্ধ ভারাতুর নিখিলের মানস মোহিনী।
কান্ত করিয়াছে অপরাধ অশ্রুজলে নিয়েছে বিদায়;
তার লাগি মনে কোন ক্ষোভ মানিনীর ক্ষণেকও জাগেনি

দ্বিতীয়া সখীঃ—

'কোকিল কাকলি মুখরিত ঘা.........................
তার লাগি চিত্তে কোন ক্ষোভ
মানিনীর ক্ষণেকেও জাগেনি!!!'

প্রথমা সখীর কথাটিই দ্বিতীয়া সখীর উত্তর। শুধু বলার ভঙ্গি স্বতন্ত্র; শুধু সুরে ভেদ, শুধু স্বারাঘাতে ভেদ। তাৎপর্য কিন্তু একেবারে ভিন্ন। সে বলিতে চায়, "মানিনী মান ক'রে ভিতরে ভিতরে কেঁদে মরতে ব'সেছে।"

কাব্য প্রকাশের টীকা প্রদীপের মতে উক্তি-প্রত্যুক্তি ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও বক্রোক্তি হওয়ায় বাধা নাই। সবাই যাহা বলে, সবাই যাহা মানে, বিশেষ করিয়া কেহ না বলিলেও নীরব-ভাষায় জনমত যাহা সমর্থন করে, শব্দের বৈচিত্র্যের সাহায্যে তাহারও যদি অন্যথা করা যায় তবে তাহাও বক্রোক্তি। যেমন—

আমাদের আর কে রাখিবে বল মান?
রক্ষা করেন ধার্মিকে ভগবান্।
ডাকাতের জ্ঞানি ডাকাতি করাই ধর্ম,
ঠকামি ঠগের, আনে কি জানিনে মর্ম?
নই চোর, নই বাটপাড়,
ধর্ম বলিতে তেমন কিছু ত নাই; কপালে দুঃখ তাই।
(তাই) ভাজা ভাজা হ'ল হাড়;
দাড়ি হ'ল মাস, প্রায় উপবাসে ভাই।
ধর্ম ক'রিনি ব'লে শুধু আজ তাহারই শাস্তি পাই।
কারো অপরাধ নাই॥

এখানে ধর্ম শব্দের একবার অর্থ, সুনীতির অনুসরণ; অপর সব জায়গায়, স্বভাব বা জৈবপ্রবৃত্তি। উক্তি-প্রত্যুক্তি নাই, শুধু একটু কাকু আছে, একটি শব্দে একটু শ্লেষ আছে। বক্রোক্তি অপহ্নুতি নয়। অপহ্নুতিতে বক্তা চায় নিজের কথা নিজেই চাপিয়া যাইতে; যতটুকু প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারই অন্যার্থ করিয়া মুখ রক্ষা করিতে। যেখানে কিছু গোপন করিয়া, কিছু চাপিয়া গিয়া, অন্য কিছু প্রকাশ করা হয়, সেইখানেই অপহ্নুতি। শব্দ কি শব্দধর্ম ধ্বনিই বক্রোক্তির প্রাণ, তাই ইহা শব্দালঙ্কার। কাকু বক্রোক্তির লক্ষণটিকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে। এটি অন্তরবগমন বা ঈশ্বরোক্তি (Interrogation বা Erotesis) নয়। আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত, না বুঝিয়া যেন অনর্থক বাগাড়ম্বর না করি। অলঙ্কারগুলির লক্ষণ বোঝায় আনন্দ আছে।

'আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?' —মধুসূদন

কাকু বক্রোক্তি নয়। শুধু সংজ্ঞাটি জানিলে ভুল হইতে পারে, লক্ষণ জানিলে ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

পুনরুক্তবদাভাস

তাৎপর্য বোঝার আগে কোথাও কোথাও কবির কথা শোনা মাত্রই মনে হয় যেন একই কথার পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। পুনরুক্তি-প্রতীতির যে যে শব্দ কারণ এই অলঙ্কারে তাহাদের আকারগত ভেদ থাকা চাই।

আকারগত পুনরুক্তি থাকিলে, তাহা হয় যমকের অন্তর্ভুক্ত।

১। 'ভুজঙ্গকুণ্ডলী শিব চেতোহর সদা
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করেন হেলায়।
ব্যক্তশশিশুভ্রাংশুশীতগু শূলপাণি
রাখিবেন কবে পদ আমার মাথায়।।

ভুজঙ্গ আর কুণ্ডলী দুইটি শব্দের অর্থ সাপ, তেমনি শিব ও হর তুল্যার্থক। শশী, শুভ্রাংশু আর শীতগু এই তিনটি শব্দের অর্থ চাঁদ; প্রথম শুনিলে মনে জাগে এত-গুলি পুনরুক্তির কথা। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায়, ভুজঙ্গকুণ্ডলী সমস্তপদটির অর্থ ভুজঙ্গ যাঁর কুণ্ডল; হর শব্দ চেতোহর শব্দের অংশমাত্র; উহার অর্থ চিত্তহারী। 'ব্যক্তশশীশুভ্রাংশুশীতগু' এই সমস্ত পদটির শশী পদের অর্থ কর্পূর, আর সমাসবদ্ধ সমস্ত পদটির অর্থ দাঁড়ায়—যে চাঁদের কিরণজাল কর্পূরের মতই শুভ্র, সেই চাঁদ যাঁর দেহে বিরাজমান। অতএব এখানে কোথাও পুনরুক্তি নাই। শুধু পুনরুক্তির মত আপাততঃ মনে হয়। এখানে অলঙ্কার তাই পুনরুক্তবদাভাস।

কুকথা কয় পঞ্চানন শিব হে, ভয়ে তাই
লুকাতে চায় পঞ্চশর মদন; খোঁজে ঠাঁই।
তোমায় দেবে ফাঁকি!
তোমার এই ভুবনে বল বিজনে কোথা থাকি?

পঞ্চানন আর শিব এই দুইটি শব্দ আপাততঃ সমানার্থক ঠেকিতেছে। পঞ্চশর ও মদনের বেলাও সেই কথা। তাৎপর্য বুঝিলে আর পুনরুক্তি থাকে না। তখন পঞ্চানন হয় পাঁচটি মুখ; আর পঞ্চশর হয় পাঁচটি শর—অরবিন্দ অশোক প্রভৃতি। ইহাও ইংরেজির Pun বা Paranomasia (ভান বা পরনামসমতা)।

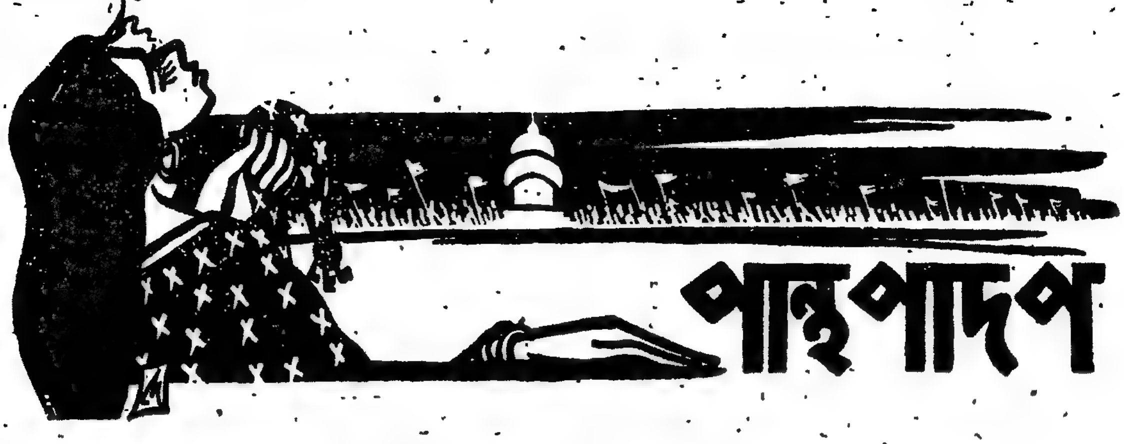

পান্থপাদপ

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

সূর্য্যনাথ একগোছা নোট নিয়ে এসে দাঁড়ালো—

সূর্য্যনাথ পুরাতন লোক, ছোটবেলা হতে এ সংসারে প্রতিপালিত হয়েছে, কলকাতার বাড়ীর ভার তার উপরে, সেখানেই সে থাকে। কেস চলবার সময় সে এখানে এসেছিল, রতন দত্ত তাকে জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছিল কলকাতায়

ভারতী জিজ্ঞাসা করলে, "ওগুলো কিসের টাকা সূর্য্যদা?"

সূর্য্য উত্তর দিলে, "পাঁচ হাজার প্রজা তাদের জমিদারের জন্যে আপিল করবার খরচ দিয়েছে, প্রায় পাঁচ হাজার টাকা তারা তুলেছে দিদিমণি, এই টাকা তারা আমার হাতে দিয়েছে, নিজেরাও সঙ্গে এসেছে।"

আপিল করতে প্রজারা টাকা দিয়েছে—

অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ভারতী।

এই সব প্রজারা কতখানি ভালবাসে তার পিতাকে—তার পিতা শুধু তার একার পিতা নয়, হাজার হাজার প্রজার পিতা। এই প্রজাদের জন্যই তিনি রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন—তাদের জন্যই তিনি জেলে গেছেন। প্রজারা তাঁকে জেল হতে মুক্ত করতে চায়। তারা জানে তাদের জন্যও তিনি তাঁর সর্ব্বস্ব হারাতে বসেছেন,—তারা নিজেরা তাঁর মোকদ্দমার খরচ সংগ্রহ করে এনেছে।

ভারতীর দুটি চোখ সজল হয়ে ওঠে, আর্দ্রকণ্ঠে সে বললে, "তারা দিলে বলেই তুমি নিলে সূর্য্যদা? কিন্তু বাবাকে তো জানো—বাবা আপিল করতে নিষেধ করেছেন, —এরপরেও যদি শোনেন প্রজারা টাকা দিয়েছে আর আমি তা নিয়েছি, তা হলে তিনি কি ক্ষমা করবেন? যারা টাকা এনেছে তাদের টাকা ফিরিয়ে দাও সূর্য্যদা, বলো—দরকার নেই। না হয় আমায় তাদের কাছে নিয়ে চলো, আমি তাদের সব বুঝিয়ে বললে তারা নিশ্চয়ই বুঝবে।

সূর্য্য উত্তর দিলে, "তারা আমায় পৌঁছে দিয়ে গেছে দিদি, আজ সন্ধ্যে হয়ে গেছে তাই তারা তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারলে না। কাল সকালে তারা এখানে আসবে, তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলবে বলে গেছে। আজ এ টাকা তুমি রেখে দাও, কাল তারা এলে তাদের বুঝিয়ে টাকা ফেরত দিয়ো।"

বাধ্য হ'ল ভারতী টাকাগুলো নিতে।

সূর্য্য বাইরে চলে গেল।

বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে ঘন হয়ে আসে—আকাশের পাতলা মেঘ জমাট বেঁধে ওঠে, বাতাস থেমে যায়।

জমাট বাঁধা সেই অন্ধকারের পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ভারতী।

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, কেবল বাইরে নয়—মনেও। কেবল ঘরে নয়—বাইরে—সমস্ত দেশে সকল মানুষকে ঘিরে। দেশে জেগেছে বিপ্লব, জ্বলছে আগুণ, কেউ আজ সুখী নয়, কেউ শান্তি পাচ্ছে না। শক্তিবান চিরদিনই দুর্বলের উপর তার শক্তি প্রয়োগ করে, দুর্বল শক্তিবানের কাছে চিরদিনই মাথা নিচু করে থাকতে বাধ্য হয়—

বাধা দিতে গেলেও তার ক্ষুদ্র শক্তি ব্যর্থ হয়। প্রবল রাজশক্তির সাহায্য পায়, আর দুর্বল হয় পদদলিত—নিষ্পেষিত। যুগে যুগে বড় ছোটর মধ্যে এ পার্থক্য থাকলেও বর্তমান যুগে এসেছে সমস্যার যুগ,—এ যুগে নাকি বড় ছোট থাকবে না, উচ্চ নীচ থাকবে না, সকলেই সমপর্য্যায়ে থাকবে।

"ঘরে আসতে পারি—?"

ভারতী চমকে ওঠে,—কে এমন লোক আছে যে ঘরে অর্থাৎ ভারতীর ঘরে আসবার অনুমতি চাচ্ছে? ভারতী ফিরে তাকালো দরজার দিকে—।

টেবিলের উপর যে ল্যাম্পটা জ্বলছিল, তারই আলো ছড়িয়ে পড়েছে দরজার উপরে; সেই আলোয় দেখা গেল দরজার পর্দার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে একটি তরুণ যুবক, যাকে ভারতী কোনদিনই চেনে না—দেখেওনি। ভারতী বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকে।

যুবক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে—হাত দুখানা তুলে নমস্কার করে, মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে তার মুখে।

"নমস্কার; বিনা এত্তেলায় ঘরে ঢুকেছি, মাপ করবেন।"

ভারতী ভ্রূ কুঞ্চিত করে—

পলকের দৃষ্টিপাতে সে যুবকের পা হতে মাথা পর্যন্ত দেখে নেয়—।

সুঠাম সুন্দর দীর্ঘাকৃতি, বর্ণ তার সুগৌর, রুক্ষ চুলগুলি অবিন্যস্তভাবে প্রশস্ত ললাটের উপর এসে পড়েছে। পরণে মোটা একখানা সাদা খদ্দরের ধুতি, গায়ে খদ্দরের একটা বেনিয়ান; সবল পেশীবহুল হাত দুখানা কনুই পর্যন্ত উন্মুক্ত। হাঁটু পর্যন্ত তার ধূলা দেখা যাচ্ছে, পায়ে জুতা থাকার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।

ভারতী সামনের চেয়ারখানা দেখিয়ে বললে, "বসুন—"

যুবক বসলে না; চেয়ারে ভর দিয়ে দাঁড়ালো। বাম হাত দিয়ে ললাটের ঘাম মুছে ফেলে বললে, "উঃ, আপনার বাড়ীতে আসতে কি কষ্টটাই না পেতে হয়েছে। এত বড় সেকেলে বাড়ী, একটা খিড়কীর দরজা নেই—আশ্চর্য্য। কেবল সদর দরজাটাই রেখেছেন, ও দরজা দিয়ে আসতে না পেরে পাঁচ সাত জায়গায় বাধা পেতে হল।"

ভারতী বিলক্ষণ কৌতুক অনুভব করে—এইরাত্রে অপরিচিত কোন লোক খিড়কী দরজা না থাকার জন্য কে কৈফিয়ৎ চায়, তার কোন পরিচয় জানার কথা তার মনে জাগে না।

সে বললে, "এককালে খিড়কী দরজা ছিল বইকি, প্রয়োজন নেই বলে আমিই সে দরজা বন্ধ করে দিয়েছি। আপনি খিড়কী দরজা খুঁজেছিলেন তার মানে,—সদর দরজা তো সকলের জন্যেই খোলা থাকে তা বুঝি জানেন না?"

ছেলেটি হাসে—

বিনীত কণ্ঠে বললে, "আপনার বলতে বাধা নেই—সদর দরজা আমরা মোটেই পছন্দ করিনে—অনেক জবাবদিহি করতে হয়। খিড়কীর দরজায় লোকজন থাকে না—কাউকে কিছু বলবারও দরকার হয় না। আর আপনাদের পাঁচিল যা উঁচু, ডিঙ্গাতে গিয়ে পায়ে রীতিমত চোট লেগে জ্বলছে। অতখানি উঁচু হলে লাফ দেওয়া সে কি সোজা কথা?"

ভারতীর পা হতে মাথা পর্যন্ত শির শির করে একটা কম্পন উঠে যায়—

কম্পিত কণ্ঠস্বরটা যথা সম্ভব সংযত করে সে বললে, 'এ পর্যন্ত—অর্থাৎ আমি বড় হয়ে পর্যন্ত কেউই খিড়কী দিয়ে আসে না, আসে সোজা সদর পথ ধরে। পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে আসবার কারণও আমি বুঝলুম না—আপনি কে—আর কি দরকার আপনার তাই বলুন দেখি—'

ছেলেটি হাসলো—

চেয়ারখানায় বসে বললে, "পরিচয় আমার নেই কাজেই কে আমি তা জানতে পারবেন না। দরকার কিছু আছে বই কি, নচেৎ পাঁচিল ডিঙ্গিয়েই বা আসব কেন? আমার দরকার আপনার ওইখানে—"

বলে সে হাত দিয়ে ভারতী খানিকক্ষণ আগে যে আয়রণ চেস্টে নোটগুলি রেখেছে সেইটাই দেখিয়ে দিলে। ভারতীর চোখ দুইটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে—নির্বাক দৃষ্টিতে সে শুধু তাকিয়ে থাকে।

যুবক একটু হাসে,—বললে, "চুপ করে রইলেন যে, অবশ্য আমার কথাটা যে একেবারেই অবৈধ—মানে আইনবিরুদ্ধ এ কথা ঠিক। তবে কি জানেন—আমরা যে কাজ করি তাতে বৈধতা অবৈধতার প্রশ্ন বিন্দুমাত্র ওঠে না। ইংরাজিতে একটা কথা আছে—মাইট ইজ রাইট, আর বাংলায় তার তর্জ্জমা করলে হয়—জোর যার মুলুক তার—"

ভারতী হাঁপায়—। তার কথা না থামতেই সে চাপা-সুরে বললে, "তার মানে—? আমি আপনার কথা কিছু-মাত্র বুঝতে পারছি নে মিঃ—মিঃ—"

অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ছেলেটি বললে—"নাঃ, মিষ্টার ফিষ্টার নয়, আমার নাম জয়ন্ত—মানে জয়ন্ত রায়। নামটা বড় পাবলিক বলে সব জায়গায় নিজের নামটা ব্যবহার করতে পারিনে, কোন জায়গায় গোপাল, কোথাও ধনা, আবার মনা, গীর্জ্জায় যোশেফ, কেলো, ভেলো এ সব নামে আমার পরিচয় মেলে। তবে আপনি মেয়েছেলে, আপনার কাছে ও সব পোষাকী নাম না বলে আসল নামটাই বললুম। আপনার হয়ত অকস্মাৎ ধনা মনা, পিরু ছিরু নামে ডাকলে মোটে ভালো লাগবে না—আর আপনার মত সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ের মুখে ও সব নাম উচ্চারণ করাও ভারি বিশ্রী লাগবে।"

তার নামের ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে ভারতীর মুখে প্রথম দিকে এক মৃদু হাসির রেখা জেগে উঠেছিল, শেষ দিকে তা মিলিয়ে গেল।

হাসতে হাসতে সে বললে, 'হ্যাঁ—চিনেছি আমি আপ-নাকে, আপনার নাম আমার শোনা আছে। কিন্তু আপনি—আপনি এখানে এরকম করে—"

জয়ন্ত রায় হেসে ফেললে, বললে, "অতটা ভয় পাবেন না ভারতী দেবী, এ্যানার্কিষ্ট হলেও আমরা মানুষ, আমরা এই দেশেরই লোক আর আমাদেরও মা বোন আছে। আপনারা আমাদের নাম শুনে ভয় পাবেন, কাঁদবেন এ আমরা সহ্য করতে পারিনে, এতে নিজেদেরকেই ছোট বলে মনে হয়। আপনারা সাহস করুন, আমাদের এগিয়ে যাও-য়ার শক্তি দিন, কাজ করবার প্রেরণা দিন, তবেই না আমরা গর্ব বোধ করব।"

ভারতী ততক্ষণে নিজেকে সামলিয়ে নেয়, বললে, হ্যাঁ, আপনাদের দলের নাম শুনেছি,—আপনারা যে সব কাজ করে বেড়াচ্ছেন সে সম্বন্ধে গল্পও শুনেছি। আপনি এখানে কি অভিপ্রায়ে এসেছেন তা—"

জয়ন্ত রায় বললে, "সেটাও বেশ বুঝেছেন, বুঝিনি এ কথা বলা চলবে না ভারতী দেবী। এ্যানার্কিজম যে কি তা বুঝতে আজকাল কারও দেরী হয় না। আমাদের আপনারা স্বদেশী ডাকাত নামে অভিহিত করে থাকেন—যদিও এর কোন অর্থ হয় না, কারণ ডাকাতিতে স্বদেশী বিদেশী গন্ধমাত্র থাকে না—ডাকাতি ডাকাত নামেই খ্যাতি পেয়ে থাকে। তবে হ্যাঁ, পার্থক্য এইটুকু—সাধারণ ডাকাতগুলো হয় নিজেদের স্বার্থের খাতিরে, আমরা করি সকলের জন্য—"

ভারতী চাপা কণ্ঠে বললে—"অর্থাৎ নিছক পরার্থ-পরতা মাত্র—"

তার কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের আভাষ পাওয়া যায়।

জয়ন্ত তার মুখের পানে তাকায়, বললে, "নিশ্চয়ই সে কথা আমি জোর করে বলছি—বার বার বলব ভারতী দেবী। আপনি আজ স্বীকার না করুন—কাল স্বীকার করতে বাধ্য হবেন—আমরা নিঃস্বার্থ হয়ে পরের জন্যই কাজ করছি। বলবেন—কেন ডাকাতি করি—ডাকাতি করি আমাদের খরচ চালানোর জন্যে, খাওয়া-পরা আছে, যাতা-য়াত আছে, দরকারী জিনিসপত্র কেনা আছে। এবার কতকটা বুঝতে পারবেন বোধ হয়।"

ভারতী তার পা হতে মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে,—শান্ত সংযত কণ্ঠে সে বললে, হতে পারে আপনার কথা সবই মেনে নিচ্ছি, আপনারা নেহাৎ পরমার্থপর লোক, দেশের স্বাধীনতা, সর্বাঙ্গীন উন্নতি, জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ এ সবই আপনাদের কাজ। আর ঠিক এই পরার্থ-পরতার উদ্দেশ্য নিয়েই আপনারা ডাকাতি করেন, লুটপাট করেন—ভয়ও দেখান। বলুন—আজ আপনি কেবলমাত্র ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে আসেননি? কিন্তু আপনি একজন এ্যানার্কিষ্ট, আপনার নাম বিখ্যাত জয়ন্ত রায়—কেবল এইটুকু কথায় ভয় পেয়ে আমি আমার যা কিছু আছে সব আপনাকে ধরে দেব আপনি এত সহজে এ বিশ্বাস করতে পারেন?"

জয়ন্ত রায় হাসে, শান্তকণ্ঠে বললে, "করি বই কি—। আপনাদের কাছ হতে বিনা নিপীড়নে কেবল ভয় দেখিয়ে আমরা টাকা আদায় করি।"

আস্তে আস্তে সে পকেট হতে যে জিনিসটি বার করলে, তা একটী রিভলবার ছাড়া আর কিছু নয়। সে বলে, দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে কি? আপনি নিশ্চয় জানবেন এই রিভলবার দিয়ে অনেক কাজ হয়েছে, ভবি-ষ্যতেও অনেক কাজ হবে। আর একটা কথা আপনি মনে করছেন, চীৎকার করবেন—আপনার দ্বারোয়ান বা বাড়ীর অন্য লোকজন এসে পড়বে। কিন্তু তার আগে আপনাকে জানিয়ে রাখছি ভারতী দেবী আমি কেবল একা আসিনি, আমরা দুই লরি সশস্ত্র ডাকাত এসেছি। আমি একা এ ঘরে প্রবেশ করেছি, তারা সমস্ত বাড়ীটা অবরোধ করে আছে।"

ভারতী বিমূঢ়ার মত তার পানে তাকিয়ে থাকে, একটা কথা বলবার অবধি ক্ষমতা তার হয় না।

(১৩)

দরজাটা বন্ধ করে জয়ন্ত ফিরে এসে চেয়ারে বসলো—রিভলবারটা সামনে টেবিলের উপর রেখে বললে, "এ সব অস্ত্র বেশীক্ষণ হাতে রাখতে নেই, গুলীটা অজান্তে ছুটে যেতে পারে।"

ভারতী মুখ বিকৃত করলে, বললে, "আপনার সাহসও তো বড় কম নয়। এখন সন্ধ্যা বেলা, মাত্র আটটা বেজেছে, আপনি দুই লরি লোক নিয়ে এসেছেন, বাড়ী ঘেরাও করেছেন, আমার ঘরে রিভলবার নিয়ে ঢুকে আমার সঙ্গে সরস আলাপ চালিয়েছেন। আপনি জানেন বাইরের যে কোন লোক পুলিশে খবর দিতে পারে, এখনই পুলিশ এসে পড়তে পারে—?"

জয়ন্ত হাসি মুখে বললে, "সব পথ বন্ধ না করে জয়ন্ত রায় কাজ করে না—সে এমন কাঁচা ছেলে নয় ভারতী দেবী। আপনি টাকা দেবেন না—অন্ততঃ পক্ষে দিতে চাইবেন না জানি, আপনিও জানবেন মোটের উপর যে করেই হোক আমি টাকা নেবই।"

ভারতী ভিতরে ভিতরে মুসড়ে পড়ে—কথা বলতে পারে না।

জয়ন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বললে, "দেখুন—আমি জয়ন্ত রায়, মিছে কথা বলছিনে—অহঙ্কারও করছিনে,—জীবনে কোন দিন কোন কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে আমি ফিরে আসি নি—আজও ফিরব না। আমরা খবর রেখেছি আপনার প্রজারা টাকা এনে দিয়েছে, সে টাকা আপনি তুলে রেখেছেন, আমি নিজের চোখে ওই জানালা হতে দেখেছি। এ টাকা আপনার কোন কাজে লাগবে না এ কথাও আপনি বলেছেন। আমার কথা এই—এ টাকা প্রজাদের ফিরিয়ে দিয়ে কোন লাভ নেই, দেশের কাজে এ টাকা দিয়ে দিন।"

ভারতী হাসে—বিদ্রুপের বাঁকা হাসি।

বললে, এ টাকায় দেশের কি কাজ হবে?"

উৎসাহিত কণ্ঠে জয়ন্ত বললে, "অনেক কাজ হবে—বহু কাজ হবে। ধরুন—আমাদের হাতে এখন পয়সা নেই—এই টাকাটা পেলে আমরা নূতন উৎসাহে কাজে নামতে পারব। আমরা বৃটিশকে এ দেশ হতে তাড়াতে চাই, আমরা স্বাধীনতা পেতে চাই, এ রকম ভাবে পায়ের তলায় পিষে মরতে চাই নে। এই বৃটিশ শাসনতন্ত্র আপনাদের কতখানি অনিষ্ট করেছে তাতো জানেন। আপনার পিতা আজ জেলে গেছেন, তাঁর প্রজারা কত জেলে গেছে, কয়েকজন তো মরেই গেল। আপনি বলুন ভারতী দেবী, আপনার বুকে কি আগুন জ্বলছে না?"

ভারতীর দুই চোখ দৃপ্ত হয়ে ওঠে,—সে জয়ন্তের পানে তাকায়।

জয়ন্ত বলে চলে—"আপনি নিজে ভুক্তভোগী কাজেই আপনাকে না বুঝালেও চলবে। এই যে অত্যাচার অবিচার গুলো নির্বিরোধে নির্বিচারে এরা করে যাচ্ছে, আপনাদের উপর দিয়েও তো বড় কম চলে নি ভারতী দেবী। আপনার বৃদ্ধা ঠাকুরমাকে যারা গুলী করে মারলে, আপনার পিতাকে যারা জেলে দিতে পারলে—"

ভারতী অধৈর্য্য কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে—"থাক থাক, আর বলবেন না জয়ন্ত বাবু—"

সে মুখ ফিরায়, মনে হয় আত্মসম্বরণ করতে সে অসমর্থ হয়ে পড়েছে।

জয়ন্ত থামলো না, বলে চলে—"বলতে পারেন—এরা আমাদের দেশের জন্যে কি করেছে? আমাদের স্বাধীন মনোবৃত্তি পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেছে, ওদের শিক্ষা আমরা গ্রহণ করেছি, ওদের আদব-কায়দায় অভ্যস্ত হয়ে নিজেদের যা কিছু সব হারিয়েছি। আজ ইতিহাসের পাতা উল্টে আমাদের পূর্বেকার যে ইতিহাস পাই, তাও সত্য নয়, ওরা সে ইতিহাসকেও বিকৃত করে প্রকাশ করেছে। বলতে পারেন, নিত্যকার খাওয়া-পরার জন্যে কোন দেশের লোক পরের দেশের পানে তাকিয়ে থাকে—সে এই ভারতবর্ষ, বৃটিশের রিজার্ভ করা জমিদারী। আমাদের কাপড় যোগায় মাঞ্চেষ্টার, জাহাজে কাপড় আসে, সেই কাপড়ে আমাদের লজ্জা নিবারণ হয়। বলতে পারেন—আমাদের তাঁতশিল্প কোথায় গেল—কি-ভাবে এই শিল্পকে ধ্বংস করা হল তা নিশ্চয়ই জানেন। আমাদের ঘরে আলো জ্বালতে দেয়াশলাইয়ের জন্যও ওদের মুখ চেয়ে থাকতে হয়। সমুদ্রের উপকূলে হাতে করে লবণ প্রস্তুত করে নেওয়ার অধিকার আমাদের নেই, ওদের দেশের লবণ আসবে তবে আমরা পাব। আমাদের দেশে এতটুকু শক্তি নাই—শক্তি চর্চ্চার এতটুকু অবকাশ এরা দেয় নি, তাই কথায় কথায় আমরা ডাকি পুলিশ, নিজেরা প্রতিবিধান করবার সাহস রাখি নে। আমরা আজ সবাই দাসত্বের

ভারতী হাঁপায়—। তার কথা না থামতেই সে চাপা-সুরে বললে, "তার মানে—? আমি আপনার কথা কিছু-মাত্র বুঝতে পারছি নে মিঃ—মিঃ—"

অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ছেলেটি বললে—"নাঃ, মিষ্টার ফিষ্টার নয়, আমার নাম জয়ন্ত—মানে জয়ন্ত রায়। নামটা বড় পাবলিক বলে সব জায়গায় নিজের নামটা ব্যবহার করতে পারিনে, কোন জায়গায় গোপাল, কোথাও ধনা, আবার মনা, গীর্জ্জায় যোশেফ, কেলো, ভেলো এ সব নামে আমার পরিচয় মেলে। তবে আপনি মেয়েছেলে, আপনার কাছে ও সব পোষাকী নাম না বলে আসল নামটাই বললুম। আপনার হয়ত অকস্মাৎ ধনা মনা, পিরু ছিরু নামে ডাকলে মোটে ভালো লাগবে না—আর আপনার মত সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ের মুখে ও সব নাম উচ্চারণ করাও ভারি বিশ্রী লাগবে।"

তার নামের ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে ভারতীর মুখে প্রথম দিকে এক মৃদু হাসির রেখা জেগে উঠেছিল, শেষ দিকে তা মিলিয়ে গেল।

হাসতে হাসতে সে বললে, 'হ্যাঁ—চিনেছি আমি আপনাকে, আপনার নাম আমার শোনা আছে। কিন্তু আপনি—আপনি এখানে এরকম করে—"

জয়ন্ত রায় হেসে ফেললে, বললে, "অতটা ভয় পাবেন না ভারতী দেবী, এ্যানার্কিষ্ট হলেও আমরা মানুষ, আমরা এই দেশেরই লোক আর আমাদেরও মা বোন আছে। আপনারা আমাদের নাম শুনে ভয় পাবেন, কাঁদবেন এ আমরা সহ্য করতে পারিনে, এতে নিজেদেরকেই ছোট বলে মনে হয়। আপনাবা সাহস করুন, আমাদের এগিয়ে যাও-য়ার শক্তি দিন, কাজ করবার প্রেরণা দিন, তবেই না আমরা গর্ব বোধ করব।"

ভারতী ততক্ষণে নিজেকে সামলিয়ে নেয়, বললে, হ্যাঁ, আপনাদের দলের নাম শুনেছি,—আপনারা যে সব কাজ করে বেড়াচ্ছেন সে সম্বন্ধে গল্পও শুনেছি। আপনি এখানে কি অভিপ্রায়ে এসেছেন তা—"

জয়ন্ত রায় বললে, "সেটাও বেশ বুঝেছেন, বুঝিনি এ কথা বলা চলবে না ভারতী দেবী। এ্যানার্কিজম যে কি তা বুঝতে আজকাল কারও দেরী হয় না। আমাদের আপনারা স্বদেশী ডাকাত নামে অভিহিত করে থাকেন—যদিও এর কোন অর্থ হয় না, কারণ ডাকাতিতে স্বদেশী বিদেশী গন্ধমাত্র থাকে না—ডাকাতি ডাকাত নামেই খ্যাতি পেয়ে থাকে। তবে হ্যাঁ, পার্থক্য এইটুকু—সাধারণ ডাকাতগুলো হয় নিজেদের স্বার্থের খাতিরে, আমরা করি সকলের জন্য—"

ভারতী চাপা কণ্ঠে বললে—"অর্থাৎ নিছক পরার্থ-পরতা মাত্র—"

তার কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের আভাষ পাওয়া যায়।

জয়ন্ত তার মুখের পানে তাকায়, বললে, "নিশ্চয়ই সে কথা আমি জোর করে বলছি—বার বার বলব ভারতী দেবী। আপনি আজ স্বীকার না করুন—কাল স্বীকার করতে বাধ্য হবেন—আমরা নিঃস্বার্থ হয়ে পরের জন্যই কাজ করছি। বলবেন—কেন ডাকাতি করি—ডাকাতি করি আমাদের খরচ চালানোর জন্যে, খাওয়া-পরা আছে, যাতা-য়াত আছে, দরকারী জিনিসপত্র কেনা আছে। এবার কতকটা বুঝতে পারবেন বোধ হয়।"

ভারতী তার পা হতে মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে,—শান্ত সংযত কণ্ঠে সে বললে, হতে পারে আপনার কথা সবই মেনে নিচ্ছি, আপনারা নেহাৎ পরমার্থপর লোক, দেশের স্বাধীনতা, সর্বাঙ্গীন উন্নতি, জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ এ সবই আপনাদের কাজ। আর ঠিক এই পরার্থ-পরতার উদ্দেশ্য নিয়েই আপনারা ডাকাতি করেন, লুটপাট করেন ভয়ও দেখান। বলুন—আজ আপনি কেবলমাত্র ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে আসেননি? কিন্তু, আপনি একজন এ্যানার্কিষ্ট, আপনার নাম বিখ্যাত জয়ন্ত রায়—কেবল এইটুকু কথায় ভয় পেয়ে আমি আমার যা কিছু আছে সব আপনাকে ধরে দেব আপনি এত সহজে এ বিশ্বাস করতে পারেন?"

জয়ন্ত রায় হাসে, শান্তকণ্ঠে বললে, "করি বই কি—। আপনাদের কাছ হতে বিনা নিপীড়নে কেবল ভয় দেখিয়ে আমরা টাকা আদায় করি।"

আস্তে আস্তে সে পকেট হতে যে জিনিসটি বার করলে, তা একটী রিভলবার ছাড়া আর কিছু নয়। সে বলে, দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে কি? আপনি নিশ্চয় জানবেন এই রিভলবার দিয়ে অনেক কাজ হয়েছে, ভবি-ষ্যতেও অনেক কাজ হবে। আর একটা কথা আপনি মনে করছেন, চীৎকার করবেন—আপনার দ্বারোয়ান বা বাড়ীর অন্য লোকজন এসে পড়বে। কিন্তু তার আগে আপনাকে জানিয়ে রাখছি ভারতী দেবী আমি কেবল একা আসিনি, আমরা দুই লরি সশস্ত্র ডাকাত এসেছি। আমি একা এ ঘরে প্রবেশ করেছি, তারা সমস্ত বাড়ীটা অবরোধ করে আছে।"

চাকায় নিষ্পেষিত হয়ে এমন জায়গায়, এমন অবস্থায় এসে পড়েছি যে—"

ভারতী বাধা দিলে, কঠিন কণ্ঠেই বললে, "দেখুন এ সব বুলি বড় মামুলি হয়ে গেছে। শুনে শুনে কান এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, মনে আর আঘাত দিতে পারে না। আমার মনে হয়—মুখে এতটা লেকচার না দেওয়াই ভালো, কাজে আপনার নাম রাখুন। যাক যা করতে এসেছেন তাই করে যান, নিয়ে যান টাকা—"

আয়রণচেস্ট খুলে মধুসূদনের দেওয়া নোটের গোছা সে জয়ন্তের সামনে টেবলে রাখলে, বললে, "এসেছেন তো ডাকাতি করতে, লেকচার দেওয়া মানায় না। নিন, রিভলবার পকেটে তুলুন, টাকা নিন, সোজা পথে চলে যান।"

জয়ন্ত স্বহস্তে নোটগুলো পকেটে রাখলে, স্মিতমুখে বললে—"ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে, সোজা পথে যেতে আদেশ করলেন বটে, কিন্তু কি করে বিশ্বাস করব আপনি আমায় ধরিয়ে দেবেন না?

ভারতী তীক্ষ্ম কণ্ঠে বললে—"আপনার দুই লরি সশস্ত্র দেহরক্ষী তো এসেছে বললেন—"

জয়ন্ত ধীরে-সুস্থে রিভলবারটা কটিবন্ধে বাঁধতে বাঁধতে বললে, "কথাটা বিশ্বাস করবেন না ভারতী দেবী, আমি একা—সম্পূর্ণ একা এসেছি। আপনি সত্যিই ইচ্ছা করলে এখনই আমায় ধরিয়ে দিতে পারেন।

ভারতী উজ্জ্বল মুখে বললে, "না,—আমি যা দিলুম আপনার হাতে তুলে—সে আমার দান নয়—মাতৃপূজার জন্য উৎসর্গ করেছি। আপনি নির্ভয়ে চলে যান জয়ন্ত বাবু,—আমি কাউকে কিছু জানাব না। তবে দোহাই আপনার পাঁচিল টপকাতে যাবেন না, সোজা সদর দরজা দিয়ে বার হয়ে যান।"

জয়ন্ত উঠে দাঁড়াল, বললে, "আমি কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিনে সেই জন্যই সদর দিয়ে বার হওয়ার ভরসা পাচ্ছিনে। কিছু মনে করবেন না—চাণক্য পণ্ডিত বলে গেছেন, নখী, দন্তী, শৃঙ্গী আর নারী এই চারটিকে বর্জন করে চলবে—"

তীক্ষ্ম কণ্ঠে ভারতী চেঁচিয়ে ওঠে—"অপমান করবেন না জয়ন্ত বাবু, যা মুখে আসছে তাই বলে যাচ্ছেন, আশা করছি নিজেকে সংযত করবেন। অন্ততঃ পক্ষে এটুকু বিশ্বাস করবেন আপনার মা বোনকে—মনে রাখবেন করুণাই আপনাকে বাঁচিয়ে তুলেছে। আপনাকে ভালো কথায় বলছি আপনি চলে যান—দেখুন নটা বেজে গেছে, এখন আমি খেতে যাব। আপনি মনে রাখবেন, এসেছেন ডাকাতি করতে, রিভলবার দেখিয়ে ভয় দেখিয়ে টাকা নিতে, এখানে নিমন্ত্রণ খেতে আসেন নি।"

জয়ন্তের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সে আবার চেপে বসলো, "আপনি এখন খেতে যাবেন বলছেন, তা হলে আমায় আবার বসতে হল। অপরাধ নেবেন না—আজ দুদিন অদৃষ্টে খাওয়া জোটে নি, যদি দুটো ভাত, রুটি এমন কি মুড়ি চিড়েও জোটে, আবার দুদিনের মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারি।—"

ভারতীর মুখখানা মলিন হয়ে যায়—আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে, "খান নি কেন?"

জয়ন্ত হাসে, বললে, "জুটলে তো খাব। আমরা তো যে-সে লোক নই, বিশেষ আন্দামান হতে পালানোর পর হতে পুলিশের ভয়ে কুকুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি, নির্জনে কোথাও একটা দিন বিশ্রাম করতে দিলে তো খেতে পাব। সে দিন এক বাড়ীতে কেবল খেতে বসেছি—এমন সময় পুলিশ করলে বাড়ী ঘেরাও। চটপট একটি বউ হয়ে গেলুম। সে বাড়ীর বউদের গহনা কাপড় পরে একদম ভুলে গেলুম, আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছিল, খেতে বসে আমার খাওয়া হয় নি। বউ হয়ে ঘোমটা টেনে পুলিশের সামনে দিয়ে বার হয়ে এলুম, তার পর সোজা পিটটান।

ভারতী নিঃশব্দে মাটির পানে তাকিয়ে থাকে—

কে জানে তবু কি মোহ আছে, কি জন্য এই সব সোনার চাঁদ ছেলেরা ঘরবাড়ী আত্মীয় স্বজন ছেড়ে এমনই ভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। নিজেদের সুখশান্তির কথা এরা ভাবে না, কত দিন খেতে বসে খাওয়া হয় না—মুখের ভাত ফেলে এরা বার হয়ে পড়ে। ধরা পড়ে যায়, কত লাঞ্ছনা, কত অত্যাচার, এরা যায় দ্বীপান্তরে, এরা থাকে জেলে, এরা দোলে ফাঁসীর দড়িতে—

জয়ন্ত তার মুখের পানে তাকিয়ে থাকে,—"নিন আপনারা ভারি সেন্টিমেন্টাল, সঙ্গে সঙ্গে চোখে জল আসে কারও দুঃখের কথা শুনলে। আমাদের নিয়ে ভাবনার কোন কারণ নেই, এ সব আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে, এই সবই আমাদের খুব ভালো লাগে। এখন যা বললুম তাই করুন দেখি, আমায় খেতে দিন, দক্ষিণাটাও নিয়ে যাই দানের।"

পিছন দিককার দরজা খুলে ভারতী বার হয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে—

জয়ন্ত নিশ্চিন্ত ভাবেই একখানা বই টেনে নিয়ে বসলো—ভারতীকে সে সন্দেহ করে নি।

কয়েক মিনিট পরে দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল—

একখানা থালায় ভাত তরকারী নিয়ে প্রবেশ করলে ভারতী। জয়ন্তের সামনে টেবলের উপর থালা নামিয়ে দিয়ে সে নিজের গ্লাসে কুঁজো হতে জল নিয়ে দিলে, বললে, "খান—এখানে তাড়াতাড়ি করতে হবে না, ধীরে-সুস্থে খেয়ে নিন।"

"এত খাবার—?"

জয়ন্ত ভারতীর পানে তাকায়—"নিজের সব দিলেন, আপনি আজ উপবাসী থাকবেন তো?"

ভারতী করুণ হাসি হাসে, বললে, "জমিদার বাড়ীতে রাত্রির খাওয়ার অভাব হবে না জয়ন্তবাবু। আপনি খেয়ে নিন।"

জয়ন্ত খেয়ে যেতে লাগলো, তার খাওয়া দেখেই জানা যায় সত্যই সে বুভুক্ষিত।

ভারতী বললে, "আর ভাত এনে দেব কি?"

জয়ন্ত মাথা নাড়ে, কথা বলার অবকাশ তার নাই।

থালাটা শেষ করতে পাঁচ মিনিটও লাগে না। এক গ্লাস জল খেয়ে একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে জয়ন্ত বললে—"ধন্যবাদ—অশেষ ধন্যবাদ। হাজার হোক জমিদার বাড়ী—জমিদারের মেয়ে আপনি—ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণী, মনের উদারতা আপনার আছে। এর চেয়ে আরও বেশী খেতে পারতুম, তাতে নড়বার ক্ষমতা থাকতো না, এখানে থাকাটাও বড় সুবিধাজনক হতো না, সেই জন্যে এককোণ খালি রেখে খেয়েছি। যা খেলুম আজ তিন বছর এমন খাওয়া কপালে জোটে নি ভারতী দেবী। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর গিয়ে দেড় বছর থেকে পালিয়েছি, বাকি দেড় বছর এমনই করে তাড়া খেয়ে পালাচ্ছি। আর এ রকম করে ছুটে বেড়াতে ভালো লাগছে না,—বড় ক্লান্তি এসে পড়েছে। তাই ভাবছি কিছুদিনের জন্যে আতিথ্য স্বীকার করা যাক, তাতে আর কিছু না হোক—বিশ্রামটা তো পাওয়া যাবে—"

বলতে বলতে সে হাসে—।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ভারতী জিজ্ঞাসা করলে, "আতিথ্য—মানে কার আতিথ্য স্বীকার করবেন?"

জয়ন্ত উত্তর দেয়—"গভর্ণমেণ্টের আতিথ্য—সোজা কথায় যাকে আপনারা শ্বশুরবাড়ী বলে থাকেন। জামাই আদরে কিছুদিন খেয়ে বিশ্রাম করে আসা যাক—আর এরকম করে ছুটে বেড়াতে ভালো লাগে না,—না, সত্যিই ভালো লাগে না ভারতী দেবী।"

তার মুখের উপর ক্লান্তির বিষণ্ণতা ফুটে ওঠে।

ভারতী শান্ত কণ্ঠে বললে, "আপনি হয় তো বিশ্রাম চান—সেটা সম্পূর্ণ সাময়িক জয়ন্তবাবু। কিন্তু যে সময়টা আপনি জেলে বন্দী হয়ে থাকবেন, সে সময় বাইরে অর্থাৎ দেশের অবস্থা কি হবে সেটা একবার ভাবুন। বিশ্রাম আপনার জন্যে নয়,—আপনি যা করছেন তাই করুন। আপনার উদ্দেশ্য কত বড়, কত মহৎ, আপনার এই কষ্ট এই দুঃখ কত জড়কে সচল করবে, সেটা মনে করুন।"

জয়ন্ত নিস্তব্ধে ভারতীর মুখখানার পানে তাকিয়ে থাকে,—অকস্মাৎ সচকিতভাবে সে উঠে পড়ে—

"যাঃ, অনেক দেরী হয়ে গেছে—অনেক দেরী। কতগুলি ছেলে আমার পথ চেয়ে রয়েছে, বেচারীরা খেতেও পায় নি, আমি এই টাকা নিয়ে গেলে তবে তারা খেতে পাবে। চললুম ভারতী দেবী, অনেক—অনেক ধন্যবাদ। হয় তো অদূরভবিষ্যতে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে—অন্ততঃ সে চেষ্টা আমি করব। আমি জানি আপনাদের আজ কিছু নেই, এ টাকা প্রজারা তাদের প্রিয় জমিদারের মামলার জন্যে এনে দিয়েছে। আপনাকে আমি অপরাধিনী করব না; আমি উপস্থিত আবশ্যকে—নিতান্ত দায়ে পড়ে এ টাকা গেলেও যত শীঘ্র পারি আপনাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।"

সে দুই পা অগ্রসর হয়ে আবার ফিরলো—

"হ্যাঁ, একখানা পত্র আছে আপনার নামে—নিন—"

ভারতী আকাশ হতে পড়ে—"আমার পত্র—?"

এনভেলাপবদ্ধ পত্রখানা তার হাতে দিয়ে জয়ন্ত বললে, "পড়ে দেখবেন—।"

একটা নমস্কার করে স্মিতমুখে জয়ন্ত বার হয়ে গেল।

[ক্রমশঃ]

সমালোচক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

সাহিত্যাচার্য পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলীর সহিত আধুনিক পাঠকসমাজ একপ্রকার অপরিচিতই ছিলেন। সম্প্রতি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র প্রচেষ্টায় তাঁহার অধিকাংশ সাহিত্যিক কৃতির প্রকাশ এবং প্রচার না হইলে আজ তিনি আমাদের পুরাতন স্মৃতির যাদুঘরেই থাকিয়া যাইতেন, বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যামোদীর মানসলোকে কোনরূপ আলোকসম্পাত করিতে পারিতেন না। অথচ তাঁহার ন্যায় বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে এত সহজে ভুলিয়া যাওয়া কেবলমাত্র অকৃতজ্ঞতাই নয়—জাতীয় অপরাধও বটে। কারণ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় একদা আমাদের বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনকল্পে যাহা করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে বুঝিতে না পারিলেও অদূরভবিষ্যতে নিশ্চয়ই বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় একাধারে ছিলেন সাহিত্যিক, সংবাদপত্রসেবী, স্বদেশহিতৈষী এবং সমাজ-সংস্কারক। তাঁহার ন্যায় জাতীয়তাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি বর্তমান যুগে একান্ত দুর্লভ। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধকার। সাহিত্য, জীবনচরিত, সমাজনীতি, জাতিতত্ত্ব, দর্শন, বৈষ্ণবশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র প্রভৃতি যে কোন বিষয়েই তিনি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও মননশীলতার স্বাক্ষর রহিয়াছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা তাঁহার সাহিত্যকীর্ত্তির সমগ্র বস্তুরূপের পরিচয় না দিয়া কেবলমাত্র উহার অংশ-বিশেষের কথা উল্লেখ করিব। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন প্রথম শ্রেণীর রসস্রষ্টা ছিলেন, তেমনি রসের বিচারক হিসাবেও তাঁহার বিচক্ষণতার সুনাম ছিল। তাই মৌলিক সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যুগোত্তীর্ণ সাহিত্যের রসবিশ্লেষণ বা মূল্য-নির্দ্ধারণের প্রতি তাঁহার সজাগ দৃষ্টি ছিল। সকল দেশেরই সাহিত্য সৃজনীপর্ব্ব উত্তীর্ণ হইয়া সংরক্ষণী পর্ব্বের মাধ্যমে আপনার আয়ুষ্কালকে বর্দ্ধিত করে। কিন্তু যে সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় একদল ভক্তের সমাদরের উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া স্থির হইয়া যায়, সমসাময়িককালের অব্যবহিত পরবর্ত্তী ভাবীকাল যাহার মূল্য-বিচার করে না তাহার জীবন শুধু স্বল্পায়ু হয় না, তাহার স্বাভাবিক বিকাশের পথও অবরুদ্ধ হইয়া যায়। অতএব সাহিত্যের জীবনধর্ম্মের জন্য বা সত্যকার চিরন্তন সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য মৌলিক নির্মাণকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে অসার বস্তু নিবারণ কার্য্যের দক্ষতার কিরূপ প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমেয়। বাংলা সাহিত্যে যেদিন হইতে সৃষ্টিধর্ম্মী সাহিত্যের জন্ম হইয়াছে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই উহার আদর্শ ও মান-নির্দ্ধারণ এবং রসবিচারের কর্ম্মও সুরু হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই বঙ্কিমচন্দ্রের কথা

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

সকলের মনে পড়িবে। বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন হইতে তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' সব্যসাচীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন সেই সময় হইতেই বাংলাসাহিত্যের রচনা ও সমালোচনা যুক্তবেণীতে প্রবাহিত হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তীকালীন যুগেও সেই ধারা রবীন্দ্রনাথের দানে পুষ্ট ও বেগবান হইয়াছে এবং তাহারও পরবর্ত্তী কালে যে সকল শক্তি-

ধর পুরুষের নিষ্ঠা ও সাধনায় সেই ধারা অব্যাহতগতিতে অগ্রসর হইয়াছে, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

সমালোচক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক-জীবনের সূচনা হয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গ-বাণী' নামক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক রূপে। ১৮৯৫ সালে তিনি ঐ পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইহার চার বৎসর পরে তিনি 'বসুমতী' পত্রিকা সম্পাদন করেন। বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলন সুরু হইলে তিনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের দৈনিক পত্রিকা 'সন্ধ্যার' নিয়মিত লেখক হন। এতদ্ব্যতীত তিনি 'দৈনিক হিতবাদী', 'প্রবাহিনী', 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকারও সম্পাদনা করেন এবং 'বাঙ্গালী', 'ভারতমিত্র' (হিন্দী দৈনিক) ও 'স্বরাজ' পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় 'সাহিত্য' ও 'নায়ক' পত্রিকার ঘনিষ্ঠ সংযোগ। বিশেষতঃ 'সাহিত্য' পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম লেখক হিসাবে তাঁহার সাহিত্য-বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনা ও সমালোচনা তাঁহাকে বাংলাসাহিত্যের ইতি-হাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। বাংলাসাহিত্যে যে-সকল পত্রিকা-রচনা ও সমালোচনার অভিনবত্বে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের সৎসাহসে যুগান্তকারী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য 'বঙ্গ-দর্শন' এবং তৎপরে ঠিক অনুরূপ সম্মানের দাবী করিতে পারে একমাত্র 'সাহিত্য' পত্রিকা। 'সাহিত্য' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নাম জানেন না বা তাঁহার সমালোচনার সহিত পরিচিত নন এমন কোন অনুরাগী পাঠক আছেন কি না তাহা আমার ধারণায় নাই। কারণ 'বঙ্গদর্শন' বলিলে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা আমাদের স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠে, সেইরূপ 'সাহিত্য' বলিলে যে-ব্যক্তির পৌরুষ-ব্যঞ্জক নির্ভীক প্রতিমূর্ত্তি আমাদের নয়নগোচর হয় তিনিই সমালোচক চূড়ামণি সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেশ-চন্দ্রের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মী ছিলেন। বাংলাদেশের বিদগ্ধ সমাজ একদা এই দুই ব্যক্তির লেখনীর যাদুস্পর্শে এমন মোহিত হইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহাদের সকল চিন্তা-কর্ম্ম ও বাক্যের মূলে ছিল এই দুই মনীষীর সুদূরপ্রসারী প্রভাব। এই দুই সমালোচকের বিচারবুদ্ধি ছিল এমন তীক্ষ্ণ এবং বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী এত সূক্ষ্ম ও অন্ত-র্ভেদী যে, তৎকালীন কোন রচনার সামান্যতম ত্রুটিও ইঁহাদের সতর্ক চক্ষুর বাহিরে যাইতে পারিত না। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য' পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ রচনা করিতেন। 'সহযোগী সাহিত্য'—এই বিভাগে তিনি প্রতি মাসে যে সকল বিষয় আলোচনা করিতেন তাহা যেমন চিন্তাপূর্ণ তেমনি বহুবিধ জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসা প্রসূত। সমালোচনা কার্য্যে তাঁহার অনন্যসাধারণ পারদর্শিতা ছিল বলিয়াই সুরেশ সমাজপতির মৃত্যুর পর তিনিই 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদনা করিতে সাহসী হন। এবং ১৩২৭ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যা হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু একথা এখন থাক। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যে' প্রকাশিত সমালোচনা প্রবন্ধগুলির মধ্যে "নবীনচন্দ্র ও জাতীয় অভ্যুত্থান" সর্ব্ব-প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৩১৫ সালের মাঘ সংখ্যায় তিনি এই রচনাটি প্রকাশিত করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলাদেশে যে নবজাগৃতির প্লাবন দেখা যায়, যাহার ফলে বাঙালীর শিক্ষা, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নবযুগের রূপান্তর সৃষ্টি হয়,—যে যুগের সাহিত্যে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় মহাকবি ও স্রষ্টার আবির্ভাব সম্ভব হয়—নবীনচন্দ্র সেই নবযুগের শেষ মহাকবি। মাইকেলের কাব্যে আছে পাশ্চাত্য Individualism বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (পুরুষকার) এবং হেম-চন্দ্রের কাব্যে আছে ইউরোপের অনুকরণে লব্ধ patriotism বা দেশহিতৈষণা। নবীনচন্দ্র এই দুই মহাকবির উত্তর-সাধক। সুতরাং তাঁহার অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। "কবি নবীনচন্দ্র প্রথমে মাইকেল ও হেমচন্দ্রের ভাবমোহে পড়িয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য পলাশীর যুদ্ধ। উহাতে patriotism অতি মধুরভাবে বর্ণিত ও বিন্যস্ত আছে।" লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে সময় বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য ভাবধারাকে দেশীয় ছাঁচে ঢালিয়া আমাদের মধ্যে পরিবেশন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং যে সময় ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রাচীন হিন্দু-সমাজ ও পারি-বারিক তত্ত্বকে ইংরাজী যুক্তি দ্বারা অভ্রান্ত ও নিষ্কলঙ্ক বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন ঠিক সেই সময়ে কবি নবীনচন্দ্র পাশ্চাত্য humanitarianismকে মহা-ভারতের গল্পের ছাঁচে ঢালিয়া নূতন জাতীয়তার উপাদানে 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' এই তিনখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিলেন। ঐ কাব্যগুলি একত্রে 'ত্রয়ী' বা 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' নামে সুপরিচিত। 'ত্রয়ী' কাব্যের বিষয়বস্তু ও উহার স্রষ্টার ভাষা কিরূপ ছিল, সেই সম্বন্ধে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "প্রৌঢ় শরতের

শেফালী-বর্ষার ন্যায় তাঁহার ভাষা আপনি আসে, আপনি ফুটে আর আপন সৌরভে দশদিক আমোদিত করিয়া দেয়। তাই তাঁহার এই তিনখানি কাব্য উদ্দেশ্যমূলক ও সিদ্ধান্ত-বিন্যাসক হইলেও, ভাষার গুণে অনেকের আদরের হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রে ও ধর্ম্মতত্ত্বে যাহা শিখাইয়াছেন, সূত্র ও ভাষ্যাকারে যাহারা বিন্যাস করিয়াছেন, উপকথার ছলে দেবী চৌধুরাণী, অনন্দমঠ ও সীতারাম এই তিনখানি উপন্যাসে যাহার আংশিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নবীনচন্দ্র তাঁহার তিনখানি কাব্যে সেই সকল তত্ত্বই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।" নবীনচন্দ্রের কাব্য আমাদের সাহিত্যে রুচির মোড় ফিরাইয়াছে। ইসলাম ধর্ম্ম ও সভ্যতার সহিত সংঘর্ষের ফলে আমাদের সাহিত্যে যে বিকৃত রুচি প্রবেশ-লাভ করিয়াছিল তাহা অপসারিত হইয়াছে। তাহার স্থলে এক অতীন্দ্রিয়বাদী চিন্তাধারা প্রবাহিত হইয়াছে এবং ইংরাজ কবি ব্রাউনিং এবং জর্ম্মাণ কবি গ্যেটের অনুসরণে বাংলাসাহিত্যে প্রকারান্তরে সেই সকল ভাবকল্পনা আমদানি করিয়াছে। "কবি নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যে ইউরোপের এই বিচিত্র transcendentalism-এর কতকাংশে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান অভ্যুত্থানের শেষ মহাকবি—শেষ ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক।"

১৩১৮ সালের বৈশাখ মাসে 'সাহিত্য' পত্রিকায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় "ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়" নামে যে প্রবন্ধটি রচনা করিয়াছেন, তাহা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, 'কল্পতরু', 'ক্ষুদিরাম' ও 'ভারত উদ্ধার' নামক তাঁহার ব্যঙ্গ কাব্যগুলি এক সময় যে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার সম্পাদিত 'পঞ্চানন্দ', 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা খাঁটি বাঙালীর ভাষা।, সকল শ্রেণীর পাঠকই সহজে তাহার অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করিত। ইন্দ্রনাথের সাহিত্যিক সাধনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেনঃ "ইংরাজীতে যাহাকে Satire বলে, যাহা বিদ্রূপ ও শ্লেষের সমবায়ে অভিব্যক্ত, ইন্দ্রনাথ বাঙ্গলা-ভাষায় তাহারই সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার 'ভারত উদ্ধার' ব্যঙ্গকাব্য বাঙ্গলা ভাষার অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় Satire। আধুনিক বাঙ্গালী লেখকগণ ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, শ্লেষ, পরিহাস, উপহাস, কৌতুক প্রভৃতির বিশ্লেষণ অনুসারে ব্যবহার করেন না। ইন্দ্রনাথের লেখায় একদিকে যেমন ইংরেজী wit ও humour দেখান আছে, অন্যদিকে তেমনি ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, শ্লেষ, রঙ্গ, কৌতুক, উপহাসাদি যেন ছড়ান-বিছান আছে।"

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াই সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সেই কারণে এই প্রবন্ধটিকে গুরুর পরলোকগমনে শিষ্যের স্মৃতি-তর্পণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে একটি বর্ণও অনাবশ্যক বাহুল্য বা অতিরঞ্জিত বর্ণনার অবকাশ নাই—যাহা আছে তাহা অতিশয় আন্তরিকতাপূর্ণ ও শ্রদ্ধাবনত উক্তি। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কেবলমাত্র পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়েরই গুরু ছিলেন না—তিনি সমসাময়িক বিদ্বোৎমণ্ডলীর অন্যতম প্রধানও ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিনায়কত্বে যে সকল মনীষী মনস্বী সাহিত্যসংঘ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন—যেমন, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর, রামদাস, রাজকৃষ্ণ, জগদীশ—পাঁচকড়িও সেই রসিকমণ্ডলীর একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। ইন্দ্রনাথের সাহিত্যিক সামর্থ্য বঙ্কিমচন্দ্রকেও মুগ্ধ করিয়াছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্র একবার বলিয়াছিলেনঃ "ইন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্য-আকাশের Halley's Comot, যখন ফুটিয়া উঠে, তখন উহার প্রভায় দশদিক আলোকিত হইয়া উঠে। পরন্তু সবাই উহাকে দেখিলে ভয় পায়। কে জানে, কাহার কোন অন্ধকার কোণটি উহার পুচ্ছের আলোকে প্রোজ্বল হইয়া উঠিবে, আর দেশশুদ্ধ লোকে তাহা দেখিয়া হাসিবে ও হাততালি দিবে।"

ইন্দ্রনাথের শ্লেষ-ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যহীন ছিল না। তিনি যে মানুষকে হাসাইতেন তাহার মূলে তাঁহার হতাশার বেদনা ছিল। স্বদেশে ও স্ব-সমাজের অধোগতি তাঁহাকে পীড়িত করিত বলিয়াই তিনি হাসাইতেন। তাঁহার 'ক্ষুদিরাম' পুস্তিকায় শ্মশানের এক বিকটহাস্য ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল। ইন্দ্রনাথ সনাতন আদর্শ বিশ্বাসী ছিলেন। সেই আদর্শ হইতে স্খলিত হইবার জন্যই বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় যতপ্রকার বৈষম্য দেখা দিয়াছে বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মাইয়াছিল। তিনি আজীবন ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। আধুনিক লেখকগণের রচনায় ধর্ম্মভাব না থাকায় তিনি ক্ষুব্ধ হইতেন। তিনি বলিতেন "ভাষার tone ও instinct অর্থাৎ ধাতু ও প্রকৃতি ঠিক বজায় না থাকিলে সে ভাষা টিকে না।......ইন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিতেন যে, "লেখক পাকা হিন্দু হইতে পারিলে তবে তাহার লেখায় ও ভাষায় হিন্দুত্ব ফুটিয়া বাহির হইবে। যে ভাষায় ধর্ম্ম নাই, প্রয়োগ সংযম নাই, তাহা এদেশে বিকাইবে না—টিকিবে না।"

১৩১৯ সালে বৈশাখ মাসে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনচরিতের 'মূলসূত্র' নামে প্রবন্ধটি 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জীবন-সাহিত্য পাশ্চাত্য দেশের সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কথা বাদ দিয়াও যদি কেবলমাত্র ইংলণ্ডের কথা ধরা যায়, তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে, সে দেশে জীবনচরিত রচনা করিয়া এমন সাহিত্যিক সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন যাহার তুলনা আদৌ আমাদের দেশে মিলিবে না। বসওয়েল, এ্যাসকুইথ, ষ্ট্রাচী প্রমুখ সাহিত্য স্রষ্টাগণ জীবনচরিত রচনায় যে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের কৃতি যুগোত্তীর্ণ সাহিত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। নর-নারীর চরিত্র বর্ণনা করিতে হইলে যে নিরপেক্ষতা, সমাজ ও পরিবেশের যে বাস্তবনিষ্ঠ বর্ণনার একান্ত প্রয়োজন তাহা না থাকিলে কোন জীবন-চরিতকারই তাঁহার কার্য্যে সাফল্যলাভ করিতে পারিবেন না। মনীষী স্যার গিড্‌নীলী এই বিষয়ে কতকগুলি বিধি নির্দেশ স্থির করিয়া দিয়াছেন যেগুলি অনুসরণ করিলে জীবন কাহিনী বর্ণনায় কোনরূপ ত্রুটী-বিচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ নির্দেশ অবলম্বনেই বলিয়াছেন, 'সমাজই মনুষ্য জীবনের ক্ষেত্র-স্বরূপ। সমাজের গতি অনুসারে, ভাব ও অভাবের পরিণতি অনুসারে এক এক নর বা নারী এক এক ভাবে ফুটিয়া উঠেন। যিনি নেপোলিয়ানকে বুঝিতে চাহিবেন, তাঁহাকে ফরাসী বিপ্লবের ভঙ্গী বুঝিতেই হইবে। জগতে ফরাসী বিপ্লব দুইটা হয় নাই, নেপোলিয়ানও দুইটা হইবেন না। প্রতিবেশপ্রভাব জন্যই মানুষ। সেই প্রতি-বেশ-প্রভাব বুঝিতে না পারিলে মানুষকে বুঝা যায় না। ....নিজের কথাই হউক, আর অন্যের কথাই হউক, জীবনকথা is the truthful transmission of personality, মানুষের সত্য বিকাশ মাত্র। উহাতে মিথ্যার বা সত্য গোপনের অবসর নাই। এই হিসাবে বসওয়েল কর্তৃক লিখিত জনসনের জীবনকথা এবং রুশোর আত্মজীবনকথা, জগতের সাহিত্যে দুইখানি আদর্শ পুস্তক।.. চরিতাখ্যান ইতিহাস নহে। ইতিহাসে এবং চরিতাখ্যানে যে বৈষম্য আছে, তাহা মণীষী বেকন সুন্দর করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন।"

ঐ বৎসরই পৌষ মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'দুইটি গান' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। উহাতে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা শক্তির নিপুনতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। লোচনদাস ও গোবিন্দদাস কবিদ্বয় বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহাদের দুইটি গান তুলনামূলকভাবে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। উহার মধ্যে আবার প্রথম গানটি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কমলাকান্তের কণ্ঠে যেরূপ নিঃসৃত করিয়াছেন সেইরূপেই গ্রহণ করা হইয়াছে। একটি —"এস, এস, বঁধু এস" ইত্যাদি আর একটি—"আইস আইস বন্ধু, আধ আঁচরে আসিয়া বৈস।" এই গান দুইটির সম্বন্ধে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "প্রথমটি লোচনদাসের বিরহ ব্যথিতার আশার উক্তিকে আধুনিক ইংরাজী ছাঁচে ঢালিয়া কমলাকান্তের গান, দ্বিতীয় মহাজন রচিত পদ—গোবিন্দদাসের পদ। প্রথমটিতে ভাব-বিপর্য্যয় ও রস বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; দ্বিতীয়টিতে ভাবের ও রসের ঘন বাঁধুনি নিত্য বিদ্যমান।......আসলে ও নকলে —মহাজনে ও কবিতে এত পার্থক্য। মহাজন শাস্ত্রোক্ত সাধনক্রমকে কাব্যের আবরণে ফুটাইয়া রোচক করিয়া তুলেন। কবি কেবল খোস খেয়ালের বসে মনভুলান কথা বলেন। শ্রীশ্রীপদকল্পতরু সাগর মন্থন করিয়া এমন একটি পদ পাইবে না, যাহা শাস্ত্রসঙ্গতি বিরুদ্ধ, অথচ প্রত্যেকটিই উচ্চাঙ্গের কাব্য। শাস্ত্রের—ভক্তিসূত্রের ঈক্ষণযন্ত্র ব্যতীত মহাজনের কোনও পদেরই রসাস্বাদন সম্ভবপর নহে। কমলাকান্তের সে যন্ত্র ছিল না।"

১৩২০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসেই অকস্মাৎ কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পরলোক গমন করিলেন। অপরিণত বয়সে তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের জগৎ হইতে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক খসিয়া পড়িল। দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-প্রতিভা তৎকালীন সাহিত্যিক সমাজে সুবিদিত ছিল। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহার দান আদৌ নগণ্য নয়। বাঙালী জাতির সম্বন্ধে বহু যুগ ধরিয়া এই অপযশ শুনা যাইত যে, 'বাঙালী না কি হাসিতে জানে না এবং হাস্যরসের অনুভূতি তাহার চিত্তবৃত্তিকে প্রবুদ্ধ করিতে পারে না।' দ্বিজেন্দ্রলাল এই অপবাদের মূর্তিমান প্রতিবাদ। বস্তুতঃ এই বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্বের কথা স্মরণ করিয়া পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় "দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নামে যে প্রবন্ধটি রচনা করেন (সাহিত্য—আষাঢ় (১৩২০) তাহাতে দ্ব্যার্থ-হীন ভাষায় বলিয়াছেন—"দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার রচিত হাসির গানের সাহায্যে বাঙালীকে হাসাইয়া মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। নব্যহিন্দু তাঁহার ব্যঙ্গে নিজের দিকে তাকাইয়াছিল। বিলাত ফেরতা বাঙালী সাহেব তাঁহার শ্লেষের কশাঘাতে দেশের মুকুরে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিল, রাজনীতিক দেশহিতৈষী তাঁহার

বিদ্রূপবাণে অধীর হইয়া বিদেশের আদর্শ প্রচ্ছন্ন রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল, স্বদেশের আদর্শের অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এক হাসির হাসে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলার শিক্ষিত সমাজে এক ভাববিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন—'ন্যাকামি'র সংকোচ করিয়াছিলেন।............হাসির গানের রচনায় তিনি যেমন অদ্বিতীয় ছিলেন, হাসির গান গাহিতে তিনি স্বয়ং তেমনি অতুল্য ছিলেন। ময়মনসিং হইতে মালদহ পর্যন্ত, দার্জিলিং হইতে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত বাংলার সকল জেলার সকল সমাজে তিনি স্বয়ং তাঁহার হাসির গান গাহিয়া বেড়াইয়াছিলেন।"

এই হাসির গান সম্বন্ধে অনেকের ধারণা আছে উহা বুঝি লঘু-চপল পরিহাস রসিকতার গান এবং উহাতে ভাবের গাঢ়তা বা সুরের তাললয় বৈচিত্র্য নাই। বস্তুতঃ "দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান সেকালের যাত্রার সঙের গান নহে, ভাঁড়ের ভাঁড়ামি নহে, কথকের নকল নহে, ঠাকুর-দাদার ব্যঙ্গ নহে পরন্তু এই সকলের সমবায়ে বিলাতী 'হিউমারে'র চাটনি মাত্র।"

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃতি ছিল ভাবুকতাপূর্ণ। তাঁর নাটকে এই ভাবাভিব্যঞ্জনার কারিগরী আছে। "দুর্গাদাস", 'রাণাপ্রতাপ', 'নূরজাহান', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রভৃতি নাটকে যে ভাবের একটানা স্রোত বহিয়াছে,—তাহা গঙ্গা-তরঙ্গের ন্যায়। যেমন সকল নদনদী গঙ্গায় আসিয়া পড়িলে গঙ্গা হইয়া যায়, তেমনই ইউরোপের নানাভাব, নানা আদর্শ, নানা স্ফুটোক্তি কবির মণীষা-খাত, প্রতিভা-সমুজ্জল ভাবগঙ্গার গর্ভে আসিয়া পড়িয়া আমাদের পেয় ব্যবহার্য্য, পবিত্রীকরণের অবলম্বনস্বরূপ ভাগীরথী সলিল হইয়াছে।............তিনি ইংরেজী সাহিত্যের সৌন্দর্য্যটুকু, আধুনিক Humanitarianism বা মানবপ্রীতির মাধুরী-টুকু বাংলার সাহিত্যে আমদানি করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার গম্ভীর গানে, নাটকের ভূমিকা বিন্যাসে, ঘটনার পরম্পর্যের উন্মেষ চেষ্টায় তিনি মানব প্রীতির পরিচয় অনেকটা দিয়াছেন।" দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, তিনি বাংলা ভাষার লিখন-পদ্ধতির উপর কোনরূপ অভিনবত্বের দৌরাত্ম্য না ঘটাইয়া বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের পরবর্তী-রূপে যাহা পাইয়াছিলেন তাহারই সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন।

ইহার পর পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সমস্ত সমালোচনামূলক রচনা প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে 'বঙ্কিম-চন্দ্রের ত্রয়ী' নামক প্রবন্ধটি সকল সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক যুগ হইতে এ পর্যন্ত বহু খ্যাতনামা সমালোচক বহুভাবে বঙ্কিম-সাহিত্যের রস বিচার ও রস বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্যের পরিধি যেমন বিস্তৃত তেমনি বিষয়ের পরিসরও অধিক। কিন্তু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র একটি প্রবন্ধের আবেষ্টনীতে সমগ্র বঙ্কিম সাহিত্যের মূলাধারটিকে রসিকজনের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ববর্তী রসপ্রমাতাগণ যথা অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, প্রমথনাথ সেন, ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়, নিঃসন্দেহে এই বিষয়ে এক এক জন দিকপাল ছিলেন। তথাপি পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা তাঁহাদের তুলনায় কোন অংশে হীন হয় নাই। 'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী' নামক প্রবন্ধটি ১৩২১ সালে বৈশাখ মাসের 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সম্পাদনায় 'নারায়ণ' তৎকালীন যুগের সাময়িক পত্রিকা জগতে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা করিয়াছিল। বহু খ্যাতনামা কবি, গল্পকার এবং প্রবন্ধলেখক ঐ পত্রিকায় রচনা পাঠাইয়া নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করিতেন। 'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী' তাহারই অন্যতম নিদর্শন। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ তিনটি উপন্যাস—আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতা-রাম—সম্বন্ধে একটি অপূর্ব আলোচনা রহিয়াছে। বঙ্কিম-চন্দ্র তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভকালে যে প্রেরণার বশবর্তী হইয়া উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন শেষ জীবনে সেই প্রেরণা যে বজায় ছিল না লেখক আলোচ্য প্রবন্ধে তাহাই যুক্তি ও তথ্যের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতে "গোড়ায় তিনি কাব্যসৃষ্টি, ভাবসৃষ্টি এবং রসের সৃষ্টি করিয়াছেন, শেষে একটা উদ্দেশ্য লইয়া তিনি উপ-ন্যাস লিখিয়াছেন।"

ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী সভ্যতার সহিত সনাতন ভারতীয় শিক্ষা সভ্যতার সংঘাতের ফলে আমাদের হিন্দু সমাজে আচার ব্যবহারগত যে সকল পরিবর্তন অবশ্য-ম্ভাবীরূপে দেখা দিয়াছিল বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃত দেশ হিতৈ-ষীর ন্যায় তাহাকে জাতির প্রকৃতি ও চরিত্রের অনুকূল করিয়া পরিচালিত করেন। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালী জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তিনিই প্রথমে উপলব্ধি করেন এবং তাহাকে দেশাত্মবোধের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। ইতিপূর্বে রঙ্গলাল হইতে হেমচন্দ্র পর্যন্ত বাঙালী কবি-গণ ভারতাত্মবোধের গুণগান করিয়া ইংরাজের নিকট হইতে 'ভীরু বাঙালী জাতি' এই অপযশ বহন করিয়া চলিয়া-ছিলেন। "এ কলঙ্ক ভঞ্জনের চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বাগ্রে করেন। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী এবং

সীতারাম লিখিয়া বাঙালীর কলঙ্কাপনোদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই তিনখানা উপন্যাসে বাঙালীর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, বাঙালীকে দেশাত্মবোধে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। 'বন্দেমাতরম্' বাংলার গান, সমগ্র ভারতবর্ষের নহে, এই তিনখানা উপন্যাসে কেবল বাংলার বাঙালীর কথা আছে, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের ইঙ্গিতমাত্র নাই।"

এই উপন্যাসগুলির সম্বন্ধে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "এই তিনখানি উপন্যাসে বাঙালীর প্রকৃতির আধারে বঙ্কিমচন্দ্র সমষ্টি, ব্যষ্টি এবং সমন্বয়ের অনুশীলন পদ্ধতি পরিস্ফুট করিয়াছেন। আনন্দমঠে সমষ্টির বা সমাজের ক্রিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; দেবী চৌধুরাণীতে ব্যক্তিগত সাধনার উন্মেষ প্রকরণ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন, সীতারামে সমাজ ও সাধনা সম্মিলিত হইলে কেমন করিয়া একটা State বা স্বতন্ত্র শাসন সৃষ্ট হইতে পারে, তাহার পর্য্যায় দেখাইয়াছেন।" এই তিনটি উপন্যাসের ঘটনা সংস্থানে ইতিহাসকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিলেও বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিকতা বজায় রাখিতে পারেন নাই। কারণ ইহাতে তিনি তৎকালোপযোগী ক্ষেত্র রচনা বা খুঁটিনাটি চিত্র বর্ণনা অপেক্ষা উদ্দেশ্য লইয়া মনোযোগী ছিলেন। "নানাভাবে অনুশীলন তত্ত্বটা বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র এই তিনখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। এ অনুশীলনতত্ত্বটা কিন্তু খাঁটি ইউরোপের সামগ্রী। জার্মান পণ্ডিত ফিক্‌তের (Fichte) Individual and Communal Culture-এর ব্যষ্টি এবং সংহতির অনুশীলনটাই তিনি বাংলার গঙ্গামাটির প্রলেপ দিয়া, বাঙালীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।"

অতঃপর লেখক উপন্যাস তিনটির অন্তর্নিহিত তথ্যসকল বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কেন 'আনন্দমঠ' রচনা করিয়াছিলেন এ প্রশ্ন আজিও অনেকের মনে উত্থিত হয়। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় অতিশয় প্রাঞ্জলভাষায় এবং সহজবোধ্যভাবে তাহার জবাব দিয়াছেন। সকল কৌতুহলী পাঠকের ইহা অবশ্য প্রণিধানযোগ্য। "বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ লিখিয়া বাঙালীকে এই কথাটা যেন ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন যে, ইউরোপের ভোগপ্রচুর শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীকে জাতির মঙ্গলকামী কর্ম্মী হইতে হইলে দেশীয়ভাবে ত্যাগী হইতে হইবে। তেমন কর্ম্মীকে সর্ব্বাগ্রে এমন পরিচ্ছদ ধারণ করিতে হইবে, যাহা দেখিলে বাংলার আপামর সাধারণে চিনিতে পারে এবং চিনিয়া স্বেচ্ছায় তাহা অনুসরণ করিতে পারে।.........আনন্দমঠের সন্ন্যাসী না পুরা তান্ত্রিক, না পুরা বৈষ্ণব। উহারা পরোপকার করিতেছে—কোম্পানীর মাল লুটিয়া, কোম্পানীর নিরীহ সিপাহীকে খুন করিয়া উহার দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাকে ক্ষুধার অন্ন দিতেছে। পরোপকারের এমন উৎকট আদর্শ আমাদের শাস্ত্রে নাই, ধর্ম্মে নাই, বিশেষতঃ কোন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসধর্ম্মে নাই। কারণ, আনন্দমঠের সন্ন্যাসীর আদর্শের তলায় বিলাতী প্যেট্রিয়টিজম্ আছে, ইয়োরোপের মোহন অংশটুকু অঙ্কিত আছে।"

আনন্দমঠ উপন্যাস রচনায় যে ত্রুটী বা দুর্ব্বলতা লেখকের মনকে কাহিনীকারের বক্তব্য বিষয়ের সহিত একমত হইতে দেয় নাই তাহাও তিনি সাহসের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "আনন্দমঠে জীবানন্দ ও শান্তিই কেন্দ্র চরিত্র। এই দুই চরিত্র যেভাবে ফুটান হইয়াছে, সেভাবে চরিত্রোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত কথাগুলি আপনি ফুটিয়া উঠে নাই। মাঝে মাঝে সত্যানন্দকে আনিয়া সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণ করিতে হইয়াছে। অনেক কথা মহাপুরুষের উপর বরাত দিয়া রাখা হইয়াছে। আনন্দমঠের মহিমা চরিত্রোন্মেষে নহে, চিত্রাঙ্কনে নহে, উহার মহিমা 'বন্দেমাতরম্ গানে' এবং মাতৃমূর্ত্তি প্রদর্শনে। শক্তিপ্রতিমাকে কেমনভাবে দেশাত্মবোধের প্রতীকে পরিণত করা যাইতে পারে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র ইঙ্গিতে আনন্দমঠে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ইহাই আনন্দমঠের বিশিষ্টতা।"

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ তিনখানি উপন্যাসের মধ্যে দেবী চৌধুরাণীর আবেদন একটু ভিন্ন প্রকৃতির। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন জিজ্ঞাসা এখানে যেন এক নবতন সৃষ্টির পথ সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছে। বস্তুতঃ এখানে বঙ্কিমচন্দ্র যেন তাঁহার অনুশীলন তত্ত্বকে নূতন এক কর্ম্মে—মানুষ গড়িবার কার্য্যে প্রয়োগ করিয়াছেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় "দেবী চৌধুরাণী যেন বৈষ্ণবের হাতের শক্তিমূর্ত্তি—কমলা নহে, ভৈরবী নহে, কালীও নহে, অথচ তিনের সমন্বয়ে এক অপূর্ব্ব বৈষ্ণব ঠাকুরাণী। যখন শক্তিমূর্ত্তি, তখন পুরুষ সম্মূঢ়, ব্রজেশ্বর পিতৃশাসনে সম্মূঢ়, প্রফুল্লরূপে সম্মূঢ়। এই পুরুষের তৃপ্তি-তুষ্টি সাগরবৌ, বিরক্তি ও বিধৃতি নয়ান বৌ এবং ঐশ্বর্য্য ও আকাঙ্খা প্রফুল্ল বা দেবী চৌধুরাণী। প্রফুল্লকে সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনী করিতে যাইয়া কবি গোলে পড়িয়াছেন। প্রফুল্লকে এক রাত্রির জন্য স্বামীসহ সুখী করিয়া কবি সর্ব্বৈশ্বর্য্যের পথে একটা কণ্টকবিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহার পরিণাম দেবীরাণীর ব্রজেশ্বরের গৃহে আসিয়া বাসন মাজা—ঘর-সংসার দেখা।"

ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য যাঁহারা সমালোচনা করিয়াছেন তাঁহারা একপ্রকার একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে বঙ্কিমসাহিত্য বিচার করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহাদের নিকট অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটানা প্রশংসা বা সমাদরের আতিশয্য ব্যতীত আর কিছু প্রকাশ পায় নাই। অর্থাৎ যে সাহসিকতা এবং নিরপেক্ষ বিবেচনা বুদ্ধি না থাকিলে সাহিত্য বিচার নেহ্য বলিয়া গৃহীত হয় না তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যেই সর্ব প্রথম দৃষ্ট হইয়াছে। দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থে প্রফুল্ল চরিত্রের অনন্যতা লেখককে মুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু উহাকে প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইলেও কখনও অবাস্তব বলিয়া বোধ হয় নাই।

ইহার পর 'সীতারাম' উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "সীতারাম উপন্যাসে যেন দেবী চৌধুরাণীর Obverse proposition solve বা কতকটা বিরোধীভাবের ব্যঞ্জনা দেখান হইয়াছে। এখানে পুরুষ প্রকট, সীতারাম রায় কর্মী ও তেজস্বী পুরুষ। তাঁহার তিন স্ত্রী—শ্রী, নন্দা, রমা। শ্রী যেন ঐশ্বর্য্য, নন্দা যেন হ্লাদিনী, রমা যেন স্ত্রী বা মেদিনী।" ইহাদের মধ্যে শ্রীই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে সন্ন্যাসিনী হইয়াও সংসার আশ্রমের পক্ষপাতিনী। কিন্তু তথাপি শ্রী Abstruction বা allegory-র পর্য্যায়ে পড়ে না। বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ আদিরসের কবি। এই আদিরস বাঙ্গালী জাতির অন্তরে ফল্গুধারায় চিরপ্রবহমান। ইহার ফলে যুগে যুগে তাহার তন্ত্রধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম ইত্যাদি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাই লেখক বলিতেছেন, "ভবানন্দের কল্যাণীর রূপে মোহ, দেবীরাণীর ব্রজেশ্বরের প্রতি মোহ ও ঘর-গৃহস্থালীর প্রতি অনুরাগ, সীতারামের শ্রীর জন্য উন্মত্ততা, শ্রীর ভ্রাতার গঙ্গারামের রমার রূপে মোহ—এ সকল উদ্ভট হইলেও, ঐ এক কথাই বুঝাইতেছে—ঐ রিরংসার হলাহল বিস্তারের পথ ও প্রণালী দেখাইয়া দিতেছে। মনে হয়, বঙ্কিম স্বেচ্ছায় drama-কে নষ্ট করিয়া উৎকটের আশ্রয় লইয়া উপদেশের সার্থকতা সাধনে অধিক মনোযোগী হইয়াছিলেন।............Art-এর হিসাবে তিনখানা উপন্যাসে দোষ থাকিলেও উপদেশের হিসাবে উহা পূর্ণাঙ্গ এবং নির্দোষ। সে উপদেশ কথা সেই বুঝিবে, যে বঙ্কিমচন্দ্রের মণীষার শেষ পরিণতি বুঝিয়াছে, যে ধর্মতত্ত্বের সিদ্ধান্তসকল হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে।"

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এই সকল আলোচনা প্রবন্ধগুলি ব্যতীত সাহিত্য বিষয়ক আরও কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। যেমন ১৩১৯ সালে চৈত্র মাসে 'সাহিত্য' পত্রিকায় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'কবি হেমচন্দ্র' নামক যে পুস্তক সমালোচনাটি বাহির হইয়াছিল তাহাও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচ্চাঙ্গের বিচার শক্তির পরিচায়ক। হেমচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'হেমচন্দ্র ইংরাজী আমলের মধ্যযুগের অবতারস্বরূপ। সে যুগের দোষ-গুণ, পাপ-পুণ্য, আশা-আকাঙ্খা—সকলই তাঁহাতে পরিস্ফুট। সে যুগ না বুঝিলে যুগাবতারকে বুঝান যায় না।.........হেমচন্দ্র জাতি-বৈরের অপরাজেয় ও অদ্বিতীয় কবি—ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। যেখানে জাতি-বৈরের কথা, সেইখানেই হেমচন্দ্র গুরুর উপর টেক্কা দিয়াছেন, সেইখানেই তিনি মধুসূদনের উপর চলিয়া গিয়াছেন। জাতিবৈরের কাব্য হিসাবে 'বৃত্রসংহার' বাংলার অদ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ—ভাবে, রসে ও ঝাঁজে যেন ফাটিয়া পড়িতেছে; এমন হয় নাই বুঝি বা এমন হইবে না।"

সমালোচক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করা গেল। যে গভীর রসসৃষ্টি, অপক্ষপাত বিচারবুদ্ধি, অতিশয় সংযত ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তি না থাকিলে সাহিত্যালোচনা সমালোচনার পর্য্যায়ে উন্নীত হয় না, সেই সকল পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে বর্তমান থাকিলেও সময়ে সময়ে স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতার টানে তিনি ভাসিয়া গিয়া আপনার বিচারকের উচ্চ ন্যায়ের আসনে অধিষ্ঠানের কথা বিস্মৃত হইতেন এবং সেই দুর্বল মুহূর্তে যে সকল উক্তি করিতেন তাহাতে ভাবের উচ্ছলতা ও ভাষার তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও ব্যাঙ্গোক্তি প্রকটিত হইত। 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' প্রণেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের পরলোক গমনের পর তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধটি (সাহিত্য ১৩২৯) ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন "......বঙ্কিম যুগের রবীন্দ্রনাথ এবং হরপ্রসাদ এখনও বিদ্যমান। তাঁহাদের অন্তর্দ্ধান হইলে থাকিবে কি? থাকিবে বিলাসের এবং অভাবের লেলিহান জিহ্বা বিস্তারের সহিত শুষ্ক কণ্ঠের ব্যর্থ "টাকা টাকা" রব—থাকিবে ব্যসনাসক্তের বিদ্বেষ বিজৃম্ভন স্বরূপ প্রতিবিধিৎসার লালিম বহ্নিমুখের উৎকট বিকাশ! আর মূর্খতার ঘোর ত্রিযামায় ফেরুপালের হাহারব, অট্ট অট্ট খট খট খট হাস্য। চন্দ্রশেখর চলিয়া গেলেন—ভাষার নির্ম্মল প্রতিভাচন্দ্রও ডুবিল। সে বাঙালী ত নাই, উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া শোক গাঁথা লিখিবে কে?"

একটি উজ্বল তারা

অরুণবরণ চক্রবর্ত্তী

মনকে আচ্ছন্ন করে, কী আশ্চর্য, আজো আছে ছেয়ে
একটি উজ্বল তারা—দুরন্ত অশান্ত এক মেয়ে।
দিনের আলোয় তাকে দেখা যে যায় না।
সন্ধ্যার অনেক পরে—রাত্রির হায়না
যখন ঘুমিয়ে পড়ে ডেকে ডেকে ক্লান্তির বিবরে,
যখন আকাশ থেকে অন্ধকার বিন্দু বিন্দু ঝরে
কোন এক দৈত্যপুরে বন্দিনী কন্যার আঁখি হ'তে
বেদনার অশ্রু সম কাঙ্ক্ষিত বীরের আসা পথে,—
অকস্মাৎ তখনি যে তাকে দেখি পূর্ব-নভাঙ্গণে
আপনার স্থানটিতে বসে আছে হাসিখুসী মনে।

জীবনের পরিক্রমা কবে থেকে সুরু? শেষ কবে আর?
কে জানে খবর তার।
তমিস্রার গর্ভ হ'তে অমেয় আলোয়,
আবার কখনো ঘুরে অসীম কালোয়,
এ ভাবে কত যে যুগ হয়ে গেছে নিঃশেষে ফতুর,
হিসাব রাখবে তার কে সে আছে এমন চতুর?
শুধু ক্ষীণ মনে বাজে ক্ষণিকের হাসি কান্না গান—
যা নিয়ে পান্থশালায় পথিকের কেটে যায় প্রাণ।
তারি মাঝে কখনো বা চিরন্তন এক আলো-রেখা
হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে হ'য়ে যায় লেখা
উজ্বল সুন্দর!
জীবনের এ সঞ্চয় অজর অমর।

হে উজ্বল তারা, ওগো কন্যা!
আমার হৃদয়ে তুমি বিস্ময়ের বন্যা!
কবে কোন অন্ধকারে তুমি আলো জেলেছিলে ধীরে
নির্জন নিঃসঙ্গ মোর মনের কুটীরে;
ছন্দহীন স্পন্দহীন স্তব্ধ মোর হৃদয়-সেতার,
তোমার অঙ্গুলি-স্পর্শে তারি যত জঙ্-ধরা তার
তুলেছিলো কী অপূর্ব সুধাবর্ষী স্বর্গীয় ঝংকার;
সেই আলো আর সেই গান
আর তব প্রেমস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাধারার মত প্রাণ
নিঃশেষে দিয়েছ ঢেলে—আমাকে করেছ আমি-হারা!
কেমনে হৃদয় হলো, ভাবি আজ, ধূসর সাহারা।

তুমি আছো—তুমি আছো—তবু তুমি নাই।
তোমাকে যায়না ছোঁয়া—তবুও তোমার স্পর্শ পাই।
তুমিতো ঘুমের দেশে থাকো,
তুমি তো স্বপ্নের দেশে থাকো,
আমাকে সেখান থেকে কখনো কি ডাকো?
কেন না তোমার ডাক গান হয়ে আসে—তাই শুনি,
আর সেই সুরের সুতোয় স্বপনের জাল বুনি।

হে স্বপন, সোনার স্বপন!
জীবনের সাহারার মরূদ্যান তুমি চিরন্তন।
তোমার শান্তির ছায়া—যদিও ক্ষণিকা,—
ওই দূর আকাশের সবচেয়ে উজ্বল মণিকা,
আমার হৃদয় ছেয়ে রয়েছে যে নিশিদিন ধরি,
তোমার শ্যামল রূপে তাকে স্পর্শ করি;
তোমার আশ্লেষে পাই তার দেহস্বাদ,
ভুলে যাই জীবনের যত অবসাদ।

বেদনার বালুচরে গীতি-সৌধ এই যে নির্মাণ,
মিথ্যা বিলাসিতা সে কি? বৃথা কালক্ষয়?
তা নয়—তা নয়।
অমূল্য সে হৃদয়কে অমৃত যে করে দান।
এ ছাড়া জীবন
আগাছার বন।

আমি তাই মাঝে মাঝে গাই মহা অরণ্যের গান,
সে গান সে শুধু পারে আছে যার অফুরন্ত প্রাণ।
হে উজ্বল তারা—ওগো কন্যা,
তোমারি উৎস হতে সে প্রাণের বন্যা।

স্মরণ ঃ ২২শে শ্রাবণ

রণজিৎ কুমার সেন

'দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে;

একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু,
কষ্টের বিকৃত ভাল, ত্রাসের বিকট ভঙ্গী যত
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার॥
যতবার ভয়ের মুখোস তার ক'রেছি বিশ্বাস
ততবার হ'য়েছে অনর্থ পরাজয়।

এই হারজিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ কুহক
শিশুকাল হ'তে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা,
দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে॥'
(৩০শে জুলাই, ১৯৪১)

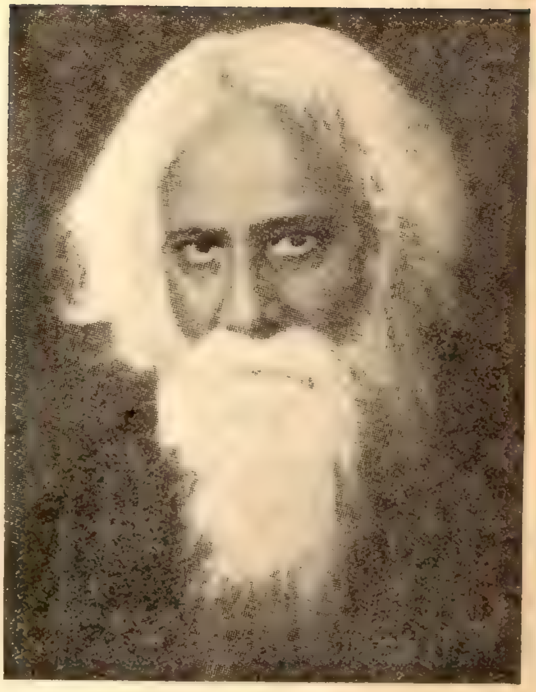

পৃথিবীর মানুষকে কবিগুরুর সর্বশেষ দান। তারপর তাঁর জড়দেহের উপর দিয়ে নেমে আসে ব্যথাদীর্ণ ২২শে শ্রাবণের ছায়া। 'মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে' ঃ নির্ভয়ের পরম সত্যাশ্রিত পথে মৃত্যুর ভিতর দিয়েই কবি জেনেছিলেন মৃত্যুহীন নবজীবনের উৎসকে। বিকীর্ণ অন্ধকারের মধ্যে মৃত্যুর নিপুণ শিল্পকে অবলোকন ক'রেছিলেন তিনি একান্ত সহজভাবেই। অন্ধকারে মৃত্যুর ছলনাময়ী রহস্যের জালে কখনও কবি ধরা দেননি। দুদিনের দেহ-ভেলাকে নিয়ে জীবন-সমুদ্রে ঝাপ দিয়ে মৃত্যুর ঘাটে একদিন সাঁত্‌রে উঠ্‌তে হবে, উঠ্‌তে হবে অমৃতরূপের মধ্যে—এই চির সত্যকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ব'লেই একদিন ব'লতে পেরেছিলেন ঃ

'এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো।
এই দুদিনের নদী হবো পার গো।
তারপরে যেই ফুরিয়ে যাবে বেলা,
ভাসিয়ে দেবো ভেলা।
তারপরে তার খবর কিছু ধারিনে তার ধার গো,

তারপরে সে কেমন আলো, কেমন অন্ধকার গো।'

মৃত্যু-স্বপ্নের আলো-ছায়ার দ্বন্দ্বে কখনও কবি আচ্ছন্ন হননি। মৃত্যুর পরপারে জীবন তার পুষ্প-শয্যা রচনা ক'রে অপেক্ষা ক'রছে—সেই তীরে পৌঁছাতে হ'লে অজানা-রহস্যে নিজেকে ধরা দিলে চলবে না। সেই অজানা রহস্যের মধ্যে 'মিষ্টিসিজম্' বা 'মরমীবাদের' অজস্রতা রয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কবি তাতেই চিত্ত ভ'রে নিতে পারেন নি। মিষ্টিক কবিদের নির্দেশিত দর্শন সম্পর্কে রসজ্ঞ সমালোচক আর্থার সাইমন একদিন বলেছিলেন—'How unsearchable is the darkness out of which we have but just stepped, and the darkness into which we are about to pass.....How the thought and sense of the two-fold darkness involve the little space of light in which, for a moment we live.'

কিন্তু মৃত্যুময় এই অন্ধকারকে অতিক্রম ক'রে রবীন্দ্রনাথ অমৃতের অমিয় মাধুর্যকে জীবন দিয়ে আস্বাদন করতে পেরেছিলেন। অন্ধকারের বর্ণে যেমন শ্যামের রূপ আচ্ছন্ন, তেম্‌নি মৃত্যুকেও তিনি এই শ্যাম-রূপেই কল্পনা করেছিলেন।—

'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।
মেঘ বরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট,
রক্তকমল কর, রক্ত অধরপুট,

তাপ বিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু অমৃত করে দান।
তুঁহু মম শ্যাম সমান।'

নিজেকে প্রেয়সী কল্পনা ক'রে এই শ্যামকেই জীবন-দয়িত রূপে ধ্যান করেছেন কবি, ব'লেছেন—

...'মিলন হবে তোমার সাথে,
একটি শুভ দৃষ্টিপাতে,
জীবনবধূ হবে তোমার
নিত্য অনুগতা;
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

বরণমালা গাঁথা আছে
আমার চিত্তমাঝে,
কবে নীরব হাস্যমুখে
আস্‌বে বরের সাজে।

সেদিন আমার রবে না ঘর,
কেই বা আপন, কেই বা অপর,
বিজন রাতে পতির সাথে
মিল্‌বে পতিরতা।

মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।।'

তারপর যেদিন মৃত্যু এসে সাম্‌নে দাঁড়াবে, সেদিন—

...'ভরা আমার পরাণখানি
সম্মুখে তা'র দিব আনি
শূণ্য বিদায় ক'রবো না তো উহারে—
মরণ যেদিন আস্‌বে আমার দুয়ারে।'...

এমনি করেই রবীন্দ্রনাথ মৃত্যু থেকে অমৃত-জীবনের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিদিনের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তিনি মনে ক'রতেন—'মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাম্, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অণিরাকরণমস্তু,' অথাৎ—'আমাকে ব্রহ্ম ত্যাগ করেন নি, আমি যেন তাঁকে ত্যাগ না করি, যেন তাঁকে পরিত্যাগ না হয়।—'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃত-মন্নুতে।' অর্থাৎ—'কর্ম্মের দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হ'য়ে বিদ্যা দ্বারা জীব অমৃত লাভ করে।' রবীন্দ্রনাথও তেম্‌নি তাঁর জড়-দেহের মৃত্যু থেকে উত্তীর্ণ হ'য়ে চির অমরত্ব লাভ করেছেন।

দেহ তো জড় পৃথিবীর একটা খোলস মাত্র। এ দেহের বিলয় আছে, পচনশীলতা আছে; কিন্তু আত্মা অমর, অমৃতের সঙ্গে তার চিরকালের যোগ। জীবন কখনও এই জড়-জগতের মধ্যেই আবন্ধ নয়, সে নানা পথে লোক থেকে লোকান্তরে এক দেহ থেকে আর এক দেহ ধারণ ক'রে চলে। একেই কবি এলা হুইলার উইলকক্স্ তাঁর নিজের ভাষায় ব'লেছেন—

From body to body your spirit spreads on;
It seeks a new form when the old one is gone;
And the form that it finds is the fabric you wrought
On the loom of the mind, with the fabric of thought.'

এ ঠিক গীতারই উৎসারিত উক্তি। গীতা বলেছেন—

'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়,
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।'

অর্থাৎ—মানুষ জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ ক'রে যেমন নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, তেম্‌নি আত্মা জীর্ণ দেহ ত্যাগ ক'রে নতুন দেহ ধারণ করে। একেই কবি এলা হুইলার উইলকক্স বলেছেন—

'You were, and you will be;
Know this while you are;
Your spirit has travelled both long and after.
It came from the Source to the Source it returns;
The Spark that was lighted, eternally burns.'

'You were, and you will be' ঃ 'তুমি ছিলে এবং তুমি থাক্‌বে'—এ যেমন সত্য, তেম্‌নি সত্য আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব। তিনি ছিলেন এবং তিনি আছেন। তাঁর জড়-দেহের অবসান ঘটেছে সন্দেহ নেই, সেই দেহ-বিমুক্ত হ'য়ে তিনি আরও নিবিড় ক'রে—আরও নিকটের হ'য়ে তিনি আমাদের মধ্যে র'য়েছেন। ভূর্লোক থেকে তাঁর আত্মা দেবলোকে মুক্তি পেয়ে তিনি আমাদের আত্মার মধ্যে এসেই বাসা নিয়েছেন। ২২শে শ্রাবণ তাঁর জড়-দেহের উপর দিয়ে পূরবীর ব্যঞ্জনা এ'কে গেলেও তাঁর অমৃতময় সত্তার ভৈরবী-রাগ প্রতি-মুহূর্তে এসে আমাদের কানে বাজ্‌ছে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি অমর হ'য়েছেন, ব্রহ্মময় হ'য়ে উঠেছেন। ব্রহ্মের

সঙ্গে প্রেমই হ'চ্ছে মুক্তি—সমস্ত আসক্তির মৃত্যু। এই মৃত্যুরই সৎকার মন্ত্র হ'চ্ছে—

'মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ।'—

বায়ু মধু বহন ক'রছে, নদী সিন্ধু সকল মধু ক্ষরণ ক'রছে। ওষধি-বনস্পতি সকল মধুময় হোক্, রাত্রি মধু হোক্, উষা মধু হোক্, পৃথিবীর ধূলি মধুমৎ হোক্, সূর্য্য মধুমান হোক্।......যখন আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হ'য়ে গেছে—তখন জল স্থল আকাশ, জড় জন্তু মনুষ্য, সমস্তই অমৃতে পরিপূর্ণ—তখন আনন্দের অবধি নেই।' আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি ঃ তখন সবই আনন্দের সঙ্গে মিলে অমৃতময় হ'য়ে ওঠে। কবির আত্মাও তাই উঠেছে। তিনি আনন্দের সঙ্গে মিলে যে অমৃত গ্রহণ ক'রেছেন—আমাদের মস্তকে তা বর্ষণ ক'রছেন অহর্নিশি। আমরাও কবির আত্মার সঙ্গে একাত্মা হ'য়ে সেই আনন্দকে উপভোগ করি।

আমাদের শাস্ত্রে পারলৌকিক আত্মার উদ্দেশ্যে তর্পণের রীতি আছে। ২২শে শ্রাবণ সমগ্র বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর কাছে সেই তর্পণের দিন। এ দিনে আমরা শোক ক'রবো না, পরাজয় ও দুঃখের গ্লানি নিয়ে জীবনকে ব্যথাদীর্ণ ক'রে তুলবো না। এ দিনে আমরা শান্ত চিত্তে কবিকে স্মরণ করবো, কবির শক্তি নিয়ে নিজেদের সামর্থ্য বাড়াবো, নিজেদের উজ্জ্বল ক'রে তুলবো। ২২শে শ্রাবণের সেই তর্পণের মধ্য দিয়ে কবির স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রণাম ক'রে তাই শুধু বলি—

দেহের মৃত্যুরে ঢাকি স্নিগ্ধ তব আত্মা যেথা রহিয়াছে জাগি',
দেবতার আশীর্বাদ বর্ষে সেথা অনিবার নিত্য তব লাগি'
তোমারি প্রমুক্ত শিরে। দেহ সে তো তুচ্ছ অতি; দেহাতীত তুমি।
যে অমৃত সঞ্চারিলে সংসারের বিষতিক্ত কালসিন্ধু চুমি'
পঙ্কে ঢাকা ধূলিম্লান ধরণীর মাঝে, সে চির অমৃতস্নাত
তোমার জীবন। সত্তা তব নিত্যকাল সেথা র'য়েছে জাগ্রত
প্রদীপ্ত ভাস্করসম জরামৃত্যুহীন। হে বিশ্ব-বরেণ্য কবি।
ধরিত্রীর মর্ম্মাকাশে অনন্তকালের তুমি, তুমি দীপ্ত রবি।

বাইশে শ্রাবণ

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বাইশে শ্রাবণ
ক'রি তব স্মৃতি আরাধন।
সংসারের সহস্র বাঁধন
ছিন্ন করি চলে গেলে দুর্গমের দুরূহ সাধনে
কাল-আবর্তনে।
ধরণীর চেলাঞ্চলে বুকভাঙা কত ফুল কাঁদে!
মৃতপ্রায় স্বার্থ গৃধু দেশে
স্বজাতির ঐতিহ্যেরে দিয়ে গেলে কাহাদের হাতে!
সারস্বত পীঠস্থান অশ্রুজলে যায় বুঝি ভেসে!
পথকুক্কুরের সম মোরা হেথা দীন দুঃস্থ রহি
তরুকিশলয় দলে তব বাণী বহি,
এ তো নহে চরম সান্ত্বনা!
এ দুর্দিনে ফিরে এস, স্বদেশের পরম প্রার্থনা।

বাইশে শ্রাবণ
বিদায়ের শেষ সম্ভাষণ
রেখে গেছ স্মরণের শাশ্বত স্বাক্ষরে
শূণ্য করি তব সিংহাসন।
কোন্ গ্রহলোকে আয়ু-সূর্য তব হোলো অধিষ্ঠান
উদয়ের বাণী লয়ে কোন্ নীলাম্বরে
জাগে তব গান।
হেথায় নেমেছে রাত্রি ঝিল্লী রবে ক্লান্ত প্রাণ লয়ে,
রজনীগন্ধার বনে ঝটিকার সাঙ্কেতিক ছায়া।
জনারণ্যে বর্ষা এলো ঃ আশাহীন ভাষাহীন হয়ে
মৌন মূক জন্মভূমি। দিকে দিকে হেরি প্রেতকায়া,
ডাকে নিশাচর;
তুমি নাই। তবু আছ,—সত্য কিনা কহ কবিবর!

নতুন আকাশ

প্রফুল্ল রায়

ছিটে-বেড়ার ফাঁক-ফুকরের মধ্য দিয়ে দুটো চোখ যখন তখন ঘুরপাক খায়। স্যাঁকা লাগে যেন সালিনার কাঁচা আনাজের মত তরতাজা চেকনাইএ। উনুন থেকে জ্বলন্ত একটা চলা নিয়ে উঁচিয়ে ধরে সালিনা। বলে—"যা যা বান্দা, মনিবের তামুক ভইরা দে গিয়া।"

পাকের ঘরের ওপাশে থনথনে মানকচুর জঙ্গল। চট করে চোখজোড়া সরে যায় ওখান থেকে। সালিনা তখনও গন গন করতে থাকে— "আবার আইসো, ড্যাবড্যাবা চোখে দিমু চলা গুইজ্যা।"

উনুনে মেটে পাতিলে ভাত ফুটছে আর সঙ্গে সঙ্গে টগবগ করে চলেছে সালিনার মনটা। "দিনরাইত পয়জার খায়, তার নজরখান একবারে গাছের আগায়; যা যা পেত্নীর পিছনে ঘুরপাক খা গিয়া।"

নিজের শরীরটা একবার আদুল করে দেখে নেয় সালিনা। একটা তরল খুশীর ফিনকি ফোটে চোখ আর ঠোঁটের আনাচে কানাচে। মুখের মানচিত্রে একটা ঘন কালো তিলের দ্বীপ। তারই তেপান্তরে দিশা হারিয়ে ফেলে কাঁচা বয়সের ছোকরাছেলেরা।

ভাতের হাঁড়ির সরার ফাঁক দিয়ে হাল্কা লঘুস্বাদ একটা গন্ধ উঠছে ভুর ভুর করে; আর তার সঙ্গে সঙ্গে সালিনার আলগোছ মনটা ফুর ফুর করে উড়াল দেয়। ভারী সচেতন সে তার সুডৌল যৌবনকে নিয়ে।

ভাতের পাতিলটা নামিয়ে পাকের ঘর থেকে বেরিয়ে এল সালিনা। মানকচু জঙ্গলের ওপাশ থেকে মোথরা ঝোপের এলাকা সুরু, তারপরেই একটা সোঁতা খালের ছলছলান অস্তিত্ব।

মোথরার দীঘল দীঘল ডাঁটাগুলোর ফাঁক দিয়ে বেশ দেখা যায়। একটা কোষ নাও বাঁধা পারের কাউগাছটার সঙ্গে। পাটাতনের ওপর এখনও ঠায় বসে রয়েছে।

সালিনার চোখের তারায় একঝলক তাজা আগুন ঝিলিক মেরে গেল। কাপড়টা কোমরে আঁট-সাঁট করে গুছিয়ে এগিয়ে এল কেষে নাওটার দিকে। বলে—"কি রে বান্দা, তোর মনিবে তো পয়জার শানাইয়া রাখছে; যা যা, শিগগির গিয়া পিঠ পাইতা দে গিয়া।"

পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা নাচাতে নাচাতে রোস্তম আকাশ-পাতাল একাকার করে ফেলছিল মনের চক্ররেখায়। বলে—"কি কলি সালিনা? মনিব আমারে পয়জার মারে?"

মচকানো হাসির তুফান তিরতিরিয়ে গেল সালিনার ঠোঁটের আগায়। বলে—"না পিরীত করে; পিরাণটা তুইলা দেখা দেখি। এইখানে কি? কলু বাড়ীত্ থনে তেল লইয়া যা সোয়া সের পিঠে তো ডলতে হইবে. যা যা।"

"যামু না, কিছুতে না।"

"ক্যান?"

"তোরে বড় মনে লাগছে সালিনা—" ড্যাবা ড্যাবা দুটো চোখ উঁচিয়ে ধরে রোস্তম।

"আলো আমার নাগর লো, যা যা বান্দা, ঐ যে হাইলা চাষা আছে হাসমা, তার কানা বইনটার লগে মুব্বৎ করগা, নজর খান মাটিতে লামা ছিকার থনে।"

"তুই বড় ছ্যাকা দিয়া কথা কইস সালিনা, ভারী ব্যথা লাগে।"

"পয়জারের ঘা'র থনেও বেশী লাগে। যা যা তোর গায়ে যা গন্ধ!"

"চত্তির মাসে গিরিগঞ্জের মেলা থনে গন্ধ সাবান আনুম, গা থনে ফুরফুরাইয়া বাস বাইর হবে।"

ডিঙ্গির রশি খুলে বৈঠা চলাতে থাকে রোস্তম। ছলছলিয়ে এগিয়ে চলেছে কোষ নাও খানা। খালের দূরে বাঁও থেকে ভেসে এল রোস্তমের অনসুরা গলার একটা বেতরিবৎ কলি—

হিজলফুলের মালা গাইথা ও সুন্দরী
দিব তোমার গলেতে—
হে সোনার বরণ রাজকইন্যা—
ময়ূরপঙ্খী নাও ভিড়িল ঘাটে গো
ও পরাণবন্ধুরে—

হোক অপটু তবু তো পুরুষের গলা, বলিষ্ঠ বুকের কেন্দ্রকোণ থেকে ভেসে আসছে। কি জানি কি ছিল রোস্তমের গানে, চনমন করে উঠল সালিনার মনটা; কাউ-গাছের পিঠে হেলান দিয়ে কানদুটো সজাগ করে রাখে। অনেকদূর থেকে তখনও বাউল বাতাসের ভেলায় ভেসে আসছে—

হে সোনার বরণ রাজকইন্যা—

বয়সটা কবরে যাওয়ার কাছাকাছি এসে পড়েছে ইত্তিমালীর। বড় গৃহস্থ। উত্তর-দক্ষিণ, পূব-পশ্চিমের ভিটিতে সাতাশের বন্দের পাটাতন-খিলান-ঘর তুলেছে হালে। নয়া টিনের পাতে রোদ ঝলকায়। ঢালা উঠানে নানান ধান শুকোয় নিত্যি। ডজনখানেক আট-পৌরে বিবি রয়েছে। ছুরাৎ হয়ত এককালে ছিল সকলেরই; ধান-শর্ষে-কাউনের, কামলা-কৃষাণের আর মিঞাজানের খেজমৎ করতে করতে অনেকদিন আগের কোন একটা দিগন্তে সে সব ঝেড়ে ঝুরে ফেলে আসতে হয়েছে। আপাততঃ প্রয়োজন একটি পোষাকী বিবির। আল্‌গোছে পাট করে মনের সিন্দুকে ফেলে রাখবার মত। সারাটা দিনমান জমিজিরাত এদিক সেদিক নিরীখ করতেই কাবার। সন্ধ্যার সময় এক শিশি আতর, কলপের ভার্নিশ দেওয়া দাড়ির ওপর ঢেলে দিলে গোলাপী একটা আমেজ ঘনিয়ে আসে চোখের উপকূলে। আর তখনই—তখনই যদি কেউ —আলগোছ বয়সের—সুর্মাটানা চোখের কোন তরলনয়না—না-না আর ভাবতেই পারে না ইত্তিমালী।

ফরশীতে আলগা টান দিতে দিতে হাঁক দেয়—"রসুল, ও রসুল।"

"কি বাপজান?"—একজন বছর তিরিশেকের আধা-বয়সী লোক এসে দাঁড়াল মুখোমুখি।

"কোমরের বাতটা আবার চাড়া দিছে।"

"হেকিম না কবিরাজ ডাকুম?"—রসুল ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওঠে।

"না না ওয়াতে কুলাইবে না।"

"তবে, গঞ্জের থন এ্যালুপাথিক ডাক্তার—"

"না না ও তো ইংজিশন দিয়া দিয়া মাইরাই হুইবে।"

"তবে।"

রসুল তীক্ষ্ণমুখ দাড়িতে হাত বুলাতে থাকে।

"একটা মাইয়া দেখ, আমারে খেজমৎ করব, এই শ্যাষ বয়সে' একটু ইতি-উতি করে ইত্তিমালী।

'কার লাইগা? সেকেন্দারের না হোসেনের? দুই-জনেরই নিকার বয়স ডাক দিয়া উঠছে।"

"আহা, এই জলের মত কথাখান বুঝতে পার না—আমার লেইগা, এই শ্যাষ বয়সে।"

"আপনার লেইগ্যা!"

একটা চমক-মাখানো বিস্ময় যেন শিউরে উঠল রসুলের গলায়।

বিকেলের দিকে রসুল খোঁজখবর নিয়ে এ'ল। এন্তেজেদ্দির বেটী সালিনা—খাপছুরাৎ মেয়ে। চোখে দেখেই ভিরমি খেতে হয়। একমুখ ঝোল টেনে নিয়ে বলে—"একেবারে হুরীর লাখান, কিন্তু দরটা বড় চড়া, সাত কুড়ি টাকা চায় এন্তেজদ্দি।"

"ঠিক আছে তুমি যাও, রোস্তমেরে পাঠাইয়া দাও এট্টু।"

খানিকটা পরেই রোস্তম এসে দাঁড়াল।

ইত্তিমালী বলে—"বড় ছইআলা নাওটা বাইর কর, আমি যামু এট্টু এন্তেজেদ্দির বাড়ী।"

"ক্যান মনিব?"

"গেলেই দেখতে পাবি।"

রোস্তমের চোখেমুখে বিচিত্র একটা অবাকতা। অন্য দিন হলে নির্ঘাৎ পয়জার পড়ত মেরুদণ্ডের ওপর। আজ কেন যেন ব্যাবুনের মত লাল দাড়ির আনাচে-কানাচে খুশীর ফুলকি ফুটেছে ইত্তিমালীর। আবারও তাড়া দেয়—"যা যা—সাঝ ঘনাইয়া আইল যে!"

একটা ডুরে লুঙ্গি পঁচিশ বছরের মত গোছগাছ করে নিয়েছে; নতুন একটা পিরানের ওপর তেইশ বছরের জোয়ান রুচির চাকচিক্য। বাঁকা মেরুদণ্ডটা সরল করবার অস্বাভাবিক প্রচেষ্টায় তেরছা হয়ে রয়েছে।

এন্তেজদ্দি ছোট চাষা। বিয়ের বাজারে মেয়ের দর সম্বন্ধে সে অতিমাত্রায় ওয়াকিবহাল। একটু মোচড় মোড়ন দিলেই রস ঝরবে। বলে—" মিঞাসাব নয় কুড়ি না হইলে—মাইয়ারে ডাঙ্গর করছি—হে'—হে'হে'—

ধান বেচে গরম টাকা নরম খেয়ালের বাতাসে না হয় ক'খানা উড়িয়েই দিল। কোমরের সেই বাতটা চাড়া দিয়ে উঠেছে তো! ন'কুড়ি কি শ'কুড়ি হলেও সে পেছপা হত না। দশ কুড়িই সে গুজে দিল এন্তেজদ্দির মুঠোমে। ইতিমধ্যে রোস্তম পাকের ঘরের সেই বেড়ার ফুকরে চোখ রেখেছে। বলে—"সালিনা, শ্যাষে ঐ বুইড়ার লগে, থালে জল আছে অখনও আর কুমার বাড়ীর পুইনে মাইটা কলস।"

"যা-যা তোর লগে তা বইলা নিকা বসুম নাকি? পোস্ত গাছেই দিমু গলায় দড়ি, কচু গাছের লগে কেনরে? যা-যা, বান্দা; এইবার গিয়া আমার পয়জার তোর জিভ্যা দিয়া চাটামু।"

চোখদুটো ছলছল করে ওঠে রোস্তমের তারপর আস্তে আস্তে সরে যায়।

সাদি হয়ে গেছে, বাপজানের বাড়ীর ঘাটলা থেকে নায়ে উঠবার সময় রোস্তমকে শুনিয়ে শুনিয়ে সালিনা মলখাড়ুর বাজনাটা বাজিয়েছিল একটু জোরালো করেই। সেই মলখাড়ু ঝমঝম করে পূব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের ঘর-গুলোয়, যখন-তখন ঘুরপাক খায় সালিনা। ইত্তিমালী

সুগন্ধি তামাক টানতে টানতে নেশাজড়ানো চোখে চেয়ে থাকে—রঙমহলের শীষমহলের আমেজ ঘনিয়ে আসে মনের দিগন্তে; পঞ্চাশ বছর আগের কোন প্রান্তরে হারিয়ে-যাওয়া যৌবনটা ঝিমানো রক্তে মাঝে মাঝে চরের মত মথা চাড়া দেয়। আরো দুটো চোখ সালিনার মলখাড়ুর বাজনার সঙ্গে ঝকমক করতে থাকে।

ইত্তিমালী হাঁক দেয়—"রোস্তম, তামুকটা সাইজা দে আবার।"

চোখ দুটো পিরানের কোণ দিয়ে ডলে এগিয়ে আসে রোস্তম—"যাই।"

নয়া নয়া কয়েকদিন কাছাকাছি এসে বসত সালিনা, এখন যেন ফারাকে ফারাকে থাকে। দুদিন ইত্তিমালীর নজরে পড়েছে। পোয়াল গাছের ওপাশে আবছা সন্ধ্যায় সালিনা রসুলের সঙ্গে পুটুর পুটুর করছিল। আর সেই থেকেই একটা অন্ধকার সন্দেহে ইত্তিমালীর মনটা লেপে রয়েছে। ঘরে বসে চোখদুটো আধাবোজা রেখে তারই একটা হিসাব কষছিল এতক্ষণ—সত্তর বছরের মন্থরতা দিয়ে সম্ভব কি সতের বছরের ঢলকে বাঁধ দিয়ে রাখা। মলখাড়ুর আওয়াজে চোখ খুলে ফেলে ইত্তিমালী। বলে—"আস ফুলবিবি, আস। আমার লগে দুই চাইরটা রসের প্যাচাল পার। কয়দিন থইর‍্যা দেখাই মিলে না তোমার।"

চৌকাঠের ওপর থেকেই সালিনা জবাব দেয়—"আমার বলে কত কাম।"

"তোমারে কাম করতে কইছে কে? কামের লেইগ্যা তো তিন হালি নিখা করছি।"

ঝলসে উঠতে চায় ইত্তিমালী।

সালিনা বলে—"কেউ কয় নাই; আমিই করি।"

"কাম যদি করতে হয় পান সাইজো কইলকাতার মশল্লা দিয়া, আমি পান বড় ভালবাসি।"

"পানের গন্ধে আমার ভিরমি লাগে।"

"তবে চুল বাইন্ধো, মুখ মাইজো গন্ধ-সাবান দিয়া। আগুন-রোদের ধারে যাইও না আর কেমুন?"

"আইচ্ছা, আমি অখন যাই।"

গানের কলির মত দেহটায় গমকের ঘূর্ণি তুলে সালিনা উঠানে গিয়ে নামল। বেসামাল যৌবন; পদ্মা-মেঘনার ঢল দেখেছে ইত্তিমালী বর্ষার মরশুমে—অনেকটা সেইরকম, তার চেয়েও জোরালো, মনের কুলভাঙ্গা জোয়ার, বার্ধক্যের বালিমাটি কতক্ষণ টিকবে ধারালো স্রোতের মুখোমুখি। একটা মর্মচেরা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এ'ল অজান্তে।

অনেকদিন পরে সত্যি কোমরের বাতটা বেহিসাবমত বেড়ে উঠছে। ভাবনা কি কম ইত্তিমালীর। সালিনার দেহের সিল্কের চেকনাই যদি হেজে যায় রোদ-জল, ধুলো-মাটির ছোঁয়াচে—তার জন্য কম সতর্কতা ইত্তিমালীর? শেষ বয়সের কাঁচা বিবি। অথচ তবু কেন যেন ধরা-ছোঁয়া যায় না। বিছানাতেও মন নেই সালিনার। শক্ত হয়ে পালট খেয়ে থাকে—দাড়ি মোচড়াতে থাকে ইত্তিমালী। তোবা তোবা। ইয়া আল্লা।

নিশি রাত্তিরে দূরের কাশমোথরার জঙ্গল থেকে শিয়াল ডেকে ওঠে। আর ঠিক সেইসময় ইত্তিমালীর শোয়ার ঘরের বেড়ায় কান পাতে রোস্তম। কয়েকদিন ধরে এমনি চলছে।

"ও গোলাপ বিবি, এইখারে এট্টু মুখখান ফিরাও।"

ইত্তিমালীর গলায় তরল ছেলেমানুষির কসরৎ।

"না-না, সরম লাগে না। বিয়া কইরা আনছ, সুখ দিতে পার না একটা রাইতও, পুরুষ না মাগী!"

ঝাঁঝিয়ে ওঠে সালিনা।

"কি করুম বুড়া হইছি।"—ইত্তিমালী এবার ভেঙে পড়ে।

"বুড়া বয়সে কবরের নিকাশ করলেই তো পারতা, নিকার লেইগ্যা দেখি বেদিশা হইয়া গেছিলা।"

"এমুন দাগা দিয়া কথা কইও না ফুলজান।"

ডুকরে ওঠে ইত্তিমালী। একটা তরল কান্না যেন ছলছল করে উঠল সত্তর বছরের অপারগ বার্ধক্যের প্রতিটি অনুপলে।

ও তরফ থেকে একটা গনগনে গলার আভাস—"তা হইলে আমারে তালাক দিয়া দাও, আমার যৌবনেরে আমি মাইরা ফালাইতে পারুম না।"

ধক্ করে উঠল বুকটা, চমকে উঠল বেড়ার ওপাশের একটা কান। সমস্ত রক্ত বুঝি ঘনীভূত হয়ে উঠেছে রোস্তমের শিরা-উপশিরায়। বলে কি সালিনা!

পুবালি চক্ররেখায় আলোর আভাস। রোস্তম ধীরে ধীরে ধানের ডোলটার কাছাকাছি এসে বসে।

খানিকটা পরেই দরজা খুলে সালিনা বেরিয়ে এ'ল।

এদিক সেদিক নিরীখ করে রোস্তম বলে—"এই সালিনা শুইনা যা এইদিকে।"

চমকে উঠেছিল সে প্রথমটা; এখন শিশুভোরে নিশিতে ডাকে না তো। রোস্তম আবারও হাঁক দেয়—"এই যে এই দিকে।"

সালিনা এগিয়ে এসে বলে—"কি কস।"

"আমি তোরে একটা জিনিষ দিতে পারি।"

"কি জিনিষ?" প্রশ্নের সঙ্গীন যেন উঁচিয়ে রয়েছে সালিনার মুখে চোখে।

"তুই যা চাস—তাই।"

"কি চাই আমি?"

"যুবতী মাইয়া যুয়ান পুরুষের কাছে কি চায়?—তাই দিমু।"

"মুখ সামাল দে, মিয়াসাহেবের কাছে কইয়া দিমু।"

"যা, কগিয়া আমি ডরাই নাকি তোর সোয়ামীরে।"

কি জানি কি ছিল রোস্তমের কথায়, সালিনা বুকের কাছে সন্নিহিত হয়ে এল? মিশে যেতে চাইল বলিষ্ঠ ছাতির আশ্বাসে।

আচমকা মোরগটা ডেকে উঠল—ক'-কর-ক।

একপাশে সরে দাঁড়াল সালিনা। বলে—"সবই তো বুঝছস, ল যাই আমরা যাই গা কোনখানে।"

"বেশ আইজ রাইতেই।"

দিকরাত্তিরে ঘুমের ঘোরে পাশবালিশটাকে জোরালো হাতে চেপে ধরে ইত্তিমালী; বিড় বিড় করে বলতে থাকে—"বিবিজান, তোমারে আমি কত ভালোবাসি।"

ঠিক সেই সময় পদ্মার ঢেউ চিরে চিরে একটা এক-মাল্লাই নাও এগিয়ে চলেছে। সালিনা বলে—"তোর সেই গানটা গা দেখি রোস্তম, বড় মিঠা লাগে—"

হালের বৈঠা এক হাতে চেপে রোস্তম পদ্মার ঢেউ-সঙ্গতের সঙ্গে গান ধরে—

হিজল ফুলের মালা গাইথা হে সুন্দরী
দিব তোমার গলেতে—
হে সোনার বরণ রাজকইন্যা
ময়ূরপঙ্খী নাও ভিড়িল ঘাটে গো—

অনেকদূরের জলদিগন্ত থেকে রোস্তমের আকুল নেশার গানটা কি ইত্তিমালীর ঘুমজড়ানো কানে পৌঁছবে এখন?

পার হওয়া চাই

শ্রীলক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস

নীরব মধ্যাহ্ন বেলা, মাঘের আকাশ
স্তব্ধতরো আরো
এই বেলা, এই বেলা, ওগো কর্ণধার।
তরীখানি ছাড়ো।
দেখ বুঝে শীত ঋতু, অতি ক্ষুদ্র বেলা
সময় ত' নাই।
সময় থাকিতে তাই ছেড়ে দাও ভেলা
পারে যাওয়া চাই।
কিছু ত' যায় না বলা, শর্তের বেলায়
কি জানি কখন
আঁধার আসিবে ঘিরে জীবন-খেলায়
ডুবিবে তপন।
কাজকর্ম্ম সব কিছু—মিছে অনর্থক
থাক্ পড়ে থাক্
সীমারে ছাড়িয়া 'নাও' অসীমের পানে
যাক্ ছুটে যাক্;
বেলা আর নাই
যেমন করিয়া হ'ক, পার হওয়া চাই।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

মহিমের বৈঠকখানা। কুমারশঙ্কর কাউকে দেখতে না পেয়ে ভিতরে চলে যাচ্ছিল, পিছন থেকে রাণু তাকে ডাকলে—

রাণু—শুনুন! আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে। বাড়ীতে যে কাণ্ড চলছে তাতে আপনি বোধ হয় আমার কথাগুলো বিবেচনা করবেন। আমি মূর্খ. পাত্রী হিসেবে আপনার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তবে আমাকে বিয়ে করে আপনি হয়ত আমার বাবার বিষয় পাবেন, কিন্তু অর্থের কামনা কি আপনার মত বিত্তশালী দার্শনিকের মানায়?

কুমার—আমি অর্থের কামনা করছি, একথা তোমায় কে বললে? তোমার আকর্ষণ ইন্দ্রের ঐশ্বর্যের চেয়ে বড়। তোমার কোমল চোখের দৃষ্টি আমার হৃদয় বিদ্ধ করেছে। তোমার এই অপরূপ রূপলাবণ্য—সে-ই ত মহত্তম সম্পদ, তাতেই আমি আকৃষ্ট।

রাণু—আপনার প্রীতি আমার পরম সম্পদ। কিন্তু তার প্রতিদান দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার প্রেমে আমি অনুগৃহীত, কিন্তু একটি হৃদয় দুভাগ করা যায় না। আমার হৃদয় আমি রজতকে দিয়ে ফেলেছি। হয়ত যোগ্যতায় তিনি আপনার পাশে দাঁড়াবারও যোগ্য নন। তাঁকে ভালবাসা হয় ত আমার মূর্খতারই প্রমাণ, কিন্তু যা করে ফেলেছি, আজ আর ত তার কোন উপায় নেই। নিজের উপর নিজেই রাগ করতে পারি।

কুমার—কিন্তু একবার যদি তোমাকে বিবাহ করতে পারি, তাহলে যে হৃদয় তুমি রজতকে দিয়েছ তা আমার হবে—এ বিশ্বাস আমার আছে। তোমার হৃদয়ে স্থান পাওয়ার জন্য আমি সবকিছু করতে রাজী আছি।

রাণু—ভুল করছেন আপনি। যে হৃদয় একবার আমি দিয়ে ফেলেছি, তাকে কোন মতেই আর স্পর্শ করা যায় না। যোগ্যতাবিচার করে আমি ভালবাসিনি। কেন বেসেছি তার কারণও আমি দেখাতে পারব না। বিচার করে যদি ভালবাসতুম তাহলে নিশ্চই আপনার জয় হত। কিন্তু মন চিরদিন অবুঝ, প্রেম চিরদিন অন্ধ। আমার এ অন্ধত্ব স্বীকার করে নিন। আমার উপর যে জুলুমের চেষ্টা চলেছে তাতে আপনি অংশ নেবেন না, জোর করে আমাকে অধিকার করলে তাতে কি আপনার মর্যাদা বাড়বে? আপনার মত গুণী ব্যক্তির হৃদয়ের কাঙাল আপনি অনেক পাবেন।

কুমার—তোমার মন পাবার পথ আমায় বলে দাও। যা খুশি হুকুম কর আমার উপর। তুমি বলতে পার, তুমি আমায় ভালবাসো না,. কিন্তু তোমার মাধুর্য লাবণ্য ছড়িয়ে দিয়ে তুমি যদি ঘুরে বেড়াও, তাহলে তোমাকে ভাল না বেসে থাকা কি সম্ভব?

রাণু—একথা আপনাকে মানায় না। কত রূপসীর প্রতি কাব্যে আপনার প্রেম বর্ষিত হয়েছে, তাদের রূপ-গুণের বর্ণনায় আপনার কবিতা উচ্ছ্বসিত।

কুমার—সে আমার প্রাণের কথা নয়। কবি কুমারশঙ্করের কাব্যবিলাস মাত্র। মানুষ কুমারশঙ্কর সমগ্র অন্তর দিয়ে একমাত্র তোমাকেই ভালবাসে।

রাণু—এ কথা শোনবার জন্য আমি আপনাকে ডাকিনি।

কুমার—এতে যদি তুমি আঘাত পাও, সে আঘাত আমি না দিয়ে পারব না। আমার হৃদয়কে তুমি যতই অবহেলা কর না কেন, সে তার পথ বেছে নিয়েছে। দরকার যদি হয়, তোমার মায়ের সাহায্য আমি নিশ্চই গ্রহণ করব। একবার যদি তুমি আমার হও তার পরেরটুকুর জন্যে আমি গ্রাহ্য করি না।

রাণু—কিন্তু জোর করে দখল করার বিপদ আপনার বোঝা উচিত। তখন অনুশোচনা রাখবার ঠাঁই পাবেন না।

কুমার—ও ভয় আমাকে দেখাবে না। বিপদ আছে জেনেও এগিয়ে যাওয়ার সাহস আমার আছে। নিজের শক্তিতে বিশ্বাস থাকলে বাজে ভয়ে হৃদয় কাঁপে না কারুর।

রাণু—সত্যি, আপনার মত বীর এবং সাহসীকে স্বামীহিসাবে পাওয়ার যে দুর্লভ আনন্দ ও গৌরব—তা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই আমাকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে।

কুমার—দেখা যাক। তোমার মার সঙ্গে গিয়ে কথা কই (প্রস্থান)

মহিম ও কুসুমের প্রবেশ

মহিম—এই ত মা তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। রজত কোথায় গেল?

রাণু—তিনি ত ওঘরে রয়েছেন।

মহিম—দ্যাখ্ এ বাড়ীতে কার ইচ্ছের দাম বেশি। তোর মা কুসুমকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, আমি তাকে ডেকে এনেছি বহাল করব বলে।

রাণু—কিন্তু তুমি যদি একটু নরম হও বাবা, তা হলেইত মা তোমার উপর হুকুম চালাবেন।

মহিম—আমাকে কি তোরা যা-তা ভেবেছিস না কি?

রাণু—তাই কি আমি বলেছি বাবা।

মহিম—আমি বুঝেসুঝে যা স্থির করি, তাথেকে নড়ায় কে আমায়? আমার কি এটুকুও বুদ্ধি হয় নি যে কি করে বাড়ী শাসন করতে হয়—বুঝি না?

রাণু—তা কেন হবে বাবা?

মহিম—তোর মা আমাকে নাকে ধরে চালাবেন, এতই কি হাঁদা আমি।

রাণু—সে কি বাবা!

মহিম—তবে কোন্ সাহসে আমাকে তুই ওসব কথা বলিস?

রাণু—তোমাকে ব্যথা দেবার বা অপমান করবার কেন উদ্দেশ্যই আমার ছিল না বাবা।

মহিম—এ বাড়ীতে সবকিছু আমার ইচ্ছা অনুসারে চলবে।

রাণু—তাইত চলা উচিত।

মহিম—আমি ছাড়া আর কারুর হুকুম করবার অধিকার নেই এ বাড়ীতে।

রাণু—তাই ত।

মহিম—আমি এ বাড়ীর কর্তা কি-না?

রাণু—আবার কে?

মহিম—আমার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার আমিই মালিক।

রাণু—নিশ্চয়ই।

মহিম—তোর উপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার।

রাণু—আমি কি তাতে আপত্তি করেছি বাবা!

মহিম—আমি আজই দেখিয়ে দেবো বিয়ের ব্যাপারে তোকে আমার কথাই শুনতে হবে। তোর মার কথা শুনলে চলবে না।

রাণু—আমিও তোমার হুকুম মেনেই চলতে চাই বাবা।

মহিম—দেখি তোর মায়ের কতবড় স্পর্ধা—আমাকে বাধা দেয়।

রাণু—ওই মা আসছেন—একেবারে সদলবলে।

(গৌরী, বেলা, আনু, কুমারশঙ্কর ও পুরোহিতের প্রবেশ)

গৌরী—(কুসুমকে দেখে) এ্যাঁ, এটা আবার আমার বাড়ীতে আসে কোন্ সাহসে? কে ঢুকতে দিয়েছে ওকে?

মহিম—সে সব কথা পরে আলোচনা করা যাবে। এখন আরও জরুরী কাজ রয়েছে ত।

গৌরী—তা হলে ঠাকুরমশাই, কাজ সেরে ফেলুন।

পুরোহিত—হ্যাঁ, পাত্রী কোথায়?

গৌরী—এই যে আমার ছোট মেয়ে—

পুরোহিত—বেশ। কি নাম মা তোমার?

মহিম—এটি আমার ছোট মেয়ে—রাণু।

পুরোহিত—আর পাত্র?

গৌরী—(কুমারশঙ্করকে দেখিয়ে) এই যে, এরই হাতে আমার কন্যাকে সমর্পণ করব।

মহিম—উঁহু। সবুর করুন। রজত! (রজতের প্রবেশ, তাকে দেখিয়া) এই পাত্র—রজতকুমার।

পুরোহিত—দুজন পাত্র কি করে হয়? একজন বেশি হয়ে যাচ্ছে না?

গৌরী—আপনি ইতস্তত করছেন কেন? পাত্র কুমারশঙ্কর।

মহিম—কিন্তু আমি জানাচ্ছি যে, পাত্র হল রজতকুমার।

পুরোহিত—আগে তা হলে আপনাদের ঝগড়া মিটিয়ে নিন। বিচার করে স্থির করুন—কে এই বিবাহের আসল পাত্র।

গৌরী—আমি যা বলছি তাই হবে।

মহিম—আমার কথা মত কাজ করতে হবে আপনাকে।

পুরোহিত—ভাল সমস্যায় ফেললেন দেখছি!

গৌরী—(মহিমকে) আমার ইচ্ছায় বাধা দাও তুমি!

মহিম—আমার বিষয়ের লোভে যে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চায় তাকে আমি কিছুতেই মেয়েকে দেবো না।

গৌরী—বুদ্ধিমান লোক টাকার কথা না ভেবেই বিয়ে করবে না কি?

মহিম—মোটকথা, আমি রজতকেই জামাই করব স্থির করেছি।

গৌরী—আর আমিও স্থির করেছি, কুমারশঙ্করই জামাই হবে। আমার ইচ্ছাই খাটবে।

মহিম—অত ওস্তাদি চলবে না তোমার।

কুসুম—সে কি কাণ্ড গো! ইস্তিরি কখনও সোয়ামির উপর কথা বলে কেউ শুনেছে কোন দিন?

মহিম—খাসা বলেছ তুমি।

কুসুম—এই ছড়া-কাটা জামাই দিয়ে কি হবে বাবু?

মহিম—ঠিক কথা।

গৌরী—পাগলের কথা তুমি মানতে পার।

কুসুম—গিন্নীর বই-পড়া জামাই পছন্দ। আমার সোয়ামিকে কি আমি বউ ছাড়া বই পড়তে দিই নি।

গৌরী—(মহিমকে) ও সব পাগলামি রাখো, আমি যা স্থির করেছি, তা-ই হবে। কুমারশঙ্করের সঙ্গে রাণুর বিয়ের আশীর্বাদ এখুনি এখানেই শেষ করতে হবে—এই আমার হুকুম। কোন কথা বলবে না তুমি। রজতকে জামাই করতে চাও, বেশ তো, তোমার বড় মেয়ে আছে।

মহিম—এই তো চমৎকার সমাধান। গিন্নী তোমার বুদ্ধি আছে।

(রজত, রাণু ও আনুর মধ্যে অত্যধিক চাঞ্চল্য দেখা গেল)

(অসীমের প্রবেশ)

অসীম—এই আনন্দের মধ্যে আমাকে একটা অত্যন্ত দুঃখের খবর দিতে হচ্ছে। এই দুখানি চিঠি পেলাম একটু আগে। দুখানাতেই সর্বনাশা খবর।

গৌরী—এমন কি খবর হতে পারে যা নিয়ে এখুনিই আমাদের মাথা ঘামাতে হবে?

(অসীম চিঠি দুখানা এগিয়ে দিতে গৌরী হাত বাড়িয়ে একখানি নিলে)

গৌরী—(পত্র পাঠ) "প্রিয় অসীম, খবরটা তোমাকেই জানাচ্ছি। সোজাসুজি তোমার দাদাকে জানাতে ভরসা পেলাম না। তোমাদের মামলাটা আজ নিষ্পত্তি হয়ে গেল। খবর দেওয়া সত্ত্বেও সময় মত তোমরা কেউ আস নি। তোমাদের গাফিলতিতে এ মামলায় আমাদের হার হয়েছে অথচ জয় ছিল সুনিশ্চিত।—"

মহিম—হার হয়েছে? কার চিঠি—এটর্নির?

গৌরী—হ্যাঁ, কিন্তু বড় ব্যথা পেলে যে তুমি! আমি গ্রাহ্য করি নে ওসব। দুর্দৈব এলে সাহসের সঙ্গে দাঁড়াতে হয়। যারা সাধারণ মানুষ তারাই ভেঙে পড়ে। (চিঠির বাকী অংশ পাঠ) "এই গাফিলতির জন্যই তোমাদের উপর চল্লিশ হাজার টাকা ডিক্রি হয়েছে। খরচ সমেত এই টাকা দেবার জন্য মহামান্য হাইকোর্ট তোমাদের উপর আদেশ জারি করেছেন।" আদেশ জারি করেছেন! একটু ভদ্র-ভাবে লিখতে পারে না?

অসীম—'অনুরোধ করিতেছেন' লেখা উচিত ছিল, না বৌদি?

মহিম—এই সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়ে আর তোমাদের রসিকতা শুনতে ভাল লাগে না।

অসীম—এ চিঠিটার খবর আরো গুরুতর দাদা। (পত্র পাঠ) "প্রিয় অসীমবাবু, আপনার সঙ্গে যে আমার গভীর প্রীতির সম্পর্ক আছে তাহাতে আপনাদের বিষয়ে আমার কিছুটা কর্তব্যবোধ আছে। তাই এই চিঠিখানি লিখিলাম। শ্রীযুক্ত সৌরেন নাগ ও শ্রীযুক্ত অমিতাভ ঘোষকে আপ-নারা যে ব্যবসা করিবার জন্য লক্ষাধিক টাকা দিয়াছিলেন তাঁহারা দুই জনেই দেউলিয়া খাতায় নাম লিখাইয়াছেন।"

মহিম—হায় ভগবান! একসঙ্গে সব কিছু গেল?

গৌরী—তোমার এ দুর্বলতার জন্য আমি লজ্জা বোধ করছি। জ্ঞানীব্যক্তি কিছুতেই মুহ্যমান হন না। তা ছাড়া, কুমারের এতবড় বিষয় থাকতে আমাদের ভাবনা কি!

কুমার—কিন্তু সবাই যখন আমার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ের বিরুদ্ধে, তখন সে বিয়ে আমি কেমন করে করি?

গৌরী—এ বিচারবোধ বুঝি তোমার হল আমাদের দুর্দৈবের দুঃসংবাদ শুনে।

কুমার—দেখুন, চারদিক থেকে বাধা পেয়ে আমি তিতি-বিরক্ত হয়ে গেছি। এসব ঝগড়াঝাটির মধ্যে আমার যাওয়ার দরকারটা কি! তা ছাড়া, পাত্রীর নিজের আপত্তি—সে বিয়ে তো আমার করা উচিতই নয়।

মহিম—ওসব এখন বাদ দাও গিন্নী।

গৌরী—বুঝলাম, কুমারের সম্বন্ধে পাঁচজনে এতদিন যা বলে এসেছে, আমি তা উড়িয়ে দিতে চাইলেও আজ দেখতে পাচ্ছি তা সত্যি।

কুমার—আমার সম্বন্ধে আপনি যা খুশি ভাবতে বা বিশ্বাস করতে পারেন, তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। যে অপমান আমাকে এখানে করা হয়েছে, তা মুখবুজে সহ্য করবার মানুষ আমি নই। আমার মূল্য যেখানে আছে, সেখানেই আমি যাব। আমাকে যারা অবজ্ঞা করে তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। (প্রস্থান)

গৌরী—উঃ, কি ছোটলোক! এই ওর পাণ্ডিত্য, এই ওর কবিত্ব, দার্শনিকতার ভাণ!

মহিম—শেষ বয়সে এমনি ভাবে যে নিঃস্ব হয়ে যাব—এ কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নি।

রজত—আমি পণ্ডিতও নই ধনীও নই। গর্ব করার কিছুই আমার নেই। সাধারণ চাকুরে মানুষ। তবু এটুকু বলতে পারি যে, আপনাদের ভাগ্যের সঙ্গে আমার ভাগ্যকে আমি আলাদা করে দেখিনে। আমি নিজেকে আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছি। আপনাদের নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার জন্য পুত্র হিসেবে আমার চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না।

গৌরী—এই তো ছেলের মত ছেলে। তোমারই হাতে আমি রাণুকে—

রাণু—না মা, তা হয় না।

রজত—এখন তুমি বাধা দিচ্ছ?

রাণু—আমি জানি তোমার উপার্জন। এ পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব নিতে হলে সে যে কি বিপুল বোঝা হবে তোমার তা আমি বুঝতে পারি। আমার জন্য তুমি এতখানি দুঃখ বরণ করে নেবে—এ আমি হতে দেবো না।

রজত—তোমার দুর্ভাগ্যের অংশ আমাকে তো নিতেই হবে। আর তুমি যদি পাশে থাক, তা হলে কোন দুঃখকেই আমি দুঃখ বলে মানব না।

রাণু—কিন্তু তা বলে আমি তো তোমার দুঃখের নিমিত্ত হতে পারি নে।

অসীম—তোর হঠাৎ বেঁকে বসার এই কি একমাত্র কারণ?

রাণু—তা না হলে—তুমি তো সবই জান কাকাবাবু!

অসীম—তবে এ সব পাগলামি ছেড়ে দে। (মহিমকে) তবে শোন দাদা, শোন বৌদি, যে চিঠি দুখানি আমি তোমাদের দিয়েছি—সে দুখানিই জাল। অনেক ভেবেচিন্তে এই কারসাজি বার করতে হয়েছে আমাকে। বৌদির ভুল যাতে ভাঙে, মোহ কাটে, তথাকথিত কবি ও দার্শনিকদের স্বরূপ যাতে চিনতে পারে তার জন্যেই এই ছলনা।

মহিম—বেঁচে থাকো ভাই!

গৌরী—শয়তানটা পালিয়ে গেল, নইলে মেরেই বসতাম ওকে। খুব জব্দ হবে ও যখন দেখবে কি সাড়ম্বরে এই বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

মহিম—কেমন! আমার ইচ্ছেই তো শেষ পর্যন্ত রইল।

আনু—(রজতকে) শেষ পর্যন্ত আমার সর্বনাশটা করলে তো!

রজত—আপনি শিক্ষিতা মহিলা, আমাদের প্রেমকে আপনার আশীর্বাদ করা উচিত।

বেলা—বিয়ে করবার আগে ও যেন স্থির বুঝে নেয়, ওর মনে আর কারুর আসন নেই। খেয়ালের বসে অনেকেই যাকে তাকে বিয়ে করে বসে এবং শেষ পর্যন্ত পস্তায়।

মহিম—তোদের বাচালতা রাখ্। ঠাকুর মশাই, আপনি এবার নির্বিঘ্নে কাজটা সেরে ফেলুন।*

---

* ফরাসী নাট্যকার মলেয়ারের The Learned Ladies নাটকের অনুসরণে।—লেখক

এই মর্ত্যভূমি

গত সংখ্যার পর

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

কড়া সিগ্রেটের একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মিঃ উইলিয়াম সুইট বললেন, তুমিই সুকুমার, তোমার কথা প্যামের কাছ থেকে প্রায়ই শুনি, কিন্তু তোমাকে দেখে তো ঠিক ইণ্ডিয়ান বলে মনে হয় না, এই স্পেন কিংবা ইটালীর লোক যেন—তোমার মা বাবা দুজনেই কি ইণ্ডিয়ান?

খাঁটী ইণ্ডিয়ান, মিঃ সুইট।

বাঃ বেশ; ব'সো ব'সো সুকুমার—কেমন লাগছে এদেশ?

ভালো।

কিছুদিন আগে তোমাদের দেশের কয়েকজন জার্ণালিষ্টের সংগে আমার আলাপ হয়—খুব চমৎকার লোক তারা—এদেশ কিন্তু তাদের মোটেও ভালো লাগে নি—তারা প্রায়ই আমাকে বলতেন, বিশ্রী ওয়েদার—বিশ্রী খাওয়া-দাওয়া, খাওয়া কেমন লাগে তোমার?

আমার তো কোন অসুবিধা হয় না মিঃ সুইট।

তুমি গরু খাও?

এখানে মাঝে মাঝে খেতে হয় বৈকি।

তোমাদের দেশের লোক ওটা খায় না শুনি।

সকলে নয়—হিন্দুরা খায় না, কারণ ধর্মের দিক থেকে তারা গরুকে মায়ের মতো মনে করে।

আস্তে আস্তে উঠে মিঃ সুইট সেলার খুললেন। ঝলমল্ ক'রে উঠলো মদের নানারকম বোতল, কি খাবে সুকুমার, হুইস্কি?

আমি মদ খাই না মিঃ সুইট।

বিয়ার্? গিনেস্? একটু সাইডার?

তাও না—ধন্যবাদ।

ভালো, সেলার বন্ধ ক'রে মিঃ সুইট সুকুমারের কাছে এসে সিগ্রেটের কেস্ খুলে বললেন, সিগ্রেট খাও তো?

খাই, কিন্তু আপনার সামনে খাবো না।

অবাক হ'য়ে মিঃ সুইট জিজ্ঞেস করলেন, কেন?

আমাদের দেশে গুরুজনদের সামনে সিগ্রেট খাওয়া অশোভন—

খোলা কেস্ হাতে নিয়ে সুকুমারের মুখের দিকে মিঃ সুইট তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর তার কপালে আস্তে চুম্বন করে বললেন, মাই সান্! ব'লেই চেঁচিয়ে ডাকলেন, প্যাম্—প্যাম্—

পামেলা ছুটে এসে বললো, কি বলছো?

কি রান্না করছিস সুকুমারের জন্যে?

সুপ্, ল্যাম্ব চপ্ আর রাইস্-পুডিং।

বাঃ বেশ, আর শোন্, ভীষণ কুয়াশা হয়েছে বাইরে—আরও বাড়বে মনে হয়—সুকুমার এখানেই থেকে যাক্ আজ—লাউঞ্জের ডিভানে ওর বিছানা ক'রে দে—বালিশ আছে তো? দেখিস ওর যেন কোন অসুবিধা না হয়—তুমি বাড়ীতে ফোন্ ক'রে ব'লে দাও সুকুমার—

সুকুমারের ফোন ক'রে রাত্তিরে এখানে থাকবার কথা জানাতে লজ্জা করতে লাগলো। তাই সে বললো. পামেলা তুমি ওদের কাউকে ব'লে দেবে দয়া ক'রে? আমার ফোন নম্বর, মাউন্টভিউ—

আমি জানি, হেসে পামেলা বেরিয়ে গেল।

সংসারের পাঠ চুকিয়ে শোবার আগে আর একবার পামেলা জানতে এলো সুকুমারের আর কিছু চাই কিনা।

কিছু না, এসো প্যাম্, সোফায় গা এলিয়ে সুকুমার বললো, একটু গল্প করি!

ঘুমোবে না? অনেক রাত হয়েছে যে, ধপ্ ক'রে পামেলা ডুবে গেল সোফায়।

এখানে কি ঘুমোবার জন্যে র'য়ে গেলাম?

তবে?

বোকা মেয়ে—তাও জানো না?

না।

তোমার সংগে সারা রাত গল্প করবার জন্যে।

অসম্ভব, আমি কিছুতেই তা পারবো না।

তোমাকে পারতেই হবে।

আঃ, ছাড়ো সুকুমার বাবা রয়েছে পাশের ঘরে!

থাকলেই বা, তিনি তো সব জানেন।

আমি কিছুতেই রাত্তিরে তোমার সংগে এক ঘরে থাকতে পরবো না।

তাহ'লে আমি চ'লে যাই?

যাও!

এই কুয়াশায়, সত্যি তুমি আমাকে চ'লে যেতে বলছো —এত নিষ্ঠুর তুমি প্যাম্—তোমাকে থাকতেই হবে—

আচ্ছা এক ঘণ্টা থাকবো—তারপর চ'লে যাবো, বড় দুষ্টু তুমি—আর কখনও তোমাকে এ বাড়ীতে থাকতে দেবো না।

উঃ যেন উনি থাকতে দেয়ার মালিক—কে আমার থাকার বন্দোবস্ত করলেন আজ?

তুমি বড় চালাক সুকুমার—

আর তুমি—বেহালা।

বেহালাটা কি আবার?

বেহালা বাজানোর গল্প ব'লেই তো তোমাকে জয় করলাম—আরো কাছে এসো প্যাম্—

আমি যাই সুকুমার—

না—

আমাকে যেতেই হবে—

না—না—না—

সু—কু—মার আমাকে যেতে দাও!

আমাকে ছেড়ে তুমি যেও না প্যাম্—

সুকুমার পামেলার সোনালী চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগিলো। সে বাধা দিলো না।

জেগে জেগেই রাত ভোর হ'লো!

ভুলে থাকতে চাইলেই ভুলে থাকা যায় না। পিছনে না তাকিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেও পিছন কি সহজে ছাড়ে! মা'র লেখা বিজয়ার চিঠি!

কল্যাণবরেষু,

সুকুমার,

আমার বিজয়ার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। মণ্টু, ঘুনু, রাণু, ছায়া তাহারাও তোমাকে প্রণাম জানাইলো। আলাদা করিয়া তাহারা তোমাকে লিখিতে চাহিয়াছিল কিন্তু তাহাদের জন্য ছ' আনা খরচ করিবার অবস্থা আমার এক্ষণে নাই। আর এ চিঠিতে আমিও তোমাকে অনেক কথা লিখিতে চাই বলিয়া তাঁহাদের কিছু লিখিতে দিয়া জায়গা নষ্ট করিলাম না। বিজয়ায় আমিও তোমার কাছ হইতে দু' লাইন আশা করিয়াছিলাম কিন্তু তুমি কি সুকুমার? বিলাতে গিয়াই এত বড় বাঁদর হইয়া গেলে। আজকাল আমাকে চিঠি লিখিবারও তোমার অবসর হয় না। মাসের শেষে ছোট একটি চিঠি দাও—তাহাতে শুধু টাকার কথা থাকে—যেন প্রথম সপ্তাহে নিশ্চয়ই করিয়া তোমার টাকা পাঠাই। যাইবার সময় তো খুব বড় মুখ করিয়া বলিয়াছিলে যত কমে পারো চালাইবে। এই কি তোমার কমে চালানো হইল? প্রথমে দু'শো—তারপর আড়াইশো —তারপর তিনশো টাকা—এখন টাকা ছাড়িয়া আবার পাউণ্ডে উঠিয়াছ—গত চিঠিতে লিখিয়াছ তিরিশ পাউণ্ডের কমে কিছুতেই চালাইতে পারিবে না। তিরিশ পাউণ্ডে কত হয় সে খেয়াল আছে তোমার? চারশো টাকা! অত টাকা আমি কোথা হইতে দিব? তুমি কি সব ভুলিয়া গেলে সুকুমার? আমার কথা না-হয় ছাড়িয়া দিলাম—কিন্তু ভাইবোনগুলি—তাহাদের শীর্ণ মুখের কথা মনে করিয়া দামী জামা-কাপড় পরিয়া টাই বাঁধিয়া সাহেব সাজিতে তোমার লজ্জা করে না? কি দরকার ছিল অত জামা করাইবার? ইচ্ছা থাকিলে যা লইয়া গিয়াছিলে তাহাই যথেষ্ট হইত। লিখিয়াছ সাহেব পরিবারে খুব সুখে আছ —অত সাহেব-মেমসাহেব লইয়া নবাব-পুত্তুর সাজিবার দরকার কি তোমার? শুনিয়াছি খুব অল্প খরচে ফ্ল্যাট লইয়া অনেক বাঙালী ছাত্র নিজেরা রাঁধিয়া-বাড়িয়া খায় —তুমি তেমন করিতে পারো না? নাকি মেমসাহেব লইয়া মদের পিপায় ডুবিয়া আছ আর ভাইবোনগুলির অন্ন মারিয়া খুব ধেই ধেই করিয়া নাচিতেছ। কিন্তু আমি স্পষ্ট বলিয়া দিলাম সুকুমার—তিনশো টাকার বেশী আমি কিছুতেই তোমাকে পাঠাইবো না—পাঠাইতে পারিব না— পারো—চালাইও—না পারিলে উপোস করিও—এমন হতচ্ছাড়া বাঁদরের মতো ব্যবহার করিবে জানিলে কিছুতেই আমি তোমাকে বিলাত যাইতে দিতাম না। তুমি কেমন করিয়া সব ভুলিয়া গেলে? আমার অবস্থা জানো না— খবর রাখো যে বাচ্চাদের তোমার জন্যে আজকাল ভালো করিয়া খাওয়া জোটে না। যাহা হউক আমি তোমাকে স্পষ্ট জানাইয়া দিতেছি যে, বেশী টাকা চাহিলেই হুপ্ করিয়া পাঠানো আমার পক্ষে অসম্ভব—ভবিষ্যতে টেলিগ্রাফ পাঠাইয়া পয়সা নষ্ট করিও না—ফল হইবে না। মনে রাখিও তুমি নবাব-পুত্তুর নও—বিধবা মায়ের ছেলে। আমার আশীর্বাদ লইও। ইতি— মা

চিঠি পড়ে সুকুমার মাথায় হাত দিয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলো। ওর শিরায় শিরায় জ্বলছে মায়ের লেখা লাইনগুলো। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সব অন্ধকার হ'য়ে গেল যেন। সমুদ্রের ওপার থেকে মণ্টু, ঘুনু, ছায়া, রাণু কথা ব'লে উঠলো! বিলেতে এসে ভুল করেছে সুকুমার— যৌবনের এই চঞ্চল সমারোহে তাল মেলাবার কোন অধিকার নেই তার। দেশে ফিরে প্রত্যেককে সাবধান করতে হবে—তার মতো অবস্থার কেউ যেন কোনদিনও এখানে না আসে। বিলেতে হয়তো আসা হয় কিন্তু দেখা হয় না, জানা হয় না, শোনা হয় না, তাহ'লে এসে কি লাভ! এসে যদি প্রতি পদে বাধা পাই, প্রতি কাজ করতে গিয়ে মনে হয় পারবো না, আমি গরীব— তাহ'লে নতুন দেশে এসে কি লাভ! নতুন দেশে এসে নতুন শিক্ষায় নতুন মানুষ যদি না হ'তে পারি তাহ'লে শুধু শুধু পাথেয় নষ্ট ক'রে কষ্ট পাওয়ার মানে কি? ভুল করেছে সুকুমার —কেন এলো সে? তাকে মানায় না—সাজে না এদেশে। এখন না পারবে ফিরতে—না পারবে কিছু গ্রহণ করতে—বেদনাই সার হবে তার—শুধু মর্মান্তিক বেদনা—পেয়ে—না-পাওয়া, দেখে—না-দেখা, কাছে এসে ছোঁয়া বাঁচিয়ে স'রে থাকা!

অভিমানে সুকুমার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো, মাকে আর চিঠি লিখবে না, কোন খবর দেবে না—ম'রে গেলেও না!

কখনও কুয়াশা, কখনও তুষারপাত, কোনদিন ভারী ঠাণ্ডা, কোনদিন ফুরফুরে হাওয়া, মাঝে মাঝে এই রোদ, এই বৃষ্টি—এমনি ক'রেই নভেম্বর মাস শেষ হ'লো।

ভারী ঠাণ্ডা পড়লো ডিসেম্বরের প্রথমেই। একদিন ঘুম থেকে উঠে জানলার পর্দা সরিয়ে সুকুমার দেখে শাদা হ'য়ে গেছে বাগান—গাছের মাথায় জমাট বেঁধে আটকে আছে তুষার-কণা। এতদিন পর লণ্ডনের চিরপ্রসিদ্ধ শীত টের পেলো সুকুমার।

ঠাণ্ডা আর কিছুতেই কমে না—গ্যাসের আগুন সারাদিন জ্বলে। বিকেলে লাউঞ্জে জ্বলে কয়লার আগুন আর দুটো ইলেক্ট্রিক ফায়ার—রাত্তিরে গরম জলের ব্যাগ দিয়ে বিছানা গরম না করলে মনে হয় দেহ কেটে যাচ্ছে।

রাস্তায় বেরিয়ে জমা তুষারের ওপর ধুপ্‌ধাপ্ আছাড় খায় সুকুমার। মাফ্‌লার, ওভারকোট, গ্লাব্‌স—হাঁটু অবধি তোলা গরম মোজা—তবু নাকের ডগা আর কান লাল হ'য়ে যায় সুকুমারের, তার ওপর হাওয়ার দাপটে কথা বেধে যায় তার। লোকে বলছে, এবার নাকি আরও বেশী ঠাণ্ডা পড়বে—জানুয়ারী ফেব্রুয়ারীতে আরও কত ডিগ্রী নামবে বলা যায় না। যা-হয় হোক্, সুকুমার গ্রাহ্য করে না কিছুই। কয়েকদিনের মধ্যেই তার শীত স'য়ে গেল। তুষারপাত হ'লে সে বিরক্ত হয়—হাঁ ক'রে তাকিয়ে থেকে কবিত্ব করে না মোটেই।

এই শীতের মধ্যেই তার পরীক্ষা হ'য়ে গেল—কিছুই শক্ত মনে হয়নি তার—মনে হ'লো ফল তার খুবই ভালো হবে। বড়দিনের ছুটি হ'য়ে গেল।

এর মধ্যে কয়েকজন বাঙালী ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হয়েছে সুকুমারের। একজনের নাম সুবিকাশ মিত্র—সে-ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ে—তবে ফ্যারাডে হাউসে নয়—ইম্পিরিয়াল কলেজে—ছেলেটি ভদ্র। থাকে টাফনাল পার্কে ডাঃ রায়ের বোর্ডিং হাউসে। সুকুমার কয়েকবার গেছে তার বাড়ী।

ডাঃ রায় মেম বিয়ে ক'রে এদেশেই থেকে গেছেন—তাঁর আইরীশ স্ত্রী সকলকে যত্ন করেন খুব—ছেলেরা বড় ভালোবাসে তাঁকে। তবে সেখানে সকলেই ভারতীয়—দিশি খাওয়া হয় রোজ রাত্তিরে। বেশীর ভাগ ডবল্ ঘর—ভাগ্যক্রমে সুবিকাশ একটা সিংগল্ ঘর পেয়েছে।

প্রথমদিন সুবিকাশের ঘরে গিয়ে চমকে গেল সুকুমার। নানা ভঙ্গীতে একটি বাঙালী মেয়ের নানারকম ছবি চারদিকে সাজানো রয়েছে।

ইনি কে?

লজ্জিত হ'য়ে সুবিকাশ বললো, আমার স্ত্রী।

আপনি বিয়ে ক'রে এসেছেন?

হ্যাঁ। বিয়ে না দিয়ে বাবা কিছুতেই আসতে দিতে রাজী হলেন না।

তাহ'লে চার বছর থাকতে আপনার খুব কষ্ট হবে বলুন?

ম্লান হেসে সুবিকাশ বললো, বিরহের একটা চার্ম আছে সুকুমার বাবু।

সেটা আপনিই ভালো বুঝবেন।

আপনি বিয়ে করেন নি?

—না—ভাগ্যিস।

কেন?

ওতে কান দেবেন না—ও আমার উচ্ছ্বাস।

এদেশে প্রেমে পড়েছেন?

কি ভেবে সুকুমার বললো, হ্যাঁ।

কি জাত?

ইংরেজ।

বিয়ে করবেন নাকি?

দেশ থেকে সবে এসেছে তাই সুবিকাশের কৌতূহল বড় বেশী।

সুকুমার হেসে বললো, বোধহয়।

একদিন নিয়ে আসুন এখানে বৌদির সঙ্গে আলাপ করি।

আনব বৈ কি!

সৌভাগ্য আপনাদের—যাকে ভালোবাসেন তার কাছে রয়েছেন, স্ত্রীর ছবিগুলির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো সুবিকাশ।

এখানে কত খরচ পড়ে আপনার?

তিন গিনি—কেন থাকবেন এখানে?

না, আমি ইংরেজ পরিবারে আরও কম দি!

আরও কিছুক্ষণ সুবিকাশের সঙ্গে গল্প ক'রে সে-রাত্রে ডাঃ রায়ের বোর্ডিং হাউসেই খেল সুকুমার। এবং তখুনি তার সেখানে থাকবার ইচ্ছে একেবারেই উড়ে গেল।

ভীড়ে-ভীড়! বেশীর ভাগ বাঙালী—কয়েকজন দিল্লী-বম্বের ছেলেও রয়েছে। কে বলবে এটা বিলেত—

সুকুমারকে দেখতে পেয়ে একজন বললো, এই যে স্যার, নমস্কার।

নমস্কার, আপনার সঙ্গে কোথায় আলাপ হয়েছে বলুন তো?

আলাপ হয়নি স্যার, তবে আপনাকে হেথায়-হোথায় দেখেছি অনেকবার, সঙ্গে আপনার বান্ধবীও ছিলেন।

তাই নাকি? আর একজন বলে উঠলো, লাকি লোক, অথচ আমাদের দিকে আজও কেউ ফিরেও তাকালো না—

মিসেস রায় হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, ওহো দাঁড়াও, সুবিকাশের গেষ্ট খাচ্ছে আজ—লিখে রাখি নয়তো বিল্ দেবার সময় ভুলে যাবো।

হেসে ডাঃ রায় বললেন, আমি আগেই লিখে রেখেছি ডার্লিং!

দিশি ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে দিশি খাওয়া শেষ হ'লো!

এ বাড়ী ছেড়ে দিতে হ'লে বুক ভেঙে যাবে সুকুমারের। তবু যদি খরচ কমানো যায়। ফিলসফির ছাত্র মোহিত মুখার্জির সঙ্গে একদিন সে তাদের বাড়ী ঘুরে এলো। শুনেছিল তারা কয়েক বন্ধু নাকি ফ্ল্যাট্ নিয়ে থাকে। নিজেরা রান্না ক'রে খায়, খরচ খুব কম পড়ে তাদের—দরকার হ'লে সুকুমারকে তারা জায়গা খুশী হ'য়েই দিতে পারে।

রাসেল্ স্কোয়ারের কাছেই তাদের ফ্ল্যাট্। তিনখানি ঘর। এক একটি ঘরে দু'জন করে থাকে ঘরের চেহারা দেখে সুকুমারের গা ঘিন্ ঘিন্ ক'রে উঠলো। নোংরা মোজার গন্ধ বেরোচ্ছে—বিছানা কতদিন করা হয়নি কে জানে—এদিকে-ওদিকে পড়ে আছে এঁটো চায়ের কাপ্। সকলে বাড়ী ছিল না, যারা ছিল তারা সুকুমারের সঙ্গে আলাপ করতে এলো।

খুব সুখে আছি আমরা জানেন সুকুমার বাবু, যখন খুশী রান্না ক'রে খাই।

বাজার-টাজার করবার সময় হয় আপনাদের?

ওতো মশাই শনিবারে একদিন। আর কোন নিয়ম-কানুন নেই মশাই এখানে।

আর একজন বললো, ইচ্ছা হ'লে দাড়ি সাতদিন না কামান কেউ কিছু কইবো না—ড্রেসিং গাউনের প্রয়োজন দরকার নাই—আপনি এখানে কি পড়েন মশাই?

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং।

ভালই হইবো, আসেন চইলা, এই ঘরেই দিমু অখন আর একখান্ ক্যাম্প্ খাট ফালাইয়া—বাত্তি-বুত্তি খারাব হইলে আপনি সারাইয়া দিবার পারবেন।

আমার অনেক বই—সেগুলো রাখবো কোথায়?

ওই খাটের তলে—আমরা সব তাই রাখছি।

মোহিতের দিকে তাকিয়ে সুকুমার বললো, কয়েকদিন ভেবে দেখি।

সেই ভদ্রলোক বললো, ভাবনার কি আছে মশাই—আসেন চইলা, ইংরেজ পরিবারের টাইম মাফিক্ খাওয়ায় কি আমাগো প্যাট্ ভরে—এখানে ফ্যালাইয়া ছড়াইয়া খাওন মশাই—আর বাত্তি-বুত্তি খারাব হইলে—

তবু কয়েকদিন ভেবে দেখি।

মুখে ওদের এড়াবার জন্যে ওকথা বললেও সুকুমার জানতো এখানে এদের সঙ্গে এমনভাবে কিছুতেই সে থাকতে পারবে না—অমনি থাকতে দিলেও না!

নিজের ঘরে আজকাল বেশী থাকে না সুকুমার। তার ঘর বেশ বড় আর সেখানে শুধু গ্যাসের আগুন। এখন তার পড়াশুনোর বেশী চাপ নেই, তাই যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে হয় সে লাউঞ্জে না হয় রান্নাঘরে এদের সঙ্গে গল্প ক'রে কাটায়।

বাইরে ঠান্ডা হ'লেও ঘরে আনন্দের বিরাম নেই। পুজো-পুজো মনে হচ্ছে সুকুমারের। সকলেই ব্যাস্ত, নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই কারুর। জিনিষে-জিনিষে ঘর ভ'রে যাচ্ছে। লাল, নীল, হলদে কাগজে মেয়েরা তৈরী করছে শিকল—লাল রাংতার ওপর শাদা রাংতায় লেখা হচ্ছে Happy Christmas. কার্ডে কার্ডে ভ'রে গেছে ম্যান্টেল পিস্—বাচ্চাদের জন্যে এসেছে কত খেলনা। সুকুমারও একদিন জন্, চার্লস্ আর মণিকার জন্যে খেলনা কিনলো। পামেলার জন্যে কি কিনবে এখনও ঠিক করতে পারলো না সে।

ওসব হ্যাপি খৃীষ্টমাস-টাস্ চলবে না, নতুন কিছু লিখতে হবে, চীৎকার ক'রে উঠলো সতেরো বছরের এডওয়ার্ড, মারজোরী ওটা ছিঁড়ে ফেল—

এত কষ্ট ক'রে করলাম আমি, এখন ছিঁড়ে ফেললেই হ'লো!

কি লিখতে চাও তুমি এডওয়ার্ড? উরসুলা উৎসুক চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো।

টেবিলে ঘুসি মেরে সতেরো বছরের এডওয়ার্ড জানালো, Revolutionary Christmas.

হাসির ধুম পড়ে গেল। হাসতে হাসতে নোয়েল বললো, যীশু শান্তিপ্রিয় লোক—অতবড় প্রেমিক, তাকে Revolutionary বানাতে চাও?

যীশুকে কেন? ওই দিনটাকে, তো তো ক'রে কক্নি পিটার বললো, ঠিক কথাই বলেছে এডওয়ার্ড।

এডওয়ার্ড সব সময় ঠিক কথাই বলে, উরসুলার চোখ ছেলের গর্বে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

আচ্ছা, আচ্ছা, দু'দিক বজায় রেখে আর্থার বললো, আসছে বছর থেকে আমরা Revolutionary Christmas করবো খ'ন—এখন 'Happy' তৈরী হয়ে গেছে কি-না—ছিঁড়ে ফেললে মারজোরীর মন খারাপ হ'য়ে যাবে—

বেশ, শান্ত হ'য়ে সতেরো বছরের এডওয়ার্ড বললো, টার্কি'র কি করলে তোমরা—এখনও তো এসে পৌঁছল না—

যা-দাম এ বছর টার্কি'র, আগুন একেবারে—তুমি ঘাবড়িও না এডওয়ার্ড, হেসে বললো হেলেন. ঠিক সময় নোয়েল টার্কি হাতে ঝুলিয়ে বাড়ী ফিরবে—আর্থার মদ কবে আনছো তুমি?

মারজোরী উত্তর দিলো, এর মধ্যেই এনে ফেলেছে, বোতলগুলো সাবধানে ওপরে রেখেছি পাছে বাচ্চারা ভেঙে ফেলে ব'লে।

যাক্ সতেরো বছরের এডওয়ার্ড বললো, এখন টার্কি এসে পড়লেই সব আয়োজন পূর্ণ হয়—ওহে সুকুমার পালাচ্ছ কোথায়? রোজ রোজ ফাঁকি দেয়া চলবে না তোমার—প্লেট ধুতে হবে।

নিশ্চয়ই, তোমরা তো কিছুই করতে দাওনা আমাকে—এখনি ধোব?

হ্যাঁ গো—এই মুহূর্তে—.

আহা, হেলেন বাধা দিয়ে ব'লে উঠলো, ও বেচারীকে খাটানো কেন—ওর পড়াশুনো আছে—শক্ত কোর্স।

এখন বড়দিনের ছুটিতে আবার পড়াশুনো কি? আবার চেঁচাতে আরম্ভ করলো সতেরো বছরের এডওয়ার্ড, আর আমার পড়াশুনো নেই—আমার বুঝি খুব সোজা কোর্স?

হেসে হেলেন বললো, তুমি তো পুচকে ছোকরা—ইস্কুলের পড়া আর সুকুমারের বিজ্ঞান—ফুঃ—

সুকুমার উঠে দাঁড়িয়ে বললো, সেই প্রভেদ দেখাবার জন্যে আমি এখুনি বৈজ্ঞানিকভাবে সমস্ত প্লেট ধোব—এডওয়ার্ড যা সময় নেয়, তোমরা সকলে দেখ তার চেয়ে কত কম সময়ে ধুয়ে ফেলি আমি—প্লেট নিয়ে সুকুমার পাশে রান্নাঘরে এসে গরম জলের কল খুলে দিলো। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়, একটু পরেই শব্দ ভেসে এলো ঝন্ ঝন্ ঝন্!

হাঁ হাঁ ক'রে উঠলো অড্রি, মারজোরী, হেলেন, কি হ'লো সুকুমার?

একটা বোধ হয় ভাঙলো।

বোধ হয়? নিশ্চয়ই ভেঙেছে, সতেরো বছরের এডওয়ার্ড জোরে হেসে বললো, বৈজ্ঞানিক কায়দা যদি সুকুমার আরও দেখায় তাহ'লে বাড়ীতে আর একটি জিনিষও থাকবে না কিন্তু—

খুব হয়েছে সুকুমার, অড্রি তার পাশে দাঁড়িয়ে ভাঙা প্লেট হাতে নিয়ে বললো, সরো আমি ধুয়ে দিচ্ছি—

আমি খুব লজ্জিত—আর ভাঙবো না—

না বাপু, মারজোরী-হেলেন একসঙ্গে বললো, আমরা থাকতে তুমি কষ্ট ক'রে প্লেট ধোবে সে-কি হ'তে পারে!

সুকুমারের রকম দেখে ওরা সকলে হাসি চাপছিল।

লাউঞ্জে ব'সে বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে ক্লোদ মাকে লম্বা চিঠি লিখছিল। কয়লার আগুন জ্বলছে গম্ গম্ ক'রে—দু'পাশে দু'টো ইলেক্‌ট্রিক ফায়ার। বাইরে অবিশ্রাম বরফ পড়ছে। জানলার পুরু কাঁচ আর পর্দা

ভেদ ক'রে ঘরে ছুটে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক। সুকুমার জানতো না ক্লোদ লাউঞ্জে রয়েছে তাহ'লে দরজায় ধাক্কা দিয়ে আসতো।

ওঃ দুঃখিত—

এসো সুকুমার!

বিরক্ত করলাম না তো?

মোটেই না, চিঠি লেখা শেষ হ'লো আমার—তোমার কিছু কাজ নেই তো, তাহ'লে এসে গল্প করি?

ধন্যবাদ, অনেকদিন গল্প করা হয়নি তোমার সঙ্গে।

পামেলা কেমন আছে?

ভালো।

সুন্দর মেয়ে তোমার বন্ধু পামেলা।

ধন্যবাদ ক্লোদ!

আচ্ছা সুকুমার, একটু থেমে দু' এক মিনিট ওপরে তাকিয়ে থেকে ক্লোদ জিজ্ঞেস করলো, মায়া কি?

মায়া? অবাক হ'য়ে সুকুমার বললো, মায়া কি?

ভারতীয় দর্শন পড়া নেই তোমার?

ও মায়া, তুমি কোথা থেকে জানলে ক্লোদ?

আমি যে ফরাসী, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রী তোমাদের দর্শনের কথা জানে।

তাই নাকি?

কিন্তু তুমি ভারতীয়, তাই তোমার কাছ থেকে মায়ার বিশদ ব্যাখ্যা শুনতে চাই।

সুকুমার বিপদে পড়লো, দেখ, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র—দর্শন তো আমার একেবারেই পড়া নেই, শুধু এইটুকু জানি যে, মায়াবাদ শঙ্করাচার্যের দর্শন—

আর সেই মায়ার মূলে রয়েছে শোক, তাই তোমাদের রাজপুত্র সিংহাসন তুচ্ছ ক'রে পৃথিবীর দুঃখ দূর করবার জন্যে নির্বাণ লাভ করেছিলেন—কী অদ্ভুত নিরাসক্তি!

তুমি এত জান ক্লোদ!

নিরাসক্তি! ফরাসীরা একথার মানে খুব ভালো ক'রে জানে সুকুমার—

অথচ আমাদের ধারণা যে, তারা শুধু ফূর্তি করে।

আমার অনুরোধ সুকুমার, তুমি দয়া ক'রে একবার ফ্রান্স ঘুরে এসো—যৌবনকে তারা দাবিয়ে রাখে না বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে সাধনাও করে—যৌবন আর সাধনা এই দুই নিয়ে ফ্রান্স—নিজেদের স্বার্থকে তারা কোনদিনও বড় ক'রে দেখে না, তাই বারবার তাদের পৃথিবীর কাছে ঠকতে হয় তবু তাদের চৈতন্য হয় না—আর এইখানেই তাদের ভারতবর্ষের সঙ্গে সবচেয়ে বড় মিল—

আর একবার সুকুমার বললো, তুমি এত জানো ক্লোদ!

কই আর জানলাম—আরও কত জানতে চাই। তবে আজ আমার কেন জানিনা সুকুমার শুধু বুদ্ধকে মনে পড়ছে—তোমাদের রাজপুত্র সমস্ত ছেড়েছিলেন আর আমরা সামান্য জিনিষ ছাড়তে পারি না কেন? নিরাসক্তির মধ্যে যে সুখ তার তুলনা নেই সুকুমার। সেকথা মানুষ বোঝে না কেন!

—[ক্রমশঃ

বিকেল থেকে সন্ধ্যে

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

আকাশ নাকি-অবশ হয়ে পড়লো এখন ঢুলেঃ
বিকেল বেলা নীশিম গায়ে শাদা বকের ঝাঁক
বুলোলো রং, ছড়ালো ধান তারার ফুলে ফুলে
তখন এল সন্ধ্যাগহন নিবিড় এলোচুলে!
শান্তনু-মন শিথিল করুণ সারা সকাল হেঁটেঃ
মনের মাঠে মৃদুল গানের মিঠে যে আলপনা
তারই আলো তোমার মুখের প্রতি রেখার বাঁকে,
সেখানে সেই রূপসায়রের গোধূলি-রং সোনা!

তখন তোমায় খোঁজে যে মন তারায় তারায় দূরেঃ
মেঘল তনুর দীঘল দুহাত আকাশ-পাতাল ছেয়ে
প্রেমের মতন তন্দ্রা হ'য়ে দু'চোখ জুড়ে নামে,
স্বপন-শিহর রচে তখন কোন মায়াবীত মেয়ে!
সকাল-বিকাল খুঁজে খুঁজেও পাই নি যাহার দিশা
অকাশ-পথের সেই সে মেয়ের নৃত্য তালে তালে
জোনাক জ্বলেই—ঝিল্লীমুখর গভীর অনেক রাতেও।
এখন মেয়ের স্বপ্ন-শরীর শিথিল রাতের কালে!

সহযাত্রী

হিমা চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা

অফিসের একটা বিশেষ কাজে দিল্লী যাবার হুকুম হোলো। জ্যৈষ্ঠের শেষের দিকে বাংলা দেশের গরমেই প্রাণ হাঁফিয়ে উঠছে—দিল্লীর লু-হাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং যাত্রাশেষের কথা ভেবেও খুব উল্লসিত হতে পারছিলাম না। দিল্লী মেলের রিজার্ভড্ সেকেন্ড ক্লাশ কামরায় তবু ঘুমটা হবে—! হাওড়া স্টেশনে মালপত্র তোলার হাঙ্গামাটা কেটে যাওয়ার পর যখন ট্রেণটা একটু একটু চলতে সুরু করেছে, সহযাত্রীটিকে দেখবার অবসর হোলো আমার। বাঙালী ভদ্রলোক, বয়স বোধহয় আমারই কাছাকাছি—কিংবা বেশীও হ'তে পারে। কানের দু'পাশের চুলে পাক্ ধরেছে, বয়সের চেয়েও মুখের গাম্ভীর্য অনেকখানি বেশী—কপালে দু' একটা কুঞ্চনের রেখা। বইয়ের দিকে নিবিষ্ট চোখ, অর্থাৎ এমন একখানা ভাব যে চট্ করে গায়ে পড়ে আলাপ করতে ভরসা হোলো না। আমার আবার একটু বেশী মেশার রোগ আছে—বেশীক্ষণ চুপচাপ থাকলে হাঁফিয়ে উঠি,......কি করি ভেবে না পেয়ে একসময় খুলে বস্‌লাম পকেট বুক সিরিজের একখানা বই।

রাত্রি কেটে যায়, প্রভাত আসে—তারপর আসে মন্থর-গতি দ্বিপ্রহর। কামরার সব পাখাগুলো চালিয়েও ঘেমে উঠি—অসহ্য গুমোট গরম—তেমনি গুমোট্ আবহাওয়া। ওপাশের ভদ্রলোক বইটা প্রায় শেষ করে এনেছেন। কথা না কওয়াটা আমারও প্রায় অভ্যেস হয়ে গেছে।

বাংলা, বিহার ছাড়িয়ে এসেছি। উত্তর প্রদেশের রুক্ষ প্রান্তরে সূর্যের আলো ঠিকরে এসে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিচ্ছিলো। হঠাৎ চোখ গিয়ে পড়লো দূরের ঐ ঈশান কোণে। আশা..আশা...আস্‌ছে সে। অল্প একটু বাতাস..ছড়িয়ে গেলো কালো ঐ মেঘটা—দুলে উঠলো দূরের কাছের গাছগুলো—শুকনো প্রান্তরের ধুলো ঢেউ তুলে এগিয়ে এলো। তাড়াতাড়ি জানলাগুলো বন্ধ করতে গেলাম, হঠাৎ বাধা পেয়ে চমকে তাকালাম। ভদ্রলোক জান্‌লা বন্ধ কবতে বারণ করছেন। একটু আশ্চর্য হলাম, এখনি সমস্ত কামরাটা ধুলোয় ভর্তি হয়ে যাবে—মনের কথাটা অনুমান করে নিয়েই বোধ করি মৃদু হাসলেন ভদ্রলোক—'এখনি বৃষ্টি নামবে'। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাবো—এই সুদীর্ঘ ২০।২২ ঘণ্টার মধ্যে যিনি একেবারে পাথর হয়েছিলেন—নামবার সময়ে একি সহযাত্রীর প্রতি কৃপাবর্ষণ নাকি? কিন্তু আমার ভাবনাকে ডুবিয়ে দিয়ে বেজে উঠলো বাদলের রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্। স্নিগ্ধ হয়ে গেলো সমস্ত শরীর—কোণের দিকে ঠেসান দিয়ে বস্‌লাম। কাব্য আমার বিশেষ আসে না—গানও না। তবুও কখন্ গুণগুণ্ করতে সুরু করে দিয়েছি। বাইরে সন্ধ্যা নেমে এসেছে—বৃষ্টিও ঝরছে অবিশ্রান্ত ধারায়। সুর কখন্ স্বরে উঠে গিয়েছে—'সঘন গহন রাত্রি, ঝরিছে শ্রাবণ ধারা'—জ্যৈষ্ঠের ধারায় আর শ্রাবণের ধারায় পার্থক্য চোখে পড়ে না, তাই রক্ষে। হঠাৎ আবার সহযাত্রীর কণ্ঠ শুনতে পেলাম—'রবিবাবুর 'ক্ষণিকা' থেকে একটা কিছু আবৃত্তি করে শোনান।' স্বরটা এবার কাছে—দেখি ভদ্রলোক উঠে এসেছেন আমারই বিছানার উপর—একটু আশ্চর্য হলাম। কিছু ছিল যে, 'না' বলতে পারলাম না। আবৃত্তি শেষে করার অভ্যাসও নেই— তবু সেই অনুরোধের মধ্যে এমন কিছু ছিল যে, 'না' বলতে পারলাম না। আবৃত্তি শেষে কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলাম দুজনেই, মনে হোল আবার উনি তলিয়ে গেলেন ওঁর নীরবতার সমুদ্রে। বাইরে অবিশ্রান্ত একঘেয়ে মিষ্টি সুরে বেজে চলেছে রিম্‌ঝিম্‌ ঝিম্‌ঝিম্—ঘরে প্রায় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আলোটা জ্বালিনি আমি—মাঝে মাঝে এক এক ঝলক বিদ্যুতের আলো এসে পড়ছে কিংবা কোনও বড় স্টেশনের পাশে থামলে আলো আসছে......। কতক্ষণ এইভাবে ছিলাম জানি না—হয়তো একটু তন্দ্রার ভাব এসে গিয়েছিলো। ভদ্রলোক তখনও আমার বিছানাতেই বসেছিলেন, হঠাৎ কথা কইতে সুরু করলেন—নিজের মনের সঙ্গে কিনা কে জানে? 'বৃষ্টির সন্ধ্যাটাকে আমার ভালো লাগে যত, ভয় করে তার থেকে অনেক বেশী। কি যে মাতাল করে দেবার নেশা আছে এর মধ্যে। ভালো লাগে বলেই দূরের মানুষকে কাছের মনে হয়, কাছের মানুষ আরও নিবিড় হয়ে এগিয়ে আসে। বাদলের দিনে বৃষ্টি যেমন ছল্‌ছলিয়ে পৃথিবীকে তার প্রাণের কথা বলে চলেছে

তেমনি বোধ হয় চুপিচুপি মানুষও তার নিজের প্রাণের গভীরকে তুলে আনতে চায়।’

ভদ্রলোকের কথাগুলো শুনতে শুনতে মনে হোল ঠিক তাই......এই যে সহযাত্রীটি আমার এই এতখানি পথে এতটা দূরত্ব বজায় রেখে এসেছিলেন তাঁকে তো আমারও আর দূরের মনে হচ্ছে না—মনে হচ্ছে বাদলের এই সন্ধ্যায় অনেক কথা আমার বল্‌বার আছে—অনেক কথা আমার শোন্‌বারও আছে......। আস্তে আস্তে বালিশের তলা থেকে হাল্‌কা চাদরটা বের করে নিজের পা ঢাক্‌লাম—ও'র পাও ঢেকে দিলাম। কোনও ভদ্র বিনীত প্রত্যাখ্যান এলো না—এইটেই যেন সহজ, এইটে ঘটাই যেন উচিত ছিল।...... কে এইরকম এক বাদল সন্ধ্যাই আমার জীবনে ওলোটপালট এনে দিল, তাই আমার একে বড় ভয়......। অলকা—আমার স্ত্রী......তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল দিল্লীর এক পার্টিতে। প্রথম দর্শনেই তার প্রেমে পড়েছিলাম কিনা জানি না, তবে তাকে আমার ভালো লেগেছিল। খোঁজখবর নিয়ে বিয়ের প্রস্তাব জানাতে এবং তাকে ঘরে তুলতে বেশীদিন লাগে নি। বিয়ের পর দু' বছর কেটে গেল নিরুদ্বিগ্ন সুখে—আমার রোজগার মন্দ ছিল না—অলকাও সুগৃহিণী ছিলো। দু'বছর পরে আমাদের সংসারে একটি আগন্তুক এলো। খোকনকে ঘিরে আমাদের ভালোবাসা যেন আরও দানা বেঁধে উঠলো। হয়তো এমনিই যেতো—আরও অনেকদিন—কিন্তু......' চুপ করলেন ভদ্রলোক। আমার তন্দ্রার ভাব্‌টাও কেটে গিয়েছিলো। উৎসুক হয়ে উঠলাম। আমার মুখ থেকে কোনও প্রশ্ন বেরোবার আগেই ভদ্রলোক আবার সুরু করলেন, ‘সেদিনও ছিলো এইরকমই একটা সন্ধ্যা। অফিস থেকে ফিরে ক্লাবে যাবার যোগাড় করছি এমন সময়ে মেঘ ঘনিয়ে এলো। গাড়ীটা বার করাই ছিলো, তাড়াতাড়ি উঠ্‌তে যাচ্ছি—অলকা বাধা দিলোঃ ‘থাক্‌ না আজ তোমার ক্লাব! কেমন মেঘ করে আস্‌ছে দেখ—আজ এখন বাড়ীতেই থাকো।’ একটু হেসে তাকালাম অলকার দিকে —পরণে ওর ছিলো আস্‌মানী নীল শাড়ী—পাড়ে অল্প জরী। আল্‌গা খোঁপায় দুটো চাঁপা। কাজল পরা ওর অভ্যেস আছে—কালো চোখদুটোয় মেঘের ছায়া পড়েছে। আব্‌দারের ভ্রূভঙ্গীতে বড় চমৎকার মানাচ্ছিলো ওকে। গাড়ীটা তুলে দিয়ে ফিরে এসে বসলাম কাঁচের শার্সি-দেওয়া বারান্দার ধারে। ওঘরে খোকন ঘুমোচ্ছে—বৃষ্টির জল টপ্‌টপ্‌ করে পড়ছে গ্যারেজের করোগেটের ছাদের উপর। অন্ধকারে পাশাপাশি বসেছিলাম দু'জনে—ওর নরম হাতটা ছিলো আমার মুঠির ভিতর। কতক্ষণ এভাবে বসেছিলাম জানি না—নীরবতা মুখর হয়ে উঠেছিল সে এক অপূর্ব গভীর অনুভূতিতে। হঠাৎ একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের শব্দে চম্‌কে উঠলাম, ‘কি হলো অলকা?’ আশ্চর্য হয়ে তাকালাম ওর দিকে।—‘কিছু না’। অল্প হেসে মুখ লুকালো ওঃ ‘একদিন ভাব্‌তাম আর বুঝি কোনওদিন সুখী হবো না—কিন্তু এখনকার এ সুখের কি তুলনা আছে! সে সব ছেলেমানুষির কথা ভাবলেও এখন হাসি পায়......’ অলকার কথা শুনে ওর প্রতি স্নেহ-ভালোবাসায় আমার মন যেন আরও ভরে উঠলো। বল্‌লাম, ‘সত্যি অলকা, তুমি সুখী হয়েছো?.. কিন্তু... কিন্তু কি তোমার দুঃখ ছিলো?’ প্রশ্নটা করেও যেন লজ্জা পেলাম—কি প্রয়োজন ছিলো এভাবে অলকার অতীতের কোন্‌ তুচ্ছ এক দুর্বলতার কথা স্মরণ করিয়ে ওকে বিব্রত করায়? কিন্তু অলকা বিশেষ বিব্রত হলো না. খিল্‌খিল্‌ করে হেসে বল্‌লো, ‘সে কলেজ লাইফে যেমন রোমান্সের সন্ধান পাবার চেষ্টা সবাই করে, তেমনি গো। ক্লাশে একটি ছেলে খুব স্মার্ট ছিলো—তাকেই এ্যাড্‌মায়ার করতাম—উঃ, কলেজ ছাড়বার সময় যা কান্না পেয়েছিল, এখন কিন্তু তার মুখখানিও ভালো করে মনে নেই.....।’ যে বাদল সন্ধ্যা একটু আগে আবেশে ভরে দিয়েছিল, এখন যেন কেমন তাকে হঠাৎ একঘেয়ে মনে হতে থাকে। ক্লাবে গেলেই হোতো..... মিছিমিছি একটা সন্ধ্যার ব্রিজ্‌ নষ্ট হয়ে গেলো। অলকা হয়তো ভাব্‌তেও পারেনি......কিন্তু আমার মনের মধ্যে হঠাৎ কোথা থেকে কি একটা এসে ভর করলো। ছি, ছি, ছি, নিজের মনকেই ধম্‌কাই..! এরকম তো কত হয়—নিজেও তো বিয়ের আগে যে দু' একজন মেয়ের প্রতি দুর্বলতাবোধ না করেছি তাও তো নয়, কিন্তু আমার জীবনে তাদের তো আজ এতটুকু ছায়াপাতও নেই। তবু..... কোথায় যেন একটা খিঁচ্‌খিঁচ্‌ করে বেঁধে, কিন্তু পাছে অলকার কাছে তার এতটুকুও প্রকাশ হয়ে যায় সে ভয়ও আসে। কি ভাব্‌বে অলকা—তার শিক্ষিত স্বামীর কাছে ঔদার্যের এতটুকু অভাব তো সে ভাবতেও পারে না।

“বাংলাদেশের বাইরে মানুষ হয়েছে অলকা—বিকেল-বেলা ঘরে আসার অভ্যেস নেই ওর। আমিও পছন্দ করি না—আমার ইচ্ছেমতই ও বিকেলে বেড়াতে যেতো, ফিরতো সন্ধ্যের পর। যেদিন আমি তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরতাম সেদিন হয়তো একসঙ্গেও বেরোতাম। অলকা কতদিন একা বেড়াতে বেরিয়েছে—কিছুই মনে হয়নি,—

এখন যেন কেমন আমার ওটা আর ভালো লাগে না—এ ভালো না লাগার পক্ষে যুক্তিও খুঁজে পাই না। প্রায়ই চেষ্টা করি অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরবার। কিন্তু কাজের চাপে সবসময়ে হয়ে ওঠে না। এইরকম টানা-পোড়েন চলে—আমার বাইরের ব্যবহারে পাছে আমার মনের এই নোংরামিটা প্রকাশ পায়, ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকি। এরপরেই হঠাৎ আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। বুকে ভয়ানক হাঁফ ধরলো। ডাক্তার এলেন, কিন্তু তিনি হাঁফানির কোনও কারণই খুঁজে পেলেন না। ফুস্‌ফুস্‌ আমার বেশ সুস্থ, অথচ হাঁফানিটাও প্রচণ্ড। এক্স-রে করানো হ'ল এবং আরও নানারকম ট্রিট্‌মেন্ট চললো। প্রায় মাসখানেক অফিস কামাইয়ের পর আমি সুস্থ হলাম। এই একমাস অলকা আমার সেবা করেছে অক্লান্ত-ভাবে। যেদিনই একটু ভালো বোধ করেছি ওকে বলেছি 'যাও একটু বাইরে বেড়িয়ে এসো।' কিন্তু ও শুধু হেসেছে, 'তুমি একেবারে সুস্থ হয়ে ওঠো তারপরে ওসব কথা।' এই অসুখে আমার একটা মন্দের ভালো হ'ল। সেই বিশ্রী সন্দেহটা আর চেতন-মনের কোথাও রইলো না। যাক্‌ কি বলছিলাম—সুস্থ হয়ে প্রথম যেদিন অফিসে বেরোলাম—দুজনেরই বড় খুশী লাগছিলো—একটা গুমোট্‌ আবহাওয়া কেটে গেলো। কিন্তু তখন তো জানতাম না! অফিসে বিকেলের দিকে আবার এলো সেই হাঁফ, তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলাম। অত তাড়াতাড়ি গাড়ী ঢুক্‌তে দেখে ছুটে এলো অলকা। বাইরে বেরোবার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছিলো ও, খোকনের পেরাম্বুলেটারটাও বাগানে বের করা রয়েছে। আমার মুখচোখের অবস্থা দেখেই চমকে উঠ্‌লো। আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলো। বাইরে বেরোবার কাপড়টাও ছেড়ে ফেল্‌লো।

"চল্‌লো এই নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সারাদিন বেশ থাকি, অফিসও করি, কিন্তু অফিস থেকে ফিরে সন্ধ্যে-বেলায় ঐ দারুণ কষ্টকর হাঁফ ধরে। অলকার আর কোনওদিন এতটুকু বাইরে বেরোবার উপায় থাকে না। ওর কষ্ট দেখে আমারও কষ্ট লাগে; বলি, 'এখন তো এ' রোজের রোগ হয়ে গেছে অলকা, আমি না হয় নিজে নিজেই মালিশ করবো, আর কিছু দরকার হলে মদন তো আছেই, তুমি অন্ততঃ আধঘণ্টার জন্যও কোথাও থেকে ঘুরে এসো।

"এইভাবে বেশ কয়েকমাস কেটে যায়—বড় বড় ডাক্তার দেখানো হয়, কিন্তু অসুখ সারে না। ইতিমধ্যে অলকার ভাইপোর অন্নপ্রাশন গেছে, বোনের বিয়ে উপলক্ষ্যে ওর ভাইয়েরা নিতে এসেছে, কিন্তু ও শুধু আমার কষ্টের কথা ভেবেই যায় নি। দিনের পর দিন একটা অদ্ভুত রোগীকে নিয়ে ওর যে কি কষ্টে কেটেছে!' বাইরে ঝরো ঝরো বৃষ্টির ধারা, ভিতরে দাম্পত্য প্রণয়ের ব্যর্থ কাব্য। নীরবেই শুনে যাচ্ছিলাম ভদ্রলোকের কথা। স্বল্পক্ষণ থেমে পুনরায় তিনি আরম্ভ করলেন—'তবু এ' অবস্থাটাও সহ্য হয়ে আস্‌ছিলো—কিন্তু এইসঙ্গে খোকনও আবার জ্বরে পড়লো। ডিপ্‌থিরিয়া—অবস্থা সঙ্কট দেখে আমার বোন মিনুকে শ্বশুরবাড়ী থেকে আনালাম। তিনদিনের জ্বরে আমাদের সোনার খোকন চলে গেল। এরপর তাকাতে পারিনি আমি অলকার দিকে। আমি পুরুষমানুষ—আমার বাইরের বৈচিত্র্যের মাঝে শোক ভুলে থাকবার অবকাশ আছে, আর অলকা? মিনু এসে আমাকে বললো, 'দাদা, বৌদিকে না হয় একবার বাপের বাড়ীই পাঠিয়ে দাও। এখানে চারদিকে খোকনের স্মৃতির মাঝে ও পাগল হয়ে যাবে।' আমিও ভেবে দেখলাম—সত্যিই ওকে কিছুকালের জন্য অন্ততঃ এই বাড়ীর বাইরে নিয়ে যাওয়া উচিত। পাঠানোই ঠিক হয়ে গেলো, অলকাও দেখলাম মনে মনে একটু যেন শান্তি পেলো—হয়তো ছোট ছোট ভাই-বোনেদের মাঝে খোকনকেও ও পাবে।

"পরদিন সকালে ওর যাওয়ার সব ঠিকঠাক, স্যুটকেশ গোছানোও হয়ে গিয়েছে। বাইরে ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে, হঠাৎ আমার বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠ্‌লো, সর্বনাশ আজ কি আবার সকালেই সুরু হবে নাকি? অনেকক্ষণ কষ্টে চেপে থাকলাম, কিন্তু তারপর আর পারলাম না। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়তে হোলো। অলকা আর মিনু ট্যাক্সি ফেরৎ দিল। মিনু আমার ঘরে এলো, কিন্তু অলকাকে দেখতে পেলাম না। সমস্ত দুপুরও ও এলো না, মিনু বললো, 'পাশের ঘরে শুয়ে আছে, হয়তো খোকনের জন্য কাঁদছে।' সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ ওঘর থেকে আবার ছুটে এলো মিনুঃ 'দাদা, বৌদিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

"লাফিয়ে উঠলাম বিছানা ছেড়ে। —'সে কি?' মিনু আমার হাতে একটা খাম দিল, ভিতরে একটুক্‌রো কাগজঃ 'কোথায় চলেছি আমি নিজেও জানি না, তবে এখানে তোমার ঈর্ষা ও সন্দেহের আবহাওয়ায় আর আমি থাক্‌তে পারছি না। আমার খোঁজ করলেও পাবে না।"

এই পর্যন্ত বলে আমার সহযাত্রী বাইরে দূরের দিকে

চেয়ে রইলেন, সে দৃষ্টি তখন সেই পেছনের দিনগুলোর দিকে।

উৎকণ্ঠায় কৌতূহলে আমার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এলো—'তারপর?'

"তারপর? সেদিন থেকে আমার হাঁফানি একদম ভালো হয়ে গেল।"—ব'লে পাশ্বর্-পরিবর্তন ক'রে একেবারেই চুপ ক'রে গেলেন আমার সহযাত্রীটি। বাইরের বর্ষার মতই বোধ করি তখন তাঁর মনের ভিতরটাও ভিজে স্যাঁত্‌সেঁতে হ'য়ে উঠেছে! এমন মুহূর্তে আর কি সত্যিই কিছু বলা চলে?

মা

শ্রীমতিলাল দাস

মনে আজি পড়ে কত কথা—
মাগো ক'রেছি কত উৎপাত
আবদার দিনরাত,
সব গেল চুকে;
যত কিছু ভালমন্দ
অবোধ সন্তানের তবু সর্বজ্বালাতন
ক্ষমিয়াছ হাসিমুখে ধৈর্য্যময়ী মাতার মতন।

যখনি হয়েছি রোগাক্রান্ত
হেরিতাম আঁখি তব অশ্রুভারাক্রান্ত,
ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জেবলে;
বন্দি ফলফুল দলে
বিশ্বের চরণপদ্ম নমি ভক্তিভরে
নিবেদিতে সুধাস্নিগ্ধস্বরে,
মোদের মঙ্গলতরে
অতৃপ্তকামনা।

সবার দুঃখে হতে দুঃখী
সবার সুখে হ'তে সুখী,
সবার আনন্দে হ'তে আত্মহারা,
মাগো, চলে গেলে আজি অনন্তধামে
আমরা হ'লাম মাতৃহারা।

শ্রান্তজনের শিয়রে বসিয়া,
তব করপল্লব দিতে বুলাইয়া
তুমি মিষ্টভাবে, দিতে কত সান্ত্বনা
আজি তা' হতেও হলাম বঞ্চনা।

মনে যা ছিল হ'ল না বলা,
রয়ে গেল কিছু বাকী;
হলে জ্ঞানহীন কাটিল একদিন
বন্ধ হইল নাড়ী।

মা বলিতে প্রাণ হয় উচাটন,
চোখে আসে জল ভরে;
আজ হ'তে তোমায় হারালাম বুঝি
চিরজীবনের তরে।

আর বৃথা খুঁজে ফিরিব না,
বৃথা শোক-অশ্রু বর্ষিব না;
সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ, সত্যশিব সুন্দর যিনি
তিনি নিয়েছেন তোমায় কোলে টানি।

সর্বশেষে, শুধু এই ভিক্ষা মাগি—
যেন তব আশীষে
সত্যকে না করি সংশয়,
দুঃখকে করিতে পারি জয়;
ধর্মপথে মতি রয়
জীবন কন্টক পথে একাকী।
আজি লহ মোর অন্তরের শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলী।

সাহিত্যে প্রথম-পুরুষের স্থান

মঞ্জু মুখোপাধ্যায়

ডিসেম্বরের শীত-বিড়ম্বিত বিষন্ন ম্লান সন্ধ্যায় এলজিয়ার্সের একটি 'কফি গ্রীলের' এককোণে ব'সে আঁদ্রে জিদকে অস্কার ওয়াইল্ড জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"তুমি তো একজন অতিমাত্রায় ব্যক্তিতান্ত্রিক লোক, কিন্তু সাহিত্যে প্রথম পুরুষের স্থান কোথায়?" জিদ তখন কফির বদলে চুমুক দিচ্ছিলেন অন্য একটি পদার্থে। সন্ধ্যার রঙটি মেঘ আড়াল করায় জমেছিল তাঁর গ্লাসের কানায়। সেই দিকে চেয়ে জিদ বললেন, "শিল্পসৃষ্টির সমস্ত ব্যাপারটাই ত' প্রথম পুরুষের কাজ, দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষের স্থান এখানে নেই, There is only first person singular in art."

সাহিত্যের 'সজ্জন সমাজে' অপাংক্তেয় জিদের উত্তর দেওয়ার সময়টিকে স্মরণ করে অনেকেই নাসিকা কুঞ্চিত করেন, কিন্তু তাঁকে উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করতে কেউ পারেন নি। তাই তাঁর অনুবর্তী সাহিত্যিক-সমাজ তাঁর কথাকে মেনেই নিয়েছেন।

বস্তুতঃ সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টির ব্যাপারটাই ব্যক্তিগত একটা সুদৃঢ় উপলব্ধির প্রকাশ। সাহিত্যে তখনই আনন্দ পাই, যখন দেখি তার মধ্যের কথাগুলোয় রয়েছে ব্যক্তি-মনের পরিচয়। লেখকের ভাবদৃষ্টি হৃদয়ে এমন একটি তন্ত্রীতে আঘাত করে যে, তার মীড়গুলিই অনুরণন তুলে নেয় অন্তরে। সেখানে প্রথম পুরুষ ছাড়া আর কেউ নেই। এই প্রথম পুরুষের মাধ্যমে গীতি-কবিতা অনবদ্য হয়ে উঠে। এই ব্যক্তিগত ভাবময়তার যেখানে অভাব, সাহিত্য সেখানে হয়ে উঠে নির্জীব এবং প্রাণহীন—অগভীর! জীবনের ছাপ সেখানে থাকে না। প্রত্যেক সৃষ্টির পিছনে থাকে স্রষ্টার এই ভাবদৃষ্টি। সার্থক সৃষ্টি তাই ব্যক্তিমননের পরশে সিক্ত। এই ব্যক্তিমননের ফলে সাহিত্যে আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পায় না, পায় একটি গভীর এবং তীব্র তীক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ।

এমন একদিন ছিল যেদিন মানুষ সাহিত্যে 'আমি'র ব্যবহার করতেই ভয় পেত। সেযুগের মানুষের স্বতন্ত্র কোন জীবনদর্শন ছিল না। তারা সমাজের নির্দিষ্ট ধারায় চিন্তা করত, কল্পনা করত, আর নিঃশেষে নিজেকে সেই ধারায় বিলুপ্ত করতে পারলেই স্বস্তি পেত। তাই তাঁদের রচনায় নিজের নামটি দিতেও তারা সঙ্কোচ অনুভব করত। তাই সেযুগের সাহিত্যে কোন বিশেষ মন ফুটে উঠত না, বিশেষ ভাবদৃষ্টি স্থান পেত না। একটি সম্পূর্ণ বাঁধাধরা নিয়মবন্ধ ধারায় কল্পনা প্রসার করেই কবিকে ক্ষান্ত হতে হতো। সেযুগের কবি ভাবতেই পারত না "আমি ভাবছি, আমি দেখছি, আমি ভালবাসছি—এসবই আমার একান্ত আপন সৃষ্টি—একে জানানতেই আমার সৃষ্টির সার্থকতা।"

এই ভাবের ধারাবাহিক সমষ্টিগত চিন্তাধারায় মানুষ তৃপ্তি পায়নি। তাই ক্রমে জেগেছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। সে ব্যক্তিমন নানা পরোক্ষ উপায়ে আত্মপ্রকাশ খুঁজেছে। গীতি-কবিতায় এই প্রকাশ বহুলাংশে আপনার পথ খুঁজে নিয়েছে। এই ব্যক্তিগত ভাবদৃষ্টির জন্যই সাহিত্যেরও বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে। 'এই রসের সন্ধানেই সাহিত্যিক গিয়ে শেষে পৌঁছেছে 'রম্য-সাহিত্যে' বা 'রচনা-সাহিত্যে' —যেখানে ব্যক্তিমন আপন খুশীতে কথার জাল বুনে যাচ্ছে পাঠকের মনে। মানুষ সবসময় তার নিজের কথা বলতে চায়, তার উপলব্ধি জানাতে চায়। যেখানে আঙ্গিকের নিয়ম এবং বন্ধন থাকে, সেখানে মন স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত হয় নিজেকে একান্তে প্রকাশ করতে। সে চায় উন্মুক্ত এবং নির্জন একটি স্থান, যেখানে তার পাঠককে সে একান্তে পেতে পারে। রম্য-সাহিত্যে এই সুদুর্লভ সুযোগ। তাই জীবনের বিচিত্র রঙ সেখানে বুনে যায় বহুবর্ণের ছবি। সেখানে বলার বিষয় হয়ত অতি সাধারণ, কিম্বা অতি নগণ্য, কিন্তু তার পিছনে থাকে আসল কথা—নিজের অন্তর-দুয়ার খুলে দেওয়া। তার বক্তব্যবিষয় সে নিজেই, "Reader! myself am the matter of my book".

আত্মপ্রকাশের এই প্রচেষ্টায় প্রকাশ পায় না 'অহং'বোধ বা আত্মগরিমাঃ এ জীবনের প্রথম এবং প্রধান বৃত্তি। অতি সহজ এবং স্বাভাবিকভাবেই তা জমে উঠে অন্তরে —অথচ এই অকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়েই বৃহৎ জীবনের অনু-প্রেরণা আসে। বার্ণাড শ'এর ভাষায় এ হচ্ছে—

'Life's incessant inspiration to higher organisation, wider, deeper, intenser, self-consciousness, clearer self-understanding'। আত্মপ্রকাশের এই উন্মুখতাই মানুষকে নিয়ে চলেছে তার জীবনতীর্থের দুর্গমপথের লক্ষ্যে। সাম্প্রতিক সাহিত্য যার মধ্যে গণ-চেতনা বা শ্রেণী-চেতনাই প্রধান উপাদান, সেখানেও এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে। শ্রেণীর উপলব্ধির প্রকাশের মধ্য দিয়ে কবি বা সাহিত্যিক তাঁর নিজের কথাকেই বল্‌ছেন। তাঁর বলার ভঙ্গীর মধ্য দিয়েই ফুটে উঠছে তাঁর স্বাতন্ত্র্য। সুতরাং সাম্প্রতিক সাহিত্যে ব্যক্তিমনের পরিচয় নেই বল্‌লে ভুল বলা হবে। কবি যখন বলেনঃ—

"জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ,
আমিতো জীবন্ত প্রাণ আমি এক অঙ্কুরিত বীজ
মাটিতে লালিত, ভীরু শুধু আজ আকাশের ডাকে,
মেলেছে সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।"

অথবা

"আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে
আমার বিস্ময় জাগে—নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে—"

তখন ব্যক্তিমনই তো প্রকাশ পায় তীক্ষ্ণ এবং তীব্ররূপে। যদিও একথা এ যুগের শ্রেণীরই—তবুও কবির মননশীল জীবনদর্শনটিই আগে চোখে পড়ে।

শুধু সাহিত্যে নয়, সমগ্র শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারটাই এই 'প্রথম পুরুষের' লীলাক্ষেত্র। আপন মনের মাধুরী মিশায়ে যা সৃষ্টি হয় না, তা সত্যিকারের সৃষ্টি নয়। শিল্পক্ষেত্রে সে প্রবেশের অধিকার পায় না। সাম্প্রতিক কয়েকজন সাহিত্যিক এই ব্যক্তিমনের প্রাধান্যকে দোষনীয় মনে করেন। এতে সৃষ্টির মূল কথাটাকেই অস্বীকার করা হয়। আপন মনের প্রকাশ ফুটে না উঠলে সাহিত্য বা শিল্প—প্রাণহীন এবং অর্থহীন।

জিদের কথাই তাই স্মরণ করি—"There is only first person singular in art."

বন্দর

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

অনেক চলার শেষে শঙ্কিত অন্তরে
তোমার বন্দরে,
অবশেষে ভেড়ালাম তরী
বাঁচি আর মরি।
অগাধ সাগর জলে শুধু ফিরে ফিরে
কামনার লবণাক্ত তীরে,
কেটে যাওয়া ব্যর্থ নিশিদিন—
জীবন করেছে হায়
করুণ মলিন।
এলো-মেলো কত ঝড় এলো
তারা এসে শুধু দিয়ে গেলো,
অকরুণ পরিহাসে,
ভাঙ্গা হাল ছেঁড়া পালখানি।
তখন কি জানি
তোমারো বন্দর আছে—আরো আছে
নিবিড় আশ্রয় ঃ
যেখানে জীবনতরী
রূপে, রসে সম্ভাবনাময়।
হৃদয়ের অঙ্গীকারে, নূতন স্বাক্ষরে
তোমার বন্দরে এসে দাঁড়ালাম,
পাল ছেঁড়া হালভাঙ্গা তরী
অবশেষে তাই ভেড়ালাম।

রাম রহিমঃ গল্পগ্রন্থ। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা। মূল্য—আড়াই টাকা মাত্র।

বিশ্ব-সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্প আজ একটা বিশেষ ঐশ্বর্যের মধ্যেই রূপময় হইয়া উঠিয়াছে। নতুন টেক্‌নিক ও ফর্মে ইহা শুধু ঔজ্জ্বল্য-লাভই করে নাই, বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যবিধানেও বাংলা ছোট গল্প আজ একটা বিশেষ দিকের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। সেই পথটি হইতেছে বস্তুতন্ত্রবাদ। বস্তুনিষ্ঠ কথাশিল্পী শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহার একটি বিশেষ উদাহরণ। শান্তিবাবুর রচনা-শৈলীর প্রধানতম গুণ হইতেছে এই যে, অত্যন্ত সহজ কথায় বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করিয়া তাহা পাঠকের চিত্তে চিন্তার প্রবাহ আনিয়া দেয়। 'রাম রহিম' গ্রন্থে অন্যূন ছোটবড় ৬টি গল্প স্থান পাইয়াছে। তাহাতে বৃহত্তম রাষ্ট্রের দিক হইতে সুরু করিয়া সামান্যতম গ্রাম্য পরিবেশ পর্যন্ত বিভিন্ন নরনারী ও ঘটনাসংস্থান নতুন ব্যঞ্জনায় রূপ পরিগ্রহ করিয়া উঠিয়াছে। ইতিপূর্বে আমরা লেখকের 'রাত্রির আকাশে সূর্য' গল্পগ্রন্থ পড়িয়াছি, কিন্তু প্রকাশব্যঞ্জনায় ও চরিত্রসৃষ্টির মাধুর্যে 'রাম রহিম' লেখকের পূর্বতন গ্রন্থাপেক্ষা অনেক বেশী আবেদনধর্মী ও শিল্পগ্রাহ্য। লেখকের এই ক্রমোন্নতি তাঁহার ভবিষ্যতেরই জয়ের সূচনা করিবে।

নাট্যকারঃ নাটক। শ্রীঅরুণ চক্রবর্তী। উত্তরায়ণ লিমিটেডঃ ১৭০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা মাত্র।

প্রচলিত যে সমস্ত নাটকের সঙ্গে আমরা সচরাচর পরিচিত, আলোচ্য নাটকখানি তাহা হইতে একেবারেই স্বতন্ত্র। বর্তমানের স্খলিত সমাজের সামনে একটা সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ সামাজিক আদর্শ তুলিয়া ধরিবার জন্যই এই নাটকখানি বিশেষভাবে রচিত। নাট্যকার শ্রীঅরুণ চক্রবর্তী গ্রন্থখানি সম্পর্কে কিছুটা ভূমিকার অবতারণা করিয়া বলিয়াছেনঃ 'নাট্যকার' সাধারণ শ্রেণীর নাটক নয়—নাট্যকার নাটকে প্রধানতঃ একটি চরিত্র—নাট্যকার। নাটকটি তাঁর স্বপ্ন, এ স্বপ্নের মূলে আছে আজকের জগৎ—তাকে বুঝতে দেরী হবে না। কিন্তু নেই ঘটনাসংঘাত, যা নাট্যকার চরিত্রটিকে ক্রমপরিণতির দিকে নিয়ে চলে—এটা তাঁর চিন্তাধারার রূপক প্রকাশ। সমাজের কয়েকটা খণ্ড চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা প্রকাশিত হ'য়েছে।'.

অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। এই জাতীয় আদর্শকে সুস্পষ্টভাবে রূপ দিতে হইলে প্রয়োজন মঞ্চাধিকারীদের সহযোগিতা। কলিকাতার কোন রঙ্গমঞ্চে এ নাটক অভিনীত হইলে বিশেষ একটা সমাজকল্যাণকর আদর্শই পালন করা হইবে বলা চলে। নাট্যকারের নাট্যশক্তি প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না।

(ক) বিদিশা, (খ) ঘোড়া কর ভগবানঃ কাব্যগ্রন্থ। আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। পরিবেশক—ডি এম্ লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে দেড় টাকা ও দুই টাকা মাত্র।

কবি আনন্দগোপালের কবিতায় একসঙ্গে রোমাণ্টিসিজম্' ও 'মিষ্টিসিজম্' এবং 'স্যাটায়ারের' অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। কিন্তু প্রকাশ-ব্যঞ্জনার এই দুইটি ধারাকে কোথাও তিনি এক করিয়া প্রকাশ করেন নাই। ইহাতে একদিকে যেমন কবিতাগুলির স্বাজাত্য রক্ষা পাইয়াছে, অন্যদিকে তেম্‌নি কবির বিভিন্নমুখী শক্তির পরিচয় কোথাও এক যায়গায় আসিয়া গোলকধাঁধার সৃষ্টি করে নাই। 'বিদিশা'য় রোমাণ্টিসিজম্ ও মিষ্টিসিজ্‌মের যে অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, তাহা কেবল উৎকর্ষবাচকই হয় নাই, অনুভূতির ক্ষেত্রেও দীপ্তিমান। অন্যদিকে 'ঘোড়া কর ভগবান'-এ তেম্‌নি যে স্যাটায়ারের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা শুধু স্যাটায়ারের মধ্যেই বিলীন হইয়া যায় নাই, সমাজের প্রতি একটা তীক্ষ্ণ শ্লেষও তাহার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এইরূপ শ্লেষ এককালে রসরাজ অমৃতলালের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। এই শ্লেষ ছাড়া যেন কবিতাগুলিকে নিতান্তই মনের জড়ত্বের অভিব্যক্তি বলিয়া মনে হইত। কবি আনন্দগোপাল সেই জড়ধর্মের উর্ধ্বে উঠিয়া পাঠককে শুধু আনন্দই দান করেন নাই, নিজেকেও দান করিয়াছেন।

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা দিবস

১৫ই আগষ্টের স্বাধীনতা-দিবসটিকে আজ আমরা আবার '৫২ সালের পরিপ্রেক্ষিতে অবলোকন করিলাম। প্রতি বৎসরই এই বিশেষ দিনটির প্রতি আমাদের ব্যাকুল

মহাত্মাজী

দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া আসিয়াছি। এমনি করিয়াই দেখিতে দেখিতে পাঁচটি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। এই বিশেষ দিনটির বিজয়-সূচনাকে কেন্দ্র করিয়াই গত সত্তর বৎসরেরও অধিককাল দেশের শত সহস্র সন্তান ইংরেজ-যূপকাষ্ঠে বলি হইয়াছেন। তাঁহাদের সেই নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের ভিত্তিতেই এদেশের আকাশ হইতে ইংরেজ-সূর্য অস্ত যাইতে বাধ্য হইল। ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজ-শাসনের অবসান ঘটিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ইংরেজি আচার-নীতি রাতারাতিই বদ্‌লাইল না। দেশ স্বাধীন হইল সত্য, কিন্তু দেশকে নানাভাগে খণ্ড ছিন্ন করিয়া তবে স্বয়ংশাসিত-অধিকার আসিল। ইহার জন্য জাতি কি সত্যই প্রস্তুত ছিল? এই প্রসঙ্গে আধুনিক কালেরই দুইজন সর্বভারতীয় নেতার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। একজন চাহিয়াছিলেন—দেশকে তাহার অখণ্ড সত্তায় স্বাধীনতার সূর্যরাগে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে। তাহার জন্য মৃত্যু-বরণেও দুঃখ নাই। তিনি আমাদের দেশগৌরব নেতাজী সুভাষচন্দ্র। আর একজনও দেশের স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন—সে স্বাধীনতা ইংরেজের সঙ্গে আপোষ করিয়াই আসুক অথবা দেশ নানাভাগে বিভক্ত হইয়াই আসুক। তিনি আমাদের আজকের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। দুইজনের জীবন-দর্শনে কত পার্থক্য, অথচ লক্ষ্য এক। সুভাষচন্দ্রের সেই অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন কবেই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। সমগ্র দেশ এক অখণ্ড প্রাণসত্তায় জাগিয়া উঠিবে, সম্প্রদায়-নির্বিশেষে দেশের মানুষ এক নতুন জীবন-বেদে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিবে, এই ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শ। কাল-বিবর্তনেই হউক বা রাষ্ট্রনৈতিক জটিলতাতেই হউক, তাঁহার সেই আদর্শ বাস্তবে রূপ পায় নাই। পণ্ডিতজীর যে আদর্শ, তাহাও অখণ্ড ভারতীয় সত্তার উপরেই ভিত্তি-শীল ছিল, তিনিই একদিন পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তুলিয়া বৃটিশ-চিন্তাশক্তিকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু কালের পরিবর্তনে পণ্ডিতজীর আদর্শও পরিবর্তিত হইতে বাধ্য হয়। ফলে স্বাধীনতার রক্তরাগে দেশ যে রূপ পরিগ্রহ করে—তাহা আজ আমরা প্রাত্যহিক জীবন

নেতাজী

দিয়াই উপলব্ধি করিতেছি। ইহাতেও ভারতের আজ অতৃপ্ত হইবার কারণ নাই, কারণ রাজনীতির অমোঘ অনুশাসন না মানিয়া লইয়া উপায় কি? গুরুর মতো,

পিতার মতো যিনি নেতাজী ও পণ্ডিতজীকে নবজীবনে দীক্ষা দিলেন, তিনি ছিলেন ভারতপুরুষ মহাত্মা গান্ধী। খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতের স্বাধীনতা কিন্তু তিনিও কামনা করেন নাই। ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা-দিবসে অন্তর্বেদনায় তাঁহার দুই চক্ষু নিমিলিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি জানিতেন—এই স্বাধীনতার অর্থ কি? সেই অর্থটিই আজ আমরা ভারতীয় সংবিধানের শব্দকোষ ঘাঁটিয়া প্রতিমুহূর্তে উপলব্ধি করিতেছি। উপলব্ধি করিতেছি—স্বাধীন দেশের স্বাধীন সন্তান হইয়াও আজ

পণ্ডিতজী

আমরা কত দীন, কতখানি নিঃস্ব! আজ আমাদের পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, দেহে স্বাস্থ্য নাই, শিক্ষা নাই। সব চাইতে আরও বেদনার বিষয় এই যে, আত্ম-বোধের দ্বারা আজও আমাদের চিত্তশুদ্ধি ঘটিল না। ১৫ই আগষ্টের এই স্বাধীনতা-দিবসটিকে প্রতি বৎসর সরকারীভাবে সত্রযজ্ঞ ও শুদ্ধি হিসাবে পালন করিবার রীতি চলিয়া আসিতেছে সত্য, কিন্তু এই পাঁচ বৎসরের অবকাশে দেশের নেতৃবৃন্দ এবং জনগণের এমন কি চিত্ত-শুদ্ধি ঘটিয়াছে—যাহার ফলে দেশ প্রাণবন্যায় নৃত্য করিয়া উঠিতে পারিয়াছে। বরং সর্বদিক হইতেই কেমন একটা বীভৎস অধোগামীতা ও হীনমন্যতা সমগ্র দেশটাকে ক্রমান্বয়ে গ্রাস করিয়া বসিতেছে। মানুষের হৃদয়ের যে পরিবর্তন হইলে দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সম্ভব হইয়া উঠিতে পারিত, যে-পরিবর্তনের অভিযানে দধীচির মতো গান্ধীজী তাঁহার অস্থি-মজ্জা বিসর্জন দিয়া গেলেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবন প্রচ্ছন্ন কুয়াশায় ঢাকা পড়িয়া গেল—কোথায় সেই পরিবর্তনের আভাষ? দেশের হৃদয়ের সেই নিভৃত প্রকোষ্ঠে একবারও কি আমরা প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছি? দেখি নাই। দেখি নাই বলিয়াই স্বাধীনতা আমাদের গৃহলক্ষ্মী হইয়াও বারবধূর ন্যায় সে আমাদের বহির্দুয়ারে দণ্ডায়মানা। তাহাকে গৃহে তুলিয়া উলু-ধ্বনি দিয়া তাহার পা দুইখানিকে আলতা-রাগে রাঙাইয়া দিতে পারি নাই। এই অক্ষমতা লইয়াই আমরা আজও চলিয়াছি।

কিন্তু জাতির এই অক্ষমতা কি স্বাধীনতাকে অধিক-কাল রক্ষা করিবার পথে যথোপযোগী? তাহার জন্য একদিকে যেমন দল ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে একযোগে কাজ করিয়া যাইবার প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন আত্মশক্তি, ঐক্য ও চিত্তশুদ্ধির। আত্মশক্তি ভিন্ন কোনো জাতি ইতিহাসের উজ্জ্বল স্বাক্ষর হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, ঐক্য ভিন্ন কোনো জাতির মুক্তি নাই, চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন কোনো দেশ মনুষ্যত্বের অধিকারে মানবিক আদর্শ গড়িয়া তুলিতে পারে না। এই অত্যাবশ্যকীয় ত্রিধারার জন্য ১৫ই আগষ্টের স্বাধীনতা-দিবসে প্রয়োজন একযোগে সমগ্র জাতির প্রাণায়াম ও শপথ গ্রহণ, এবং সেই উদ্দেশ্য-সাধনের পথে একত্রে চলা। দুঃখের বিষয়, প্রচলিত বৎসরেও সেই পথটি ব্যর্থতার অন্ধকারেই আচ্ছন্ন রহিয়া গেল।

কলিকাতায় হাঙ্গামা

সম্প্রতি কিছুকাল পূর্বে সুন্দরবন ও নদীয়া জেলার কোনো কোনো অঞ্চলে যেভাবে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটে, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গ-অধিবাসীরা কেহ নীরব থাকিতে পারে নাই। দুর্ভিক্ষ -সম্পর্কে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যথাসময়েই কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইহারই ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী জনাব রফি আহমদ কিদোয়াই কলিকাতায় আসিয়া দুর্ভিক্ষ-অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ দর্শন করেন এবং পরে এই মর্মে এক বিবৃতি দান করেন যে, কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চল-সমূহের খাদ্য-ব্যবস্থার ভার কেন্দ্রীয় সরকার স্বহস্তে

গ্রহণ করিলেন এবং ঘাট্‌তি অঞ্চলসমূহে যাহাতে অধিকতর খাদ্য-ব্যবস্থা চালু হয়, তজ্জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অবিলম্বে অতিরিক্ত চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতেছেন। এজন্য খাদ্য-রেশনের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের মানুষদের জন্য বাড়্‌তি দোকান খুলিবারও ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু ইহাকেই যথেষ্ট মনে করিয়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বামপন্থী দলীয় নেতৃবৃন্দ সুখী ও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহারা সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করিয়া অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর চাপ দেন। চাপ দিবার কারণ যে না ছিল, তাহা নয়। দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করিয়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্বিকার-ভাবেই কাটাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন ; আর শুধু তাহাই নয়, ঠিক ঐ একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে মন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদের ক্রমবর্ধমান মাহিয়ানা ও সুরম্য বাস-স্থানের ব্যবস্থায় সংখ্যাগুরু কংগ্রেসী দল তথা গবর্ণমেণ্ট কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছেন। দেশ ও জাতির দিক হইতে এই অসাম্য লক্ষ্য করিয়াই সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি উহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য পরিষদ-ভবনের সামনে সমবেত হইলে পুলিশ তাহাদের উপর লাঠি-চার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে এবং সরকার পক্ষ হইতে বিধান পরিষদের অঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ কমিটি ঘোষণা করেন যে, ১৫ই জুলাই হইতে তাঁহারা খাদ্য অভিযান পরিচালনা করিবেন এবং যথাদিনে তাঁহারা ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া বিধান পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন ; ফলে পুলিশ তাহাদের যথাযথ কর্তব্য পালন করে।

সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ কমিটির খাদ্য অভিযান সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক প্রেস নোটে বলা হয়ঃ '১৪ই তারিখে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে বলেন যে, সরকার অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, কিন্তু আগামী বৎসরের পূর্বে কিদোয়াই-পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা যাইবে না। কারণ কলিকাতা এবং শিল্পাঞ্চলের জন্য গম ও চাউল সরবরাহ করিবার মতো অবস্থা ভারত সরকারের এখন নাই। ঐ বিবৃতিতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, ভারত সরকার এই বৎসর হইতেই কিদোয়াই-পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে সম্মত আছেন কিনা—তাহা তাঁহাকে জানাইবার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর নিকট তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটিকে কোনো প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইতে এবং বিনা বাধায় বাজেট আলোচনা চলিতে দিবার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিবৃতিতে তাঁহার শোভাযাত্রা বাহির করা এবং ১৪৪ ধারা অমান্য করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তিনি এই যুক্তি দেখান যে, উহার ফলে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় গম ও চাউল পাইতে রাজ্য সরকারের সুবিধা হইবে।'

কিদোয়াই-পরিকল্পনার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া ধার্য হয় আগামী ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাস হইতে। কিন্তু ইহার উপর আস্থা রাখিতে প্রস্তুত নয় প্রতিরোধ কমিটি। ফলে গবর্ণমেণ্টের বিস্তৃত আঞ্চলিক ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করিয়া তাঁহারা অভিযান চালাইয়া যান। ইহাতে বহু লোক পুলিশের হতে ধৃত হন এবং এমন কি বিধান সভার চারিজন সদস্য শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র জোয়ারদার, শ্রীনেপালচন্দ্র রায়, ডাঃ অতীন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীহেমন্ত-কুমার বসুও অভিযাত্রী বাহিনীর পরিচালকবর্গ হিসাবে গ্রেপ্তার হন। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে লীলা রায়, ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি, সুধা রায়, যতীন চক্রবর্তী, নরেন দাস প্রমুখ বিভিন্ন দলীয় নেতৃবৃন্দও ছিলেন। ইহার ফলে প্রতিরোধ-অভিযান কিন্তু নিরস্ত হইল না। ১৭ই জুলাই বিধান সভায় পাঁচ ঘণ্টাকাল উত্তাপহীন বিতর্কের মধ্য দিয়া চারিদিনব্যাপী পশ্চিমবঙ্গ বাজেটের সাধারণ আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটে। গত দুই দিবসের ঘটনার কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিয়া বিরোধী পক্ষ হইতে বলা হয় যে, ইংরাজেরা যেভাবে স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে পুলিশ লেলাইয়া দিয়াছিল, ডাঃ রায় যদি উহারই পুনরাবৃত্তি করেন ও অতীত অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভ না করেন, তবে সাদা চামড়ার শাসকদের মতো তাঁহাদেরও জনসাধারণ গদি হইতে নামাইয়া আনিবে। অপর এক সদস্য ভুখা মিছিল দমনে ডাঃ রায় যে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ডাঃ রায়কে 'মহাবীর চক্র' উপাধি দানের প্রস্তাব করেন।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিতর্কের জবাব দিতে উঠিয়া বলেনঃ 'পুলিশ বাবদ আমরা যে অর্থব্যয় করিতেছি, তজ্জন্য আমি আদৌ অনুতপ্ত নই। গত তিন দিনের অভিজ্ঞতায় আমি এই কথা বুঝিয়াছি যে, দেশে গুণ্ডামি মনোবৃত্তির লোক, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লোক ও রাষ্ট্রের

সাম্যাবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে চাহে, এমন লোক আছে এবং ইহাদের পুলিশের সাহায্যেই সংযত করিতে হইবে। পুলিশের খাতে আমরা এই উদ্দেশ্যেই অর্থব্যয় করিতেছি যে, যাহারা রাজনৈতিক নহে, যাহারা হাঙ্গামা সৃষ্টি করিতে চাহে না, পক্ষান্তরে যাহারা শান্তিতে ও স্বস্তিতে বসবাস করিতে চাহে, আমরা সেই বিরাট জনসাধারণকে রক্ষা করিব।'

পরিষদ ভবনে বসিয়া বিরোধী পক্ষকে এই উক্তি শুনিতে হইলেও অভিযাত্রী-বাহিনীর শ্রবণেন্দ্রীয় পর্যন্ত গিয়া তাহা পৌছায় নাই। বরং তাঁহাদের তরফ হইতে ১৭ই জুলাই কলিকাতা ও সহরতলীতে ব্যাপক হরতাল পালিত হওয়া সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই একটি ঘোষণা প্রচারিত হয়। ইহাতে উক্ত দিবস শিয়ালদা লাইনে ভোর হইতে স্বভাবতঃই কিছু ট্রেন-গোলযোগ ঘটে, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই সর্বাংশে হরতাল ঘটে নাই। পরে অভিযাত্রী বাহিনীর পক্ষ হইতে এতৎসম্পর্কে ঘোষণা করিয়া বলা হয় যে, হরতালের কোনো স্কীম তাঁহাদের ছিল না, উক্ত দিবসটি দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধ দিবস হিসাবে পালন করারই মাত্র ব্যবস্থা ছিল। এতদুপলক্ষে ময়দানে যে সভা আহূত হইবার কথা ছিল, ১৪৪ ধারা জারী থাকার ফলে তাহা হইতে পারে না। জনতা ও পুলিশের মধ্যে ইহা লইয়া পুনরায় সংগ্রাম হয় এবং পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস এবং প্রয়োজনবোধে গুলি ব্যবহার করে।

অবস্থা যখন এই পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন সাম্প্রতিক এই ঘটনা সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী জনাব রফী আহমদ কিদোয়াই হায়দরাবাদের এক সভা-কেন্দ্র হইতে ঘোষণা করিয়া বলেনঃ গত ১২ই জুন তারিখ হইতে পশ্চিমবঙ্গে নূতন খাদ্যনীতি নির্দ্ধারিত হয়। ঐ সময় দুর্গত অঞ্চলে সাহায্যদান এবং পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ খাদ্যনীতি সংশোধনের বিষয় বিবেচনা করিয়াই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঐ সময় দুর্গত অঞ্চলে খয়রাতি দান হিসাবে ৫ হাজার মণ চাউল ও ৫ হাজার মণ গম দেওয়া স্থির হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তৎক্ষণাৎ ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করেন এবং ইহাও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন যে, প্রয়োজন হইলে তাঁহারা আরও গম ও চাউল সরবরাহ করিবেন। দ্বিতীয় ব্যবস্থায় তখন এইরূপ প্রস্তাবিত হইয়াছিল যে, সুলভ মূল্যের দোকানে ১৫৲ টাকা মণ দরে বিক্রয়ের জন্য ১০ হাজার টন গম ও ১০ হাজার টন চাউল দেওয়া হইবে এবং ইহাও কার্যে পরিণত হইয়াছে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এইরূপ দোকানসমূহ খুলিয়াছেন। দুর্গত অঞ্চলে সাহায্যদানের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এইভাবে উভয় ব্যবস্থা কার্যকরী করিয়াছেন। তখন এইরূপ স্থির হইয়াছিল যে, কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে খাদ্য-সরবরাহের ভার ভারত সরকার গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহারা স্বল্পমূল্যে আমদানীকৃত চাউল বিক্রয়ের জন্য দোকান খুলিবেন। মফঃস্বল এলাকা হইতে বেআইনীভাবে কলিকাতায় চাউল আমদানী বন্ধ করার জন্য এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই সিদ্ধান্তের সময় কলিকাতায় মাত্র ৯০ দিনের মজুদ খাদ্যশস্য ছিল। তখন এইরূপ স্বীকৃত হয় যে, এই বৎসরের অবশিষ্ট সময়ের জন্য যে পরিমাণ খাদ্যশস্যেরই প্রয়োজন হউক না কেন, ভারত সরকার তাহা সরবরাহ করিবেন এবং আগামী বৎসরের জন্যও ঐভাবে সরবরাহ চলিতে থাকিবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে ৭ই জুলাই হইতে চাউলের দোকান খোলা হইয়াছে এবং ঐসব দোকানে ৩০৲ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে।

প্রতিরোধ কমিটির অভিযান কিন্তু ইহাতেই থামিয়া যাইবার নয়। অবস্থা বিবেচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমগ্র কলিকাতা অঞ্চলেই ১৪৪ ধারা জারী করিয়া যে কোনো প্রকারের সভা-সমিতি বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু এ বাধাও সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি লঙ্ঘন করিয়া যথাক্রমে তাঁহারা নানা অঞ্চলে সভানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন এবং প্রতি ক্ষেত্রেই পুলিশ যথেচ্ছ লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে। মনে করা গিয়াছিল—ইহা লইয়া অবশেষে বোধ করি একটা বড় রকমের বিপ্লব গড়িয়া উঠিবে। কিন্তু কংগ্রেসের বাহিরে একমাত্র শক্তিশালী দল কমিউনিষ্ট প্যার্টি এই আন্দোলনে গোড়া হইতেই যোগ না দেওয়ায় জনমতকে আয়ত্বে আনা সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষে সম্ভব হইয়া ওঠে নাই।

দেশের বিশৃঙ্খলতার দিক দিয়াই হউক অথবা নিজেদের জনপ্রিয়তার প্রতি অধিকতর সচেতন হইয়াই হউক, গত ২৩শে জুলাই বিধান সভার বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গভর্ণমেণ্ট পক্ষের একটা পারস্পরিক বুঝাপড়ার মনোভাব পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। বিধানসভার অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক বিবৃতি দিয়া বিগত কয়েকদিনের কলিকাতার খাদ্য আন্দোলন সম্পর্কে ধৃত সকল ব্যক্তির বিনাসর্ত্তে মুক্তির আদেশ দিবার কথা ঘোষণা করেন এবং কলিকাতা সহরে ১৪৪ ধারা জারীর আদেশ সংশোধনের জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি খাদ্য সমস্যাকে সর্বপ্রকার রাজনীতির উর্ধ্বে রাখিয়া উহার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সকল দলের

আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। এবং খাদ্য সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে সকল দলকে লইয়া তিনি পরামর্শ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। সরকারী আদেশে ২৩শে জুলাই রাত্রির মধ্যেই বিধানসভার চারিজন সদস্য সহ ধৃত প্রায় ৫০০ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহৃত হয় এবং সকলে মুক্তিলাভ করেন।

কিন্তু এই হেনস্থার খুব বেশী প্রয়োজন ছিল কি? বিধান সভায় বাজেট আলোচনা কালে পার্শ্বস্থ স্থানসমূহে ১৪৪ ধারা জারী না করিলেই অবস্থাটা এতদূর পর্যন্ত আসিয়া গড়াইত না। সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষে অপরাধ এইটুকু যে—১৪৪ ধারা জারী থাকা সত্ত্বেও তাহা লঙ্ঘন করিয়া সেই সমস্ত নিষিদ্ধ অঞ্চলেই সভা ডাকিবার বা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবার জন্য তাঁহাদের উন্মত্ততা বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যদি স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করিতেন, তাহা হইলে স্পষ্টতঃই উপলব্ধি করিতে পারিতেন যে, মানুষ যখন না খাইতে পাইয়া হন্যে হইয়া উঠিয়াছে, তখন খাদ্যের দাবীতে এই বিক্ষোভের অভিযাত্রা ভিন্ন তাহাদের আর কীই বা করিবার ছিল? জনতার অশিষ্টাচরণের সকলেই নিন্দা করিবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাদের ন্যায্য দাবীকে নিন্দা করিবার মতো যথার্থই কিছু আছে কি? সুন্দরবন ও নদীয়া জেলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিতেই যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেদিকে প্রয়োজনীয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যথাসময়ে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, তবে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী জনাব কিদোয়াইকেও কলিকাতায় ছুটিয়া আসিতে হইত না, আর সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটিও এভাবে গড়িয়া উঠিত না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার খানিকটা ঠেকিয়া ভাবিতে শেখার ফলেই এমন একটা মর্ম্মান্তিক ঘটনা কলিকাতার বুকের উপর দিয়া ঘটিয়া গেল।

২৭শে জুলাই বিডন স্কোয়ারের এক সভায় শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু বলেনঃ 'দেশের খাদ্যাবস্থার অবনতির জন্য কংগ্রেস সরকারই দায়ী। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদে অস্বীকার করিয়া এবং কৃষকদের বিরুদ্ধে জমিদারদের স্বার্থরক্ষা করিয়া সরকার রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করিয়াছেন।'— ইহার উপর টিপ্পনি করা বৃথা। এতদসম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের নীতি ও আচরণই ইহার সপক্ষে কিম্বা বিপক্ষে যথোপযোগী উদাহরণ হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ও সরকারী কর্ম্মনীতি

গত ৩০শে জুলাই পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মেডিকেল এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত বাজেটের আলোচনা লইয়া সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে এক তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিরোধী পক্ষ এই রাজ্যে বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা-ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, জনস্বাস্থ্যের প্রতি গভর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য এবং পল্লী অঞ্চলে সরকারী চিকিৎসা-কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করিতে গভর্ণমেণ্টের শোচনীয় ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা করেন। মেডিকেল ও জনস্বাস্থ্য খাত দুইটিতে বিরোধী পক্ষ প্রায় ৭৫টি ছাটাই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া নানা দাবীর মধ্যে যক্ষ্মা রোগীদের জন্য আরও অধিক বেডের ব্যবস্থা, আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় সরকারী স্বীকৃতি, পল্লী অঞ্চলে অধিক সংখ্যায় চিকিৎসা কেন্দ্র ও নলকূপ স্থাপনের দাবীও উপস্থিত করেন। ইহার কোনো একটি দাবীই অযৌক্তিক বা অন্যায্য নয়। বিরোধী দলের পক্ষ হইতে ভেজাল ঔষধ প্রস্তুতকারকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী উত্থিত হইলে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জানান যে, ভেজাল ঔষধ প্রস্তুতকারীদের দমন করিতে গভর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ...যদি কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাদের সিদ্ধান্তে অবিচলিত থাকেন, তাহা হইলে বাংলা দেশের ঔষধ প্রস্তুতকারকগণ—যাঁহারা বেশীর ভাগ ভারতীয় ঔষধ প্রস্তুত করেন—তাঁহাদের স্বার্থের খাতিরে তাঁহাদিগকে নিজেদের জন্য অপর একটি লেবরেটরি স্থাপন করিতে হইবে।

মেডিকেল খাতে বিতর্কের উত্তরে ডাঃ রায় বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে দশ শয্যাবিশিষ্ট ১৪৮টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং পঞ্চাশ শয্যাবিশিষ্ট ৩২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। তাঁহাদের আরও ৩৫টি থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ৪২৭টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে এবং ঐগুলি করিতে ৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির উল্লেখ করিয়া ডাঃ রায় বলেন যে, বিশেষ করিয়া উদ্বাস্তু সমস্যার দরুণ এই রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক্ষণে যক্ষ্মা রোগীর জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে ১৭০০টি শয্যা আছে। ঐগুলিতে বড় জোর ৩৫০০ জন রোগীকে চিকিৎসা করিতে পারা যায়। কিন্তু এক লক্ষেরও বেশী লোক যক্ষ্মারোগে ভুগিতেছে এবং তাহাদের হাসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসা করা দরকার। তাঁহারা কাঁচরাপাড়ার শয্যাসংখ্যা বাড়াইয়া ১০০০ করিয়াছেন এবং অপর কয়েকটি হাসপাতালেও হয়ত কিছু শয্যাসংখ্যা

বাড়াইতে পারিবেন। তথাপি তিনি মনে করেন যে, ইহা 'সমুদ্রে বারিবিন্দু সম'।

নিতান্ত বারিবিন্দু না হইয়া যাহাতে গোটা সমুদ্রেরই সেতুবন্ধন সম্ভব হয়, তজ্জন্যই সরকারী কর্ম্মপ্রসূতার প্রয়োজন লোকসংখ্যানুপাতে পশ্চিমবঙ্গের রোগাধিক্যে যে-পরিমাণ হাসপাতালের প্রয়োজন, তাহার এক-পঞ্চমাংশও আজ পশ্চিমবঙ্গে নাই। যাহাও বা রহিয়াছে, সেগুলিতেও অব্যবস্থার অন্ত নাই। যে কোনো ভুক্তভোগী ব্যক্তিমাত্রেই ইহার প্রমাণ দিবেন। বাজেট আলোচনার সূত্রে পরিষদে বহুতর ভাবালুতারই পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মূল বিষয়ের প্রতিকার অনেক দূরেই নিক্ষিপ্ত থাকে। হাসপাতাল বাড়াইয়া রোগীর সংখ্যানুপাতে একদিকে যেমন বিভিন্ন হাসপাতালে বেডের সংখ্যা বাড়াইবার প্রয়োজন, তেমনি হাসপাতালগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাবলীরও সংস্কার সাধন করা কর্তব্য। আমাদের আশঙ্কা হয়, যে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কালোবাজারকে সায়েস্তা করা সম্ভব হয় নাই, সেই গভর্ণমেণ্ট দেশ হইতে ভেজাল ঔষধের প্রচলন যথার্থই বন্ধ করিতে পারিবেন কিনা! অথচ না পারিলে দেশের অবস্থা যে ক্রমেই সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এদিকে যাহাতে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট তথা কেন্দ্রীয় সরকারের সক্রিয় শক্তি নিয়োজিত হয়, তজ্জন্য এই প্রসঙ্গে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর দৃষ্টি আকর্ষণীয়।

বিতর্কের উত্তর দান প্রসঙ্গে ডাঃ রায় একথারও উল্লেখ করিয়াছেন যে, কলিকাতার বস্তিগুলিকে ধীরে ধীরে তুলিয়া দিয়া পাকা বাড়ীর ব্যবস্থা করা হইবে। পাকা বাড়ীর ব্যবস্থা হইলে বস্তিবাসীরা অবশ্য নিশ্চয়ই সেখানে স্থান পাইবেন না, তাঁহাদের জন্য গভর্ণমেণ্টকে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতেই কি রোগের বীজাণু নির্ম্মূল হইবে বলিয়া ডাঃ রায় মনে করেন? যে যক্ষ্মা রোগের আধিক্যের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও যে যথোপযোগী পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবজনিত আধিক্য, তাহা কি তিনি অস্বীকার করিতে পারেন? জনসাধারণকে সুস্থ ও বলিষ্ঠ রাখিয়া রোগ-বীজাণুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে দেশের খাদ্য-ব্যবস্থার উন্নতি করিয়া প্রত্যেকটি লোক যাহাতে স্ব স্ব ক্রয়ক্ষমতার দ্বারা যথোপযোগি পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিয়া শারীরিক উৎকর্ষের দিকে সচেতন হইতে পারে, গভর্ণমেণ্টকে তাহার অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্তু বোধ করি, এইভাবে আমাদের গভর্ণমেণ্ট এখনও ভাবিতে শেখেন নাই। কোনো সুস্থ্য স্বাধীন দেশের স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের প্রথম লক্ষ্যই হইল দেশের স্বাস্থ্য, আবাস ও শিক্ষা। এ স্থলে আমাদের তিনটিরই অভাব। অতএব আমরা পশ্চিমবঙ্গ তথা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিব—তাঁহারা যেন গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিতে বৃথা চেষ্টা না করিয়া—দেশের পক্ষে যাহা যথার্থ কল্যাণপ্রদ—তাহারই আশু ব্যবস্থা করেন।

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ-প্রস্তাবিত স্কুল-কোড

সম্প্রতি মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক রচিত 'স্কুল কোড' লইয়া শিক্ষক-মহলে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এই কোডের দ্বারা দুর্গত শিক্ষক সমাজের যে অপরিসীম ক্ষতি হইবে, তৎপ্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি বলেন যে, নূতন কোড প্রবর্তিত হইলে বহু বিদ্যালয় উঠিয়া যাইবে এবং সমস্ত বিদ্যালয় হইতেই ছাত্রসংখ্যা কমাইতে হইবে, এবং অভিভাবকদিগকে ছাত্র ভর্তি করাইবার সময় বহুবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে। প্রসঙ্গতঃ স্কুল কোডে বর্ণিত বিভিন্ন ধারাগুলি এখানে উল্লেখযোগ্য। যথাঃ—

ম্যানেজিং কমিটির গঠন ব্যবস্থাঃ (১) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হইবে —হিতৈষী ব্যক্তিদিগের (১০ হাজার টাকা দানকারী ব্যক্তি হিতৈষী বলিয়া পরিগণিত হইবে)। অনূর্দ্ধ তিনজন এবং সোসাইটি; মিশন বা ট্রাষ্ট কর্তৃক বিদ্যালয় পরিচালিত হইলে ঐ প্রতিষ্ঠানের অনূর্দ্ধ তিনজন প্রতিনিধি। (২) দাতা-(পাঁচশত টাকা দানকারী) একজন। (৩) বর্তমান ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক মনোনীত দুইজন শিক্ষানুরাগী এবং প্রতিষ্ঠাতা থাকিলে তাঁহাদের একজন। (৪) প্রধান শিক্ষক। (৫) চূড়ান্তভাবে নিযুক্ত শিক্ষকদিগের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যালয়ে অন্ততঃ দুই বৎসর কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের কর্তৃক নির্বাচিত দুইজন প্রতিনিধি। পরিষদের প্রেসিডেণ্ট প্রয়োজন মতো একজন সদস্য মনোনয়ন করিতে পারিবেন। বৎসরে দশ টাকা করিয়া দুই বৎসর টাকা দিয়া পঞ্জীভুক্ত অভিভাবকগণের দুইজন প্রতিনিধি।

এ সম্বন্ধে শিক্ষকদের প্রধান দাবী—বর্তমনেব ন্যায় সমস্ত অভিভাবকদিগকে প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার দিতে হইবে। নতুবা বিদ্যালয়ের পরিচালনা একটি ক্ষুদ্র দলের কুক্ষিগত হইয়া পড়িবে। এতদ্ব্যতীত শিক্ষক প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়াইতে হইবে। শিক্ষক কাউন্সিল সম্বন্ধে

বোর্ডের বিধান এই যে, সহকারী প্রধান শিক্ষক মহাশয় অথবা তাঁহার অবর্তমানে প্রধান শিক্ষক কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষক কাউন্সিলের সেক্রেটারী হইবেন। শিক্ষকদের দাবী এই যে, শিক্ষকদিগকে সেক্রেটারী নির্বাচনের অধিকার দিতে হইবে।

শিক্ষক নিয়োগ বিধান: ইণ্টারমিডিয়েট পাশ ভিন্ন কোনো ব্যক্তির মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবার যোগ্যতা থাকিবে না।

ইহার ফলে বহু বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাব ঘটিবে, বহু শিক্ষক যোগ্যতাহীন বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং অনেকের চাকুরী যাইবে বলিয়া শিক্ষকগণ মনে করেন।

শিক্ষকদিগের বেতন: (ক) শিক্ষা শিক্ষণ প্রাপ্ত স্নাতক অনার্স অথবা এম্-এ, এম-এস্‌সি সহ অথবা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর এম্-এ, এম্-এস্‌সি ১০০্ টাকা; শিক্ষা-শিক্ষণ প্রাপ্ত স্নাতক অথবা অন্যান্য এম্-এ ও এম্-এস্‌সি ৭৫্ টাকা; স্নাতক ও শিক্ষা-শিক্ষণ-প্রাপ্ত আণ্ডার গ্রাজুয়েট ৬০্ টাকা; পরিষদের কার্য্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য শিক্ষকগণ ৫০্ টাকা।

বর্তমানে শতকরা ৮০ জন শিক্ষক স্নাতক বা আণ্ডার গ্রাজুয়েট। সুতরাং উক্ত নিয়ম প্রবর্তিত হইলে বহু শিক্ষকের দুরবস্থা দেখা দিবে বলিয়া শিক্ষকগণ মনে করেন।

(খ) কাজের সময় সপ্তাহে ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ ৪০ মিনিটের ৩৬ পিরিয়ড্।

(গ) প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের লিখিত অনুমতি ভিন্ন শিক্ষকদিগের উপশিক্ষকতা করা চলিবে না।

(ঘ) ৬০ বৎসরে সাধারণতঃ কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে।

রিজার্ভ ফাণ্ড: (ক) তিন বৎসরের মধ্যে ২৫০০্ টাকা করিতে হইবে এবং তৎপরে প্রতি বৎসর দুইশত টাকা রাখিতে হইবে। (খ) **অনুমোদনের সর্ত:** তিন মাইল ব্যাসার্দ্ধের মধ্যে কোনও অনুমোদিত বিদ্যালয় থাকিলে সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হইবে না। (গ) শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা চল্লিসে সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। শ্রেণীতে প্রত্যেক ছাত্রকে দশ বর্গফুট স্থান দিতে হইবে।

ছাত্র ভর্তির নিয়ম: বৎসরের প্রথম ছয় সপ্তাহের পর সাধারণতঃ কোনও ছাত্রকে প্রথম ভর্তি করা চলিবে না। সপ্তম শ্রেণী বা তাহার উপরে ছাত্রদিগকে প্রথম ভর্তি করিতে হইলে গেজেটেড অফিসার, কলেজের অধ্যক্ষ বা অধ্যাপক অথবা পাবলিক কর্পোরেট বডির সদস্য অথবা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে তাহারা যে ইতিপূর্বে কোনও অনুমোদিত বিদ্যালয়ে পড়ে নাই, এইরূপ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিতে হইবে।

শৃঙ্খলা বিধায়ক ধারা: বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা চলিবে না, যথা—(১) বিদ্যালয়গৃহে থুথু ফেলা; (২) ধূমপান; (৩) মদ্যপান প্রভৃতি: এবং (৪) জুয়াখেলা ইত্যাদি। ছাত্রগণ প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের অনুমতি ভিন্ন কোনো ক্লাব বা সোসাইটিতে যোগদান করিতে পারিবে না—কোনো প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষিকা অথবা শিক্ষক বিদ্যালয় ভবনে বা মাঠে কোনো রাজনৈতিক সভা অথবা দলীয় রাজনৈতিক মতবাদের আলোচনা করিতে পারিবেন না। হরতাল বা পিকেটিং করিলে দলীয় নেতাদের শাস্তি দিতে হইবে।

শুধু শিক্ষকগণ নহেন, শিক্ষকগণের সঙ্গে বিদগ্ধ জনসমাজও মনে করেন যে, উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি না হইলে শিক্ষক বাঁচিতে পারে না এবং শিক্ষক না বাঁচিলে শিক্ষাও বাঁচিতে পারে না। কোডের রচয়িতাগণ শিক্ষা সংস্কারের যতবড় অযুহাতই স্বপক্ষে দেখাইতে চান না কেন, প্রতিদিনকার নির্ম্মম অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহারা পরিষ্কার বুঝিতে পারেন যে, নূতন স্কুলবিধি চালু হইলে শিক্ষা, শিক্ষক, ছাত্র, বিদ্যালয়—কাহারও পক্ষেই মঙ্গল হইবে না। শিক্ষকদের মতে এই প্রস্তাবিত স্কুল-কোড শিক্ষা প্রসার এবং শিক্ষকদের ভাগ্যোন্নতির পরিপন্থী।

ইহারই ভিত্তিতে শিক্ষকসমাজ ও জনসাধারণের মতামত সংগ্রহের জন্য প্রস্তাবিত স্কুল-কোড সাধারণের নিকট প্রচার ও উহার অবাঞ্ছিত ধারাগুলি প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া গত ৩রা আগষ্ট কলিকাতা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শিক্ষক সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে, শিক্ষকগণের দাবী মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক যদি গৃহীত না হয়, তবে ৯ই হইতে ১৬ই আগষ্ট পর্যন্ত দেশব্যাপী প্রতিবাদ সপ্তাহ পালন করা হইবে এবং শিক্ষক প্রতিনিধিগণ পরিষদের সভা হইতে বাহির হইয়া আসিবেন। ছাত্র সংগঠনের পক্ষ হইতে সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় যে, শিক্ষা সংকট প্রতিরোধের জন্য একটি ছাত্র কমিটি গঠন করা হইয়াছে। ১৪ই আগষ্ট—যেদিন পরিষদের সভায় স্কুল কোড সম্বন্ধে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, সেদিন—প্রত্যেক স্কুলের ছাত্রেরা ধর্ম্মঘট করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে এবং হাজার হাজার ছাত্র শোভাযাত্রা করিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইবে ও তাহাদের দাবী জানাইবে।

সম্মেলনে গৃহীত মূল প্রস্তাবে বলা হয় যে, বিদ্যালয়গুলির উন্নতি ও প্রসার করিতে হইলে যে অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন, প্রস্তাবিত স্কুল-কোডে তাহার কোনো ব্যবস্থা না করিয়া শাসন ও নিয়ন্ত্রণের কঠোর বেড়াজাল বিস্তার করা হইয়াছে এবং শিক্ষার উন্নয়নের নামে শিক্ষা সঙ্কোচের পুরাপুরি ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং সম্মেলন দাবী করে যে, প্রকৃত গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া শিক্ষক সমিতি ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্কুল কোড রচনা করা কর্তব্য।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষ হইতে এই দাবী উত্থিত হইলেও ইতিমধ্যেই তাঁহারা জনসাধারণের বৃহত্তর সমর্থন লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। স্কুল-কোডে এমন বহু ধারাই প্রবর্তিত হইয়াছে—যাহার পরিবর্তন না ঘটিলে শিক্ষক ও ছাত্রস্বার্থ অনেকাংশেই ব্যাহত হইবে। শিক্ষা সংস্কারের আশু প্রয়োজন, সন্দেহ নাই। এতকাল যে পদ্ধতিতে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, তাহাতে শিক্ষার নামে দেশে কতিপয় শিক্ষামূলক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানই গড়িয়া উঠিয়াছিল মাত্র, প্রকৃতপক্ষে ছাত্র গঠনের কাজে তাহা বিশেষ কিছুই করিতে পারে নাই। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবধি তাহার পিছনে খুব বড় কিছু অবদান আছে বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায় নাই। শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কারের অভাবের ফলেই এইরূপ ঘটিয়াছে। আজ স্বতন্ত্র মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড গঠিত হইয়া শিক্ষা সংস্কারের একটা আভাব দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু ইহাকেও পুরাপুরি শিক্ষা সংস্কার নামে অভিহিত করা যায় না। যে শিক্ষা ছাত্রের নৈতিক জীবন উন্নত করিয়া পূর্ণ মনুষ্যত্বে তাহাকে বিকশিত করিয়া তুলিতে পারে না, তাহাকে সৎশিক্ষা বলে না। প্রকৃত সৎশিক্ষা দানের পক্ষে অগ্রসর হইয়া মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের এমন সব আইন প্রণয়ন করা কর্তব্য হইবে, যাহাতে শিক্ষক, ছাত্র তথা ছাত্রদের অভিভাবকশ্রেণী তাহার সঙ্গে নিজদিগকে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারেন, এবং শিক্ষক ও ছাত্র—উভয়েরই আর্থিক, মানসিক ও চারিত্রিক উন্নতি হয়। শিক্ষক ও ছাত্র সমাজের পক্ষ হইতে আজ যে দাবী উত্থিত হইয়াছে—তাহাকে একেবারেই অন্যায় বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। স্কুল-কোডের বিভিন্ন আইনগত ধারা এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের দাবী—এই উভয় দিকের সামঞ্জস্যের মাধ্যমে গঠনমূলক নতুন কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করাই বোধ করি এ ক্ষেত্রে সমীচীন হইবে। এ সম্পর্কে আমরা মাধ্যমিক-শিক্ষা বোর্ডকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলি। ১৮ই আগষ্টের ধর্ম্মঘটকারীদের দাবীর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের কর্তৃপক্ষ অবশ্য শিক্ষক ও ছাত্রসমাজের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সহিত যথোপযোগি আলোচনা করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, কিন্তু উক্ত প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত কতখানি রক্ষিত হইবে, বলা কঠিন। পরিষদের সভা আপাতত আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা মনে করি, এই দীর্ঘ সময়ের অবকাশে শিক্ষা পরিষদ তাঁহাদের প্রবর্তিত এই কোডের ধারাগুলি সংস্কার করিয়া দেশের কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবার যথেষ্ঠ সময় পাইবেন।

বিশ্ব অলিম্পিকে ভারতের কৃতিত্ব

অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় হকি দল এ বৎসর ফাইনালে হল্যান্ডের হকি দলকে ৬—১ গোলে পরাজিত করিয়া হকি খেলায় বিশ্ববিজয়ী হইয়াছে। সমস্ত ভারতবাসীর কাছেই ইহা গৌরবের বিষয়। ভারতীয় হকি দলের এই জয়ের সম্মান প্রথম সূচিত হয় ১৯২৮ সালে। সেই হইতে প্রতিবারের খেলাতেই (১৯২৮, ১৯৩২, ১৯৩৬, ১৯৪৮, ১৯৫২) ভারতীয় দল অলিম্পিক-বিজয়ী হইয়া আসিয়াছে। ১৯২৮ সালেও হল্যান্ডের সঙ্গেই তাহাদের ফাইনাল খেলা হয় এবং ৩—০ গোলে হল্যান্ড পরাজিত হয়। এ বৎসর তাহাদের পরাজিত গোলের সংখ্যা ১৯২৮ সালের দ্বিগুণ। এবারে কোনোক্রমে একখানি গোল মাত্র হল্যান্ড ভারতবর্ষকে ফিরাইয়া দিতে পারিয়াছে। হকিতে ভারত তাহার শ্রেষ্ঠত্বের ঐতিহ্য যথোচিত যোগ্যতার সহিতই রক্ষা করিয়াছে। সেমি-ফাইনালে একদিকে হল্যান্ডের নিকট পাকিস্থান পরাজিত হয়, অন্যদিকে বৃটেনকে পরাজিত করে ভারত। গত ২৪ বৎসরে বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী দল হিসাবে ভারত পর পর চারিবার অলিম্পিক-বিজয়ী হইয়া আসিয়াছে। কোনো দেশ এ পর্যন্ত হকিতে ভারতীয় নৈপুন্য ও ঔৎকর্ষকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। এবারে ভারতীয় দলে খেলিয়াছেন—ফ্রান্সিস, ধরম সিং, আর এস্ জেন্টল, এল ক্লাডিয়াস, কেশব দত্ত, জি পেরুমল, রঘুবীর লাল, কে ডি সিং (বাবু), অধিনায়ক, বলবীর সিং, উধম সিং ও রাজগোপাল। তাঁহাদের এই পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের জন্য তাঁহাদিগকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

হকি ব্যতীত ভারত আর একটি বিভাগে কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা হইতেছে মল্লযুদ্ধ। ভারতীয় মল্লবীর ব্যান্টাম ওয়েট বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া

প্রথম ভারতীয় হিসাবে ব্যক্তিগত ব্রোঞ্জ পদক লাভ করিয়াছেন। ফেদার ওয়েট বিভাগে মল্লবীর-মঙ্গাভে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এথ্‌লেটদের মধ্যে অধিনায়ক লেভি পিণ্টো ১০০ মিটারের সেমি-ফাইনালে ১০·৭ সেঃ ৪র্থ স্থান অধিকার করিয়া সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত অবাধে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। মুষ্টিযোদ্ধা রণ নরিস পয়েণ্টে পরাজিত হইয়া কোয়ার্টার-ফাইনালে হার স্বীকার করিয়াছেন।

স্বভাবতঃই দেখা যাইতেছে, একমাত্র হকি ভিন্ন বিশ্ব-অলিম্পিকের অন্যান্য ক্রীড়ায় ভারতীয়রা অন্যান্য দেশকে পরাভূত করিয়া বিশ্ব-বিজয়ী হইবার গৌরব অর্জন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বহু ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও তাই ভারতীয়দের পক্ষে একমাত্র এই হকি বিজয়ে বড় বেশী উল্লসিত হইবার বিশেষ কারণ নাই। হকিতে তাহারা বিজয়ী হইলেও হল্যান্ড প্রভৃতি দেশ ক্রীড়ায় যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে স্বভাবতঃই এই কথা বলা চলে যে, ভারতীয় দল যদি এখন হইতে নিজদিগকে আরও বেশী সংযত ও শক্তিশালী করিয়া না তোলে, তবে ভবিষ্যতে হয়ত তাহাদের প্রাক্তন সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন হইবে। ফুটবল প্রভৃতি খেলায় ভারত কোনো দিনই পাশ্চাত্য দেশগুলিকে পরাভূত করিয়া যশস্বী হইতে পারে নাই। ইহা নিশ্চয়ই গৌরবের কথা নয়। ভবিষ্যতে যাহাতে হকি, ফুটবল, সাঁতার, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতেই ভারতীয় দল আত্মমর্য্যাদার সঙ্গে বিজয়-তিলক ললাটে গ্রহণ করিতে পারে—তজ্জন্য পূর্ব হইতেই তাহাদিগকে সতর্ক হওয়া কর্তব্য। ভারতীয় হকি দলের সাম্প্রতিক এই বিজয়ে ভারতীয় ঐতিহ্য-প্রদীপের সহস্র শিখার একটি শিখাই মাত্র দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল।

কাশ্মীর প্রসঙ্গ

গত সংখ্যায় কাশ্মীর সমস্যা প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করিয়াছিলাম যে 'সম্প্রতি কাশ্মীর-প্রধান শেখ আব্দুল্লা দিল্লী আসিয়াছেন; ইহা নিশ্চয়ই বর্ষা-সফর নয়, পলিটিকাল সফর। এবারে একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাওয়াই তো যুক্তিযুক্ত!'— দেখিলাম আমাদের অনুমান এক তিলও মিথ্যা হয় নাই। ভারত ও কাশ্মীরের মধুর সম্পর্কটি নানা ঝড় ঝঞ্ঝা অতিক্রম করিয়া এবারে মধুরতর হইতেই চলিয়াছে। ভারতীয় 'লোক সভা'র অধিবেশনে এত বড় একটা ঐতিহাসিক মাধুর্য্যকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ করিয়া উৎকণ্ঠিত ভারতবাসীর অনেকখানিই কৌতূহল নিবৃত্ত করিয়াছেন। ভারত ও কাশ্মীরের অতীত ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়া উভয় দেশের সমস্যাবলী সম্পর্কে তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া ভাবীকালের জয়যাত্রার পথকে বহুলাংশেই সুগম করিয়া দিয়াছেন।—

কাশ্মীরের পরিচয় শুধু তার আজকের রাজনৈতিক পটভূমির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বহু বৎসর ধরিয়া কাশ্মীর বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমোদ-ভ্রমণের স্থান হিসাবে পরিচিত। অথচ এমন একটি মনোরম স্থানের জনসাধারণ কিন্তু অত্যন্ত দরিদ্র। রাজনৈতিক দিক দিয়া কাশ্মীর ইতিপূর্বে খুবই অনগ্রসর ছিল; কিন্তু সহসা সাম্প্রতিক ইতিহাসে সে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করে। তাহার পর হইতে ভালোমন্দ বহু ব্যাপার সেখানে ঘটিয়া গিয়াছে এবং কাশ্মীর-সমস্যা আজ একটা আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের পক্ষে অবশ্য ব্যাপারটা আরও গুরুত্বপূর্ণ। সহস্র সহস্র বৎসরের পারস্পরিক সম্পর্ক ছাড়াও সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ফলে ভারত ও কাশ্মীর পরস্পরের আরও নিকটবর্তী হইয়াছে। ভৌগোলিক দিক দিয়া ভারতবর্ষ দক্ষিণে কণ্যা কুমারিকা হইতে উত্তরে কাশ্মীর পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার মাইল বিস্তীর্ণ। যুগ যুগ ধরিয়া বহু যাত্রীদল ভারত হইতে কাশ্মীরের মধ্য দিয়া মধ্য-এশিয়ায় গিয়াছে। দুই হাজার বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক দিক দিয়া কাশ্মীর ভারতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত। বহু বিষয়ে মধ্য-এশিয়ার সহিতও ইহার যোগ রহিয়াছে। অনেকেরই হয়ত ধারণা নাই যে, কাশ্মীর তিব্বত অপেক্ষাও উত্তরে অবস্থিত। সুতরাং এই বিশেষ অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হইয়া কাশ্মীর সমস্যার বিবেচনা করিতে হইবে। ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের ন্যায় জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যেও জনসাধারণ সামন্ত-তান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে। ভারতের জাতীয় আন্দোলন এই সংগ্রামের প্রেরণার উৎসস্থলস্বরূপ ছিল। বস্তুতপক্ষে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতে যে বিরাট জাতীয় আন্দোলন সম্ভব হইয়াছে, কাশ্মীরে গণ-আন্দোলন তাহারই ফল-স্বরূপ। নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা-সম্মেলনের সহিত এই আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সুতরাং কাশ্মীরের গণ-আন্দোলনকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনেরই অঙ্গ বলা যাইতে পারে।

বিবৃতি প্রসঙ্গে ভারতীয় লোকসভার সাম্প্রতিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নেহরু বলেন—'স্বাধীনতা লাভ ও দেশ-বিভাগের পূর্বে ভারতের প্রায় ছয় শত দেশীয় রাজ্যের

ব্যাপার লইয়া এক গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়। বৃটিশ সরকারের ১৯৪৭ সালের জুন মাসের এক ঘোষণার একটি অংশ আমাদের মনঃপূত হয় নাই। এই ঘোষণার ফলে কতিপয় নৃপতির এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তাঁহারা স্বাধীনভাবেই শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারিবেন। সৌভাগ্যক্রমে এই দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হইবার মতো একজন শক্তিশালী মানুষ—সর্দার প্যাটেল আমাদের মধ্যে ছিলেন। বস্তুত পক্ষে সকল রাজ্যই অতি সত্বর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। অবশ্য হায়দরাবাদ, কাশ্মীর এবং অন্যান্য দুই একটি ছোট রাজ্য তখন যোগদান করে নাই।' প্রসঙ্গতঃ কাশ্মীরে হানাদারদের আক্রমণ, পাকিস্থান সরকারের সহিত তাহার যোগ, কাশ্মীরের জনসাধারণের রক্ষাকল্পে ভারতের সৈন্যবাহিনীর প্রশংসনীয় সংগ্রাম, নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সমস্যা প্রভৃতিও আলোচনার বিষয়বস্তু হয়। অতঃপর শ্রীযুক্ত নেহরু দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেনঃ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ভারতেরই অংশ এবং অন্তর্ভুক্ত একটি রাজ্য। জম্মু ও কাশ্মীরের অধিবাসীরা অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক। আইন অনুযায়ী এবং কার্যতঃ উক্ত রাজ্যের ভারতে যোগদান এক্ষণে সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভারত সরকার ও কাশ্মীর সরকারের প্রতিনিধিরা একমত হইয়াছেন যে, রাজ্যের আইন সভা যাঁহার নাম সুপারিশ করিবেন, রাষ্ট্রপতি যদি তাহা অনুমোদন করেন, তবে তিনিই রাজ্যের প্রধান হইবেন। নির্বাচন পদ্ধতি রাজ্যের আইন সভাই নির্ণয় করিবে এবং রাজ্যের প্রধান সাধারণতঃ নিজ পদে পাঁচ বৎসর অধিষ্ঠিত থাকিবেন। ভারতের অন্যান্য অংশের ন্যায় কাশ্মীর এবং জম্মুতেও জাতীয় পতাকা সমান মর্যাদা পাইবে। রাজ্যের পতাকা জাতীয় পতাকার সমতুল হইবে না, তবে স্বাধীনতার জন্য কাশ্মীরের জনগণ যে সংগ্রাম করিয়াছে, তাহার বহু স্মৃতি জড়িত আছে বলিয়া তাহারা রাজ্যের এই প্রতীকটি রক্ষা করিতে চাহে। এই বিষয়ে মতৈক্য হইয়াছে। কাহারও প্রাণদণ্ড স্থগিত বা মকুব করিবার অধিকার ভারতের রাষ্ট্রপতিরই থাকিবে। আক্রমণ, বাহিরের বিপদ অথবা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের দরুণ রাষ্ট্রপতির জরুরী ক্ষমতা বলে জরুরী অবস্থা ঘোষণার যে অধিকার আছে, তাহা কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে, তবে আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইলে রাজ্য সরকারের সহিত একমত হইতে হইবে।'

কাশ্মীর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীনগরের এক জনসভায় কাশ্মীর-প্রধানমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাও অনুরূপ এক ভাষণ প্রসঙ্গে ঘোষণা করিয়া বলেনঃ 'আমাদের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। কাশ্মীরবাসী দীর্ঘকাল ধরিয়া যে আদর্শ লাভের জন্য সংগ্রাম করিতেছে, তাহাই জয়যুক্ত হইল। আমাদের ও ভারতের আদর্শ এক এবং ভারতের শুভেচ্ছার বলেই আমরা জয়ী হইয়াছি। কাশ্মীরের রিজেণ্ট যুবরাজ করণ সিং পাঁচ বৎসর রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক প্রধানের পদে বহাল থাকিবেন; কিন্তু তিনি জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিলে কাশ্মীরবাসী তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারিবে। আমাদের আদর্শ লোকায়ত্ত গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্যই আমরা ভারতের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলাম। আমরা বংশানুক্রমিক শাসনতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া জনমতকে জয়যুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছি। কোনোরূপ সাম্প্রদায়িক কারণে আমরা বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থার অবসান চাহি নাই। এই ব্যবস্থায় লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর শাসনভার মাত্র মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে ন্যস্ত থাকে বলিয়াই আমরা ইহার অবসান ঘটাইতে চাহিয়াছিলাম। কাশ্মীরবাসী ভারতের ন্যায় ধর্ম্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশের দিকেই চাহিয়াছিল। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি তাঁহারা লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন এবং শ্রীনেহরুর নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া এখন তাঁহাদের স্বপ্ন সার্থক হইয়াছে।'

কাশ্মীর গণ-পরিষদের সভাপতি গোলাম মহম্মদ সাদেক বলেনঃ 'দিল্লীতে কাশ্মীর ও ভারতীয় প্রতিনিধিদের আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় 'প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা' নিদারুণ আঘাত পাইয়াছে। ইহারা এতাবৎকাল ভারত-কাশ্মীর সম্পর্ক দুর্বল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিল। বর্তমান অবস্থায় দিল্লীতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, তাহা সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক বলিয়া আমি মনে করি।' তিনি বলেন যে, কিছুকাল ধরিয়া পাকিস্তান, ভারত ও অন্যান্য স্থানের কায়েমী স্বার্থবাদীরা ভারত ও কাশ্মীরের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিল। দেশবাসীর আস্থা অর্জ্জন করিয়াছে বলিয়াই প্রতিনিধিদলের প্রচেষ্টা সার্থক হইয়াছে। কাশ্মীরের বংশগত শাসনাধিকার বিলোপের সিদ্ধান্তে সম্মত হইয়া ভারত সরকার কাশ্মীরবাসীদের অভিমতকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সুপ্রীম কোর্টের এলাকা সম্পর্কে এই কথা বলা যায় যে, উহাতে কাশ্মীরের অধিবাসীদেরই লাভ হইবে। আমরা যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছি: তাহাতে মনোমালিন্যের ভাব তিরোহিত হইবে।'

কাশ্মীর ভারতের এই একতান্ত্রিকতা গ্রহণের পরেও কিন্তু ডাঃ গ্রাহামের ব্যাপারটা অব্যাহতই থাকিয়া যায়।

কাশ্মীর সম্পর্কে মন্ত্রিসভা পর্য্যায়ে আরও আলোচনার জন্য গত ৩০শে জুলাই ডাঃ গ্রাহাম প্রস্তাব করিলে ভারত তাহাতে সম্মত হয়। অদূর ভবিষ্যতে জেনেভাতে এই আলোচনা হইবার কথা চলিয়াছে। পাকিস্তানেরও এই আলোচনায় যোগ দানের কথা আছে। রাষ্ট্রসংসদে যাইয়া অবস্থা যাহাই দাঁড়াক না কেন, উভয় রাষ্ট্রের সংযুক্ত আলোচনা ও ঘোষণায় বিশ্বের নিকট আজ ইহাই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, আইন, শাসনতন্ত্র এবং বাস্তবতার দিক দিয়া কাশ্মীর ভারতীয় রাষ্ট্রেরই অবিচ্ছেদ্য একটি অঙ্গ; ভারতের ভূগোলে এবং ইতিহাসে অপরাপর রাজ্যের ন্যায়ই কাশ্মীর একটি বৃহত্তর অংশ হিসাবে স্থায়ীভাবে যুক্ত হইয়া আছে। ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের এই বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে এমন অবকাশ আজ আর পৃথিবীর কোনো শক্তির নাই।

ভারত-কাশ্মীর সিদ্ধান্তের মূল সূত্রটি পাঠক-সাধারণের বুঝিবার সুবিধার্থে এখানে আমরা পুনরায় সংক্ষেপে বিবৃত করিলামঃ (১) কাশ্মীর ভারতীয় রিপাব্লিকের একটি রাজ্য বা অংশ এবং ভারতীয় ভূ-ভাগের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; (২) কাশ্মীরের রাজ্যপ্রধান কাশ্মীরের আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইবে, কিন্তু তাহা ভারত-রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপেক্ষ; রাজ্যপ্রধানের কার্য্যকাল বা মেয়াদও রাষ্ট্রপতির বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে; (৩) শুধু কাশ্মীরের রাজ্যপ্রধান সম্বন্ধেই নহে, জরুরী অবস্থা এবং অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারেই ভারত রাষ্ট্রপতির পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে; (৪) ভারতের রাষ্ট্রপতাকার প্রাধান্য থাকিবে, কিন্তু কাশ্মীরের নিজস্ব পতাকা সম্বন্ধেও কোনো আপত্তি থাকিবে না; (৫) ভারতের সুপ্রিম কোর্টের পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে, কাশ্মীরের সর্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণ 'এড্‌ভাইসরি ট্রিবিউন্যাল' লোপ পাইবে এবং তাহাদের ক্ষমতা ও অধিকার সুপ্রিম কোর্টের হস্তে ন্যস্ত হইবে; (৬) কাশ্মীরের বিশেষ অবস্থানুযায়ী শুধু প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখিয়া ভারতীয় শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারসমূহ কাশ্মীরেও বলবৎ থাকিবে; (৭) কাশ্মীরের ভূমি-অধিকার কাশ্মীরের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবার অধিকার কাশ্মীরের আইনসভার থাকিবে। ভারতীয় নাগরিক অধিকার বিশেষ প্রয়োজনেই কাশ্মীরের ক্ষেত্রে এইরূপ সীমাবদ্ধ ও সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। এবং (৮) ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে কাশ্মীরের যথাযথ স্থান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার পরে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

বিক্ষুব্ধ নেপাল

মাঝখানে বেশ কিছুদিনের বিচ্ছেদের পর নেপালের রাজনৈতিক আবহাওয়া পুনরায় উত্যক্তকর হইয়া উঠিয়াছে। নেপালের প্রধানমন্ত্রী এবং নেপালী কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির পারস্পরিক বিরোধ কিছুকাল মাত্র ধামাচাপা থাকিয়া পুনরায় তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশকে নিয়মতন্ত্রসম্মত বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাতৃকাপ্রসাদ কৈরালা, এবং স্বীকার করিতে পারেন নাই বলিয়া পদত্যাগও করেন নাই। তাঁহার মন্ত্রিসভার মাত্র তিনজন মন্ত্রী পদত্যাগ করিয়াছেন —যাঁহাদের নাম ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত নূতন সাতজন মন্ত্রীর নামের তালিকায় ইতিপূর্বে স্থানলাভ করিয়াছিল। তাঁহারা সকলেই কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীবিশ্বেশ্বরপ্রসাদের সমর্থকদলের অন্তর্ভুক্ত। নেপালাধীশ ত্রিভুবন তাঁহাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমাতৃকাপ্রসাদ সাতজন মন্ত্রী লইয়াই প্রধানমন্ত্রীরূপে শাসনতন্ত্রগত দায়িত্ব পালন করিয়া চলিতেছেন। বিষয়টি লইয়া উভয় দলের যে মতান্তর ও বাদানুবাদ তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে উভয় দলের দুইটি বিরুদ্ধ নীতির পরিচয় পাওয়া যায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য এই যে, 'মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের ব্যাপারে কোনো প্রকার নির্দ্দেশ দান করিবার অথবা হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ওয়ার্কিং কমিটির নাই।' তাঁহার এই মতবাদ ক্রমে আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাঁহার সর্বশেষ বক্তব্য হইতেছে এই যে—'এই ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্রসম্মত কমিটিই নহে।' অন্যদিকে কংগ্রেস-সভাপতি এবং পদত্যাগী মন্ত্রীত্রয় পাল্টা অভিযোগ করিয়াছেন যে, 'মাতৃকাপ্রসাদের বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীই নহে।' এই দলের সমর্থক কোনো কোনো বিশিষ্ট নেতা আরও কঠিন মন্তব্য করিয়া বলিতেছেন যে,—'ইহা বে-আইনী মন্ত্রিসভা।' ওয়ার্কিং কমিটি সম্পর্কে মাতৃকাপ্রসাদের ব্যক্তিগত মতবাদের বিষয়গুলিই অবশ্য শেষ পর্যন্ত বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইহা দ্বারা তিনি ওয়ার্কিং কমিটির অনাস্থাভাজন হইয়াছেন বলিয়া কিছু প্রমাণ নাই। যদি প্রমাণই থাকিবে, তবে সাতজন মন্ত্রীর নামের নূতন তালিকায় ওয়ার্কিং কমিটি মাতৃকাপ্রসাদের নামটি বাদ দেন নাই কেন? তাঁহারা বরং প্রধানমন্ত্রীর পদে মাতৃকাপ্রসাদকেই রাখিতে চাহিয়াছিলেন; রদবদল চাহিয়াছিলেন শুধু অন্যান্য মন্ত্রিপদে। ওয়ার্কিং কমিটি অবশ্য তাঁহাদের বক্তব্যের এই দুর্বলতা

ঢাকিবার জন্য কয়েকটি ব্যাখ্যা উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বিচক্ষণ সমালোচকের দৃষ্টিতে সেগুলির অসারতাই প্রমাণিত হইবে। নেপালাধীশ ত্রিভুবন অবশ্য মাতৃকাপ্রসাদের মন্ত্রীমণ্ডলীকে বৈধ বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু উভয় দলের এই বিরোধের মীমাংসায় তিনি বিশেষ কিছু হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। মাতৃকাপ্রসাদ দাবী করিয়াছেন—মহাসমিতির সাধারণ সম্মেলন আহ্বান করিয়া এই বিরোধ সম্পর্কে মীমাংসার ব্যবস্থা করা হউক। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি ইহা লইয়াও বিশেষ অনুমোদনজাত ভাষ্য প্রকাশ করিতেছেন না। অনেকে অবশ্য এমন দাবীও করিয়াছেন যে, নেপালী কংগ্রেসেরই নূতন নির্বাচন আহ্বান করা হউক্। সাধারণ সম্মেলন ছাড়া এই বিরোধের আশু কোনো মীমাংসার পথ খোলা আছে কিনা, বলা শক্ত। কিন্তু অনুরূপ পন্থায়ও মীমাংসার যেটুকু সম্ভাবনা রহিয়াছে, শ্রীবিশ্বেশ্বরপ্রসাদ এবং পদত্যাগী মন্ত্রিত্রয়ের উপর এক জনতার আকস্মিক আক্রমণে সে-সম্ভাবনাও বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে। একথা স্পষ্টতঃই বলা যায় যে. নেপালী কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিরোধ যদি এইভাবে ক্রমাগত আক্রমণাত্মক পরিবেশের মধ্যেই যাইয়া পড়ে, তবে নেপালী কংগ্রেস নিজেই যে নিজের সমাধি রচনা করিতেছেন, তাহাতে ভুল কি? বিষয়টি সম্পর্কে আমরা নেপালী কংগ্রেস তথা নেপালাধীশ শ্রীত্রিভুবনের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। নিতান্ত সাক্ষীগোপালের মতো বসিয়া রাজা ত্রিভুবন যদি নিরপেক্ষ দর্শকের মতোই মাত্র এই বিরোধ দেখিতে থাকেন, যদি ইহার যথোপযোগী মীমাংসা সম্পর্কে তিনি বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ না করেন, তবে ভবিষ্যতে দেশের এই পারস্পরিক হানাহানি অদূরভবিষ্যতে তাঁহার সিংহাসনে গিয়া গড়াইয়া পড়াও বিচিত্র কিছু নয়।

এই পর্যন্ত লিখিবার পর গত ১০ই আগস্টের সংবাদে প্রকাশ—নেপালের প্রধানমন্ত্রী শ্রী এম্ পি কৈরালা রাজা ত্রিভুবনের নিকট তাঁহার মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন। অতঃপর তিনি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে,—গত কয়েকদিন যাবৎ বিশেষভাবে বিবেচনার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এখন তাঁহার পদত্যাগ করাই উচিত। যাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহাদের মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ পাওয়া উচিত, তাঁহাদের পথে কোনোরূপ অন্তরায় সৃষ্টি না করার জন্যই তিনি এই ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রাজ্য শাসনের ক্ষমতা বর্তমানে রাজা ত্রিভুবন স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

এতৎসম্পর্কে গত ১০ই আগষ্ট নেপালী কংগ্রেসের কলিকাতা শাখার উদ্যোগে কলিকাতা প্রবাসী নেপালীদের এক সভায় নেপালের রাজা ত্রিভুবন কর্তৃক নিজ হস্তে দেশের শাসনভার গ্রহণ প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয় এবং ইহাকে অগণতান্ত্রিক ও অসময়োচিত সিদ্ধান্তরূপে মন্তব্য করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, নূতন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান মন্ত্রিসভারই শাসনকার্য চালাইয়া যাওয়া কর্তব্য। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বিভিন্ন বক্তা বলেন যে,—গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নেপালের জনসাধারণ দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিয়াছিল। সেই ক্ষমতা কথঞ্চিৎ জনসাধারণের হাতে আসিবার অল্পদিনের মধ্যে রাজা পুনরায় তাহা হরণ করিয়া লইতেছেন। ইহাতে নেপালে স্বৈরতন্ত্রের পুনরাবির্ভাবের সূত্রপাতই ঘোষণা করিতেছে।

স্থির হইয়াছে যে, সাম্প্রতিক কালের জন্য রাজা ত্রিভুবনই নেপালের শাসনকার্য চালাইয়া যাইবেন এবং একটি উপদেষ্টা বোর্ড তাঁহাকে শাসনকার্যে সহায়তা করিবে। উপরোক্ত সভার মন্তব্যানুসারে একথা এখনই জোর করিয়া বলা যায় না যে, নবনিযুক্ত উপদেষ্টা কমিটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া রাজা তাঁহার নিজের হাতের শাসনক্ষমতাকে অধিককাল অব্যাহত রাখিবেন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রয়াসকে রাজা ত্রিভুবন কোণঠাসা করিয়া মারিবেন, এমন বিশ্বাস আমরা করি না। সাম্প্রতিক এই বিশৃঙ্খলার মুহূর্তটি অতিবাহিত হইলেই তাহা নির্বিঘ্নে সম্ভব হইয়া উঠিবে বলিয়াই আমরা মনে করি। তবে 'কালস্য কুটিলা গতি'। পরবর্তী অবস্থার জন্য আমরা তীব্র কৌতূহল লইয়াই অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

মিশর সমস্যা

গত ২২শে জুলাই মিশরীয় সেনাবাহিনীর এক আকস্মিক অভ্যুত্থান লক্ষ্য করা গেল। রক্তপাতহীন সংগ্রামের দ্বারা তাহারা বিজয় অভিযাত্রীর মতো অকস্মাৎ রাজধানী দখল করিয়া বসে। জেনারেল মহম্মদ নাগুইব এই বিদ্রোহ পরিচালনা করেন এবং নিজেকে সকল সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক বলিয়া ঘোষণা করেন। সেনাবিভাগীয় অফিসারগণের পক্ষ হইতে প্রেরিত প্রতিনিধি দল যে সকল দাবী পেশ করেন, প্রধানতঃ সেইগুলি হইতেছেঃ (১) সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ফিল্ড্ মার্শাল মহম্মদ হায়দার

এবং তাঁহার চীফ অব স্টাফ জেনারেল হুসেন ফরিদ বে-কে পদচ্যুত করিয়া মিশরীয় বাহিনীর সেনাধ্যক্ষমণ্ডলীর পরিবর্তন ; (২) সেনাবিভাগীয় ক্রয়-কমিশনের গঠন-বিধির আমূল সংশোধন এবং (৩) সামরিক ব্যয়-বরাদ্দ হ্রাস বন্ধ করিতে হইবে।' —এই সর্তগুলি মানিয়া লওয়া হইবে বলিয়া মন্ত্রিসভার জরুরী বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরেই সৈন্যগণ সেনাবিভাগীয় বর্তমান কর্মকর্তাগণকে অপসরণের এবং দেশের রাজনৈতিক জীবন কলঙ্কমুক্ত করার দাবী জানায়। সঙ্গে সঙ্গে মিশরের সরকারী বেতার ভবনটিও দখল করা হয়। সেনাবাহিনী ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী আলী মেহের পাশাকে 'আপৎকালীন' প্রধানমন্ত্রীরূপে অভিষিক্ত করে। রাজা ফারুক মিশরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া-স্থিত মন্তাজা প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন ; আলী মেহের পাশা মিশরের সর্বশেষ রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি রাজা ফারুকের গোচরীভূত করেন এবং সেই-সঙ্গে মন্ত্রিসভার নামের তালিকাও ঘোষণা করেন। অতঃপর রাজকীয় অনুজ্ঞাবলে তিনি মিশরের সামরিক গভর্ণর নিযুক্ত হন। স্থির হয়—২৮শে জুলাই গভর্ণমেণ্ট আলেকজান্দ্রিয়া হইতে কায়রোতে স্থানান্তরিত হইবে।

রাজা ফারুক গত ২৬শে জুলাই সিংহাসন ত্যাগ করেন বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়। বিদ্রোহী সেনাদলের নির্দেশেই তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেন। তাঁহার এই সিংহাসন ত্যাগের ফলে তাঁহার সাতমাস বয়স্ক পুত্র এখন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন। এটি রাণী নরীম্যানের গর্ভজাত সন্তান। রাজা ফারুকের বর্তমান বয়স মাত্র ৩২ বৎসর। তাঁহার রাজ্যকাল প্রায় ১৭ বৎসর। তাঁহার পুত্র যুবরাজ আমেদ দাউদ গত ১৬ই জানুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ফারুক রাণী ফরিদাকে ত্যাগ করিয়া রাজমাতা নরীম্যানকে বিবাহ করেন আধুনিক মিশরের শাসক পরিবার মহম্মদ আলীর বংশের পুরুষদের মধ্যে রাজা ফারুকের ৭৫ বৎসর বয়স্ক পিতৃব্য মসেদ আলী ভিন্ন আর কেহ জীবিত নাই। যুবরাজ আমেদ দাউদের জন্মের পূর্ব পর্যন্ত ইনিই রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ছিলেন। ইনি অকৃতদার।

রাজা ফারুকের সিংহাসন ত্যাগের কথা ঘোষিত হইবার পর হইতে মিশরের সর্বত্র অবস্থা অনেকখানি শান্ত হয়। ২৬শে জুলাই রাত্রে মিশর গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ফারুকের সাতমাস বয়স্ক পুত্র আহমদ ফুয়াদকে মিশর ও সুদানের রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। জনসাধারণের নিকট এক আবেদনের আকারে ইহা প্রচার করিয়া গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা জাতির পক্ষ হইতে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা গ্রহণ করিলেন। এই ক্ষমতা সংবিধান অনুযায়ী রিজেন্সী কাউন্সিলের নিকট হস্তান্তর না করা পর্যন্ত তাঁহারা স্বহস্তে রাখিবেন। রাজা ফারুক এই চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী দলটিকে চূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের ঘোষণায় বলা হয়ঃ 'রাজা ফারুক যখন যুবরাজের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া মিশর ছাড়িয়া যাইতেছেন, তখন মন্ত্রিসভা মহামান্য আহমদ ফুয়াদকে মিশর ও সুদানের রাজারূপে গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহার রাজত্বে মিশরের ভাগ্যলিপি সফল হউক।' রাজা ফারুক তাঁহার সিংহাসন ত্যাগের বাণীতে বলেনঃ 'যেহেতু আমরা জাতির হিত ও সমৃদ্ধি চাই এবং যেহেতু আমরা দেশকে উহার সম্মুখীন বাধাবিপত্তি হইতে মুক্ত দেখিতে চাই, সেইহেতু জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী আমরা যুবরাজ আহমদ ফুয়াদের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগের সিদ্ধান্ত করিয়াছি। আমরা প্রধানমন্ত্রী আলী মেহের পাশাকে বর্তমান সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করিবার নির্দেশ দিতেছি।'

অতঃপর নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া মিশরের নূতন রিজেন্ট্‌স্ কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে, যথাঃ (১) প্রধানমন্ত্রী আলী মেহের পাশা (সভাপতি) ; (২) মিশরী সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি মার্শাল ফেরি মহম্মদ নাগুইব বে ; (৩) কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেক্টর লুৎফী এল সৈয়দ পাশা ; (৪) রাজ্য-পরিষদের প্রেসিডেণ্ট ও প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী আবদুল রাজেক সানোরী পাশ এবং (৫) ওয়াফদ দলের সদস্য ও সেনেটের প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট জাকি ওয়াবি পাশা।

জেনারেল নাগুইব ঘোষণা করেন যে, 'আমাদের এই সামরিক প্রচেষ্টার সহিত রাজনীতির কোনই সম্পর্ক নাই। সেনাবাহিনী ও দেশের শাসনযন্ত্রের সংস্কারসাধনের উদ্দেশ্যেই এই সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।' ওয়াফদ দলের বিচক্ষণ নেতা নাহাশ পাশা বিদ্রোহের নেতা জেঃ নাগুইবকে 'জাতির মুক্তিদাতা'রূপে অভিনন্দিত করেন।

স্থির হইয়াছে—আগামী ১৭ বৎসর অর্থাৎ যতদিন না শিশুরাজা আহমদ ফুয়াদ সাবালকত্ব লাভ করিতেছে, ততদিন মিশরের এই রিজেন্সী কাউন্সিলই দেশের সার্বভৌম প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পাইতে থাকিবে। কর্তৃপক্ষ মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, মিশরস্থ বৃটিশ দূত স্যার

র‍্যালফ স্টিভেনসনকে শিশুরাজা ২য় আহমদ ফুয়াদের দরবারে প্রেরণ করিতে বৃটেন প্রস্তুত নয়। রাজা ফারুক সিংহাসন ত্যাগ করায় মিশররাজকে সুদানেরও অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবার প্রশ্নটি এক নূতন আকার ধারণ করিয়াছে।

মিশর হইতে বিদায়ের প্রাক্কালে রাজা ফারুক সাংবাদিকগণকে বলেনঃ 'এই ক্ষুদ্র পরিবার—স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি—ইহাই আজ আমার সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য লইয়া আমাকে শান্তিপূর্ণ স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগ দিন। স্বদেশ হইতে আজ আমি নির্বাসিত। কিন্তু মিশরের প্রতি, মিশরীয়গণের প্রতি আমার ভালোবাসা বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায় নাই। আজ যাঁহারা মিশরে শাসন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আমার দেশকে আমি ভালোবাসি—চিরদিন আমি দেশের কল্যাণ কামনা করিব।'

বিদায়ী রাজা ফারুকের এই কল্যাণ কামনায় অতঃপর মিশরের তথা মিশরের এই নয়া শাসকগোষ্ঠীর যথার্থই কিছু কল্যাণ হইবে কিনা—তাহা ভবিতব্যের প্রচ্ছন্নতার মধ্যেই নিহিত।

ইন্‌ষ্টিটিউট অব এ্যাক্‌চুয়ারিজের নবনির্ব্বাচিত ফেলো শ্রীযুক্ত পি. কে. ঘোষ

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার ঘোষ সম্প্রতি ইনষ্টিটিউট অব এ্যাক্‌চুয়ারিজের ফেলো নির্বাচিত হওয়ায় তাঁহাকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। গত দীর্ঘকাল যাবৎ শ্রীযুক্ত ঘোষ মেট্রোপলিটান ইন্‌স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের এ্যাক্‌চুয়ারী হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত রহিয়াছেন। তিনি স্বল্পভাষী, কর্মঠ ও উদ্দমশীল পুরুষ। তাঁহার এ্যাথ্‌লেট্‌ধর্মী মন চিরকালই সজীব ও ক্রীড়ামোদী। তাঁহার এই সজীব সবুজতা অক্ষয় হউক এবং ক্রমাগত তিনি এইরূপ সম্মান হইতে উচ্চতর সম্মানের অধিকারী হইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন, এই কামনা করি।

পরলোকে কবি মোহিতলাল মজুমদার

রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম প্রতিভাবান কবি, সমালোচক ও শিক্ষাবিদ শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের আকস্মিক মৃত্যু বিনামেঘে বজ্রপাতের মতই সহসা বাঙালী-চিত্তে আসিয়া আঘাত হানিল। সাহিত্য ও কাব্য সাধনা ছিল মোহিতলালের জীবন-সাধনা। সেই সাধনায় কোথাও খাদ ছিল না। বঙ্গভারতীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া একদিকে যেমন সিদ্ধ যোগীর মতো তিনি বঙ্গ-ভারতীর পায়ে পাদ্যার্ঘ্য রচনা করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি প্রাণ দিয়া ভালোবাসিয়াছেন বাঙালী জাতিকে, বাংলা দেশকে। তাঁহার সেই অকৃত্রিম ভালোবাসাই সহস্র পুষ্পস্তবকে রূপান্তরিত হইয়া বাগ্দেবীর চরণ-বন্দনায় নিবেদিত হইয়াছে। দেশ এবং সাহিত্যের প্রতি এমন অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ইতিহাসে বিরল। একমাত্র পিতৃদত্ত নাম ব্যবহার করিয়াই তিনি জীবনে সুখী হইতে পারেন নাই, জীবন-সাধনায় ব্রতী হইয়া তিনি নিজেকে সত্যসুন্দর দাস নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। নিজেকে তিনি সত্য ও সুন্দরের দাস মনে করিতেন। সত্য ও সুন্দরের সাধনাই ছিল তাঁহার জীবন-সাধনা। বাঙলা সাহিত্যে কোনোক্রমেই যাহাতে অশিব বা অশুভ কিছু প্রবেশ করিতে না পারে, সেইদিকে ছিল তাঁহার আমৃত্যু প্রচেষ্টা। ইহা লইয়া বহু ব্যক্তির সহিত মোহিতলালের মতান্তর ঘটিয়াছে, এমন কি সেই মতান্তর কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনান্তরে পর্যবসিত হইয়াছে, কিন্তু সাধন-ক্ষেত্রে কোনো একটি মুহূর্তের জন্যও তিনি বিচলিত বা নীতিভ্রষ্ট হন নাই। বঙ্গশ্রীর পৃষ্ঠা একসময় তাঁহার অজস্র দানে ভরিয়া উঠিয়াছে। পিতৃদত্ত ও স্ব-গৃহীত উভয় নামেই তিনি নিয়মিত প্রতিমাসে বঙ্গশ্রীতে লিখিয়াছেন। তাহা বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণ-সম্পদ হইয়া আছে।

গত ৩০ বৎসরেরও অধিক কালব্যাপী বঙ্গ-সাহিত্যের সাধনা করিয়া মোহিতলাল শেষ বয়সে নীরবে নিভৃতে কলিকাতার উপকণ্ঠে বরিষায় একরূপ অবসর জীবনই যাপন করিতেছিলেন। কিন্তু সাহিত্যের আহ্বান তাঁহাকে কখনও নির্লিপ্ত থাকিতে দেয় নাই। মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পূর্বেও তিনি নূতন উদ্যমে 'বঙ্গ-ভারতী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা সুরু করেন। ইহার মাত্র দুইটি সংখ্যা বাহির হয়। ইহার পূর্বে তিনি 'বঙ্গ-দর্শন' (নব পর্য্যায়ে) সম্পাদনা করেন। জীবনের সুদীর্ঘকাল তিনি 'ভারতী', 'শনিবারের চিঠি', 'বঙ্গশ্রী', 'প্রবাসী' প্রভৃতি মাসিক পত্রে স্বনামে ও ছদ্মনামে অসংখ্য নির্ভীক সমালোচনা লিখিয়া বাঙলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। 'সত্যসুন্দর দাস' এই ছদ্মনামে শুধু বঙ্গশ্রীতেই মাত্র নয়, বহু সাময়িক পত্রেই তিনি যে সব প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সেগুলি বাঙলা সাহিত্যে বিশেষ স্মরণীয় হইয়া আছে। কবি হিসাবে সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি প্রথম প্রবেশ করিলেও সমালোচক হিসাবেই তিনি উত্তরকালে প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বপন পসারী'। তাঁহার 'বিস্মরণী', 'স্মর-গরল', 'হেমন্ত গোধূলি' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ বাঙলা কাব্য-সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ। 'আধুনিক বাঙলা সাহিত্য', 'সাহিত্য কথা', 'বিচিত্র কথা', 'বিবিধ কথা', 'বঙ্কিম বরণ', 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র', 'সাহিত্য বিতান', 'রবি প্রদক্ষিণ' প্রভৃতি তাঁহার সমালোচনা সাহিত্যের অন্যতম গ্রন্থ।

বাংলা ১২৯৫ সালের ১১ই কার্ত্তিক নদীয়া জেলার কাঁচরাপাড়া গ্রামে মোহিতলাল মাতুলালয়ে বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার জিরাট বলাগড় গ্রাম। পিতার নাম নন্দলাল মজুমদার। মাতার নাম হেমমালা দেবী। পিতা ছিলেন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের নিকট-জ্ঞাতিভ্রাতা। দেবেন্দ্রনাথের পিতারও পূর্ব উপাধি ছিল 'মজুমদার'। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বংশও তাঁহার মাতুল বংশেরই এক শাখা। মোহিতলালের কৈশোর ও স্কুল-জীবন বলাগড় গ্রামেই অতিবাহিত হয়; বাল্যে কিছুকাল কাঁচরাপাড়ার নিকটবর্তী হালিসহরে মায়ের মাতুলালয়ে থাকিয়া তথাকার স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। ১৯০৮ সালে তিনি মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউশন (বিদ্যাসাগর কলেজ) হইতে বি-এ পাশ করেন। এক যায়গায় তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার মানস-প্রকৃতির উন্মেষে ও সাহিত্যিক সাধন-পন্থার নির্দ্দেশে তাঁহার পিতার চরিত্র ও তন্নিহিত আদর্শ এবং পিতারই কবি-স্বভাব ও কাব্য-প্রীতি প্রকৃত সহায় হইয়াছে; সে বিষয়ে পিতাই তাঁহার শিক্ষা ও দীক্ষা গুরু। বাঙলা সাহিত্যের সেবায় যদি তাঁহার কিছুমাত্র অধিকার জন্মিয়া থাকে, তবে তাঁহার জন্য তিনি সর্বতোভাবে তাঁহার পিতার নিকট ঋণী। —বি-এ পাশ করিয়া মোহিতলাল কিছুকাল বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া মোহিতলাল কলিকাতায় আসিয়া অনন্যচিত্তে সাহিত্যসাধনায় নিমগ্ন হন। সেই সময় তিনি বঙ্গ-দর্শনের (নব পর্য্যায়) সম্পাদনা সুরু করেন। গত বৎসর বঙ্গবাসী কলেজে বাঙলায় এম্-এ ক্লাশ খোলা হইলে তিনি কিছুকাল ঐ কলেজে অধ্যাপনা করেন। তাঁহার বক্তৃতার অপূর্ব ভঙ্গীতে সাহিত্যরসপিপাসুদের চিত্ত সব সময়ই মোহিত হইত। প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে তাঁহার সুশ্রূষাকারীদের নিকট জানা যায় যে, কঠিন রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্বন্ধে সূক্ষ্ম আলোচনা করিতে চেষ্টা করিতেন। —মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার স্ত্রী, সাত পুত্র ও একমাত্র ভগিনী রাখিয়া যান। বাণীর সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া মোহিতলাল জীবনে কোনোদিন লক্ষ্মীর বরলাভ করিতে পারেন নাই। তাই বলিয়া দারিদ্র্য কখনও তাঁহাকে অবদমিত করিতে পারে নাই। অন্তর-রাজ্যে তিনি ছিলেন সম্রাট। সেখানে তিনি বিপুল গৌরবে সিংহাসনে আরূঢ়। রাজার মতোই তিনি বাংলা সাহিত্যকে আজীবন লালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের একটা দিক আজ রাজন্য-ঐতিহ্য হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। ভগবান তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি বিধান করুন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আশ্বস্ত করুন।

তরল আলতা
বলতে বোঝায় সুপ্রসিদ্ধ পি, সি, দাসের "সুবাসিত তরল আলতা" যে—শত বৎসর ধ'রে সুনাম অক্ষুন্ন রেখে সমজাবে চ'লে আসছে। মাত্র একবার ব্যবহারেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান হয় – কারন তারপর আর কোন আলতায় মেয়েদের মন ভরে না-------
আলতা-সিন্দুর-স্নো-ক্রীম
সকল সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠানেই পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড
৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

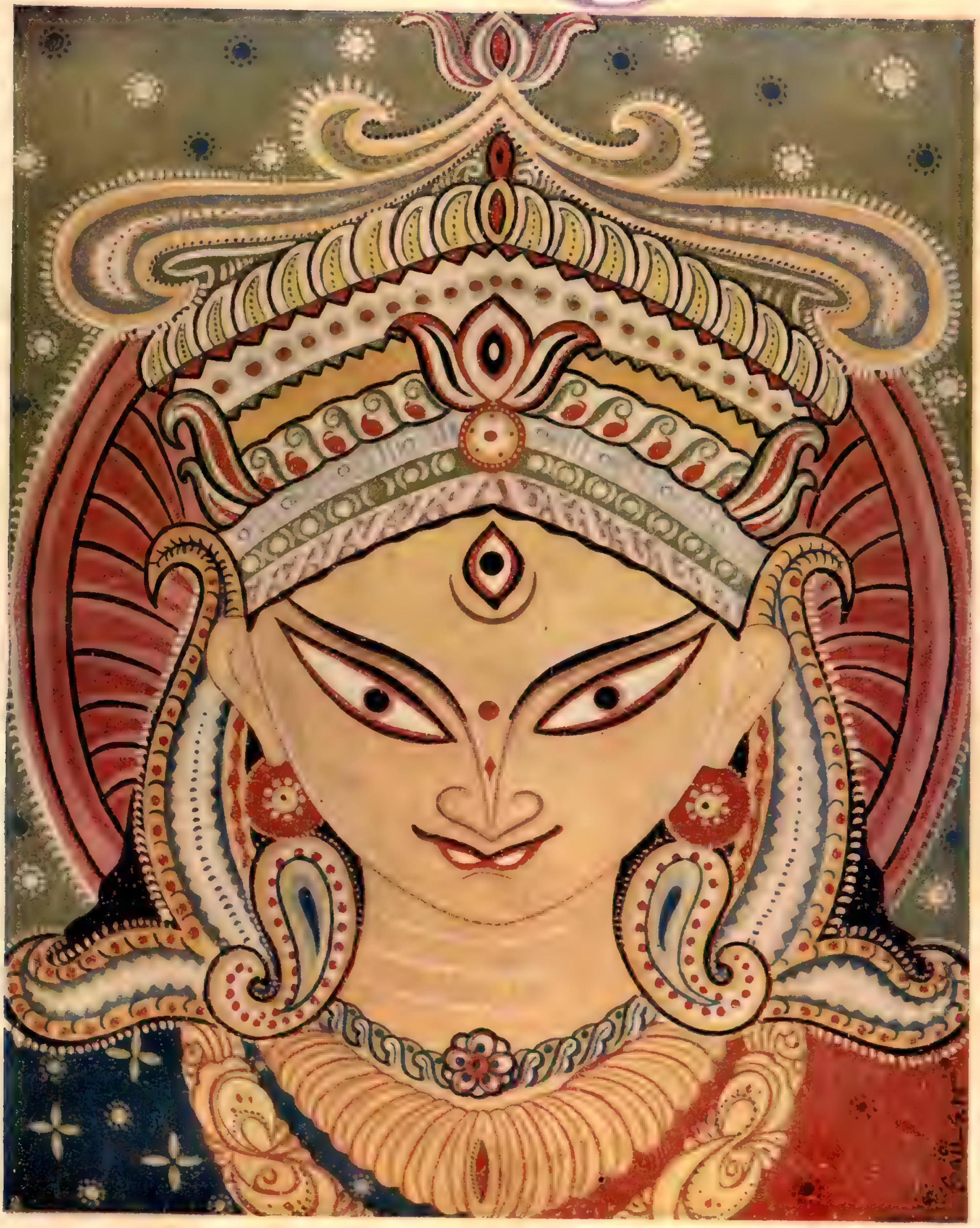

"শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে ।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্তু তে ॥"

শিল্পী—শৈলেন দাস

CENTRAL LIBRARY

বিংশ বর্ষ   শারদীয়া আশ্বিন—১৩৫৯   ১ম খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা

বাংলা সাহিত্যে আগমনী-বিজয়া গান

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতব্যাপী বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবনে একদা সমাজজীবনে একটা নিদারুণ নিষ্ক্রিয়তা এসে গিয়েছিল। সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। বাঙ্গলা দেশ দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধপ্রভাব মুক্ত হ'তে পারে নি। ফলে সমাজ জীবনে নিরাশক্তি ও নিশ্চেষ্টতা দেখা দিয়েছিল। তাই বাঙ্গালীর সুপ্রাচীন লৌকিক দেবতা শিবের প্রাধান্য ছিল তখন। শিবকে যদিও প্রথমে কৃষকের দেবতা ব'লেই কল্পনা করা হয়েছিল, কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরই তিনি পৌরাণিক শিব হয়ে উঠেছেন। কিন্তু উভয়েরই রূপ এক। উভয়েই বাস্তব সংসারে নিরাসক্ত, নিস্পৃহ, নির্ব্বিকার। বুদ্ধের জীবনাদর্শ থেকেই শিবের পরিকল্পনা।

কিন্তু রাজনৈতিক কারণে সমাজে ও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যখন বড় রকমের কোন পরিবর্ত্তন আসে, ধর্ম্মতত্ত্বেরও তখন পরিবর্ত্তন ঘটে। যুগে যুগে এমনই হয়ে এসেছে। তাই দেখি বৌদ্ধধর্ম্ম যখন এদেশে শিকড় বিস্তার ক'রে বসেছে, তখন ক্রমে তার বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছে। ক্রমে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়।

মুসলমান রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে দেশে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দেখা দিল। সমাজে ও রাষ্ট্রে সমস্ত কিছুই বিচলিত হয়ে উঠলো, শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিপর্য্যয় দেখা দিল। মানুষের মনের ভারকেন্দ্র হ'ল কক্ষচ্যুত। এই অবস্থায় লোকে আর নিশ্চেষ্ট শিবকে আশ্রয় ক'রে থাকতে পারলো না। শিবের উপাসনা ত্যাগ ক'রে তারা শক্তি উপাসক হয়ে উঠলো।

আর্য্য সমাজে স্ত্রীদেবতার স্থান ছিল না। অনার্য্য সভ্যতার যুগে এদেশে মাতৃকাপূজার প্রচলন ছিল। মোহেন-জো-দারো ও হরপ্পার আবিষ্কারে তার প্রমাণ

মিলেছে। পরবর্ত্তীকালে আর্য্যেরা অনার্য্যদের কাছ থেকেই এই আদর্শ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু স্ত্রী দেবতাকে সর্ব্বশক্তিময়ী ব'লে কল্পনা করা হয়েছিল আরও পরে। তাই চণ্ডীমঙ্গল মনসামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে দেখি এই স্ত্রী-দেবতারই জয়গান। কারণ মানুষ তার সঙ্কট ও বিপদের মধ্যে এমন কাউকে চেয়েছিল যে তাদের ত্রাণ ক'রতে, উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবে। তাই শিবের বিরুদ্ধে শক্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল।

পরবর্ত্তীকালে রাষ্ট্রীয় জীবনে যখন আবার পরিবর্ত্তন দেখা দিল, যখন এই অশান্ত অবস্থার অবসান হ'ল, তখন এই শক্তিকেই দেখতে পাওয়া গেল আবার অন্যরূপে। কারণ তখন আর শক্তি স্ত্রীদেবতার বিপত্তারিণী মূর্ত্তির প্রয়োজন নেই, তাই তিনি দেখা দিলেন কল্যাণের মূর্ত্তিতে, স্নেহ-মমতার মূর্ত্তিতে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা মুকুন্দরামের সময় থেকেই মঙ্গলকাব্যগুলির ওপর সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব দেখা দিতে থাকে। ফলে লৌকিক কাব্যগুলির রূপ পরিবর্ত্তিত হ'তে আরম্ভ হয়। মুকুন্দ-পরবর্ত্তী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলির ওপর বিশেষ প্রভাব দেখা যায় সংস্কৃত মার্কণ্ডেয় পুরাণের। ক্রমে এই পুরাণোক্ত চণ্ডীই লৌকিক চণ্ডীকে অপসারিত করে। এই পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীর কাহিনী অবলম্বনে বাংলায় রচনা আরম্ভ হয়। এইগুলিই 'দুর্গা-মঙ্গল' নামে অভিহিত। এই পুরাণোক্ত উমা-মেনকার কাহিনী থেকেই বাংলা সাহিত্যে আগমনী-বিজয়ার গান রচিত হয়।

বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি, তাই বাংলা সাহিত্যে গীতিকাব্যের প্রাধান্য অত্যন্ত বেশী। চর্য্যাপদ ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে সুরু করে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী প্রভৃতি গীতি-কবিতা দিয়েই বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন হয়। এই জন্যই এদেশ এক সময় বৈষ্ণবধর্ম্মের বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যের মাধুর্য্য, গীতি-প্রাণতা বাঙ্গালীর মনকে সিক্ত ক'রে তুলেছিল। এই বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাবের ফলেই মঙ্গলকাব্যের রুদ্র চণ্ডী পরবর্ত্তীকালে স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আগমনী-বিজয়া গান রচনার মূলে আছে বৈষ্ণব গীতি-কবিতার প্রভাব। উভয়েরই মূল সুর মধুর রস। তবে বৈষ্ণব কবিতায় ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রাধান্য, আর আগমনী-বিজয়া গান ব্যক্তির গণ্ডী অতিক্রম ক'রে সংসারের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। বৈষ্ণব কবিতার বিষয়বস্তু কতকটা আত্মগত, কিন্তু আগমনী-বিজয়া গানে সাংসারিক শোক-তাপ, স্নেহ-মমতার সুস্পষ্ট চিত্রের মারফৎ একেবারে সোজাসুজি প্রবেশ করা হয়েছে বাঙ্গালীর মানসরাজ্যে। এই মাটির পৃথিবীকে ঘিরেই আগমনী-বিজয়া গানের সৃষ্টি, কিন্তু বৈষ্ণব কবিতা মাটিকে ছাড়িয়ে ভাবরাজ্যে প্রবেশ করেছে। আগমনী-বিজয়া গানে পাই নিখুঁত গার্হস্থ্য চিত্র।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, পৌরাণিক শিবের কাহিনী অবলম্বনেই আগমনী-বিজয়া গানের আখ্যানভাগ গ'ড়ে উঠেছে। গিরিরাজ হিমালয় ঐশ্বর্য্যশালী; কিন্তু তাঁর পরম আদরের কন্যা উমার বিবাহ হয়েছে দরিদ্র শিবের সঙ্গে। বিবাহের পরে রাজকন্যা চ'লে গেলেন দরিদ্র স্বামীর সংসার ক'রতে। হিমালয়ের পত্নী মেনকার কন্যাগত প্রাণ। তাঁর স্নেহবিগলিত অন্তরে উমার অনুপস্থিতি অসহ্য হয়ে উঠলো। অবশেষে এক শারদরাতে কন্যাকে স্বপ্নে দেখে মেনকার মাতৃহৃদয় আকুল হয়ে উঠলো। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। এই শারদোৎসবেই কন্যাকে পিতৃগৃহে আনার জন্য তিনি স্বামীকে অনুনয়-বিনয় করলেন।

উমার অবস্থাও মায়ের অনুরূপ। তিনিও মাকে স্বপ্নে দর্শন ক'রে বিচলিতা হয়ে উঠলেন। পিতামাতার দর্শন লাভের জন্য তিনি স্বামীর নিকট মাত্র তিনটি দিন সময় প্রার্থনা করে পিতৃগৃহের উদ্দেশে রওনা হলেন। উমার পিতৃগৃহে আগমনকে কেন্দ্র ক'রেই আগমনী গানের উদ্ভব।

কন্যার আগমনে মাতার অন্তরে আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু এই মিলনের মেয়াদ মাত্র তিন দিনের। তিন দিন উত্তীর্ণ হওয়ার পর আবার বিষাদের সুর বেজে উঠলো। উমা আবার স্বামীগৃহে যাত্রা করলেন। উমার পিতৃগৃহ থেকে বিদায় গ্রহণকে কেন্দ্র ক'রেই বিজয়া গানের উৎপত্তি।

আগমনী-বিজয়া গানের বিষয়বস্তু বাঙালীর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আগমনী-বিজয়া গানের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এর সর্ব্বজনীন আবেদন। মেনকা-উমার কাহিনী প্রত্যেকটি বাঙালী ঘরের কাহিনী। আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ নিয়ে একেবারে ঘরোয়া একটা চিত্র ফুটে উঠেছে এই শ্রেণীর গীতি-কবিতাগুলির মধ্যে। তার মধ্যে আছে সারল্য ও বাস্তবতা, আছে আন্তরিকতা ও মানবিকতা।

জীবনে আনন্দ যেমন সত্য, দুঃখও তেমনি বড় সত্য। শুধুমাত্র আনন্দ জীবনকে পূর্ণতা দেয় না। আনন্দ ও দুঃখের সংমিশ্রণেই পরিপূর্ণতা। আগমনী-বিজয়া গীতি-কবিতার মধ্যেও জীবনের এই সত্যটিই প্রকাশিত হয়েছে। জীবনের একদিকে আগমনীর আনন্দ, অপরদিকে বিজয়ার বেদনা।

আগমনী গানের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন। তাঁর পূর্ব্বে উমা ও মেনকাকে নিয়ে বাৎসল্য রসের এমন অপূর্ব্ব ছবি আর কোন কবি আঁকেননি। সম্ভবতঃ ১৭১৮ থেকে ১৭২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে রামপ্রসাদ হালিসহর পরগণার কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তিরসাত্মক খণ্ড গীতি-কবিতা রচনায় রামপ্রসাদ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বোধ করি সে যুগে এই শ্রেণীর কবিতা রচনায় রামপ্রসাদ ছিলেন অদ্বিতীয়। মাতৃ-মন্ত্রের মহাশক্তির খেলা চলেছিল যাঁর অন্তরে নিরন্তর, সেই প্রেমিক সাধক ভক্ত রামপ্রসাদের পদাবলী যে ভক্তিরসের আকর তা বলাই বাহুল্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মাতৃভাব সাধনার প্রবর্ত্তন করেছিলেন বোধ করি কবি রামপ্রসাদ।

রামপ্রসাদের প্রত্যেকটি পদে যে সাহসিকতা ও নির্ভীকতা লক্ষ্য করা যায়, ঈশ্বরকে মাতৃভাবে উপাসনার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। মা আর সন্তান যেমন পরস্পরে সহজভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, রামপ্রসাদের কলমেও উমা-মেনকার চরিত্র তেমনিভাবে ফুটে উঠেছে। তাই তাঁর রচিত পদগুলিতে এত নির্ভীকতা। উমার পিতৃগৃহে আগমনকে উপলক্ষ্য ক'রে মেনকা গিরিরাজকে বলছেন—

গিরি! এবার আমার উমা এলে
আর তারে পাঠাব না।
বলে বলুবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয় উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়ে ঝিয়ে করবো ঝগড়া
জামাই বলে মান্‌বো না।

এই পদে মেনকার মধ্যে খাঁটি বাঙালী মায়ের রূপ ফুটে উঠেছে। এখানে মেনকার দৃপ্ত মূর্ত্তি লক্ষ্য করবার মত। কিন্তু মেনকা সন্তানের মা। তাঁর চরিত্র শুধু কঠিন মাত্র নয়, কঠিনে-কোমলে মিশে সে অপরূপ। তাই উপরে উদ্ধৃত পদে যদিও দেখি যে মেনকা বলছেন, 'জামাই উমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এলেও তার সঙ্গে ঝগড়া করবো, মেয়েকে আর পাঠাবো না, তাতে লোকে যে যাই বলুক না কেন,' কিন্তু তিন দিন অন্তে যখন বিজয়ার সকরুণ বিদায় রাগিণীতে আকাশ-বাতাস ভ'রে উঠলো, তখন মেনকার আর এক রূপ দেখতে পাই। মেনকা তখন বলেন—

ওহে প্রাণনাথ, গিরিবর হে,
ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বোসে মহাকাল,
বেরোও গণেশমাতা, ডাকে বার বার॥

মেনকা এখন বুঝেছেন যে "তনয়া পরের ধন"। তাই তাঁর সুরও গেছে পরিবর্ত্তিত হয়ে। মেনকা একদিকে বজ্রের মত কঠোর, অন্যদিকে কুসুমের মত কোমল।

প্রসাদের গীতি-কবিতার প্রধান বিষয়বস্তু মা। মা আর সন্তানের মধ্যে যে স্নেহ-আব্দারের সম্পর্ক বিদ্যমান, প্রসাদের আগমনী-বিজয়া গীতি-কবিতায় মেনকা-উমার মধ্যে তার সার্থক প্রকাশ দেখি। দু' একটি মাত্র কথায় মায়ের স্নেহাকুল অন্তরের ছবি এমন ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সে যুগের আর কোন কবিকে

দেখি না। সপ্তমীর শুভ প্রত্যুষে উমা পিতৃগৃহে এসেছে শুনে মেনকা কেশবাসের প্রতি দৃকপাত না করেই ছুটে চলেছেন—

শুনিয়া এ শুভ বাণী এলো চুলে ধায় রাণী,
বসন না সম্বরে।

'আগমনী'র আর একটি পদে মায়ের অন্তরের ব্যাকুলতা আরও সুন্দরভাবে ফুটেছে—

রাণী ভাসে প্রেম জলে দ্রুত গতি চলে,
খসিল কুন্তল ভার।
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে,
গৌরী কতদূরে আর গো॥

'আগমনী'র অপর একটি পদে দেখি গৌরীর আগমন-বার্ত্তা পেয়ে ছুটে চলেছেন মেনকা—

যেতে যেতে পথ উপনীত রথ
নিরখি বদন উমার।
বলে মা এলে মা এলে মা কি মা ভুলে ছিলে?
মা বলে এ কি কথা মার গো॥
রথ হোতে নাবিয়া শঙ্করী, মায়ে প্রণাম করি,
সান্ত্বনা করে বার বার।

তারপর কন্যার বিদায় মুহূর্ত্তে রাজ্যের বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে মেনকার হৃদয়ে। 'বিজয়া'র একটি পদে মেনকা গিরিরাজকে বলছেন—

তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ, না হোলো বিদার।

এক বৎসর কাল কন্যার অদর্শনে মেনকা মৃতপ্রায়া হয়ে উঠেছেন। তাই এক বৎসর কাল পরে কন্যার সঙ্গে পুনর্মিলনের দৃশ্য এত মনোরম। মেনকা বলছেন—

বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা থুলে,
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে।

'আগমনী'র কবিতায় মায়ের অন্তরের এতখানি স্নেহ প্রকাশ পেয়েছে ব'লেই 'বিজয়া'র কবিতায় এতটা কারুণ্য সম্ভব হয়েছে। আগমনী-বিজয়া কবিতা পরস্পরের অনুপূরক। আগমনীর আনন্দ না থাকলে বিজয়ার বেদনা এত সুতীব্র হ'ত না; আবার বিজয়ার বেদনা আছে ব'লেই আগমনীতে এত আনন্দ।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ ক'রেই আমরা প্রসাদ কবির প্রসঙ্গ শেষ করবো। রামপ্রসাদের গীতি-কবিতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ভাষায় ও ভাবে সামঞ্জস্য। রামপ্রসাদ ভক্ত, রামপ্রসাদ সাধক। তাই তাঁর পদাবলীতে ভক্তিরসের বান ডেকে গেছে। ভক্তমনের যে আকুলতা তাঁর প্রত্যেকটি গীতিকবিতার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তাঁর আশ্চর্য্য ভাষার জন্যেই তা সম্ভব হয়েছে। ভাষায় এমন সুস্পষ্টতা, আন্তরিকতা ও প্রাণের স্পন্দন সে যুগে এক বিস্ময়।

রামপ্রসাদের পরবর্ত্তীকালে বহু কবি এই জাতীয় গীতি-কবিতা রচনা করে গিয়েছেন, কিন্তু উৎকর্ষতার দিক থেকে অধিকাংশই অনুল্লেখযোগ্য। তবে পরবর্ত্তীকালে অন্ততঃ একজন কবিওয়ালা এদিক থেকে কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কবি-গানের স্বর্ণযুগ বলা যায়। এই সময় যে সকল কবিওয়ালা আগমনী ও বিরহ সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাম বসুর স্থান সর্ব্বোচ্চে। এই শ্রেণীর গীতি-কবিতা রচনায় রামপ্রসাদের পরেই রাম বসুর উল্লেখ করতে হয়। রাম বসু ১৭৮৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৮২৮ সালে।

আগমনী গান রচনায় রাম বসু যে সাধক রামপ্রসাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন একথা অস্বীকার করা যায় না। তাই রাম বসুর গানেও সারল্য ও আন্তরিকতা লক্ষ্য করা যায়, সুখ দুঃখের সংমিশ্রণে একটা পারিবারিক আবেষ্টনীর মধুর স্পর্শ লাভ করা যায়।

রাম বসুর মেনকা গিরিরাজের কাছে যে ভাবে অভিযোগ পেশ করেছেন, তাতেই তাঁর কন্যাবিরহে কাতর হৃদয়ের সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে—

তবে নাকি উমার তত্ত্ব কোরেছিলে।
গিরিরাজ ওহে শুন শুন
তোমার মেয়ে কি বলে॥

নারী প্রবোধিয়ে যেতে হে
কৈলাসে যাই বোলে।
এসে বলতে মেনকা তোমার দুঃখের কথা,
উমা সব শুনেছে।
তোমায় দেখতে পাষাণী, আপনি ঈশানী
আসতে চেয়েছে।
তুমি গিয়েছিলে বই উমা বলে ঐ হে,
আমি আপনি এসেছি জননী বোলে॥

গিরিরাজ কৈলাসে যাওয়ার কথা ব'লে মেনকাকে মিথ্যা প্রবোধ দিয়ে যেতেন আবার ফিরে এসে বলতেন উমা মায়ের কথা শুনে নিজেই তাঁকে দেখার জন্ত পিতৃগৃহে আসতে চেয়েছে। কিন্তু এক বৎসরের পর পিতৃগৃহে এসে উমা বলছেন, 'আমি আপনি এসেছি।' মেনকা আপন অন্তরের কাতরতা উমার কাছে সোজাসুজি প্রকাশ করলেন না বটে, কিন্তু স্বামীকে যেভাবে অভিযুক্ত করলেন, তাতেই কবির উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেল।

রাম বসুর ভাষা ও শব্দগ্রন্থনও বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। রাম বসুর প্রায় সমসাময়িক কালে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য আগমনী গানে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অথবা দাশরথির আগমনীর ভাষায় রাম বসুর ভাষার তীক্ষ্ণতা নেই, পারিপাট্যও নেই। দু-একটি উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্য স্পষ্ট করে নেওয়া যাক।

কমলাকান্তের মেনকা কন্তাকে নিয়ে আসার জন্ত গিরিরাজকে তাগিদ দিয়ে বলেছেন,—

আজি কালি করে দিবস যাবে,
প্রাণের উমারে আনিবে কবে;
প্রতিদিন কি হে আমারে ভুলাবে,
একি তব অবিচার।

আবার দাশরথির মেনকা গিরিরাজের প্রতি দোষারোপ করে বলেছেন :—

জানি হে পাষাণ! তোমায় জানি চির দিন!
স্বভাবগুণে তব কায়া দয়ামায়া হীন।

কিন্তু রাম বসুর মেনকা বলছেন :—

ভাল হোক্ হোক্ ওহে গিরি!
যাই আমি নারী তাই ভুলি বচনে।
তোমারো কি মনে, হোতো না হে সাধ,
হেরিতে উমার চন্দ্রাননে।

উদাহরণ তিনটির মধ্যে রাম বসুর মেনকার কথা বলার যে কৌশল তার আবেদন যে গিরিরাজের অন্তরকে অনেক বেশী স্পর্শ করবে তা বলাই বাহুল্য। রাম বসুর মেনকার হৃদয়ের জ্বালা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ভাষার সাহায্যে।

উমার সঙ্গে মিলনের পর রাম বসুর মেনকা যা বলেছেন তাতে মাতৃহৃদয়ে একটি সহজ সত্য প্রকাশিত হয়েছে—

তারা হারা হোয়ে, নয়নের তারা হারা হোয়ে রই।
সদা কই, উমা কৈ, আমার প্রাণ উমা কৈ?
আমার সেই হারা তারা, ত্রিজগতের সারা,
বিধি এনে মিলালে।
উমা চন্দ্রবদনে, ডাকছে সঘনে, মা মা বোলে।
উমা যত হেসে কয়, ওতো হাসি নয় হে,
যেন অভাগীর কপালে অনল জ্বলে।

পরম স্নেহের পাত্রকে কাছে পেয়ে মাতৃহৃদয় যেমন পরিতৃপ্ত হয়েছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে একটা বেদনাও দেখা দিচ্ছে, কারণ সে জানে যে এ মিলন অতি ক্ষণস্থায়ী। তাই উমা হেসে কথা বললেও মেনকা তাকে হাসি বলে মনে করতে পারছেন না, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ক'রে তাঁর অন্তর ব্যথিত হচ্ছে। পাশাপাশি দুইটি বিরুদ্ধ ভাবের সংঘাত দেখা দিয়েছে মেনকার মনে, আর তাকে সুন্দর রূপ দিয়েছেন রাম বসু।

রাম বসুর মেনকা কুস্বপ্ন দেখেন না। রামপ্রসাদের মেনকা বলে, ওগো জয়া কুস্বপনে প্রাণ আমার কাঁদে, কিন্তু রাম বসুর মেনকা বলেন—

গত নিশি যোগে আমি দেখেছি যে সুস্বপন।
এলো হে সেই আমার তারাধন।
দাঁড়ায়ে দুয়ারে—
বলে মা কই, মা কই, মা কই আমার
দেখা দাও দুখিনীরে।
অমনি দুবাহু পশারি উমা কোলে করি
আনন্দেতে আমি—আমি নই।

অপূর্ব্ব হৃদয়াবেগের নিদর্শন এই কবিতাটি।

রাম বসুর ভাবের অনাড়ম্বর সহজ বিকাশ, রচনাভঙ্গীর সারল্য, প্রকাশের ঋজুতা তাঁর আগমনী বিষয়ক গীতি কবিতাগুলিকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক'রে তুলেছে।

রামপ্রসাদের মত তাঁর গানেও কোন আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্য নেই, কোন নীতিকথা শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা নেই, চরিত্রসমূহের মধ্য দিয়ে অতিমানুষ সৃষ্টির চেষ্টা নেই। চরিত্রগুলি রক্তমাংসে গড়া স্বাভাবিক মানুষ।

কবিওয়ালা রাম বসুর পর আগমনী গানে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের নাম উল্লেখযোগ্য। বর্দ্ধমান জেলার অম্বিকা কালনা থেকে সম্ভবতঃ ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে কমলাকান্ত বর্দ্ধমান নগরে আসেন এবং বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা তেজশ্চন্দ্রের সভাপণ্ডিত পদ অলঙ্কৃত করেন। উত্তর কালে তাঁর সাধনায় মুগ্ধ হয়ে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর কমলাকান্তকে স্বীয় গুরুপদে বরণ করেন এবং কোটালহাট গ্রামে বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়ে দেন।

কমলাকান্ত উচ্চ সাধনমার্গে আরোহণ করেছিলেন। শ্যামাসাধনায় তিনি এত তন্ময় হয়েছিলেন যে তাঁর মৃত্যুকাল উপস্থিত হ'লে মহারাজ তেজচন্দ্র তাঁকে সজ্ঞানে গঙ্গাতীরে নীত করার ব্যবস্থা করলে তিনি বলে উঠলেন—

কি গরজ, কেন গঙ্গাতীরে যাব ?
আমি কেলে মায়ের ছেলে হয়ে,
বিমাতার কি শরণ লব ?

নিজেকে তিনি শ্যামা মায়ের পুত্র কল্পনা ক'রে বিমাতা গঙ্গার আশ্রয়ে যেতে অস্বীকার করেন। বস্তুতঃ সাধকরূপে ভক্ত কবিদের মধ্যে রামপ্রসাদের পরই কমলাকান্তের স্থান। তবে কমলাকান্তের জীবনে যতটা তন্ময়তা লক্ষ্য করা গেছে, তাঁর আগমনী কবিতায় কিন্তু সে গভীর তন্ময়তার পরিচয় নেই। মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা কমলাকান্ত অপেক্ষা রামপ্রসাদের আগমনীতে অধিক সুন্দররূপে মূর্ত্ত হয়েছে। উমার আগমনবার্ত্তা লাভের পর মেনকার বর্ণনা দিয়ে কমলাকান্ত বলেছেন :—

কহিতে কহিতে রাণী ধাইল যেন পাগলিনী
কেশপাশ বাস না সম্বরে, গো!
দেখিয়ে সে চাঁদমুখ, বাণী পাশরিল সব দুখ
গো! কোলে নিল ধোরে দু'টি করে।

আর একটি কবিতায় আছে—

হেনকালে শৈলরাণী এলো যেন পাগলিনী,
মুখে নাহি সরে বাণী
রৈল ও চাঁদমুখ চেয়ে।

এই কবিতাগুলিতে যে রামপ্রসাদের রচনার পূর্ণ প্রভাব রয়েছে তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

কমলাকান্তের অনেকগুলি আগমনী গান কবিতা হিসাবে সাধক রামপ্রসাদ বা কবিওয়ালা রাম বসু অপেক্ষা উৎকর্ষতা লাভ ক'রেছে সত্য, কিন্তু বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের যে সহজ অনাড়ম্বর সুর ফুটে উঠেছিল রামপ্রসাদ ও রাম বসুর আগমনীতে, কমলাকান্তের গানে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। কমলাকান্ত আগমনীর প্রথমদিকের কতকগুলি গানে গার্হস্থ্য আবহাওয়া কিছুটা সৃষ্টি করতে সক্ষম হ'লেও পরবর্ত্তী কয়েকটি কবিতায় সে সুর ছিন্ন হয়ে গেছে। গিরিরাজ মেনকাকে বলছেন :

তোমার উমার মায়া নির্গুণে সগুণ কায়া,
ছায়ামাত্র জীবনাম ধরে।
ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী, কালীতারা নাম ধরি,
কৃপা করি পতিতে উদ্ধাবে।

আর একটি কবিতায় মেনকা বলছেন :

শুনেছি মা! মহিমা তোমার, ওগো প্রাণ গৌরী
তুমি ত্রিভুবন জননী॥
মোর মনে ভ্রান্তি, অভয়া নিজ নন্দিনী, মা!
কি জানি কুল কামিনী॥
পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব তুমি তমো রজঃসত্ত্ব
মাগো! তুমি গুণময়ী গুণরূপিণী।
নির্গুণ নিরূপ নিরঞ্জন বিভুতারে মা!
তব গুণে সগুণ গণি।
অবিদ্যা অপরা পরা, বিদ্যা তুমি পরাৎপরা,
মাগো! তুমি বিশ্বময়ী বিশ্বকারিণী॥

তত্ত্বের দিক থেকে এগুলির যত মূল্যই থাক, এখানে শিল্পের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। তত্ত্বের খাতিরে সৌন্দর্য্য হয়েছে ক্ষুণ্ণ। সাহিত্যের বিচারে কমলাকান্ত এখানে কোন কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন না। এই

শ্রেণীর কবিতার প্রধান যে গুণ সরলপ্রাণতা, পাণ্ডিত্যের ভারে এখানে তিনি তা হারিয়ে ফেলেছেন।

উপরোক্ত পদগুলিতে কবির কল্পনা প্রসার লাভ করেছে সত্য, কিন্তু কবি নিজেও যেন অনেকখানি দূরে স'রে গেছেন। মেনকা ও গৌরীর সম্পর্কের মধ্যে যেন বেশ কিছুটা ব্যবধান এসে গেছে, সেই আপন ভাব নেই।

রবীন্দ্রনাথ অতি সুন্দর একটি উপমার সাহায্যে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করেছেন। একদিন একটি গানের দু'টি মাত্র কলি তাঁর কানে আসে—

যুমতী, ক্যান্‌বা কর মন ভারী।
পাবনা থ্যাহে আন্তে দেব ট্যাহা-দামের মোটরি।

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "জগতে যত প্রকার দুর্বিপাক আছে যুবতীচিত্তের বিমুখতা তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য—সেই দুর্গ্রহ শান্তির জন্ত কবিরা ছন্দো রচনা এবং প্রিয়প্রসাদ-বঞ্চিত হতভাগ্যগণ প্রাণপাত পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত। কিন্তু যখন গানের মধ্যে শুনিলাম 'পাবনা থেকে আনি দিব টাকা-দামের মোটরি'—তখন ক্ষণকালের জন্ম মনের মধ্যে বড়ো একটা আশ্বাস অনুভব করা গেল। মোটরি পদার্থটি কী তাহা ঠিক জানি না, কিন্তু তাহার মূল্য যে এক টাক'র বেশী নহে কবি তাহাতে সন্দেহ রাখেন নাই। * * কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর কবিরা এমন স্থলে নিশ্চয়ই মানস সরোবরের স্বর্ণপদ্ম, আকাশের তারা এবং নন্দনকাননের পারিজাত অম্লানমুখে হাঁকিয়া বসিতেন। * * মেঘদূতের কবি অলকা পর্য্যন্ত গিযাছেন, তিনি উজ্জয়িনীর রাজসভার কবি,—আমাদের অখ্যাত গানের কবি কঠিন দায়ে পড়িয়াও পাবনা শহরের বেশী অগ্রসর হইতে পারে নাই,—যদি পারিত, তবে তাহার গ্রামের লোক তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিত; কল্পনার সংকীর্ণতা দ্বারা সে আপন প্রতিবেশীবর্গকে ঘনিষ্ঠসূত্রে বাঁধিতে পারিয়াছে, এবং সেই কারণেই তাহার গানের মধ্যে কল্পনাপ্রিয় একক কবির নহে, পরন্তু সমস্ত জনপদের হৃদয় কলরবে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।"

রামপ্রসাদ ও রাম বসুর আগমনীতে কল্পনার সংকীর্ণতা আছে ব'লেই তার মধ্যে বাঙ্গালীর হৃদয় ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

আগমনী অপেক্ষা বিজয়ার গানে কমলাকান্তের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়:

ওগো উমা। আজু কি কারণে পোহাল যামিনী।
এত অনুচিত কেন, গো করে শূলপাণি॥
আমি উমার লাগিয়ে, অনেক কেলেশ পেয়ে,
এ তনু সফল করি মানি।
হেরিয়ে ও চাঁদমুখ পাশরিলাম সব সুখ
আজু কেন কান্দিছে পরাণি॥

অপর একটি পদে—

ফিরে চাও গো উমা। তোমার বিধুমুখ হেরি।
অভাগিনী মায়েরে বধিয়ে, কোথা যাও, গো
রতন ভবন মোর, আজি হৈলো অন্ধকার,
ইথে কি বাহিরে দেহে এ ছার জীবন।
এইখানে দাঁড়াও উমা! বারেক দাঁড়াও মা।
তাপের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও, গো॥

রামপ্রসাদ বা রাম বসু অপেক্ষা কমলাকান্তের ভাষা সুসংস্কৃত সন্দেহ নেই, কিন্তু ভাষায় সেই সারল্য ও প্রাণের স্পন্দনের অভাব।

আগমনী বিজয়া গানের সাহিত্যিক উৎকর্ষতা সম্পর্কে দ্বিমত থাকলেও এর সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সম্পর্কে মতভেদের অবকাশ নেই।

ইংরাজী সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর সাহিত্যে-জীবনে, সমাজে-সভ্যতায়, আচারে-ব্যবহারে অনেক কিছুরই পরিবর্ত্তন ঘটেছে, কিন্তু পুণ্য শারদীয়া মহাসপ্তমীর শুভ প্রত্যূষে আগমনীর সুর আজও বাঙ্গালীর মনকে সমানভাবে আন্দোলিত ক'রে তাদের চিত্তে এক অভূতপূর্ব্ব অনুভূতির সঞ্চার করে।

শ্রীবিমল মিত্র

বললাম—না ভাই, ভুল শুনেছ, আমি জীবনে কখনও অভিনয় করিনি—

সবাইকেই হতাশ করতে হলো। বিলাসপুরের রেল-কলোনীর ছেলেরা বড় আশা করে আমার কাছে এসেছিল। তিন দিন ধরে থিয়েটার, নাচ, গান। চাঁদাও উঠেছে বহু টাকা। কোলিয়ারীর মালিকরাই দিয়েছে সাতশো। কলকাতা থেকে ড্রেসার পেণ্টার আসছে।

আবার বললাম—না ভাই, ভুল শুনেছ তোমরা, আমি জীবনে কখনও অভিনয় করিনি—

কিন্তু ছেলেরা চলে যাবার পর হঠাৎ যেন নিজের অজ্ঞাতে চমকে উঠলাম। তবে কি ছেলেরা অন্তর্য্যামী। কী করে জানলে ওরা! আমি তো মিথ্যে কথাই বললাম। জানালার বাইরে দেখলাম বুধবারী-বাজারের দিকে ছেলেরা চলে যাচ্ছে। টাউনের রাস্তায় ইলেক্‌ট্রিক বাতিগুলো হঠাৎ জ্বলে উঠলো। ডাউন বম্বে মেল আসবার সময় হয়েছে বুঝি। টাঙ্গাগুলো সওয়ারী নিয়ে ছুটে চলেছে ষ্টেশনের দিকে। নিজের প্রায়-অন্ধকার ঘরটার মধ্যে বসে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। ওদের কাছে আমি মিথ্যে কথাই তো বলেছি। সত্যিই-তো অভিনয় করেছি আমি। ছোট এক অঙ্কে সমাপ্ত একখানা নাটক। ষ্টেজ নেই, দৃশ্যপট নেই, ড্রেসার, পেণ্টার, রিহার্শাল কিছুই নেই। তবু তো সেদিন অভিনয় করতে আমার বাধেনি।

ছেলেদের ডাকা হলো না। সেইখানে বসেই যেন মল্লিক মশাইকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম চোখের সামনে। মল্লিক মশাই বললেন—কেমন জামাই দেখলে মুকুন্দ ?

বললাম—খাসা, চমৎকার—

মল্লিক মশাই আবার বললেন—আমি জানতুম জয়ন্ত রাজি হবেই. এদিকে চারশো টাকা মাইনে পায়,.আর ওই তো বয়েস, এর পর পরীক্ষাটা দিলেই একেবারে অফিসার হয়ে যাবে···কিন্তু তুমি খেয়েছো তো ? পেট ভরেছে ?

এবারও বললাম—হ্যাঁ—

—মাংসটা কেমন হয়েছিল ?

এবারও বললাম—ভালো—কিন্তু এবার আমি আসি মল্লিক ম'শাই, এর পর গেলে আর ট্রেণ পাবো না হয়ত—

কোনও রকমে মল্লিক মশাই-এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাইরে আসতেই আদিনাথ ধরেছিল।

বললে—আপনি খেয়ে যাবেন না ?

মনে আছে আদিনাথের হাত দু'টো ধ'রে ব'লেছিলাম, কিছু মনে করো না তুমি—কিন্তু খেতে আমাকে বোল না ভাই—

—অন্ততঃ গরীবের বাড়ীতে ডাল-ভাত-চচ্চরী—যা জোটে ?

কিন্তু কুড়ি বছর আগের এ-ঘটনা এমন ক'রে মাঝখান থেকে বললেই কি সব বোঝানো যায় ? এখানে এই পাঁচ-শো মাইল দূরে বিলাসপুর রেল-কলোনীর বি-টাইপ্ কোয়ার্টারে বসেও ঘনায়মান অন্ধকার অতিক্রম ক'রে যেন শাঁখের আওয়াজ শুনতে পেলাম। কুড়ি বছর আগের আওয়াজ এখানে পৌঁছুতে কি এত সময় লাগে ? তারপরে তো কত দেশ কত নদী, কত পাহাড় নিঃশব্দে পেরিয়ে এসেছি—কিন্তু সে-দিনের সে-ঘটনা এমন ক'রে ভুলতেই বা পেরেছিলাম কী ক'রে ?

তবে গোড়া থেকেই বলি—

হঠাৎ ভৈরবগঞ্জে এসে ট্রেণটা থেমে গেল। শুনলাম—ট্রেণ আর যাবে না। এখানেই রইল। কালও যেতে পারে, পরশুও যেতে পারে—কিম্বা তার পর দিনও যেতে পারে। ইছামতীর জল বেড়ে রেলের লাইন ডুবে গেছে। জল না নাবলে কিছু বলা যায় না।

যে-যার মাল-পত্তর নিয়ে নিয়ে নেবে পড়লো।

ভৈরবগঞ্জ ছোট ষ্টেশন। না আছে ওয়েটিংরুম, না আছে ভালো রকমের প্লাটফরম। না আছে একটা কুলী। টিম টিম করছে এক কালি একটা ষ্টেশন ঘর। কাঁকর বিছানো প্লাটফরমের ওপর রাত কাটানো যায় না।

ষ্টেশন মাষ্টার টেলিফোন নিয়েই ব্যস্ত। কথা বলবার সময় নেই তাঁর।

হাত নেড়ে বললেন—এখন মরবার সময় নেই স্যার, তিনখানা আপ, দুখানা ডাউন গাড়ি সেকশানে আটকে গেছে—

তারপর পাশের টিফিন ক্যারিয়ারটা দেখিয়ে বললেন—ওই প্রত্যক্ষে দেখুন বাড়ী থেকে হালুয়া করে পাঠিয়েছে—মুখে দিতে পারি নি—

বলে আবার হ্যালো হ্যালো করতে লাগলেন।

চোখে অন্ধকার দেখলাম। বিকেল হয়েছে। এ জায়গায় রাত-কাটাবার কথাটা মনে আসতেই ভয় পেয়ে গেলাম। শনিবারের দুপুর বেলা শেয়ালদ' থেকে উঠেছি, আবার সোমবাবে ফিরে গিয়ে অফিস করতে হবে।

প্লাটফরমের ওপর দাঁড়িয়ে এই কথাই ভাবছি। হঠাৎ ষ্টেশনের এক প্রান্তে পাথরের ওপর বড় বড় অক্ষরে "ভৈরবগঞ্জ" লেখাটা চোখে পড়তেই মনে পড়ে গেল।

ভৈরবগঞ্জ !

এই ভৈরবগঞ্জেই তো মল্লিক মশাইএর বাড়ি। কত দিন যেতে বলেছেন। কিন্তু কখনও আসা হয়ে ওঠেনি। গ্রামের নামটাও মনে আছে ছুটিপুর। এই ছুটিপুর থেকেই ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করতেন মল্লিক মশাই।

বলতেন—একবার তো সময়ই হলো না তোমার মুকুন্দ, কিন্তু মিনুর বিয়ের সময় কোনও ওজর আপত্তি শুনবো না।

বলেছিলাম—নিশ্চয়ই যাবো মল্লিক মশাই, দেখে নেবেন, মিনুর বিয়ের সময় নিশ্চয়ই যাবো।

তারপর মল্লিক মশাই হতাশা ভরে আবার কাজে মন দিতেন—হ্যাঁঃ, তুমি আর গিয়েছ !

সত্যিই, কত অকাজে কত দিকেই গিয়েছি, কিন্তু মল্লিক মশাইএর ছুটিপুরে যাবার আর সুযোগ হয়ে ওঠেনি আমার। হঠাৎ ভৈরবগঞ্জ ষ্টেশনের প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আবার মনে পড়ে গেল মল্লিকমশাইএর কথা বহুদিন পরে।

ষ্টেশনের পেছনেই একটা পান বিড়ির দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

সে বললে—ছুটিপুর ? তা পোয়া তিনেক রাস্তা হবে এখেন থেকে—আজ্ঞে—সামনে খাটরোর বিল পেরিয়ে সোজা পেঁপুলবেড়ের আল্-পথ ধরে চলে যান—যাবেন কা'র বাড়ী ?

তারপর অবশ্য সেই বিকেল বেলা দশজনকে জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে গিয়ে পৌঁছে ছিলাম শেষ পর্য্যন্ত ছুটিপুর। চারদিকে সন্ধ্যে নেবে এসেছে তখন। দু'পাশে ধান বোনা হয়েছে, জলে থই থই করছে ক্ষেত। মাঝখান দিয়ে পেছল আলের পথ। অনেক উঁচুতে পৃথিবীর ছাদের ওপর দিয়ে কয়েকটা বিচ্ছিন্ন বাদুড় উড়ে চ'লেছে দক্ষিণ দিকে। সামনের আমবাগানের ঢালু জমিটার ওপর দিয়ে শেষ গরু ক'টা জঙ্গলের ছায়ার মধ্যে মিশে গেল। ছুটিপুরে গিয়ে যখন পৌঁছুলাম, তখন বেশ অন্ধকার।

একজন কৃষাণ গোছের লোক বললে—এ হলো মালো পাড়া, মল্লিক ম'শাই থাকেন পুব পাড়ায়—এই বাঁশ-ঝাড়ের পাশ বরাবর গিয়ে পড়বেন বারোয়ারীতলায়, তার ডান ধার পানে পুবপাড়া—

চলতে চলতে ভাবছিলাম—বলা নেই, কওয়া নেই, হয়ত মল্লিক ম'শাই খুব অবাক হয়ে যাবেন। একদিন কত পীড়াপীড়ি ক'রেছেন এখানে আসবার জন্যে। তখন আসা হয়নি। সেই মল্লিক ম'শাই অফিস থেকে রিটায়ার করলেন, ফেয়ারওয়েল হলো তাঁর—তখনও কথা দিয়ে-ছিলাম—যাবো মিনুর বিয়েতে, নিশ্চয় যাবো কথা দিচ্ছি—

মল্লিক মশাই বলতেন—আগের দিন খবর দিও, আমি পুকুরে ঝোরা দিয়ে মাছ ধরিয়ে রাখবো, আর উমেশ ময়রাকে কাঁচাগোল্লার বরাত দিয়ে রাখবো, তাই খাবে—শেষে মিনুর গানও শুনিয়ে দেব—

আশ্চর্য্য! এই এতখানি পথ হেঁটে বত্রিশ বছর ধরে কেমন ক'রে একটানা চাকরী ক'রে এসেছেন মল্লিক মশাই। ভোর বেলা সাতটা বাজতে না বাজতে বেরুতেন বাড়ী থেকে আর ফিরতেন রাত আটটায়। আর তারই মধ্যে ইট পোড়ানো, বাড়ী করা, পুকুর কাটানো—ক্ষেত-খামারের তদারক···

আমার সঙ্গে কেমন ক'রে যে অমন বন্ধুত্ব হয়েছিল কে জানে। অথচ আমি তো প্রায় তাঁর ছেলেরই বয়সী।

মনে আছে প্রথম দিন আমাকে বলেছিলেন—এটা ক্যামেরা নাকি মুকুন্দ? তুমি নিজে ছবি তুলতে পারো?

তারপর বলেছিলেন তা দাওনা মিনুর একটা ছবি তুলে ভায়া, ওর ভারি ছবি তোলাবার সখ—একদিন তুমি চলো আমাদের দেশে—যা দাম লাগে আমি দেব—

ভুধরবাবু বলতেন—মল্লিক মশাই আপনি যে এত মেয়ে-মেয়ে করেন-মেয়ে তো বিয়ে হলেই পর হয়ে গেল—

ওপাশ থেকে সুধীরবাবু বলতেন—এই দেখনা আমার জামাই-এর আক্কেলটা, যতবার ছেলে হবে আমার কাছে পাঠাবে, আর মেয়েও তেমনি হয়েছে—আসে আসুক কিন্তু একেবারে খালি হাতে—আমার তো এই মাইনে—সবদিক সামলাই কী করে?

সনাতনবাবু বলতেন—কথাতেই তো আছে—জন্-জামাই-ভাগ্না তিন নয় আপ্না—বুঝতে পারতাম মল্লিক মশাই কথাগুলো শুনে অপ্রসন্ন হতেন। চুপি চুপি বলতেন—জয়ন্ত আমার সেই রকম জামাই নাকি তোমরা ভাবো, অমন ছেলে হাজারে একটা মেলে না—

জিজ্ঞেস করলাম—আপনার মেয়ের কি বিয়ে হয়ে গেছে নাকি?

মল্লিক মশাই বললেন—তা এক রকম হওয়া'ই বলতে পারো—শুধু দেরি হচ্ছে ওর চাকরীর জন্যে—সীতানাথ বাবুকে ব'লে আমিই তো ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম ইছাপুরে, সেখান থেকে বদলি হয়েছে জব্বলপুরে, এইবার একটা প্রমোশন হলেই ফোরম্যান একেবারে—

বললাম—তা ব'লে বিয়েটা ক'রে রাখতে দোষ কী?

মল্লিক মশাই বলতেন—আমিও তো তাই বলি—সেবার ছুটি নিয়ে সেই কথা বলতেই গিয়েছিলাম জব্বলপুরে, বেশ জায়গা, সাহেবদের বাঙ্লো পেয়েছে, চাকরবাকরে রান্না করে—আমি বললাম—কেন তোমার এ-সব হাঙ্গামা করা, মিনু এলে একদিনেই তোমার ঘর-সংসারের শ্রী বদলে যাবে—কেউ নেই তোমার সংসারে, তুমি কার পরোয়া করবে? তা কী বলে জানো?

বললাম—কী?

বলে—টাকা জমাচ্ছি আমি, বিয়েতে আপনাকে এক পয়সা খরচ করতে দেব না কাকাবাবু।

—আপনি কী বললেন?

—আমি আর কী বলবো, আমি চলে এলাম, তা তুমি কী ভাবছো আমি কিছু খরচ না ক'রে পারি? আমার তো এদিকে সব তৈরী, সেদিন যে ইট পোড়ালাম, সে বাড়ী তো জামাই-এর জন্যেই—সব তৈরী মুকুন্দ সব তৈরী,—খাট, আলমারী, ড্রেসিং আয়না, ষোল ভরির গয়না পর্য্যন্ত গড়িয়ে রেখেছি—দানের বাসন কিনেছি, এক একটা ক'রে গায়ে হলুদের কাপড় পর্য্যন্ত কিনে রেখেছি—মিনুর মা নেই, আমাকেই তো সব করতে হবে—সাধে কি আর বলি, জামাই তো অনেকেরই দেখছো—আর বিয়ের সময় আমার জামাইকেও দেখো—খবর দেব তোমাকে—

সুধীর বাবু বলতেন - তুমি ওই বুড়োর কথা বিশ্বাস করো নাকি মুকুন্দ? আজ পাঁচ বছর ধ'রে শুনে আসছি ওই এক কথা। আমি কতদিন বলেছি—একটা ভালো পাত্র আছে, আপনার মেয়ের সঙ্গে দিন বিয়ে, আপনার মেয়ে সুন্দরী, একটা পয়সা নেবে না, তা উনি বলেন—না, মেয়ের আমার পাত্র ঠিক হয়ে আছে—

একদিন সরাসরি বলেই ফেলেছিলাম -আচ্ছা মল্লিক মশাই, ভগবান না করুন—যদি জয়ন্ত শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে না-ই করে - এতদিন হয়ে গেল—

মল্লিক মশাই-এর কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস। বলতেন—তুমি বলো কি মুকুন্দ, জয়ন্তকে আমি চিনি না। আমি ওকে মানুষ করলাম, ছোট বেলায় বাপ-মা মারা গিয়েছিল, আমি না দেখলে ওকি বাঁচতো? ইস্কুলের মাইনে দিয়ে পড়িয়ে চাকরীতে ঢোকানো ইস্তোক - সব যে আমি করেছি—নইলে ধর্মে ওর সইবে—মাথার ওপরে ভগবান ব'লে একজন আছেন তা মানো তো?

সুধীরবাবু সব শুনে বললেন—শুনলে তো, এখন কী জবাব দেবে দাও—

তারপর একটু থেমে বললেন—ওঁর মেয়েটি কিন্তু ভারি সুশ্রী ভাই, লক্ষ্মী প্রতিমার মত চেহারা, এমন চমৎকার তার ব্যবহার; একবার দেশে গিয়ে দেখেছিলাম জয়ন্ত গান ভালোবাসে ব'লে মেয়েকে উনি মাষ্টার রেখে গান শিখিয়েছেন, জয়ন্ত ভালো-মন্দ খেতে ভালোবাসে ব'লে নানান্ রকমের রান্না শিখিয়েছেন—

এক-একদিন দেখতাম মল্লিক মশাই মনোযোগ সহকারে চিঠি লিখছেন।

আমি কাছে যেতেই বললেন—জয়ন্তকে আর একটা চিঠি লিখলাম—

বললাম—আগেকার চিঠির উত্তর পেয়েছেন না কি?

বললেন—না, সেই জন্যেই তো লিখছি আবার—

—আপনার চিঠির উত্তর দেয়না এটাই বা কী রকম?

—তা ভাই এ তো আর আমাদের মত কেরাণীগিরির চাকরি নয়, অফিসে বড় খাটুনি ওর, সময়ই পায় না—

তবু কখনও মনে পড়ে না জয়ন্ত একটা চিঠিরও উত্তর দিয়েছে।

একদিন এমনি করে রিটায়ার করবার দিনও এল। চাঁদা তুলে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হলো মল্লিক মশাইকে। যাবার দিন মল্লিক মশাইএর চোখে জল এসে গিয়েছিল। বত্রিশ বছরের সম্পর্ক ছাড়তে কষ্ট হয় বৈ কি। আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন—মিনুর বিয়েতে তোমার যাওয়া চাই কিন্তু ভাই—

আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। বললাম—দিন স্থির হয়ে গেছে না কি?

—ওই দিন স্থির করাটুকুই যা বাকি—নইলে বিয়ে ওদের একরকম হয়েই গেছে ধরে নিতে পারো, ওদের ছুটি পাওয়া খুব শক্ত কি না, বিয়ের ছুটি তাও দেবেনা বেটারা, তা বলাও যায় না একদিন হয়ত হুট্ করে এসে বলতে পারে—এখুনি বিয়ে হয়ে যাক, একদিনের ছুটি হয়ত মেরে কেটে পেয়েছে।

বললাম—একদিনের মধ্যে সব যোগাড় যন্ত্র করতে পারবেন?

মল্লিক মশাই এবার হেসে ফেলেছিলেন—যোগাড় তো সব করেই রেখেছি ভায়া, মায় ফুলশয্যার বন্দোবস্তও শেষ—শুধু কাঁচা বাজারটা, তা সে আমার ভাইপো আদিনাথ আছে, সব করে ফেলবে সে।

এ-সব পাঁচ বছর আগের ঘটনা। মল্লিকমশাই রিটায়ার করবার পরও পাঁচ বছর কেটে গেছে। আর দেখা হয়নি তাঁর সঙ্গে। জানি বেঁচে আছেন। এই পর্য্যন্ত।

ভাবছিলাম—এত দিন পরে, বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ আমাকে কেমন ভাবে গ্রহণ করবেন কে জানে!

কিন্তু পুবপাড়ায় পৌঁছে আর বেশি দেরী হলো না। ছাড়া ছাড়া বাড়ি, চারদিকে গাছ পালার জঙ্গল। বেশ ঘন হয়ে এসেছে অন্ধকার। কাছাকাছি কোনও বাড়িতে ঢোল আর শানাই বাজছে। ঘন ঘন শাঁখের আওয়াজও আসছে। বোধহয় কোনও উৎসব চলেছে কোথাও।

বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকতেই একজন বেরিয়ে এল।

বললে—মল্লিক মশাই? তাঁর তো অসুখ—

বললাম—অসুখ? কী অসুখ?

—অসুখ—মানে—

ছেলেটি যেন কেমন আমতা আমতা করতে লাগলো।

তারপর বললে—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

বললাম—কলকাতা। বলোগে মুকুন্দ এসেছে। বি-এন-আর অফিস থেকে—

অফিসের নাম শুনে যেন কেমন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো ছেলেটি।

জিজ্ঞেস করলাম—তোমার নাম কী?

—আদিনাথ।

—তুমি কি মল্লিক মশাইএর ভাইপো?

আদিনাথ আশ্চর্য্য হয়ে গেছে। বললে—আপনি জানলেন কী করে?

বললাম—আমি জানি সব—কিন্তু মল্লিকমশাইএর সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে—

—কিন্তু—

আদিনাথ তবু যেন কেমন দ্বিধা করতে লাগলো।

বললে—তিনি তো চোখে দেখতে পান না—

—সে কি? আমার বিস্ময়ের আর অন্ত নেই।

—হ্যাঁ, আজ চার বছর অন্ধ হয়ে গেছেন, শুধু চুপ চাপ বসে থাকেন নিজের ঘরে—

বললাম—তা' হোক, আমাকে তিনি অনেকবার এখানে আসতে বলেছেন—একবার দেখা না করে যাবো না—

আদিনাথ তবু যেন কোনও উৎসাহ দেখায় না। কিন্তু এবার অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পেলাম তার মুখখানা যেন ফ্যাকাসে হয়ে এল। হারিকেনের মৃদু আলোয় তার দু'চোখের পাতাগুলো কেমন যেন ছল্ ছল্ করছে।

হঠাৎ কান্নার মতন করে যেন আদিনাথ ককিয়ে উঠলো।

বললে—আপনি যেন কিছু বলবেন না তাঁ'কে—কাকাবাবুর হার্ট বড় দুর্ব্বল। ডাক্তারে কেবল বিশ্রাম নিতে বলেছে—আপনার পায়ে পাড়ি, আপনি···

হঠাৎ ছেলেটির এই ব্যবহারে কেমন স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই স্বল্পালোকিত পরিবেশে, চারদিকে ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ আর অদূরের ঢোল আর শানাইয়ের মূর্চ্ছনার সঙ্গে এক মুহূর্ত্তে সমস্ত অতীত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম।

আদিনাথ বললে—চলুন, নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে, কিন্তু আপনি যেন কিছু বলবেন না—

আমি মন্ত্রচালিতের মত পেছন পেছন চলতে লাগলাম। সদর দরজা পেরিয়ে বাড়ির অন্দর মহলেও কোনও লোকজনের সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। যেন মৃত্যুপুরীর অলিন্দ দিয়ে আমি কোন্ অনাবিষ্কৃত অনন্তের সন্ধানে চলেছি।

আমি সামনে এগিয়ে একবার বললাম—বাড়িতে কোনও বিপদ চলছে নাকি?

আদিনাথ হাতের সঙ্কেত করে বললে—চুপ, কাকাবাবু শুনতে পাবেন—

তারপর একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। গলা নিচু করে বললে, উনি যা বলবেন আপনি হ্যাঁ বলে যাবেন—আপনার পায়ে পড়ি, আমাদের বাঁচাবেন—

বললাম—কী হয়েছে? কিছুই বুঝতে পারছি না যে—

আদিনাথ তেমনি গলা নিচু করে বললে—আর চেপে রাখা যাচ্ছিল না—আপনাকে সব বলবো পরে—কাকাবাবুর মেয়ের আজকে বিয়ে—

আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে বললাম—কা'র? মিন্নুর?

আদিনাথ কী যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাধা পড়লো। ঘরের ভেতর থেকে মল্লিকমশাইএর গলা শোনা গেল—কে? কে ওখানে কথা কয়?

আদিনাথ আমাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লো। বললে—আমি কাকাবাবু।

—সঙ্গে কে? কার সঙ্গে কথা বলছিলে?

—ইনি এসেছেন মিন্নুর বিয়েতে কলকাতা থেকে আপনি বলেছিলেন নেমন্তন্ন করতে—বি এন্ আর অফিসের লোক।

সঙ্গে সঙ্গে মল্লিক মশাই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—কে? সুধীর? সনাতন? মুকুন্দ?

এগিয়ে গিয়ে বললাম—মল্লিক মশাই আমি মুকুন্দ।

আমার উত্তরটা শুনেই মল্লিক মশাই যেন উত্তেজনায় আনন্দে উঠে বসবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বললেন—

মুকুন্দ ? মুকুন্দ তুমি এসেছ ?—আর ওরা এল না—সুধীর সনাতন ?

আদিনাথ এগিয়ে গিয়ে বললে—ইনি বলছিলেন ওঁদের আসবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু অফিসের ছুটি পায়নি।

এবার ঘরের ভেতর ভালো করে চেয়ে দেখলাম। মল্লিক মশাই একটা খাটের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছেন। সমস্ত শরীরে চাদর ঢাকা। মাথার পেছনে একটা টেবিলের ওপর একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। কয়েকটা ওষধের শিশি, জলের গ্লাস।

আমি কথা বলতে চেষ্টা করলাম—আপনার চোখ খারাপ হয়েছে জানতাম না তো!

মল্লিক মশাই হাসলেন। বললেন—বয়েস হয়েছে, যাবারও সময় হয়ে এল মুকুন্দ, কিন্তু তার জন্যে আমার দুঃখু নেই, আর মিনুর বিয়েটা যে শেষ পর্য্যন্ত হলো, তাতেই আমার সব দুঃখু মিটে গেছে ভায়া—

তারপর থেমে বললেন—তুমি যে এসেছ মুকুন্দ, আমি ভারি খুসী হয়েছি, চিঠি ঠিক সময়ে পেয়েছিলে ?

আদিনাথ আমার দিকে চাইলো।

আমি বললাম—হ্যাঁ চিঠি ঠিক সময়ে পেয়েছিলাম, আমি আপনাকে কথা দিয়েছিলাম মিনুর বিয়েতে আসবো—

মল্লিক মশাই এবার বললেন—আদিনাথ—মুকুন্দকে তুমি ফার্ষ্ট ব্যাচেই খাইয়ে দেবে। ওর আবার ট্রেণের সময়—

আমি কেন জানি না বলে ফেললাম—আমার খাওয়া হয়ে গেছে মল্লিক মশাই।

মল্লিক মশাই যেন তৃপ্তি পেলেন, শুনে বললেন—ভালোই করেছ—মাংসটা কেমন খেলে ? আর উমেশ ময়রার কাঁচাগোল্লা ?

বললাম—খাসা—চমৎকার।

মল্লিক মশাই বললেন—আদিনাথ তুমি নিজে খাবার সময় কাছে ছিলে তো ?

আদিনাথ টপ্‌ করে বললে—হ্যাঁ কাকাবাবু, আমি নিজে খাইয়েছি ওঁকে—

মল্লিক মশাই আবার বললেন—বর দেখলে মুকুন্দ—জয়ন্তকে দেখলে ? কেমন জামাই করেছি বলো ? তখন তো সবাই তোমরা ঠাট্টা করতে। বলতে জয়ন্ত বিয়ে করবে না—কিন্তু মাথার ওপর একজন ভগবান আছেন এ কথা মানো তো ? তোমরা আজকালকার ছেলে ভগবান-টগবান মানো না—কিন্তু আমার অসীম বিশ্বাস ছিল ভাই-ছোটবেলা থেকে।

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—ওইযে যে-বাড়িতে বসে তুমি খেলে, ওই বাড়িটাতেই বিয়ের ব্যবস্থা করলাম ভাই, ওটা দিয়ে যাবো মেয়ে-জামাইকে, আর এই বাড়িটে হচ্ছে আমার পৈত্রিক, শরীরটা খারাপ বলে ওই সব হাঙ্গামার মধ্যে আমি আর গেলাম না—আমি আদিনাথকে বললাম—আমি নিরিবিলিতে এখানেই থাকবো—তা' আদিনাথ একাই সব করছে—

বললাম—ভালোই করছেন—

মল্লিকমশাই বললেন—দেখ ভাই, ভগবানের ওপর অসীম বিশ্বাস ছিল ব'লে বরাবর আমি বিশ্বাস করতুম জয়ন্ত রাজি হবেই—এদিকে চারশো টাকা মাইনে পায়, আর ওই তো বয়েস, এবার ফোরম্যান হয়েছে, এরপর একটা পরীক্ষা দিলেই একেবারে অফিসার হয়ে যাবে—তা জয়ন্তকে আমি কিছু খরচ করতে দিইনি—প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে আমি পনেরো হাজার টাকা পেয়েছিলাম জানো ত, সবই খরচ করলাম মিনুর বিয়েতে—

তারপর আদিনাথকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—আদিনাথ, ওদিকে কোনও গোলমাল হচ্ছে না তো ? সবদিকে নজর রাখবে, কেউ যেন না খেয়ে চলে যায় না—টাকার জন্যে ভেবো না—

আদিনাথ বললে—না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কাকাবাবু—আমি সব দেখছি—

আমি আর স্থির থাকতে পারছিলাম না। বললাম—এবার আমি আসি মল্লিক মশাই, এরপর গেলে আর ট্রেণ পাবো না হয়ত—

মল্লিক মশাই বললেন—আচ্ছা এসো ভাই—খুব কষ্ট হলো তোমার—আদিনাথ মুকুন্দর যাওয়ার বন্দোবস্ত ক'রে দিও—

সেই নিঃসঙ্গ ঘরের মধ্যে মল্লিক মশাইকে রেখে সোজা উঠে বাইরে এলাম। তারপর অন্ধকারে পা ফেলে

ফেলে একেবারে সদর দরজার কাছে এসে পৌঁছুলাম। আমার যেন নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। চেয়ে দেখি আদিনাথও হারিকেনটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে।

আদিনাথও যেন আমার মত নির্ব্বাক হয়ে গেছে!

তার চোখে চোখ পড়তেই দেখলাম আদিনাথ কাঁদছে।

মুখ দিয়ে যেন কিছু বলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কথা বেরুল না।

আদিনাথই মুখ খুললে। বললে—আপনি যেন কাউকে কিছু বলবেন না!

এতক্ষণে রাস্তায় নেমে এসেছি। বাইরে অন্ধকার। চারদিকে বাঁশঝাড় আর জঙ্গল। কোনও দিকে কিছু স্পষ্ট দেখা গেল না। শুধু অদূরের ঢোল-শানাই-এর শব্দ ভেসে আসছে। দু' একবার শাঁখও বেজে উঠছে। মনে হলো—শানাইটা বিনিয়ে বিনিয়ে কেবল বুঝি বিসর্জ্জনের সুরই বাজাচ্ছে।

হঠাৎ মুখ ফেরালাম।

আদিনাথও আমার দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালো।

বললে—আপনি খেয়ে যাবেন না?

মনে আছে আদিনাথের হাত দু'টো চেপে ধরেছিলাম। বলেছিলাম—কিছু মনে কোর না তুমি—কিন্তু এর পর খেতে আমাকে তুমি বোল না ভাই—

—অন্ততঃ গরীবের বাড়িতে ডাল-ভাত-চচ্চড়ি যা জোটে—

সেদিন অভুক্ত অবস্থায়ই চলে এসেছিলাম মনে আছে। বারোয়ারীতলা পর্য্যন্ত আদিনাথ আমাকে এগিয়ে দিতে এসেছিল। আমাকে ষ্টেশন পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে আসছিল। কিন্তু আমি বারণ করেছিলাম।

বললাম—তোমাকে আর আসতে হবে না ভাই, তুমি মল্লিকমশাইকে গিয়ে দেখো—

আদিনাথ বলেছিল—কিন্তু কাকাবাবু জানতে পারলে রাগ করবেন—

—কিন্তু জানাবে কেন তাঁকে?

এ-কথার উত্তরে আদিনাথ কোনও জবাব দেয়নি। আমার দিকে চেয়ে কেমন যেন কোনও নতুন প্রশ্নের অপেক্ষা করছিল।

আমি আর কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। বললাম—জয়ন্ত কি চিঠি দিয়েছিল তোমাদের—শেষ পর্য্যন্ত?

আদিনাথ বললে—না—কাকাবাবুর একখানা চিঠিরও জবাব দেয়নি—

—সে কি জব্বলপুরেই আছে? একবার গেলে না কেন সেখানে?

—গিয়েছিলাম, কিন্তু দেখা হয়নি—

কেন?

—তার চাকর ঢুকতেই দিলেনা বাড়ির ভেতর। দু'টো কালো কালো কুকুর তাড়া করে এল কামড়াতে—

—তার চাকর কী বললে?

—চাকরটা বললে—মেম-সাহেব মানা করে দিয়েছে। আমিও শুনলাম, জয়ন্ত এক মেম-সাহেবকে বিয়ে করেছে, ছেলেও হয়েছে—

—তারপর? যেন নিজেও হতবুদ্ধি হয়ে নির্ব্বোধের মত প্রশ্ন করে বসলাম।

আদিনাথ বললে, তারপর আর কি, কাকাবাবুও অবুঝ, তাঁরও হার্ট খারাপ হয়ে গেছে, এ-খবর দিতে পারিনি তাঁর কাছে। ডাক্তারবাবু বারণ করেছিলেন—। কিন্তু আর বেশি দিন চেপে রাখাও যাচ্ছিল না—ওঁকে বাঁচাবার জন্যে এই পথ নিতে বাধ্য হলাম, এ-ছাড়া আর গতিও ছিলনা—আমার মা এই বুদ্ধিই দিলেন—

বারোয়ারীতলার বিরাট বিরাট বট গাছের তলায় কেমন নির্ব্বোধের মতন খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আশে পাশে চারদিকে পাকা-পাকা ফলগুলো টপ টপ করে পড়ছে। মনে হলো—যেন কারো চোখের জল পড়ার শব্দ ওটা। তবে কি নির্জ্জীব গাছটাও সব জানে! চেয়ে দেখলাম—আদিনাথ এখনও কাঁদছে। মনে পড়লো—মল্লিকমশাই বলেছিলেন—মাথার ওপর ভগবান বলে একজন আছেন তা মানো তো?

হঠাৎ বললাম—এবার আসি ভাই—

আদিনাথ হারিকেনটা উঁচু করে ধরলো।

সে-আলোয় সামনের পথটা একটু ঘোলাটে হয়ে এল।

হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালাম। যে-মেয়েটিকে নিয়ে এত-

কিছু কাণ্ড, এত মুখর অভিনয়, তা'র কথা তো এতক্ষণ একবারও মনে আসেনি। মল্লিক মশাইএর দিকটাই সবাই দেখেছে। কিন্তু তার কথা তো কেউ ভাবছে না। ওই ঢাক ঢোল শানাই-এর মূর্চ্ছনা আর শাঁখের মঙ্গল-ধ্বনির অন্তরালে সে-ও কি একজন অন্যতম অভিনেত্রী হয়েই আছে? জয়ন্তর জন্যে তার গান শেখা আর রান্না শেখার কৃচ্ছ্রসাধনের ইতিহাস কি আজ এই পরিণতির জন্যে প্রস্তুত ছিল? মনে হলো—ও বটফল নয়, ও যেন সেই মেয়েটিরই চোখের জল—আমাদের আশে পাশে চারিদিকে টপ্ টপ্ করে ঝড়ে পড়ছে। ওকে শুধু জয়ন্তই উপেক্ষা করেনি—মল্লিকমশাই, আদিনাথ, আদিনাথের মা সকলের কাছেই সে উপেক্ষিতা।

আদিনাথ আলোটা উঁচু করে তখনও দাঁড়িয়েছিল। কাছে গিয়ে বললাম—আর···আর···

আদিনাথ আমার দ্বিধা ভেঙে দিয়ে বললে—বলুন—

—আর সেই মল্লিকমশাইএর মেয়ে? সে জানে?

আদিনাথ বললে—মিন্টুর কথা বলছেন। তার মত আছে, সে তো কাকাবাবুর মত অবুঝ নয়। তা ছাড়া এ পাত্রও তো খারাপ নয়, দেড়শো বিঘে ধানজমি আছে, এক বিঘের ওপর জমিতে বাস্তু বাড়ি, বছরের খাবার ঘরেই হয়, শুধু আগের পক্ষের একটা মেয়ে আছে—তা এত কাণ্ডের পর একজন যে রাজি হয়েছে এই তো সৌভাগ্য বলতে হবে মিন্টুর পক্ষে—

অকারণ

আশুতোষ সান্যাল

কত নিদ্রাহীন রাতে চাহি' দূর নীলাভ্রের পানে—
তারায় তারায় যেথা নিরিবিলি কয় কানে কানে
প্রাণের গোপন কথা; মুক্ত করি' গৃহ বাতায়ন,
পুষ্পপরিমলবাহী শান্ত, স্নিগ্ধ, মুক্ত সমীরণ
ভুঞ্জি সর্ব্ব অঙ্গ দিয়া নিরজনে যবে অনিবার—
অকারণ অশ্রুজল কেন ঝরে নয়নে আমার?
প্রচ্ছায়সুলভ নিদ্রা নিদাঘের তপ্ত দ্বিপ্রহরে,
কালবৈশাখীর নৃত্য শস্যহীন ধূসর প্রান্তরে;
কুলায়ে কপোতকণ্ঠে জাগি' উঠি' করুণ কূজন
বিষাদ-বিধুর করি' তোলে সুপ্ত সারাটি ভবন;
যাই যাই করি' যবে ক্লান্ত বেলা যায় নাকো আর—
অকারণ অশ্রুজল কেন ঝরে নয়নে আমার?

আষাঢ়-সন্ধ্যায় যবে রিম্‌ ঝিম্‌ ঝরে বৃষ্টিধারা—
বাহিরে বায়ুর মত হু হু করে প্রাণ সাথীহারা,
কশাহত অশ্বসম বজ্র-দীর্ণ ব্যথিত আকাশ—
সহসা গর্জ্জিয়া উঠে গুরু গুরু—পেয়ে মহাত্রাস,
মুছে দেয় বিশ্বসৃষ্টি প্রলয়ের গাঢ় অন্ধকার—
অকারণ অশ্রুজল কেন ঝরে নয়নে আমার?
উৎসবের দিনে যবে বাজে বীণা, উঠে বেণুরব,
আলোকপুলকস্পর্শে যেন কল্পলোক অবাস্তব
নেমে আসে দুঃখময় ব্যথাভরা ধরার উপর,
প্রত্যক্ষের তুচ্ছ যাহা—তাও হয় অনিন্দ্য সুন্দর,
নৃত্যগীতিহাস্যলাস্যে উচ্ছলিত হয় চারি ধার—
অকারণ অশ্রুজল কেন ঝরে নয়নে আমার?

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র-সাহিত্য

বাংলার প্রখ্যাত কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আজ আর ইহ-জগতে নাই। জীবিতাবস্থায় আজীবন তিনি বিশ্ব-প্রকৃতির ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। প্রকৃতির মাধুর্য্যই ছিল তাঁহার ভাব-জগতের একমাত্র উপাদান। তাঁহার জীবনব্যাপী সমগ্র সাহিত্যই ছিল এই উপাদানে গঠিত। নিজে যেমন তিনি প্রকৃতির প্রেমে মুগ্ধ ছিলেন, অপরকেও তেমনি তিনি তাঁহার সেই সাধন-ক্ষেত্র প্রকৃতির কোলে টানিতে চাহিতেন। এই চাওয়াই ছিল তাঁহার জীবনের সব চাইতে আনন্দের চাওয়া। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীসুনীলমাধব সেনগুপ্তকে লিখিত বিভূতিভূষণের নিম্নোক্ত পত্রগুলিতে তাঁহার সেই প্রাকৃতিক মননধর্ম্মই বিশেষভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। এই কারণেই বিভূতিভূষণের পত্রগুলি নিতান্তই সংবাদ-আদান-প্রদানে পর্য্যবসিত না হইয়া প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। —সম্পাদক : বঙ্গশ্রী

(১)

বারাকপুর।
সোমবার

প্রীতিভাজনেষু,

সুনীলমাধব বাবু,

আপনার পত্রে আপনাদের কুশল সংবাদ পাইয়া আনন্দলাভ করিলাম। মাঝে মাঝে এইরকম পত্র দিয়া আনন্দ দান করিলে সুখী হইব। আপনার কথা আমারও প্রায়ই মনে পড়ে। কেন না আপনি শিল্পী। শিল্প-সৌন্দর্য্য বিষয়ে আপনি যে আগ্রহপূর্ণ গল্পগুলি আমার নিকট করিয়াছিলেন, সে গল্পগুলির মধ্যে একটী শিল্পী-মনের আত্মপ্রকাশ দেখিয়া মনে হইয়াছিল—আপনি ওক্ষেত্রে আমার সগোত্র। মনের সঙ্গীই আসল সঙ্গী কি না?

বর্ষাকালে আমাদের গ্রামের বনভূমিতে কত তেলা-কুচো-লতা, মাকাললতা, তিৎপল্লী, বনকলমীলতা, কত কি ফুল, কত গাছপালা। সেই মহাশিল্পীর হাতের চিহ্ন এদের মধ্যে এত স্পষ্ট ও এত প্রত্যক্ষ যে সর্ব্বদাই এ বন-ভূমিতে তাঁর উপস্থিতি যেন দেখতে পাই। এ বনতলে সর্ব্বদাই তাঁর আসন পাতা। শুধু বন কেন, বনের উপর-কার সুনীল আকাশে তাঁর আসন, গ্রহ-নক্ষত্রে তাঁর আসন, দিক-দিগন্তে যে বিরাটের আসন পাতা। যে শিল্পী হইবে, সে আগে এই মহাশিল্পীর অদৃশ্য আবির্ভাবের আনন্দকে অন্তর দিয়া অনুভব করিবে। শিল্পীর মনে প্রেরণা আসিবার ইহাই উৎসমুখ।

ভগবান আপনাকে সেই অনুভবের ভাণ্ডার খুলিয়া দিন; ইহাই প্রার্থনা করি। আপনার গল্প বলা সুন্দর

হইয়াছে। তবে আমি সামান্য লোক। আমার কথা বলিবার মত নহে।

কলিকাতায় অনেকদিন যাই নাই। মধ্যে মেঘমল্লার রেডিওতে তিমিরবরণ কর্ত্তৃক সঙ্গীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন গিয়াছিলাম, ২২শে তারিখ আমার একটি রেডিও বক্তৃতা ছিল, সেদিনও গিয়াছিলাম, যে দাঙ্গাহাঙ্গামা তাহাতে কোথাও যাইবার প্রবৃত্তি হয় না। একদিন ব্যারাকপুর আসুন না? এ বারাকপুর নয়, ব্যারাকপুর।

আপনার বৌদিদিকে ওখানে শুক্রবারে রাখিয়া আসিব। ৩।৪ মাস ওখানেই থাকিবেন। এখানে ডাক্তার নাই, উপযুক্ত ধাত্রী নাই, এখানে রাখিব না। সময় মত ওখানে গিয়া আপনার বৌদিদির সঙ্গে বৌমার আলাপ করাইয়া দিবেন। আমিও মাঝে মাঝে ওখানে যাইব। সামনের রবিবার যদি আসেন সকালের দিকে (৯টার মধ্যে) ওখানেই থাকিব। সেবার আতিথ্যের ত্রুটি হইয়াছিল আমার এখানে। আমি সাধারণ শ্রেণীর গৃহস্থ মানুষ। আপনাদের উপযুক্ত অভ্যর্থনা কোনদিনই করিতে পারিব না। বৌমাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিবেন। ইতি

ভবদীয়
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

বারাকপুর
বৃহস্পতিবার।

প্রীতিভাজনেষু,

আগামী শনিবার আমার বারাকপুর যাওয়া হোল না। পরের শনিবার যদি যাই, তবে জানাবো। আপনি ও বৌঠাকরুণ রবিবার সকালে আসবেন। আমি আপনাকে জানাবে। প্রীতিনমস্কার গ্রহণ করুন।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পু:—আমার রোয়াকের পাশে যে নারিকেল গাছটা দেখেছেন, ওর গায়ে একটা তিৎপল্লীর নধর সুকুমার লতা উঠে নারিকেল গাছের মাথায় গিয়ে ঠেকেচে প্রায়। বর্ষাসতেজ প্রাণের রসে পুষ্ট এই তেজালো লাবণ্যময় লতাটি কি অপূর্ব্ব আনন্দেই আমার মনকে ভরিয়ে দেয় রোজ রোজ। দেখতে ছোট, কিন্তু ওই শিল্পকে সৃষ্টি করতে ভগবানকে কি বিপুল আয়োজন করতে হয়েছে, ন' কোটি মাইল দূরে সূর্য্যকে বসাতে হয়েচে আকাশে। আরও কত কি করতে হয়েচে। কত বড় মহাশিল্পীর প্রতিভার অবদান ওই নগণ্য(?) তিৎপল্লী লতাটী, তাই মুগ্ধ হয়ে ভাবি ওদিকে চেয়ে চেয়ে। কি সুন্দর, কি সুকোমল অথচ কি বিরাট, অথচ এ শিল্পকে চেনা যায় না, কেউ চোখ দিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখে না। আমার এখানে একদিন এসে দেখে যেতেন যদি এই তুচ্ছ নগণ্য বন্যলতাটি!

(৩)

বারাকপুর
গোপালনগর পোষ্ট
(যশোহর)
১৫ই আশ্বিন, ১৩৫২

প্রীতিভাজনেষু

আপনার পত্র পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছি, কারণ আমাদের লেখনী তখনই সার্থক যখন তা পাঠককে আনন্দ দিতে সমর্থ। একটি মহিলা-কবি সেদিন আমার জন্মতিথি উপলক্ষ্যে একটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন, সেটী এখানে লিখি—

আজি হ'তে বহু দূরে শতবর্ষ পরে
আমিও বলিতে চাই রবীন্দ্রের ভাবে
হয়তো নির্জ্জনে কোনো একাকিনী বালা
তোমার কাহিনী বক্ষে ধরিবে আদরে
হয়তো হরিণনেত্রে একবিন্দু জল
শিল্পীর চরম প্রাপ্তি, করিবে উচ্ছল।
ইতিহাসে লেখা থাকে ভাবাতত্ত্বে দান
স্রষ্টা তুমি, লহ প্রীতি শ্রদ্ধার প্রণাম।

আমার আনন্দ শুধু এখানে যে আমি আপনাদের জীবনের এক মুহূর্ত্ত সময়ও রূঢ় বাস্তবকে ভুলিয়ে দিতে পেরেছি। আমার অহংকারও এখানে, আনন্দও এখানে। আমি ৫ই অক্টোবর সন্ধ্যার লুপ এক্সপ্রেসে ভগবানপুরে যাচ্ছি, ওখানে কলেজের সাহিত্য সম্মেলনে পৌরোহিত্য

করতে। আপনি যে সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন আপনার গৃহে, সেজন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। কিন্তু পূজোর ছুটিতে আমি ঘাটশিলা যাচ্ছি। সেখানে আমার একটা ক্ষুদ্র গৃহ আছে, আমার ছোট ভাই ধলভূমগড় হাসপাতালের ডাক্তার। তাঁর পরিবারবর্গ ঘাটশিলার বাড়ীতে থাকে, পূজোর পর আমি নিশ্চয়ই একদিন আপনার ওখানে যাবো। আপনি কিরকম ছবি আঁকেন? প্রচ্ছদপটের ছবি আঁক্তে পারবেন? আমার একটা ভাল ছবি দরকার 'দেবযান'-এর নতুন সংস্করণের প্রচ্ছদপটের জন্য। অবিশ্যি এজন্যে প্রকাশকেরা দক্ষিণা দেবে ভালই। আপনি কি 'দেবযান' প'ড়েছেন? না পড়ে থাকলে কি কোনো লাইব্রেরী থেকে পড়ে নেবেন? 'দেবযান' সম্বন্ধেও নানাস্থান থেকে বহু চিঠি পেয়েছি। ওখানা পড়ে ওর central ideaটি অবলম্বন করে গড়ে উঠবে প্রচ্ছদপদের ছবিটি, বুঝলেন?

আমি cleopetraর বর্ণনা কোথায় করেছি? যা দেখে আপনি ছবি এঁকেচেন? বুঝলুম না। ছবিখানা দেখতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। বৃহস্পতিবার ৬-১০ মিনিটের সময় লুপ এক্সপ্রেসে আপনি কি দেখা করতে পারবেন? আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় থাকবো। ৮নং প্লাটফর্ম। যদি এখন সুবিধে না হয় থাক গে। ফিরে এসে আপনার বাড়ীতে যাবো। পূজার ছুটীর পর। আমার ঘাটশিলার ঠিকানা—C/o. Dr. N. Banerji. (আমার ভাই) Gouri Kunja, Ghatsila. B. N. Ry. বিজয়াদশমী পর্য্যন্ত থাকবো ওখানে। একাদশীর দিন ওখান থেকে বেরিয়ে সস্ত্রীক পশ্চিম ভ্রমণে বার হবো। চিঠি দশমীর মধ্যেই ঘাটশিলার ঠিকানায় দেবেন। নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪)

Rajgir
(Patna)
21. 3. 46

প্রীতিভাজনেষু,

এখানে এসে বড় আনন্দ পেয়েছি। বুদ্ধদেবের পাদ-ভূত শোনভাণ্ডার গুহাতে এখনো অতীতের পবিত্র মহিমার স্পর্শ পাওয়া যায়। আমার স্ত্রীও আমার সঙ্গে আছেন। আপনি ও বৌঠাকরুণ আমাদের উভয়ের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আপনার মত আর্টিষ্টের উচিত এমন সুন্দর স্থানে আসা। বহু সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে পাদচারণ করতে করতে ভারতের বিস্মৃত অতীত চোখের সামনে ভেসে উঠে। সামনের সপ্তাহে দেশে ফিরব, তখন আসুন একদিন আমার ওখানে। বড় সুখী হবো। ঠিক সময় চিঠি দিতে পারিনে বলে আমার ওপর যেন বিরক্ত হবেন না। আশা করি আপনাদের বাড়ীর সকলে ভালই আছেন। ইতি—

প্রীতিবদ্ধ
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

* শিল্পীপত্নী শ্রীযুক্তা অরুণা দেবীর সৌজন্যে।

সমালোচনা পদ্ধতি—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

মানুষের সহিত মানুষের যে সম্পর্ক তাহার প্রকাশের নাম সাহিত্য। এই সহিতত্ব দেশকাল-অনালিঙ্গিত। আমরা শুধু যে আমাদের পূর্ব্ববংশীয়দের রচনার রসই উপলব্ধি করি তাহা নহে, যাহারা আমাদের স্বদেশীয় নহে, যাহাদের সামাজিক রীতিনীতি আমাদের রীতি-নীতির অনুরূপ, তাহাদের সঙ্গেও সাহিত্যের মারফতে একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করিতে পারি, তাহাদের সহিতও সহৃদয়ত্বের সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারি। কিন্তু এই মৌলিক সাদৃশ্য থাকিলেও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বিচারপদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের সঙ্গে ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রের তুলনা করিলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমালোচনাপদ্ধতির পার্থক্য অনুমিত হইবে। যত মত তত পথ—এই মহাবাক্যের সারবত্তা এখানে উপলব্ধি করা যায়, আবার ইহাও দেখা যায় সমস্ত পথেরই উদ্দেশ্য এক—রসের স্বরূপ নির্ণয় এবং তাহার সার্থকতা বিচার। সাহিত্য বিচারের মৌলিক সমস্যাগুলি অপরিবর্ত্তনীয়। তাই বিভিন্ন দেশের আলোচনাপদ্ধতির তুলনা করিলে আমাদের উপলব্ধি তীক্ষ্ণতা ও সম্পূর্ণতা লাভ করিবে।

প্রথমে পশ্চিমদেশীয় সমালোচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ করার চেষ্টা করা যাইতে পারে। যে সমালোচনার সঙ্গে আমরা পরিচিত আছি, তাহার প্রারম্ভ হইয়াছে প্লেটোর রচনায়। প্লেটো মনে করেন যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিনের সম্পর্ক, তাহার মধ্যে কোন পারমার্থিক সত্য নাই। তাহার অন্তরালে রহিয়াছে কতকগুলি ভাব বা আইডিয়া; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ তাহারই অনুকরণ করে এবং কবিরা এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের প্রতিচ্ছবি আঁকেন। সুতরাং কবির কাব্য নকলের নকল, অর্থাৎ একেবারে অচল। সেইজন্য কবিরা আদর্শ-রাজ্য হইতে নির্ব্বাসনযোগ্য। প্লেটো ছিলেন অসামান্য কবিপ্রতিভা সম্পন্ন দার্শনিক; কিন্তু তিনি কাব্যকে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার আমল হইতে ইউরোপীয় সমালোচনা-সাহিত্যে এই দুইটি সমস্যা প্রাধান্য পাইয়াছে; কাব্য কি ভাবময় না রূপময়? তাহা রূপময়ই হউক আর ভাবময়ই হউক, তাহার সঙ্গে বস্তুজগতের সম্পর্ক কি এবং তাহার দ্বারা মানবের কোন প্রয়োজন সাধিত হয়?

এই প্রশ্নগুলিই প্লেটোর শিষ্য অ্যারিষ্টটল সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি মানিয়া লইয়াছেন যে—কবিকর্ম্ম অনুকরণ, কিন্তু ইহা বাস্তবের নকল নহে। যাহা সম্ভাব্য, নৈতিক নিয়মানুসারে যাহা অনিবার্য্য হওয়া উচিত কাব্য তাহাই অনুকরণ করে। সুতরাং কাব্যের অনুকরণ সৃষ্টিরই নামান্তর মাত্র। ইহা বাস্তব কাহিনীর অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের বস্তু—প্লেটোর ভাব বা আইডিয়ার সমগোত্রীয়। অ্যারিষ্টটল ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রের ধারা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যালোচনার প্রধান গুণ এই যে, তিনি কাব্যকে সমগ্র ভাবে দেখিয়াছেন, ইহা মানুষের ইতিবৃত্ত, তাহার কর্ম্মের কাহিনী। এই কারণে ইউরোপীয় সমালোচনা-সাহিত্যের মধ্যে একটা সমগ্রতা আছে যাহার জন্য কাব্যরস আস্বাদন সহজ ও সুগম হইয়াছে। কারণ শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচনায় কবিবর্ণিত চরিত্র ও অনুভূতি

প্রতিফলিত হইয়াছে। যাঁহারা ব্র্যাড্‌লি-লিখিত শেক্সপীয়র সমালোচনা পড়িয়াছেন, তাঁহারা মনে করেন শেক্সপীয়রের নাটকের বাহিরে যদি কোথাও হ্যামলেট, ইয়াগো প্রভৃতি প্রাণ পাইয়া থাকে, তবে সে ব্র্যাডলির রচনায়। কিন্তু তাহা হইলেও ইউরোপীয় সমালোচনা সাহিত্য দুইটি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নাই। কবি কল্পিত জগৎ ও বাস্তব জগতের মধ্যে সম্পর্ক কোথায়? আমরা কবির সৃষ্ট নর-নারীর যে ইতিবৃত্ত লিখি তাহার যৌক্তিকতা কোথায়? তাহারা কি বাস্তব জগতের মানুষের মত সম্পূর্ণাঙ্গ? আমরা তাহাদের যে বিস্তীর্ণ বিশ্লেষণ দিয়া থাকি তাহা কি কবির সৃষ্টি না আমাদের বিশ্লেষণী বুদ্ধির কণ্ডয়ন? অনেক সময় মনে হয় আমরা দুইয়ে দুইয়ে যোগ করিয়া পাঁচ করিয়া থাকি। কোন কোন পাঠক ব্র্যাড্‌লির অতি বিস্তারিত আলোচনা পড়িয়া সকৌতুকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "লেডি ম্যাক্‌বেথের কয়টি সন্তান ছিল তাহা তো আপনি বলেন নাই!"

আর একটি প্রশ্ন এই: কাব্য কি শুধু অনুভূতির অভিব্যক্তি, না তাহা চিন্তারও প্রকাশ? তাহা কি শুধু রূপমাত্র না ভাবেরও অভিব্যক্তি? যদি তাহা ভাবের প্রকাশ হইয়া থাকে তবে দর্শন ও কাব্যে পার্থক্য কোথায়? আর যদি তাহা রূপের সৃষ্টি মাত্র হইয়া থাকে তবে সেই-রূপ কিসের রূপ? রূপ তো অঙ্গসৌষ্ঠব মাত্র; অঙ্গীকে বাদ দিয়া আঙ্গিক রচনা করা কি সম্ভব? কেহ কেহ বলেন অঙ্গী ও আঙ্গিক যেখানে অবিনাভূত হইয়া থাকে তাহার নামই কাব্য সাহিত্য। কিন্তু এই অবিনাভূত সত্তাকে বিশ্লেষণ করিলেই ইহার দুই অংশ বাহির হইবে এবং তাহাদের সম্পর্ক বিচার না করিলে সাহিত্যের স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকিয়া যাইবে। ইউরোপীয় সমালোচনা সাহিত্য এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারে নাই এবং এই জন্যই সাহিত্যশাস্ত্রমূলক গ্রন্থে অলঙ্কারের স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার সঙ্গে কাব্য সৃষ্টির সম্পর্ক কি তাহা স্পষ্ট হয় নাই।

(২)

ভারতবর্ষীয় সাহিত্যশাস্ত্র শব্দ ও অর্থকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ক্রমে এই শাস্ত্রের মধ্যে বহু বিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু ইহার শব্দার্থের সঙ্গে সংযোগ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই জন্য আমাদের দেশে এখনও সাহিত্যশাস্ত্র অলঙ্কারশাস্ত্র নামে পরিচিত। আমাদের দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা মনে করিতেন যে শব্দ ও অর্থের বৈচিত্র্য হইতেই কাব্যের সৌন্দর্য্য আহৃত হয়। সহজ কথা সাধারণভাবে বলা ইতিহাসাদি গদ্যসাহিত্যের কাজ, কবিরা সাধারণ কথার মধ্যে বৈচিত্র্য আনিয়া তাহাকে সৌন্দর্য্যশালী করেন। এই বৈচিত্র্যের নানা প্রকার ভেদ সম্ভব; সেই প্রকার ভেদ অনুসারে অলঙ্কারের নামকরণ করা হইয়া থাকে—কাহারও নাম অনুপ্রাস, কাহারও নাম যমক, কাহারও নাম উপমা, কাহারও নাম রূপক ইত্যাদি। সকল অলঙ্কারেরই একটি সাধারণ ধর্ম্ম আছে। তাহা হইতেছে উক্তির বক্রতা। সেইজন্য আলঙ্কারিকেরা উক্তির বক্রতাকে কাব্যের প্রাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

অপর কোন কোন আলঙ্কারিকেরা রচনার রীতি ও গুণের উপর নির্ভর করিয়া কাব্য-সৌন্দর্য্যের অন্য ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দিলেও এই জাতীয় আলোচনা অসম্পূর্ণ। শব্দ প্রয়োগের অন্তরালে রহিয়াছে অর্থের প্রেরণা। যেখানে অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কার হইতে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয় সেখানেও অর্থই প্রধান। সুতরাং অর্থের বৈশিষ্ট্যের উপর কাব্যের মহিমা নির্ভর করিবে। অলঙ্কারাদি অর্থের যে পরিচয় দেয়, তাহা একান্তভাবে বহিরঙ্গের বর্ণনা। রমণীর অলঙ্কারের মতই তাহা ইচ্ছামত গ্রহণ করা যায় আবার ইচ্ছামত ত্যাগও করা যায়। অলঙ্কার বা রচনার স্বচ্ছতা বা ওজস্বিতা অর্থ প্রকাশের উপায় মাত্র; তাহারা কখনও মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে না। তাঁহারা বলেন, কাব্যের অর্থ মনোগত ভাবের প্রকাশ করে। সেই ভাব প্রকাশিত হইয়া রসে পরিণত হয়। সেই ভাবগুলি চিত্তবৃত্তির বিশেষ অবস্থা। তাহারা নিছক অনুভবও নহে, নিছক মতবাদও নহে—রতি, হাস, শোক প্রভৃতি মানসিক অবস্থা। ইহারা লৌকিক জগতের

বস্তু, কিন্তু ইহারা যখন কাব্যে রূপান্তরিত হয় তখন ইহারা অলৌকিকত্ব লাভ করে। সাহিত্যে মতবাদ প্রচার করা যায় কিনা, কাব্য জগতের সঙ্গে লৌকিক জগতের সম্পর্ক কি—ইউরোপীয় সাহিত্য শাস্ত্রের এই সকল প্রশ্ন ইঁহারা সহজভাবে সমাধান করিয়াছেন। রস চিত্তবৃত্তির অবস্থা-বিশেষের প্রকাশ; সুতরাং তাহার মালমশলা আসে লৌকিক জগৎ হইতে। কিন্তু যখন ইহা রসরূপ পরিগ্রহণ করিল, যখন রতি শৃঙ্গারে পরিণত হইল অথবা শোক করুণরসে পরিণত হইল, তখন ইহা অলৌকিক জগতের বস্তু হইয়া পড়িল, তখন ক্রৌঞ্চীর শোকে আমরা আর কাঁদি না, দুষ্মন্তভীত মৃগের ভয়ে সন্ত্রস্ত হই না।

এখন প্রশ্ন এই: কেমন করিয়া এই অলৌকিকত্ব প্রকাশ করা যাইতে পারে? এই প্রশ্নের সদুত্তর আলঙ্কারিকেরা শব্দার্থের মধ্যেই পাইয়াছেন। শব্দের অর্থ সোজাসুজিভাবে ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন প্রকাশ করে এবং ইতিহাস, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই প্রাথমিক অর্থই গ্রহণ করিয়া থাকে। এই প্রাথমিক অর্থের নাম দেওয়া হইয়াছে—বাচ্য অর্থ। কিন্তু ইহা ছাড়া শব্দের আর একটি অর্থও আছে। তাহার দ্বারা একটি নিগূঢ় অর্থ দ্যোতিত হয়। শব্দের এই শক্তির নাম—ব্যঞ্জনা। এই শক্তির সাহায্যে অন্তর্নিহিত রতি, শোক প্রভৃতি ভাব শৃঙ্গার, করুণ প্রভৃতি রসে রূপান্তরিত হয়। কবি কালিদাস বলিয়াছেন, দেবর্ষি নারদ পার্ব্বতীর সহিত মহাদেবের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, পার্ব্বতী পিতার পাশে বসিয়া নীলকমলের পত্র গণনা করিতে লাগিলেন। নীলকমলের গণনা পার্ব্বতীর সপুলক লজ্জা সূচিত করিয়া তাঁহার অন্তঃস্থিত রতিভাব প্রকাশ করিতেছে। ইহা শৃঙ্গার রস। ইহা অলৌকিক।

প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা শব্দার্থের প্রতি জোর দিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা কাব্য ও দর্শন-ইতিহাসাদির পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছেন। কাব্য ভাব না রূপ, বাচ্য অর্থ ও ব্যঞ্জনার মধ্যে সম্বন্ধ কোথায়—এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা না করিলেও এই প্রশ্নের সমাধানের পথ তাঁহারা দেখাইতে পারিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, বাচ্য ব্যঞ্জনার ভূমি; ব্যঞ্জনা আলোক, বাচ্য দীপশিখা। কিন্তু তাঁহারা সমগ্র কাব্যকে গৌণ করিয়া একটি শ্লোক এবং শ্লোকস্থ খণ্ড শব্দের উপর জোর দিয়াছেন। তারপর, তাঁহারা একটি বিশিষ্ট ভাবকে আলোচনার কেন্দ্র করিয়াছেন বলিয়া সমগ্র চরিত্র এবং তাহার কর্ম্মজাল হইতে ভাব বা রসবিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা—কর্ম্মরত মানুষ; সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের উপজীব্য হইল ভাবব্যঞ্জক শব্দ। এই জন্য ভারতবর্ষীয় সাহিত্যশাস্ত্রে সমগ্রতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপীয় সমালোচনার তুলনায় ইহা আংশিকতা দোষদুষ্ট বলিয়া মনে হয়; ইহা যেন বহুর মধ্যে এককে হারাইয়া ফেলিয়াছে। ভবিষ্যতের সাহিত্য-সমালোচনা ভারতবর্ষীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য এবং বাচ্যব্যঙ্গের বিভেদের সঙ্গে ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রের সামগ্রিক দৃষ্টির সমন্বয় করিলে কাব্যের নিগূঢ় রহস্য সমালোচনায় সম্যকরূপে প্রতিভাত হইবে।

আবার আশ্বিন

শশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

আবার আশ্বিন এল, বহে স্নিগ্ধ হিমের বাতাস,
রবি-করে সোনা ঝরে—তবু নাই কোথাও আশ্বাস!
নীল-দ্যুতি-বিকীরিত বিথারিত উন্মুক্ত অম্বর,
মুক্তির আভাসে আজো ভরে নাক' বিক্ষুব্ধ অন্তর!
মাঙ্গলিক ধূপে দীপে উৎসবের কত আয়োজন,
কত সুরভিত পুষ্প, কত অর্ঘ্য অগুরু-চন্দন!

কত বাদ্য, কত তান, কত গান, কত না বন্দনা,
তবু চিত্ত ভরিল না, লভিল না শান্তি এককণা!
জাগিয়া রহিল আজো বিশ্বগ্রাসী দানবের ক্ষুধা,
মঙ্গলের চিহ্ন হারা, ব্যথাজীর্ণা নিখিল বসুধা!
কাঁদে জায়া, কাঁদে পুত্র, কাঁদে মাতা, কাঁদে অসহায়,
প্রতীক্ষার লগ্ন আজ ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে ফিরে যায়!

এ বিশ্ব শ্মশান যেন—বিভীষিকা ভরা চারিধার—
জাগে মৃত্যু, জাগে শোক, জাগে ভয়—নাহি প্রতিকার!

মানুষ ঃ প্রকৃতি

দুর্গাদাস সরকার

বারবার আমি ক'রেছি আমার জীবনকে জিজ্ঞাসা,
কাহারো কখনো পেয়েছো কি ভালোবাসা ?
তুমি তো নিঃস্ব, তুমি থাকো কোন্ অজানা গ্রামের পথে
তোমার জন্যে কাঁদে না অন্যে ; সিংহ-দরজা হ'তে
যাহারা তোমাকে ফিরিয়েছে, আজো ফিরালো ঘৃণায় ফের
তুমি নও তাহাদের।
তাহারা হেলায় অপচয় করে সম্পদ-সম্ভার ;
তোমার শিথিল মুঠোতেও নেই এ-মাটির অধিকার।
তবু কি কাহারো পেয়েছো কখনো তুমি স্নেহ-ভালোবাসা
—জীবনকে করি আজো সেই জিজ্ঞাসা।

কোথায় শান্তি, কোথায় বা বিদ্রোহ ?
চারিদিক জুড়ে ছিল যে শান্ত সবুজের সমারোহ,
সুনীল আকাশে জ্বল্‌তো যে কোটি তারা,
সে সবই তোমাকে বাসতো ভালো কি,
সে সব তো দিশাহারা।
সে-সবই তোমাকে বেঁধে স্নেহ-বন্ধনে
ঝড় আনবে কি অজনে অজনে ?
দিকে দিকে তাই প্রস্তুতি চলে অরণ্য-পর্ব্বতে,
ঝড় উঠবে কি মানুষ-প্রকৃতি দুয়েরই সখ্য হোতে ?
তাই তুমি নিশ্চুপ ?
হে জীবন, তুমি অদ্ভুত অপরূপ।

শরৎ

সুশীল কুমার গুপ্ত

শরতের যাদু-স্পর্শে নাগরিক আকাশ কী নীল!
মেঘের হাসির ঢেউ নীলিমার রূপসীর মুখে ;
রোদের নির্ঝর নামে রাজপথ-প্রাসাদের বুকে ;
পলায়িত মৃত্যু-ভয় ; ছত্রভঙ্গ ছায়ার মিছিল।
পার্কের গাছের সারি বায়ু-স্বরে করে সূর্য্য স্তব।
চঞ্চল পাখীর ডানা নীলশূন্যে আঁকে সুর-ছবি।
নগরীর বুকে বাজে জীবনের গভীর ভৈরবী।
লক্ষ মন দ্বার খুলে শোনে ছুটি-আনন্দের রব।

মায়াময় সে-মুহূর্ত্তে ভুলি আমি ছা-পোষা কেরানী।
প্রেতের গলিতে থাকি, রুগ্ন শিশু, উপোসী বনিতা,
প্রেম-স্বপ্ন-আশা বন্দী, প্রাণ কাঁদে মৃত্যুর পীড়নে ;
বলে উঠি, 'আমি সুখী' ; দেখি—আশা দেয় হাতছানি ;
নূতন আশ্বাসে লিখি আনন্দের ভাস্বর কবিতা ;
ভাবি—এ-ক্ষণিক মায়া সত্য হবে আমার জীবনে!

রক্তখাওয়া

রমেশচন্দ্র সেন

উমার মনে কয়েকদিন যাবৎ দ্বন্দ্ব চলিতেছে. কি করিবে, কি করা উচিত!

পাশেই মলিন শয্যায় শীর্ণ পঙ্গু স্বামী শুইয়া; উঁচু চোয়াল, পাঁজরের হাড়গুলি এক এক করিয়া গোণা যায়। চোখ না যেন দুখণ্ড সাদা পাথর, ঘুমের সময়ও চোখের পাতা বোজে না। দেখিলে মনে হয় উন্মুক্ত শবাধারে মিশরের ম্যমি শুইয়া আছে।

বিহারের প্রান্তের শহর, এখানে সামান্ত যে দু'চারজন প্রবাসী বাঙ্গালী আছে, এই চেহারার জন্ত তারা রোগীর নাম দিয়াছে কঙ্কাল। কঙ্কাল ক্রমে ক্রমে কঙ্কুতে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

কঙ্কু মাঝে মাঝে স্ত্রীকে বলে, যম আমায় দেখে ভয় পেয়ে গেছে উমা। আমি অমর।

উমা বলে, ছিঃ, ওকথা মুখে আনতে নেই।

—গরিবরা আমরা জাত অমর। অন্ততঃ একদিন অমর হব—বলিয়া কঙ্কু হাসে। মরণহীন দরিদ্রের দুঃখের হাসি।

*　　　*　　　*

সেদিন কঙ্কুর অবস্থা খারাপ। কথা বলিতে পারে না, নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়, আধবোজা চোখ দেখিলে বোঝা যায় না জাগ্রত কি নিদ্রিত। উমা পাশে বসিয়া পাখা করে, তার গায়ে হাত বুলায়, হাত পায়ের আঙ্গুল টানিয়া দেয়, কপাল টেপে।

অন্তদিন কঙ্কু স্ত্রীর কাপড়ের খুঁট আঙ্গুলে পেচায় আর খোলে, খোলে আর পেচায়। আজকাল এই তার খেলা—প্রেম নিবেদনের এই-ই রূপ।

সেদিন সকাল হইতে কয়েকবার চেষ্টা করিয়া এ খেলাও সে খেলিতে পারিল না। আঙ্গুল ঘুরাইবার মতন শক্তি আর নাই। উমা নিজের কাপড়ের খুঁট লইয়া তার হাতের আঙ্গুলে জড়ায় আর খোলে। কঙ্কু তার দিকে চাহিয়া থাকে। দেখে তার কমনীয় কান্তি, মেঘে ঢাকা চাঁদের মতন। মলিন তবু চাঁদ, এমনই সুন্দর তার উমা।

মনের আকাশে টুকরা টুকরা ছবি ভাসে—শরতের পাতলা মেঘের মতন পরস্পর বিচ্ছিন্ন। মেদিনীপুর জেল,

বক্সা ক্যাম্প, বিবাহ রাত্রি। ভোর হইতে না হইতে পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করিল। কুশণ্ডিকা হইল না।

সামনে প্রকাণ্ড ওটা কি?

কম্বু চীৎকার করিয়া উঠিল, ঘানি—ঘানি।

তার সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া গেল।

উমা নেকড়া জলে ভিজাইয়া তার কপাল ও চোখের পাতা মুছাইয়া দেয়। পাখা করে।

আজকাল প্রায়ই এইরূপ হয়। আধ অচৈতন্য অবস্থায় অতীত জীবনের ছবি দেখিয়া কম্বু কখনও হাসে, কখনও বা ভয়ে আঁতকাইয়া ওঠে।

প্রকৃতির কী পরিহাস। টেগার্ট লোম্যান যাকে সমীহ করিয়া চলিতেন—লম্বা চওড়া সেই মানুষটা কী ছোটই না হইয়া গিয়াছে। যেন একটা প্লাষ্টিকের পুতুল। অতীতের চিহ্ন আছে শুধু উঁচু নাক আর চওড়া কপাল।

ঔষধ বন্ধ অনেক দিন। নিজে অনশন অর্দ্ধাশনে থাকিয়া উমা এতদিন স্বামীর পথ্যের ব্যবস্থা করিয়াছে। এখন আর তা'ও পারে না।

কাল বৈকাল হইতে কম্বুর পেটে কিছু পড়ে নাই।

উমা নিজে উপবাসী পুরা দুই দিন। কম্বুর গলা শুকাইয়া গিয়াছিল। সে হাঁ করিয়া একটু জল চায়। দুই ঢোঁক জল গিলিয়া বলে, তুমি না ব'লেছিলে ওষুধ পথ্যের যোগাড় হ'তে পারে? কে একজন—

পরক্ষণেই—উঃ উঃ করিয়া নিজের পেট চাপিয়া ধরে। যন্ত্রণায় মুখ নীল হইয়া যায়। এই দৃশ্য উমা আর সহ্য করিতে পারে না, উঠিয়া জানালার কাছে যাইয়া দাঁড়ায়। দুই হাত দিয়া জানালার গরাদ ধরিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকে।

বিশাল আকাশ, তার পরিচিত নিবিড় নীল আকাশ এ নয়, রৌদ্রদগ্ধ ধূসর এক মহামরু। ধূলির কণা ওড়ে, ধূলি না যেন আগুনের গুঁড়া। দূরে দেখা যায় বাঁকা একটা গাছ যেন কুষ্ঠরোগী লাঠি ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আরও দূরে মহাশূন্যে একটা শকুন উড়িতেছে। তার ঠোঁট হইতে রক্তমাখা কী যেন ঝোলে; বোধ হয় ছোট্ট শিকার।

ওপাশে প্রায় সিকি মাইল দূরে অজেন ঘোষের বাড়ীর লাল ইট। বাড়ী না যেন লাল কেল্লা।

কী সব অলক্ষণ। শকুন রক্তমাখা মড়া, কুঠে—লাল কেল্লা। উমার ভয় করে।

ধূলার নিশান উড়াইয়া জানালার নীচ দিয়া একটা গরুর গাড়ী চলিয়া গেল। গাড়োয়ান চাবুক ঘুরায় আর চেঁচায়—জয় রামচন্দ্র কী জয়। জয় মহাবীর জীউ।

একটা চাবুক পড়িল বাঁ দিকের গরুটার নাকের ডগায়। দর দর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। উমা চীৎকার করিয়া উঠিল, মারো মত্। তার ক্ষীণ কণ্ঠ মহাবীর ও সীতাপতি ভক্তের কাণে পৌঁছিল না।

সময় কাটে, মিনিট দণ্ড, ঘণ্টা। উমা যেন আঁধারের মধ্যে ডুবিয়া ছিল। হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া দেখিল কম্বু হাঁ করিয়া আছে। তার চোখ ঘোলাটে, নিস্পন্দ, নিঃশ্বাস পড়ে কিনা বোঝা যায় না।

তবে কি? উমার বুক ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

কম্বুর ঠোঁট একটু নড়িল। সে ধীরে ধীরে বলিল, জল।

জল পেটে পড়িলেই আবার বেদনা বাড়িবে। না দিলেও গলা শুকাইয়া যাইবে।

মুহূর্ত্তের জন্য উমা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া কী যেন ভাবে। তার বুকের ভিতরে ঝড় বহিয়া যায়।

কম্বুর মুখে একটু জল ঢালিয়া পরক্ষণেই সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। আর পিছু তাকাইল না। ঘরের দরজাও ভেজাইল না। হন হন করিয়া ছুটিতে লাগিল সামনের রাস্তা ধরিয়া।

ছোট্ট শহর, গ্রামই বলা চলে। এমনিই লোক চলাচল কম, তার উপর লু বহিতেছে। উমাকে কেহ দেখিতে পাইল না। পাইয়া থাকিলেও সে উহা জানিতে পারিল না।

অজেনের ফটকে কেহ তাহাকে বাধা দিলনা। কোন লোকই ছিল না দরজায়। সামনের ঘরের খসখসের পর্দ্দা সরাইয়া উমা দেখিল—অজেন নেইল্-কাটার দিয়া হাতের নখ কাটিতেছে।

ঘরে এক রাশ আলো ঢোকায় অজেন মুখ তুলিয়া তাকায়। দেখে সামনে উমা।

বিস্ময়ের প্রথম আবেগ কাটার সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখে মুখে আনন্দ ফুটিয়া ওঠে—জয়ের আনন্দ। সে জানিত এই জন্য একদিন আসিবেই।

আর উমার চাহনিতে ছিল বিরক্তি ও ঘৃণা। নিজের দারিদ্র্যের উপর, সমাজের ব্যবস্থার উপরে বিরক্তি। অজেনের প্রতি তিক্ততা, সে উহা দেখিয়াও দেখিল না, উমাকে কহিল, বসুন। উমা বসিলে প্রশ্ন করিল, কি চাই?

ওঁর পথ্যের জন্য এসেছি। উনি এখনও বেঁচে আছেন।

কি কি দরকার?

দুধ, গ্লুকোজ, হর্লিক্স, রোগীর যে কোন পথ্য।

আপনার নিজের জন্য?

আমার কিছু দরকার নেই।

তা'হলে রোগীকে বাঁচাতে চান কেন?

উমা নীরব। অজেন বলিল, যাক্ আমার প্রস্তাবে আপনি তা হ'লে রাজী আছেন?

হাঁ, আপনি তাড়াতাড়ি পথ্যের ব্যবস্থা করে দিন।

ব্যবস্থা এক্ষুণি করছি। কিন্তু আপনি বড্ড লেট্ করে ফেলেছেন। যাক্—এর পরই অজেন ডাকিল, অরু, গোয়াড়ি।

কালো কুঁচকুঁচে গোফওয়ালা ফরসা গৌরবর্ণ এক যুবা আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল, হুজুর। লোকটি তার গাড়ীর ড্রাইভার—গোয়াড়ি।

অজেন তাকে বলিল, ওঁর সঙ্গে সের খানেক দুধ নিয়ে যাও। দুধটা গরম করে ফ্লাস্কে নিও। সঙ্গে চিনি, হর্লিক্স, ফল ফলারি যা আছে।

গোয়াড়ি চলিয়া যাইতেছিল, অজেন তাকে আবার ডাকিয়া কহিল, যাবে মোটর নিয়ে—পথে ডাক্তার কে পি রায়কে তুলে নিয়ে যেও। তাঁকে ব'ল—

পাছে পথ্য দিতে দেরি হইয়া যায় এই ভয়ে উমা বলিল, ডাক্তার পরে হবে। এখন তার পথ্যিটা তাড়াতাড়ি—

অজেন বলিল, আপনিও কিছু খান নি দেখছি, আপনাকে একটু চা দিক্।

চা খেতে আমি আসিনি।

উমার কথাটা বেশ একটু রূঢ় শুনাইল। গোয়াড়ি বাহির হইয়া গেলে অজেন বলিল, আজ চা খেতেই যদি রাজী না হ'ন তা হলে ভবিষ্যতে—

ভবিষ্যতের জন্য আমায় অবিশ্বাস করবেন না। কিন্তু চা এখন আমার গলায় ঢুকবে না।

অজেনের মুখ দিয়া একটা শব্দ বাহির হইল, হুঁ।

উমা বলিল, যদি অবিশ্বাস করেন তাহলে দুধও থাক্।

না, না—অবিশ্বাস আমি করিনি।

উভয়েই নীরব হইয়া গেল। অজেন নেইলকাটার দিয়া নখের উপর দাগ কাটে, আর উমা ভাবে তার স্বামীর মুখের উপর হয়ত মাছি ভন্ ভন্ করিতেছে, মুখের মধ্যেও নিশ্চয়ই দু'একটা ঢুকিয়াছে। বাড়ি ফিরিয়া তাকে দুধ খাওয়াইতে পারিবে ত? দুধ হয়ত গলায় আটকাইয়া যাইবে।

এর পরের দৃশ্য কল্পনা করিতেও শিহরিয়া ওঠে। সেই কল্পনাকে এড়াইবার জন্যই হয়ত ঘরখানার এদিক-ওদিক তাকায়।

পরিচিত ঘর, আগে একবার আসিয়াছিল। তখন শোফাগুলি ছিল ভেলভেটে মোড়া, সেগুলি ব্রাউন রংয়ের চামড়ায় ছাওয়া হইয়াছে। পুব ও পশ্চিমের দেয়ালে দু'খানা ছবি ছিল, সম্ভবতঃ অজেনের পিতা মাতার।

এখন সেই দু'খানা একই দেয়ালে ঝুলিতেছে, বিপরীত দিকের দেয়াল হইতে বৃদ্ধ বৃদ্ধার দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছে এক চিত্র-তারকা। আর একপাশে একখানা নগ্নচিত্র।

আর সব আগের মতনই আছে। কুক কেলভির বড় ঘড়ি, প্রকাণ্ড টেবিল, রিভলভিং চেয়ার। টেবিলের উপর কাঁচখানাই বা কত বড়।

অজস্র এদের ধন দৌলত সিন্দুকে বন্দী হইয়া আছে, অকেজো হইয়া পড়িয়া আছে টেবিলে চেয়ারে গদিতে সোফায়। আর নিকটেই তার স্বামী না খাইয়া গলা শুকাইয়া মরিতেছে।

মিনিট কয়েক পড়ে গোয়াড়ি আসিয়া বলিল, হুজুর, সব গাড়ীতে তুলে দিয়েছি।

উমা তার সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। পিছু পিছু আসিল অজেন।

দরজার সামনেই দানে চকোলেট রংয়ের গাড়ী, গদিগুলি খুন-খারাপি রংয়ের চামড়ায় মোড়া। পাদানিতে একটা চুবড়ির ভিতর ক্লাম্ব, কমলানেবু, বেদানা টম্যাটো আপেল ও অরুনাভ নাসপাতি।

উমা গাড়ীতে উঠিলে গোয়াড়ি গাড়ী ছাড়িয়া দিল। উমা অজেনকে ধন্যবাদ দিল না, নমস্কার করিল না, এমন কি তার দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না।

বাঁ দিকের মোড়ে গাড়ীখানা অদৃশ্য হইয়া গেলে অজেন আপনা-আপনিই বলিল, টু লাভার, স্বামীকে ভালবাসে বটে। আচ্ছা দেখা যাক—তার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল শ্বাপদসুলভ হিংস্রতা।

উমাদের দাম্পত্য জীবনের ইতিহাস ধারাবাহিক এক দুঃখের কাহিনী। তাদের প্রথম পরিচয় কলিকাতার এক থানায়। শহরে দিল্লী হইতে বড়লাট আসিবেন, তাঁর নিরাপত্তার জন্য ধরপাকড় শুরু হইল। এম, এ ক্লাসের ছাত্র কম্বু ধরা পড়ে, উমাকে পুলিশ থানায় লইয়া যায়। সে তখন আই, এ পড়িত।

সন্ত্রাসবাদ ও গান্ধীবাদ, আবার সন্ত্রাসবাদ—এই ভূমিকার মধ্য দিয়া কম্বু জীবনপথে আগাইতে থাকে। জেলে দড়ি পাকায়, ঘানিতে ঘোরায়।

দু' দু'বার হয় নির্জন কারাবাসের হুকুম।

একবার কাঠকয়লা দিয়া সেলের দেয়ালে সে কতগুলি কবিতা লিখিয়া রাখে। কবিতাগুলি উমার উদ্দেশে।

উমার অভিজ্ঞতাও কম্বুরই অনুরূপ। পুলিশের হাতে বহু লাঞ্ছনা, বহু অপমান তাকে সহ্য করিতে হয়। জেলেই কাটে পাঁচ ছয়টা বছর।

দু'জনেই জেল হইতে বাহির হয় সাম্যবাদে গভীর আস্থা লইয়া। কম্বু 'সাম্যবাদের ভূমিকা ও ভারতবর্ষ' নামে একখানি বইও লেখে। পুলিশ তার পাণ্ডুলিপি লইয়া যায়।

এরপর তাদের বিবাহ। বিবাহের রাত্রেই কম্বু আবার গ্রেপ্তার হয়। উমার বাপের বাড়ীতে সংসারের কর্ত্রী ছিলেন তার জেঠাইমা। তিনি নিচ বর্ণীয় কম্বুকে জামাই বলিয়া স্বীকার ত করিলেনই না বরং হুকুম দিলেন উমা ও বাড়িতে ঢুকিতে পারিবে না।

প্রধানতঃ তাঁর স্বামীর টাকায় সংসার চলিত, তাই উমার বাবাও কোন প্রতিবাদ করিলেন না। মাতৃহীনা কন্যাকে ভাসাইয়া দিলেন।

পুলিসের বিরাগভাজন ছেলেকে কম্বুর বাবা আগেই ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছিলেন।

কম্বু শেষবার যখন জেল হইতে বাহির হইল, তখন তার অবস্থা রস নিংড়ে বার করা আখের ছিবড়ার মতন। কারাগারে মৃত্যুসংখ্যা বাড়াইতে চান না বলিয়াই কর্তৃপক্ষ হয়ত তাকে মুক্তি দিলেন।

উমা স্বামীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল। ডাক্তার মল-মূত্র থুথু ও রক্ত পরীক্ষা করিলেন। রক্তই ছয়বার। এক্স-রে হইল কিন্তু রোগ নির্ণীত হইল না। ঔষধের এক্সপেরিমেন্ট চলিতে লাগিল।

উমা কলিকাতা কর্পোরেশন স্কুলে মাষ্টারী করিত। তার সামান্য আয়ে সংসারের ও চিকিৎসার খরচা চলিত না। দেনা হইতে লাগিল।

ছয়মাস কাটিয়া গেল। ঔষধে ফল না হওয়ায় ডাক্তাররা বলিলেন, মেডিসিন ত ফেল পড়ল। দেখুন পশ্চিমে নিয়ে গিয়ে। ক্লাইমেটের গুণে উপকার হ'তে পারে।

দেনা প্রচুর। আর দেনা পাওয়ার উপায় নাই। সামান্য কিছু গহনা যা ছিল, তাহা বেচিয়া বহু আশা বুকে করিয়া উমা একদিন স্বামীকে লইয়া স্বাস্থ্যকর এই ছোট্ট শহরে আসিল।

হাতের শেষ কপর্দক নিঃশেষ হইয়া গেল। ক্যাজুয়াল, প্রিভিলেজ, মেডিক্যাল, যত রকমের ছুটি আছে, সব ফুরাইয়া গেলে সে চাকরি ছাড়িল।

হাতে আসিল প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সামান্য কিছু টাকা। উহা দিয়া আবার মাস কয়েক স্বামীর চিকিৎসা করাইল,

ভাল ভাল পথ্য দিল। উহা নিঃশেষিত হইলে জেঠাই-মাকে চিঠি দিল, স্বামীর অজ্ঞাতে খবর দিল শ্বশুর বাড়ীতে।

কঙ্কুদের বাড়ী হইতে উত্তর আসিল—তার বাবা মারা গিয়াছেন। তাঁর ভাইয়েরা ও ছেলেরা সব পৃথগন্ন। সেখান হইতে সাহায্য পাওয়ার কোন আশাই নাই।

উমার জেঠিমা চিঠির জবাবই দিলেন না।

স্বামীর এবং নিজের বন্ধু ও সহকর্ম্মীদের নিকটও সে হাওলাত চাহিয়া চিঠি দিয়াছিল। অনেকেই জবাব দিল না। দু' একজন ইনাইয়া বিনাইয়া নিজেদের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিল। সাহায্য পাঠাইল একটি মাত্র বন্ধু। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইয়া দিল যে ধার করা এবং ধার দেওয়া কোনটাই সে পছন্দ করে না। 'Neither lender nor borrower be' এই ইংরেজী প্রবাদ বাক্যটা উমা যেন মনে রাখে।

টাকাটা পাইয়া উমা ক্ষোভে ও অপমানে ফাটিয়া পড়িল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উহা ফিরাইয়া দিতে পারিল না।

ডাক্তার কে, পি, রায় কঙ্কুকে দেখিবেন। অজেনেরও তিনি গৃহ-চিকিৎসক। তাঁর সঙ্গে অজেনের বেশ সদ্ভাব ছিল। তিনি তাকে বলিলেন, এখানে একটি বাঙালী পরিবার কষ্টে প'ড়েছে। আপনি তাদের কিছু সাহায্য করলে ভাল হয়।

অজেন জিজ্ঞাসা করে, কোন্ পরিবারের কথা বল্‌ছেন?

এঁরা থাকেন রাণীবাগে। স্বামী-স্ত্রী দু'জন, স্বামীটি অসুস্থ; মরণাপন্ন। ওষুধ পথ্য চল্‌ছে না।

অজেন প্রশ্ন করিল, মেয়েটি ক'লকাতা কর্পোরেশনের স্কুলে মাষ্টারি করে না?

হ্যাঁ, আপনি জানলেন কি করে?

মাঝে মাঝে এখানে আসি ত। ছোট্ট শহর, সবই কাণে আসে, নিজের গরজেও কিছু কিছু খবর রাখতে হয়।

এই কথার জবাবেই যেন ডাক্তার বলিলেন, মেয়েটি খুব ভাল, তবে বড্ড অভাবে প'ড়েছে।

অজেন বলিল, দেখতেও শুনেছি যেন কাশ্মীরী আনারস। জানেন ত সুন্দরী মেয়েকে সাহায্য করতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

ডাক্তার কহিলেন, মেয়েটি আদর্শবাদী, উচ্চ শিক্ষিত।

সেই ত সুবিধের কথা। আদর্শবাদ হচ্ছে ওদের একটা আবরণ। আদর্শবাদীরাই বেশী দুর্ব্বল হয়।

ডাক্তার এবার কথায় ছেদ টানিয়া দিলেন।

অজেন পরদিনই উমাকে ডাকিয়া পাঠায়। সে আসিলে হাসিয়া অভ্যর্থনা করে। উমা প্রশ্ন করে, আপনি আমায় ডেকেছেন কেন?

—শুনলাম আপনার স্বামী অসুস্থ এবং তাঁর নাকি চিকিৎসা চল্‌ছে না।

হ্যাঁ, অসুখ বেশী। ওষুধ পথ্য কিছুই চলছে না।

আপনি অনুমতি করলে আমি সাহায্য করতে পারি।

উমার মুখ খুসীতে ভরিয়া ওঠে। সে বিনয়নম্র স্বরে বলে, সাহায্যের আমার খুবই দরকার। তবে বিনিময়ে আমিও কিছু সার্ভিস দিতে চাই।

কি সার্ভিস?

আপনার বাড়িতে কোন ছেলেমেয়ে থাকলে আমি তাদের পড়াতে পারি। আই, এ ক্লাস পর্য্যন্ত ছেলে মেয়েদের আমি পড়াই।

আপনি নিজে?

এম, এ অবধি পড়েছি।

অজেন বলিল, আমার বাড়ীতে পড়াবার মতন কেউ নেই, কোন ভাগ্নী ভাইঝি কেউ না। নিজে আমি ব্যাচিলর।

উমা তার মুখের দিকে তাকায়।

অজেন বলে, এখানে বড় lonely feel করি। আপনি মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে মোটরে বেড়াবেন। সিনেমায় যাবেন। এখানে ভাল হোটেল নেই, আছে বিশ মাইল দূরে, অ…………শহরে। সেখানে—

উমা বাধা দিয়া বলিল, আপনি আমায় ডেকেছেন এই কথা বলতে? আস্পর্দ্ধা ত আপনার কম নয়।

সে রাগে কাঁপিতেছিল। তার গাল দু'টা লাল হইয়া উঠিল।

অজেন হাসিয়া বলিল, আমি এ সম্পর্কে বরাবরই দুঃসাহসী এবং কিছুটা ভাগ্যবানও বটে—

উমা উঠিয়া দাঁড়ায়। অজেন বলে, বেশ, আজ যাচ্ছেন যান। তবে আমার দরজা বরাবরই আপনার জন্য খোলা থাকবে। যখন ইচ্ছে—

বাকী কথাগুলি উমার কানে গেল না। সে তখন ঘরের বাহির হইয়া আসিয়াছিল।

মাত্র কয়েকমাস আগের কথা। সেদিন বাড়ি ফিরিয়া কন্থুকে সে সব কথা জানায়। অজেনের দুঃসাহস লইয়া দুজনে হাসাহাসি করে। কন্থু বলে, রেচ্।

চামচে করিয়া তার গলায় দুধ দিতে দিতে উমার আজ মনে পড়ে সেইদিনকার দৃশ্য।

সে ভাবে, রেচ্ কে? তার মতন গরিব ভিখারিণী না ধনকুবের ঐ মানুষটা?

ঠিক এই সময় কন্থু একটা আরামকর নিঃশ্বাস ছাড়িল—আঃ। এতটা আরাম সে পায় নাই বহুদিন।

ধনীর দুলাল অজেন। উত্তরাধিকারসূত্রে সে পাইয়াছিল অনেক কিছু, কয়লার ও অভ্রের খনি, চা বাগান, জুট প্রেস, কোম্পানীর কাগজ, সেয়ারস্ক্রিফ্ট। ব্যাঙ্কে ছিল অগুণতি টাকা।

গুণ অনেক, প্রতিভা, কর্ম্মশক্তি, নিজের কর্ম্মচারীদের প্রতি সদয় ব্যবহার। কিন্তু চরিত্রের মারাত্মক দুর্ব্বলতা ছিল নারীর প্রতি আসক্তি।

বাংলা বিহারের ছোট বড় অনেক শহরে তার আপিস আছে। তাকে প্রায়ই সেই সব জায়গায় যাতায়াত করিতে হয়। এর প্রত্যেকটি জায়গায় তার দু'একটি বান্ধবী আছে। অজেনের সময় ও অর্থের বেশীর ভাগই ব্যয় হয় এই সব নারীদের জন্য। হিতার্থীরা বলে, ছোড়ার কপালে অনেক দুঃখ আছে। বাপের-কাজ কারবার সব মাটি করে ফেলবে।

বাধা দেওয়ার মতন উপরে কেউ ছিল না। সু-পরামর্শ দেওয়ার মতন বন্ধুও নয়। অজেন উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল। সে মনে করিত অর্থমূল্যে সবই ক্রয় করা যায়। তবে মূল্যের তারতম্য আছে। মূল্য যেখানে বেশী, অপেক্ষা সেখানে বেশী করিতে হয়, আনন্দও সেই অনুপাতে বেশী পাওয়া যায়।

উমার বেলায় অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, বাধা আসিয়াছিল—তাই আনন্দও পাইল প্রচুর।

* * *

ঔষধপথ্য পাওয়ার ফলে কন্থুর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। গুছাইয়া কথা বলার কিংবা কিছু ভাবার মতন শক্তিও যার লোপ পাইয়াছিল, তার চোখে মুখে স্বাস্থ্যের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। ঠোঁটের কোণে হাসি, আবার তার আকাঙ্ক্ষা হইল বাঁচিয়া থাকার।

স্বামীর এই হাসিটুকু দেখার জন্য উমা অজেনের সঙ্গে বেড়ায়, সিনেমায় ও হোটেলে যায়।

অজেন প্রথমে প্রস্তাব করে—উমা সপ্তাহে তিন দিন তার সঙ্গে বেড়াইতে যাইবে। বহু তর্ক করিয়া, ওজর আপত্তি করিয়া উমা ঐটাকে একদিনে দাঁড় করায়। সেই একদিনও নিয়মিত যায় না। অজেন উহা লইয়া রাগারাগি করে।

উমা বাহিরে যাওয়ার সময় কন্থু তার দিকে চাহিয়া ভাবে—উমা কোথায় যায়, যায় কেন? কিন্তু তাকে সে কোন প্রশ্নও করে না। একদিন সেই যে তাকে অজেনের নিকট যাইয়া খাবারের যোগাড় করিতে বলিয়াছিল,—সে কথাও ভুলিয়া গিয়াছে।

কিন্তু উমার মনে দ্বন্দ্ব চলে, বুকের ভিতরে ঝড় বহিয়া যায়। সে ঝড়ের খবর কেহ জানে না। চোখ থাকিলে অজেন জানিতে পারিত, কিন্তু মেয়েদের বেদনা বোঝার শক্তি তার ছিল না।

মদ্যপ অজেন নেশার ঘোরে প্রলাপ বকে। বলে, তুমি চাঁদের মত সুন্দর, ইউ আর ডিভাইন।

উমার তখন ইচ্ছা করে, তার নাক মুখ পেচাইয়া ঠাস করিয়া চড় দেয়, কিন্তু নিজেকে সে সংযত করে।

অজেনের অনুগ্রহ প্রদত্ত ঔষধপথ্য তার স্বামীকে অতি যত্ন করিয়া খাওয়ায় বটে, কিন্তু তার নিজের মুখে

পথে প্রান্তরে

কিছুই রোচে না। খাইতে হয়, তাই খায়। খায় নিছক বাঁচার জন্য।

অজেন তার নীরবতাকে ভুল বোঝে, মনে করে সে জয়ের পথে আগাইয়া যাইতেছে।

সেদিন তাঁরা বিশ মাইল দূরের সেই শহরের হোটেলে গিয়াছিল। আগেও দু'তিনদিন এখানে আসিয়াছিল। আজ উমার মুখের কাছে মদের গেলাস ধরিয়া বলিল, একটু খাও।

উমা আপত্তি করে। অজেন বলে, অন্ততঃ একটা সিপ লক্ষ্মীটি।

বার বার অনুরোধ করায় উমা শেষটায় বলিল, একান্তই খেতে হবে?

খেলে আমি খুসী হব।

আর না খেলে?

তুমি—তুমি ভারী—অজেন কি যে বলিল বোঝা গেল না। একটা শব্দ হইল দাঁতে দাঁত ঘষার মতন।

উমার মনে হয় মদ না খাইলে লোকটা হয়ত তাকে অপমান করিয়া বসিবে। সে তাই ঢক্ ঢক্ করিয়া সমস্তটা মদ নিঃশেষ করিয়া ফেলে। কোন শব্দ করে না, মুখ একটুও বিকৃত করে না।

অজেন বলিল, অভ্যেস আছে দেখছি, তুমি একটি ডভ্, যাকে বলে ঘুঘু—বলিয়াই উমার কোমরের দিকে হাত বাড়ায়।

উমা বলিল, অভ্যেস আমার অনেক রকমই আছে। আমার খুনের অভ্যেস আছে জানেন?

অজেন শিহরিয়া ওঠে। উমা বলে, আমি আপনাকে খুন করতে পারি। এক সময় টেররিষ্ট ছিলাম।...জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে—

এঁ্যা! তুমি—পরক্ষণেই অজেন হাসিয়া ফেলিল। বলিল, তুমি দেখছি খাসা অভিনয় করতে পার—একেবারে লেডী ম্যাক্‌বেথ, একদিন নয় ভালবাসারই অভিনয় কর

হ্যাঁ, করব বৈ কি।

তারপর হোটেলে আর কোন কথাবার্ত্তাই হইল না। অজেন কেমন যেন গম্ভীর হইয়া গেল। অন্যদিন বয়দের সে মোটা বখসিস দেয়। আজ বখসিস দিতেও ভুলিল।

মোটর চালায় অজেন। পাশে থাকে উমা। সে থাকিলে অজেন গোয়ারিকে আনে না। তাঁর এক হাতে থাকে ষ্টিয়ারিং হুইল আর এক হাত দিয়া মধ্যে মধ্যে উমাকে আদর করে। কিন্তু আজ আদর করিল না। দুই হাত দিয়াই ইঞ্জিন চালাইতে লাগিল।

অন্ধকার রাত, দুপাশে ফাঁকা মাঠ। গাছ পালা খুবই কম। উপরের মত নীচেও এক বিরাট মহাশূন্য। উর্দ্ধে তারকা জ্বলে, নীচে জ্বলে শুধু অজেনের গাড়ীর হেড্ লাইট।

উভয়েই নীরব। বাহিরের মতন ভিতরেও থমথমে ভাব।

অনেকটা পথ যাওয়ার পর প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করিল অজেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার স্বামী কেমন আছে?

উমা কোন উত্তর করিল না। অজেন আবার বলিল, আমি তোমার স্বামীর কথা জিজ্ঞেস করছিলুম।

উমা বলিল, সে কথা থাক্।

অজেন আগেও দু একবার প্রশ্ন করিয়াছিল। উমা জবাব দেয় নাই। তার সামনে সে স্বামীর নাম উচ্চারণ করে না। রোগ এবং চিকিৎসা সম্পর্কেও কোন কথা বলে না। তাদের দু'জনের মাঝখানে টানিয়া তার অবমাননা সে করিতে চায় না।

অজেনেরও জিদ চাপিয়া গেল। যার জন্য সে জলের মতন টাকা খরচ করিতেছে, তার খবরও জানিতে পারিবে-না? কী আস্পর্দ্ধা উমার।

সে এবার তীক্ষ্ণস্বরে বলিল, আমি জানি কি করে তোমার কাছ থেকে কথা আদায় করতে হয়। ইউ-ইউ আর এ—

উমা তথাপি নীরব, যেন পাথরে খোদাই অচঞ্চল এক মূর্ত্তি।

কয়েক দিন কঙ্কুর অবস্থা খারাপ চলিতেছিল। সেদিন তার চেহারায় একটা ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিল। সব চেয়ে উজ্জ্বল দু'টি চোখ যেন দু'খণ্ড শুকতারা। সে বাহিরে রোদে ভরা নীল আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। কী সুন্দর প্রকৃতি! গাছ আর লতা পাতায় আজ যেন উৎসব লাগিয়াছে।

খানিকক্ষণ ঐ দিকে চাহিয়া থাকিয়া কঙ্কু বলিল, এ সব ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না, উমা। আর—

আর ছাড়তে ইচ্ছে করে না আমায়? তাই না? —উমা প্রশ্ন করে।

কঙ্কু কোন উত্তর করে না। তার হাতের আঙুল লইয়া নাড়ে, দুর্ব্বল মুঠির মধ্যে ধরিয়া মৃদু চাপ দেয়। আঙুলগুলি একবার মুখের কাছে তুলিয়া ধরে—কিন্তু ঠোঁট পর্য্যন্ত নিয়া আবার নামাইয়া রাখে।

উমা ভাবে, ব্যাপার কি? হাত তুলিলে চুমা না খাইয়া কখনও ত নামাইয়া রাখে না। আজ এরূপ করিল কেন?

কঙ্কু প্রশ্ন করিল, তুমি কি টিউশন পেয়েছ? মাঝে মাঝে বেরিয়ে যাও যে?

উমা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে।

ওঃ! তাই ওষুধপত্তর চলছে। তুমি বড় লক্ষ্মীমেয়ে। কী কষ্টই না আমি তোমায় দিলুম।

কষ্ট আবার কি? তুমি এ সব ভাব কেন?

হপ্তায় ক'দিন যেতে হয়? কী কী পড়াও তুমি?

ইংরেজী বাংলা লজিক অঙ্ক।

অঙ্ক! তুমি অঙ্ক পড়াও? কোন্ ক্লাশের মেয়ে?

আই-এ ক্লাশের। আমি ভুল করেছি। অঙ্ক নয়—ইতিহাস।

তাই বল! তোমারও আজকাল ভুল হচ্ছে। বড্ড খাটুনি পড়েছে কি না, তার পরে এত দুশ্চিন্তা। ভুল হয়—মানুষের এ রকম হয়ে থাকে।

মিথ্যা কথা বলার গ্লানির চেয়েও উমাকে বেশী কষ্ট দিল—ভুল হয়, মানুষের ওরকম হয়ে থাকে—কঙ্কুর এই কথা কয়টি।

এই সময় বাহিরে ভিখারী একটি গান ধরিল—একঠো পয়সা রে দেও রাম—

ওকে কিছু দিয়ে আসি—বলিয়া উমা উঠিয়া যায়। বাহিরে আসিয়া ভিখারীকে একটা ডবল পয়সা দিয়া দরজার পাশেই দাঁড়াইয়া থাকে। কি যেন ভাবে। কি যে ভাবে নিজেই জানে না।

এরপরে সে ঘরে আসিল সন্ধ্যার সময়। আলো জ্বালিয়াই দেখিল কম্বু ঘুমাইয়া আছে। তার কপাল চক্‌চক করিতেছে—এত উজ্জ্বল যে সে দিকে চাওয়া যায় না। ভয় ভয় করে।

খাবার তৈরি করিয়া আনিয়াও দেখিল কম্বু ঘুমাইয়া আছে। উমার দেহ মনও অবসন্ন ছিল। স্বামীর তক্তপোষের পাশে মেজেয় কাপড় বিছাইয়া সে সেইখানে ঘুমাইয়া পড়িল। উঠিল পরদিন সকালে।

কম্বু তখনও ঘুমাইয়া। সেই ঘুম আর ভাঙ্গিল না।

শব সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন কে, পি, রায়। স্বামীর মুখে আগুন ছোঁয়াইবার সময় উমা শুধু একটি কথা বলিল, তুমি আমায় ভুল বুঝো না, লক্ষীটি। ভুল বুঝো না।

ধীরে ধীরে তার চাহনিতে অদ্ভুত এক আত্মপ্রত্যয় ফুটিয়া উঠিল।

কয়েকদিন পরের কথা। উমার মন খারাপ। তাকে লইয়া বেড়াইতে যাইবে বলিয়া অজেন গাড়ী লইয়া আসিয়াছে। সে বার কয়েক হর্ণ বাজাইল। ভিতর হইতে কোন সাড়া না পাওয়ায় গাড়ী হইতে নামিয়া দরজায় কড়া নাড়িতে লাগিল।

উমা রাস্তার দিকের একটা জানালার পাল্লা খুলিয়া বলিল, দেখা হবে না।

অজেন মদ খাইয়া আসিয়াছিল। সে একটু চড়া গলায় বলিল, তার মানে?

উমা উত্তর করিল, আমি আপনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না।

অজেন এবার চেঁচাইতে শুরু করিল। গালি দিতে লাগিল, অসতী, কুলটা -

তার গালাগালির উত্তরেই যেন উমা সশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া দেয়। তার বিরক্তি ঐ গালির চেয়েও অনেক তীব্র ও মুখর হইয়া ওঠে।

তারপর সে কলঘরে আসিয়া কল খুলিয়া দেয়। তার সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়ে। শরীর যেন শীতল হইয়া যায়। কাছেই তাকের উপরে ছিল জিলেটের একখানা ব্লেড। সে নিজের হাতের আঙুলের ডগা চাঁছিতে আরম্ভ করে। এই আঙুলগুলিতে অজেন চুমা খাইয়াছিল। সে ঠিক করিল ভিতরের দূষিত রক্ত আর রাখিবে না।

চামড়ার ভিতর হইতে প্রথমে বাহির হয় রস, তারপর রক্ত। রক্তক্ষরণে যে আনন্দ আছে সে তাহা জানিত না, জানিল আজ প্রথম। তার মন নূতন এক অনুভূতিতে ভরিয়া উঠিল—নূতন জন্ম লাভের আনন্দে।

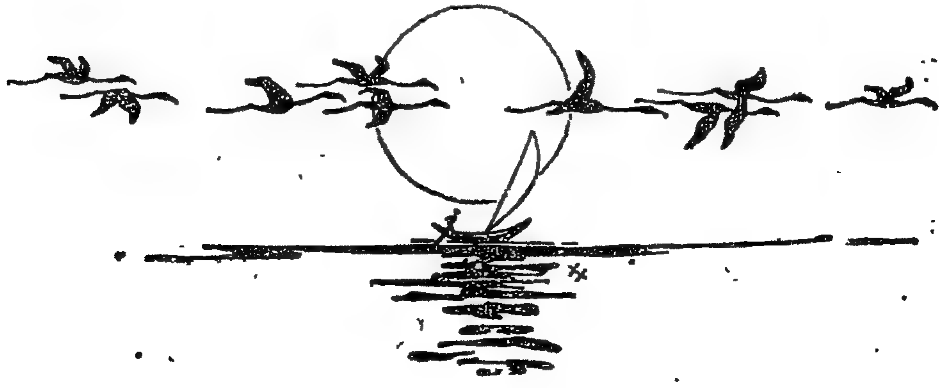

মুঘল যুগে মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্য

শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অধুনা ভারতবর্ষের অন্যান্য সাহিত্যের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্যের একটী বিশিষ্ট স্থান আছে। সমগ্র দক্ষিণ ভারতের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে ইহার প্রভাব সুদূরপ্রসারী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাধু জ্ঞানেশ্বর রচিত—'ভাগবৎগীতার মহাভাষ্য,' 'জ্ঞানেশ্বরী,' সমর্থ রামদাস প্রণীত—'আনন্দবনভুবন', 'দাসবোধ ও তুকারাম, একনাথ, মুকুন্দরাজ প্রভৃতির' সঙ্কলিত—'অভঙ্গ' গাথাবলীর নাম আজ সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেবলমাত্র সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্যের জন্ম হয় নাই। হঠাৎ একটা বিস্ফোটকের ন্যায়—অন্তরে অন্তরে সঞ্চিত হইয়া—অবশেষে উহা দাক্ষিণাত্যের অঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে। প্রজাপীড়ণকারী, হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী আওরঙ্গজেব বাদশাহের উগ্র দমননীতির বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যের বন্ধুর পার্ব্বত্যাঞ্চলে এই সময় যে ধর্ম্ম-আন্দোলন সুরু হইয়াছিল—তাহা হইতেও বটে, এবং কতকাংশে রাজনৈতিক কারণেও বটে, এই সাহিত্য-বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। মহারাষ্ট্রের এই আধ্যাত্মিক ও মানসিক পুনর্জ্জাগরণ শুধু পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতমালাদ্বারা পরিবেষ্টিত ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়াই সন্তুষ্ট ছিল না। উত্তর এবং পশ্চিম ভারতের বহু স্থানেই তৎকালে ইহার আলোড়নাবেগ অনুভূত হইয়াছিল। সমসাময়িক ইউরোপের 'প্রটেষ্ট্যাণ্ট অভ্যুত্থানের' ন্যায়[১] মহারাষ্ট্রের এই renaissance-এর নেতৃগণও বর্ণ বিদ্বেষ এবং জাতিভেদপ্রথার আমূল উচ্ছেদসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। অখ্যাত, অনাদৃত, অস্পৃশ্য—চর্ম্মকার, মাংস বিক্রেতা, সৌচিক, এমন কি 'মাহাড়গণও'[২] তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ঈশ্বরের আরাধনা ও তাঁহার মন্দিরে প্রবেশাধিকার লাভ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। এই ভক্তি-প্রস্রবণের মূল উৎসস্থল ছিল ভীমানদ-তটস্থ পান্ধারী জিলার অন্তর্গত পান্ধারপুর এবং জেঁহু ও আলন্দি নামক অন্যান্য দুইটী গ্রাম। কালক্রমে উক্ত পান্ধারপুর আন্দোলন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, 'খণ্ডছিন্ন' মারাঠা জাতিকে 'এক রাজ্য, এক পাশে' গ্রথিত করিয়া দিতে সমর্থ হয়।[৩]

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাষ্ট্রে যে সকল সাধক-সাধিকা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন তথাকথিত অনুন্নতবংশোদ্ভূত। নামদেব ছিলেন জাতিতে দর্জ্জি (শিল্পী), তুকারাম—বেণিয়া (ভানি), গোরা কুম্ভকার, নরহরি স্বর্ণকার, মেন ক্ষৌরিক,

১। Ranade, 'Rise of the Maratha Power', pp. 8—10.

২। মারাঠী ভাষায় 'মাহাড়' বাক্যের অর্থ 'মেথর' অথবা 'ঝাড়ুদার'।

৩। এই প্রসঙ্গে পাঠকবর্গকে ১৬ই এপ্রিল ও ২৫শে জুন' ১৯৫০ তারিখের ইংরাজী Nation পত্রিকার 'রবিবাসরীয় আলোচনী' বিভাগে মৎলিখিত Marathi Literature in the 17th Century এবং Women Saints In Maharastra In the 17th Century শীর্ষক নিবন্ধ দুইটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি।—লেখক।

হোকা পাত্মকুৎ,-জনাবাই দাসী ও কানোপাত্রা৪ এক নর্ত্তকীর সন্তান। কিন্তু জন্ম ও উপজীবিকা ইঁহাদের সর্ব্বশক্তিম'ন পরমেশ্বরের আসন হইতে দূরে সরাইয়া রাখে নাই। অনুন্নতজাতীয় বলিয়া রক্ষণশীল সমাজ তাঁহাদের অবজ্ঞা করিলেও ভগবানের বক্ষে তাঁহারা পাইয়াছিলেন শান্তির চিরআশ্রয় নীড়ের সন্ধান। কবীর, দাদু, রুইদাস প্রভৃতির ন্যায় যে সকল সাধক-সাধিকা ভজন রচনা করিয়াছিলেন, মারাঠী ভাষায় সেগুলি 'অভঙ্গ' নামে প্রসিদ্ধ। এই অভঙ্গ মহারাষ্ট্রের জাতীয় সম্পদ। স্ব-কর্ণে যাঁহারা তুকারাম ও মুক্তাবাই-এর রচিত অভঙ্গ সুধার সুর-লহরী পান করিয়াছেন কেবলমাত্র তাঁহারাই আমার এই উক্তির যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। প্রতি বৎসরই দাক্ষিণাত্যের পান্ধারপুর নামক ক্ষুদ্র গ্রামখানি লক্ষ লক্ষ তীর্থ পর্য্যটকের সমাগমে ভরিয়া যায়।

মহারাষ্ট্রে, ভক্তি সম্প্রদায়ের উত্থানের প্রাক্কালে, যে দুইজন সাধক কবির জন্ম হয়, তন্মধ্যে মুকুন্দরাজ ও জ্ঞানেশ্বরের নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সঠিক তারিখ না পাওয়া গেলেও, মুকুন্দরাজ যে খৃঃ অব্দ সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মুকুন্দরাজ ছিলেন শৈবধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ। 'পরমামৃত', 'বিবেকসিন্ধু', ও 'মুলতত্ত্ব' নামক তিনি সবশুদ্ধ তিনখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রথমোক্ত গ্রন্থ দুইখানিতে মারাঠী কবিতার সহায়তায় শঙ্করাচার্য্যের 'অদ্বৈত দর্শনের' সমালোচনা করা হইয়াছে।৫ তৃতীয় ও শেষ গ্রন্থখানিতে আছে দেবাদিদেব ত্রিলোচনের অলৌকিক ক্ষমতা ও মহিমার বর্ণনা।

জ্ঞানদেব বা জ্ঞানেশ্বর ছিলেন মহারাষ্ট্রের ভক্তি সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্যোক্তা। জনশ্রুতি অনুসারে, ১২৭১ খৃঃ অব্দে আপেগাঁও নামক পল্লীতে তাঁহার জন্ম হয় ও জীবনের অধিকাংশই তিনি পার্শ্ববর্ত্তী আলন্দি জিলাতে অতিবাহিত করেন। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'জ্ঞানেশ্বরী'ই সমধিক প্রসিদ্ধ। গ্রন্থখানি 'ভাগবৎগীতার বিস্তারিত ব্যাখ্যা' বিশেষ এবং অন্যূন দশ সহস্রাধিক শ্লোকে পূর্ণ। যতদূর বোধহয়, একমাত্র 'জ্ঞানেশ্বরী' ও তুকারাম রচিত 'অভঙ্গ গাথাবলী' ভিন্ন মহারাষ্ট্রে আর কোন সাহিত্যই জাতীয় চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীকে এরূপভাবে প্রভাবান্বিত করিতে সমর্থ হয় নাই। জ্ঞানেশ্বর মনে-প্রাণে মহারাষ্ট্রের জাতীয় ভাষার উন্নতিসাধনে আপনাকে নিয়োজিত করিতে প্রয়াস পান। তৎপ্রণীত 'জ্ঞানেশ্বরীর' এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন—"কবির অভিব্যক্তি হইবে উজ্জ্বল কৌমুদীধারার মতো সুস্পষ্ট, সুন্দর ও রূপ-রস-গন্ধময়; কাব্যের প্রতিটি সূত্রে সূত্রে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকিবে অসংখ্য ভাবের পদ্মপুষ্প। কবি এইখানেই অবিনশ্বর ও চিরনূতন।" শ্রীযুক্ত ম্যাক্নিকল যথার্থই বলিয়াছেন, যে, ইতালীর মহাকবি দান্তের মতো সমগ্র মহারাষ্ট্রের আপামর জনসাধারণের ওষ্ঠে সাধু জ্ঞানেশ্বরের নাম পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত উচ্চারিত হইবে।৬ দান্তে ছিলেন ইতালীয় সাহিত্যের জনক; জ্ঞানেশ্বর ছিলেন মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্যের আদি কবি ঋষি বাল্মিকী। সু-বৃহৎ 'জ্ঞানেশ্বরী' ওভি নামক ছন্দে লিখিত। পরবর্ত্তী যুগে এই ছন্দেই নামদেব, চাম্পদেব, তুকারাম, কানোপাত্রা ও মুক্তাবাই প্রভৃতি সাধক-সাধিকা তাঁহাদের অভঙ্গ কবিতাবলী রচনা করেন।৭

নামদেব জ্ঞানেশ্বরের সমসাময়িক হইলেও জ্ঞানেশ্বরের মৃত্যুর পর তিনি প্রায় আনুমানিক অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল জীবিত ছিলেন। বংশানুক্রমে নামদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ দর্জ্জির ব্যবসায় করিতেন।৮ যৌবনে দস্যুবৃত্তিই

৪। দ্রষ্টব্য, মৎলিখিত 'আনন্দবাজার রবিবাসরীয় বিভাগে' [২৭শে আগষ্ট, ১৯৫০) প্রকাশিত প্রবন্ধ 'মহারাষ্ট্রের নর্ত্তকী-সাধিকা'; আরও Macnicol, N., "Psalms of the Maratha Saints" pp. 11—13.

৫। সর্গ ৭৮৮—৮৫০।

৬। জ্ঞানেশ্বর 'অমৃতানুভব' নামে আরও একখানি গ্রন্থ ও গুটীকয়েক 'অভঙ্গ' রচনা করেন। কিন্তু 'জ্ঞানেশ্বরীর' তুলনায় সেগুলিকে নিতান্ত নগণ্য বলিলেও অসঙ্গত হইবে না।

৭। দ্রষ্টব্য, Ranade, R. D., Hist. Indian Philosophy, Vol. II. p. 36.

৮। নামদেবের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী জীবনের কোন প্রমাণসিদ্ধ বিবরণই অধুনা সহজ লভ্য নহে। কেবলমাত্র তাঁর রচিত কতিপয় অভঙ্গ হইতে এইটুকুমাত্র সংগ্রহ করা যায়, যে, সাতারা জিলার অন্তর্গত কড়াধ নামক স্থানে খৃঃ অব্দ ১২৭০ শতকে তাঁহার জন্ম হয় ও তিনি শৈব ধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন ইত্যাদি।

ছিল নামদেবের উপজীবিকার একমাত্র পন্থা। কিন্তু কালক্রমে জনৈকা স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আগমন করার ফলে তাঁর জীবনযাত্রাপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে ও তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। ঐতিহাসিক মণ্ডলীর মতে, সম্ভবতঃ, খৃঃ অব্দ ১৪২০ শতাব্দীর মাঝামাঝি তাঁহার দীক্ষালাভ হয়।

অত্যাচারী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রাণহীন, অনুষ্ঠানবহুল পূজা-আরাধনার বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া নামদেব মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "ঈশ্বরের আরাধনায় ইতর-ভদ্র সকলেরই তুল্য অধিকার আছে। তিনি ভক্তের সম্পত্তি, অর্থলোভী খাণ্ডোবা অথবা জেজুরীর তান্ত্রিক যাজক মণ্ডলীর বশীকৃত যন্ত্রমাত্র নহেন। অন্তরতম চিদানন্দের স্থান অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে। তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে বেদ বা পুরাণ পাঠ করিবার প্রয়োজন নাই। হে মহারাষ্ট্রবাসিগণ! কেবল নামের মাহাত্ম্য সংকীর্ত্তন করো।" নামদেবের অভঙ্গ গুলির মধ্যে সবগুলি আমরা অবিকৃত কিংবা অপ্রক্ষিপ্ত অবস্থায় পাই না। গোন্ধালীচারণ কবিদের মুখে-মুখে গীত হইয়া, কালক্রমে, বহু শতাব্দীর কাঠ-গড়া অতিক্রম করিয়া আমাদের হস্তে যে গুটীকয়েকমাত্র ভজন আসিয়া পৌঁছাইয়াছে, তাঁহার মধ্যে যে ভেজাল নাই, একথা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন।৯ বিশেষ করিয়া মূর্খ, অজ্ঞ-কৃষক ও অস্পৃশ্য ইতর শ্রেণীভুক্ত মানব সন্তানদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলন করিয়া দিবার উদ্দেশ্য লইয়াই নামদেব তাঁহার অভঙ্গ কবিতাগুলি রচনা করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রের প্রতি ঘরে ঘরে, কুটিরে কুটিরে ছড়াইয়া পড়িয়া সেগুলি অবশেষে প্রতিদিনকার ব্যবহৃত প্রবাদ-বাক্যাবলীর স্থান অধিকার করে। স্কটল্যাণ্ডের সর্ব্বজনপ্রিয় বার্নস রচিত গ্রাম্য-সঙ্গীত ও ডেভিডের ধর্ম্মমঙ্গল ভজনের ন্যায় নামদেবের অভঙ্গমালাও বিশাল মহারাষ্ট্রের কণ্ঠে এক বহুমূল্য রত্নহারস্বরূপ চিরদিন আপন প্রভায় উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।১০

সাধু একনাথের জন্ম হয় পৈঠানে। তাঁর পিতামহ ভানু দাসের নাম সাহিত্যানুমোদী ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট পরিচিত। একনাথ অতি শৈশব কালেই জনক-জননীকে হারান। কথিত আছে, তিনি ১৫৪৫ খৃঃ অব্দে দেবগড়ে জনার্দ্দন স্বামীর নিকট সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সেখানকার কোনও স্থানীয় পর্ব্বতের গুহায় নির্জ্জনে একাদিক্রমে সুদীর্ঘ ছয় বৎসরকাল তপস্যায় মগ্ন থাকেন। জাতে একনাথ ছিলেন 'দেশস্থ ব্রাহ্মণ'। কিন্তু নামদেবের ন্যায় তিনিও সমকালবর্ত্তী যাজকতন্ত্রকে সুনজরে দেখেন নাই। স্বভাবতঃই পরিণামে নামদেবের মতো তাঁহাকেও সমাজের হস্তে অশেষ লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়।

একনাথ বহু গ্রন্থ, কাব্য ও অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন। 'চতুঃশ্লোকী ভাগবত', 'স্বাত্মসুখ', 'রুক্মিণী স্বয়ম্বর' প্রভৃতি তাঁহার অপ্রধান রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু সংস্কৃত 'ভাগবত পুরাণে'র একাদশ অধ্যায়ের ভাষ্য বিবৃতিই মহারাষ্ট্রের জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ভাষার মাধুর্য্যে, বিষয়বস্তুর অবতারণায়, ইহার পরেই তল্লিখিত "ভাগবত রামায়ণের' স্থান। কথিত আছে, শেষোক্ত গ্রন্থখানি একনাথ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া রচনা করেন। দুর্ভাগ্য-বশতঃ ৪৪শ অধ্যায়ের যুদ্ধকাণ্ড পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। অবশিষ্টাংশ তাঁহার এক শিষ্যের দ্বারা সম্পূর্ণ হয়। একনাথের 'ভাগবত পুরাণ' বিশ সহস্র হাজসিক পংক্তিতে গ্রথিত।

একনাথের রচিত অভঙ্গগুলির সহিত খৃষ্টানদের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলের পূর্ব্বভাগ বা Old Testament এর কতকগুলি অধ্যায়ের আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এগুলির অধিকাংশই মূলতঃ ব্যাখ্যাত্মক ও দর্শন এবং অধ্যাত্মবাদের প্রশান্ত দুরবগাহিতা বিহীন।

৯। মহারাষ্ট্রে নামদেব ছিলেন দুইজন :—(১) পূর্ব্বোক্ত নামদেব ছিলেন জাতে তুন্নবায় ও (২) দ্বিতীয় নামদেব ছিলেন উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ। বহুস্থলে এই দুইজনের রচনা সংমিশ্রিত হওয়ার ফলে বিপত্তির সূত্রপাত হইয়াছে।

১০। Macnicol, N. p. 18; also, Orr. W, G, "A sixteenth Century Indian Mystic" p. 22.

ইংরাজীতে যাহাকে matter-of-fact বলা হয়, এও কতকটা তাহাই। অন্যথা, মানব-মনের বিভিন্ন বোধ-বৃত্তি সুখ-দুঃখ ও আবেগোৎপন্ন চিন্তাধারার প্রকাশভঙ্গীর দিক হইতে এগুলিকে আগাগোড়া নিখুঁত বলিলে দোষ হইবে না। জ্ঞানেশ্বরের ন্যায় একনাথের মাতৃভাষার প্রতি ছিল অসীম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। সংস্কৃত ভাগবত পুরাণ শূদ্রের ভাষা মারাঠীতে অনুবাদ করার জন্য বারানসী ধামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের হস্তে তাঁহার লাঞ্ছনার একশেষ হয়। কিন্তু সাধক একনাথ তাঁহাদের সকল অত্যাচার হাস্যমুখে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার একটী অভঙ্গে উক্ত আছে—

"একনাথ কায়মনোবাক্যে তাঁর মাতৃভাষার সেবা করিবেন। যে যাহাই বলুক না কেন, তাঁহার স্বদেশীয় ভাষা যে হীন তস্করের ভাষা, এ কথায় তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না। ঈশ্বর যে কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষাই সৃষ্টি করিয়াছেন, এমন বাক্য প্রত্যয়যোগ্য নহে। তিনি পরম পুরুষ; সকল ভাষাই তাঁহার ভাষা। যে ভাষাতেই তাঁহার আরাধনা করা হউক না কেন, তাহাতে ভক্তির লেশমাত্র থাকিলে তিনি ধরা দিতে বাধ্য।" (অভঙ্গ ২৭)

কি উপদেশাত্মক, কি গাথা-বিষয়ক, কি গুরুগম্ভীর ছন্দোবদ্ধযুক্ত মহাকাব্যাত্মক—সর্ব্বপ্রকার সাহিত্যেই একনাথ এক অপূর্ব্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। একনাথ মাত্র জনৈক সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী নহেন, পরন্তু উচ্চ শ্রেণীর কবিও বটে। দসোপন্ত, বামনপণ্ডিত ও তুকারাম তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কালক্রমে মারাঠী ভাষার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হ'ন (দ্রষ্টব্য, Abbot, J. E. 'A Life of Ekanatha)।

পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য সাধক-কবিদের মধ্যে একনাথের পৌত্র মুক্তেশ্বরই ছিলেন সমধিক বিখ্যাত। ১৬০৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। মুক্তেশ্বরের উদ্দেশ্য ছিল—ধর্ম্মের জন্য নয়—'সাহিত্যের জন্য সাহিত্যের সৃষ্টি করা।' সাধন-ভজন প্রভৃতি যৌগিক অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের কোন সম্পর্কই ছিল না। সাধারণতঃ সুপ্রাচীন কয়েকটী হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া মুক্তেশ্বর তাঁহার গ্রন্থাবলী রচনা করেন। রামায়ণ ও মহাভারত মারাঠী ভাষায় অনুবাদ করিবার প্রথম কৃতিত্ব সর্ব্বাংশে তাঁহারই প্রাপ্য। তাঁহার রচনাশৈলীর মধ্যে 'হনুমন্তাখ্যান', 'হরিশ্চন্দ্রাখ্যান', 'ভগবদ্ গীতা'র আংশিক (মারাঠী) অনুবাদ ও জীবনীমূলক এবং বিদ্রূপাত্মক দুইখানি নাতিদীর্ঘ কাব্যগ্রন্থ, (১) 'একনাথ-চরিত' ও (২) 'মূর্খাচিলক্ষণে' মারাঠী সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। শেষোক্ত গ্রন্থখানিতে মহারাষ্ট্রের সমকালীন সামাজিক অবস্থা অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

মহারাষ্ট্রীয় ভক্তি সম্প্রদায়ের শীর্ষবিন্দু তুকারাম ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে এক নগণ্য শূদ্র বেনিয়া পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ছত্রপতি মহিমান্বিত কেশরী শিবাজী ও তদীয় গুরু স্বামী রামদাস উভয়েই ছিলেন তুকার সমকালবর্ত্তী।[১১] মাত্র ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে পিতা-মাতা ও তাহার অনতি-কালের মধ্যেই স্ত্রীপুত্রকে হারাইয়া ক্ষোভে-দুঃখে তিনি মৃতপ্রায় হইয়া পড়েন। অবশেষে ১৬১১ খৃঃ অব্দে তাঁহার দীক্ষালাভ হয়। তাঁহার রচিত আভঙ্গগুলি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তুকার পারিবারিক ও সামাজিক জীবন আদৌ সুখকর ছিল না। তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী ছিলেন অনেকটা সুবিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের কলহপ্রিয়া অর্দ্ধাঙ্গিনী জ্যান্টিপীর মতো।[১২] এতদ্ব্যতীত, গ্রাম্য পাতিল ও রামেশ্বর ভট্ট, মম্বাজী গোঁসাই প্রমুখ দেহুর গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দের ঘোরতর প্রতিকূলতায় তাঁহাকে শেষ

১১। Ranade and Bilvalkar, p. 264; Macnical, p. 18. Edwardes, S. M., Grant Duff's Hist. Mahrattas, vol. 1, pl xviii, Introduction; Bal-krishna, Shivaji the Great vol IV, p. 186.

১২। তুকারাম দুইবার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রী রখুমাবাই অন্নের অভাবে দুর্ভিক্ষের সময় প্রাণত্যাগ করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী জিজাবাই ছিলেন কোপন-স্বভাবা উগ্রচণ্ডা প্রকৃতির নারী। তুকারাম স্বয়ং লিখিয়াছেন, যে, তদীয় গৃহে অতিথি সমাগম হইলে জিজাবাই তৎক্ষণাৎ 'ক্ষিপ্ত কুক্কুরের ন্যায়' সম্মার্জ্জনী হস্তে তাঁহাদের আক্রমণ করিতে উদ্যত হইতেন (অভঙ্গ, ৩৪৮৯ ও ৩৪৯১); দ্রষ্টব্য Fraser and Marathe, Translation of Tukaram's Abhangas.

পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া স্বগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিবার-সমভিব্যহারে স্থানান্তরে গমন করিতে হয়। লোকালয়ের কলকোলাহল হইতে বহুদূরে নিভৃত গিরিকন্দরের অভ্যন্তরে বসিয়া তিনি যে অভঙ্গগুলি রচনা করিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা আটসহস্রেরও অধিক। ভাবের অকৃত্রিমতা, ভাষার তীক্ষ্ণতা ও বিষয়বস্তুর মাধুর্য্যে সেগুলি বাস্তবিকই অনবদ্য। কতকগুলি অভঙ্গের সাহায্যে তুকারাম তাঁহার আধ্যাত্মিক বিবর্ত্তের আনুক্রমণিক ইতিহাস বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; কতকগুলির মধ্যে উপ্ত আছে, সমসাময়িক অত্যাচারী মারাঠী পুরোহিততন্ত্রের প্রতি প্রচ্ছন্ন শাণিত ব্যঙ্গোক্তি কেবলমাত্র উচ্চতম সাহিত্য সৃষ্টির জন্য নহে, তৎকালীন সমাজবিধির আমূল সংস্কার সাধনের জন্যও সনাতন মহারাষ্ট্র তুকারামের কাছে অশেষভাবে ঋণী। কখনও তীব্র শ্লেষ, কখনও উপহাস, কখনও অনুনয়-বিনয়, কখনওবা রূঢ় ভর্ৎসনার সাহায্যে তিনি আপনার মহান আদর্শকে দেশবাসীর সম্মুখে উত্তোলিত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রচেষ্টা বিফল হয় নাই। অধুনা মহারাষ্ট্রের কথিত ও লিখিত ভাষার মধ্যে তুকারামের দানের পরিমাণ প্রায় অর্দ্ধাংশেরও অধিক। অ্যাকৃওয়ার্থ সাহেব (Ballads of the Marathas, Introduction) তুকারামকে 'মহারাষ্ট্রের কবির' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ম্যাক্নিকল তাঁহাকে তুলনা করিয়াছেন ইতালীয় সাধক-শ্রেষ্ঠ সর্ব্বত্যাগী সিদ্ধা ফ্রান্সিসের সহিত। দুষ্ট পুরোহিতগণ একবার তাঁহার রচনাবলী ইন্দ্রানী নদীর অতলগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিল। কিন্তু তুকারাম তাহাতেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি ছিলেন ধৈর্য্যের অটল হিমালয়—আপনার মহিমায় আপনিই মহিমামণ্ডিত। শুনা যায়, অদ্যাপিও প্রতি বৎসর, দেশদেশান্তর হইতে সমাগত লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী পান্ধারপুর নিবাসী বিঠোবার মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পরমভক্তি ভরে তিনবার উচ্চারণ করে, "জ্ঞানোবা, তুকারাম," "জ্ঞানোবা, তুকারাম," "জ্ঞানোবা তুকারাম।"[১৩]

তুকারামের সমসাময়িকগণের মধ্যে কবি বামন পণ্ডিত,[১৪] রামবল্লভদাস (১৬১০), "জ্ঞানেশ্বরীর' ভাষ্যকার শিবকল্যাণ, 'বৈদ্যজীবন' নামক সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের রচয়িতা সাধক লোলিমবরজস্বামী, 'উপনিষদ', 'রামায়ণ' 'মহাভারত' ও 'ভাগবতের' বিখ্যাত টিকাকার শ্যামরাজ, ধামান গাঁও নিবাসী বোধেল ভুবা, রঘুনাথ, শিবরাম, মুকুন্দ, কাশি এবং মুচকুন্দ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই সাধ্যানুযায়ী মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে উদ্যোগ পাইয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজীর (১৬২৭-৮০) দীক্ষাগুরু স্বামী শ্রীসমর্থ রামদাস ছিলেন নিজাম-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জাম্ব গ্রামের অধিবাসী। ১৬০৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়, এবং মাত্র দ্বাদশ বৎসর বয়সে সংসারের সকল প্রকার বাসনা-কামনায় জলাঞ্জলি দিয়া তিনি গৃহ ত্যাগ করেন। এ সম্বন্ধে নানাপ্রকার জনশ্রুতির প্রচলন আছে। উপযুক্ত স্থানাভাবে এইখানে মাত্র দুইটীর উল্লেখ করিলাম। (১) এক পক্ষ বলেন, তাঁহার জননী তাঁহাকে বিবাহ করিতে পীড়াপীড়ি করায় রামদাস সাময়িকভাবে তাঁহার অনুরোধে সম্মতি জ্ঞাপন করেন, কিন্তু পরিণয় সভায় উপস্থিত হইবা মাত্রই কোনও কারণে তাঁহার চিত্তে সহসা বৈরাগ্যভাবের সঞ্চার হয় ও তিনি তৎক্ষণাৎ বিবাহ-মণ্ডপ হইতে পলায়ন করেন। (২) অপর পক্ষ বলেন, রামদাসের জ্যেষ্ঠভ্রাতা গঙ্গাধর পন্ত দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক বালক রামদাসকে তাঁহার অভিলাষানুযায়ী উপনয়ন ব্রতে অভিষিক্ত করিতে অনিচ্ছা-জ্ঞাপন করাতে অভিমানী রামদাস ক্ষুব্ধচিত্তে অভিপ্রেত গুরুর অন্বেষণে স্বয়ং নাসিকাভিমুখে যাত্রা করেন।[১৫]

১৩। বিশেষ দ্রষ্টব্য, Prof. Bhate, G. C. History of Modern Marathi literature; Edwands, Life of Tukaram; Altekar, S. K., Shri Samattha Charita, pp. 117-18; Ajagaonkar, j. R, Tukaram; Ranade ও Bilvalkar এর মতানুযায়ী ১৬৫০ খৃঃ অব্দে (শক, ১৫৭২) তুকারাম মানবলীলা সম্বরণ করেন; বলা আবশ্যক, তুকারামের জন্ম ও মৃত্যুর সন তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতদ্বৈধতা অদ্যাপিও দূর হয় নাই।—লেখক।

১৪। বামন পণ্ডিত (মৃত্যু ১৭১৩)—'যথার্থদীপক' 'ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা', 'সীতাস্বয়ম্বর', 'কালীয় মর্দ্দন', 'ভামাবিলাস', 'ভারতভব' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া 'ছন্দাকর বামন' উপাধি অর্জ্জন করিয়াছেন।

অতঃপর রামদাস টাকলি নামক স্থানে গমন পূর্ব্বক তত্র সুদীর্ঘ দ্বাদশবৎসরকাল কঠোর ধ্যানধারণায় অতিবাহিত করেন তাঁহার সাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্র একদিন স্বপ্নে রামদাসকে দর্শন দেন ও তাঁহাকে যথাবিহিত ভাবে মন্ত্রপূত করেন। রামদাস রচিত একটী অভঙ্গে উক্ত আছে—

"সাহ্য আম্‌হাংসি হনুমন্ত। আরাধ্য দৈবত শ্রীরঘুনাথ॥
গুরু শ্রীরাম সমর্থ। কায় উনেং দাসাসী॥
দাতা এক রঘুনন্দন। বরকড় লেংড়ী দেঈল কোন॥
তেং সোডোনি আম্হীংজন। কোনাং প্রতিমাগাবেং॥
ম্হণোনি আম্হীং রামদাস। রামচরণীং আমচা বিশ্বাস॥
কোসলোনি পড়োরে আকাশ। আনিকা চী
বাসন পাহুং॥"

দীর্ঘকাল উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানা অংশে পর্য্যটন করিয়া রামদাস অবশেষে সাতারা জিলার চাফল নামক স্থানে উপস্থিত হ'ন। এইখানে তিনি মহাবীর পবননন্দন হনুমান ও শ্রীরামচন্দ্রের একটী মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর তিনি মহাবালেশ্বরের নিকটবর্ত্তী শিবথর জিলায় গমন করেন। তৎপ্রণীত বিখ্যাত গ্রন্থ 'দাসবোধ' এই স্থানে, এই সময়েই লিপিবদ্ধ হয়, ঐতিহাসিকগণ এমত অনুমান করিয়া থাকেন।

তুকারামের তুলনায় রামদাসের রচনা-ভঙ্গী অপেক্ষাকৃত সরল এবং বাগ্মিতাবিহীন হইলেও অধিকতর বিশ্লেষণশক্তি ও সৌকর্য্যে তাঁহার প্রত্যেকটী গ্রন্থই যে অতি আশ্চর্য্যরূপে সম্পদশালী, একথা পাঠকমাত্রেই স্বীকার করেন। 'দাসবোধ' একটী বৃহৎ আত্মচরিত-বিষয়ক গ্রন্থ। ইহার ঐতিহাসিক মূল্যও অল্প নহে। গ্রন্থখানির বিভিন্ন খণ্ডে রামদাসের আধ্যাত্মিক কার্য্যকলাপ ও সাধন-ভজন, প্রত্যাদেশ প্রভৃতির বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

রামদাসের 'আনন্দবনভুবন' নামক অপর গ্রন্থখানি একটী নাতিদীর্ঘ কাব্য-সঞ্চয়ন বিশেষ। কিন্তু তাঁহার অন্যান্য রচনার তুলনায় এখানিকে মারাঠী সাহিত্যের একটী Magnum Opus বা 'পরম কীর্ত্তি' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'দাসবোধে' আমরা সাধু রামদাসকে দেখিয়াছি তাঁহার ধ্যানমগ্ন অবস্থায়—মহিমা-মণ্ডিত আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম শিখরে। সেখানে তিনি আপনার মাঝে আপনিই সমাসীন—মানবজীবনের বস্তুগত অভাব-অভিযোগের গণ্ডীর বহু ঊর্দ্ধে। আনন্দবনভুবনে আমরা সর্ব্বপ্রথম পরিচয় পাই তাঁহার রূঢ় বাস্তববাদী অভিজ্ঞতার—দেখিতে পাই, কূটবুদ্ধি সম্পন্ন রাজনীতিবিদ্ উপায়জ্ঞ রামদাসকে—ছত্রপতি শিবাজীর প্রধান মন্ত্রণাদাতা হিসাবে। হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠকাব্যগ্রন্থ মহাভারত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, 'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতের'। রামদাস-লিখিত আনন্দবনভুবন সম্পর্কেও একই উক্তি প্রযোজ্য। ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান সকল বিষয়েই এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইযাছে।

রামদাসের রচনার মধ্যে pacifism বা শান্তিবাদের স্থান নাই বলিলেই চলে। তিনি ছিলেন মহারাষ্ট্রের বীর পরশুরাম। অত্যাচারী, বিধর্ম্মী যবনজাতির আমূল বিনাশ সাধন করিয়া তাহার উপর গড়িয়া তুলিবেন এক সুদৃঢ় ভিত্তি 'হিন্দু পদপাদ্‌শাহী', ইহাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। আনন্দবনভুবনের এক অংশে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—'মহারাষ্ট্রবাসীগণ আজ নিরন্ন, নিপীড়িত। বিজাতীয় মুসলমানের অত্যাচারে তাহাদের ধন-মান আজ আর নিরাপদ নহে। তাহাদের বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত করা হইতেছে। নগ্ন মানবতা আকুল হৃদয়ে দ্বারে দ্বারে ক্রন্দন করিতেছে অসহায় বালকের মত্ন। মনুষ্যের শবদেহ উপযুক্ত অন্ত্যেষ্টির অভাবে পথপার্শ্বে আবর্জ্জনার মতো পড়িয়া রহিয়াছে। কোথায় ইহার প্রতীকার?'

শিবাজীর রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে স্বামী রামদাসের কোনরূপ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সংযোগ ছিল কিনা, এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন। প্রশ্নটী লইয়া অদ্যাবধি বহু বাক্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে; আমিও ১৯৫০ সনের ২৬ মার্চ, Nation পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে, 'Ramdas and Shivaji' শীর্ষক রচনাটীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। বর্ত্তমান সন্দর্ভে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সময়বিশেষে প্রাণাধিক শিষ্যকে রাজ্যশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে গুটি দুই উপদেশ প্রদান করিয়া থাকিলেও, রাজনীতি হইতে রামদাস চিরদিন দূরেই

অবস্থান করিতেন। শিবাজী অতি শৈশবকাল হইতেই সাধু-সন্ন্যাসীদিগের সংস্পর্শ কামনা করিতেন। রামদাস ছিলেন প্রবীণ, বিচক্ষণ ব্যক্তি। মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামে নবীন অধিনায়ককে যোগ্যপথে পরিচালিত করিবার জন্য সেদিন কেবলমাত্র শারীরিক নহে, অধিকন্তু, নৈতিক বলেরও প্রয়োজন হইয়াছিল।১৫ স্বামী রামদাস করিয়াছিলেন সেই অভাব পূরণ। এতদ্ভিন্ন তিনি ছিলেন শিবাজীব দীক্ষাদাতা, ধর্ম্মগুরু।১৬ সাতারা অধিকারের পর (১৬৭৩ খৃঃ অব্দ) সজ্জনগড়েব স্থানীয় পার্ব্বত্য দুর্গে শিবাজী স্থায়ীভাবে তাঁহার বাস নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। সংসাবের ক্লেশ হইতে সাময়িকভাবে অব্যাহতি লাভের আশায় তিনি প্রায়ই গুরুর নিকট আগমন করিতেন। তাঁহার পুত্র সম্ভাজী ছিলেন স্খলিত-চরিত্র মদ্যপ। শিষ্যের প্রার্থনানুসারে তাঁহার চরিত্র সংশোধনের জন্য রামদাসও যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। সম্ভবতঃ এই সূত্রেই পরস্পরের সহিত পরস্পরের সাক্ষাৎ ঘটিত। এরূপ অনুমান করা অন্যায় হইবে না।

রামদাস ছিলেন একজন নির্লোভ, ত্যাগী পুরুষ। শিবাজীর বহু অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তাঁহার নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। কথিত আছে, তিনি প্রতিদিন ভিক্ষালব্ধ অন্নের সাহায্যে আপনার উদরপূর্ত্তি করিতেন। ইহা লইয়া শিবাজীর আক্ষেপ ও অভিযোগের অন্ত ছিল না। অবশেষে একদিন তিনি 'নিজ রাজ্য-রাজধানী' একখণ্ড দানপত্রে স্বাক্ষর করিয়া রামদাসের পদতলে সমর্পণ করেন। রামদাসও তাঁহার উপহার স্বীকার করিয়া লন এবং শিবাজীকে 'ভিক্ষুকের প্রতিনিধি' হিসাবে তাঁহার রাজ্যশাসন করিতে আদেশ দেন—

'তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন;
পালিবে যে রাজধর্ম্ম জেনো তাহা মোর কর্ম্ম,
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।"

রামদাসের গৈরিক বস্ত্র শিবাজী তাঁহার রাজপতাকায় সংলগ্ন করেন। সন্ন্যাসীর এই কপিল বর্ণ পরিধেয় মহারাষ্ট্রের "ভাগোষা ঝাণ্ডা" নামে খ্যাত।১৭

জ্ঞানেশ্বরের দুই ভ্রাতা—নিবৃত্তিনাথ ও সোপান দেব এবং ভগ্নী মুক্তাবাই অভঙ্গ রচনা করিয়া সমধিক খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার (মুক্তাবাই) ও চাঙ্গদেবের রচিত অভঙ্গগুলির মধ্যে কিঞ্চিৎ আলঙ্কারিক বহুলতা বর্ত্তমান থাকিলেও অধ্যাত্মবাদ ও ভগবৎ প্রেমের দিক দিয়া সেগুলি যে সত্য সত্যই মহারাষ্ট্রীয় কাব্য সাহিত্যের অতি উচ্চতম নিদর্শন, সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। চাঙ্গদেব স্বয়ং তাঁহার একটি অভঙ্গে ভ্রাতা-ভগিনীর সম্বন্ধে উক্তি করিয়াছেন—

"মোতিয়াচেং পানী রাংজন ভরিলা।
পোট ভরুণী প্যালা জ্ঞানদেব॥
অভ্রাচী সাউলী ধরোনিয়াং হাতীং।
গেলাসে একাংভীং নিবৃত্তিদেব॥

১৫। ১৬৪৯ খৃঃ অব্দে রামদাস শিবাজীকে দীক্ষাদান করেন, এই প্রকার কিংবদন্তী আছে। দ্রষ্টব্য, Deming, W. S., "Ramdas and the Ramdasis" pp. 52-72.

১৬। Sardesai, G. S., "Main Currents of Maratha History" p 68. বিঃ দ্রঃ—শিবাজীর জীবন-চরিত্র প্রণেতা কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদ তাঁহার 'শিবছত্রপতিচরিত' নাটক গ্রন্থে কোথাও রামদাসের নাম উল্লেখ করে নাই। চিট্‌নীস সঙ্কলিত 'বখরে' একাধিকবার রামদাসের নাম পাওয়া গেলেও তাহার প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দেহই থাকিয়া যায়। প্রথমতঃ 'চিট্‌নীস্-বখরে' রামদাসের নামমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, কোনরূপ স্পষ্ট উক্তি করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, চিট্‌নীস বখর বহু পরবর্ত্তী যুগে রচিত। অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের মতে এটা একটা worthless modern fabrication ভিন্ন আর কিছুই নহে (Shiraji and his times, p. 413), শিবাজী ও রামদাস: চিট্‌ ৪৪—৫৩; also সম্ভাজী বখর, ৫—৬; অধ্যাপক ভাটে প্রণীত, 'শিবাজী আনি রামদাস'; ও ধুলিয়ার রামদাসী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক (অধুনা অপ্রচলিত) প্রকাশিত মাসিক পত্র এবং গ্রন্থাদি।

১৭। দ্রষ্টব্য, "বৎস, তবে এই লহ মোর আশীর্ব্বাদসহ
আমার গেরুয়া গাত্রবাস
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো"—
কহিলেন গুরু রামদাস।"
—রবীন্দ্রনাথ: প্রতিনিধি

also Sir Jadunath Sarkar, "Shivaji", p. 382.

হিথ্যাচ্যা ঘুগথ্যা জেবন জেবলী।
পোট ভরুণী থালী মুক্তা বাই ॥
চৌধাচেং আলেং অমে হাতাং।
বটেশ্বর স্বতাং জয় বারীং ॥"১৮

মহারাষ্ট্রে, তৎকালবর্ত্তী মহিলা কবিদিগের মধ্যে, বহিনা বাই (১৬২৮-১৭০০), জনাবাই (জন্ম ১২৭১) ও বেণু বাই ছিলেন একাধিক প্রথম শ্রেণীর ধর্ম্ম এবং ভক্তিবিষয়ক কাব্যগ্রন্থের রচয়িত্রী। বেণুবাই লিখিত 'সীতা সয়ম্বর' মারাঠী সাহিত্যের শ্লাঘার সামগ্রী। স্বামী রামদাস বেণু বাইকে কন্যাধিক স্নেহ করিতেন ও তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে বেণুবাই কোল্লাপুরের অন্তর্গত মীরাজ গ্রামের মারুতি মন্দিরের প্রধানা পরিদর্শিকার পদে নিযুক্ত হন। বহিনা বাই ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে সিউবে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তুকারামের প্রিয়তমা শিষ্যা। ইদানীং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাতনামা মনিষী শ্রীযুক্ত জাষ্টিন অ্যাবট ইংরাজীতে 'Autobiography and Verses of Bahinabai' নামে তাঁহার আত্মচরিত ও অভঙ্গগুলির একথানি সুষ্ঠু অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তুকারামের মৃত্যুর পর বহিনাবাই গুরু রামদাসের শিষ্যাত্ব গ্রহণ করেন বলিয়া জানা যায়।

জনাবাই ছিলেন নামদেবের গৃহপরিচারিকা। কথিত আছে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা জনাবাইএর কীর্ত্তন গীত শ্রবণের লোভে ভগবান শ্রীবিঠোবা কখনও কখনও তাঁহার নিকট ছদ্মবেশে আগমন করিতেন। ভক্ত কবি রামপ্রসাদ সেনের ইষ্টদেবী কালিকার ন্যায় তিনি ছিলেন জনাবাই-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মূলতঃ নামদেব ও জনাবাই রচিত অভঙ্গগুলির মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের ভাব ও ভাবাগত প্রভেদ অতি অল্পই দেখা যায়। গুরু ও শিষ্যার নিবিড় অন্তরঙ্গতাই এই সাদৃশ্যের অন্যতম প্রধান কারণ।

১৮। 'জ্ঞান দেব আকণ্ঠ দ্রবীভূত ভক্তিধারা পান করিয়াছিলেন; নিবৃত্তিনাথ দুই হস্তে সঞ্চরণশীল মেঘমালাকে বন্দী করিয়াছিলেন; সোপান সুগন্ধি সমীরণের মাল্যস্তবকে আপনাকে ভূষিত করিয়াছিলেন; মুক্তাবাই হীরকখণ্ডের দ্বারা স্বীয় ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছিলেন; কেবলমাত্র চাঙ্গদেবই পাইয়াছেন চারিজনের এই গুপ্ত রহস্যের সন্ধান।'—অনুবাদ : লেখক।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাষ্ট্রে অভঙ্গ ব্যতীত আরও দুই প্রকার কবিতা সাহিত্যের প্রচলন হইয়াছিল। যথা—(১) 'লাভনি' ও (২) 'পাউদা' বা জাতীয় সঙ্গীত। 'লাভনি' এক প্রকার নিম্ন শ্রেণীর প্রণয়াত্মক কাব্য। অশ্লীল ভাষা ও কামোদ্দীপক বিষয়বস্তু ইহার একমাত্র বিশেষত্ব। এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে শুধু সোলাপুর নিবাসী ব্রাহ্মণ সাধক রামযোশীর সৃষ্ট লাভনি সঙ্গীতগুলিই ছিল উপরোক্ত দোষাবলী হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। সাধারণতঃ পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের পবিত্র ধর্ম্মমূলক কাহিনীগুলিকে রামযোশী তাঁহার কবিতার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার লাভনি সঙ্গীতগুলির অনুকরণে রচিত গুটিকতক 'গাথা' বা 'পাদ'ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটীতে ১৮০৩ সনের 'ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের' করুণ চিত্রখানি রামযোশী অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।

মহারাষ্ট্রের এই বিরাট সাহিত্য বিপ্লবের বীজ অনুর্ব্বরা ভূখণ্ডের উপর পতিত হয় নাই। তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি সাধকগণের মহান আদর্শ মহারাষ্ট্রবাসিগণকে কালক্রমে এক চরম স্বজাতিপ্রীতি ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। মাতৃভাষার প্রতি দেশবাসীর অকৃত্রিম অনুরাগ জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যথাকালে মহারাজ শিবাজীর প্রচেষ্টায় চতুস্পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত মারাঠা জাতি এক অচ্ছেদ্য সৌহার্দ্দ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। স্বাধীন 'জাতীয় হিন্দুরাষ্ট্র' স্থাপিত হওয়ার ফলে অন্যান্য সকল প্রকার বিদ্বেষ ও বিরোধিতামূলক প্রবৃত্তির ঘটে চির অবসান। বৈদেশিক মুঘলশক্তির সহিত অবিরত সংঘর্ষ ও বিবাদ পরিণামে পরবর্ত্তী যুগের ক্ষমতাশালী পেশোয়া মন্ত্রিগণকে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অংশে মারাঠা আধিপত্য স্থাপন করিতে প্রেরণা দেয়।

—সিদ্ধান্তস্বরূপ এখানে গুটি দুই আপাত চক্ষে অবান্তর বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও—একান্ত প্রয়োজনীয় কথা বলিতে ইচ্ছা করি। বর্ত্তমানে কতিপয় ঐতিহাসিক ধুয়া তুলিয়াছেন যে, পান্ধারপুরের এই সাহিত্যান্দোলনের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিবার কালে আমরা—সাহিত্যিকেরা

—বিশেষ করিয়া কয়েকটী ক্ষেত্রে—মস্তিষ্কের স্থিরত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে পারি নাই। ভাবের উচ্ছ্বাস বশতঃ আমাদের মূল্যানুমান নাকি স্থানে স্থানে অতিশয়োক্তি হইয়া উঠিয়াছে।১৯ এই উক্তিটির চারি ভাগের তিন ভাগ অযৌক্তিক হইলেও বাকীটুকু একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। সময়ে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিলেও, মহারাষ্ট্রের এই সাহিত্যালোড়ন সে দেশের ইতর-দরিদ্র, অজ্ঞ সাধারণকে তেমনভাবে বিচলিত করিতে সক্ষম হয় নাই, এ-কথা রূঢ় হইলেও সত্য। সাময়িকভাবে প্রণোদিত হওয়া এক কথা, স্থায়ীভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া আর এক কথা। মহারাষ্ট্র নিরক্ষর প্রধান দেশ। মাওয়ালী. কুম্বি প্রভৃতি জাতি কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্গত। লেখনী পরিচালনা করা অপেক্ষা লাঙ্গলের সাহায্যে রুক্ষ পার্ব্বত্য ভূমি কর্ষণ করার কার্য্যকেই তাহারা অধিক আয়াসসাধ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। কবিতা, সাহিত্য ও সঙ্গীত বলিতে তাহারা বুঝে একমাত্র গ্রাম্য গোন্ধালী কবিদের পাউদা কীর্ত্তন। বর্ষার সমাগমে দাক্ষিণাত্যের প্রতি শহরে ও পল্লীগ্রামে সুরু হয় শ্রীধর পণ্ডিতের ২০ 'পোথি' আবৃত্তি ও ভজন গান। ধর্ম্মপ্রাণ মারাঠা মাত্রেই তদ্গতচিত্তে সেগুলি শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হয়। মাঝে মাঝে একটু মৃদু হাস্যে, একটী হৃদয়মথিত ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাসে অথবা একবিন্দু অশ্রুপাতে বিমুগ্ধ শ্রোতৃবর্গের একাগ্র তন্ময়তা ভঙ্গ হয়। অবশেষে বর্ণনার কোনও করুণ অংশে তাহারা উপস্থিত হয়। তখন তাহাদের সংযম আর বাঁধ মানে না। সম্মিলিত ভক্তমণ্ডলীর উচ্ছ সিত কলরোলের ঐক্যতানে পাঠকের উদাত্ত কণ্ঠস্বর কোথায় ডুবিয়া যায় কে জানে।"...কি দাক্ষিণাত্যের সমতল ভূমির উপর, কি সহিয়াদ্রীর বন্ধুর উপত্যকা ও গিরি-সঙ্কটের মধ্যে—গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, লোকালয় হইতে লোকালয়ে—অগর্ব্বিত দীনদরিদ্র গোন্ধালী প্রত্যহ নিয়মিত-ভাবে প্রাচীন মহারাষ্ট্রের অতীত মহিমার গৌরবময় দিন-গুলির কাহিনী বর্ণনা করিয়া যায়। এই 'পোথি' ও 'পাউদাই' মহারাষ্ট্রের জাতীয় ভাবধারার একমাত্র বাহ্যিক প্রতিচ্ছবি।

কিন্তু এই শ্রেণীর সাহিত্যের সমধিক রেওয়াজ হয় শিবাজী ও তাঁহার বংশধরগণের যুগে।২১ পূর্ব্বে 'কবিতা' বলিতে মহারাষ্ট্রবাসিগণ—ধ্বনির মিল বিশিষ্ট কতকগুলি ক্ষুদ্র এবং সংক্ষিপ্ত প্রবাদবচন অথবা মহাকাব্যের অনুকরণে, একঘেয়ে পয়ার ছন্দে লিখিত এক জাতীয় রচনা সমষ্টিকেই বুঝিত। সেগুলির মধ্যে ছন্দের নৈপুণ্য, ভাবের উন্মেদ বা শ্রুতিমধুরতা—কিছুরই নামগন্ধ ছিল না। 'গদ্যেও' তথৈবচ। অষ্টাদশ শতাব্দীর অগ্রভাগে সরকারী বিভাগের কর্ম্মচারীগণ যে ধরণের গদ্যে কালক্রমিক বিবরণাদি লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহার একাধিক নমুনা আমার স্বচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। মারাঠীর পরিবর্ত্তে ফারসী ও উর্দ্দু শব্দের বাহুল্যই চক্ষু এবং মনকে বিশেষ করিয়া পীড়া দেয়। কোন কোন রচনার শতকরা নিরানব্বই ভাগই ফারসী ভাষা পদ্ধতি ও শব্দ-সংমিশ্রিত বাক্যাবলীর অবিকল অনুকরণে পরিপূর্ণ। দেশের সর্ব্বত্রই এক নূতন চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ হইলেও পান্ধার-পুরের তৎকালীন সাহিত্যান্দোলনের ফলে 'রক্ষণশীল মহারাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক জীবন' যে বিন্দুমাত্রও অভিভূত হয় নাই, উপরোক্ত উদাহরণই তাহার অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ।২২

উপরন্তু, জ্ঞানেশ্বর, তুকারাম, শ্রীধর প্রমুখ ভক্তগণের

১৯। Edwardes, S. M., p. lxxiii, op. lit.,

২০। পান্ধারপুরের নিকটবর্ত্তী নজারে গ্রামে ১৬৭৯ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীধর রচিত 'রামবিজয়', 'হরিবিজয় (১৭০৩ খৃঃ অব্দে রচিত), 'পাণ্ডব-প্রতাপ' (১৭১২), 'শিব লীলামৃত' (১৭১৮) প্রভৃতি 'পোথি' কবিতার উৎকৃষ্টতম নিদর্শন। ১৭২৮ খৃঃ অব্দে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে শ্রীধরের মৃত্যু হয়। দ্রষ্টব্য, A. C. Worth and Shaligram, The Ballads of the Marathas, intro. pp. xxvii—viii.

২১। Sir Jadunath Sarkar. p. 12.

২২। আধুনিক (তৎসম) উচ্চাঙ্গের মারাঠী গদ্য-সাহিত্য ব্রিটিশ আমলের সৃষ্টি। (রাজওয়াড়ে, তৎপ্রণীত 'মারাঠীয়াঞ্চ-ইতিহাসচিন-সাধনেন' নামক গ্রন্থে অষ্টম খণ্ডের মুখবন্ধে 'মারাঠী গদ্যসাহিত্যে ফারসী ভাষার প্রভাব' সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।)

হংস-মিথুন

শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মহারাষ্ট্রে বর্ণ-বিদ্বেষ ও জাতি-ভেদ রীতির আমূল উচ্ছেদ সাধন সম্ভব পর হয় নাই। চিৎপবন প্রাধান্যের যুগে বর্ণাশ্রম প্রথা পুনরায় পূর্ব্বাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। মানবজাতি স্বভাবতঃই যুগধর্ম্ম ও আবেষ্টনীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এতদ্ব্যতীত, মহারাষ্ট্রের রাজ্যশাসন পদ্ধতিও ছিল তৎকালবর্ত্তী সামাজিক জীবনে 'জাতি স্বাতন্ত্র্য ধারার' পুনঃ প্রবর্ত্তনের জন্য সম্পূর্ণাংশে দায়ী। শিবাজীর মৃত্যুর পর রাজ্যে শৃঙ্খলার অত্যন্ত অভাব ঘটে। মারাঠা শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল কৃত্রিম বুনিয়াদের উপর; স্বাভাবিক নিয়মানুসারে তাহার জন্ম হয় নাই। কার্য্যক্ষেত্রে রাজ্যের অধিপতি রাজার অসামান্য ব্যক্তিগত ক্ষমতার উপরই তাহার শুভাশুভ বহুল পরিমাণে নির্ভর করিত। শিবাজীর উত্তরাধিকারীগণ ছিলেন (একমাত্র রাজারাম ভিন্ন) দুর্ব্বলচিত্ত অস্থিরমতি রাজপুরুষ। ব্রাহ্মণ পেশোয়া মন্ত্রীগণের আদেশ অগ্রাহ্য করেন এমন শক্তি তাঁহাদের ছিল না। শিবাজী তাঁহার জীবদ্দশায় সে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা বিফল হয় নাই। কৌলিন্য-প্রথা, জাতি-ভেদ ও বর্ণ-বোধই কালক্রমে স্বাধীন মহারাষ্ট্রের ধ্বংসের কারণ হয়।

একটি সুর

শ্রীমতী বাণী রায়

বন্ধু, তুমি কি জাননা আমি অতীতকে ভুলে গেছি। ভুলে গেছি ঘরোয়া আটপৌরে জীবন—কয়লার ধোঁয়ায় কালো, চোখে জল আনা দিনগুলো। যখন খোঁপায় একটা জড়ির ফিতে জড়িয়ে বিলাস মনে হ'ত—মনে হ'ত আলতা-পরা প্রধানত সৌখিনতা। সেদিন আমি পেছনে ফেলে রেখে এসেছি। তুমি—তুমি বারে বারে মনে করিয়ে দাও। তাই তোমাকেই আমি ভুলে যেতে চাই। তোমার স্মৃতির সঙ্গে তাই আমার সংগ্রাম।

কেমন করে ধীরে ধীরে অতীতকে পদাঘাতে দূরে সরিয়ে দিলাম, কেমন করে আমার পরিবারের লোকেরা ঐশ্বর্য্যের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করল, সে সুদীর্ঘ ইতিহাস আলোচনায় সময় বৃথা নষ্ট হ'বে মাত্র। কিন্তু, আমার পরিবর্ত্তনের লক্ষ্য অতীতকে ভোলা। অতীতকে ভোলা ভবিষ্যতে দৃষ্টি রেখে। আমার সে ভবিষ্যৎ তুমি নও।

মনে পড়ে প্রথম দিন যেদিন তোমার বাড়ী আমার যেতে হয়েছিল। গলির মধ্যে একতলার গোটা কয়েক ঘর। তোমার ছোট ভ্রাতুষ্পুত্র আদর করে ডা'কল, "সরে বসুন। কাকা আসছেন।"

সমীর সেন গাড়ীতে ছিল—কৌতূহলী স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "কাকা কি করছেন?"

"ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত ধুচ্ছেন।"

আমরা হেসে উঠলাম, "বেলা নয়টায় কাকা ঘুম থেকে ওঠেন নাকি! আমরা গাড়ীতেই বসে আছি। কাকাকে একটু তাড়াতাড়ি আসতে বল।"

ছেলেটি আমাদের কথায় অপ্রতিভ হয়ে ভেতরে চলে গেল। শীতকাল। গায়ের ফারের গলাবন্ধটা মুখের কাছে তুলে নাক পর্য্যন্ত ঢেকে চারদিক দেখছিলাম। হঠাৎ, তোমার বাড়ীটা বড় চেনা-চেনা মনে হ'ল।

আমাদের সৌখিন নাচ-গানের অনুষ্ঠানে বেহালা-বাদক তুমি। সকালবেলায় আজ মহড়া—আগে খবর দেওয়া হয়নি। তাই গাড়ী করে তুলে নিতে এসেছি।

মনে হ'ল, এমন চেনা বাড়ীখানা লাগছে কেন? সরু রাস্তা—ট্রাম-বাস চলে না। ছোট ছোট পুরণো বাসাড়ে বাড়ী—মামুলী হলদে-লাল-শাদা; সবুজ কাঠের দরজা-জানালা। সব কিছুই কিন্তু রং-জলা ফ্যাকাশে। উঁচু রকে পাড়ার ছেলেরা গামছা কাঁধে, ফ্রক পরা বাচ্চা মেয়ের দল। ফেরিওলা চলছে—রিক্সার টুং-টাং। সব কিছুই অতি চেনা, অতি চেনা লাগছে কেন? যেন অনেক দূরে এমনি একটি দেশ আছে আমার।

বালিগঞ্জের বনেদী পাড়ার কথা স্মরণ হ'ল—শাদা বা নানা রংএর ঝকঝকে বাড়ী—লোহার ফটক—ফটকে

দারোয়ান। সবুজ লনের টুকরো—জাফ্‌রি কাটা জানলা। আজ আমার দেশ সেখানে।

তবু কেন এত চেনা লাগে এ উত্তর কলকাতার পাড়াটা! ইতস্ততঃ চেয়ে দেখলাম।

উনুনে আগুন পড়েছে অনেক বাড়ীতে বেলায়—ছুটীর দিন কিনা। হঠাৎ ধোঁয়ার ছবি মনে এনে দিল ধোঁয়ার মতই অস্পষ্ট আমার পুরণো দিন।

সেই বাড়ী—এমনি এক নগণ্য পাড়ায় ছিল। শৈশব কেটেছে কয়লার ধোঁয়া খেয়ে খেয়ে। এখন আমার বাড়ী গ্যাস জ্বলে।

হিমের একটা স্রোত যেন গা বেয়ে ঠেলে উঠল। শীতে শিউরে উঠলাম। গাড়ীর কাঁচখানা তুলে হঠাৎ নীরস স্বরে বললাম, "প্রবীরবাবু, বড্ড দেরী করছেন। রিহার্সেলে যাবার কথা বলে দিয়ে, চল আমরা চলে যাই।"

ইন্দিরা বলল, "অত দূরে ট্রামে-বাসে পৌঁছতে দেরী হয়ে যাবে ভদ্রলোকের। আমরাই নিয়ে যাই।"

তখন সেই গলির বাতাস আমার শ্বাসরোধ করে ধরেছে। এমনি ধোঁয়ায় কালি-করা ছিল আমার দিনগুলো। আর ফিরে পেতে চাই না।

এমন সময়ে দরজার বাইরে হাসিমুখে পা দিলে তুমি। এলোমেলো চুল এখনও একটু আধটু। চোখে-মুখে ক্লিষ্ট নিদ্রার ভাব। উদার প্রসন্নতা তবু তোমার চোখে, অধরে তোমার কোমল প্রেমিকতা। গলির ধোঁয়া মিলিয়ে গেল।

পথে যেতে যেতে ইন্দিরা বলল, "রোজ এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমোন আপনি?"

"না, কাল রাত্রি তিনটেয় শুয়েছিলাম কি না।"

"কি করছিলেন? বাজনা?"

"না, কবিতা লিখছিলাম।"

"আমার পাশে বসেছিলে তুমি। যত জনতাই হোক না কেন, ঠিক চলে আসতে অলক্ষিতে আমারি পাশে। সিটে-রাখা হাত আমার অন্তের অলক্ষিতে ধরলে বজ্রমুঠিতে। হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে পারলাম না। ধরা পড়ার ভয়ে অবশেষে সেইভাবেই রইলাম। অন্যের অলক্ষিতে আমার শোনার মত স্বরে কানের কাছে বললে, "তোমার জন্য রাত্রে ঘুমুতে পারিনি, জানো না?"

বিগত রাত্রির কথা মনে পড়ে গেল—মার্ব্বেলের মেজের উপর অসংখ্য মেয়ে নাচছে। তুমি অর্কেষ্ট্রাকে নির্দ্দেশ দিচ্ছ। আমি বসে আছি বাড়িতে। বন্ধু বান্ধবেরা এধারে ওধারে। হঠাৎ বলে উঠলে, "মিস সেন, একটু কথা আছে, শুনে যান তো।"

প্রকাণ্ড হল। কোনে বসে বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা শোনা যেত। তুমি আমাকে নিয়ে এলে দোতালার টেলিফোনের ঘরে সোজা। ইন্দিরার বাড়ী রিহার্সেল হ'ত—তোমার চেনা হয়ে গিয়েছিল।

কৌতূহলী দুই চার জন উঁকি দিচ্ছিল। তাদের শুনিয়ে জোর গলায় বললে, "আচ্ছা তারিখটা পিছিয়ে দিলে হয় না? মেয়েদের তো নাচ ঠিক তৈরি হয়নি।"

তারপরে—আমি কিছু বলার আগে, চাপা গলায় কাছে এগিয়ে বল্লে, "দম বন্ধ হয়ে আসছিল আমার অত লোকের মধ্যে। তোমাকে নিয়ে এলাম—তোমার ঠোঁটের উপর নিশ্বাস নিতে—to take a full breath over the lips."

আমি চমকে উঠলাম, "তুমি কি পাগল হয়েছ, প্রবীর? চারপাশে এত লোক! কি যে বল?"

ইতস্ততঃ পায়চারী করতে করতে হেসে বললে,— তোমার আশ্চর্য্য মনোহারী হাসি—"লোক থাকলই কি হয়েছে তাতে?"

বিরক্ত ও বিব্রত হয়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলাম।

আমার জগতে ছিটকে-আসা দুরন্ত পথিক! অল্প দিনেই আমাকে চাও নিজস্ব করে নিতে? আ... বালিগঞ্জের তরুণ তরুণীরা একটি সভার সভ্য। সখের অভিনয় করাচ্ছি। মিউজিক মাষ্টারের প্রয়োজন হয়েছিল। পেশাদারীতে মন ওঠেনি। অবশেষে বারীন নিয়ে এল তোমাকে। তার দাদার তুমি বন্ধু।

আমরা অবাক হয়ে গেলাম তোমার বেহালা শুনে, তোমার কবিতা পড়ে, তোমার নিরাবরণ সারল্য দেখে। গানের আবহাওয়ায় অজানিতে আমি তোমার কাছে

সরে এলাম। ভাল হ'ল কি ? ভাল হ'ল কি দক্ষিণ-উত্তরের মিলনে ? দক্ষিণের দাক্ষিণ্য যদি উত্তরকে স্পর্শ না করে, তা'হলে যোগাযোগটাই তো মিথ্যা।

আজ আবার বাজছে সেই সুর—বাইরে নয়, আমার মনের বেহালায়—'প্রেমের স্বপ্ন'—লিষ্টের অমর সুর। তুমিই না বাজিয়েছিলে ? কিন্তু, স্বপ্ন তো ভেঙে গেল।

আজ তোমাকে ভুলে গেছি নিঃসন্দেহে। ভোলারই তো সাধনা আমার। তবু, হঠাৎ কোন সুর বেজে ওঠে মনের কোণে—মনে পড়ে যায়। আহা, মনে পড়ে যায় !

আমাদের অভিনয়ের মহলা চলল। সঙ্গে চলল তোমার প্রেমের সাধনা। মনে হ'ত, ধরা দিই, ঐশ্বর্য্য ছাড়া কি সুখ হয় না ? আবার মনে পড়ে যেত সেই তোমার গলির ঘর। তেমন ঘরই যে ছেড়ে আজ আমি এসেছি এত পথ। এত দূরে চলে এসেছি প্রাচীন আবেষ্টনী ছেড়ে। ফিরে যেতে ভয় আমার অত্যন্ত।

মাঝে মাঝে একঘেয়ে মহলার মধ্যে মধ্যে নানা আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হ'ত। এমনি করে যেতাম কখনও উদ্যান-ভ্রমণে, জলবিহারে, বাষ্পভ্রমণে। আরও কাছাকাছি সরে আসতাম।

গঙ্গার ওপরে নৌকায় উঠতে উঠতে বলেছিলে, "আজ বজন-সমক্ষে একটা কিছু করবই।"

শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাইলাম। হৃদয়তাপে আরক্ত মুখে রূপ হাসি। সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি, শুনি ?"

"তোমার গালে একটা চুমো খাব। পারি এক্ষুণি কলের সামনে।"

"পাগলামি রাখ, প্রবীর।"

গঙ্গার বুকে ভেসে গেল স্বরলহরী—"দিল দেওয়ানা হোগয়ী।"

চাঁদের আলোতে আউট্‌রাম-ঘাটের পাটাতন। আমার পাশে প্রবীর। যথানিয়মে হাত ছুঁয়ে আছে সে অলক্ষিতে সকলের। আজ তার করগ্রাসে বজ্রের কাঠিন্য নেই, আছে বিদ্যুতের শিহরণ। আস্তে বলল, এমনি রাতে আমরা এমনি করে ঘুমোব। "We will sleep like this." মাথাটা আমার মাথায় ঠেকাল, হাতখানা উঠে এল পিঠে।

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। এর লজ্জা নেই, নেই সাধারণ্যে ধরা পড়ার ভীতি। আমার দরজায় এমন বেপরোয়া আগন্তুক তো আর আসেনি।

সত্যই স্বতন্ত্র ছিল সে। আমার সমাজে অনেক পুরুষ, তারা শিক্ষিত, তারা ভদ্র। চাওয়াকে ফুলসাজে সাজিয়ে ধরে তারা। প্রেমের প্রেক্ষাগৃহে বাসনার আবহ-সঙ্গীত তারা বাজায় না। তারা ভুলে গেছে হয়তো ; হয়তো পরিণয়ের পশ্চাতে রেখেছে কামনা। নারীকে তারা অধিকার করতে আসে বৈশ্যের মন নিয়ে। গাড়ী বাঁধে দরজায়, ব্যাঙ্কে রাখে টাকা, গৃহ গড়ে সমৃদ্ধ। নারীর দরজায় আসে তারা—কেনার ব্যবসায়ে কত মূল্য কে দিতে পারবে, তাই দেখায় পোষাকের ভাঁজে ভাঁজে, ঘড়ির কাঁটায়, আংটির পাথরে। আবরণ ও আভরণ। কিম্বা, জাত বণিক ক্যাডিলাকের ময়ূরপঙ্খী তুলে থাকে দরজায়। আর কি প্রয়োজন ?

"রাজার দুলাল চলি গেল মোর ঘরের সম্মুখ পথে,
মোর বক্ষের মণি না খসায়ে মাগো রহিব বল কি মতে ?"

নারীর দ্বারে ক্ষত্রিয় আসে কই ? মৃগয়ার বেশে শুধু ধনুর্ব্বাণ হাতে। বলে বন্দিনী প্রেমের দীক্ষা নেয়। শক্তির অনাবৃত প্রকাশ সে চায়, আমার জগতের পুরুষে তার তৃপ্তি কোথায় ?

অনাবরিত কামনা—জ্বলছে তার মুখচোখ। সারা সত্তা তার মশালের মত জ্বলছে পথ দেখিয়ে : কামনার দহনের অগ্নিশিখা - তৈল যোগায় কিন্তু প্রেম। সুকুমারী, তুমি ভয় পেয়োনা। যা পড়েছ কাব্যগাথায়, দেহাতীত প্রেমের বন্দনা, সে প্রেম আমারই মনে আছে। বাসনার ধূপজালের মধ্যে তোমার চোখ খুলে রেখ। আমি তোমাকে চাই—দেহকে বাদ দিয়ে নয়। সেটাই আমার প্রেম-প্রকাশের মাধ্যম।

এমন করে কে চেয়েছে আমাকে ? এমন করে কে নিরতিশয় আসক্তি দেখাতে পেরেছে ? আমি নারী, সে পুরুষ। তাই চায় আমাকে। ঢেকে বলবার কিছু নেই।

আমি মুগ্ধ হ'লাম। দারিদ্র্যে জন্ম আমার। দেহ-

বিলাস সে জীবনের একমাত্র রস। যারা ভাল বাড়ীতে থাকতে পায় না, ভাল গাড়ী চড়তে পায়না, ভাল অশন-বসনে যারা বঞ্চিত, ভাল দৃশ্যে, ভাল জগতে যারা সহজে প্রবেশ-স্বাধীন নয়, তারাই দেহপঙ্কে অন্ধের মত অবগাহন করে পশুর ব্যগ্রতায়। তাদের অনেক প্রয়োজনের একটি মাত্র হাতের কাছে। তাই নাও, তাই নাও।

দেখেছি একটি মাত্র ঘরে গোটা পরিবার সুপ্ত। মা, বাবা, ভাই, বোন, ঠাকুরমা, ঠাকুরদা। তবু বৎসরান্তে আর একটি মুখব্যাদান—অন্ন দাও। দেখেছি চিররুগ্না স্ত্রী, চিররুগ্ন পুরুষের অবাধ বিহার। দেখেছি অবৈধতার চরম।

আমার রক্তে তাই মিশে গিয়েছিল সেই সাপের মৃত্যুবিষ। দেহের শান্তি বিবাহের পরে নয়। যে বিবাহ করবে, তার পূর্ব্বরাগে সেই শান্তির প্রতিশ্রুতির অগ্রিম আভাস। প্যাসন্‌মথিত প্রেম। আমারি অতীতজীবনের সংগে জীবনের ভাগীদার প্রবীর। প্রতিশ্রুতির আভাস দেওয়া তার জৈবধর্ম্ম।

বারে বারে যন্ত্রীর সূক্ষ্ম আঙুলে আমাকে স্পর্শ করে বাজাত মনের মত সুর, "নামে তোমার গান, আমার হাতে তোমাকে রাখব চিরকাল।"

"আ, প্রবীর!" সরে বসেছিলাম শিবপুরের বাগানে।

"সরে গেলেই ছাড়ব না কি? বসন্তের বাতাস গায়ে লাগলে সর্ব্বত্র এই রকম।"

অধর থেকে অনিচ্ছুক অধর তুলে প্রবীর বলল, "ভাগ্যি এখানে এলাম। বেশ নিরিবিলি আছে।"

"ওরা সব গেল কোথায়?"

"গেছে আমাদের সুযোগ দিতে।" প্রবীরের সবল আকর্ষণে তার বিস্তৃত বক্ষের ওপর এসে পড়লাম—"না, না প্রবীর না।"

একটু পরে, "সব সময় একসঙ্গে থাকবো। I am waiting for the day. যদি আমার সঙ্গে মিশতে থাকো, আমি আর থাকতে পারব না।"

"সে কি করে হয়, প্রবীর?"

"কেন নয়?"

মনে পড়ে গেল সেই দু'খানা ঘর গলির বুকে। কত সাধনায় সেই ঘর থেকে আজ এতদূরে এসেছি। আবার কি ফিরে যাব সেখানে? আরও অগ্রসর না হয়ে আবার ফিরে যাব? চলার সাধনায় এ কী বিড়ম্বনা?

আমার চুলের মধ্যে চঞ্চল অঙ্গুলি সঞ্চালনে প্রবীর বলল, "প্রেমের স্বপ্ন।"

"ভেঙে যাবে প্রবীর।"

"প্রেম ভাঙলেও, স্বপ্ন ভাঙেনা। জানো না তুমি?"

শ্রবণ মন আচ্ছন্ন করে বেজে উঠল করুণ-মধুর পাশ্চাত্য সঙ্গীত—পিয়ানোতে প্রবীরের হাত। মহলার ঘরে একটি পিয়ানো ছিল। আলোর ফুলঝুড়ি তার মুখে, আমার মুখে। প্রবীর বাজাচ্ছে, আমি শুনছি, অনেকে শুনছে।

Reve D Amour, 'Dream of have' বাজাচ্ছি। 'প্রেমের স্বপ্ন'। বুঝেছেন, মিস সেন?"

শেষ হয়ে গেল অভিনয়। বন্ধ হয়ে গেল মহলা। শুধু খ্যাতির শুষ্ক ধুলোয় পড়ে রইল দুইটি মনের ছিন্ন কাহিনী। গানের মধ্যে যে কাছে সরে এসেছিল, সে জীবনে পর হয়ে গেল।

নিরাসক্ত নির্লিপ্ত দিন। প্রিয়সমাগমের আশা নেই নিত্য নিত্য। মাঝে মাঝে দেখা হয়। হিসাবপত্র নিয়ে ব্যস্ত দিন সকলের।

ইন্দিরার বাড়ী বৈঠক বসেছে। আমি পৌছলাম। সমীর বসে আছে বারান্দায় ঝুঁকে হিসাবের ওপর, পাশে প্রবীর।

জুতোর শব্দে দু'জনেই মুখ তুলে তাকাল। সমীর বলল, "ওপরে বসুন, মিস সেন। ইন্দিরা আছে। হিসাবটা দেখেই আমরা আসছি।"

স্বল্পভাষী প্রবীর কথা বললনা। কিন্তু, আমাকে দেখে তার মুখের জ্যোতি একটু ম্লান দেখলাম কি? আস্তে জুতো টিপে সমীরের বোন ইন্দিরার সন্ধানে বাঁকানো সিঁড়ির বাঁকে অদৃশ্য হ'লাম। একবার ফিরে দেখতে সাধ হল। ওরা তো আমাকে দেখছে না।

সংযত—অতিভদ্র সমীর স্বভাবশীতল ইঙ্গ-বঙ্গ কণ্ঠে বলছে,—"কথা তো ছিল, প্রবীরবাবু, লাভটা ভাগ করে

শিল্পীদের দেওয়া হ'বে। লাভ তো দেখছি না, লোকসানই। আপনি পেশায় যন্ত্রী, হয়তো আপনার ক্ষতি হ'ল।"

গলির ঘর সমীরও দেখেছিল কি না! সঙ্কোচে চলে আসতে গিয়েই চমকে উঠলাম। প্রবীরের স্বভাব-কোমল কণ্ঠে কেমন ইতর ব্যঞ্জনা! "সে কি? অত লোক হয়েছিল, লোকসান কেমন করে হ'ল?" সমীর আমার সমাজের পালিশ-চর্চ্চিত; গলার সুর উঠলোনা তার—"কেন প্রবীর বাবু, অর্দ্ধেকের ওপর তো নিমন্ত্রণ পত্র ছিল।" "কে দিতে বলেছিল? এমন একটা শো, এতে যে হাজার হাজার টাকা লাভ হ'ত। আপনারা কি যে করলেন ইচ্ছামত? সময়টা আমার একেবারে নষ্ট!"

সিঁড়ির ওপরে দাঁড়ালাম ফিরে এসে। স্থির কণ্ঠে বললাম, "সমীরবাবু, ওঁকে জানান যে আমরা ওঁর ক্ষতি পুষিয়ে দেব। উনি যে পেশাদার, আমরা তা জানি। কত টাকা ওঁর রেট্ শুনে নিয়ে এক্ষুণি দিয়ে দিন। আমি পরে হিসাব মিলিয়ে দেব।"

তারপরে, সুদীর্ঘ দশবছর। ইন্দিরার বাড়ী আমারই গৃহ হয়েছে। ইন্দিরার দাদা সমীর সে গৃহপতি। বিবাহ সমীচীন। যে মেয়ের কোন কর্ম্ম-জীবন নেই, বিবাহ তার পক্ষে সার্থকতার অব্যর্থ মুষ্টিযোগ। চিরকৌমার্য্য যাপনের কারণ ছিলনা আমার। ক্ষণস্থায়ী প্রেমের স্বপ্ন তো আমার জীবনে ভেঙেই গেল।

উনবিংশ-শতাব্দীর হাঙ্গেরীর ভূভাগে নাটক অভিনীত হয়েছিল বৃহত্তর জীবনের রঙ্গমঞ্চে। খেয়ালী শিল্পী ফ্রাঁ লিস্ট্—অগ্নি দিয়ে রচিত সঙ্গীত তাঁর, পিয়ানো যন্ত্রের মাধ্যমে। হাঙ্গেরীর প্রাণস্পন্দন বেজে উঠেছিল সেই সব র‍্যাপ্সোডিতে—লিস্টের সৃষ্টি। তাঁর প্রেমিকা ঘর ছেড়েছিলেন, ত্যাগ করেছিলেন ঐশ্বর্য্য, স্বামী ও সন্তান। কিন্তু, তবু প্রেমের স্বপ্ন তাঁর জীবনে স্থায়ী হয়নি। যে 'রেভে ডামুর' সৃজন হয়েছিল প্রেমের তন্ময়তায়, সেই সুর বাজল জনতার তৃপ্তির জন্য শুধু। লিস্ট্ ভুলে গেলেন সুরের উৎস কে ছিলেন। সারা ইউরোপে উল্কাশিখার মত ছুটে বেড়ালেন, অশান্ত প্রতিভা লিস্ট্। সারা ইউরোপ শুনল স্বপ্নে পাওয়া সেই সুর—'প্রেমের স্বপ্ন'। যে প্রেম উদ্দাম, যে প্রেম অপরিণামদর্শী, সেই শুধু পারে এমন সুরের সৃজন। কিন্তু, যে তাকে যোগাল উপাদান, তাকেই সে প্রেম ভুলে গেল!

আমি সাহসিকা নই। শিল্পীর প্রণয়িণী হ'বার যোগ্যতা আমার ছিল না। তাই চার্টার্ড্ অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট্ সমীর সেন পেলেন বরমাল্য। আর—সে তো আমাকে ভাল বাসেনি। তার জগতের অনেক উর্দ্ধে ছিলাম আমি। প্রবীরের উচ্চাভিলাষী শিল্পীসত্তার পরিতৃপ্তি ছিল সেখানেই। সে আমাকে চেয়েছিল স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্ররূপে নিশ্চয়। তাই তো, টাকার জন্য এত ব্যাকুলতা। স্বতন্ত্র যে আমার জগত থেকে, অর্থের দিকেও তার স্বতন্ত্র মতবাদ, তার পার্থক্য বুঝিনি। বুঝতে বোধ হয় চাইনি। তার অভাব অনেক, সে নিজের ক্ষতি করেছে অভিনয়ে সময় দিয়ে। আমাদের পক্ষে সৌখিন অভিনয় পোষায়, তার কাছে সেটা উপার্জ্জনের একমাত্র উপায়। এত কথা আমি বুঝতে চাইনি। শুধু বুঝেছিলাম, সে বুঝি আমাকে চায় না।

বন্ধু, তুমি তো জান আমার অবচেতন মন যে ভুল বুঝতেই চেয়েছিল। নইলে, আমার জগতে—যে বিপ্লব ঘটত। যেখান থেকে অবিরত সাধনায় অন্তলোকে উন্নীত হয়েছিলাম, সেখানেই ফিরে যেতে হ'ত। ধূমজালে শ্বাসরুদ্ধ দিনগুলো! ফিরে চাই না। আর, প্রেমের দেখাই পেলাম না, তার স্বপ্ন কেন? লোভী প্রবীর আমাকে ভাল বাসেনি। হৃদয়হীন লিস্ট্ আবার তারই মধ্যে জন্ম নিয়েছিল। লিস্টের কাছে খ্যাতি বড়, প্রবীরের কাছে অর্থ বড়।

তবু যদি ও লিস্ট্ হোত। সাধারণ কালো একটি ছেলে দরিদ্র-সুলভ দেহকামনায় অস্থির। বিবাহ করে সুখে ঘরকন্না করছে শুনেছি। হাসি পায়। নিশ্চয়, 'প্রেমের স্বপ্ন' সুর আর তাকে বাজাতে হয় না। সাধারণ প্রাপ্তি, একটা সাধারণ মেয়েকে বিয়ে। তা ও না করে থাকতে পারল না। হাসি পায়। একদিন প্রেমের কত দীর্ঘ ও উচ্চ ভাষণ শুনেছিলাম ওর মুখে।

ঘৃণায় কণ্টকিত হয়ে উঠি। কি সাধারণ পুরুষ! কোথায় সেই লিস্ট্—যার হৃদয়হীনতার মধ্যেও ছিল

অসামান্যতা। প্রবীর তো সেই শিল্পী নয়—তার চাওয়া অতি সাধারণ—অর্থ। আমার অর্থশালী পিতা। তাই, চাওয়ার বস্তু আমি হয়েছিলাম। প্রতিহত হয়ে অতি সাধারণ জীবন-যাপন করছে—সাধারণ নারীকে বিবাহ ও সংসার। পেশাদার বেহালা বাজিয়ে!

ভাঙ্গা বেহালার টুকরোগুলো জীবন থেকে তো তুলেই ফেলে দিয়েছি। বন্ধ পিয়ানো আর 'প্রেমের স্বপ্ন' বাজায় না। বন্ধু, তুমি কি জাননা, আমার ভোলার সাধনা?

দশ বছর কেটে গেল। অদর্শনের বিবর্ণ স্মৃতিপটে হঠাৎ কোনদিন একটু রং লাগতো। ভুলে-থাকা দিনে হঠাৎ নীরব পিয়ানোর ডালা অদৃশ্য হাতে তুলে কে যেন বাজিয়ে যেত—ভুলে যাওয়া বিদেশী সুর ঝঙ্কার—'প্রেমের স্বপ্ন'। চমকিত হ'তাম। চোখ মুছে তাকাতাম। কই! শূণ্য ঘরে নীরব পিয়ানো। কারুর শ্যামাভ অঙ্গুলী-প্রান্ত বাজিয়ে যায় না সুর—এলোমেলো চুলে-ছাওয়া ললাটে জ্বলে না আলোর ফুলঝুড়ি। প্রেমের স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে।

ফিল্ম ফেষ্টিভালের সপ্তাহে সমীরের সেক্রেটারী আমার টিকেট এনে দিত। শেষ মুহূর্ত্তে ছবিগুলো দেখব স্থির করায় যে কোন মূল্যেই হোক টিকেট পেতাম না। যে চিত্রগৃহে যেখানা পারি, দেখে নিতাম।

ভয়ে ভয়ে লোকটি বলল, "আজ দু'খানা টিকেট পেয়েছি মাত্র। একখানা উত্তর কলকাতায়, তাও আবার তিনটায়। তা ছাড়া, কম দামী মহিলা-আসন। আর পেলাম না। চীনে ছবিখানা আপনি দেখতে চেয়েছিলেন, তাই কিনলাম।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললাম, "মহিলা-আসন, উত্তর ক'লকাতায়। তায় কম দামী! কত?"

"আজ্ঞে, এক টাকা দু' আনা মাত্র। কম বেশী কোন দামেই সিট নেই আর। 'The white married-girl-'এর আজই শেষ।" আমার মুখে অসন্তোষ লক্ষ্য ক'রে লোকটি তাড়াতাড়ি যোগ দিল, "জাপানী ছবিখানার আমি ডবল দামে চৌরঙ্গীপাড়ায় ভাল সিট যোগাড় ক'রেছি। এই নিন।"

একটু প্রীত হ'য়ে বললাম, "চীনে ছবিখানা দেখা দরকার। যাকগে, কষ্ট একটু করবই। সন্ধ্যার ছবিটা আরামে দেখা যাবে তো। গাড়ী ব'লে দিন।"

এলাম বহু দিন পরে উত্তর কলকাতার পুরাতন চিত্রগৃহে। শৈশবে এখানে আসা উচ্চাশা ছিল। তার পরে, চ'লে গেলাম দক্ষিণে। ভুলে গেলাম উত্তরকে।

সেই আঁকাবাঁকা গলি, ঘেষাঘেষি ছোট বাসার বাড়ী। অন্যমনস্ক ভাবে চিত্রগৃহে চ'লে এলাম। দোতালায় মহিলা-আসন। ব্যবস্থা ভাল নয়। বারান্দায় দাঁড়ালাম এসে—পাঁচ মিনিট এখনও বাকী। নীচে অজস্র জনসমাগম। যে না বুঝবে, সে-ও এসেছে দেখতে। আমার মত দক্ষিণের কয়েকটি মেয়েও আছেন। ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল উত্তর দক্ষিণকে এক ক'রেছে।

নীচে চেয়ে রইলাম। দশ বছর পরে এ-পাড়ায় পা দিলাম। দশ বছর পরে পা দিয়েই দেখলাম অনিবার্য্য ভাবে—তাকে। প্রবীর।

রিক্সা থামিয়ে নামাচ্ছে স্ত্রীকে। হ্যাঁ, ওরই স্ত্রী, ওরই স্ত্রী। অসার্থক সুরশিল্পীর স্ত্রীপদের ছাপ মহিলার সর্ব্বাঙ্গে লেখা আছে যে।

পাতলা চেহারা, অপরিণত। মনে হয়, শৈশবে টাইফয়েড্ হ'য়ে বোধকরি চেহারা এমন ঝিট্‌কে ধ'রে গেছে শুকনো বেগুণের মত। কোথাও যৌবনের ইঙ্গিত মাত্র নেই। মুখ বুদ্ধিহীন, কৈশোর যেমন রেখেছিল, তেমনি। প্রাচীনপন্থী লোকেরা এমন চেহারাকে 'কচি' ব'লে প্রশংসা করেন কখনও। তারুণ্য নেই, আছে অপূর্ণতা। রং ফ্যাকাশে, প্রবীরের মত প্রাণবন্ত শ্যাম নয়। হয়তো বিবাহকালে ফর্সা মেয়ে ও সুন্দরীকে বিবাহ করছি ভেবে প্রবীর উল্লসিত হ'য়েছিল।

পরিধানে হাল্কা নীল তাঁতের সাড়ী, গত যুগের ফ্যাসানে ঘটীহাতা রং-চঙে ছিটের নীলিম জামা। দশ বছর আগে যা আধুনিক ছিল, তেমনি কয়েকটি গয়না। পায়ের চটি ও কাপড়ের ঘোরে চেষ্টাকৃত নাগরিকতা। এক মুহূর্ত্তে দেখে ফেললাম।

কঠোর সমালোচনা নয়। যদি প্রণয়ী-পত্নী লোভনীয়া হ'ত, আমি প্রীত হ'তাম। আমার আসনে একেই বসানো হয়েছে!

প্রবীর দশ বছরে আরও সাধারণ হয়েছে। বর্ণনায় বেদনা আছে। তাই নিরস্ত হ'লাম। শুধু মনে হ'ল 'প্রবীর' নামটাই ওর বিলাসিতা, 'হরিদাস' নামটাই মানাতো।

আমারই আসনের অনেকটা পশ্চাতে প্রবীর-পত্নী বসল। ঝিকে গোপনে একটি আধুলি দিলাম, "দেখ, আমার সর্দ্দি, জ্বর হয়েছে। মাথার ওপরে পাখা সহ্য হবে না। ওই ভদ্র মহিলার পাশের আসনটা ক'রে দাও।"

প্রবীর-পত্নীর পার্শ্ববর্ত্তিনী ভাল জায়গা পেয়ে বিনা-বাক্যে উঠে গেলেন। পাশাপাশি বসলাম দু'জনে, প্রবীরের স্ত্রী আর আমি।

ছবির ফাঁকে ফাঁকে কথা জমালাম। প্রবীর-পত্নীর আপত্তি দেখা গেলনা। বেচারী কিছুই বুঝছিল না! একখানা ছবিও দেখা হয়নি, তাই স্বামী এনেছেন।

এই প্রবীরের স্ত্রী! খোঁপার কাপড় সরে গেল—জড়ির ফুল গাঁথা। আর, আমার চুল কাটা। এমন জড়ির ফিতে আমি ছেড়ে এসেছি শৈশবে। প্রবীরের স্ত্রী তাই ধরেছে। প্রবীরের জগতে এমনি পত্নী মানায়। ভালই হয়েছে।

ছায়া কত গান করে গেল—ছবি কত প্রেম রূপায়িত করল। আমার জীবনের প্রেম-স্বপ্নের ধ্বংসাবশেষ চেয়ে দেখলাম শুষ্ক চক্ষে। এই প্রবীরের প্যাসনের পাত্রী, প্রবীরের উদ্দাম প্রেমের নায়িকা? সাধারণ প্রবীর, সাধারণ তার প্রেম—তার স্বপ্ন নেই।

অস্থির হয়ে উঠলাম। উঠে যাবো। আর কি প্রয়োজন? প্রবীরের জীবনে তো আমার তিলমাত্র চিহ্ন নেই। ভাঙা বেহালার একটি তারেও গান বাজছেনা আজ। প্রবীর নিঃশেষে আমাকে ভুলে গেছে। এই সাধারণ জীবনে অসাধারণ একদিন এসেছিল, সে মনে রাখেনি। লিস্‌টের সুর ছিল, প্রবীরের আছে শূন্যতা।

উঠে যাবো, উঠেই যাবো। তবু অদম্য কৌতূহলে আরও একটি কথা জানতে চেষ্টা করলাম। ছবির অবৈধ অংশের দিকে চেয়ে বলে উঠলাম, "ভাগ্যিস্ সঙ্গে ছোট ছেলে মেয়ে নেই। আমার বাচ্চাটি আসবার জন্য কাঁদছিল। আনিনি তাকে। আনলে কি করতাম? এসব দেখে বয়ে যেত। তা আপনার বাচ্চারাও কি আসতে চায়নি?"

প্রবীর-পত্নী সাগ্রহে উত্তর দিল, "ছোট দু'টি বড়ই ছোট। কিছু বোঝে না। বড়টি একটু কান্নাকাটি করছিল।"

"বড়টি কত বড়? ছেলে না মেয়ে?"

"বড়টি আট বছরের মেয়ে। বিয়ের পরেই হয়েছে। তারপরে পর পর দুটি মারা যেয়ে আবার দুটি। ছোটটি পাঁচ মাসের।"

ঘৃণায় সারা শরীর ভরে গেল। মেয়েটির স্বাস্থ্যহীন দেহ, প্রবীরের দারিদ্র্য একত্রে যোগ করে। চলে যাই, এবার উঠতেই হল। হাতব্যাগটা তুলে নিয়ে কিছু না ভেবেই বল্লাম, "বেশ বেশ। মেয়েটি বড়, না? কি নাম রাখলেন?"

"নাম ওর বাবা রেখেছে। রেখেছে মনোবীণা।"

দাঁড়িয়ে হাতখানা তুলে ঘড়ি দেখছিলাম। এইবার বেরিয়ে যাবো। হাত ধরাই রইল তোলা—নামাতে ভুলে গেলাম। মনোবীণা!

মনোবীণা, মনোবীণা! সারা গৃহ আচ্ছন্ন হয়ে গেল সুরের ঝড়ে, ভরে গেল আকাশ; বাতাস দুলে উঠল। অদৃশ্য পিয়ানোয় বেজে গেল—রেভে ডামুর, প্রেমের স্বপ্ন। লিস্‌টের অমর রাগিণী আবার আমার জীবন ভরে দিল।

বেড়িয়ে গেলাম অন্ধকার ঘর থেকে। দাঁড়িয়েছি যখন, যেতেই হবে চলে। যেতেই হবে গতির আকর্ষণে। স্থিতির উপায় নেই আমার।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম মোহাচ্ছন্নার মত। ওই তো গাড়ী। এখনি দক্ষিণ উত্তর ছেড়ে যাবে।

আমার ধীরমন্থর অনিচ্ছুক পায়ের প্রতি পদক্ষেপে বাজতে লাগল—প্রেমের স্বপ্ন, করুণ মিনতির মত। আমার জীবন গানে ভরে গেল।

মনোবীণা, মনোবীণা! আমারই নাম। আমি তা'হলে প্রবীরের জীবনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাইনি? হাঙ্গেরীর রুক্ষতা যা জীবনে রাখেনি—বাংলার শ্যামভূমি সস্নেহে সঞ্চয় করেছে মাটীর আড়ালে—প্রেমের স্বপ্ন।

প্রবীর, প্রেম ভাঙলেও স্বপ্ন ভাঙেনা। স্বপ্ন থাকে, স্বপ্নই থাকে।

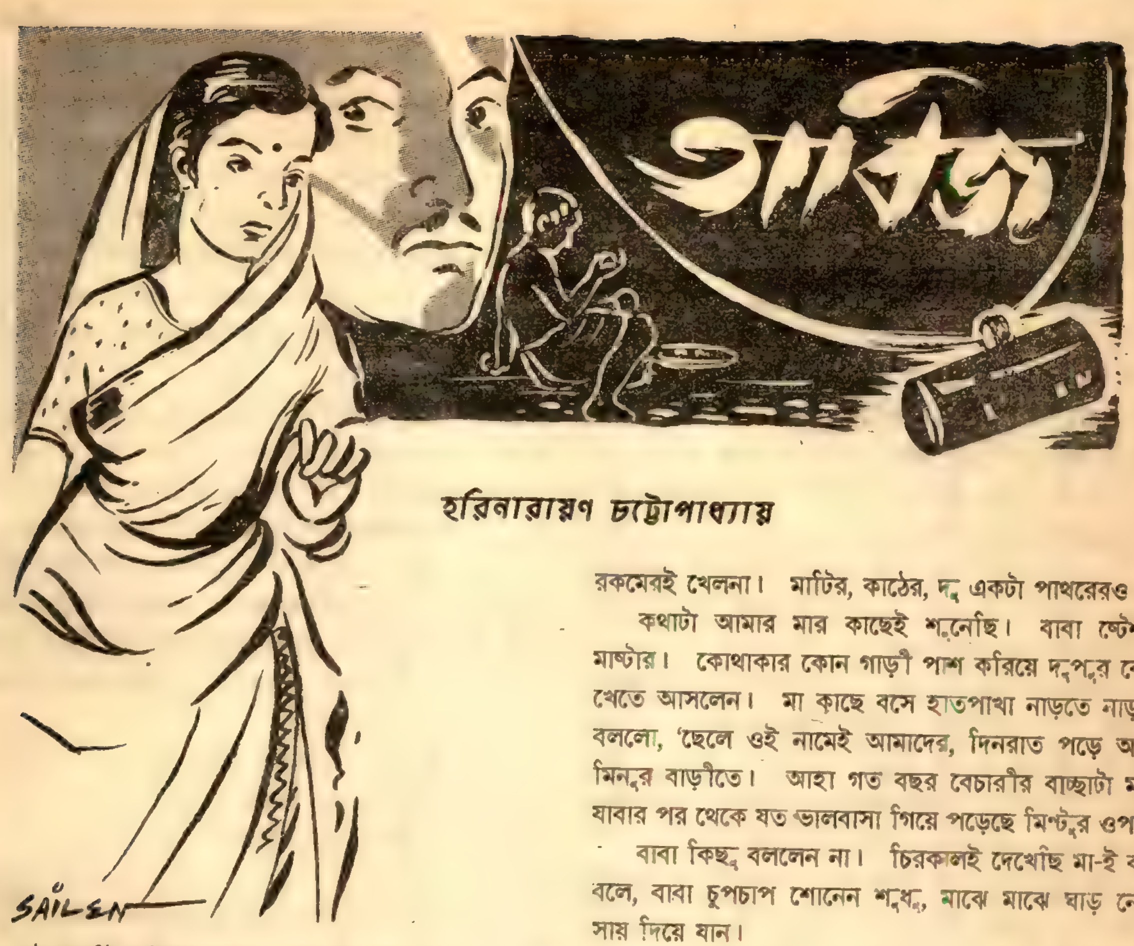

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ঐ একটি বাড়িতে আমার গতি ছিলো অবাধ। সময়ে অসময়ে, কারণে অকারণে। আমি কোনদিন না যেতে পারলে মিনুদি নিজেই এসে হাজির হতো।

'কি ব্যাপার মিণ্টুবাবু, আজ যাওনি যে? গোসা নাকি?

আমার বয়স বছর এগারো। মিনুদি ভরা যুবতী। আমাদের কোয়ার্টারের দু'খানা বাড়ী পরেই মেটে রংয়ের একতলা। সামনে ভাঁটু আর আকন্দর ঝোপ। ঝকঝকে উঠান। অন্য কোন বাড়ীতে গিয়ে উঠলে বাড়ীর লোক তটস্থ। ছেলে বুড়ো সবাই। জিনিসপত্তর সাবধানে সরিয়ে রাখতো। যতটুকু থাকতাম, সবাই হুঁসিয়ার। মাস্টারমশাইয়ের দস্যি ছেলেটা ঘরে ঢুকেছে রে, একটু সাবধান। হাতের কাছে যা পাবে ভেঙে তচনচ করবে। এমন ছেলে নয়।

কিন্তু আশ্চর্য, মিনুদির বাড়ীতে পা দিলেই আমার দুষ্টুমিও যেন কমে যেতো। ছুটোছুটি করতে ইচ্ছে করতো না, আর জিনিষপত্রে হাত দেবো কি, ঘরে ঢোকার সংগে সংগে যত রাজ্যের খেলনা আমার সামনে জড়ো করা হ'তো। মানুষের মধ্যে তো দুজন। গিন্নি আর কর্তা। অথচ কত রকমেরই খেলনা। মাটির, কাঠের, দু একটা পাথরেরও।

কথাটা আমার মার কাছেই শুনেছি। বাবা স্টেশন-মাষ্টার। কোথাকার কোন গাড়ী পাশ করিয়ে দুপুর বেলা খেতে আসলেন। মা কাছে বসে হাতপাখা নাড়তে নাড়তে বললো, 'ছেলে ওই নামেই আমাদের, দিনরাত পড়ে আছে মিনুর বাড়ীতে। আহা গত বছর বেচারীর বাচ্ছাটা মারা যাবার পর থেকে যত ভালবাসা গিয়ে পড়েছে মিণ্টুর ওপর।'

বাবা কিছু বললেন না। চিরকালই দেখেছি মা-ই কথা বলে, বাবা চুপচাপ শোনেন শুধু, মাঝে মাঝে ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে যান।

আমি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। লাউ মাচার কাছ বরাবর একটা প্রজাপতি ঘুরছিলো। সেটাকে মুঠোয় আনবার চেষ্টায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম চুপচাপ। কথা-গুলো কানে গেলো। কতক বুঝলাম, কতক বুঝলাম না। কিন্তু মিনুদির যত্ন আত্তি ক্রমেই বাড়তে লাগলো।

বেশ কিছুদিন পর। স্কুলের মাঠ থেকে খেলে ফিরছি, মিনুদি জানালায় দাঁড়িয়ে। প্রথমে হাতছানি, তারপর একটু গলা চড়িয়ে নাম ধ'রে ডাক। টিপ টিপ বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে চলেছিলাম। কাছে যেতেই মিনুদি আঁচল দিয়ে মাথা মুখ মুছিয়ে দিলো। রেকাবিতে নারকোলের নাড়ু দুটো, একটা ক্ষীরের ছাঁচ। কিন্তু খেতে বসতেই মিনুদি অদ্ভুত কাণ্ড করলো। গা ঘেঁষে বসলো প্রথমে, আমার পিঠে আলতো হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, 'একটা কথা বলবো মিণ্টু।'

একটা? 'এমন ভোগ সামনে পেলে হাজার কথা শুনতে আমি রাজী। কথা শোনার মধ্যে আর কষ্টটা কোথায়! নারকোলের নাড়ু কামড়াতে কামড়াতে বললাম, 'বলো।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ। কোন কথা নেই। ক্ষীরের ছাঁচে

হাত দেবার আগে মুখ তুলেই অবাক হ'য়ে গেলাম। একদৃষ্টে মিনুদি আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। ফর্সা দুটি গালে আবীরের ছোপ। টানা চোখ দুটো আবেশে আধবোজা।

'মিণ্টু'! গলার সুরেও কাঁপন।

'কি'? আর মাথা তুললাম না।

মিনুদি আরো সরে আসলো আমার দিকে। একটা হাতে আমার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললো, 'এবার কি হবে বলতো আমার, ছেলে না মেয়ে?'

ভারি অস্বস্তিকর অবস্থা। ছুটে পালিয়ে যাওয়ারও উপায় নেই। ক্ষীরের ছাঁচের অর্ধেকের ওপর বাকি।

মিনুদির হাত পিঠের ওপর অনুভব করলাম। সেই তন্দ্রাজড়ানো গলা, 'এই, বলো।'

মরীয়া হ'য়ে গেলাম। যা হবার হবে। এদিক ওদিকে চেয়ে সামনের দেয়ালে টাঙানো ছবিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, 'ওই রকম।'

ছবিটা ননীচোরা কৃষ্ণের। হামাগুড়ি দেওয়া অবস্থার। একটা হাতে ননী ছানা গোছের কিছু একটা হবে। এই ছবিটা আমার বরাবর ভালো লাগতো। তেত্রিশ কোটি ঠাকুর দেবতার মধ্যে এই একজন খাবার জিনিস হাতে নিয়ে পোজ দেবার সাহস রাখেন। খাঁটি দেবতা।

কিন্তু ফল হ'লো মারাত্মক। আচমকা মিনুদি আমাকে একেবারে বুকের মধ্যে জাপটে ধরলো। শুধু জাপটানো? কপালে গালে চুমু খেয়ে সে এক বিশ্রী ব্যাপার।

কিছুটা ভয়ে, কিছুটা হয়তো বিস্ময়ে বহুদিন মিনুদির বাড়ী মাড়াই নি। স্কুল ফেরৎ এসেছি চৌধুরীদের বাগান-বাড়ীর ভিতর দিয়ে। একটু ঘুরপথ। তা হোক। বিকেলে মাঠে খেলতে না গিয়ে, উল্টোপথে গিয়েছি নদীর ধারে। একলা একলা ঘুরেছি এদিক ওদিক। তবু যাই নি। মিনুদি বাড়ীতেও দু একবার এসেছে আমার খোঁজে। মা অনুযোগ করেছে, 'হ্যারে মিণ্টু, মিনুদির বাড়ী আর যাস না কেন? দুপুরবেলা বেচারী এসে কত দুঃখ করলে।'

কোন উত্তর দিই নি। কেন যাই না মার কাছে কি বলবো। আমি নিজেই জানি না।

মাস দুয়েক, তারপরই বাড়ীতে হৈ চৈ পড়ে গেলো। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা, সোরগোল। বাবা শহরে বদলী হচ্ছেন। মন খুশীতে ডগমগ। বিরাট শহর কলকাতা। গাড়ী ঘোড়া লোক লস্করে জমজমাট। নিত্য নতুন দেখার জিনিস। কিন্তু আশ্চর্য মানুষের মন। যত যাবার দিন এগিয়ে আসলো, তত মন খারাপ হয়ে গেলো। কালো ছপ-ছপ রাস্তা, বিদ্যাধরী নদী, কদম, বক, পলাশের সার, অফুরন্ত অনুর্বর মাঠ—হাত বাড়িয়ে মনকে টানতে শুরু করলো। প্রথমে শীতের আমেজের মতন শিরশিরে ভাব। চোখদুটো আপনা থেকেই ছলছলিয়ে ওঠে।

যাবার আগের দিন। বিকেলের দিকে পা টিপে টিপে মিনুদির বাড়ীর উঠানে গিয়ে দাঁড়ালাম। উঁকি দিয়ে দেখলাম রান্নাঘরে। ফাঁকা। আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকতেই চোখাচোখি হ'য়ে গেলো। কি একটা কাজে মিনুদি এদিকেই আসছিলো।

কাছে এসে দাঁড়ালো। একটু হেসে বললো, 'মিণ্টুবাবু, কালকেই তো যাচ্ছো শহরে, না?'

ঘাড় নাড়লাম। হ্যাঁ। খুব ভয়ে ভয়ে। এখনই হয়তো জাপটে ধরে কান্নাকাটি শুরু করবে। সেদিনের মতন।

কিন্তু মিনুদি সে সবের ধার দিয়েও গেলো না। কবাটে শরীরের ভর দিয়ে আস্তে আস্তে বললো. 'তোমার মার কাছ থেকে তোমাদের কলকাতার ঠিকানা নিয়েছি। চিঠি লিখবো, খোকার ভাতের সময় কিন্তু আসতেই হবে। কোন কথা শুনবো না।'

খোকার ভাত। চমকে মুখ তুললাম। মিনুদির কপালের সিঁদুর নাকের ডগায়, গালের পাশে খসে পড়েছে। ঘামের ভিজে গন্ধ। দুটো চোখ কাচের মতন চক্‌চক্‌ ক'রে জ্বলছে।

একটু এদিক ওদিক ক'রে পালিয়ে বাঁচলাম।

তারপর বহু বছর কেটেছে। গোটা পাঁচ ছয়েক তো নিশ্চয়। ম্যাট্রিকের বেড়া পেরিয়ে কলেজের ময়দানে ঢুকেছি। মিনুদির কথা খুব ফিকে। মিলিয়ে যাবার আগের অবস্থা।

সিনেমার টিকেট কেনা। প্রায় ছুটেই চলেছি। চার-দিন ঘোরাঘুরি ক'রে তবে বরাতে শিকে ছিঁড়েছে। একটুও বাদ দিতে রাজী নই।

'কে, আমাদের মিণ্টু না?' ভীড়ের মাঝখান থেকে কে একজন আলগোছে ছুঁড়ে দিলো কথাটা। বেঁটে খাটো একটি লোক। খয়া খয়া চেহারা। সারা মুখের মধ্যে গিনিপিগ-প্যাটার্ণ চোখদুটি সম্বল। জ্বলজ্বলে চাউনি। মুখ নয় মুখোস। ভাবের বালাই নেই, ভাবান্তরেরও নয়। এসব লোককে এক নজরেই চেনা যায়। বাড়তি নজর চালাতে হয় না। পরেশবাবু। মিনুদির স্বামী। নির্বিরোধ সুবোধ মানুষ। সাত চড়ে একটি কথাও বের করেন না।

দেখে খুব খুশী হলাম না। এই তাড়াতাড়ির মুখে, তাছাড়া আমার সদ্য ভাঁজভাঙা কড়া ইস্ত্রির সার্ট, ফিনফিনে ফরাসডাঙ্গা, পায়ে ইকাঁড়িমিকাঁড়ি স্যাণ্ডেল—পুরোদস্তুর

ভদ্রলোক! আচমকা অন্নপ্রাশনের নাম করে ডাকলে কার ভালো লাগে!

উপায় নেই। দাঁড়াতেও হলো, কথা বলতেও। আমার খবর মোটামুটি দিলাম। ওদিকের খবর ভালো নয়। যার ভাতে আমাদের নিমন্ত্রণ খাওয়ার কথা, সেটি বছর আড়াই-য়ের হয়ে মারা গেছে। ডবল নিউমোনিয়া। খরচপাতি করেও টেঁকানো গেলো না। তার পরেরটি আট মাসেই কাবার। পৃথিবী দেখতে হয় নি। রান্নাঘরে মিনুদি পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলো। অজ্ঞান তিন দিন তিন রাত। সেই সময়েই পেটেরটা নষ্ট হয়ে যায়। জ্ঞান হ'য়ে মিনুদির সে কি কান্না। বুঝিয়ে রাখা দায়।

একচোখ হাতঘড়ির দিকে আর এক চোখ পরেশবাবুর ওপর। কাচুমাচু মুখ ক'রে শুনে গেলাম। মিনুদির অবস্থা এখনও খুব ভালো নয়, তবে বিপদ একটু কেটে গেছে এই যা। ওষুধপত্তর নিয়ে যেতেই পরেশবাবুর কলকাতায় আসা।

পরেশবাবু একটু দম নিতেই, আমি পাশ কাটালাম। বড্ড জরুরী দরকার রয়েছে একটা। আর দাঁড়ানো সম্ভব নয়।

'আচ্ছা, আমি চলি,' পরেশবাবু বেঁটে হাতটা আকাশের দিকে ওঠালেন। চাঁদ ধরবার কায়দায়, 'তুমি সময় ক'রে এসো না একদিন। কতক্ষণেরই বা রাস্তা। তোমার কথা ও প্রায়ই বলে।'

পরেশবাবুর কথা শেষ হবার আগেই আমি মোড় ঘুরেছি। আর পাঁচ মিনিট বাকি, অথচ এখনও দুটো চৌরাস্তা পার হতে হবে। যতো সব উটকো আপদ রাস্তার মাঝখানে। নাকে কাঁদুনী সার। সাত পুরুষের কুটুম।

সিনেমাহলে আয়েস ক'রে ব'সে কিন্তু মেজাজটা নরম হ'লো। নিউজরীল দেখার ফাঁকে ফাঁকে মিনুদির ডাগর দুটি চোখ ভেসে আসলো। ক্ষুধার্ত মনের ইসারা। ছোট-বেলায় যেটুকু অস্পষ্ট ছিলো, কুয়াশার মতন আবছা, আজ আর কোন অসুবিধা নেই। বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়ের রূপটা সাম্‌নের সেলুলয়েডের ছবির মতনই সাদা কালো রঙে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

আসল ছবি শুরু করার সংগেই মিনুদি নিঃশেষে মন থেকে মুছে গেলো। মাস দুই আর মনেই হ'লো না তার কথা।

কি একটা ব্যাপারে কলেজ হঠাৎ ছুটি হ'য়ে গেলো। কলেজের চাতালে জড়ো হ'য়ে কিছুক্ষণ হৈ চৈ। ম্যাটিনী শো দেখার সময় উৎরে দিয়ে ছুটি দেওয়াটা কর্তৃপক্ষের কতটা অবিবেচনার লক্ষণ, তাই নিয়ে আলোচনা। তারপর যে যার বাড়ীর দিকে রওনা—হাঁটি হাঁটি পা পা ক'রে।

বাড়ী যেতে ভালো লাগছিলো না। চুপচাপ বসে থাকতে হবে কিংবা সংসারের ফাইফরমাস খাটা। তার চেয়েও মুস্কিলের ব্যাপার, মা হয়তো ধরে বসবে এমন হঠাৎ পাওয়া ছুটিটা মাঠে নষ্ট না ক'রে তাকে দক্ষিণেশ্বরে বোনের বাড়ী ঘুরিয়ে আনতে। বিশ্রী ব্যাপার। তার চেয়ে বই বগলে করে দুপুরের কলকাতার ভীড়ে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া ঢের ভালো। দোকানের প্লাসকেশে সাজানো পশরা দেখতে দেখতে যে কোন একটা দিক ধ'রে চলতে শুরু।

তাই করলাম। খেয়াল হ'লো শেয়ালদা স্টেশনের কাছ বরাবর এসে। প্ল্যাটফর্মে পা দেওয়ার সংগে সংগেই সগর্জনে ট্রেন এসে থামলো। কোন কিছু না ভেবেই সামনের কামরায় উঠে বসলাম। টনক নড়লো গাড়ী নড়ার সংগে। উপায়! উপায় মিনুদি এমন যোগাযোগ সহজে হবে না। উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ। পরেশবাবুর অনুরোধ রাখা উচিত বইকি।

মন ঠিক করে জুতসই হয়ে বসলাম। কিন্তু স্টেশনে নেমেই সব বানচাল হ'য়ে গেলো। এত কষ্টে ঠিক করা মনটাও সায় দিলো না। কোথা থেকে রাজ্যের লজ্জা এসে জড়ো হ'লো। বয়সটাই একটা বাধা। ঠিক আগের মতন বেড়া পার হ'য়ে উঠানে দাঁড়িয়ে "মিনুদি" বলে ডাকতেও তো কেমন মনে হবে। তাছাড়া পরেশবাবুও বাড়ীতে নেই নিশ্চয়।

দু এক মিনিট এদিক ওদিক। খোয়াঢালা প্ল্যাটফর্মে একটু পায়চারি, তারপরই গেট পার হ'য়ে মেঠো পথ ধরলাম। এতদূর এসে আর ফিরে যেতে মন সরলো না। একটু ঘুরে দেখেই যাই না হয় পুরোনো গ্রাম।

উঠানের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে অস্বস্তি লাগলো। দু একবার চেষ্টা ক'রেও মিনুদির নাম উচ্চারণ করতে পারলাম না। বুদ্ধি ক'রে পরেশবাবুর নাম ধরলাম। বার দুয়েক। তারপরেই জানালার গরাদের ওপারে মিনুদির মুখ দেখা গেলো। দু এক মিনিট। ভুরু কুঁচকে দেখার চেষ্টা। বিস্মৃতির আবর্জনা সরিয়ে চেনা মানুষকে ঠাওর করার প্রয়াস। তারপরই মিনুদি দরজা খুলে সিঁড়ির চাতালে এসে দাঁড়ালো, 'কে মিণ্টু না?'

মিনুদির গলার আওয়াজে সব জড়তা কেটে গেলো। বললাম, 'হ্যা মিনুদি। তবু ভালো যে চিনতে পেরেছো?'

'শহরে গিয়ে খুব যে কথা শিখেছিস। সেই গেলি

আর এদিক মাড়াবার কথাই মনে নেই। মিনুদি ম'লো না বাঁচলো তা জানতেও ইচ্ছা করে না।'

কথাটা জিভের ডগায় আসলো। ছেলের ভাতে মিনুদিরই না নিমন্ত্রণ করার কথা। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম। মরার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের সামিল। যে ছেলে রইলোই না, তাকে কেন্দ্র ক'রে পুরোনো উৎসবের কথাও মনে করিয়ে দেওয়া উচিত হবে না। এখনি হয়তো মিনুদি ডুকরে কেঁদে উঠবে।

'আয়, ঘরের মধ্যে আয়। সারাক্ষণ উঠানেই দাঁড়িয়ে থাকবি না কি'? মিনুদি দরজা ছেড়ে দাঁড়ালো।

না, তা অবশ্য থাকবো না। দুটো গল্পগাছা করতেই তো আসা।

মুখোমুখি বসলাম দুজনে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম মিনুদিকে। প্রায় আগের মতনই আছে। তেমনি ঢলঢলে কচি চেহারা। একটু রোগা হ'য়ে গেছে, খুব সামান্য। কিন্তু শীর্ণ হ'য়ে আরো যেন সুন্দরী হয়েছে। এত বছর পরে দেখা, অথচ বয়সের একটু আঁচড়ও পড়ে নি চেহারায়। কোথাও একটু টোল খায় নি।

শহরের কথা, কলেজের নতুন জীবনের কাহিনী, বাড়ীর খবর সব হ'লো। কথার মাঝখানে হঠাৎ মিনুদি উঠে গেলো ভিতরে। বোধ হয় খাবারের আয়োজন করতে। এত বছর পরে দেখা। না খাইয়ে বুঝি ছাড়বে মিনুদি?

কিন্তু মিনুদি ফিরে আসতেই ভুল ভাঙ্গলো। খাবারের থালা নয়, আঁচল চাপা ছোট ছবি। মিনুদির ছেলের। হাতে ক'রে দেখলাম। মিনুদির দিকে চোখ তুলে চাইবার সাহস হ'লো না। দিব্যি ছেলে। মোটাসোটা, মিনুদির মতনই সুন্দর।

'এমন ছেলেটো রাখতে পারলাম নারে মিন্টু। ঠাণ্ডা লেগে ডবল নিউমোনিয়া হ'লো, ব্যস।' মিনুদির গলা ধরে এলো।

'সবই নিয়তি মিনুদি।' আমি আশ্বাস দেবার চেষ্টা করলাম। তার পরেরটার কথা আর তুললাম না। অবশ্য সেটার ওপর হয়তো কোন মায়াই পড়ে নি। রক্তের ডেলা বই তো নয়। তবু সেটা থাকলে এটার শোক হয়তো অনেকটা ফিকে হ'তো। পলিমাটি পড়ার মতন কতকটা।

বাড়ী ফিরলাম নটা তেরোর গাড়ীতে। লণ্ঠন হাতে পরেশবাবু স্টেশন পর্যন্ত এলেন। পথে বিশেষ কথা হ'লো না।

বি-এ ক্লাশে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই জীবনসংগ্রাম শুরু হ'লো। বাবা মারা গেলেন। সামান্য পুঁজি একটা বোনের বিয়ে দিতেই কাবার। এখনও একটা বোন বাকি। পড়া-শোনা শিকেয় তুলে মাতব্বর আত্মীয়দের দরজায় ধর্ণা। কিন্তু সব জায়গায় এক গৎ। চাকরীর বাজার মন্দা। অফিসে অফিসে ঘোরাঘুরি। সরকারী বে-সরকারী সব। চেয়ার খালি নেই। শীঘ্র খালি হবে এমন আশাও কম। দম প্রায় ফুরিয়ে আসার মুখে এক জায়গা থেকে ডাক এলো। অন্ধকারে আলোর আঁচড়। চটকদার সাজানোগোজানো অফিস নয়। বার্ণিশ-চকচকে টেবিল চেয়ারের কারসাজি নেই। একুশ ফুট শড়কের ওপর রঙীণ সাইনবোর্ড। ঘুপসী ঘর। পাঁচজন এলে একজনকে পথে পায়চারী করতে হয়। কিন্তু মালিক ভারি ভদ্র। বনোয়ারীলাল এণ্ড কোম্পানীর খোদ বনোয়ারীলাল আপ্যায়ন করলো। কাঁচি সিগারেট, গুণ্ডি দেওয়া পানের খিলি। চায়ের দোকান ধারে কাছে নেই, নয়তো এক কাপ চাও এসে যেতে পারতো।

ব্যবসা স্নো আর সাবানের। এইতে শুরু। চালু হ'লে পাউডার, সুগন্ধি তেল, রকমারী খোসবো এসব করার মালিকের মতলব আছে। নিজেদের তৈরী নয়, সোল এজেন্সি। একবার দাঁড়িয়ে যেতে পারলে আর ভাবনা কি! লেখাপড়া জানা ছেলের দরকার। মফঃস্বলে ঘুরে ঘুরে বোঝাতে পারবে লোককে। আর পাঁচটা এই ধরণের জিনিসের সংগে তুলনা ক'রে দেখাতে পারবে "কুমারী স্নো" অর "নির্মলা সাবানের" উপকারীতা। মাইনে আছে, পথ-চলতি রাহা খরচ, তার ওপর বিক্রীর ওপর কমিশন। দশটা পাঁচটা অফিস করার চেয়ে হাজার গুণ ভালো। দাসত্ব তো আর নয়। নিজের রোজগার নিজের কেরামতীতে।

স্বীকার করতে হলো। কিছুক্ষণ মাইনে নিয়ে দর-দস্তুর, কমিশনের অঙ্ক নিয়ে আলোচনা। তারপর রাজী হয়ে গেলাম। ভিক্ষের চাল আবার কাড়া না আকাড়া। ডুবন্ত মানুষের কাছে খড়ই আশ্রয়ের সামিল। একেবারে নিয়োগপত্র নিয়ে দোকান ছাড়লাম। দিন সাতেক পর থেকেই কাজ আরম্ভ করতে হবে। মালিক খুব ভদ্র। মির্জাপুর আর ফৈজাবাদে জানাশোনা লোক আছে, কার-বারী আত্মীয়। তাদের কাছে চিঠিও দিয়ে দিলো কয়েক-খানা। বিদেশ বিভূঁয়ে কাজে লাগবে।

ঠাকুরদেবতা প্রণাম করে চাকরি শুরু হলো। সেকস্-পীয়র, মিল্টন আওড়ানো মুখে "কুমারী স্নো"র গুণগান আওড়াতে আরম্ভ করলাম। ত্বকের পক্ষে "নির্মলা" সাবান যে অপরিহার্য একথা জোর গলায় বলে বলে লোক জড়ো করে ফেললাম।

বছর দেড়েক। সুখে দুঃখে জীবনের চাকা চললো।

কোন মাসে বাড়তি রোজগার, কোনমাসে ঘাটতি। সব মিলিয়ে মন্দ নয়। সত্যিই দশটা পাঁচটা কুঁজো হয়ে অফিসের চেয়ারে বসে মাসের শেষে হাত বাড়িয়ে পঁচাত্তর টাকা মাইনের চেয়ে ভালো। খাটুনী একটু বেশী। তা হোক তেমনি নতুন নতুন দেশ দেখাও হয়, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা।

সেবার মোগলসরাই অবধি গিয়ে মন খুঁত খুঁত করতে লাগলো। সুযোগ সুবিধা ক'রে একবার কাশীতে গেলে হয়। বিশ্বনাথের মন্দির দর্শন আর দশবাশ্বমেধ ঘাটে একবার ডুব। জানাশোনা বোর্ডিংও রয়েছে। জিনিসপত্তর সলোমন কোম্পানীর জিম্মায় রেখে কাশী রওনা হয়ে গেলাম। অভ্যাসের দোষ। ঠাকুর দর্শন করতে গেছি, ওরই মধ্যে সময় করে দু'একজন খানদানী দোকানের মালিকের সংগে মোলাকাত। দু এক গ্রোস জিনিস গছানো। কাজ সারতে বেলা গড়িয়ে এলো।

গঙ্গায় ডুব দিয়ে যখন উঠলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। লোকের ভীড় কাটিয়ে চাতাল পার হচ্ছি, হঠাৎ কানে এলো, 'কে মিণ্টু?'

ঘুরেই অবাক হ'য়ে গেলাম। আবছা অন্ধকার, কিন্তু মানুষ না চিনতে পারার মতন জমাট অন্ধকার নয়। মিনুদি। গলায় আঁচল দেওয়া। বোধ হয় প্রণাম সেরে উঠলো। তেমনি ঋজু সবল চেহারা। হাসি হাসি ঠোঁটের গড়ন, চিবুকে ভাঁজ, চকচকে চোখের তারা।

'কে মিনুদি, তুমি এখানে?' এগিয়ে গেলাম। অপরিচিত মানুষের সংগে কথা বলে বলে জড়তাটুকু একেবারে কেটে গেছে। চেনা মানুষের বেলা তো অসুবিধাই নেই।

এ জায়গা ছাড়া আমাদের মতন লোক আর যাবে কোথায় বল'? মিনুদির গলা ভারী হ'য়ে এলো।

তার মানে? খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করতেই মানে মিললো। পরণে সাদা থান। সিঁথিতে রঙ নেই।

মাথা নিচু ক'রে বললাম, 'কবে এ ব্যাপার হ'লো মিনুদি?'

'মাস তিনেক' মিনুদি আমাকে পেরিয়ে চোখ ফেরালো গঙ্গার দিকে। অসংখ্য বজরা। ঢেউয়ের কলরোল। মানুষের চীৎকার। জীবনের ইসারা। সব শেষ হ'য়ে যাওয়া মানুষের কাছে এসব যেন অর্থহীন। দ্রুত স্পন্দনের সংগে যেন তাল রেখে উঠতে পারে না।

মিনুদি আমার দিকে চোখ ফেরালো অনেকক্ষণ পর। অন্য মানুষ। হাসিতে আবার চোখমুখ উপচে পড়ছে। বললো, 'বিয়ে থা করেছিস? করিস নি? ওমা, এমন বাউণ্ডুলে হ'য়ে আর কতদিন ঘুরবি মিণ্টু?'

এ কথার উত্তর দিলাম না। অন্য সব কথা শুরু হলো। বাড়ীর কথা। বাবার না থাকার খবর। মায়ের স্বাস্থ্য, টুনির বিয়ে।

আজই চলে যাবো শুনে মিনুদি আক্ষেপ করলো, 'আজ রাত্তিরেই যাবি? ওমা, ভাবলাম কিছুদিন থাকবি। নিজের হাতে রান্না ক'রে তোকে খাওয়াবো একদিন। মনে আছে মিণ্টু ক্ষীরের ছাঁচ খেতে তুই কি ভালোই বাসতিস?'

এ কথারও উত্তর দিলাম না। আলগোছে হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নিলাম। আর দেরী করা চলবে না। মন্দির দর্শন ক'রে ফিরতে হবে।

সে কথা বলতেই মিনুদি বললো, 'চল্লি তা হলে, আবার কবে দেখা হবে কে জানে।' তারপর একটু থেমে বললো, 'একটা কাজ কর মিণ্টু, কমণ্ডলুটা তুলে দে আমার হাতে। শরীরের এ অবস্থায় উঁচু নিচু হ'তে বড় কষ্ট হয়।'

চমকে উঠলাম। ভালো ক'রে ঠাওর ক'রে দেখলাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। আশ্চর্য, এতক্ষন খেয়ালই করি নি। আর দেরী নেই। বোধ হয় মাসখানেক।

কমণ্ডলু হাতে তুলে দিতে মিনুদি মুখ তুললো। হাওয়ায় চুলের রাশ উড়ছে, থান কাপড়ের কিছুটা অংশও। একটা হাত প্রসারিত ক'রে বললো, 'এবার আর গোলমাল হবে না মিণ্টু। এই দেখ, বাবা বিশ্বনাথের তাবিজ বেঁধেছি হাতে।' এইটুকু কথা বলেই মিনুদি হাঁপিয়ে উঠলো। মাথা নিচু ক'রে চোখের দুটো কোন মুছে নিয়ে বললো, 'তাছাড়া, এবারে ভগবান আর কেড়ে নেবেন না, কি বল্? ওই টুকু ছাড়া আমার পৃথিবীতে আর কে থাকবে বল্? একটু একটু ক'রে সবই তো কেড়ে নিয়েছেন।'

মিনুদির নিঃশ্বাস কানে যেতেই মুখ তুললাম। অন্ধকারে চকচক ক'রে জ্বলছে চোখ দুটো, গোধূলির আলো এসে পড়া বিশ্বনাথের মন্দিরের চূড়োর মতনই।

হুইট্‌ম্যান ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

এই গণতন্ত্রের যুগে হুইট্‌ম্যানের কাব্যের একটী বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। অনেক মণীষীর মতে হুইট্‌ম্যানই হচ্ছেন বর্তমান যুগের কবি। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে আমেরিকার মাটিতে তাঁর আবির্ভাব। অনেক রকমের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছিল। কখনো ছুতার, কখনো স্কুল-মাস্টার, কখনো ছাপাখানার শ্রমিক, কখনো নিউইয়র্কের সাংবাদিক এবং সর্বশেষে কাগজের সম্পাদক। এই বিচিত্র পটভূমিকায় তাঁকে আমরা দেখ্‌তে পাই দেশ-বিদেশের নানা মণীষীর লেখা পড়ে জ্ঞানের ঐশ্বর্যে মনকে তিনি ভরিয়ে তুল্‌ছেন।

হুইট্‌ম্যানের কাব্যপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—মানুষের সত্তার সকল দিককে তিনি শ্রদ্ধার সংগে স্বীকার করেছেন। জীবন অখণ্ড—এই বাণী উৎসারিত হয়েছে তাঁর কণ্ঠ থেকে। জীবনের বিচিত্র আনন্দকে, পৃথিবীর সুষমা ও সৌন্দর্যকে অস্বীকার করে বৈরাগ্য-বারিধির তলায় ডুব দিয়েছেন যাঁরা —তাঁরা হুইট্‌ম্যান পড়ে নিশ্চয়ই নিরাশ হবেন। হুইট্‌ম্যান যুগে যুগে তাদেরই প্রেরণা যোগাবে যারা ভালোবেসেছে আমাদের এই মাটির পৃথিবীকে, জীবনকে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে যারা চিরদিন বলেছেঃ ভালোবাসি তোমাকে! তুমি আমার!

হুইট্‌ম্যান যে-মানুষের বন্দনা-গান গেয়েছেন সে মানুষ আধখানা মানুষ নয়, আস্ত মানুষ, গোটা মানুষ। সে মানুষ স্বীকার করেছে দেহের গরিমাকে, স্বীকার করেছে আত্মারও মহিমাকে।

"I have said that the soul is not more than the body,
And I have said that the body is not more than the soul . ."

"আমি বলেছি আত্মা শরীরের চেয়ে বড়ো নয়,
আবার এও বলেছি শরীরও আত্মার চেয়ে বড়ো নয়।"

আমাদের সত্তার কোন একটা দিককে একান্তভাবে বড়ো করে তোলা হুইট্‌ম্যানের কাছে কখনও যথার্থ প্রগতি বলে মনে হয় নি। তিনি ব্যক্তিত্বের বিকাশ বলতে বুঝতেন balanced growth of individuality. ধর্ম্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি—এদের প্রত্যেককে তিনি কিছু কম মূল্য দেন্‌ নি।

Facts, religions, improvements, politics, trades, are as real as before,
But the soul is also real, it too is positive and dircet, ...

যার ওজন আছে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা বাইরে থেকে ধরে ছুঁয়ে পাওয়া যায়—তাকেই শুধু সত্যের মর্য্যাদা দেন নি হুইট্‌ম্যান। অলডাস্‌ হাক্স্‌লি (Aldous Huxley) যাকে বলেছেন non-measurable, purely qualitative aspects of reality, তাকেও হুইট্‌ম্যান সমান মর্য্যাদা দান করেছেন।

আসলে হুইট্‌ম্যান ছিলেন জীবনের পূজারী। জীবনকে শুধু পুঁথির মধ্য দিয়ে জানা আর জোরের সংগে বাঁচা—এ দুটো ঠিক এক জিনিষ নয়। আমরা জীবন সম্পর্কে বই পড়ে অনেক কথা জানতে পারি। এই জানাকে হুইট্‌ম্যান বিশেষ কোন মূল্য দেন নি। তাঁর প্রাণের প্রিয় তারাই যারা বাঁচতে জানে। তাঁর ভালোবাসা যে পেয়েছে সে হবেঃ

First-rate to ride, to fight, to hit the bull's eye, to sail a skiff, to sing a song or play on the banjo.

অর্থাৎ

পয়লা নম্বরের ঘোড়-সোয়ার, লড়াই করতে ওস্তাদ, লক্ষ্য-ভেদ করতে সুনিপুণ, পাকা মাঝি, ভালো গাইয়ে আর বাজিয়ে।

আর একটা কবিতায় আছেঃ

"Myself and mine gymnastic ever,
To stand the cold or heat, to take good aim with a gun, to sail a boat, to manage horses, to beget superb children,
To speak readily and clearly, to feel at home among common people,
And to hold our own interrible positions on land and sea."

"আমি নিজে এবং আমার আপজনেরা চিরদিনই ব্যায়াম-বীর,
ঠাণ্ডা আর গরম দুই সহ্য ক'রবার শক্তি থাকা চাই, বন্দুকের গুলি লক্ষ্যভেদ করবেই, নৌকা চালানো জানা চাই, দুষ্ট ঘোড়াকে শায়েস্তা করবার কৌশলও আয়ত্ব করতে হবে, জন্ম দিতে হবে, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সন্তানকে,
কথা বলার মধ্যে সঙ্কোচের অথবা জড়তার লেশ থাকবে না, জনসাধারণের সঙ্গে বাস করা চাই তাদেরই একজন হ'য়ে,
সমুদ্রে অথবা ডাঙায় যেখানেই বিপদ ঘটুক না কেন সেই বিপদের ধাক্কা সামলাবার ক্ষমতা থাকা চাই।"

বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে একজন মনীষী লিখেছেনঃ

The educated man is he whose first concern is not in reading about life, but in becoming a master of living.

হুইট্‌ম্যানের কাব্য পড়তে পড়তে আমার কেবলই মনে হয়েছে বুনিয়াদী শিক্ষার কথা। পুঁথিগত বিদ্যাকে হুইট্‌ম্যান মূল্য দিয়েছেন অল্পই।

তিনি বলেছেনঃ

I lead no man to a dinner-table, library, exchange.

তিনি জোর দিয়েছেন জীবনের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথে সম্মুখ থেকে সম্মুখের পানে চলার মধ্য দিয়ে নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উপরে, তিনি মূল্য দিয়েছেন বাঁচার আর্টকে রপ্ত করার কৌশলকে। যে ছেলে না জানে ঘোড়ায় চড়তে, না জানে নৌকা বাইতে, না পারে গান গাইতে, না পারে বন্দুক ছুঁড়তে—হুইট্‌ম্যানের প্রশংসা পাওয়ার যোগ্যতা সে ছেলে অর্জন করেনি। ডানপিটে ছেলে, জুতো শেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কাজে পাকা—এমনটা না হ'লে হুট্‌ম্যানের মন ভরে না।

কিন্তু হুইট্‌ম্যান যেখানে যুগের উপরে নূতন

ওয়াল্ট্‌ হুইট্‌ম্যান

আলোকপাত করেছেন সেখানে তাঁর কণ্ঠে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বন্দনাগান। আমাদের সমাজ-জীবনে যেখানে আমরা সমষ্টির সঙ্গে নবসূত্রে বাঁধা সেখানে সকলের প্রতি আমাদের একটা কর্তব্য আছে। সমাজের আর দশজনের কাছে আমাদের ঋণের গুরুত্বকে অস্বীকার করা চলে না;—হুইট্‌ম্যানও এই ঋণকে অস্বীকার করেন নি। 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'—এই পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে যে গভীর সত্য আছে তার স্বীকৃতি হুইট্‌ম্যানের কবিতার পর কবিতায়।

Come, I will make the continent indissoluble
With the love of comrades
With the life-long love of comrades.

বন্ধুর প্রতি বন্ধুর জীবনব্যাপী প্রেম দিয়ে একটা মহাদেশকে জয়, এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধবার স্বপ্ন কবিকে বারম্বার উতলা করেছে। যারা পরস্পরকে ভালবাসে শুধু তাদেরই স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে—এ বিষয়ে হুইট্‌ম্যানের মনে তিলমাত্র সংশয় ছিল না। হুইট্‌ম্যান ছিলেন মানবপ্রেমিক। সেই প্রেমের কাছে জাতিধর্মের কোন বিচার ছিল না। নিউইয়র্কের এক ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের

অন্যতম। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে হুইট্‌ম্যান আহতদের সেবার কাজ গ্রহণ করেছিলেন। একলক্ষ আহতদের সেবা করেছিলেন নিজের হাতে। প্রেমের জয়গান কেবল কবিতায় গান নি, যে-আদর্শে বিশ্বাস করতেন, জীবনে তাকে সর্বতোভাবে অনুসরণ করেছেন। পৃথিবীর আর কোন কবির জীবনে বাণীর সঙ্গে আচরণের এমন অদ্ভুত মিল ঘটেছে ব'লে আমাদের জানা নেই।

কিন্তু সত্যের আর একটা দিক আছে। সমষ্টির প্রতি যেমন আমাদের কর্তব্য আছে তেমনি একটা কর্তব্য আছে আমাদের ভিতরের মানুষটার প্রতি। আমাদের যিনি স্রষ্টা তিনি আমাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন একটা স্বাতন্ত্র্য দিয়ে যাকে আমরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বল্‌তে পারি। আমাদের কারও সঙ্গে কারও রুচির এবং স্বভাবের হুবহু মিল নেই। মানুষে মানুষে এই তফাৎ না থাক্‌লে দুনিয়াটা অত্যন্ত একঘেয়ে হ'য়ে যেতো। জগতে বৈচিত্র্য রয়েছে ব'লেই প্রাণের দীনতায় আজও সে অভিশপ্ত নয়। মানুষে মানুষে এই মৌলিক পার্থক্য আছে এবং একজন মানুষ দুনিয়াকে যা দিতে পারে আর কোন মানুষের পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই যারা প্রতিষ্ঠানের দোহাই দিয়ে, রাষ্ট্রের আর সমাজের প্রতি কর্তব্যের দোহাই দিয়ে মানুষকে ছায়ায় আর প্রতিধ্বনিতে পর্যবসিত করতে চায়, তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে করতে চায় অবলুপ্ত, তাদের মতো সাংঘাতিক জীব আর নেই। স্রষ্টা তো তোমাকে, আমাকে, আর সকলকে তৈরী করেন নি ব্যষ্টির জীবনের চিতাভস্মের উপরে সমষ্টি-জীবনের জয়ধ্বজাকে ওড়াবার জন্যে। ব্যষ্টি নিয়েই তো সমষ্টি। মানুষগুলো যদি ছোট হয়ে থাকে তবে দুনিয়াটা প্রগতিশীল হবে কিসের জোরে? উনুনে আগুনের জোর হবে কেমন ক'রে যদি কাঠ শুকনো না হয়? অবশ্য আগুনের জোর থাকলে তার মধ্যে দু' একখানা ভিজে কাঠ দিলেও তা ধ'রে যায়। ব্যষ্টির উপর সমষ্টির প্রভাবকে অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু কাঠগুলো যত শুকনো হবে আগুনের যে তত জোর হবে—এ সত্য অনস্বীকার্য। তাই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপরে হুইট্‌-ম্যানের এত জোর। হুইট্‌ম্যান গাইলেনঃ

I swear I begin to see the meaning of these things,
It is not the earth, it is not America who is so great,
It is I who am great or to be great, it is You up there, or anyone,
It is to walk rapidly through civilisations, government theories,
Through poems, pageants, shows, to form individuals,
Underneath all, individuals,
I swear nothing is good to me now that ignores individuals,
The American compact is altogether with individuals,
The only government is that which makes minute of individuals,
The whole theory of the universe is directed unerringly to one single individual, namely to You.

হুইট্‌ম্যান গাইলেন, ব্যষ্টির উপরে দাঁড়িয়ে আছে সব কিছু। পৃথিবীও বড়ো নয়, আমেরিকা বড় নয়। বড়ো আমি, বড় তুমি, বড়ো প্রত্যেকে। সেই গবর্ণমেণ্টই খাঁটি গবর্ণমেণ্ট যা প্রত্যেকটি ব্যক্তির পরিচর্যায় অতন্দ্র। বিশ্ব জগতের সমস্ত সত্যের গতি একটিমাত্র মানুষকে ফুটিয়ে তোলার দিকে—সে মানুষ তুমি।

এই যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ—এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদই হুইট্‌-ম্যানের কবিতার একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য। হুইট্‌ম্যান বলছেনঃ

I am for those that have never been master'd,
For men and women whose tempers have never been master'd,
For those whom laws, theories, conventions, can never master.

আমি আছি তাদেরই জন্য যাদের কেউ কোন দিন দাবিয়ে রাখ্‌তে পারে নি,
সেই সব নারী আর পুরুষের জন্য যাদের প্রকৃতি কারও বশ্যতা কখনো স্বীকার করেনি,
তাদেরই জন্য যাদের বশ মানাতে পারে না কোন আইন, মতবাদ অথবা প্রচলিত কোন প্রথা।

হুইট্‌ম্যান এই জন্যই চিরদিনই দেশে দেশে বিদ্রোহীদের কবি। চিরাচরিত পথ ছেড়ে নতুন পথে যারা যাত্রা করেছে তারা দুর্দিনের অন্ধকারে প্রেরণা পেয়েছে হুইট্‌-ম্যানের কবিতা থেকে। হুইট্‌ম্যান তাদেরই প্রিয়তম কবি যারা ভবিষ্যতের সঙ্গে আপনাদিগকে মিলিয়ে দিয়েছে—সে ভবিষ্যৎ জন্ম নেবার জন্য আজ সংগ্রাম করছে। যাদের

একটি ছুটির গল্প

প্রভাত দেব সরকার

যা দিনকাল পড়েছে তাতে নিজে থেকে খোঁজ-খবর করে আত্মীয়তা বজায় রাখা চলে না। আর আসা-যাওয়ায় যে-কুটুম্বিতা তা তো একরকম উঠেই গেছে। তুমি যদি দয়া করে এসে খোঁজ-খবর তত্ত্ব-তল্লাস কর খুশীই হ'বো, কিন্তু না-এলে আর অভিমান করবো না। জানি তো, আত্মীয়তার সম্বন্ধে বেঁচে থাকবার দিন চলে গেছে! —এখন যে কটা দিন বেঁচে থাকি শুধু নিজের জন্যে কোন মতে অজানা-অদেখা হ'য়ে দিনগত পাপক্ষয় করে'। মুখস্থ পাঠের মত দিন-রাত্রির আবর্ত্তে সংসারটা যত ঘুরছে আমিও তত বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ছি সবার থেকে। রোগে-শোকে এত নিজেকে অসহায় বোধ করি যে বলবার নয়। অনর্থক এই বাঁচায় তবু তো কত অর্থ আছে!

চাকরি করছি আজ দশ বছর। এই দশ বছরে দশের থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছি, নিজের সংসার বেড়ে একাই দশ হয়ে আছি। আর দশজনকে আমার দরকার কি!

ছুটিছাটা যা পাই তাতে সপ্তাভোর ছোটার হাঁপটা ফেলি, হয় ঘুমিয়ে, না হয় একটা-আধটা ছবির বই দেখে। কি বড় জোর গৃহিনী সমভিব্যাহারে কোন নামে বন্ধুর বাড়ী কিছুক্ষণ খোস গপ্প করে। তারপর আবার খাওয়া, আবার শোয়া, আবার অফিস করা। তিনশ' প'য়ষট্টি গাণিতিক ফলের মোটামুটি হিসাব এই-ই আছে। আমরণ হয়তো এই থাকবে, দিনের পর রাত্রি আর রাত্রির পর দিনের মত। বাঁধা মাইনের চাকুরে বাঁধাধরা জীবন—বৈচিত্রের মধ্যে দু পাঁচটাকা ইন্‌ক্রিমেণ্ট, দু পাঁচটা জন্ম, মৃত্যু!

লম্বা ছুটি কোনদিন বড় একটা নিইনি। যদি কোনদিন সখ করে নিয়েছিও দু পাঁচ দিন পরে বাতিল করে আবার কাজে যোগদান করেছি। শুধু শুধু অফিস কামাই করে আমার মত লোক আর কি মহাভারত রচনা করতে পারে! তা ছাড়া দেখেছি, এই ছুটি নেওয়ার ব্যাপাবে গৃহিনীর আপত্তিই বেশী—তাঁর কাজের অসুবিধা হয় আমি ছুটি নিয়ে বাড়ী বসে থাকলে। পাওনা ছুটি অমনি অনেক পচে গেছে।

সতৃষ্ণ দৃষ্টি মুমূর্ষু অতীতের দিকে তারা কখনও হুইট্‌ম্যানকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করতে পারবে না। একটা ঘুণধরা অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার যূপকাষ্ঠে উৎসর্গীকৃত জনসাধারণের পাশে দাঁড়াতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যারা তাদের কানে হুইট্‌ম্যানের কবিতা ঢালবে মধু। হুইট্‌ম্যানের কাব্য শৃঙ্খলিত যারা তাদের মনে আনে নূতন প্রভাতের আশা, যারা উৎপীড়ক তাদের মনে জাগায় বিভীষিকা। এই বিংশ শতাব্দীর ক্রোড়ে বসে আজ হুইট্‌ম্যানকে পড়বার আর একবার প্রয়োজন আছে—কারণ দেশে দেশে একদল মানুষ আজও ষড়যন্ত্র করছে কি করে দুনিয়ার বুকে শয়তানের আধিপত্যকে কায়েম রাখা যায়। এই আধিপত্যকে উন্মূলিত করে পৃথিবীতে যারা সাম্যের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার সাধনায় ব্রতী—হুইট্‌ম্যানের কবিতা চিরদিন তাদের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

তবু কিছু পাওনা বৎসরান্তে থেকেই যায়। ঠিক সখ না হ'লেও অভ্যেস বশে, অনেকটা মায়ায় (আহা, শুধু শুধু পচে যায় কেন)! এবার বেশ কিছু দিন ছুটি নিয়ে ফেলেছি। সংসারটা বড় আর অবস্থাটা নেহাৎ হীন না হলে সুবিধা মত কোথাও বেরিয়ে পড়ার অসুবিধা ছিল না। কিন্তু সুযোগ আর সুবিধা আমাদের জন্য নয়।

অঢেল সময়, খেয়ে ঘুমিয়ে শেষ করতে পারছিনে না। ছুটি নিয়ে প্রাণ আই-ঢাই। যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ার দুর্ভাবনায় একটা অজানা অস্বস্তি। আশ্চর্য, কাল-পরশুর 'আমিটা' যেন ছুটি পেয়ে গুলিয়ে গেছে। আরো একটা মজা, আমিই যে সেই শ্রীভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—ভাবতে এখন দ্বিধা হয়। ভয় হয়, ছুটিতে এই সত্যিকারের চাকরি না-থাকলে মনের কি অবস্থা হ'তো!

একদিন সকালে উঠে স্ত্রীকে বল্লুম, কি গো, আজ অফিসে যাব নাকি! আর ভাল লাগচে না।

স্ত্রী আড়চোখে চেয়ে হেসে বললেন, ঢঙ্। যাবার ইচ্ছে হয় যাবে, আমি কি জানি!

স্ত্রীর নির্লিপ্ত কণ্ঠে একটু অপ্রস্তুত বোধ করলুম। বল্লুম, না, তাই জিগ্যেস করচি। ঘরে বসে ছুটি নষ্ট করার কোন মানে হয় না।

সচিব-সখীর মত স্ত্রী এবার বললেন, কোথাও যাও না—ঘুরে এস কদিন!

অসহায়ের মত বল্লুম, কোথায় যাই বলদিকি?

স্ত্রীর এক মিনিটও দেরী হ'লো নাঃ কেন পিসিমার বাড়ী যাও না, অনেককাল তো খোঁজ-খবর নাওনি কোন। কাছেও আছে—

রথ-দেখা কলা-বেচার পক্ষে প্রস্তাবটা মন্দ নয়। আর আমার সামর্থের মধ্যে। ত্রিশ মাইলের মধ্যে কেবল বাস ভাড়ায় অবসর বিনোদনের পক্ষে জায়গাটা উপযুক্ত—বুড়ি-ছোঁয়া হ'য়ে ঘুরে আসা যাবে। ভাল লাগে ভাল, না-লাগলে ফিরতে আর কতক্ষণ।.........

অনেক দিন পরে হঠাৎ দর্শন দিয়ে বিধবা পিসিকে যেন উপকৃত করতে যাচ্ছি। এতদিন কোন কর্তব্য না-করার অপরাধটা যেন সশরীরে সন্দেশ লাভের সুযোগে খণ্ডন করতে চাইছি। মনে ভয়ও আছে, আবার অহং আছে, এই বাজারে আত্মীয়তা বজায় রাখছি তো। কটা লোক পারে!

কিন্তু বাস থেকে নেমে মনটা দমে গেল। আর তেমন যেন উৎসাহ পাচ্ছি না। কেবলি মনে হ'তে লাগল, কোন মুখে এতদিন পরে পিসিমার সামনে দাঁড়াব। নেহাৎ বেহায়া না হলে এমন আত্মীয়তা বোধ হয় কেউ করে না। পিসিমার কে আছে? একমাত্র উপযুক্ত ছেলে, এই তো সেদিন মারা গেল! উচিত ছিল সান্ত্বনা দিতে পিসিকে নিজেদের আশ্রয়ে এনে রাখা। তাও করিনি। এখন আমার সময় কাটচে না বলে তত্ত্ব করছি।

দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপে বাস-রাস্তা থেকে গাঁয়ের রাস্তা ধরলুম। আমার ছুটির অবসরের মত সামনে গাঁটা নির্জীব, নিরুৎসুক। না-আবাহন, না-বিসর্জনের মত নিরুৎসাহ। বছর দশেক পূর্বে ঠিক এমনটা ছিল না। ছুটী-ছাটায় এখানে এলে কারো না কারো সঙ্গে ঐ রাস্তার মুখে দেখা হ'তো, কুশল প্রশ্নে গ্রামে ঢোকবার ছাড়পত্র মিলতো। ঐ যে সরকারী বাঁধান পোলটা (বর্ষার জল নিকাশের জন্যে) ওখানে বসে গ্রামের দু'-পাঁচজন সকাল-সন্ধ্যে নিয়মিত জটলা করতো। নতুন মানুষ দেখলে পরম আতিথেয়তায় জিগ্যেস করতোঃ কোথায় যাবেন? মিত্তির বাড়ী? কোন মিত্তির? ও আমাদের খেঁদু? যান যান, সামনে আম-বাগানটা পেরিয়ে একটা সান-বাঁধান পুকুর দেখবেন—

নতুন লোক পাছে বুঝতে না পারে, পাছে মুশকিলে পড়ে, সঙ্গে আসতো কেউ-কেউ, রাস্তা থেকে কুটুমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহে। ছুটীর পর ফিরে গেলে ছবির মত মনে হ'তো এই গ্রাম পরিবেশকে।

সরকারী পোলটা আছে, তারা কেউই নেই। বসবার জায়গাটা সিমেন্ট উঠে খোঁদল হ'য়ে গেছে। একটু আগে সহর যাবার পিচের রাস্তাটা কিন্তু সাপের পিঠের মত মসৃণ। ঝিমোন রোদে নিঝুম আশ-পাশ। নেড়া মাঠে মাটি কামড়ে হাড় জিরজিরে ঐ যে গরুটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, এখন গ্রামের ছবিটা কতকটা ঐ রকম।

আমবাগানটা এখন বিধ্বস্ত; জানা না থাকলে বোঝ-বার উপায়ই নেই বাগান না মাঠ। পাঁচিল ভেঙে বেড়া উড়ে, গাছপালা উচ্ছেদ হ'য়ে বাগানত্ব ঘুচে গেছে। একটা হাঁটা-পথের রেখা নোনালাগা ভাঙা পাঁচিলের পাশ দিয়ে বাগানের বুকের ওপর অনধিকার-প্রবেশের মত চলে গেছে। কতদিন গ্রীষ্মের ছুটিতে পিসির বাড়ী এসে অটুট ঐ পাঁচিলের পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতুম রসনা তৃপ্তির আশায়—যথা ঘোষ বুড়োটা একবার অন্যমনস্ক হ'লে হয়। নিজের নয় তবুও বাগানের এই অবস্থায় মনে মনে কষ্ট পেলুম। ঘোষবুড়ো অনেককাল মরেছেন, কিন্তু ঘোষে-দের কি কেউ বেঁচে নেই, বাগানটার সংস্কার করে! অত গাছ কেটে কি হ'লো কে জানে—তক্তা না জ্বালানী কাঠ?

সানের পুকুরটায় আর সে শ্রী নেই। পাড় ভেঙে মজে-মজে পুকুরটা অনেক ছোট হ'য়ে গেছে। ভারি রোগ-

ভোগের পর গৃহিনীদের যে মূর্ত্তি হয়।—জলও অনেক কমে গেছে। একধারে বাঁধান তুলসীমঞ্চটা খট-খট করছে, আর একধারে বকফুলের গাছটা শুকিয়ে কাঠ—না ফুল, না ফল, না পত্রসম্ভার, 'নিরস তরুবর পুরত ভাতি।'

সন্তর্পণে চোখ ফিরিয়ে-ফিরিয়ে আশপাশ দেখে নিলুম। আট দশ বছর পরে কি যেন খুঁজছি, কি যেন দেখছি—হারান স্মৃতির মায়াবন্ধন সহস্র পাকে আমাকে এখন জড়িয়ে ধরেছে। কোলকাতায় আত্মসর্বস্ব শ্রীভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আত্মীয়সর্বস্ব হবার জন্যে আকুলি-বিকুলী করছে—বিগত দিনের অনেক স্মৃতি তাকে বিচলিত করছে। পিসিমার দেওরের বড় ছেলে নন্তু, বড় জায়ের মেজ মেয়ে উমা, ওপাড়ার কালি, গোকুল, ভোঁদা আর কে-কে- যেন, তারা কি সবাই এখানেই আছে? হ্যাঁ, এই সময় তো, সারা দুপুর সদরঘরে কি জটলাটাই না হ'তো। উমা কি ফর-মাসটাই না খাটতো—জল আনো, বাতাস কর, ঘামাচি মার, কুটুমের ছেলে তোমাদের বাড়ী বেড়াতে এসেছে যে! কে জানে কত বড় হ'য়েছে এখন মেয়েটা—তখন তো এগার-বার বছরের ছোটখাটো মানুষটি ছিল।

একলা একলা এসে অপ্রস্তুতের মত সদর দরজায় দাঁড়ালুম। খানিকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইলুম, ভুলে গেছি যেন কোথায় এসেছি, কেন এসেছি। চেনা জায়গায় এসে এমন অচেনার মত ইতস্তত জীবনে আমার এই প্রথম। ভাবলুম, ফিরে যাই—লাভ কারো নেই, আমি ছাড়া পিসিমার দিন যেমন চলছে তেমনিই চলে যাবে আর পিসিমা ছাড়া আমারো কিছু আটকাবে না। আজকের এই মুহূর্তটাকে বাদ দিলে এমন কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

বোধহয় বাড়ীর পরিচারিকাই হবে। কি কাজে বাইরে আসছিল, আমাকে ইতস্তত করতে দেখে প্রশ্ন করলে, কাকে চাই?

কি বলবো, এবাড়ীর কোন বাবুর নাম করবো না, নিজের পরিচয় দেবো? কারো নামই তো মনে পড়ছে না।

বল্লুম, বাড়ীর ভেতর গিয়ে বল, কোলকাতা থেকে ভুবনবাবু এসেছেন।

ভেবে বলিনি বলে বোধ হয় অভ্যর্থনা নিয়ে ঝি-এর ফিরতে দেরী হচ্ছিল। কেমন অস্বস্তি বোধ করলুম—এখানে উন্মুখ হ'য়ে আগ্রহ নিয়ে সত্যিই তো আমার দাঁড়াবার কথা নয়। আমার আগমন বার্তায় গৃহস্থের খুশী হবারও কথা নয়। তবু অভিমানে ক্ষুন্ন হই অভ্যর্থনার বিলম্বে।

খানিক পরে পিসিমা এলেন। কিন্তু আর সে পিসি নেই, শুধু দীন হীন নয়, কেমন জবুথবু ম্লান। শুধু কি শোক তাপ, আর কিছু নয়—যার জন্যে অমন মূক হয়ে গেছেন?

এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে পিসিমা অস্ফুটে জিগ্যেস করলেন, ভাল আছিস?

কি জানি কেন নিজের ভাল থাকার কথাটা উচ্চারণ করতে বাধল। চুপ করে রইলুম।

পিসিমা ডাকলেন, আয়, ভেতরে আয়।

কেমন সঙ্কোচ বোধ করলুম। দশ বছর আগে যা অবাধে পারা যেত এখন যেন তা পারা যায় না। আত্মীয় কুটুম্ব হ'লেও আমাদের স্থান আর অন্দর মহলে নয়। সম্বন্ধ খুইয়ে ফেলেছি।

মাথা নীচু করে পিসিমার পিছনে পিছনে বাড়ীর ভিতর এলুম। ভিতরের দীনতাটা যেন আরো প্রকট—দালান-মেজের ইঁট খসে চটা উঠে কিম্ভূত-কিমাকার হ'য়ে আছে। ঘরের মেজে খোয়া ওঠা।

পরিচিত জানা-শোনা কেউ এল না, কাউকে কাছে পেলুম না। একলা একলা ঘরে বসে চুণবালি-খসা কড়ি-কাঠের দিকে চেয়ে অনেক কথাই ভাবতে লাগলুম—সত্যি-কারের পিসিমার এই অবস্থার জন্যে আমাকে কোন মতে দোষী করা যায় কি না। আর গেলেও তার জবাবদিহি কারো কাছে হ'তে হ'বে কি না। আমার কি দোষ, সবই তো কালের খেলা! জানালার বাইরে চোখ গেল, মনটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগল। হঠাৎ যেন নজর পড়ল, কি যেন জানালার নীচে দেখতে পাচ্ছি না, কারা যেন ওখান থেকে সরে গেছে। মনে পড়ল, লেবু গাছের ঝোপটা ওখানে নেই—মরে বোধ হয় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে।

পিসিমা ঘরে ঢুকতে ছেলেমানুষের মত ঔৎসুক্য প্রকাশ করলুম, হ্যাঁ পিসিমা, লেবুগাছগুলো কি হ'লো?

নিরুৎসুক কণ্ঠে পিসিমা বললেন, মরে গেছে।

তবুও আমার ঔৎসুক্য নিবৃত্ত হয় না ঃ অত গাছ মরে গেল?

পিসিমা তেমনি বললেন, হাঁ। আজ নাকি, কবে!

এরপর আর কিছু জিগ্যেস করা বোকামি। দশ বছর পরে সব কিছুর একই অবস্থা দেখার আশা বৃথা। আরো মনে হ'লো, আমার এ আগ্রহ যতই আন্তরিক হোক না কেন, পিসিমার ভাল লাগেনি। সামান্য লেবুগাছ নিয়ে এত আগ্রহ শোভা পায় না।

প্রসঙ্গান্তরের জন্যে জিগ্যেস করলুম, নন্তু খাঁদা এরা সব কোথায়?

পিসিমা বললেন, কোলকাতায়!

তবু জিগ্যেস করলুম, দেশে থাকে না কেউ?

না, দরকার কি! নির্লিপ্ত কণ্ঠে পিসিমা জবাব দিলেন। সত্যিই তো দরকার না থাকলে লোকে দেশে থাকবে কেন, ভিটে-ভদ্রাসন সংস্কার করবে কেন! মনে পড়ল, আজ একটা সাধারণ ছুটির দিন। শহর থেকে এত নিকটে তবু গ্রামে চাকুরে বাবুদের কোন সাড়া শব্দ নেই। বেশ বোঝা যায়, গ্রামবাসের আর কোন মোহ নেই,—সস্তাগণ্ডা, স্বাস্থ্য, কোনটাই এখন মিলবে না। খাঁ-খাঁ করছে নেহাৎ কতকগুলো হতভাগ্যার জন্যে গ্রাম এখনো।

অনেকদিন পরে দেখাশোনার যে আত্মীয়তার প্রত্যাশা করেছিলুম তা মিথ্যে কল্পনা। আর কার সঙ্গে আত্মীয়তা হ'বে!

একলা একলা ভাল লাগছিল না। বেরিয়ে পড়লুম এদিক-ওদিক ঘুরে দেখবো বলে। দু এক পা এগিয়ে কেমন বেদনার সুর অনুভব করলুম। নির্জন গ্রামপথ কি যেন বেদনায় স্তব্ধ। অশ্বত্থতলায় বাঁশ বাঁখারির তৈরী বসবার আসনটা ভেঙেচুরে ধ্বংস হ'য়ে গেছে, বুড়ো গাছটার ঝাঁকড়া মাথা অনেকটা পাতলা হ'য়ে গেছে। অদূরে গাজনতলাটা কাঁটাগাছে ভরে গেছে, শিবের ঘরে বৎসরান্তে বাতি দেবার লোকও নেই, উপায়ও নেই। আমার গ্রাম নয়, বাঙলা দেশের কোন গ্রামের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই, তবু কষ্ট হ'লো এই শ্রীহীনতায়, এই দীনতায়।

একে একে অনেক দুঃখ অনেক কষ্ট পিসিমার চোখে পড়ল। কোলকাতায় ভাইপোর আদর যত্নের জন্যে তিনি বিশেষ ব্যস্ত হয়েছেন বোঝা গেল। হয়তো তিনি ভেবে নিয়েছেন, দু মুঠো মুড়ি আর দুটুকরো নারকেলকুচোতে ভাইপোর আর মন উঠবে না। চোখে না দেখলেও মনে মনে বুঝছিলুম পিসিমার এই সাধ্যের অতিরিক্ত প্রাণান্তকর চেষ্টা। ছেঁড়া আঁচলের ঘোমটা সামলানর মত।

বার বার পিসিমাকে ঘর-বার হাঁক ডাক করতে দেখে এক সময় বললুম, থাক না, পিসিমা—তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন!

পিসিমা কোন উত্তর না করে মুখের দিকে চাইলেন শুধু। অত্যন্ত করুণ আর অসহায় সে-চাহনি। মনে হ'লো, এসে ভাল করিনি। যে-যেমন ছিল তেমনি থাকলেই ভাল হ'তো।

খানিক পরে পিসিমা অশ্রুমোচন করলেন, তোর দাদা থাকলে কি আর বলতে হ'তো! সব খেয়ে বসে আছি!

যা ভয় করেছিলুম। তাড়াতাড়ি বললুম, আমাকে তুমি কুটুম ঠাওরালে! খোঁজ-খবর নিতে পারিনি সে নিজের সংসারের জন্যে, না হ'লে—

মনে হ'লো মিথ্যে কথা। বলবার আমার কিছু নেই নিজের স্বার্থপরতার কথাটা আর মুখ ফুটে বলি কি করে. জানি পিসিমা বিশ্বাস করবেন না, তবু বললুম, জান তো সব ঝক্কি আমার ঘাড়ে পড়েছে বাবা মারা যাবার পর। ইচ্ছে থাকলেও কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠে না।

পিসিমা অশ্রুমোচন করে বললেন, আমাদের ভাগ্যটাই খারাপ, তোরা কি করবি!

চুপ করে থাকা ছাড়া এ অভিযোগের উত্তর দেবার কিছু নেই। ভাগ্যই তো! তা না হ'লে অমন পিসির বাড়ীর আজ এই অবস্থা হয়! বেশী দিনের কথা নয়, ধনে-জনে পূর্ণ সংসার আজ খাঁ-খাঁ করছে। দিন চলে না আজ এমনি অবস্থা! কেন জানি না, নিজেকে বার বার অপরাধী আর কুণ্ঠিত মনে হচ্ছিল। হয়তো সুখের দিনে ভোগ করে, দুঃখের দিনে গা-আড়াল দিয়েছি বলে। কে জানে পিসিমা আমাদের অকৃতজ্ঞ মনে করছেন কি না।

খেতে খেতে কি দুর্মতি হ'লো, চালের দাম জিগ্যেস করলুম, এখানে এখন চাল কতো করে?

প্রথমটা মনে হ'লো পিসিমা শুনতে পান্‌নি, আবার জিগ্যেস করলুম।

মনে হলো পিসিমা ক্ষুব্ধ হয়েছেন আমার প্রশ্নে। বললেন, কত আবার? প'য়ত্রিশ-চল্লিশ!

অবিশ্বাসের সুরে শিউরে ওঠার মত বললুম, সেকি! কোলকাতায় তো সাড়ে সতের!

পিসিমা এমনভাবে বললেন যেন শ্লেষ মনে হ'লোঃ চকমাণিক তো আর কোলকাতা নয়!

কোলকাতায় বাস করার জন্যে আজ এই প্রথম লজ্জা পেলুম।

পিসিমা অতশত বোঝেন না। পাখার বাতাস করতে করতে এমনি বললেন, আর ক'দিন পরে পঞ্চাশ হ'বে। ধান চাল কি আর তেমন হ'চ্ছে আজকাল!

অধিক শস্য ফলাবার যাঁদের দায়িত্ব তাঁরা ভাববেন। আমরা শুধু জানি, যা হবার তাই হ'বে, ধান হ'লেই বা কি আর না হ'লেই বা কি! সহরে চালের দাম আজকের গাঁয়ের দামের মত হ'লে না হয় ভাবা যাবে তখন! খাদ্য বরাদ্দ মারে কে!

আরো অনেক কথা উঠলো। পাড়াগাঁয়ে বাস করার সুখ-দুঃখের কথা। পিসিমা এমন করে বলতে লাগলেন যেন কোলকাতায় ফিরেই আমি একটা ব্যবস্থা করতে

পারবো। কোন একটা সরকারী অফিসে চাকরি করি বলে যেন সরকারকে চালাবার ক্ষমতা আমার আছে। একদিন সরকারী চাকরির জন্যে অনেক কাঠখড় পুড়িয়েছিলুম, আজ মনে হচ্ছে সেই কাঠখড়ের খরচটা ভবিষ্যতের জন্যে রেখে দিলে কাজে দিতো। আপশোষ আর লজ্জার একশেষ।

তবু পিসিমাকে আশ্বাস দিইঃ সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার ধনধান্যে পুষ্পে ভরে উঠবে।

পিসিমা কি বুঝলেন, ভগবান জানেন। আর তাঁর বিশেষ লাভ হবে বলে মনে হয় না, বিশ্বাসও করেন না। তবু মন দিয়ে শুনলেন।

পিসিমাকে বললুম, চল না কিছুদিন আমার ওখানে গিয়ে থাকবে। এখানে একলা-একলা ভাল লাগে?

কি ভাবলেন পিসিমা। খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, না আর কোথাও যাব না। যে কটা দিন বাঁচি এইখানেই থাকবো।

পেড়াপিড়ি করবার মুখ নেই বলেই বোধ হয় আর অনুরোধ করতে পারলুম না। জানি কোন লাভ হবে না।

আমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে যেন পিসিমা বললেন, কোলকাতা আমার ভাল লাগে না, ঐটুকুর মধ্যে হাত-পা মুড়ে বাস করা। বেশ আছি এইখানে, খাই-না-খাই নিঃশেষ ফেলে বাঁচি। মনটা যখন নেহাৎ হু-হু করে তখন ঐ সদর রাস্তার ধারে গিয়ে বসি, বাস-লরী দেখি।

আমার চোখে জল এল। কি বলবো কি করবো ভাবতে পারছি না। আমার কোন কথাই তাঁর গ্রাহ্য নয়।

তবু বলি, চল না দিন কতকের জন্যে, ভাল না লাগলে ফিরে আসবে।

পিসিমা নিরুত্তর, স্তিমিত চোখে অভিমান-বর্ষতার দ্বন্দ্ব! অবশেষে বললেন, যাব একদিন, আজ নয়—এবার গঙ্গা চান করতে গেলে তোর ওখানেই গিয়ে উঠবো। ঠিকানাটা দিয়ে যাস।

অভিমান আমারও কম হয়নি, এত করে বলেও রাজী করাতে পাচ্ছি না। যাকগে, বলবার দায় বললুম—কার কি?

বিকালে ফেরবার সময় দেখি একবোঝা জিনিসপত্তর। সংসারের নিত্য-প্রয়োজনীয় তরীতরকারী। বললুম, এসব কি?

পিসিমা বললেন, বৌমা ছেলেপুলের জন্যে নিয়ে যা। দেবার তো আর কিছু নেই—

কি জানি কেন আজ এগুলো নিতে বড় লজ্জা করছে। কিছু দিতে পারিনা যেখানে, সেখান থেকে হাত পেতে কিছু নিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। তা ছাড়া ঐ সম্বল করে পিসিমার কটা দিন চলে যেতে পারে।

কিন্তু কোন আপত্তিই আমার খাটলো না। উপঢৌকনের বোঝাটা সঙ্গে নিতে হলো। পিসিমা কিছুতে ছাড়লেন না। পিসিমা হয়তো কিছু ভেবে দিচ্ছেন না, কিন্তু আমার ভাবনার অন্ত নেই—কোথায় বাধছে ঠিক বোঝাতে পাচ্ছি না।

ঠিক বেরবার মুহূর্তে পিসিমাকে কিছুক্ষণের জন্যে পাওয়া গেল না। বোধ হয় ভাইপোকে আরো কিছু উপহার দেবার জন্যে তিনি ব্যস্ত আছেন। কি খেয়াল হলো, ঘর থেকে বাইরে এসে ভাঙা রোয়াকের ওপর দাঁড়ালুম। রোদ পড়ে গেছে, চোখের সামনে বাঁশ ঝাড়ে আগুন ধরেছে, পাশে আম-পাকুড়ের বাগানটা পোড়ো বাড়ীর মত গম্ভীর দেখাচ্ছে। মনে হলো, এ বাড়ীতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই—এ-ও একটা পোড়ো বাড়ী। গায়ে কাঁটা দিল, সঙ্গে সঙ্গে আমার আশপাশে শব্দহীন উচ্চ কণ্ঠে কারা যেন কিসের ব্যস্ততায় চকিত হয়ে উঠলো। অনেক কণ্ঠস্বরের সঙ্গে অস্পষ্ট পরিচয়ও আমার আছে। হঠাৎ হাড়-পাঁজরা বার-করা ইঁটকাঠের বাড়িটা জ্যান্ত হয়ে উঠলো।

চোখ নামাতে বিভ্রম কাটলো। এটুকু বোঝা গেল উপস্থিত এ বাড়ীতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। পিসিমা না-আসা পর্যন্ত ঘরে গিয়েই বসি ততক্ষণ।

পা বাড়িয়েছি, একটা ছায়া মূর্তি সামনে এগিয়ে এল। পরিধানের বস্ত্র শুধু জীর্ণই নয়, মলিন, দীন-দুঃখীর মত মাথার চুল রুক্ষ। হয়তো সধবা।

আমি কিছু বলবার আগেই মূর্তিটি বললে, আমাকে চিনতে পারছেন না?

মিথ্যে কথাটা আর উচ্চারণ করলুম না।

মূর্তিটি বললে, আমি উমা!

যা খুশী হ'তে পারে। কে উমা, কোন উমা এখন প্রশ্ন করে আর আত্মীয়তা ক'রতে রাজী নই।

তবু উমা ম্লান হেসে আত্মীয়তা করতে চাইলে, এরি মধ্যে ভুলে গেলেন!

ভুলিনি ভোলার ভান করছি। কি লাভ এখন উমাকে চিনে নিয়ে। একদিন সে আমায় অনেক সেবা অনেক আতিথেয়তা করেছিল, কিন্তু তাতে কি—আজ যা তার অবস্থা তাতে কিছুরই প্রত্যাশা করা চলে না। সুতরাং ঢোক গিলে খাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

তবু উমা নাছোড়বান্দা, চেনা সে দেবেই—অনেক পুরোন কথা তুললে, অনেক নিস্তব্ধ দুপুরে তার সঙ্গে ছেলেখেলার কথাও উল্লেখ করলে।

হাসলুম, স্মৃতির যদি কোন মূল্য না থাকে আমার এ হাসিরও কোন মূল্য নেই।

বাস রাস্তায় এগোতে এগোতে পিসিমার কাছে উমার বর্তমান অবস্থার কথা শুনেছিলুম। হতভাগী স্বামী পরিত্যক্তা, বিয়ের দু বছর পরে আধুনিক ভব্য স্বামী ওকে ত্যাগ করেছে—উমা গেঁয়ো অশিক্ষিতা। এখন কলকাতাবাসী ভায়েদের গলগ্রহ হ'য়েছে—তারা দয়া করে যা পাঠায় তাতেই কোনরকমে চলে যায় কষ্টেসৃষ্টে। ঐ পাগলের মতই থাকে। এখন ও-ই ভায়েদের ভিটে আগলায়।

সন্ধ্যে হয়ে গেলেও মাঠে আলো ছিল। চলন্ত বাস থেকে সেই আলোয় গ্রামটাকে দেখে নিলুম। নিঝুম, নিস্তব্ধ, হতচেতন। হঠাৎ উমার কথা মনে হ'লো।—কি দোষে ওর অমন অবস্থা হ'লো? অত সেবা অতিথিকে কি কেউ করতে পারতো ঐ বয়েসে?

কি জানি কেন মনে হ'চ্ছে, পিছনে অপসৃয়মান গ্রামের ছবিটা উমার মতই দীন, হীন।

যাযাবর হাঁস

সুনীলকুমার নন্দী

খর রৌদ্র মুছে ফেলে শিশিরের জলে নেয়ে মায়াবী আশ্বিন
এলো কী? কিশোরী হাওয়া নরম ফুলের ঘ্রাণে হ'য়েছে চঞ্চল
নদীর শিয়রে শুভ্র কাশবনে, মেঠো পথে ;—ক্লান্তি-ঝরা-দিন
খুসিয়ালী গানে গানে হঠাৎ মদির আহা। পদ্ম-দীঘি-জল
ফেলে রেখে স্বপ্ন-হাঁস হৃদরের হ্রদে নেমে উতরোল ঢেউ
তুলেছে। পাখায় তার অভিজ্ঞান ঝিলকায়ঃ আহ্নিক জীবন
থমকে স্মৃতির হাতে আবছায়া ছবি আঁকে;—
জানে না তো কেউ
দুমঠো জলের বুকে সমুদ্র-স্বাদের মতো' হলুদাভমন
ফেরারী নীলাভ ছায়া ফিরে পেলো। ধু ধু মরু রজনীগন্ধার
স্পর্শের বিস্ময়ে কাঁপে। আশ্বিনের হিম-স্নিগ্ধ মেদুর
হাওয়ায়
ভেসে আসা যাযাবর হাঁসের পাখার ছায়া হয় তো আবার
মৃত্যুর পাহারা রেখে অঘ্রাণের ম্লান নীল ঘন কুয়াশায়
উড়ে যাবে। স্বপ্ন-হাঁস না হয় উড়ুক! তবু, তবু দন্ড কয়
ঝিলিমিলি ঢেউ তোলে তার ওই পাখার স্পর্শে কাঁপিশ
হৃদয়।

গোধূলী

সন্তোষকুমার অধিকারী

তারপরে একদিন স্বপ্ন শেষ হ'বে।
তারপরে এত হাসি এত প্রেম অভিমান
সকলি ফুরোবে!

তবে কি আমরা আর বলবোনা হৃদয়ের কোনো
কথা? তবে কি তবে কি নীরবেই বয়ে যেতে দোবো
জীবনের কলগান? প্রাক্‌রাত্রি আকাশে কখনো
জাগ্‌বেনা গোধূলিবিচিত্র ; মন নিঃশেষে ফুরোবো?

আকাশে তখনো ছিন্ন ছায়াপথে যদি থাকে রঙ্‌
বিগত দিনের? কিম্বা হাওয়াদের চকিত গুঞ্জন্‌
যদি ঠেলে দ্বার? যদি কোন এক পলাতক মন
হঠাৎ হৃদয়ে এসে চুপি চুপি বাজায় সারং!!
তাহ'লেও সে মন হারাতে দেবো আকাশধূসরে;
বরং বেদনা ভালো; তবু নিত্য ভগ্ন মনোভারে
কাঁদাকাঁদি—সইবেনা। দিনশেষ গোধূলিবাসরে
ভুলে যাওয়া চেতনাকে বরং হারাই একেবারে।

নব্যশিক্ষা ও দেশ-জ্ঞান

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চল্লিশ বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশে নবজাগরণের সূচনা হয়। নব্যশিক্ষা—তথা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা দ্বারাই যে তখন ইহা সম্ভব হইয়াছিল তাহা এখন কাহাকেও নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হয় না। শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি নানাদিকেই নব নব জিজ্ঞাসা আমাদের মনে উদিত হয় এবং নিজ নিজ জ্ঞান বিশ্বাস মতে নব্যশিক্ষিতেরা তাহার সমাধানেও অগ্রসর হন। ইংরেজী শিখিলেই আমরা 'চাকুরি' পাইব, অথবা 'চাকুরি'র জন্যই আমরা ইংরেজী শিখিব এরূপ ধারণা তখনও বাঙালীদের মনে বদ্ধমূল হয় নাই। তবে হিন্দু কলেজ ও অন্যান্য ইংরেজী বিদ্যালয়-সমূহে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের সরকার বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ করিতে ক্রমে আরম্ভ করিলেন। অনেক খরচে কাজ উসুল করার জন্যই তাঁহারা এরূপ করিতে প্রলুব্ধ হন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকার স্পষ্টতঃই ঘোষণা করিলেন যে, সরকারী কর্মে নিয়োগে ইংরেজী শিক্ষিত যুবকগণকে অগ্রে সুযোগ দেওয়া হইবে। ইহার পর হইতে এই রীতি বরাবর চলিয়া আসিয়া 'চাকুরি'র জন্যই আমরা ইংরেজী শিখি এইরূপ ধারণা শ্রেণী ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল বাঙালীর মনে দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছিল। আজিও এই মনোভাবের জের চলিতেছে।

বাংলার নবজাগৃতির মূলে যে তখনকার নব্যশিক্ষা একথা এইমাত্র বলিলাম। নব্যশিক্ষা লাভ করিয়া বাঙালীরা আহৃত জ্ঞান গৌরজন'কে পরিবেশন করার জন্যও উদ্গ্রীব হইয়াছিল, কখনও এককভাবে আবার কখনও সংঘবদ্ধভাবে। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ পাঠ্যাবস্থায়ই নিজ নিজ পল্লীতে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া প্রতিবেশী সন্তানদের বিদ্যাদান সুরু করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা সভা-সমিতি গঠন করিলেন সামাজিক জীবনের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা নিমিত্ত। পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় ইহার একটি উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু ইহার মূলে ছিল দেশ-প্রীতি। দেশ-প্রীতি বা দেশ-প্রেম এ কথাগুলির তখন তেমন চলন হয় নাই বটে, তবে স্বদেশের উন্নতিসাধন স্পৃহাই যে তাঁদের সকল প্রয়াসের প্রেরণা যোগাইত একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। আজিকার দিনেও ইহা আমাদের নিকট কেমন আশ্চর্য ঠেকে। ইংরেজীতে এই মর্মের একটি কথা আছে—চিন্তা কর্মের নিয়ামক। স্বদেশের উন্নতিচিন্তা যে স্বদেশের হিতকর্মে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা দান করিয়াছিল একটি প্রতিষ্ঠান বা সংঘ হইতে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই সংঘটি সম্বন্ধেই এখানে বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

২

সে কালের শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক সভা-সমিতির যাঁহারা খোঁজখবর রাখেন তাঁহারা হিন্দু কলেজের ছাত্রদের একাডেমিক এসোসিয়েশনের কথা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। ছাত্র-যুবকদের সংঘবদ্ধভাবে স্বদেশের হিত-চিন্তার সূত্রপাত হয় এখানে। সভাটি প্রায় দশ বৎসর চলিয়া ১৮৩৯ সন নাগাদ উঠিয়া যায়। এই দশ বৎসরের মধ্যে উক্ত এসোসিয়েশনের সভ্য-ছাত্রগণ বিবিধ কর্মে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেহ সরকারী কর্ম গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় বা মফস্বলে চলিয়া গিয়াছেন, কেহ শিক্ষাব্রত অবলম্বন করিয়া পঠন-পাঠনে নিযুক্ত, কেহ সাংবাদিক হইয়াছেন, আবার কেহ-বা ব্যবসা-কর্মে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু যখন যে কার্যেই তাঁহারা লিপ্ত থাকুন, স্বদেশের উন্নতি-চিন্তা তাঁহাদের অধিকাংশ কর্মেরই ছিল নিয়ামক। কলিকাতাস্থিত হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রগণ অগ্রবর্তী হইয়া তাঁহাদের এই ভাবনাকে একটি সংঘের মধ্যে দিয়া স্পষ্ট রূপ দিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই প্রয়াসের ফল—'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'। ইহার ইংরেজী নাম বড়ই দীর্ঘ—Society for the Acquisition of General Knowledge। আমরা পরবর্তী সময়ে বঙ্গদেশে এইরূপ বহু সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করি। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র কথা এখানে বলিতেছি না। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইহার কর্মসূচীর অন্তর্ভূত হইলেও ইহার লক্ষ্য ছিল ভিন্ন। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র মত পার্সীভিয়ারেন্স সোসাইটি',

'বেথুন সোসাইটি', 'ফেমিলি লিটারারি ক্লাব', 'ভবানীপুর লিটারারি এসোসিয়েশন', 'সোশ্যায়াল সায়ান্স এসোসিয়েশন' প্রভৃতি সভা-সমিতি পর পর স্থাপিত হইয়াছিল। 'কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি', 'ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাক্ট সোসাইটি' বা 'ভার্ণাকুলার ট্রান্স্লেশন কমিটি' ঠিক এ পর্য্যায়ে পড়ে না বলিয়া উল্লেখ করিলাম না।

পূর্বেই বলিয়াছি, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার প্রধান উদ্যোক্তারা ছিলেন হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদল। ১৮৩৮ সনের ২০শে তারিখে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি-পত্রে ('Circular') স্বাক্ষর পাইতেছি এই পাঁচ জনের: তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং রাজকৃষ্ণ দে। এই বিজ্ঞপ্তি-পত্রখানি অন্যত্র* হুবহু প্রকাশিত করিয়াছি। সভার উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। স্বাক্ষরকারিগণ বলেন যে, আমাদের বিদ্যালয়সমূহে যে-সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, পরবর্তী কালে কর্মজীবনে প্রবেশের পর চর্চার অভাবে তাহা তাহারা ক্রমশঃ ভুলিয়া যায়, সে-সব বিষয়ে জ্ঞান বর্ধিত ও প্রসারিত হওয়া দূরে থাকুক। অধিগত বিদ্যা এভাবে সমাজেরও কোন কল্যাণে আসে না। ইহার উন্নতির সম্ভাবনাও দূরে সরিয়া যায়। তাঁহারা বলেন, এই অভাব পূরণ করিবার জন্য —বিদ্যা-চর্চা বৃদ্ধি এবং সংঘবদ্ধ প্রয়াসে প্রবৃত্তি উভয়ই বর্ধনকল্পে একটি সভা গঠন করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের কথায়—

"If a tree is to be known by its fruits, where, with but one or two solitary exceptions, are the fruits to which we can point with pride and satisfaction, as manifesting any degree of intellectual energy or extent of learning? We have ever sincerely regretted the want of an Institution which should be the means of promoting mutual intercourse among the educated Hindoos and of exciting an emulation for mental excellence. There is at present no occasion whereby we are ever called upon to congregate on an extensive scale, for the purpose of mutual improvement and whence we may require an impetus for applying ourselves to useful studies. It is not then desirable to unite in such a laudable pursuit by which the bonds of fellowship may be strengthened, the acquisition of knowledge promoted, and the sphere of our usefulness extended?"

স্বাক্ষরকারিগণ বিজ্ঞপ্তি-পত্রে কর্মপ্রণালীরও খানিকটা আভাস দিয়াছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দেশোন্নতি বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে মধ্যে মধ্যে এই সভায় প্রবন্ধ পাঠ করা হইবে, বা মৌলিক বক্তৃতা দেওয়াও চলিবে। লেখক বা বক্তা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণন দ্বারা সাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা করিবেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে এমন কে আছেন যিনি নিজের বা দেশের উন্নতি চান না? তাঁহারা বলেন যে, সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক রামকমল সেনের নিকট হইতে সভার অধিবেশনসমূহের জন্য কলেজ-হল ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে, এবং ১৮৩৮, ১২ই মার্চ দিবসে সভা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ সভা হইবে।

৩

বিজ্ঞপ্তি-পত্র বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এবং নব্যশিক্ষিত যুবকদের মধ্যে প্রচারিত হয়। যথারীতি সভার অধিবেশন হইল। এই সভার একটি বিস্তৃত বিবরণ অন্যতম উদ্যোক্তা রামগোপাল ঘোষের একখানি পত্র* হইতে জানা যায়। নির্দিষ্ট দিনে (১২ই মার্চ ১৮৩৮) সংস্কৃত কলেজ হলে তিন শতাধিক যুবক নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। নানারূপ আলাপ-আলোচনার পর পূর্বোক্ত নামে ও পূর্ব প্রচারিত উদ্দেশ্যে সভা গঠিত হইল। নব্যবঙ্গের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের লইয়া অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হয়। সভাপতিপদে বৃত হইলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী; সহকারী সভাপতি—কালাচাঁদ শেঠ এবং রামগোপাল ঘোষ; সম্পাদক—রামতনু লাহিড়ী ও প্যারীচাঁদ মিত্র; কোষাধ্যক্ষ—রাজকৃষ্ণ মিত্র। এতদ্ব্যতীত সদস্য হন ছয় জন—পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন, মাধবচন্দ্র মল্লিক, প্যারীমোহন বসু, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজকৃষ্ণ দে। মাধবচন্দ্র মল্লিক অল্পদিন পরেই সদস্য পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। সর্বোপরি ডেভিড হেয়ার, 'ভিজিটর' বা দর্শকের সম্মানিত পদে বৃত হইলেন। এই প্রারম্ভিক সভায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের

*"জাতি-বৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ", পৃঃ ৫০—৫৩

**General Biography of Bengal Celebrites Both Living and Dead, by Ramgopal Sanyal, pp. 169-72.*

ছাত্রগণও ভিড় জমাইয়াছিল। রামগোপাল উক্ত পত্রে তাঁহাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার কথাও ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

সভা পরিচালনা সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম ধার্য হয়। সভ্যদের চাঁদা দেওয়া ইচ্ছাধীন, সভা মাসে একবার করিয়া হইবে, প্রতি মাসের দ্বিতীয় বুধবার সন্ধ্যায় সভা বসিবে—এরূপ উল্লেখ কতকগুলি নিয়মে ছিল। প্রবন্ধ-পাঠ বা বক্তৃতা-দান সম্বন্ধে বাধ্যবাধকতা ছিল। পরবর্তী অধিবেশনে কি বিষয়ে প্রবন্ধ-পাঠ হইবে তাহা পূর্বদিনের অধিবেশনে বিঘোষিত করা হয়। উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে বক্তা অনুপস্থিত হইলে তিরস্কৃত হইবেন—একটি নিয়মে এরূপ কথাও ছিল। প্রবন্ধ-পাঠ বা বক্তৃতা-দানের পর আলোচনাও চলিত। মোট কথা, এসিয়াটিক সোসাইটির আদর্শেই এই নিয়মগুলি রচিত হইয়াছিল। তবে নিয়ম-সংখ্যা ছিল অতি কম, মাত্র পনেরটি।

যাহা হউক, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার প্রতিষ্ঠা ও নিয়মকানুন রচনার পর প্রথম সাধারণ মাসিক অধিবেশন হয় প্রায় দুই মাস পরে, ১৮৩৮ সনের ১৬ই মে তারিখে। অধ্যক্ষ-সভার অন্যতম প্রধান সদস্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রথম অধিবেশনে ইতিহাস পাঠের উপকারিতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। এদিন ঝড়বৃষ্টি সত্ত্বেও অন্যূন একশত যুবক তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য সংস্কৃত কলেজ-হলে সমবেত হইয়াছিলেন। সংবাদ-পত্রেও সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাহির হয়। এই বক্তৃতাটি সম্বন্ধে রামগোপাল ঐ পত্রে লিখিয়াছেনঃ

"It is remarkable for its chaste and elegant language as well as for the varied information with which it was replete. The illustrations were apt and striking, and were chiefly drawn from ancient History."

৪

সভায় ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রবন্ধ-পাঠ বা বক্তৃতা-দান চলিত। এখানে প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহ অধ্যক্ষ-সভা কর্তৃক তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়, যথাক্রমে ১৮৪০, '৪২ ও '৪৩ সনে। প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত রচনা বা বক্তৃতাবলীর চৌদ্দটির মধ্যে পাঁচটি লিখিত বা প্রদত্ত হয় আমাদের মাতৃভাষা বাংলায়। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিই ছিল বাংলায়। ১৮৩৮, ১৩ই জুন "এতদ্দেশীয় লোকদিগের বাঙ্গলাভাষা উত্তমরূপে শিক্ষাকরণের আবশ্যকতা বিষয়ক প্রস্তাব" "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়" সম্পাদক উদয়চন্দ্র আঢ্য কর্তৃক পঠিত হয়। শতাধিক বৎসর পূর্বে বঙ্গসন্তানেরা যে বাংলা ভাষা অনুশীলনের এবং শিক্ষার বাহনরূপে ইহার প্রয়োগের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এই বক্তৃতা হইতে তাহা সম্যক্ বুঝা যাইতেছে। ১৮৩৮ সনে প্রদত্ত বা পঠিত পাঁচটি প্রস্তাবই ইহাতে স্থান পায়। প্রথমোক্ত দুইটি প্রস্তাব ব্যতিরেকে কাব্য, বাঁকুড়া জেলার ভৌগোলিক বিবরণ ও আর্থিক অবস্থার পরিসংখ্যান জ্ঞান, হিন্দুনারীর অবস্থা—এইরূপ নানা বিষয়ের উপরই প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল। ১৮৩৯ সনে পঠিত প্রস্তাবের মধ্যে আটটি ও ১৮৪০ সনের একটি এই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে তিনটি প্রস্তাব বাংলায় লিখিত। 'ভারতবর্ষের সংক্ষেপ ইতিহাস' (১ম, ২য় ও ৩য় প্রস্তাব) বাংলা ভাষায় গোবিন্দলাল সেন কর্তৃক লিখিত। চট্টগ্রামের বিবরণ সম্বন্ধে ইংরেজী প্রস্তাব রামগোপাল ঘোষের বিশিষ্ট বন্ধু গোবিন্দচন্দ্র বসাকের রচনা। প্যারীচাঁদ মিত্রের হিন্দু রাজাদের আমলে হিন্দুস্থানের অবস্থা শীর্ষক দুইটি প্রস্তাব এবং পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নব্যশিক্ষা-প্রাপ্ত হিন্দুদের মধ্যে সামাজিক ও অন্যান্য সংস্কারের প্রবর্তন বিষয়ে ইংরেজী প্রস্তাবও এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

১৮৩৮ হইতে ১৮৪০ সনের প্রারম্ভ পর্যন্ত সভার সাধারণ সভ্যদের একটি তালিকাও প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে ১৬৬ জন সভ্যের নাম পাইতেছি। সে যুগের নব্যশিক্ষা-প্রাপ্ত বিখ্যাত বহুলোকেরই নাম এই তালিকায় পাওয়া যায়। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, সভা কর্তৃক প্রকাশিত পরবর্তী দুই খণ্ড রচনাবলীতেও (১৮৪২ ও '৪৩) এক একটি করিয়া সভ্য-তালিকা সংযোজিত রহিয়াছে। এ দুইটিতে সভ্য-সংখ্যার কিছু রদ-বদল আছে সত্য, কিন্তু দুই-ই মূলতঃ প্রথম তালিকারই অনুক্রম। প্রথম তালিকার ১৬৬ জন সভ্যের মধ্যে ১১ জন মফস্বলে স্থিত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চন্দ্রশেখর দেব, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, মাধবচন্দ্র মল্লিক ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক। ইঁহারা প্রত্যেকেই সে যুগে হিন্দু কলেজের ছাত্ররূপে যেমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তেমনি সরকারী কর্মেও বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন হন। কলিকাতায় স্থিত সভ্যদের অনেকেই যে কৃতবিদ্য যুবক সে সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ নাই। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন—বেণীমাধব মিত্র, ভোলানাথ চন্দ্র, চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, গুরুচরণ দত্ত, হরমোহন চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, কাশীশ্বর মিত্র,

ক্ষেত্রচন্দ্র দত্ত, কিশোরীচাঁদ মিত্র, নীলমণি মতিলাল, প্যারীচরণ সরকার, রাজেন্দ্র দত্ত, রামচন্দ্র মিত্র, শ্যামাচরণ সরকার, শিবচন্দ্র দে, উদয়চন্দ্র আঢ্য প্রভৃতি। অধ্যক্ষ-সভার সদস্যগণের নামও সাধারণ-সভ্য তালিকায় পাইতেছি। পুনরুক্তি বোধে এখানে তাহা দিলাম না।

সভ্য-তালিকার দুইটি বৈশিষ্ট্য স্বতঃই আমাদের চোখে পড়ে। সেযুগের প্রবীণ নেতা—যেমন রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামকমল সেন প্রভৃতির নাম ইহাতে নাই। এটি যুবজনদের সভা বলিয়াই তাঁহারা ইহার সঙ্গে যোগ দেন নাই। প্রবীণদের মধ্যে একমাত্র ডেবিড হেয়ার এই সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। হেয়ার ভারত-হিতৈষী; এদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে নিজেকে একান্ত লিপ্ত করায় যুবজনের সত্যিকার বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তবে দেশীয় প্রবীণেরা যে এই সভার প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সভ্য-তালিকার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—ইহাতে 'মধুসূদন দত্ত' নামটি পাইতেছি। ইনি কি পরবর্তী কালের বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক সুবিখ্যাত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, না অন্য কেহ? এ প্রশ্নের জবাব বা এ সম্বন্ধে আলোচনার স্থান ইহা নহে। তবে সমসাময়িক প্রমাণাদি হইতে বুঝা যায়, ইনি কবি মধুসূদন দত্ত নহেন, হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগের শিক্ষক মধুসূদন দত্ত।

৫

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার প্রথম দুই বৎসরের বিবরণ আমরা মোটামুটি জানিতে পারিলাম। সভার দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তক হইতে এপ্রিল ১৮৪০ হইতে মে ১৮৪১ পর্যন্ত এখানে পঠিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতার পরিচয় আমরা পাই। এবারে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, সাতকড়ি দত্ত, প্রসন্নকুমার মিত্র প্রমুখ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা জানা যাইতেছে। ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, শিক্ষা ও সামাজিক সমস্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠের সঙ্গে এই বৎসরে বিজ্ঞানের—শরীরতত্ত্ব, ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা প্রভৃতির আলোচনাও বিশেষ লক্ষণীয়। ছোটনাগপুরের ভৌগোলিক বিবরণ, সিংহভূমের বিবরণ, চট্টগ্রামে তুলার চাষ, চট্টগ্রামের বিশদ বিবরণ—সীতাকুণ্ড তীর্থ, হিন্দু রাজত্বে ভারতবর্ষের অবস্থা (এক), ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (৪), নব্য-শিক্ষিতদের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা—প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রবন্ধ পঠিত হয়। এই সকল প্রবন্ধের রচয়িতা ছিলেন যথাক্রমে—প্রথম দুইটির তরাকনাথ সেন, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, প্যারীচাঁদ মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র সেন ও কিশোরীচাঁদ মিত্র। ইঁহারা প্রত্যেকেই সভার সভ্য। এখানে এগুলি ব্যতিরেকে অন্যান্য প্রবন্ধও পঠিত হয়। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'পদার্থ'-বিষয়ক প্রবন্ধ এবং সাতকড়ি দত্তের 'চক্ষুর গড়ন', প্রসন্নকুমার মিত্রের 'কর্ণের গড়ন' সম্বন্ধীয় বক্তৃতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবারের কতকগুলি রচনা পরবর্তী খণ্ডের জন্য মজুত রাখা হয়।

আত্মোন্নতি ও জ্ঞানবৃদ্ধিমূলক আলোচনাসমূহ অবিলম্বে সাধারণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ১৮৪৩, ১৬ই জুন তারিখে 'বেঙ্গল হরকরা'য় সভার কার্যকলাপের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়। 'হরকরা' বলেন যে, এই সভা সাত বৎসর পর্যন্ত চলিলেও সাধারণ্যে ইহার কথা এখনও তেমন প্রচারিত দেখি না। কারণ সভ্যগণ নিজেদের কার্য সম্বন্ধে বাহিরে প্রচার করিতে বড়ই অনিচ্ছুক, তাঁহারা নীরবে অথচ নিয়মিতভাবে কার্য করিয়া যাইতেছেন। প্রতি মাসে সভার অধিবেশন, প্রবন্ধ-পাঠ, বক্তৃতা-দান তৎসম্বন্ধে আলোচনা এবং সভার পুস্তকে এই সমুদয় রচনা প্রকাশ—এসব বিষয়েও 'হরকরা' উল্লেখ করিলেন। বক্তা বা প্রবন্ধ-পাঠক নিজ নিজ বিষয় ধার্য করেন এবং ইংরেজী-বাংলা যে কোন ভাষায়ই লিখিতে পারেন। ইহার পর 'হরকরা' লেখেন:

"In this way, since the establishment of the society, a great variety of topics have been treated of at the meetings of the society, and the most choice essays and papers have been collected together and printed as the 'transactions' of the society. Two little volumes of these transactions have already passed through the press. It may be added that the society at present has about two hundred members."

সভার তখন প্রায় দুইশত সভ্য। নির্বাচিত প্রবন্ধগুলি দুই খণ্ডে ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। তৃতীয় খণ্ডে (প্রকাশকাল ১৮৪৩) জুলাই ১৮৪১ হইতে এপ্রিল ১৮৪২ সন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পঠিত প্রবন্ধগুলির কয়েকখানি প্রকাশিত হয়। গোবিন্দচন্দ্র বসাকের ত্রিপুরা জেলা ও ত্রিপুরা রাজ্যের বিবরণ সম্বলিত পাঁচটি প্রবন্ধ পর পর এখানে পঠিত হইল। পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "Native Female Education" বা

এদেশীয় স্ত্রীশিক্ষা শীর্ষক একটি পুরস্কার-প্রাপ্ত প্রবন্ধের উপরে আলোচনা-প্রবন্ধ পাঠ করেন প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৪২ সনের ১২ই জানুয়ারীর সভায়। প্রসন্নকুমার মিত্র "On the Physiology of digestion" বা পরিপাকক্রিয়ায় শারীরতত্ব সম্বন্ধীয় রচনা পাঠ করেন পরবর্তী ১৩ই এপ্রিল। ইহার পর সভা হইতে আর কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। সভায় ক্রমশঃ রাজনীতি এবং তৎকালীন শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কীয় প্রবন্ধ-পাঠ ও আলোচনাও চলিতে থাকে। এই কথাই এখন বলিতেছি।

৬

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার অধ্যক্ষগণ স্বদেশের সর্বপ্রকার উন্নতি যাহাতে হয় সে বিষয়ে বিশেষ অবহিত ছিলেন। স্বদেশ সম্বন্ধে, স্বজাতীয় বিভিন্ন সমস্যা লইয়া যে আলোচনা হইত একথাও আমরা জানিতে পারিয়াছি। সভার মুখপত্র হিসাবে না হইলেও রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ নেতৃগণ কর্তৃক 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' (এপ্রিল, ১৮৪২) প্রকাশে ইহা সম্যক সূচিত হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৪২ সনের ডিসেম্বর মাসে ভারত-প্রত্যাবর্তনকালে বিখ্যাত বাগ্মী ও মানবহিতৈষী জর্জ টমসনকে নিজ ব্যয়ে এদেশে লইয়া আসেন। দ্বারকানাথ নব্যদলের বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ইঁহাদের দ্বারা যে স্বদেশের সত্যিকার শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব এ বিশ্বাসও তিনি হৃদয়ে পোষণ করিতেন। তিনি নব্যদলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে টমসনের পরিচয় করাইয়া দিলেন। ১৮৪৩ সনের ১১ই জানুয়ারী সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকার সভ্যগণ এক প্রকাশ্য সভায় টমসনকে অভিনন্দিত করেন। তাঁহারা প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়ীতে এবং পরে চিৎপুর রোডস্থ ফৌজদারী বালাখানা-হলে টমসনের বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া দেন। টমসনের ওজস্বিনী বক্তৃতায় যুবক-মনে স্বদেশপ্রীতি নবরূপে দেখা দিল। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে রাষ্ট্রীয় শক্তির কার্যকারিতা নব্যদল নূতন করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলেন। তাঁহারা রাজনীতির চর্চায় অভিনিবিষ্ট হওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করিতে থাকেন।

ইতিমধ্যে এমন একটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে সাধারণের দৃষ্টি এ সভার দিকে স্বতঃই আকৃষ্ট হইল। ১৮৪৩, ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সংস্কৃত কলেজ হলে যথারীতি স্থায়ী সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার একটি অধিবেশন হইল। পূর্ব-নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুযায়ী দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় "The Present State of the East India Company's Judicature and Police, under the Bengal Presidency" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। পাঠ কিছুদূর অগ্রসর হইলে, সভায় নিমন্ত্রিত হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপটেন রিচার্ডসন প্রবন্ধ-পাঠে এই বলিয়া বাধা দেন যে, কলেজ-গৃহকে তিনি রাজদ্রোহের আস্তানায় পরিণত হইতে দিবেন না! তৎক্ষণাৎ এইরূপ মন্তব্যের সমুচিত জবাব দেওয়া হইল। রিচার্ডসন এই মন্তব্য প্রত্যাহার করিলেন। কিন্তু সভার কর্তৃপক্ষ অতঃপর সংস্কৃত কলেজ-হলের পরিবর্তে ফৌজদারী বালাখানা-হলেই সভার অধিবেশন করা সাব্যস্ত করেন। এই ঘটনা লইয়া সংবাদপত্রে খুব জটলা হইল। ইংরেজ-সম্পাদিত রক্ষণশীল পত্রিকাগুলি নব্যদলকে কটূক্তি করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, নব্যদলের নেতা তারাচাঁদ চক্রবর্তীর নামে তাঁহাদের 'চক্রবর্তী কাকশ্যান' আখ্যা দিতেও ছাড়িল না। পরবর্তী ৩রা ও ৪ঠা মার্চ 'বেঙ্গল হরকরা'য় সমুদয় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে দেখা গেল ন্যায্য সমালোচনা ব্যতীত রাজদ্রোহের নামগন্ধও উহাতে নাই। অথচ 'ফ্রেন্ড অফ ইণ্ডিয়া' (১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৩) এরূপ মন্তব্য করিতে দ্বিধা করেন নাই যে, ওরূপ খাঁটি রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতা বাটাভিয়া বা সামারঙে (যবদ্বীপ) করা হইলে, কমপক্ষে নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করা হইত! নব্য দলের প্রতি শ্বেতকায়দের মনোভাব তখনই কিরূপ বিকৃত হইয়া উঠিতেছিল এই উক্তি হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

ইহার পর নব্যদল 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র স্থলে রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা সম্বন্ধীয় ও শাসন-সংক্রান্ত বিবিধ বিষয় আলোচন এবং এ সকল বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক এদেশে ও বিদেশে আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি সভা স্থাপনের মনস্থ করিলেন। নবাগত জর্জ টমসন এ বিষয়ে তাঁহাদের প্রধান সহায় হইলেন। প্রথমে টমসন ও নিজেদের মধ্যে কিছুকাল আলাপ-আলোচনা চলিল। তাহার পর বিলাতস্থ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির আদর্শে এখানে একটি সভা স্থাপিত হইল ১৮৪৩ সনের ২০শে এপ্রিল তারিখে। ইহার নাম দেওয়া হয় বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোস্যাইটি'। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার অধ্যক্ষগণ প্রায় সকলেই ছিলেন এই সভা প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা। তাঁহারা স্বতঃই এই নূতন সভারও অধ্যক্ষ হইলেন। পরবর্তী পাঁচ-ছয় বৎসর যাবৎ এই সভাই দেশের রাজনৈতিক কার্যে মনোযোগী হয়। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'রই অনুক্রম একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

দুরাভিসার

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

মাথার বোঝাটা নামিয়ে রেখেই পয়সা নিয়ে সরে পড়ে কুলিটা। ট্রেন তখনো প্লাটফরমেই লাগেনি, ছাড়বার সময়ের তো অনেক বাকি।

স্টেশনে একটু বেশি তাড়াহুড়ো করেই আসা হয়েছে। এতটা আগে না এলেও চলতো। তা' হোক, একেবারে গাড়ি ছাড়ার মুখে দৌড়োদৌড়ি করার চেয়ে এই ভাল। তবে বড্ড যেন নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল ওয়েটিং রুমটায়। সাত আট বছরের একটি বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে যা-ও এক ভদ্রমহিলা রা ছিলেন, তিনিও কিছুক্ষণ না যেতেই আগের গাড়িতে চলে গেলেন বর্ধমানে।

ওয়েটিং রুমে সম্পূর্ণই একাকী তখন সুতপা সেন। একা চলাফেরায় বেশ অভ্যস্ত হলেও সেদিন সত্যি সত্যি যেন কেমনই লাগছিল তাঁর। রাত্রি বলেই হবে হয়তো। কিন্তু কলকাতায় অনেক রাতেও তো একা পথ চলতে হয় তাঁকে। কোনদিনই তো এমনি নিঃসঙ্গতা মনে হয়নি তাঁর। তা'ছাড়া এ হাওড়া স্টেশন। ওয়েটিং রুমের বাইরে প্লাটফরমে হাজার লোকের ছুটোছুটি। কাজেই ভয়ের কী থাকতে পারে?

ইজি চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম করছিলেন সুতপা। ওয়েটিং রুমের ঠিক মাঝখানে মস্ত বড় একটা গোল টেবিল। তারই একপাশের একটা ইজিচেয়ার অধিকার করে আছেন তিনি। সামনে ও পেছনে দুই দেয়ালে টাঙানো বড় বড় দু'টি আয়না। উপর থেকে মাঝখানটায় ঝোলানো খুব বেশি পাওয়ারের একটা বৈদ্যুতিক আলোর বাল্ব বাইরের সামান্য বাতাসে সর্বক্ষণই ক্ষীণ দোলায়মান। দু'টি আয়নাতেও ঐ আলোর ছায়া একই-ভাবে একটু একটু দুলেই চলেছে। ইজি চেয়ার থেকে সামনের অয়নায় সেই আলোর দোলন লক্ষ্য করেন সুতপা। তাঁর মনে যে একটু নাড়া লেগেছে তাও এ থেকেই তাই টেবিলের উপর থেকে খবরের কাগজখানা তুলে নিয়ে বেশ বড় করে খুলে ধরে পড়া সুরু করে দেন তিনি।

ছোট-বড় অনেকগুলো খবর পড়া শেষ করে সম্পাদকীয় পাঠে একটু মনোনিবেশ করতেই হঠাৎ ওয়েটিং রুমের মধ্যেই কার যেন পদচারণার শব্দ শুনতে পেলেন সুতপা। বিশেষ-ভাবে পরিচিত সে পদশব্দ। গুরুগম্ভীর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়া আর সম্ভব নয় এর পর।

সবিস্ময়ে মুখের উপর থেকে খবরের কাগজখানা সরিয়ে নিতেই আরো আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় সুতপাকে। আরেঃ, সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চুল আচড়ে নিয়ে গৌরীই চলে গেল না পিছন ফিরে চোখের ওপর দিয়ে?

গৌরী কোত্থেকে আসবে হাওড়া স্টেশনে এসময়ে? তা' ছাড়া গৌরী হলে সুতপার সঙ্গে কথা না বলে কখনো যেতে

পারে এভাবে? অবশ্য সুতপাকে যদি সে দেখতে পেয়ে থাকে তবেই উঠতে পারে সে কথা। কিন্তু নাইবা দেখতে পাবে কেন? এত বড় একটা হলঘরে একা বসে সুতপা। আর দ্বিতীয় কেউ এসে সে ঘরে ঢুকলে তাঁর দিকে অন্ততঃ একটিবার নজর না পড়ে যায় কখনো? তা' হতেই পারে না।—এমনি করেই এঁকেবেঁকে চলে সুতপার চিন্তাধারা। পথেঘাটে পড়ে থাকা সাপের খোলসের মতই তা' অন্তঃসারশূন্য।

চোখেরই ধাঁ ধাঁ হবে হয়ত। তাছাড়া প্রায় আট বছর পর গৌরীকে এ বেশে এভাবে একা একা হাওড়া স্টেশনে চকিতে দেখার ঘটনাকে বুদ্ধি বা যুক্তি দিয়ে কোন রকম ব্যাখ্যাই করে উঠতে পারেন না সুতপা। তবে ধাঁ ধাঁই হোক আর যাই হোক গৌরীর সঙ্গে সঙ্গে পটের ছবির মত সুতপার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে সমরেশের ছবি, গোয়ালিয়র প্রাসাদ, ফোর্ট এবং গোয়ালিয়র শহরের নানা বিচিত্র ছবি।

প্রায় আট বছর আগের ঘটনা। বিয়ের তিন বছর পর প্রথম যেবার ছুটিতে সমরেশের সঙ্গে গৌরীও বেড়াতে আসে কলকাতায় সেবার একরকম জোর করেই গৌরী সুতপাকেও নিয়ে গিয়েছিল সঙ্গে করে গোয়ালিয়রে ফেরার সময়। দেশ তখনো স্বাধীন হয়নি। গোয়ালিয়র তখন বৃটিশ-তাবেদার একটি দেশীয় রাজ্য। গোয়ালিয়রে বেড়াতে যেয়ে প্রথম প্রথম যত আনন্দই হোক না কেন এ রাজ্যের অতীত ইতিহাস মর্মাহত করেছে সুতপা সেনকে। ঝাঁসির রাণী মহীয়সী লক্ষ্মী বাঈয়ের পতনকে ত্বরান্বিত করেছে গোয়ালিয়র মহারাজার বিশ্বাসঘাতকতা, বীর নারী লক্ষ্মী বাঈয়ের প্রাণ হননের সুযোগ পেয়েছে বৃটিশ সৈন্য এই গোয়ালিয়রের মাটিতে একরূপ বিনা প্রতিরোধে, এ লজ্জার কাহিনী শুনে যে তিনি সেদিন শিউরে উঠেছিলেন সে কথাও মনে পড়ে যায় সুতপার। পুরুষ নারীকে তার যোগ্য সম্মান দিতে পারে নি কোন কালেই, এ ধারণা তাঁর বদ্ধমূলই হয়ে গেছে ক্রমে ক্রমে। তবু পুরুষকে বাদ দিয়ে চলে না নারীর, এই হলো ট্র্যাজিডি। গোয়ালিয়রে লক্ষ্মী বাঈয়ের বেদীমূলে দাঁড়িয়ে আপন বুকের রক্তে অঞ্জলি দিয়ে অতীতের প্রায়শ্চিত্ত করার ইচ্ছে হয়েছিল সুতপার। কিন্তু পুষ্পাঞ্জলি দিয়েই সেবার নিবৃত্ত হতে হয়েছিল তাঁকে।

একের পর এক কাহিনী ছবির মত ভেসে ওঠে। সিনেমার ছবির চেয়েও দ্রুত ভেসে আসতে থাকে তারা। ফোর্টে বেড়ানোর কথা একেবারে সুস্পষ্ট মনে পড়ে সুতপার। সমরেশ তাঁর নতুন গাড়ি নিয়ে ফোর্টে উঠতে ভরসা পাননি প্রথম। বিশেষ করে মেয়েদের নিয়ে এ risk নেওয়া ঠিক নয়, এমনি মন্তব্যও করেছিলেন তিনি। কিন্তু সুতপা তাঁর সে মন্তব্যের প্রতিবাদ করায় তিনি শেষ পর্যন্ত গৌরী ও সুতপাকে নিয়ে জয় মা কালী বলে start দিয়েছিলেন তাঁর গাড়িতে। বিপদ ঘটেনি কোন। তবে ফোর্টে গাড়ি নিয়ে ওঠার সময় এবং নামার সময়েও গৌরী ও সুতপা দুই বন্ধু যে বেশিক্ষণ চোখ মেলে থাকতে পারেন নি তা' তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করেছিলেন সমরেশের কাছে।

সে যাই হোক, গোয়ালিয়র ফোর্টের উপরবার দৃশ্য ভুলবার নয়। গাড়ি ঠিক উপরে যেয়ে উঠতেই একেবারে যেন হাফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন সুতপা। সমরেশ বাবুর মন্তব্যের প্রতিবাদের দায় থেকে মুক্তি, সে কি সোজা ব্যাপার! দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল আর কি! গাড়িতেও পথ আর ফুরোয় না যেন, কেবলই উঠছে উপরের দিকে। তাই উপরে উঠে সুউচ্চ মন্দির ঘেঁষে যেই এসে গাড়িখানা দাঁড়াল অমনি যেন ঘাম দিয়ে জ্বর সেরে এল সবাইর। সমরেশও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন। হবে না? গিন্নীর দায়িত্ব নয় নিজের, কিন্তু গৌরীর বন্ধু সুতপা তো পরের মেয়ে। কিছু একটা হলে কি আর উপায় ছিল, ঠিক এমনি ভাব সেদিন লক্ষ্য করেছিলেন সুতপা সমরেশের চোখেমুখে।

ফোর্টের উপর গোয়ালিয়র আর্ট কলেজ। অধ্যক্ষ তার একজন বাঙ্গালী শিল্পী। কল্পনা-বিভোর শিল্পী ও তাঁর সদাহাস্যময়ী পত্নীর সাদর অভ্যর্থনার কথাও মনে পড়ে যায় সুতপার। ছাব্বিশ হাজার বর্গ মাইলব্যাপী সমগ্র গোয়ালিয়র রাজ্যের রূপ দৃষ্টির জালে ধরা পড়ে ফোর্টের উপর থেকে। সুদূরে দেশীয় রাজ্যে প্রবাসী বাঙ্গালী শিল্পী দম্পতি সেদিন তাঁদের কজন বাঙ্গালী দর্শককে পেয়ে কী খুশিই না হয়েছিলেন! তাঁরা নিজেরাই ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছিলেন তাঁদের সব কিছু। সমরেশ ও গৌরীর কিছুটা পরিচয় ছিল তাঁদের সঙ্গে। কিন্তু সুতপা ছিলেন সম্পূর্ণই অপরিচিতা। তা' হলেও মুহূর্তের মধ্যেই যেন সমস্ত অপরিচয়ের যবনিকা ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

বসুন আর একটু, একটু চা খেয়ে যেতে হবে।—শিল্পীপত্নীর সেই মৃদুমধুর আমন্ত্রণ-ধ্বনি কাণে বেজে ওঠে সুতপার। সুবিন্যস্ত শিল্পী-গৃহের পরিবেশ মূর্ত হয়ে ওঠে তাঁর চোখের সামনে। তারপর মনোরম কলেজ-ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার, ছায়া-সুশীতল ফোর্টের প্রাঙ্গণ। অতীতের অপূর্ব স্বপ্ন ঘিরে ফেলে সুতপাকে।

সমরেশ আর গৌরী। এদেরই জন্যে সুতপার সৌভাগ্য

হয়েছিল কলেজ-জীবনেই দূরবর্তী একটি ঐতিহাসিক রাজ্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের। এজন্যে কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই ওদের কথা স্মরণ করেন সুতপা। কিন্তু সেই আট বছর আগে গৌরী আর সমরেশের মধ্যে যে অপ্রীতিকর ভাব লক্ষ্য করে এসেছেন তিনি, তা' মনে পড়লে সত্যি খুব দুঃখ পেতে হয়।

একটা নামকরা স্বদেশী বীমা কোম্পানীর ডিভিশন্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট সমরেশ। বিয়ের দু'বছর আগে গোয়ালিয়র অফিসের ভার নিয়েছেন তিনি। তাঁরই সহকারী সান্যাল সাহেবের ঘটকালিতে অপরূপা সুন্দরী গৌরীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তাঁর।

সান্যালেরই নিকট-আত্মীয়া গৌরী। তাই বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় নি। গৌরী-সমরেশের বিতর্ক-বিতণ্ডায় অনেক সময়ই মধ্যস্থতা করতে হয় তাঁকে। পূজোর ছুটির এক মাস বেড়ানোর সময় সুতপাকেও সে কাজ করতে হয়েছে কয়েকবার। সুতপা কিন্তু প্রতিবারই সমরেশের পক্ষ নিয়ে কথা বলেছেন, যদিও আড়ালে তিনি গৌরীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, ওর কর্তার পক্ষ টেনে কথা বলার ব্যাপারটা সবটাই শো!

সমরেশ-গৌরীর গোলমালের মূলসূত্রটা কিন্তু নিতান্তই তুচ্ছ। টাকা-পয়সার ব্যাপার নয়, সোনা-গয়নার তাগিদ বা শাড়ির সখ নয়; অপব্যয় বা অপচয়ের কথাও নয়। সামান্য একটা পোষা বেড়াল নিয়ে ঝগড়া, পারিবারিক অশান্তি।

আচ্ছা বল্ দেখি সুতপা, উনিতো সারা দিন আর রাতের অর্ধেক কাটিয়ে বাড়ি ফেরেন ইনস্যুরেন্সের কেস করে। আমি বেচারা বাড়ি থাকি কি নিয়ে? আমারও তো একটা সঙ্গী চাই। এই বেড়ালটাকে নিয়ে খানিকক্ষণও যদি আমার আমোদ-আহ্লাদে কাটে তাতে ও'র আপত্তি করার কী থাকতে পারে, বল্ দেখি?

একদিনের ঘটনা মনে পড়ে যায় সুতপার। তারপর একে একে বিভিন্ন দিনের বিভিন্ন ব্যাপারই যেন মিছিল করে দেখা দিতে থাকে।

সুতপা গোয়ালিয়র থেকে চলে আসার দু'তিন দিন আগের কথা। সকালবেলা চায়ের টেবিলে বসেছেন সবাই মিলে। মাঝখানটায় একখানা বড় প্লেটে মাখনমাখানো কয়েক পিস্ টোষ্ট আর অন্য একখানা প্লেটে খান কয়েক সরভাজা। এক পিস্ টোষ্ট তুলে নিয়ে খাওয়া সুরু করতে যাবেন এমন সময় হঠাৎ বলে ওঠেন সমরেশ—আরে ঐ দেখুন মিস্ সেন, আপনার বন্ধু-কন্যার জ্বালায় কি আর চাটুকুও শান্তিতে খাবার জো আছে।

এও যেই বলা, অমনি একেবারে দপ করে জ্বলে ওঠেন গৌরী দেবী। যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন হয় ঠিক তেমনি।

মেরেই ফেলনা শুভাকে; তোমার যদি এতই জ্বালা হয়ে থাকে ওর জন্যে। চা না বিষ। আমি আর এ বাড়ির চা ভুল করেও ছোব না।—এই বলে চায়ের কাপ টেবিলের উপর ঠেলে রেখে সেই যে গৌরী দেবী গিয়ে শুয়ে পড়লেন সুতপা শত সাধ্য সাধনা করেও আর উঠিয়ে আনতে পারলেন না তাঁকে।

তোরই তো দোষ গৌরী। সে বেচারা তোর সঙ্গে একটু ঠাট্টা তামাসাও করতে পারবে না, এ কেমন কথা। এমনি হলে তোরা সংসার করবি কি করে? —সুতপা এই বলে বুঝাতে চেষ্টা করেন গৌরীকে। কিন্তু তাতে ফল হয় উল্টো।

যা না, তোর যদি এতই পছন্দ হয়ে থাকে সে বেচারাকে, তুই-ই যেয়ে সংসার করগে তাঁর সঙ্গে। —তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে গৌরী দেবী একেবারে এমনি কড়া কথা শুনিয়ে দেন সুতপাকে।

সে কি বড় সুখের হবে তোর কাছে? সইতে পারবি তুই?

গৌরী পাশ ফিরে শুয়ে থাকেন। আর একটি কথাও মুখ ফুটে বেরোয় না তাঁর।

সুতপাও ঝড়ের পূর্বাভাষ লক্ষ্য করে আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করে যান সেদিনের মত।

বেড়ালটাই যত নষ্টের গোড়া, যত অশান্তির মূল। কিন্তু কী-ই বা উপায়। গৌরী তো সন্তানের চেয়েও বেশি আদরে পুষছে এই বেড়ালকে। তার নাম রেখেছে শুভা। খাওয়া, শোওয়া, বসায় শুভা গৌরীর চোখে চোখে। এতও পারে, বাবা। —ভাবতে ভাবতে সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন সুতপা।

কিন্তু সব দিক ভেবেও সুতপার এ কথাই ঠিক বলে মনে হয়েছে যে, নাম শুভাই হোক আর যাই হোক এই বেড়ালের জন্যেই যখন গৌরীর সংসারে যত গোলমালের আমদানী তখন বেড়ালটাকে সরিয়ে দেওয়াই উচিত। যাবার আগে সমরেশকে একথাটা বলতেই হবে, এও স্থির করে নিয়েছিলেন সুতপা সেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত আর কথাটা তোলবার সুযোগই হয়নি সমরেশের কাছে। মাত্র তো আর দু'দিনের দেখাশুনো, তাই গৌরী দেবী সর্বক্ষণই রয়েছেন তাঁর বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে।

অভিমানভরে একটা দিন প্রায় অনাহারে কাটিয়ে দেবার

পর মনটা যেন অনেকটা পাতলা হয়ে এসেছিল গৌরী দেবীর। সুতপার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তাও মোটামুটি বেশ সহজ হয়েই আসছিল। কিন্তু যাকে নিয়ে তাঁর সংসার তিনি একেবারেই নীরব। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মতই নিস্তব্ধ। সুতপার মোটেই ভাল লাগেনি সে অবস্থা। তাই তাঁরই আগ্রহে ঠিক হলো, রবিবারের ম্যাটিনি শোটা দেখা হবে তিনজনে মিলে।

পরদিনই চলে যাবেন সুতপা। কাজেই তার অনুরোধ উপেক্ষা করা কারুর পক্ষেই সম্ভব হয়নি—গৌরীরও নয়, সমরেশেরও নয়। যথাসময়ে তিনখানা টিকিটও নিয়ে এসেছে সমরেশের আরদালী।

ওরা দুই বন্ধু তখন মত্ত ছিলেন সাজগোজ নিয়ে।

আর যে মাত্র বার মিনিট শো আরম্ভ হবার। এবার চলুন সুতপা দেবী। ডাক আসে সমরেশের ঘর থেকে।

ঃ এই যে আসছি, হয়ে গেছে আমাদের। —এই বলে ড্রয়িং রুমের চৌকাট পেরিয়ে মাত্র বেরিয়েছেন সুতপা অমনি ধপাস করে এক শব্দ। পেছন ফিরে তাকাতেই তাঁর চোখে পড়ে, জিভ কাটছেন গৌরী দেবী।

ঃ কি হলো? কিসের শব্দ? পড়ে গেলি বুঝি?

ঃ আরে না, আমার আর যাওয়া হবে না। তোরাই ঘুরে আয় সুতপা। এই দেখছিস না, কী ব্যাপার। —এই বলে গৌরী তাঁর পরণের বেনারসী শাড়ির আঁচলটা ধরে দেখান বন্ধুকে যে, কিভাবে তাঁর শুভা হঠাৎ গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রায় এক হাতের মত কাপড় ছিঁড়ে ফেলেছে।

ঃ তা' হোক গে, সিনেমায় যেতেই হবে তোকে।

ঃ কী করে যাই, বল্। দেখছিস্ না, এখনো কেমন করে শুভা আটকে রেখেছে আমায়?

সত্যি সত্যি তখনো পর্যন্ত বেড়ালটা গৌরীর পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে ছিল তাঁর স্যাণ্ডেলটা টেনে ধরে।

ঃ এতও পারিস বাবা! —গৌরীর এসব কাণ্ডকারখানা দেখে অনেকটা বিরক্তির সঙ্গেই এ মন্তব্য করেন সুতপা।

ঃ আরে আর কত দেরি করবে তোমরা? যেতে যেতে শো তো আরম্ভই হয়ে যাবে। —এবার গৌরীকে লক্ষ্য করেই ডাকেন সমরেশ।

ঃ এই শোন। তোমরাই যাও আজ সিনেমায়। এই দ্যাখো না, কতটা কাপড় ছিঁড়ে দিয়েছে শুভা। কিছুতেই আমায় আজ যেতে দেবে না।

ঃ বারে, তোমার টিকেট আনা হলো আর তুমি যাবে না?

ঃ তাতে কি হয়েছে, পরেশকে নিয়ে যাও না তোমাদের সঙ্গে।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো। পরেশ আরদালীকে নিয়েই ওরা গেলেন গোয়ালিয়র টকিজে। গৌরীর না যাওয়ায় সুতপা বা সমরেশের দিক থেকে তেমন জোর আপত্তি উঠল না দুই কারণে। প্রথমত, সমরেশ আর গৌরীর মানভঞ্জনের জন্যেই সুতপার এই সিনেমা দেখার আয়োজন। শুভাই যখন সে কাজ করে দিয়েছে তখন আর এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কি আছে? দ্বিতীয়ত, সুতপা চলে যাবার আগে তাঁকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও যদি একটু একা পাওয়া যেত তা' হলে যেন খুবই ভাল হত, আগের দিন থেকে কেবল এই মনে হচ্ছিল সমরেশের। শুধু সমরেশেরই বা হবে কেন, সুতপারও তাই। তবে পরেশ আরদালী সঙ্গে থাকায় তাঁদের উভয়েরই মন খুলে কথা বলায় একটু অসুবিধা হয়েছিল বৈকি?

সে যাই হোক, গৌরী দেবী ঘরে রয়ে যাওয়ায় অনেক কাজ এগিয়ে রইল সুতপার। তা' নইলে সিনেমা থেকে ফিরে তাঁকেই হয়ত সব গুছিয়ে নিতে হতো এক হাতে। খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা চুকিয়ে গৌরীর কি আর সময় হতো? কাল ঘুম থেকে উঠেই তো কলকাতা যাওয়ার হাঙ্গামা।

আসন্ন বন্ধু-বিচ্ছেদের চিন্তায় সে সময় কেমন বেদনার্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর মন তা আবার নতুন করে মনে পড়ে সুতপার। শুধু গৌরীর জন্যে নয়, সমরেশের জন্যেও তাঁর মন যেন কেঁদে উঠছিল বার বার। সত্যি সত্যি বড্ড নিরীহ লোক সমরেশ বাবু। রাত্তদিন এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতেও কোন ক্লান্তি নেই ভদ্রলোকের। তারপর ঘরে ফিরেও গৌরীর মুখঝামটা তো আছেই কথায় কথায়। তবুও বিরক্তি নেই এতটুকু। এসব দেখেশুনে সুতপার কেমন যেন একটা মায়াও হয়ে গিয়েছিল সমরেশের জন্যে। তাই তাঁর কেবল মনে হতো, গৌরী আর সমরেশের মন কষাকষির যদি একটা স্থায়ী নিষ্পত্তি হয়ে যেতো তিনি থাকতে থাকতে, তা' হলে বড়ই ভাল হতো। সিনেমায় যাওয়া উপলক্ষ করে কিছুটা বুঝাপড়া যে অন্তত হয়েছে, সুতপা তাতে খুবই আনন্দিত।

ঃ সুতপা, ছাড়াছাড়ি হবার আগের রাতটা আয় আমরা গল্প করেই কাটিয়ে দি দুজনে। ছোটবেলা কত রাত এভাবে কাটিয়েছি, বলত?

ঃ দূর পাগলি! সমরেশবাবু একা পড়ে থাকবেন এক-ঘরে আর আমরা রাতভর গল্প করব, কি চমৎকার তোর ব্যবস্থা! —গৌরী দেবীর প্রস্তাব নাকচ করে দিতে চান সুতপা, কিন্তু টেকে না তাঁর যুক্তি

ঃ বারে, কতরাত ওঁর একা একা ফাইলপত্র নিয়ে কেটে যায় তুই কী করে জানবি তার খবর? এ নিয়ে তোর মাথা ঘামাতে হবে না। বল্‌ছি, উনি কিছুই মনে করবেন না এজন্যে। সত্যি সুতপা, তুই চলে যাবি, এখন থেকেই আমার যেন কেমন লাগছে। কাল থেকে আবার তো যে মরুভূমি সে মরুভূমিই হয়ে দাঁড়াবে এ সংসার।

ঃ কেনরে তুই এসব কথা বলছিস্‌ গৌরী? সমরেশ বাবুর মত লোক হয় কোন? দেবতার মত মানুষ; তাঁকে নিয়ে কোন হাঙ্গামাই তো হবার কথা নয় তোর। আমার কি মনে হয় জানিস্‌, মানুষের যার যতটুকু অশান্তি সে নিজেই সেটুকু সৃষ্টি করে নেয় নিজের জন্যে। তা নইলে তোদের দুজনের সংসারে গোলমালই বা আসে কোত্থেকে আর মরুভূমিই বা মনে হবে কেন? তারপর তো আবার তোর শুভাও রয়েছে।

ঃ আরে ভাই, এই শুভাকে নিয়েই তো যত গোলমাল।

ঃ তাই যদি হয়ে থাকে, শুভাকে বিদায় করে দিলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়। বুঝতে পারছি, মা হবার সখ মেটেনি বলে তোর এই বেড়াল পোষা। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো হচ্ছে। কিন্তু ভাই, একটা মেয়ে থাকলেও তো তাকে তোর বিয়ে দিতে হতো। এও না হয় শুভাকে কোথাও পার করে দিয়ে সব হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেলি। তাই কি ভাল না? আর এও তোর ভাবা উচিত, ভদ্রলোক যা পছন্দ করেন না তেমন ঝক্‌মারির মধ্যে তোর থাকা ঠিক নয়। কি বলিস্‌?

এই বলে গৌরীর দিকে তাকাতেই সুতপা দেখতে পান যে, দর দর ধারায় জল পড়ছে তাঁর দুচোখ বেয়ে আর অকারণেই তিনি একটা বইয়ের পাতার পর পাতা উল্টাচ্ছেন টেবিলের উপর।

এদিকে বারান্দায় পায়চারি করতে করতে সুতপার দু-চারটে কথা শুনতে পেয়েছেন সমরেশ এবং তা শুনে ঠিক একই সময়ে একটু মৃদু মন্তব্য করে ফেলেন তিনি।

ঃ খুব জোর গবেষণা করছেন বটে মিস্‌ সেন, কিন্তু সাব্‌জেক্টটা বড্ড টেক্‌নিক্যাল। তবে সারা রাতটাই তো আপনার হাতে রয়েছে। দেখুন কি দাঁড়ায়?

দুই বন্ধুরই কাণে যায় সমরেশের কথাগুলো। গৌরী ভাবেন, সুতপার এই পরামর্শের পেছনে সমরেশেরও যুক্তি রয়েছে হয়ত। তা' নইলে সুতপার কথার সঙ্গে সমরেশের সুরের এতটা মিল ঘটছে কি করে? আবার সুতপা ভাবছেন, সাবজেক্টটা টেকনিক্যাল যতটা নয়, তার চেয়ে ঢের বেশি সেণ্টিমেণ্টাল। তাই ড্রাষ্টিক কিছু করা মুস্কিল। তবে গৌরী যখন নীরব নির্বাক, তখন খুব কষ্টের সঙ্গে হলেও হয়ত তিনি তাঁর পরামর্শের বার আনাই মেনে নিয়ে থাকবেন, এই তাঁর ধারণা। খাওয়াদাওয়ার পর শুয়ে শুয়ে বাকিটা কথায় কথায় কন্‌ভিন্স করা যাবে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই সুতপার।

ঃ চল্‌ গৌরী, খাওয়ার হাঙ্গামাটা সেরে আসি। রাত কম হয়নি কিন্তু।

ক্রমে রাত্রির আকাশে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। গোয়ালিয়র—রাজের প্রাসাদ-প্রহরী আর দুর্গ-প্রহরীরা ছাড়া রাজ্যের আর প্রায় সবাই তখন ঘুমিয়ে। আর যারা ঘুমোয় নি তাদের মধ্যে গৌরী এবং সুতপার নামও করা যেতে পারে।

কথায় কথায় তরুণ-তরুণীর রাতভোর করা নয়; দুই বান্ধবীর গল্পে গল্পে কখন যে পূর্বাকাশে ঊষার আলোক-রেখার উন্মেষ ঘটেছে গৌরী বা সুতপা কারুরই তা খেয়াল হয়নি। সুতপার কোন সাড়া না পেয়ে ভোরের কাক-ডাকার সঙ্গে হঠাৎ চমকে ওঠেন গৌরী দেবী। সর্বনাশ! একেবারে রাত শেষ! আচ্ছা, ঘুমোক সুতপা—এই বলে বিছানা ছেড়ে সটান রান্নাঘরে চলে যান গৌরী। শুভাও তখন ঐ বিছানারই একধারে পায়ের তলার দিকে পড়ে ঘুমোচ্ছিল।

সুতপার ট্রেণ আটটায়। দুঘণ্টার মধ্যে তার রান্না শেষ করে আবার রাস্তার খাবারও তৈরী করতে হবে। চোখেমুখে যেন পথ খুঁজে পান না গৌরী দেবী। কোনটায় তেল পড়ে তো, নুন পড়ে না। আবার কোন তরকারীতে হয়ত মশলা দিতেই ভুল হয়ে যায়। এমনি তাঁর অবস্থা। তবু ভাগ্যি পরেশটা এরই মধ্যে লুচি বেলা শেষ করে স্টোভটা ধরাতে সুরু করেছে। কাজেই যা'হোক কোন রকমে সব কিছুই সময়মত হয়ে যাবে এই তাঁর ধারণা।

এদিকে ঘড়িতে এলার্ম পড়তেই একলাফে বসে পড়েন সুতপা। তখনো সেখানে ঘুমোচ্ছিলো শুভা।

ঃ বাঃ, বেশ লোকতো তুই গৌরী! তুই নিজে উঠে এলি চুপি চুপি আর আমায় একটু ডেকে দিলি না। বলি, কে যাবে, তুই না আমি? —একটু পরেই এক দৌড়ে ছুটে গিয়ে সুতপা প্রশ্ন করেন গৌরীকে।

ঃ বারে, তুই যাবি বলেই তো তোর খাবার সব আয়োজন করে দিতে হবে আমাকে! সময়মত তোর ঘুম ভাঙ্গলেই হলো। তার জন্যেই তো ঘড়িতে এলার্ম দেওয়া। আগে থেকে তোকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে কি লাভ? —উত্তর আসে গৌরী দেবীর তরফ থেকে।

যথা সময়ে গৌরী আর সমরেশ গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে আসেন সুতপাকে।

দীর্ঘ দিনের অসাক্ষাতের যবনিকা পড়ে তাঁদের মধ্যে।

আট বছর পর হাওড়া স্টেশনের ওয়েটিংরুমে বসে হঠাৎ স্বপ্নের মত গৌরীর ছায়া নজরে পড়তেই তাঁর গোয়ালিয়র বাসের পুরো কাহিনী এমনি করে মনে পড়ে যায় সুতপার। ইতিমধ্যে সরগরম হয়ে উঠেছে ওয়েটিংরুম যাত্রী সমাগমে। সুতপা দেবীর খেয়ালই ছিল না কোন কিছুর।

হঠাৎ গাড়ির ঘণ্টা পড়ে। চিন্তার নেই কিছু। তাঁর শিলপিং একোমোডেশন রিজার্ভ করাই আছে সেকেণ্ড ক্লাসে। ঠিক সময়েই সুতপা এসে তাঁর যায়গা ঠিক করে নেন গাড়িতে।

তিনজনের আর একটি পরিবার বাকি সিট কয়টি অধিকার করে বসেছিলেন। তাতে বেশ ভালই হয়েছে সুতপার। রাত্রির জার্নি। অনেকটা নিশ্চিন্ত।

সহযাত্রী পরিবারভুক্ত পাঁচছয় বছরের ছেলেটিই কিন্তু প্রথম এসে যেচে আলাপ সুরু করেছে সুতপার সঙ্গে। শুধু তাই নয়, তাঁকে দু' দুবার করে এসে জোর করে চকোলেটও দিয়ে গেছে। তারপর আর বাকি দুজনের সঙ্গে আলাপ না জমে পারে কখনো?

ঃ শংকর, এই শংকর শোনো একটা কথা। —সুতপা যতই ডাকেন ওকে শংকর ততই তার মায়ের কোলে মাথাটা চেপে রেখে লুকিয়ে রাখতে চায় নিজেকে।

রাত তখন প্রায় সাড়ে নটা। ঘুমিয়ে পড়ার সময় হয়ে গেছে শংকরের অনেক আগেই। কিন্তু চলমান ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে তার মনও ছুটে চলেছে জাগরণের উদ্দাম উল্লাসে। ঘুম নয়, ঘুমের ভানও নয়। বিষম লজ্জায় পড়েছে শংকর। কথা শোনার জন্যে নয়, তাঁর খাবারের একটা অংশ নেবার জন্যেই যে ডাকছেন তাকে সুতপা এ সে বেশ বুঝতে পেরেছে। তাই সে লজ্জায় মুখ ঢেকেছে মা'র কোলে।

ঃ ছিঃ, যাও না শংকর। মাসীমা এত করে ডাকছেন বার বার, একবারটি শুনে এসো যেয়ে। —সুতপা আর একবার শংকরকে ডাকতেই শংকরের মা তাকে কোল থেকে টেনে তুলে পাঠিয়ে দেন সুতপার কাছে।

মাথা নীচু করে কাচুমাচু হয়ে এগিয়ে যায় শংকর। সুতপা দেবী তাকে কাছে টেনে নিয়ে একখানি সন্দেশ তার হাতে দিতেই লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে ওঠে। সন্দেশ নিয়েই ছুটে এসে মায়ের কোলে মুখ ঢেকে আবার সে লুকোতে চায় নিজেকে। মা এবার তাকে তুলে নিয়ে শুইয়ে দেন তার বিছানায়। সন্দেশ হাতে করেই ঘুমিয়ে পড়ে শংকর।

রাত্রি গভীর হয়ে আসে। একে একে সবাই ঘুমিয়ে পড়েন এর মধ্যে।

পুরী এক্সপ্রেস। নিশীথ নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে বিপুল বিক্রমে এগিয়ে চলেছে ট্রেন ঘনান্ধকার ভেদ করে। লক্ষ্য নীলাচল। নীলাচল মহাতীর্থ আর কতদূর? কতদূর আর সেই মহামিলন ক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র?

ট্রেনের দোলার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের মধ্যেও দোলা লাগে সুতপা দেবীর মনে। তাঁর অধ্যাপক স্বামীও হয়ত তাঁরই কথা ভাবছেন ঘুমের ঘোরে। পুরী স্টেশনে তিনি হয়ত এসে উপস্থিত হবেন নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই। পুরী স্টেশন আর কতদূর? —ঘুমের মধ্যেই ভাবছেন এসব সুতপা দেবী।

দেখতে দেখতে কটক স্টেশনে এসে গাড়ি থামে। তার আগে আরো অনেকগুলো স্টেশনেই গাড়ি এমনি থেমেছে, কিন্তু সুতপা বা তাঁর ট্রেন-সঙ্গীরা তার কোন হদিসই রাখেন নি বা রাখার দরকার মনে করেন নি। শংকরের বাপ-মা অনেক কালের বাসিন্দা কটকের। তাঁদের জানাই আছে, গাড়ি এসে কটক স্টেশনে লাগবে ঠিক সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। তাঁরাও সময় মতই তৈরী হয়ে আছেন নেমে যাবার জন্যে। সুতপাকে তাঁরাই ডেকে তুলছেন যাবার আগে। মেয়েছেলে, একলা একটা কামরায় ঘুমিয়ে থাকবেন, তা' ঠিক নয়। শংকরের মা তাই সজাগ করে দিয়ে যান তাঁকে বিদায় নেবার আগে। ওরা চলে যাবার সময় শংকরের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়েই থাকেন সুতপা। ভারি মিষ্টি ছেলেটি!

সত্যি, কেমন যেন গা ছম্ ছম্ করে ওঠে সুতপার একলা কামরায়। একজন যাত্রীও উঠলেন না তাঁর কামরায় কটক স্টেশন থেকে! বিস্ময় লাগে তাঁর। আবার এও তিনি ভাবেন, একা কোন পুরুষ যাত্রী আসার চেয়ে এই ভাল। কে জানে, কখন কার মনের অবস্থা কী দাঁড়াবে।

কটক থেকে গাড়ি স্টার্ট দেবার মুখে একখানা মাসিক পত্রিকা কিনে নেন সুতপা স্টেশন থেকে। নির্জন বাকি পথের জন্যে চাইতো একটা কিছু!

মানুষের জীবনে অতীতের আকর্ষণও বড় কম নয়। পিছনের পথ, পিছনের পরিচয় টেনে রাখতে চায় মনকে অনেক সময় মনের অজ্ঞাতেই। মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টে চলেছেন সুতপা। একের পর এক গল্প শেষ করছেন, শেষ হচ্ছে এক একটি প্রবন্ধ বা কবিতা পড়া। কিন্তু তারই মধ্যে হঠাৎ মনে পড়ে যায় পথের দেখা শংকর ছেলেটিকে। ওরই মত একটি ছেলে তো অনায়াসেই থাকতে পারতো গৌরীর। তা'হলে কী শান্তির সংসারই না হতো

ওদের। শুধু গৌরীর কথাইবা কেন? সুতপার নিজেরও তো আজ নিতান্তই প্রয়োজন এমনি একটি ছেলে বা মেয়ের। কতটুকুই বা সময় এই ট্রেনে একা একা থাকতে হচ্ছে তাঁকে, তাতেই যেন একেবারে হাঁপিয়ে উঠছেন তিনি। আর পুরীতে নির্জন গৃহবাসে কতই না জানি কষ্ট হবে তাঁর। শাশ্বত সন্তান-তৃষ্ণা তীব্রভাবে জেগে ওঠে সুতপার অন্তরে। সুতপা তখন সন্তানসম্ভবা। অলক্ষ্যেই তাই তাঁর দুই ঠোঁটে হাসির বিদ্যুৎ খেলে যায়।

এমনি সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি চলে যায় সুতপার। সবুজ বনানী ঘেরা দূরে পল্লীর আকাশ ছাড়িয়ে চোখে পড়ে কয়েকটি মন্দিরের চূড়া। তার মধ্যে একটি প্রধান। কোথাকার মন্দির এসব, কোন্ দেবতার? প্রশ্ন জাগে সুতপার মনে। কিন্তু জিজ্ঞেস করার কেউ নেই কাছাকাছি।

পুরোদমে ছুটে চলেছিল ট্রেন। হঠাৎ যেন স্তিমিত হয়ে আসে তার গতি। গাড়ি সম্পূর্ণ না থামতেই হুড়মুড় করে এক ধরণের লোক উঠে পড়ে কামরায় কামরায়।

ঃ কী চাও তুমি? —সুতপার ভয়চকিত জিজ্ঞাসায় থমকে দাঁড়ায় আগন্তুক।

ঃ আমি পাণ্ডা আছি মা। ভয় কিছু নেই আপনার। চলুন, বাবার দর্শণ চাই, চলুন আমার সঙ্গে। কোন কষ্ট হবে না।

ধুতি-চাদর পরিহিত বলিষ্ঠদেহী ঐ বামন আগন্তুকের নির্ভয়তার আশ্বাসে ভয় আরো বেড়ে যায় সুতপার।

ঃ কি, পুরী এসে গেলুম নাকি এত সকালে?

ঃ না মা, এ পুরী নয়, ভুবনেশ্বর মহাতীর্থ আছে। ঐ যে দেখুন না ভুবনেশ্বর মহাদেবের মন্দির। বাবার দর্শনে সমস্ত মনস্তাপ ঘুচে যাবে, সমস্ত আশা পূর্ণ হবে। চলুন আমার সঙ্গে।

ঃ না, আমি ভুবনেশ্বরে যাবো না তো. পুরী যাবো। —এই বলে সুতপা ভুবনেশ্বরের মন্দিরের দিকে তাকাল আর একবার জানালার ফাঁক দিয়ে।

পূর্বে আর কখনো উড়িষ্যায় না এলেও সুতপার পরিচয় আছে এ রাজ্যের ঐতিহ্য সম্বন্ধে। পুরী-ভুবনেশ্বর-কোনার্কের মন্দির-ভাস্কর্য সম্বন্ধে তিনি জ্ঞান আহরণ করেছেন ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে। তিনি ইতিহাসের ছাত্রী।

• সুতপা পুরী যাবেন শুনে পাণ্ডা আর তাঁর কামরায় অনর্থক কালক্ষেপ না করে হাতের খাতার ভিতর থেকে ছাপানো এক টুকরো কাগজ বের করে দিয়ে যায় আর যাবার সময় বলে যায়, 'পুরীতে পৌঁছে এই গোবর্ধন ঠাকুরের খোঁজ করবেন মা, গোবর্ধন পাণ্ডাকে পেলে আর কোন অসুবিধা হবে না আপনার জগন্নাথ দরশনে'।

পাণ্ডাদের এই ধরণের ব্যবসা ও উৎপাতের কথা সুতপা কিছু কিছু শুনেছিলেন কলকাতা থাকতেই. এবার তা' প্রত্যক্ষ করলেন। কামরায় কামরায় উঠে তো বটেই, যে সব যাত্রী বা যাত্রিনী নেমে পড়েছেন ট্রেন থেকে তাঁদেরও কি সহজে এগুবার জো আছে এই পাণ্ডাদের জ্বালায়। সুতপা এসবই লক্ষ্য করছিলেন ট্রেণ থেকে আর ভাবছিলেন বাকি পথটাও এই একা একাই যেতে হবে। ঐ যে ঐ বেঁটে পাণ্ডা-ঠাকুর তাঁর কামরা থেকে নেমে যেয়েই এক ভদ্রমহিলার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে, অথচ তাঁর সঙ্গের যাত্রী ভদ্রলোক এগিয়ে চলে গেছেন অনেকখানি অখেয়ালে। সুতপার ইচ্ছে হয়, ট্রেন থেকে নেমে পাণ্ডাঠাকুরকে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে ছাড়িয়ে দিয়ে আসে ভদ্রমহিলাকে।

এরই মধ্যে হঠাৎ এক প্রৌঢ় বয়সের যাত্রী এসে ওঠেন সুতপার কামরায়। তাঁর হাতে মাঝারি গোছের একটা সুটকেশ। আর কোন মালপত্র নেই তাঁর সঙ্গে, অপর কোন সঙ্গীও নয়।

ভদ্রলোকের দিকে চোখ পড়তেই খুব পরিচিত বলে মনে হয় তাঁকে সুতপার। পরিচয় এতই ঘনিষ্ট যে, বিশেষ একটি নাম সুতপার একেবারে দু' ঠোঁটের ডগায় এসে চাপা পড়ে আছে সামান্য একটু সন্দেহে। সুটকেশটার উপর তাকাতেই সে সন্দেহ শূন্যে মিলিয়ে যায় ধোঁয়ার মত।

ঃ আরে, সমরেশ বাবু এখানে কোথেকে? কোথায় চলেছেন? থাকেনই বা কোথায় আজকাল?

পরিচিত কণ্ঠে একটানা এতগুলো প্রশ্নে হতভম্ব হয়ে পড়েন সমরেশ। স্তব্ধ-বিস্ময়ে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাঁকে হাতের সুটকেশ নামিয়ে রেখে।

ঃ কে, আপনি সুতপা দেবী না? আগেকার মিস্ সেন, এখন মিসেস something, কি বলেন? —বিস্ময়ের ঘোর একটু কাটতেই পাল্টা প্রশ্ন করেন সমরেশ

ঃ ঠিক বলেছেন সমরেশ বাবু, ঠিক বলেছেন। ভালই হলো। উঃ এমনি করে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ভাবতেই পারিনি। বসুন, বসুন!

ঃ তা' বসছি। কিন্তু আপনি একা একা একেবারে পুরীর পথে, তার মানে?

ঃ তার মানে পরে শুনবেন। আগে বলুন আপনারা কোথায় আছেন?

ঃ আমরা কোথায় আছি, এ উত্তর দেওয়া মুস্কিল সুতপা দেবী। তবে আমি বছর আড়াই হলো ভুবনেশ্বরে

ট্রান্সফার হয়ে এসেছি। এখানে একটা নতুন আফিস খুলেছি। তা' নিয়েই দিন রাত কেটে যাচ্ছে।

পুরনো দিনের ব্যথার একটা সুর মর্মরিত হয়ে ওঠে যেন সমরেশের কথায়। গৌরীর সঙ্গে সম্পর্কটা আরো তিক্ত হয়ে উঠেছে বোধহয়। সন্দেহ হয় সুতপার। তাঁর এত চেষ্টা একেবারেই ব্যর্থ তা' হলে। মনের সংশয় চেপে রেখে বলতে সুরু করেন তিনি—

ঃ গৌরী ওর মা'র কাছে গেছে বুঝি? ও এলেই কিন্তু আমাকে জানাবেন। আর আপনি তো পুরীই চলেছেন এখন। চলুন, আমাদের বাড়িতেই উঠবেন। বেশ আমোদ হবে। তা' ছাড়া ওর সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় হয়ে যাবে। বড্ড লোক ভালবাসেন আমার কর্তা। খুবই খুশি হবেন আপনাকে পেয়ে।

ঃ তাই নাকি! বেশ তো, নিশ্চয়ই যাব তা' হলে। তবে এবার নয়। পরে কোন এক সময় আগে থেকে ব্যবস্থা করেই আসা যাবে। —সুতপা দেবীর আমন্ত্রণের উত্তরে সমরেশ চেপে যেতে চান গৌরীর কথা।

ঃ এই নিন, রেখে দিন আমাদের পুরীর ঠিকানাটা তা' হলে। এই বলে এটাচি কেসটা খুলেই নোটবই থেকে এক-টুকরো কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে সুতপা নিজেই লিখে দেন তাঁদের নতুন ঠিকানা আর বেশ জোরের সঙ্গেই আর একবার অনুরোধ জানান সমরেশবাবুকে তাঁদের পুরীর বাড়িতে যাবার জন্যে।

ঃ সে তো হলো, এবার আপনার প্রসঙ্গ বলুন কিছু। নতুন পরিচয়ে পরিচিত হচ্ছেন কদ্দিন ধরে, ভদ্রলোকই কি খুঁজে বার করলেন আপনাকে না আপনি আবিষ্কার করলেন তাঁকে, সে সব রহস্য বলুন, শুনি। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বলেইতো জানার আগ্রহ। তা' না হলে কি আর এমনি খোঁজখবরের সুযোগ হতো কখনো?

ঃ বারে, বেশ পাল্টা অভিযোগ করছেন তো আপনি। আমি চিঠি লিখে লিখে হয়রান। কোন জবাব-পত্র নেই। আর উল্টো কথা শোনানো হচ্ছে আমাকে? গোয়ালিয়র থেকে কলকাতা ফিরেই সেবার আপনাদের দুজনকেই চিঠি দিয়েছি। উত্তর না পেয়ে ফের পত্র দিয়েও জবাব না পাওয়ায় ধরেই নিয়েছি যে আপনারা হয়ত বিরক্ত হয়েছেন আমার উপর কোন না কোন কারণে। তাই অনেকদিন পর্যন্ত আর কোন চিঠিপত্রই দি-ই নি আপনাদের। কিন্তু দু'বছর আগে অধ্যাপক দাশগুপ্তের সঙ্গে বিয়ের কথা যখন ঠিক হলো আমার তখন আর কি চুপ থাকা চলে অভিমান করে? আমার বিয়েতে গৌরী উপস্থিত থাকবে না এতো ভাবতেই পারিনি কোনদিন। কিন্তু তাই হলো। আপনারা এলেন তো নাই, এমন কি দু'লাইনের একটা চিঠিতে একটু শুভেচ্ছাও এলো না আপনাদের কাছ থেকে।

সমরেশ বাবু গম্ভীর ভাবে শুনে যান সুতপা দেবীর কথা। কী যে উত্তর দেবেন ভেবেই যেন পান না কিছু। কেমন একটা অধৈর্য অস্থিরতার ভাব ফুটে ওঠে তার চোখে-মুখে। তবু যেন অনেকটা জোর করেই নীরব থাকেন তিনি।

গাড়ি চলছে। গাড়ি চলার সঙ্গে সঙ্গে সুতপা দেবীও বলে চলেছেন—

ঃ জানেন সমরেশ বাবু, অধ্যাপক দাশগুপ্ত গৌরীরও খুবই পরিচিত। আমাদের স্কুল-জীবনে আমরা দু'জনেই পড়েছি তাঁর কাছে। এ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাষ্টার ছিলেন তিনি আমাদের স্কুলে। তারপর মাষ্টারি করতে করতেই ভদ্র-লোক ইংরেজীর এম্-এ হয়েও আবার ইতিহাসের এম্-এ পরীক্ষা দিয়ে brilliant result করে কলকাতার একটা নতুন কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। আমিও সে কলেজ থেকেই ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেছি। এই দিন বার আগে পুরী কলেজে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে join করেছেন তিনি। আমারও একটা চাকুরী জুটে গেছে পুরী গার্লস স্কুলে। তাই সেখানেই যাচ্ছি। বলুন তো, গৌরী থাকলে কী-ই না আনন্দ হতো বিয়েতে!

ঃ তা' হতো নিশ্চয়ই। কিন্তু কী করেই বা জানবে গৌরী আর কী করেই বা সে উপস্থিত থাকবে আপনার বিয়েতে? —নীরবতা ভেঙ্গে উত্তর দেন সমরেশ-বাবু।

ঃ কেন?

ঃ আর কেন! গৌরী কি আর আপনার চিঠি পেয়েছে কোন? সে তো প্রায় আপনার সঙ্গে সঙ্গেই উধাও হয়েছে গোয়ালিয়র থেকে।

ঃ সে কি? —আঁৎকে ওঠেন সুতপা দেবী এই কথা শুনে।

ঃ আমার উপর রাগ করে চলে যাবার আগে আমার জন্যে এটুকুই শুধু সে লিখে রেখে গেছে, "তোমার মত প্রাণহীন নিষ্ঠুরের সঙ্গে আমার জীবনকে আর বেঁধে রাখা চলে না। তোমার সংসার রইল। আমি চললাম। শুভার খোঁজে।"

ঃ কী সাংঘাতিক কথা! সেই থেকে একদম নিখোঁজ গৌরী? —সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে সুতপার এটুকু প্রশ্ন করতে। জিহ্বা-আড়ষ্ট হয়ে আসে আর কোন কথা বলতে।

ঃ পাঁচ বছর ধরে কোন চেষ্টারই ত্রুটি করি নি তাকে খুঁজে বার করার। কিন্তু তাতেও যখন কোন সন্ধানই

পাওয়া গেলনা তখন চুপ করে গেলাম। আপনার কাছেও একবার খোঁজ করব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু ন'-দশ মাস পর হঠাৎ আপনার দ্বিতীয় পত্রখানা পেয়েই বুঝলাম আপনিও কোন সন্ধান রাখেন না গৌরীর। পৃথিবীর কেউ আর তার খবর রাখে, এ বিশ্বাস আমি হারিয়েছি গোয়ালিয়র থাকতেই। তারপর চলে এসেছি এই ভুবনেশ্বরে। প্রতি রোববার যাই পুরী-তীর্থে। সেখানে সীমাহীন সমুদ্রের কূলে দাঁড়িয়ে আমি ধ্যান করি সেই অসীমের যে অসীমের কোলেই হয়ত যেয়ে গৌরী শেষ আশ্রয় নিয়ে থাকবে আমার নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদে। আমিই নাকি তার শুভার হত্যা-কারী!

ঃ একি বলছেন সমরেশ বাবু? আমার পাপের প্রায়-শ্চিত্ত আপনাকে করতে হচ্ছে এভাবে? আমিই যে গোয়া-লিয়র থেকে বিদায় নেবার দিন ভোর সকালে ঘুম থেকে উঠেই শুভাকে একা পেয়ে তাকে জানালার ভিতর দিয়ে সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম ড্রেনের দিকে। ভেবে-ছিলাম, আপনাদের পারিবারিক জীবনের সব অশান্তি দূরে হয়ে গেল সেই সঙ্গে। তার ফল হলো এই!

সুতপা এই বলে উঠে পড়েন তাঁর আসন ছেড়ে। সম-রেশ বাবুর পাশে যেয়ে দাঁড়িয়ে এক বেদনার্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তিনি। সমরেশ খোলা জানলায় তাঁর দু'হাতের উপর মাথা রেখে গৌরীর কথা ভাবতে ভাবতে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন তখন। টেনে তোলেন তাঁকে সুতপা দেবী। নীরব কান্নায় অশ্রুসজল চোখে নিস্পন্দ বসে থাকেন সমরেশ। নিরালা এক চলন্ত ট্রেনের কামরায় সে দৃশ্য অসহ্য মনে হয় সুতপার। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মুখ-মণ্ডল ব্যথার কালিমায় ছেয়ে যায়। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে তাঁর দু'চোখ বেয়ে। ট্রেনের কামরায় জানালার পাশে হেলান দিয়ে সুতপাও নিশ্চল দাঁড়িয়ে।

ঊর্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে পুরী এক্স্‌প্রেস। লক্ষ্য নীলা-চল। আর বেশি দূরে নয়। অসীমের আহ্বান ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে ভেসে আসছে।

অন্তরীপ

কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত

সূর্যের মশাল জ্বলে অন্ধকার মনের গুহায়
শপথ-শাণিত ছন্দে; সামুদ্রিক হাওয়ার সেনানী
বিষবাষ্প-কলুষিত মননের সাম্রাজ্য-চূড়ায়
রেখে দেয় জীবনের চিরন্তন স্নিগ্ধ-সুস্থ বাণী
কবন্ধ-সভ্যতা-বন্ধ পৃথিবীর প্রাণের বন্দরে
সুস্থ নবজাতকের জীবনের স্বর্ণ-তরী
আচম্বিতে আসে আজো; কান্নার বিষন্ন বালুচরে
আনন্দ-আশার গান অলক্ষিতে এখনো নির্ঝরি'
পড়ে যেন হৃদয়ের ব্যথা-রুক্ষ ধূসর প্রান্তরে
অসীম কালের বজ্রদর্পণের প্রতিবিম্বে কাঁপে
স্বর্ণিল ভবিষ্য; দীপ্ত জীবনের শপথ-স্বাক্ষরে
ভগ্ন-পিষ্ট-মন তবু পুনর্ণব রক্তের উত্তাপে
নাস্তির সমুদ্রে দেখে অস্তির অনন্ত অন্তরীপ
ললাটে পরানো যার সবুজের চিরস্বপ্ন-টিপ।

নদী

বীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত

ঝড়ের মতন নদী, কখনো উত্তাল তার স্রোত
ক্ষিপ্রতা-প্লাবন নিয়ে ছুটে চলে সমুদ্র অবধি,
মাঝখানে নানা গ্রাম প্রান্তরের অরণ্য, পর্বত—
শৈলস্তূপ ভেঙে যায়, তারুণ্য-প্রমত্ত যেন নদী!
দ্রুত যেতে সোজা ঘাড় করে রাখে সর্বদা উদ্যত।
একটি প্রচণ্ড শক্তি দুর্বিষহ প্রচুর প্রবাহ
ফেনিল মত্ততা আনে, দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার মত।
হে নদি, ঝড়ের চেয়ে আরো দ্রুত বহে যেতে চাহ?
হে নদি, দুর্বার গতি—তোমার প্রবাহগুলি হায়—
কেন নিত্য ঊর্মিমালা অনর্থক সৈকতে ছড়াও?
—সেই দীপ্ত বহ্নিরাশি মানুষের মাঝে ছুঁড়ে দাও ঃ
তড়িৎ-প্রবাহশক্তি, যার স্পর্শে সমগ্র সত্তায়
পূর্ণতেজ সাড়া আনো, সমস্ত জড়তা যেন যায়।
হে নদি, তফাৎ নয় ক্ষিপ্রগতি এ মন ভাসাও।

ভারতীয় শিল্প-সংকটের একটি দিক

ভবানী সেন

ভারতীয় শিল্পপতিদের কোন কোন মহলে এই বলে গর্ব প্রকাশ করা হয়ে থাকে যে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় অর্থনীতির অনেক উন্নতি হয়েছে। এই ধারনার স্বপক্ষে প্রধান তথ্যস্বরূপ দেখানো হয়ে থাকে যে গত পাঁচ বছরে ৪৫০ কোটি টাকার ওপর বিভিন্ন শিল্পে মূলধন নিযুক্ত হয়েছে। তা ছাড়া আরও দেখানো হয়ে থাকে যে ভারত এখন কয়েকটি পণ্যে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী, সে পণ্যগুলি হচ্ছে ড্রাই ব্যাটারী, ইলেক্‌ট্রিক মটর, ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান, এন্টিমনি প্রভৃতি।

কিন্তু ভারতের সাধারণ লোক প্রতিদিনই অনুভব করে থাকেন যে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত ত হয়ই নি, বরং অবনতির দিকে গেছে। ভারতীয় শিল্পের কোন চমকপ্রদ উন্নতি হলে জনসাধারণ তা নিশ্চয়ই অনুভব করতে পারতেন, কারণ জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির গোড়ার কথা হ'লো জনসাধারণের জীবনধারণের মানের উন্নতি। সেদিক দিয়ে বিচার করলে ইদানিং ভারতীয় অর্থনীতিক ক্ষেত্রে উন্নতির পরিবর্তে যে অবনতি ঘটেছে তার প্রধান পরিচয় অবশ্য খাদ্যব্যবস্থার অবনতি এবং দুর্ভিক্ষ। এবার শুধু এক পশ্চিমবংগেই ৫০ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়েছে।

শুধু খদ্যসংকটই যদি ভারতের অর্থনৈতিক অবনতির একমাত্র পরিচয় হ'ত তা হলে এটাকে একটা বিশেষ সমস্যার অন্তর্গত করা যেত, কিন্তু সমস্যা তার চেয়েও গভীরতর। তার প্রধান পরিচয় হচ্ছে এই যে ন্যাশনাল ইনকাম কমিটির রিপোর্ট অনুসারে ১৯৩৮ থেকে ১৯৫০ এই বার বছরে গড়ে প্রত্যেক ভারতবাসীর আর্থিক আয় বেড়েছে ৩·৩৬ গুণ কিন্তু জিনিষের দর বৃদ্ধির সংগে তুলনায় আসল আয় কমেছে শতকরা ১০·১ ভাগ। অথচ ঠিক এই সময়ের মধ্যে নানাবিধ সরকারী ট্যাক্সের বোঝা বেড়েছে গড়ে মাথাপিছু ৬৷৷৪ পাই থেকে ২৩৷৷/১১ পাই, অর্থাৎ ৩·৬৪ গুণ বেড়েছে।

জাতীয় অর্থনৈতিক সংকটের মূলকথা হ'লো এই যে পণ্যের দর যে মাত্রায় বেড়েছে উৎপাদন সে মাত্রায় ত বাড়েই নি বরং অনেক ক্ষেত্রে কমেছে।

পণ্যের দর গত কয়েক বৎসর ক্রমাগতই বাড়ছে। তার মধ্যে ১৯৫০-এর জানুয়ারী থেকে নভেম্বর এই দশ মাসেই সমস্ত পণ্যের সাধারণ দরের মাত্রা ৩৮৪·৭ থেকে বেড়ে ৪১০·১ হয়েছিল, অর্থাৎ শতকরা ৭ ভাগ বেড়েছিল। এ বৎসর গোড়ার দিকে হঠাৎ পণ্যের দর কমার যে ধারা আরম্ভ হয়েছিল, কলকারখানার মালিকদের চীৎকারে সরকার তা থামিয়ে দিয়েছে। অবশ্য কৃষিক্ষেত্রে তুলো, পাট প্রভৃতি অর্থকরী পণ্যের দাম বাড়াবার কোন ব্যবস্থা হয় নি। তাতে সুবিধে হয়েছে কাঁচামালের খরিদ্দার শিল্পপতিদের, সংকট বেড়েছে কৃষকদের।

দর বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদন যে কত পেছনে পড়ে আছে তার প্রধান উদাহরণ অবশ্য খাদ্যের ঘাটতি। ১৯৫১-৫২ সালে সারা ভারতে খাদ্যের ঘাটতি হ'ল ৭০ লক্ষ টন, যদিও ১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত ভারত সরকার কর্তৃক ফসল বাড়াবার জন্য ৪৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

শিল্পক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ১৯৫০ সালে ২৬টি প্রধান প্রধান শিল্পের মধ্যে ৯টা শিল্পে উৎপাদন সাংঘাতিকভাবে কমেছিল আর ১৭টা শিল্পে নামমাত্র বেড়েছিল।

যে যে শিল্পে উৎপাদন বেশী কমেছিল তার মধ্যে সুতোর উৎপাদন শতকরা ১৪·২ ভাগ, কাপড় শতকরা ৪·৩ ভাগ, চট শতকরা ২২·৮ ভাগ এবং মেশিন টুল শতকরা ৬০·২ ভাগ কমে যায়।

এর পর ১৯৫১ সালে উৎপাদন সমস্ত ক্ষেত্রেই কিছু কিছু বেড়েছে, এ বৎসর আগের বৎসরের তুলনায় সমস্ত শিল্পের সাধারণ উৎপাদন বৃদ্ধির মাত্রা হচ্ছে শতকরা ১৫ ভাগ। (ইন্‌ভেস্টর, এপ্রিল ১৯৫২)। কিন্তু এ বৃদ্ধির প্রধান কারণ কোরিয়ার যুদ্ধের পর হঠাৎ সমস্ত পণ্যের অস্বাভাবিক দর বৃদ্ধি। কাজেই এই উন্নতির ধারা ১ বছরের বেশী আর টেকেনি।

১৯৫২ সালে উৎপাদনের ক্ষেত্রে আবার দেখা দিয়েছে সংকট, এ সংকট ১৯০৫ এর তুলনায় গভীরতর। পশ্চিম-বংগ সরকারী দপ্তরের এক বিবরণ অনুসারে ঐ বৎসর এই রাজ্যের অনেক যৌথ কারবার তালাবন্ধ করেছে এবং তার ফলে বেকারের সংখ্যা গিয়েছে বেড়ে।

ভারতীয় আর্থিক সংকটের গুরুত্ব সবচেয়ে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় এই তথ্য থেকে যে ১৯৪৯-৫০ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্যে মোট ঘাটতির পরিমাণ ৯৪ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা, ১৯৫০-৫১ সালে ঘাটতি হয় ১১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা; এবং ১৯৫১-৫২ সালের যে হিসেব এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় সমুদ্র এবং বিমান-পথে যে বহির্বাণিজ্য হয় তাতেই ঘাটতি পড়েছে ১৫৬ কোটি টাকা! পি টি আই-এর এক বিবরণ অনুসারে (২৪শে এপ্রিল), মোট ঘাটতি আরও বেশী হবে।

ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের এই সংকটের বিশেষ কারণ কি? শিল্প এবং বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারে ভারত সরকার যে নীতি অবলম্বন করছে তাতে ইংগ-আমেরিকান রপ্তানি কারকদের প্রতি ভারতীয় জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব রয়েছে।

ষ্টীল, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য এবং রাসায়নিক পদার্থ এইগুলি হচ্ছে জাতীয় অর্থনীতিতে শক্তির উৎস। ভারত সরকার এই সমস্ত শিল্পের বিকাশের দাবী উপেক্ষা করে বিদেশীদের দাবী পূরণ করছে। ১৯৫১ সালের ১৪ই জুন ভারত সরকার বিদেশ থেকে আমদানির যে নীতি ঘোষণা করে তাতে এই ধরণের কয়েকটি পণ্যের দর বাড়িয়ে দেওয়া হয় দ্বিগুণ, তা ছাড়া এইসব পণ্যের আমদানি-লাইসেন্সও বাড়ান হয়।

বিদেশ থেকে ষ্টীল আমদানির জন্য ভারত সরকার 'সাবসিডি' দিয়ে থাকে প্রতি টনে ৩০০ টাকা। অথচ ১৯৫২ সালে অপরিহার্য খাদ্য আমদানির সাবসিডি বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে এই অজুহাতে যে সরকারী অর্থ এ ভাবে আটকে রাখা চলে না। কিন্তু ষ্টীলের সাবসিডি বন্ধ করলে বার্ষিক ৩০ কোটি টাকা বাঁচত। [ইনভেষ্টর, এপ্রিল ১৯৫২, ২৭ পৃষ্ঠা]

প্রতি টনে ৩০০ টাকা সাবসিডি দিয়ে বিদেশ থেকে যে ষ্টীল আমদানি করা হচ্ছে তার আবার অনেকটাই এ দেশে ব্যবহারের অযোগ্য, এবং ভারতীয় ষ্টীল শিল্পকে সাহায্য করলে তারা উৎপাদন যথেষ্ট বাড়াতে পারে। কিন্তু সরকারী সাবসিডি ভারতীয় ষ্টীল-শিল্প পাচ্ছে না, পাচ্ছে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী বিদেশী একচেটিয়া ষ্টীল কোম্পানি। এমন কি ভারত সরকারের পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাতেও ভারতে ষ্টীল শিল্পের প্রসার এক রকম উপেক্ষাই করা হয়েছে। বর্তমানে ভারতের বাৎসরিক ষ্টীল উৎপাদনের পরিমাণ ১০ লক্ষ টন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উৎপাদনের পরিমাণ ধরা হয়েছে মাত্র ১৫ লক্ষ টন।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথমাংশে মোট ১৪৯২·৯২ কোটি টাকার মধ্যে শিল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ১০০·৯৯ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট অর্থের মাত্র ৬·৭ ভাগ। ভারত সরকারের নীতি যে জাতীয় শিল্পের বিরোধী নীতি, তা এই তথ্য থেকেই বোঝা যায়।

ভারতের জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে ইংগ-আমেরিকান একচেটিয়া শিল্পপতিদের প্রতি ভারত সরকারের পক্ষপাতিত্বের সবচেয়ে জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায় এই তথ্য থেকে যে ঐ সব বিদেশীদের এমন সব বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে যা এদেশের শিল্পপতিদের দেওয়া হয় না। তার একটি উদাহরণ আমরা দিয়েছি, সেটা হচ্ছে ষ্টীল আমদানির জন্য সরকারী সাবসিডি। আর একটা উদাহরণঃ—ভারত সরকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে তারা এদেশে মূলধন খাটালে তাদের পণ্যের দর বাইরে থেকে আমদানি পণ্যের দরের চেয়ে কমিয়ে দেওয়া হবে না। অথচ ভারতীয় শিল্পকে এ রকম সুবিধে দেওয়া হয় না। ভারতীয় ষ্টীলের দর আমদানি ষ্টীলের দরের চেয়ে কমই রাখা হয়েছে।

১৯৪৯ সালে ডলারের সংগে ভারতীয় টাকার হার কমানো হয়েছিল। তার ফল হলো ভারতে সমস্ত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি,—অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির সামিল; তখন যুক্তি দেখানো হয়েছিল এই যে এই ব্যবস্থার ফলে ভারতের রপ্তানি বাড়বে। এটা যে কতবড় ফাঁকি তা ধরা পড়েছে বহির্বাণিজ্যের দরুণ ঘাটতি থেকে। উপরন্তু তার ফলে ভারতীয় জনগণের জীবনধারণের ব্যয় গেছে বেড়ে আর ক্রয়শক্তি গেছে কমে। অন্যান্য কারণের মধ্যে এই কারণে ভারতের বাজারে ভারতীয় শিল্পের ঘাটতি কমেছে এবং দেখা দিয়েছে শিল্প-সংকট। ফলে, শুধু এক পশ্চিম-বংগেই ১৯৫১ সালের মার্চ থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে মোট ৩৭টি যৌথ কারবার বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের মূলধনের পরিমাণ তিন লক্ষ টাকা।

ডলারের সংগে টাকার হার কমানোর মূলে ছিল আমেরিকার স্বার্থ, এ ব্যাপারে আমেরিকানদের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের হটিয়ে বৃটিশ কমনওয়েলথের বাজার দখল

করা। ভারত সরকার টাকার মূল্য কমিয়ে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের খাতিরে ভারতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েছে।

কিন্তু টাকার মূল্য হ্রাস করার ফলে প্রকারান্তরে ভারতীয় শিল্পপতিদেরও একটা সুবিধা হয়ে যাচ্ছিল। সেটা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতির দরুণ মূলধনের স্বচ্ছলতা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি। ১৯৫০ সালে হয়েছিল অনেক শিল্পে উৎপাদন হ্রাস, কিন্তু ১৯৫১ সালে হচ্ছিল উৎপাদন বৃদ্ধি। এই ধারা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্গত অন্যান্য দেশেও দেখা দেওয়া সম্ভব। এতে আমেরিকান পুঁজিপতিদের স্বার্থে ঘা লাগত। তাই ১৯৫২ সালে তারা ইংলণ্ড এবং ভারতকে বাধ্য করল সরকারী ও আধা-সরকারী ব্যাঙ্কে সুদের হার বাড়াতে। তার ফলাফল আমরা দেখেছি। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে সুদের হার বাড়ানোর পরই দেখা দিল শেয়ার বাজারের সংকট, শেয়ারের মূল্যের অধোগতি এবং মূলধনের টানাটানি।

এমনি করেই ভারত সরকারের নীতি জাতীয় শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষতিসাধন করছে, এমনি করেই আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতীয় অর্থনীতির উপর তাদের প্রভাব বিস্তার করছে, এবং এমনি করেই ভারত সরকার আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীর নির্দেশ মেনে ভারতের জাতীয় স্বার্থের ক্ষতিসাধন করছে।

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীর লক্ষ্য হলো ভারতে ইংরেজদের যে বাজার ছিল সেটা দখল করা এবং ভারতকে অনুন্নত রেখে দিয়ে সস্তায় কাঁচামাল কেনা আর চড়াদরে তাদের দেশের তৈরী মাল বিক্রী করা।

গত ৩রা আগষ্ট কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত শিল্প-সংকট সম্মেলনে ডাঃ কুমারাপ্পা বলেনঃ—

"আমাদের দেশে বৈদেশিক মূলধন ও পণ্যসম্ভারের প্রাধান্যই অর্থনৈতিক তথা শিল্প ও কৃষি-সংকটের মূল কারণ। অতীতে বৃটিশ মূলধন ও পণ্য সম্ভারের প্লাবনে আগমনে যে অধ্যায়ের সূচনা, বর্তমানে মার্কিণ মূলধন ও পণ্যসম্ভারের প্লাবনে সেই অধ্যায়ের নিরবচ্ছিন্ন ধারা। মার্কিণ ও বৃটিশ আরণ্য অর্থনীতি হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না করিলে আমাদের সংকটের সমাধান নাই।"

['স্বাধীনতা', ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৫২]

উল্লিখিত উক্তির ভিতর দিয়ে ডাঃ কুমারাপ্পা ভারতীয় শিল্প-সংকটের নাড়ির কথাই টেনে বের করেছেন।

তবে একথা বললে ভুল হবে যে ভারতে বর্তমানে বৃটিশ পণ্যসম্ভারের স্থান আমেরিকান পণ্যসম্ভার দখল করে ফেলেছে। আমেরিকান বণিকেরা ভারতীয় বাজার দখল করার চেষ্টা করছে সত্য, কিন্তু এখনও ভারতীয় বাজারে ব্রিটিশ মূলধন এবং ব্রিটিশ পণ্যেরই আধিপত্য বেশী।

১৯৫১-৫২ সালের প্রথম ছয় মাসে বৃটেন বিদেশে কলকব্জা রপ্তানি করেছে মোট ৫৫২,৭১২ টন এবং তার মূল্য ২১৮,৮১৭,০০০ পাউণ্ড ষ্টার্লিং। তার মধ্যে ভারতেই রপ্তানি করেছে ৫২,৩৮২ টন এবং তার মূল্য ১৯,০০০,০০০ পাঃ ষ্টার্লিং। এক অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া আর যে কোন দেশে ব্রিটেন যে পরিমাণ কলকব্জা রপ্তানি করেছে তার চেয়ে ভারতে রপ্তানির পরিমাণ ঢের বেশী। এই ছয় মাসে বৃটেন ভারত থেকে আমদানি করেছে মোট ৬৩,৩৩৭,৬১৭ পাঃ ষ্টার্লিং মূল্যের পণ্য আর ভারতে রপ্তানি করেছে মোট ৫৯.১৩০,৭৫৯ পাঃ ষ্টার্লিং মূল্যের পণ্য।

সম্প্রতি 'কমিউনিটি প্রজেক্ট' উপলক্ষে আমেরিকার সংগে ভারত সরকার ৮টি চুক্তি সম্পন্ন করেছে। এই সমস্ত চুক্তির মধ্যে দেখা যায় যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে কৃষি ব্যবস্থা উন্নতির জন্য যে সার এবং যন্ত্রপাতি দরকার হবে—তা আমদানি করতে হবে আমেরিকা থেকে। অর্থাৎ এ সমস্ত পদার্থ ভারতে তৈরী করবার কিংবা দুনিয়ার অন্য কোন দেশ থেকে কিনবার স্বাধীনতা রইল না।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মার্শাল প্ল্যান পরিচালনা থেকেই দেখা গেছে যে আমেরিকা অন্য দেশকে যে অর্থ-সাহায্য দান করে তার বিনিময়ে আমেরিকা থেকে পণ্য-সম্ভার কিনবার সর্ত লগান থাবে, তা আমেরিকার পণ্য যত খারাপই হোক আর যত অক্রাই হোক। ভারতকে ট্রুমানের ৪ দফা পরিকল্পনা অনুযায়ী যে অর্থ দেওয়া হচ্ছে তার সংগেও অনুরূপ সর্ত জোড়া আছে। এর ফলে ভারতের শিল্প-সংকট আরও গভীরতর হবে, কেননা আমেরিকান পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা করার কোন অধিকারও আর থাকছে না।

ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার হয়ে উঠছে সে সম্বন্ধে ব্যবসায়ী মহলের মনে কোন সন্দেহ নেই। সরকারী ঋণসংগ্রহ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে 'স্টেটস্ম্যান' পত্রিকার (৪-৮-৫২) আর্থিক বিষয়ের সংবাদদাতা লিখছেন—

'ইদানিং মূলধনের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন দেখা

দিয়েছে। সরকারী ঋণ গ্রহণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সঠিক পরিকল্পনা করার উপযোগী অতীতের মত শুভযোগ আর যে কখনও পাওয়া যাবে তা মনে হয় না।"

মন্দা ঠেকাবার জন্য সরকারের সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও দেখা যায় যে আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহেও:

"কলকাতা ফটকার বাজারে কারবার পড়ন্ত অবস্থাতেই চলছে। লগ্নী কারবারের জন্য মূলধনের কোন চাহিদা নেই, আবার বিক্রীর জন্যও কোন চাপ নেই। দর যা কমছে তার কারণ হ'লো ব্যবসায়ের মন্দা অবস্থা।"

['ষ্টেট্‌সম্যান', ৪-৮-৫২]

আজি মোর কৃতার্থ জীবন

বীণা দেবী সেন

হে বেদনা, পূর্ণ জয়শ্রীতে ভরা ললাট আমার
জয়মাল্য গলে
উপেক্ষিত চিত্ত মম, আজি তোমা বন্দে বারম্বার
নয়নের জলে।
যবে তুমি ছিলে দূরে দূরে দূরান্তরে
অনাত্মীয়া মত
ভ্রূকুটির তীব্র তেজে রেখালে বিরাগে
জীবনে সতত
তোমার সে দীপ্তি বহ্নিশিখা দহিয়াছে তনু মোর
সারা প্রাণখানি
শাপভ্রষ্টা দেববালা ফেলিয়াছে নয়নের লোর
যুক্ত করি পাণি।
অভিশপ্ত জীবনের তীব্র হাহাকারে বিফল রোদনে
আকাশ প্রান্তর
অহর্নিশি কাঁদিয়াছে শুধু কাঁদিয়াছে তার সনে
বিশ্ব চরাচর
তোমার পরশ রবি অস্তমিত ক্ষণিকের লাগি
চির অন্ধকার
বিভীষিকা সম শুধু রহিয়াছে নীরবেতে জাগি
দেউলে আমার।
তোমারে হারায়ে আমি হারায়েছি মোর দেবতারে
জীবন নির্মূল
উচ্ছৃঙ্খল তরীখানি ভাসায়েছি দুখ পারাবারে
বায়ু প্রতিকূল
নিজেরে করিয়া কেন্দ্র ঘুরিয়া মরেছি ব্যর্থ সব
হইয়াছে খেলা
হৃদয় অতল দেশে শুনিয়াছি চির কলরব
ভাঙ্গিয়াছে মেলা।
না পাওবার সে বেদনা ভাঙ্গিয়াছে অন্তরেতে মোর
কাঁটা হয়ে বিঁধে—
হে সজনি পড়েছিল অভাগীর রুদ্ধ অশ্রুধার
কোন অপরাধে?
তোমার ভৈরবমূর্তি করিয়া স্মরণ কেহ যদি
হয় সশঙ্কিত
সেই অভিমানখানি অন্তরেতে তব জাগে নিরবধি
থিবিয়া সতত।

নির্মম সুতীক্ষ্ম শরে বিঁধিয়াছে তোমা করে উপহাস
করিয়াছে শুধু
তোমারে হেরিয়া যদি ফেলে অশ্রু, ফেলে দীর্ঘশ্বাস
হে আমার বঁধু—
সে কঠোর প্রতিশোধ লইলে কী আমার উপরে
ওগো অকরুণ
তুমি যে অমোঘ দণ্ড ভুল করে দিয়াছ আমারে
তীব্র নিদারুণ।
যার যাহা মনে হয় বলুক তোমারে যাব যাহা খুশী
দিক্ অপবাদ
তুমি মোর অন্তরেতে হাসিয়াছ সুমধুর হাসি
ঘুচিল বিবাদ
এত দীর্ঘদিন পরে তোমার পাষাণ প্রাণে জাগে
করুণার রেখা
তাই তুমি রাঙ্গা হয়ে আসিয়াছ নব অনুরাগে
দিতে মোরে দেখা।
আজি মোর কৃতার্থ জীবন তোমার মাধুরী হেরি
তপস্যা সফল
সংগ্রামের শেষে আজি বাজিতেছে বিজয়ের ভেরী
নিভিল অনল
বহু যাগ যজ্ঞ করি লভিয়াছি তপস্যার ফলে
হৃদয়ের ধন
তোমারে হেরিয়া সখি হর্ষে ভাসি নয়নের জলে
এই শুভক্ষণ
চূর্ণ করি দাও মোর সর্ব দেহ মন নয়ন পলকে
তবু রহ কাছে
যেন করে তব প্রেমখানি ঝলকে ঝলকে
যাহা তব আছে
নিঃশেষ করিয়া দিনু আমার জীবনে যাহা পারি
কাছে লহ টেনে
তোমার আদেশ যদি তীব্র হয় কভু হে দর্পহারী
লব তাহা মেনে—
বহ্নির শিখাতে যেন হয় মোর পরীক্ষা কঠিন
হে জীবন সখি
আর মোরে ফিরায়োনা উন্মীলিত রহে নিশিদিন
অন্ধ দুটি আঁখি।

রণজিৎ কুমার সেন

সারা বছর ধ'রে ক'ল্‌কাতার কর্ম্মমুখর জীবনের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠি। ছুটিছাটা যে না থাকে, তা নয়, কিন্তু তাকে উপভোগ ক'রবার মতো মনের অবস্থা থাকে না। কখনো সখনো এখানে-ওখানে বেরিয়ে প'ড়বার উদ্যোগ ক'রেছি, কিন্তু উদ্যোগ-আয়োজনেই সমস্ত উৎসাহ নিঃশেষিত হ'য়েছে, বেরোনো আর হয়নি। কেন হয়নি, সে কথা বলা বড় কঠিন। ফলে কোনো ছুটি বা একটানা মাসিকপত্র প'ড়ে কাটিয়েছি, কোনো ছুটি বা একেবারেই ঘুমিয়ে। ক'ল্‌কাতার কর্ম্মমুখর জীবনের অবকাশগুলি এইভবেই দিনগত পাপক্ষয়ে পর্য্যবসিত হ'য়ে একই নিয়মে বর্ষচক্র ঘুরে চলেছে।

এবারে পুজোর ছুটিতে তাই ঠিক ক'রলাম—প্রতিদিনের এই জড়তা থেকে যে-ক'রেই হোক্ উত্তীর্ণ হ'তে হবে। সুযোগও একটা এসে গেল। আমাদের অফিসের সহকর্মী সমর দত্তের সঙ্গে লোয়ার ডিভিশনের একই গ্রেডে পাশাপাশি বসে কাজ করি ব'লে মাখামাখিটাও তার সঙ্গে দীর্ঘ দিন থেকেই বেশী। দুজনেই অকৃতদার এবং বোর্ডিং-আশ্রিত। দুজনে তাই দুজনের মনের গভীরে ঠাঁই ক'রে নিতে দেরী হয়নি। সম্বোধনের বালাইটাও ক্রমে আপ্‌নি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে, নইলে বন্ধুত্বে বাধে। গিরিডিতে মস্তবড় ব'নেদী বাড়ী সমর দত্তদের। দু'-পাঁচ দিনের বেশী ছুটি হাতে পেলেই অম্‌নি আর কথা নেই তার, সোজা গিরিডি। এবারে পুজোর ছুটি এগিয়ে আস্‌তেই সমর দত্ত ধ'রে বস্‌লো: 'আপত্তি না থাকে তো চলো গিরিডি গিয়ে এবারে উশ্রী-ফল্‌স্ দেখে আস্‌বে।'

প্রস্তাবটা লাভজনক না হ'লেও লোভজনক সন্দেহ নেই। উশ্রী নামের সঙ্গে নিজের জীবনটাই কি কম জড়িত! অফিস ছুটি হ'তেই এবারে তাই সত্যি সত্যিই ক'ল্‌কাতাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রলাম। হাওড়ায় এসে ট্রেনে উঠে ব'ল্‌লাম, 'ভ্রমনটা ঐতিহাসিক সন্দেহ নেই, নইলে বাংলা ছেড়ে হঠাৎ এমন বিহারে পা বাড়াবো কেন?'

মুচ্‌কি হেসে সমর দত্ত বল্‌লো, 'বিহার ক'রতে হ'লে বিহারই যে দরকার; ভারত-রাষ্ট্রতন্ত্রের কর্ণধার অবধি আজ বিহারী। বিহার-দর্শন না ক'রে উপায় কি?'

কথাটা দ্ব্যর্থবাচক হ'লেও বুঝতে কষ্ট হ'লো না। ব'ল্‌লাম, 'বাড়ী গিয়ে কিন্তু পরোটা আর অর্‌হর্ ডালেই খাবার মেনু শেষ কোরো না। গরীবের রসনাকে তবে পীড়া দেওয়া হবে।'

আসলে ও দুটো পদার্থই চিরকাল আমার কাছে বর্জ্জনীয়। আলাপ-আলোচনার সূত্র থেকে সমর দত্তের একথা অজানা ছিল না। কথা শুনে তাই টিপ্পনি কেটে ব'ল্‌লো, 'পরোটা আর অর্‌হর্ না চলে তো ক্ষতি নেই, জোয়ার আর বজ্‌রার চাষ গিরিডির প্রায় একচেটিয়া। মেনু হিসেবে মন্দ হবে কি!'

ব'ল্‌লাম, 'কেন, জোয়ার আর বজ্‌রা খেয়েই গিরিডির মানুষ ভারত-রাষ্ট্র চালনা করে নাকি?'

কথাটা বলায় বোধ করি এবারে সমর দত্তের আগের কথাটার পাল্টা জবাব দেওয়া হ'লো — শব্দ ক'টি উচ্চারণ ক'রে মনে মনে তাই কিছুটা খুসীবোধই ক'রছিলাম।

ইতিমধ্যে বাধা দিয়ে সমর দত্ত ব'লে উঠ্‌লো: 'সিডিশন, রাষ্ট্রের দিক থেকে তোমার এ উক্তি ঘোরতর আপত্তিকর। এক্ষুদি উইথ্‌ড্র করো।'

ব'ল্‌লাম, 'তা হ'লে তো খাবার মেনুটাকেই পুরোপুরি উইথড্র ক'রতে হয়!'

—'তোমার মতো এমন স্যিলি লোক দেখিনি মাইরি।' ব'লে পকেট থেকে একটা সিগারেট বার ক'রে ধরিয়ে নিল সমর দত্ত। ব'ল্‌লো, 'বলি, গিরিডির মানুষগুলোকে ভেবেছ কি, বলো তো? তারা কি গরু-ছাগল—না লেজ-বিশিষ্ট কোনো কিষ্কিন্ধার জন্তু!'

হেসে ব'ল্‌লাম, 'সবগুলোই যে চতুষ্পদীর নাম ক'রলে, এর মধ্যে দ্বিপদী কোথায়? পদার্থের যুগে এসে পদ ভুলে তুমি একেবারে অপদার্থ হ'য়ে গেছ, দেখ্‌তে পাচ্ছি। এই বিদ্যে নিয়ে আপিসে লোয়ার ডিভিশন থেকে আপার ডিভিশনে উঠ্‌বে কি ক'রে?'

কথাটায় এবারে তর্কের মোড় ফিরলো।

কিছুক্ষণ স্থির হ'য়ে ব'সে কি যেন একবার ভাবলো সমর দত্ত, তারপর ব'ল্‌লো, 'মিঃ ভোস আমাদের ডিভিশন থেকে ট্রান্স্‌ফার না হওয়া পর্যন্ত উঁচলে চ'ড়বার কোনো আশাই নেই।'

কথাটা আদৌ মিথ্যে নয়। অফিসে মিঃ ভোস আমাদের ডিভিশন-ইন্‌চার্জ, সম্পর্কে বড় সাহেবের সম্বন্ধি; অতএব যে-আসর একবার জাঁকিয়ে নিয়ে ব'সেছেন তিনি, তা থেকে তাঁকে সরায় কার সাধ্যি? ছিলেন বসু, বিলেত থেকে ঘুরে এসে হ'য়েছেন ভোস। সদ্য মোটরে ষ্টার্ট দেবার মতো শব্দে সারাদিন আমাদের লোয়ার গ্রেডের ক্লার্ক-দের নিয়ে ভোস্‌-ভোসানি তাঁর লেগেই আছে। কারুর কোনো কাজেই খুসী নন্‌। আপার ডিভিশনে ওঠা তো দূরের কথা, লোয়ার ডিভিশনের চাক্‌রিটাই শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকে কিনা, এই নিয়েই সকলের দুশ্চিন্তা। সেখানে সমর দত্তে আর আমাতে কোনো পার্থক্য নেই। দুঃখ-দুশ্চিন্তাকে সমানে ভাগ ক'রে নিয়েই আমাদের সৌহার্দ্য গ'ড়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে অফিসের জানালার বাইরে ধূসর অতীতের দিকে তাকিয়ে মনে মনে আবৃত্তি ক'রে বলিঃ

'ঘরেতে এলো না সে তো, মনে তার নিত্য আসা যাওয়া
পরণে ঢাকাই শাড়ী, কপালে সিঁদুর।'......

অতীতের প্রণয়মুখর মুহূর্তগুলি মাঝে মাঝে মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে বৈ কি! কিন্তু সেই মুহূর্তেই আবার নিজের মধ্যে ব্যর্থ কেরাণী বিলাপ ক'রে ওঠে; ফাইলের মধ্যে মুখ গুঁজে অপাঙ্গে তখন ভয়ে ভয়ে তাকাই মিঃ ভোসের চোখের দিকে।...

হুইসেল দিয়ে সমানে দ্রুত গতিতে ছুটে চ'লেছিল ট্রেন। সমর দত্তের কথার জবাবে বল্‌লাম, 'আশ্চর্য যে, লোকটার একটা দিনের জন্যে অসুখ পর্যন্ত করে না। বারো মাস তিরিশ দিন একই স্পিডে তিনি চ'লেছেন।'

হাতের আস্তিন দুটোকে গুটিয়ে নিয়ে বেঞ্চির উপর পা তুলে জোড়াসন হ'য়ে ব'সলো সমর দত্ত, ব'ল্‌লো, 'ঐ স্পিডের জোরেই যে কত্তাদের শরীর টিঁকে আছে। মাস-কাবারে অমন মোটা মাইনে পকেটে এলে তোমাকেও আর বার্লির জল গিল্‌তে হ'তো না। মানি ইজ বেটার দ্যান হানি।' থেমে একবার অট্টবিদ্রূপের ভঙ্গীতে হেসে উঠ্‌লো সমর দত্ত। বিদ্রূপটা আর কাউকে নয়, তার নিজের অদৃষ্ট-কেই। লক্ষ্যবস্তু হ'য়েও আমি তার উপলক্ষ মাত্র।

ব'ল্‌লাম, 'বড়বাবুদের শালা-সম্বন্ধি হ'য়ে কাজে ঢুক্‌তে না পারলে দেখলাম চাকরী ক'রে লাভ নেই। এবারও পুজোর বোনাস ছ' হাজার টাকা পিটিয়ে নিলেন মিঃ ভোস। স্টাফের বোনাস দিতে হ'লেই কত্তাদের জ্বর আসে।'

কেমন একটা তাচ্ছিল্য প্রকাশ ক'রে সমর দত্ত ব'ল্‌লো, 'ঐখানেই কত্তাদের জ্বর, তা ছাড়া সুস্থই থাকেন তাঁরা। ভেবেছি, ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত দেখে তারপর ছেড়ে দেবো চাক্‌রী। এমন চাক্‌রীর কপালে লাথি মারি।'

ভালো ফুটবল প্লেয়ার হিসেবে এককালে নাম ছিল সমর দত্তের, এখনও মাঝে মাঝে সুযোগ পেলেই আর কথা নেই, সোজা গিয়ে মাঠে নেমে পড়ে। ব'ল্‌লাম, 'একি ফুট-বল যে, লাথি মারবে?'

প্রথম সিগারেটটা অনেক আগেই নিঃশেষ হ'য়েছিল, এবারে আর-একটা ধরিয়ে নিয়ে সে ব'ল্‌লো, 'চাকরীটাও ফুটবল ভিন্ন কি! খালি পাম্পের ব্যাপার, এদিকে যে ব্লাডার ফাটে, সে আর কে দেখে?'

কথা শুনে এবারে হাসি সম্বরণ ক'রতে পারলুম না। চাকরী সম্পর্কে সমর দত্ত বীতশ্রদ্ধ হ'লেও রসিকতা ক'রতে সে ভুলে যায়নি। অফিসের কাজেও মাঝে মাঝে যখন মিঃ ভোস কিম্বা বড়সাহেবের রক্তচক্ষুর প্রাবল্য কিছু অত্যধিক হ'য়ে ওঠে, তখনও ফাইলে সুতো বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে এমনই এক একটা রসিকতার সুর টেনে শ্রান্তি লাঘব করে সমর দত্ত। তাকে নইলে চাক্‌রী-জীবনটা যে কী দারুণ বিস্বাদে ভ'রে উঠ্‌তো, ভাবতেই পারিনা।

ট্রেনটা একই গতিতে ঝক্‌ঝক্‌ ক'রে চ'লছিল। ক্রমে চারপাশে অন্ধকার নেমে এসে বাইরের উন্মুক্ত প্রান্তর আর বন-বীথি চোখে আড়াল প'ড়ে গেল। নিস্তব্ধ প্রকৃতির গর্ভ ভেদ ক'রে ছুটে চ'ল্‌ছিল ট্রেন, বেশ লাগছিল গাড়ীর ঝক্‌ঝকানি আর পোড়া কয়লার গন্ধ। অনেক কালের

অনেক দূরের স্বাদ যেন! কতকাল যে ট্রেনে চড়ি না, ভাবতেও লজ্জা পাই। এবারের এ যাত্রাটাও সমর দত্তের উদ্যোগ না হ'লে মারাই গিয়েছিল। মনে মনে তাই আরও খানিকটা খুসী হ'য়ে উঠ্‌লাম তার উপর। অফিসগত চিন্তার বাইরে খানিকটা মুক্ত জীবনের শ্বাস নিতে চেষ্টা ক'রে ব'ল্‌লাম, 'জীবনে তুমি কখনও কাউকে ভালোবেসেছ সমর?

শুনে হঠাৎ এমন বিকট শব্দে হেসে উঠ্‌লো সে যে, পাশাপাশি যাত্রীরা অবধি সচকিত হ'য়ে উঠ্‌লো। অবস্থা দেখে নিজের প্রশ্নের জন্য নিজেই এবারে লজ্জা বোধ ক'রলাম. কিন্তু লজ্জা ব'লে কোনোকালে কোনো বস্তু নেই সমর দত্তের। উচ্ছ্বসিত হাসির মুখেই সে ব'ল্‌লো. 'লোয়ার ডিভিশনের কেরাণীর আবার ভালোবাসা! হ্যাঁ, তবু বেসেছিলাম, ভালোবেসে তার নামে লটারি অবধি খেলেছিলাম। কিন্তু উঠ্‌বে কেন, লটারি পেলে যে জীবনে মনি-কাঞ্চন-যোগ ঘটে! ভগবানের অতটা সইল না। ভালোবাসারও সেইখানেই ইতি হ'লো।'

ব'লে আর-একবার উচ্ছ্বসিত আবেগে হেসে উঠ্‌লো সে, তারপর পুনরায় ব'ল্‌লো, 'ও ইতি হওয়াই ভালো, মেয়েমানুষের ব্যাপার বড় গোলমেলে।'

উত্তরে হঠাৎই কিছু-একটা আর প্রশ্ন ক'রতে পারলুম না। কথাটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবতে হ'লো। কখনও এ দেহ যখন কোনো তন্বীতনয়াকে স্মরণ ক'রে রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে, যখন বিরহ-রাগের মূর্চ্ছনায় ভেঙে পড়ে এই যৌবন-সত্তা, তখন কি অবচেতন মনের আড়াল থেকে সমর দত্তের মতো এম্‌নি ক'রেই কেউ ব'লে ওঠে—'ও বড় গোলমেলে, অতএব ইতি হওয়াই ভালো!' সত্যিই কি তাই? তাই কি মাঝে মাঝে এমন ব্যর্থতার হাহাকারে হঠাৎ আবৃত্তি জাগে মনে—

> 'ঘরেতে এলো না সে তো, মনে তার নিত্য আসা যাওয়া
> পরণে ঢাকাই শাড়ী, কপালে সিঁদুর।' ....

নিজের মধ্যেই কেমন যেন দিশে হারিয়ে ফেল্‌লাম। প্রশ্ন যে কিছু-একটা না জেগেছিল, এমন নয়; কিন্তু আলাজিভের আড়ালেই তা থেকে গেল, প্রকাশ পেলো না

ভোরে এসে ট্রেনটা একসময় দাঁড়িয়ে প'ড়লো গিরিডি স্টেশনে। গাড়ী থেকে নেমে আর যানবাহনের আশ্রয় নিতে হ'লো না; স্টেশন থেকে বেরিয়ে মিনিট পাঁচ-সাত হাঁটলেই সমর দত্তদের বাড়ী। বাংলাদেশের সঙ্গে যেন এতটুকুও পার্থক্য নেই,—সেই অফুরন্ত প্রাণসম্পদ, সেই পল্লীমুখর ব'নেদি'য়ানা। বাড়ী হিসেবে বাড়ীর লোক-সংখ্যা কিন্তু একেবারেই কম। থাক্‌বার মধ্যে সমন দত্তের বুড়ী ঠাকুরমা, মা, বাপ আর ছোট ছোট দু'টি ভাই। পরিচয় করিয়ে দিতেই পরম আত্মীয়তায় আন্তরিক হ'য়ে উঠ্‌লেন সবাই, এমন কি ছোট দু'টি ভাই সুবীর আর সুকান্ত অবধি। আলাপ আলোচনা থেকে বুঝে নিতে কষ্ট হ'লো না যে, গিরিডির বাইরে থেকে সাধারণত বড় একটা কারুর পায়ের ধুলো পড়ে না এ বাড়ীতে। পড়লে বরং খুশীই হ'য়ে ওঠেন এ বাড়ীর লোক। ছুটিছাটায় সমর দত্ত যখন বাড়ীতে আসে, পুরনো বন্ধু-বান্ধবেরা এসে তখন কেউ কেউ আসর জমায় সকাল-দুপুর-সন্ধ্যায়। তা ছাড়া বাড়ীটা প্রায় নিস্তরঙ্গ একই গতিতে চলে। সকাল থেকে রাত্রি অবধি সেই একই মানুষের একই কথার পুনরাবৃত্তি, তাতে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু হৃদয়বৃত্তি আহত হয়। দু'জন নতুন প্রাণীর সঙ্গে মিশ্‌বার জন্যে মনটা কেবলই চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। এর মধ্যে একমাত্র অচঞ্চলা সমর দত্তের বুড়ী ঠাকুরমা। চোখেও কম দেখেন, কানেও কম শোনেন। মানুষের সঙ্গে মিশ্‌বার আগ্রহ আছে, কিন্তু উপায় নেই। বাড়ীর মাথা হিসেবে তাঁকেই আশ্রয় ক'রে একসময় মুখর হ'য়ে উঠলাম। সুবীর আর সুকান্তের মতো পার্শ্বচর থাক্‌তে মুখর হ'য়ে উঠ্‌তে কতক্ষণ!

আলাপটা কিছু জ'মে উঠ্‌লে একসময় ঠাকুরমা বল্‌লেন, 'তোরা যে ক'ল্‌কাতা থেকে এলি, তা—আমার জন্যে কি নিয়ে এলি মিন্সেরা?'

আগে থেকে জেনে শুনে কিছু একটা আন্‌তে পারলে ভালো ছিল, কিন্তু সেজন্যে লজ্জা পাবার কারণ নেই। ঠাকুরমার প্রায় গাত্র-সংলগ্ন হ'য়েই ব'ল্‌লাম, 'সাবেককালে দ্রৌপদীর ছিল পঞ্চস্বামী, এখানে আমরা উপযুক্ত চার-চারজন উপস্থিত থাক্‌তেও কি ক'ল্‌কাতার আর কিছু না হ'লেই আপনার নয়?'

বার্দ্ধক্যক্লিষ্ট মুখে ঈষৎ হাসি টান্‌তে চেষ্টা ক'রে ঠাকুরমা ব'ল্‌লেন, 'ছোট দুই মিন্সের তো আমাকে একেবারেই পছন্দ নয়; বলে—তোমার মতো বুড়ীকে নিয়ে কি ক'রবো? আরে—বয়সকালে আমার যা স্বাস্থ্য আর রূপ ছিল, তার কাছে আজকালকার ছুঁড়িগুলো কেউ দাঁড়াতে পারে নাকি? পেটে একটা এলেই অম্‌নি চিৎপাত। আমার যে এই সত্তর হ'লো, এখনও চ'লে ফিরে কাজ করি। এই বয়সে তোরা মিন্সেরাও হিম্‌সিম্‌ খেয়ে যাবি।'

আমার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে এবারে সমর দত্ত ব'ল্‌লো, 'আগে তোমার মতো বয়সটা তো আসুক, তখন না হয় দেখ্‌বো!'

—'দেখ্‌বি, দেখ্‌বি, আমি তো আর তখন থাক্‌বো না যে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবো! নিজেরাই তখন দেখ্‌তে পাবি—কত চালে কত মোয়া হয়!' ব'লে একবার সমর দত্তের মুখের দিকে জরাগ্রস্ত চোখ দু'টোকে তুলে ধ'রলেন ঠাকুরমা, কিন্তু কিছু দেখ্‌তে পেলেন কি না, তিনিই জানেন।

সমর দত্ত ব'ল্‌লো, 'তা—মিথ্যে বলোনি ঠাকুমা, তোমার আজ যেমন সোমত্ত যৌবন, এমন শ্রী বোধ হয় তখন আর আমাদের থাক্‌বে না।'

ইতিমধ্যে পাশের ঘর থেকে সমর দত্তের ডাক পড়ায় মাঝপথে এসে সুরটা হঠাৎ কেটে গেল। দেখ্‌লাম—আলোচনা যে-স্তরে এসে পৌঁছেচে, সেখানে এ বাড়ীতে সদ্য নতুন এসে আমার পক্ষে একা সাম্‌লে ওঠা কঠিন। সমর দত্তের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও তাই যথাসম্ভব গা-ঢাকা দিতেই চেষ্টা ক'রলাম।...

সমর দত্তের বাবা বীরেশ্বর বাবু একসময় আক্ষেপ ক'রে ব'ল্‌লেন, 'এলেই তো পারো এম্‌নি ক'রে মাঝে মাঝে, ছুটি-ছাটাগুলো দিব্বি কাটিয়ে যেতে পারো! বাড়ীটার পরিধি আমাদের যত বড়, সেই আন্দাজে মানুষ যদি হ'তো, তবে হয়ত অনেকখানিই শান্তির ছিল, কিন্তু নিজেদের কাছেই নিজেদের বাড়ীটা এখন শ্মশানের মতো মনে হয়। তোমরা এলে কিছুটা তবু প্রাণ পেয়ে বাঁচি।'

ব'ল্‌লাম, 'বাঁচি যে আমরাও, কিন্তু কোনোদিকেই আর শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকার মতো অবস্থা থাকে না। চাক্‌রী-জীবনে উদ্যোগ-আয়োজনেই ছুটিছাটাগুলো ফুরিয়ে যায়।'

বীরেশ্বর বাবু ব'ল্‌লেন, 'তার মধ্যেই চেষ্টা ক'রে বেরিয়ে প'ড়তে হয়। দেহের খোরাকের মতো মনের খোরাকও যে প্রয়োজন!'

—'তা তো নিশ্চয়ই।' ব'লে নিজেকে পাশ কাটিয়ে নিলাম বীরেশ্বর বাবুর সাম্‌নে থেকে। কিন্তু কথাটা তার অগ্রাহ্য ক'রতে পারলুম না। মনের খোরাকের জন্যেই যে মানুষ চিরকাল প্রাণান্ত চেষ্টা ক'রে এসেছে। কিন্তু পেরেছে কি কোথাও সে নিজেকে অতিক্রম ক'রে এগিয়ে আস্‌তে? বোধ করি না। নিজের জীবন দিয়েই তা প্রতিমুহূর্তে উপলব্ধি ক'রছি।

সমর দত্ত কিন্তু ইতিমধ্যেই উগ্রীতে যাবার সমস্ত আয়োজন ঠিক ক'রে ফেলেছিল। না ক'রে তার উপায় ছিল না, উগ্রী দেখাবার নাম ক'রেই আমাকে নিয়ে এসেছে সে। তা ছাড়া পুজোর ছুটি হ'লেও ছুটিটা আমাদের দীর্ঘমেয়াদী নয়। সপ্তমী থেকে একাদশীঃ মাত্র পাঁচ দিন। তার মধ্যে দু'দিন একরকম শ্বাস নিতে নিতেই কেটে গেল। বাকী আর মাত্র দু'দিন। অতএব আয়োজনের দিক দিয়ে ঢিলে দিলে সমর দত্ত ক্ষমা পাবে কেন? কাছাকাছিই প্রখ্যাত মাইকা-মার্চেণ্ট ছিল চিমনলাল, তার নতুন 'জীপ'খানিই আমাদের জন্যে ঠিক হ'য়ে গেল। রাত্রিটা কোনোভাবে কেটে যেতেই সকালের দিকে রওনা হ'য়ে প'ড়লাম উগ্রীর পথে। এখান থেকে প্রায় ন' মাইলের মতো পথ। পথের রসদ সঙ্গে আনতে তাই ভুল ক'রলো না সমর দত্ত; ঠাসা দু'টো টিফিন-কেরিয়ার এসে আশ্রয় নিল' জীপে। ষ্টার্ট দিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিল ড্রাইভার। সহর ছাড়িয়ে দু'পাশে ফাঁকা মাঠের মাঝ দিয়ে সরু মেঠো পথে ধুলো উড়িয়ে চ'ল্‌লো জীপ। তারপর আরও কিছুটা আগে গিয়ে আঁকাবাঁকা চড়াই-উৎরাই পথ। কোথাও বা বিটপীর ঘন সারি, কোথাও বা লতাগুল্মগুলি জড়াজড়ি ক'রে পথ আগ্‌লে প'ড়ে আছে। তার উপর দিয়ে কখনও বা একেবারেই খাদে নেমে প'ড়ছে জীপ, কখনও বা ঠেলে উৎরাইয়ের পথ ধ'রছে। ব'ল্‌লাম, 'উগ্রীর পথ তবে একেবারেই সহজগম্য নয়, অনেক বিপদ অতিক্রম ক'রে তবে তার দর্শন মিল্‌বে!'

এমন স্থলেও কিন্তু রসিকতা আটকালো না সমর দত্তের মুখে। ব'ল্‌লো, 'প্রেমের পথ ঘোরালো জানো তো? বহু দুঃখ বরণ ক'রে তবে তাকে পেতে হয়। উগ্রীও তাই।' ব'লে আপন মনেই একটা আবৃত্তি ক'রে উঠ্‌লো সেঃ

জল-কল্লোলে কল-কল্লোল
প্রাণ-বন্যায় হ'লো উতরোল,
পাহাড়ীয়া মেয়ে স্রোতোবতী সে যে
উগ্রী।
পূর্ণিমা রাতে পুলকে চমকি
নেচে চলে সে যে ঠমকি' ঠমকি',
নবারুণে জাগে ললিত ললনা
সুশ্রী! উগ্রী!!

শুন্‌তে শুন্‌তে মনে হচ্ছিল—এক যুগ পিছনে গিয়ে প্রণয়-বিলাসে কোনো তন্বী-তনয়ার দু'টি উজ্জ্বল চোখের দিকে চোখ দু'টোকে স্থির ক'রে কোনো নির্ভরশীল ভাবী-কালের স্বপ্ন দেখ্‌চি! স্বপ্নই হয়ত দেখ্‌ছিলাম, কিন্তু আবৃত্তিটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেটুকু ছুটে গেল। ব'ল্‌লাম, 'তুমি কেরাণী না হ'য়ে কবি হ'লে না কেন সমর?'

—'এবারেই হাসালে তুমি বেণু। আমি কবি হ'লে মিঃ ভোসের লেজার-রেকর্ডের ফাইল রাখ্‌বে কে?' সমর দত্ত ব'ল্‌লো, 'কবি হ'তে হ'লে কাব্যে অধিকার থাকা চাই। সে-অধিকারেরও যে বাহুবল নেই। পরের মুখে শেখা

স্রোতস্বতীর পথ

বুলি পাখীর মতো ব'লে ব'লেই এ জীবনটা কাটাতে হ'লো।'

ব'ল্লাম, 'কবিতাটা নিতান্তই তবে তোমার ধার করা?'

সমর দত্ত ব'ল্লো, 'কেরাণীর ধার ছাড়া গতি কোথায়? কবিতাটা এখানকারই কোনো কবির রচনা। মায়াতরু সেন। দুঃখের বিষয়, গতবার ঠিক্ এম্নি দিনেই সে এ-পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেছে।'

শুনে কষ্ট হ'লো। এমন কবিরও মৃত্যু হ'তে পারে? গিরিডির মাটি এখনও যে তাকে নিবিড় ক'রে আঁকড়ে র'য়েছে! নইলে তার কবিতার এমন মনোরম প্রকাশ ঘটা কি এমন একটা যান্ত্রিক পরিবেশে সত্যিই সম্ভব ছিল?

জীপটা এসে হঠাৎ একটা গাছের গুঁড়িতে আঘাত খেয়ে থেমে প'ড়লো। টাল সাম্লাতে পারছিলাম না। হঠাৎ ধ'রে ফেলে সমর দত্ত ব'ল্লো, 'ভয় নেই, এ্যাক্সিডেন্ট্ নয়, এখানেই নাম্তে হবে। শুন্তে পাচ্ছো উশ্রীর আহ্বান?'

কিছুক্ষণ থেকেই কেমন একটা গুম্ গুম্ শব্দে জল-ধারার আওয়াজ আস্ছিল। ক্রমেই সে-আওয়াজ গভীর থেকে আরও গভীর হচ্ছিল। সমর দত্তের কথার জবাবে কিছু-একটা বলার আগেই এসে পৌঁছে গেলাম উশ্রীর পাড়ে। প্রথম দর্শনেই চোখ জুড়িয়ে গেল। পাহাড়ের গা বেয়ে স্বতোৎসারিত ধারায় নৃত্যতরঙ্গিনীর মতো নেমে আস্ছে উশ্রী। মানুষের ভাব যে প্রকাশের অক্ষমতায় কেমন ক'রে কান্নায় ভেঙে পড়ে, এই মুহূর্তে নিজের দিকে তাকিয়ে তা স্পষ্টই অনুভব ক'রতে পারলুম। এমন অনুভূতি আর কখনও আসেনি। স্বচ্ছতোয়া প্লাবনমুখিতায় মুখর হ'য়ে উঠেছে উশ্রী। আপন যৌবনকে ধ'রে রাখ্তে না পেরে সে শতখান হ'য়ে ভেঙে প'ড়ছে। পাহাড়ের আড়ালে কি কোনো অদৃশ্য রাজপ্রাসাদে রাজকুমার ঘুমিয়ে আছে? তার ঘুম ভাঙাতেই কি উশ্রীর এই উৎসারিত যৌবন-অভিসার? সমর দত্তের মুখের দিকে তাকিয়ে ব'ল্লাম, 'আর একবার আবৃত্তি করো না মায়াতরু সেনের কবিতাটা, শুনি!'

কিন্তু শুন্লো না সমর দত্ত, ব'ল্লো, 'চলো, উপরে উঠি।'

পা দু'খানিকে যথাসম্ভব সংযত ক'রে ধীরে ধীরে উঠে পড়লাম পাহাড়ের উঁচলে। উশ্রী এখানে সমতল রেখায় বেগবতী। আমার দেহকে স্পর্শ ক'রে সে দেহাতীত প্রাণ-স্ফূর্তিতে সহস্র লাস্যধারায় প্রবাহিত হ'য়ে চ'লেছে। খানিকটা জল তুলে দু'চোখে বুলিয়ে নিয়ে মনে মনে বল্-লাম, 'তুমি আমার চিরকালের অন্ধ চোখ আজ তোমার অরূপ

লাবণ্যে খুলে দিলে; তোমার মুক্তকেশী ধারায় ধারায় আমার সমস্ত চেতনাকে রাঙিয়ে দিলে তুমি। এ জীবনে সত্যিই কি তোমাকে ভুল্‌তে পারবো?'

হঠাৎ চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো একটি মুখঃ উশ্রী চাটার্জি। নিজের অগোচরেই অকস্মাৎ কখন্ আবার ফিরে গিয়ে দাঁড়ালাম একটা যুগ পিছনে। সেদিনও এম্‌নি ক'রেই ব'লেছিলাম, এম্‌নি ক'রেই দু'চোখের সম্পূর্ণতা দিয়ে দেখেছিলাম তাকে। অধরে ছিল তার স্মিত হাসি, কণ্ঠ বাণীহারা। সেই বাণী বুঝি অন্তঃসলীলা এই উশ্রীর মতই তার নিজের মধ্যে গুমুরে ম'রছিল।

সমর দত্ত জিজ্ঞেস ক'রলো, 'কেমন বোধ ক'রছো?'

ব'ল্‌লাম, 'ইচ্ছে ক'রছে না আর এখান থেকে ফিরে গিয়ে হাওড়া স্টেশনে নামি। হতভাগ্য তুমি যে, উশ্রীকে এমন কাছের ক'রে পেয়েও তাকে ত্যাগ ক'রে ভালো বাসলে গিয়ে ক'ল্‌কাতার ডালহৌসী স্কোয়ারকে।'

—'জীবিকা আর জীবন, টাকা আর হৃদয়!' কথাগুলি যেন স্বগতোক্তিসূচক ভাবেই উচ্চারণ ক'রে আপন খেয়ালে একবার হেসে উঠ্‌লো সমর দত্ত; ব'ল্‌লো, 'কোথাও মিল নেই কারুর সঙ্গে। দু'টোর মধ্যে কিছু-একটা মিল খুঁজে বার ক'রবার জন্যেই তো এম্‌নি ক'রে অনবরত বাংলা-বিহার পরিক্রমা ক'রে চ'লেছি। এবারে ডিসেম্বরের পর থেকে শান্ত ছেলের মতো ঘরেই থাক্‌বো স্থির ক'রেছি।'

—'ভালো।' ব'লে আর বেশীদূর অগ্রসর হ'লাম না। নইলে আরও খানিকটা এগিয়ে বলা যেতোঃ 'সেই সঙ্গে আমারও কি হয় না এখানে কিছু-একটা জীবিকার সংস্থান?' কিন্তু দেখ্‌লাম—ব'লে লাভ নেই কথাটা। এখানে কোনো 'প্রভিশনের' ব্যবস্থা থাকলে সমর দত্তই বা ক'লকাতার বোর্ডিংয়ে থেকে প'চে ম'রবে কেন?

প্রভাত-সূর্য ধীরে ধীরে প্রায় মাথার উপরে উঠে এসেছিল। এতক্ষণ ক্ষিদে ব'লে কারুরই বড় একটা হুঁস ছিল না। এবারে চিমনলালের ড্রাইভারের তাগিদেই খানিকটা সচেতন হ'য়ে উঠ্‌তে হ'লো। উশ্রীর আকর্ষণ তার এতটুকুও নেই, এতক্ষণ জীপের ষ্টিয়ারিংয়ের উপর মাথা রেখেই সে ব'সে ব'সে ঝিমোচ্ছিল। কিন্তু ক্ষিদেয় পেটের নাড়ী চন্-চন্ ক'রে উঠ্‌তেই অকস্মাৎ বিহারী পৌরুষ তার মধ্যে জাগ্রত হ'য়ে উঠ্‌লো। এতটুকুও আর অপেক্ষা ক'রতে সে রাজি নয়। অগত্যা পাহাড়ের উঁচল থেকে তড়িৎ-গতিতে নেমে এসে জীপেই আবার আশ্রয় নিতে হ'লো আমাদের। টিফিন-কেরিয়ারের বাটিগুলো খুলে খাবার ভাগ ক'রে নিল' সমর দত্ত। খাবারের সামগ্রীও নিতান্ত সামান্য নয়। বার দু'তিন মুখের মধ্যে খাবার পুরে এতক্ষণে তবে খানিকটা স্বচ্ছন্দ হাসি হাসতে পারলো ড্রাইভার। ব'ল্‌লো, 'মুঝে মালুম থা কি, ঘরমে যা কর্ তব্ খানা-পিনা হোগা।'

টিপ্পনি কেটে সমর দত্ত ব'ল্‌লো, 'শরীরটা তোমার বড় ব'লে চিন্তাটাও বড় দেখেই মাথায় আসে। ঘরে গিয়ে আবার এক পেট মেরো, তবেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারবে।'

উত্তরে কিন্তু ড্রাইভারের মুখে আর একটি কথাও প্রকাশ পেলো না,— শুধু কথাটার অর্থ ধ'রে নিয়ে কিছুক্ষণ হো-হো ক'রে হাসলো, তারপর এক নিশ্বাসে খাবার শেষ ক'রে তবে আবার ষ্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে ব'সলো।

এতক্ষণের একটানা সুর যে হঠাৎ কোথা দিয়ে কেটে গেল, বুঝ্‌তে পারলুম না।

সমর দত্ত ব'ল্‌লো, 'চলো, এবারে ফিরি, বেশীক্ষণ রোদ লাগানো ঠিক হবে না।'

আপত্তি ক'রতে পারলুম না। সমর দত্তের উপরেই এখানে নির্ভরশীল। অতএব তার নির্দেশ না মেনে নিয়ে উপায় কি? একটু-কালের জন্য শুধু আর-একবার এসে দাঁড়ালাম উশ্রীর পাড়ে, মনে মনে একরকম আর্ত্তনাদের সুরেই ব'ল্‌লাম, 'বিদায় উশ্রী; বুক ভ'রে আজ যে তোমার অমিত ভালোবাসা কুড়িয়ে নিয়ে গেলাম, আমার কর্মক্লান্ত জীবনে এই ভালোবাসাই আমাকে প্রতিমুহূর্তে প্রাণবন্যায় উদ্বোধিত ক'রে তুল্‌বে। তোমাকে আজ আমার শেষ নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি উশ্রী।'— তারপর ফিরে এসে জীপে ব'স্‌তেই ষ্টার্ট দিয়ে ড্রাইভার গাড়ী ছেড়ে দিল।

আবার সেই চড়াই-উৎরাই পথ। ক্রমে সহরের উপান্তে এসে গাড়ীটা বাঁক নিতেই ড্রাইভার জানিয়ে দিলঃ 'মোবিল খতম হো গিয়া, আউর ঘুমনে নেই শেখ্‌তা।' অর্থাৎ পেট্রোল ফুরিয়ে যাওয়ায় গাড়ী নিয়ে আর ঘোরাঘুরি সম্ভব নয় ড্রাইভারের পক্ষে।

ব'ল্‌লাম, 'সহরের পাকা সড়কে একবার যখন এসে পড়েছি, তখন গাড়ীটারই বা এমন আর বিশেষ কি প্রয়োজন আছে! বড় জোর আর একটা দিন তো আছি এখানে, হে'টেই বরং সহরের রাস্তাঘাটগুলোর সঙ্গে খানিকটা পরিচিত হ'তে চেষ্টা করি। আপত্তি নেই তো তোমার?'

রাজি হ'য়ে সমর দত্ত ব'ল্‌লো, 'বিলক্ষণ, আপত্তি আবার কিসের! হে'টে না বেড়ালে কি ভালো ক'রে কিছু দেখা যায়! কথাটা তুমি না ব'ল্‌লে আমিই তোমাকে ব'ল্‌তাম।' ব'লে ড্রাইভারকে বিদায় ক'রে দিল সমর দত্ত।

গিরিডির পাকা সড়কে স্বচ্ছন্দভাবে এই প্রথম পা প'ড়লো। বিকেল প্রায় গড়িয়ে এসেছিল। আশ্বিনের

রোদের তাপ ক্রমেই স্তিমিত হ'য়ে আসছিল ধীরে ধীরে। ঝির্‌ঝিরে মিষ্টি হাওয়ায় বেশ লাগ্‌ছিল হেঁটে বেড়াতে। এক একটা পথ অতিক্রম ক'রে নতুন পথের সঙ্গে আবার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল সমর দত্ত। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ-ছিলাম এপাশে ওপাশে। বাড়ীগুলোর নির্মাণ-পরিপাট্যে আধুনিক ঐতিহ্যের ছাপ স্পষ্ট হ'য়ে না উঠ্‌লেও অধিকাংশ ব'নেদী বাড়ীকেই কেন্দ্র ক'রে আছে ছোট ছোট ফুলের বাগান। ইতিপূর্বে ট্রেনে আসার সময় গিরিডিতে জোয়ার আর বজ্‌রার আধিক্য সম্পর্কে সমর দত্ত যে মিথ্যে ভাষণ দিয়েছিল—তা প্রমাণিত হ'য়ে গেল এখানে। ব'ল্‌লাম, 'তুমি একটি ফার্স্টক্লাশ হিপোক্রিট্‌।'

—'মানে?'

—'মানে—মিথ্যে ব'ল্‌তে একনম্বরের ওস্তাদ।'

—'কেরাণী-জীবনে ঐটুকুই তো সম্বল, নইলে কি নিয়ে আর সম্পদের বড়াই ক'রতে পারি, বলো?' ব'লে ঠোঁটের আড়ালে একটুক্‌রো মুচ্‌কি হাসি গোপন ক'রে নিল সমর দত্ত।

ব'ল্‌লাম, 'মূলধন হিসেবে মিথ্যের বেসাতিকেই তবে তুমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ ক'রে নিয়েছ?'

—'নিয়েছি নই, নিতে বাধ্য হ'য়েছি।' স্মিতমুখে সমর দত্ত ব'ল্‌লো, 'ওটা অফিসিয়াল হ্যাবিট, নইলে চাক্‌রী রাখা দায়।'

শুনে এবারে নিজেও না হেসে পারলুম না। হেসেই কথাটাকে উইথড্র ক'রে নিলাম। না নিলে পথের সঞ্চয়ে বিঘ্ন ঘট্‌বার সম্ভাবনা ছিল।

সাম্‌নেই দু'পা এগিয়ে বাঙালীটোলা। বাংলাদেশের রাস্তা ঘাটগুলোর সঙ্গে বড় একটা অমিল চোখে প'ড়লো না। বাঙালীটোলায় বাঙালিয়ানা না দেখ্‌লেই বরং আক্ষেপের কারণ ঘট্‌তো। সাম্‌নেই একখন্ড ফুলবাগিচাকে কেন্দ্র ক'রে বাংলোর মতো ছোট্ট একখানি বাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ীটা স্বভাবতই চোখকে আকর্ষণ করে। তাকাতেই দৃষ্টিতে ভেসে উঠ্‌লো একটি শীর্ণকায়া মহিলা। কোলে তার বছর তিনেকের একটি শিশু নিচে দাঁড়িয়ে বছর পাঁচ ছয়েকের একটি ছেলে আব্দারের সুরে কান্না সুরু ক'রেছে। মহিলাটির মুখের দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখ্‌বার অবকাশ পাইনি। তবু যেটুকু চোখে প'ড়েছিল, তাতে প্রশস্ত সিঁদুরের টিপে ললাটখানি রঞ্জিত ব'লেই মনে হ'য়েছিল।

সমর দত্ত ব'ল্‌লো, 'এপাশে দেখ্‌বার মতো বিশেষ কিছু নেই, চলো ফিরি; এখনও ব্রাহ্ম-হিলে গিয়ে ঘুরে আসা বাকী র'য়েছে।'

জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'ওটা কি বিশেষ কোনো পাহাড়ের নাম নাকি?'

—হ্যাঁ, এই নামেই পাহাড়টার খ্যাতি, বিকেলে সাধারণত ঐদিকটাতেই আমরা বেড়াতে গিয়ে থাকি।' ব'লে পিছনের পথেই আবার পা বাড়াতে যাচ্ছিল সমর দত্ত।

ইতিমধ্যে সহসা একটি নারী-কন্ঠের স্পর্শে সচকিত হ'য়ে উঠ্‌তে হ'লো। —'কে, বেণুদা না?'

বাংলো বাড়ীর অলিন্দে দাঁড়িয়ে মহিলাটিই উচ্চারণ ক'রলো বটে কথা ক'টি। অনেকটা যেন পরিচিত কণ্ঠ! কৌতূহল চেপে রাখ্‌তে না পেরে বাধ্য হ'য়েই এবারে তাই বাড়ীটার দিকে দু'পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম।

পিছন থেকে সমর দত্ত ব'ল্‌লো, 'দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবঃ, কে বলে তুমি নিঃস্ব! যাও, আত্মীয় জুটে গেল বোধ হয় একটি। আমি বরং এখানেই দাঁড়াই, তুমি ততক্ষণে কথা সেরে এস।'

ইতিমধ্যে মহিলাটি ফুলবাগিচার মাঝ দিয়ে পথ কেটে অনেকখানি আগে এসে থম্‌কে দাঁড়িয়ে প'ড়েছিল। এবারে আরও স্পষ্ট ক'রে চিন্‌তে পেরে ব'ল্‌লো, 'হঠাৎ গিরিডির পথে তুমি, ব্যাপার কি বেণুদা?'

মেয়েদের চোখ বড় সাংঘাতিক। কিন্তু নিজের চোখ দুটোই বা আমার কম যায় কিসে? এতটুকুও চিন্‌তে ভুল হ'লো না উত্রী চাটার্জিকে। ব'ল্‌লাম, 'এ বোধ করি তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে ব'লেই হঠাৎ নিজের অজান্তেই এম্‌নি ক'রে এবার গিরিডিতে এসে প'ড়েছি। তা—তুমিই বা হঠাৎ এমন বাহেরের দেশে কেন?'

—'কেন আবার, কপালে সিঁদুরের রেখা দেখেও বুঝ্‌তে পারছো না?' থেমে উত্রী ব'ল্‌লো, 'বড় জা'র কাছে কিছুদিন হ'লো বেড়াতে এসেছি এখানে। কিন্তু স্বস্তি আছে কি, দেখ্‌তেই তো পাচ্ছো সব নমুনা?' ব'লে ছেলে দুটোর দিকে ইঙ্গিত ক'রলো উত্রী।

জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'দুটিই কি তোমার?'

—'দুটি কেন, তিনটি; বড়টি বাড়ীর ভিতরে তার জ্যাঠামনির সঙ্গে খেল্‌ছে।' থেমে উত্রী ব'ল্‌লো, 'বীরু, মামাবাবুকে প্রণাম করো '

কান্না থামিয়ে সুবোধ বালকের মতো এসে পায়ে গড় হ'তেই যাচ্ছিল বীরু, দু'হাতে এবারে তাকে কোলে তুলে নিয়ে মৃদু একটা চুম্বন ক'রে ব'ল্‌লাম, 'প্রণাম আর তোমাকে

ক'রতে হবে না, বীরেন্দ্রশেখর হ'য়ে একদিন দেশের মুখ উজ্জ্বল করো, শুধু এই আশীর্বাদ করি।'

উশ্রী ব'ল্‌লো, 'আমরাই ক'রেছি, এখন বাকী আছে ওরা। তা যাক্‌, আমাকে চিন্‌তেই পারছিলে না তুমি, তাই না বেণুদা?'

যত সহজভাবে প্রশ্নটা ক'রলো উশ্রী, তত সহজেই কিন্তু জবাব দেওয়া সম্ভব হ'লো না। যে উশ্রীকে একদিন জীবন দিয়ে চিনেছিলাম, যার হাসি দিয়ে একদিন আলোকসজ্জা রচনা ক'রেছিলাম আমার সমস্ত প্রাণ-সত্তায়, এ কি সেই উশ্রী? একটু আগে উশ্রী ফল্‌স্‌ দেখ্‌তে গিয়ে কি এই মুখখানিই বার বার ক'রে ভেসে উঠ্‌ছিল আমার মানস-লোকে? মনটা সহসা এক যুগ পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। পড়ি তখন বহরমপুর কলেজে; থার্ড ইয়ার। বাবা-মাকে হারিয়েছিলাম স্কুল-জীবনেই। সংসারে আত্মীয় ব'ল্‌তে কোথাও আর কেউ রইল না। নিজের অদৃষ্টকে স্মরণ ক'রে একবার চম্‌কে উঠ্‌লাম, কিন্তু মচ্‌কালাম না। কলেজে ঢুকে ট্যুইশনির আশ্রয় নিয়ে হস্টেলে ভর্তি হলাম। কাছা-কাছিই নতুন একটা ট্যুইশনি মিলে গেলঃ ফার্স্টক্লাসের ছাত্রী উশ্রী চাটার্জি। এক ঘণ্টার টাকা নিয়ে দু'ঘণ্টা ক'রে পড়াতে হতো, নইলে ছেড়ে দিতনা উশ্রী। ব'ল্‌তাম, 'আমার নিজেরও তো পড়াশুনো রয়েছে। বাকী যেটুকু থাকে, সেটুকু কাল এসে আবার বুঝিয়ে দেবো।'— উত্তরে প্রথম প্রথম 'আচ্ছা' ব'লে বইখাতা বুজিয়ে নিয়েছে উশ্রী, পরে শুধু মুখ ভার ক'রে অভিমানের চোখ তুলে তাকিয়ে থেকেছে। প্রথম দিকে বিরক্ত হ'লেও পরে নিজেই আবার কষ্টবোধ ক'রেছি। অতিরিক্ত খেটে সামান্য দুটো টাকার প্রশ্ন তো, নাই বা পেলাম! কিন্তু কে জান্‌তো—সেই সামান্য অর্থের পরিবর্তে সহসা কখনো উশ্রীর মন পাবো, পাবো তার অকুণ্ঠ প্রাণের ভালোবাসা! তখন ম্যাট্রিক পাশ ক'রে নিজেও কলেজে ভর্তি হ'য়েছে উশ্রী। কী তার উজ্জ্বল কান্তি তখন, কী তার দীপ্ত যৌবনের অতুল বৈভব! ভালো কি আমিও বাসিনি, বেসেছিলাম। তখন আর আমি তার নিতান্তই মাস্টারমশাই নই, বেণু বন্দ্যো-পাধ্যায়কে তখন সে বেণুদা ব'লেই ডাকতে সুরু ক'রেছে। কিন্তু সম্পর্কটা তখন তা থেকে আরও খানিকটা এগিয়ে। উশ্রীই এগিয়ে নিয়েছিল সেটুকু। ব'ল্‌লাম, 'আমাকে ভালোবেসে তুমি কি জীবনে ঠ'ক্‌তে চাও উশ্রী? মানুষের দারিদ্র্য প্রেমকে কোথাও রাজসিংহাসনে বসাতে দেয় না, জানো তো?' উত্তরে কিন্তু নিজেকে এতটুকুও কোথাও প্রচ্ছন্ন রাখ্‌লো না উশ্রী, ব'ল্‌লো, 'রাণী হবার সখ আমার কোনোকালেই নেই, আমি যা আছি, তাই নিয়েই সুখী হ'তে চাই। জানি, সেখানে আমি কোনোদিনই ঠ'ক্‌বো না।' ব'লতে ব'লতে চোখ দুটি গাঢ় হয়ে উঠেছে উশ্রীর, সুন্দর নিটোল মুখখানি আশায় আর আত্মবিশ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু বহরমপুরে থাকা আর সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে। বি-এ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় দিতে হলো বহরমপুরকে। এবারে কাজের চেষ্টা না দেখ্‌লে নয়। কাজ চাই, সেধে গোলামী না নিলে ভবিষ্যৎ তিমিরে অবলিপ্ত হ'য়ে যাবে। তাই বেরিয়ে প'ড়লাম একদিন উশ্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে। আজ পাহাড়ের উঁচলে উঠে সাগর-দুহিতা উশ্রীর কাছ থেকে যেভাবে বিদায় নিয়ে ফিরলাম, সেদিনও ঠিক এম্‌নি করেই উশ্রী চাটার্জির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ব'লেছিলাম, 'বুক ভ'রে আজ যে তোমার অমিত ভালবাসা কুড়িয়ে নিয়ে গেলাম, আমার কর্মক্লান্ত জীবনে এই ভালো-বাসাই আমাকে প্রতিমুহূর্তে প্রাণ-বন্যায় উদ্বোধিত করে তুলবে।' —উত্তরে একটি কথাও আর প্রকাশ পায়নি উশ্রীর মুখে; শুধু দু'চোখ বেয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে প'ড়ে গালের দুটো পাশ ভিজে গিয়েছিল মাত্র। মনে মনে একটা দারুণ অশ্বস্তি নিয়েই বেরিয়ে প'ড়েছিলাম সেদিন। কিন্তু যত বড় আশা ক'রে বেরিয়েছিলাম, বাস্তব-জীবনের সংঘাত কিন্তু ঠিক ততখানি বড় হ'য়েই পথ রোধ ক'রে এসে দাঁড়ালো। চাক্‌রীর যোগাড় কিন্তু সহসা হ'য়ে উঠ্‌লো না। হ'লে উশ্রীকে জীবনের সঙ্গিনী পেয়ে নিজের পৌরুষকে জয়যুক্ত ক'রতে পারতুম। কিন্তু অদৃষ্ট তা থেকে বঞ্চিত ক'রলো। চাক্‌রীটা যখন পেলাম, উশ্রীর সংসার-রচনা তখন পাকা হ'য়ে গেছে।—তারপর দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোথা দিয়ে যে দীর্ঘ একটা যুগ কেটে গেল, নিজেই টের পেলাম না। উশ্রীর সংসার-ধর্মের অনিবার্য ফল তো আজ নিজের চোখেই দেখ্‌তে পেলাম! কোথায় সেই অমিত লাবণ্য, কোথায় সেই কমনীয় মুখের উজ্জ্বল হাসি? আজ তিন তিনটি সন্তানের জননী হ'য়েও ঝরা পাতার মতো জীবন থেকে ঝরে প'ড়েছে উশ্রী। গাল দুটো ব'সে গেছে, চোখ দুটো প্রায় কোটরগত, দেহে আজ আর আগেকার সেই কাঁচা হলুদের রং খুঁজে পাওয়া যায় না, কেমন কাল্‌সে হ'য়ে উঠেছে সর্বাঙ্গ। গলার নিচে হাড় দু'খানি সমান্তরালভাবে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মনে প'ড়লো সমর দত্তের ঠাকুরমার কথাটাঃ 'বয়সকালে আমার যা স্বাস্থ্য আর রূপ ছিল, তার কাছে আজকালকার ছুঁড়িগুলো দাঁড়াতে পারে নাকি? পেটে একটা এলেই অম্‌নি চিৎ-পাত।' উশ্রীকে দেখে কথাটা যে এমনভাবে মিলে যাবে,

বেলাশেষে

এও কি কল্পনা ক'রতে পেরেছিলাম? উগ্রীর প্রশ্নের জবাবে তাই হঠাৎ একবার থামতে হ'লো। তারপর ব'ল্লাম, 'নিজেকে ধরা দেবার জন্যে আজ যে কিছুই আর রাখোনি তুমি। এ তোমার কি শ্রী হ'য়েছে উগ্রী?'

—'খুব বিশ্রী হ'য়ে গিয়েছি, তাই না?' ব'লে কৃত্রিম একটা হাসির ভান ক'রলো উগ্রী।

কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে ব'ল্লাম, 'না, বিশ্রী কেন হ'বে. তবে শরীরে আজ আর আগেকার রং নেই, এই যা—।'

উগ্রী ব'ল্লো, 'শরীরটা কি মন ছাড়া কিছু? মনেই যেখানে রং ধ'রলো না, শরীরে সেখানে রং লেগে থাক্‌বে কি ক'রে?'

কথাটা শুনে মনে মনে আঘাত পেলাম। তবে কি উগ্রী তার স্বামীকে আজও ভালোবাস্‌তে পারেনি? ছেলে তিনটির জন্ম কি তবে নিতান্তই একটা জৈবিক প্রেরণা ভিন্ন আর কিছু নয়? ব'ল্লাম, 'তবে কি সত্যিই তুমি সুখী হ'তে পারোনি?'

এবারে জবাব না দিয়ে মাথা নিচু ক'রে নিল উগ্রী। একটু দূরপ্রসারি দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে দেখলাম—সমর দত্ত অধৈর্যের মতো অনবরত এদিক-সেদিক পায়চারি ক'রছে। ক্রমেই যে দেরী হ'য়ে পড়ছে, বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু উপায় ছিল না। আজ কত দীর্ঘকাল পর আবার উগ্রীকে দেখ্‌তে পেলাম, ইচ্ছে ক'রলেই কি তাকে সহসা অতিক্রম ক'রে যাওয়া যায়?

একটুকাল থেমে উগ্রী জিজ্ঞেস ক'রলো, 'সঙ্গে বোধ করি তোমার বন্ধুই কেউ হবেন, তা—এখানে এসে উঠেছ কোথায় তুমি বেণুদা?'

সমর দত্তের পরিচয় দিয়ে ব'ল্লাম, 'ওর সঙ্গে ওদের বাড়ীতে এসেই উঠেছি।'

উগ্রী ব'ল্লো, 'দাঁড়িয়ে পথে পথেই তোমার সঙ্গে কথা সেরে নিচ্ছি, নিজের বাড়ী নয় যে তোমাদের নিয়ে গিয়ে ভিতরে বসাই। তা ছাড়া—'

—'জা-ভাসুরের কাছে কীই বা পরিচয় দেবে, এই তো?' ব'ল্লাম, 'তা নিয়ে তোমাকে ভাব্‌তে হবে না। সমর যেভাবে অধীর হ'য়ে উঠেছে, তাতে অপেক্ষা ক'রতে পারি—এমন সময় একেবারেই কম। এখানে সমরই আমার একমাত্র বাহন এবং অবলম্বন। অতএব তাকে চটানো ঠিক হবে না।'

গোড়ার কথাটার সূত্র ধ'রে উশ্রীর মুখের উপর দিয়ে এবারে সহসা কেমন একটা বেদনার কালো ছায়া নেমে এলো। ব'ল্লো, 'আঘাতটা তো অন্যভাবেও দিতে পারতে বেণুদা! নিয়তির কঠিন চক্রে একদিন পিষ্ট হ'য়েছি সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই ব'লে কি এই মনটারও আমার অপরাধ ছিল? পুরুষেরা মেয়েদের সেই মনের অতলে কোনোদিনই প্রবেশ ক'রতে চাইল না, তুমিও না।' কথাটা শেষ ক'রতে গিয়ে চোখ দু'টি একবার ছল্ ছল্ ক'রে উঠ্‌লো উশ্রীর।

ব'ল্লাম, 'আমিও তো পুরুষ। তা থাক্। মানুষের কাছে পরিচয়ের সূত্রে আমি যেন তোমার মাষ্টার মশাই হ'য়েই চিরকাল থাকি। অতীতের মধ্যে যে-দিনগুলি একবার মিশে গেছে, তারা আর কোনোকালেই ফিরে আস্‌বে না। তবু আজ এতকাল পর এই আকস্মিক দর্শনে তোমাকে সুখী দেখতে পারলেই আমি শান্তি পেতাম উশ্রী। এর পিছনেও বোধ করি সেই নিয়তি, তাই না?'

উশ্রী এবারে কিন্তু একটি কথাও আর ব'ল্লো না। এতক্ষণের অবরুদ্ধ অশ্রু এবারে ধারায় নেমে এলো তার দু'চোখ বেয়ে। উশ্রী-ফল্‌সে গিয়ে একটু আগে পর্বত-দুহিতা উশ্রীর যে ধারা দেখে এলাম, তার সঙ্গে উশ্রী চ্যাটার্জির এই অশ্রুধারার কি এতটুকুও পার্থক্য র'য়েছে? পর্বত-দুহিতা উশ্রীর অন্তরেও বুঝি এমনই কোনো অন্তঃসলীল বেদনার ধারা অহর্নিশি প্রবাহিত হ'য়ে চ'লেছে। এই উশ্রী দেখাতেই কি তবে আমাকে ক'ল্‌কাতা থেকে গিরিডির এই বিহারী-ক্ষেত্রে টেনে এনেছিল সমর দত্ত?

উশ্রীকে সান্ত্বনা দিতে পারি—সহসা এমন কোনো ভাষা খুঁজে পেলাম না নিজের মধ্যে। ছোট্ট ক'রে শুধু একবার ব'ল্লাম, 'ছিঃ, এম্‌নি ক'রে চোখের জল ফেলে তোমার ভাবীকালের পথকে কখনও সিক্ত কোরো না। তাতে যে তোমার স্বামী-পুত্রদেরই অকল্যাণ!' তারপর বিদায় নিয়ে ধীরে ধীরে উশ্রীর সাম্‌নে থেকে স'রে এলাম। আসার সময় উশ্রীর দুই ছেলের হাতে দু'টো টাকা গুঁজে দিয়ে আদর ক'রে ব'লে এলাম, 'বেঁচে থাকো, বড় হ'য়ে মায়ের মুখ উজ্জ্বল করো।'

বিকেল গড়িয়ে গোধূলির ছায়ায় তখন দিগন্ত ঢাকা প'ড়েছে। রাঙ্কাহিলে যাবার মতো আর এতটুকুও অবকাশ রইল না। কিছুটা উত্যক্তকরকণ্ঠেই সমর দত্ত ব'ল্লো, 'বেশ তো জমিয়ে এলে এতক্ষণ যা হোক্! বলি কি সাধে, মেয়েমানুষের ব্যাপারটাই আসলে গোলমেলে। তা—আত্মিয়াটি কে?'

যা বলা উচিত ছিল—তা কিন্তু সত্যি সত্যিই ব্যক্ত ক'রতে পারলুম না; ব'ল্লাম, 'আমার কলেজ-জীবনের একটি ছাত্রী। বিয়ে হ'য়ে ছেলেপুলে হবার পর দীর্ঘকাল বাদে আজ হঠাৎ এই প্রথম দেখা।'

কিন্তু এ দেখা যে কতখানি দেখা—তা কি এতটুকুও বুঝ্‌লো সমর দত্ত? উত্তরে শুধু ছোট্ট একটা 'ওঃ'—ব'লে থেমে গেল সে। এর বাইরে তার আর কীই বা ব'ল্‌বার ছিল! মন্থর পায়ে ধীরে ধীরে বাড়ীর পথেই পা বাড়ালাম দু'জনে। অলক্ষ্যে বাঙালীটোলার দিকে আর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মনে মনে একবার ব'ল্‌লাম: দেশভ্রমণের নামে এম্‌নি ক'রে হঠাৎ যদি কেউ কোথাও অলক্ষ্যিত পথে পা বাড়াতে গিয়ে এমনই কোনো বাঙালীটোলায় এসে অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে, তাকে আর যে-দুর্ভোগই পোহাতে হোক্ না কেন, এমন ক'রে কোনো বাঙালী মেয়ের দর্শন যেন তার অদৃষ্টে কোনোদিন না ঘটে! আর যদিই বা ঘটে, তাকে যেন আমার মতো এমন কান্নার কারুণ্য নিয়ে ব্যর্থ চিত্তে ঘরে ফিরতে না হয়!

যে উৎসাহ নিয়ে এখানে পৌঁছেই সমর দত্তদের গোটা বাড়ীটার সঙ্গে মিশে গিয়েছিলাম, কোথা দিয়ে কেমন ক'রে যে সে-উৎসাহ হঠাৎ নিভে গেল, বুঝতে পারলুম না। যথাসময়েই স্টেশনে এসে আবার ট্রেনে চেপে ব'স্‌লাম: ক'ল্‌কাতার ট্রেন। আসার সময় গাড়ীর ঝক্‌ঝকানি আর পোড়া কয়লার গন্ধে বেশ একটা মাদকতা অনুভব ক'রেছিলাম, এবারে সারা পথ জুড়ে কেবল উশ্রীর কথাগুলিই ঘুরে ফিরে বার বার ক'রে এসে কানে বাজতে লাগ্‌লো। কখন যে আমার সমস্ত অস্তিত্ব তার মধ্যেই মিশে গেল, বুঝতে পারলুম না।

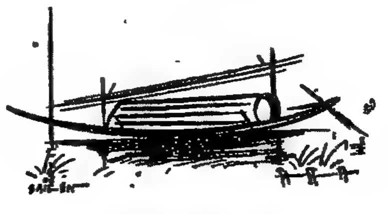

চূড়ালা ও শিখিধ্বজ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

"স্ববিবেক-ঘনাভ্যাস-বশাদাত্মোদয়েন সা শুশুভে শোভনা পুষ্পলতেবাভিনবোদগতা।"
—রাণী চূড়ালা, যোগবাশিষ্ঠে

সুপ্রবল পরাক্রান্ত রাজা শিখিধ্বজ
স্বদেশে স্বনামধন্য পবিত্র বংশজ
যশস্বী প্রথিতকীর্ত্তি।

বৈরাগ্য উদয়
চিন্তাশীল চিত্তে তাঁর দিনে দিনে হয়
মিথ্যা মরীচিকাময় স্বপ্ন যেন সব
নিতান্ত নশ্বর বলি হয় অনুভব।
শৃঙ্গে সর্ষপের মত আছে আর নাই—
প্রাণ চায় নিত্য সত্যে ধরিবারে তাই
অম্লান উজ্জ্বল শান্ত শাশ্বত সুন্দরে
সত্য হ'তে সত্য যেই সেই পরাৎপরে
অপরোক্ষ অনুভবে।

অন্তর উদাস—
পরমা সুন্দরী রাজ্ঞী চূড়ালার পাশ
ক্রমশঃ এড়ায়ে চলে। বলে: "কেবা কার
কান্তা পুত্র কার তুমি কেই বা তোমার
এই চলচ্চিত্র পথে? ছায়াবাজি সম
দৃশ্য পরে দৃশ্য হয় পটক্ষেপ মম
কৈশোর যৌবন গত, প্রৌঢ়ের প্রাক্কালে
এখনো কি মূঢ় মন মোহের খেয়ালে
চলিবি মত্তের মত? পিয়া মোহ-মদে
প্রিয়া প্রিয় বোধ করি আত্মীয় সংসদে
ক্রীড়া-পুত্তলিকা সম ঘুলিয়া ফিরিবি
কবে আর জ্ঞাননেত্র মেলি নেহ নিরি
নারায়ণ নিরঞ্জনে?"

গীতা নীতি বাদ—
রাজ্ঞী তাঁরে বুঝাইলে রাজা বন্দী হেন,—
সিংহাসনে সিংহ নহে,—কারাগৃহে যেন
বদ্ধ মানে আপনারে।

রাণী ব্রহ্মজ্ঞানী
অতুল ঋষির কন্যাসম—তাঁর বাণী
রাজা না নিতেন কর্ণে; ভাগ্য-বৈরিতায়
স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী এই ধারণায়
তুচ্ছ করিতেন তাঁরে।

না-দেখে যে-জন
চক্ষু থাকিতেও অন্ধ; কাহার নয়ন—
অন্ধ তার চেয়ে বেশী?

শুনিয়া শ্রবণে
শোনে না যে, তা'র চেয়ে আর কারে গণে
বধির অধিকতর?

বুঝিবে না যেই
অজ্ঞান পণ্ডিতম্মন্য আপনারে সেই
মানে সে পণ্ডিততম।

প্রজাদের স্তুতি
নাহি করে শ্রুতিমুগ্ধ বিচিত্রানুভূতি
মনে হয় পরিহাস করে প্রজাদল
মৃতপ্রায় দেহে তাঁর তর্পণের জল
ছিটায় মৃত্যুর আগে।
সর্ব্বত্যাগ করি
অর্পিলেন অবশেষে অমাত্যের 'পরি
রাজ্যভার, রাজ্ঞী মাত্র আজ্ঞাকারী তাঁর
সিংহাসনে উপলক্ষ পালনে প্রজার
রাজার প্রতীক রূপে।
হিমাচল পরে
রাজা শিখিধ্বজ দীর্ঘ তপশ্চর্য্যা করে
অষ্টাদশ বর্ষ ধরে। পর্ণকুট বাসে
চিত্তের সঞ্চিত ক্লেদ তপস্যায় নাশে
নীরন্ধ্র সংযমে শমে।
ধীমতী চূড়ালা
রাজার কল্যাণ চিন্তা চিত্তে দীপ জ্বালা
আসিলা সন্ন্যাসী বেশে জটাজুট ধরি
সে নির্জ্জন গিরিচূড়ে ছদ্মবেশ পরি
গৈরিক অরুণ কান্তি অঙ্গে বাহিরায়
ভস্মে নাহি ঢাকে বহ্নি প্রসন্ন উষায়
দীপ্ত বরণীয় রূপে—জ্যোতিঃপুঞ্জ দেহ
আরণ্য লাবণ্যে পূর্ণ। নাহিক সন্দেহ
মুক্ত আত্মা বনচারী ইনি আত্মারাম
রাজা ভাবিলেন তাঁরে, পূর্ণ-মনস্কাম
মানিলেন আপনারে।
বসিলে আসনে
স্বাগত করিয়া কন বিনম্র ভাষণে—
"হে ব্রহ্মণ্য দেব। আজি তোমারে হেরিয়া
মনে হয় ভগবান করুণা করিয়া
অবতীর্ণ তব দেহে আমারে তারিতে
গুরুরূপে জ্ঞানাঞ্জনে মোহ নিবারিতে
অজ্ঞান তিমির নাশি।
কর উপদেশ—
কোন তপশ্চর্য্যা করি, করি তপঃক্লেশ
প্রত্যাহার করি চিত্ত, চিত্তরোধ করি
কোন সে অভ্যাস-যোগে ধ্যান তাঁর ধরি
সম্পূর্ণ সমাধি লভি ভূমার পরশে
স্বল্পের সঙ্কীর্ণ সুখে যেন নাহি রসে
বহির্মুখী বৃত্তি মোর। তুমি হও গুরু
ধর হাত, কর শান্ত বক্ষ দুরু-দুরু,
নিয়ে চল সঙ্গে মোরে তমসার পারে
দিব্য জ্যোতির্ম্ময় দীপ দেখাও আমারে
দীর্ঘ দুরত্যয় পথে।"
কহিলেন রাণী :—
"লহ যদি উপদেশ এই মাত্র জানি
সর্ব্বত্যাগ বিনা কেহ ভূমার পরশ
পারে না লভিতে কভু।"
কহিল নৃপতি :—
"সব ত্যজিয়াছি তবু,—তবে মহামতি
আবার ত্যাগের আজ্ঞা কর কেন আজ
স্ত্রী-পুত্র প্রভুত্ব ত্যজি, সিংহাসন রাজ
নিষ্কিঞ্চন ভিক্ষু আজি, আর কি ত্যজিব
এ পর্ণ কুটির ত্যজি বলতো রচিব
শয্যা শষ্পাসন 'পরে।"
রাণী তারে ক'ন—
"অবিরক্ত চিত্তে রাজা শুন দিয়া মন
কিছুই ত্যজনি তুমি, আত্ম প্রবঞ্চক
গৈরিক পরেছো মাত্র মিটাইতে সখ
ব্রহ্মজ্ঞানী সন্ন্যাসীর।
বহির্ব্বাস চীর
গাত্রে শীতত্রাণ বস্ত্র, এ পর্ণ কুটির
ভোজন শয়ন জন্য সম্ভোগের ধন
গার্হস্থ্যের চূর্ণরূপে পূর্ণ নিদর্শন
সকলি রয়েছে রাজা। যা কিছু তোমার
তাহারা সকলে মিলে প্রভাব বিস্তার
করিছে তোমার মনে। কিঞ্চিৎ কিঞ্চন
আপন বলিতে বস্তু আছে যতক্ষণ
ততক্ষণ তোমারেও করে অধিকার—
তুমিও প্রভুত্ব মানো তাদের সবার।

অবশ্য তোমার পরে।"

নৃপতি তখন
কুটিরে অনল দিয়া গৈরিক বসন
যাহা ছিল স্বল্পতন্ত্র কমণ্ডলু থালি
লোমবস্ত্র অগ্নিসাৎ ভস্ম করি, খালি
রাখিয়া কৌপীণ মাত্র বলিলেন :— "প্রভু
আর তো কিঞ্চিৎ মাত্র সঞ্চয়িত কভু
কোথাও না কিছু আছে, তবে মোর ত্যাগ
এবারে কি পূর্ণ হ'ল, বিষয়-বিরাগ
কহ দেব কৃপা করি।"

কহিলেন রাণী:—
"কোথায় প্রবৃত্তি তব তাহা নাহি জানি
বাসনা নিবৃত্তি সূত্র ; এ তুচ্ছ কুটিরে
দগ্ধ করি মিথ্যা পরিধান করি চীরে
কোন ত্যাগ ফল তুমি লভিলে নৃপতি ?
নৃপত্ব ত্যজেছো যদি তবে মহামতি!
কোন ক্ষুদ্র ত্যাগ ফলে প্রলুব্ধ মানসে
পোড়াইলে কন্থা কমণ্ডলু মোহ বশে
যেন অবশিষ্ট শুধু তা'রা বৈরাগ্যের
ইষ্টলাভে অন্তরায়।

আপন দেহের
ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে লিপ্ত ভোগের পিপাসা
ছুটে চলে বহির্মুখী মধুমুক্তি আশা
গৃহে কিম্বা বনে কিম্বা কুঞ্জবনে গিয়া—
নানা কুসুমের মধু আনি আহরিয়া
বিরচিবে মধুচক্র।

এ স্বভাব তার
কেমনে সংহত হবে তাহার বিচার
ক'রেছো কি সাবধানে ?"

রাজা ক'ন তা'রে :—
"বল যদি এ মুহূর্তে পারি ভস্মিবারে
এ শরীর, বিষতরু সার্দ্ধ তিন হাত
আত্মার পথের কাঁটা করি অগ্নিসাৎ
এ কঙ্কাল কলেবর।"

উদগ্র নৃপতি,
তখনো জলিছে অগ্নি, প্রবেশিতে মতি
করেন তাহাতে তিনি।

রাণী ক'ন তা'রে :—
"ক্ষান্ত দাও শান্ত কর অস্থির আত্মারে
দেহ যদি দগ্ধ করি কর ভস্মসাৎ
সেই ভস্মে পুনরায় হইবে সঞ্জাত
কামনার নবাঙ্কুর, চিন্তা কর তুমি
কোথা তার প্রাণশক্তি, কোথা জন্মভূমি
ভেবে দেখো মতিমন্! কোথায় বন্ধন
মিথ্যা কেন অজ্ঞ হেন আত্ম-প্রবঞ্চন
করিছ আপন সাথে ?

ত্যাগের স্পর্দ্ধায়
ত্যাগ নহে অহঙ্কার আকাশে পৌঁছায়
দম্ভের স্তম্ভের চূড়া ধূমায়িত করি
যেন সে দণ্ডীর রূপে শূলদণ্ড ধরি
বিধাতারে দিবে দণ্ড।

আত্মহত্যা করি
আপনি পাইবে দণ্ড অজ্ঞানে আবরি
আপনার জীবাত্মারে।

হত্যা যদি কর
এই মিথ্যা আমিটারে সর্ব্ব-পরিহর
ত্যজি এই ছদ্মবেশ স্বত্ব অধিকার
ভেবে দেখো মহারাজ সত্য কেবা কার
সম্বন্ধ বন্ধন মিথ্যা কর্ত্তা মনে করি
কে তুমি মমত্ব বশে রাজিলে প্রহরী
কাহার প্রদত্ত ধনে ?

বাসনাই মূল
স্বজন সাম্রাজ্য লক্ষ্মী ত্যাগ মাত্র স্থূল
মূলতঃ মনের ভ্রমে! বাসনা আলানে
এ মত্ত মাতঙ্গ চিত্ত বদ্ধ নানা টানে
টানিয়া ছিঁড়িতে নারে।

গৈরিক বৈরাগী
যে ত্যাগ করিতে নারে সেই ত্যাগে ত্যাগী
রাজর্ষি জনক পৃথু রহে সিংহাসনে

যে ত্যাগের মর্ম্ম কথা বসি শষ্পাসনে
সন্ন্যাসী বুঝিতে নারে।

কর্ম্মফল ত্যাগ
কর্ম্মত্যাগ হ'তে শ্রেষ্ঠ কোনো যজ্ঞ যাগ
নহে তার সমকক্ষ।

সন্ন্যাসীর ঘর
সার্দ্ধ তিন হস্ত মাত্র আত্মচিন্তা-পর,
বিশাল বিশ্বের তরে, কোন ভার ধরে ?
'এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং'—সে-চক্রের তরে—
না তোলে সে করাঙ্গুলি।

দেহ দগ্ধ করি
ভস্ম করি এ কুটির তুষাগ্নিতে মরি
তবুও না হবে দগ্ধ অনন্ত বাসনা
অবচেতনের তলে অতল-গহনা।
রচিয়াছে জাল মালা ঊর্ণানাল সম
টানিলে সে বাড়ে মাত্র, তার অন্ধ তমঃ
না মিলায় সূর্য্য করে, সন্দেহ সন্দেহা
দূর নাহি হয় কভু ; আসক্তির লেহা,
চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয়ে ইন্দ্রিয়ের ভোগে
পিপাসা বেড়েই চলে, মধুমেহ-রোগে
রোগীর তৃষ্ণার মত।

শুধু মিথ্যাচার
জ্ঞান বিনা বৈরাগ্যের মাত্র অনাহার
সাময়িক অরুচিতে শরীর পীড়ন
আসুর তপস্যা করি না হয় মিলন
পরমাত্মাসহ তাহে। এ দেহ নাশিবে
জন্মান্তর গতাগতি কিসে নিবারিবে—
পৃথ্বীর মুক্তির তৃষ্ণা ? ভেবে দেখো মনে
স্থূলে ছাড়িয়াছো যাহা তাহা ক্ষণে ক্ষণে
মনে মনে কর ধ্যান, কর মিথ্যাচার
উপবাস কালে যেন লুব্ধ রসনার
নানারসে হয় ধ্যান। কাম্যের কামনা
চিত্তেরে আকৃষ্ট করে, তাহা কি জান না—
হে তিতিক্ষু মহাজন।"

রাজা কন :—"তবে—
শিখাও অভ্যাস-যোগ, যার ফলে হবে
প্রাণায়ামে প্রত্যাহার ধারণা ও ধ্যান
আমারে করুণা করি দাও মোরে স্থান
বিষ্ণুর পরমপদে।

এ প্রাণ ত্যজিব—
হয় মুক্তি, নয় মৃত্যু, সাদরে বরিব—
আশ্রিতে শরণ দাও শিখাও সাধনা
ভূমার সন্ধান বিনা আর ফিরিব না
অকৃতার্থ প্রাণ নিয়া।

মৃত্যু নাহি চাই
ভস্মীভূত করি দেহ যদি নাহি পাই
আনন্দিত স্ব-স্বরূপে, কিন্তু কিবা হবে
কৃমি কীট সম প্রাণ দেহে সে কি রবে
শুধু মেদ মজ্জা বহি ?"

চূড়ালা তখন—
শিখালেন শিখিধ্বজে নিগূঢ় সাধন
রাজগুহ্য রাজযোগে। মাস বর্ষ যায়
অক্ষরাক্ষর পরিচয় চূড়ালা কল্পায়
নব বর্ণ পরিচয়ে। ভ্রূমধ্য দ্বিদলে
কূটস্থে সুস্থির স্থিতি ধ্যান যোগবলে
নস্রোত পশুর মত সুসংযত মন
সমাধির পূর্ব্বকালে ধ্যানে নিমগন
ঈষৎ উদয় রশ্মি তমসার পারে
তিতীর্ষু তৃষিত আত্মা তবু সে তাহারে
ধরিয়া ধরিতে নারে।

পরীক্ষার ছলে—
চূড়ালা তখন তাঁরে যোগশক্তি বলে
দেখান আপন রাজ্য ; যেন সেথাকার
রাজ্যশ্রী হইল নষ্ট অভাবে তাঁহার,
রাণী স্বৈরাচার করে সিংহাসনে বসি
রাজ্য ছারেখারে দেয় স্বেচ্ছাচারে পশি
রাজকর্ম্মচারী সবে।

ধ্যানভঙ্গ হলে
জাগিয়া উন্মত্তপ্রায় রাজা তবে বলে :—

"অনুমতি দাও দেব রাজ্যে ফিরি গিয়া
বিশ্বাসহন্ত্রীরে আসি নির্ব্বাসনে দিয়া
রাজ্যদান করি কোন দায়াদের পরে
অচিরে ফিরিয়া আসি তপস্তার তরে
তব সন্নিধানে পুনঃ।"

কহেন চূড়ালা :—

"ভেবে দেখো মহারাজ! এই পর্ণশালা
সর্ব্বত্যাগ করি তব নিরালায় স্থিতি
এই কি নির্ব্বেদ তব? আমি নিতি নিতি
আসি যাই তব ঠাঁই এই শিক্ষা লাগি
নিষ্কিঞ্চন নিরাসক্ত সুপক্ক বৈরাগী
দগ্ধ পর্ণ কুটিরেরে করি ভস্মভাগ
পুড়াইয়া উড়াইয়া আগে অনুরাগ
কাহার রাজত্ব প্রতি? কে কাহার রাজা
কে কাহার রাণী, শুনি, কারে দিবে সাজা?
এই চীর পরিধান নির্জ্জন কাননে
নগ্ন দেহে অনশনে বিশুষ্ক আননে
রাজযোগ সমাচরি পুনঃ রাজ্যভার
লইতে ছুটিল মন, দণ্ড দিতে তার
যে তব বিশ্বাসহন্ত্রী, কিসের বিশ্বাস?
প্রাণে ও অপানে সন্ধি করিয়া নিঃশ্বাস
সাধিলে সমাধি যোগে কোন সুখ লাগি,
যে সুখে কান্তার প্রেম ত্যজি, হে বৈরাগী!
হইলে কান্তারচারী? এই প্রাণ পণে
হয় মুক্তি নয় মৃত্যু সংকল্প সাধনে
প্রাণ-মন-বিনিয়োগ? কহ হে নৃপতি!
কে চূড়ালা রাণী তব, স্বাধীনা সম্প্রতি,
কিম্বা নীতিপরায়ণা?

তুমি দেহ নও

পঞ্চকোষ পুরে বদ্ধ বন্দী হয়ে রও
মনোবুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত ইন্দ্রিয়াদি
বহু সপত্নীর মত তোমারে অনাদি
টানিছে কামনা স্রোতে। পঞ্চ মহাভূত
পঞ্চ প্রাণ সপ্ত ধাতু স্বরূপ বিচ্যুত
বিরূপ আত্মার প্রতি। তিন গুণে বাঁধা
কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্য্যের বাধা
সুবর্ণ শৃঙ্খল সম তারে জ্ঞান করি
মোহ বশে অলঙ্কার হেন বক্ষে ধরি
এখনো রয়েছো রাজা বাসনার দাস
বিবেক বৈরাগ্য যোগে কাটি মায়া পাশ
মুক্ত হও—ধ্যান ধরি।

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম

কাটিয়া শৃঙ্খল পার্শ্বে পড় আত্মারাম
সুন্দরের শিবমন্ত্র। বৃথা পুণ্য পাপ—
যজ্ঞযাগ দায়ভাগ স্ময়াপলাপ
অনুতাপ মোহ বশে।

ব্রহ্মহবি রূপে

ব্রহ্মানলে ব্রহ্মসাৎ করি চুপে চুপ,
লবণ পুত্তলী সম অথবা সেথায়
মিলায়ে মিশায়ে দাও আপন সত্তায়
পরমাত্মা পারাবারে।

জঠরে শয়ন

পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু যন্ত্রণা রোদন
দিবারাত্রি ঋতুচক্রে ঘুরি গতায়াত
আলাত-চক্রের মত ঘাত প্রতিঘাত
নিষ্পেষিত করে জীবে।

জন্মে জন্মে তার

রাঙা ফলে মুখ দিয়া চলে হাহাকার
যাবজ্জীব কারাবাসে, মিথ্যা আশা পাশে
মায়া যাদুকরী তার আত্মদৃষ্টি নাশে
বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চ পরে রচে চিত্রছায়া
ছায়ারে সে মনে করে পুত্র বন্ধু জায়া
আপনার ছায়াপাশে।

দুই চক্ষু বাঁধা

তৈলিকের বলীবর্দ্দ দিনে দেখে আঁধা
অসম্পূর্ণ দরশনে। কভু ইন্দ্রজালে
রোপিয়া সংসার তরু তারি আলবালে
ঢালে দ্রবীভূত স্নেহ—অন্তরের সুধা
নিঃশেষ করিয়া দেখে তবু এ বসুধা

ত্রিগুণ ত্রিতাপ তপ্ত।
পদতলে বালু
উপরে ভাস্বর তাপ তৃষাশুষ্ক তালু—
মরে মরুভূমে মিথ্যা মরীচিকা ভ্রমে
আপাত মধুরে মজি স্বৈরস্বিন্ন শ্রমে
বিধিরে ধিক্কার করি।
ক্ষমা কর তারে,
না কর, উপেক্ষা কর, যারে প্রেমভারে
নিপীড়িত করেছিলে নিজে একদিন
অনন্ত তন্ময় প্রাণ প্রণয়ে নবীন
তাহার পায়ের কাঁটা তুলিবার লাগি
আপনার প্রাণ তুলে দিতে অনুরাগী
সে দিন কোথায় আজ? হলে তার সুখ
সুখী না হইতে পার, হও পরাঙ্মুখ,
উদাসীন নির্বিকারে।
আত্মরাজ্য তব
অধিকার কর নৃপ তাহার বৈভব
কারো হতে অল্প নহে অনেক অধিক
ঐশ্বর্য্যে মাধুর্য্যে পূর্ণ। সংসার ক্ষণিক
এ রাজ্য শাশ্বত সত্য। আত্যন্তিক সুখ,
অতিক্রান্ত মনো বুদ্ধি, লেশ মাত্র দুখ
ইহাতে মিশ্রিত নাই।
নাই ক্ষতি ক্ষয়
একবার লব্ধ হলে নাই আর ভয়
পুনরায় হারাইতে। কোনো লাভ নয়
ঔপম্য ইহার সনে,—ভূমার প্রত্যয়
পরাজয় করে তুচ্ছে।
মিথ্যাভিনিবেশে
রমণীরে রমণীয় মনে করি শেষে
দেখিবে সে, মাংস, বসা, শোণিত বিকার
ভঙ্গুর কন্দর্প শর হানে মাত্র তার
দু'চারি যৌবন দিনে। মুহূর্ত্তের ফুল
মাটিতে পড়িয়া যেন বেদনা-আকুল
করে যে সৌরভ-ভারে।

অনিত্য এ দেহ
সোহাগের স্বর্গ ইহা নাহিক সন্দেহ
অমেধ্য, মলিন-মধ্য, আদি অন্তে ভ্রম,
পাণ্ডু রোগে হয় যেন পীতাভা সংক্রম
চক্ষু হতে দৃশ্যপটে।
মনোরম কায়া,
প্রাণবায়ু গত মাত্রে, জলবিম্ব-মায়া
ফুটিয়া টুটিয়া যায় বর্ণমালা তার,
অমর আত্মারে ভুলি, ভূত-ভবে আর
ভার্য্যাও না যায় কাছে।
আত্মা কি আত্মার
ক্রীত কি বিক্রীত ধন, যার অধিকার
ভূ-স্বামীর মত তুমি কর তার পরে
উপাধিতে অর্দ্ধাঙ্গিনী যারে মাত্র করে
দিয়া এলে রাজ্যভার, নিয়া এলে তার
সাধের সর্ব্বস্ব ধন, এ দেহ তোমার
তথাপি প্রভুত্ব চাও উপরে তাহার
মমত্ব মদিরা পানে। এ কি ব্যবহার
উচিত বিচার মত?
শান্ত করি মন,
পুনরায় ধ্যান করি কর আরোহণ,
কূটস্থে ভ্রূমধ্য ভূমে রাখহ আত্মায়,
ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা তব নিরপেক্ষতায়
পাইবে আশ্রয় তথা।"
পুনঃ শিখিধ্বজ,
নিমীলিত নেত্রে ধ্যান করে অধোক্ষজ
মাত্রাস্পর্শ শোক-হর্ষ-দ্বেষ-হিংসাহীন
উর্দ্ধ হতে উর্দ্ধলোকে। মগ্ন যেন মীন
গভীর আনন্দ হ্রদে। জালিকের জাল
সেথা না প্রবেশ করে তরঙ্গ উত্তাল—
সেথা না স্পন্দন তোলে।
দিন চলে যায়
ছদ্মবেশে বাণী এসে নিত্য তপস্যায়
করে অগ্রসর তাঁরে গুরুরূপ ধরি
পতির পরম সেবা সযত্নে আচরি
পত্নীর বিচিত্র ব্রতে!

সমাহিত মন
শিখিধ্বজ ক্রমে ক্রমে অতিক্রান্ত হন
উদ্বেল সমুদ্র হতে ক্ষুব্ধ বাত্যাহত
নিস্তরঙ্গ মেরুদেশে সুস্থির গতত
অর্ণব পোতের মত, সুনির্ম্মল জলে
ধবল তুষার শৈল যেন ভেসে চলে
রজত শৈলের মত। ভোলা মহেশ্বর
চারু চন্দ্রকলা শিরে কল্যাণসুন্দর
যেন পরিপূর্ণ রূপে।

পুনরায় রাণী—
রাজার সে তপশ্চার অন্তরে বাখানি
পরীক্ষিতে ইচ্ছা করে শিক্ষকের মত
অন্তেবাসী হিতৈষণা করে হিতব্রত
ব্রহ্মজ্ঞ সদ্গুরু যথা।

যোগনিদ্রা দিয়া
আবার রাজার চক্ষে চক্ষু সঞ্চারিয়া
রচিল আশ্চর্য্য দৃশ্য; দেখিলেন তিনি
নিজ রাজ্য রঙ্গমঞ্চে বাজে রিনি ঝিনি
রাণীর নর্ত্তিত পদে কাঞ্চন নূপুর
চূড়ালার কণ্ঠ হতে অপ্সরীর সুর
তরঙ্গ বহিয়া চলে। রাণীর প্রণয়ী
সুন্দর নবীন যুবা গীতি কাব্যময়ী
গাহে স্তুতি গাথা তার, দেয় সাধুবাদ
কামাতুর ওষ্ঠে তার অধর আস্বাদ
করে সে নিবিড় বক্ষে বাহুতে বাঁধিয়া
রাণী যেন সুখালসে পড়ে এলাইয়া
তাহার বক্ষের পরে।

"কহ মহারাজ"
শুধায় গম্ভীর কণ্ঠে রাণী পুনঃ আজ—
"কি দেখিছ ধ্যান নেত্রে?"

মহারাজ কহে—
"পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে বন্যা হেন বহে
বহু রঙ্গে তরঙ্গিনী, হেরি মোর রাণী
এই রঙ্গময় নাট্যে অভিনয়খানি
করে পরকীয় প্রেমে অতি পরিপাটি
আমিতো দর্শক মাত্র এই সুখে খাঁটি
নিরপেক্ষ সাক্ষী হ'য়ে।

করি আশীর্ব্বাদ
'নাম্নে সুখমস্তি'—যেন এই সুখাস্বাদ
অনন্ত সুখের পানে টানে তার মন
অগাধ আনন্দ-হ্রদে হয় নিমগন
প্রেয় হ'তে শ্রেয়স্তরে, শ্রেয়স্তরে প্রেয়,
যেন তার মনে হয়, অকিঞ্চিৎ হেয়
ক্ষণিক ঐহিক সুখে।

আনন্দে আহ্লাদে
প্লাবিত আমার চিত্ত, চিত্ত নাহি বাঁধে,
দ্বেষ নাই, হিংসা নাই শান্ত নিরুদ্বেগ
লোভ নাই, ক্ষোভ নাই লেশ মাত্র মেঘ
নাহিক অন্তরাকাশে। ব্রহ্ম হ'তে তৃণ
জগৎ সুতৃপ্ত হোক প্রার্থনা নবীন
স্বতঃ উৎসারিত হয় অন্তস্থল হ'তে—
আনন্দে নিখিল লোক কল্যাণের পথে
চলিতে প্রবৃত্ত হোক। হে ব্রহ্মণ্য দেব!
তোমার কৃপায় মোর অজ্ঞানের লেপ
মিলালো আলোক লভি।

কিন্তু না না একি!
তুমিই চূড়ালা দেবী সত্যই কি দেখি
মহিষীবে মহীয়সী রূপে?"

"মহারাজ
তোমারে বঞ্চনা করি সাজিয়াছে আজ
দাসী তব কুম্ভী-সর, গুরু মূর্ত্তি ধরি
সেবা করে অভিনয়ে, যাহা কিছু করি
বশিষ্ঠের উপদেশে।"

"দাসী নহ দেবী
তোমারি নির্দ্দেশে আমি পরমাত্মা সেবি
লভিনু পরম পদ। কিন্তু কহ শুনি,
হেন জ্ঞানে জ্ঞানী তুমি, হেন গুণে গুণী

তবে কেন রাখিলে না নিজ অন্তঃপুরে
কেন এই দূর বনে, দবিষ্ঠ সুদূরে,
আসিয়া অর্পিলে জ্ঞান হেন ছদ্মবেশে
স্বপ্নে মিথ্যা দেখাইয়া মোরে হিংসাদ্বেষে
করিলে জর্জ্জর দগ্ধ ?"
"শুন মহারাজ
অন্তর খুলিয়া বলি, কেন ছদ্মসাজ,
রাজ্য ছাড়ি গুরুদেব পাঠাইলা বনে
কোন অভিসন্ধি লাগি, কোন প্রয়োজনে
আপন নগরী ছাড়ি। পত্নীরূপে মোর
আমার দেহের রূপে চন্দ্রের চকোর
তোমার সংসক্ত ছিল। অযথা সন্দেহে
হিংসায় বৈরাগ্য বহ্নি জ্বালি নিজ স্নেহে
আপনি হইলে দগ্ধ, আমারে দহিলে,
আমিও ছায়ার মত আসিনু নহিলে
তুমি কি লইতে জ্ঞান মোর মুখ হ'তে ?
নিজ অন্তঃপুরে বসি কন্দর্পের পথে
চালাইতে মনোরথ।
আজি সিদ্ধকাম
তোমার দাসীর প্রতি নাহি হও বাম,
দীক্ষিত নিষ্কাম ধর্ম্মে চল রাজ্যে পুনঃ
প্রজাহিত ব্রতে রাজ্য, মোর কথা শুন,
করিব দু'জনে গিয়া।
বনে কিবা কাজ
বনদেবতার রাজ্যে ? চল মহারাজ!
রাজর্ষির রূপে নররাজ্যে চল তবে
সেথায় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নরনারী সবে
বহিছে সংসার ভার। বহুরূপে রূপী
বিশ্বনাথ যেথা লীলা করে চুপি চুপি
মায়ায় প্রপঞ্চ রচি, সংসার নাটকে,
চল অভিনয় করি। যেমতি বাহকে
বহে গুরুভার বোঝা, রাজ আজ্ঞা স্মরি
তেমনি তাহার ভার দোঁহে পুনঃ ধরি
নিষ্কাম কর্ম্মের ব্রতে লোক-সংগ্রহের
শোক বিজয়ের মন্ত্র, মন্ত্র অভয়ের,
আনন্দে কীর্ত্তন করি!
রহে যবে দেহ,
বিশ্বে ব্রহ্ম, ব্রহ্মে পরমাত্মা রূপে, স্নেহ
বিলাই প্রতিটী জীবে ব্যষ্টিরূপে তাঁর
সমষ্টির মহেশ্বরে। মৃত্যু পরপার
দেহ গেলে, যেথা গেলে ফিরে নাকো আর,
একান্ত নিবৃত্ত বৃত্তি, নির্লিপ্ত-আত্মার
যাবে সে পরমধামে, পুরুষোত্তমেরে
অপরোক্ষ অনুভবে আনন্দময়েরে
অকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠধামে।"
"যাহা ইচ্ছা তব"
রাজা কন :—"বাক্য তব মাথাপাতি লব
আপনি আহরি জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানবতী
গার্গী; বিশ্ববারা, আর মৈত্রেয়ী যেমতি,
আমারে করিলে ধন্য দিয়া সেই জ্ঞান,
গুরুরূপে দাসীরূপে উভয়ে সমান।
তাই হবে, রাজ্যে রব বাণপ্রস্থে রত
অপত্যের মত প্রজা পালিব সতত,
আর এক কথা প্রিয়ে! সিংহাসনে বসি
তোমারে দক্ষিণ পার্শ্বে বসাবো প্রেয়সি!
তোমার দাক্ষিণ্য স্মরি।
তুমি দাক্ষায়নী
সৌম্যা সৌম্যতবা রূপে আমারে আপনি
করিলে অসীম স্নেহ গুরুরূপে সখি!
আমারে অমৃত দিলে হলাহল ভখি
নীলকণ্ঠ সম নিজে—গুরুরূপে তাঁর
অনির্ব্বচনীয় রূপে যে সাক্ষাৎকার
করাইলে দিব্যনেত্রে—সেই নেত্র দিয়া
তোমার পবিত্র পুষ্পে কীট আশঙ্কিয়া
এসেছিনু জুগুপ্সায় বিদ্বেষ বৈরাগে
বুঝি নাই, তুমি যবে শুদ্ধ অনুরাগে,
চেয়েছিলে পবিত্রিতে এ পঙ্কিল হিয়া
আমি এসেছিনু চলি অভিমান নিয়া
অতৃপ্ত দাম্পত্য প্রেমে, তুমি নহ বামা
পতিত পতির মুক্তি লাভে সিদ্ধকামা।"

প্রতিবিম্ব

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

সুধাকর সাহেব সস্ত্রীক সান্ধ্যভ্রমণ সম্পন্ন করিয়া গৃহ-প্রত্যাগত হইয়া পা-পোষে পা ঘসিতেছেন, টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সুধাকর টেলিফোনের, সুধাকরপত্নী বাবুর্চ্চিখানার দিকে প্রায়-ধাবিত হইলেন। স্বদেশী রাষ্ট্র-চালিত ফোন, ভীষণ খামখেয়ালি—কখনও ঘণ্টাটা এক মিনিট বাজিয়াই নিঃশব্দ, কখনও কাণ মাথা ঝনঝনাইয়া ফোন তুলিয়া দেখা গেল কাকস্য পরিবেদনা। অথচ টেলিফোনের ঘণ্টা এমনই জিনিষ যে সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে—উপেক্ষা করিবার সাধ্য কাহারও হয় না। ওদিকে, বাবুর্চ্চিটা চোর, মশালচী জোচ্চোড়, জমাদারটা ছ্যাচোড়, ঘুঁটে কয়লা পর্য্যন্ত বেচিয়া দেয়। গৃহস্বামিনীর সোয়াস্তি নাই।

সাহেব 'হ্যালো' করিতে অপরপ্রান্তবর্ত্তী অদৃশ্য বক্তা এক দমে এক রাশ বক্তৃতা করিয়া যখন হাঁপ লইল, সুধাকর কহিলেন, কানাঘুষো আমিও শুনেছি। তার আর আশ্চর্য্য কি বলুন? কলকাতা কর্পোরেশন যদি স্বাধীনতার আট মাসের মধ্যেই স্বাধীনতা হারাতে পারে, আমাদের বোর্ড বাতিল হ'তে ক'মিনিট সময় লাগে? এত কাল ইংরেজ ছিল, ড্রাষ্টিক কাজ করবার আগে দশবার ভাবতো, দশ জনের সঙ্গে পরামর্শ করতো, লোকে না ক্ষেপে ওঠে, সেটা দেখতো; ন্যাসান্যাল গভর্ণমেন্টের কোন তোয়াক্কাই নেই। এঁরা একদম বে-পরোয়া।

সুধাকর থামিলেন এবং পুনশ্চ এক প্রস্থ বক্তৃতা শ্রবণা-নন্তর কহিলেন, নিয়মমত তা-ই হওয়া উচিত। জানেন ত' এই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডটির জন্মদাতা হচ্ছেন আমার পিতামহ, আমার শ্বশুরই একে এতো বড় ও পোজিশান্ রেস্পেক্টেবল ক'রে দিয়ে গেছেন। বোর্ড চালাবার অধিকার কেউ যদি দাবী করতে পারে সে আমিই পারি। কিন্তু স্বাধীনতা বলতে আপনার আমার স্বাধীনতা ত' নয়, দেশের স্বাধীনতাও নয়। স্বাধীনতা হচ্ছে কর্ত্তা ও তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গদের, চেলা চামুণ্ড নন্দী-ভৃঙ্গিদের।

আবার গোটাকতক প্রশ্নোত্তর, সওয়াল জবাবের পর সাহেব "থ্যাঙ্কস্, খবর পেলে দেবেন" বলিয়া টেলিফোনের কল্ ছাড়িয়া আসিয়া বসিলেন। মেম সাহেবও ড্রয়িংরুমে দর্শন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ডিনার দিতে বলবো?

সাহেব অত্যন্ত দ্বিধাজড়িত স্বরে কহিলেন, বলবে? বলো।

আবার টেলিফোন। উদ্বিগ্ন সাহেব ছুটিলেন।

আমরা কথা শুনিতে পাইব না, উপকথনগুলা উদ্ধৃত করা গেল: আপনি কার কাছে শুনলেন? আমি শুনেছিলুম শনিবারে অর্ডিন্যান্স হচ্ছে···নরেশ বোস্?—বলিতে বলিতে সুধাকর সাহেবের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল; কণ্ঠস্বরও যেন সদ্য খোয়াঢালা পথে চলার মতো প্রতি পদে হোঁচোট খাইতেছে।···হ্যাঁ হ্যাঁ, আই-সি-এস্ ত নিশ্চয়ই; তবে অনেক জুনিয়র। হ'তেও পারে, আশ্চর্য্য নয়। মিসেস্ বোসের বেশ পুল্ আছে, শুনেছি। কিন্তু, নরেশ বোসের নাম আপনি কার কাছে শুনলেন?···আচ্ছা, লেট্স্ সি—দেখা যাক্, থ্যাঙ্কু, গুড্ নাইট্।

সাহেব পার্শ্বে বসিলে মেম সাহেব কহিলেন, শোভার কথা কি হচ্ছিল?

সুধাকর চমকাইয়া উঠিলেন, শোভা! শোভা! কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোভাই ত বটে! আমাদের এ-ডি-এম্ (এডিসনাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট) ফোন করছিলেন বোর্ড কালই সুপারসিড হবে আর ঐ নরেশ বোস্ হবে চীফ কমিশনার।

মেম সাহেবের প্রফুল্ল আননে কে যেন কালো কালী মাখাইয়া দিল এবং এমনই আহার অভিঘাত যে অনেকক্ষণ সে মুখ দিয়া বাক্যস্ফুরণ হইল না।

সাহেব কহিলেন, সুজিত সেনকে একবার ফোন করি। কি বলো? এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় না; প্রশ্নকারী উত্তরের প্রতীক্ষাও করে না। মিনিট দু'তিন পরে স্বস্থানে ফিরিয়া সুধাকর সাহেব শুষ্ক স্বরে কহিলেন, নেই; বাইরে খানা খাচ্ছে।

মেম সাহেব মৃদুকণ্ঠে, যেন প্রায় আপন মনেই খেদোক্তি করিলেন, নরেশকে তোমার মাথার ওপর বসিয়ে দেবে? অন্তত পাঁচ-ছ'বছরের জুনিয়র ত।

সুধাকর ভিতরে দাহ হইতেছিলেন, মেম সাহেবের কথাটা যেন দমকা হাওয়ার কাজ করিল। লু লু করিয়া খানিকটা আগুন ছড়াইয়া পড়িল; বলিলেন, রেখে দাও জুনিয়র। লোক্যাল সেল্ফ গভর্ণমেণ্ট কা'কে বলে জানে সে? একটা ডিষ্ট্রিক্টের চার্জও পেয়েছে কোনদিন? তবে তোমাদের স্বদেশী গভর্ণমেণ্ট, এই যা। যাক্ গে, যা হয় হোক্ গে, না-হয় রিজাইন্ দোব।—বলিয়া, পার্শ্বে রক্ষিত পুস্তকাধার হইতে সবেগে একখানা বিলাতি মাসিকপত্র টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে শেষের দিকে গেলেন, পরে পুনরায় বেগে সামনের দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সান্টিং ইঞ্জিনের মতো পুনরায় পশ্চাদপসরণ করিতেছেন, মেম সাহেব কহিলেন, একবার মল্লকে ফোন করবো? সাহেব সাগ্রহে বলিলেন, করো ত। বলা বাহুল্য, সুরঞ্জিত, সুচিত্রিত ও সুলিখিত মাসিকপত্রও আর তাঁহার চিত্তাবেগ ধারণে সক্ষম হইল না। সাহেব এক দৃষ্টে, এক মনে, এক কাণে, বুঝিবা নিশ্বাস প্রশ্বাস স্তম্ভিত করিয়া কক্ষের অপর-প্রান্তস্থিত রহস্যগর্ভ টেলিফোন যন্ত্রটির পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে মেম সাহেব মুখ কালো করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, জানে, ভাঙ্লে না। আমিও শুনেছি, আমিও শুনেছি ক'রে এড়িয়ে গেল।

সুধাকর শ্লেষ-স্বরে কহিলেন, ও তোমার খুড়োর ছেলে, না?

অন্য সময় হইলে মেম সাহেব ক্রুদ্ধ হইলেও হইতে পারিতেন, পাটকেলের বদলে পাটকেল্‌ও ছুঁড়িতেন; কিন্তু অত্যাসন্ন বিপদের মুখে স্থৈর্য্য রক্ষা করাই উচিত। ম্লান হাস্যে নীরব রহিলেন।

সাধারণত সাহেব বাড়ীর স্তব্ধতা অসাধারণ হইয়া থাকে। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পাঁচ সাতটা কচিকাচা থাকিলেও সে সব গৃহে কখনও ঘোষপাড়ার মেলাও বসে না, রাম রাবণের যুদ্ধও বাধে না। এই যে দুই ব্যক্তি ড্রয়িংরুমে কাছাকাছি দু'খানা কৌচে উপবিষ্ট তাহাদের নিশ্বাসের শব্দটুকুও শুনা যাইতেছে না। কিছুক্ষণ পরে, সাহেব 'সলিলকি' বা স্বগতোক্তি করিলেন, চোদ্দ বছর ওঁদের খিদমৎ খাটা হয়েছে, তার পুরস্কার এই হবে না ত আর কি হবে! তোমার মনে আছে ত যুদ্ধের সময় বার্ম্মা ইভাক্যুইদের কোথাও যখন যায়গা হচ্ছে না, কলকাতা ভরে গেছে, হাওড়ায় ধরছে না, আলিপুর লোক বার করে দিচ্ছে, তখন আমায় এসে ওঁরা ধ'রে পড়েন নি? রাত নেই, দিন নেই, না-আহার না-বিশ্রাম, ওরা নাম কিনবেন, বাহবা পাবেন, তার জন্যে কি পরিশ্রমই না করতে হয়েছিল আমার। তখনকার সেই চিঠিগুলো খবরের কাগজে ছাপিয়ে দোব না কি? গভর্ণমেণ্টে ব'সে আর কোন কথাই মনে নেই না? এরাই আমাদের দেশের লীডার।

মেম সাহেব বলিলেন, দশবছর বাবার ডেভিল্ ছিলেন না? ওঁকে এত বড়োটা করলে কে? বাবা না থাকলে চিরকাল ব্রিফলেস্ ব্যারিষ্টারই থেকে—

সুধাকর সাহেব অকস্মাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন, আমি রিজাইন্ করবো।

বারো-তেরোশ টাকা মাহিনার চাকরী ইস্তফার ইঙ্গিতেও মেম সাহেবের অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া পড়িতেছিল; বলিলেন, রিজাইনই বা করবে কেন?

কি বলছো মণি? চোদ্দ বছর নম্বর ওয়ান্ থেকে আজ ঐ নরেশ বোসের অধীনে চাকরী করতে হবে? ডিস্‌গ্রেস্।

বাবুর্চি পর্দ্দা ঠেলিয়া মেম সাহেবের উদ্দেশে কহিল, হুজুর, খানা তৈয়ার।

সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত, অতীব অবজ্ঞা সূচক কণ্ঠে কহিলেন, আভি যাও—যাও।

ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ অত্যন্ত মধুর, চিনির পানা ঢালা মোলায়েম স্বরে মেম সাহেব সেই ব্যক্তিকে অভয়দাত্রী

মতো বলিলেন, তুমি বন্দোবস্ত করো, আমি আসছি।

বাবুর্চ্চির সঙ্গে সকালে ১০টা ১টা ও সন্ধ্যায় ৭টা ৯টা ব্যবস্থা—ব্যবস্থাটা হোম ডিপার্টমেন্টের। সে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় একটা ইঙ্গ-ভারতীয় মেম টাইপিষ্টদের হোষ্টেলে পাচকবৃত্তি করে। সুধাকর সাহেবের সংসার ক্ষুদ্রএবং আড়ম্বরশূন্য, কাজেই সময় লইয়া সংঘর্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই; অপিচ এই ইনক্রেসনের—মাগ্‌গিগণ্ডা-দুর্ম্মূল্যের দিনে আর্থিক সুবিধা উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। মেম সাহেব পুনঃ পুনঃ ঘড়ির দিকে চাহিতেছিলেন এবং মনে মনে সময়ের নির্ঘণ্ট ছকিতে ছকিতে একবার মধুরকণ্ঠে কহিলেন, আজ আমি চিকেনমিট করেছিলুম; খেয়ে নেবে চলো।

সাহেব পূর্ব্বের রায় বহাল রাখিতে বলিলেন, না, না। খাবার ইচ্ছেই দেখছি না। দেরীতে তখন ইচ্ছে হয়, দেখা যাবে।

আচ্ছা, বলিয়া মেমসাহেব প্রস্থান করিলেন। বাবুর্চ্চিখানায় ঢুকিয়া, ইতি কর্ত্তব্যাদি সম্পন্ন করিয়া, বাবুর্চ্চিকে ছুটি দিয়া, ড্রয়িংরুমে প্রত্যাগমন করত দেখিলেন, সাহেব ফোন করিতেছেন; শুনিলেন প্রতি তিন চারিটা শব্দের ব্যবধানে "স্যার"কথিত হইতেছে। আশার একটুখানি আলো যেন মেঘান্তরাল হইতে উঁকি দিল। উপসংহারে "ইওর এক্সেলেন্সি" শুনিবামাত্র তরুণ অরুণ-কিরণে অন্তর প্রভাসিত হইয়া উঠিল। মেমসাহেব সাহেবের কৌচেই স্থান গ্রহণ করিলেন।

গভর্ণরকে বললে?

বলিনি, একটা সময় (য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট) ক'রে নিলাম। কাল সকাল ৭টায়। চলো, খেয়ে নেওয়া যাক্। 'বুর্চ্চি—আব্দুল—

মেমসাহেব ত্রস্তে কহিলেন, তুমি ওয়াব করবে (মুখ হাত ধোবে) ত? এসো, ডিনার রেডি আছে।—মেমসাহেব বাবুর্চ্চিখানার দিকে পা চালাইলেন।

লাট সাহেব নামের কি মহামহিমা! মেঘমুক্ত আকাশে আবার নীলিমা সুপ্রকাশ। বেশ স্বাভাবিক সহজ এবং হাসি ও গল্পের ভিতর দিয়া ভোজনপর্ব্ব চলিতে লাগিল। এক সময়ে মেমসাহেব একটি সমস্যা উত্থাপিত করিয়া বলিলেন, তুমি ওঁদের কাছে না গিয়ে সোজা লাটসাহেবের কাছে যাচ্ছ, তাতে তোমাদের মন্ত্রীরা রাগ করবেন না? সুধাকর ঝটিতি উত্তর দিলেন, করলেন ত বড় ব'য়ে গেলো। তাঁদের বুদ্ধি বিবেচনার দৌড় যতো সে তো দেখাই গেল। আমাকে কি তাঁরা চেনেন না? না, কোনদিন আমার কাছে কাজ পাননি? বোর্ড সুপারসিড করবার আগে আমার সঙ্গে কথা কইতে—পরামর্শ করতে পারতেন না। উপায় বাৎলাতে আমি কি পারতুম না? আজ কলকাতা কর্পোরেশন, কাল হুগলী চুঁচুড়া, পরশু বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যালিটি সুপারসিড করতে করতে দম্ভে উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, কাণ্ডজ্ঞানটুকুও হারিয়ে ব'সে আছেন কি না! নইলে, বোর্ড বানচাল না ক'রেও ভাল করবার ঢের উপায় ছিল, একবার আমাকে ডাকলে সেটা আমি বুঝিয়ে দিতে পারতুম। লাট সাহেবকে সেই কথাই কাল বলবো। লোকটি ভাল, শুনেছি খুব কড়া অফিসার,—গণ্ডায় এণ্ডা মেশাবার লোক ন'ন। মন্ত্রীদের উপরওয়ালা ত! দেখি-না কি হয়!

আমি বলছি, এঁরা চটবেন না ত?

চটুক, আমি ভয় করিনে। মন্ত্রীর বাড়া গাল নেই, তেমন বুঝি, চাকরী ত ছাড়বোই, তার আর কি! ওদের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলে না ব'লে যা-তা হতে চলেছে, দেখছো না? ইংরেজকেও হার মানিয়ে দিচ্ছে, এত স্পর্দ্ধা।

সাহেব টেবিল-রুমালখানি বক্ষঃস্থল হইতে খুলিয়া তদ্বারা বারবার মুখাগ্রভাগ মুছিয়া ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন, বলিহারি এ দেশের লোক! বোবা গরু-মোষেরও অধম এরা। কলকাতা কর্পোরেশন বাতিল ক'রে বিরেনব্বই জন কাউন্সিলার অল্ডারম্যান, ডেপুটি মেয়র, মেয়রকে তাড়িয়ে একজন আই-সি-এস্‌কে বসিয়ে দিলে, একটা লোক প্রতিবাদ করল না, আশ্চর্য্য। অবারি, নেপোটিজম্, করাপসান্, কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে এইগুলো ছিল অভিযোগ। নিজেরা কি! পার্লামেণ্টের খবর রোজ কাগজে পড়েছো ত? জীপ স্ক্যাণ্ডাল, প্রি-

ফ্যাব হাউস স্ক্যাণ্ডাল, সিদ্ধ্রীর সার স্ক্যাণ্ডাল—কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের কেলেঙ্কারীতে কেলেঙ্কারীতে খুল পরিমাণ হয়ে গেলো, সে বুঝি কিছু নয়? আমাদের এখানকার এসেম্বলী-কাউন্সিলে যখন যে মাটিতে হাত পড়ছে, সেইখান থেকেই যে ফোঁস কেউটে ফোঁস সাপ বার হচ্ছে, সেগুলোও কিছুই নয় বুঝি? সুপারসিড করতে হ'লে সকলের আগে কংগ্রেস গভর্ণমেন্টগুলোকে সুপারসিড করা উচিত। ডিস্‌গাষ্টিং! চালুনী খোঁজে ছুঁচের ছেঁদা। শকিং।

মেম সাহেব তাঁহার পূর্ব্বেকার উক্তিটিই পুনরাবৃত্তি করিলেন, এঁরা বলবেন না ত যে, তুমি ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে গেছ—

সুধাকর সতেজে কহিলেন, বলুক। আমার যা করবার আগাগোড়া ছক আমি ঠিক করে ফেলেছি।

মেম সাহেব সভয়ে সাহেবের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। সাহেব কহিলেন, হিজ এক্‌সেলেন্সি আমার কথা শোনেন ভাল। না শোনেন চাকরী ছাড়বো।

ভোজন সমাধা হইয়াছিল, সাহেব দাঁতে খড়কে খুঁচাইতে খুঁচাইতে বাথরুমে প্রবেশ করিলেন; মেম সাহেব বিমর্ষ ম্লানমুখে শয়ন কক্ষে ঢুকিয়া নিদ্রিত পুত্র সত্রাজিতের শয্যা মশারী আদি পরীক্ষা করিয়া পুনরায় ড্রয়িং রুমের দিকেই চলিতেছিলেন, দেখিলেন সাহেব নিজের ঘরে ঢুকিয়া দ্বারের পর্দ্দা টানাটানি করিতেছেন, অতএব ফিরিতে হইল।

পাশাপাশি দুটি কক্ষ, মাঝের দরজা খোলা এবং নিদ্রা দেবী সে রাত্রে ঐ দুই ব্যক্তির ত্রিসীমানার মধ্যেও পাদক্ষেপ করিলেন না। শক্তিমান, ক্ষমতাশালী উচ্চমণ্ডলের অকৃতজ্ঞতা ও কৃতঘ্নতার পরিমাপ করিতে করিতে সুধাকর রোষে ক্ষোভে ও ঘৃণায় উদ্বেলিত হইতে লাগিলেন এবং গভর্ণরের মধ্যস্থতা ফলপ্রসূ হইয়া মুখের মতো হইলে—যদিই হয়—সাহেবের মনটি যেন এক দিগন্তবিস্তৃত খোলা মাঠে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। চেষ্টা করিয়াও সাহেব রথাশ্বের রাশ টানিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। সে বায়ুবেগ রোধ করিবার সাধ্য তাঁহার নাই। তা না থাক, একটি সুসংস্কৃত সমৃদ্ধিশালী ও সর্ব্বকলুষবিমুক্ত একটি আদর্শ ও অভিনব প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে জরাজীর্ণ বোর্ডের খোলস পরিহার করিয়া তাঁহার দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে দিব্যালোকে দিব্য বিভায় উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়া সাহেবের অন্তর্লোকে সুধা সঙ্গীতের প্রস্রবণ বহিয়া যাইতে লাগিল। সে সুখ স্রোতে সুপ্তি ভাসাইয়া দিয়াও সাহেব অসুখী হইলেন না। ঘড়িতে ৫টায় য়্যালার্ম্ম বাজিবার ব্যবস্থা, সাহেব তাহারও অনেক পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া স্বহস্তে শয্যা-চা তৈরী করিলেন। চা পানান্তে বাথরুম, সেভ্, ড্রেস করিয়া ড্রয়িং রুমে বসিয়া প্রাভাতিক চায়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন তখন ঘড়ি তাহার কর্ত্তব্য নিষ্পন্ন করিল।

মেম সাহেব য়্যালার্ম-শব্দে উঠিয়া পড়িলেন। ঘুম তাঁহাকেও পরিত্যাগ করিয়াছিল। সত্রাজিতের গায়ে হাত দিয়া, কখনও ভাবাতিশয্যে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া চোখের জলে বালিশ ভিজাইয়া রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে। এরূপ একটা কঠিন ও অনিশ্চয়তাপূর্ণ সমস্যার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বুঝাপড়া করিবার আহ্বান আসিতে পারে জীবনে এ কথা কোনদিন কল্পনাতেও চিন্তা জাগিয়াছিল কি? সমস্যা কি ভীষণ। দিনের পর দিন, প্রতি দিবস, প্রতি সন্ধ্যা শুষ্ক মুখে বিরস নেত্রে ভিড় করিয়া তাঁহারই বারান্দায়, তাঁহার বাগানের পথ ভরাইয়া সারি দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আবার মলিন মুখে কাতর নয়নে ঐ ফটক পার হইয়া অলস উদাস মন্থর গমনে প্রস্থান করিত, চাকুরীপ্রার্থী দেশের অগণিত বালক কিশোর যুবকের সেই অপস্রয়মান শ্রেণীমধ্যে নিজের সন্তান সত্রাজিতকে দেখিয়া মেম সাহেব আর আপনাকে স্মরণ করিতে পারিলেন না। সবলে সত্রাজিতকে বক্ষোমধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন: হু হু করিয়া চোখের জল গড়াইয়া সত্রাজিতের সর্ব্বাঙ্গ ভাসাইতে লাগিল। বালক জাগিয়া, উঠিয়া, দুইহাতে মা'র মুখখানি তুলিয়া ধরিতেছে, জননী তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়িয়া বুকের আঁচলে মুখ ঢাকিয়া ছুটিয়া পালাইলেন। সত্রাজিৎ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। মা'র চোখে জল বালক আর ত কখনও দেখে নাই! ছেলে মানুষ, চিন্তাশক্তি কতটুকুই বা! তবু তাহার চোখেও জল আসিতেছে, এমন সময়ে মা অন্ধকারে ঘরে ঢুকিয়া ডাকিলেন, জিৎ, ড্যাডি চা খাচ্ছেন, তোমাকে ডাকছেন।

ড্যাডি ডাকিয়াছেন, বালক নিঃশব্দে আসিয়া জননীর হাত ধরিল।

সিংহল ও ভারত

ডক্টর কালিদাস নাগ

ত্রিশ বছর আগে সিংহলের বন্দর কলোম্বো ছেড়ে বোম্বাই এসেছিলাম P & V কোম্পানীর 'China' জাহাজ ধ'রে ; সেই জাহাজেই আমার প্রথম ইউরোপ যাত্রা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতেই বাইরের জগৎ দেখবার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলাম ; ১৯২০—১৯৫২ সালের মধ্যে জগতের কত পরিবর্ত্তনই দেখা গেল।

১৯১১ সালের চীন বিপ্লব, ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লব বিশ্বের ইতিহাস-ধারায় কত বড় আলোড়ন তুলেছে তখন কেউই ভাল করে বোঝে নি, যদিও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ১৯১৪ সালে যুদ্ধ বাধবার আগেই সাবধান করে ছিলেন- "এবার বুঝি এল সর্ব্বনেশে গো"। "বলাকার" কবিতায় শুনেছি তাঁর দীপ্তবাণী "দূর হতে কি শুনিস্ মৃত্যুর গর্জ্জন" ; সেই বলাকার ফরাসী অনুবাদ কবিবন্ধু Pierre Jean Jouve-এর সাহচর্য্যে শেষ করে ও রম্যা রলাঁর সঙ্গে ফরাসী 'Mahatma Gandhi" প্রকাশ করে দেশে ফিরলাম ১৯২৩—অর্থাৎ পাঁচ বছর "ভবঘুরে" জীবন কাটান গেল। ত্রিশ বছর পরে দেখি—সেই বোম্বাই থেকেই আবার ভাসছি ইউরোপ—আমেরিকায়। অসমাপ্ত দ্বিতীয় যুদ্ধ তলে তলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধেই হয়ত আমাদের নামাতে যাচ্ছে !—তবু যেটুকু নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ মিলল, জগৎটা দেখে নেওয়া যাক্—হয়ত এবারকার মত শেষবার ইতিহাসের পাতা উল্‌টান !

এবার নাকি আমরা অনেকেই স্বাধীন হয়েছি এবং স্বাধীন ভাবেই—ধ্বংসের পথে চলেছি। ভারত স্বাধীন, ব্রহ্মদেশ, সিংহল সবাই স্বাধীন—দুপাশে দু' টুকরো পাকিস্তানও স্বাধীন ভাবেই চল্‌ছে। শুধু ভাল করে বোঝা যায় না চালাচ্ছে কে ? আমরা নিজেরা—না আর কেউ। ব্রহ্মদেশে ভারতবাসীদের কথা আগে বঙ্গশ্রীতে লিখেছি, এবার সিংহলে তাদের অবস্থা আলোচনা করা যাক। ১৯৪৬ সালের গণনা অনুসারে দেখি ৭৩২, ২৫৮ অর্থাৎ প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ ভারতবাসী রয়েছে সিংহল দ্বীপে, তার অধিকাংশই দক্ষিণ ভারতীয় তামিল-ভাষী নর-নারী ; তারা উত্তর সিংহলে, বিশেষ Jaffira অঞ্চলে Jaffira Tamil ব'লেই প্রসিদ্ধ ; সুতরাং বৌদ্ধ সিংহলীদের সঙ্গে নামে কামে ও ধর্ম্মে পৃথক হয়ে সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মও ভারত থেকে গিয়েছে—খৃঃ পূর্ব্ব তৃতীয় শতকে দেখি 'দেবানাম প্রিয়' ধর্ম্মাশোক তাঁর বন্ধু দেবানাম প্রিয় তিষ্যরাজের নিমন্ত্রণে রাজকুমারী সংঘমিত্রা ও তাঁর ভ্রাতা মহেন্দ্রকে সিংহলে পাঠিয়েছিলেন। সেই মহেন্দ্র নামাঙ্কিত কলেজেই Principal নিযুক্ত করে সিংহলী বন্ধুরা আমায় Galle সহরে নিয়ে যান। উত্তর ভারতের মানুষ আমি —বিশেষ বিজয় সিংহের বংশধর 'বাঙ্গালী" বলে শুধু ভদ্রতা নয়—আত্মীয়জনোচিত সমাদর পেয়েছি, সেকথা সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করি। মহেন্দ্র কলেজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন অমরসূর্য্য(Amarasuriya)পরিবার—তাঁরা আমাকে তাঁদের পরিবারের একজন বলেই সমাদর করেছেন এবং তাঁদের জ্যেষ্ঠ সন্তান আজ Hon. Henry Amarasuriya মন্ত্রীত্ব লাভ করে রাজ্য শাসন করছেন বহুকাল দেখে গর্ব্ব অনুভব করি। আমার সঙ্গে পরলোকগতা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী ও ১৯১৯ সালে কলোম্বোর এক বৌদ্ধ নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপ্যাল হয়ে যান ও গাউন ছাড়িয়ে অনেক মেয়েকে শাড়ী পরাতে শেখান। ১৯২০ সালে Colombo সহরে বিরাট আয়োজন শুরু হল—Celon National congress-এর অধিবেশন হবে ; আমরাও সাদরে নিমন্ত্রিত হয়েছি। উদ্বোধন সঙ্গীত কি গাওয়া হবে ? অনেক তর্ক চলছে দেখে আমি জানালাম যে বিশ্বকবির জাতীয় সঙ্গীত "জনগণ"; পত্রে তাঁর অনুমতি নিয়ে—"দ্রাবিড় উৎকল-বঙ্গ" স্থানে 'দ্রাবিড়-সিংহল-বঙ্গ' বলে আমি ঐগানটি মহেন্দ্র কলেজের ছাত্রদের শিখিয়েছি এবং সেই গানের পদ সিংহলী অক্ষরে ছেপেছি Mahindra College

magagine-এ। তখুনি Galle থেকে পত্রিকা আনিয়ে 'জনগণ' গানটি কলোম্বো কোরাসে শেখালাম ও সিংহল জাতীয় কংগ্রেসে গাওয়া হল ; মহাত্মা গান্ধী তখন ভারতে নেতৃত্ব নিয়েছেন—জালিয়নওয়ালা হত্যার পর অভিনব জাগরণের যুগ শুরু হয়েছে, সিংহলী নেতারা—যথা Sir Pannambalam Arunachalam ও তস্য ভ্রাতা Ramanatham (জাফ্‌নী তামীল) ও Sir D. B Jayatilaka ও Dr. Hewawitaran প্রভৃতি ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগ রেখে চলতেন ও আমাকে সর্ব্বদা পরামর্শাদির জন্য আমন্ত্রণ করতেন—'ভারতীয় বিদ্বেষ' কি তা আমরা জানতাম না। তবে কলোম্বোর প্রধান বৌদ্ধ কলেজ—Ananda College-এর এক অভিনয়ে প্রথম দেখলাম প্রাচীন সিংহলী বৌদ্ধ রাজা Duttagamunu বীরদর্পে হত্যা করলেন তামিলরাজ Elara-কে। দক্ষিণ-ভারত থেকে তামিলরা সিংহল আক্রমণ ও আংশিক জয় করেছিল, তার প্রতিশোধ নিলেন সিংহলরাজ দুষ্টগামিনি—সেই নাটকে শতাব্দী-ব্যাপী সংঘর্ষের আভাষ পেলাম।

মালয়দেশে যেমন রবার ও টিন (Tin), সিংহলে তেমনি চা ও রবারের আবাদ থেকে কোটী কোটী টাকা লাভ হয় অথচ মজুর খাটবার লোক সেখানে মেলেনা, তাই পরাধীন ভারত রপ্তানী করেছে লক্ষ লক্ষ "কুলী" এবং তারাই বংশ বৃদ্ধি করে আজ এক উৎকট সমস্যা বাধিয়েছে। মালয়ে সাত লক্ষ ও সিংহলে প্রায় আট লক্ষ ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকার কি? বহুকাল ধরে তর্কবিতর্ক চলেও মীমাংসা হল না। বিগত Election থেকে সিংহলে তারা ভোট থেকে বঞ্চিত হয়েছে—স্বাধীন ভারতের সবাই অবাক হয়ে দেখল কিন্তু একরাষ্ট্র সমবায়ে (Commonwealth) থেকেও কিছু করা সম্ভব হল না। ১৯২০ সালে যখন সিংহল ছাড়ি তখনও দেখেছি, ভারত অন্তত দক্ষিণ ভারত "কুলীর দেশ" বলেই সিংহলীরা যেন অবজ্ঞা করে। Coolie lineএ তারা যে জঘন্য জীবন যাপন করে, তার কারণ কি সেটা না ভেবে সিংহলীদের চেয়ে তারা কত নোংরা কৃপণ অশিক্ষিত—এই সব কঠোর আলোচনাই চলত। ১৯২৭ সালে ভারতীয় কুলীদের ন্যায্য বেতনাদি নিয়ে একটা চুক্তি হয়েছিল, কিন্তু ১৯৩২-৩৩ এর ব্যবসা মন্দা (depression) হওয়ায় মাইনে কমান হয়। সুতরাং কুলী আমদানী বন্ধ হয়েছিল ; ১৯৩৭ সালে ব্যবসায় উন্নতি ও সেই সঙ্গে বহু ভারতীয় কুলী আমদানী হয়, কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ কমিশনে আলোচনার ফলে কুলী আমদানী নিয়ন্ত্রিত হয়।

স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে দু'টি আইন পাশ করে চেষ্টা করা হয় সিংহলবাসী ভারতীয়দের কিছু রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক অধিকার কায়েম করতে। কিন্তু নানা কারণে জটিলতা বেড়েই চলে এবং যারা নাগরিক অধিকার পাবে না, তাদের ওদেশে থাকা ও জীবিকা অর্জ্জন করা কঠিন হয়ে ওঠে। বাহির থেকে সিংহলে প্রবেশ করা ও সিংহলের বাইরে চলে আসাও কঠিন হয়েছে—অনেক নূতন আইন ও উপ-আইন পাশের ফলে ; আবাদের শ্রমিকরা পরিবার পিছু তিন মাসে ৬০৲ টাকা ও অন্য ভারতীয়গণ মাত্র ২৫৲ টাকা মাসে ভারতে পাঠাতে পারবে—তার বেশী নয়। Exchange control আইনে ভারতীয়দের শ্রমলব্ধ অর্থও ভারতে পাঠান প্রায় বন্ধ হয়েছে। ভোটের অধিকারাদি নিয়ে ১৯৪৯ সালের Electoral Amendment Actএর উৎপাত কমাবার জন্য মকদ্দমা করে কোন কোন ভারতবাসী জিতেছিল, তাই বোধ হয় আশঙ্কিত হয়ে ১৯৫২ সালের Election থেকে আইনের প্যাঁচ কষে তাদের বঞ্চিত করা হল! স্বাধীন সিংহল রাষ্ট্র চাকুরী ও ব্যবসাবাদিতে "Ceylonisation" বা স্বদেশীকতা নীতিই কঠোরভাবে পালন করতে সুরু করেছেন, এক্ষেত্রে আমাদের গভর্ণমেণ্ট কি করেন দেখা যাক। শুধু বাক্য বিনিময়ে যে ফল হয় না সেটা আমরা দেখেছি, বস্তু-বিনিময়ের ক্ষেত্রে ভারত কাঁচামালের বিরাট আড়ৎ হয়েও—bargaining hand অর্থাৎ ব্যবসাদারী হাতখানা খেলাতে পারছেনা কেন? দক্ষিণ আফ্রিকার ও পূর্ব্ব আফ্রিকার উন্নতির প্রধান কারণ হয়েও আজ ভারতবাসী শুধু কোনঠাসা নয়, প্রায় বিতাড়িত! নিজে সরে না এলে Malan এর বংশধরেরা যে 'মেরে তাড়াবে' তার আভাষ তারা করেই দিয়েছে। তেমনি ব্রহ্মদেশেও ভারতীয়দের বহু ধন সম্পত্তি "বিশ বাঁও" জলে পড়েছে—পাকিস্থানে সম্পত্তির ত কথাই নাই। শতাব্দী

সঞ্চিত এই বিরাট সম্পত্তি ভারতীয়রা শুধু হারাবে? কোনও প্রতিকার তার নেই? এটা ভাবতেও যেন মন শিউরে ওঠে; কিন্তু উপায় কি? প্রতিশোধের কথা না তুলেও ভাবা যেতে পারে—সম্পত্তি মাত্রই কি অন্যায্য অপরাধ?

রাষ্ট্র ও জাতির ইতিহাসে ভাঙ্গা ও গড়া চলে যেন এক অলঙ্ঘ্য নিয়মে। ভারতের আধুনিক ইতিহাসে গড়ার পর্ব্বটা তেমন স্পষ্ট নয় যেমন তার ভাঙ্গার নিষ্ঠুর কাহিনী। ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভারতের বামে দক্ষিণে হল অঙ্গচ্ছেদ; পাঞ্জাব ও বাংলার উপর রক্ত স্রোত বইল—চরম মূল্য দিতে হল এই দুই প্রদেশকে—এই দু'টি জাতির লক্ষ লক্ষ পরিবার উদ্বাস্তুরূপে পথের ভিখারী হয়ে কত জটিল সমস্যার সৃষ্টি করছে। ভারতের বাকী প্রদেশবাসীদের প্রাণে সহানুভূতি দূরের কথা—সাড়াও যেন জাগেনি। স্বাধীনতা এসে গেছে—আর ভাবনা কি? কিন্তু স্বাধীনতা রাখা যাবে কি? সেইত আসল ভাবনা। একাত্ম বোধ না জন্মালে রাষ্ট্রিক ঐক্য দাঁড়াবে কার উপর? ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান বহুকাল রুখে দাঁড়াবে সেটা জানা কথা, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংযোগ থাকা সত্ত্বেও সিংহল ও ব্রহ্মদেশ কেন ভারতের অনুকূল না হয়ে প্রতিকূলতা করছে, সেটা আমাদের ভেবে দেখতেই হবে। দলে দলে ছাত্র ও ছাত্রী ব্যবসায়ী সাংবাদিকদের পাঠাতে হবে নিকট প্রতিবেশীদের দেশে; শিক্ষায় ও ব্যবসায় নূতন পদ্ধতি আনতে হবে, শুধু রাষ্ট্রিক সংযোগ ও Pact চুক্তিতেই চুকবেনা আমাদের সমস্যা। সিংহলী নেতা অনাগরিক ধর্ম্মপাল ভারতেই তাঁর আগার করে "মহাবোধি-সঙ্ঘ" কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা করে বাঙ্গালী বন্ধুদের সাহায্যে ক্রমশঃ নিখিল ভারতীয় সমিতিতে পরিণত করেন; বহু সিংহলী ভিক্ষু ও ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পেয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন—বিশ্বভারতীর কল্যাণে শিল্পাদি ক্ষেত্রে নবচেতনা লাভ করেছে। ভারতের মধ্যে বাঙ্গালীদেরই তাই প্রথম চেষ্টা করতে হবে সিংহলে বিরুদ্ধভাব দূর করে "মৈত্রী ভাবনা" পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। বৌদ্ধ শিল্প ও শাস্ত্রাদির গভীরভাবে চর্চ্চা বাঙালীই করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে—এই আশা মনে রাখি বলে অদ্য এই সঙ্কটের দিনে ভগবান বুদ্ধের নীতিই বাঙালীকে অনুসরণ করতে বলি—তিনি বলে গেছেন বৈরিতা দিয়ে নয় অবৈর বা প্রেমের বলেই বৈরিতাকে জয় করা যায়। ধর্ম্মপদের বুদ্ধ-বাণী আমাদের জাতীয় সঙ্কটের দিনে প্রেরণা আনুক—এই প্রার্থনা করি।

কাহিনী

শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী

বহুদিন এই আশা গুঞ্জরি' ফিরেছে মনে মনে
একবার দেখা পাবো কোনদিন কোন শুভক্ষণে।
যা কিছু না-বলা কথা জমে আছে মনের অতলে—
চুপি চুপি সব বলে তারপর দূরে যাবো চলে।

সে-ক্ষণ এলো না কাছে, সে-কথা হলো না বলা আর,
মর্ম্মের শ্মশানভূমে সে মানসী প্রতিমা আমার
পুড়ে পুড়ে ভস্ম হলো। সে-ভস্ম ভূষণ করে আজ
নিয়েছি সর্ব্বাঙ্গে আমি আত্মভোলা বৈরাগীর সাজ।

আমরা দু'জনে মিলে করেছিনু কী মহাশপথ,
দেখেছিনু কল্পনায় কী উজ্জ্বল দূর ভবিষ্যৎ,
সে-কাহিনী রয়ে গেল মনের আকাশে অগোচরে
অস্পষ্ট ভাষায় লেখা কম্পমান তারার অক্ষরে।

সে-পথে পড়েছে কাঁটা—ফিরে যাবো কেউ কারো নীড়ে,
আজকে হারিয়ে গেছি দু'জনেই জনতার ভিড়ে।

বানর নাচের খেল

শ্রীঅখিল নিয়োগী

টিফিনের ঘণ্টায় আশা বিদ্যুৎকে একান্তে স্কুল কম্পাউণ্ডের একটি গাছতলায় ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, কাল যে তোকে দেখতে এসেছিল—হবু বর কি জিজ্ঞেস করলো ?

বাঁ চোখটা নাচিয়ে চোখে মুখে ক্ষণপ্রভার চমক এনে বিদ্যুৎ উত্তর দিলো, সে এক ভারী মজার ব্যাপার।

আশা আরো কৌতুহল বোধ করল। ঘনিষ্ঠ হয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, আমার কাছে তুই লুকোবি ? বল না ভাই, বর তোকে কি বল্লে।

বেণী নাচিয়ে বিদ্যুৎ বললো, বর বর করবিনে বলছি। দেখতে এলেই বুঝি বর হয়ে যায় ? অমন কত আসবে কত যাবে।

তারপর ভ্রূ কুঁচকে আপন মনেই যেন বললো, বিদ্যুৎকে বউ পাওয়া কি অতই সোজা ? সেজন্যে সিঁড়ি ভাঙতে হবে না ?

অবশ্য বিদ্যুৎ এ গুমোর করতে পারে। বড়লোকের মেয়ে, গ্যারেজে সারে সারে গাড়ী, সুন্দরী বলে খ্যাতি আছে অভিজাত মহলে। ইস্কুলে অতি ছোটবেলা থেকে ওর ওপর ভার পড়ে সভাপতি রাজ্যপাল কিম্বা প্রধান অতিথি পুলিশ কমিশনারকে মাল্যভূষিত করবার। ওর গাড়ী যখন ইস্কুলের কম্পাউণ্ডে এসে ঢোকে মেয়ের দল কেউ কেউ অবাক হয়ে গাড়ীটার দিকে তাকিয়ে থাকে আবার আর এক দল তার চমকে দেওয়া রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু একটি ব্যাপারে বিদ্যুৎকে প্রশংসা করতে হবে। সে সবাইকার সঙ্গে হুল্লোড় করে মেশে আর গল্প জমায়। এ বিষয়ে তার কোনো গুমোর নেই।

এরই মধ্যে আশা আবার বিদ্যুতের মনের সই। যা কারো কাছে বলা চলে না—আশার কানে কানে এসে সেই কথা সে শুনিয়ে যায়। এ জন্য আশার গর্ব্ব আর গৌরব বড় কম নয়। ইস্কুল শুদ্ধ মেয়েরা ওকে হিংসে করে। বিদ্যুৎকে যে দেখতে আসবে একথা সে-ই আগের দিন আশাকে গোপনে জানিয়ে গিয়েছিল। সেই জন্যে আশা যেন সব কিছু জানবার আগ্রহে একেবারে ফেটে পড়ছে। তাই সে আবার শুধোলো, বল্ না ভাই, কি বল্লে হবু বর ?

বিদ্যুৎ মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো। কেননা সেও ত বলবার জন্য পা বাড়িয়ে রয়েছে।

এইবার আশার হাত ধরে সে বল্লে, বলুলো ভাই, এই গাছের শেকড়টার ওপর নিরিবিলি দুজনে বসি।

দুজনে পাশাপাশি বসল। ঝির ঝির করে হাওয়া বইছিল। দুই সখির চুল দুলছে সেই হাওয়ার দোলায়। আশা জিজ্ঞেস করল, আগে বল দেখতে কেমন ?

বিদ্যুৎ উত্তর দিল, ঠিক যেন মুখপোড়া বানর।

তারপর সে কী খিলখিলে হাসি।

যেন কতকগুলো কাচের বাসন খান খান হয়ে ভেঙে গেল।

বিদ্যুৎ মুখে আঁচল দিল, তবু তার হাসি থামে না। ওদিকে আশার পেট ফুলে জয়ঢাক। কতক্ষণে সব কথা জানতে পারবে।

বিদ্যুৎ বললে, বুঝতে পারলিনে? বিলাত ফেরৎ কি না, একেবারে মুখপোড়া বীর হনুমান। আমাকে জিজ্ঞেস করলে, পিয়ানোর সঙ্গে নাচতে পারবে?

—তুই কি জবাব দিলি? আশা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে।

—আমি? বিদ্যুতের চোখে মুখে হাসি উপচে পড়ে।

—আমি বললাম, আপনি সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ বলতে পারেন? তার জবাবে আমায় শোনাল, না আমি ইংরেজী কবিতা মুখস্থ বলতে পারি। আমিই বা ছেড়ে কথা কইব কেন? উত্তর দিলাম, আগে সংস্কৃতটা ভালো করে জেনে আসুন।

আশা শুধোল, তাহলে বর ফিরে গেল?

বিদ্যুৎ উত্তর দিলো, হ্যাঁ, একেবারে লেজ গুটিয়ে প্রস্থান।

আশা বললো, কিন্তু তোকে বিয়ে ত করতেই হবে বিদ্যুৎ—

বিদ্যুৎ এবার সইয়ের গায়ে গড়িয়ে পড়ল। বললো, আসল কথা কি জানিস? আমার নিত্য নতুন নমুনা দেখতে ইচ্ছে করে। বানর নাচ দেখতে কার না ভালো লাগে বল?

আশা নিজের গালে তর্জ্জনী রেখে চোখ দুটো বড় বড় করে উত্তর দিল, কী সর্ব্বনাশ। তুই এইভাবে ছেলেদেব বানর নাচ নাচিয়ে বেড়াবি নাকি?

বিদ্যুৎ বাঁকা চোখে তাকিয়ে বললো, মন্দ কি।

এইভাবে দিন যায় গড়িয়ে।

দুই সখির মধ্যে কি কানাকানি চলে কেউ জানেনা।

কিন্তু বিদ্যুতের মা ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

বিদ্যুৎ বাবার অত্যন্ত আদুরে মেয়ে। তাঁর মোটেই ইচ্ছে নয় যে মেয়ের এখন বিয়ে হয়।

শুধু গৃহিনীব তাগাদাতেই তিনি মেয়ে দেখাতে রাজি হয়েছেন।

হঠাৎ খবর এলো, এক ব্যবসায়ী পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে।

লাখে লাখে টাকা নিয়ে তার কারবার।

মাথার ওপরে কেউ নেই, ছেলেই সমস্ত সম্পত্তি দেখে। সব ঠিকঠাক। ছেলে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে একদিন মেয়ে দেখতে আসবে।

কিন্তু বাজার দরের ওঠা পড়ার মতো ব্যবসায়ী বরের কথা ঠিক থাকে না। শুভ পাঁজি দেখে দিন ক্ষণ ঠিক হয় কিন্তু মাল কেনা আর মাল ছাড়ার হাঙ্গামে সে শুভ মুহূর্ত্ত অতীত হয়ে যায়। তারপর ফোন আসে—সেদিন নয়, অন্য দিন ছেলে আসবে মেয়ে দেখতে

বিদ্যুৎদের বাড়ীতে ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ চলে। 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট' এখানে নড়চড় করা চলে না। তাই বিদ্যুৎ মাকে শুনিয়ে দেয়: যার কথার ঠিক নেই তার সঙ্গে আবার বিয়ে কী? বাবাকে বলো ফোনে বারণ করে দিতে।

কিন্তু মা আশা পোষণ করেন মনে মনে। ভাবী জামাই এত টাকার মালিক, তাকে কি হুট করে হাত ছাড়া করতে আছে?

অবশেষে বিদ্যুৎ এসে আশার কানে কানে একদিন বললো, কাল রবিবার ত? সকাল সকাল যাস আমাদের ওখানে।

আশা উৎসাহিত হয়ে ওঠে। শুধোয়: বনভোজন করতে যাবি?

—উহুঁ।

—হ্যাসার কোন পার্টি আছে বুঝি?

—উহুঁ।

—তবে বুঝি সিনেমা দেখতে যাবি ম্যাটিনী শোতে?

—না রে না।

—কি ব্যাপার বলনা খুলে।

—বানর নাচের নতুন খেল্?

হাসতে হাসতে জবাব দেয় বিদ্যুৎ।

আশা হাত তালি দিয়ে উঠে বলে, ও! তাই বল!

নিশ্চয়ই, তোর নতুন বাঁদর দেখতে যাবো। আর শুধু যাবো? যতক্ষণ তার পোড়ামুখ না দেখ্‌ছি—ততক্ষণ আমার চোখে ঘুম নেই।

বিদ্যুৎ তার বেণী টেনে দিয়ে উত্তর দেয়, সত্যিই ত! বানর নাচের খেল্‌ দেখা ভাগ্যের কথা। আর তা ছাড়া আগে থেকে বেশ কয়েকটি নমুনা দেখে রাখ্‌লে তোর নিজেরটি চিনে নিতে বিন্দুমাত্র ভুল হবে না।

আশা মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে বল্‌লো, মরণ আর কি!

পরদিন খুব সকাল-সকাল সে গিয়ে হাজির হ'ল। বিদ্যুতের মাকে বল্‌লো, মাসিমা, সইকে কিন্তু আমি মনোমত ক'রে সাজিয়ে দেবো।

বিদ্যুতের মা এক গাল হেসে উত্তর করলেন, সে ত সুখের কথা মা। তুমি ত' ওর মনের কথা জানো, বেশ মনোমত ক'রে সাজিয়ে দিও। যার দেখ্‌তে আসবে যেন চোখ ফেরাতে না পারে।

আশা কৌতুক ক'রে বল্‌লো, তা মাসিমা, বিনা সাজাতেই আমার সই সবাইকার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। আপনি কিছু ভাব্‌বেন না।

যথা সময়ে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে কয়েকখানি গাড়ী বোঝাই ক'রে ব্যবসায়ী বর এসে হাজির হ'ল।

বিদ্যুৎ তেতলার জান্‌লা থেকে সেই বাহিনীর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সইকে বল্‌লো, ব্যবসায়ী হ'লেই বুঝি বোকা বুদ্ধি হয়? যেন নেকামর্দ্দনের মেলায় গরু-ভেড়া যাচাই ক'রে কিন্‌তে এসেছে। আজ যদি আমি ওদের ঘোল না খাওয়াই ত' আমার নাম তুই পাল্‌টে রাখিস্‌।

যে হল ঘরে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ছেলে বসেছে—তার ত্রিসীমানায় বিদ্যুতের মা-বাবা কেউ থাকবেন না।

বিদ্যুতের ধনুকভাঙা পণ, মেয়ে দেখার সময় বাড়ীর কেউ সেখানে থাক্‌বে না।

ওকে সবাই ভয় ক'রে চলে। তাই সে যে আবদার করে—তাতেই হুঁ দিতে হয়।

ইতিমধ্যে বাড়ীর ঝি-চাকরের দল নানারকম খাবার আর ফলের প্লেটে টেবিলগুলো ভর্ত্তি ক'রে ফেলেছে।

আশা বিদ্যুৎকে দোর গোড়া পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল কান খাড়া ক'রে।

বস্‌তে বল্‌বার অপেক্ষা নেই বিদ্যুতের। গট্‌ গট্‌ ক'রে গিয়ে একটা চেয়ার দখল ক'রে বস্‌ল।

এরা যারা দল বেঁধে আজ এসেছে—শুধু হাজার হাজার টাকার লেনদেন করতেই অভ্যস্ত, দর কষাকষি করতেও অপটু নয়। কিন্তু এই জাতীয় একটি অতি-আধুনিকা তরুণী যদি বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে সাম্‌না সাম্‌নি এসে বুক্‌ং দেহি ভাব নিয়ে চেয়ার দখল ক'রে ব'সে পড়ে, তবে সেই পরিস্থিতিতে কি করা কর্ত্তব্য ব্যবসায়ী মহলে তার তালিম দেয়া হয় না।

দ্রুত ফ্যান চলা সত্ত্বেও বর সহ বন্ধুবর্গ কুল-কুল ক'রে ঘামতে লাগলো। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী একেবারে সপ্‌সপে হয়ে উঠ্‌ল। একখানি ক'রে রুমাল আর কত-দিক সাম্‌লাবে।

বিদ্যুৎ ওদের এই পরাজিতের মনোভাব সাগ্রহে লক্ষ্য করছিল···এইবার অতর্কিতে একটি বোমা ফেলার মতো প্রশ্ন করে বসল, আপনাদের কি সব জিজ্ঞেস্‌ করবার আছে আগে শেষ করে ফেলুন, তারপর ঠাণ্ডা সরবৎ-এ চুমুক দিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করুন।

ব্যবসায়ী মহলে অনেক কিছু 'ভাঁওতা' চলে, কিন্তু এই জাতীয় আক্রমণ ওদের অভিধানে লেখা নেই। স্বয়ং হবু বর ত' মেঝের দিকে চোখ রেখে ক্রমাগত রুমাল দিয়ে কপালের ও ঘাড়ের ঘাম নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে সচেষ্ট হয়ে উঠল।

হঠাৎ বরের এক বন্ধু মরিয়া হয়ে বললো, না—না, প্রশ্ন আর কি? আপনি আমাদের সামনে দিয়ে একটু হাঁটুন না—

প্রশ্ন শুনে তড়াক্‌-করে লাফিয়ে উঠল বিদ্যুৎ। বললো, কেন, আপনারা কি গরু-ঘোড়া—মেষ-ছাগল হাঁটিয়ে যাচাই করে দেখতে এসেছেন? তা হলে আমি বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি যে, এ হাঁটে আপনাদের বিকিকিনি চল্‌বে না।

—হেঁ-হেঁ সেই ভালো। তা হলে আমরা না হয় উঠি—! একান্ত লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে ব্যবসায়ী মহল।

ভেড়ার পালের মতো সবাই একসঙ্গে উঠে পড়ল। এত তাড়াতাড়ি ওরা জুতায় পা গলাতে গেল যে, একের পাদুকা অন্যের পদ-যুগলের শোভা বর্দ্ধন করেছে।

সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে—গল্ গল্ করে ঝরছে ঘাম! বরের মনে হতে লাগলো—ব্যবসা করতে বসে জীবনে এত বড় লোকসান সে দেয়নি!

হুড়মুড় করে সবাইকার নাটকীয় প্রস্থানের পর বিদ্যুতের সে কি প্রাণখোলা হাসি! ওর রকম সকম দেখে মনে হল—এইমাত্র একটি হাসির নাটক অভিনীত হয়ে গেল! কিন্তু তার নায়িকা যে সে নিজে বিদ্যুৎকে দেখে তা বোঝবার যো নেই!

আশা কিন্তু একেবারে নির্ব্বাক 'ষ্ট্যাচু' বনে গেছে! সে লজ্জায় আর বিস্ময়ে সইয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারছে না!

বিদ্যুৎ ওকে ঠেলে প্রশ্ন করলে, হ্যাঁরে আশা, বল না সত্যি করে বানর নাচ্ কেমন দেখ্লি?

আশা ভাবছিল—বিদ্যুতের মা যখন জিজ্ঞেস করবেন তখন সে কী বলবে তাঁকে?

তাই সইয়ের রসিকতায় চটে উঠে বল্লো, থাক্ তুই তোর বানর নাচের খেলা নিয়ে, আমি চল্লুম—

বিদ্যুৎ পেছন পেছন ডেকে বল্লো, সই, তুই মিছি মিছি চটছিস্ কেন? না হয় একটু মিষ্টি মুখ করে যা—

কিন্তু আশা সেদিন মর্ম্মান্তিক চটে গিয়ে সত্যি সত্যিই চলে এলো।

এরপর বিদ্যুতের যে সম্বন্ধ এলো—সে নবীন তরুণ হচ্ছে বিধান সভার নতুন সদস্য। সাফল্যের উল্লাসে তরুণ সর্ব্বদাই উৎফুল্ল, আজ অভিনন্দন-সভা, কাল পার্টি, পরশু প্রধান অতিথিরূপে সাদর আহ্বান।

এই অষ্ট-প্রহর নাম সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে একদিন কনে দেখবার দিন ধার্য্য হল।

বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে চিঠি এলো আশার কাছে—বানর নাচের নতুন খেল্—দেখবি আয়—বিলম্বে হতাশ হবি—আগেই জানিয়ে রাখছি।

আশা যত বিরক্ত হয় সইয়ের ওপর—তত তার ঝোঁক চেপে যায় কি করে একটা বিয়ের যোগাযোগ হতে পারে।

মাসিমা প্রায় হাল ছেড়ে দিলেও একমাত্র তারই মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

কাজেই যথা সময়ে গিয়ে সে হাজির হল বিদ্যুৎদের বাড়ীতে।

অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র ত্রুটি নেই। কিন্তু বাড়ীর কেউ সেদিকে উঁকি মেরে দেখেনা! তারাও সবাই এটাকে এক রকম খেলাই মনে করে নিয়েছে।

তরুণ হবু বর কনে দেখে ভারী খুশী। বল্লো এমনি চৌকস মেয়েই ত আমি চাই। চোখ ঝলসানো রূপ, চটপটে ইংরেজীতে অনর্গল কথা বল্তে পারবে, পার্টি, লাঞ্চ, ডিনারে হামেশা যেতে হবে। গভর্ণমেণ্ট হাউসে এনগেজমেণ্ট থাকবে একজিবিশন 'ওপন' করতে হবে, সব অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেয়াও ত চাই…

বিদ্যুৎ ঠোঁট উল্টে বল্লো, কিন্তু আপনি কি রকম বিধান সভায় বক্তৃতা দেন তাও ত আমাদের শোনা দরকার। কি বলিস রে সই?

আশা পাশেই বসে ছিল। বিদ্যুতের মন-রাখা গোছ তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে দিলো।

বিধান সভার তরুণ সদস্য পুলকিত হয়ে বল্লো, বেশ ত! এত আনন্দের কথা! দুটি 'ভিজিটর্স কার্ড' আমি কালকেই আমার পিয়ন দিয়ে পাঠিয়ে দেবো। আপনারা দুই সখিতে মিলে অবশ্য যাবেন। আপনাদের দেখলে—সত্যি বলছি—আমি প্রেরণা পাবো। তখন বক্তৃতা ভাজা খইয়ের মতো আমার মুখ থেকে অনর্গল বেরিয়ে আসতে থাকবে—বিদ্যুৎ আশার মুখের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে একটুখানি মুচকি হাসল।

যথাসময়ে দুই বান্ধবী গিয়ে উপস্থিত হ'ল বিধান সভায় গিজ গিজ করছে মানুষ। ভেতরে সরকারী পক্ষ আর বিরোধী দলের দারুণ বাকবিতণ্ডা। সেদিনকার বিষয় হচ্ছে "পশুপালন"। সেদিন বিরোধী পক্ষের বক্তৃতার তোড়ে বিধান সভায় দাঁড়ায় কার সাধ্যি! আর পশুরা যদি মানুষের কথা বুঝতে পারত ত তারা দল বেঁধে বনজঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে সাবাস আর বাহবা দিয়ে উঠত। জয় কামনা করত বাক্যিসর্ব্বস্ব মানুষের! পশুর দুঃখে যে মানুষ এত দরবিগলিত ধারায়

ধারাবাহিক ভাবে কাঁদতে পারে এ কথা কারো জানা ছিল না। সেই তরুণ বিধান সভার সদস্য ত পশুর দুঃখে ভিজিটার্স গ্যালারীর দিকে তাকিয়ে ক্রমাগত আর্ত্তনাদ করতে সুরু করে দিলেন। এ আর্ত্তনাদ পশুর দুঃখে না আর কোনো অকথিত কারণে তা কেউ বুঝতে পারল না।

বিদ্যুৎ বিরক্ত হয়ে বললো, কি রকম হামলাচ্ছে দেখনা! একেবারে মাথা ধরিয়ে দিলে।

দুজনে উঠে বাইরে বেরুবার জন্যে রওনা হল ছুটতে ছুটতে এসে তরুণ বক্তৃতাবাগীশ ওদের পথের মাঝখানে ধরে ফেললো। রোমাল দিয়ে চোখ মুছে জিজ্ঞেস করল, কেমন শুনলেন?

বিদ্যুৎ কটাক্ষ করে উত্তর দিল, আজ্ঞে পশুর দুঃখেই প্রাণ ত্যাগ করুন, অন্যদিকে মনোযোগ দেবার বৃথা চেষ্টা করবেন না।

তরুণ বক্তৃতাবাগীশের মুখ থেকে শুধু একটি বিস্ময়কর ধ্বনি বেরিয়ে এলো—অঁ্যা—।

ইতিমধ্যে আশা আর বিদ্যুৎ দু জনেই কলেজের ছাত্রী হয়ে একই সঙ্গে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে। বানর নাচের খেলে কিছুটা মন্দা দেখা গেলেও—ওদের সখিত্বে কিন্তু এতটুকুও ভাঁটা পড়ে নি।

বিদ্যুতের মা শুধু মাঝে মাঝে আশাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দুঃখু করেন, আমাদের অবর্ত্তমানে মেয়েটার যে কী দশা হবে সেই কথা ভেবে রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না। তখন কি ভায়েরা ওকে দেখবে?

আশা মাসিমাকে সান্ত্বনা দেয়, বিদ্যুতের জন্যে আপনি কিছু ভাবনা করবেন না মাসিমা! এক দিন না একদিন ওর সুমতি হবেই। তখন ও ছেলেখেলা ভুলে গিয়ে রাজরাণীর আদরে শ্বশুর-ঘর করবে।

বিদ্যুতের মা উত্তর দেন, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মা। মরবার আগে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি।

কিন্তু সবচাইতে মজার কথা এই যে বিদ্যুতের খেলা আর শেষ হয় না। নিত্যি নতুন রূপ নিয়ে সে আত্ম-প্রকাশ করে।

ইতিমধ্যে কলকাতার শহর মেতে উঠল এক "সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতায়।" যে সেরা সুন্দরী বলে স্বীকৃতা হবে তাকে রাজ্যপাল ভবনে এক বিরাট অভিনন্দন দেওয়া হবে এবং তারপর বেরুবে এক বিশাল মিছিল।

এই প্রতিযোগীতায় "মিস্ কলকাতা" আখ্যা পেল কুমারী বিদ্যুৎ। তাকে নিয়ে এমন এক মিছিল বের হল যে, ভীড়ের চাপে খুব কম পক্ষে একশত 'ব্যাচিলার' মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল।

কাগজের পুরোনো রিপোর্টাররা এই মন্তব্য প্রকাশ করলেন যে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শোকযাত্রাকেও এই মিছিল ম্লান করে দিয়েছে।

দৈনিক, সাপ্তাহিক আর মাসিকে ছাপা হল নানা রঙের ছবি। সেই আলেখ্য দেখে ছুটে এলেন গিরিডির বিখ্যাত গোলাপ বাগানের মালিক লোহিত সুন্দর।

কনে দেখে তিনি এই মন্তব্য প্রকাশ করলেন যে, এতদিন তাঁর হাজার-হাজার একর জমিতে লাল গোলাপ ফুটেছে আর অনাদরে ঝরে পড়েছে। এইবার সেই গোলাপ গুচ্ছ সার্থকতা লাভ করবে বিদ্যুতের দুটি-আলতা রঙের চরণতলে।

বিদ্যুৎ কিন্তু এতখানি কবিত্বেও কিছুমাত্র বারি বরিষণ করল না! শুধু ভ্রূভঙ্গে বললো, আপনি ত' শুনি লাল-গোলাপের চাষ করেন, কিন্তু আপনার গায়ে গোবরের এত গন্ধ কেন? সার জোগাবার মহান দায়িত্ব কি আপনিই গ্রহণ করেছেন?

লোহিত সুন্দর যেমন হাসিখুশী মুখে এসেছিলেন তেমনি মুখখানি কালো করে নিঃশব্দে প্রস্থান করলেন।

বিদ্যুতের মা কপালে করাঘাত করে অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, আমার অদৃষ্ট!

এরপর যিনি বিদ্যুৎকে দেখতে এলেন তিনি কোনো মফঃস্বল কলেজের এক নিরীহ অধ্যাপক। একটা বিষয় লক্ষ্য করবার যে, বিলাত ফেরৎ, নাম করা ব্যবসায়ী, অর্থবান ব্যক্তিদের সংখ্যা ক্রমশই কমে যাচ্ছিল এবং তারই যায়গায় স্থান করে নিয়েছিলেন—নিরীহ গোবেচারী অধ্যাপক।

এদিনও আশা ছিল তার সখির পাশে। অধ্যাপক খুব কম কথাই মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন এবং বিদায় নেবার সময় কোনো রকম মন্তব্য করতে বিরত থাকলেন। বিদ্যুৎ তাঁর এই স্বল্প ভাষণকে কেন্দ্র করে রসিকতা করবার প্রয়াস পেলো—কিন্তু সে রসিকতা জম্‌ল না। হাওয়ায় রাখা মুড়ির মতো কেমন যেন মিয়িয়ে গেল।

দুদিন পরে বিদ্যুতের বাবা এক চিঠি পেলেন অধ্যাপকের কাছ থেকে। তাতে খুব সংক্ষেপে লেখা আছে—আপনার মেয়ের পাশে সর্ব্বক্ষণ যে স্বল্পবাক্‌ মেয়েটি ছিল—তার অভিভাবকের আপত্তি না থাক্‌লে আমি তাকে বধূরূপে বরণ করতে পারি।

সেই চিঠি নিয়ে নাচতে নাচতে বিদ্যুৎ প্রথমে সখি আশার কাছে গেল। তারপর চিঠিখানি আশার মাকে দেখাল।

মেয়ে পক্ষ যেন আকাশের চাঁদ হাতে খুঁজে পেলো। এ সম্বন্ধ তাদের কাছে আশার অতিরিক্ত। আদুরে মেয়ে বিদ্যুৎ তার বাবাকে বলে ঠিক করলো, বিয়ে তাদের বাড়ী হবে। সখির বিয়ে কিনা।

দু' দিনের কথায় বিয়ে হয়ে গেল। সারা রাত ধরে বিদ্যুৎ সখির বরের সঙ্গে রসিকতা করবার আন্তরিক চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলো।

শেষ রাত্তিরে ছাদে দাঁড়িয়ে ম্লান চন্দ্রালোকে তার চোখে কি এক ফোঁটা জল চিক্‌ চিক্‌ করে উঠল?

সে নিজে কিন্তু স্বীকার করে না। বাঁদর নাচের খেলায় কি তার হার হয়েছে।

না-না, খেলা তার চলবে।

বিয়ের পর আশার অধ্যাপক স্বামী তাকে নিয়ে মফঃস্বলের এক কলেজে বদ্‌লি হয়ে চলে গেলেন।

এরপর ঘটনা খুব দ্রুত-গতিতে এগিয়ে চললো।

পর পর বিদ্যুতের মা আর বাবা হৃদরোগে মারা গেলেন।

কিন্তু বিদ্যুতের খেলায় তখনো যবনিকাপাত হয়নি। দার্জ্জিলিংএর কোন এক কনভেণ্টে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়ে জীবনে এই প্রথম বিদ্যুৎ কল্‌কাতা ছেড়ে চলে গেল। ইতিমধ্যে তার দুটি ভাই-ই বিয়ে করেছে। বৌদের সঙ্গে তার আদপেই বন্‌ছিল না।

মা-বাবা নেই যে, তার সব কিছু আবদারে সম্মতি দিয়ে চল্‌বেন।

আশা অনেক চিঠি লিখেও বিদ্যুতের ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারেনি। তার সইয়ের খেলা শেষ হয়েছে কি না জান্‌বার জন্যে তার ভারী কৌতূহল জাগে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সে কোনো হদিশ পায়নি।

তার অধ্যাপক-স্বামী ঠাট্টা করে বলেন, সংবাদপত্রে একটি নিরুদ্দেশের খবর ছাপিয়ে দাও না।

—"আমার সখি হারিয়ে গেছে…যে তার মন খুঁজে পেতে এনে দিতে পারবে—তাকে—আমিও হৃদয় সমর্পণ করিব।"

আশা মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, তোমার রসিকতা আমার ভালো লাগে না।

লিণ্ডন কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীস্ লিঃ
পি ১৫।১ চৌরঙ্গী স্কোয়ার,
কলিকাতা-১

অধ্যাপক উত্তর করেন, রোগ তাহলে খুব জটিল।

দীর্ঘ পাঁচ বছর পর হঠাৎ আশা একখানি চিঠি পেল। হস্তাক্ষরটি তার অত্যন্ত পরিচিত। দুরু দুরু বুকে আর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সে খামখানি খুলে তার দুটি চোখ মেলে ধরল। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পত্র। তাতে লেখা আছে—

আশা,

বানর নাচের খেলের শেষ দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে—২৫শে আষাঢ় সন্ধ্যায়। প্রধান সাক্ষীরূপে তোকে উপস্থিত থাকতে হবে। ঠিকানা ওপরে রইল।

তোর বিদ্যুৎ।

চিঠি নিয়ে ছুটতে ছুটতে আশা স্বামীর কাছে উপস্থিত হল। বল্‌লো, এক্ষুণি আমাদের রওনা হতে হবে। আর এক মিনিটও দেরী নয়।

চিঠি পড়ে আর সব কিছু অনুমান করে অধ্যাপক বল্লেন, যাক্‌, অবশেষে তোমার সখির মনের-মানুষ পাওয়া গেছে! কিন্তু আমি যেতে পারবোনা। কাঁধের ওপর এক বোঝা পরীক্ষার খাতা!

আশা রাগ করে বল্‌লো, কিন্তু তাই বলে আমি আমার সইয়ের বিয়েতে যাবোনা? পরীক্ষার খাতাই তোমার বড় হল?

অধ্যাপক উত্তর করলেন, অ-হা-হা! সে কথা কি আমি বলেছি? তুমি তোমার দেওরকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গা বলে রওনা হয়ে পড়ো। ভগবান তোমার সখির সুমতি দিন।

আশা হিসেব করে দেখ্‌লো, সেদিন রাত্তিরে রওনা হলেও বিয়ের সময় গিয়ে দার্জ্জিলিং পৌঁছুতে পারছেনা। পৌঁছুতে হবে পরদিন সকাল বেলা!

আপন মনেই বল্‌লো, তা হোক। তবু ত' বাসি বিয়ে রইল। আজ ওর মা নেই, বাপ নেই, ভায়েরা থেকেও নেই। আমিও যদি পাশে না থাকি তবে কোন ভরসায় ও ঘর বাঁধবে। আনন্দে আর ব্যথায় আশার চোখে জল এলো।

সেদিন সকাল বেলা দার্জ্জিলিং পৌঁছে আশা আর তার দেবর ঠিকানা খুঁজে খুঁজে এক বাংলোর সামনে এসে উপস্থিত হল।

চুপ চাপ নিঝুম বাড়ী।

বিয়ের হৈ-হল্লোর-চীৎকার, লোকজনের আনাগোনা; বাজি-বাজনা কিছু নেই।

দরজাটা হা-হা করছে খোলা।

আশা ছুটে ভেতরে চলে গেল।

খোলা চুলে, রাঙা চোখে, অগোছাল বেশভূষায় উদাস ভাবে বিদ্যুৎ তখনো বাসর শয্যায় একা বসে।

সামনে পড়ে আছে একটি খোলা চিঠি।

আশা তাড়াতাড়ি চিঠিখানি হাতে তুলে নিলো। ওতে লেখা রয়েছে—

বিদ্যুৎ,

অমরগঞ্জের কুমার বলে মিথ্যে তোমার কাছে পরিচয় দিয়েছিলাম। এটা আমার খেলা। আসলে লক্ষ্য ছিল তোমার দামী গয়নাগুলির দিকে। বাসর শয্যায় নিশ্চিন্তে তুমি ঘুমিয়ে ছিলে। তাই আমার খেলা খেলতে কোন অসুবিধে হয় নি। তোমায় ধন্যবাদ।

চল্‌লাম। তুমি আবার নতুন করে ছাঁদনাতলার খেলা খেল্‌তে পারো। অনুমতি দিয়ে গেলাম। After all I am a sportsman. বানর-নাচের খেলের একটা জবাব হয়ত পুরুষদের পক্ষ থেকে মিল্‌লো। Sweet dreams.

তোমার

অতনু।

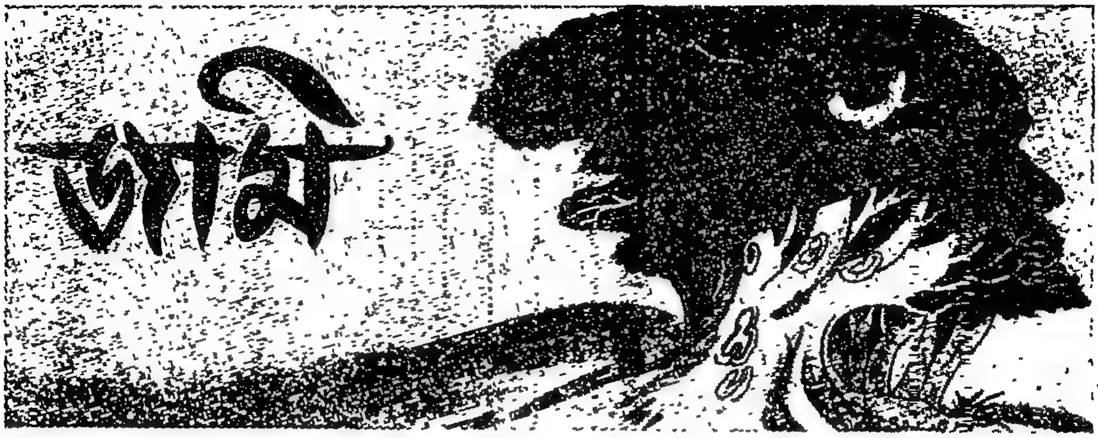

সন্তোষ কুমার দে

নীচে যদ্দূর তাকাই সবুজে-নীলে-সোনালিতে একাকার। মাঝে মাঝে টিনের চালা চক্ চক্ করে ওঠে, খড়ের ঘরগুলি ফিকে বাদামী রং-এর টিপ মনে হয়। তারপর একটানা গাছপালা, বাঁশঝাড়-বেতঝোপ সব একাকার।

আরো নীচুতে নামলাম। ষ্টীমার ঘাট হতে খুলনা সহরের নিশানা বুঝে ভৈরবের সূত্র ধরে আমার গ্রামের উপর উড়ে এসেছি। গ্রাম চিনেছি ম্যাপ দিয়ে, কিন্তু আমাদের বাড়ীটা চিনব কি দিয়ে? রান্নাঘরের কাছে ছিল আস্তাকুড়, তার অদূরের দীর্ঘ নারকেল গাছটিতে চড়লে গ্রাম ছাড়িয়ে ভিন্ন গ্রামের বাড়ী ঘর, এই ভৈরব নদ নজরে পড়ত। কিন্তু আকাশ থেকে তাকিয়ে অত উঁচু গাছটাও চিনতে পারলাম না। ঝাপসা ছায়াছবি যেমন কাঁপতে কাঁপতে সরে যায় চোখের সুমুখ দিয়ে, তেমনি ভাবে নীচের বাড়ীঘর, গাছপালা সরে গেল। আমার সঙ্গী সেন বল্লে—কি দেখছেন এতো?

উত্তর দিতে পারলাম না। সে জানে আমি এ নিয়ে হা-হুতাশ করি নে, করে লাভ কি বলুন? সাতপুরুষের বাস্তুভিটার জন্য মিথ্যা মায়া কেন? মায়া বৈ কি? পায়ের নীচে পরিদৃশ্যমান গোটা দেশটাই যেমন একাকার মনে হচ্ছে, আসলেও কি তাই নয়? বিশেষ করে আমার জন্মভূমি, আমার সাতপুরুষের বাস্তুভিটা বলে চিহ্নিত একখণ্ড জমির উপর আমার অন্যায় দাবী কেন, কেন এই আকর্ষণ?

মাটির স্পর্শ ছাড়িয়ে পাখা মেলে যখন উপরে উড়ে আসি, নীচে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করি পৃথিবী গোলকটিকে। বৃহৎ গ্রহ, তার কতটুকুই বা নজরে পড়ে। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হতে বিশেষ করে এক টুকরো জমি কি আমি উপরে তুলে নিয়ে আসতে পারি একান্ত আমার বলে, আমার সাতপুরুষের বাস্তুভিটা ছিল বলেই?

শুধু যে ভিন্ন দেশ, ভিন্ন রাষ্ট্র ভিন্ন কৃষ্টি-সভ্যতা ও শাসনতন্ত্রের কব্জায় ও জমিটুকু বন্দ হয়েছে তাতো ঠিক নয়, ও জমি আমি কক্ষনো সাথে নিয়ে আসতে পারতাম না যদি এই বৈমানিক জীবন যাপন করতে চাইতাম। মাটি যেখানে ছিল সেখানেই থাকত, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। তবুও এ দুঃখ বোধ কেন?

পৃথিবীকে ভালোবাসি বলে কি? হয়ত তাই, হয়ত সেই জন্যই বিশাল পৃথিবীর পৃষ্ঠে গোষ্পদভূমি টুকুতে হলেও নিজের কায়েমি স্বত্ব পাকা করে রাখতে চাই।

কিন্তু তার কি কিছু প্রয়োজন আছে? বিশেষ করে আমার মত উড্ডীয়মান জীবনে? চব্বিশ ঘণ্টার বেশ খানিকটা অংশই যার কাটে আকাশে মাটির পৃথিবীর মায়াবন্ধন কাটিয়ে যেন সাময়িক ভাবে শূন্যেই বাসা বাঁধা।

সেন একটা নতুন হিসেব আমার মাথায় ঢোকাতে চেষ্টা করে, বলে—পুরাণের কাহিনীতে আছে বিশ্বামিত্র তপস্যাবলে আপন জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। বিজ্ঞানের বলে মানুষ নিজের পৃথিবী নিজে গড়ে নিয়েছে; নিচ্ছে, আরো নেবে।

দূর আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে তাকালে কি দেখতে পাই—দেখতে পাই—পৃথিবীর অনেক যায়গায় সবুজের সমারোহ, অনেক যায়গায় উদার উদধি—ওই যায়গাগুলিতে সোজাসুজি ধরাতলে দৃষ্টি যায়। কিন্তু যখন কোন বড় সহরের উপর উড়ে আসি তখন দেখি মানুষ কত উঁচু উঁচু প্রাসাদ তৈরী করেছে। একশো তিনতলা ভক্ উঁচু বাড়ীওতো মানুষেরই সৃষ্টি। তাতে পৃথিবীর পৃষ্ঠে যতটুকু স্থান অধিকৃত হয়েছে তার চেয়ে শতগুণ স্থান মানুষ বুদ্ধি করে শূণ্যে তৈরী করে নিয়েছে। "শূণ্যে সৌধ নির্ম্মাণ" কথাটা একেবারে গাজাখুরি নয় তা হলে!

আবার যখন ভাবি এই সব সংখ্যাহীন বহুতলবাড়ী যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠে বিছিয়ে দেওয়া যেত তবে কতবার পৃথিবী বেষ্টিত হতে পারত। অর্থাৎ নৈসর্গিক কারণে পৃথিবীর ক্ষেত্রতল যতটা পরিমাণ বিস্তৃত হয়ে সৃষ্ট হয়েছে মানুষ তার প্রয়োজনের তাগিদে তার উপরে আরো অনেক লক্ষ বর্গগজ 'জমি' নিজে সৃষ্টি করে নিয়েছে।

শুধু কি তাই? নৈসর্গিক জমি স্থাবর, থিওডোলাইটের মাপ ভুল হতে পারে, কিন্তু জমির স্থান পরিবর্ত্তন হয় না। নদীর এক কুল যদি ভাঙে, অপর কুল গড়ে ওঠে। তাতে জমির মালিকের হয়ত লোকসান হয়, কিন্তু ধরাপৃষ্ঠের চৌহদ্দিটা বাড়ে কমে না। সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক হিসাবে যদিই বা কিছু কমতি-বাড়তি ধরা পড়ে, স্থূল চোখে মনে হবে মোটামুটি সব ঠিক আছে।

অপর পক্ষে মানুষের সৃষ্ট জমি জাহাজের বুকে জলের উপর ভাসে, বিমানে আকাশে ওড়ে, চলমান ট্রাম-বাস ট্রেনে এক মুল্লুক থেকে আর এক মুল্লুকে চলে যায়, অর্থাৎ তারা সচল, স্থান পরিবর্ত্তন করতে পারে। আমার বাবা যে বাড়ীতে বাস করতেন সেটা নিয়ে আসতে পারেন নি, কিন্তু যে গাড়ীতে চড়তেন সেটা সাথে নিয়ে আসা সম্ভব হয়।

সব বুঝি, না বুঝলেও যেন সাগ্রহে বোঝাতে থাকে। সে জানে, ভিটের মায়ায় লাভ নেই, ওটা নেহাৎ ভাবালুতা মাত্র।

বিজ্ঞান ছেড়ে সেন অর্থনীতির দৃষ্টান্ত দেখায়। ল্যাণ্ড-লেবার-ক্যাপিটাল—অর্গানাইজেশান,—মুখ্যত এই চারি-পদ বিভাগে বিভক্ত উৎপাদন ব্যবস্থা। যা কিছু করতে চাও জমি, ভূমি বা ভিত্তি চাই। তবে অর্থনীতির জমি কেবল পৃথিবী পৃষ্ঠ না বোঝাতেও পারে। তাতে জমির আরো ব্যাপক ভাব গ্রহণের প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ অর্থনীতির বিচারে জমির প্রয়োজন স্বীকার করলেও সেটা বাস্তভিটাই হওয়ার কোন সার্থকতা নেই। সে আস্তানা নির্ব্বাচনের জন্য কাঁচামাল ও শ্রমিক মিলবার সুবিধা এবং রেল-ষ্টিমার প্রভৃতি পরিবহন ব্যবস্থার সম্ভাবনাও বিচার করা দরকার।

জন্মস্থানের উপর আমাদের জন্মমাত্রই কোন টান জন্মে না। সেটা দিনে দিনে জমে ওঠে। অপর পক্ষে মানুষ বাসস্থান পালটাতে পারে কিন্তু জন্মস্থান পালটাতে পারে না। সেটা তাকে বিধি-নির্ব্বন্ধের মতোই মেনে নিতে হয়। তাই দৈবাৎ যে গ্রামে আমি জন্মেছি ওই গ্রামের সাথে আমার সম্বন্ধটা অস্বীকার করতে পারিনে।

আর গোটা গ্রাম আমার কাছে যে গৃহখানিকে কেন্দ্র করে বেঁচে ছিল সেখানেই তো আমার সাতপুরুষের বাস। আমার সব চিন্তা—চেষ্টা—চেতনা—আনন্দের আদি লীলাস্থল। তাই বাইরের দৃষ্টিতে তা যতো অকিঞ্চিৎকর হোক অন্তর দিয়ে ভাবলে তার কোন তুলনা হয় না।

চার চৌহদ্দি আঁটা ভূমিখণ্ড কেনা কঠিন নয়, কিন্তু এই বাস্তভিটা কি টাকা দিয়ে কেনা যায়? এযে কতো স্বপ্নে তৈরী, কতো স্মৃতি-স্বাক্ষরিত! টাকায় তারতো কিছুই কেনা সম্ভব নয়।

বাবার মুখে শুনেছি—আমরা ওই গাঁয়ের আদিম বাসিন্দা ছিলাম না। আমরা 'বাজাল' আজো আমাদের বাড়ীকে বাজাল বাড়ী বলে। পূর্ব্ববাংলার কোন দূর অঞ্চল হতে আমাদের বংশের কোনও ঊর্দ্ধতন পুরুষ ব্যবসাসূত্রে পাশের গঞ্জ—ফকির হাটে এসেছিলেন। তারপর হয়ত বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম বলে এখানেও বাড়ীঘর করেন, বিষয় আসয় করেন। সেই অবধি গোটা পরগনার লোক আমাদের বাড়ীকে বাজাল বাড়ী বলে। ওই বাড়ীতে আমার অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ হতে সুরু করে পিতামহ জ্যেষ্ঠতাতরা দেহ রেখেছেন। বাবা বিদেশে এলেন নেহাৎ অনিচ্ছায়—দেশে যখন আত্মীয়-স্বজন ডাক্তার-কোবরেজ কেউ রইলনা,

মা গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন—তাঁর চিকিৎসা হয়না, তখন নিতান্ত বাধ্য হয়েই বাবা বিদেশে এলেন। এখানে এসেও কি কোনদিন ভুলতে পারলেন সেই বাড়ী! মাত্র দুশো মাইলের মধ্যে, তবু যেন কত দূর, যেন সাত সমুদ্র তের নদীর পারের দেশের কথা। সেই ভাবে নাতি-নাতিনীদের কাছে দেশের গল্প করতেন। আমরা কাছে যেযে বসলেও নানা প্রসঙ্গে সেই বাড়ীর কথা,—বারো মেসে আম গাছের কথা, ধবলী গাইয়ের কথা, মাঠের পুকুর পাড়ে আনারস বাগানের কথা, কুয়াতলার কলম্বলেবু ঝাড়ের কথা—কত কিছু বলতেন।

বাবা মারা গেলেন বাড়ীর কথা মুখে নিয়ে। শ্রাদ্ধাদি চুকোতে টাকার দরকার। মাথার উপর থেকে বাবা চলে যাওয়ার সাথে সাথে অনুভব করলাম এখন আমিই বাড়ীর বুড়ো। আগে যে সব প্রসঙ্গে সবাই বাবার মতামত চাইত, এবার আমার মত চাইছে। ছোট ভাই এসে বল্লে, মামার বেয়াই তার সহরের বাড়ী ছত্রিশ হাজারে ছেড়েছেন, মামা তার বাড়ীর খরিদ্দার খুঁজছেন, তুমিও একবার যাওনা, যে দাম পাও জমিজমা ছেড়ে দিয়ে কিছু টাকা নিয়ে এসো।

বাড়ী গেলাম। গ্রামের পথঘাট বনজঙ্গলে ভরে উঠেছে লোকজন নেই। আমার জ্যেঠতুত বোন দেশে ছিলেন, তিনিও ইতিমধ্যে মারা গেছেন। আমার ভগিনীপতি অকালেই বুড়ো হয়ে গেছেন। তবু তিনিই সমাদর করে বসালেন। আর কার কাছেই বা যাবো, গ্রামে আছেই বা কে?

তবু গ্রামটা শেষবারের মতো দেখবার জন্য পথে বেরুলাম। পথ নির্জ্জন। পায়ে পায়ে চলে এলাম নদীর দিকে। এর নাম বটতলার ঘাট। একটা বুড়ো বট ঝুরি নামিয়ে তলাটা অন্ধকার করে রেখেছে। তলা দিয়ে একটা পথ গিয়েছে নদীর দিকে, আর একটা গ্রামের দিকে, আর একটা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক হয়ে মহকুমা সহর ও রেল ষ্টেশনের দিকে।

এই গাছতলায় মেয়েরা পূজো দিতে আসত, মানত ঝুলিয়ে দিত বটের ডালে কাপড়ের পুটলি বেঁধে। ইতু পূজো হত বুঝি ঋতু বিশেষে। ঘুটের ছাই আর বেনে-বউ ফুল দিয়ে বাসি মুখো দেবতার পূজো হত। মাঘ মোড়লের ব্রত করত আমার দিদি, তার সাথে খুব ভোরে ফুল কুড়াতে যেতাম। মা ধোলাই চাদর গায়ে জড়িয়ে পিঠের কাছে গিঁট বেঁধে দিতেন। শীতের সকালে শিশির-ভেজা মাটিতে পা দিতে গা শিউরে উঠত। মাটিতে কেঁচো গড়িয়ে যেত। শীত শীত, তবু কেমন মজা লাগত। বেনে-বউ ঝোপের উপর মাকড়সার জাল, শিশিরে ভিজে থাকত—তাতে রোদ পড়লে সাতরঙের বাহার খুলত। তলায় যেয়ে দাঁড়াতে টুপটাপ শিশির গায়ে পড়ত।

চলতে চলতে সেই বটতলা পর্য্যন্ত যেয়ে থেমে যেতাম। এর ওদিকে ছোটদের যাওয়া নিষেধ। ওদিকে ভয়ের রাজ্য। বৈচীবন, গোখরো সাপের বাসা। তার ওপারে তালগাছ, খেজুর গাছ মাথা বাড়াচ্ছে। এই বন জঙ্গল ঘেরা জমিখানা পেরুলে চর, তার পরে নদী। কী রহস্য জমা ছিল বৈচী বনের পিছনের জঙ্গলে!

বাল্যের সেই আতঙ্ক-মেশা রহস্যপুরীর দরজাও এক দিন উন্মুক্ত হয়েছিল আমার কাছে। পথের বাম পাশের কালভার্টের মুখের সুড়ঙ্গ পথে বসে বসে চলে গেলে পৌছানো যায় পথের ডাইনের দুর্ভেদ্য বৈচীবনের পিছনের জঙ্গলে। সেখানে নালাটা একটা খালের মুখে পড়েছে। শুকনা পাতা ছড়ানো হলেও জায়গাটা অধিকতর প্রশস্ত। কাছেই বিস্তৃত বেতঝোপ। শীতকালে কেঁদো বাঘ মাঝে মাঝে এসে এখানেই বাসা বাঁধত। বেতঝোপের তলাটা যেমন নিরিবিলি তেমনি পরিষ্কার। স্বচ্ছন্দে শুয়ে থাকা যায়।

ঘন শুয়ের ঝোপ, কুলগাছের জঙ্গল পেরিয়ে পাতলা ইটের কয়েকটা ভাঙ্গা কোঠা নজরে পড়ে। তার উপরে শ্যাওলা ধরেছে, বট গাছ গজিয়ে ডালপালা বিস্তার করেছে। এককালে নীল কুঠির সাহেবদের আস্তানা ছিল, কালক্রমে কেবল মনুষ্য পরিত্যক্ত হয়নি, দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে সাপখোপের বাসায় পরিণত হয়েছে।

গ্রামের ঘনবসতির বাইরে নদীর নিকট এমন চমৎকার নিরিবিলি জায়গার লোভ সামলাতে পারেনি যারা এর থেকেও গহন পথের যাত্রী, তারা তাই এটাকে একটা ঘাঁটিতে পরিণত করেছিল। দুষ্প্রাপ্য এবং আইনত

অপাঠ্য বই থেকে সুরু করে টাকাকড়ি আগ্নেয় অস্ত্র সব কিছুই দরকার মতো এখানে মজুত রাখত এবং এখান থেকেই জেলার নানাস্থানে চালান দেওয়া হত।

যাঁরা এপথে এসেছিল তাঁদের অনেকের কথা মনে পড়ে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের যুদ্ধে জালাবাদ পাহাড়ে প্রাণ দিয়েছিলেন একজন, বালাশোরে গেছেন একজন। হাত উড়ে যেয়ে ধরা পড়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে ছিলেন একজন। আর কয়েকজন 'ভগিনী রাষ্ট্রে' অন্তরীণ। বাকী যারা—তারা বেপাত্তা, কী এপারে, কি লাইনের ওপারে—কেউ কোথাও একটা ডেপুটি সেক্রেটারিত্বও পায়নি। অথচ তারাই এই দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছিল। পন্থা তাদের ভ্রান্ত বিবেচিত হতে পারে কিন্তু তাদের নিষ্ঠায় খাদ ছিল না।

ঝির্ ঝির্ করে বাতাস বইচে ঠিক যেমন আমার ছোট বেলায় বইত। বট-অশ্বত্থের পাতায় তখনও যেমন নাচন লাগত এখনও তেমনই তারা নাচছে। শুধু আমিই বদলেছি।... আর বদলেছে এই দেশ, এই মাটি, মিঠে মাটি যেন লোনা হয়ে গেছে!

বাতাস বদলায়নি, নদী বদলায়নি, গাছ বদলায়নি, তবু কি জমি বদলে গেছে, দেশবিভাগের সাথে গেছে এর মাটির মমতা? তাই কি সত্য? দেশ বলতে কি তবে শুধু মানুষই বোঝায়, মাটি কিছু নয়; কিছু নয় এই জমি?—যার জন্য এত মমতা, এত লালসা, এত কামড়াকামড়ি—সে কি সবই ভুয়া?

পশ্চিমের আলো এসে পড়েছে পথের পরে, লাল-সূর্য্যের রক্তিম আভায় গোটা বনস্থলীর চেহারা আমার কাছে অপরূপ দেখালো। ধারে কাছে কেউ-নেই—সেই জনহীন পথপ্রান্তে শুধু আমি আর আমার আজন্ম পরিচিত গ্রাম, আমার জন্মভূমি দু'জনে যেন বহুদিন পরে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালাম। এ আর বিমান থেকে উঁকি দিয়ে দেখা নয়, বিদেশ থেকে মুহূর্ত্তের জন্য এসে দুদণ্ডের দেখা নয়, যেন আমার চৈতন্যের মধ্যে তার সত্তা ওতপ্রোতভাবে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যেতে লাগল। চোখের সুমুখে আমার শৈশব—বাল্য—কৈশোর—যৌবনের দিনগুলি চলচ্চিত্রের মতো ভেসে গেল—তার সমগ্র পটভূমিকায় প্রসারিত হয়ে আছে এই গ্রাম, এই নদী, এই বন, এই পথ, এই শতপরিচিত গাছ-লতা-পাতা। এদের রসে পুষ্ট, এদের স্নেহচ্ছায়ায় বর্দ্ধিত এই দেহ এদেরই একজন, একে আর ভিন্ন করে ভেবে ছিন্ন করে দূরে রেখে চিন্তা করতে পারলাম না। অভিভূতের মতো বাড়ী ফিরে গেলাম।

জমিজমা বিক্রি করা হল না।

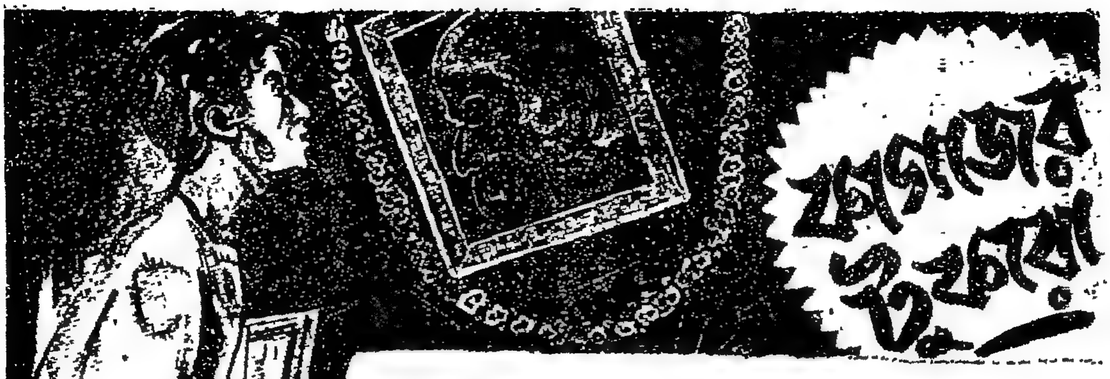

যুগান্তের উত্তরণে

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্ধকারের মধ্যে যেন আরো অন্ধকারের স্তূপ জ'মে উঠছে চারদিকে। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট বোধ হচ্ছে, মনে হচ্ছে আকাশ বাতাস, নদীর স্রোত সময়ের প্রবাহ সব যেন এখনই বন্ধ হ'য়ে যাবে।

সবে খেতে ব'সেছিলাম, ছোট ভাই এসে বল্‌লে, এই মাত্র খবর এসেছে ১২-১০ মিনিটের সময়ে সব শেষ হ'য়ে গেছে দাদা!

থালা, গেলাস সব তেম্‌নি প'ড়ে রইলো, এক গ্রাসও মুখে দেওয়া হয় নি—সেই অবস্থায় উঠে গায়ে জামা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়েছিলাম—তারপরে কি ক'রে যে ধর্ম্মতলায় এসেছি—কি ভাবে যে জোড়াসাঁকোয় এসে পৌঁছেছি—সে সবের বিশদ বর্ণনা আজ দেওয়া সম্ভব নয়।

পথঘাট লোকে লোকারণ্য। ট্রাম, বাস সমস্ত বন্ধ। কেবল অনর্গল জনস্রোত চ'লেছে দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলির দিকে!

চিরকালের জন্য যুগসূর্য্য অস্তমিত হ'ল। তারপরেই অন্ধকার—চারদিকেই অন্ধকার!

সভার এককোণে ব'সে ব'সে এই দিনটার কথাই বার বার মনে পড়ছিলো। সকলেই এসেছেন আজ এখানে। বাংলার শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পী, শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। মনীষীদের অভূতপূর্ব্ব সমাবেশ। তাঁদের বিরাট বিপুল ছায়ানুসারী হ'য়ে আমরাও ক'জন এসেছি। এখানে—তাঁদের কাছে যদিও আমরা বামনের মতো, তবু চন্দ্র স্পর্শ করবার দুরাকাঙ্ক্ষা আমাদেরও আছে, যতো ছোটই হই, একই পথের অভিযাত্রী তো বটে!

উপন্যাস-সম্রাট সূর্য্যপ্রসন্ন উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আজকে আমাদের ঘোরতর দুর্দ্দিন, চারদিকে অন্ধকার তামসী নিশা। নাহলে এমন ক'রে ইন্দ্রপতন কেন হবে! তবু মহাকালের মহাবিধানের উপরে তো আমাদের হাত নেই, তাঁর যা বিধান তা ঘটবেই! নরদেহ ধারণ ক'রে যখন তিনি এই মর্ত্ত্যভূমিতে এসেছিলেন, তখন একদিন এই ধরণীকে তাঁর পরিত্যাগ করতে হতোই।

ব্যক্তিগতভাবে আমরা অনেকেই তাঁর মহা আশীর্ব্বাদ পেয়েছিলাম, কিন্তু আজ সে-সব কথা নয়, আজ শুধু ভাবতে হবে, জাতি তাঁর কাছে কতোখানি ঋণী সমস্ত জীবন ধরে, সমস্ত দেশের জন্যে—সমগ্র বিশ্বের জন্যে কি তিনি ক'রে গেছেন! তাই এই সভায় আমার প্রস্তাব হচ্ছে যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে, তাঁর স্মৃতিকে অক্ষয় ক'রে রাখবার জন্যে আসুন আমরা একটা গ্রন্থ প্রকাশ করি, তার নাম হোক 'রবীন্দ্র স্মৃতি-স্মরণিকা'! বাংলার প্রত্যেক সাহিত্যিক এতে লিখবেন এবং এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্যে প্রত্যেকেই যাঁর যথাসাধ্য দান করবেন।

আর এই কাজ করবার জন্যে চাই স্বেচ্ছাসেবক, আসুন, আমরা প্রত্যেকে স্বেচ্ছাসেবক হই!

বিপুল হর্ষ-ধ্বনির মধ্যে তিনি আসন গ্রহণ করলেন।

বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি অরুণাচল চট্টরাজ এবারে উঠলেন। বললেন: এই বেদনার্ত্ত হৃদয় নিয়ে আপনাদের কাছে খুব যে বেশী কিছু বলতে পারবো, তা মনে হ'চ্ছে না—কেবলই মনে হচ্ছে ভারতভূমির থেকে সমস্ত হিমাচলকে যেন অপসারিত করা হ'য়েছে—আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা শ্রদ্ধেয় সূর্য্যপ্রসন্নদা যা বললেন তার উপরে আমাদের আর কোন বক্তব্য নেই, এর থেকে আরো চমৎকার হৃদয়গ্রাহী প্রস্তাব আর কি-ই বা হ'তে পারতো—আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁর এই প্রস্তাবটীকে সমর্থন করছি। শুধু এই সংগে একটী কথা আমার বলবার আছে, সূর্য্যপ্রসন্নদা ব'লেছেন, প্রত্যেক সাহিত্যিক এই গ্রন্থে লিখবেন, খুব ভালো কথা, কিন্তু সাহিত্যিক বলতে কাদের বুঝবো, তার কী ডেফিনেশন্ হবে, সেটাও তো জানা দরকার—তারও একটা মাপকাঠি থাকা উচিত। আমার প্রস্তাব এই যে, ছাপার অক্ষরে যাঁরই অন্ততঃ চার লাইন প্রকাশিত হ'য়েছে—তিনিই সাহিত্যিক—তাঁরও রচনা আমরা আগ্রহের সংগে গ্রহণ করবো।

সাধু, সাধু, সাধু! সমস্ত সভাকক্ষ সাধুবাদে গম্ গম্ ক'রে উঠলো। সমবেত সুধীমণ্ডলী আনন্দে আবার হর্ষধ্বনি ক'রে উঠলেন। এই না হ'লে কি বিশ্বকবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সম্ভব? তিনি সমস্ত পৃথিবীর জন্যে সারা জীবন ধ'রে তাঁর রচনাকে দান ক'রে গেছেন—তার স্বীকৃতি এম্নি ভাবেই তো লেখক-সাধারণের মধ্যে থেকে আসা উচিত।

আনন্দে আমারও মন কানায় কানায় ভ'রে উঠলো। সংগে তপেন চাক্‌লাদার ছিলো। উদীয়মান তরুণ কবি তপেন চাক্‌লাদারের লেখা আপনারা অনেকেই প'ড়েছেন আশা করি। আমাকে বড়ো ভালোবাসতো সে—এক রকম তারই উৎসাহে অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যে ব'সেও আজো আমি তাই লেখনী চালনা করছি। যেখানে যেতো তপেন আমাকেও সংগে নিয়ে যেতো, আমি তার প্রিয় ছায়ার মতো হ'য়ে উঠেছিলাম।

আনন্দে সে আমার একটা হাত চেপে ধরলো, বললে, হংস, চমৎকার হবে তাহ'লে, নারে?

বললাম, সে আর বল্‌তে?

ইতিমধ্যে বাংলার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হেমদাকান্ত উঠে দাঁড়িয়েছেন, বললেন, আজ যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন হোত, যদি তিনি স্বাধীন দেশে দেহত্যাগ করতেন, তা'হলে আমি প্রস্তাব করতাম, সমস্ত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলটা তাঁর স্মরণ-তীর্থে পরিণত করা হোক। এইটেই হোক ভারতবর্ষের রবীন্দ্র মিউজিয়াম। দেশ দেশান্তর থেকে লোক এসে দেখুক তাঁর কীর্ত্তিকে, জানুক তাঁর মহানুভবতাকে,—দিকে দিকে গড়ে উঠুক অমর অচল প্রতিষ্ঠা, কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, আমরা আজো পরাধীন, সম্পূর্ণ পরাধীন দেশে এই মহাকবি জন্মেছিলেন, সম্পূর্ণ পরাধীন দেশে থেকেই তিনি আজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে গেলেন। তবু আমাদের ভাব্‌তে হবে—

মনে আছে, এই সভা পুরো চারঘণ্টা ধ'রে চলেছিলো। অনেক প্রস্তাব উত্থাপিত হ'লো, অনেক প্রস্তাব গৃহীত হোল। বাংলার শ্রেষ্ঠ-মনীষীরা সেদিন একযোগে কবি গুরুর স্মৃতিকে অক্ষয় ক'রে রাখ্‌বার জন্যে বদ্ধপরিকর হ'লেন।

বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রকাশক "অবনীকান্ত কুণ্ডু এণ্ড সন্স" এই স্মরণিকা প্রকাশের ভার নিলেন। উপন্যাস সম্রাট সূর্য্যপ্রসন্ন এই বইএর জন্যে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'মায়া কাজল'-এর বর্ত্তমান এডিশন্ রাইট্‌টা দান করবেন, কথা দিলেন। সংগে সংগে দানের পরিমাণ হু হু ক'রে বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। বুকের মধ্যেটা তোলপাড় করতে লাগলো আমার। আমিও যদি এই ভাবে, এই মহাযজ্ঞে এক টুক্‌রো সমিধও সংগ্রহ ক'রে দিতে পারতাম, কিন্তু আমার তো কোনো বই নেই, আজো একখানিও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি আমার! তপেনকে সে-কথা বলতে, সে বললে, তাতে ক্ষতি কি ভাই? বই নেই? বেশ তো, এসো আমরা অন্যভাবে পরিশ্রম করি। আমরা চাঁদা সংগ্রহ করবো, লেখা থেকে যা আয় হবে তার কিছু কিছু অংশ দেবো এই স্মরণিকা ভাণ্ডারে। রামচন্দ্র যখন সেতুবন্ধন করেন, তখন ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীর সাহায্যকেও তিনি তো অবহেলা করেন নি ভাই।

বড়ো ভালো লাগলো তপেনের কথাগুলি। আনন্দে সমস্ত মনটা ভ'রে উঠলো।

দিকে দিকে 'রবীন্দ্র-স্মৃতি-স্মরণিকা' প্রকাশের জন্যে আয়োজন চললো। প্রথম বছরে 'শ্রীরংগমে' এবং 'ছায়া'-তে দুটী গীতি-নাট্যের অভিনয় হ'য়ে গেলো—সংগৃহীত সমস্ত অর্থ গেলো 'স্মরণিকা ভাণ্ডারে'। তারপরের বছরে একটী গানের আসর বসলো নিউ এম্পায়ারে, রবীন্দ্র সংগীতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়, তার সংগে অভিনীত হ'লো চিত্রাংগদা। এবারেও সমস্ত অর্থ গেলো নির্দিষ্ট ভাণ্ডারে, চারদিকে রীতিমতো একটা যেন সাড়া প'ড়ে গেছে।

তপেনের উৎসাহের অন্ত নেই। মাঝে মাঝে প্রায়ই সে যায় 'অবনীকান্ত কুণ্ডু'তে। প্রকাশনার শেষতম বিবরণ সংগ্রহ ক'রে এনে দেয়। এ পর্য্যন্ত বাড়ী বাড়ী ঘুরে সে প্রায় ৫০০ টাকা সংগ্রহ ক'রেছিলো, সব দিয়ে এসেছে সেই ভাণ্ডারে। আমিও তপেনের সংগে ঘুরে যৎসামান্য কিছু অর্থ সংগ্রহ ক'রেছিলাম।

তারপরে এলো ১৩৫০ সাল। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া প্রসারিত হ'য়ে গেলো বাংলার গ্রামে গ্রামান্তরে। নিম্ন মধ্যবিত্তের সমাজ ব্যবস্থা তখন এলিয়ে পড়ছে, কে কোথায় ছিঠকে পড়ছে, তার ঠিক নেই—আমিও সেই প্রবল ঝঞ্ঝার মধ্যে বাংলার থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়লাম।

দেশে ফিরলাম আট বছর পরে। অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে চারদিকে। ঔপন্যাস-সম্রাট সূর্য্যপ্রসন্ন এখন লেক্‌চার-টুরে বেরিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি রোমে আছেন—এর পরেই যাবেন আমেরিকা। কবি অরুণাচল চট্টরাজ সাহিত্যের একটি বিশেষ কন্‌ফারেন্সে আমন্ত্রিত হ'য়ে গেছেন রাশিয়ায়, বিখ্যাত গল্প-লেখক সুজিত নন্দী এখন মস্ত বড়ো ফিল্ম-ডিরেক্টর।

আমারো পরিবর্ত্তন কম হয় নি। ঘুরতে ঘুরতে বোম্বাই প্রদেশে গিয়ে এক মারবার-তনয়ের সুনজরে পড়ি এবং তাঁরই করুণায় আজ আমি পাট-ব্যবসায়ী। বড়বাজার অঞ্চলে আমার অন্যতম পার্টনার মদনলাল কানোরিয়ার নূতন ব্যবসায় কেন্দ্রের গুরুভার নিয়ে এখানে এসেছি। সময় নেই। চারদিকেই কাজ।

বেলা দু'টো বেজে গিয়েছিলো। টেলিফোনে হরিরাম পুগলিয়ার সংগে কথা বল্‌ছিলাম। আরো সওয়া পাঁচ হেসিয়ান্ দরকার আমার। দর হু হু ক'রে বাজার উঠ্‌ছে। এমন সময়ে ভীরু পায়ে দু'টী বাঙালী ছেলে পুশ্-ডোর ঠেলে আমার ঘরে ঢুক্‌লো, সংগে একটী সুন্দরী তরুণী। নমস্কার ক'রে ইংগীতে সাম্‌নে রাখা চেয়ারে বস্‌তে বললাম তাঁদের।

একটু পরেই ফোনের কথা শেষ হ'তে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম তাঁদের দিকে।

একটী ছেলে হিন্দীতে নিবেদন করলে, আমাদের দেশের সব থেকে বড়ো কবি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-রক্ষার আয়োজন চল্‌ছে সেই উপলক্ষ্যে নিউ এম্পায়ারে অভিনীত হবে 'তাসের দেশ'। দয়া ক'রে আমি, শেঠ্‌জি, যদি কয়েকখানা টিকিট্ কিনি!

হিন্দী ভাষায় কথা বলবার জন্যে অবশ্য তাদের আমি সেদিন কোন দোষ দিতে পারিনি—পারিও না। সে-পথ আমিই তো নিজের হাতে বন্ধ ক'রে দিয়েছি। আমাকে দেখে কি ক'রে তারা বুঝবে, আমি, হংসেশ্বর মুখুজ্জে, বড়োবাজার অঞ্চলের মাড়োবার কুলের মধ্যে হংসোমধ্যে

তরল আলতা

বলতে বোঝায় সুপ্রসিদ্ধ পি, সি, দাসের "সুবাসিত তরল আলতা" বহু-শত বৎসর ধ'রে সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে সমভাবে চ'লে আসছে। মাত্র একবার ব্যবহারেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান হয় – কারণ তারপর আর কোন আলতায় মেয়েদের মন ভরে না-------

আলতা-সিন্দুর-স্নো-ক্রীম

সকল সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠানেই পাওয়া যায়।

বকো যথা হ'য়ে ব'সে আছি—নিজের হাতেই সাজ-পোষাক দিয়ে সব বাঙালীত্বকে মুছে দিয়েছি!

৫০৲ টাকার দু'খানা টিকিট্ বিক্রী ক'রে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে তারা চ'লে গেলো। তরুণীটী কৃতজ্ঞতার হাসি দিয়ে তাকে আরো উজ্জ্বল ক'রে দিলে। কিন্তু এ-সব দেখ্‌বার আমার সময় কোথায়? কোন রকমে প্রতিনমস্কার ক'রে আমি ততক্ষণে আবার ফোন তুলে নিয়েছি।

সন্ধ্যার পরে বাড়ী ফিরে এসে মনটাকে কিন্তু কিছুতেই স্থির করতে পারলাম না। পুরোণো অনেক দিনের স্মৃতি সব জট পাকিয়ে আসতে লাগলো। মনে পড়লো সেই জোড়াসাঁকোর ঘর—সেই সভাগৃহ! ঠিক করলাম—না, এর মধ্যে একদিন তপেনদের সেই আহিরীটোলার বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ করতে হবে। কেমন আছে তপেন? কি করছে সে আজকাল?

আরো কয়েক সপ্তাহ কেটেছে তারপরে। ডিরেক্টর বোর্ডের জরুরী মিটিং ডাকা হয়েছে। গানির দাম হু হু করে নাম্‌ছে এখন! আমাদের প্রায় ১০ হাজার গাঁট হেসিয়ান কেনা পড়ে রয়েছে—বম্বে থেকে আজ সকালে মদনলাল এসেছেন প্লেনে। সামনে ভয়ানক দুর্য্যোগ। দ্রুত গতিতে মোটর চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ পার হয়ে যাচ্ছিলো, হঠাৎ দেখি ফুটপাথের ওপার থেকে তপেন হেঁটে আসছে। গায়ে একটা ছেঁড়া খদ্দরের জামা, চুল এলো-মেলো, বাঁ হাতে কতোগুলি ফাইল আর ডান হাতে একটা ছোট থলি।

বললাম, গাড়ী রোখো ড্রাইভার। সংগে সংগে ফুট-পাথের এক পাশে গাড়ীটা বহু বিচিত্র শব্দ করে থেমে গেলো। বিস্মিত দৃষ্টিতে মদনলাল তাকালেন আমার দিকে, বললেন, 'বৈঠিয়ে, আভি আতা হুঁ।'

তপেন নিজের মনেই এগিয়ে আসছিলো। মাথার থেকে টুপিটা খুলে ফেললাম, বললাম, তপেন?

চম্‌কে এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো সে আমার সাম্‌নে, তারপর একটু চিন্‌বার চেষ্টা করে উচ্ছ্বসিত আবেগে কাছে এসে হাতটা চেপে ধরে বললে, কে হংস? কোথায় ছিলি ভাই এতোদিন তুই? আমি যে তোকে কতো খুঁজেছি?

আমি বললাম, সে সব কথা পরে হবে, কিন্তু তোর এ অবস্থা কেন? কি করছিস আজকাল?

—কেন? 'রবীন্দ্র স্মৃতি-স্মরণিকা' যে প্রকাশ করবো আমি, সব ঠিক ক'রে ফেলেছি—দেখছিস্ না এই ফাইল। চার হাজার লেখা জোগাড় করেছি, তা ঐ কুণ্ডু কোম্পানীর সংগে বন্‌লোনা ভাই, ওরা খালি দেরী করছে বইটা বের করতে। শুনলুম শিয়ালদার কাছে তুই নাকি মস্ত বড়ো পাবলিশিং হাউস খুলেছিস্? তা—তোর কাছেই যাবো আমি, ভালোই হ'য়েছে তোর সংগে দেখা হ'য়ে, তারপরে খুব কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে কেউ যেন শুনতে না পায়, এইভাবে ফিস্‌-ফিস্ করে বললে, বাজারে কাগজের বড়ো অভাব রে, কোথাও কাগজ পাওয়া যাচ্ছেনা, তাই আমি এই থলি নিয়ে বেরিয়েছি, ব'লেই থলিটা সে আমার সাম্‌নে খুলে ধরলো।—দেখলাম, তার মধ্যে রাস্তায় পড়ে থাকা যতো ছেঁড়া কাগজ, পোষ্টারের টুক্‌রো, হ্যাণ্ডবিল—কাগজের ঠোঙা!

এই ভাখ, কতো কাগজ যোগাড় ক'রেছি। পরম তৃপ্তির সংগে সে হেসে বল্‌লে, আর আমাদের কাগজের অভাব হবে নারে!

কেমন যেন বিমূঢ় হ'য়ে গিয়েছিলাম, বললাম, তপেন!

তপেন হেসে বললে, চলি ভাই আজ, আমি তোকেই দেবো এ-বই, ভাবিস্ নে!

ছেঁড়া স্যাণ্ডেলটা পা দিয়ে ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে সাম্‌নের দিকে এগিয়ে চল্‌লো তপেন।

গাড়ীতে ফিরে এসে বললাম, চলো ড্রাইভার!

বিস্মিত মদনলাল তখনো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে র'য়েছেন, বললেন, কে হোংসো বাবু?

বললাম, কেউ না। ও একটা পুরোণো লোক!

ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিংএ যেতে সেই আমার প্রথম দেরী হ'য়ে গেলো।

সম্পাদকীয়

শারদীয়ার শুভাগমনে

পিতৃপক্ষ গিয়া মহালয়ায় দেবীপক্ষ পড়িল। পূজা সমাগত; মাতৃঅর্চ্চনার শুভ শঙ্খধ্বনি আসিয়া কানে বাজিতেছে। কিন্তু কাহাকে লইয়া পূজা, কাহাদের পূজা, কেন পূজা, একথা কি একবারও আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি? দুর্গোৎসব—সে কি দুর্গতদের দুর্গতিনাশের উৎসবারাধনা, না দশভুজার প্রশস্তি-আয়োজনে ভূরিভোজিদের চিত্ত-স্বাচ্ছন্দ্য মাত্র? কাহাকে লইয়া দুর্গোৎসব সার্থক হইবে, কাহাদের অঞ্জলিতে মায়ের রাঙা চরণে মঞ্জীর বাজিয়া উঠিবে? এ প্রশ্ন বোধ করি অনেকেই অবান্তর বলিয়া মনে করিবেন। পূজা তো হিন্দুমাত্রেরই! কিন্তু সেই বাঙালী হিন্দুর অবস্থা আজ কোন্ স্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে? ব্যক্তি বিশেষের গৃহ-পূজা বা সম্প্রদায় বিশেষের বারোয়ারী পূজা ততক্ষণই সার্থক হইয়া উঠিতে পারে না—যতক্ষণ দেশের কোটি কোটি নিরন্ন, উপবাসী-আত্মা পথে পথে অশ্রুবিসর্জন করিতেছে। বাঙালী হিন্দুর সেই অশ্রুর স্বাক্ষর আজ পথে পথে। পূজা তো সেই অসংখ্য মানব-আত্মাকে লইয়াই, পূজা যে সেই নিরন্ন উপবাসী সন্তানদেরই, দুর্গতিনাশের মন্ত্র দিয়াই যে দেবী-আরাধনার উদ্যোগ! অতএব কাহাকে লইয়া পূজা, কাহাদের পূজা, কেন পূজা—এ কথা উপলব্ধি করা কঠিন নয়।

পূজানুষ্ঠানের অবশ্য আরও একটি তাৎপর্য্য আছে, মিলিত হইবার এবং মিলাইবার তাৎপর্য। প্রিয়-পরিজনকে এসময়ে আমরা কাছে পাই, আত্মীয় বান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হইয়া হৃদয়-বিনিময়ের একটা স্বাভাবিক সুযোগ ঘটে এ-সময়ে; কতকটা তাহা ছুটির অবকাশে, কতকটা পূজার নৈবেদ্যে। কিন্তু পূজার মহৎ প্রয়াসের কাছে এ তাৎপর্য একেবারেই গৌণ। ক্ষুধা-তৃষ্ণার বালাই হৃদয়কে কোথাও মুক্ত বিহঙ্গের মতো ডানা মেলিয়া উড়িতে দেয় না। সেই বালাই আমাদের বাঙালী-জীবনে আজ সবচাইতে বড় বালাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মিলনের আনন্দ তাই বিরহের পূরবী-রাগে মূর্চ্ছিত।

অথচ ইতিমধ্যেই পাড়ায় পাড়ায় লাল শালুতে শাদা কাপড়ের হরফে বারোয়ারীর আক্ষরিক ঘোষণা সমাপ্ত হইয়াছে। চাঁদার খাতা হাতে লইয়া বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইতেছেন পাড়ার প্রতিনিধিরা। পাড়ায় পাড়ায় বারোয়ারী, কোথাও বা এক পাড়াতেই দুইটি বারোয়ারী। সেখানে পূজার চাইতে প্রতিযোগিতারই আধিক্য। মায়ের মৃন্ময়ী স্বরূপকে লইয়া মায়ের সন্তানদের কতই না সমর-সজ্জা! ইহার পিছনে কি ভক্তি নাই? আছে। কিন্তু ভক্তির পরিণতি অনুষ্ঠান পর্যন্তই নয় কি? অনুষ্ঠানও তো বড় বড় মাইক-বক্তৃতা, এ্যাম্প্লিফায়ারে সংযোজিত কয়েকখানি নির্দিষ্ট প্রণয়-সঙ্গীত, তৎসহ কোথাও বা কোনো প্রদর্শনীর আতিশয্য; সেখানেও মাইকে ভলান্টিয়ারের তৎপরতা। বাঙালীর মা শঙ্করী ক্রমেই উদরশঙ্করী (!) রূপ লইয়া বাংলার মানস-কাঠামোয় আসিয়া আশ্রয় লইতেছেন। তাহার জন্য কুমারের হাতে মোটা অর্থ দিতে বাধে না, ষষ্ঠি হইতে দশহারা পর্যন্ত মাইক-খরচা মিটাইতে কার্পণ্য নাই, অনুষ্ঠানের সর্বদিক রক্ষা করিয়া দেখা গেল—শেষ পর্যন্ত সামান্য চাল-কলাটুকুও জুটিল না অনেকের। মায়ের ভোগ হয়ত যজমান-পুরোহিতের ঘরে কিছু গেল, তাহা ভিন্ন ভোগ লইয়া শেষ পর্যন্ত দুর্ভোগেরই সৃষ্টি।

এই দুর্ভোগই চতুর্দিকে। পূজাতেও সেই দুর্ভোগ। পূজার মহৎ উদ্যোক্তা যিনি, তিনিই কি অতঃপর মনে মনে উচ্চারণ করেন না—'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি!' মা তো ছাড়িয়াই আছেন, মাকে অদৃষ্টের সঙ্গে যুক্ত করিতে পারিতেছি কোথায়? সারা বৎসরের কান্না লইয়া তাইতো অন্ততঃ কয়েকটা দিনও আনন্দের প্রত্যাশা। কিন্তু আনন্দকে ধরিতে পারা যায় কোথায়? বাঁশের মাথায় এ্যাম্প্লিফায়ার বাঁধিতে বাঁধিতেই যে বেলা ফুরাইয়া আসে, মাইকে ভলান্টিয়ারী করিতে গিয়া যে শেষ পর্যন্ত মায়ের সেই এত ঘটার মৃন্ময়ী স্বরূপটাও চোখে আড়াল পড়িয়া যায়, প্রদর্শনীর মাচা বাঁধিতে গিয়া মাতৃ-দর্শন আর অদৃষ্টে ঘটে না: ঘরে যদি মা বাড়া-ভাত লইয়াও বসিয়া থাকেন, তাহা বিরক্তিকর বলিয়াই মনে হয়। অর্থাৎ অসুস্থতা এবং অস্থির-চিত্ততা। এ অস্থিরতা আনন্দকে পাইবারই অস্থিরতা; মা যে আনন্দময়ী—'আনন্দরূপম্ অমৃতম্'—তাঁহার আসন রচনার তাই এত ঘটা, তাঁহার আসন রচনা কি নৈঃশব্দের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইতে পারে? অথচ মন্ত্রে যে ফাঁক থাকিয়া যায়, ধ্যানে যে চিত্ত জাগে না—সেদিকে লক্ষ্য নাই কাহারও।

কিন্তু ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের সেদিকে লক্ষ্য ছিল—অনুষ্ঠানকে বর্জন করিয়া মাকে তাই সে দর্শন করিতে পারিয়াছিল। কমলাকান্তের দিব্য চক্ষে ভাসিয়া উঠিয়াছিল—মা কি ছিলেন, মা কি হইয়াছেন, মা কি হইবেন। কালসমুদ্রে মাতৃসন্ধানে নামিয়া বিকীর্ণ লোহিতোজ্জ্বল আলোকে কমলাকান্ত চিনিতে পারিল—'এই আমার

জননী; জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্ত-রত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভূজা—দশদিক—দশদিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধ-রূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্জিত—পদাশ্রিত বীরজন-কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্তি এখন দেখিব না, আজি দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিকভূজা নানাপ্রহরণ-প্রহারিণী শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী-বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম—এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।'

কিন্তু এ-যুগের কমলাকান্তদের মাতৃদর্শনের সেই নিষ্ঠাও যেমন নাই, মাও তেমনি নানাভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। বঙ্গপ্রতিমা বঙ্গজননী বাংলাদেশ আজ শতধা বিভক্ত। অন্ন-বস্ত্র মিলাইয়া নানা দিকে আজ সমস্যা ভারী হইয়া উঠিয়াছে। বাংলার ছেলেমেয়ে বাংলার মাটি-তেই আজ শরণার্থী। নিজ গৃহের নিরাপদ আশ্রয়ে বসিয়া আজ যদি কেহ ঢাকের বাদ্যে কর্ণকুহর বিদীর্ণ করে, বারোয়ারীর আসোয়ারীতে যদি কোনো কোকিলকণ্ঠ কুজন করে, তবে তাহা কি পেচকের রবের মতই কর্কশ শুনাইবে না? দুঃসহ দিনের কালস্রোত আর কাহাকে বলে? অনন্তরত্ন-ভূষিতা জননী জন্মভূমি আজ কালগর্ভে নিহিতা। যতকিছু আয়োজন অনুষ্ঠান, তাহা উৎসবের উৎসাহের মধ্যেই অবসিত, মাটি দিয়া মাতৃরূপকে যতই খাঁটি করিতে চাই, ফাঁকি আসিয়া আশ্রয় লইতেছে তাহার পুরোভাগে। দুর্গত দুঃস্থের জননী, তাঁহার আবির্ভাব কি সত্যই সার্থক হইতে পারে প্রাচুর্বের মধ্যে? প্রদর্শনী আর এ্যাম্‌প্লিফায়ারের চিৎকারে রুদ্ধকর্ণে মা নেপথ্যচারণা করেন। লজ্জায় তাই তিনি দন্তপংক্তিতে জিহ্বা কাম্‌ড়াইয়া মহাকালীর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। শান্তরূপের পরিবর্তে মাকে দেখিতে পাইতেছি রুদ্ররূপে। অন্যায়, অবিচার আর বাহুল্যে যেখানে সারা দেশ আচ্ছন্ন, বিভীষিকা রূপ সেখানে মার, লজ্জায় দুঃখে নিজের দাঁতে নিজের জিহ্বা কাম্‌ড়াইতেছেন মা। কোটি কোটি সন্তান তাঁহার অন্নভিক্ষু কাঙাল, কোটি কোটি সন্তান তাঁহার গৃহহীন, বস্ত্রহীন, ক্ষুণবৃত্তি উৎসবের আতিশয্য দেখিয়া মা সেখানে লজ্জিতা হইবেন ভিন্ন কি? মায়ের ভুবনমোহিণী রূপ দেখিবার জন্য কি একবারও আমরা কমলাকান্তের মতো বলিতে পারিয়াছি— 'উঠ মা হিরন্ময়ী বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব. সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা দেবী দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব, উঠ মা!'

কমলাকান্তের মতো এমন আকুলকণ্ঠে ডাকিতে পারিলে আজ কি স্বর্ণপ্রসু বঙ্গভূমির এমন বিভক্ত বিভীষিকারূপ দেখিতে হইত? আজও পূজামণ্ডপে কোথাও সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার নাই, আজও উৎসবে সকলকে মিলাইতে পারিতেছি না আমরা, আজও ভ্রাতৃবৎসল হইয়া দেশের আপামর ভাইবোনকে একত্র করিতে পারিতেছি না মায়ের অঙ্গনে। এখনও জনে জনে পার্থক্য, মনে মনে বিরোধ। পরের মঙ্গলসাধনের প্রবৃত্তি কবেই তো অন্তর্হিত হইয়াছে আমাদের জাতীয় চরিত্র হইতে! ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মোহে পড়িয়া আমরা বিবেকবুদ্ধিহীন হইয়া আজ খাঁটি ছাড়িয়া মেকীর আশ্রয় লইয়াছি। না পারিতেছি তাই নিজেদের রক্ষা করিতে, না পারিতেছি মায়ের মুখ রাখিতে।

পূজা অর্থে আজ অনুষ্ঠানই বিশেষতম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে অর্থ মাইক আর এ্যাম্‌প্লিফায়ারে নিঃশেষ হয়, সেই অর্থ যদি দুর্গতদের সেবায় নিয়োজিত হইত, তবে কি অনুষ্ঠাতাদের সংবেদনশীল চিত্ত অন্ততঃ কিছুটাও আশ্বস্ত হইত না? এক কলিকাতার বারোয়ারী অনুষ্ঠান-গুলিকে মিলাইলেই লক্ষাধিক অর্থের হিসাব মিলিবে। দেশের কোন্ দুর্গতের সেবায় তাহার একটি পয়সাও ব্যয় হয়? লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ হতভাগ্য অশ্রুসিক্ত ভাইবোনকে বঞ্চিত করিয়া কোনো পূজা কি সত্যই আনন্দমুখর হইয়া উঠিতে পারে? বঞ্চনা সেইখানেই—যেখানে তাহাদের পেটে অন্ন নাই, পরণে বস্ত্র নাই। ক্যাম্পে, ফুটপাথে, প্লাটফর্মে, জীর্ণ কলোনীর ভাঙা বস্তিতে বস্তিতে, কৃষিপল্লী আর শ্রমজীবীদের ঘরে ঘরে ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহারা। তাহারাও বাঙালী, বাঙালী হিন্দু, জন্মগত অধিকারে বাংলাদেশ তাহাদেরও দেশ। তাহাদিগকে যদি একত্রে আনিয়া পূজার আনন্দে না মিলানো গেল, তবে জাতীয় কর্তব্য হিসাবে আমরা দেশের কতটুকু কি করিলাম? 'ডিভাইড্ এ্যান্ড রুলের' কড়া শাসনে এতকাল ইংরেজ এদেশকে পায়ের নিচে দাবাইয়া রাখিয়াছিল। আজ পরশাসনমুক্ত হইয়া দেশ স্বাধীন হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, দেশের মানুষ এখনও দেশের স্বাধীন নাগরিক হইতে পারে নাই। 'স্বাধীনতা' একটা শব্দমাত্র নয়, ইহার দায়িত্ব অনেকখানি। পূজা-পার্বনের মধ্য দিয়াও সেই দায়িত্ব পালনের অবকাশ কমখানি নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত চক্রবর্তী একদিন জন-সাধারণের সামনে এই মন্ত্রই তুলিয়া ধরিয়া বলিয়াছিলেনঃ 'উঠ মা, এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবী দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব, উঠ মা!' —কিন্তু সত্যই কি মায়ের সুসন্তান হইয়া পরের মঙ্গল সাধনায় ভ্রাতৃবৎসল হইয়া আমরা আজও দাঁড়াইতে পারিয়াছি? বড় জোর এক সন্ধ্যা কাঙালী-ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া আমরা আত্মচরিতার্থতা বোধ করিয়া থাকি। তাহাতে না ভরে কাঙালের পেট, না ভরে আমাদের চিত্ত। এই চিত্তবিকৃতিই আজ আমাদের সম্পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই পূজা অর্থে অনুষ্ঠানের আধিক্য, সেবা অর্থে লোকদেখানো ভাবের ছটা

আর ধর্ম অর্থে বাহ্যাড়ম্বরের প্রাচুর্য আমাদের জাতীয় জীবনের চরিত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

এই আচ্ছন্নতার তন্তুজাল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রকৃত সংবেদনশীল মানুষ হইয়া না দাঁড়াইতে পারিলে আমাদের কল্যাণ নাই। মহাপ্রলয়ের তরঙ্গাবিক্ষেপে বিশ্বসংসার আজ সমাচ্ছন্ন। সেই প্রলয়-বারিধিতে মা নিমজ্জিতা। কাঠামোয় যত মাটি আর রং চড়াইয়াই আমরা মাতৃনামে ভাবগদগদ হইয়া উঠি না কেন, দেশ-মাতৃকা সেখানে নাই। মা ছড়াইয়া রহিয়াছেন নগ্নতায় আচ্ছাদিত সেই-ক্যাম্পে, ফুটপাথে, প্লাটফর্মে, জীর্ণ কলোনীর ভাঙা বস্তিতে বস্তিতে, কৃষি-পল্লী আর শ্রম জীবীদের ঘরে ঘরে। কবিগুরু সেই বিশ্ব-বিধাত্রীর খাঁটি আসনকে উপলব্ধি করিয়াই ভক্তচিত্তে বলিয়াছিলেন—

'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন,
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে সবহারাদের মাঝে।...'

সেই সর্বহারাদের ডাকিয়া একাসনে বসিতে হইবে মাতৃপূজায়, কমলাকান্তের মতো সকলকে আকুলকণ্ঠে ডাকিয়া বলিতে হইবে:-'এস ভাইসকল, আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই।... অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই কাল সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি— সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?

যাঁহারা সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহী, তাহাদেরও যেমন এ পূজায় জাতীয় কর্তব্য রহিয়াছে, যাঁহারা বারোয়ারীর উদ্যোক্তা, তাঁহাদেরও সেই কর্তব্যের গুরুদায়িত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। তবেই পূজা সার্থক হইবে, সুন্দর হইবে, অনুষ্ঠান মধুর হইবে, কারণ ইহা জাতির পূজা, জাতি হিসাবে কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া নয়। মাতৃ-পূজার উদ্যোগের মধ্য দিয়া যদি রিক্তা বিপর্যস্তা বঙ্গভূমিকে আবার স্বর্ণপ্রসূ করিয়া তুলিবার প্রতিশ্রুতিই গ্রহণ না করা গেল, তবে ব্যর্থ সেই পূজানুষ্ঠান। সেই ব্যর্থতা লইয়াই কি আমরা অশ্রুবিসর্জন করিব, না দেশের সকলের সঙ্গে এক-যোগে দুঃখ-সুখের সম অংশীদার হইয়া দেশকে আবার ফলে শস্যে সম্পদে জাগাইয়া তুলিব, মাটির প্রতিমাকে স্বর্ণ-প্রতিমা করিয়া মাথায় তুলিয়া লইব? পূজা সমাগত। পূজার এই প্রাক্‌মুহূর্তে আমাদের সমষ্টিগত জাতীয় জীবনে এই প্রশ্নটিই আজ সব চাইতে বড় প্রশ্ন।

আমরা আমাদের শুভানুধ্যায়ী লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও দেশবাসী সর্বসাধারণকে শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতিসম্ভাষণ ও সাদর অভিবাদন জ্ঞাপন করি।

রবীন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড
৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা সংস্কৃত গ্রন্থমালা

গোভিলগৃহ্যসূত্র ১৫৲

সামবেদীয় প্রসিদ্ধ প্রামাণিক সূত্রগ্রন্থ। ভট্টনারায়ণ কৃত প্রাচীন ভাষ্য ও সুবিস্তৃত টিপ্পনী সহ।

কৌলজ্ঞাননির্ণয় ৭৷৷০

মৎস্যেন্দ্রনাথ-সম্প্রদায়ের কৌলজ্ঞান-নির্ণয়, অকুবীরতন্ত্র, কুলানন্দতন্ত্র ও জ্ঞানকারিকা। নেপাল হইতে সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য হস্তলিপি অবলম্বনে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী, এম্-এ, ডি-লিট্ (প্যারিস) কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

বেদান্তসিদ্ধান্তসূক্তিমঞ্জরী ৫৲

গঙ্গাধরেন্দ্র সরস্বতী প্রণীত বেদান্ত-গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক ইংরাজী ভূমিকা ও টিপ্পনী সহ সম্পাদিত।

কাব্যপ্রকাশ ১২৲

মম্মট ভট্ট কৃত সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত অলঙ্কার-গ্রন্থ। মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের 'আদর্শ' নামক টীকা, শ্রীযুক্ত এস কে দে, এম্-এ, ডি-লিট্ লিখিত ইংরাজি ভূমিকা ও শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর, এম্-এ, পি-এইচ-ডি লিখিত ইংরাজি 'অ্যানালিসি' সহ।

মাতৃকাভেদতন্ত্র ২৷৷০

ইংরাজি ভূমিকা সহ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সপ্তপদার্থী ৫৲

শিবাদিত্য কৃত। বৈশেষিক দর্শন-সম্মত পদার্থ নিরূপণের গ্রন্থ। মিতভাষিণী, পদার্থ-চন্দ্রিকা, বলভদ্র-সন্দর্ভ, ইংরাজি ভূমিকা ইত্যাদি সহ।

ন্যায়ামৃত-অদ্বৈতসিদ্ধি ১৫৲

বেদান্ত-গ্রন্থ। সাতটী টীকা এবং ইংরাজি ও সংস্কৃত ভূমিকা প্রভৃতি সহ। সাক্ষিবাধ-বিচার পর্যন্ত, প্রথম খণ্ড।

ডাকার্ণব ৬৷০

বৌদ্ধতন্ত্র। ইংরাজি ভূমিকা সহ। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্-এ, পি-এইচ-ডি সম্পাদিত।

অধ্যাত্মরামায়ণ—২ খণ্ড ১৫৲

নবোত্তম ও গোপাল চক্রবর্ত্তীর টীকা, টিপ্পনী, ইংরাজি ভূমিকাদি সহ।

কুমারসম্ভব ২৷৷০

মল্লিনাথ কৃত টীকা, ভরত মল্লিক, নাথ ও নারায়ণ কৃত টীকার সারাংশ, অন্বয়, বাচ্যান্তর, বাংলা ও হিন্দি অনুবাদ সহ।

ছন্দোমঞ্জরী ২৲

সংস্কৃত পরীক্ষায় পাঠ্য—ছন্দ-বিষয়ক প্রামাণিক গ্রন্থ। টীকা ও অনুবাদ ইত্যাদি।

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী ২৲

বাচস্পতি মিশ্র কৃত। অপ্রকাশিত 'সাংখ্য-তত্ত্ববিলাস' গ্রন্থের উপোদ্ঘাত প্রকরণ সহ।

যুক্তিদীপিকা ৬৷০

অপ্রকাশিতপূর্ব্ব সাংখ্যগ্রন্থ। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, এম্-এ, সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

ন্যায়দর্শন—২য় খণ্ড ৮৲

বাৎস্যায়ন ভাষ্য, উদ্দ্যোতকরের বার্ত্তিক, বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্য্য-টীকা, বিশ্বনাথ বৃত্তি ও টিপ্পনী সহ। ৪ ও ৫ অধ্যায়।

শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি ১৬৷০

পূর্ণানন্দ পরমহংস কৃত অপ্রকাশিত তন্ত্র-গ্রন্থ। ইংরাজি ভূমিকাদি সহ।

চতুরঙ্গদীপিকা ৩৸০

শূলপাণি কৃত দ্যূতক্রীড়া-বিষয়ক গ্রন্থ। ইংরাজি ভূমিকা ও অনুবাদ সহ।

নন্দিকেশ্বর-কাশিকা ৷৷০

(মূলমাত্র)।

প্রাসাদমণ্ডনম্ ১০৲

সূত্রধর-মণ্ডন কৃত প্রাসাদমণ্ডন ও রাজবল্লভমণ্ডন নামক বাস্তু ও গৃহনির্ম্মাণ-বিষয়ক শিল্পশাস্ত্রীয় দুইখানি গ্রন্থ একত্র।

রঘুবংশম্ (হিন্দি অনুবাদ) ১৲

কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ

মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস্ লিঃ

৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা-১৪
টেলিফোন: সিটি ১৩০৭

হেড অফিস—৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩
টেলিফোন: সিটি ১৩০১

দিনের শেষে

[ফোটো—শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

CENTRAL LIBRARY
UNIVERSITY

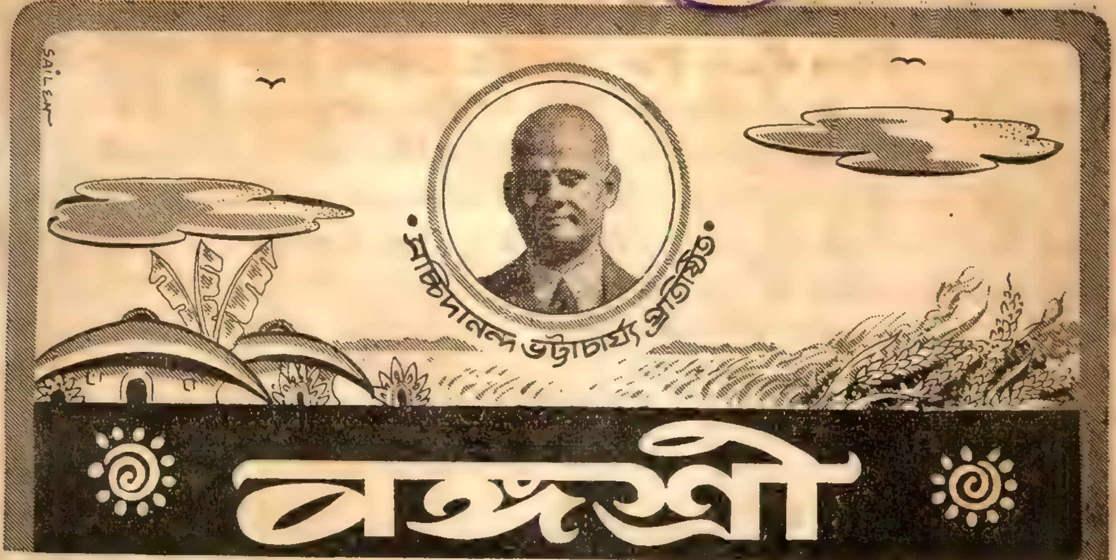

বিংশ বর্ষ | কার্ত্তিক—১৩৫৯ | ১ম খণ্ড—৫ম সংখ্যা

সভ্যতার উৎস-সন্ধানে

শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল

কল্পনা করা যাক—একশ' বছরেরও আগেকার কলকাতারই এক মানুষ হঠাৎ পুনর্জ্জীবন লাভ করে এখানেই ফিরে এসেছে। এক অদৃশ্য শক্তি তাকে নামিয়ে দিয়ে গেছে এখানকার একটা বড় রাস্তার মোড়ে। কানে কানে বলে দিয়ে গেছে, এই হলো সেই কলকাতা যা মৃত্যুর আগে ছিল তোমার প্রিয়তম ভূমি আর মৃত্যুর সময়ও যাকে ছেড়ে যেতে তোমার ছিল কি তীব্রই না অনিচ্ছা।

অট্টালিকার অরণ্যে-ঘেরা নগরীর সেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানুষটীর কি মনে হবে? সে নিশ্চয়ই ভাববে অদৃশ্যশক্তি তার সঙ্গে করে গেছে নিতান্তই একটা বিশুদ্ধ রসিকতা। কালো কয়লার মত পীচে ঢাকা সুমসৃণ রাস্তা, অতি ব্যস্ত অফুরন্ত মানুষ, গাড়ী, ঘোড়া, ট্রাম, বাস, মোটর, লরী আর সম্প্রতি আমদানী করা নানা অদ্ভুত চেহারার জঙ্গী যান বহন – এর মধ্যে দাঁড়িয়ে তার পূর্ব্বাভ্যস্ত গতিমন্থর মন নিশ্চয়ই হাঁপিয়ে উঠবে। মাথার উপরে এরোপ্লেন আকাশের বুকে পাখা ঝাঁপটিয়ে গোঁ করে উড়ে চলে যাবে, ঘরে ঘরে, এমন কি ধাবমান মোটরেও রেডিওর কণ্ঠে বেজে উঠবে শ্রাব্য-অশ্রাব্য নানা ধ্বনির তরঙ্গ। মানুষটি হতভম্ব চোখে সেই অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে বৃথাই খুঁজে মরবে কৈশোর, যৌবন আর বার্দ্ধক্যের শত স্মৃতি বিজড়িত, অতি পরিচয়ের চিহ্ন আঁকা তার বাসভূমি কলকাতাকে। এ যে এক অজানা নূতন গ্রহ নয়, তার কলকাতারই বিচিত্র সাজসজ্জা-পরা এক নূতন রূপ, অবুঝ মনকে একথা বোঝাতে তার বেশ খানিকটা সময় কেটে যাবে। বোঝানো আদৌ সম্ভব হবে কি না তাই বা কে জানে।

কিন্তু কেন? এই যে একশ' বছরের মধ্যে সমস্ত পরিমণ্ডলের এই আমূল পরিবর্ত্তন, এই যে বিদ্যুৎ বাষ্প

আরও কত কিছুকে নিয়ে বিজ্ঞানের এই যাদু খেলা, যার প্রভাব পড়েছে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে, প্রতি মুহূর্ত্তের কাজে কর্ম্মে, তা সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের সহায়-পুষ্ট যান্ত্রিক শক্তির কল্যাণে। এই যান্ত্রিক বিপ্লব যে মানুষের জীবনে আচরণে এমন কি তার মানসিকতায়ও কি বিপুল পরিবর্ত্তন এনেছে, এ যুগে বাস করে আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ রূপে তা উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। তাই কল্পনা করে নিতে হয়েছে প্রাগ্‌যন্ত্র-যুগের এক মানুষ যার জীবন প্রবাহ ছিল মৃদুগামী, অভাববোধের তীব্রতা ছিল মন্দতর। এ রকম মানুষের সত্যই যদি আজকের পৃথিবীতে আসা সম্ভব হতো, তবে তার পক্ষেই শুধু সম্ভাবনা থাকতো এই রূপান্তরের আয়তন ও প্রকৃতির তুলনামূলক ভাবে পরিমাপ করার।

কিন্তু এই উভয় কালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলেও পুঁথি পত্তরের সাহায্যে আমরা এ দু'যুগের পার্থক্য খানিকটা ধারণা করতে যে না পারি তা নয়। তা থেকেই বুঝতে পারি, এ পরিবর্ত্তন যে শুধু ভারে বড় তাই নয়, এর ধারও সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। সাধু ভাষায় বলা চলে বৈপ্লবিক।

মানুষের সভ্যতা এই রকম ছোট বড় নানা বিপ্লবের ভিতর দিয়েই অগ্রসর হয়ে চলেছে, আর তাতেই হচ্ছে সভ্যতার কম-বেশী রূপবদল। ওজন করে বলতে গেলে, যান্ত্রিক বিপ্লবের মত, হয় তো তার চেয়েও বড় পরিবর্ত্তন ঘটেছিল মানুষের জীবনে আর একবার। সে হল যখন মানুষ শিখলো উদ্ভিদ্‌পালন বা কৃষিবিদ্যা আর তারই আনুষঙ্গিক ভাবে পশু পালন। অনেক পণ্ডিত অবশ্য বলেন যে মানুষগুলো কৃষিবিদ্যার উদ্ভাবন করলো, পশুপালনও যে তাদেরই উদ্ভাবন তা মনে করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। আলাদা আলাদা জায়গায় স্বাধীনভাবে হয়েছে এই উভয় বিদ্যার উদ্ভাবন, পরে প্রয়োজনের তাগিদে হয়েছে তাদের সংযোগ। সে যা হোক, কৃষিবিদ্যার উদ্ভাবনে মানুষের যে নতুন জীবনের সূত্রপাত হল, তা শুধু তার জীবনের সূত্রপাতই নয়, সভ্যতারও গোড়াপত্তন বটে। বস্তুতঃ আজ আমরা সভ্যতা বলতে যা বুঝি তার সূচনা হয়েছিল তখনই যখন যাযাবর মানুষকে এই অভিনব উদ্ভাবনের ফলে ঘর বাঁধতে হয়েছিল। সেদিন থেকে আরম্ভ করে মনুষ্যের যা পরিবর্ত্তন এসেছে তা সিঁড়ির পর সিঁড়ি অতিক্রম করার ইতিহাস মাত্র। সে সিঁড়ি অতিক্রম করার মধ্যে হয়তো বৈচিত্র্য আছে। কখনও এক এক করে ধীর পদপাতে সিঁড়ি ভেঙ্গে সে এগিয়েছে, কখনও বা অনেকগুলো সিঁড়ি একলাফে সে পিছু ফেলে চলে গেছে। কিন্তু যাযাবরত্বে সে আর ফেরেনি, কৃষিকে পরিহার করে অন্য-ভাবে সভ্যতার মোড় ফেরানোও তার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। সমবিত্তভোগী আদিম সমাজ থেকে আরম্ভ করে দাস সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, ধনতান্ত্রিক সমাজ, সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রভৃতি সমাজ-জীবনের নানা শ্রেণী-বিভাগ সমাজবিজ্ঞানী করেছেন। কিন্তু তার সবই মানুষের ঐ কৃষিসভ্যতারই সম্প্রসারণ মাত্র, তারই বিবর্ত্তনের ইতিহাস।

আজ সুপুষ্ট ধান আর সুপরিণত গোধূমজাত খাদ্য খেয়ে আমাদের এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক যে ওদের এই রূপ শুধু আজ নয়, আবহমান কালই চলে এসেছে। আর সত্যি সত্যি এ ধারণা কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও যে মানুষের না ছিল তা নয়। এর পেছনে যে মানুষের কত সযত্ন সাধনার ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তা আজ আমরা খুব সহজেই ভুলে আছি। আজকের ধান বা গমের পূর্ব্ব-পুরুষদের সাক্ষাৎ আজ যদি হঠাৎ আমাদের মিলে যায়, তাহলে তাদের যে সহসা এদের পূর্ব্বপুরুষ বলে চিনতে পারবো তার সম্ভাবনা খুবই কম। শুধু ধান গম কেন, কৃষিজাত যে কোন জিনিষ সম্বন্ধেই বোধ হয় এ কথা বলা চলে। কিন্তু শুধু পরিণতির কথাই বা কেন, কোন কোন ঘাস যা বনে জঙ্গলে আপনা আপনি জন্মায়, মাটি চষে বুনলে তাদের ফলন যে হয় অনেক গুণ বেশী, আর তা হতে পারে মানুষের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য, এ আবিষ্কারেরও কি গুরুত্ব কম! এই আবিষ্কারই তো দিয়েছে মানুষের সমস্ত জীবনটাকেই উল্টেপাল্টে। খাদ্যের সন্ধানে পশুর পিছু পিছু বিচরণশীল যাযাবর মানুষকে যাযাবরত্বের জন্যই তার জীবনের প্রয়োজনকে যথাসাধ্য কমিয়ে রাখতে হয়েছিল। কিন্তু মানুষ যেদিন কৃষিবিদ্যার চাবিকাঠিটি

খুঁজে পেয়ে স্থির হয়ে বসলো সেইদিন থেকেই হল তার এই বস্তুবহুল সভ্যতার অভিযান আরম্ভ। জনৈক বৈজ্ঞানিক বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছেন—"...it is the grain-growers only that made any real advance in material civilisation. All our evidence goes to show that to them is due the potter's art, and the knowledge of metals, the beginnings of writing, architecture and of trade." অর্থাৎ শস্য-উৎপাদনকারীরাই সভ্যতাকে সত্যি সত্যি এগিয়ে নিয়ে গেছে। যা কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে তার সবগুলো থেকেই জানা যায় যে, মৃৎপাত্র নির্ম্মাণবিদ্যা, ধাতু ব্যবহারের জ্ঞান, লিপিবিদ্যা, স্থপতি বিদ্যা এবং বাণিজ্য বিদ্যা—এ সব কিছুর জন্যই আমরা তাদের কাছে ঋণী। কাজেই এই কৃষির আদি কথার সঙ্গে সভ্যতার আদি কথাও যে ওতপ্রোত ভাবেই জড়িত, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। এ যদি আজ সঠিক ভাবে খুঁজে বের করা যায় কৃষির আদি জন্মস্থান কোথায় ছিল, তা হ'লে সভ্যতার গোড়া-পত্তনও যে কোথায় হয়েছিল সে প্রশ্নেরও জবাব মিলে যাবে।

মানুষের অনুসন্ধিৎসা তার জীবনের আদি ধাপগুলোকে খুঁজে বের করবার জন্য কত বিদ্যারই না উদ্ভাবন করেছে। নৃতত্ব, জীববিজ্ঞান, ভূতত্ব, ইতিহাস, ভাষাতত্ব, শিল্প-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যার এক লক্ষ্য এই ধারাগুলোরই গতি-রেখার সন্ধান করা। খুব বেশীদিনের কথা নয়, কৃষির আদিতত্ত্ব অনুসন্ধানেও মানুষ মেতেছে ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে অর্থাৎ তার আদি কথার বইখানাতে একটি নূতন পাতা সংযোজনের জন্যে। মানুষের এই আদিকথা জানার সাধনা শুধু বুদ্ধির বিলাসমাত্র নয়, তার বর্ত্তমানকে বোঝবার জন্যই অতীতকে এইভাবে জানার তার প্রয়োজন। শুধু বর্ত্তমানই বা কেন, মানুষের বিবর্ত্তনের ধারার একটা নির্ভরযোগ্য খসড়া খাড়া করতে পারলে ভবিষ্যতের একটা রেখাচিত্র তৈরীর কাজও তার পক্ষে অনেক সহজ হয়ে পড়ে। তা ছাড়া বহু পথে একের সন্ধানের সুবিধা এই যে, একের সাহায্যে আর এককে যাচাই করে নেওয়া চলে—এক বিদ্যার ভুল ত্রুটি অন্য বিদ্যার সাহায্যে সংশোধিত হয়ে বহু বিদ্যার সংযোগে এক সম্পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সৃষ্টির সহায়তা করে। কাজেই কৃষির আদিকথা আবিষ্কারের পথে সভ্যতার ইতিহাসের এই যে অনুসন্ধান, নূতন হলেও গুরুত্ব এর কোন বিদ্যার চেয়েই কম নয়।

এ কথা বোঝা বোধ হয় খুব শক্ত নয় যে, কৃষির গোড়াপত্তন যেখানেই হয়ে থাক, তা এমন একটা জায়গায় নিশ্চয়ই হয়েছিল যেখানে বর্ত্তমান পুষ্ট শস্যের পূর্ব্বপুরুষেরা জঙ্গলা অবস্থায় আগে থেকেই জন্মাত। এ কথা যদি আমরা মেনে নিই তা হলে সরাসরি আরও একটা গুরু সিদ্ধান্তে গিয়ে আমরা পৌছুতে পারি। সেটা হল এই যে, সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল তেমনি এক জায়গায় যেখানে খাদ্যশস্যের পূর্ব্বপুরুষদের বন্য ভাবে জন্মানো সম্ভব ছিল। অর্থাৎ যাঁরা বলেন সভ্যতার পত্তন হয়েছিল বাল্‌টিক সাগরের তীরে অথবা উল্লেখ করেন এমন কোন জায়গার কথা যেখানকার জলবায়ুর অবস্থাই এমন নয় যে সেখানে বন্য শস্য জন্মানো সম্ভব, তাঁদের কথাকে আমরা সহজেই ভিত্তিশূন্য বলে বাতিল করে দিতে পারি।

এখানে আরও একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। এ পর্য্যন্ত যা কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায় মানুষের কৃষিকার্য্যের স্বস্তিবাচন হয় খাদ্যশস্যকে নিয়ে অর্থাৎ শাকসব্জী বা ফলমূলের গাছ লালন করার আগে শস্য উৎপাদনেই তাদের হাত পাকিয়ে নিতে হয়েছিল। অবশ্য এই আদি শস্যটি যে কি সে সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছান নি। তবে তাঁরা অনুমান করেন যে, বাজরা বা চীনা জাতীয় এক শ্রেণীর তৃণই (panicum miliacium) হয়তো প্রথম শস্য যা নিয়ে মানুষের অতিদূর পূর্ব্বপুরুষদের কৃষিকার্য্যের সূচনা হয়েছিল।

মানুষ কর্ত্তৃক কৃষিকার্য্যের এই আদি সূচনার সন্ধান ইতিহাস, প্রত্নতত্ব বা ভাষাতত্ত্বের সাহায্যেও কতক পরিমাণে হতে পারে। কিন্তু উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের দিক থেকে এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতনভাবে অনুসন্ধানের একটা শাস্ত্র গড়ে উঠছে। আধুনিককালে উদ্ভিদ্ বিদ্যাবিদ্ রুশীয় অধ্যাপক ভ্যাভিলফের (Vaviloff) গবেষণাই এ সম্বন্ধে সব চেয়ে

বেশী উল্লেখযোগ্য। ভ্যাভিলফের আগে বৈজ্ঞানিক De condolle Willis প্রমুখ পণ্ডিতেরাও এ সম্বন্ধে অল্পাধিক গবেষণা করে গেছেন। কিন্তু উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের সাহায্যে যে এর একটা নির্ভরযোগ্য সমাধানের পথ পাওয়া যেতে পারে, বর্ত্তমানকালে অধ্যাপক ভ্যাভিলফই তার উপর খুব জোর দিয়েছেন এবং সেদিক দিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। অবশ্য প্রত্নতত্ত্বাদি বিদ্যার সাহায্যে ঐ গবেষণার যাচাই করাতে তিনি কোন আপত্তি তোলেন নি, বরং তা বাঞ্ছনীয় বলেই মত প্রকাশ করেছেন।

ভ্যাভিলফ হলেন সোভিয়েট ইউনিয়নের একটা উদ্ভিদ্‌ গবেষণাগারের পরিচালক। উত্তর হিমমণ্ডল তখন সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেখানে জন্মাতে পারে এবং তার আবহাওয়ায় টিকে থেকে ফলপ্রদ হতে পারে, এই রকমের গোল-আলুর চারার তাদের প্রয়োজন হল। প্রথম প্রথম রুশিয়াতেই তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চললো। কিন্তু তাতে ফল না হওয়াতে গোল আলু যেখানে প্রথম উৎপাদিত হয়, পেরুর (Peru) অন্তর্গত সেই অ্যাণ্ডেস (Andes) ও বলিভিয়াতে (Boliva) একদল গবেষক প্রেরিত হলেন। তাঁরা গিয়ে দেখলেন বহু রকমের আলুর চারা ঐ জায়গাতে তো হচ্ছেই, তার কাছাকাছি ওদের বন্য জাতিরা এখনও বরফের কোল ঘেঁসে প্রচুর পরিমাণে জন্মাচ্ছে। অনুসন্ধানের ফলে তাঁরা তাঁদের প্রয়োজনানুরূপ গোল আলুর চারার সন্ধান তো পেলেনই, অধিকন্তু এই গবেষণাকালেই ভ্যাভিলফ একথা বুঝতে পারলেন যে, যে শস্যের যেখানে প্রথম চাষ হয়েছিল সেখানেই তার সমজাতীয় সব চেয়ে বেশী রকমের শস্য উৎপাদিত হওয়া সম্ভব। এর আগে De condolle প্রমুখ পণ্ডিতেরা মনে করতেন যে, যে জাতের শস্য যেখানে বন্য অবস্থায় জন্মায় সেখানেই তার আদি জন্ম স্থান। কিন্তু অধ্যাপক ভ্যাভিলফ এই মতের প্রতিবাদ করে পূর্ব্বোক্ত মতের উপরেই জোর দিয়েছেন।

অবশ্য তাঁর এই মতবাদ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্ব্বে যে অত্যন্ত সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে সে সম্বন্ধেও তিনি খুব সজাগ। স্থানবিশেষে কোন শস্যের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রকমের জাতের উৎপাদন যে অন্য কারণেও হতে পারে, তাও তিনি বলেছেন। সে কারণটি হল—যে জায়গায় নানা দিক থেকে বিভিন্ন সংস্কৃতির ও সভ্যতার সমাগম হয়েছে সেখানেও কোন শস্যের বহু সংখ্যক জাতির বসবাস করা সম্ভব। এই জন্যে তিনি এই রূপ অঞ্চলগুলোকে দু' শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—মুখ্য অঞ্চল (Primary region) ও গৌণ অঞ্চল (Secondary region)। মুখ্য অঞ্চল তিনি বলেছেন সেই অঞ্চলকে যাকে তিনি কোন শস্যের আদি উৎপাদন ভূমি বলে মনে করেন। আর বিভিন্ন সংস্কৃতির সমাগমে যেখানে কোন শস্যের বহু জাতির আমদানী হয়েছে, সে অঞ্চলগুলোকে তিনি অভিহিত করেছেন গৌণ অঞ্চল বলে।

অধ্যাপক ভ্যাভিলফ যবের (Wheat) সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক রকমারির সন্ধান পেয়েছেন আবিসিনিয়াতে ও দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়াতে। গম (Wheat) সম্বন্ধে তাঁর অনুসন্ধানের ফলও তিনি জানিয়েছেন। সে সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে গম সম্বন্ধে দু'একটা কথা মনে রাখা উচিত। উদ্ভিদবিজ্ঞানের দিক থেকে গমের প্রজাতি ও শ্রেণী নির্ণয় এক অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। এখানে শুধু এই কথা মনে রাখলেই চলবে যে, তাঁরা গমকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন—আইনকর্ণ (Einkorn), এমার (Emmer) ও ব্রেড হুইট (Bread wheat)। আইনকর্ণের পুষ্টিকারিতা অত্যন্ত কম, আকারও খুব ছোট। এমার আইনকর্ণ থেকে একটু উন্নততর। এখন যে সব ভাল গম আমরা সচরাচর দেখি তার প্রায় সবই ব্রেড হুইট জাতীয়। ভ্যাভিলফের মতে এশিয়া মাইনরেই প্রথম আইনকর্ণ জাতীয় গমের চাষ হয়েছিল। এমার জাতীয় গমের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রকমারির চাষ হয় ভূমধ্য সাগরের তীরে, বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকার উপকূলে। আর হয় আবিসিনিয়া, আলজেরিয়া আর গ্রীসে। ব্রেড হুইট নামে যে গম পরিচিত তার সব চেয়ে বেশী সংখ্যক রকমের সন্ধান পেয়েছেন তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়াতে। তিনি আরও নির্দ্দিষ্ট করে বলেছেন যে, পূর্ব্ব-আফগানিস্থানেই তিনি ওর সন্ধান পেয়েছেন সব চেয়ে বেশী। এখানে তিনি যত রকমের গম উৎপাদিত হতে দেখেছেন, তার সংখ্যা ষাটের কম নয়। পারস্যে তিনি সন্ধান

পেয়েছেন ৫২ রকমের আর সমগ্র ইউরোপে পেয়েছেন মাত্র ২০ রকমের। ট্র্যান্স্‌ককেশিয়াতে তিনি যে কয় রকমের সন্ধান পেয়েছেন তার সংখ্যা পারস্যের চেয়ে কম, কিন্তু ইউরোপের থেকে অনেক বেশী। কাজেই তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ব্রেড হুইট জাতীয় গমের আদি জন্মভূমি আফগানিস্থান বা ওরই নিকটতম কোন ভূখণ্ড। অধ্যাপক ভ্যাভিলফ মনে করেন যে, ট্র্যান্স্‌ককেশিয়াতে তুরস্ক ও আরমেনিয়া—এই উভয় স্থান থেকে সভ্যতার আমদানী হয়েছিল। কাজেই ঐ স্থানে ব্রেড হুইট জাতীয় গমের এত রকমারির সন্ধান পাওয়া যায়। সেইজন্য এই অঞ্চলকে তিনি তাঁর সংজ্ঞা অনুসারে গৌণ অঞ্চল বলে মনে করেন।

এইভাবে নানা শস্য নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। পূর্ব্বেই বলেছি ঠিক প্রথম কোন শস্যটির যে চাষ হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে না এলে সভ্যতার প্রভবভূমি কোথায় তা নিশ্চয় করে বলা চলবে না। তবে বহু শস্যের পরীক্ষার ফল একত্র করে একটা সিদ্ধান্তে তাঁরা এসেছেন। সেটা হল এই যে, কৃষিকার্য্যের গোড়াপত্তন হয়েছিল পার্ব্বত্য অঞ্চলে দলবদ্ধ মানুষের দ্বারা। সে দলগুলিও খুব বড় ছিলনা। অতএব পার্ব্বত্য অঞ্চলেই যে সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছিল এ থেকে আমরা সে সিদ্ধান্তেও আসতে পারি। তারাই বা তাদের সন্তানসন্ততিরা পরে নেমে আসে সিন্ধু নীল বা ইউফ্রেতিসের তীরভূমিতে। অবশ্য উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সাহায্যে যে সিদ্ধান্তেই পৌছানো যাক না কেন, অন্যান্য বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যাও যদি নানা দিক দিয়ে সেইখানেই এসে পৌছায় তবেই কেবল ও সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া সম্ভব।

কিন্তু সে রকম কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এখনও পৌছান সম্ভব হয় নি, অন্যান্য দেশের সব বৈজ্ঞানিক এখনও অকুণ্ঠভাবে অধ্যাপক ভ্যাভিলফের মত মেনেও নেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞানের সাহায্যে সভ্যতার উৎস-সন্ধানের এই নববিদ্যার প্রসার ও পরিপুষ্টি জ্ঞানপিপাসু মাত্রেই অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সঙ্গেই অনুধাবন করবেন বলে আমরা মনে করি।

উপসংহারে উল্লেখ করা ভাল যে, প্রত্ন-তত্ত্বাদির সাহায্যেও কৃষির তথা সভ্যতার আদিভূমি সন্ধানের প্রচেষ্টা বহু আগে থেকেই চলেছে। আমরা শুধু প্রতীক্ষা করবো সেই শুভদিনের যেদিন বিবিধ বিদ্যার আহৃত জ্ঞান সংশ্লেষণের ফলে আমরা প্রকৃত তত্ত্বে গিয়ে পৌছুতে পারবো।

মেঘলা দিনে

শ্রীসুধীর গুপ্ত

শ্যাম-শোভা-স্নিগ্ধ দিন, শান্ত শূন্যলোক ;
বসুধা নিবিষ্ট ধ্যানে ; যেন দুটি চোখ
গভীর প্রশান্তি ভরে রয়েছে মুদিত ;—
বস্তু-লোক পার হ'য়ে বস্তুর অতীত
অনন্ত ভাবের দেশে লয়েছে আশ্রয় ;
বন্ধন-বিমুক্ত বুঝি হয়েছে হৃদয়।

মনে পড়ে রামগিরি শৈল-সানুদেশে
'মেঘদূত' নিখিলের মর্ম্মের সন্দেশে
'অলকার' অবরোধ করিল মোচন ;
শাপ-দগ্ধ বিরহীরে শাশ্বত স্বপন
দেখালো এমন দিনে ; চির-বৃন্দাবনে
চির-প্রেম রূপ নিল শিল্পীর স্বপনে ;

আমারও মনের মিতা মেঘ-নিশিথিনী
মন-রাধিকারে তাই করে পাগলিনী।

পুতুল

শ্রীবিমলকুমার ঘোষ

আয়নায় মুখ দেখল কল্পনা।

স্নো উঠে গেছে, আর একবার পাফটাও বুলিয়ে নিলে। কাপড় ছেড়ে আকাশী রঙের শাড়ীটা পরে বাথরুমে যেতে হবে। সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে—আরও একবার প্রসাধন করতে রাত্রি আটটা বেজে যাবে।

রাত্রি দিনে চব্বিশ ঘণ্টা ঐ একই কাজ কল্পনার। রণেনের কোন সময় চোখে পড়ে, কিংবা পড়ে না—সেজন্য ব্যস্ত হয় না কল্পনা। রণেন ঝড়ের গতিতে ঘরে আসে; কল্পনার দিকে না চেয়েই বলে—"চাবিটা দাও তো একবার—"

কল্পনা সাড়া পেয়ে আরও মনোযোগী হয়ে ওঠে প্রসাধনে—আয়নায় মুখ রেখে গুণ্ গুণ্ করে এক কলি গানও সে ধরে এবং মুখ না ফিরিয়েই আঁচল থেকে চাবির গোছা খুলে পিছন দিকে ফেলে দেয়।

রণেন টাকা নিয়ে বেরিয়ে যায়। কোনদিন হয় তো বলে—"স্ত্রী হিসেবে তুমি কিন্তু আদর্শ কল্পনা—"

কল্পনা আঙ্গুলের ডগায় স্নো সমেত মুখ ফেরায়—"তার মানে?"

"এই ত্যাখো না—অন্য কোন স্ত্রী হলে এতক্ষণে কৈফিয়ৎ দাও—টাকা দিয়ে কি হবে—কত টাকা নিচ্ছি—"

"ওঃ"—কল্পনা আবার আয়নায় মুখ রাখে।

"শোন টাকাটা নিচ্ছি কেন—তোমাকে বলেই যাই; মিসেস্ চক্রবর্ত্তী ধরেছেন ওদের মহিলা সংহতির মেয়েরা ডায়মণ্ড হারবারে পিক্‌নিকে যাবে—আমাকেও কিছু চাঁদা দিতে হবে, এই আর কি—

—ধন্যবাদ—

কল্পনার ধন্যবাদ শোনার জন্য রণেন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেনি।

ইউনিভার্সিটি থেকে এম্. এ. পাশ করে একটি চাকরীর আশাই করেছিল কল্পনা। বাবার আর্থিক অবস্থার জন্য এ চিন্তা তার যুক্তিসঙ্গতও বটে—কিন্তু কি ভাবে যেন সব ওলটপালট হয়ে গেল।

কলকাতার পরে কোন এক ডাক-সাইটে বনেদী বংশের ছেলে রণেন। সাতপুরুষের আপ্রাণ সঞ্চিত অর্থের ব্যয় এবং অপব্যয় করবার অধিকার সে পেয়েছে। কলকাতার পরে অতবড় বাড়ীখানা সাজিয়ে রেখেছে শুধু দুষ্প্রাপ্য বিলাস বস্তুতে। যেদিন শ্যামবাজারে কোন আত্মীয় বাড়ীতে কল্পনার সাথে পরিচয় হ'ল তার—সেদিন বাড়ী এসে চিন্তা করেছিল—

গৃহসজ্জায় একটুখানি খুঁত রয়ে গেছে এবং তা পূরণ করতে হলে ঐ কল্পনাকেই প্রয়োজন।

কল্পনার বাবা মার্চ্চেণ্ট অফিসের আশী টাকার কেরাণী, অত্যন্ত সহজেই রাজী হয়ে গেলেন। রণেনের বংশমর্য্যাদা আর আর্থিক কিংবদন্তীর মধ্যে এমনি একটি মোহ ছিল—যা এম, এ পাশ করে কল্পনাও অবহেলা করতে পারেনি।

গৃহসজ্জাই বটে। রণেন বিয়ে করে শুধু পাগলের মত—শাড়ী, গয়না আর সৌখীন দ্রব্যেই ঘরে ভরে তুলল। কল্পনাকে কোন সময় সজ্জাহীন অবস্থায় দেখলে অনুযোগ করত। শাড়ী গয়না সে প্রায়ই কেনে—নতুন ডিজাইন বাজারে বের হলে—তা কিনতেই হবে কল্পনার জন্য।

কিন্তু কল্পনার পক্ষে এ সবই দুঃসহ। রণেন এবং কল্পনার মধ্যে ব্যবধান শুধু ঐ মহিলা সংহতি। প্রায় রাত্তিরেই সে বাড়ী ফেরে না। মহিলা সংহতির কোন বিশেষ সভ্যার বাড়ী নেমন্তন্ন থাকে প্রায়ই এবং বাকী রাতটাও সে সেখানে কাটিয়ে আসে।

মাঝ রাতে চাঁদের আলোর বন্যা এসে সমস্ত ঘরখানা ভরে তোলে; তখন একা একা কল্পনার বিছানায় শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে না। শাড়ী, গয়নাগুলোর সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করে সারা রাত। প্রথম প্রথম অভিমান

করত কল্পনা। রণেন অবাক হয়ে যেত, তারপর কোমল সুরে জিজ্ঞাসা করতো—তোমার কি চাই বল—শাড়ী—না গয়না—

"দড়ি—একগাছি দড়ি গলায় দেব—"

রণেন আর কথা বলে না—কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়ে।

মহিলা সংহতির প্রায় সমস্ত সভ্যা মিলে রণেনের নীচের ঘরে জটলা করছিল, সহসা রণেনের কলেজের বন্ধু গৌরীপ্রসাদ এসে উপস্থিত স্ত্রী ইভাকে সঙ্গে নিয়ে।

—আরে, গৌরী তুই—

খুব যে অবাক হয়ে গেলি—একা আমি নাকি?

তাই তো দেখছি—

গৌরীপ্রসাদ বলে—ইভা, এ আমার কলেজের বন্ধু রণেন।

ইভা মৃদু হেসে নমস্কার জানায়—ওর কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি, কতদিন করে বলে বলে আজ এলাম—

গৌরীপ্রসাদ ততক্ষণ ঘরখানা ঘুরে ঘুরে দেখে নিয়ে রণেনের রুচির প্রশংসা করে—বাঃ ঘরখানা যা সাজিয়েছিস্!

ঘরের প্রশংসা শুনে যেন কি মনে পড়ে গেল রণেনের—ওঃ তোকে একটা "জিনিষ" দেখাইনি, চল ওপরে—

প্রসাধনরতা কল্পনাকে দেখিয়ে রণেন বলে, "আমার স্ত্রী কল্পনা—গত বছর এম. এ পাশ করেছে—"

ইভা খুসীতে ভরে ওঠে। পরিচয়ের অপেক্ষা না রেখেই কল্পনার সাথে আলাপ সুরু করে দিল।

গৌরীপ্রসাদ বলে—নীচে যারা বসে রয়েছেন ওরা?

রণেন সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিল।

নিজের হাতে চা তৈরী করে কল্পনা। ইভা পাশে বসে বলে—যাই বলুন এত সাজানো গোছানো বাড়ী কিন্তু ভাল লাগে না—একটা ছোট্ট দুষ্টু খোকা ভাঙ্গবে—ফেলবে।

কল্পনা বলে—দেব কিন্তু গাল টিপে—

একটি চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাসও পড়ে তার। আসন্ন মাতৃত্বের আনন্দে ভরপুর ইভার তা নজরে পড়ে না।

"একটি ছোট্ট খোকা—

জ্যোৎস্না রাতের নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তগুলো মনে পড়ে বেশী করে। সামনের চাঁপা গাছের পরে একটি কোকিল অধীর আবেগে ডাকছিল বার বার।

"সেতার বাজাতে জানেন নাকি"—ইভা কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

"জানি আর কই—যখন ইচ্ছে হয় টুং টাং করি বসে বসে—"

ইভা অনুযোগ করে—শিখবেন তো ভাল করেই শিখুন, না হয় তো মাষ্টার রাখুন—

রণেন বলে, "বেশ তো দিন না ঠিক করে—ওর তো কাজ নেই কিছু—

ইভা বলে—আমার এক মাসতুতো ভাই আছে—পাঠিয়ে দেব, মাষ্টার রাখাতে রণেনই উৎসাহী বেশী। যখন শুনল ছেলেটি ভাল সেতার বাজায় এবং অবিবাহিত তখন উৎসাহ দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছায় পরিণত হ'ল—

কল্পনার মুখ ভার করা অসহ্য হয়ে উঠেছে।

ছেলেটি লাজুক, অর্থের প্রয়োজনেই সেতার শেখাতে হয়। সেতার শেখানোতে অত্যন্ত মনোযোগী। বরঞ্চ কল্পনাই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সময়ে সময়ে। পরিপূর্ণ যৌবন দীপ্তি মনোজের চোখে মুখে ভাসে।

কল্পনা বলে—থাক মাষ্টারমশাই আজ আর মন নেই, তার চেয়ে গল্প করুন।

—মন তো কোনদিনই দিতে পারেন না আপনি—মনোজ অনুযোগ করে—এভাবে কিন্তু সেতার শেখা যায় না।

কল্পনা বলে—আপনার আর কে আছে?

—মা আছেন, দুটি বোন কলেজে পড়ছে—তাইতো টিউশনি করতে হয়—রেডিওতে যা পাই তাতে চলে না ইত্যাদি—

অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে কল্পনা। এসব জানতে চায় না। সে নিজেও মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে—তার একদিন ইচ্ছে ছিল এম্-এ পাশ করে চাকরী করবে—বাবার সাহায্য করবে।

কল্পনা জানতে চায় না। জানাতে চায়। জানাতে চায়—সে বড় নিঃসঙ্গ। এই সেতার শেখা বৃথা। চাঁপার কলির মত আঙ্গুলে ঝংকার তোলা সেতার শুনে কেউ তারিফ করবে না। পড়ন্ত বেলার রোদে এলো চুলে জানালার কাছে দাঁড়ালে কেউ পিছন থেকে এসে চোখ টিপে ধরে না। তার এই সযত্ন শোভিত মুখের দিকে কেউ ফিরে তাকায় না। যে অনুযোগ কল্পনার মনে গুমরে মরে, তার বোঝা সে মনোজের কাঁধেই চাপাতে চায়। শুধু কি সেতারই শেখাবে সে?

—বাঃ, আকাশী রঙের শাড়ীখানায় বেশ মানিয়েছে তো আপনাকে! একথা মনোজ কি কোনদিন বলতে পারে না ইচ্ছে করলে? কিংবা একগুচ্ছ বেলফুল এনে যদি বলে "কিছু মনে করবেন না, এই ফুল কটী আপনার চুলে পরলে—কথা শেষ করবে না—শেষের দিকে জড়িয়ে জড়িয়ে হাসবে। কতই বা দাম।

মনোজ বলে—একদিন সেতার শিখিয়ে যাওয়ার সময় মাটীর দিকে চেয়ে আমতা আমতা করে—"একটা কথা বলি"—কল্পনার বুক দুর দুর করে ওঠে আবেগে আর উত্তেজনায়। তার অন্তরাত্মা শতকণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে "আমি একটী কথাই শোনার জন্য অপেক্ষা করে আছি যে।"

মনোজ জড়িয়ে জড়িয়ে বলে—"রণেন বাবুকে বলবেন, এই মাসের টাকাটা যদি অ্যাডভান্স দেন তাহলে—

—ওঃ—বলব—কল্পনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শুধু।

সত্যই সেতার শিখতে মন নেই আর। একটা অবসাদ যেন সমস্ত দেহ মনে জুড়ে বসেছে কল্পনার। মনোজকে ছাড়িয়ে দেবে কি না ভাবছে!

মনোজ একদিন শাসনের সুরে বলে—শুনুন এবার বাজাচ্ছি—"রাগ কুকুভা", এ সুরের তাৎপর্য্য কি জানেন? রাত শেষ হয়ে এসেছে দীর্ঘ মিলনের শেষে—

আর বলতে পারে না মনোজ। লজ্জায় মুখ নত করে।

অত্যন্ত কৌতুহলী হয়ে ওঠে কল্পনা—বলুন—বলুন। তারপর বলতেই হয় মনোজকে—" মিলনের শেষে বিচ্ছেদ মুহূর্ত্ত এসেছে দয়িত দয়িতার, ভোরের পাখী ডাকছে। বেদনাবিহ্বল চোখ মেলে তাকিয়ে আছে উভয়ে উভয়ের দিকে।

সেতারে আঙ্গুল দিতেই কল্পনা মনোজের হাত চেপে ধরে উত্তেজনায় ও আবেগে—সে থরথর করে কাঁপছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে তার।

"কি হল আপনার—"

"কিছু হয়নি—এক ঝটকা মেরে উঠে গেল কল্পনা।

দরজার কাছে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে সে ধরা গলায়—তুমি কি পুতুল? বুকে স্পন্দন নেই তোমার?

পরদিন ড্রেসিং টেবিলে মুখে গুজে পড়ে ছিল কল্পনা। গত কালের ঐ ব্যাপারের পর যেন অবসাদ নেমে এসেছে সারা শরীর জুড়ে। মনোজের আসার সময় হয়েছে। আজ এলে তাকে পরিষ্কার বলে দিতে হবে—"আর দরকার নেই আসার—"

সহসা একখানি হাত তার পিঠে রাখল কেউ।

আমি পুতুল নই কল্পনা, শোন—মনোজ মৃদু হাসে।

আবেশে চোখ জড়িয়ে আসে কল্পনার। মনোজের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে বলে—কিন্তু অভিনয়টা করা হোত পুতুলের মতই—পুতুল আমিও নই—মন বলে আমারও একটা জিনিষ আছে।

নীচে গাড়ীবারান্দায় দাঁড়িয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে রণেন সহসা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। পাথরের মত একটা ভারী বোঝা তার বুক থেকে নেমে গেল আজ। কল্পনার মুখভার দেখতে হবে না তাকে। মাষ্টার রাখার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে আজ।

সে ভাবছিল ঐ কথা—কল্পনা পুতুল নয়—রক্তমাংসে গড়া মানুষই!

কথা ও সুর

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

কথা আগে—কি সুর আগে, এ-প্রশ্নই জাগে সকলের মনে কথা ও সুরের আলোচনায়। কেননা মানুষ সকল জিনিসের আদি বা গোড়াটাই জানতে চায় প্রথমে বাইরের বিকাশ দেখে। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা ছেড়ে দিলে এটাই স্বীকার করতে হয় যে, কথা আগে, সুর পরে। দর্শনকারেরা বলবেন—সুর বা শব্দ অনাদি অনন্ত, কারণ শব্দ স্ফোটই তার অধিষ্ঠান, স্ফোট শব্দব্রহ্ম, সুতরাং সুরের থাকাটাই আগে, পরে শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এ-সবের বিচার অতীব জটিল ও সূক্ষ্ম, তবে সাধারণভাবে ও সহজ কথায় বলা যায় যে, কথাও শব্দেরই গোষ্ঠীভুক্ত, ভাষা আগে সৃষ্টি হয় মানুষের সমাজে তার ভাবকে প্রকাশ করার জন্যে, তারপর সমাজের বিকাশ ও উন্নতির সাথে সাথে ভাষাকে সাজিয়ে বাক্য, পদ, গান, গাথা, স্তোত্র, স্তব, গ্রন্থ সব-কিছুর উৎপত্তি। বিশ্বসৃষ্টির গোড়ার দিকের বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট কোন ইতিহাস কোন জাতির এখনো তৈরী হয়নি বলেই আমাদের বিশ্বাস, তবে যতটুকু ইতিহাস আমাদের জানা আছে তা থেকে বলা যায়, প্রথমে মানুষের সম্পদ-হিসাবে ছিল তার কাছে ভাষা বা কথা, জীবনে নিত্য-নূতন অভিজ্ঞতার সাথে সাথে এলো আনন্দেরও অভিব্যক্তি, সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ও সমস্যা তার সামনে, সৃষ্টির মাধুর্য্য ও গাম্ভির্য্য অনুভব ক'রে কোন শক্তিমান বিশ্ব-নিয়ন্তার চিন্তা এলো তার জ্ঞানলিপ্সু মনে, তাঁর উদ্দেশে সে অন্তরের আবেদন ও কৃতজ্ঞতা জানালো সুরের সংযোগ দিয়ে ভাষা বা কথার মাধ্যমে, স্তব ও স্তোত্র হোল রচিত, এবং তা থেকেই এলো গানের রূপ। পাশ্চাত্য ও কোন কোন প্রাচ্য পণ্ডিতেরা এখানে অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভয় থেকে হয়েছে গানের সৃষ্টি, —'from fear the music originated in human society,' যেমন পণ্ডিত ক্রড্, টাইলর প্রভৃতি বলেছেন—Religion origines from fear,—ভয় থেকেই ধর্ম্ম-বিশ্বাসের হয়েছে উৎপত্তি। প্রকৃত-পক্ষে তাঁদের কথার পুরোপুরি সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না বটে, তবে বিরাটের কল্পনায় ব্যষ্টি মানুষের মনে ভক্তি-মিশ্রিত ভয় যে একেবারে থাকে না তাও ঠিক বলা যায় না, কিন্তু তাই বোলে নিছক ভয় থেকে গান বা ধর্ম্মের উৎপত্তি একথা জড়বাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া অন্য কিছু নয়।

সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরা গানের উৎপত্তি বলেছেন বেদ থেকে। অবশ্য বেদের মধ্যে ঋগ্বেদকেই বলি প্রাচীনতম সাহিত্য। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিকে ঋক্‌ছন্দেরই সমাবেশ বলা হয়। ঐ ছন্দগুলিকে আবৃত্তি করার জন্যে সুরের সহযোগিতা নিলে মানুষ, ঋক্‌মন্ত্র বা ঋক্‌মন্ত্রগুলিতে সুর অর্থাৎ স্বর যোজনা ক'রে সৃষ্টি করলে গান। এই গানই পরিচিত 'সামগান' নামে, আর এরকম ক'রেই সামবেদ বা সামগানগ্রন্থের হোল উৎপত্তি। সামগানেও ঋক্‌ছন্দ বা কথা ছিল আগে, পরে তাতে সুর অর্থাৎ স্বর দিয়ে সৃষ্টি করা হোল গান এবং গানের বা কথা ও সুরের গোড়ার কাহিনীই হোল এই।

সঙ্গীতে স্বরের ও রাগ-রাগিণীর যেমন ক্রমবিকাশ তথা ক্রমোন্নতির ইতিহাস আছে; ভাষা বা কথারও তাই। সৃষ্টির প্রভাত থেকে মানুষের মনে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে ভাবকে অভিব্যক্ত বা প্রকাশ করার জন্যে, সুতরাং ভাষা একটা ছিলই, কথা একটা ছিলই আদিম যুগ থেকে, কিন্তু সে ভাষা বা কথার আবার ক্রমবিকাশ হয়েছে সমাজে মানুষের বুদ্ধি, চিন্তা ও ভাবের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে। জলবায়ু ও দেশের বিভিন্ন গণ্ডীর পরিবেশ অনুসারে কথার মধ্যেও আবার 'বৈচিত্র্য' সৃষ্টি হয়েছে, তবে একথা সকল ভাষার পক্ষেই সত্যি যে, ভাবকে প্রকাশ করার জন্যেই তাদের উপযোগিতা, ভাষা বা কথা ভাবের বাহন

(vehicle), ভাষা ভাবের মাধ্যম (medium), স্বতরাং মন ও প্রাণের অস্তিত্ব বজায় রাখতে গেলে যেমন শরীরের প্রয়োজন হয়, সুর তথা স্বরের সমবেত রূপকে প্রাণবান করতে গেলে তেমনি ভাষা বা কথার দরকার ; কথা ও সুর স্বতরাং অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটীকে ছেড়ে অপরটী থাকতে পারে না।

অনেক সঙ্গীতশিল্পী হয়তো বলবেন—সঙ্গীত এমন একটী জিনিস যাতে সুরেরই প্রাধান্য কেন, সুরেরই একমাত্র উপযোগিতা, কথার চাহিদা গৌণ অথবা অপরিহার্য্য মোটেই নয়। তাঁদের মতে, স্বর কিংবা সুর সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতির অন্তর থেকে—music has been created from Nature, স্বতরাং শিল্পী সঙ্গীতকে প্রকাশ করবেন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও মহিমাকেই অভিনন্দন জানাবার জন্যে। স্বতরাং মানুষ সুরকে শুনুক বা না শুনুক, মানুষ সুরের মধ্যে আনন্দ পাক বা না পাক, সঙ্গীতের সাধক তা নিয়ে বিচার করবেন কেন ?

কিন্তু এ কথার উত্তরে আমরা বলি—সঙ্গীতের শিল্পী তাহলে কোথাকার মানুষ ? নিরাধার আকাশের—না দুঃখ-সুখভরা ও আদান-প্রদানের দরবার পৃথিবীর ? সমাজকে ও সমাজের মানুষকে বাদ দিয়ে নিশ্চয়ই শিল্পী তাঁর অস্তিত্বকে সপ্রমাণ করতে পারবেন না। প্রকৃতি এবং এমন কি ভগবানও কি সামাজিক মানুষকে ছেড়ে নিজেকে বজায় রাখতে পারেন ? সৃষ্টিকে অপেক্ষা ক'রেই তো স্রষ্টার উপযোগিতা ? সৃষ্টির প্রজা না থাকলে স্রষ্টার অস্তিত্ব ও স্রষ্টার মহিমা প্রমাণ ও প্রকাশ করবে কে ? স্বতরাং পৃথিবীর গণ্ডীকে ছেড়ে প্রকৃতিও থাকেন না, ভগবানও থাকেন না। সমাজবাসী মানুষের তাই সমাজের সঙ্গে সম্পর্কই নিবিড়, সমাজের আদান-প্রদানকে তার গোড়ার দিকে মেনে চল্‌তেই হবে, তারপর ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ, মানুষ, পৃথিবী, সৃষ্টি—এ সবকে অতিক্রম করার উঠবে প্রশ্ন, স্বতরাং তার আগে পর্য্যন্ত সামাজিক মানুষকে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির সঙ্গে তার ভাবের আদান-প্রদান চালাতেই হবে, এবং এই আদান-প্রদানের মাধ্যমই হোল ভাব ও ভাবের মাধ্যম ভাষা বা কথা, স্বতরাং পৃথিবীর মাটীতে অথবা সমাজের বুকে বাসা বেঁধে কোনদিনই কেউ বল্‌তে পারে না যে, ভাষার বা কথার মাধ্যমকে আমি চাই না, ভাষাহীন অস্ফুট ও অজানিত হবে আমার গতিবিধি ও আদান-প্রদান। কারণ তাই যদি হয় তবে সে-অবস্থার জন্যে অদ্বৈতবেদান্তের বাণীকেই আমাদের মাথায় পেতে নিতে হবে। অদ্বৈত বেদান্ত বলেছে—সব শেষের কথা হোল 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্', সেখানে কিনা চরম জ্ঞানের অবস্থায় বা চরম ব্রহ্মজ্ঞানের রাজ্যে বাক্যও নেই, মনও নেই ; 'কথাও নেই', ভাবও নেই। কিন্তু সে তো হোল সকল শেষের কথা, সাধারণ অবস্থায় এ সবের ভাণ করা তো ছল করা মাত্র। তাই সমাজে যতদিন পৃথিবীর জ্ঞান নিয়ে আমরা বাস করব, ততদিন মনকেও কথার উপযোগিতাকে মানতেই হবে। তাই শিল্পীর অনুশীলন ও আলোচনার জিনিস সঙ্গীতে থাকবে কথা ও সুর এ দুটীরই উপযোগিতা, একটিকে বাদ দিয়ে অপরটীর চাক্ষুষ আবেদন থাকবে না।

সঙ্গীতে আলাপের সৃষ্টি অনেক পরেকার যুগে হয়েছে। আমরা আলাপ ও আলপ্তি শব্দটীর নজির পাই অন্তত ছাপা বই জৈন-সঙ্গীতশাস্ত্রী পার্শ্বদেবের (খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর পর) 'সঙ্গীত সময়সার' গ্রন্থে। এর পরে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর গুণী শার্ঙ্গদেব তাঁর 'সঙ্গীতরত্নাকর' গ্রন্থেও এই দুটীর আলোচনা করেছেন রাগ ও রাগিণী, পুরুষ ও স্ত্রী এই প্রকৃতি দুটীকে বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করার জন্যে, আলাপচারী দেখাবার জন্যে নয়, কেননা সিংহ ভূপাল (১২২০ খৃঃ) ও কালিনাথ (১৪৪৬—১৪৫৬ খৃঃ) প্রভৃতি টীকাকারগণও বিশেষ ক'রে কালিনাথ এ কথাই স্পষ্ট ক'রে ব'লেছেন। স্বতরাং 'হরি ওঁ, ওঁ, তা-না নানা, তোম্ তেরি, নানা দেরে অর্থহীন শব্দগুলির সমাবেশে' রাগের আলাপের প্রবর্ত্তন হয়েছে মনে হয় মুসলমান রাজত্বের আমল থেকে তথা খৃষ্টীয় ১১শ—১৮ শতাব্দীর ভেতর। কিন্তু তাহলেও একথা কিন্তু শিল্পীরা অস্বীকার করতে পারবেন না যে, 'হরি ওঁ, তোম্ তানা নানা' প্রভৃতি শব্দগুলিও কথা বা ভাষা। স্বতরাং কথা-বিহীন আলাপ বা আলাপচারীও হতে পারে না।

ভাবের অভিব্যক্তির জন্যে অথবা তাবকে বাইরের জগতে ও মানুষের সমাজে প্রকাশের জন্যে তাহলে কথার

প্রয়োজন। জাতি হিসাবে ভাষা বা কথা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু কথা যে মনের ভাবকে প্রকাশ করে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুরের সঙ্গে ভাষার মিলন বৈদিক যুগে ছিল, ব্রাহ্মণ, সংহিতা, শিক্ষা, প্রাতিশাখ্য এবং উপনিষদ্‌-গুলিই তার জলন্ত প্রমাণ। বৈদিকোত্তর ক্ল্যাসিকাল ও আধুনিক যুগের তো কথাই নাই। সুতরাং 'সঙ্গীত' বল্‌তে শুধুই সুর, স্বর বা রাগ-রাগিণীর কাঠামোকে আমরা বুঝব না, কিংবা কেবলই ভাষার বা কথার পারিপাট্য ও কাব্যের ছন্দ সুষমাকেই আমরা গ্রহণ করব না, পরন্তু কথা ও সুরের বেণীবন্ধনকেই আমরা বলব সঙ্গীত।

তবে একথাও আবার সত্যি যে, সঙ্গীতের সত্যিকারের রূপ কেবলই কথা ও সুরের একত্র সমাবেশ নয়, সঙ্গীতে থাকে রাগ, অলঙ্কার, তান, গমক, রস ও ভাবের অভিব্যক্তি, সঙ্গীতে থাকে নৃত্য গীত ও বাদ্যের সহযোগীতা, সঙ্গীতে থাকে বিশ্ব ও বিশ্বোত্তীর্ণ ভাব ও মাধুর্য্যের একত্র সমাবেশ, সঙ্গীতে থাকে মনের আকুলতা ও প্রাণের আবেদন। কাজেই কথা ও সুর আসলে হোল সঙ্গীতের কাঠামো ও সঙ্গীতের কঙ্কাল, রক্ত, মাংস, মন, প্রাণ, ভাব, রস এসব দিয়ে তাকে করতে হবে জীবন্ত, তাকে সচল প্রাণবান।

বৈদিক যুগের ভারতীয় সমাজে গান বা সঙ্গীতের কথা ছিল কি, সেকথা আমরা মোটামুটিভাবে জানি। ১০ম বা ১২শ শতক থেকে চর্য্যাগীতি, বৈষ্ণব গীতিকবিতার কথাও আমাদের কাছে অবিদিত নয়। ১৫শ শতাব্দী থেকে গৌড় সাহিত্যের যুগে সঙ্গীতের কথারও ইতিহাস আছে। খৃষ্টীয় ১৪৯৪—১৫৭৫ শতাব্দীর ভেতর পাঠান ও আফগান আমলের গানের কাহিনী অন্তত বাঙ্গলাদেশের কাছে সুপরিচিত। ১৬শ—১৭শ শতাব্দীতেও বাঙ্গালার সমাজ যুগিয়েছে গানের কথা বাঙ্গালা, মৈথিলী ও হিন্দী ভাষার মিশ্রণের মাধ্যমে। কিন্তু মুসলমান আমলে ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যখন দেখা দিল আরব ও পারস্য সাম্রাজ্যের প্রভাব, দেশী সঙ্গীতের কথা ছেড়ে দিলে অভিজাত ক্ল্যাসিকাল গানের কথার গাঙে এসেছিল দুকুল ভাসানো প্লাবন। হরিদাস স্বামীর গান ও গুণের কথা আমরা শুনি ইতিহাসের মারফতে, কিন্তু তাঁর রচিত অথবা তাঁর প্রচলিত গানের কথার সঙ্গে পরিচয় আমাদের বিন্দুমাত্রও মেলে না। ধ্রুপদ গান, খেয়াল গান এসকল যা রচিত হয়েছিল সবই আধুনিক যুগের ভাষা দিয়ে এবং তাতে হিন্দীর প্রভাবই বেশী। কাব্যের বালাইও সেসব গানে অধিকাংশের মধ্যে নাই বল্লেও চলে। ঐ যুগের মধ্যে কথার উপযোগিতাকে স্বীকার করলেও সুরের প্রাধান্যকেই যেন দেওয়া হয়েছিল বিশেষভাবে। অবশ্য ১৮শ শতাব্দীর কোন কোন ধ্রুপদ গানের রচয়িতাদের কথায় কিছু কিছু ছন্দলালিত্য ও কাব্য-সুষমার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু বেশীর ভাগ গানের মধ্যেই কবিতার ও ভাবের বেলায় ছিল দৈন্য। কিন্তু সঙ্গীতে রস ও সৌন্দর্য-সৃষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে গানের সুর ও গায়কীভঙ্গী সুন্দর ও শোভনীয় হলেও কথা অসুন্দর ও ছন্দবিহীন থাকায় 'সঙ্গীত' পদবী পাবার যোগ্যতা লাভ থেকে তখনকার গান একটু বঞ্চিতই ছিল এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও একথা স্বীকার করেছেন।

কথা সুর বা গানের অপরিহার্য অংশ একথা সত্য, কিন্তু কথায় রচনার সময় সর্ব্বদাই মনে রাখ্‌তে হবে কাব্য-সৌন্দর্য ও যথার্থ অর্থ-প্রকাশকতার দিকে, হেঁয়ালী ও মেঘেঢাকা অথচ ছন্দায়িত ভাষার সমাবেশ হলেও চলবে না। গানের কথা গানের প্রকৃতি অনুযায়ী হওয়া উচিত, আবার সুর সংযোগও করতে হবে কথার প্রকৃতি অনুযায়ী। হয়তো কথা হোল : "আজি বহিছে বসন্ত-পবন সুমন্দ তোমার সুগন্ধ হে," আর তাতে সুর যোজনা করা হোল মেঘ বা মল্লার রাগকে অবলম্বন ক'রে, এই রীতি অত্যন্ত অসংগত ও প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। কথায় প্রকাশ করছে হয়তো "আজি বরষায় ঝর ঝর বারিধারা" আর তাতে সুর দেওয়া হোল পূর্বী বা গৌড়ীরাগিণীকে অবলম্বন ক'রে। এতেও রস ও ভাবভঙ্গের চূড়ান্ত নিদর্শন পাওয়া যায়। এজন্য রচয়িতার সুর তথা রাগ-রাগিণীদের প্রকৃতিবোধ থাকা দরকার, আর কথাকার যদি গায়ক ও সুরকার দুইই হন, তবে গানে অসঙ্গতি প্রায় থাকে না। এজন্য রচয়িতা ও শিল্পী উভয়েরই কথা ও সুরের পারস্পরিক ঐক্য ও সামঞ্জস্যের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। অন্যথা কথা ও সুরের সমাবেশ থাকলেও গান বা গানের অনুশীলন হয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত।

গানের বা রাগ-রাগিণীর বেলায় যেমন রস ও ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়, কথার রচনার সময়েও তাই। কথা ভাবের প্রকাশক, ভাবই আসল আর কথা বাহক মাত্র। তাই কথা যাতে ঠিক ঠিক ভাবের প্রকাশক হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে। রচয়িতা হয়তো চান কথার বা রচনার ভেতর নিবিড় বেদনার ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে, তবে তাঁকে তেমনি কথার চয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। তারপর অনুবাদ নীতি যদি গানের রচনায় ব্যবহার করা প্রয়োজন হয় তবে যে ভাষা ও রচনা থেকে অনুবাদ করা হবে, সেই ভাষা ও রচনার মাধুর্য ও দরদকে পরিপূর্ণ মন দিয়ে জান্‌তে হবে এবং সম্ভব হলে সেই ছন্দ ও কথার সৌন্দর্য দিয়েই গান রচনা করতে হবে। এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সিদ্ধহস্ত; তাঁর মৌলিক ও স্বতন্ত্র রচনার তো কথাই নেই, অনুবাদের ভাষাও ছিল অনিন্দ্যসুন্দর। যেমন তাঁর অনুবাদিত গানগুলিতে দেখা যায়: তিনি হিন্দী গান থেকে ভাবানুবাদ ক'রে গান রচনা করেছেন—

(১) ক্যায়সে কাটেঙ্গি রয়না সো পিয়া বিনা
একেলি জাগি সজনি আজু মোরা
নয়ন মে নিদ ন আওয়ে ছোঁড়ি সৈয়াঁ।

বঙ্গানুবাদ তথা হিন্দী-গানের অনুকরণে বাঙ্গলা-গান,

হে বিরহী, হায় চঞ্চল হিয়া তব
নীরবে জাগ একাকী শূন্য মন্দিরে
কোন সে নিরুদ্দেশ লাগি আছ জাগিয়া।

বৈষ্ণব পদকর্ত্তা জানকী দাসের বর্ষার গান,

প্রচণ্ড গর্জ্জন সজল বরখা ঋতু
কাম অগম অত বিরহিণী জীয়ন তর্জ্জন।
ঝট অস দামিনী মতঙ্গ-সম যামিনী;
অরু দ্রুম চাপ কর্কশ বুঁদ বারি বরখন।

বাঙ্গালা-গান,

প্রচণ্ড গর্জ্জনে আসিল একি দুর্দ্দিন
দারুণ ঘনঘটা, অবিরল অশনি তর্জ্জন,
ঘন ঘন দামিনী ভুজঙ্গ-ক্ষত যামিনী,
অম্বর করিছে অন্ধ নয়নে অশ্রু বরিষণ।১

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কথার যাদুকর; ভাষা ও ভাবের রৌদ্র-ছায়ায় খেলা তাঁর হাতে যাদুমন্ত্রের মত কাজ করত। তাই বর্ত্তমান যুগের যাঁরা রচয়িতা হবেন, তাঁদের কর্ত্তব্য তাঁরা যেকোন শ্রেণীরই গান রচনা করুন না কেন, ভাব ও রসের প্রকাশ-সামর্থ্যের দিকে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রেখে তাঁরা যেন রবীন্দ্রনাথের রচনাশৈলীকে অনুসরণ করেন। অবশ্য এথেকে যেন কেউ মনে না করেন যে, অন্ধ-অনুকরণের আমরা পক্ষপাতী, কিন্তু আমাদের কথা হোল মৌলিক চিন্তা ও স্বতন্ত্র প্রতিভার বিকাশকে পূর্ণ-স্বাধীনতা দান ক'রেও সৌন্দর্যদেবী স্বভাব-কবি রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করায় কোন দোষ নেই; কেননা চলার পথে দিকদর্শক যন্ত্র রাখলে ক্ষতির চেয়ে বরং লাভই বেশী হয়।

আজকাল আমাদের দেশে গান-রচয়িতার যথেষ্ট অভাব দেখা দিয়েছে। বৈষ্ণব কবিগণের পর রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, কবি নজরুল বাঙ্গালাদেশে অনেক গান রচনা করে গেছেন। অবশ্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে রচয়িতা ও গীতকারদের সংখ্যা বড় কম নয়। মীরাবাঈ, কবির, নানক, সুরদাস, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির মত ভজন-রচনাকারদের অভাব এখন দেশে আমরা অনুভব করি এবং এজন্য দেশে প্রতিভার অভাবকেই মেনে নিতে হয়। বর্ত্তমানে অবশ্য ভাল ভাল গান রচনা-করার চেষ্টা ভারতের বিভিন্ন স্থানে দেখা যাচ্ছে। এই রচনার প্রসঙ্গে আমার বিশেষ ক'রে বর্ত্তমান বাঙ্গালাদেশের সঙ্গীতগুণীদের কথাই মনেপড়ে। তাঁদের উচিত—বাঙ্গালাভাষার মারফতে উচ্চাঙ্গের ক্ল্যাসিকাল গানগুলির অনুশীলন করা। হিন্দীগানগুলিকে বাঙ্গালায় তর্জ্জমা অথবা কাব্যসম্পদপূর্ণ ভাষায় নূতন নূতন গান বাঙ্গালাভাষায় রচনা ক'রে সেগুলিকে ক্ল্যাসিকাল রাগ-রাগিণীতে গান করা উচিত। রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি অসংখ্য হিন্দী ধ্রুপদ গানকে

১। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা শ্রীশান্তিদেব ঘোষ-রচিত 'রবীন্দ্রসংগীত' (১৩৫৬), পৃঃ ১০৭—১১৩ দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালাভাষায় রূপান্তরিত করে বাঙ্গালা-গানের মানকে যথেষ্ট উন্নত ক'রে গেছেন। বাঙ্গালাদেশের সঙ্গীতগুণীদের মনে রাখা উচিত যে, জাতীয় ভাষাকে মাধ্যম (medium) হিসাবে গ্রহণ না করলে কোন শিল্প, সাহিত্য বা দর্শনের সত্যিকারের বিস্তার লাভ ঘটে না। রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাঙ্গালা-ভাষা ভাবের প্রকাশক হিসাবে যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অন্ততঃ উচ্চাঙ্গ ক্ল্যাসিকাল-সঙ্গীতের বিস্তার সাধন করতে গেলে বাঙ্গালা-ভাষাকেই সুরের (গানের) কথা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, এখানে গোড়ামী করলে অথবা পুরাতনপন্থীর মনোভাব দেখালে যথেষ্ট দেশের, জাতির ও শিল্পের অনিষ্ট সাধনই করা হবে। শিল্পে বিশেষ ক'রে উদার মনোভাবের প্রয়োজন আছে। সৃষ্টির অভিযানে গা ভাসালেই কল্যাণের পথকে প্রশস্ত করা হয়। এজন্য ভাষার বা কথার নির্ব্বাচনকে সুরের তথা গানের মধ্যে ভাল ক'রে এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গেই করা উচিত, কেননা এই নির্ব্বাচন-নীতির ওপরই সকল জাতির উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে।

মোহান্ধ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কহে বিধর্ম্মী, "ভাঙিল মামুদ
সোমনাথ মন্দির—
রক্ষিতে, ভয়ে এলোনা দেবতা
স্বমুখে দুষ্কৃতীর।"
লাঞ্ছনা কই করিতে নারিল রোধ?
দেবাদিদেবের হলনা তো কই ক্রোধ?
হয় তো দেবতা বলহীন—নয়,
ক্রুপা তার অস্থির।

২

মন্দির আর দেবের মূরতি
ভাঙিল নির্ব্বিচারে,—
যে কালাপাহাড় কইতো দেবতা
শাস্তি দিলেনা তারে?
নাহিক দেবতা, নয় তারা দুর্ব্বল,
বলি চীৎকার করে প্রগল্ভ দল
অচিন্ত্যনীয় ভগবৎ লীলা
তারা কি বুঝিতে পারে?

৩

ঈশ্বরের যে পুত্র যীশু তা
মানে সব খৃষ্টান,
যাহাদের ভয়ে অতি দম্ভীরা
সতত কম্পমান,
বিশ্ববিজয়ী বিখ্যাত সব বীর
যে যীশুর পদে সম্ভ্রমে নত শির,
ক্রুশে বিঁধে যবে তাঁহারে মারিল
এলেন না ভগবান।

৪

জেনো ভগবান আসে না আসে না
সৈন্য অস্ত্র সহ,
দুর্ বৃত্তেরে দণ্ডিতে আর
গর্জ্জিতে অহঃরহ।
তাঁর ইচ্ছায় হয়েছে হতেছে সব,
কোথাও তাঁহার নাই নাই পরাভব,
তাঁহার মহিমা বোঝোনা—বোঝার
যোগ্য যাহারা নহ।

৫

এক যীশু মরি অনন্ত যীশু,
শক্তি কি দুর্ব্বার!
দেশ কি প্রদেশ নহেক-বিশ্ব
চরণে প্রণত তাঁর।
মামুদ তো ধুলি, ধুলি এ ধরিত্রীর
মৃত কীট আজ কুখ্যাত সমাধির,
সোমনাথ আজ সেই সোমনাথ
সেই সুধা পারাবার।

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

চৌদ্দ

পত্র আসছে কিশোরের কাছ হতে। মহেশ্বরী দেবীর সহোদর, রতনমণি দত্তের মাতুল, আর ভারতীর অপরিচিত দাদু।

নিজের পরিচয় তিনি নিজেই দিয়েছেন—

নিশ্চয়ই তুমি আমায় চিন্‌বে—নামটা নিশ্চয়ই শুনেছো। একদিন যখন ও বাড়ী ছেড়ে বার হয়ে আসি তখন আমি তরুণ বয়স্ক। বড় বেদনা পেয়ে সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আর ও বাড়ীতে প্রবেশ করব না—আজও সে প্রতিজ্ঞা আমি রেখে চলেছি।

হয় তো শুনেছো আমি গিয়েছিলুম আমার গ্রামে—সেখানে প্রচার করেছিলুম—আর নয়—এবার জাগতে হবে। এরই নাম বিদ্রোহ নয় কি? লোককে যদি জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়—তারা ক্রীতদাসেরও অধম, সেইটাই নাকি বেআইনী কাজ। সরকার বললেন আমি শান্ত জনগণকে উত্তেজিত করছি,—আমি তাদের ক্ষেপিয়ে তুলছি।

এই দেশের জনগণ,—সব দিয়েও তারা ছিল পরম সুখী। তারা বুঝতে চায়নি তারা রামরাজত্বে বাস করছে না,— জোঁকের মত এ গভর্ণমেণ্ট তাদের রক্ত শুষে খাচ্ছে। তাদের অবস্থা বুঝাতে আমায় যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে, শত শত যুগের স্লেভ মেণ্টালিটী আমার দুদিনের বক্তৃতায় যায়নি। কিন্তু বুঝলো তারা, বিচার করতে শিখলো তারা। তাদের যে বৃত্তি ছিল অন্তরতলে সুপ্ত, সে বৃত্তি উঠলো জেগে। এর পর তারা মানুষের অধিকার যদি চায়—সেটাকে বেআইনী বলে কতদিন এ সরকার ঠেকিয়ে রাখতে পারবে?

ঠেকিয়ে রাখতে পারা গেল না উন্মত্ত বন্যার স্রোত, সেই স্রোতের পুরোভাগে রইলেন আমার মাতৃসমা দিদি—তোমার ঠাকুরমা মহেশ্বরী দেবী।

পুলিস এসেছে, গ্রাম ঘিরে ফেলেছে, শিশু বৃদ্ধ নারীর উপর অবধি অত্যাচার চলছে, এ সংবাদ পেয়ে তিনি বার হয়ে এলেন পলাশডাঙ্গার সম্মানীয় অন্তঃপুর ত্যাগ করে। এগারো বৎসরের যে মেয়েটী ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে গিয়েছিল একদিন পলাশডাঙ্গার কুললক্ষ্মী হয়ে, বৃদ্ধ বয়সে সিংহীনীর মত প্রকাশ্য পথে ফিরে এলেন তিনি, দাঁড়ালেন সবার সামনে, বরাভয় দিলেন—ভয় নেই তোরা এগিয়ে চল। বললেন, "মানুষ মরবে একবার—মরবেই যখন, বীরের মত মর, তোদের মরণ জয়যুক্ত হোক্।"

গোপনে রয়েচি তখন, আমায় খুঁজে ফিরছে পুলিস—জীবন্ত না পারে মরা দেহটাকেও তাদের চাই।

সেই গোপনে থেকে শুনতে পেলুম—পুলিস বেপরোয়া গুলি চালিয়েছে, ধ্বংসের পথে তারা জয় করতে চেয়েছে জনসাধারণকে, কিন্তু পেরেছে কি?

কয়েকদিন পরে ফিরলুম সেই জায়গায় যে জায়গার মাটি আমার দেশের লোকের রক্তে ভিজে উঠেছিল। আমার দিদিও এইখানেই মারা গেছেন।

পবিত্র তীর্থস্থান—মাকে কোনদিন চোখে দেখিনি, শুনেছি মাত্র দুই মাস বয়সে আমি মাকে হারিয়েছি, দিদির বুকের দুধ খেয়েছে রতন, দুধ খেয়েছি আমি। দিদি দুই কোলে দু'জনকে নিয়েছেন, অসুখ হলে সারারাত জেগে শুশ্রূষা করেছেন। সেই দিদি আমারই জন্য ঘর ছেড়ে এলেন, মারাও গেলেন, অথচ আমি বেঁচে রইলুম।

আর কোন বন্ধন রইলো না, প্রতিহিংসার জ্বালা নিয়ত অনুভব করছিলুম, তাই ভেসে চললুম স্রোতের মুখে।

অনেকবার জেল খেটেছি—যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ পেয়েছি, কিন্তু আমি পলাতক, আমায় আজও কেউ ধরতে পারে নি।

এসেছে জরা—এসেছে বার্দ্ধক্য; মনে শক্তি থাকলেও দেহে আজও শক্তি পাইনে, তাই কাজের জন্য আমি যাকে তৈরী করেছি সে জয়ন্ত। তার মাথায় আমি কাজের ভার চাপিয়েছি—সে আমার উপযুক্ত শিষ্য, আমি জানি—সে আমার ত্যক্ত কাজ করতে পারবে, পথ সে হারাবে না, সে ভুল করবে না।

আমি নিজে একদিন এসেছিলুম, কিন্তু দরজা দিয়ে আমিও বাড়ীতে প্রবেশ করতে পারলুম না। আজ যদি আমার মাতৃসমা দিদি থাকতেন, আমি প্রতিজ্ঞা ভুলে যেতুম। জানি রতন সম্পূর্ণ বদলেছে, তার মায়ের প্রভাব তার উপর পড়েছে, সেই রতন—যে চিরদিন মাথা নত করে সেলাম বাজিয়েই এসেছে, সে আজ সেই সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, সে আজ জেলে গেছে স্বেচ্ছায়। তবু—তবু আমি ও বাড়ীতে প্রবেশ করতে পারলুম না।

যদি বেঁচে থাকি, তোমায় আমায় দেখা হবে আমি সেই প্রতীক্ষায় আছি। আজ এইখানেই বিদায় নিচ্ছি। তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি—তোমার ঠাকুরমা—আমার মৃতা দিদির বাসনা যেন তোমার মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। আমার দিদিকে বাঁচিয়ে তোল তুমি—এই আমি চাই।

তোমার—দাদামণি কিশোর।

ভারতী পত্রখানা মাথায় রাখে—তোমার আশীর্ব্বাদ সফল হোক অপরিচিত দাদু, সাহসে, স্নেহে মমতায়, দৃঢ়তায় স্থৈর্য্যে মণ্ডিতা মহেশ্বরী দেবী বেঁচে উঠুক ভারতীর মধ্যে—ভারতীও সেই প্রার্থনা করছে।

অত্যন্ত যত্ন করে ভারতী পত্রখানা ড্রয়ারে তুলে রেখে দেয়। রাজনৈতিক আসামীর পত্র—সে আসামী পলাতক, তাকে খুঁজে ফিরছে আজও পুলিস।

কে জানে, সমীর বোস এই সন্ধানেই ঘুরছে কিনা—এতটুকু ছিদ্র খুঁজছে কিনা?

ঘরের একপাশে একখানি চৌকির উপর কালো বনাতে ঢাকা ঠাকুরমায়ের ছোট চরকাটি রয়েছে। চরকাটীতে এ যাবৎকাল কেউ হাত দেয়নি। মায়ের এই স্মৃতিচিহ্নটীকে রতন দত্ত সযত্নে রক্ষা করেছেন। বনাত দিয়ে এটি ঢাকা থাকে, মাঝে মাঝে রতন দত্ত নিজের হাতে এটি পরিষ্কার করে মুছে রাখেন।

এতদিন ভারতীও এর দিকে চায়নি—চাইবার অবকাশ তার হয়নি। আজ কাজ খুঁজবার মুহূর্ত্তে চোখ পড়লো এই চরকাটির উপরে,—ভারতী উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

ঠাকুরমায়ের ত্যক্ত এ কাজ প্রথম সে তুলে নিলে। ঢাকনীটা সে খুলে ফেললে।

অনাদিকালের জন্য বলা চলে বই কি। মানুষ প্রথম লজ্জা নিবারণের আবশ্যকতা অনুভব করেছিল, সেদিন গাছের ছাল নিলে ও সুতা তৈরী করে কাপড় বুনবার মতলব যখন মাথায় জেগেছিল, সেই সময় হল চরকার জন্ম। মানুষের উদ্ভাবনী শক্তিকে ধন্যবাদ।

কত যুগ চলে আসছে চরকা।

আজ মহেশ্বরী দেবীর শ্লোকটা মনে হয়—

চরকা আমার স্বোয়ামীপুত
চরকা আমার নাতি
চরকার দৌলতে আমার
দুয়ারে বাঁধা হাতী।

ভারতীর সামনে খুলে যায় অতীতের অন্ধকারময় গুহাপথ; দেখা যায়—ঘরে ঘরে চলছে চরকা। দেশের লজ্জা নিবারণের ভার নিয়েছে দেশের মেয়েরা। বাগানে বাগানে জন্মেছে কার্পাস গাছ, চরকায় সেই কার্পাসের

তুলা হতে স্থতা তৈরী করছে মেয়েরা। পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে চলছে তাঁত, খটাখট শব্দও যেন ভারতীর কানে আসে। মেয়েরা স্থতা তৈরী করে দিচ্ছে, ছেলেরা তাঁতে কাপড় বুনছে, সেই কাপড়ে লজ্জা নিবারণ হচ্ছে সমগ্র দেশবাসীর। উজ্জ্বল আলোময় দেশ, মাঠ ভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, অসংখ্য তাঁত চলছে—সোজা কথায় ভাত কাপড়ের দুঃখ ছিল না। স্বাস্থ্য সুন্দর চেহারা আনন্দ উচ্ছল মন নিয়ে দেশের ছেলে মেয়ে সেদিন বেঁচেছিল। দেশের পয়সা থাকতো দেশের ঘরে, সেদিন দেশে ছিল না অর্থাভাব। অন্ন এবং বস্ত্র এই দুইটীর সমস্যা যে আজকের মত এমন জটিল হয়ে উঠবে তা সেদিনকার লোক স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

এলো বর্ত্তমান শতাব্দী—ম্যাঞ্চেষ্টার নিলে ভারতের কাপড় যোগানোর ভার। শাসন দণ্ড হাতে নিয়ে বণিক ইংরাজ বস্ত্রশিল্প ধ্বংস করতে চালালো নিদারুণ নির্য্যাতন, ফলে তাঁতিরা তাঁত বন্ধ করতে বাধ্য হল, দেশের ঘরে ঘরে আর চরকার দেখা মিললো না।

অকস্মাৎ চমক ভাঙ্গে ভারতীর, কি স্বপ্ন দেখছে সে?

সে অতীত হারিয়ে গেছে, সে অতীত আজ মরে গেছে; যা যায় তা আর ফেরে না,—সে অতীতও আর ফিরবে না।

চরকার পানে তাকিয়ে থাকে ভারতী।

কত কম মূল্যে কত সুন্দর কাপড়ই না দিয়েছে বিদেশী, কত প্রচুর কাপড় পেতো এ দেশের লোক। দেশবাসীর এই ক্ষুদ্র চরকা কি যন্ত্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাতে পারবে? আমাদের প্রত্যেক অভাব অতি নিপুণ ভাবে যারা মিটিয়ে চলেছে, আমরা তাদের পরম হিতৈষী বন্ধু বলে গ্রহণ করেছি। আগে একদেশ হতে অন্য দেশে যাওয়ার কল্পনাও এদেশের লোক করতে পারেনি—পৃথিবী যে গোল এবং অবিরত ঘূর্ণায়মান সে কথা এরা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। এক গ্রাম হতে অন্য গ্রামে যেতে লাগতো কত সময়, পথে ছিল কত বিপদ, এখন তিনদিনের পথ একঘণ্টায় লোকে চলে যাচ্ছে বিনা বাধায়। চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালানোর দিন আর নেই, সস্তাদরে একপয়সার দেয়াশলাই পাওয়া যায়, যতবার খুসি আগুন জ্বালা চলে। চকমকির আগুন একবার জেলে দিনের পর দিন সে আগুন বাঁচিয়ে রাখবার ব্যগ্রতার দিন আজ চলে গেছে।

আদিম কালের প্রদীপ আর জ্বলে না, এসেছে হ্যারিকেন লণ্ঠন, এসেছে গ্যাসের আলো, সহরে ইলেক্‌ট্রিক—ঝড় বৃষ্টিতেও যা থাকে জাগ্রত।

একপয়সার পোষ্টকার্ড আনে দেশ বিদেশের খবর বয়ে, এ শতাব্দীর মানুষ কেন হবে না আরামপ্রয়াসী, কেন হবে না বিলাসী? হাতের কাছে দরকারী জিনিস পেলে কে আবার কষ্ট করে আনতে যায়? ক্ষেতের ধান আজ ঢেকিতে না গিয়ে কলে ছাঁটা হচ্ছে, আসল প্রাণশক্তি তার নষ্ট হলেও মানুষ দেখছে তার রূপ—পরম আনন্দে তাই খেয়ে জীবন ধারণ করছে। দুধ মহার্ঘ হয়ে উঠেছে, দেশে গরুর সংখ্যা কমেছে, যা আছে তারাও দুধ দেয় খুব কম। আসছে হল্যাণ্ড সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হতে বিভিন্ন কোম্পানীর জমাট দুধ, গুড়ো দুধ; এসেছে চা,কাফি, কোকো, এসেছে বিস্কুট, পাউরুটি, জ্যাম, জেলি—এতে কয়দিন থাকবে স্বাস্থ্য, কয়দিন বাঁচবে লোক? নাঃ, ভারতী আর ভাবতে পারে না, তার মাথার মধ্যে কিরকম করে।

চরকা সে আর চালায় না, আস্তে আস্তে ঢেকে দেয়।

চরকা চলবে না, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আজকের দিনে চরকা চলতে পারে না। দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমে যে স্থতা তৈরী হয় তাতে হবে মাত্র একখানি কাপড়, সে কাপড়ই বা পড়বে কে?

কিন্তু না—পরবার লোক আছে বৈ কি। পরবে তার দাদামণির মত, জয়ন্তের মত একনিষ্ঠ দেশসেবকবৃন্দ, যারা দেশের পয়সা দেশে রাখতে চায়।

দৃপ্ত হয়ে ওঠে ভারতীর মুখ!

পরাধীন দেশের আশা ভরসাস্থল তো এরাই। এই যে ছেলেরা চলেছে পথ বেয়ে, সে পথ তাদের সহজ সরল নয়, সে পথ কণ্টকাকীর্ণ, বিপদসঙ্কুল। এরা চাইছে আজ দেশের স্বাধীনতা, সেই স্বাধীন দে হবে মৃতশে শিল্পের পুনরুজ্জীবন, দেশ জাগবে, দেশের লোকই নেবে দেশের উন্নতির ভার।

কিন্তু সমগ্র দেশবাসী, স্বপ্নবিলাসী দেশবাসী বুঝবে কি এদের আত্মদান, এরা স্রোতের মুখে কুটোর মত ভেসে চলেছে, এরা কি জানতে চাইবে কোথায় ছিল, কোথায় এসেছে, এর পর কোথায় যাবে ?

কিন্তু আজ না বুঝুক, একদিন এদের বুঝতেই হবে এদের বিদেশী শাসক এদের কি সর্ব্বনাশ করেছে। কাঁচের খেলনা দিয়ে, ঠুনকো জিনিস দিয়ে ভুলিয়ে এ দেশের ধন-সম্পদ নির্ব্বিবাদে জাহাজ ভরে নিয়ে গিয়ে নিজের দেশকে তারা করছে সমৃদ্ধ। দেশের এই সব তথাকথিত স্তাবকেরা ইংল্যাণ্ডকে স্বর্গ বলে স্তব করে যাচ্ছেন—দয়া করে কেউ যদি পদাঘাতও করে, খুসি হয়ে হাসছেন। এদের লক্ষ্য করেই এদেশের কবি বড় মনের দুঃখে লিখেছেন—

শ্যামা, এবার ম'লে সাহেব হব,
সাদা হাতে হাত দিয়ে মা, বাগানে বেড়াতে যাব,
আর কালো বদন দেখলে পরে ডার্কি বলে মুখ ফিরাব।

আস্তে আস্তে একটা সমাজই ন গড়ে উঠেছে এমনই ভাবে,—সর্ব্বাংশে যারা ইংরেজের অনুকরণ করে চলতে চায়। এরা নিজেদের চারিদিকে অতি সতর্কতার এক আবেষ্টনী দিয়ে রেখেছেন যেন তার কোন ফাঁক দিয়ে কোন ডার্কিম্যান মুখ না দেখাতে পারে। এরা নিজেরা নিজেদের অতীতকে ভুলে যান,—মনে প্রাণে সাহেব হতে চান, তাই ছেলেমেয়েদের শিশুকাল হতে বৈদেশিক চালচলনে অভ্যস্ত করে তোলেন ; এমন কি অনেকে মাতৃভাষাও ভুলে যান, একথা মিথ্যা নয়।

ভারতীর মুখখানা বিকৃত হয়ে ওঠে।

মনে পড়ে সৌম্য মিটারকে। নিজের মিত্র উপাধিটা পর্য্যন্ত সে বিকৃত করে মিটারে পরিবর্ত্তিত করেছে। কয়েকটা বৎসর বিলাত থেকে সে নাকি একেবারেই বাংলা ভুলে গেছে। অতি কষ্টে বেঁকে চুরে সে যা বাংলা উচ্চারণ করে তা বুঝতে রীতিমত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

শুধু সেই বা কেন ? তার বোন এলা মিটার যদিও বিলাতে যায়নি তবু শুনে শুনে সে ঠিক নিজেকে তৈরী করে নিয়েছে। মেমদের ধাঁজে সে চুল বব্‌ড করে মুখের রং বদলে ফেলে, মিহি সুরে টেনে টেনে কথা বলে। আজও বিলাতে যায়নি বলেই বাংলা ভাষা বর্জ্জন করতে পারেনি,—একবার গেলেই সে ভুলে যাবে সে কথা সত্য।

ভারতী অতি বেদনায় হাসে।

পনের

জমীদার রতনমণি দত্তের বাগানবাড়ী আজ নিস্তব্ধ। কেবল তাঁরই নয়, তাঁর পিতা, পিতামহ সকলেরই প্রমোদ ভবন এই বাগান বাড়ী। এখানে দিনের পর দিন কত ব্যাপারই না ঘটে গেছে, নর্ত্তকীর নৃত্য গীত, কত হাসি, আনন্দ কোলাহল, কত সতী মেয়ে এখানে তাদের সর্ব্বস্ব হারিয়েছে শোনা যায়, কত চোখের জল এখানকার মাটিতে শুকিয়ে আছে কে হিসাব রাখে !

ভারতী সরু পথটার উপর দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে এই বাগানবাড়ীটার পানে—

আজ নিঝুম হয়ে আছে উৎসব মুখরিত সেদিনকার সেই বাগানবাড়ী। কোলাপসিবল্ গেট বন্ধ, ভিতরে থাকে বৃদ্ধ মালি যুধিষ্ঠির, আজও যেটুকু সেই দেখাশোনা করে। ভারতী গেটের ফাঁক দিয়ে ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করে।

আজও ফুটছে স্থলপদ্ম, রজনীগন্ধা, বেল, যুঁই, চামেলি, আজও ফুটছে বকুল, শিউলি, সারারাত গন্ধ বিস্তার করে সকালে ঝরে পড়ে গাছের তলায়। আজও পথিক পথ চলতে আচমকা দমকা বাতাসে আকুলকরা ফুলের গন্ধে সচকিত হয়ে ওঠে।

ছোট বেলার স্মৃতি মনে জাগে ; হার্ম্মোনিয়াম, সেতার এস্রাজের মধুর সুরের সঙ্গে গানের সুর মেশে, নুপুরের রিণিঝিনি নিক্কণ কানে আসে।

কে—কে গান গায় ? জানকী বাই,—বিখ্যাত বাইজী জানকী বাই। আজ ভারতী ভাবে প্রচুর খ্যাতি প্রচুর সম্পদ ছেড়ে সে কেন এসেছিল এই অখ্যাত একটী গ্রামে—কিসের আশায় সে ছিল, কি পেয়েছিল সে ?

কোথায় কে ভেসে গেল—কোথায় গেল অপরূপ সুন্দরী গায়িকা জানকী বাই ?

আজ পড়ে আছে সে প্রমোদ ভবন, রতন দত্ত আর সে ভবনে প্রবেশ করেন নি। যুধিষ্ঠির বাগান দেখাশোনা করে, প্রত্যহ রাশী রাশী ফুল মালা গেঁথে তোড়া বেঁধে

পৌছে দেয় ঠাকুরের মন্দিরে। পূজারী প্রত্যহ এখান হতে ফুল তুলে নিয়ে যায় ইচ্ছামত, সেই ফুলে হয় দেবতার পূজা।

আজ সে বাগানে মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। এই উদাস মধ্যাহ্নে শোনা যাচ্ছে ঘুঘু পাখীর অতি মিষ্ট ঘু ঘু শব্দ।

নিজের অজ্ঞাতসারে ভারতী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। নিত্য পরিবর্ত্তনশীল জগৎ—আজ তারই একটা প্রমাণ দেখা যাচ্ছে। কেউ ভাবতে পারে নি এমন কি রতনমণি দত্ত নিজেও ভাবতে পারেন নি তাঁর জীবনে আসবে আকস্মিক পরিবর্ত্তন। একদিন রায় বাহাদুর উপাধি নেওয়ার জন্য তিনি জলের মত অর্থ ব্যয় করেছেন, শ্বেতাঙ্গের মুখে একটী ধন্যবাদ পাওয়ার আশায় তিনি সব কিছু করতে রাজি ছিলেন। মাত্র কয়টা বৎসর ব্যবধানে তাঁর জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে।

অন্যমনস্ক ভারতী অগ্রসর হয়।

দ্বারোয়ান তার সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, ভারতী তাকে নিবৃত্ত করেছে। অত্যন্ত সাধারণভাবে সে বেড়াতে চায়, জাঁকজমকের সঙ্গে নয়।

আঁকাবাঁকা সরু পথ ধরে চলতে চলতে সে এসে দাঁড়াল পদ্মদহের ধারে।

বিলের জল শান্ত, মাঝখান দিয়ে ছোট ছোট স্রোত বয়ে চলেছে। ধারে ধারে পদ্মবনে ছেয়ে গেছে, অসংখ্য পদ্মও ফুটেছে।

ভারতী অগ্রসর হয়।

ও পাশে দেখা যাচ্ছে গ্রাম, এখানে সেখানে ছড়ানো কুটির, এ পাশ ধু ধু করছে। বর্ষায় পদ্মদহের জল ছড়িয়ে পড়বে এই মাইলের পর মাইল ব্যাপী মাঠের উপর, কালো জলের রং বদলে যাবে—সেই পাশুটে জল হিলি-বিলি করে চলবে মাঠের উপর দিয়ে। এ সব জমিতে চাষ আবাদ হবে না, কোনরকমে এ জমী বাঁচাবারও উপায় নাই। বাঁধটা খানিক দূর হয়েছে, সবটা দিতে পারলে জমিগুলো বাঁচানো যেত, কিন্তু তা হওয়ার উপায় নাই। যেটুকু বাঁধ দেওয়া হয়েছে, এবারকার বর্ষায় সে বাঁধ ধ্বসে পড়বে পদ্মদহের বুকে।

এই বাঁধ নিয়েই না বাধলো কত কাণ্ড। লাঠি চললো, গুলি চললো, কত লোক মরলো, কত লোক হল জখম; তারপর কত লোক পুলিসের হাতে ধরা পড়লো, কত গেল জেলে। দেশের নিঃসম্বল গরীব লোকেরা এমনই করে মরে, কে ওদের দেখবে—কে ওদের সহায় হবে?

ওরে—ওরে হতভাগারা—

ভারতীর চোখে জল এসে পড়ে—মনে পড়ে রবি কবির কবিতা, ভারতী মনে মনে আবৃত্তি করে—

'মুহূর্ত্তে তুলিয়া শির বারেক দাঁড়াও দেখি সবে—'

এই কথাই বলে গেছেন রতন দত্ত, তার মহানুভব পিতা। এই সব মূঢ় মূক মুখে তিনি ভাষা ফুটিয়েছেন, এদের বুকে ঘুমন্ত আশাকে তিনি জাগিয়েছেন। চিরদিন যা কল্পনার বাইরে ছিল, আজ তা স্বরূপে প্রকাশ হয়েছে।

জেগেছে—জেগেছে চাষী, জেগেছে শ্রমিক, জেগেছে ছাত্রদল, জেগেছে জনসাধারণ। নিজেদের অবস্থা প্রণিধান করতে পেরেছে তারা. তারা ক্ষেপে গেছে, আজ তাদের শান্ত করতে রতন দত্তও পারবেন না।

দুপুরের প্রখর রৌদ্রে মাথা জ্বলতে থাকে, মাথার উপর আঁচলটা টেনে দেয় ভারতী, ফিরবার জন্য পা বাড়ালো।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো সে; তার সামনে যে লোকটি দাঁড়াল, তাকে এখানে দেখবার কথা সে ভাবেনি। জয়ন্ত এসেছে—কয়েকদিন আগে যে টাকা নিয়ে গেছে—প্রজাদের গচ্ছিত টাকা।

হাসিমুখে জয়ন্ত অভিবাদন করে বললে, "আপনার বাড়ীতে গিয়েছিলুম ভারতী দেবী, শুনে খুসি হবেন, পাঁচিল ডিঙিয়ে যাইনি, ভদ্রপোষাকে ভদ্রভাবে আপনার গেট দিয়েই ঢুকেছিলাম, কিন্তু আপনাকে দেখতে পাইনি। আপনার লোকদের কাছে শুনলুম, আপনি এইদিকে এসেছেন, আমি সোজা তাই এই পথ ধরেছি। কিছু মনে করবেন না, আজ আমায় বেশ শান্তশিষ্ট ভদ্রলোকটির মত দেখাচ্ছে কি না বলুন—"

বলতে বলতে সে হেসে উঠলো।

"ভদ্রলোক।"

ভারতী চেয়ে দেখলে—সত্যই ভদ্রলোকের মতই সেজে এসেছে সে। তার পায়ে সুন্দর পামসু, হাতকাটা বেনিয়ান একটা গায়ে, পরণে সূক্ষ্ম ধূতী—চুলগুলা আজ সুবিন্যস্ত, কোন দিক দিয়ে আজ তার ত্রুটি ধরা যায় না।

বিনীত কণ্ঠে জয়ন্ত বললে, "আজ উদরে কিছু আছে ভারতী দেবী, মনে হয় কেউ ধরতে এলে তাকে দুচার ঘা দিতে পারে। পুলিশ এখন এমুল্লুকে নেই, সে সব সন্ধান নিয়ে তবে আমাদের বার হতে হয়। লোকে বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশও কতকটা সেই টাইপের কি না একবার ছুঁলে আর রক্ষে নেই। হাজার হোক বৃটীশের তৈরী আইন তো, বিশেষ করে এই সব পুলিশেরা যে আইন ষোল আনার ওপর আঠারো আনা করে চালিয়ে যাচ্ছে। ও সব আইনের সর্ত্ত বাঁচিয়ে চলা আমাদের মত লোকের পক্ষে বড় মুস্কিল হয়ে ওঠে, সেই জন্যে পাঁচিল টপকানোর মত ওদের আইন, ওদের বিধি নিষেধের গণ্ডীও মাসে মাসে টপকে ফেলি।"

ভারতী বললে, তাতে কোনদিন গোল বাধেনি ?

বিস্ফারিত চোখে জয়ন্ত বললে, "বাধে না আবার, বৃটীশের শাসন বিধির মধ্যে এতটুকু ফাঁক আপনি দেখতে পাবেন না, যেখান হতে একটি মাছি পর্য্যন্ত গলতে পারে না। কর্ত্তাদের চেলা একজন না একজন ঠিক পেছনে থাকবেই। এড়াতে পারবেন এই পুলিশ জাতটাকে, কিছুতেই এড়াতে পারবেন না।"

শঙ্কিত কণ্ঠে ভারতী জিজ্ঞাসা করলে, "আজও কেউ আপনার পেছনে আছে ?"

নির্ভীক কণ্ঠে জয়ন্ত উত্তর দিলে, "থাকার তো কথা, না থাকাটাই বিচিত্র। তবে কথা হচ্ছে পুলিশ আজ এ গ্রামে নেই, সেপাই হিসাবে কেউ থাকলেও সুবিধে কিছু করতে পারবে না। যাই হোক, আমি যে জন্যে এসেছি সে কাজটা আগে করে ফেলা যাক—কি বলেন ?"

ভারতী বিস্মিত চোখে তার পানে তাকায়—বললে, "আজও কিছু নেওয়ার মতলব নাকি ? কাছে তো টাকা পয়সা একটি নেই, নেওয়ার মধ্যে আছে হাতের এই চুড়ি কয়গাছা আর গলার হার ছড়াটা—বুঝলেন ?"

জয়ন্ত জিভ কাটে—"ছিছি ও সব কি বলছেন—সত্যি আপনি আমাদের এত ছোট মনে করেন ? এটুকু জানবেন ভারতী দেবী, আমরা আর যাই করি, আজও মেয়েদের গা হতে গহনা কেড়ে নেই নি, আমাদের সংস্কারে ও কাজটা করতে বাধে। নিলে আমরা অনেক নিতে পারি, পথে সালঙ্কারা মেয়ে অনেক দেখা যায়, একটা রিভলভার বা ছোরা নিয়ে দাঁড়ালে আর টুঁ শব্দ করতে পারে না—"

বলতে বলতে সে হাসে—"এদিক দিয়ে আপনারা কিন্তু বড় দুর্ব্বল ভারতী দেবী, মুখে যতই কেননা আস্ফালন করুন, কাজে কিছু করবার ক্ষমতা আপনাদের নেই।"

ভারতী প্রতিবাদ করবার জন্য মুখ তোলে, জয়ন্ত বাঁধা দেয়—

"থামুন, কথা পরে হবে, আমার দেনাটা আগে শোধ করে নেন দেখি—" বলতে বলতে সে পকেটে হাত ভরে।

[ক্রমশঃ

অন্য গ্রহের অধিবাসী

শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী

বৃহস্পতি গ্রহের চক্ষুহীন মানব

অন্য গ্রহে কি আছে তা জানবার জন্যে মানুষের মনে কৌতুহলের সীমা নেই। অন্য গ্রহগুলি আবিষ্কার হবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মনে এই কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা নিরন্তর গবেষণা করছেন এই নিয়ে। কিন্তু যেখানে আজ পর্য্যন্ত পৌঁছাবার মত যান-ই তৈরী হলো না—সেখানে সত্যিই কি আছে, তা একমাত্র অনুমান ছাড়া আর কি ভাবে বলা যায়। তবে এই অনুমানটা যতটা সম্ভব বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, পৃথিবীর বাইরে অন্য গ্রহে কি আছে সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের মতামতও অবিরত বদলাচ্ছে। ইচ্ছা করলেই যে কোন বৈজ্ঞানিক অন্য গ্রহ সম্পর্কে একটা গাঁজাখুরী গল্প ছেড়ে দিতে পারেন—এটা ঠিক নয়। যিনিই যে মত প্রকাশ করুন না কেন, তার পেছনে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি থাকা চাই।

অনেকদিন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা এই ধারণা পোষণ করেছেন যে, একমাত্র মঙ্গলগ্রহে মানুষ থাকলেও থাকতে পারে।

সম্প্রতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ হেনরী নরিস রাসেল বৈজ্ঞানিক জগতে এক বোম্বশেল নিক্ষেপ করেছেন। তিনি বলেছেন—"একটী নয়, বেশ কিছু সংখ্যক গ্রহেই মানুষের মত প্রাণী আছে। একটী দু'টী নয়, এক সহস্র বা তারও বেশী গ্রহে যে প্রাণী রয়েছে, এটা অনুমান করা চলে।"

বৃটেনের বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ এইচ, স্পেন্সার জোনস্ বলেছেন—"অন্য গ্রহগুলিতে প্রাণীর ক্রমবিকাশ পৃথিবী থেকে সর্ব স্পূ ভিন্ন ধরণে হয়েছে এবং এ সম্পর্কে আমরা হয়তো সঠিক ধারণাই করতে পারবো না।"

এখন কথা হচ্ছে অন্য গ্রহের অধিবাসীরা দেখতে কেমন ? তারা কি মানুষ না পশু না গাছপালা—না এই তিনের মিশ্ররূপ ?

এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে এই সঙ্গে জানা দরকার ঐ সব গ্রহের আবহাওয়া কেমন, তার উত্তাপ কতটা, কতটা জল এবং কতটা স্থলভাগ এবং অন্য কি বিশেষ অবস্থা সেই সব স্থানে বিরাজমান !

এ সব সম্বন্ধে আলোচনার পর বৈজ্ঞানিকরা যে জবাব দিয়েছেন তা বেশ চমকপ্রদ। সমস্ত বিশেষজ্ঞ একটী বিষয়ে একমত হয়েছেন এবং তা হচ্ছে এই যে, আমরা যে ধরণের প্রাণীর সঙ্গে পরিচিত অধিকাংশ গ্রহে সে ধরণের প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। পৃথিবীর মানুষ বুধ গ্রহে বাঁচতে পারে না—কারণ সেখানে সূর্য্যেরই অত্যধিক উত্তাপে রক্ত টগবগ করে ফুটে তার মৃত্যু ঘটবে। তবে এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, অন্যান্য গ্রহের বিশেষ বিশেষ অবস্থা অনুসারে সেই সব গ্রহে বিশেষ বিশেষ ধরণের প্রাণী জন্মাতে পারে।

এইবার বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি দিয়ে আমরা এক একটী গ্রহের দিকে লক্ষ্য করছি।

প্রথমে শুক্রগ্রহের দিকে তাকানো যাক্। কারণ এটা অনেকটা পৃথিবীর মত—ওজন, আয়তন সব দিক থেকেই। বৈজ্ঞানিকরা এ বিষয়ে একমতযে, শুক্রগ্রহে

পৃথিবীর মানুষ শুক্র গ্রহের পশুসদৃশ মানুষ মঙ্গল গ্রহের মানুষ

আবহাওয়া রয়েছে, তবে এই আবহাওয়া সম্পূর্ণটাই কঠিন ডায়কসাইড-এ ভর্তি। এখানে জল নেই—নদী, হ্রদ, সাগর—কিছুই নেই—জমি প্রায় সবটাই মরুভূমির মত। এখানে কি ধরণের প্রাণী বাস করতে পারে?

জন উব্লিউ ক্যাম্পবেল নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক বলেছেন—অক্সিজেন ছাড়াও শুক্রে মানুষের অস্তিত্ব থাকতে পারে। সেখানে এমন ধরণের প্রাণী থাকা সম্ভব যে, কঠিন ডায়কসাইড্ থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে এবং সেই প্রাণীর রক্ত মাংসের শরীর না থাকবার কোনও কারণ নেই।

শুক্রের মানুষ কি পৃথিবীর মানুষের মত? "কেন নয়?" ক্যাম্পবেল বলেছেন—"পৃথিবীর মানুষ দুই কোটী বৎসরের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে আজকার পর্য্যায়ে পৌঁছেছে। শুক্রের মানুষেরও যে তেমনিভাবে পরিবর্ত্তন আসেনি তা মনে করা যায় না।" তবে সেখানকার বিশেষ অবস্থা অনুসারেই মানুষের আকৃতি প্রকৃতি হবে। শুক্রের অধিবাসীর ফুসফুস এমন ধরণের হবে যাতে তার সাহায্যে কার্ব্বন ডায়ক্সাইড থেকে অক্সিজেন পৃথক করে নিয়ে গ্রহণ করতে পারে। তার দেহের কোষগুলি আমাদের থেকে পৃথক ধরণের হবে। যেহেতু কার্ব্বন-ডায়ক্সাইড থেকে অতি সামান্য পরিমাণ অক্সিজেন পাওয়া সম্ভব, সেইজন্যে শুক্রের মানুষকে বেশী পরিমাণে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করতে হবে। এই কারণে তার ফুসফুস্‌টা বেশ বড় আকারের হবে—তাই স্বভাবতই তার বুক চওড়া হতে হবে। তার খাদ্যের মধ্যে চর্ব্বি জাতীয় পদার্থ এবং হাইড্রোকার্ব্বনই হবে প্রধান। পেটটাও তাই বেশ বড় চাই এবং স্থূলাকার দেহকে দাঁড় করিয়ে রাখবার জন্যে চাই বেশ মোটা মোটা পা। তার শরীরের শক্তি বেশী থাকবে না—সুতরাং তার গতি হবে মন্থর। তার খাদ্যের প্রয়োজন খুব বেশী। এই জন্যে তাকে যাযাবরের মত কেবল খাদ্যের অন্বেষণে ঘুরে বেড়াতে হবে।

এ থেকে ক্যাম্পবেল এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে শুক্রের মানুষের উন্নত স্তরের সংস্কৃতি থাকা সম্ভব নয়। এই মানুষের চিন্তার অবকাশ নেই এবং তাকে প্রায় পশুর মত জীবন যাপন করতে হবে।

এবারে মঙ্গল গ্রহে আসা যাক্। এ সম্পর্কে মেজর জেমস্ আর ব্যাগুলপ্-এর অভিমত উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেছেন—

"মঙ্গল গ্রহের মানুষের হাত পা হবে সরু সরু, বুক

চওড়া, ছড়ানো নাসারন্ধ্র এবং মুখের হা'ও বড়। তার মাথাটা দেহের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ, চোখ বড় বড় ও ঘোলাটে। তার দেহের দৈর্ঘ্য হবে চার ফুটের মত।" মঙ্গলের মানুষ এমন হওয়ার কারণ কি ?

পৃথিবীর চেয়ে মঙ্গলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি শতকরা ৩৮ ভাগ কম, তাই সেখানে প্রতিটি জিনিষই অপেক্ষাকৃত সহজে তোলা, নামানো, ঠেলে দেওয়া এবং বহন করা যায়।

মঙ্গলের আবহাওয়ায় বায়ুর ঘনতা এবং চাপ কম। তাই সেখানকার মানুষকে বেশী করে ফুসফুসে শ্বাস গ্রহণ করতে হবে—ফুসফুসটা তাই বড় হওয়া চাই। মুখ এবং নাসারন্ধ্র ও একই কারণেই বড় হওয়া দরকার। স্বাভাবিক মস্তিষ্ক থাকার জন্যে পৃথিবীর মানুষের মত তার মাথা হবে এবং চার ফুট মানুষের তুলনায় তাই মাথা হবে বড়।

এবার বৃহস্পতি। এই গ্রহের বিশেষ অবস্থার জন্যে এখানকার মানুষ খর্ব্বাকৃতি, ন্যুব্জ, মাংসপেশী বেশ স্থূল। কিন্তু তার চোখ থাকবে না। অথচ তেমনি অবস্থাতেই সে চলতে পারবে। পৃথিবীর চেয়ে বৃহস্পতিতে মধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রায় তিনগুণ, সুতরাং শক্তিমান মানুষের প্রয়োজন সেখানে। আবহাওয়া সেখানে এত ঘন এবং গভীর যে এই চিরন্তন অন্ধকারের মধ্যে বৃহস্পতির মানুষের চোখের কোনও প্রয়োজন হবে না।

শনি, ইউরেণস এবং নেপচুন—এই তিনটী গ্রহ অনেক দূরবর্ত্তী এবং ঠাণ্ডা, এই গ্রহগুলির আবহাওয়ায় হাইড্রোজেন, হেলিয়াম, এমোনিয়া (শনি গ্রহে) রয়েছে; অক্সিজেন মোটেই নেই। এখানে পৃথিবীর মানুষের বাঁচা সম্ভব নয়।

ফ্লেচার প্র্যাট বলেছেন, "যদি আদৌ এই সব গ্রহে কোনও প্রাণী থাকে তা হলে সে আমাদের চেয়ে একেবারে ভিন্ন ধরণেরই হবে। কারণ ঐ প্রাণীদের আমাদের মত অক্সিজেন গ্রহণ না করে মূলতঃ নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের ফুসফুস এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং সেগুলির আভ্যন্তরীণ গঠনও সেই দিক থেকেই হতে হবে।" যে সব গ্রহ সূর্য্য থেকে বহু দূরে সেই গ্রহে আলো থাকবে না, সুতরাং সেই সব গ্রহের প্রাণীর চোখ থাকবে না—তবে ঐ ধরণের কোনও রূপ ইন্দ্রিয় থাকবে, যার সাহায্যে তারা চলাফেরা করতে পারবে।

শুক্রগ্রহ সৌরমণ্ডলে সব চেয়ে দ্রুত ঘূর্ণায়মান গ্রহ। এই গ্রহে তিনটী ভূভাগ রয়েছে। একটীতে চিররাত্রি, একটীতে চিরন্তন দিন আর একটীতে দিবারাত্রি ঘুরে ঘুরে আসে। যে ভূভাগে শুধু দিন সেখানে অসম্ভব গরম এবং যেখানে রাত্রি সেখানে অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা, তৃতীয় ভূ-ভাগে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের ফলে তাপ কম বেশী হয়।

মার্কিন বৈজ্ঞানিক কেনেথ হিউয়ারের মতে "শুক্রের অধিবাসীর চার পা থাকাই সম্ভব। তার খাদ্য গাছগাছড়ার মূল।"

মঙ্গল আর বৃহস্পতির মধ্যে ৫০ হাজারেরও বেশী ছোট ছোট "পৃথিবী" রয়েছে। এই সব স্থানে বাতাস নেই, জল নেই—ধূ ধূ করছে মরুভূমি। এই সব জায়গায় কোনও প্রাণী থাকা সম্ভব নয়।

বেলা শেষে

শ্রীসুরুচি সেনগুপ্তা

শৈশবে পিতৃহীনা হ'লেও মায়ের স্নেহযত্নে হেমলতা কোনোদিন দুঃখ পায়নি। একমাত্র সন্তান এই মেয়েটিকে মা অনেক যত্ন ক'রে বড় ক'রে তুলেছিলেন। ধনী না হ'লেও তাঁর মোটা ভাত কাপড়ের অভাব ছিল না। ক্ষেতের ধান, বাগানের তরি-তরকারি, পুকুরের মাছ, গোয়ালের গরুর দুধ, আর কিছু তালুকদারি; পল্লীগ্রামে এর চেয়ে আর বেশী কি লাগে? গ্রামের স্কুলে প'ড়ে হেমলতা সামান্য কিছু লেখাপড়াও শিখেছিল, তারপরেই বড় হ'য়েছে ব'লে স্কুল ছাড়িয়ে এনে মা কন্যাকে পাত্রস্থ ক'রবার চেষ্টা ক'রতে লাগলেন।

বারো বছর বয়সে বিয়ে হ'ল হেমলতার। মায়ের যা' কিছু আছে, সবই মেয়ের, তাই জামাইয়ের বিত্তের দিকে মায়ের দৃষ্টি ছিল না। কৌলিন্য আর রূপ বেছে অষ্টাদশ বর্ষীয় একটি মাতৃপিতৃহীন দরিদ্র যুবকের হাতে কন্যাসম্প্রদান ক'রে তিনি জামাইকে ঘর-জামাই ক'রে রাখলেন। জামাতা বাসব তখন গ্রামের স্কুলে পড়্তেন, বিয়ের পরে পড়া ছেড়ে দিয়ে শাশুড়ীর বিষয়ের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হ'লেন।

মায়ের আদরের মেয়ে হেমলতা স্বামী নিয়ে সুখী হ'ল না। বিয়ের রাত থেকেই ভালোবাসার চেয়ে সে স্বামীকে ভয় ক'রতে শিখল বেশী। তার বালিকা বয়সের দোষ ত্রুটি গুলি স্বামীর চোখে বৃহৎ হ'য়ে দেখা দিত, আর কঠোর শাসনে তিনি তাকে নিপেষিত ক'রতেন। হেমলতার মা প্রথম প্রথম জামাতার এই অসঙ্গত আচরণকে অপরিণত বয়সের বুদ্ধিহীনতা ব'লে তেমন ক'রে গায়ে মাখতেন না, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন বাসবের স্বভাবের কঠোরতাও বাড়তে লাগল, তখন তিনি জামাতাকে সংযত ও শাসন ক'রতে চেষ্টা করতেন, তার ফল শুভ না হ'য়ে অশুভই হ'ত বেশি। ফলে শাশুড়ী, জামাইয়ের সম্পর্ক ক্রমে তিক্ত হ'য়ে উঠতে লাগল আর উভয়ের বিদ্বেষের জ্বালা সমভাবে দগ্ধ ক'রতে থাকে হেমলতাকে।

নিজের অহেতুক অপমান আর লাঞ্ছনা হেমলতার সয়ে এসেছিল, কিন্তু স্বামী আর মা যখন পরস্পরকে কটূক্তি ক'রতেন, তখন সে অপমান শাঁখের করাতের মত দুদিক দিয়ে তাকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে তুলত। কিন্তু দু'জনের একজনকেও নিরস্ত ক'রবার তার সাহস বা ক্ষমতা ছিল না। মেয়ের অহেতুক লাঞ্ছনার জন্যই জামাইয়ের সঙ্গে শাশুড়ীর সংঘর্ষ লাগত; কিন্তু জামাইয়ের অপমানের জ্বালা তিনি মেয়েকে কটূক্তি ক'রেই জুড়াতে চাইতেন। আর শাশুড়ীর দুর্ব্বাক্যের দহনও তাঁর কন্যাকে উৎপীড়ণ ক'রেই শীতল করতে চাইতেন বাসব। সমস্ত লাঞ্ছনাই নির্ব্বাক হ'য়ে স'য়ে যেত হেমলতা।

মায়ের সঙ্গে কলহ ক'রে স্বামী কতদিন তাকে মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। গ্রামের মেঠো পথের শেষ সীমা পর্য্যন্ত মায়ের কান্নার সুর শোনা গেছে, সঙ্গে সঙ্গে হেমলতার সমস্ত অন্তর গুম্‌রিয়ে কেঁদেছে, কিন্তু স্বামীর সম্মুখে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবারও তার সাহস হয়নি। বরং শুষ্ক চোখে দুই কান ভরে মায়ের বিরুদ্ধে কটু মন্তব্য শুনেছে সে। জ্ঞান হওয়া অবধি মায়ের কোলই তার আশ্রয় ছিল, সেই মায়ের কোলছাড়া হ'য়ে কিছুদিন পর্য্যন্ত অনাহারে অর্দ্ধাহারে কাটিয়ে আবার সেই মায়ের কাছেই তাকে ফিরে আস্‌তে হ'য়েছে।

তার সমস্ত জীবনের লাঞ্ছনা আর অপমানের কালিমা মুছে দিয়ে একদা হেমলতা মাতৃত্বের গৌরবে গরীয়সী হয়ে উঠল। ভূমিষ্ঠ হ'ল তার প্রথম সন্তান চিত্র। এতদিন সে যে নিরানন্দ জীবন যাপন ক'রে এসেছে, ছেলে কোলে

নিয়ে সে জীবন যেন ওর স্মৃতি থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে গেল। অনাস্বাদিত মাতৃত্বের গৌরবে সে যেন ক্ষণে ক্ষণে অবগাহন ক'রতে লাগল। তার জীবনের সম্মুখে যেন নতুন এক জীবনের স্বর্ণ-সিংহদ্বার উদ্ঘাটিত হ'ল। সে জীবনে শুধু আশা, শুধ্ আনন্দ, শুধুই তৃপ্তি।

এরপর স্বামীর উৎপীড়ণ ওকে আর তেমন ক'রে দুঃখ দিতে পারত না। তার ছেলে আছে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে বড় হ'য়ে উঠবে। সর্ব্বস্ব ঢেলেও হেমলতা তাকে লেখাপড়া শেখাবে; তার ছেলে বিদ্যায় বড় হবে, বিখ্যাত হবে জ্ঞানে; মহৎ হবে, হবে দেশের মধ্যে একজন। তখন হেমলতার আর কোনো দুঃখ থাক্‌বে না, বিদ্যাসাগর আর আশুতোষের গর্ভধারিণীর মত সে হবে জগৎ বরেণ্যা। তার মত সুখী কে?

ক্রমে ক্রমে দুটি ছেলে আর দুটি মেয়ের জননী হয় হেমলতা। পরাধীন জীবনে সন্তান কটিকে পালন করে তুলতে তার কষ্টের অবধি থাকে না, তবু সে সব কষ্ট তার কাছে তুচ্ছ বোধ হয়।

মায়ের সে ছিল একমাত্র সন্তান, তখন জিনিষ পত্রও সুলভ ছিল, তাই সংসারে কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু এখন সংসার ক্রমে বেড়ে চ'লেছে, জিনিষপত্রও দুর্ম্মূল্য হয়ে উঠেছে, অথচ আয় বাড়েনি, তাই তাদের সংসারে অভাব দেখা দিল। মনের মত আহার্য্য না পাওয়ায় বাসব ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে যায়, সমস্ত উপাদেয় খাদ্যই যে হেমলতা ছেলেমেয়েদের দিয়ে খাওয়ায়, মুক্তকণ্ঠে সে অভিযোগ করে! এদিকে মা-ও চিরজীবন স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে বুড়ো বয়সে মেয়ের সংসার নিয়েই যে অভাবে পড়েছেন, ইচ্ছামত পূজা অর্চ্চন দান ধ্যান করবার তাঁর সামর্থ নেই, এ নিয়ে মেয়েকেই দায়ী করেন তিনি। মায়ের মন্তব্য যেন স্বামীর কানে না যায়, হেমলতা যথাসাধ্য সেই চেষ্টাই করে, কিন্তু মাকে কিছু বল্‌তে পারে না; জামাতাকে অর্থোপার্জ্জনের কোনো সুযোগ না দিয়ে বিষয় দেখ্‌বার জন্য তিনিই যে তাঁকে ঘরজামাই ক'রে রেখেছেন, একথা বলবার অদম্য ভাষাকেও সে সংযত ক'রে নেয়। একদিকে মায়ের কটু মন্তব্য, আর একদিকে স্বামীর যুক্তিহীন নিষ্ঠুরতা সহ্য ক'রেও হেমলতার ঠোঁটের হাসি ম্লান হয় না। আজ সে চারটি ছেলে মেয়ের মা, তারা এখন মায়ের দুঃখ বুঝতে শিখেছে, জগতের কোনো দৈন্যই তাকে আর স্পর্শ ক'রতে পারে না।

চিত্র গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে। অনেক দুঃখেও হেমলতা কাঁদেনি, আজ সে আনন্দে কেঁদে ফেলে। ভগবান পৃথিবীতে এত সুখ বোধ হয় কখনো কাউকে দেয়নি। হাত জোড় ক'রে সে ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানায়।

বিদেশে গিয়ে পড়বার মত টাকা নেই ব'লে গ্রামের মাইনর স্কুলে মাষ্টারী করবার জন্য বাসব ছেলেকে উপদেশ দেয়, শাশুড়ীও তাতে মত দেন। কিন্তু নিজের সারা জীবনের নিষ্ফলতাকে হেমলতা সহ্য ক'রেছে, একদিনের জন্যও প্রতিবাদ করে নি। না মানুষের কাছে, না ভগবানের কাছে, কারো কাছেই কোনো অভিযোগ জানায় নি। কিন্তু সন্তানদের নিয়ে সে যে কল্পনার স্বর্গ গড়ে তুলেছে, তাকে তো এমন ক'রে ধূলিসাৎ হ'তে দেবে না সে। চিত্রও মায়ের কাছে অনেক আশার বাণী শুনেছে। হঠাৎ আজ এ ভাবে তার জীবনের উন্নতির পথ রুদ্ধ হ'তে দেখে সে-ও ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে।

হেমলতার মা ছিলেন সঙ্গতিপন্ন ঘরের মেয়ে ও বধূ। তাঁর প্রচুর স্বর্ণালংকার ছিল। বিবাহের সময় মেয়েকে কিছু অলংকার দিয়ে বাকি অলংকার রেখেছিলেন লোহার সিন্দুকে। মেয়েকে হাতে তুলে না দিলেও সেগুলো যে মেয়ের জন্যই সুরক্ষিত আছে, একথা মা-ও জান্‌তেন, মেয়েও জান্‌ত। মায়ের অজ্ঞাতে কয়েকখানা অলংকার ছেলের হাতে তুলে দেয় হেমলতা। ছেলে মেয়েরাই তার অলংকার, তারা মানুষ হ'য়ে উঠলেই গৌরবে সে অলঙ্কৃত হ'য়ে উঠবে, সোনার অলংকার তার কাছে তুচ্ছ।

নিজের চেষ্টায় কলেজে পড়বে বলে পিতা আর মাতামহীকে আশ্বস্ত ক'রে বিদেশে চ'লে যায় চিত্র, আর আশা উৎকণ্ঠায় দিন গুণতে থাকে হেমলতা।

তার দ্বিতীয় পুত্র বিচিত্রও পরের বছর ম্যাট্রিক পাশ করে আর মাইনর স্কুলের গৌরবময় শিক্ষকের পদ উপেক্ষা ক'রে কলেজে গিয়ে ভর্ত্তি হয়। যে ক'খানা গহনা হেমলতা সব সময় ব্যবহার ক'রত, এখন তার থেকেও

দু'একখানা খুলে দিতে হয় তাকে। মেয়ের অলংকারের ক্রমঘাটুতি এবার মায়ের চোখে ধরা পড়ে; মেয়ের এই স্বেচ্ছাচারকে তিনি ক্ষমা ক'রতে পারেন না। যার স্বামীর এক কাণাকড়ির মুরোদ নেই, মায়ের দেওয়া সোণায় সে হাত দেয় কোন্ সাহসে! ছেলেদের পণ্ডিত ক'রবার সখই বা তার হয় কেন? মায়ের গচ্ছিত জিনিষই বা খোয়ায় সে কি অধিকারে?

মায়ের গলা জড়িয়ে ধ'রে হেমলতা বলে, 'সে তো খোয়া যায় নি মা! সব মজুত হ'য়ে আছে। তোমার চিত্র, বিচিত্র মানুষ হ'য়ে উঠলেই এর দশগুণ সোণা আমারা ফিরে পাব। তার আর ক'দিন বাকি মা?

এ কথা বাসবের কানেও যায়। তাঁর নিজের কোনো স্বার্থে ঘা না দিয়ে যে ছেলেদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে, এতে তিনি মনে মনে খুসিই হন, কিন্তু তাঁর অগোচরে হেমলতাই যে এ ব্যবস্থা ক'রেছে, তার এই কর্ত্তৃত্বটুকুই তিনি সইতে পারেন না। সন্তানের জন্য মায়ের এই স্বার্থ-ত্যাগকে তিনি স্ত্রীলোকের স্বেচ্ছাচার বলেই মনে করেন। ছেলে দুটিকে নিজের কুক্ষিগত করে রাখবার একটা হীন প্রচেষ্টাও তিনি মনে মনে কল্পনা করেন।

দৌহিত্রদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করে সোনার শোক হ্রাস পেলেও জামাতাকে অপদস্থ করবার জন্য হেমলতার মা অহরহ মেয়েকে সোনার জন্য খোঁটা দেন; মেয়েকে বল্‌লেও পরোক্ষে এ অপমান বাসবের গায়েই লাগে। সন্তান.দর উন্নতির জন্য মা হ'য়ে হেমলতা দুঃসাহস ক'রেছিল, লাঞ্ছনায় তার প্রায়শ্চিত্ত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপ ডিঙিয়ে বেরিয়ে এলো হেমলতার দুই ছেলে। যাদের বড় করবার জন্য নিরাভরণা হ'য়ে শংখ সিন্দুর ধারণ করে সে সৌভাগ্যবতী হ'য়েছে, সেই ছেলেরা তার লেখাপড়া শিখে ভালো চাকৃরী পেয়ে কল্‌কাতায় চলে গেল।

সুখ, শান্তি দুটী মেয়েও বেশ বড় হয়ে উঠেছে, কিন্তু হেমলতা তাদের বিদ্যাশিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই করতে পারেনি। এখন ছেলেদের উপার্জ্জিত অর্থে ওদের বিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থা করবে মনস্থ করে।

বিদেশ থেকে মায়ের নামে টাকা পাঠায়, চিত্র, বিচিত্র দু'ভাই। কিন্তু দস্তখত করে রেখে বাসবই সে টাকা খরচ করেন, আর ছেলেরা বাপের নামে টাকা না পাঠিয়ে মায়ের নামে পাঠায় বলে স্ত্রীকে নির্য্যাতন করেন। ছেলে-দের উন্নতির জন্য যে বাপ কোনো প্রকার ত্যাগ স্বীকার করেন নি, সেই ছেলেদের উপার্জ্জনের অর্থে আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হ'লে তাঁর ক্রোধের সীমা থাকে না। ছেলেদের অর্থে মেয়েদের শিক্ষালাভের আশা বিসর্জ্জন দিয়ে হেমলতা ছেলেদের উপদেশ দিয়ে চিঠি লেখে যে বাপ বর্ত্তমানে মায়ের নামে টাকা পাঠানো তাদের কর্ত্তব্য নয়। টাকা হাতে পেয়ে বাসব স্ত্রীর প্রবল আকাঙ্ক্ষা বুঝেই মেয়ে দুটীর শিক্ষা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করে খুসিমত খরচ করেন সে টাকা। মেয়েদের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিলে সংসার উৎসন্ন যায় বলে প্রচার করেন সগৌরবে।

এর পর বিয়ে হয় হেমলতার দুটী ছেলের। মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার সুযোগ পায়নি ব'লে শিক্ষিতা দুটি বউ আনবে বড় সাধ ছিল হেমলতার। কিন্তু স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বাসব দুটি মূর্খ মেয়ের সঙ্গে ছেলেদের বিয়ে ঠিক করে ফেলে। চোখের জল মুছে হাসিমুখে বউদুটি বরণ করে ঘরে তোলে হেমলতা, কিন্তু তাদের নিয়ে স্বাধীনভাবে ঘর করতে পারে না। হেমলতার নির্দ্দেশ মত না চলবার জন্য বাসব প্রকাশ্যেই বউদের উপদেশ দেন, আর বধূদের উপস্থিতিতেই নানা প্রকারে স্ত্রীকে লাঞ্ছনা করেন। বউদের নিয়ে শ্বশুর এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেন যে তার মধ্যে হেমলতার স্থান নেই।

বউরা তাদের স্বামীদের সঙ্গে বিদেশে চ'লে গেল। তাদের সঙ্গে গেলে মেয়েদুটির হয়তো লেখাপড়ার সুবিধে হবে এই ক্ষীণ আশায় প্রলুব্ধ হ'য়ে হেমলতা তাদেরও পাঠাতে চায় সেই সঙ্গে। মেয়েরা, বউরা গেলে সে-ও এই তিক্ত আবেষ্টনী থেকে একবার মুক্ত হাওয়ায় বেরিয়ে ছেলেদের নতুন গৃহস্থালী গুছিয়ে দিয়ে আসবে অন্তরের এ প্রচ্ছন্ন কামনাটুকুকেও সে গোপনে ছেলেদের কাছে প্রকাশ করে; কিন্তু স্থানাভাব উল্লেখ ক'রে ছেলেরা মা বোনকে যেতে নিষেধ করে। হেমলতার অন্তরের আশার প্রদীপটী যেন ক্রমে তৈলহীন অনুজ্জ্বল হ'য়ে আসে।

বউদের নিয়ে ঘর বাঁধবার পর ছেলেরা নিয়মিত টাকা পাঠায় না ব'লেও স্বামীর অনেক গঞ্জনা সহ্য কর্‌তে হয় হেমলতার।

এরপর একদিন শাশুড়ীর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া ক'রে বাসব ছেলেদের কাছে চ'লে গেলেন। যে জামাইকে এতদিন সপরিবারে পালন ক'রে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছেন তার অকৃতজ্ঞতা আর ঔদ্ধত্য বৃদ্ধাকে দিন দিন অসহিষ্ণু ক'রে তুলেছিল। সেই জামাই যখন দংশন ক'রে নাগালের বাইরে চ'লে গেল, তখন তাঁর মনের সমস্ত উত্তাপ দগ্ধ ক'রতে লাগল হেমলতাকে, জন্মদায়িনী, আশ্রয় ও অন্নদায়িনী মায়ের অপমান যেমন হেমলতাকে বেদনা দেয়, আবার স্বামীকে আশ্রিত ক'রে রেখে তার সম্মানকে অহরহ লাঞ্ছিত করলেও সে আঘাত পায়, কিন্তু অন্তর্য্যামী ভিন্ন তার বেদনা বুঝবার তো কেউ নেই।

সহসা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যায়। অভিভাবক হীন গ্রামে তরুণী মেয়ে দুটি নিয়ে হেমলতা সংকিতা হ'য়ে ওঠে। গ্রামবাসিগণ উর্দ্ধশ্বাসে পশ্চিমবঙ্গে পলায়ন করে, সেই সময় একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী পেয়ে হেমলতাও কলকাতায় চ'লে আসে। মাকে সঙ্গে আস্‌বার জন্য সে অনেক মিনতি করে, কিন্তু ঐ অকৃতজ্ঞ বর্ব্বর জামাতার সংশ্রবে যেতে তিনি সম্মত হ'লেন না।

পথশ্রমে ক্লান্ত হেমলতা যখন ছেলেদের বাড়ী গিয়ে পৌঁছাল, তখন বাইরে ঝটিকার পূর্ব্বাভাস, আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকায়, মেঘের মৃদু কণ্ঠও শোনা যায়। ছেলেদের গৃহসজ্জা দেখে হেমলতা আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করে, সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের গহনে একটু বেদনার তীক্ষ্ণতাও অনুভব করে সে।

মাকে দেখে ছেলে বউরা এগিয়ে এসে প্রণাম করে কিন্তু বাসব এগিয়ে আসে বজ্রমুষ্টিতে, অনুমতি না নিয়ে সে চ'লে এসেছে কি স্পর্দ্ধায়? তার মা যখন অপমান ক'রে স্বামীকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন ক্ষীণ একটু প্রতিবাদও কি সে ক'রেছিল? যে স্ত্রীলোক স্বামীর চেয়ে মাকেই বেশী আপন মনে করে, সে স্ত্রীকে বিশ্বাস কর্‌লে বিষাদে পড়তে হয়। এখন সে স্নেহময়ী মায়ের ঘর ছেড়ে এখানে আসা হ'য়েছে কিসের ভরসায়? এখানে তার স্থান হবে না, সেই সুখের ঘরেই আবার তাকে ফিরে যেতে হবে।

ব'লেই সে দ্বারের দিকে হস্ত প্রসারিত করে। নির্ব্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে ছেলে বউরা, পিতার এই অন্যায় কটূক্তির একটুও প্রতিবাদ করে না; অশ্রুপ্লাবিত অসহায় দৃষ্টিতে হেমলতা ছেলেদের মুখের দিকে তাকায়, কিন্তু একটু আশ্রয় ও আশ্বাসের আভাস নিয়ে কেউ ওর চোখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে না। সমস্ত জীবন ভ'রে জীবনের সমস্ত পাথেয় নিঃশেষ ক'রে দিয়ে জীবন-সন্ধ্যায় সে আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? বালিকা বয়সে মা যাঁর হাতে সমর্পণ ক'রে দিয়েছিলেন, তার অশেষ অত্যাচারের চিহ্ন তার সর্ব্বাঙ্গ কলংকিত ক'রে আছে, কিন্তু তার সঙ্গে তো হেমলতার কোনো রক্তের সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু যারা তারই রক্ত-মাংস দিয়ে সৃষ্টি হ'য়েছে, যাদের মুখের দিকে চেয়ে সে সারাটা জীবনকে একমুষ্টি ধূলার মত অপব্যয় ক'রে ফেলেছে, তার অপমানে তাদের এ নিঃশব্দ সমর্থন কেন? কি তার অপরাধ? মার কাছে, স্বামীর কাছে, পুত্রকন্যার কাছে কি তার অপরাধ?

বাইরে তখন শন্ শন্ ক'রে বাতাস এই অবিচারের প্রতিবাদ জানায়, কোন্ এক সর্ব্বহারা নারীর হৃদয় বেদনা অনুভব ক'রে আকাশের চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে।

আনন্দরূপিণী

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আমার যৌবন-কুঞ্জে এখনও বসন্ত ফিরে আসে,
এখনও চম্পক বনে জেগে উঠি'সুরভি নিঃশ্বাসে।
এখনও পাখীর গানে অফুরান প্রাণের মরসুম,
ভেসে যাই ডুবে যাই, অতল গভীরে আসে ঘুম।

চিনিতে পারিনা যারে সেও আসে একান্ত নিকটে
পরিচয়ে মনে হয় যেন সে আমার চিত্তপটে
আঁকা ছিল চিরদিন, যেন সে আমার পরিচিতা
সম্মুখে দাঁড়াল মোর প্রেমময়ী নারী অসম্বৃতা।

অন্তর দেখিনু তা'র তাই তারে লাগিল যে ভালো
আজি দেখি দিগন্তের কুয়াসায় সে স্বপ্ন মিলাল।

রূপসজ্জা দেখেছিনু, বিলোল কটাক্ষে হারালাম
আমার সর্ব্বস্ব ধন ; একে একে তাহারে দিলাম
আমার চরম সত্য, উন্মুখী এ তনু দেহ মন
ত্যাগের আনন্দে সে কি করিলাম সর্ব্ব সমর্পণ ?

আজিকে সম্মুখে মোর ধূ ধূ করে মায়া মরীচিকা
আমার সম্মুখে জ্বলে চিতাবহ্নি মৃত্যুললাটিকা।

অমাবস্যা অন্ধকারে ঢেকে গেছে ভুবন আমার
ওপারের ডাক আসে,—বলে, হোল সময় যাবার।

কোথা যাব ? কোথা পথ ? পথ মোর আনন্দ-রূপিণী
হরিয়া আনন্দ মোর সে কি সাজিয়াছে বৈরাগিণী ?
চিনি চিনি তারে চিনি ; একবার যদি পাই দেখা
দেখিলে চিনিব আমি অধরের সে চুম্বন লেখা।

মুছিবার নহে তাহা, লুকাইবে বল কোন ছলে,
রজনীগন্ধার মালা নিজে তার দিয়েছিনু গলে।

তৃতীয়ার চাঁদ ছিল সাক্ষী তার, শুক্লপক্ষ রাতে
প্রথম বাসরসজ্জা, আমরা দু'জনে একসাথে
আনন্দ-সমুদ্রে যেন চলেছিনু তরণী বাহিয়া।
সেদিন অন্তরলোকে এ উহার উদ্দেশে চাহিয়া

দিয়েছিনু প্রতিশ্রুতি,—বলেছিনু শুধু দু'টি কথা
সে কথা সমুদ্র জানে, অন্তর্য্যামী জানে সে বারতা।

পুষ্পবতী হোল নাক অনুরাগে কামনার কলি,
অন্তর 'আঁধারি' মোর আনন্দ-রূপিণী গেল চলি'।

বারভুঁইয়ার ইতিহাস

বাক্‌লার রাজা রামচন্দ্র রায়

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

রাজা রামচন্দ্র রায় কন্দর্পনারায়ণের পুত্র এবং প্রতাপাদিত্যের জামাতা ছিলেন। পিতা কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর রামচন্দ্র রায় যখন বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইলেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র আট বৎসর। রালফ ফিচ্ (Ralph Fitch) যখন বাক্‌লা আসেন তখন তিনি বাক্‌লাকে বলিয়াছিলেন A large Hindu City (1586) হিন্দুদের একটি বৃহৎ নগরী।

চন্দ্রদ্বীপে সেকালে খৃষ্টীয় সমাজের (Society of Jesus) পর্ত্তুগীজ ধর্ম্মযাজকেরা বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার, লোক সেবা উপাসনামন্দির (গির্জ্জা ঘর চার্চ্চ) প্রতিষ্ঠার জন্য পরিভ্রমণ করিতেন। রামচন্দ্র যখন সিংহাসনে বসিয়াছেন, সে সময়ে মেলকিওর দ ফন্ সেকা নামে একজন ধর্ম্মযাজক, তাঁহার দরবারে আসিয়াছিলেন। ফন্ সেকা রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি সেই সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন: "আমি বাক্‌লাতে পৌঁছিবার পর রাজা আমাদের তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। আমি কয়েকজন স্বদেশবাসী পর্ত্তুগীজ সহ সেখানে উপস্থিত হইলাম। আমরা গিয়া দেখি রাজা সম্ভ্রান্ত লোক ও সেনাপতিগণসহ আসনে উপবিষ্ট আছেন। সুন্দর গালিচার উপরে সকলে উপবিষ্ট ছিলেন। রাজার বয়স মাত্র আট বৎসর। আমরা যেমন দরবারে প্রবেশ করিলাম, তৎক্ষণাৎ রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, মন্ত্রী, সেনাপতিগণ ও আমার পর্ত্তুগীজ বন্ধুগণ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলাম। আমি এক জন দরিদ্র ধর্ম্মযাজক মাত্র, রাজা আমাকে পরম সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার বিপরীতদিকের একখানি মূল্যবান গালিচার আসনে বসিতে অনুরোধ করিলেন। পরস্পরের অভ্যর্থনা ও শিষ্টাচার বিনিময়ের পরে রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: আপনি এখান হইতে কোথায় যাইবেন?

আমি উত্তর দিলাম, "চ্যাণ্ডিকান যাইব।" আমি জানিতাম চ্যাণ্ডিকানের অধিপতি রাজা রামচন্দ্রের ভবিষ্যত শ্বশুর, সম্ভবতঃ রাজা আমার এই কথায় সন্তুষ্ট হইলেন। আমি বলিলাম যে, "আমাদের যখন আপনার রাজ্য মধ্য দিয়া যাইতে হইতেছে, তখন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাওয়া একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। রাজা যদি তাঁহার রাজ্য মধ্যে আমাদিগকে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে এবং গীর্জ্জা নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে আমার সঙ্গীয় ধর্ম্মযাজকেরা এখানে অবস্থান করিয়া, তাঁহারা এই দুই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন।"

রাজা আমার কথা শুনিয়া বলিলেন—"আমি আপনাদের বিবিধ গুণাবলীর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি। আপনাদের প্রার্থনা আমি মঞ্জুর করিলাম।"

রামচন্দ্র রায় প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহকালে বিন্দুমতীর বয়স ছিল দ্বাদশ বৎসর আর রামচন্দ্রের বয়স ১৩।১৪ বৎসরের অধিক ছিল না। এ সম্বন্ধে একটি আখ্যান প্রচলিত আছে যে, রাজা প্রতাপাদিত্য বাক্‌লারাজ্য লাভ করিবার লোভে জামাতা রামচন্দ্রকে বিবাহের রাত্রিতে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করেন, এই বিষয় নবপরিণিতা পত্নী বিন্দুমতীর নিকট শুনিতে পাইয়া রামচন্দ্র কৌশলে তাঁহার সঙ্গী এবং দেহরক্ষী রামমল্লের সাহায্যে গোপনে প্রতাপাদিত্যের রাজপ্রাসাদ হইতে পলায়ন করিয়া এক চৌষট্টী দাঁড়যুক্ত তরণীতে উঠিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করেন। তাঁহার সেই দ্রুতগামী কোষ নৌকাতে কামান সজ্জিত ছিল। যখন তাঁহারা নিরাপদে বাহিরে বড় নদীতে পড়িলেন, তখন কামানে অগ্নি সংযোগ করা হইল, তোপধ্বনির কারণ অনুসন্ধান করিয়া রাত্রিশেষে প্রতাপ বুঝিলেন, রামচন্দ্র পলাইয়া গেলেন।

তিনি তখনই তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। সম্ভবত সংবাদ বাহক রামচন্দ্রের নৌকা ধরিতে পারেন নাই, অথবা পারিলেও রামচন্দ্র শ্বশুরের ব্যবহারে ক্রোধান্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিতে সম্মত হন নাই।

এ বিষয়ে বাক্‌লা ও যশোরে প্রচলিত কিংবদন্তী এই রূপ: "বিবাহার্থী রাজা রামচন্দ্র বহু সমৃদ্ধি সহকারে বহু

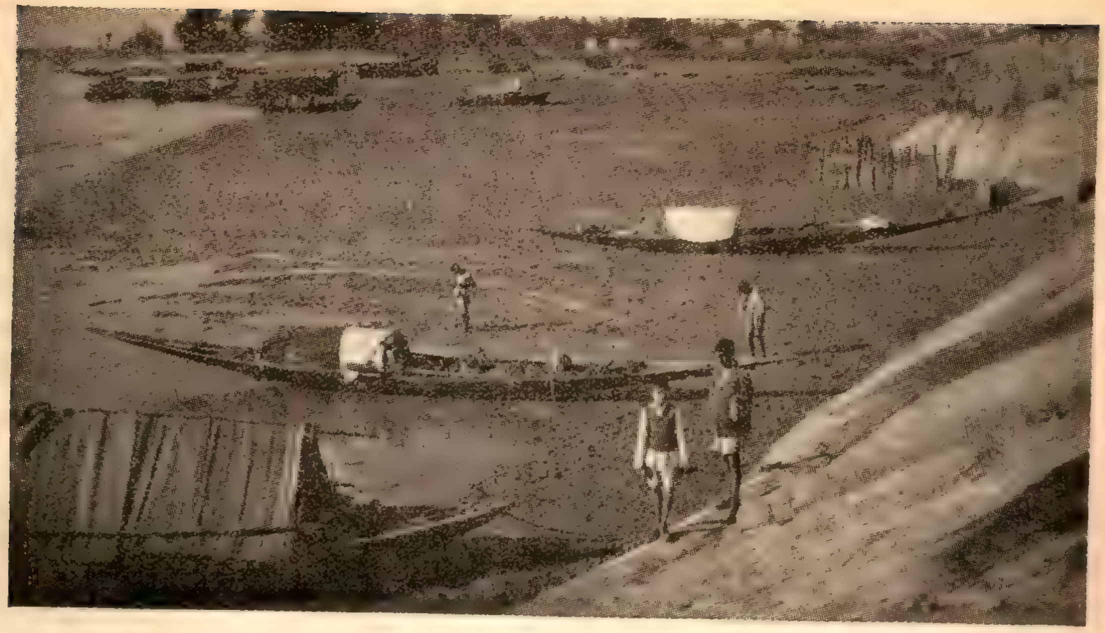

খেয়া ঘাট

ফটো—স্কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সমারোহ পূর্ব্বক রাজা প্রতাপাদিত্যের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। বিবাহ রাত্রিতে বিবাহ কার্য্য সমাপনান্তর বর কন্যা গৃহে প্রবৃষ্ট হইলে, বর রাজা রামচন্দ্র শুনিতে পাইলেন যে, অদ্য রাত্রিতে তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজা প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক চন্দ্রদ্বীপের রাজত্ব ও কায়স্থসমাজ-পতিত্ব অধিকার করা হইবে, তাহার সমুদায় মন্ত্রণা স্থির হইয়াছে। (কেহ বলেন, রাজা তাঁহার নববিবাহিত পত্নীর নিকট এই মন্ত্রণার কথা শুনিতে পান; কেহ বলেন, রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য রাজা বসন্ত রায় তাঁহাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করেন।) আর ইহাও তিনি অবগত হইলেন যে, রাজধানীতে আসিতে হইলে যে খাল দিয়া আসিতে হয়, তাহা বৃহৎ কাষ্ঠ সকল দ্বারা রুদ্ধ করা হইয়াছে। অন্তঃপুরে রাজা রামচন্দ্র এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তাঁহার ভৃত্য ও রক্ষিবর্গ তখন রাজবাটীর বহির্ভাগে ছিল। তিনি একাকী নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায় পড়িয়া অত্যন্ত শঙ্কট ভাবিতে লাগিলেন; পরিশেষে কেহ বলেন, রাজা বসন্তরায়ের, কেহ বলেন—তাঁহার নব-বিবাহিতা পত্নীর সাহায্যে অবরুদ্ধ রাজপুরী উত্তীর্ণ হইয়া আইলেন। রাজার দিগের সর্দ্দার রামমোহন মাল অতি বলবান ব্যক্তি ছিল। সে আপন প্রভুর মুখে সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহার অধীনস্থ লোকদিগের সাহায্যে রাজার ৬৪ দাঁড়ের কোষ নৌকা আনয়নপূর্ব্বক খালমধ্যস্থ কাষ্ঠাদির উপর দিয়া তাঁহাকে ত্বরিত গতিতে একেবারে প্রতাপাদিত্যের অধিকারস্থ স্থান অতিক্রান্ত করিয়া আনিল। রাজবাটী হইতে কতক দূরে আসিয়া নৌকাস্থিত কামানের শব্দদ্বারা রাজা বিপক্ষপক্ষকে তাঁহার গমন সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ তাঁহার গমন প্রতিরোধার্থ উপস্থিত হইল না।

এইরূপে রাজা রামচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার নববিবাহিতা পত্নী পিতৃগৃহেই রহিলেন। রাজা তাঁহাকে স্বালয়ে আনিবার ইচ্ছা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

কয়েক বৎসর পরে উক্ত রাজপত্নী কাশীযাত্রাচ্ছলে বহু সংখ্যক রক্ষী, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে নৌকাযানে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। কিন্তু তিনি আপনা হইতে রাজাকে আপনার আগমন বৃত্তান্ত না জানাইয়া, রাজবাটীর কিঞ্চিৎ দূরে নৌকাতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায়

ও বাসনা ছিল যে, রাজা আপনা হইতে তাঁহার আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা পূর্ব্বক স্বভবনে লইয়া যাইবেন। তিনি প্রথমতঃ যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহার তীরোপরি প্রতি সপ্তাহে দুইবার এক হাট বসিতে আরম্ভ হইল। এখন সে স্থানে হাট নাই; কিন্তু সেই স্থানটিই "বউ ঠাকুরাণীর হাট" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া পরে তিনি বিল্ববাটি গ্রামের উত্তরে সারসী গ্রামের নিকট নৌকা লাগাইয়া তথায় কিছু দিন ছিলেন। সেই সারসী গ্রামে তিনি এক বৃহৎ দীঘি খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সর্ব্বদা নৌকাতে থাকিতেন; কখন কখন তীরে তাম্বু ফেলিয়া তাহার মধ্যে উঠিয়া বসিতেন। তাঁহার এই সকল কীর্ত্তির বিষয় রাজার কর্ণগোচর হইল। কিন্তু কে তিনি, রাজা তাহার পরিচয় না পাইয়া তাঁহার বিষয়ে কোন মনোযোগ করিলেন না। পরে রাজার অন্তঃপুরে তাঁহার পরিচয় পরিজ্ঞাত হইল। রাজমাতা বধূর আগমন বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে স্বভবনে আনয়ন করিবার নিমিত্ত স্বয়ং তাঁহার নৌকাতে আগমন করিলেন। তাহাতে রাজপত্নী এক থাল মোহর দিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করেন। পরে তিনি সমারোহ পূর্ব্বক বধূকে স্বভবনে লইয়া গেলেন। কিন্তু বধূকে গৃহে আনিয়া রাজমাতার মনোভিলাষ পূর্ণ হইল না। রাজার চিত্ত বিবাহ রাত্রি অবধি প্রতাপাদিত্য ও তাঁহার সমস্ত পরিবারের প্রতি যে কেমন বীতরাগ ও বিরূপ হইয়াছিল, সে ভাব আর কোন মতে পরিবর্ত্তিত হইল না। রাজমাতা বধূকে গৃহে আনয়ন করিলে রাজা তিন দিবস দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিলেন, তথাপি সেই পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। রাজপত্নী তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যাকুলা হইয়া বিস্তর রোদন করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমে তাঁহার ভাগ্যে পতি সন্দর্শন লাভ হইল না। তিনি এইরূপে ভগ্ন মনোরথ হইয়া তথা হইতে একেবারে কাশীধামে যাত্রা করেন। রাণীর ভাগ্যে পতি সন্দর্শন লাভ হইল না বটে, কিন্তু তিনি পতির প্রসাদ লাভ বিষয়ে একান্ত বঞ্চিত হন নাই। তিনি যে সকল লোককে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহাদিগকে কিছু কিছু বিত্ত দিয়া চন্দ্রদ্বীপে রাখিয়া গেলেন, রাজা তাহার প্রতিবন্ধক হইলেন না। *

রামরাম বসু বলেন যে, বিবাহের পর প্রতাপাদিত্য রামচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখেন, এবং তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। রামচন্দ্র পত্নীর নিকট হইতে তাহা শুনিয়া শ্যালক উদয়াদিত্যের সাহায্যে মশালধারীর বেশে প্রতাপাদিত্যের ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নৌকাযোগে বাকলায় প্রস্থান করেন, এবং তোপধ্বনি দ্বারা আপনার পলায়ন জ্ঞাপন করেন। বসন্ত রায়। তাঁহার পলায়নের সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া প্রচার হয়। প্রতাপ যে রামচন্দ্রকে বধ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে প্রাচীন ঘটককারিকায় লিখিত বিবরণই বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া মনে হয়, তাহাতে আছে :—

"যশোহরেশ্বরো মানী প্রতাপস্য দুহিতরং।
বিন্দুমতীং মহাসতী মুপয়েমে নৃপোত্তমঃ॥
ততো বিবাহযামিন্যাং ক্রুরোর্যশোহরেশ্বরঃ।
সমাজস্যাধিপত্যর্থং লাভং চন্দ্রদ্বীপস্য চ।
মন্ত্রণাং পাত্রভিঃ সার্দ্ধং কৃত্বাসৌ ভীমবিক্রমঃ।
কুচক্রং কল্পয়ামান স্বজামাতুর্ব্বধং প্রতি।
এতৎ সর্ব্বং রামচন্দ্রঃ শ্রুত্বা পত্নীমুখাত্ততঃ।
কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়াত্মা মহাচিন্তান্বিতোঽভবৎ।
মল্ল কুলোদ্ভবো মল্লো রামনারায়ণঃ শূরঃ।
সামন্তস্তস্য বিখ্যাতো মহাবল সমন্বিতঃ।
শ্রুত্বা সকল সবাদং নৃপস্য প্রমুখাত্ততঃ।
চতুঃ ষষ্টি দণ্ডযুতা নৌকানীতা মহামতিঃ॥
নালীকৈঃ সজ্জিতা স্বৈরং সৈন্যাস্তৈঃ পরিরক্ষিতা।
তস্যামারোহণং কৃত্বা প্রগৃহ্য নালীকায়ুধং।
তূর্ণং গমনবার্ত্তাঞ্চ নালীকাধ্বনি নিদদৌ।
কল্পয়িত্বা শত্রুপুরীং স্বরাজ্যে পুনরাগতঃ॥

রামমোহন মল্লও কায়স্থ বংশজঃ ছিলেন। উজীরপুরের সিংহরায়গণ উক্ত রামমোহন মল্লের বংশোদ্ভব। *

---

* চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ ৩৫—৩৬ পৃষ্ঠা। – ব্রজসুন্দর মিত্র।

* সত্যচরণ শাস্ত্রী, নিখিল নাথ রায় প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ বিন্দুমতী নামই গ্রহণ করিয়াছেন। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ

ঘটককারিকায় প্রতাপের কন্যার নাম বিন্দুমতী বলিয়া লিখিত আছে :

"যঃশাহরেশ্বরো মানী প্রতাপস্য দুহিতরং।
বিন্দুমতীং মহাসতীমুপযেমে নৃপোত্তমঃ॥

চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ প্রণেতা বলেন যে—রাজা রামচন্দ্রের সহিত বিন্দুমতীর মিলন হয় নাই, একথা প্রকৃত নহে। "কয়েকদিন পরে রামচন্দ্র পত্নীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন প্রতাপ-দুহিতা তখন নিজের চরিত্রগুণে রাজ্যেশ্বরের হৃদয় রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন।

তাঁহারই গর্ভে রামচন্দ্রের কীর্ত্তিনারায়ণ ও বসুদেব নামক দুই মহাবলশালী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর কীর্ত্তিনারায়ণ রাজা হন, তিনি মহাবীর ও নৌযুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন।"

দুই

রামচন্দ্রও পিতা কন্দর্পনারায়ণের মত বীর ছিলেন। তাঁহার বীরত্ব ও রণ নৈপুণ্যের সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। মোগলেরা যখন বার ভুঁইয়াদের দমন করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, সে সময়ে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে জমিদার শ্রেণী স্বদেশবাসী সকলের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শক্তিশালী মোগলের সহিত যুদ্ধ করেন।

বাক্‌লার রাজা রামচন্দ্রও স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়া বিশেষ সাহসিকতার সহিত এক সপ্তাহ কাল মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

ইস্‌লাম খাঁ বাক্‌লার রাজা রামচন্দ্রকে পরাজিত করিবার জন্য গিয়াস খাঁ নামে একজন মোগল সেনাপতিকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন—কিন্তু গিয়াস রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে বিজয়ী হইতে না পারায়, সুবেদার সৈয়দ হাকিম, সৈয়দ বাও, মির্জ্জা নুরুদ্দিন, রাজা শত্রুজিৎ এবং ইসলাম কুলির অধিনায়কত্বে এক বিরাট নৌবহর, তিন হাজার গোলন্দাজ, বহু হস্তী এবং অন্যান্য রণসম্ভার সহ রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। সৈয়দ হাকিম এক শুভ মুহূর্ত্তে রণযাত্রা করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাক্‌লার নিকট গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

রামচন্দ্রের মাতা মোগলের সহিত যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ পুত্রকে মোগলের সহিত যুদ্ধ করিতে নিবৃত্ত হইবার জন্য আদেশ করেন। কিন্তু রাজা রামচন্দ্র তাঁহার দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণের পরামর্শে মোগল সৈন্যবাহিনীর গতি রোধ করিবার জন্য একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া—নিজে নৌবহর, পদাতিক, অশ্বারোহী, তীরন্দাজ ও গোলন্দাজ সৈন্য লইয়া এক সপ্তাহকাল সাহসিকতার সহিত মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র কিংবা মোগলপক্ষীয়েরা যুদ্ধ হইলে কোন্ পক্ষ জয়ী হইতেন বলা যায় না।

কিন্তু তাঁহার মাতা, পুত্র যুদ্ধ হইতে বিরত না হইলে বিষপানে আত্মহত্যা করিবেন এই ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। মাতৃভক্ত রামচন্দ্র বাধ্য হইয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলেন এবং মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

সুবেদার ইসলাম খাঁর আদেশে রাজা শত্রুজিত রাজা রামচন্দ্রকে জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকা) বন্দীভাবে লইয়া গিয়া নবাবের নিকট উপস্থিত করিলেন। সুবেদার রাজা রামচন্দ্রকে নৌবহর ইত্যাদি তাঁহার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহের উপযোগী রাজ্যাংশ দিয়া বক্রী ভূ-খণ্ড করোরি এবং জায়গীরদারদের মধ্যে বিলাইয়া দিলেন। মুছা খাঁ মসনদ আলি প্রভৃতির ন্যায় রামচন্দ্রও মোগলদের নজরবন্দী হিসাবে বিশ্বস্ত মোগল কর্ম্মচারীদের তত্ত্বাবধানে রহিলেন। রাজা শত্রুজিতের প্রতি সুবেদার সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে খেলাৎ ও বিবিধ পুরস্কার দিয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং সুবেদারের আদেশে মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ সৈয়াদ হাকিমের সহিত মিলিত হইবার জন্য বহু সৈন্যসহকারে এইবার তাঁহাকে মহারাজা প্রতাপাদিত্যকে আক্রমণ করিবার জন্য যশোহর যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন।

এইরূপে রাজা রামচন্দ্র ঢাকাতে নবাবের নজরবন্দী রহিলেন। শত্রুজিত—ভূষণার মুকুন্দ রায়ের পুত্র ছিলেন। রাজা রামচন্দ্রকে জাহাঙ্গীর নগরে রাখিয়া পুনরায় শত্রুজিত

বিদ্যাবিনোদ, হারাণ চন্দ্র রক্ষিত (ঔপন্যাসিক)ও বিন্দুমতী নাম গ্রহণ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ও প্রসিদ্ধ লেখক যোগিণী কুমার সেন লিখিয়াছেন :—"মাধব পাশার রাজা শ্রীযুক্ত বীরসিংহ নারায়ণ বলেন যে, রামচন্দ্রের পত্নীর নাম বিমলা। প্রতাপাদিত্য প্রদত্ত যৌতুকভূমি তৎকন্যা বিমলার নামেই প্রদত্ত হইয়াছে।" বাক্‌লার—১৭১ পৃষ্ঠা। তদনুসারে তিনি স্বীয় পুস্তকে বাক্‌লা নামই গ্রহণ করিয়াছেন। যৌতুক দিবার দানপত্রে যদি প্রকৃতই বিমলা নাম থাকে, তবে তাহাই গ্রাহ্য। বিমলার অন্য নাম বিন্দুমতীও থাকিতে পারে।—যশোহর—খুলনার ইতিহাস ৩২৩ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যশোহর যাত্রা করিয়াছিলেন।

রাজা রামচন্দ্র যে বীরপুরুষ, স্বাধীনতা প্রিয় এবং নির্ভীক ব্যক্তি ছিলেন, তাহা মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতেই বুঝিতে পারা যায়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বাক্‌লার অধিপতি রামচন্দ্রের রাজ্য জয় করিবার জন্য মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ সৈয়দ হাকিম প্রেরিত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের রাজ্যের সীমান্ত দুর্গ যখন মোগলেরা জয় করিয়া দেশমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন রাজমাতা পুত্রকে বলিলেন : "তুই যদি মোগলের সহিত সন্ধি না করিস, তবে আমি বিষ খাইয়া মরিব।" তখন বাধ্য হইয়াই রামচন্দ্র মোগল সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ইস্‌লাম খাঁ এই বিজয় সংবাদ জ্ঞাত হইয়া রামচন্দ্রকে শত্রুজিতের সাহায্যে ঢাকায় লইয়া গিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন এবং সৈয়দ হাকিমকে হুকুম দিলেন যে, বাক্‌লা হইতে দক্ষিণ দিকে যশোহর আক্রমণ করিয়া ইনায়েৎ খাঁর সাহায্য কর।... সম্ভবতঃ রামচন্দ্র, প্রতাপাদিত্যের জামাতা, এই কথা জানিয়া, তিনি যাহাতে কিছুতেই শ্বশুরকে কোন সাহায্য করিতে না পারেন, এইজন্য প্রতাপের পরাজয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে ঢাকাতে আটক রাখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি আর কোন দুর্ব্যবহার করা হয় নাই, ইহা সত্য কথা। রামচন্দ্র শীঘ্রই স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন।*

রাজা রামচন্দ্র সম্বন্ধে আর একটি কাহিনী জানিতে পারা যায়। তাহা এই—রাজা রামচন্দ্রের পিতা রাজা কন্দর্পনারায়ণের সময়ে মেঘনা নদীর পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী ভুলুয়া পরগণায় লক্ষ্মণমাণিক্য নামে এক জমিদার ছিলেন।

তিনি রাজোপাধি ধারণ করিতেন। রাজা কন্দর্পনারায়ণ যেমন অতি বলিষ্ঠ ও যোদ্ধা ছিলেন, রাজা লক্ষণমাণিক্যও সেইরূপ বলিষ্ঠ ও বীরপুরুষ ছিলেন। অধিকন্তু তিনি অতি গর্ব্বিত ছিলেন। ইঁহারা উভয়ে পরস্পরকে বিশেষ জানিতেন। রাজা কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যু হইলে রাজা লক্ষণমাণিক্য রাজা রামচন্দ্রকে নিতান্ত বালক বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া কথা বলিতেন, তাহাতে রাজা রামচন্দ্র উত্তেজিত হইয়া সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ গমন করেন।

রাজা লক্ষণমাণিক্য শ্রবণ করিলেন, তাঁহার তুচ্ছীকৃত বালক রাজা রামচন্দ্র তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া তাঁহার দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি ক্রোধে ও গর্ব্বে পরিপূরিত হইলেন এবং অবলীলাক্রমে সেই বালককে পরাভব ও নিধন করিতে পারিবেন, এই বিশ্বাসে একাকী রাজা রামচন্দ্রের নৌকার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা রামচন্দ্রের এইরূপ আগমনে তাঁহার এত দূর কোপ ও অভিমান জন্মিয়াছিল যে, তিনি নদী তীরে উপস্থিত হইয়া মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা করিতে পারিলেনন না, অমনি রাজার নৌকোপরি লম্ফ দিয়া পড়িলেন। কিন্তু দৈবযোগে এইরূপ হইল যে, তিনি নৌকার উপরিভাগে পতিত না হইয়া তাহার ডহরের মধ্যে পতিত হইলেন। সেই সময়ে রাজা রামচন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত রামমোহন মাল প্রভৃতি সামন্তগণ সতর্ক ছিল, তাহারা তাঁহাকে ডহর হইতে আর উঠিতে দিলনা, সেইখানে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া নৌকাবক্ষে বন্ধন পূর্ব্বক, তাহারা অমনি নৌকা খুলিয়া দিল। নৌকা তীরবেগে পশ্চিমাভিমুখে ধাবমান হইল। লক্ষণমাণিক্য তদবস্থাতেই রহিলেন। কিয়দ্দিন পরে নৌকা চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া পৌছিলেন।

এইরূপে রাজা রামচন্দ্র দুর্দ্দান্ত লক্ষণমাণিক্যকে বন্ধন করিয়া স্বদেশে আনিয়া তাঁহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মাতা লক্ষণমাণিক্যের দীর্ঘাকৃতি সুন্দর বলিষ্ঠ শরীর দর্শন করিয়া তাঁহাকে লৌহ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখেন। এক দিবস রাজা তৈল মাখিতেছেন এমন সময় তাঁহাকে লৌহ পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া আনা হইয়াছিল। লক্ষণমাণিক্য এক নারিকেল বৃক্ষের নিকট দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি রাজা রামচন্দ্রের উপর বৈর নির্য্যাতন করিবার অবকাশ অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এক্ষণে সেই নারিকেল বৃক্ষে হেলান দিয়া রাজার অভিমুখে এমনি চাড় দিলেন যে, তৎক্ষণাৎ তাহা ভগ্ন হইয়া রাজার নিকটেই পতিত হইল, ধর্ম্মে ধর্ম্মে রাজার প্রাণ রক্ষা হইল। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজমাতা এরূপ আতঙ্কিত হইয়াছিলেন যে, সেই প্রবল শত্রুকে তিনি গৃহে রাখিতে একান্ত সঙ্কুচিত হইলেন। পরে তাঁহার সম্মতি হইলে রাজা রামচন্দ্র লক্ষণ মাণিক্যকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। †

বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের পরবর্ত্তী বিবরণ অর্থাৎ রাজা রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর কিরূপ পরিণতি হইয়াছিল সে কথা পরে বলিব।

* বহারিস্তান ই-গাইবি—Dr. M. L Norah, M. A, B. L. (Dac.) PhD. (London) Vol. I P. 131.

† J, A, S, B, 1874, চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ ও বঙ্গজ কায়স্থগণের বিবরণ, ৩৭—৪০ পৃষ্ঠা

পারফেক্ট মার্ডার

অলকা মুখোপাধ্যায়

প্রবীণ বিচক্ষণ ডিটেকটিভ হিতেন রায় তিরীশ বছরে তিনশো খুনীকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে যেদিন সরকারী চাকরি থেকে বিদায় নিলেন, সেদিন দপ্তরের সবাই যত দুঃখিত হল তত আনন্দিত হল খুনের বাজারে যারা চোরা ব্যবসা করে তারা! সহকর্মীরা বললেন, 'আহা এমন বিচক্ষণ লোক আর হবে না'! রাত্রির অন্ধকারে যারা লুকিয়ে বেড়ায় তারা বললে, "বাঁচা গেল, এবার আমাদের ধরে কার বাবার সাধ্যি!"

বিদায় নেবার দিন বিকেলবেলায় সম্বর্দ্ধনা সভা, নতুন বিভাগীয় কর্তা সমীর সেন সভাপতি। সমীর সেন অল্প-বয়সী, উচ্চ শিক্ষিত কিন্তু উদ্ধত প্রকৃতি। বয়সের তুলনায় সমীর বেশী কথা বলে, মনে মনে হিতেন রায়কে হিংসা করে, তাই বোধ হয় জোর গলায়, সবার সামনে তাঁকে, বড় বড় কথা ব'লে ছোট করায় তার আত্মপ্রসাদ। তিন মাস ওঁরা এক সঙ্গে কাজ করেছিলেন, সেই তিন মাস কেবলই সমীর সেন ওঁকে সকলের কাছে ছোট প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছে—বলেছে, "ধৈঁতিয়ে ধৈঁতিয়ে পঁচিশ বছরে ডিরেক্টর হ'য়ে পাঁচ বছর ডিরেক্টরী করা আর বিদেশী শিক্ষা নিয়ে সোজা সহকারী ডিরেক্টর হওয়ার মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য, ওঁর ভোঁতা অভিজ্ঞতার ওজন আছে, আমার আছে তীক্ষ্ণ ধার বুদ্ধির জোর!"

এই 'অভিজ্ঞতা' আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বন্দ্ব সমাস বেশ জোরের সঙ্গে ঘটে গেল হিতেন রায়ের বিদায়ী সভায়! কথাপ্রসঙ্গে হিতেন রায় বললেন "কর্ম্মী জীবনে আমার সাফল্য যা কিছু তার মূলে আছে আমার ভাগ্য-লীলা আর আমার সহকর্ম্মীদের সাহায্য। 'Perfect murder' হয় না এটা রায়ের কথা—আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি এমন বহু খুন হয়েছে যেখানে খুনী আসামী এমন কোন কিছু প্রমাণ দিয়ে যায়নি যে-সূত্র ধ'রে তাকে ধরা যায়। যাঁরা বলেন পারফেক্ট মার্ডার অসম্ভব তাঁরা পণ্ডিত কিন্তু বিচক্ষণ নন!"

কথাগুলো উনি কাউকে উদ্দেশ্য ক'রে বলেননি, কিন্তু সভাপতি সমীর সেনের মনে হল কথাগুলো ওঁকে উপলক্ষ ক'রেই বুঝি ছোড়া হয়েছে। নিজের বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাই সমীর সেন বলে বসল—

"Perfect murder হয় একথা আমি বিশ্বাস করি না, যাঁরা বলেন হয়, তাঁরা হাততালির মোহ নিয়ে বলেন—তাঁরা বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত নতুনদের ছোট করার জন্যেই একথা বলেন। Crime detection ব'লে যে পদ্ধতি বহু বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে আজ সারা পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে Perfect murder হয়েছে।"

বিদায়ী সভার বেদনা ছাড়িয়ে উঠল এই পুরাতন ও নতুনের মতবাদের সংঘর্ষ।

তিনবছর পরের ঘটনা।

বিপত্নীক হিতেন রায়ের একমাত্র ছেলে যেদিন বাইশ বছর বয়সে মারা গেল সেদিন তিনি কলকাতা ছেড়ে উঠে গেলেন নতুন আলিপুরের শেষ প্রান্তে তার নতুন ছোট্ট বাড়ীতে। ঐ পাড়ায় তিনটে ছোট ছোট বাড়ী, একটা ওঁর, একটা সমীর সেনের বাবা রাজেন সেনের আর তার পাশের বাড়ীটায় ভাড়াটে তাঁরই ছোট বেলাকার বন্ধু বিমান ঘোষ। তিনি বিপত্নীক, বৃদ্ধ, সকাল বিকেল তাস খেলেন, পাশা খেলেন গল্প করেন আর বেড়িয়ে বেড়ান। মাঝে মাঝে দুই বন্ধু রাজেন সেন আর বিমান ঘোষের ঝগড়া বাঁধে, উনি সেটা প্রথমে উপভোগ করেন তারপর মিটমাট করেন। রাজেন সেন আর বিমান ঘোষ সহপাঠি ছিলেন, যৌবনকালে একসঙ্গে ব্যবসাও করেন, কিন্তু বিমান ঘোষের স্ত্রী আর রাজেন সেনকে নিয়ে যখন কানাঘুঁষো নানারকম কথা ওঠে, তখন ওদের ছাড়াছাড়ি হয়, সোনা

যায় দুই বন্ধুর মধ্যে তুমুল ঝগড়াও নাকি হয়েছিল, তবে কুড়িবছর মুখ দেখাদেখি যে বন্ধ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই ঘটনার তিরিশ বছর পর আবার যখন দুই বন্ধু আচমকা পাশাপাশি বাড়ীতে উঠে এলেন তখন দেখা গেল বিমান ঘোষ সরকারের কাছ থেকে পেনসন পান মাসে একশো টাকা আর রাজেন সেন তাঁদের পুরোণো ব্যবসা থেকে মাসে রোজগার করেন চার হাজার। ব্যবসা আজকাল ছোট ছেলে অমলই চালায় কারণ বড় ছেলে সমীর সেন সরকারী ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টর।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় তিনবন্ধুর আসরে এসে যোগ দিল সমীর সেন, বাবাকে মাঝে মাঝে এসে সে দেখে যায়, গল্প করে ঘণ্টাদুয়েক কাটিয়ে যায়। খাওয়ার টেবিলে কথাপ্রসঙ্গে অনেক পুরোণো কথা উঠল, সমীর সেন টেবিল চাপড়িয়ে বললে, "আপনি যাই বলুন না কেন Perfect murder বলে কোন কথা আমি বিশ্বাস করি না। খুব যদি কেউ করে, তাহলে খুনী এমন কিছু প্রমাণ রেখে যাবেই—যাতে তাকে খুঁজে বের করা সম্ভব হয়।

হিতেন রায় হেসে বললেন, "বই পড়া বিদ্যা আর অভিজ্ঞতা দুটোর মধ্যে অনেক প্রভেদ।"

সমীর সেন নটার সময় উঠে চলে গেল। হিতেন রায় তার চলে যাবার পথের দিকে চাইলেন, এক পলক।

পরদিন তিন বৃদ্ধ গল্প করছিলেন রাত্তির বেলা—বোধ হয় দশটার সময় রাজেন সেনের চাকর কফি দিতে এসে শুনল রাজেন সেন আর বিমান ঘোষের মধ্যে তাঁদের পুরোণো কথা নিয়ে তুমুল তর্ক, ঝগড়াও বলা চলে। হাই-কোর্টে সাক্ষ্য দেবার সময় সে বলেছিল, "হুজুর সব কথা আমার মনে নেই। বাবুরা খাওয়া দাওয়া ক'রে গল্প কর-ছিলেন আমি বাসন মাজছিলাম—হঠাৎ, তখন বোধ হয় রাত দশটা বাজে, বাবুর গলার আওয়াজ শুনলাম—বুঝতে পারলাম বিমান বাবুর সঙ্গে তর্ক লেগেছে। তার একটু পরেই বাবু কফি চাইলেন, আমি কফি নিয়ে ওঁদের ঘরে ঢুকতে যাব এমন সময় হিতেন বাবু দরজার কাছে এসে বললেন, "রঘু ট্রেটা আমায় দাও আমি নিয়ে যাচ্ছি—ওঘরে বিমান বাবুর সঙ্গে তোমার বাবুর ঝগড়া হচ্ছে, এখন তোমার যাওয়া উচিৎ হবে না।—আমি ট্রেটা হিতেন বাবুকে দিলাম। তখন শুনতে পেলাম পাশের ঘরে বিমান বাবু আমাদের বাবুকে বলছেন, 'তখন আমি তোমাকে খুন করতে পারতাম, করিনি যে কেন তা জানিনা!' পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে দেখলাম আমাদের বাবু খুব উত্তেজিত হ'য়ে ঘরে পায়চারি করছেন!"

খানিকটা কেঁদে নিয়ে রঘু বলেছিল, "তার অল্পক্ষণ পরে হিতেন বাবু চলে গেলেন বাড়ী, ঘরে তখনও ঝগড়া চলছে। যাবার সময় উনি বলে গেলেন, রঘু, যদি দরকার হয় আমাকে খবর দিও!

হিতেন বাবুর চলে যাওয়ার পর আরও প্রায় পোনেরো মিনিট তর্ক, হয়েছিল তারপর বিমান বাবু চলে গেলেন, তাও আমি দেখেছি।"

"তারপর ?"

তারপর বাবু নিজের ঘরে গেলেন, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন, বিলেতি তালা দরজায়, ভেতর থেকে চাবির দরকার হয় না, বন্ধ করলেই চলে। বাইরে থেকে খুলতে গেলে চাবির দরকার হয়! বাবু শুয়ে পড়বার পরই আমিও শুয়ে পড়লাম!"

"তারপর, সকাল বেলায় কি দেখলে ?

সকাল ছটার সময় বাবুকে রোজ চা দিতাম। সেদিনও সকাল বেলায় চা নিয়ে বাবুর ঘরের সামনে এসে দেখলাম বাবু তখনও ঘুমোচ্ছেন—অন্যদিন বাবু সকাল পাঁচটায় উঠে দরজা খুলে রাখতেন। আমি ফিরে গেলাম। সাতটার সময় আবার চা নিয়ে এলাম, দরজা তখনও ভেতর থেকে বন্ধ। তখন আমার মনে সন্দেহ হল—বাবুকে ডাকলাম কিন্তু ভেতর থেকে কোন জবাব পেলাম না—খুব জোরে দরজা ধাক্কা দিলাম, তবুও জবাব পেলাম না—তখন ছুটে গিয়ে হিতেন বাবুকে খবর দিলাম। হিতেন বাবু ঘুমোচ্ছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠে এলেন আমার সঙ্গে।"

"কেঁদো না, বলে যাও তারপর কি হল ?"

"তারপর", রঘু বলেছিল, "তারপর হিতেন বাবু তিন চারবার দরজা ধাক্কা দিলেন, বাবুর নাম ধ'রে ডাকলেন, তখনও যখন উত্তর পেলেন না তখন কাঁধ দিয়ে দরজাটায় খুব জোরে ধাক্কা মারলেন—দুবার ধাক্কা মারতেই

দরজাটার বিলেতি কব্জাটা ভেঙে গেল—ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গেই হিতেন বাবু দরজায় দাঁড়ালেন আর চিৎকার ক'রে উঠলেন—"খুন!"

"তারপর?"

"তারপর আমার দিকে ঘুরে বললেন, রঘু তোমার বাবু খুন হয়েছেন তুমি শিগ্‌গীর তোমার দাদাবাবুকে টেলিফোন কর! আমি ছুটে গিয়ে টেলিফোন করেই বাবুর ঘরে এলাম, দেখলাম বাবুর গলাটা কাটা, বিছানায় রক্তারক্তি আর হিতেন বাবু ঘরের কোনে চেয়ারে ব'সে আছেন, চোখ দিয়ে তাঁর জল পড়ছে!"

রঘু কাঁদতে লাগল।

তারপরের ঘটনা বললে রাজেন সেনের ছেলে সমীর সেন।

"আমি খবর পেয়েই পোনেরো মিনিটের মধ্যে সেখানে উপস্থিত হলাম—দেখলাম বিছানায় বাবা শুয়ে, গলাটা ক্ষুর দিয়ে কাটা; বাবার দাঁড়ি কামাবার ক্ষুরটা ঘরের মধ্যেই একটা টেবিলে থাকত, তাই প্রথমে মনে হল হয়ত বাবা আত্মহত্যা করেছেন—কিন্তু বাবার ক্ষুরটা কোথাও খুঁজে পেলাম না। রঘুকে প্রশ্ন ক'রে জানলাম আগের দিন রাত্রে বিমান বাবুর সঙ্গে বাবার ঝগড়া হয়েছিল, তাই প্রথমেই তাঁকে সন্দেহ হল। তাঁর বাড়ীতে লোকজন নিয়ে গিয়ে শুনলাম তিনি তখনও ঘুমোচ্ছেন। তাঁর চাকর বললে—বাবু অন্যদিন ভোর বেলাই ওঠেন, কিন্তু আজ এখনও ওঠেন নি। আমার সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। তাঁকে জাগিয়ে তুলে ঘরটা খানাতল্লাসী আরম্ভ করলাম, ওঁর কোটের পকেটে পেলাম বাবার ঘরের চাবিটা, আর ওরই বাড়ীর কম্পাউণ্ডের পাঁচিলের ধারে ফুল গাছের মধ্যে পেলাম বাবার ক্ষুরটা!"

শুনানীর তিনমাস পর বিমানবাবুর ফাঁসির হুকুম হল। বলা বাহুল্য সমীর সেন নিজেই তদন্ত করেছিল।

যে দিন ফাঁসি হবে তার আগের দিন সন্ধ্যা বেলায় হিতেনবাবু সমীর সেনকে ডেকে পাঠালেন নিজের বাড়ীতে, বললেন, "এবার প্রমান পেলে?"

"কিসের?"

"Perfect murder এর?"

একটা ঢোক গিলে সমীর সেন বললে, "মানে?"

একটা সিগারেট ধরিয়ে হিতেন রায় বললে, খুন তো আমিই করেছিলাম—বিমানবাবু তো করেননি!

সমীর সেন সম্মোহিত হ'য়ে শুনে গেল, হিতেন রায় বলে চললেন:

"ওঁদের মধ্যে তর্কটা আমিই লাগিয়ে দি এবং ঝগড়ারও সৃষ্টি আমিই করিয়েছি পুরোণো কথার রেশ তুলে! যখন ওদের মধ্যে তুমুল তর্ক হচ্ছিল, তখন ঘরের চাবিটা আমি বিমানবাবুর পকেটে এমন ভাবে রেখে দি যে উনি জানতেও পারেননি। রঘুকে কাফি আনতে বলি দুটো কারণে—প্রথমতঃ যাতে ওদের ঝগড়াটা রঘু শোনে এবং লক্ষ্য করে আর দ্বিতীয়তঃ কফিতে ঘুমের ওষুধ মেশানো অনেক সহজ। রঘুর কাছ থেকে ট্রেটা নিয়ে আমি সিগারেট ধরাবার ভান করে পর্দার এ পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম, রঘু চলে যাবার পরই ওঁদের দুজনের কফিতেই আমি ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দি। কফি খেয়েই আমি বাড়ী চলে আসি, আসবার সময় রাজেনবাবুর ক্ষুরটা তুলে নিয়ে আসি এবং বাড়ী যাবার পথে বিমানবাবুর কম্পাউণ্ডে ফেলে যাই।

জানতাম পরদিন সকালেই রঘু আমাকে ডাকতে আসবে, তাই নিজের ক্ষুরটা পকেটে নিয়েই শুয়েছিলাম। রঘু যেমন ডাকলো অমনি ছুটে গেলাম। দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলেই দরজায় দাঁড়ালাম এমন ভাবে যাতে রঘু তোমার বাবাকে দেখতে না পায়—এবং সঙ্গে সঙ্গেই "খুন!" বলে চিৎকার ক'রে উঠলাম, কারণ রঘুর মন ইতিমধ্যেই ঐ ধরণের আশঙ্কায় উত্তেজিত হয়েছিল। আমার ভীত কণ্ঠস্বরে ওর মনে বিশ্বাস জন্মে গেল, ও ছুটে গেল টেলিফোন করতে—সেই সুযোগে আমি পকেট থেকে আমার ক্ষুরটা বের করে ঘুমন্ত রাজেন বাবুর গলাটা কেটে দিলাম এবং ক্ষুরটা পকেটে রেখে দিলাম!" টেবিলের ওপর থেকে তুলে হিতেন রায় ক্ষুরটা সমীর সেনকে দিলেন। তখন রক্তের দাগে ক্ষুরটা জায়গায় জায়গায় কালো।

সমীর অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগল।

হিতেনবাবুই ওকে নিজের কর্ত্তব্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে আবার একটা সিগারেট ধরালেন। হাসিতে মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—নিরপরাধ বিমানবাবু বাঁচলেন বলে, না—সমীরকে পরাজিত করেছেন বলে, কে জানে?

প্রাচীন বাংলা পুঁথির নক্সা

রণজিৎ কুমার সেন

৺শিবরতন মিত্র প্রতিষ্ঠিত সিউড়ীর 'রতন লাইব্রেরী' বিশিষ্ট গ্রন্থাগার হিসাবে এক সময় বঙ্গদেশে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করে। কেবল প্রচলিত সাহিত্য সংরক্ষণই নয়, অনাবিষ্কৃত হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া বাংলার লুপ্ত গৌরব উদ্ধারেরও একটা বিশেষ উদ্যম উক্ত গ্রন্থাগারের দেখা যায়। 'বীরভূমের ইতিহাস-প্রণেতা ৺গৌরীহর মিত্রের জীবিতকালে তাঁহারই উৎসাহ ও ইচ্ছানুক্রমে উক্ত গ্রন্থাগারের বহু তত্ত্ব এবং তথ্য জানিবার আমার সুযোগ হয়। তিনি নিজেও বহু অনাবিষ্কৃত লুপ্ত গ্রন্থ উদ্ধার করিয়া 'রতন লাইব্রেরী'কে সমৃদ্ধ করেন। সিউড়ী সম্পর্কিত তাঁহার বহু রচনায় তিনি তাঁহার পিতা-পিতামহের ঋণ স্বীকার করিয়া 'রতন লাইব্রেরী'র ঐতিহ্য সম্পর্কে নানাভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে বাংলায় যে গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার মতো সম্পদ এই গ্রন্থাগারের আছে বলিয়াই একসময় আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু কলিকাতার ভৌগোলিক পরিবেশে ইহার ভিত্তি স্থাপিত না হওয়ার ফলে বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্র হইতে ইহা অনেকখানি আড়াল পড়িয়া গিয়াছে। সহরমুখী নাগরিক সভ্যতার প্রভাবে মফঃস্বল আজ অনেকখানিই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। অথচ পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বল জীবনকে ইদানিংকালে অনেকখানি সাংস্কৃতিক আলোকে আলোকিত করিয়া তুলিতে অগ্রণী হইয়াছিল 'রতন লাইব্রেরী'। 'বিশ্বভারতী'কে বাদ দিলে বোধ করি 'রতন লাইব্রেরী'ই মফঃস্বল-পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র গ্রন্থাগার—যেখানে উপযুক্ত গবেষণা কার্য্যের সঙ্গে সংস্কৃতি প্রচার ও প্রসারেরও অবকাশ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উপযুক্ত যত্নশীল লোকের অভাবে এবং সুপরিচালনার অক্ষমতায় গ্রন্থাগারটির সুসজ্জিত হাট আজ ভাঙিয়া যাইতে বসিয়াছে।

সম্প্রতি আমাদের নিকট কয়েকটি 'প্রাচীন বাংলা পুঁথির নক্সা' পাঠাইয়া ৺শিবরতন মিত্রের পৌত্র শ্রীঅমলেন্দু মিত্র লিখিয়াছেন :

'হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি বাংলা দেশে সহস্র সহস্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু তত্ত্বজ্ঞ মনীষিগণ তাঁহাদের মধ্যে গভীর তত্ত্বান্বেষণে নিমগ্ন। আজ পর্য্যন্ত উহার সম্যক অনুসন্ধান কার্য্য বা আবিষ্কার শেষ হয় নাই। প্রাচীন পুঁথি (বাংলা, সংস্কৃত বা অন্য ভাষা) রচনার সহিত স্থানে স্থানে বিচিত্র চিত্র বা নক্সা রচনা করা থাকে। উহাদের সাঙ্কেতিক অর্থ বা বিশদ ব্যাখ্যা পরিপূর্ণরূপে নির্দ্ধারণ করা দীর্ঘকাল সাপেক্ষ। পুঁথির মলাট হিসাবে কাঠের পাটা ব্যবহৃত হইত। মূল্যবান পুঁথির পাটার উপর অতি সযত্নে দেবদেবীর অদ্ভুত সাঙ্কেতিক অর্থসম্বলিত চিত্র অঙ্কন করা হইত। তাহাদের কিছু কিছু আলোকচিত্র তত্ত্বান্বেষিরা মাঝে মাঝে পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া থাকেন।—পিতামহ ৺শিবরতন মিত্র প্রতিষ্ঠিত 'রতন লাইব্রেরী' পুঁথি সংরক্ষণ কার্য্যে প্রসিদ্ধ। সেখান হইতে ৺গুরুসদয় দত্ত (তদানীন্তন জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট) অনেকগুলি চিত্রিত পুঁথির পাটা সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। অবশিষ্ট কয়েকটি সিউড়ী নির্ম্মল শিব স্মৃতিমন্দিরে (যাদুঘর) রক্ষিত আছে।—(বোলপুর) বিশ্বভারতী রতন লাইব্রেরীর ৪

হাজার বাংলা পুঁথি লইয়া সবিশেষ গবেষণা কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন। আশা করা যায়, তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কারের সংবাদ পাইয়া ধন্য হইব।—এই সকল প্রাচীন বাংলা পুঁথির রচনাকাল সম্যক হিসাব করিয়া বলা শক্ত! তবে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য যে ভারতে ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বকালের এবং তখন দেশে কোনো ছাপাখানা ছিল না—এ বিষয়ে কাহারও কোনো সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহা বিদেশী প্রভাব বিবর্জ্জিত ও সম্পূর্ণ দেশীয় বলা যাইতে পারে।'

বাংলার প্রাচীন পুঁথি সম্পর্কে শ্রীঅমলেন্দু মিত্র যে সযত্ন দৃষ্টি লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তজ্জন্য বিদগ্ধ সমাজের তিনি সাধুবাদ লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। একটা আনুমানিক হিসাব খাড়া করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই সকল পুঁথির অধিকাংশই প্রায় প্রাক্ ইংরেজ রাজত্বকালের—যে সময়ে মুদ্রাযন্ত্র শুধু ছিলই না নয়, এদেশের মানুষের মাথায় পর্য্যন্ত মুদ্রাযন্ত্রের কথা আশ্রয়লাভ করে নাই। কিন্তু সর্ব্বত্রই যে অমলেন্দু বাবুর অনুমান সত্য, তাহা বলা ভুল হইবে। এদেশে ইংরেজি শাসনের গোড়ার দিকে তথা উইলিয়াম কেরীর প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রে প্রথম বাংলা অভিধান মুদ্রণের সমসাময়িক কালেও এদেশে বহু পুঁথি রচিত হইয়াছে—মুদ্রাযন্ত্রের মাধ্যমে যাহার প্রকাশ অদ্যাবধি সম্ভব হয় নাই। দেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সমাজ তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের চিন্তাধারাকে সর্ব্বজনসমক্ষে উপস্থিত করিবার মতো অবকাশ লাভে বঞ্চিতই ছিলেন। এইরূপ একাধিক পুঁথি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সেগুলির বয়স দেড়শত হইতে দুইশত বৎসরের মধ্যে বলা যাইতে পারে। সেই সকল পুঁথি বাংলা এবং সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই রহিয়াছে। বাংলা পুঁথিগুলিও অবশ্য পালি, প্রাকৃত তথা মৈথিলী ভাষা সম্পৃক্ত।

অমলেন্দু বাবুর প্রেরিত প্রাচীন পুঁথির প্রথম নক্সাটী কিন্তু এই স্তরের বহির্ভূত। ইহার বয়স মোটামুটি আড়াইশো হইতে তিনশো বৎসরের মধ্যেই মনে হয়। অমলেন্দু বাবু এই পুঁথিটির স্বরূপ বর্ণনা করিতে না পারিয়া মোটামুটি ইহাকে কেন্দ্র করিয়া মূল বিষয়বস্তুটি সম্পর্কে বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি চেষ্টা করিলে অবশ্য অনায়াসে ইহার পাঠোদ্ধার করিতে পারিতেন। কিন্তু সেপথ তিনি গ্রহণ করেন নাই। সর্ব্বসাধারণের বুঝিবার সুবিধার্থে আমরা ইহার আনুমানিক স্বচ্ছন্দ পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :

ওঁশ্রীহরি শরণম

(ধ্যানস্ত্য) সিংহস্কন্ধারূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাং দুর্গাযন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি শৃণস্বহরবল্লভে।
ত্রিকোণং বিন্দুসেৎপূর্ব্বং নবকোণসমন্বিতং ত্রিবিশ্বসহিতং সর্ব্বমধ্য পত্রসমন্বিতং ত্রিরেখা
সহিতং কার্য্যং বজ্রভূপূবসংযুতং। সমীকৃত্যেব যত্নেন বিলিখেৎ। বিধিনামুনানানাস্ত্রসংযুক্তং
চক্রমন্ত্রসমন্বিতং। তত্রতাং পূজয়েদ্দেবীং মুনপ্রকৃতিরূপিনীং।

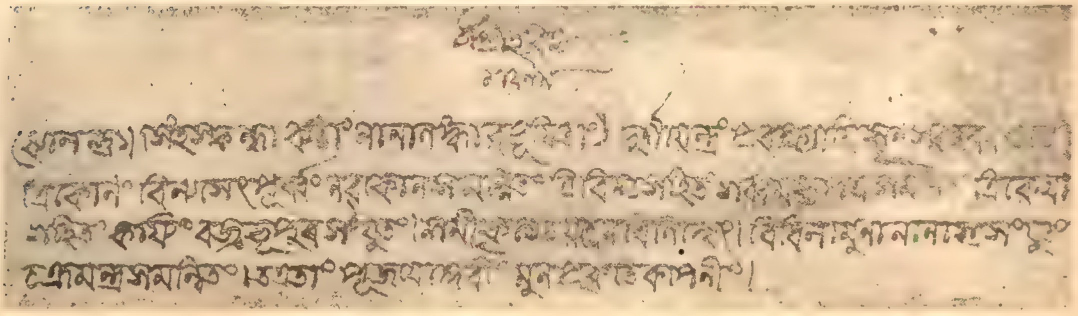

ইহা আদৌ বাংলা পুঁথির সংজ্ঞায় পড়েনা, বাংলা হরফে সংস্কৃত রচনা। অতএব শ্রীঅমলেন্দু মিত্রের ব্যবহৃত 'প্রাচীন বাংলা পুঁথির নক্সা' কথাটি যথোপযোগি নয়, পরক্ষোপযোগি মাত্র। পুঁথিটির মূল সুর দুর্গাযন্ত্র তথা সিংহবাহিনী দেবী দুর্গার বন্দনা ও তৎসম্পর্কিত আলোচনার উপর ভিত্তিশীল। রচনাকাল প্রাক্-ইংরেজ রাজত্বের সময় বলিয়াই অনুমিত হয়। লেখ-মালার পাশে পাশে নানারূপ কারুকার্য্যময় নক্সা চিত্রনও পুঁথিতে রহিয়াছে। মুদ্রিত

কারুকার্য্যময় নক্সা

চিত্র হইতে পাঠক তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই সূত্রে অন্যান্য যে সমস্ত পুঁথির পাতা আমাদের হাতে আসিয়াছে বা অমলেন্দু বাবু পাঠাইয়াছেন—তাহাতে ঠিকুজিধর্ম্মী চিত্রনের আধিক্যই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। অনাবশ্যক বোধে এখানে উক্ত চিত্রাবলী প্রকাশ করা হইতে বিরত রহিলাম।

এই জাতীয় পুঁথিগুলির সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শিক্ষাবিভাগ এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় সামান্য চেষ্টা করিলেই এই জাতীয় অধিকাংশ পুঁথিই সংগ্রহ করিয়া যোগ্যতর গবেষণা কার্য্যের মাধ্যমে একদিকে যেমন বাংলার লুপ্ত গৌরবের পুনর্প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন, অন্য দিকে বাঙালী-সংস্কৃতি প্রসারেরও ব্যাপ্তি ঘটাইতে পারিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্য এ জন্য স্বতন্ত্র 'Manuscript Department'ই রহিয়াছে। সেখানে নিয়মিত গবেষণাকার্য্য চলিয়া থাকে। প্রশ্ন তাহা লইয়া নয়; যদি সরকারী শিক্ষা বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ একটি আবেদন পত্র প্রচার করেন যে, যাঁহারা অনাবিষ্কৃত প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সাধ্যমতো পুরস্কৃত করা হইবে, তবে এই জাতীয় পুঁথি সংগ্রহের কাজ আরও যোগ্যতর ভাবে নিষ্পন্ন হইতে পারে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। এইরূপ ব্যবস্থায় অমলেন্দু বাবুর মতো ব্যক্তির সহযোগিতা পাওয়া আদৌ কঠিন নয়। অনুরূপ ব্যবস্থায় একদিকে যেমন 'প্রাচীন পুঁথি'র মিউজিয়াম গঠিত হইতে পারে, তেম্‌নি গবেষণার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্কলারশিপ প্রদত্ত ছাত্র-ছাত্রী নিযুক্ত হইয়া এই সব প্রাচীন রত্ন উদ্ধারের কার্য্য দ্রুত ও সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে। অমলেন্দু বাবুর কথা হইতেই বলা চলে—বিশ্বভারতী এইরূপ সংগ্রহ ও গবেষণার কার্য্যে দ্রুত অগ্রসর হইয়া থাকিলে বিদগ্ধ বাঙালীসমাজ তথা ভারত-বাসীর শ্রদ্ধাভাজন হইবেন সন্দেহ নাই। 'রতন লাইব্রেরী'র স্বভাবগত ধর্ম্মে এইরূপ আরও বহু পুঁথি অবশ্যই তাঁদের হাতে আসিবে। উক্ত পুঁথিগুলিকে শ্রেণীবিভাগের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া গবেষণা-কার্য্যে অগ্রসর হইবার প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'রতন লাইব্রেরী'র কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া কাজে অগ্রসর হইলে আনন্দের বিষয় হইবে, সন্দেহ নাই।

পাশা-স্তুতি

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ

ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের চৌত্রিশ সূক্তটি কবষ ঋষি রচিত অক্ষ-স্তুতি। ঋষিরা অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি নানা দেবতার স্তুতি করিয়াছেন। ইঁহাদিগকে তাঁহারা মেঘ বজ্র বিদ্যুৎ বৃষ্টিপাত এই সকল নৈসর্গিক ব্যাপারের দেবতা মনে করিতেন। মানসিক বৃত্তি শ্রদ্ধা ক্রোধ এই সকলেরও অধিপতি দেবতা আছেন কল্পনা করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যেও স্তোত্র রচনা করিয়াছেন।

পাশা খেলা তৎকালে আর্য্যদিগের এক প্রবল ব্যসন ছিল। বাজি রাখিয়া পাশা খেলায় দ্যূতকার সর্ব্বস্বান্ত হইত, তবুও পাশার নেশা কাটিত না। এই সকল কথা এই সূক্তে অতীব সূক্ষ্মদৃষ্টি সহকারে, সরল অথচ অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

সূক্তটির অনুবাদ দিতেছি :

"বড় বড় পাশাগুলি যখন শব্দ করিতে করিতে ছকের উপর সঞ্চালিত হয়, তখন আমার সোমরস পানোন্মত্তের ন্যায় আনন্দ হয়।

আমার রূপবতী পত্নী কখনও আমার প্রতি বিরূপ হন নাই, কখনও কোন বিষয়ে আমার নিকট সঙ্কোচ দেখান নাই। তিনি আমায় ও আমার বন্ধুবর্গের সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। হায়, এই পাশার জন্যই আমি আমার সেই পরমা অনুরাগী ভার্য্যাকে ত্যাগ করিলাম।

যে পাশা খেলে, তাহার শাশুড়ী তাহার উপর বিরক্ত হয়, তাহার স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করে। সে কাহারও নিকট কিছু চাহিলে তাহারা তাহা দেয় না। বৃদ্ধ ঘোটক কেহ যেমন মূল্য দিয়া কিনিতে চাহে না, সেইরূপ দ্যূতাসক্তকে কেহ সমাদর করে না।

পাশার আকর্ষণ অতীব প্রবল। যে পাশাখেলায় মত্ত, তাহার স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করে। তাহার মা তা পি তা, ভ্রা তা গ ণ তাহাকে নিজের লোক বলিয়া চিনিতে চাহেনা।

ভাবি, আর পাশা খেলিব না। খেলার সঙ্গীদিগকে দেখিলে দূরে সরিয়া যাই। কিন্তু, পিঙ্গলমূর্ত্তি পাশাগুলি ছকের উপর বসিয়া আছে দেখিলে আর স্থির থাকিতে পারি না। ভ্রষ্টা নারী যেমন পরপুরুষের নিকট গমন করে, আমিও সেইরূপ খেলার সঙ্গীদিগের গৃহে উপস্থিত হই।

দ্যূতকার, গর্ব্ব করিয়া আস্ফালন করে, খেলায় সে নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে। পাশাগুলি হয়ত তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করে। বিপক্ষের নিকট হইতে সে যাহা জিতিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা করে হয়ত তাহা সে পায়। যে জয়ী হয়, তাহার পক্ষে উহা পুত্র জন্মের ন্যায় সুখকর হয়। তাহার মনে হয় পাশা যেন তাহাকে মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিতেছে। যে পরাজিত হয়, তাহার মনে হয় পাশা যেন তাহাকে হত্যা করিয়াছে। পাশার যেন আকর্ষণী (আঁকশি) আছে, উহা দ্বারা সে যেন আকর্ষণ করিতে থাকে, যেন বাণের ন্যায় বিদ্ধ করে, ছুরিকার ন্যায় কর্ত্তন করে, উত্তপ্ত পদার্থের ন্যায় সন্তপ্ত করে।

তিপ্পান্নটি পাশার দল, সকলে একত্র হইয়া ছকের উপর বিরাজ করে, যেন সত্যস্বরূপ সূর্য্যদেব বিশ্বভুবনে বিহার করিতেছেন। যিনি যত বড় দুর্দ্ধর্ষই হউন, পাশাগণ কাহারও বশীভূত নহে। রাজা পর্য্যন্ত ইহাদিগকে নমস্কার করে।

পাশাগুলি কখনও নীচে নামিতেছে, কখনও উপরে

উঠিতেছে। ইহাদের নিজের হাত নাই, তথাপি হস্তবান্ ব্যক্তিকে ইহাদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হয়।

পাশাগুলি দেখিতে শ্রীসম্পন্ন, কিন্তু উহারা জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় ছকের উপর অবস্থান করে। ইহাদের স্পর্শ শীতল, কিন্তু হৃদয়কে দগ্ধ করে।

দ্যূতাসক্তের স্ত্রী দীনহীন বেশে পরিতাপ করে। তাহার মাতা তাহার জন্য ব্যাকুল ভাবে দুশ্চিন্তা করে, পুত্র কোথায় কি করিয়া বেড়াইতেছে। যে তাহাকে টাকা ধার দেয়, তাহার দুশ্চিন্তা, হয়ত সে, আর তাহার টাকা ফিরিয়া পাইবে না। দ্যূতাসক্ত নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে সাহস পায় না, অপরের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করে। নিজের স্ত্রীর দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। অপরের স্ত্রীর সৌভাগ্য ও সুন্দর অট্টালিকা দেখিয়া তাহার পরিতাপ জন্মে। প্রাতঃকালে, সে হয়ত সুশ্রী ঘোটকে গমনাগমন করিয়াছে, কিন্তু দ্যূত ক্রীড়ায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া, সন্ধ্যায় শীত নিবারণের জন্য নিতান্ত দরিদ্রের ন্যায় অগ্নি সেবা করিতেছে।

এই সকল দেখিয়া, হে পাশাগণ, তোমাদের মধ্যে যিনি প্রধান সেনাপতি এবং রাজার তুল্য, তাহাকে আমি আমার হস্তের দশ অঙ্গুলি একত্র করিয়া প্রণাম করিতেছি। সত্য করিয়া কহিতেছি আমি তোমাদিগের নিকট অর্থ প্রার্থনা করি না।

হে দ্যূতাসক্ত, আমার উপদেশ শোন, কখনও আর পাশা খেলিও না। তাহা অপেক্ষা কৃষিকার্য্য কর। তাহাতে যাহা লাভ হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নিজেকে কৃতার্থ বোধ কর। প্রভু সূর্য্যদেব আমাকে ইহা বলিয়া দিয়াছেন।

হে পাশাগণ, আমাদের উপর বন্ধুভাব ধারণ কর, আমাদের কল্যাণ কর। তোমাদিগের দুদ্ধর্ষ প্রভাব আমাদিগের প্রতি বিস্তার করিও না। আমাদের যাহারা শত্রু, তাহারাই যেন তোমার কোপদৃষ্টিতে পতিত হয়।

(ঋগ্বেদ ১০।৩৪)

স্তুতিতে পাশা খেলার বর্ণনা, এই বিশেষ ব্যসনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, দ্যূতাসক্তের প্রতি উপদেশ যে অপরূপ ভাবে স্বচ্ছন্দ গতিতে রচিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। প্রার্থনা শেষে ঋষি আবেদন জানাইয়াছেন—হে পাশা, দোহাই তোমার, আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিও না। বরং আমাদের শত্রুদিগকে নিপাত কর। ইহাতে তোমার পরাক্রম দেখানও হইবে, সেই সঙ্গে আমাদের উপকারও হইবে। এ প্রার্থনা যেমন উপভোগ্য তেমনি স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষের মধ্যে শত্রুর নিপাত কে না কামনা করে? তবে আধুনিক কালের লোকে এরূপ প্রার্থনা মনে মনে করে, আর বৈদিক ঋষিরা অত্যন্ত সরল প্রকৃতির ছিলেন, সরল ভাবেই উহা দেবতার কাছে নিবেদন করিয়াছেন।

অন্যখানে

মঞ্জু ভট্টাচার্য্য

প্রগতি যুগের পথিকরা আজ কবিতা লেখে
চাঁদ, ফুল আর পাখী-কাকলীর নেইকো ঠাঁই
ফিপটী মাইল স্পীডের চেতনা আলুণী ঠেকে
চন্দ্রগ্রহের তুষারের স্তূপে পৌছোনো চাই
নিমেষের আগে আনবিক বেগে রকেটে চড়ে।
নিথর আকাশে ঈথারে ঈথারে ছড়ানো গলা
সাগর পারের বি-বি-সির বাণী বেতারে ধ'রে
মেটেনি ওদের তবু ক্ষোভ আর এগিয়ে চলা,
আর্টারী ও ভেনে যে-গতিতে ছোটে রক্ত-কণা
সেই গতি বেগে ছুটেছে ওদের মনের রথ
জীবনের স্থিতি! মূল্য কি তার? দিনতো গোণা
অশান্ত ওই অশ্বখুরও চিনেছে পথ,
বলাকার শ্বেত শুভ্র পাখায় যে বাণীখানি—
জেগেছিল, আজও সেই বাণী ওদেরও প্রাণে
বেজেই চলেছে, ছন্দও সেই চিরন্তনী
চল ছুটে চল হেথা হোথা নয় অন্যখানে।

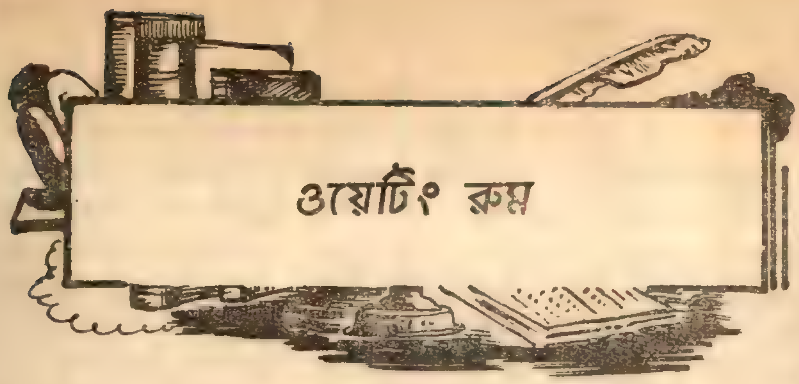

ওয়েটিং রুম

এইচ. ই. বেটস

আমি ও আমার ভাই সকাল সকাল ন'টার আগেই হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছুলাম। ওয়েটিং রুমটায় একটি-মাত্র উঁচু জানলা, দেয়ালে ফিকে সবুজ রঙ্। নির্জন। অগত্যা বেঞ্চির উপরে বসে রইলাম কতক্ষণ, বসে বসে সমুখের দেয়াল নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। আজকের মত এত ঠাণ্ডা আর কোনবার শীতকালে পড়েছে বলে মনে পড়েনা। রাস্তাগুলো হ'য়ে উঠেছে এক একটি বরফ জমাট নদী। আকাশ ছেয়ে গেছে তুহিন তীক্ষ্ম তুষারে। মনে হচ্ছিল যেন এ তুষার বিভীষিকা থেকে কোনদিন আর মুক্তি পাওয়া যাবে না। অসহ্য ঠাণ্ডায় আমার ভাইয়ের মচকানো হাতের আঙুলগুলো ইতিমধ্যেই অসাড় হ'য়ে গিয়েছে, নীল হ'য়ে গেছে নখগুলি। নিঃসাড় আঙুলগুলোকে উত্তপ্ত করে তুলবার চেষ্টায় সে অন্য হাতখানা দিয়ে মচকানো হাতটা সজোরে চেপে ধরে বসে রইল। যাক, ভাগ্য ভালো, ভাবছিলাম আমি; সবার আগে আমরা এসেছি, কাজেই খানিকক্ষণের মধ্যেই বিদায় হওয়া যাবে। হাসপাতালের অন্য কোথাও একটি শিশু চীৎকার করে কাঁদছিল। এই আকস্মিক শব্দতরঙ্গ নির্জন বারান্দা বেয়ে বেয়ে ধ্বনিত প্রতি-ধ্বনিত হ'তে লাগল। তারপর সহসা থেমে গেল। পুনরাবির্ভাবের প্রতীক্ষায় আমরা কান খাড়া করে রইলাম। কিন্তু বৃথাই! সমস্ত পুরীটা মনে হচ্ছিল শূন্য, পরিত্যক্ত—যেন বাসিন্দারা সব গত রাত্রেই ইহলীলা সাঙ্গ করেছে।

'রেডিয়ামটা খুলে নিয়ে গেলেই বা দেখে কে!' বললাম আমি।

আমরা যখন হেসে উঠলাম, আওয়াজটা মনে হল যেন কোনো ভুতুড়ে দেশের। অতএব, পুনরায় চুপচাপ বসে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। আমাদের কাজের মধ্যে, মচকানো হাতটার একটা এক্স-রে ছবি তোলা, আর প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্তরগুলো ডাক্তারকে দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া, ব্যস! কাগজ-পত্তরগুলো ঠিকঠাকমতো খুলে রেখে হাতে করে বসে রইলাম।

অনেকক্ষণের মধ্যে কোন সাড়া-শব্দ নেই। কিছুক্ষণ বাদে আর একটা শব্দ কানে এল। করাত কাটার শব্দ। ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে দেখি, শব্দটা শোনবার সাথে সাথে সে ভয়ে কেমন আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে।

অপারেশন হ'চ্ছে—তাকে বললাম।

চুপ! কে যেন আসছে।

একটু পরেই দোরটা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল এসে একটি স্ত্রীলোক, তারপর একজন পুরুষ। মজুর শ্রেণীর রোগী এরা। স্ত্রীলোকটি দেখতে বেঁটে, বাঁশের কঞ্চির মত পাতলা চেহারা। বয়স বছর প'য়তাল্লিশেক। পুরুষটি বয়সে এবং আকৃতিতে তার চেয়ে অনেক বড় হবে। বিধ্বস্ত বিজয়ী সৈন্যের মতো দেখায় তাকে। ধূসর ছাপ পড়েছে তার চুলে, সারামুখে। দুজনেই বসে পড়ল বেঞ্চির উপর। অনেক লোক আছে, পরম উৎসাহে অবিরাম বকবক করতেই যারা ভালোবাসে। স্ত্রীলোকটির দেমাকভরা ফ্যাকাশে মুখখানি তাদের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

আপনারা কি জন্যে—সে আমাদের জিজ্ঞেস করল।

এক্স-রে—আমি উত্তর দিলাম।

হবে; তবে দেরী করতে হবে। একটা বিষণ্ণ তৃপ্তির সংগে কথা বলছিল সে—সবাইকেই দেরী করতে হবে। আমাদের হবে না? শুনছ!—লোকটির দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—আমাদের দেরী করতে হবে না?

এ্যাঁ—লোকটি তার কানের কাছে হাত তুলল।

দেরী করতে হবে না আমাদের?

হুম্। হলফ্ করে বলছি, একবর্ণও শুনতে পায়নি।

'কানে শোনেনা', বেশ আনন্দের সংগে মেয়েলোকটি বলল আমাদের। 'এককাণে তো ছাইভস্ম কিছুই শোনেনা, আরটাও যেতে বসেছে।' তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, এ সবে যেন সে মহাখুশি। 'কিন্তু ও এসেছে পা দেখাতে।' সে শুনতে পারবে না জেনেই খাটো গলায় কথা বলার প্রয়োজন বোধ করল না। 'ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে।' তার ছোট্ট মুখখানা পরম আনন্দে জ্বলজ্বল করতে লাগল। 'ঢোল হয়ে উঠছে—জল জমে জমে।'

ওকে নিয়ে এসেছ কেন? আমি বললাম।

'ম্যাসেজ। ইলেক্‌ট্রিকের।' শোথ রোগের এ-তো অদ্ভুত চিকিৎসা, ভাবছিলাম আমি। কিন্তু নিঃসন্দেহ নই,

কাজেই চুপ করে রইলাম। 'সেই জন্যেই আমি নিজে এখানে এসেছি।'

তোমার পা ফুলে উঠেছে না কি? জিজ্ঞেস করলাম।

অসম্মতিসূচক দৃষ্টি মেলে করুণাভরে সে আমার দিকে তাকাল,—আমার যা রোগ আছে তা কোনদিন সারবার নয়।

ও, তোমায় ঠিক সারিয়ে দেবে—বললাম আমি।

এ জন্মে নয়। গম্ভীরভাবে সে বলল, তা জানা আছে আমার। আমার না হ'য়েছে এমন রোগই নেই। ওদের দৌড় কতদূর তা জানি ভালোরকম।

নিউমোনিয়া থেকে বহুমূত্র অবধি আজ পর্যন্ত তার যত রোগ হয়েছে তার দীর্ঘ ফিরিস্তি আমাদের শোনাবার জন্যে সে আবৃত্তি করতে যাচ্ছিল, এমন সময় লক্ষ্য করলাম, আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য বৃদ্ধটি আমার দিকে চেয়ে আছে। তৎক্ষণাৎ আমি তার দিকে চোখ ফেরালাম, সে-ও। স্থির নিস্পলক চোখে দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। শেষ অবধি সে-ই চোখ নামাল।

মেয়েলোকটি অবিরাম বকবক করছিল; এমন সময় দোরটা আবার খুলে গেল। আশা করেছিলাম নার্সকে দেখতে পাবো। কিন্তু তার বদলে ঢুকলো এসে আর একজন আগন্তুক। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেঞ্চিটার উপরে বসে পড়ল সে, হাঁপাতে হাঁপাতে কোনোরকমে আমাদের সম্ভাষণ জানিয়েই একহাত দিয়ে বুক চেপে ধরল। এক এক সময় তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, এক্ষুনি বুঝি হার্টফেল করবে। লোকটি অস্বাভাবিক রকম মোটা, লালচে গম্ভীর গোলগাল মুখখানা। তার ভাবটা এখন যেন দিশেহারা হ'য়ে হঠাৎ এখানে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

উঃ কি ঠান্ডা।

ঠান্ডা! বেঁটে মেয়েলোকটি বলল, তোমার তো ঠান্ডা লাগার কথা নয়!

আমার? কেন?

যা চর্বি জমিয়েছ ওতেই তো তাতিয়ে রাখছে।

তা হ'লে তো বাঁচতাম......কিন্তু হ'চ্ছে কই? এটা তো স্বাভাবিকভাবে জমেনি!

কিন্তু দেখাচ্ছে তো বেশ স্বাভাবিক!

শোন, তুমি জিনিসটা বুঝছনা। আমিও একদিন তোমার মত পাতলা ছিলাম—তোমার চেয়েও পাতলা। ঠিক যাকে বলে তালপাতার সেপাই তাই ছিলাম আমি। তারপর, কই আসেনি এখনো?

কারা?

নার্সরা।

প্রথমে ভেতরের রোগী, মেয়েলোকটি বলল, তারপর আমাদের পালা। আমরা স্বচ্ছন্দে অপেক্ষা করতে পারি।

চুপ করে গেল লোকটি। অতিকষ্টে জোরে জোরে শ্বাস ফেলে দম ফিরিয়ে আনতে লাগল। এবং আমরা কতকটা যেন তার প্রতি সহানুভূতিবশতই চুপ করে রইলাম। এ ওর প্রতি দৃষ্টি বিনিময় করতে লাগলাম, পরস্পরকে আপাদমস্তক মাপতে শুরু করলাম।

দু এক মিনিট পরেই দোরটা আবার খুলে গেল।

একটি নার্স এসে ঢুকল। আমি দাঁড়িয়ে উঠে কাগজ-পত্তরগুলি বাড়িয়ে ধরলাম। 'আমার একটা......'। ঘরের কোণের দেয়াল-টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে সে শুষ্ক সরব কণ্ঠে বাক্য বিনিময় শুরু করে দিলঃ আমরা সবাই আপনার জন্যে তৈরী হয়ে আছি, ডক্টর। হ্যাঁ। নার্সটি দেখতে অত্যন্ত লম্বা, সর্বাংগে শাদা পোষাক, হাতে একটা নোটবই। যেমন নিস্প্রাণ তেমনি নৈর্ব্যক্তিত। একটা গর্বিত ভংগী আর একটা 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না' ভাব মুখের উপরে জমাট হ'য়ে আছে। কখন সে টেলিফোন করা থেকে নিরস্ত হবে তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলাম; এমন সময় লালমুখো লোকটি নীরবে আমাকে বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি সূচক ইসারা জানাল। নার্সটির কথা আমরা সবাই কাণ খাড়া করে শুনছিলাম এবং সেও তা বুঝতে পারছিল। এবং তা বুঝেই কথোপকথন দীর্ঘতর করল। 'কিন্তু আমাকে আবার কেন! আচ্ছা, আপনি যদি বলেন! হ্যাঁ! সে বেশ হবে। ঠিক আছে। আমি তো জানিই। সত্যিই বেশ হবে।' হঠাৎ সে রিসিভারটা তুলে রাখল। 'আমার একটা......' আবৃত্তি করতে শুরু করলাম। কিন্তু সে দোর খুলেই অদৃশ্য হল।

এ এখানকার কেউ নয়—বেঁটে স্ত্রীলোকটি বলল।

এ কথাটা তাকে বললেই তো পারতে—বললাম আমি।

অগত্যা বসে পড়লাম। একটু পরেই দোরটা আবার খুলে গেল; ভেতরে ঢুকল এসে জোয়ান চেহারার একজন লোক। চোখে পুরু চশমা, এক পায়ের জুতোর উপরে লোহার স্প্রিং আঁটা। আমার পাশ ঘেঁসে এসে বসল। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে তারপর জুতোর ফিতে খুলতে লাগল।

কি, ঘুমুতে যাচ্ছেন নাকি? বেঁটে মেয়েলোকটি বলল।

ঘুমুতে! অত্যন্ত ক্লান্তকণ্ঠে সে আমাদের সংগে কথা বলছিল। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, জীবনে যেন আর বিছানায় যেতে না হয়!

এ্যাঁ!

একটা বছর বিছানায় পড়ে ছিলাম—প্রায় চীৎকার করে

উঠল লোকটি। তারপর একটা কাগজ বের করে একমনে চুপচাপ পড়তে শুরু করে দিল। আমি তার কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, শুকনো মাছের ব্যবসা সংক্রান্ত কোন পত্রিকা হবে। দেখতে পেলাম, কডমাছ, ইয়ারমাউথ হেরিং, মাছের তেল, বরফ এ সবের বিজ্ঞাপন রয়েছে ওতে। বিষয়টা আমার কাছে নতুন।

পত্রিকাটা কেমন—ভালো? জিজ্ঞেস করলাম।

সে অভদ্রের মতো চুপ করে রইল।

এবং ক্রমশ তার নীরবতা আমাদের উপরও প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। আমরা বসে বসে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম, ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে তাকাতে লাগলাম। জানালার একেবারে উপরের দিককার তুষারমুক্ত সার্সি'র মাঝ দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছিল। ধূসর কৃষ্ণ আকাশ, তুষারে তুষারে ছেয়ে গেছে সর্বাংগ। মনে হচ্ছিল যেন এ জমাট তুষার কোনদিন আর মাটিতে পড়বে না। অনেকক্ষণ এইভাবে একঠাঁয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। কিছু ঘটলোনা, কেউ এল না—যেন কেউ জানেনা বা জানবার প্রয়োজনবোধও করেনা যে আমরা এখানে আছি।

হঠাৎ একসঙ্গে চারজন নার্স এসে ঢুকল। একটা দরজার উপরেই এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই। তারপর ওয়েটিং রুমটার ভেতর দিয়ে গট্ গট্ করে হেঁটে গিয়ে অন্য দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে গেল—একটি নিষ্প্রাণ পাষাণ-পুত্তলি'র শোভাযাত্রা! আমাদের পাশ দিয়ে এমনিভাবে চলে গেল তারা যে আমাদের অস্তিত্ব বলে যে কিছু আছে তা-ও বোঝা গেল না। এদের মধ্যে সর্বশেষ নার্সটি দেখতে অত্যন্ত লম্বা। এ রকম লম্বা টিনটিনে চেহারার মেয়ে আমার আর চোখে পড়েনি। আঁটসাঁট শাদা নার্সের পোশাকে তাকে দেখাচ্ছিল ঠিক যেন একটি সুপুরী গাছ। সে অদৃশ্য হওয়ামাত্র আমরা সবাই হাসিতে ফেটে পড়লাম। ভূড়িওয়ালা লোকটি হাসবার সময় তার মাংসল দেহটা থলথল করতে লাগল। হাসির চোট সামলে উঠতে না উঠতেই দোরটা আবার খুলে গেল। ঢুকল এসে অন্য তিনজন নার্স তিনটি ভদ্র নিষ্প্রাণ মূর্তি। আগের চারজনের মতো এরাও সারি বেঁধে মার্চ করে অন্তর্ধান হ'য়ে গেল।

সাতটি দেবকন্যা আর কি! —আমি বললাম।

এক মুহূর্ত পরেই একজন ডাক্তার এলেন। নার্সদের অনুসরণ করলেন তিনি। তার গলায় ঝোলানো একটা টর্চ। তিনি কখন অন্তর্হিত হবেন তার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। তারপর সবাই সমস্বরে হোহো করে হেসে উঠলাম।

অপারেশন হবে—বেঁটে মেয়েলোকটি বলল।

কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে যেন ডাক্তারের পক্ষে মহা আনন্দের কোন ব্যাপার হ'তে চলেছে—বললাম।

আনন্দের বই কি! মেয়েলোকটি বলল,—আমার তিন তিনবার হয়েছিল এবং ......

কিন্তু আমরা সবাই একপাল নির্বোধের মতো হাসতে লাগলাম। এবং এইবারই প্রথম তার একটানা কথার তোড়ে বাধা পড়ল।

দোরটা না খুলে গেলে আমাদের হাসিতে ছেদ পড়তো না। এবারে দোরটা খুলল আস্তে আস্তে। একটি নার্স পিছন ফিরে ভেতরে আসবার চেষ্টা করছিল। তার কাছে কিছু নিবেদন করবার জন্যে প্রায় অভ্যাসবশেই তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালাম। দেখতে পেলাম, দোর খুলে ভেতরে ঢুকবার উদ্দেশ্যে সে পিছন ফিরে একটা চাকাওয়ালা স্ট্রেচার ঠেলে আনছে। স্ট্রেচারের উপরে পঞ্চান্ন ষাট বছর বয়স্ক একজন মেয়েলোক শুয়ে আছে। প্রথমটায় ভাবলাম মড়া; কিন্তু তারপর লক্ষ্য করলাম তার মুখের অনুরূপ ধূসরবর্ণ চোখদুটি সম্পূর্ণ খোলা। তাকে ঠেলে নেওয়ার সময় সে একদৃষ্টে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার চোখে মুখে কেবল একটা অজানা ভয়ের চিহ্ন। রাবারের চাকা আঁটা স্ট্রেচারে করে নার্সটি তাকে নিঃশব্দে অন্য ঘরে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল, আর যেতে যেতে সে একান্ত হতাশভাবে আমাদের এই অপেক্ষমান জনতার দিকে তাকিয়ে রইল। যেন সে অনুভব করছিল, এই পৃথিবীতে আমরাই তার সর্বশেষ দরদী জন।

নার্সটি তাকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। দু এক মিনিটের জন্যে আমরা একটু ঠিকঠাক হ'য়ে নিলাম; চুপ করে বসে কান খাড়া করে রইলাম। মেয়েলোকটি চীৎকার করে উঠবে আমরা সবাই এই প্রতীক্ষা করছিলাম বলেই মনে হল। কিন্তু বৃথাই! অবশেষে বেঁটে মেয়ে-লোকটি আমাকে বললঃ

এবারে আপনার পালা। বেরুলেই ধরবেন ওকে।

ঠিক আছে—বললাম।

কোন নেতা সভা থেকে বেরুলে পর তাঁকে পাকড়াও করবার জন্যে যেমন সংবাদদাতারা অপেক্ষা করতে থাকে, তেমনি সচকিত উদ্গ্রীবতা সহকারে বসে বসে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। অবশেষে দোরটা খুলে যাওয়ামাত্র আমি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। নার্সটি থতমত খেয়ে যাওয়াতে এই প্রথমবার তার কাছে কিছু নিবেদন করতে সক্ষম হলাম।

একটা, মানে এক্স-রের জন্যে—বললাম। তাকে সমীহ করে ভদ্রভাবে গুছিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছিলাম। সার্টি-ফিকেট ইত্যাদি সব আছে।

সে কাগজগুলি হাতে নিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে দেখতে লাগল।

যত তাড়াতাড়ি কাজটা হয়—একটু দেখবেন—আমি বললাম।

হাত ভেঙেছে, সে বলল। সে এমনভাবে কথা বলছিল যেন আমি কোন গরুভেড়া গোছের কিছু হব। কোন হাতটা? এক এক করে আমার দুটো হাতের উপর দিয়েই চোখ বুলিয়ে দেখলে।

'না, মানে আমার ভাইয়ের হাত', আমি বললাম।

ও, তাই নাকি! বলল সে। সেই মুহূর্তে আমাতে আর গরুভেড়ার মূল্যও রইলনা। সে এমনভাবে আমার সংগে কথা বলছিল যেন আমি একটা ভাঙা কুলো, বা ফুটো কলসী বা এমন কিছু যা সে রোজ দেখছে, নাড়াচাড়া করছে। আমার প্রতি তাচ্ছিল্যসূচক সহনশীলতায় তার পাতলা আরক্ত ওষ্ঠ দুটি আধো মৃদুহাসিতে কাঁপছিল।

আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে, সে আমার ভাইকে বলল।

বহুক্ষণ ধরে বসে আছি আমরা! বললাম।

ঘর থেকে চলে গেল সে। আমরা আবার বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সরব কথাবার্তা, নৈশব্দ্য, তার-পর আবার রোগীর আগমন—এই চক্রাকারে চলতে লাগল। ক্রমশ আরও লোক আসতে শুরু করল, ফলে পরস্পর গাদা-গাদি করে বসতে হল। অবশেষে এক মা তার মেয়েকে নিয়ে ঢুকল এসে। হাতে এবং কাঁধে বাতব্যাধি জাতীয় কিছু একটা হওয়ায় মেয়েটি শুকিয়ে গেছে। হাঁটে সে এমনিভাবে যেন কোন অদৃশ্য দুর্বহ বোঝা কেউ তার পিঠে চাপিয়ে দিয়েছে। লালমুখো লোকটি উঠে মেয়েলোক দুজনের জন্যে তার জায়গাটা ছেড়ে দিল। 'কেমন আছে?' বেঁটে মেয়েলোকটি জিজ্ঞেস করে। মা নীরবে মাথা নাড়ে। মেয়েলোকটি একদৃষ্টে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। যেন সে রোগের লক্ষণগুলি বিচার করে দেখছে—যে রোগে নাকি সে এখনও আক্রান্ত হয়নি কিন্তু হবার আশা রাখে।

একবার একজন নার্স ভেতরে এসে টেলিফোন করে আবার চলে গেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। অবশেষে হাসপাতালের দুপুরের খাবারের মিষ্টি গন্ধ ভেসে এল। রোদ্দুর দেখে বলে দিতে পারি, প্রায় দুপুর হয়ে গিয়েছে।

আর সহ্য করতে পারলাম না। উঠে দাঁড়ালাম। রোগী-দের ঢুকবার দরজাটা খুলে বারান্দা ধরে এগোতে লাগলাম। কাউকে না পেয়ে কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে এলাম।

'আর দরজাটা, বেঁটে মেয়েলোকটি বলল, আর দরজাটা চেষ্টা করে দেখুন না। ওরা তো সবাই ওই পথেই যাতা-য়াত করে।

অন্য দরজাটা খুলে থমকে দাঁড়ালাম। স্ট্রেচারের উপরকার সেই মেয়েলোকটি আবছা অন্ধকার ঘরটাতে পড়ে আছে। একেবারে একা। সে সোজা আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। আগে যখন দেখেছিলাম তখনকার চাইতে তার মুখের ভাব অনেক বদলে গেছে। সেই মৃত্যুশীতল পাণ্ডুর বর্ণ, চোখে সেই হতাশ দৃষ্টি কিন্তু সে ভীতির রাজ্য থেকে এখন চলে গিয়েছে নিরুদ্বেগ শান্তিরাজ্যে। যেন এই মধ্য-বর্তী প্রতীক্ষাকাল তার মন অনেকখানি পরিবর্তিত করে দিয়েছে। সে স্থিরদৃষ্টিতে একইভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল; আমিও ফিরে তাকালাম। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

'কাছে কেউই নেই?' আমি বসলাম পরে বেঁটে মেয়ে-লোকটি জিজ্ঞেস করল।

'কেউ না',—বললাম।

এবং আমরা আবার অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অনুবাদক— **অমিয় কুমার চক্রবর্তী।**

ভারতীয়া নারীর দৃষ্টিতে জীবন

শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

জীবনের মূল্য তখনি অনিরূপনেয়, যদি সেই জীবন সার্থকতায় সমৃদ্ধ হয়।

সেই সার্থকজীবনে নারী ও পুরুষের জীবন-দর্শনে ভেদ থাকেনা, কারণ তাহা সার্থকতার একই বিন্দুতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

চিরদিন মানুষ এই সার্থক জীবন খুঁজিয়া মরে। জীবনের এই যে সার্থকতা, ইহা পুরুষের জীবনে যেমন বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়, নারীর জীবনে তেমন নহে। বিশেষ করিয়া হিন্দু নারীর জীবন। ভারতবর্ষে নারীর জীবনের গণ্ডি বড় সংকীর্ণ। ভারতবর্ষের অধিকাংশ নারীর জীবন যেন টবে রক্ষিত পুষ্পবৃক্ষ অথবা বৃহৎ-বৃক্ষের দেহে পরগাছার ন্যায়। পূর্ণ আলো-বাতাস অথবা মাটির রস সে বৃক্ষের ভোগে লাগে না। পরমাণুগ্রহে যত-টুকু মেলে ততটুকুই লাভ। এইজন্যই বোধকরি ভারতের মেয়েরা জগতের কোনও বড়কাজে স্বাভাবিকভাবে লাগিল না। জোর করিয়া ঠেলিয়া জগতজনের সম্মুখে যাঁহাদের বাহির করা হইয়াছিল এবং হইয়াছে তাঁহাদের সংখ্যাও তো মুষ্টিমেয় এবং তাঁহাদের নিকটও স্বাধীন চিন্তা অথবা পরিচালনা শক্তির বিকাশ কিবা পাইলাম। তাঁরাও তো পুরুষের চিন্তাধারা ও চালনায় চালিত।

সমগ্র ভারতে এই যে অগন্য নারীর সংখ্যা এবং ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ যারা সামাজিক সাংসারিক ও প্রাদেশিক গন্ডীর চাপে আছেন তাঁহাদের কথা ভাবিলে দুঃখ হয়।

তাঁহাদের কত নারীর মধ্যে হয়ত বৃহৎ সম্ভাবনা মুকুলে শুকাইয়া যায়। কত প্রতিভা অকালে ঝরিয়া যায়। কত সুন্দর মন কুৎসিৎ পরিবেশে পড়িয়া বিকৃত হইয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই বৃহৎ অবহেলিত নারীসমাজ হয়ত স্বাভাবিকভাবে বিকাশের সুযোগ পাইলে আমরা হয়ত বহু উন্নততর সমাজের আবির্ভাব আজ দেখিতাম। অনেক সময় যে নারী-প্রগতি ও নারী স্বাধীনতার ছায়া অনেক মেয়ের মধ্যে দেখি, তাহা দেখিয়া দুঃখ হয়, মনে হয় উহা নারী-স্বাধীনতা বা নারীর জাগরণের প্রকাশ তো নয়, উহা revolution. অন্ধকারার মধ্য হইতে পলায়মান আত্মার বিকৃত প্রকাশ, তাই অনিয়মানুবর্ত্তীতা ও উচ্ছৃংখলতা দোষে তাহা দুষ্ট। সমাজে সে মেয়েরা তো কল্যাণময়ী নহে, ধ্বংসের বারতা।

নারীকে পুরুষ চিরদিন অবলা করিয়া রাখিল। কোন জাতি বলিল তাহাদের আত্মা নাই, কোন জাতি করিল তাহাকে জড় সম্পত্তির দলভুক্ত। কেহ বা দেবী করিয়া মৃত্তিকার পুতুলের দলে বসাইয়া দিল।

নারীর এই যে অসংখ্য বিশেষণ তাহা স্নেহবশতঃ কি ভয়বশতঃ সে বিচার আজ স্থগিত থাক, কিন্তু ভাবিয়া দেখি যে ভারতের নারী চিরদিনই পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ। বাল্যে পিতার অধীন যৌবনে স্বামীর অধীন ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের। নিজের অধীন নারী কোনও দিনই নয়।

এই অধীনতার বর্ম আমাদের মর্মে এমন আঁটিয়া বসিয়াছে যে অতি-সাধারণ বিচারবুদ্ধিও আমাদের চলিয়া গিয়াছে, একটি পদ অগ্রসর হইতে হইলে অভিভাবকের পরামর্শ চাই।

একটা অশিক্ষিত কুলী সে-ও তাহার বিচারবুদ্ধি খাটাইয়া জীবনক্ষেত্রে সংগ্রাম করে, কিন্তু আমরা অতি উচ্চ-শিক্ষিতা নারীও সোনার খাঁচায় বসিয়া প্রভুর বুলি আওড়াই, নিজস্ব বুলি পর্যন্ত আমাদের নাই। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি।

ইউরোপের কথা স্মরণ করি। তাহাদের নারীদের সংগ্রাম সুরু হইয়াছে বহুদিন হইতে। এবং ভাল-মন্দয় মিশাইয়া তাহারা জীবনের ক্ষেত্রে একটা স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। সোনার খাঁচার বাহিরেও যে মুক্ত উদার আকাশ ও জীবন আছে সে বোধ তাহাদের হইয়াছে। ইবসেনের নোরার নারীত্বের চেতনা ইহাদের জীবনে কার্য্যকরী হইয়াছে।

কিন্তু আমরা আজও সেই ঘুমন্ত রহিয়া গিয়াছি। ভারতের এই অগণ্য নারী সংখ্যা। আমরা সোনার খাঁচা বা লৌহকারাগারের আশ্রয়কেই পরম নিরাপদ মনে করি। প্রভু আছেন যাহা করিবার তিনিই করিবেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য একটু পরিবর্তিত করিয়া বলা যায়—

বাঁচান বাঁচি মারেন মরি
বল ভাই ধন্য প্রভু।

এই আমাদের মনোগত ভাব।

মানুষের সবচেয়ে বিকাশ হইতেছে মনুষ্যত্বের বিকাশ। সেই বিকাশের পথ তৈয়ারী হয় জ্ঞানের দ্বারা শিক্ষার দ্বারা। সেই শিক্ষার অভাব আমাদের ভারতের নারীদিগের মধ্যে। ফলে আমরা বড় হইতে পারিলাম না। সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, সমাজ-সংস্কারে নারীর সে অসামান্য দান কই? যে দানের মহিমায় পুরুষ আপনি মাথা নত করিবে? যে নারীর মহিমা সূর্যের প্রদীপ্ত আলোকের মত সমগ্র নারী সমাজকে আলোকিত করিয়া তুলিবে। হতাশার সহিত চাহিয়া দেখি তেমন নারী একটিও নাই।

সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের পাশাপাশি চলিবার মত নারী একটিকেও খুঁজিয়া পাই না। সাহিত্যক্ষেত্রে নারীর দানকে পুরুষেরা কৃপার চক্ষেই দেখিয়া থাকে।

দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয় যে সাহিত্যে কি কাব্যে গদ্যে সাহিত্যের সত্যকার সমৃদ্ধিতে নারীর অবদান কিছুই নাই। বহু গুণী গায়িকার কথা শুনি, কিন্তু ঠিক আবদুল করিম, ফৈয়জ খাঁ, আলাউদ্দিনের মত সুরস্রষ্টা তো কেহ নাই। চিত্রকর বা চিত্রসৃষ্টি ভাবিলেই মনে আসে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, কোনও নারী তো চিত্রশিল্পিনী নামেও সর্বাধিক পরিচিতা নহেন, চিত্রসৃষ্টি তো দূরের কথা। পুরুষের সহিত একযোগে কিছু কাজ করিলেও কাহারো নাম শুনিয়া যিনি দৃঢ়হস্তে সমাজের আবর্জনা দূর করিয়াছেন। দোষ দিব কাহাকে? ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একই কথা ভাবি—বড় সংকীর্ণ পরিসরে পরগাছার মত পরিপুষ্ট নারীর জীবনে কোনও বৃহৎ সম্ভাবনা কোনও দিন নাই। তাই বলি তাহাদের স্বচ্ছন্দ জীবন দাও। মেয়ে ও ছেলেতে ভেদ রাখিয়া বাল্য হইতে কন্যাকে শ্বশুরবাড়ির ভয় দেখাইয়া মানুষ করিও না।

পুত্রকন্যায় শ্রেণী বিভেদ রাখিও না, মানুষের মত মানুষ হইতে দাও, কবির ভাষায় তাহাদের জন্য—

"আলো চাই চাই মুক্তবায়ু
চাই বল চাই স্বাস্থ্য আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু।
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।"

তবে হয়ত ভারতের সমাজের সন্তানের ও কালের নব পরিবর্তন হইবে।

নারীর পরাধীনতার গ্লানি দূর করা চাই। স্বামী ও স্ত্রী এই দুই মিলিয়া এক অখণ্ডসত্তা এই বোধ নারীর মধ্যে জাগুক। একজন দাসী ও একজন প্রভু নয়।

"আমি নারী আমি মহিয়সী"

আমিও বিশ্বের প্রয়োজনে একজন, এই জাগ্রত চেতনা আসুক।

ভারতের নারী একদিন বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসন গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাই ভারতের বিস্মৃতপ্রায় গৌবরময় যুগের কথা স্মরণ করিলে। অংকশাস্ত্রে লীলাবতী, তর্কশাস্ত্রে গার্গী, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসায় ঋষিনারী মৈত্রেয়ীর আদর্শ আমাদের মনকে পরম আশ্বাস পূর্ণ করে যে হয়ত আমরাও বাঁচিয়া উঠিব, সুপ্ত আত্মা হয়ত একদিন আবার জাগিয়া উঠিয়া বিশ্বের সম্মুখে আপন দাবী হিসাব বুঝিয়া লইব। একদিন যাহা ছিল, আবার তাহা আসিবে।

প্রেম

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

প্রেম?
খরস্রোত জীবনের চঞ্চল তরঙ্গ বক্ষে
প্রস্ফুটিত শুভ্র শতদল?
অলীক স্বপন!
ভঙ্গুর চিন্তার স্রোতে
বয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে
কল্পনার বিচিত্র বিলাস;
জলোচ্ছ্বাস
ধেয়ে চলে দিকে দিকে উদ্দাম উন্মাদ
ফেনিল আবর্ত তুলি' মত্ত ঝঞ্ঝাসম।

প্রতিক্ষণে দেয় জলাঞ্জলি ক্ষণিকেরে
পলে পলে নিষ্ফল আক্রোশে;
অনাগত নূতনেরে জানায় আহ্বান।
চঞ্চল জীবন-নীর
নহে স্থির ক্ষণেকের তরে।
ফেলে-আসা দীর্ঘ পথ-রেখা
ভরে যায় কর্দ্দম কলুষে;
সে অতীতে
ফিরে যাওয়া তাই নয় তো সম্ভব;
জীবন চাহে না তারে।
মত্ত লালসায়
ছুটে চলে আকুল অন্তর
সম্মুখের পথপানে দু'বাহু প্রসারি'।
পায় যাহা
পরক্ষণে যায় হারাইয়া;
ব্যর্থতার হাহাকারে তাই
জ্বলে ওঠে কামনার লেলিহান শিখা।
তটভূমে যা কিছু সুন্দর
উপাড়িয়া দুই হাতে বক্ষপরে টানে।
সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা
আত্মসাৎ করিবারে চায়
নীলাঞ্জন স্নিগ্ধ তরুছায়া;
অপরূপ মায়াকুঞ্জ মাধবীবিতান
পলকে লুটায় ভূমিতলে।
কোথা প্রেম?
মনের নিভৃত কুঞ্জে
দক্ষিণ মলয়ানিলে
আন্দোলিত শুভ্র শতদল?
মৃদুগন্ধ, সুকোমল
আনন্দ পরশে যার
শিহরিয়া ওঠে ক্ষণে ক্ষণে
জীবনের মরুপথে তৃষিত পথিক?
তৃষ্ণার্ত্ত মানস-ভৃঙ্গ
ছুটে যায় আসঙ্গ পিয়াসে।
কল্পনা অলীক।
সপ্তমীর ক্ষীণ চাঁদ ডুবে যায় পশ্চিম আকাশে;
ক্লান্তপক্ষ তৃষিত চাতক
অবসন্ন জীর্ণ পত্রসম
ভেসে যায় বায়ুর হিল্লোলে,
নেমে আসে ধূসর ধূলায়।
ধরিত্রীর শিয়রে ঘুমায়
ব্যর্থ মনে লজ্জাবতী লতা।
ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস
রজনীর নিঃশব্দ প্রহরে
কেঁদে মরে ঝাউবনে, দেবদারু শিরে।
কোথা প্রেম?
মত্ত স্রোতস্বিনী—
ধাববান জলোচ্ছ্বাস,
ছুটে চলে
জীবনের প্রান্ত হ'তে দিকসীমা পানে।
সহসা তন্দ্রালু হয়
প্রতিগ্রন্থী অবসাদভরে।
চঞ্চল চলার বেগ
আচম্বিতে থেমে যায় সাগর-সঙ্গমে।
লীন হয় তনুসীমা
নিবিড় বন্ধনে
স্নেহগন্ধ মিশে যায় অঙ্গের সুবাসে
মত্ত আলিঙ্গনে;
দুরন্ত শিশুর মত
তৃষাতুর ক্ষুধিত অন্তর
লুটাইয়া পড়ে যেন মাতৃবক্ষ পরে।
সাগর দুলিয়া ওঠে,
শান্ত হয় নদ,
নিঃশেষে ঢালিয়া দেয়
আপনার অন্তর নিঙাড়ি';
থেমে যায় কলরব।
অঞ্চলে লুকায়ে মুখ
সোহাগে ফুলিয়া ওঠে মত্তজলস্রোত।
ধীরে চাঁদ নেমে আসে
ধরিত্রীরে করিতে চুম্বন—
সে মিলন-মহাক্ষণে
যৌবনের বালুবেলা তটে।
এই প্রেম!
চিরন্তন মৃত্যুঞ্জয়ী সুধা
লোকে লোকে তৃষাতুরে করেছে অমর,
যুগে যুগে মিটায়েছে জীবনের ক্ষুধা।

আদিম জাতির লোক-সঙ্গীত

শ্রীনলিনী কুমার ভদ্র

আদিম জাতির নৃত্যগীতের একটি দৃশ্য

আদিম জাতিসমূহের প্রতি আমাদের অনেকের মনে একটা অবজ্ঞার ভাব বিদ্যমান। এই মনোভাব অজ্ঞতা-প্রসূত। ভারতের আড়াই কোটি আদিবাসীকে আজও যে আমরা ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রেখেছি, তার কারণ তাদের জাতিগত ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে আমরা অপরিচিত। একই দেশে অন্ততঃ দু' হাজার বৎসর পাশাপাশি বাস করা সত্ত্বেও আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলতে পারি নি। ফলে আর্য ভারত এবং অনার্য ভারতের মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে এক দুর্লঙ্ঘ্য বিরাট ব্যবধান।

জাতির আত্মার প্রকৃত অভিব্যক্তি তার লোক-সাহিত্যে। কোনো জাতির যথার্থ স্বরূপের সন্ধান পেতে হলে তার লোকসঙ্গীত, রূপকথা, লৌকিক কাহিনী ইত্যাদির ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ অপরিহার্য। অধিকাংশ আদিম জাতিরই কোনো লিখিত সাহিত্য নেই, কিন্তু সৃষ্টির আনন্দে স্মরণাতীত কাল থেকে তারা ছবি এঁকে এসেছে গিরি-গুহাগাত্রে, নৃত্যচ্ছন্দে রূপায়িত হয়েছে তাদের অন্তরের আকুতি, মনের নিগূঢ় কথাকে প্রকাশ করবার জন্যে তারা করেছে গীত রচনা; আর শুধু কথার মাধ্যমে অকথিত আনন্দ বেদনাকে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলতে অক্ষম হয়ে তাতে করেছে সুরসংযোজনা। নির্মল দর্পণে সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের ন্যায় এই সমস্ত স্বতঃস্ফূর্ত লোকসঙ্গীতে তাদের জাতীয় আত্মার স্বরূপ সুষ্ঠুভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। আদিম জাতিদের লোকসঙ্গীতের প্রধান গুণ আন্তরিকতা; সেগুলো সর্ব-প্রকার বাহুল্য ও কৃত্রিমতা বর্জিত। আদিবাসীদের লোক-সঙ্গীতে যেন অরণ্যবৃক্ষের মর্মরধ্বনি। বিহগকণ্ঠের কল-কাকলি এবং গিরি নির্ঝরিণীর কুলু কুলু রব শুনতে পাওয়া যায়।

আমাদের ঘরের পাশে যে সকল আদিম জাতি বাস করে তাদেরও পর্যন্ত লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে আমরা খোঁজ রাখি না। সেগুলো সংগ্রহ করে তার সঙ্গে আমা-দের লোকসঙ্গীতের তুলনামূলক সমালোচনা করলে আমরা উভয়ের মধ্যে ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য সত্ত্বেও মূল ভাবগত ঐক্য উপলব্ধি করে চমকিত হতাম এবং আদি-বাসীরা যে আমাদের আত্মার আত্মীয়, আমরা যে একই মাটির সন্তান এ সত্যও আমাদের অন্তরে প্রতিভাত হত।

বিচিত্র মানবগোষ্ঠী অধ্যুষিত ভারতবর্ষে আপাত-দৃশ্যমান অসংখ্য বিভেদের মধ্যেও যে একটা গভীর ঐক্য রয়েছে, সকল প্রদেশের সকল জাতীয় ভারতীয়ের হৃদয়ের তন্ত্রীতে যে সুর অনুরণিত তা যে মূলতঃ এক সে পরি-চয় বিধৃত এদেশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র প্রচলিত লোকসঙ্গীতে। এ প্রসঙ্গে ভারতের অন্য-তম শ্রেষ্ঠ লোকগীতি সংগ্রাহক শ্রীদেবেন্দ্র সত্যার্থীর 'ধীরে বহো গঙ্গা' নামক পুস্তকের ভূমিকায় বাসুদেবশরণ অগ্র-বালের লিখিত নিম্নোক্ত কথাগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ—

"ইন অসংখ্য লোকগীতো কী আত্মা অভিন্ন হৈ। ভাষা কে ভেদ হোতে হুয়ে ভী গীতো মেঁ ব্যাপ্ত ভী ভারতীয় মানব কা হৃদয়, উসকে দুঃখ সুখ কী অনুভূতি, উসকী আশা ঔর নিরাশা এক জৈসী হীহৈ। শব্দোঁ কী দৃষ্টি মেঁ স্থান স্থান কে গীত অলগ-অলগ হোনে পর সব মেঁ সমান অর্থ কা ধাগা পিরোয়া হুয়া হৈ। অর্থ কী একতা গীতময় ভারত কো বিলক্ষণ একতা প্রদান করতী হৈ। একতা কী ওয়াহ্ পরিপাটী প্রান্ত প্রান্ত কে গীতোঁ মেঁ অনেক প্রকার সে প্রকট হোতী হুই দিখাঈ পড়েগী।"

অর্থাৎ—"এই অসংখ্য লোকগীতির আত্মা অভিন্ন। ভাষাগত পার্থক্য সত্ত্বেও, ভারতীয় মানুষের হৃদয়, তাদের সুখদুঃখের অনুভূতি, তাদের আশা-নিরাশা যে এক সেই-

ঢেউ এই সকল গীতের মধ্যে ওতপ্রোত। কথার দিক দিয়ে বিচার করলে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গীতের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও ভাবের সমতা হেতু সবগুলি একই সূত্রে বিধৃত। ভাবের এই একতা গীতময় ভারতের বিশিষ্ট ঐক্যের নিদর্শন দেখা যায় যে, বিভিন্ন অঞ্চলের গীতের মধ্যে এই সুষ্ঠু ঐক্য বহু প্রকারে প্রকট।"

দীর্ঘকাল ধরে দেশবিদেশের বহু লোকসঙ্গীতানুরাগীর অনুসন্ধানের দরুণ ভারতের বিভিন্ন আদিম জাতির মধ্যে প্রচলিত অসংখ্য লোকগীতি সংগৃহীত হয়েছে। ফলে যে বিরাট লোকগীতি-সাহিত্য গড়ে উঠেছে তা আমাদিগকে বিস্মিত করে। আসামের কাছাড়ী, নাগা, গারো, খাসিয়া, মিকির প্রভৃতি এবং কোল, ভীল, শবর মুণ্ডা, ওরাও, গোন্দ ইত্যাদি বহু আদিম জাতির মধ্যে স্মরণাতীত কাল থেকে সুললিত লোকসঙ্গীতসমূহ প্রচলিত। লোকসঙ্গীতের ন্যায় নৃত্যকলাও আদিম জাতিসমূহের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে। নৃত্য প্রায় সবগুলি আদিম জাতিরই পূজাপার্বণ এবং উৎসবাদির অপরিহার্য অঙ্গ। সুললিত লোকসঙ্গীতের সমন্বয়ে নৃত্যকলার অপরূপ রূপায়ণ আদিম জাতির উৎসবসমূহকে প্রাণবন্ত করে তোলে। আসামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আদিম জাতি মণিপুরীদের নৃত্যকলার খ্যাতি আজ শুধু সমগ্র ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও প্রচারিত।

এদেশের আদিম জাতিসমূহের লোক-সাহিত্য সংগ্রহের ব্যাপারে পথ-প্রদর্শক হচ্ছেন বিদেশী। বিশেষভাবে ইংরেজ ও জার্মাণ অনুসন্ধানীগণ। তাঁদের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি আদিম জাতির লোকসঙ্গীত সংগ্রহে মনোযোগী হয়েছেন। তাঁদের অনুসন্ধানের ফলে বহু লোকগীতি সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় বাংলাদেশে এদিক দিয়ে কাজ বড় একটা হয়নি। আমাদের ঘরের পাশেই আমাদের নিকটতম প্রতিবেশীরূপে যারা বাস করে আসছে সেই সকল আদিম জাতির লোকসাহিত্য লৌকিক কাহিনী ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল এবং অনুসন্ধিৎসা অবিলম্বে জাগ্রত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এখন, আমরা কোন্ কোন্ সন্ধানীর দ্বারা ভারতের কোন্ কোন্ আদিম জাতির লোকসঙ্গীত সঙ্কলিত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি।

মুণ্ডা জাতির সরহুল পর্বের অনুষ্ঠান অনেকটা উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত বসন্তোৎসবের ন্যায়। এই সময়ে সমবেত নৃত্যানুষ্ঠান হয়ে থাকে। লোকসঙ্গীতের অক্লান্ত সংগ্রাহক শ্রীদেবেন্দ্র সত্যার্থী তাঁর 'ধীরে বহো গঙ্গা নামক পুস্তকে এরূপ কয়েকটি গীত মূল ও অনুবাদসহ দিয়েছেন। এই গ্রন্থে তিনি ওরাও, গোন্দ, মড়িয়া, সাঁওতাল, ভীল ইত্যাদি বিভিন্ন আদিম জাতির লোকসঙ্গীতের সঙ্গে অন্ধ্র এবং কান্‌ড়ার লোকসঙ্গীতের নমুনাও দিয়েছেন। এই ব্যাপারে তিনি গুজরাটের অমর কলাশিল্পী পরলোকগত ঝবেরচন্দ্র মেঘানীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছেন গুজরাটের ভীলদের লোকগীতি সম্বন্ধে শ্রী পাগো বাণকর আর অধ্যাপক টকারভাই নায়কের পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে।

উদয়পুরের সাহিত্য শোধ প্রতিষ্ঠানের ভূতপূর্ব কর্মকর্তা শ্রীফুলজী মীনা ভীলী (ভীলদের ভাষা) ভাষার দু' হাজারের উপর লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করে রাজস্থানী সাহিত্যের সম্পদবৃদ্ধি করেছেন। ইনি নিজে একজন প্রতিষ্ঠাবান ভীল। আদিবী বপীরাজু কর্তৃক গঙ্গারেডী নামক আদিম জাতির লোকগীতি সংগৃহীত হয়েছে। অন্ধ্রদেশে ভক্তার, জটাপু, কোণ্ডা, ডেরা প্রভৃতি বহু আদিম জাতির বাস। অন্ধ্রদেশের অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গোদাবরী নদীর পশ্চিম তীরস্থ রাজমহেন্দ্রীর তিন মাইল দূরবর্তী কোণ্টা মারু নামক অঞ্চল থেকে শ্রীনন্দনুরী গঙ্গাধরম চার হাজারেরও অধিক লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। সর্বশ্রী সিগরাচার্য, শ্রীনিবসচার্য, এস কৃষ্ণমূর্তি এবং এস সুব্বারাও অন্ধ্র গীতি সংগ্রহের জন্যে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করেছেন। আজ থেকে নহু বৎসর পূর্বে একজন দক্ষিণী বিদ্বানের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁর নাম শ্রী সি আই গোবর। ১৮৭২ সালে তাঁর 'ফোক সংগ্‌স অব সাদার্ণ ইণ্ডিয়া' নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়।

ইংরেজ সন্ধানীদের মধ্যে যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য, ডবলু জি আর্চার তাঁদের অন্যতম। ইনি ওরাও লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁর কয়েকখানি মূল্যবান পুস্তকও প্রকাশিত হয়। মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন আদিম জাতি বিশেষতঃ গোন্দজাতির শুধু রীতিনীতি নয়, লোকসঙ্গীত সম্বন্ধেও সম্যক্‌রূপে আলোচনা করেছেন ডক্টর ভেরিয়ার এলউইন। তিনি গোন্দ ভাষা থেকে বহু লোকসঙ্গীত মূলের সৌন্দর্য অক্ষুন্ন রেখে সুষ্ঠুভাবে ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন।

ছত্রিশগড়ের লোকগীতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন শ্যামাচরণ দুবে। সেখানে দাদরিয়া, বারমা, নচেরী, সুয়া ইত্যাদি কয়েক শ্রেণীর গীতের প্রচলন আছে, বিবাহ অনু-

ষ্ঠানেও কয়েক প্রকার গীত গাওয়া হয়ে থাকে। ছত্রিশ-গড়ের অধিবাসীরা দরিদ্র হলেও সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ অনুরাগসম্পন্ন। গীত এদের কর্মক্লান্ত জীবনে নব উদ্দীপনার সঞ্চার করে, দুরূহ কার্যে আত্মনিয়োগ করবার জন্যে এদের নূতন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করে তোলে।*

(২)

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আদিম জাতিসমূহের লোক-সঙ্গীত সংগ্রহের যে বিরাট প্রচেষ্টা চলছে তা আশাপ্রদ। জাতির প্রাণসত্তার নিগূঢ় পরিচয় লাভ করতে হলে এগুলির মর্মমূলে প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। আর কথা না বাড়িয়ে এবার আমরা বিভিন্ন আদিম জাতির কতকগুলি শ্রেষ্ঠ লোকসঙ্গীতের নিদর্শন উদ্ধৃত করছি।

সাঁওতালদের প্রণয় এবং বিবাহ-সঙ্গীতগুলি এমনি একটা স্নিগ্ধ মাধুর্য এবং আন্তরিকতায় পূর্ণ যে তা হৃদয়কে স্পর্শ করে। এক প্রেমিকা তার প্রণয়ীকে বলছেঃ—

সাসাং ধুতীতেম ধুতী এনা
আলে রাচারেম পারোম এনা
আলে রাচারে সুলুই—লুন্দই
তোব্‌া বাহা।

অর্থাৎ—তুমি হলুদ রঙের ধুতি পরে যাচ্ছ আমার আঙিনা পার হয়ে। কিন্তু দেখো আমার অঙ্গনে ফুটেছে দুধের মত সাদা সুন্দর উজ্জ্বল ফুল। তুমি নিজের হাত নিয়ে যেতে পার ঐ ফুলের উপর, কিন্তু একে তুলে নিয়ে যেও না।"

এর শেষের পংক্তিটি কি করুণ ব্যঞ্জনাময়!

নীচে আর একটি সাঁওতালী গান তুলে দিচ্ছি যাতে অভিব্যক্ত হয়েছে দাম্পত্য প্রণয়ের মাহাত্ম্যঃ—

এংগা-আপা ওড়াক খোনেম ইদিঞ কানা,
তিনাক দুলাড় রেম দোহোইজা
দেলাঙ্‌ ইজ ইদিমে দুলাড় রেঞ দোহোমে
তিরী পুরুষ দুলাড় তিরে দোহোমে জুগে।

(বিবাহ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হওয়ার পর বধূ বরকে বলছে) —"মা বাপের ঘর থেকে নিয়ে যাচ্ছ তুমি আমায়। (কিন্তু কে জানে) কত আদরে আমায় তুমি রাখবে। (প্রিয়তম বলছে) আমি নিয়ে যাব তোমায়, রাখব সমাদরে, পতিপত্নীর প্রেম যে শাশ্বত। তা কি জানো না তুমি?"

ধনীর দুলারীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে গরীব যুবকের। সে নববধূর সামনে তুলে ধরছে তার পাহাড়ে দেশের ছবিঃ—

আম দো কি সাঁন হোপোন জৈ দো রে'গেচ
হোপোন
তোব্‌া-দাহে দো নালোম উইহার
আলে দিসোম দো বুরুরে সিজ আড়াক
ডাড়ু তে ঘাণ্টায় দো হোড়োর গোত—হোড়োর গোত
আলে দিসোম দো বইহাড় রে কান্থা আড়াক
ঝিনুকতে খাপোদ দো খোপোর গোত খোপোর
গোত
তোব্‌া-দাহে দো আলেম উইহার।*

অর্থাৎ, তুমি ধনী পরিবারের সন্তান, আমি গরীব ঘরের যুবক। প্রিয়ে আমার ওখানে দধি দুগ্ধ পাবার প্রত্যাশা করো না। আমার দেশে পাহাড়ে হয় 'সিজ' শাক। রন্ধন-কালে সেই শাক খোন্তা দিয়ে নাড়লে আওয়াজ হয়—'হোড়োর গোত' 'হোড়োর গোত'। তা হবে তোমার পক্ষে বিরক্তিকর। আর আমার দেশের ক্ষেতে জন্মায় প্রচুর কান্থা শাক। ঐ শাক পাক করবার সময় শব্দ হয় 'খোড়োর গোত', 'খোড়োর গোত'—এতেও তুমি হবে বিরক্ত। প্রিয়ে, তুমি দধিদুগ্ধের প্রত্যাশা করো না।"

সাঁওতালদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের অজস্র লোক-সঙ্গীত প্রচলিত। শ্রীদিবাকর সাহু এগুলোকে ১২টি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যথা—(১) দোঙ্‌ সেরেঘ —বিবাহ অনুষ্ঠানে যে সকল গান গাওয়া হয়। (২) লাগড়ে সেরেঘ—এ হচ্ছে বিশেষভাবে স্ত্রীলোকদের গীত ইত্যাদি।

বিহারের রাঁচি জেলার ওরাও' নামক আদিবাসীদের মধ্যে এমন কতকগুলি লোকসঙ্গীত প্রচলিত আছে যা রসসৃষ্টির সার্থক নিদর্শন বলে গণ্য হতে পারে। ওরাও' কবির হাত দিয়ে এমন জিনিষও বেরিয়েছে যা ভারতের সংস্কৃতির ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্নসমূহের সঙ্গে একত্রে স্থান পাবার যোগ্য। নিম্নে একটিমাত্র মূল ওরাও' গান ও তার অনুবাদ দিচ্ছিঃ—

সব্বী লে মনে এংগহৈ' এয়ংগা
অথাহ ভের্খা নু উড়িয়ার আলগী
উড়িয়ার আলগি হওরআ হোং মলখওরই
মুন্দা ইজআ কে অন্ত বেন্দা হো পোল্লী॥

*হমারি আদিম জাতিয়াঁ—শ্রীঅখিল বিনয়—পৃঃ ২৮

* এই সাঁওতালী লোকসংগীতগুলি সাঁওতালী ভাষার সাপ্তাহিক পত্রিকা "হোড়্‌ সোম্‌বাদ"-এর সম্পাদক শ্রীদিবাকর সাহু সমীর কর্তৃক সংগৃহীত।

মনে এংগহে অক্কুন সন্নীম রঙ্গ বোলোন রঙ্গ,
অক্কুন অন্নু নীদী তাকাদিম নিন্দকী রঙ্গ
অরগী অড়সা অক্কুন ঘোড়া পরিয়া আদিবী
একাতরা উরওয় অজগোম উড়িয়ার ঈ॥
নিংগ অচরণ চী অয়ংগ আদ্ ধরচ কী দিন রও
মলতো বীড়ী বিল্লী নু ইজআ হোঁ পোচল্লা
মোখারো বদালী মাড়া হো টকও।

চী-অয়গ অচরন।

অর্থাৎ—ওগো মা মন আমার ছোট, কিন্তু তা বিচরণ করে অনন্ত আকাশে।

সে বিচরণ করে বটে, কিন্তু পড়ে যায় না।
কিন্তু তা হলেও সে যে পায় না স্থির হয়ে দাঁড়াবার স্থান।

এখন, এর মধ্যে পোরা আছে স্রেফ বায়ু,
মন আমার এখন তো ছোট মা আর তা লঘুও বটে।
এখনো যে তার যৌবনকাল হয় নি সমাগত।
যেদিকেই ফুঁ দেওয়া যায় সেদিকেই সে হয় সঞ্চালিত।

মাগো মেলে দাও তোমার আঁচলখানি,
তাই আঁকড়ে ধরে থাকবে সে
নইলে সূর্যের প্রচণ্ড কিরণে সে তো পারবে না খাড়া থাকতে,
(তুমি যদি আশ্রয় না দাও তো) আঁধি এসে ওকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে না?

কালো বাদল ওকে ফেলবে না ঢেকে?

স্যার্ভেন্ট অব ইন্ডিয়া সোসাইটির কর্মী এল্ এন সাহু আদিম জাতির লোকসঙ্গীতের আর একজন উৎসাহী সংগ্রাহক। তাঁর বইয়ে বিভিন্ন আদিম জাতির যে সমস্ত লোক-সঙ্গীত সঙ্কলিত হয়েছে তন্মধ্যে অনেকগুলোই ভাবৈশ্বর্যে সমৃদ্ধ, রূপসৃষ্টি কৌশলে অনবদ্য এবং উপমা ও অলঙ্কারে মনোজ্ঞ। এখানে সামান্য মাত্র নিদর্শন দিচ্ছি। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় মূল বাদ দিয়ে শুধু অনুবাদই দেওয়া হবে। প্রথমেই উদ্ধৃত করছি "হো"দের একটি লোক-সঙ্গীত—পাণিপ্রার্থী প্রণয়ীকে তরুণী প্রেমিকা বলছেঃ

আমার পেছনে ধাওয়া কর তুমি সকল স্থানে
রাস্তার 'পরে, পাহাড়ের ধারে বসে থাকো ওৎ পেতে,
তোমার সঙ্গে ঘর বাঁধতে আমায় প্রলুব্ধ কর তুমি,
কি করে ছাড়া পাই আমি?
তুমি আমায় ভালোবাস, আমায় কর প্রলুব্ধ
কিন্তু বলো আমায়, পারো কি তুমি ঘর বানাতে?
দিব্যি কর—আর খাবে না মদ।
দিব্যি কর—আমায় করবে না তুমি প্রহার
মৃদুমন্দ বাতাসের মত তুমি হবে মধুর;
আর বৃক্ষতলের ছায়ার মত হবে শীতল।

রোমান্টিসিজমের সঙ্গে বাস্তবতার কি অপূর্ব সমন্বয় হয়েছে এই সঙ্গীতে।

গরীবের ঘরে জন্মানো যেমন আমাদের সমাজের মেয়েদের তেমনি আদিম জাতির কন্যাদের পক্ষেও চরম অভিশাপ। নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতে টাকার লোভে পিতামাতা কর্তৃক বিক্রীতা একটি কন্যার গভীর মর্মবেদনার অভিব্যক্তি আমাদের অন্তরকে বিচলিত করে। মাকে সম্বোধন করে মেয়েটি বলছেঃ

"মাগো, কত যাতনা সয়ে তুমি আমায় জন্ম দিয়েছিলে
গরীব ছিলে তোমরা, তাই কত যত্নে আর কত ধৈর্যে তোমরা করেছিলে আমায় মানুষ.
কিন্তু হায়,
কিসের জন্যে এখন তোমরা আমায় দূর দুর্গম পাহাড়িয়া দেশে ফেললে বেচে।

এখন, উপমাপ্রয়োগ নৈপুণ্যের কতকগুলো দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে প্রবন্ধের উপসংহার করছি। এগুলির মৌলিকত্ব ও মাধুর্যে মুগ্ধ হতে হয়। একজন প্রেমিক তার প্রণয়িনীকে বলছেঃ

"ওগো রাণী, অগ্নিকুণ্ডে কুমোরের পাত্র যেমন লাল হয়ে উঠে তেমনি প্রেমের আগুন আমায় তাতিয়ে করে তুলেছে লাল।"

নববসন পরিহিতা প্রণয়িনীকে প্রেমিক বলছে—"গাছ যেমন জীর্ণ পীতাভ পত্র পরিত্যাগ করে সবুজ পত্র সম্ভারে সজ্জিত হয়, তুমিও তেমনি হলদে সাড়ী পরিত্যাগ করে নূতন সবুজ সাড়ীতে অঙ্গ আচ্ছাদিত করেছ।"

নায়ক কর্তৃক নায়িকার রূপ বর্ণনাঃ

"শাদা চালের মত শুভ্র তোমার দাঁতগুলো
আর গাল দুটি তোমার শেদ্ধ করা ভাতের মত।"

এই উপমাগুলিতে দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব লক্ষ্যনীয়।

আর অধিক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। আরণ্য প্রকৃতির পটভূমিকায় আদিম জাতির কবিদের সাধনায় যে অজস্র সঙ্গীতকুসুম প্রস্ফুটিত হয়েছে তার সৌরভ রসিকজনের চিত্তকে আনন্দে আত্মহারা করে তোলে। আদিবাসী

অধ্যুষিত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু লোক-সঙ্গীত আবিষ্কৃত হয়েছে সত্য, কিন্তু আরো কত অমূল্য রত্ন যে লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে কে তার খবর রাখে। আধুনিক সভ্যতার আওতায় জাতির এই অমূল্য সম্পদ যাতে চিরবিলুপ্তির অন্ধকারে বিলীন না হয় সেজন্য দেশবাসীর অবিলম্বে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ঢেকে গেছে চাঁদ দুরাশার মেঘে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ভেসে যায় মেঘ বিদ্যুৎ হানি
তোমার প্রেমের সঙ্গীত সুরে,
আমাদের ছায়া পড়িবে কি রাণি!
আগামী কালের মর্ম্ম মুকুরে।
মরাদিনগুলো আজো পড়ে আছে;
সজীবতাহারা হৃদি-উপকূলে।
আমার জীবনে যারা এলো কাছে,
তাদের মত কি এলে পথ ভুলে!

সীমারেখা পারে স্বপন আমার
খুঁজিছে কাহারে তুমি তো বোঝ না?
যেদিকে নেহারি গহন আঁধার,
ঘুমায় রজনী, অলস জ্যোছনা।
শিথিল শেফালি ঝরে যায় রাতে
বাতাস মুখির মৃদুল সুবাস,
অন্ধকারের জপমালা হাতে
গাহিছে কে গান করুণ উদাস!
দূর হ'তে আসে দুলে দুলে তরী,
দূর পারাবারে ভেসে যায় ভেলা।
আলোক ছায়ায় নিশিদিন ধরি
কালের বেলায় চলিতেছে খেলা।
কত আকাশের বুকে জাগে তারা,
কেবা জানে আলো থামে কোন্‌খানে?
মোদের জীবনে দিয়েছে কি সাড়া
স্বপ্নবাসরে নিশীথের গানে?

মরুময় কেন মায়াঘেরা মন
মরীচিকা পানে ছুটিতেছে জীব?
সাগরের সম নিখিল জীবন,
অন্তরে তার শোভে প্রেমদ্বীপ।
সে দ্বীপে কতনা শ্যাম সমারোহ
ভালোবাসিবার বর্ষণ ফাঁকে;
প্রাণ বিনিময়ে মেঘ হোলো মোহ,
আকাশ যেথায় সিন্ধুরে ডাকে।
ঘুমের দোলায় দোল খেয়ে খেয়ে
আকাশকুসুম গেঁথে গেলে রাণি।
কোথা রেখে যাবে, বলো, সোনা মেয়ে,
লাজভরা তব সোহাগের বাণী।
তুমি কি ভেবেছ ক্ষণ পরিচয়ে
আমার মনেতে শত সংশয়?
এই ধরণীতে জয় পরাজয়ে
লাভক্ষতি কিছু বুঝিবার নয়।

ঘরছাড়া বাঁশী গিয়েছে কি ডেকে,
দ্বার হ'তে ফিরে চলে গেছে কেউ?
ঢেকে গেছে চাঁদ দুরাশার মেঘে,
নিরাশার তটে বেদনার ঢেউ!
তেপান্তরের পথে তরুবীথি,
বলো, কেন গায় সকরুণ গীতি?

দর্পচূর্ণ

শ্রীশক্তিপ্রসাদ রায়শর্ম্মা

অবিনাশবাবুর স্ত্রী সৌদামিনী একটু দস্যি প্রকৃতির লোক। ছোটো একটা পরিবারের গিন্নী। অবিনাশবাবু এবং একমাত্র ছেলে সুকুমারকে নিয়েই তাঁর সংসার। সৌদামিনী স্ত্রী হয়েও অবিনাশবাবুকে আঘাত দেবার মতো অনেক কাজই করে থাকেন। অবিনাশবাবু কিন্তু নীরবে সহ্য করেন সব। গিন্নীর মতের প্রতিকূলে কোনো কাজই করেন না তিনি। সুকুমারও মায়ের সব কথাই মেনে চলে। এককথায়, সৌদামিনী স্বেচ্ছায় এবং অবাধে সবকিছুই করেন। ফলে আশেপাশের বাড়ীতে যেমন মনোমালিন্য ও বিশৃঙ্খলার ভাব, সৌদামিনীর শত অন্যায় অবিচারের মধ্যেও তার কোনো চিহ্নই দেখা যায় না। অবশ্য গিন্নীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবিনাশবাবু একটু মাথা তুললে তাঁর সংসারেও হয়তো একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হোত, বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। কারণ সৌদামিনী অন্যায় করলেও তাঁর বিরুদ্ধে কেউ যে কোনো কথা বলবেন, এটা তাঁর অভিপ্রেত নয়, বললে সহ্যও হয় না।

নিজের সংসারের এই শান্তি-শৃঙ্খলাটুকুর জন্যে সৌদামিনী কিন্তু অত্যন্ত বড়াই করেন। এই বড়াই করাটাও সহ্য করা যায়। কিন্তু এই বড়াই করার প্রসঙ্গে যে একটা বিশ্রী মনোভাব প্রকারান্তরে প্রকাশ পায় সেটা সতিই অসহ্য। মনোভাবটি এই, আর কারো সংসার যেন তাঁর চেয়ে সুখের না হয়। সবাই দেখুক, সৌদামিনীর সংসার সকলের চেয়ে সুখের।

ভাগ্য-চক্রের আবর্ত্তনে সুখটা যদি কারো সংসারে কখনো মাথা উঁচু ক'রে অমনি সৌদামিনীর বুকটা ছ্যাঁক করে ওঠে। অমনি সেই সুখের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাবার একটা অপপ্রচেষ্টাও চলতে থাকে তাঁর।

পাশের বাড়ীর গিন্নী রুদ্রাণী একটু চাঁছা-ছোলা প্রকৃতির লোক। তিন-চার ছেলের বৌ নিয়ে সংসার করেন তিনি। অভাবের সংসার তাঁর। মাঝে মাঝে রুদ্রাণীর মাথার উপর দিয়ে বড়ো বড়ো অশান্তির ঝড় বয়ে যায়।

মেজো বৌমার সঙ্গে সেদিন রুদ্রাণীর একটু মন কষাকষির ভাব চলছিলো। দুজনেরই গলার স্বর একটু মাত্রা ছাড়িয়েছিলো। এই সুযোগে সৌদামিনী জানলার ফাঁক দিয়ে দুটো কথা শুনিয়ে দিলেন। বললেন, তোমাদের চালে যে কাক বসতে পায় না গো। আমি এ্যাদ্দিন ধরে সংসার করে আসছি। কেউ কোনো টুঁ শব্দ পায়নি আজ পর্যন্ত।

কথাটা রুদ্রাণীর কাণে গেল। সহজে কারো কথা হজম করবার পাত্রী রুদ্রাণী নন। বললেন, অতো বড়াই করো না দিদি। ঘরে ছেলের বৌ আসতে দাও। একা একা দিন কাটাও। স্বরূপটি তো প্রকাশ পায় না।

বছর কয়েক এগিয়ে গেছে। সুকুমারের বিয়ে হয়েছে। নতুন বৌ এসেছে ঘরে। নাম ঊর্মিলা।

পাড়ার গিন্নীরা বলতে লাগলেন, এবার দেখা যাবে সৌদামিনী কিরকম সংসার করতে জানে।

কেউ কেউ বলেন, না-না একটা বৌ-এ কি আর শাশুড়ী চেনা যায়! বৌ তো হাতের মুঠোয় থাকবে।

দিন আরো এগিয়ে গেছে। বৌ হয়েছে পুরোণো। এবার শাশুড়ীর অবাধ গিন্নীপণায় বাধা পড়লো। ঊর্মিলা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাশুড়ীর স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধিতা করতে লাগলো। বৌমা ও শাশুড়ীর মধ্যে দাঁড়ালো একটা মনোমালিন্যের ভাব।

এই মনোমালিন্যের ভাবটুকু সৌদামিনী চেপে রাখতে চান। অপর কারো কাছে প্রকাশ করতে চান না। কিন্তু তিনি প্রকাশ না করলে কি হবে? বৌমা তো যে কোনো মুহূর্তেই শাশুড়ির যে কোনো অপবাদ ছড়াতে পারে! এই আশঙ্কাতেই সৌদামিনীর দিনরাত্তির স্বস্তি নেই।

ঊর্মিলা বেশীক্ষণ বাড়ীতে থাকতে চায় না। কাজকর্ম শেষ করেই আশেপাশের বাড়ীতে বেড়াতে যায়। সৌদামিনীর উদ্বেগের সীমা থাকে না। কখনো কোনো দেওয়ালের পাশে, কখনো কোনো দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে গোপনে বৌমার কথায় কাণ দেন। জানতে চান, বৌমা তাঁর কোনো অপবাদ ছড়ায় কিনা।

সুকুমার বিদেশে। চাকরীর ক্ষেত্রে। স্ত্রী হঠাৎ রোগে পড়লো। অবিনাশবাবু চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে চাইলেন। গিন্নী বাধা দিয়ে বললেন, দরকার নেই। রোগ এমন কিছু মারাত্মক নয়।

মাসখানেক অবহেলায় কেটে গেল। ঊর্মিলা মুমূর্ষু। সুকুমারকে কোনো খবরই দেওয়া হয়নি। এতোদিনে একটা ডাক্তার ডাকা হোল। সেটাও নেহাৎ লোক-দেখানো। ওষুধ নেই, সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থাও নেই। কারণ বৌমা গেলে সৌদামিনীর কিছু ক্ষতি নেই। বরং তাঁর অবাধ গিন্নী-পণার পথ পরিষ্কার হবে। যে আশঙ্কাটা তিনি মনে মনে জপছিলেন তার থেকে অব্যাহতি পাবেন।

জোর করে একটা বিষাদের ছায়া মুখের উপর টেনে আনবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় সৌদামিনী অবশভাবে বসে থাকেন। লোককে দেখান, বৌমার জন্যে নিদারুণ চিন্তায় তাঁর সেবা করবার শক্তিটুকুও হারিয়ে গেছে।

রুদ্রাণী মাঝে মাঝে ঊর্মিলাকে দেখতে আসেন। সেদিন সৌদামিনী পুজোর জন্যে বাগানে ফুল তুলতে গেলেন। এমন সময় বাড়ীতে রুদ্রাণীর আবির্ভাব। একবার দেখতে এলেন ঊর্মিলাকে। দেখলেন, ঊর্মিলা ঘরে একা শুয়ে। বাঁচবার আশা তার খুব কম। রুদ্রাণী জিজ্ঞেস করলেন, সুকুমারকে কোনো খবর দেওয়া হয়েছে বৌমা?

ঊর্মিলা ইঙ্গিতে জানালো, না, কোনো খবরই দেওয়া হয়নি।

সৌদামিনী বাগান থেকে ফিরে আসার আগেই রুদ্রাণী চলে গেলেন নিজের বাড়ীতে। যাবার সময় সুকুমারের ঠিকানা সমেত একটা চিঠি নজরে পড়লো তাঁর। সেইটা তিনি আঁচলের তলে লুকিয়ে নিয়ে গেলেন।

সেইদিনই রুদ্রাণী সুকুমারকে চিঠি দিলেন। জানালেন, ঊর্মিলা মুমূর্ষু। তার চিকিৎসা বা শুশ্রূষার কোনো ব্যবস্থাই করা হয়নি।

সুকুমারকে চিঠি দিতে হ'লে তার ঠিকানাটা দরকার। সেইজন্যেই চিঠিটা লুকিয়ে এনেছিলেন রুদ্রাণী।

সুকুমার বাড়ী এসে উঠলো। দেখলো, রুদ্রাণী যা লিখেছেন তাই ঠিক। স্ত্রীর রোগ সারাবার কোনো ব্যবস্থাই নেই। আসন্ন একটা ঘোর অমঙ্গলের আশঙ্কায় ঊর্মিলার চোখদুটো ঝিমিয়ে পড়েছে। স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুকুমার। চোখ দিয়ে গড়িয়ে আসে ফোঁটা ফোঁটা জল। একটিও কথা সরে না সুকুমারের মুখে।

সৌদামিনী বলে উঠলেন, এর মধ্যেই ভেঙ্গে পড়ছো তুমি। আমরা একমাস ধরে যমের সঙ্গে যুদ্ধ করছি।

সুকুমারের অসহ্য রাগ এবার আত্মপ্রকাশ না ক'রে থাকতে পারলো না। দারুণ উত্তেজিত হ'য়ে সুকুমার বলে উঠলো, ওসব ভনিতাগুলো রাখো। কোনো খবর দিয়েছো আমাকে? রোগ সারাবার কোনো ব্যবস্থা করেছো? আজ যদি কোনো বিপদ ঘটে তাহ'লে তোমাদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই থাকবে না আমার।

আড়াল থেকে রুদ্রাণী সুকুমারের সব কথাই শুনলেন।

ছেলের ভয়ে সৌদামিনী বৌমার সেবায় মন দিলেন। অবিনাশবাবু বড়ো একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করলেন। সুকুমার প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করলো।

সুকুমার আসার পরদিন রুদ্রাণী একবার এলেন ঊর্মিলাকে দেখতে। দেখলেন, সৌদামিনী ব্যস্ত হ'য়ে বৌমার সেবা করছেন। কোনোদিনই তিনি সৌদামিনীকে বৌমার জন্যে এতো ব্যস্ত দেখেন নি।

রুদ্রাণী এবার মনের রাগটা প্রকাশ না ক'রে থাকতে পারলেন না। বললেন, কোনোদিনই দিদিকে বৌমার জন্যে এতো ব্যস্ত দেখিনি। আজ বুঝি ছেলে এসেছে তাই?

সৌদামিনীর বুকে কথাটা তীরের মতো বিঁধলো। গুম্ হ'য়ে উঠলো তাঁর মুখটা। বললেন, আমি সেবা না করেছি তো সেবা বুঝি পাড়ার লোক করতে এসেছিলো? বৌমা শুধুই এতোদিন টিঁকে আছে?

রুদ্রাণীও সহজে চুপ্ করবার পাত্রী নন। বললেন, বলি, বিছানা নেওয়ার পর থেকে বৌমা কি কোনদিন ভালোর দিকে গেছে। না তার রোগ সারাবার কোনো ব্যবস্থা করেছো?

সৌদামিনী এবার চুপ করে রইলেন। কারণ উত্তর দেওয়ার ফাঁকটুকু পেলেন না।

সুকুমার আসার পর মাসখানেক কেটে গেছে। ভগবানের ইচ্ছায় ঊর্মিলা এ যাত্রা রক্ষা পেলো। কিন্তু হায়! ঊর্মিলা এবার জোরগলায় সকলের কাছে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর অপবাদ ছড়াতে লাগলো। বলতে লাগলো, পোড়া শ্বশুর-শ্বাশুড়ী আমায় মারতে বসেছিলো। আর প্রতিজ্ঞা করলো, আমি আর শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর কাছে থাকবো না।

তারপর সুকুমার স্ত্রীকে নিয়ে চিরদিনের মতো মা-বাবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। সৌদামিনী ও অবিনাশবাবু অসহ্য জ্বালায় জ্বলতে লাগলেন।

সকলের কাণে পেঁছালো সৌদামিনী ও অবিনাশবাবুর অপবাদ।

গিন্নীরা 'ছি ছি' করতে লাগলেন। রুদ্রাণী এবার সৌদামিনীর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে জোরগলায় বললেন, খুব তো বড়াই করতে দিদি! আজ একটা ছেলের বৌ নিয়েই তোমার এই দশা। আমার মতো তিন-চার ছেলের বৌ নিয়ে সংসার করতে হ'লে আরো কি হোত না জানি!

সৌদামিনী ও অবিনাশবাবু কিন্তু জান্‌তে পারলেন না সুকুমারকে চিঠি দেওয়ার কথা।

এই মর্ত্যভূমি

[ভাদ্র সংখ্যার পর]

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

মিঃ উইলিয়াম স্মইটকে সুকুমার পাঠালো একটা দামী কার্ড আঁর পামেলাকে একটা ভালো পুতুল। পোষ্টাপিস থেকে বাড়ী ফিরে দেখলো পামেলা তাকে পাঠিয়েছে একটা হাতে বোনা নীল স্কার্ফ। সেটাকে যত্ন করে নিজের ঘরে রেখে দিল সুকুমার। সেইদিন সন্ধ্যায় পামেলা এলো হেসেলমেয়ার রোডের বাড়ীতে।

তোমার উপহারের জন্যে ধন্যবাদ পামেলা।

আমি জানতাম ওটা তোমার পছন্দ হবে।

তুমি ছাড়া আমার পছন্দ-অপছন্দ আর কে জানবে? কিন্তু তোমার বাবার সংগে বড়দিনের আগে দেখা করতে চাই—

যতই ছুতো কর আমাদের বাড়ীতে তুমি আর যেতে পাবে না—

হেসে সুকুমার বললো, এত ভয়?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে পামেলা বললো, বাবা কিন্তু ভয়ানক পছন্দ করে ফেলেছেন তোমাকে, প্রায়ই তোমার খবর নেন।

করবেনই, বুদ্ধিমান লোক তো।

যাই বল, বাবাকে দু'চোখে দেখতে পারি না—ওকে সহ্য করতে পারি না আমি—

কেন?

দেখান যেন উনি কত বড় ভালমানুষ—মাতাল—মাতাল—যার জন্যে মা মারা গেল—যার জন্যে লেখাপড়া ছেড়ে আমাকে চাকরীতে ঢুকতে হ'লো—কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে ওর?

পামেলার এমন রাগ কখনও দেখেনি সুকুমার, ও শুধু বললো, ছিঃ পামেলা, বাবার কথা অমন ক'রে বলতে হয় না—

কেন বলি সেকথা তুমি বুঝবে না—মাত্র একদিন দেখেই ওর স্বরূপ বোঝা যায় না সুকুমার।

সুকুমার তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে বললো, যাক্ বড়দিনে কি করবে—তুমি এখানে আসবে না আমি তোমাদের বাড়ী যাবো?

আমি এখানে আসবো—বাবা চ'লে যাচ্ছে আপিসের কাজে হল্যাণ্ড!

ভালই হবে পামেলা—তুমি থাক না এখানে এসে ও দু'দিন।

দেখি কি হয়।

অত গম্ভীর হ'য়ে থেকোনা পামেলা, ছোট মেয়ে নাকি তুমি?

সুকুমারের কোলে মাথা রেখে পামেলা বললো, মার কথা মনে পড়ছে বড়—বড়দিনের সময় তিনি মারা যান, আমাকে শক্ত ক'রে ধরো সুকুমার—যত জোরে পারো—

সেই রাত্রে পামেলা চ'লে যাবার পর নিজের মা'কে মনে পড়লো সুকুমারের। না, এমন ক'রে অভিমান ক'রে থাকার সত্যি কোন মানে হয় না। সুকুমার একটু বেশী খরচ তো করেইছে। মা তো কিছুই ভুল বলেন নি—মেয়ে হ'য়ে কেমন ক'রে পারবেন তিনি সমস্ত চালিয়ে নিতে। সমস্ত বুঝিয়ে সুকুমার তখন মা'কে খুব বড় একটা চিঠি লিখলো—ছ' পেন্সের এয়ার-লেটারে নয়—শিলিং-এর টিকিট লাগিয়ে খামে।

মা-মণি,

'বিজয়ার প্রণাম জানাইনি ব'লে রাগ হয়েছে! এখানে পাঁজি পাওয়া যায় না মা-মণি—তারিখের কথা কেমন ক'রে জানবো! তবু তুমি কেমন ক'রে ভাবতে পারলে যে আমি ইচ্ছে করেই করিনি—তুমি কেমন ক'রে ভাবতে পারলে তোমার সুকু বাঁদর হয়েছে—মদের পিপেয় ডুবে আছে। তোমার 'বিজয়ার চিঠি প'ড়ে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল! তাই এতদিন চিঠি লিখিনি—লিখতে পারিনি। তুমিও কেন আমাকে চিঠি লিখলে না। আমি নেই ব'লে

তোমার কি একটুও কষ্ট হয় না—আমার কিন্তু তোমাদের ছেড়ে থাকতে খুব কষ্ট হয়।

কাপড়-জামা করাবার কথা তুমি আজও ভুলতে পারনি। সত্যি বলছি যদি দরকার না হ'তো তাহ'লে আমি কিছুতেই ওগুলো করাতাম না। এদেশের সংগে আমাদের দেশের তফাৎ অনেক—তাই আমরা এদেশে এসে একটু ঘাবড়ে যাই—বোকার মতো চলাফেরা করি। ঠিক তাল রাখতে বেশ অসুবিধা হয়। একেই এদের ধারনা আমাদের দেশ গরীব—তার ওপর কালো রঙে, বাজে পোষাকে কাবলার মতো ঘুরে বেড়ালে ভারতবর্ষের ওপর এদের ধারনা আরও খারাপ হ'য়ে যায়—যস্মিন দেশে যদাচার। সেটা না মানলে হাস্যাস্পদ হ'তে হয়, তাতে জাতের দুর্ণাম—দেশের দুর্ণাম! জার্মাণ—আমেরিকান অন্য যে কোন জাত ঠিক তাল রেখে যায় অথচ মুস্কিল শুধু ভারতীয়দের! আমাদের যাই দোষ থাক সে-দোষ বাইরের লোককে জানতে দেব কেন· সুরুচির মূল্য এরা সব চেয়ে আগে দেয়—তাই সবদিক ভেবে আমাকে নতুন পোষাক, যা' এদেশে মানায়, করাতেই হ'য়েছিল—তা' না হ'লে কোথাও যেতে পারতাম না—লোকে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো।

সাহেব-পরিবারে সুখে আছি ব'লে তুমি খুশী হও নি—লিখেছ সস্তায় বাঙালীদের সংগে ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতে। তাতে ইংরেজ পরিবারে খরচ কিছুই কম পড়ে না মা, তার ওপর রান্না—বাজার করা এইসব হ্যাঙ্গাম আছে—আমাকে একবারে পাশ করতেই হবে—ক্লান্ত হ'য়ে কলেজ থেকে এসে যদি একপাল লোকের সংগে রান্না করতে হয় তাহ'লে শক্ত কোর্সের ঠেলা সামলাবো কেমন করে—রান্নার পর আবার বাসন মাজা আছে। আরও একটা কথা, এসে যখন পড়েইছি তখন এদের মধ্যে থেকে এদের বিষয় জানা আরও কাজের কথা নয় কি? তুমি বলবে, ওদের কথা জেনে কি হবে? তাই যদি বল তাহ'লে এত টাকা খরচ ক'রে এদেরই দেশে—এদেরই পরীক্ষায় পাশ করতে এলাম কেন? তার ওপর অসুখ-বিসুখ নানা বিপদ-আপদ আছে—তখন এদেশের লোকের বাড়ীতে থাকলে এরা অনেক সুবিধার কথা ব'লে দিতে পারে ক'রেও দিতে পারে—আমারও ভরসা হয়—সাহস হয়। এখন যেখানে আছি তারা আমাকে সংসারের একজন মনে করে—আত্মীয় ব'লে ধ'রে। আজকাল এমন পরিবারে থাকার সুযোগ কেউই পায় না—আমার ভাগ্য ভালো তাই পেয়েছি। তবু তুমি যদি বল এ বাড়ী ছেড়ে দিয়ে তোমার যা ইচ্ছে তাই আমি করবো।

এইবার খরচের কথা। খরচ এখানে যে কত বেশী সেকথা আমি তোমাকে এতদূর থেকে লিখে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। শীতের দেশ—মোজা, গেঞ্জি, নানারকম জুতো—ওগুলো তো প্রায় কিনতে হয়—তার ওপর লণ্ড্রি খরচ—বাস-টিউবের খরচ—ভারতবর্ষের চেয়ে এখানে বাস-টিউবের অনেক বেশী খরচ। এক পয়সা বাজে খরচ না করলেও তিনশো টাকার কমে কিছুতেই চ'লে না—তাতে শুধু খাওয়া-থাকা ইত্যাদি হয়—এর ওপর বই খাতা আছে, কলেজের মাইনে আছে—লৌকিকতাও আছে। বন্ধু-বান্ধবকে বড়দিনের সময় ছোটখাটো উপহার না দিলে মান থাকে না—কেননা তারাও উপহার দেয়—আমি সেগুলো কি কষ্টে কত সাবধানে পয়সা জমিয়ে করি তোমাকে বোঝাতে পারবো না। একটু ভদ্রভাবে থেকে দু'একবার সিনেমায় গেলে চাই সাড়ে তিনশো টাকা—তার ক'মে বিলেতে থাকা যে যায় না তা নয় তবে থেকে কোন লাভ নেই—সারাদিন ঘরে ব'সে বন্দী-জীবন কাটাতে হয়।

আমি তোমার কাছে চারশো পাউণ্ড বরাবর চাইনি—বড়দিন ব'লে, নিজের সার্ট, জুতো, মোজা কিনবো ব'লে একবারই চেয়েছিলাম।

এদের দেশে থেকে—এদের মধ্যে থেকে আমি যদি সব সময় আলাদা থাকি—সব সময় মনে করি আমি বিদেশী—তাহ'লে মনের অবস্থা কতদূর খারাপ হবে—তোমাদের কথা মনে প'ড়ে কি ভাবে দিন কাটবে সেকথা সহজেই বুঝতে পারবে। তাহ'লে পড়াশুনো করবো কেমন ক'রে। মন খারাপ হ'লেই তো ফিরে যাওয়া যাবে না—আর পাশ না ক'রে গেলে তোমার মুখের দিকে তাকাবো কেমন ক'রে?

তোমাকে বেশী চিঠি লিখিনা কারণ সত্যি সময় কম। সকালে শীতের দেশে একেবারে সময় থাকে না—কলেজ থেকে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে পড়তে বসি। আজ লিখব—কাল লিখবো ক'রে দেরী হ'য়ে যায়—তুমি কেন ভাবলে তোমার কথা ভাবি না!

যাহোক্ আর রাগ করে না মা-মণি—চিঠি পেয়েই উত্তর দিও। তা না' হ'লে সত্যি বাঁদর হবো কিন্তু ব'লে দিলুম।

তারপর সুকুমার মণ্টু, ঘণ্টু, ছায়া, রাণুকে সেই একই খামে চিঠি লিখে খাম বন্ধ ক'রে এয়ার মেইল লেবেল লাগিয়ে ঘুমোতে গেল।

বড়দিন হ'য়ে গেল! পয়লা জানুয়ারী কলেজ খুললো সুকুমারের। প্রথম পরীক্ষার ফল খুব ভালো হয়েছে—এত ভালো যে সে নিজেও অবাক হ'লো। ক্লাশে সব ছাত্রদের মাঝে প্রফেসার রবিনসন্ খুব প্রশংসা করলেন সুকুমারের।

তাই শুনে অনেক ছাত্র আলাপ করলো সুকুমারের সংগে—যারা আগে তার সংগে কোনদিন কথা বলেনি—ইণ্ডিয়ান ব'লে প্যাট প্যাট ক'রে তাকিয়ে থাকতো শুধু। সুকুমারও এবার সুযোগ পেয়ে মাতব্বরী চালে হাসলো—যেন এতে সে আশ্চর্য হয়নি মোটেই—এটা তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। প্রফেসার রবিনসন্ আরও জানালেন যে গরমের সময় তাকে যন্ত্রপাতি দেখে কাজ শেখবার জন্যে কারখানায় কাজ করতে যেতে হবে—হয় তো লণ্ডনের বাইরে যেতে হবে। মাস কয়েক থাকতে হবে সুকুমারকে। থাকবার জায়গার জন্যে যেন কিছু ভাবনা না ক'রে সুকুমার—সে-বন্দোবস্ত কলেজ করবার চেষ্টা করবে। লণ্ডনের বাইরে যাবার কথা শুনে মন খারাপ হ'য়ে গেল সুকুমারের—পামেলাকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাকবে সে।

জানো পামেলা, সেইদিনই বিকেলে বললো সুকুমার, গ্রীষ্মকালে আমাকে লণ্ডনের বাইরে চ'লে যেতে হবে কয়েক মাসের জন্যে—

কেন?

কারখানায় কাজ করতে।

বাঁচবো আমি—কতদিনের জন্যে?

তা প্রায় আট মাস।

বাঃ আমার তাহ'লে হবে লম্বা ছুটি—কিন্তু অমন মুখ ক'রো না সুকুমার, গ্রীষ্মের এখনও অনেক দেরী—এটা তো সবে শীত!

ফ্যারাডে হাউসের কাছে 'জলি' চায়ের দোকানে ঢুকতেই মিঃ বিজন ঘোষের সংগে দেখা—সেই সুকুমারকে মার্চমণ্ট ষ্ট্রীটের গ্রীণ কাফেতে যে ঠাট্টা ক'রেছিল। সুকুমার তাকে যেন চেনেনা এমনভাব ক'রে এগিয়ে যাচ্ছিল কারণ অনেক-বার রাস্তায় দেখা হ'লেও মিঃ বিজন ঘোষ তাকে যেন দেখেও দেখতো না। আজ কিন্তু এগগাল হেসে সে সুকুমারদের টেবিলে এসে ব'সে পড়ে বললো, বসতে পারি? আপনি তো আমাকে চিনতেই পারেন না স্যার—আমার নাম মিঃ বিজন ঘোষ—

সুকুমার অগত্যা আলাপ করিয়ে দিল, পামেলা সুইট।

ভারী মিষ্টি নাম তো—তা' সুকুমার বাবু একদিন আসুন আমাদের বাড়ী—মাছের ঝোল ভাত খাওয়াবো—

বেশ—

হে' হে' একেও নিয়ে আসবেন—ভারী মিষ্টি নাম—মিঃ বিজন ঘোষ পামেলাকে মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করলো, দিশি খাওয়া খেতে কোন আপত্তি আছে নাকি মিস্ সুইট?

মোটেও না—খুব খুশী হবো।

বেশ, হে' হে' হে', শীগগিরই বলবো আপনাদের, ডায়েরি বের ক'রে মিঃ বিজন ঘোষ বললো, তোমার ফোন্ নম্বর কত মিস্ সুইট—ফোনেই নেমন্তন্ন করবো কিন্তু—

পামেলা বললো, গ্রীনিচ ১১১২।

সেটা লিখে মিঃ বিজন ঘোষ বললো, ও'কে খবর দিলেই তো আপনিও খবর পাবেন ও'র কাছ থেকে—তাই আপনার নম্বর লিখলাম না সুকুমার বাবু—আচ্ছা আজ চলি, শীগ্-গিরই খবর দেবো, বিদায় মিস্ সুইট—আমার নাম মিঃ বিজন ঘোষ।

সে চ'লে যেতেই পামেলা বললো, এত ইচ্ছে আমার ইণ্ডিয়ানদের সংগে আলাপ করবার অথচ তুমি কারুর সংগে আলাপ করিয়ে দাও না আমার—

আমি তোমাকে ছাড়া কাউকে চিনিনা পামেলা।

অনেক লোকের সংগে মিশে তোমাদের দেশের আচার-ব্যবহার আমি খুব ভালো করে জানতে চাই—

সে-যখন আমার সংগে ভারতবর্ষে যাবে তখন জানবে—কিন্তু তোমার বন্ধু-বান্ধব—কারুর সংগে তুমিও তো আমার আলাপ করিয়ে দাওনি আজও?

দুটি তো মোটে বন্ধু আমার—ডায়না আর জ্যাকলীন। তারা এত দেখতে চায় তোমাকে অথচ তাদের যখন সময় তোমার তখন সময় হয় না আর তারা যখন ব্যস্ত তোমার তখন অবসর—কেমন ক'রে আলাপ করাবো বল?

তোমার কথা ওদের সকলকে বলেছ বুঝি?

ওরা কোথা থেকে খবর পেয়েছে আমার সংগে নাকি আজকাল একজন ভারতীয় রাজকুমারের আলাপ হয়েছে।

হেসে সুকুমার বললো, আমাকে রাজকুমার বানালে?

কিন্তু তুমি কি তাতো আমি আজও জানলাম না—দেশের কথা কিছুই তুমি আমাকে ব'লতে চাও না—

কি জানতে চাও পামেলা?

তোমার মা দেখতে কেমন, তোমার ভাইবোনেরা কেমন?

আর আমি কেমন সেটা জানতে চাও না?

একটুও উৎসাহ নেই আমার তোমার সম্বন্ধে—বল কবে তুমি আমাকে তোমার আত্মীয়দের ছবি দেখাবে?

সুকুমার বললো, মা'র ছবি তোমায় দেখাতে পারবো না কারণ তিনি কখনও ছবি তোলান না—ভাইবোনদের ছবি পাঠিয়ে দিতে বলবো।

তাদের ব'লো আমায় চিঠি লিখতে।

ওরা তো অত ইংরেজী জানে না পামেলা—

তা-হয় লিখতে বলো তবু।

বলবো, গম্ভীর হ'য়ে সুকুমার বললো।

যতই দিন যেতে লাগলো শীত ভারী হ'তে লাগলো তত। একদিন এত বরফ পড়লো যে ২১২নং বাস বন্ধ হ'য়ে গেল। বাড়ী থেকে বেরিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্টায় সুকুমারের নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে যাবার উপক্রম হ'লো। তুষার-পিছল পথে বার কয়েক আছাড় খেয়ে ফিনস্ব্যারি পার্ক টিউব স্টেশনে হে'টে আসতে হ'লো সুকুমারকে। এমন প্রায়ই করতে হ'লো তাকে আর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কয়েকটা ক্লাশ প্রকৃতির বিপক্ষতায় কামাই করতে হ'লো। নাঃ, সুকুমার অবশেষে ধ'রে নিলো, ইংল্যাণ্ডের সব কিছু হয় তো সে জয় করতে পারে কিন্তু শীত?—অসম্ভব। বড় কাবু ক'রে ফেলেছে তাকে এরই মধ্যে। ফেব্রুয়ারী মাসে নাকি আরও বেড়ে যাবে। আরও কেমন ক'রে বাড়তে পারে সেকথা ভেবে পেল না সে। আর এমনি এক হাড়-কাঁপানো শীতের রাত্রে এক ভীষণ বিপদে পড়লো সুকুমার।

লাউঞ্জে অনেক আগুন আর সব কটা একসংগে জ্বলে তাই শোবার আগে সকলে অনেকক্ষণ সেখানে ব'সে থাকে। সাপারের পর সুকুমারও আজকাল বই হাতে নিয়ে সেখানে থাকে। যথা রীতি আজও নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে ছিল। এমন সময়—ওরে বাবা—ঘটলো অকস্মাৎ সেই ভীষণ বিপদ।

আর্থার প্রথমে কথা তুললো, কি সুকুমার হুঁ?

কি? কিছু বুঝতে না পেরে সুকুমার জিজ্ঞেস করলো।

কি? হুঁ? খুব যে ব'লেছিলে—

কি বলেছিলাম?

যে শীতকালে রোজ চান করবে?

করি তো—আমি তো প্রায়ই চান করি।

প্রায়ই চান কর—শেষ চান কবে করেছ বাছাধন?

এই তো কাল করলাম।

কাল? হুঁ?

হুঁ কাল।

ঠিক বলছো?

মানে কাল কি পরশু—

হেলেন হেসে বললো, পরশু তো তুমি রাত এগারোটায় বাড়ী ফিরে ছিলে সুকুমার?

তাতে কি হয়েছে, ফিরেই চান করলাম।

কই, অড্রি বললো, আমি তো বারোটা অবধি জেগে-ছিলাম চান করার শব্দ পাই নি তো?

কি বলো অড্রি, তুমি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলে, আমি হুস্ হুস্ ক'রে এক ঘণ্টা ধ'রে চান করলাম—শব্দ পাওনি?

আর্থার এবার উঠে এসে সুকুমারের হাত ধ'রে বললো, দেখ সুকুমার ওসব গুল-তাল রাখো—আমরা সকলে মিলে আজ দু'মাস ধ'রে তোমার ওপর চোখ রাখছি আর আমি ডাইরীতে লিখে রেখেছি তুমি শেষ চান করেছ তেসরা নভেম্বর—আজ হ'লো দশই জানুয়ারী—বুঝেছ? কাজেই ওঠো—আর্থার তার হাত ধ'রে টানলো।

উঠবো কেন?

ওঠো ওঠো চান করতে চ'লো।

আজ এই শীতে—কি যে বল আর্থার!

সুকুমারের অবস্থা দেখে সকলে হাসছে।

ওঠো সুকুমার—

কাল ঠিক করবো—

কাল আরও ঠাণ্ডা হবে।

না না—কাল ঠিক চান করবো, যতই ঠাণ্ডা হোক।

মানে কাল তুমি তাহ'লে দেরী ক'রে বাড়ী আসবে, মারজোরী বললো, আজই ওকে জোর ক'রে বাথরুমে নিয়ে যাও—শেষে কি চান না ক'রে রোগে পড়বে।

হ্যাঁচ্চো ক'রে সুকুমার হাঁচলো, দু'একবার রুমালে নাক ঝেড়ে বললো, আজ শরীরটা ভালো নেই—সর্দি হচ্ছে—একটু জ্বরও হয়েছে—

চান করলে সব ঠিক হ'য়ে যাবে—এসো সকলে, আমাকে সাহায্য করো—

এইবার এক কাণ্ড হ'লো। মারজোরী অড্রি আর্থার আর পিটার চ্যাং-দোলা ক'রে সুকুমারকে এনে ফেললো বাথরুমে। তারপর তোয়ালে সাবান ইত্যাদি এনে বললো, নাও, আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছি শুধু মাথায় জল দিয়ে বেরিয়ে এসোনা, খুব শব্দ ক'রে চান করবে—শব্দ না হ'লে আমরা গিয়ে তোমাকে চান করিয়ে দেবো।

আর সুকুমারের মনে হ'লো এ একটা মনে রাখবার মতো রাত বটে। কি কুক্ষণে যে মুখ ফুটে এদের সামনে বলে-ছিল, শীতকালে রোজ চান ক'রবে। [ক্রমশঃ

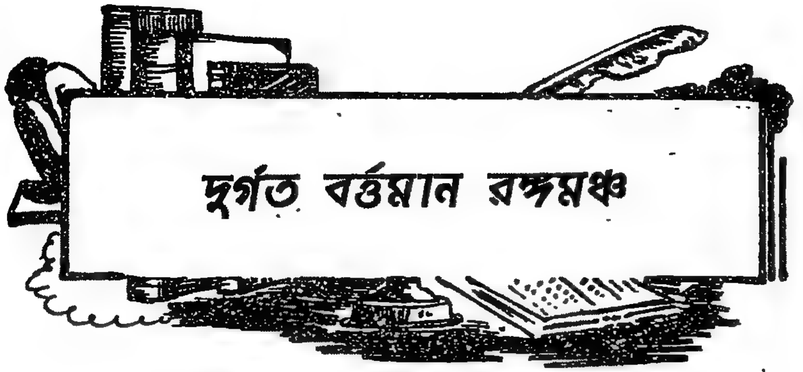

দুর্গত বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চ

শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের দেশে, এই বাংলায় রঙ্গজগতে একদা এসেছিল নবযুগ বিপুল এবং বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে। এবং সত্যি কথা বলতে গেলে বাংলার দান এক বিস্ময়কর দান মঞ্চের ইতিহাসে। লোকে রঙ্গালয়কে ঘৃণার চক্ষে দেখলেও ভারতবর্ষ নাট্য ও নৃত্যকলাকে গ্রহণ করেছিল এবং যথারীতি তাকে শাস্ত্রের মর্যাদা দিয়ে ধর্ম করে তুলেছিল। একথা ঠিক ম্যাডেন কোং এখানে এসে থিয়েটারের ব্যবসা সুরু করেন কিন্তু বাংলাদেশের মত বোম্বেতে কোন স্থায়ী রঙ্গশালা নেই। হিন্দুগণ মানব সভ্যতার এমন একটা উৎকর্ষের স্তরে একদিন উঠেছিল, যেখানে আজও পর্যন্ত আর কেউ পৌঁছতে পারেনি। এবং সেটা এই রঙ্গশালা ও নাটকের ভিতর দিয়েই সার্থকতা লাভ করেছিল। এটা শুধু স্বদেশপ্রেমের কথা নয়, এটা বৈজ্ঞানিক সত্য।

যাত্রাই ছিল আমাদের খাঁটি নিজস্ব জিনিষ যার ভেতর দিয়ে লোকে নাট্য-রস পিপাসা মেটাত। এবং এই রামায়ণ গান, কথকতা, যাত্রার মধ্যে দিয়েই বিরাট অশিক্ষিত জনসাধারণ দেশের সঙ্গে, নিজেদের মাটির সঙ্গে, জাতির সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখত। কিন্তু এটা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে লোকে অবসর-বিনোদনের জন্য, নিছক আমোদের জন্য এই সব আসরে যোগ দিত কিন্তু পরোক্ষে সহজভাবেই খানিকটা লোকসাহিত্যের কাজ হয়ে যেতো। এই ভাবেই জাতির পুরাণ আর লোক-সাহিত্যের ভেতর দিয়েই জাতির ভাবসম্পদ বেঁচে ছিল এবং অশিক্ষিত গ্রাম্য চাষীরাও একটা বিশেষ সংস্কার গড়ে তুললো। সুতরাং এইভাবে বিনা আড়ম্বরে এবং সম্পূর্ণ উপেক্ষিতভাবে যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ গান আমাদের জাতীয় জীবনে একটা মস্ত বড় কাজ করে এসেছে।

তারপর এল ইংরাজ। তাদের শাসন করার ব্যাপারে কামান আর বন্দুকের সঙ্গে নিয়ে এল তারা সেক্‌পীয়র-মিলটনকে, তার বল-নাচকে, ওদের মদের গেলাসকে, তাদের হোটেল, ক্লাব আর থিয়েটারকে। কারণ তারা বুঝেছিল একটা জাতকে স্থায়ীভাবে পরাধীন করে রাখতে হলে তার মনকেও স্থায়ীভাবে জয় করতে হবে। বাংলার মধ্য দিয়ে, বাংগালীর মধ্য দিয়ে ইঙ্গ-ভারতীয় নূতন সভ্যতার রূপ প্রকট হয়ে উঠল। বাঙ্গালী ইংরেজদের কাছ থেকে থিয়েটার করতে শিখে, থিয়েটারকে সমাজের সেবায় লাগাবার চেষ্টা করতে লাগল। রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলতে লাগল। নিছক আনন্দ পরিবেশন করার জন্য হলেও রঙ্গমঞ্চ সমাজ-সেবায়, সমাজ-সংস্কারে এবং দেশের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনে একটা মস্ত স্থান অধিকার করে এসেছে। রঙ্গমঞ্চের ভেতর দিয়েই স্বদেশপ্রেমের এক নূতন মূর্তি রূপান্বিত হ'ল।

যখন এ দেশে সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হয় নি, তখন নব্য বাংলার যে সব গুণীরা নাট্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা ভাসন পেতেন বিদগ্ধসভার মধ্যেই। কালীপ্রসন্ন সিংহ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, উমেশচন্দ্র দত্ত, প্রতাপ মজুমদার প্রভৃতি নামকরা গুণীরা অভিনয় অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। তখন উচ্চশ্রেণীর নাটক না থাকলেও অভিনয় খুব খারাপ হত না। তখনকার অভিনেতারা ছিলেন সত্য সত্যই গুণী। সৌখীন সম্প্রদায়ের ভিতর থেকেই প্রকাশিত হয়েছেন গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতি।

কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয় গিরিশ-যুগের স্বরূপই আত্মপ্রকাশ করে। এই সময় নাট্য জগতের এক বিশেষ অধ্যায় সূচিত হয়। কারণ এই সময় নাট্যকাররূপে গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বিশেষভাবে রঙ্গমঞ্চে প্রভাব বিস্তার করেন। ভাল ভাল নাটক রচিত হয় এবং একাধিক ভাল ভাল নট-নটী আত্মপ্রকাশ করেন। এই সময় ভাল ভাল নাটক ছাড়াও কয়েকখানি গীতিনাট্য বা হাস্যনাট্য রচিত হয় এবং সমারোহে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।

রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতেন—গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দু-

মাঝি চলে গ্নণ টেনে

শেখর, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর নটরা। এ'দের সঙ্গে মিলিত হলেন দানীবাবু, অমর দত্ত, তারক পালিত, হাঁদুবাবু, অপরেশ-চন্দ্র, ক্ষেত্র মিত্র প্রভৃতি। অভিনেত্রীদের মধ্যে ছিলেন তিনকড়ি, তারাসুন্দরী, সুশীলা ও নরীসুন্দরী। এই-সময় নৃত্যবিদ ছিলেন কাশীবাবু, রাণুবাবু ও নৃপেন্দ্র বসু।

এই সময় যে সব নাটক রচিত ও অভিনীত হয় তার মধ্যে ভ্রান্তি, সিরাজউদ্দৌলা, শাস্তি কি শান্তি, বলিদান, ছত্রপতি, অশোক, তপোবন, প্রতাপাদিত্য, রঘুবীর, দুর্গা-দাস, সাজাহান, মেবার পতন, পরপারে, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

তারপর এল বাংলা রঙ্গশালায় এক অন্ধযুগের ইতিহাস। শক্তিশালী নাট্যকার নেই, অধিকাংশ নট হয় বৃদ্ধ নয় মৃত। সুতরাং গিরিশচন্দ্রের তিরোধানের পর যুগের জন্য। এই অন্ধযুগকে 'ভয়াবহ যুগ' বলে প্রখ্যাত সমালোচক প্রসাদ রায় অভিহিত করেছেন। কারণ নিম্ন-শ্রেণীর অভিনয় এবং জঘন্য নাটক অনেকখানি নীচুতে নামিয়ে দিয়েছিল।

তারপর শিশিরকুমারের আবির্ভাব নাট্যজগতে ধূম-কেতুর মত। বাংলার রঙ্গমঞ্চের পূর্ব গগনে, বাংলার নাট্যশালার ইতিহাসে নবঅরুণোদয়। পূর্ব গগন উদ্ভা-সিত করে প্রখর সূর্যকিরণের ঝলক লাগিয়ে বিরাট নাট্য প্রতিভার উদয় এক বিস্ময়। তাঁর সঙ্গে আরম্ভ হ'ল নবযুগের নব মহাসমারোহ। শিশির-যুগকে নাট্যশালার ইতিহাসে স্বর্ণযুগের আখ্যা দেওয়া হয়েছে। একাধারে শিক্ষক, নট, নাট্যকার, পণ্ডিত, জ্ঞানী, গুণী অসাধারণ প্রতিভা এ রকম যোগাযোগ কদাচিৎ দেখা যায়।

কুৎসিত অবজ্ঞাত অবস্থায় রঙ্গমঞ্চ ও থিয়েটার পড়ে ছিল, শিশিরকুমার রঙ্গমঞ্চে এসে আপ্রাণ চেষ্টা করে প্রকৃত মর্যাদা দান করেছেন। থিয়েটার দেখে আসার পর লোকে ভুলে যায় যেমন নিশীথ-বিলাসী ভুলে যায় পরের দিন রাত্রির প্রমোদ নিকেতনকে।

বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে এলেন শিশিরকুমার। তিনিই প্রথম পথ দেখালেন যে রঙ্গমঞ্চ শিক্ষিত লোকেদের জন্য এবং তিনি নিজে প্রকাশ্য রঙ্গশালায় যোগদান করে ভবিষ্যতের পথ দেখিয়ে দিলেন। তাঁর সম্প্রদায়ে তাই আমরা একাধিক উচ্চশিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন নটনটীর সমাবেশ দেখেছি।

শিশিরকুমার রঙ্গমঞ্চের জন্য যে চেষ্টা করলেন তা' অসাধারণ। তিনি প্রথম চেষ্টা করলেন রঙ্গমঞ্চকে লোক-শিক্ষার বাহন হিসাবে গড়ে তুলতে। তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"যতরকম লোকশিক্ষার আয়তন আছে তার মধ্যে রঙ্গমঞ্চ শ্রেষ্ঠ—এই রঙ্গমঞ্চই হচ্ছে প্রধান জোরালো অস্ত্র যেখান থেকে স্বাধীনতার বাণী ঘোষিত হয়েছে।" তিনি প্রথম বঙ্গদেশে জানালেন যে, A Nation is known by its theatre। তাই শিশিরকুমারের আবির্ভাবের সঙ্গে লোক রঙ্গমঞ্চ থেকে আনন্দ পেয়েছে, শিক্ষা পেয়েছে, জতীয়তা, প্রেরণা পেয়েছে নিজেদের দেশকে দশকে ভাল-ভাবে বুঝতে শিখেছে।

অবশ্য শিশিরকুমার প্রথম ম্যাডান কোং-র চাকুরে হয়ে প্রবেশ করেন এক নূতন আদর্শ ও প্রেরণা নিয়ে। পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ 'ভীমসিংহ' নাটক নিয়ে উপস্থিত হন। শিশিরকুমার সেটাকে 'আলমগীর' নাটকে পরিণত করে নামভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রঙ্গজগতকে তোলপাড় করে দিলেন। সে এক স্মরণীয় দিন নাট্যশালার ইতিহাসে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শিক্ষিত সম্প্রদায় রঙ্গমঞ্চে প্রেক্ষাগৃহে ভীড় করলেন অধ্যাপকের প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে যোগদান দেখবার জন্য।

তাই বলছিলাম যে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দ নাট্যজগতের ইতিহাসে স্মরণীয় বরণীয়। শিশিরকুমার 'আলমগীর' নাটকে নাম ভূমিকায় অভিনয় করে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন। তাঁর 'আলমগীর' রূপে, রসে, অভিনয়ে কণ্ঠস্বরের লীলায়িত ছন্দময় আবৃত্তিতে একেবারে অতুলনীয়। যেদিন 'আলমগীর' অভিনীত হয় সেদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস গ্রেপ্তার হন। তারপর এল 'রঘুবীর'। গান্ধীজির অহিংসা নীতির বিরুদ্ধে এই নাটকটি লিখিত। শিশিরকুমার নিজে 'শ্রীরঙ্গমে' অভিনয়ের পূর্বে বলেছেন—'রঘুবীর হচ্ছে দেশাত্মবোধের অনুভূতি নিয়ে লেখা প্রথম জাতীয় নাটক। 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম আভাষ দিয়ে গেছেন, সূত্র ধরিয়ে গেছেন কিন্তু তিনি রায়বাহাদুর, সি-আই-ই, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, পেনসেন্ বন্ধ হবার ভয় আছে। আমাদের ইংরাজ শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রথম রঘুবীরে দেখান হয়েছে।'

'সব চেয়ে বড় কথা রাজপুতানার ইতিহাস, আর বাংলার মধ্যযুগকে আশ্রয় করে বাঙ্গালী মুঘলপাঠান আর তুর্ককে প্রতিপক্ষ খাড়া করে, ইংরেজের সিডিশন্ আইনকে ফাঁকি দিয়ে রঙ্গমঞ্চ জাতির নব-জাগরণ আন্দোলন চালাতে লাগল।'

শিশিরকুমারের দান তাই রঙ্গমঞ্চে স্মরণীয়। সব চেয়ে বড় কথা গিরিশচন্দ্রের অভিনীত ও লিখিত নাটক শিশিরকুমারের হাতে সমগ্রভাবে নতুন পদ্ধতিতে সু-অভিনীত হয়েছে। জনা, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, বলিদান, প্রফুল্ল প্রভৃতি নাটক তাই এ যুগেও স্মরণীয় হয়ে আছে।

কিন্তু যেদিন শিশিরকুমার বুঝলেন যে, ম্যাডান কোং এসেছে ব্যবসা করতে সেদিন থেকে তিনি তাদের সংস্রব ত্যাগ করে শিক্ষিত ভদ্রসন্তান প্রভৃতি নিয়ে যোগেশ চৌধুরীকে দিয়ে 'সীতা' নাটক লিখিয়ে অভিনয় করলেন। এই নাটকে তাঁর প্রযোজনা শক্তির পরিচয় পেয়ে বাঙ্গালী মুগ্ধ হ'ল। আধুনিক রুচিসঙ্গত পোষাক-পরিচ্ছদ, সঙ্গত ও শোভনীয় দৃশ্যপট, সমস্ত কুশীলবদের নিখুঁত অভিনয়, সর্বোপরি রামের অনিন্দ্যসুন্দর অভিনয় দেখে সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে এই নটনাথের পূজারীকে গ্রহণ করলেন।

সীতা নাটক সম্বন্ধে প্রখ্যাত সমালোচক প্রসাদ রায় বলেছেন—'বাংলা রঙ্গালয়ে সুনিয়ন্ত্রিত জনতা দেখেছিলুম

বাংলার বাউল

মাত্র একটি নাট্যাভিনয়ে 'সীতা' নাটক যখন খোলা হয় তখন তার শেষদৃশ্যে রঙ্গমঞ্চের উপরে উপস্থিত থাকত প্রায় একশো জন করে লোক এবং তারা মাটির মূর্তির মত অবস্থান করত না, অভিনয়ও করত।'

'দিগ্বীজয়ী', 'বিসর্জন', 'নরনারায়ণ', 'ভীষ্ম', 'রমা', 'তপতী' প্রভৃতি নাটকে আমরা শিশিরকুমারের সৃজনীশক্তি, প্রয়োগকৌশল, অভিনয় এবং একটি নিখুঁত Team Work দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

তারপর নবযুগ নাট্য আন্দোলনে আর একটা স্মরণীয় যে শিশিরকুমার নিজ হাতে একাধিক নটনটী সৃষ্টি করে রঙ্গমঞ্চকে শক্তিশালী করেছেন। বর্তমানেও রঙ্গমঞ্চে তাঁর শিষ্য ও শিষ্যা আছেন এবং অভিনয় করছেন।

শিশিরকুমারের সঙ্গে 'শরৎ-শিশির' প্রতিভার মণিকাঞ্চন সংযোগ রঙ্গমঞ্চে আর একটা মনে রাখবার মত ঘটনা। রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিশিরকুমারের যোগাযোগও বড় কম হয়নি। এ সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করবার ইচ্ছে রইল।

কিন্তু আজ বাংলার তথা রঙ্গমঞ্চের কি দুর্দশা। নবযুগ শেষ হয়ে গেছে। অসংখ্য বিরাট বিরাট সুরম্য চিত্রগৃহের নামে 'ভীরু কম্পিত শিখা'র মত রঙ্গমঞ্চ টিম্‌টিম করছে।

আজ নতুন নাট্যকার নেই, প্রথম শ্রেণীর ভাল নট-নটীরও অভাব এবং দর্শকদের রুচি গেছে বদলে। তাই আজ দেখি নাট্যকারের অভাবে পুরানো নাটকের সম্মিলিত অভিনয় একাধিক জনপ্রিয় নটনটী নিয়ে। লোকে ভীড় করে তাই দেখতে যায়। নতুন নাটক গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, পুরানো নাটকের অভিনয় করে রঙ্গমঞ্চ বাঁচে না। তাই বলছিলাম—নবযুগ এসেছিল চলে গিয়েছে। সত্যিকার অভিনয় দেখবার মত লোক আর নেই। তা যদি থাকত লোকে 'পরিচয়' 'তখৎ-এ-তাউস', 'নিষ্কৃতি' নাটক দেখত, সম্মিলিত অভিনয় দেখত না। বাংলার দর্শকও কম দায়ী নন রঙ্গমঞ্চের অবনতির জন্য।

সবচেয়ে বড় কথা বাংলার রঙ্গমঞ্চে গীতি-নাট্য নেই, হাস্যরস বা প্রহসন নেই। সেকালের রঙ্গমঞ্চে পরম উপভোগ্য ছিল। গিরিশচন্দ্রের অসংখ্য রচনা আছে, অমৃতলালের প্রহসন নাট্যজগতে অমর হয়ে আছে। কিন্তু এ শ্রেণীর নাট্যকাররা এ রকম রচনায় হাত দেন না। অর্থাৎ বর্তমান অন্ন আহার সমস্যায় বাঙালী হাসতে ভুলে গেছে।

বাংলার রঙ্গমঞ্চে এত বড় দুর্ভিক্ষ আর কখনও আসেনি। কোথায় কাণ্ডারী যিনি আবার রঙ্গমঞ্চকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন?

আজ সেই কথাই মনে হচ্ছে বারবার।

অনন্যা

বটকৃষ্ণ দাস

এ-যৌবন ব্যর্থ হ'লো। দিনান্তের চিতাগ্নি শিখায়
চৈত্রের পলাশ জ্বলে। ম্রিয়মাণ বিষন্ন ব্যথায়
জ্বলে লাল কৃষ্ণচূড়া! এইবার দিগন্তে ধূসর
সন্ধ্যার পায়ের শব্দ; আকাশে রাত্রির কণ্ঠস্বর!

অনেক দিয়েছো তুমি। কাছে এসে নীরবে, নিভৃতে
বিনামূল্যে মহামূল্য জীবনের গ্রীষ্মবর্ষাশীতে
তোমার দানের পাত্র লীলায়িত চিত্তের হরষে
প্রতিদিন পূর্ণ ক'রে রূপে, রঙে, রসে
দিয়েছো আমার হাতে। দিয়েছো যৌবন,
অগাধ সমুদ্র-স্বপ্ন,—বিস্ময়ের অরণ্য-কূজন
জীবনের চারিদিকে। পরম আগ্রহে
আদিগন্ত কুহকের মুগ্ধ-সমারোহে
আমাকে নিয়েছো টেনে। হে অনন্যা, হে আমার
পরমা গৃহিনী
আমার চাওয়ার আগে দিলে সব; তাই আমি সবচেয়ে ঋণী।

সেই ঋণ প্রতিদিন আমার ভাঁড়ারে
জমেছে বিপুল হ'য়ে। ইন্দ্রনীল দিগন্ত-বিস্তারে,
সমুদ্রের কলোচ্ছ্বাসে, অরণ্যের অস্থির বিদ্রোহে,
গ্রীষ্মের দুঃসহ তাপে, বর্ষার মন্থন-মন্দ্রে, ফাল্গুনের
দুর্বিনীত মোহে
সে-ঋণের বোঝা নিয়ে যৌবনের মুক্তির বন্দনা
অগস্ত্য তৃষ্ণার তীর্থে এ'কে দিয়ে রক্তের আল্পনা
কামনার পাদপীঠে,—বারম্বার ব্যর্থ-হতাশ্বাসে
ফিরেছে বিদীর্ণ হ'য়ে। যৌবনের কারুশিল্পে, চৈত্রের পলাশে
তবু হায় সন্ধ্যা এলো; এলো রাত্রি ধূসর, মলিন,—
কামনা যাওয়ার আগে ঝ'রে গেলো কামনার দিন।

তবুও দিয়েছো তুমি। দিয়েছো উজ্জ্বল দিন, আর তারপর
দিলে রাত্রি; ক্লান্ত, নীল বেদনার জ্বর,
ম্রিয়মাণ অন্ধকার। ভস্মসার অন্তিম পলাশে
ম্লান গোধূলির নদী আকাংখার অতন্দ্র আকাশে
তবুও দিয়েছো জ্বেলে। এইবার বলো
নক্ষত্রের পদশব্দে এই ম্লান, অশ্রু ছলোছলো
রাত্রি কি দেবেনা ভ'রে? দেবেনা কি এই চেতনার
অন্ধকার রুদ্ধ দুর্গে বন্দী-বেদনার
সব দ্বার খুলে আজ? দেবেনা কি হায়
আমার আত্মাকে মুক্তি স্বপ্নিল রাত্রির কবিতায়?

অবিনাশ কম্পোজিটার

গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়

অফিসে আসতে আজ অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল অবিনাশের। নারকেলডাঙ্গা থেকে রামকানাই অধিকারী লেনের এই 'প্রভাতী' প্রেসে হেঁটে আসতে কী কম সময় লাগে? আজই প্রথম যেন ও টের পেল সেটা। তবু তো না খেয়েই চলে এসেছে। খেয়ে আসতে গেলে অফিসই হত না আজ। অথচ এখন কামাই করাও অসম্ভব একটা দিন। পুজোর দেরী আছে আর মাত্র দিন বাইশেক। প্রেসেও কাজের ভিড় অনেক। পুজো সাময়িকী, চাঁদার বই, সার্বজনীন দুর্গোৎসবের বার্ষিক হিসাবনিকাশের বই ইত্যাদি অনেক রকমের কাজ। এক মুহূর্ত দম ফেলবার উপায় নেই। অতিরিক্ত সময় কাজ করেও কুলকিনারা পাচ্ছে না সাড়ে তিনজন কম্পোজিটার অর্থাৎ তিনজন ঝানু কম্পোজিটার ও একজন ছোকরা বয়সী শিক্ষার্থী, আর দুজন মেশিনম্যান। একজন মেশিন চালায়, আর একজন সাহায্য করে তাকে। হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে সবাই।

অবিনাশ একমুহূর্ত থমকে দাঁড়াল এক চিলতে সাইনবোর্ডটার সামনে যেখানে অংগুলি নির্দেশে বাঁ দিকে মোড় ফিরতে অনুরোধ করা হয়েছে। কাপড়ের খুঁট দিয়ে ঘাড়, মুখ, কপাল মুছতে লাগল। বড্ড বেশি পরিশ্রান্ত বোধ হচ্ছে এতখানি পথ হেঁটে এসে। ক্ষিদেয় পেটের ভিতরে নাড়িভুঁড়িগুলি মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে। আসবার সময় সাধনা তাড়াতাড়ি করে লক্ষ্মীর কৌটো থেকে খান কয়েক বাতাসা আর এক গ্লাস জল এনে সামনে দিয়েছিল। কিন্তু তা স্পর্শও করেনি অবিনাশ। বাতাসা কখানা থাকলে মেয়েটার বার্লির সংগে মিষ্টির কাজ দিতে পারবে। মেয়েটার জন্যেই তো দেরী হয়ে গেল প্রেসে আসতে। অনেকদিন ধরেই ভুগছে মেয়েটা। প্রথম প্রথম কিছুদিন কোলে করে নিয়ে গিয়েছিল কর্পোরেশনের চ্যারিটেবল ডিসপেনসারীতে। কিন্তু অসুখটা যে ঠিক কী তা বলতে পারেন নি ডাক্তারবাবু। হয়তো বলেননি। আর তাতেই আশংকিত হয়েছিল ও খুব বেশি। ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করেছিল, মেয়েটা বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার একরকম ধমকের সুরেই বলেছিলেন, বড্ড বকো কেন? অসুখ হলেই মরে নাকি? তবে আর আমরা আছি কী করতে? কিন্তু তারপরেই একটু থেমে নীচু গলায় উপদেশ দিয়েছিলেন কাগজের উপর কলম চালাতে চালাতে, আমার এখানে আনবার দরকার নেই। একটু ভালো পথ্য-টথ্য দিও। তা হলেই সেরে যাবে।

বাড়ি ফিরে অবিনাশও যথারীতি গোপন করতে চেষ্টা করল সাধনার কাছে। ডাক্তারের অভিমতটা অতিরঞ্জিত করে বলল, কিছুই হয়নি মিনুর। ডাক্তার বাবু ওষুধ দিয়ে দিয়েছেন, দু' দিনেই সেরে যাবে।

কথাটা ঠিক বিশ্বাস হল না সাধনার। স্বামীর চোখ থেকে চোখ না সরিয়েই ভীতিজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, বাঁচবে তো? —তোমার যত অলক্ষুণে কথা। অবিনাশ তিরস্কারের সুরই ফুটিয়ে তুলল কথায়—অসুখ হলেই বুঝি মানুষ মরে! আর মিনুর তো হয়ইনি কিছু। মিছিমিছি যত রাজ্যের দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা।

সাধনা তবুও বিশ্বাস করতে পারেনি। চোখও সরিয়ে নেয়নি স্বামীর চোখ থেকে। কিন্তু না নিলে কী হবে মিনুকে আর রোজ রোজ ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ও ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। ভালো পথ্য তো দূরের কথা বার্লির পয়সাই সব দিন জোগাড় হয়ে ওঠে না। কাছাকাছি একজন এম-বি ডাক্তার আছেন। তাকে ফি দিয়ে বাড়ীতে আনা অসম্ভব—অসাধ্য ব্যাপার আর ডাক্তার এনেই বা লাভ কী হত? অসুখের মূল কারণটা যে কী তা তো একটু একটু বুঝতে পারতো ও। সমস্যা তো সেখানেই। কিন্তু উপায় কী।

কদিন ধরেই নিঃঝুম হয়ে পড়েছিল মেয়েটা। আজ সকাল থেকে সেটা শংকার কারণ হয়ে দাঁড়াল। সাধনার

কান্নাকাটিতে অবিনাশ ছুটে গিয়েছিল চ্যারিটেবল ডিস্‌পেন্‌সারীর ডাক্তারের কাছেই। অনুনয় করে বলেছিল, ডাক্তারবাবু, মেয়েটার বড় বাড়াবাড়ি সুরু হয়ে গিয়েছে। আপনি এ যাত্রা দয়া না করলে ওর জীবন ফিরে পাবার আর কোনো আশাই নেই।

ডাক্তার বেদনাম্লান হাসি টেনে সহানুভূতি জানিয়ে বললেন, আমি কী করতে পারি বল। এখানকার রোগী ফেলে তো তোমার বাড়ী যেতে পারি না। পরের চাকরি তো বুঝতেই পারো। কর্তব্যচ্যুতির নৈতিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব বিষয়ে উপদেশ দিয়ে ওষুধ দিয়ে দিলেন—ওষুধ লিখে দিচ্ছি, নিয়ে যাও। আর একটু ফলের রসটস জোগাড় করে খাওয়াতে পার কিনা দেখ গিয়ে। কেমন থাকে বিকেলে খবর দিয়ে যেও।

লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে যখন ওষুধ নিয়ে ফিরে এল তখন অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। কোনোরকমে সাধনাকে ওষুধটা বুঝিয়ে দিয়ে অবিনাশ তাড়াতাড়ি চলে এসেছে প্রেসে।

মেশিনম্যান আনোয়ার কালিঝুলিমাখা হাত সাজিমাটির জলে ধুতে বাইরে এসেছিল। অবিনাশকে দেখে বলল, এই আপনার আসবার সময় হল? মেশিনে কী চড়বে তার কিছুই ঠিক নেই। বেশ লোক আপনি।

অবিনাশ আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করল না। মালিকের সামনে এসে উপস্থিত হল।

তাঁরও সেই একই প্রশ্ন। এত দেরী? এরকম খুশিমত এলে গেলে চলে কী করে। কত কাজ পড়ে রয়েছে। এটুকু বিবেচনাশক্তি না থাকলে ঘরে বসে থাকাই উচিত। চাকরীগিরি চলে না।

খুব বেশি পর্দা চড়ালেন না তিনি। চড়ান না কখনও। অনুচ্চ স্বরে অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করেন শুধু। তারপর গম্ভীর মুখে প্রুফ দেখার কাজে মনোনিবেশ করলেন।

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল অবিনাশ। বলল, মেয়েটার অসুখ বড় বাড়াবাড়ি। তাই দেরী হয়ে গেল আসতে। ডাক্তারের কাছে যেতে হয়েছিল।

তিনি আর বললেন না কিছু। বলবার ছিল না এরপর। অবিনাশ নিজের জায়গায় এসে দাঁড়াল। গা থেকে ঘাম-চট্‌চটে জামাটা খুলে রাখল দেয়ালের গায়ে টাঙানো দড়িটার ওপর। কুজো থেকে তোবড়ানো এ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে করে ঢকঢক করে জল খেল দু' গ্লাস। চোখেমুখে ছিটিয়ে দিল খানিকটা। ঘাড়ে কপালেও। একটু আরাম-বোধ হল যেন। কিন্তু পেটের ভিতরে রাবণের চিতা জ্বলতেই লাগল।

তারপর ছোট কাঠের টুলটার উপর সুস্থির হয়ে বসে কাজে মন দিল অবিনাশ। সামনে র‍্যাকে পর পর সাজানো রয়েছে টাইপের কেসগুলি। খোপ খোপ ঘরে অক্ষরের অবস্থিতি। ধাতব বর্ণমালা।

অবিনাশ বাঁদিকের অর্ধশয়ান কেসটির ওপরে পাণ্ডুলিপিটা ভাঁজ করে মুড়ে রেখে মিলিয়ে মিলিয়ে অক্ষর সাজিয়ে যাচ্ছিল। মাথার উপরে একশ' পাওয়ারের একটা আলো জ্বলছে। সূর্য ব্রহ্মতালুর উপরে এলেও রাত্রি প্রভাত হয় না কখনও এ ঘরটাতে। অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য এটা।

হঠাৎ কেন যেন আশ্চর্য লাগল অবিনাশের। অদ্ভুত। রাত্রি প্রভাত না হওয়াটা নয়, বানিয়ে বানিয়ে গল্পলেখাটা।

দু' লাইন কম্‌পোজও সারা হয়নি তখনও, প্রথম অনুচ্ছেদ পূর্ণ হতে অনেক বাকী। অত্যদ্ভুত এই অনুভূতিটাই অবিনাশের অন্তর মথিত করে তুলল। অবিনাশ কিন্তু থামল না। অভ্যস্ত নিয়মে হাত চলতে লাগল ওর। সেই সংগে মনের গতিটাও।

লেখকেরা সত্যিই কী অদ্ভুত জীব। এই চিন্তাটাই কেবল ওর মনকে ঘিরে নাচানাচি করতে লাগল। বানিয়ে বানিয়ে পাতা জুড়ে জুড়ে খুশিমাফিক কাহিনী তৈরী করে, কথা জোগায় চরিত্রের মুখে অথচ সবই যেন সত্যি—একেবারে বাস্তব। নকলনবীশের মত দেখে দেখে লেখা। এক-বর্ণ মিথ্যে নেই কোথাও। অতিরঞ্জন একটুও না। সব গল্পেরই হয় কিনা কে জানে তবে যে গল্পটা ও কম্‌পোজ করছে সেটাতো হুবহু ওর নিজের জীবনেরই ছবি। লেখক অবিনাশকে চেনে নাকি? ওর সংসারের খুঁটিনাটি খবর নিয়েই যেন তৈরী হয়েছে গল্পটা। প্রতি লাইনে লাইনে মিল। অমিল নেই এক ছিটেফোঁটাও এটাই আশ্চর্য।

অবিনাশ হঠাৎই আবিষ্কার করতে পারে নিজেকে। নিজের গোপনতম সত্তাকে। লেখকের মনের মুকুরে নিজের প্রতিচ্ছায়া দেখে অনুভব করতে পারে একটি কম্‌পোজিটারের বৈচিত্র্যবিহীন জীবনের গতি। যেমন গল্পের নায়ক লেখকের মানসপুত্রটির।

ওরও সংসার আছে—স্ত্রীকন্যা নিয়ে ছোট্ট তিনজনের সংসার। আছে সংসারধর্ম পালনের প্রাণপণ প্রয়াস। মেয়েটি বাপের খুব আদুরে। বয়েস প্রায় তিন বছর। আশ্চর্য। আর জীবিকা? সে তো প্রেসের এই সামান্য চাক্‌রি।

বাড়ির অবস্থা অসচ্ছল ছিল না এককালে। অনায়াসেই দিন চলে যেত। যাচ্ছিলও। কিন্তু হঠাৎই বিপর্যয় বেধে গেল। বাবার মৃত্যু হওয়ায় সংসারের সমস্ত দায়িত্ব এসে কাঁধে পড়ল দুটি ভাই-এর উপর। বড় ভাই চাষবাস জমিজমার তদারকেই সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। ওর উপরে গুরু দায়িত্ব বর্তায়নি তখনও পর্যন্ত। বউদি এসে বললেন একদিন, ঠাকুরপো, এভাবে ঘরে বসে বসে সময় নষ্ট করো না। দিনকাল খারাপ। এখন থেকেই কাজটাজ জোগাড়ের চেষ্টা দেখ।

একটু আশ্চর্য হয়েই মুখ তুলে তাকিয়েছিল কম্পোজিটারটি। বউদির গলার স্বরে যেন কিসের একটা দুর্বোধ্য ইংগিত। বউদিও লক্ষ্য করেছিলেন ওর সচকিত পরিবর্তনের ভাবটি। সপ্রতিভ দৃঢ়তার ভংগিতেই বলেছিলেন, তোমার দাদা তো খেটে খেটে হয়রাণ হয়ে যাচ্ছে। ক্রমেই কাহিল হয়ে পড়ছে শরীর। চেহারার তো যা ছিরি হয়েছে দেখে ভয় করে।

ইংগিতটা স্পষ্ট—বোধগম্য হল বুঝি এতক্ষণে। তাই বউদির ভয় নিরসনের জন্যে ও বলল, দেখি চেষ্টা করে। কাজ জোগাড় করা তো আর মুখের কথা নয়।

বউদি খুশিই হয়েছেন দেখাতে চাইলেন। বললেন, তা তুমি একটা কাজ চেষ্টা করলেই জুটিয়ে নিতে পারো। তোমাকে চিনি তো। তোমার দাদাই বরং তোমাকে চিনতে পারল না। আর শক্তসামর্থ পুরুষমানুষের বসে বসে বাড়া ভাত খাওয়া উচিত নয়। বোঝ তো সংসারের অবস্থা।

বুঝল ও সবই। তার পরদিনই দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে ক্রোশ আড়াই দূরের শহরে গিয়ে চাকরি বাকরির চেষ্টায় এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করে সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ফিরে এল। তার পরদিনও। লেখাপড়া বিশেষ শেখেনি। যা তা কাজ নিতেও সম্মানে বাধে। সুতরাং হঠাৎই মনের মত কাজ জুটবে কেমন করে।

বউদি বুঝিয়ে বললেন, প্রথম প্রথম ছোটখাটো যে কোনো রকমের একটা কাজ জোটাতে পারো কিনা দেখ। তারপরে ধীরেসুস্থে ভালোর চেষ্টা দেখবে। চাকরি করতে গিয়ে মানঅপমানের কিছুই নেই। ছোট বড় সবাই চাকর। শুধু সৎপথে টাকা রোজগার নিয়ে কথা।

তার পরদিনই হাসিমুখে বাড়ি ফিরল ও। বউদি জিগ্গেস করলেন, সুখবর আছে কিছু?

—আছে। ও হেসে জবাব দিল।

বউদি উৎসুকমুখে কাছে সরে এলেন। ও বলল, কাজ জুটিয়েছি মোটামুটি একটা।

—মাইনে কত? আগ্রহভরা চোখ বউদির।

—মাইনে? একটু ইতস্ততঃ করে বলেছিল ও, মাইনে আর কী। তিন মাস কিছু দেবে না। প্রেসের চাকরি, কাজ শিখে নিতে হবে। তারপর সব ঠিক হবে। নেহাৎ খারাপ হবে না বোধ হয়, কী বল বউদি?

বউদি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন ততক্ষণ। বললেন, কী জানি। দেখ। তিন মাস মনোযোগ দিয়ে তো কাজ শেখো। তাহলে পরে হয়তো উন্নতি হতে পারে।

কাজ ও মনোযোগ দিয়েই শিখেছিল। তিন মাস পরে মালিকও যৎসামান্য পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে ও খুশীতে ডগমগ হয়ে বাড়ী ফিরল। স্বাধীন জীবিকার্জনের আনন্দ কী কম?

বউদি বললেন, এবার তো নিজের পায়েই দাঁড়াতে শিখলে। এখন বিয়েসাদী কর। ঘরসংসার পাতো। হেসে হেসেই বলেছেন কথাগুলি। তবু কেমন একটা সন্দেহ জেগেছে ওর মনে।

অনিচ্ছাঅর্থে হেসে বলেছে, হ্যাঁ। এবার তাই পাতবো মনে করছি। সত্যি ঘরসংসার পাততে হয়েছিল ওকে কিছুদিনের মধ্যেই। বিয়ে করে সংসারধর্ম সুরু করতে হয়েছিল। বউদিই উদ্যোগী হয়ে সব ব্যবস্থা করেছিলেন। ও যে আপত্তি প্রকাশ করেনি এমন নয়। সবাইই নাকি করে থাকে। ওটা লোকদেখানো। বউদি তাই বলেছিলেন হেসে হেসে। কিন্তু তিনি তাঁর কর্তব্য করতে ছাড়েননি। শুভ কাজ সমাধা করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিলেন।

এরপর বছর খানেক কাটল। এক প্রেসে টিঁকে থাকা ওর পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। এ প্রেস ও প্রেস করে দু' তিনটে প্রেস বদল হয়ে গিয়েছিল। এ লাইনে অভিজ্ঞতাও অর্জন হয়েছিল বেশ কিছু। রীতিমত কম্পোজিটার হয়ে উঠেছিল ও।

ইতিমধ্যে পরিবর্তনও হয়েছে ওর অনেক কিছু। পিতৃত্বের গৌরব অর্জন করেছে। একটি মেয়ে হয়েছে ওর। দাদাবউদির সংগে একান্নভুক্ত আর নয়। ভিন্ন সংসার এখন ওর। ভিন্ন হাঁড়ি। পাশাপাশিই ঘর। একই দাওয়ায় এ কোণে ও কোণে রান্নার জায়গা। তবু আলাদা তো। স্ত্রীকন্যা নিয়ে নিজস্ব স্নেহনীড় রচনা করেছে ও এখন।

একদিন সকালে অকস্মাৎ সামান্য কারণ থেকে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল বউদির সংগে ওর। তারপর থেকেই মন

কষাকষি। তাও একদিন চরমে পৌঁছল। বউদি দাদাকে সুপরামর্শ দিলেন ওদের সংস্রব এড়াতে। রোজ রোজ ঝামেলায় দু' পক্ষেরই ক্ষতি। তার চেয়ে বরং ভাগাভাগির বন্দোবস্তই ভালো। প্রত্যেকেই নিজে নিজে স্বাধীন, কারুরই কারো অধীন থাকা উচিত নয়। তাই হল শেষ পর্যন্ত। মুখোমুখি বসবাস। কিন্তু মুখ দেখাদেখির দরকার নেই।

তাতেও ও ঘাবড়ায়নি। উপার্জন ওর তেমন ছিল না সত্যিই। মাসের শেষে নিয়মিত মাইনেও দেত না। দশটাকা পাঁচটাকা করে আদায় হত। তবু যেটুকু জমি-জমা ক্ষেতখন্দ ছিল সেটুকুই বলভরসা। মহামুস্কিল বাধল হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হয়েই। দেশগাঁ ভিটেমাটি ছেড়ে যখন সবাই পালাল। দাদাবউদিও চলে গেলেন নবদ্বীপে আত্মীয়ের আশ্রয়ে। মেয়েবউ নিয়ে ও চলে এল কলকাতায়। আশ্রয় জীবিকার কথা না ভেবেই।

কিন্তু আশ্রয় ওর মিলল অচিরেই। জীবিকাও। এমন মণিকাঞ্চন যোগাযোগ বড় সচরাচর ঘটে না। ওদের গ্রামেরই একজনের জানাশোনা প্রেস ছিল। ভদ্রলোক ফরিদপুর শহর থেকে চলে এসে এখানে প্রেস করছেন। গবর্ণমেন্টের কাছ থেকে সাহায্যও পেয়েছেন কিছু সেই বাবদ। কর্মচারীরা তাঁর সবাই পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু। সেখানেই একটা কাজের ব্যবস্থা হয়ে গেল। অর সেই সূত্রে মাথা গোঁজবার একটুখানি ঠাঁই। শহরের উপকণ্ঠে একখানা ঘর। অন্ধকার। বুকচাপা। পাশ দিয়ে ময়লা জল নিষ্কাশনের ড্রেন চলে গেছে। দুর্গন্ধে শ্বাসরোধ হয়ে আসে। তবু আশ্রয় তো! আর ছোঁয়াছুঁয়িও রক্ষা হয় শহরের সংগে। কর্মকেন্দ্র বলে নয়, সভ্যতার প্রাণ-কেন্দ্রও তো ওটা।

দেখতে দেখতে দু' বছর কেটে গেল। অভাবঅনটন দুঃখ দুর্বিপাকের মধ্য দিয়েই। অনন্যোপায় হয়ে প্রাণে বাঁচবার জন্যে ও ছুটে এসেছিল কলকাতায়। জীবিকার আশায় উপস্থিতমত কম মাইনের চাকরিই নিয়ে নিয়ে-ছিল। কিন্তু খাওয়াপরার সমস্যা মিটল না তাতে। জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনও মিটবার অঙ্গীকার মিলল না সে জীবিকায়। গ্রামে থাকতে ধারণা ছিল কলকাতায় গিয়ে কোনোরকমে একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে পারলেই আর কোনো ভাবনা থাকবে না। মাসান্তে অন্ততঃ মাইনেটা হস্তগত হবেই। তার উপরে অবসর সময়ে টুকটাক আরও কিছু করে যদি কিছু হয়। শ্রমবিমুখ ও নয় কোনোদিনই যদি পারিশ্রমিক কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু এখানকার অবস্থা দেখেশুনে মুষড়ে পড়ল ও। দেখে ওর যুগপৎ বিস্ময় আর বেদনাবোধই হল।

অর্থাভাবে অবসর সময়ে কিছু করার পরিকল্পনা বাতিলই হয়ে গিয়েছিল এতদিনে। কিন্তু চাকরির অবস্থাও যে সুবিধাজনক নয়। মাস কাবার হয়ে গেলেও মাইনে ঠিকমত আদায় হয় না। সেই গ্রামের মতই অবস্থা। প্রথম প্রথম মুখ বুজে কষ্টেসৃষ্টে কাটিয়েছিল। কিন্তু তারপর তা অসহ্য হয়ে উঠল।

একদিন ভীষণ রাগারাগিই হয়ে গেল মালিকের সংগে এই নিয়ে। চটেমটে অস্থির হয়ে ও বেরিয়ে এসেছিল প্রেস থেকে জরুরী একটা কাজ ফেলে। টাকার প্রয়োজনটাও বড় জরুরী ছিল সেদিন ওর। কলকাতার মত বিরাট মহানগরীতে জীবনধারণ করে বেঁচে থাকা খেলা কথা নয়। তাও ওর মত নিঃসহায় নিঃসম্বল অবস্থার লোকের। জোড়াতালি দিতে দিতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গিয়ে অন্ধকার দেখছিল চোখেমুখে। ধারদেনায় আকণ্ঠ ডুবে গিয়েছিল। তার উপরে সেদিন সকালে বাড়ীওলা এসে গত কয়েকমাসের বাড়ীভাড়ার জন্যে অপমান করে গিয়েছিল। পরদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় দিয়ে বলে গিয়েছিল, যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব টাকা শোধ না দেওয়া হয় তাহলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হবে। আর কোনো অজুহাত শোনা হবে না। চাকরি করে মাইনে পাওয়া যায় না, মালিক রোজ রোজ কেবলই ঘোরায়—এটা বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। আর বিশ্বাসযোগ্য হলেই বা রোজ রোজ প্রতি মাসে মাসে বিবেচনা করা যায় তা কাঁহাতক্?

আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব এমন কেউ ছিল না যার কাছে টাকা চাইবে। গ্রামের সেই পরিচিত লোকটির কাছে চেয়েও বিমুখ হতে হয়েছে।

বিকেলের দিকে প্রেসের মালিককে তৈরী হয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে ও হাতের কাজ ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি বলে-ছিল কাছে গিয়ে, বাবু, আজ আমাকে কিছু টাকা দিতেই হবে। না হলে চলবে না।

—আজকে টাকা দেবো কোত্থেকে? মালিক ক্রুদ্ধ-বিস্ময়ে ফেটে পড়েছিলেন। আপনারা কী বোঝেন না ব্যবসা কী ভাবে চলছে। দেখতেই তো পাচ্ছেন নিজের চোখে, পার্টিগুলো ঠিকমত টাকা দিচ্ছে না। টাকাগুলো সব আটকা পড়ে আছে। যাবার জন্যে পা বাড়িয়েও ফিরলেন তিনি, বললেন, এই তো একটা কাজ আপনি

করছেন। কাল সন্ধ্যের সময় ডেলিভারী দেবার কথা। দেখি, যদি পার্টির কাছ থেকে টাকা পাওয়া যায় কাল পাবেন।

—তা বললে আমাদের কী করে চলে। তীব্রভাবেই প্রতিবাদ করে ওঠে ও। জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে মরীয়া হয়ে গেছে যেন। এবার একটা এস্পার ওস্পার করবেই। বলল, আমরা কর্মচারী মানুষ। খাটি টাকার জন্যে। তা-ই যদি না পাওয়া যায় তাহলে বাঁচি কী করে বলুন। আজ কিছু অন্ততঃ দিতেই হবে।

—না। আজ হবে না। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মালিক।

—কিছু দিতেই হবে। জেদের সুর ফুটে উঠল তারপরেও ওর কথায়। তা নাহলে কাল থেকে আসতে পারব না আমি।

মালিক স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এতটা আশা করতে পারেননি তিনি। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। আগুন ঝরছে ওর চোখদুটিতে। বিবর্ণ নীল ঠোঁটদুটো কাঁপছে।

নরমসুরে বললেন, টাকা নেই। থাকলে কী দিই না আমি?

আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিল না। জামাটা ইতিমধ্যেই ও টেনে নিয়েছিল কাঁধে। কেড্সের ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বলল, কাল থেকে আর আসব না আমি। তারপর মালিকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল গট্গট্ করে।

মালিক অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন সেইভাবে। স্তব্ধ হয়ে। কিন্তু তার পরদিন ভোরে নিজেই গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন ওর বাড়িতে। কিছু টাকা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন, এই দিয়েই এখন চালিয়ে নিন। কী করব বলুন, আমিও তো পাকিস্তান থেকে এসে হাবুডুবু খাচ্ছি। আমার অবস্থাটাও একবার বুঝে দেখুন।

বুঝে ও দেখেছিল ঠিকই, কারণ না দেখে যে উপায় ছিল না। আজকালকার দিনে চাক্রি ছাড়লে নতুন আর একটা চাক্রি দিচ্ছে কে। বাড়িওলার সঙ্গে আপোষরফা করে নিয়েছিল বলেকয়ে। কোনরকমে বেআব্রু হতে হতে বেঁচে গিয়েছিল সেযাত্রা।

কিন্তু দিন আর কাটে না এভাবে। সংসার-বোঝা বয়ে বয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে ও। জীবনস্রোতের গতিবেগ রুদ্ধ হতে চাইছে বার বার।

সব চেয়ে মুস্কিল হয়েছে মেয়েটাকে নিয়েই। অসুখ নেই, বিসুখ নেই তবু দিন দিন রোগা, দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। জীবনাবেগের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ, সহজ স্ফূর্তি নেই। কেবল সব সময় চুপচাপ পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে ক্ষীণসুরে কাঁদে।

স্ত্রী বলে, কম পয়সার ডাক্তারবদ্যি নেই এখানে? মেয়েটাকে দেখালে হত। কী যে হয়েছে বুঝতে পারি না।

বুঝতে ও কিন্তু সবই পারে। ওইটুকু শিশুর জন্যে একপোয়া দুধ রোজ করে দেওয়ার সাধ্য ওর নেই। এক-টাকা সের দুধ। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে কিছু করাও ওর পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। কতদিন তো দু' চার পয়সার বার্লি দিয়েই ভুলিয়ে রাখতে হয় মেয়েটাকে।

বলল, কম পয়সাই বা পাই কোথা থেকে যে ডাক্তার ডেকে দেখাব। ওদের খাঁইও তো কম নয়। ওষুধের দাম, ফি, গাড়ীভাড়া সে এক বিরাট ব্যাপার।

—বাবুকে বল না, মেয়েটার বড় অসুখ, কিছু টাকা না দিলে চলছে না। এ তো আর দান নয়। তোমারই পাওনা টাকা। এখন পেলে কত উপকার হয়।

—লাভ হবে না কিছু তাতে। নির্বিকার ভংগিতেই জবাব দেয় ও।

—কেন?

—বলবে সেই একই কথা। টাকা নেই। যা শুনে আসছি এতদিন ধরে।

দুজনেই চুপ করে গম্ভীরমুখে বসে থাকে কিছুক্ষণ এরপর। সেই অবসরে মেয়েটাও কান্না জুড়ে দেয় নাকি-সুরে। আলোচনারত বাবা-মা-কে হঠাৎই চুপচাপ হয়ে যেতে দেখে ভয় হয় বুঝি ওর?

—মেয়েটাকে তবে মেরে ফেলতে চাও নাকি?

হতাশাক্রুদ্ধ স্বর স্ত্রীর। ও মুখ তুলে তাকায় স্ত্রীর দিকে। খোঁচাটা মর্মমূল ভেদ করেছে ওর। চোখমুখ মুহূর্তে বেদনাবিবর্ণ হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি মেয়েকে কোলে টেনে নিয়ে ও বলে বেদনাহত সুরে, কী যে ছিরি হয়েছে কথার আজকাল তোমার। মুখের একটুও বাঁধন নেই। রোগটোগ ওর কিছু নয়। শরীরটা একটু খারাপ খারাপ যাচ্ছে, ও আপনিই সেরে যাবে। ঘাব্ড়াবার কী আছে এতে।

মেয়ের গালে, কপালে চুমু খায়। আদর করতে থাকে ও তাকে। তাই না মা? কিচ্ছু বোঝে না ও। বুঝবে কোত্থেকে? তোমার মত বুদ্ধিসুদ্ধি নেই।

জীবনে একদিন রঙ্ ছিল বুঝি ওর। সে রঙ্ ধুয়েমুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছে। এখন সময়ে অসময়ে ঠাট্টা পরিহাসের মধ্য দিয়েই ও ধরে রাখতে চায় অবশিষ্টাংশটুকু তার। কিন্তু বৃথাই সে চেষ্টা।

এর কয়েকদিন পরে হঠাৎ প্রেস থেকে সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফিরে ও একটু অবাকই হয়ে যায়। অন্যান্য দিন ও ঘরে ঢোকামাত্রই মেয়েটা দৌড়ে এসে কচি কচি দু' হাত বাড়িয়ে কোলে উঠতে চায়। অস্ফুট কথায়, আকারে-ইংগিতে বেড়াতে নিয়ে যেতে বলে। ও জামাকাপড় না ছেড়েই তাকে সামনের রাস্তা থেকে একটুখানি ঘুরিয়ে আনে। নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার এটা। কিন্তু সেদিন মেয়েটার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বিছানায় পড়ে পড়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। ঘটনাটা তেমন অদ্ভুত কিছু না হলেও বেনিয়মটা খুবই অস্বাভাবিক মনে হল ওর কাছে। বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করল, এখন অসময়ে ঘুমোচ্ছে যে?

—শরীরটা খারাপ হয়েছে খুব। পেটটা ফেঁপে উঠেছে। জ্বরও হয়েছে একটু। আস্তে আস্তে জবাব দিল স্ত্রী। মুখটা কেমন ভার ভার। গলার স্বরও। নড়বড়ে তক্তপোষের প্রান্তে কেরোসিনের কুপিটা রেখে রঙ্চটা ট্রাংকের ঢাক্না তুলে সযত্নে ভাঁজ করে রাখা দু' একখানা ভালো শাড়ি বের করে রাখছে। স্বামীর উপস্থিতিও কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারল না ওর।

—কখন থেকে এ রকম হল? চিন্তিত হয়েই জিগ্গ্যেস করল ও ফের। কাছে সরে গিয়ে মেয়ের কপালে হাতের স্পর্শ রেখে শরীরের উত্তাপ অনুভব করতে চেষ্টা করল।

—দুপুর থেকে। জবাব দিল স্ত্রী।

—অনিয়ম কিছু হয়নি?

কিন্তু সেকথার কোনো উত্তর দিল না স্ত্রী। কোনো সাড়াশব্দও না। বাক্সের ঢাক্না বন্ধ করে রেখে মুখ ঘুরিয়েই কান্নাভাঙা স্বরে বলে উঠল, কালই তুমি ওকে ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থা কর। আর দেরী করা উচিত নয়। সময় থাকতে ব্যবস্থা না হলে পরে আফ্শোষের অন্ত থাকবে না বলে রাখছি।

ইংগিতটা পরিষ্কার বুঝতে পারল ও। যে দু' একখানা ভালো শাড়ি অবশিষ্ট আছে ওর তাই বিক্রীবাঁধা দিয়ে যে করে হোক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সাধছে ও। একমুহূর্ত সবুর সইছে না আর।

জামা খোলা আর হল না। স্তব্ধমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ও। পরিস্থিতির সংগে পরিচয় সম্পূর্ণ হতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। তারপর বলল, দেখি, অত ব্যস্ত হচ্ছো কেন?

—না-না, তুমি বুঝছো না। একমুহূর্ত আর দেরী করা উচিত নয়। তুমি এ রকম লোহার মানুষ হয়ে গেলে কেন? আগে তো ছিলে না কোনোদিন।

—এত অল্পতেই উতলা হলে চলে কখনও?

—অল্পতেই? মুখেচোখে গভীর আতংক নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। এই ঘুষঘুষে জ্বর, পেটের গণ্ডগোল, দিন-দিন রোগা কাঠি হয়ে যাচ্ছে। আমি কী চোখে দেখতে পাচ্ছি না কিছুই? না অন্ধ হয়ে গেছি? হঠাৎই তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ও তক্তপোষের প্রান্তে মেয়ের শিয়রের পাশেই বসে পড়ল। বসেই রইল চুপচাপ। টুপ্টাপ্ মুহূর্তগুলো ঝরে যেতে লাগল। তারপর একসময় ঝড়ের বেগেই হঠাৎ আবার ঘরে ঢুকল স্ত্রী, বলল, কোণের ঘরের দিদি বলেছেন গরীবদুঃখীদের জন্যে কোথায় বিনে পয়সার ডাক্তারখানা আছে। সেখানেই নিয়ে চল তুমি। আমিও যাচ্ছি তোমার সংগে।

—আচ্ছা আচ্ছা। সে হবে'খন। এখন সুস্থির হয়ে বসো দেখি তুমি। অধৈর্য হয়ো না।

অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্ত্রীকে সে রাতটা রেখেছিল কোনোরকম।

কিন্তু তার পরদিন পাশাপাশি ঘরের সহবাসিন্দাদের কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে ও মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিল সরকারী ডাক্তারখানায়। পর পর কয়েকদিনই নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার বাবু বুকপিঠ পরীক্ষা করে ওষুধ দিয়ে দিয়েছেন। করণীয় সম্বন্ধে দু' চারটে উপদেশ। কিন্তু কিছুই করা সম্ভব হয়নি। মেয়েটাও দিন দিন শুকিয়েই গেল।

কী আশ্চর্য! এই পর্যন্ত হুবহু ওর জীবনের সংগে মিলে যায়। স্থানকালপাত্রের একটুআধটু যা তফাৎ। অবিনাশ মনে মনে হাসল। কিন্তু শেষটায় লেখক কল্পনার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। তা না নিলে চলবে কেন? গল্প তো আর সত্যি নয়। তাই শেষে মেয়েটা দুদিনের জ্বরে হঠাৎ একদিন মারা গেল।

অবিনাশের দুঃখ হল এই পরিণতির জন্যে। কেমন একটা সমমর্মিতাও অনুভব করল গল্পের নায়কের সংগে।

কাজ শেষ করে ছুটির পর ও বেরিয়ে পড়ল প্রেস থেকে। অতিরিক্ত সময় কজ করে যেতে বলেছিলেন

মালিক। কিন্তু খেয়ে আসেনি বলে ও ছুটির পর আর অপেক্ষা করেনি। তাছাড়া মনটাও উস্খুস্ করছিল মেয়েটার জন্যে। কেমন আছে খবরটা দিয়ে আসতে হবে ডাক্তারকে।

বাড়ির সদর দরজার কাছে পোঁছেই অবিনাশ থম্কে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। পা দুটো কাঁপতে সুরু করে দিল। অমন বুকফাটা চীৎকারে কাঁদছে কে? সাধনাই না?

তবে কী—?

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না অবিনাশ। সেখানেই বসে পড়ল ধপ্ করে।

কল্পনা

শ্রীনন্দদুলাল চক্রবর্ত্তী

কল্পনা গো কল্পনা—
স্বপনপুরে আলপনা
নিত্য রাঙাও কোন্ রঙে
কোন্ তুলিকায় কোন্ ঢঙে?

নেই কি বাধা...নেই শাসন—!
তাই কামনার পদ্মাসন
পাতলে সেথা সব ভুলে
অভিসারের তান তুলে?

মৌন-মদির এই মিলন—
সৃষ্টি-লীলার উদ্বোধন!
জাগলো ধরায় জোর প্লাবন..
ছন্দ-বাণীর প্রস্রবণ!

একলা রাতে কোন্ কবি
ভাবছে তোমার কোন্ ছবি!
...প'ড়ছে ধরা দৃষ্টিতে—
তোমার নবীন সৃষ্টি যে!

স্বপ্ন-ঝরার এই যে দান...
জীবনদোলার এই যে গান...
হোক্ না ক্ষণিক—মিথ্যা নয়,
ঝড়-বাদলে নেই তো ক্ষয়!

নও তো অলীক—কল্পনা,
অলস মনের জল্পনা!
রিক্ত-লোকে—সান্ত্বনা,
কল্পনা গো কল্পনা!

জলতরঙ্গ

আনন্দ বাগ্চী

বুড়োনো সকাল ফুরোনো-দুপুর ভাঁজ ক'রে রেখে
এসো না আমরা বেরিয়েই পড়ি দূরে কোথাও,
তির্যক এই রোদ্দুর-রেণু চোখে মুখে মেখে
চ'লেই চলো না, মন হয়ে যাক উড়ে উধাও!

নিমতলার ঘিঞ্জি গলির পিঞ্জর ছিঁড়ে
কব্জি ঘড়িতে ঠিকে দেওয়া চোখ উড়ে ফুড়ে যক
বুড়ো-ব্যাধির ঘানী-জীবনের সহবাস ছিঁড়ে
ইডেনুদ্যান হাইকোর্ট ফোর্ট পিছনেই থাক্।

দেখেছো? এখানে বন্দর বুঝি, গন্ধ-নোঙর
দেশ-বিদেশের জলতরঙ্গ বাজে শোনো নাই?
বাহুতে বাহুতে ভোর-ভোর চোখ. .তনুর ঘোর
হাওয়া উৎরাই: জলতরঙ্গে কথা নিয়ে যাই।

ওষ্ঠ গোষ্ঠে হাসির হরিণ হেসে খেলে যায়
প্রগল্ভতায় ভাবটা এমন, উড়ে যাবে এক্ষণি,
উড়ু-উড়ু-ভুরু কৃষ্ণ-মদির হরিণাক্ষির গায়
অধরে নধর সুর-বিজল্পির প্রতিধ্বনি!

ব'সবে এখানে? হাওয়ারদের হাতে মুঠোমুঠো চুল,
গাঙ্-পার-রোদ: আরো তরঙ্গে জলতরঙ্গ তুড়ি দিয়ে যায়
আকাশ গঙ্গা: ঘন হ'য়ে ব'সো: হাওড়ার পুল
এখানে কোথায় সবুজ-রেখার আঁকা-বাঁকায়?

বুড়োনো-সকাল ফুরোনো-দুপুর ক্যাট ফাইলেই
চাপা দিয়ে, চাও, মুখোমুখী ব'সো,
তিথি-ডোরে বাঁধ সাঁঝের লগ্ন, যদি বা পেলেই
জীবনে এমন রোজ তো আসে না, মুখো-মুখী ব'সো!

মধুরেণ—

শ্রীকমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

[১]

ক্রিং, ক্রিং শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল।

"হ্যালো, কে?"

"কে সুলতা?"

"হ্যাঁ। আপনি?"

"কণ্ঠস্বর শুনে অনুমান করে নাও।"

"নিয়েছি, কি বল?"

"সন্ধ্যের সময় এসো না!"

"আজ থাক না!"

"তাহলে আজকের পূর্ণিমাটা যে কালকের জন্য থাকবে না সুলতা, তাছাড়া—"

"—তাছাড়া কি?"

"দাদা বাড়ী নেই, আসতে অনেক রাত হবে, কাজেই বুঝতে পারছ একেবারে—"

"অমৃত যোগ, কি বল?" সুলতার কলধ্বনি ভেসে এলো।

"তাহলে আসছ তো?"

"চেষ্টা করে দেখব, কলেজ ফেরত যদি আসতে পারি।"

"না, যদি নয়; কথা দাও।"

"আচ্ছা দিলাম।"

"সুলতা!"

"টেলিফোনে ওসব কথা ভাল লাগে না। দিদি কি করছে?"

"স্নান সেরে পুজো করতে গেছেন।"

"সেই ফাঁকে তুমি.....চালাক কম নয়! বাবার পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি, এ-ঘরেই আসবেন, গুড্ বাই, যাবো।"

সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেল।

[২]

বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় প্রণব মাসিক পত্রিকা পড়ছিল। দক্ষিণের সুবৃহৎ জানালা দিয়ে লেকের ঝির-ঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া কক্ষে প্রবেশ করে ওর দেহ মন স্নিগ্ধ করে তুলল। পত্রিকার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে প্রণব কিছুতেই পারছিল না, বারবার পূব দিকের জানালা দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে লাগল। যেন কার প্রতীক্ষায় অযথা সময় কাটাবার জন্যই পত্রিকাটির প্রয়োজন ওর কাছে অত্যন্ত, অথচ পড়ার প্রয়োজনীয়তা নেই।

প্রণব একসময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ছিল এবং প্রতি পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে সম্প্রতি সে ইংল্যান্ড থেকে শল্য-বিদ্যার একটা বড় রকমের ডিগ্রী নিয়ে কলিকাতায় ফিরে এসেছে। অর্থ-সম্পদে তার পিতা অমরেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রভূত বিত্তশালী, কিন্তু তার চেয়েও তাঁর বড় পরিচয় ছিল চন্দনপুরের বাঘা জমিদার ব'লে। ছলে, বলে, কৌশলে, সর্বোপরি প্রজাদের চর্বিত-চর্বন করে তিনি যে এত বিত্তশালী হয়েছিলেন সেকথা তাঁর উইলে প্রাপ্ত অর্ধাংশের মালিক পরম পিতৃভক্ত প্রণবকুমার এবং অপরার্ধাংশের স্বত্বাধিকারী তার জ্যেষ্ঠ বিনয়কুমারও এক-বাক্যে স্বীকার করবে। মায়ের কথা প্রণবের একেবারেই মনে পড়ে না, তার অতি শৈশবেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। পিতা এবং অগ্রজের স্নেহের তত্ত্বাবধানে শৈশব অতিক্রম করে প্রণব কৈশোরে পদার্পণ করল। ঠিক এই সময় বিনয়কুমার কলিকাতার সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী দ্বিজদাস চৌধুরীর কন্যা সুষমার সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হ'ল।

বিনয় ওকালতী পরীক্ষায় পাশ করার পর অমরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য বালীগঞ্জ অঞ্চলে একটি সুরম্য গৃহ নির্মাণ করালেন এবং এক শুভ দিন দেখে চন্দনপুর পরিত্যাগ করে দুই পুত্র এবং পুত্রবধূ সুষমাকে নিয়ে গৃহ-প্রবেশ করলেন। দ্বিজদাসের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে যে প্রীতি এই দুই পরিবারের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল তা অধিকতর প্রগাঢ় হয়ে উঠল অমরেন্দ্র-নাথের কলিকাতায় আগমনে। পূর্বে এই দুই পরিবারের মধ্যে মিলন হতে পারত বিবাহ, দুর্গোৎসব, মৃত্যু প্রভৃতি বিশেষ কোন উপলক্ষ্যে; কিন্তু দূরত্ব ক'মে যাওয়ায় উপলক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তা আর রইল না। সুতরাং যাওয়া

আসার এই প্রাবল্যের ফলে যে দুটি তরুণ হৃদয়ের মধ্যে প্রেম সঞ্চারিত হল, তা প্রণব এবং সুলতা ছাড়া অপর কেউ জানতে পারল না।

প্রণব তখন মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, এমন সময় অকস্মাৎ একদিন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অমরেন্দ্রনাথ মারা গেলেন। শ্রাদ্ধ-শান্তির পর তাঁর সিন্দুক খুলে উইল বার করে দেখা গেল দুই পুত্রের কারুর প্রতি তিনি পক্ষপাতিত্ব করেন নি, ঠিক আধাআধি স্বত্বে তাদের মালিকানা দিয়ে গেছেন। উইলের চক্ষে উভয়ে পৃথক হয়ে গেলেও শৈশব থেকে যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধন উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিন্ন করতে উইল সক্ষম হয় না, বরং একই গৃহতলে সুষমার শ্রদ্ধা-ভালবাসার শীতল ছায়ায় উভয়ের আকর্ষণ প্রবলতর হয়ে উঠল।

[৩]

ইংল্যান্ড যাত্রার পূর্বরাত্রে বিদায় নেবার জন্য প্রণব দ্বিজদাসের গৃহে উপস্থিত হ'ল। সকলের সহিত সাক্ষাৎ এবং বিদায় গ্রহণ করে সুলতার কক্ষে প্রবেশ করে দেখে সুলতা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, নিকটে এসে তার কাঁধে হাত রেখে মৃদু ভাবে ঝাঁকানি দিয়ে প্রণব ডাকল, "সুলতা!"

ফিরে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুলতা বললে, "কি বল?"

"মন খারাপ করছে?"

"কন্নাটা কি অস্বাভাবিক!"

সুলতার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে প্রণব বললে, "স্বাভাবিক।... খুব স্বাভাবিক। আমারও খুব করছে, কিন্তু তার সঙ্গে আমার মনে একটা ভাবনাও ঢুকেছে সুলতা; আমার অসাক্ষাতে অন্য কেউ যদি তোমাকে বেদখল করে নেয়!"

দৃঢ়তার সহিত সুলতা বললে, "সে ভয় করার প্রয়োজন তোমার নেই প্রণবদা; তোমার সুলতাকে কেউ বেদখল করতে পারবে না।"

ঈষৎ প্রফুল্ল মুখে প্রণব বললে, "তোমার কাছ থেকে নিশ্চয়তা পেলাম, কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় যে কর্ম সুলতা।"

"প্রয়োজন হলে সব কথাই প্রকাশ করব, তবে বাবা-মার কাছে তো পারি না, দিদির শরণাপন্ন হতে হবে। আর আমার যাতে ভাল হয় তার চেষ্টা করতে দিদি একটুও ইতস্তত করবে না।"

সত্য-সত্যই একদিন সুলতাকে সুষমার শরণাপন্ন হতে হ'ল। প্রণবের ইংল্যান্ড যাত্রার কিছু দিন পরে সুলতার বিবাহের একটি প্রস্তাব নিয়ে দ্বিজদাসের শ্যালক অজয়নাথ এসে তাঁকে চেপে ধরলেন, যেমন করে হোক দ্বিজদাসকে এ-বিবাহে রাজি হতে হবে। পাত্রের গুণাবলী এবং ঐশ্বর্যের বহরের কথা শুনে দ্বিজদাস অজয়নাথের চেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে শ্যালককে চেপে ধরলেন—যেমন করে হোক এ-বিবাহ ঘটাতেই হবে। অতঃপর বাধা আর কোথাও রইল না।

সুতরাং বিবাহ যখন একরূপ পাকা-পাকিভাবে স্থির হয়ে এলো, তখন উপায়ান্তর না দেখে একদিন বিনয়কুমারের গৃহে উপস্থিত হয়ে সুষমাকে জড়িয়ে ধরে আকুল কণ্ঠে সুলতা বললে, "দিদি, এ-বিয়ে তোমাকে যেমন করে হোক বন্ধ করতেই হবে।"

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে সুষমা বললে "কেনরে, অমন বিদ্বান, সৎচরিত্র, অর্থবান, সুদর্শণ বর তোর পছন্দ হয় না?"

দৃঢ়স্বরে সুলতা বললে, "না হয় না। বাবা-মাকে বুঝিয়ে বলে তুমি এ-বিয়ে বন্ধ কর দিদি।"

ঈষৎ বিরক্ত হয়ে সুষমা বললে, "এ তোর অন্যায় অনুরোধ সুলতা, আমার কথায় বাবা না হয় বিয়ে ভেঙে দিলেন, কিন্তু পরে যদি এমন সৎপাত্র পাওয়া না যায়, তখন যে আমাকেই দোষী হতে হবে।"

সুষমার দেহের ওপর ভেঙে পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে সুলতা বললে, "কিছু তোমায় ভাবতে হবে না দিদি।"

তাকে একটু ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কঠোর স্বরে সুষমা বললে, "ব্যাপারটা একটু খুলে বল্ত', তারপর ভেবে না হয় দেখব'।"

তারপর সুলতাকে ওকালতীর প্যাঁচে ফেলে জেরার পর জেরা করে সমস্ত জেনে নিয়ে পুলকিত হয়ে বললে, "এর জন্য এমন করছিস, আগে বলিসনি কেন, তাহলে তো কোন গন্ডগোলই থাকত না। শোন্ সুলতা, তোর কিছু ভাবনা নেই, কাল আমি ওখানে গিয়ে বাবাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলব; এ বিয়ে কিছুতেই হবে না।"

পরদিন কোর্টে যাবার প্রাক্কালে বিনয় গাড়ী করে সুষমাকে দ্বিজদাসের গৃহে পৌঁছিয়ে দিল। শয়নকক্ষে আরাম কেদারায় উপবিষ্ট হয়ে নিশ্চিন্ত মনে চতুর্দিকে ধূম্রজাল বিস্তার করে দ্বিজদাস খবরের কাগজ পড়ছিলেন। সুষমা কক্ষে প্রবেশ করে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করাতে আলবোলার নলটা চেয়ারের হাতলে রেখে দ্বিজদাস প্রশ্ন করলেন, "কে?" তারপর সুষমার মুখপানে চেয়ে পুলকিত হয়ে বললেন, "তুই এসেছিস মা!"

মৃদু হাস্যে সুষমা বললে, "তোমার শরীর এখন কেমন

আছে বাবা?"

"উপস্থিত একটু ভাল আছি। তোর মার মুখে সুলতার বিয়ের কথা শুনেছিস?"

"কই না!" বিস্ময়ের ভাণ করে সুষমা বললে, "আমাকে কোন খবর তো দাও নি।"

আলবোলার নলটা হাতে তুলে নিয়ে দ্বিজদাস বললেন, "বড় তাড়াতাড়ি বিয়েটা স্থির হয়ে গেল। আজ সন্ধ্যের সময় তোর মাকে নিয়ে তোকে সংবাদ দিতে যাব ভেবেছিলাম।"

"ছেলেটি কে?" সুষমা প্রশ্ন করলে।

ভবানীপুরের নামজাদা বড়লোক রামসদয় দত্তর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ছেলেটি বিদ্বান, সচ্চরিত্র, সুদর্শন, এক কথায় একটি লোভনীয় পাত্র।"

বিন্দুমাত্র উল্লসিত না হয়ে গম্ভীর কণ্ঠে সুষমা বললে, "বাবা, আমি তো তোমার বড় মেয়ে, তোমার একটিও ছেলে নেই; কাজেই বিয়ের কথাটা পাকা করে নেবার আগে কি একবার আমার মতটা জানা উচিত ছিল না!"

উদ্বিগ্ন হয়ে দ্বিজদাস বললেন, "কেন মা, এতে তোর কিসের আপত্তি থাকতে পারে?"

অনুযোগের সুরে সুষমা বললে, "এর চেয়ে কি ভাল পাত্র পেতে না?"

হতাশা মিশ্রিত কণ্ঠে দ্বিজদাস বললেন, "কোথেকে পাব?"

"কেন, আমার ঠাকুরপো। সে কি তোমার রামসদয় দত্তর ছেলের চেয়ে অযোগ্য? আমার কতদিনের ইচ্ছে ঠাকুরপোর সঙ্গে সুলতার বিয়ে দেব।"

দ্বিজদাসের মুখে একই সঙ্গে হর্ষ ও বিষাদ খেলে গেল, চিন্তাগ্রস্থ মুখে বললেন, "এ কথা তুই আগে বলিস্ নি কেন মা?"

"আগে কি জানতাম আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই সুলতার বিয়ে স্থির করে ফেলবে!"

ধীরে ধীরে দ্বিজদাস বললেন, "প্রণবের সঙ্গে যদি সুলতার বিয়ে হয় তাহলে তো সব দিক থেকেই আমার ভাল, অর্থ সমস্যাটাও তো আমাকে কম কাবু করেনি, কিন্তু ও'দের যে কথা দিয়ে ফেলেছি।"

"ও'দের খবর দাও যে ঠিকুজিতে মিল হয়নি।"

"দেখি ভেবে।"

দৃঢ়স্বরে সুষমা বললে, "ভেবে দেখি নয়; কথা দাও।"

মৃদু হাস্যে দ্বিজদাস বললেন, "আচ্ছা, তাই হবে।"

[৪]

"ঠাকুর পো!"

মাসিক পত্রিকাটা পাশে নামিয়ে রেখে বিছানার ওপর উঠে ব'সে প্রণব বললে, "কিছু বলবে বৌদি?"

সুষমা বললে, "আর কতদিন আমাকে একলা এবাড়ীতে থাকতে হবে বলতে পার?"

সহাস্যে প্রণব বললে, "একলা কি রকম! দাদা আমি বুঝি এবাড়ীর লোক নই?"

সুষমা বললে, "তোমরা পুরুষমানুষ কাজ-কর্ম নিয়ে মেতে থাক।"

প্রণব বললে, "একটি নারীর সঙ্গ তোমার প্রয়োজন বুঝি?"

"সেরকম জানা-শোনা ভাল নারী তোমার সন্ধানে আছে না-কি?"

"আছে একটি।"

"কে বলত?"

"সুলতা।"

"সুলতা!" প্রণব যেন আকাশ থেকে পড়ল, একটু ভেবে বললে, "হ্যাঁ, পরী হিসেবে সুলতা লোভনীয় বটে, কিন্তু ব্যবসায় লোকশান হওয়ায় সম্প্রতি তোমার বাবার অবস্থা তো খুব খারাপ হয়ে গেছে।"

সুষমা বললে, "তার সঙ্গে বিয়ের কি সম্পর্ক?"

"তিনি পারবেন কি পনেরো হাজার টাকা পণ দিতে?"

প্রচণ্ড আঘাতে সুষমা হতবাক্ হয়ে গেল, একটু পরে বললে, "তুমি পণ নেবে?"

"অবশ্যই। না নেবার তো কোন কারণ দেখি না।"

"আমার বিয়ের সময় তোমরা এক পয়সা পণ নাওনি, তাছাড়া তোমাদের বংশে আজ পর্যন্ত কারুর পণ নেওয়ার কথা শুনিনি।"

প্রণবের মুখে ক্ষীণ হাস্যরেখা ফুটে উঠল; বললে, "বাবা নেননি বলে যে আমাকেও নিতে হবে না এমন কোনও লেখা-পড়া কোন দিন কারুর সঙ্গে আমার হয়েছিল না-কি? আর বংশের কথা বলছো না? আমি ছাড়া আমাদের বংশে আজ পর্যন্ত কেউ কি ইংল্যাণ্ড যেতে পেরেছে?"

"শোন ঠাকুরপো, তোমার সঙ্গে সুলতার বিয়ে দোবো বলে স্থির করায় অন্য এক জায়গায় ওর পাকাপাকি সম্বন্ধ আমি ভেঙে দিয়েছি, আর বাবা-মাও সেই ভরসায় অন্য কোথাও খোঁজ করার চেষ্টা করেননি।"

প্রণব বললে, "এমন গুরু-দায়িত্ব তুমি কেন নিজের কাঁধে তুলে নিলে বৌদি?"

সুষমা বললে, "তোমার কথার ওপর নির্ভর করেই আমি এ দায়িত্ব নিয়েছিলাম।"

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে প্রণব বললে, "আমার কথার ওপর নির্ভর করে!"

দৃঢ়স্বরে সুষমা বললে, "হ্যাঁ তোমার কথার ওপর নির্ভর করে। আজ অবাক হচ্ছ কেন ঠাকুরপো, বিলেত যাবার আগে তুমিই না সুলতাকে কথা দিয়েছিলে ওকে বিয়ে করবে?"

প্রণব মৃদু মৃদু হাসতে লাগল, একটু পরে গম্ভীর কণ্ঠে বললে, "কথা দিয়েছিলাম তখন, আজ তা এড়াবার জন্য অস্বীকার করব না; কিন্তু নিজের প্রকৃত মূল্য তখন ঠিক বুঝতে পারিনি, ছিলাম সাধারণ এম-বি পাশ করা ডাক্তার; তখন হলে হয়ত' বিনা পণেই সুলতাকে বিয়ে করে ফেলতাম, কিন্তু বিলেত থেকে বুঝে দেখ দিকি কত বড় একটা ডিগ্রী নিয়ে এলাম, তার কি সামান্যটুকুও মূল্য নেই! আছে, নিশ্চয়ই আছে; আর তারই মূল্য স্বরূপ যদি মাত্র পনেরো হাজার টাকা পণ নিই, তাহলে কি খুব অন্যায় হয়! আমি এখনও বলছি সুলতাকে বিয়ে করতে আমার আপত্তি নেই, তবে আমার দাবী যেন অক্ষুন্ন থাকে।"

প্রণবের এই অর্থগৃধ্নুতায় বিস্ময় এবং ঘৃণায় সুষমা কিছুক্ষণের জন্য হতবাক হয়ে রইল, একটু পরে গভীর আক্ষেপের সহিত বললে, "আজ বাবা গরীব হয়ে পড়েছেন, তার সুযোগ নিয়ে আমাকে এভাবে অপদস্থ করবে ঠাকুর-পো! বাবা ওঁদের মুখ দেখাব কি করে।"

ধীর-শান্ত কণ্ঠে প্রণব বললে, "শুধু তোমার বাবার কথাই ভাবছ বৌদি, আমারও যে একটা দিক আছে, সে চিন্তা তো করছ না; বিলেতে আমার যা খরচ হয়েছে বিয়ের পণে তার কিছুটা অংশ পূরণ করে নিলে কি খুব নীতি-বিরুদ্ধ কাজ হয়!" তারপর একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, "এ বিয়েতে তোমার যদি অতই আগ্রহ তো দাদাকে বল না পণের টাকাটা দিয়ে দিতে; আর দাদা যদি নাই রাজি হন্ তোমার তো অত গয়না-গাটি আছে যেগুলো তুমি আজকাল পরো না; বিক্রী করলে অনায়াসে পনেরো হাজার টাকা উঠে আসবে।"

এর পর আর প্রণবের সঙ্গে কথা বলতে সুষমার প্রবৃত্তি হ'ল না, চলে যেতে যেতে ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করে বললে, "পাশ করা বিদ্যেটাই শিখেছো ঠাকুরপো, মনুষ্যত্বটা সেখানে খুইয়ে এলে!"

ঘরে ফিরে এসে সুষমা বিছানায় শুয়ে পড়ল, অসহ্য যাতনায় মাথা দপ্ দপ্ করতে লাগল এবং কোন এক অজ্ঞাত মুহূর্তে চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে দুই গণ্ড ভাসিয়ে দিল। প্রণবকে নিয়ে সুষমা কত গর্ব করেছে বাবা-মার কাছে, আর আজ তার এ-কি স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ল! যখন সকলে শুনবে—কথা দিয়েও প্রণব কথা রাখল না পণের লোভে সুষমা তখন লজ্জায় মুখ ঢাকবে কোথায়! সুষমার কথাতেই না বাবা-মা অমন সুপাত্র হাতছাড়া করলেন; এখন তাঁরাই বা বল-বেন কি! সুলতার বয়স বেড়ে যাচ্ছে, ও'রা সকলে ওর বিবাহের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তাঁদের ব্যস্ততায়ই না আজ সে প্রণবের নিকট বিবাহের কথা পাড়লে। সুলতা ত' বাড়ীতেই আছে, সে যদি প্রণবের এই হীন মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়ে থাকে! থাকুক পেয়ে, চৈতন্য হবে তাহলে পোড়ারমুখির।

"দিদি শুয়ে আছ যে?" কক্ষে প্রবেশ করে সুলতা প্রশ্ন করলে। চোখের জল ঢাকবার চেষ্টা করে সুষমা বললে, "মাথা ধরেছে"। তারপর প্রসঙ্গ এড়িয়ে বললে, "লাইব্রেরী রুম্ থেকে এরই মধ্যে যে চলে এলি?"

"বাড়ী যেতে হবে, একটু দরকার আছে, কিছুটা পড়ার বাকি থেকে গেল, আর কি করব" তারপর সুষমার পাশে বসে বললে, "একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দেবো?"

বিরক্তি মিশ্রিত কণ্ঠে সুষমা বললে, "না, থাক্।"

"তাহলে এখন চলি দিদি। জামাইবাবু এসেছেন?"

সুষমা বললে, "ও'র আসতে অনেক রাত হবে।"

চিন্তান্বিত মুখে সুলতা বললে, "তাহলে কার সঙ্গে যাই! প্রণবদাকে বলব পৌঁছিয়ে দিতে?"

সশ্লেষে সুষমা বললে, "তিনি এখন বিলেত ফেরৎ ডাক্তার হয়েছেন, আর কি তোমার ড্রাইভার হতে চাইবেন! বলে দেখতে পার; যদি নিয়ে যায়!"

প্রণবের কক্ষে এসে সুলতা বললে, "উঠুন মশাই, আর শুয়ে থাকতে হবে না; আমাকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিতে হবে!"

শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সহাস্যমুখে প্রণব বললে, "বৌদির হুকুম, না তোমার অনুরোধ?"

"দুই-ই। আর দেরী নয়।"

ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে হতে সুলতার কণ্ঠস্বরে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রণব বললে, "চল, আর দেরী নয়।"

গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে রিষ্টওয়াচ দেখে প্রণব বললে, "এখন সবে আটটা বেজেছে, অতএব ঘণ্টাখানেক লেকটা অনায়াসে ঘোরা চলবে, আশা করি সুলতা দেবীর আপত্তি নেই?"

সুলতা বললে, "ঘণ্টাখানেক ঘুরতে সুলতাদেবীর

আপত্তি নেই বটে, কিন্তু সময়টা যেন ঘণ্টাখানেককে ছাড়িয়ে না যায়।"

সুদৃশ্য ক্রাইস্‌লার গাড়ীটা চক্রাকারে লেক পরিক্রমণ করতে লাগল। লেকের জলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সুলতা গাড়ীর বাইরের দিকে মুখ করে বসেছিল; বার-কয়েক তার দিকে তাকিয়ে প্রণব বললে, "আজ এমন গম্ভীর হয়ে গেলে কেন সুলতা? কথা বলছো না, কি অত ভাবছ?"

প্রণবের কথায় সুলতার চমক ভাঙ্‌ল; বললে, "দিদির কথা ভাবছি।"

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে প্রণব বললে, "বৌদির কথা! হঠাৎ এ সময়ে?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুলতা বললে, "আচ্ছা, দিদিকে তুমি শুধু শুধু কষ্ট দিলে কেন বলত'?"

মৃদুস্বরে প্রণব বললে, "এমনি, কেন, বৌদি কিছু বলছিলেন না-কি?"

"কাঁদ্‌ছিল।"

"আমাদের কথা তুমি শুনেছ না-কি?"

স্বল্পহাস্যে সুলতা বললে, "শুনেছি; দরজার আড়াল থেকে। এক এক সময় আমারও মনে হচ্ছিল যে, তুমি অভিনয় করছ না।"

গাড়ী অন্য একটা পথ ধরল, সুলতা বললে, "আবার কোথায় চললে?"

"বাড়ীতে।"

"কেন?"

"পরিহাসের সীমা লঙ্ঘন ক'রে যে অন্যায় করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে।"

"কি প্রায়শ্চিত্ত করবে?"

"যে অন্যায় করেছি তার মধুরেণ সমাপয়েৎ ক'রে।"

বাড়ী এসে প্রণব বললে, "আমি যা করব' তুমিও ঠিক তাই করবে।" এই বলে ওপরে উঠতে উঠতে উচ্চস্বরে ডাক্‌লে, "বৌদি!"

ঘর থেকে বেরিয়ে সুষমা সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল, নিকটে এগিয়ে গিয়ে প্রণব বললে, "বৌদি, আমরা তোমার আশীর্বাদ নিতে এসেছি।" এই বলে প্রণাম করল; সুলতাও প্রণবের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, প্রণব প্রণাম করতেই নত হয়ে সুষমাকে প্রণাম করল। পুলকিত হয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সুষমা বললে, "ঠাকুর পো!" তারপর কি করবে ভেবে পেল না; হঠাৎ টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললে, "হ্যালো, নর্থ. ...."

"কে, বাবা? শোন, আমরা এক্ষুনি তোমার ওখানে যাচ্ছি; এর মধ্যে মাকে ব'লে কিছু ধান-দূর্বার ও চন্দনের ব্যবস্থা করে রেখো। এখন কিছু বলব' না, ওখানে গেলেই বুঝতে পারবে। আচ্ছা, টেলিফোন রেখে দিচ্ছি।"

ইতিমধ্যে বিনয় ফিরে এসে সুষমার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল, সুষমা ফিরে দাঁড়াতেই বললে, "কিসের চক্রান্ত চলেছে তোমাদের মধ্যে?"

সুষমা বললে, "তোমাকে প্রণাম করার; ওরা তোমাকে প্রণাম করবে।"

প্রণব নত হয়ে বিনয়কে প্রণাম করল। প্রণামের হেতু খুঁজে বার করতে প্রখর বুদ্ধিশালী বিনয়ের মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হ'ল না, তাই সুলতা যেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে অগ্রসর হ'ল অমনি শশব্যস্তে দু-তিন পা পেছনে সরে এসে কপট বাধা দেবার ভঙ্গীতে বললে, "কর কি, কর কি, আমি যে তোমার ভাসুর হই; দূরে থেকে প্রণাম কর।" ব'লে হো হো করে উচ্চস্বরে হাসতে লাগল; তার হাসির সহিত সমবেতভাবে যোগ দিয়ে সকলে নীচে নাবতে লাগ্‌ল দ্বিজদাসের গৃহে যাবার জন্য।

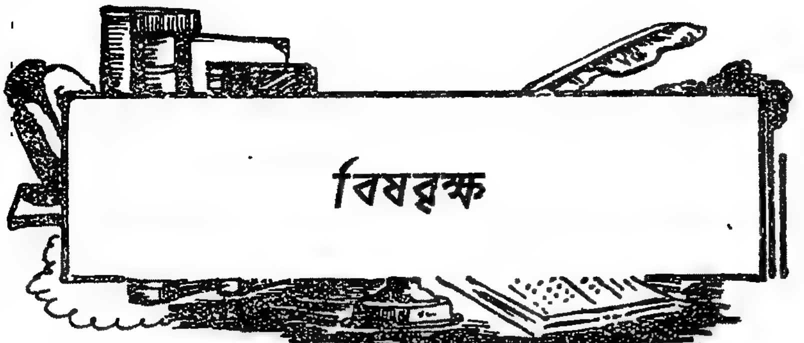

বিষবৃক্ষ

শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একটা বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আরম্ভ হয়। আরম্ভভাগের গাম্ভীর্য গ্রন্থের আশ্রিত বিষয় সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করে, পাঠক বিরাট কিছু পাইবার আশায় মনের অজ্ঞাতে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে; বিষবৃক্ষেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

বিষবৃক্ষ গার্হস্থ উপন্যাস। বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই যে উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে তাহা সুস্পষ্ট। অধিকন্তু আমরা জানি বঙ্কিমচন্দ্র উদ্দেশ্যহীন সাহিত্যচর্চা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ছিলেন জাতীয় নেতা, সমাজ-নেতা ও ধর্ম-নেতা। সামাজিক সমস্যা আশ্রয় করিয়া লিখিত হইয়াছে কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ ইত্যাদি। জাতীয় সমস্যা অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে আনন্দমঠ ও নানা প্রবন্ধ, আর শ্রীকৃষ্ণ চরিত ও ধর্মতত্ত্বে পাই ধর্ম সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্ট চিন্তা ও ভাবনা।

মানুষমাত্রই অমৃতলোভী। কিন্তু অমৃতের অন্তরায় হইল বিষ। তাই বিষবৃক্ষের কল্পনা অলীক নয়। অমৃতফল লাভ করিতে হইলে আমাদের জানা উচিত সমাজ জীবনে কি অমৃত আর কি বিষ। বিষ ও অমৃতের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে না পারিলে জীবনে অমৃতলাভ করা দুরাশা মাত্র। যে নাবিক বায়ুর গতিপ্রবাহে ঝড়ের সন্ধান লাভ করিতে সক্ষম সে-ই তরণীকে বাত্যাহত হইবার লাঞ্ছনা হইতে সংরক্ষিত করিয়া ধীরে সাবধানে কূলে ভিড়াইতে পারে। নাবিকের বিচক্ষণতা কেবলমাত্র তরণী-পরিচালনে নয়; তরণীর গতিপথে বাধাবিষয়ক দৃষ্টিজ্ঞান নাবিকের সম্পদ। বিষবৃক্ষের পরিকল্পনায় যে বিরাটত্ব ও গাম্ভীর্য লক্ষ্য করিয়া থাকি তাহা আংশিক ব্যাহত হইয়াছে গ্রন্থের আশ্রিত চরিত্রের পূর্ণতা ও মনোজ্ঞতার অভাবে। বিষবৃক্ষের চরিত্রগুলি যেন অপূর্ণ। কুন্দনন্দিনী স্বাভাবিক সৌন্দর্যে মনোরম কিন্তু মানসিক সম্পদে কতকটা সৌন্দর্যহীন। কুন্দনন্দিনীর সৌন্দর্য আছে কিন্তু মানসিক উৎকর্ষের অভাবে আকর্ষণহীন; এই কারণেই নগেন্দ্রকে স্বামীরূপে পাইয়াও কুন্দ তাহাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই। সূর্যমুখী আদর্শ স্ত্রীর চরিত্র অন্ধভাবে অনুকরণ করিতে গিয়া নিজের জীবন ও জীবন-সর্বস্বের জীবন বিপন্ন করিয়াছে মাত্র। বিষবৃক্ষের নারী-চরিত্রের মধ্যে কমলমণিই সার্থক সৃষ্টি। সে স্ত্রী হিসাবে সার্থক, সখি হিসাবে সার্থক আর জননী হিসাবেও সার্থক।

পূর্বে বলিয়াছি কুন্দনন্দিনীর চরিত্র অপূর্ণ। বাস্তবিক পক্ষে নগেন্দ্রের মত পত্নীব্রত স্বামীর পক্ষে কুন্দনন্দিনীতে স্থায়ীভাবে আকৃষ্ট থাকিবার যথেষ্ট কারণ নাই। কুন্দনন্দিনী বাক্‌চতুরা নয়, শিক্ষার সম্পদেও সে আকর্ষণীয় নয়। তবে নগেন্দ্র তাহাতে আকৃষ্ট হইল কেন? নগেন্দ্রনাথ শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান; সূর্যমুখী তাহাকে ধর্মাত্মা-আখ্যাতেও বিভূষিত করিয়াছে। মনে হয় কুন্দনন্দিনীর কিশোরীসুলভ স্নিগ্ধ মনোরম অস্ফুট সৌন্দর্যই তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে। হরদেব ঘোষালকে লিখিত নগেন্দ্রনাথের পত্রেও কিশোরীর সৌন্দর্যের মহিমা-কীর্তন দেখিতে পাই। কেবলমাত্র রূপমোহ সূর্যমুখীর ধীর স্থির অচঞ্চল প্রেমকে কি করিয়া ব্যাহত করিল তাহা ভাবিয়া আমরা অবাক হই। কুন্দনন্দিনীর সহিত নগেন্দ্রনাথ চটুল প্রণয়ে লিপ্ত হইলে তাহা যতই নিন্দনীয় হোক না ক্ষমা করিতে পারিতাম। কিন্তু ত্রিংশ বৎসরের যুবক যে শিক্ষিত বুদ্ধিমান ও ধর্মপ্রাণ তাহার সম্মান্যাতে অনুরক্ত হইয়া বিধবা বিবাহের মত নিন্দিত উপায়ে স্নেহ-পাত্রীর সহিত মিলনাকাঙ্খায় গভীরতা ও তীব্রতা লক্ষ্য করিলে মনে হয় কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রের এই আকর্ষণ কেবলমাত্র রূপজ মোহ নয়। ইহা আরও গভীর, ইহা পবিত্র প্রেম। কিন্তু কুন্দনন্দিনীর সহিত বিবাহের অব্যবহিত পরেই বিচ্ছেদে এই আকর্ষণের অগভীরতা ধরা পড়িয়া যায়, তখন নিঃসন্দেহে মনে হয় ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মোহান্ধতা।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা ব্যাপার বিবেচ্য। আচরণের অন্যায় তখনই উপলব্ধ হয় যখন ভাবসঙ্গত ক্রিয়া চিন্তা-জগৎ ছাড়িয়া কর্মজগতে আবির্ভূত হয়। কুন্দনন্দিনীর

সহিত বিবাহের পরেই নগেন্দ্রনাথ বুঝিল কি নিদারুণ অত্যাচার সূর্যমুখীর উপর অনুষ্ঠিত হইয়াছে; তদুপরি সূর্যমুখীর গৃহত্যাগে এই নির্যাতন মুখরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। রূপমোহে পত্নীপরায়ণ স্বামী যে কতটা নির্মম ও নিষ্ঠুর হইতে পারে নগেন্দ্রনাথ তাহার উদাহরণ; তাই বিষবৃক্ষের ফলোৎপাদন ব্যাপারে নগেন্দ্রনাথকেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে দেখিতে পাই।

নগেন্দ্রনাথের প্রত্যবায় যেমন ছিল অনুপেক্ষণীয় তাহার প্রায়শ্চিত্তও তাই হইয়াছে করুণ ও মর্মস্পর্শী। একমাত্র শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তই নগেন্দ্রনাথের তুলনায় হইয়াছে অধিক হৃদয়বিদারক; কারণ শৈবলিনীর অপরাধ ও বিদ্রোহ ছিল ক্ষমার অযোগ্য। আখ্যায়িকার প্রারম্ভে দেখিতে পাই বিষবৃক্ষ রোপণ ব্যাপারে তিনজনের ক্রিয়া সক্রিয়ভাবে বিদ্যমান—নগেন্দ্রনাথ, সূর্যমুখী ও কমলমণি। তখন গ্রন্থকার বৃক্ষের বিষক্রিয়ার সুবিস্তৃত ও সুগভীর ফল সম্বন্ধে কতকটা অনবহিত ছিলেন বলিয়া তিনজনকে তুল্যাংশে দোষার্হ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই বিষবৃক্ষরোপণের মূলে একজনই আছেন এবং তিনি হইলেন নগেন্দ্রনাথ। তাই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা হইয়াছে নগেন্দ্রনাথের মর্মন্তুদ। এ প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্য স্মরণীয়—'নগেন্দ্রের যে দোষ নাই এমন বলি না। তাহার দোষ গুরুতর; প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর আরম্ভ হইল।'

এখন বিষবৃক্ষের রচনার গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছু বলিব। গল্প রচনাকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। প্রথমতঃ কল্পনাভাগ বা Conception; দ্বিতীয়তঃ সম্পাদনা-ভাগ বা execution। রচনার কল্পনাংশ বিবেচনা করিলে বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকক্ষ কেহ নাই বা হইতে পারিবেন না; বঙ্কিমচন্দ্রের সকল রচনারই আরম্ভভাগের পটভূমিকা সুবিরাট ও সুগম্ভীর। রচনার পূর্বগামী এই পরিকল্পিত বিরাটত্ব ও গাম্ভীর্য রচনাকে অসাধারণত্ব দান করিয়া থাকে। রচনার আরম্ভভাগের এই পারিপাট্য, গাম্ভীর্য ও বাগাড়ম্বর মহাকাব্যেরই বিষয়বস্তু এবং মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র রচনাকে একটা বিশেষ গৌরবদান করিবার জন্যই আখ্যায়িকার প্রারম্ভভাগে কাব্যের আঙ্গিক গ্রহণ করিয়া থাকিতেন। কিন্তু যতই আমরা আখ্যায়িকার অগ্রগতির সহিত পা মিলাইয়া চলিতে থাকি ততই পূর্বভাগের গাম্ভীর্য যেন পদে পদে ব্যাহত হইতে থাকে; ফলে রচনা বা রচনাশ্রিত চরিত্রগুলি পরিসমাপ্তিতে সাধারণ পরিণতি লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র রচনার পরিকল্পনা সৃষ্টিতে যতটা সার্থক চরিত্রপুষ্টিতে ততটা সার্থক নন। এ বিষয় শরৎচন্দ্র সত্যই অপরাজেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের পতিব্রতা স্ত্রী সম্বন্ধে কল্পনা রূপ পাইয়াছে সূর্যমুখীতে। সূর্যমুখী একান্তভাবে পতিগতপ্রাণা তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই; স্বামীর সুখের জন্য সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনীকে স্বামীর অঙ্কশায়িনী করিয়া আদর্শ স্ত্রী হইলেন। কিন্তু এই কার্যে প্ররোচিত তাহাকে কে করিল? কেবলমাত্র তাহার স্বামীভক্তি নয়; কেবলমাত্র স্বামীর কুন্দনন্দিনীর সহিত আসঙ্গলিপ্সা নয়; তাহা যদি হইত তবে স্বামীর সহিত কুন্দনন্দিনীর বিবাহের পর তাহাকে অসুখী হইয়া গৃহত্যাগে প্রবৃত্ত হইতে দেখিতাম না। যে সূর্যমুখীকে এই অসম্ভব (এবং অন্যায়) স্বার্থত্যাগে প্ররোচিত করিয়াছে তাহা হইল সূর্যমুখীর দম্ভ। তাহার পাতিব্রত্যের অহমিকা। সে দেখাইতে চায় সে কত ভাল, কত ভালবাসে স্বামীকে এবং এই ভালবাসার জন্য সে কল্পনাতীত স্বার্থত্যাগও করিতে পারে, সহাস্যমুখে স্বামীকে সপত্নীর হাতে তুলিয়া দিতে পারে। কিন্তু এটা বুজরুকি বা ভ্রান্ত পাতিব্রত্য। সতীর সতীত্ব স্বামীকে পরস্ত্রীর হস্তে সঁপিয়া দেওয়ায় নয়, স্বামীকে পরস্ত্রীর কবল ও কুহক হইতে সযত্নে রক্ষা করিবার চেষ্টাই প্রকৃত সতীত্ব ও পাতিব্রত্য। আদর্শ স্ত্রীর চরিত্রবল তাহার মানসিক উৎকর্ষ এমন হইবে যে স্বামী কল্পনা ব্যতীত অন্যাতে আসক্ত হইবার দুষ্ট চিন্তা হইতে সতত মুক্ত থাকিবে। যদি কোন দুর্বল মুহূর্তে স্বামী অন্যাচিন্তাগত হয় তবে পরমুহূর্তে লজ্জিত হইয়া পত্নী সান্নিধ্যে পুনরাবৃত্ত হইবে। আমাদের পূর্ববর্তীগণ পাতিব্রত্যের কতকগুলি ভ্রান্ত চিত্র দিয়া গিয়াছেন; একাধিক পত্নীতে আগ্রহশীল পুরুষ নারীকে ভ্রান্ত পাতিব্রত্য-ধর্ম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। স্বামীর আকাঙ্ক্ষিতা বারবনিতার গৃহে পৃষ্ঠদেশে কুষ্ঠরোগী স্বামীবাহনকারিণী পতিব্রতা স্ত্রীর চিত্র আমরা পাইয়াছি। গল্প-লেখকের এই সামান্য কাণ্ডজ্ঞানের অভাব দেখিয়া মর্মাহত হই যে, প্রণয় ব্যাপারে একজনই যথেষ্ট সংখ্যা নয়; নরনারীর পারস্পরিক সম্মতিতেই প্রণয় সার্থক ও সমাপ্ত হয়। কুষ্ঠরোগীকে বারবনিতার গ্রহণ করিবার যে বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই এই সামান্য ব্যাপারটাও লেখকের মস্তিষ্কে স্থান লাভ করে নাই। কিংবা গল্পের সবটাই বাজে এবং স্ত্রীর পাতিব্রত্যও ভুয়া কারণ কুষ্ঠরোগীকে দিলেও কাহারও গ্রহণ করিবার কথা নয়।

সূর্যমুখীও ভ্রান্ত আদর্শের বশবর্তী হইয়া কুন্দনন্দিনীর সহিত স্বামীর বিবাহে অগ্রণী হইয়াছিল। তাহার ধারণা সে দেবীত্বে উন্নীতা হইল এই স্বার্থত্যাগে। কিন্তু মানুষী যে দেবী হইতে পারে না এবং দেবী হইবার চেষ্টাও যে বিড়ম্বনাময় তাহাই সূর্যমুখীর পরবর্তী গৃহত্যাগে প্রমাণিত হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে শরৎচন্দ্রের একটি পতিব্রতা স্ত্রীর কথা উল্লেখ করিতে পারি। সে আমাদের অতি সুপরিচিতা সুরবালা। উপেন্দ্র যদি কোন সুন্দরী কিশোরীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইতেন তবে কি আমরা কল্পনা করিতে পারি সুরবালা অগ্রণী হইয়া কিশোরীর সহিত স্বামীর পুনর্বিবাহে যত্নশীলা হইয়া পড়িয়াছে? বরং ব্যাপারটা যে অতীব কৌতুকপ্রদ তাহাই প্রকাশ হইয়া পড়িত তাহার নিম্নোক্ত কথায়—'হ্যাঁগা, এ কথা কি সত্যি তুমি একটি কিশোরীর রূপে বাঁধা পড়েছ?' কিম্বা সমস্ত ব্যাপারটাই যে অবিশ্বাস্য তাহাই তাহার উক্তিতে ব্যক্ত হইত—'এ-ও বিশ্বাস কর্তে হবে আমার স্বামী আমা-ছাড়া অন্যাতে আসক্ত; সে কথা যেদিন বিশ্বাস কর্ব তার আগে যেন আমি মরি।'

এই সব আলোচনার অর্থ ইহাই যে নায়িকার চরিত্রের উপরেই নির্ভর করে তাহার উপরে আরোপিত চিন্তা ও পরবর্তী কার্য্য। প্রত্যেক সার্থক চরিত্রেরই একটি অর্থপূর্ণ বিশিষ্ট ভঙ্গি আছে। সূর্যমুখী যে কাজ করিয়াছে সুরবালার পক্ষে তাহা করা দূরে থাকুক কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। নায়িকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এইখানে। আখ্যায়িকার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নায়ক-নায়িকার ক্রমোন্নত চরিত্র এমন এক বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে যে তখন গল্পকার তাহাদের আর ইচ্ছামত ঘুরাইতে ফিরাইতে, চলাইতে বলাইতে পারেন না। এই সব চরিত্র হয় এক একটি সৃষ্টি। সুরবালা একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি; সেই হিসাবে সূর্যমুখী অতি সাধারণ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে শরৎচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এইখানেই পার্থক্য। এই দৃষ্টি যাহার নাই তিনি উভয়ের সৃষ্টির পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন না।

কুন্দনন্দিনী আখ্যায়িকার গতিকে সচল করিতে পারে নাই; সে বড় মূক, বড় অস্ফুট, বড় শঙ্কাভীরু। সে কথা কহিতে পারে না, তাই তাহার পক্ষে একটি গুণবান বিবাহিত যুবককে সুচিরকাল রূপমুগ্ধ করিয়া রাখিবার কথা নয়। তাহার জীবনের বিপর্যয়ের ইতিহাস এইখানেই লুক্কায়িত। সৌন্দর্যপিপাসুর কাছে রূপ আকর্ষণের বস্তু সন্দেহ নাই কিন্তু রূপের স্থায়িত্বকাল দীর্ঘ নয়। কুন্দনন্দিনী যে কি করিয়া নগেন্দ্রকে এমন চঞ্চল ও বিবেচনাহীন করিল তাহা ভাবিলে আশ্চর্য লাগে। নগেন্দ্রনাথের মত বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীর চরিত্রের গুণাগুণে ভুল হইবার কথা নয়। যে গুণের সন্নিপাত বা বাহুল্যে সুপরিচিত অতি প্রিয় প্রিয়তমাকেও স্বামী ভুলিয়া গিয়া অপরিচিতা বা সামান্য পরিচিতা অন্যাতে আসক্ত হয় সেই দুর্নিবার শক্তির অভাবই কুন্দনন্দিনীর সহিত নগেন্দ্রের বিবাহ ব্যাপার আমাদের কাছে অদ্ভুত ও অসম্ভব মনে হয়। এ ব্যাপার যেন লেখকের গরজেই সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়। একটু আঘ্রাণ লইয় লোকচক্ষুর অন্তরালে যাহাকে সকৌতুকে স্পৃষ্ট ও পিষ্ট করিয়া সাময়িক সুখবোধ করিবার কথা তাহাকে লইয়া জীবনে বিপর্যয় আনিবার কোন কারণই আপাতদৃষ্টিতে আমাদের চক্ষে পড়িতেছে না। তাই মনে করি লেখকের পরিকল্পিত সমস্যার অকিঞ্চিৎকর সূত্র হিসাবেই কুন্দনন্দিনীর গল্পে আবির্ভাব। কুন্দনন্দিনী ব্যর্থ সৃষ্টি। যে পাঠকের হৃদয়ে হিল্লোল তুলিতে সমর্থ হয় নাই নায়ককে বিভ্রান্ত ও বিহ্বল করিবার কথা তাহার নয়। কুন্দনন্দিনী অপূর্ণ চরিত্র। কুন্দনন্দিনী অস্ফুট অপূর্ণ বলিয়াই গল্পের পটভূমি হইতে অতি সহজে সে অপসৃত হইল এবং নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলন সংঘটিত হইল। কুন্দনন্দিনী যদি অচলা বা কিরণময়ীর মত পরিণত ও পুষ্ট হইত তবে অত সহজে বিষবৃক্ষের মূলোৎপাটন করিয়া বিষবৃক্ষকে অমৃততরুতে রূপান্তরিত করিতে পারা যাইত না।

নগেন্দ্রনাথ 'বন্ধুর হিতকারী ভৃত্যের প্রতি কৃপাবান, আনুগত্যের প্রতিপালক শত্রুর প্রতি বিবাদশূন্য। তিনি পরামর্শে বিজ্ঞ, কার্যে সরল, আলাপে নম্র, রহস্যে বাঙ্ময়। —তাহার দেশে সম্মান, বিদেশে যশ, অনুগত ভৃত্য-প্রজাগণের সন্নিধানে ভক্তি, সূর্যমুখীর নিকট অবিচলিত অপরিমিত অকলুষিত স্নেহরাশি। যদি তাহার কপালে এত সুখ না ঘটিত তবে তিনি এত দুঃখী হইতেন না।' এই গেল গল্পকারের নগেন্দ্র সম্বন্ধে সার্টিফিকেট। নিম্নে সূর্যমুখীর অভিমতও বলিতেছি—'তোমার সহোদরকে মন্দ বলিও না। আমি তাহার নিন্দা করিতেছি না। তিনি ধর্মাত্মা, শত্রুতেও তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক এখনো করিতে পারে না।' এখন জিজ্ঞাস্য, যে লোক এমন বিজ্ঞ, মহৎ ও ধর্মাত্মা তাহার পতনটা কি একেবারে আকস্মিক ঘটনা? না এ কর্মফল বা রিষ্টিযোগ? চরিত্রের দোষস্খালনের জন্য গ্রন্থকার নায়ককে সর্বগুণালঙ্কৃত করিয়া-

ছেন কিন্তু যে দোষে নগেন্দ্রনাথ দুষ্ট তাহা যে তাহার জীবনের সকল গুণকে তিরস্কৃত করিয়াছে তাহা ভুলিলে চলিবে না। চরিত্রের পতনে তিনি পত্নীর প্রতি নিষ্ঠুর হইয়াছেন, ভৃত্যের প্রতি অহেতুক নির্মম। তাঁহার বাক্য জ্বালাকর ব্যবহার কার্যে। তাঁহার চরিত্রে অন্য দোষও আসিয়া পড়িয়াছে, তিনি মদ্যপ হইয়াছেন। যে স্ত্রীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিবার শাস্ত্রীয় উপদেশের অধিকারী সে চরিত্রহীন হইয়া এমন কালাপাহাড়ে পরিণত হইল যে সে অম্লান বদনে স্ত্রীকে মুখের উপর বলিয়া ফেলিল—আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। মরিব না। কিন্তু দেশান্তরে যাইব। বাড়ী ঘর সংসারে আর সুখ নাই, তোমাতে আমার আর সুখ নাই। আমি অনাগতপ্রাণ হইয়াছি সে কথা তোমাকে স্পষ্ট বলিব।' কথাগুলি স্পষ্ট, তাহা অস্পষ্ট নয়, কিন্তু ইহা সত্যবাদিতাও নয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল স্ত্রীকে স্পষ্ট করিয়া জানান, বাধা দেওয়া নিষ্ফল—দিলে তাহা পদদলিত হইবে। অধিকন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি নগেন্দ্রনাথের পতনের কারণ আছে। যে স্বামী এমন রূঢ় অশ্রাব্য কথা বিবাহিতা পতিগতপ্রাণা ধর্মপত্নীর সম্মুখে উচ্চারণ করিতে পারে তাহার পতন যে কোন অতলে তলাইয়া গিয়াছে তাহার সন্ধান সর্বত্র বিচরণশীল এক ভগবান ছাড়া বাহারো জানিবার কথা নয়। এখন আমাদের সূর্যমুখী চরিত্র বুঝিতে সহজ হইয়া আসিতেছে। সূর্যমুখী যে স্বেচ্ছায় কুন্দনন্দিনীকে স্বামীর অঙ্কশায়িনী করিয়াছে তাহা নয় —নগেন্দ্রনাথ মনে মনে বহু পূর্বেই সূর্যমুখীকে হৃদয় সিংহাসনচ্যুত করিয়া ইতিমধ্যে সেখানে কুন্দনন্দিনীকে বসাইয়া দিয়াছেন; এখন প্রয়োজন মাত্র একটু লৌকিক ক্রিয়ার—তাহা সম্পাদন করিয়াছে সূর্যমুখী। যে লোক এমন নিষ্ঠুর, পতিগতপ্রাণা পত্নীর প্রতি বিবেচনাহীন. অত্যাচারী, তাহার চারিত্রিক গুণাবলীর যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহা একান্ত মূল্যহীন। বস্তুত নগেন্দ্রনাথ বিদ্বান, পত্নীবৎসল ও ধর্মাত্মা নহেন। এই তিনের যে কোন একটি গুণের প্রকৃত অধিকারী হইলে চরিত্রের এমন পতন হইতে পারিত না। প্রকৃতপক্ষে নগেন্দ্রনাথ বিলাসী ও রূপপিপাসু। তাহার বাটীর গঠন নির্মাণ-কার্যে তাহার বিলাসিতার পরিচয় পাই। তাহার গৃহে দেশী ও বিদেশী নানাবিধ চিত্রের অবস্থানে রূপ পিপাসার পরিচয় পাই, সে যদি অতি-পরিচিতা স্ত্রীতে সাময়িকভাবে নিরাসক্ত হইয়া তরুণীর নূতন সৌন্দর্যে আসক্ত হইয়া পড়ে তবে বিস্মিত হইবার কারণ নাই: কারণ তাহার সর্বগুণ থাকা সত্ত্বেও অসংযম বা সংযমের অভাব তাহার সকল গুণের বিনাশ-কারণ হইয়াছিল। এই অসংযম ও চরিত্রহীনতা সৌন্দর্যপ্রিয়তার রন্ধ্র দিয়াই নগেন্দ্রনাথের দেহে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। নগেন্দ্র শুধু যে বিলাসী ও রূপপিপাসু তাহাই নয়, সে বিবেকহীন ঘৃণ্য স্বার্থপরও বটে। তাহার বিলাসের পরিচয় যেমন পাই বাসভবনের শিল্পকার্যে ও চিত্তবিনোদনের নানাবিধ উপকরণে, তাহার দুর্নিবার রূপপিপাসার পরিচয় পাই হরদেব ঘোষালকে লিখিত পত্রেঃ—'বল দেখি কোন বয়সে স্ত্রীলোক সুন্দরী? তারপরে—কুন্দ যে নির্দোষ সুন্দরী তাহা নহে। অনেকের সঙ্গে তুলনায় তাহার মুখাবয়ব অপেক্ষাকৃত প্রশংসনীয় বোধ হয়। অথচ আমার বোধ হয় এমন সুন্দরী কখনো দেখি নাই। বোধ হয় কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া কিছু আছে; রক্তমাংসের যেন গঠন নয়; যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে। অন্যত্র—চক্ষু দুইটি কিরূপ তাহা আমি এ পর্যন্ত স্থির করিতে পারিলাম না। আবার—যদি তোমাকে সেই দুইটি চক্ষুর সম্মুখে দাঁড় করাইতে পারি তবে তোমারও মতিস্থৈর্যের পরিচয় পাই।' এই শেষ পংক্তিতে আমরা বুঝিলাম সর্বগুণালঙ্কৃত নগেন্দ্রের চরিত্রের পতনের যথেষ্ট কারণ আছে। এতো কেবল রূপ বর্ণনা নয়, এ রূপ বর্ণনাতে রূপপিপাসুর চিত্তে অলোকসামান্য রূপের উন্মাদনা-ক্রিয়া প্রতিফলিত দেখিতে পাই, তাহারই অনিবার্য ফল রূপভুক্তি। তাই আমরা নগেন্দ্রের অধঃপতনে বিস্মিত হই না। যে রূপের আগুনে রাবণ সবংশে মরিয়াছে, ট্রয় রাজ্য ধ্বংসস্তূপে পরিণত, আমাদের বিদ্বান, বুদ্ধিমান ধর্মাত্মা পত্নীবৎসল নগেন্দ্রনাথও যে স্খলিতচরিত্র হইবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই; কিন্তু আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছে সূর্যমুখীর পত্র। সেই পত্রে কুন্দনন্দিনীর রূপের যে পরিচয় পাই তাহা অতি সাধারণ, চিত্তবিভ্রমকারী মোটেই নয়। তাই নগেন্দ্রনাথের পদস্খলন ব্যাপার আমাদের কাছে অস্বাভাবিক ও বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইয়াছিল।

কমলমণি সত্যই নারীকুলমণি। কমলমণি আমাদিগকে সুরবালাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কমলমণি যেন সুরবালার যুবতী সংস্করণ। সুরবালাও যুবতী কিন্তু বিশ্বাসের গভীরতায় বয়সোচিত তারল্যের অসবর্তমানতায় সুরবালা যৌবনোত্তীর্ণা হইয়া পড়িয়াছে। কমলমণি সরল সরস ও বিশ্বাসে ভরায় না। স্বামীর চরিত্রে সূর্যমুখীর অবিশ্বাসিণী হইবার সংবাদে কমলমণি যে উত্তর

দিয়াছে তাহা তাহার চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশক ; ঐ কয়টি কথায় তাহার রূপটি যেন দেহ পরিগ্রহ করিয়া আমাদের কাছে সহাস্যে সলাস্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া আনন্দবর্ধন করিতে থাকে। 'আমি কমলমণি তর্কসিদ্ধান্ত ব্যবস্থা দিতেছি তুমি দড়ি-কলসী লইয়া জলে ডুবিয়া মরিতে পার। স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না তাহার মরাই ভাল।' এ কথা কমলমণিই কহিতে পারে আর পারিত সুরবালা। এ কথায় যুক্তি নাই আছে কেবল অন্ধ ভক্তি ও ভালবাসা ; কিন্তু এই অন্ধতার মধ্যে আলোক অদ্ভুতভাবে রহস্যাবৃত।

বিষবৃক্ষে কতকগুলি অনাবশ্যক চরিত্র যুক্ত হইয়া পত্রবহুল হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ, হীরা, তারাচরণ ইত্যাদি অনাবশ্যক চরিত্র। যে সব চরিত্র আখ্যায়িকার নায়ক-নায়িকার চরিত্র সৃষ্টি ও পুষ্টিতে কিছুমাত্র সাহায্য করে না তাহারা অনাবশ্যক। সে হিসাবে দেবেন্দ্র, হীরা, তারাচরণ অনাবশ্যক চরিত্র। তদুপরি তাহাদের সাহায্যে যে রসের সঞ্চার হইয়াছে তাহাও পরম উপভোগ্য বলিতে পারি না।

বিষবৃক্ষের একটি মারাত্মক ত্রুটি লেখকের মুখরতা : লেখক বড় বেশি কথা কহিয়াছেন। উপন্যাসে লেখকের কথা বলিবার কিছু স্বাধীনতা আছে স্বীকার করি কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক উপন্যাসে সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়াছেন। কুন্দনন্দিনী যে ফুটিতে পাবে নাই তাহার কারণ যখনই তাহার আবির্ভাব হইয়াছে তাহাকে কথা বলিতে দেওয়া হয় নাই, লেখক বা অন্য কেহ তাহার হইয়া কথা বলিয়াছে, কুন্দনন্দিনীকে হইতে হইয়াছে মূক ও নির্বাক। কুন্দনন্দিনীকে যদি নিজের কথা বলিতে দেওয়া হইত তবে হয়ত তাহার জীবন এমন ব্যর্থ হইত না। সুদক্ষ উকিলও যে ভাল মোকদ্দমা নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে তাহার নিদর্শন কুন্দনন্দিনী চরিত্র।

পরিশেষে বক্তব্য 'বিষবৃক্ষে'র উদ্দেশ্য কি? বিষবৃক্ষ কি? রিপুর প্রাবল্যে সংসারে যে অবাঞ্ছিত ও উৎকট সমস্যার উদ্ভব হয় তাহাই বিষবৃক্ষ। জ্ঞানী, বিদ্বান ব্যক্তিরাও ঘটনাধীন হইয়া রিপুর তাড়নায় বিচলিত হইয়া থাকেন ; কিন্তু মনুষ্যে মনুষ্যে প্রভেদ এই যে, কেহ উচ্ছ্বলিত মনোবৃত্তি সংযত করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি মহাত্মা। কেহ আপন চিত্ত সংযত করে না তাহারই জন্য বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয়। সংসারে বিষবৃক্ষের সম্ভাবনা অলীক নয়। কিন্তু মনে হয় গ্রন্থের ইহাই একমাত্র শিক্ষা নয়। বহু পত্নীকতা যে সংসারে অনাসৃষ্টির কারণ তাহাও বিষবৃক্ষের গৌণ শিক্ষা। বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষিত মন বহু পত্নীকতার বিরোধী হইবার কথা ; মনে হয় কুমারী কুন্দনন্দিনীর সহিত যদি নগেন্দ্রনাথের বিবাহ হইত তাহার ক্রিয়াফলও বিষময় করিয়াই চিত্রিত হইত. এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, বহু-বিবাহের স্বপক্ষে নগেন্দ্রনাথের যুক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের নয়, নায়কের অনুরোধে তাহা করা হইয়াছে, তাহা না করিলে গল্প আকাঙ্ক্ষিত পরিণতি লাভ করিতে পারিত না।

প্রসঙ্গত প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত আলোচনা এখন করিব ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের সমকক্ষ হয়ত কল্পনা করিতে পারি কিন্তু প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি যে একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন জননায়ক ছিলেন তাহার নিদর্শন অসংখ্য উক্তি ও প্রবন্ধে নিবন্ধ। প্রেম ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি প্রণিধানযোগ্য। হরদেব ঘোষালের জবানীতে বঙ্কিমচন্দ্রই বলিতেছেন :— 'রূপবতীর রূপ ভোগ লালসা—ভালবাসা নয়। কিন্তু প্রণয় বা প্রেম কি? প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণসকল যখন বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা পরিগৃহীত হয়, হৃদয় সেই সব গুণে মুগ্ধ হইয়া তদ্প্রতি সমাকৃষ্ট এবং সঞ্চালিত হয় তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল সহৃদয়ত এবং পরিণামে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জন। এ-ই যথার্থ প্রণয়। —আমি ইহাকে ভালবাসা বলি।—ভালবাসাকে কখনও অযত্ন করিবে না ; ভালবাসাতেই একমাত্র নির্মল এবং অবিনশ্বর সুখ। ভালবাসাই মনুষ্যজাতির উন্নতির শেষ উপায়—মনুষ্যমাত্রে পরস্পরে ভালবাসিলে আর মনুষ্যকৃত অশিষ্ট পৃথিবীতে থাকিবে না। উপরি-উদ্ধৃত উক্তিতে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাশীলতার এক বিশিষ্ট দিক আমাদের দৃষ্টিতে পড়িয়া যায়। জগতের সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই মনুষ্য জাতিকে বন্ধুত্বে বা ভালবাসার এক দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাও যে একই পথে প্রসারিত তাহা নূতন করিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিতেছে। এই উক্তি প্রায় একশত বৎসর পূর্বে বাংলাদেশের বাঙালীর মুখেই উচ্চারিত হইয়াছিল। প্রচারকের অভাবে এই উক্তি বিস্তৃতি ও প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। আমরা এমন অপদার্থ যে অনুরূপ উক্তি ভিন্নমুখে হইতে শুনিতে পাইলে বিস্মিত হইয়া ভাবি—কি দৃষ্টি! চিন্তার কি সরল সবল উচ্চতা!

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তির সারল্য ও মাধুর্য পূর্ণ

গ্রহণ করিয়াও বলিতে চাই, ও কেবল কবিতা ও প্রার্থনা। পৃথিবীর মানুষ অমানুষ ছাড়া অর কিছুই নয়। মানুষ কখনও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হইবে না কারণ একের অন্ন-গ্রাসেই অন্যের পুষ্টি। মানুষ সব বুঝিয়াও মারামারি কাটাকাটি করিবে এবং মরিবে কারণ তাহার পশুত্ব তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্বের চেয়ে অধিক বলশালী। অধিকন্তু জগতের ধনসম্পদ যেন সীমাবদ্ধ, একের দারিদ্র্যের উপরেই যেন অপরের সমৃদ্ধি নির্ভরশীল।

পরিশেষে বক্তব্য বিষবৃক্ষ মিলনান্ত উপন্যাস না বিয়োগান্ত? বিয়োগান্ত উপন্যাস নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদে হয় পরিসমাপ্ত। আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য কুন্দনন্দিনী বিষবৃক্ষের নায়িকা নয়, উপ-নায়িকা। নায়িকার জীবনে বিপর্যয় ও সংঘাত সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই হয় উপ-নায়িকার আবির্ভাব। তাই উপ-নায়িকার তিরোভাবে উপন্যাস বিয়োগান্ত হয় না। তবে অবশ্য বলিব বিষবৃক্ষ সর্বতোভাবে মিলনান্ত নয়, যেভাবে মিলনান্ত শকুন্তলা বা দত্তা। শকুন্তলা নাটকে নায়িকার জীবনে সংঘাত সৃষ্টিতে যে উপায় গৃহীত হইয়াছে, সেই সংঘাত নাটকের মিলনান্ত হইবার পথে দুরতিক্রম্য বাধা সৃষ্টি করে না। দত্তা মিলনান্ত উপন্যাসের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু বিষবৃক্ষ মিলনান্ত উপন্যাস হইলেও পরিসমাপ্তিতে কুন্দনন্দিনীর অপঘাত মৃত্যুতে যে কালো ছায়া নায়কের জীবনে বিস্তৃত হইল তাহাতে সূর্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের পুনর্মিলন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে পারে না। মনে হয় নগেন্দ্র ও সূর্যমুখী আর পূর্বের মত একে অন্যকে পরিপূর্ণভাবে ভালবাসিতে পারিবে না। নগেন্দ্র যখন সূর্যমুখীকে আলিঙ্গনে আহ্বান করিবে সূর্যমুখী সেই আহ্বানে সাড়া দিবে সন্দেহ নাই কিন্তু তবু অজ্ঞাতসারে যে চিন্তা সূর্যমুখীর মনোপীড়ার কারণ হইবে তাহা হইল নগেন্দ্রের শুভ্র প্রশস্ত বক্ষ কুন্দর পঙ্কিল স্পর্শে কলঙ্কিত ও সঙ্কুচিত। নগেন্দ্র সূর্য-মুখীকে আলিঙ্গনে পিষ্ট করিতে থাকিলে আর একখানি সুমিষ্ট মুখ তাহার ও সূর্যমুখীর মধ্যে ছায়ারূপে অব-স্থান করিয়া উভয়ের কায়িক মিলনে বাধা সৃষ্টি না করিলেও মানসিক মিলনে মধ্যবর্তিনী হইয়া তাহাদের পূর্ণ মিলনে বাধা সৃষ্টি করিবে বৈ কি। বৈষ্ণব কবি প্রণয়-প্রণয়িনীর মিলনে বস্ত্রকেও বাধাস্বরূপ গণনা করিয়া গিয়াছেন কিন্তু স্মৃতির জ্বালা পুনর্মিলনে যে এক অদৃশ্য বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকে তাহা দুরতিক্রমনীয়। বঙ্কিম-চন্দ্রও এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করিয়া গিয়াছেন—নগেন্দ্র তখন সেই মৃত্যুচ্ছায়ান্ধকার ম্লান মুখমণ্ডলের স্নেহ-প্রফুল্লতা দেখিতেছিলেন। তাহার সেই আধিক্লিষ্ট মুখে মন্দ বিদ্যুন্নিন্দিত যে হাসি তখন দেখিয়াছিলেন নগেন্দ্রের প্রাচীন বয়স পর্যন্ত তাহা হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল। এই উক্তির পরেও কি বলা যায় 'বিষবৃক্ষ' অবিমিশ্র মিলনান্ত উপন্যাস?

সুমাত্রা

চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

আজকের সুমাত্রার অতীত নাম সমুদ্রিকা। বাঙালীদের মতই সুমাত্রার অধিবাসিগণ আদি-অস্ট্রীক পিতৃপুরুষদের উত্তর পুরুষ। ব্রাহ্মী-লিপি হতেই আজকের বাঙলা ও সুমাত্রার লিপি বিবর্তিত হয়েছে। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে সাগরিকা সুমাত্রার সংগে বাঙলার প্রথম সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। আজকের সুমাত্রা ধর্মে মক্কামুখী আর মর্মে বঙ্গমুখী।

রামায়ণের কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডে এবং মহাভারতের বনপর্বে সুমাত্রা দ্বীপের উল্লেখ আছে। চাণক্যের 'অর্থশাস্ত্রে' লিখিত আছে, হলুদ-অগুরু-চন্দনের জন্য সুমাত্রা সুবিখ্যাত। বৌদ্ধ-জাতকে এবং কথা-সরিৎ-সাগরে সুমাত্রা সম্বন্ধে বহু বিবরণ লিখিত আছে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে লিখিত 'মিলিন্দপনহ' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, তাম্রলিপ্তের বণিকগণ বাণিজ্যের জন্য সুমাত্রায় গমনাগমন করতেন। সুমাত্রা বাঙলার অন্যতম প্রাচীন উপনিবেশ। ফরাসী পণ্ডিত ফে'রার মতে খৃষ্টের আবির্ভাবের কয়েকশো বছর আগে সুমাত্রায় আর্য-পূর্ব সনাতন সংস্কৃতি প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছিল।

সুমাত্রা সমুদ্রপথে বাঙলা ও জাপানের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তাই বাঙালী বণিকগণের দ্বারা সুমাত্রায় বহু বিরাট বিরাট বন্দর নির্মিত হয়েছিল। বাঙালী নাবিক ও বণিকগণের কাছ থেকেই সুমাত্রাবাসী শিখেছিল তুলা-চরখা-লাঙলের ব্যবহার। পূর্ব-ভারতীয় জ্যোতিষ গণনা, দিন-মাস-সাল গণনা এবং দূরত্বের পরিমাপক প্রথা সুমাত্রা দ্বীপে প্রচলিত ছিল। প্রাপ্ত বিভিন্ন 'শাসন' হতে প্রমাণ ও প্রতীয়মাণ হয় সুমাত্রায় বাঙলার লিপি ও ভাষা, ধর্ম ও সাহিত্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধি-বিধান পরিপূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করেছিল। লোয়েব সাহেবের মতে সুমাত্রার আদি-অধিবাসী 'বটপ'-জাতি শোনিতে ও সংস্কৃতিতে পূর্ব-ভারতীয় ছিলেন।

তন্ত্র-সাহিত্যে সুমাত্রা সম্বন্ধে বহু সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। বাঙলার তন্ত্র-ধর্মের অশ্বক্রান্তা সম্প্রদায়ের জন্য বাঙলার দিনাজপুর হতে সুমাত্রা দ্বীপ পর্যন্ত সীমা-রেখা সুনির্দিষ্ট ছিল।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের চৈনিক ইতিহাস হতে জানা যায় শ্রীবিজয়কে কেন্দ্র করে সুমাত্রায় হিন্দু-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। সিডিস সাহেবের মতে বিগত শ্রীবিজয়ের বর্তমান নাম পালেম-বংগ। সুমাত্রাবাসী জনৈক বাঙালী মুসলমান ভদ্রলোক একদা আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন—'পরম' শব্দের মালয়নেশিয় প্রতিশব্দ 'পালেম' তাই তিনি মনে করেন, 'পালেমবংগ' শব্দ 'পরম-বংগ' শব্দের রূপান্তর। তিনি অনুমান করেন—রাঢ় ও কলিঙ্গ-বঙ্গের আদি উপনিবেশিকগণ তাঁদের উপনিবেশ সুমাত্রা আদর করে পরম-বঙ্গ নামে অভিহিত করেছিলেন। অতীতের বাঙালীর 'পরম-বঙ্গ' আজ 'পালেম-বংগে' বিবর্তিত হয়েছে।

সুমাত্রার শ্রীবিজয় শিক্ষা ও সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্রভূমি ছিল। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও দ্বীপ হতে জ্ঞান-পিপাসুগণ শ্রীবিজয়ে এসে সমবেত হতেন। ই-চিং নামক জনৈক বিদ্বান সুমাত্রার শ্রীবিজয়ে সুদীর্ঘ সপ্তবর্ষ শিক্ষালাভের জন্য অতিবাহিত করেছিলেন। ই-চিং বর্ণিত বিবরণ হতে জানা যায়—বাঙলার তাম্রলিপ্ত এবং সুমাত্রার শ্রীবিজয়ের মধ্যে নিয়মিতভাবে যাত্রী-জাহাজ ও বাণিজ্য-জাহাজ গমনাগমন করত। আজকের কুক-কোম্পানীর লণ্ডন-কোলকাতা সার্ভিসের মত। ই-চিং সপ্তম শতকে শ্রীবিজয়-তাম্রলিপ্ত সার্ভিসের এক জাহাজে চড়ে সুমাত্রা হতে বাঙলায় আগমন করেছিলেন। তাঁর বর্ণনা হতে প্রতিপন্ন হয়—শ্রীবিজয় হতে তাম্রলিপ্তে জাহাজযোগে যাবার পথে মালয়ের কটাহ (বর্তমান কর্ডার), নুদে (বর্তমান নিকোবর) প্রভৃতি ছিল বিশ্রাম-বন্দর। বিভিন্ন চৈনিক বিবরণ প্রমাণ করে খৃষ্টীয় প্রথম শতক হতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতক অবধি বাঙলা, মালয়, যাভা-সুমাত্রা, আন্নাম-কাম্বোডিয়া, ফিলিপাইন—জাপানের মধ্যে বিবিধপ্রকার আদান-প্রদান বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল, প্রসারিত ছিল।

ধীরে ধীরে শ্রীবিজয় সবিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। অষ্টম-শতকে শ্রীবিজয় শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্য বহু বিস্তৃত হয়ে

পড়েছিল। মালয়-উপদ্বীপ, দ্বীপময়-ভারত, শ্যাম-আনাম, কাম্বোডিয়া-ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করেছিল। সুদীর্ঘ চারশো বছর পর্যন্ত শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্য পূর্ব ও দক্ষিণ-এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র-শক্তি ছিল। শ্রীবিজয়ের শৈলেন্দ্র-সম্রাটগণ আদিতে কলিঙ্গ-বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের এক স্মারক হতে প্রমাণিত হয় সুমাত্রার শৈলেন্দ্র সম্রাটের আদেশে 'মধ্য-যাভার 'কলাসন' মন্দিরের সন্নিকটে 'তারা-মন্দির' নির্মিত হয়েছিল। সুমাত্রার শৈলেন্দ্র-সম্রাটের প্রতিনিধিদের দ্বারা তখন যাভা-মালয়-কাম্বোডিয়া প্রভৃতি জনপদ শাসিত হত। স্মারকখানি দাক্ষিণাত্যের পল্লব-লিপিতে লিখিত নয়—পাল যুগের বঙ্গ লিপিতে লিখিত। ডাঃ বিজন চাটুজ্জের মতে খৃষ্টীয় অষ্টম শতক হতে দ্বীপময়-ভারত, মালয়-উপদ্বীপ, সমগ্র হিন্দু-চীন শিল্পে-স্থাপত্যে, ধর্মবোধে-আধ্যাত্মিকতায় সম্পূর্ণভাবে বাঙলার পাল যুগের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। সত্য সন্ধানী অধ্যাপক—ক্রোম মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন—গৌড়কে কেন্দ্র করে বাঙলার পাল সম্রাটগণ শুধু সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন করেন নি, নালন্দাকে কেন্দ্র করে তিব্বত হ'তে সিংহল, বর্মা হতে কাম্বোডিয়া, সিংহল হতে ফিলিপাইন পর্যন্ত সুবিশাল এশিয়ার শিল্প-স্থাপত্য, ধর্মবোধ-আধ্যাত্মিকতা শোধন করেছেন, সুন্দর করেছেন।

অষ্টম শতকে লিখিত 'মঞ্জুশ্রী মূল কল্প' হতে জ্ঞাত হওয়া যায় কারমারাঙা দ্বীপ (যেখান থেকে আমরা কামরাঙা পেয়েছি), বারোন দ্বীপ (সুমাত্রার অংশ বিশেষ যেখান থেকে আমরা নারকেল পেয়েছি), নুদে দ্বীপ (বর্তমান নিকোবর) বালি দ্বীপ, যবদ্বীপ (যেখান থেকে আমরা আজো বার্লি পাই) প্রভৃতি জনপদের ভাষায় অত্যধিক 'র' অক্ষরের ব্যবহার। মঞ্জুশ্রী মূল কল্পে লিপিবদ্ধ বিভিন্ন দ্বীপের বিবরণ হতে প্রতীয়মান হয় তাম্রলিপ্তের বাঙালী বণিকগণের সংগে বর্ণিত দ্বীপবাসীদের বিবিধ আদান-প্রদান প্রচলিত ছিল।

নবম শতকের নালন্দায় প্রাপ্ত বাঙলার নৃপতি—কুলরবি দেব পাল দেবের এক তাম্র শাসন হতে জানা যায়—সুমাত্রা-সম্রাট বালপুত্র দেবের অনুরোধে নালন্দায় এক বৌদ্ধ-বিহার নির্মাণের জন্য গৌড়পতি পঞ্চগ্রাম প্রদান করেছিলেন। 'শাসনে' লিপিবদ্ধ আছে বালপুত্র দেবের মাতার নাম তারাদেবী, এবং মাতামহের নাম চন্দ্রবংশ কুল তিলক 'ধর্ম সেতুদেব'। তারাদেবী শৈলেন্দ্র-সম্রাট সমরাগ্রবীরের সম্রাজ্ঞী। ডাঃ সাটের হামের মতে সুমাত্রা-সম্রাট 'বালপুত্র-দেবের' মাতার নাম তারাদেবী এবং পিতার নাম 'সমরাগ্রবীর'। যাভার 'কলাসন' মন্দিরের স্মারক হতে প্রমাণিত হয় সম্রাট 'সমরাগ্রবীর' সম্রাজ্ঞী তারার স্মৃতি রক্ষার জন্য কলাসন মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। 'কলাসন' ও কেলুরক মন্দিরের শিলালিপি হতে এবং নালন্দায় প্রাপ্ত স্মারক হতে স্বীকৃত হয় বালপুত্রের মাতা সমরাগ্রবীরের বণিতা তারা-দেবী সম্রাট ধর্মসেতুর দুহিতা। ডাঃ সাটের হামের দৃঢ় অভিমত তারাদেবীর পিতৃদেব ধর্মসেতু এবং গৌড়ের সম্রাট ধর্মপালদেব অভিন্ন ব্যক্তি। গৌড় ও শ্রীবিজয়ের মধ্যে বৈবাহিক শুভ সম্বন্ধ স্থাপনের ফলেই বাঙলার মহাযান ও তন্ত্রযানের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ জীবনবাদ দ্বীপময় ভারতে, মালয়-উপদ্বীপে, পূর্ব-ভারতীয় উপদ্বীপে বিস্তার লাভ করেছিল। সম্রাট পনংকরণ যাভার অধিবাসী ছিলেন না, তিনি ছিলেন সুমাত্রার শৈলেন্দ্র-বংশের সুসন্তান। সুমাত্রার শৈলেন্দ্র বংশ সুরুতে কলিঙ্গ-বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। ডাঃ সাটের হামের মতে বাঙলার ধর্মপাল দেব সুমাত্রার 'সমরাগ্রবীরের' শুধু শ্বশুর নয়—ধর্মগুরুও।

দশম শতকের আরবীয় বিবরণ হতে জানা যায় হিন্দু-সুমাত্রার বণিকগণ দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার 'সোফালা' পর্যন্ত বাণিজ্যের পণ্য গমনাগমন করতেন এবং সুমাত্রার দরবারে বহু নিগ্রো দেহরক্ষী নিযুক্ত ছিল। পোর্টুগীজ বিবরণ হতেও সুমাত্রার বণিক ও নাবিকগণের মাদাগাস্কার দ্বীপে গমনাগমন স্বীকৃত হয়। আরব পোর্টুগীজ বিবরণ হতে এবং মাদাগাস্কার দ্বীপের ভাষায় সুমাত্রা দ্বীপের ভাষার প্রভাব প্রত্যক্ষ করে পন্ডিত গেবরিল ফেরান্ড উপসংহারে এসেছেন—খৃষ্টীয় প্রথম শতক হতে খৃষ্টীয় দশম শতক পর্যন্ত মাদাগাস্কার হিন্দু-সভ্যতার পীঠভূমি ছিল। এই প্রসংগে বলা অবাস্তব হবে না—বর্তমান মাদাগাস্কারের বিগত নাম 'মহাসেনা'। আজকের ফরাসীর মাদাগাস্কার অতীতে ছিল সুমাত্রার।

গৌড়-গৌরব নালন্দার ধর্মগুরু 'ধর্ম কীর্তি' তাঁর পবিত্র জীবনের শেষ অধ্যায় সুমাত্রার শ্রীবিজয়ে অতিবাহিত করেছিলেন। মহাজ্ঞানী ধর্মকীর্তির সুমাত্রায় অবস্থানের ফলে শ্রীবিজয় বৌদ্ধ সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছিল। মহাজ্ঞানী ধর্মকীর্তি সমসাময়িক বৌদ্ধ-জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্ডিত ছিলেন। শরৎচন্দ্র দাস মহাশয়ের **Indian Pandits in Tibet** নামক পুস্তকের মাধ্যমে ত্রয়োদশ শতকের বাঙালী 'কল্যাণ মিত্রের' তিব্বতী রচনা হতে জানা যায় একাদশ শতকে বাঙলার মহাজ্ঞানী ও মহা-ধার্মিক অতীশ দীপংকর পরমপন্ডিত ধর্মকীর্তির কাছে সুশিক্ষা

লাভের জন্য সুমাত্রার শ্রীবিজয়ে গমন করেছিলেন। একাদশ শতকের এক নেপালী স্থাপত্যে লিখিত আছে—'সুবর্ণদ্বীপে'—দীপংকর, অপর আরেক স্থানে লিপিবন্ধ আছে—সুবর্ণদ্বীপের শ্রীবিজয়পুর। তিব্বতী রচনা ও নেপালী স্থাপত্য হতে প্রমাণিত হয় বাঙলার মাধ্যমে দ্বীপময় ভারতের কথা তিব্বতী ও নেপালীদের অজ্ঞাত ছিল না। অধ্যাপক কের্ণ বলেন—সুমাত্রার সংগে বাঙলার নিকট-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল বাঙলার পাল-সম্রাটগণের সহায়তায় ও সহযোগিতায়। পাল-সম্রাটগণের পৌরোহিত্যে মহাযান ও তন্ত্রযানের যে সমন্বয় বাঙলায় সম্ভব হয়েছিল তারই প্রবল প্লাবনে তিব্বত হতে সুমাত্রা, মালয় হতে কাম্বোডিয়া, সিংহল হতে ফিলিপাইন পর্যন্ত প্লাবিত হয়েছিল। আজো অর্ধ-এশিয়ার আধ্যাত্মিকতার দীক্ষাগুরু বাঙালী। তিব্বত হতে সিংহলে, শ্যাম হতে কাম্বোডিয়ায়, বালি হতে জাপানে যে আধ্যাত্মিকতা প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত তা মহাযান ও তন্ত্রযানবাদের সমন্বয়ে এক সুন্দর জীবনবাদ। বেদ-বিরোধী মূর্তি-পূজারী মাতৃ-সাধক—বাঙালীর কালি-তারা-জগদ্ধাত্রী, ষষ্ঠী-শীতলা প্রভৃতি দেবীগণ আজো জাপান পর্যন্ত আরাধনার জন।

দ্বাদশ শতকের সোমদেব রচিত 'কথাচরিৎসাগরে' লিপিবন্ধ আছে সুবর্ণভূমির নারকেল, কর্পূর, কাটা প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের সংগে তাম্রলিপ্তের বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। কথাসরিৎসাগর দ্বাদশ শতকে লিখিত হলেও 'কথাচরিৎসাগরের' উৎস 'গুণধ্যায়ের ব্রত-কথা'।

ত্রয়োদশ শতকে 'হে-যুকা' নামক এক চীনা শুল্ক বিভাগের পদস্থ কর্মচারীর লিখিত বিবরণ হতে সুমাত্রার শ্রীবিজয়-রাষ্ট্রের সম্বন্ধে বহু সংবাদ সংগ্রহ করা যায়। হে-যুকার বিবরণে লিপিবন্ধ আছে—সুমাত্রাবাসী জলে ও স্থলে সুদক্ষ যোদ্ধা। মৃত্যুকে অবজ্ঞা করতে ও শত্রুকে আতংকিত করতে তাদের জুড়ি জগতে নেই। রাজকার্যে শৈলেন্দ্র-সম্রাটগণ বিদেশী ভাষা ব্যবহার করেন। (হয়তো পালযুগে প্রচলিত বাঙলা ভাষাকে চৈনিক হে-যুকা বিদেশী ভাষায় অভিহিত করেছেন) শ্রীবিজয় রাষ্ট্রের আইন খুবই সুকঠোর। সুনীতি ও সুরীতি বিরোধী কর্মে মৃত্যুদণ্ড অপরিহার্য। সম্রাটের মৃত্যুতে জনগণ অশৌচ পালন করেন এবং মস্তক মুণ্ডন করেন। মৃত সম্রাটের অনুগত অনুচরেরা সম্রাটের জ্বলন্ত চিতায় স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেন। এই প্রথাকে বলা হয় একসংগে বেঁচে থাকা ও মরে যাওয়া। সম্রাট সর্প-সুত পদবী ব্যবহার করেন। কাম্বোডিয়ায়ও প্রবাদ প্রচলিত কোন নাগিনী হতেই রাজবংশের সুরু হয়েছিল, সুমাত্রা বিভিন্ন দেশ ও দ্বীপের সংগে বাণিজ্য বিনিময় করত—কর্পূর, চন্দন, মণিমুক্তা, ধূপ, হস্তীদন্ত, সুতীবস্ত্র গোলাপজল, কৃপাণ, কুঠার, বৃক্ষ-বল্কল, কচ্ছপের চাড়া। শ্রীবিজয় রাষ্ট্র লৌহ-আবেষ্টনীর দ্বার প্রণালীর মুখ শাসন ও সংরক্ষণ করত এবং বিদেশী জাহাজের গমনাগমন নিয়ন্ত্রণ করত। শ্রীবিজয় বিশ্ববিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল।

হে-যুকার অল্পকাল পরেই শৈলেন্দ্র সম্রাট চন্দ্রবাহু সিংহল আক্রমণ করে পরাজিত হয়েছিলেন। তারপর সুমাত্রায় শৈলেন্দ্র শাসনের বিলুপ্তি ঘটে। ত্রয়োদশ শতকে শৈলেন্দ্র বংশের পতনের পরে সুমাত্রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত সুমাত্রা বিভিন্ন বৌদ্ধ রাজাদের অধীনস্থ ছিল। প্রায় দু' হাজার বছর ধরে বাঙলা ও সুমাত্রার মধ্যে ধর্মের-শিল্পের-বাণিজ্যের বহুবার বহুবিধ আদান-প্রদান ঘটেছে।

সুমাত্রায় প্রথমে হিন্দুধর্ম এবং পরে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। সুমাত্রা দু' হাজার বছর ধরে পূর্ব-ভারতের সর্বপ্রকার প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। সুমাত্রার শিল্প-স্থাপত্যে, ধর্মবোধে-আধ্যাত্মিকতায় দক্ষিণ-ভারতের প্রভাব সাময়িক ও সামান্য। ব্রোঞ্জের ও পাথরের শিব ও বিষ্ণু, বুদ্ধ ও মৈত্রেয়ের বহু সুন্দর সুন্দর মূর্তি সুমাত্রায় আবিষ্কৃত হয়েছে। সুমাত্রার শিল্পে ও ভাস্কর্যে বাঙলার পাহাড়পুর হতে পাল যুগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সাগরিকা সুমাত্রা সুদীর্ঘকাল বাঙালীর সাধনার, সভ্যতার, সংস্কৃতির গ্রাহক ও পরিবেশক ছিল।

আলোচনী

শশীদা

শ্রীঅবনীনাথ রায়

প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। আমি তখন দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি কলেজে আই-এ ক্লাসের ছাত্র। এই কলেজটি এখন পাকিস্থানে গেছে, এর বর্তমান রূপ দেখে সেকালের কলেজের ধারণা করা যাবে না। স্বর্গীয় ব্রজলাল শাস্ত্রী কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল ছিলেন—তিনি সনাতন হিন্দু ধর্মের আনুষ্ঠানিক নিষ্ঠার ভিত্তিতে একদা এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

গবর্ণমেণ্ট বিল্ডিং নাম দিয়ে একটা হোষ্টেল ছিল। সেই ছাত্রাবাসের আমরা অধিবাসী ছিলাম। একদিন দেখি হষ্টেলের একজন নতুন সুপারিন্টেন্ডেণ্ট এসেছেন—যতদূর শীর্ণতার কল্পনা করা যায় ততদূর শীর্ণ চেহারা, সামনের দাঁত পড়ে গেছে কিন্তু গায়ের রং পরম গৌরবর্ণ। চেহারা দেখে বিশিষ্ট ব'লে বোধ করার কোন উপায় নেই—সুতরাং মনে মনে যে শ্রদ্ধার উদয় হ'ল না বা তাঁর প্রতি কোন আকর্ষণ অনুভব করলাম না তা এখনো স্মরণ আছে।

কয়েকদিন যেতে না যেতেই দেখলাম ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেছে। সকলেই কর্মচঞ্চল—নতুন সুপারিন্টেন্ডেণ্ট ছাত্রদের ডেকে অযাচিতভাবে তাদের সঙ্গে আলাপ করছেন, বিকালের দিকে একটা ইংরাজি পড়ানোর ক্লাসও হয়েছে, আর সন্ধ্যার পূর্বে কোদাল দিয়ে মাটি কোপানোর একটা আয়োজন হয়েছে যাতে ছাত্রবাসের সব বা অধিকাংশ ছাত্রই যোগ দিতে পারে। মোট কথা মনে হ'ল ছাত্রজীবনের বাঁধা রুটিনের জীবন কোথায় যেন ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠেছে। নতুন সুপারিন্টেন্ডেণ্ট সম্বন্ধে কৌতূহল অনুভব করলাম। শুনলাম তাঁর নাম শশীভূষণ রায় চৌধুরী, দৌলতপুর কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বর্গীয় কামাখ্যাচরণ নাগ মহাশয়ও নাকি তাঁর ছাত্র শুধু কামাখ্যাবাবু নন, বহু কলেজের বহু নামজাদা অধ্যক্ষ, অধ্যাপক এবং বহু প্রতিষ্ঠাবান দেশকর্মী তাঁর হাতেগড়া মানুষ। বলা বাহুল্য মনে সম্ভ্রমের সঞ্চার হ'ল। ইতিমধ্যেই শশীভূষণ বাবু ছাত্রদের শশীদা হয়ে গেছেন। তাঁর ইংরাজি পড়ানোর ক্লাসে যোগ দিলাম। ইংরাজির বিশুদ্ধ উচ্চারণ শেখানো শশীদার একটি বিশেষত্ব ছিল। মাটি কোপানোর দলেও ক্রমশ জুটে পড়লাম। ছাত্রদের শরীর এবং মন দুটোরই খোরাক জোগানো এবং ছাত্রদের নিকট সম্পর্কে আসার এই সব রীতি ছিল শশীদার কৌশল। আর তিনি সকলের "শশীদা" হওয়ার ফলে পরস্পরের এমন একটা প্রীতির এবং সৌহার্দ্দের সম্পর্ক স্থাপিত হল যে শশীদার কাছে যখন তখন এগিয়ে যাওয়ার কোন বাধাই কোনখানে রইল না। শুধু যে শশীদার দিকে এগিয়ে যাওয়ারই সুবিধা হ'ল তাই নয়—যারা তাঁকে শশীদা বলে তাদের পরস্পরের মধ্যেও একটা নিবিড় বন্ধুত্বের সৃষ্টি হ'ল যেটি মনে হয় কালের ব্যবধানেও আজো অম্লান আছে।

কিছুদিন পরে শশীদা এক অপরাহ্ণে কলেজের ক্লাস শেষ হওয়ার পরে আমাকে ডেকে পাঠালেন। দৌলতপুর কলেজ থেকে খুলনার দিকে যে রেল লাইন চলে গেছে তাই দিয়ে আমরা হেঁটে চল্‌লাম। সঙ্গে আর কেউ নেই। অনেক দূর গিয়ে তিনি বস্‌লেন। আমিও তাঁর কাছে বসলে আমাকে আমার স্কুল-জীবনের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করলেন। বিশেষ ক'রে তাঁর জিজ্ঞাস্য ছিল নৈতিক জীবনের দিকটা—কোন পদস্খলন কিংবা ত্রুটির কাহিনী। আমি তখন বিবাহিত। আমার শ্বশুরবাড়ী আবার দৌলতপুর কলেজের অনতিদূরে—এক মাইলের একটু উপরে। স্ত্রীও তখন পিত্রালয়ে। শশীদা আমার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া পছন্দ করেন না বল্‌লেন। এ বিষয়ে আমাকে বেশি সাবধান করার প্রয়োজন ছিল না। তার কারণ শশীদার নিকট সম্পর্কে আসারও আগে আমরা আমাদের গ্রামে একজন পলাতক বোমার আসামীর নিকট সম্পর্কে এসেছিলুম। তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন পাতঞ্জলির মন্ত্র, মরণং বিন্দুপাতেন, জীবনং বিন্দুধারণাৎ। সুতরাং ছাত্র-জীবনের কর্তব্যটা আমার দৃষ্টিপথে ছিল। শশীদাও ঐ মন্ত্রের পুনরুক্তি করলেন। এই কথাটি বিশেষ ক'রে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে বর্তমান যুগে আর এই আদর্শের কথা শুনতে পাইনে। এখন যেন সমাজ-জীবনে একটা

আদেখ্‌লের মত ভাব এসেছে—কোনগতিকে লুটে পুটে ভোগ করতে পারাটাই যেন চরম বাহাদুরি। ত্যাগের—অন্তত প্রতীক্ষা করার—কোন আদর্শও যেন কোনখানে বেঁচে নেই। ফলে আমাদের বর্তমান যুবসম্প্রদায় যে স্বাস্থ্যবিহীন, মস্তিষ্কবিহীন এক জবুস্থবু মনুষ্যমূর্তিতে পর্যবসিত হবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

শশীদার প্রেরণায় আমরা দৌলতপুর কলেজ থেকে দল বেঁধে অজয় নদের প্লাবনে যখন দেশ ভেসে গিয়েছিল তখন রিলিফ ওয়ার্ক করতে বর্ধমানের নিকট ভেদিয়ায় গিয়েছিলাম। কলেজ হস্টেলের ছাত্রদের কেউ অসুস্থ হ'লে তার সেবা শুশ্রূষা করা, ডিউটি ক'রে রাত জাগা, মলমূত্র পরিষ্কার করা প্রভৃতি আমাদের শিখিয়েছিলেন। শনিবার মঙ্গলবার দৌলতপুরে হাট বস্‌তো। এক শনিবার হাটের ফেরত পথে একজন মুচি কলেরায় আক্রান্ত হ'ল। বর্তমান "ফরওয়ার্ড" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার তাকে কাঁধে ক'রে কলেজে নিয়ে এলেন। মল এবং বমিতে তাঁর কাঁধ ভেসে গেল। ডাঃ যুগলকিশোর আঢ্য তখন আমাদের কলেজের ডাক্তার এবং বোট্যানির অধ্যাপক। তিনি সমস্ত রাত্রি ধরে ইঞ্জেক্‌শন দিলেন কিন্তু বাঁচাতে পারলেন না। তার মৃত্যু হ'লে একেবারে তাকে কবর দিয়ে ভূপেন্দ্রকুমার হস্টেলে ফিরে এলেন। এই ঘটনা এখানে বিবৃত করার উদ্দেশ্য এই যে মানুষকে এমন ক'রে নির্বিচারে সেবা করার আদর্শ আমাদের দৌলতপুর কলেজে দিয়েছিলেন শশীদা, গণিতের অধ্যাপক স্বর্গগত মণীন্দ্রনাথ শেঠ এবং ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ।

একবার পূজার ছুটিতে কলেজবন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শশীদার বাড়ি তেঘরায় গিয়েছিলাম মনে আছে। রাত্রির ট্রেণে আমরা গিয়েছিলাম। তার কয়েকদিন আগেই নেতাজী সুভাসচন্দ্র দৌলতপুর কলেজে একদিনের জন্য (বরঞ্চ একরাত্রের জন্য বলাই সঙ্গত) এসেছিলেন। তেঘরেতে শশীদার ২।৩ খানি মাটির ঘর ছিল। তখন তাঁর দাদা বেঁচে ছিলেন এবং একখানি ঘরে তিনি থাকতেন। তাঁর দাদা পরে ১৪নং মিরজাফর লেনে ডাঃ বিজিতেন্দ্র বসুর (পরে কর্নেল বি বাসু আই, এম্‌, এস্‌) বাসায় মারা যান। এই তেঘরেতে শশীদা সর্বপ্রথম শ্রমিকদের জন্য রাত্রির স্কুল স্থাপন করেন। গরীব শ্রমিকদের দুঃখে তাঁর প্রাণ কেঁদেছিল। তারা দিনের বেলা সময় পায় না—তাই রাত্রে তারা পড়ুক—শিক্ষার সুযোগ সুবিধা তারা লাভ করুক—এই ব্যবস্থা করার জন্য Workingmen's Institute নাম দিয়ে তিনি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং তিনি নিজে তার প্রথম শিক্ষক হন। এই বিদ্যালয়ের ইতিহাস ইতিপূর্বে অনেকে বিবৃত করেছেন এই কথাটা এখানে স্মরণ রাখলেই যথেষ্ট হবে যে শশীদা যখন শ্রমিকদের দুঃখের কথা ভেবেছিলেন তখন শ্রমিক আন্দোলনের যুগ ছিল না। সেটা বিংশ শতাব্দীর সুরু হওয়ার সময়কার কথা। যে শ্রমিক আন্দোলনের ঢেউ পরে উত্থিত হবে তারি পূর্বাভাষ এই মহামানবের চরিত্রে দেখতে পাই।

শশীদার চরিত্রের পূর্ণাবয়ব আলেখ্য দেওয়া সম্ভব নয় তাঁদের কাছে যাঁরা তাঁর সংস্রবে না এসেছেন। এর কারণ তাঁর জীবনে চোখ ধাঁধানো (Spectacular) কিছু ছিল না বা ঘটে নি। তিনি নিজেকে সর্বদা নেপথ্যেই রেখেছেন। কিন্তু ভগবানকে যেমন চোখে দেখা না গেলেও তিনি সর্বত্র এবং সর্বদা বর্তমান আছেন, শশীদা তেমনি আমাদের দেশের অনেক নেতাদের জীবনে ছিলেন এবং বরাবর থাকবেন। শশীদার স্থান বীজরূপে—সেই বীজ অঙ্কুরিত হ'য়ে রূপায়িত হয়েছে অন্য জীবনে। বীজাকারে যাঁরা থাকেন তাঁরা চিরকালের নমস্য।

কণিকা

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

১

বন্ধু যদি শানায় ছুরি
শত্রু কে আর তবে?—
তেমন লোকের তবুও গলায়
ঝুল্‌তে কি হে হ'বে!!

২

দীপশিখা কাহারেও পুড়োতে না যায়,
মৃত্যুপণ পতঙ্গই কাছে তা'র ধায়
দোকানে থেকেই সুরা সহজে বিকায়,
লোকেই গলায় ঢালি' ধূলায় গড়ায়।

কলিকাতার পৌর প্রতিষ্ঠান ও কলিকাতাবাসী

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জগতের অন্যতম প্রধান নগরী কলিকাতাকে যদি কেহ নোংরা সহর বলিয়া অভিহিত করেন, তবে কি তাহা অন্যায় হবে—এই প্রশ্নটা কাহারও কাহারও মনে নিশ্চয় উঠিয়া থাকে। কেন,—এই কথার সহিত জড়িত আছে সোজা সত্য কথা,—জনকয়েক ধনী ব্যক্তির সুবিধার জন্য সমগ্র সমাজের মানুষের স্বার্থবলি। এই দিন ছিল, এবং তাহারই ফলে আজ এই দুর্দশা। দিন বদলাইয়াছে, কিন্তু সেই নোংরা সহর কলিকাতা আজও কি তাই থাকিবে? আজও কি জন কয়েকের স্বার্থের চক্রে লক্ষ লক্ষ কলিকাতাবাসী সেই নোংরামিরই অনুসরণ করিবে? একটা সামঞ্জস্য (adjustment) অন্ততঃ হউক, ইহা কি কাম্য নয়?

এই কলিকাতার নোংরাবস্থার প্রধান সহায়ক হইল—ধোঁয়া—Smoke nuisance. অবাক হইয়া ভাবি—সহরের মধ্যে, যেখানে মানুষ বাস করে সেই সব স্থানে কি করিয়া গ্যাস কোম্পানী, তেলের কল, নানারকমের কল-কারখানা প্রভৃতি নির্মাণকার্যে কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান অনুমতি দিয়াছিলেন! এটা তো অতি সাধারণ বুদ্ধির কথা যে জনস্বাস্থ্যের খাতিরে কখনো এই সব কল-কারখানা বসতিপূর্ণ স্থানে হইতে পারে না। হয়ত যখন এই সব তৈরী হয় তখন জনবিরল স্থানেই নির্মিত হয়, কিন্তু কাউন্সিলারদের কি কলিকাতার বিস্তার সম্বন্ধে কোন দূরদৃষ্টিই ছিল না? আজ যে যক্ষ্মা প্রভৃতি মারাত্মক ব্যারাম এইসব স্থানে তাহাদের রাজ্য স্থাপন করিয়া চলিয়াছে তাহার ব্যবস্থা কি? তারা রাজ্য স্থাপনেই সুখী নয়, রাজ্য বিস্তারেও একই রকম আগ্রহশীল। চিকিৎসা করিয়া এই সব ব্যাধি সারাইবার জন্য অনেক কথাই শুনি, কিন্তু গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালার মত ব্যবস্থা নয় কি এই সব? অথচ ইহারই জন্য কত না আয়োজন!! ধোঁয়া তো আটকান যায়, তার চেষ্টা কই? বিজ্ঞানের দোহাই সব সময় দিই, অথচ বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়া যে এই সব সর্বনাশা শত্রুর গ্রাস হইতে রেহাই পাওয়া যায় তাহা তো পৌর প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের জানা এবং ভাবা উচিত। দেশে বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানী তো আছেন, কই তাহাদের সাহায্য নেওয়া কি উচিত নয়? আমাদের তো মনে হয় সত্যকারের উপকার করা কর্তৃপক্ষের মনোগত ভাব নয়। তাই যদি হয়, তবে একটু হৃদয় দিয়া বিচার করিলে সমাজের অশেষ উন্নতি হয়। কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান তো কোন ব্যক্তি বিশেষের বা বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের নয় যে শুধু উপকার করিলে ঐ লোকদের টাকাই খরচ হইবে? খরচ তো হইবে করদাতার টাকা। উপকার করার কথা বলিলেই উপকার হয় না, চাই উপকার করার স্পৃহা, আগ্রহ। নির্বাচনের সময় দেখা যায় যে প্রতিটী প্রার্থী শুধু পরের সেবায়, পরের উপকারের জন্যই তাহাদের ধন মন প্রাণ উৎসর্গ করিতে উদ্যত, অন্ততঃ ইহাই তো প্রচার করা হয়।

তার পর সব ফুসফাস হয় কেন? বক্তৃতা এবং কাজের এই অসামঞ্জস্য কেন? তবে কি নির্বাচনী প্রচারের কোন সত্যতা নাই? সবার বেলায় এই কথা সাজে না একথা সত্য। কিন্তু কাহারও কাহারও বেলায় খাটে, কেন? করদাতারা কি এই প্রশ্ন করিয়া তাহার বিধান করিতে পারেন না? আমাদের মতে পারেন, যদি তারা শুধু জানেন যে কর, করদাতা, কর গ্রহীতার অর্থ কি? আশা করি এইবারের যাঁহারা কাউন্সিলার হইয়াছেন, তাঁহারা প্রমাণ করিবেন যে তাঁহারা যাহা ভোটারদের বলিয়াছেন তাহা কার্যে পরিণত করিবেন। নহিলে লোকে তাঁহাদের অবিশ্বাস করিবে, তাঁহাদের পদমর্যাদার হানি হইবে, তাঁহাদের ব্যক্তিত্বে সন্দিহান হইবে। দেশের শাসকবর্গ ও কাউন্সিলারবৃন্দ পরীক্ষার সম্মুখীন। দেখা যাক্ এখনও এই বর্তমান (modern) যুগে তাঁহারা কি সেই জনকয়েকের সুবিধার জন্যই পৌর শাসন করেন, না সমস্ত কলিকাতাবাসীর সুবিধার জন্যই শাসন করেন।

লক্ষ লক্ষ চুল্লী আছে জানি। Smokeless Chimney (ধূম্রহীন চিম্‌নী) ব্যবহার করিতে বাধ্য করা হউক, সময়দিয়া পুরাতন চুল্লী বদলান হউক। কেহই আপত্তি করিবে না। এই ব্যবস্থা হইলে নতুন একটা শিল্প (Industry) গড়িয়া উঠিতে পারে।

কলিকাতা সত্যই নোংরা থাকুক—এই কি ছিল সেকালের কর্তৃপক্ষের অভিপ্রায়? একটু নজর দিলেই দেখা যায় সেটা ছিল অন্য রকম। ধরুন মাণিকতলা খাল। এটা কি কলিকাতাকে নোংরা করার জন্য আছে? এই খালের যদি সদ্ব্যবহার করা যায় তবে আমরা কি কি পাই, কলিকাতা-

বাসী বা দেশবাসী কি তাহা ভাবিয়া থাকেন? সরকারী এবং আধাসরকারী অব্যবস্থার জন্য আজ এই খাল একটা জঞ্জাল মাত্র। অব্যবস্থা কি চিরস্থায়ী? তবে আর অগ্রগতির অর্থ কি?

প্রসঙ্গতঃ মাণিকতলার খাল সম্পর্কেই উদাহরণ টানা যাউক। এই খালের সদ্ব্যবহার করিতে বিশেষ কিছু অর্থ ব্যয় হয় না, দরকার শুধু সৎকাজ করার আগ্রহ, উদ্যম। শুধু পৌর প্রতিষ্ঠান বা সরকারকে গালাগালি দিলে, বা তাদের দোষ দিলে সহরবাসীর কর্তব্য শেষ হয় না। তাঁদের যে এই খালটা স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের দিক দিয়া প্রয়োজন তাঁহারা তো বলেন না। যদি তাহাদের দরকার হয় তবে সরকার বা পৌর প্রতিষ্ঠান তাহা করিবেন না, ইহা ভাবা তো যায় না। প্রয়োজনের তাগিদে যদি মানুষ যে কোন কাজ করে, তবে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের উপকার হয়, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, সৌন্দর্যের বৃদ্ধি হয় সে তাগিদ নাই কেন? এগুলি প্রয়োজন নয়? দোষ তো কর্তৃপক্ষেরই নয়, দোষ তো করদাতাদেরও। খালের উন্নতির সহিত কতগুলি aquatic club হইতে পারে এই চারি মাইলব্যাপী খালে, চমৎকার বেড়াইবার যায়গা হয় দুই পার ধরিয়া, মাছ চাষের ব্যবস্থা তো সহজ কথা। সর্বোপরি ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রথম অধ্যায়ের একটা অংশ এখানে অনায়াসে আরম্ভ করা যায়।

খণ্ডিত ভারতে এমন কোন নদী নাই যেখানে বছরের ১২ মাস গভীর জল থাকে একমাত্র ভাগীরথী ছাড়া। সেই ভাগীরথীতে Naval training-এর (নৌ শিক্ষা) মহা অসুবিধা রহিয়াছে কলিকাতা বন্দরের গতায়াতকারী জাহাজ, নৌকা প্রভৃতির জন্য। এই মাণিকতলা খালটী অত্যন্ত প্রশস্ত। জল ইচ্ছামত সেখানে আটকাইয়া রাখা যায় কাজের জন্য। সেখানে অনায়াসে নৌশিক্ষা বা Naval Training দেওয়া যায়। বঙ্গোপসাগর অথবা আরব্য সাগর এই Practice বা চর্চার জন্য কি প্রথম হইতেই উপযুক্ত? একটু সাহস বাড়িলে তারপর সে সব কাজ হইতে পারে ভাল। Naval authorities বা নৌ বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ইহা ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

বস্তির কদর্যতার কথা না বলাই ভাল। বর্তমানে ইহার সংস্কার-এর চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু সে কি আসল সংস্কার বলিয়া মনে হয়? বর্তমান ব্যবস্থাকে স্বীকার করিয়া এই সংস্কার মূল্যহীন। উৎসাহ একটু স্তিমিত হইলেই যে আঁধার সেই আঁধারই হইতে বাধ্য। অভিজ্ঞতায় তাহাই বলে, শুধু শুনিতে কেমন যেন। সত্য অস্বীকার আর কতকাল! বস্তি উন্নতির প্রধান সহায়ক হইবে কঠোর অমোঘ আইন বস্তী-মালিকের জন্য, তাঁহাদের তাহা মানিতেই হইবে। আইনের ফাঁক দিয়া যেন তাঁহারা বাহিরে যাইতে না পারেন, উন্নতি করিয়া বাহিরে যান, আপত্তি নাই। দেবোত্তর এবং ওয়াক্‌ফ্‌ এর সম্পত্তি কতগুলি বস্তি আছে। সেগুলির ব্যবস্থা তো সহজ। শুষ্ঠুভাবে আয়ের পথ হইবে এবং সেই আয় হইতে দানের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, ইহাতে কোন অছি অরাজী হইতে পারেন না। চেষ্টা হইয়াছে কি সেই সব দিক দিয়া?

শুধু করপোরেশন বা সরকারকে গালি দিয়াই যদি কার্যোদ্ধার হইত, তবে এই কলিকাতা আজ ইন্দ্রপুরী হইত। যাঁহারা গালাগালি দেন তাঁহারা কি করেন? রাস্তার উপর নোংরা, আম, কলার খোলা, উনুনের ছাই, পাখী, ইঁদুর, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতির মৃত দেহ, পানের পিক্‌, আরও কত কি নির্বিচারে ফেলেন তাহার কি ইয়ত্তা আছে? তারা মনে করেন "আমাদের বাড়ী তো পরিষ্কার হইল"। ভাবেন না যে অপরের অনিষ্ট হইল। এই মনোভাবের কি হইবে। যদি ইহার উন্নতি না হয় যদি "প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" না জানি বা শিখি, তবে কাহারও সাধ্য নাই কলিকাতার উন্নতি করা। করদাতারা তাদের যে কি অধিকার জানেন না, সেই সুবিধা তো পৌর প্রতিষ্ঠান নিবেই। চাইতে গেলে যে দিতে হয় এই কথা কি তাঁহারা ভাবেন। তাঁহারা মনে করেন ট্যাক্স দিয়াই খালাস। সত্য তা নয়। সেই সুরু।

একথাও সত্য পৌর প্রতিষ্ঠান করদাতাদের অজ্ঞানতার সুবিধা নিয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন, তারা যে করদাতার স্বার্থ রক্ষার জন্য তাহা ভুলিয়া গিয়া একটী গোষ্ঠীবৎ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষের স্বার্থপরতার সুবিধা নিয়া। পৌর প্রতিষ্ঠানের উচিত করদাতাদের বুঝাইয়া দেওয়া ভাল ভাবে—তাদের কি অধিকার এবং সেই অধিকারের যেন অপব্যবহার না হয়।

দেখা যায় দোষী উভয়েই—করদাতা ও করপোরেশন। সময় এখন উপস্থিত উভয়ের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার। এই কথাগুলি নুতন নয়, সবাই জানেন, কিন্তু তার ব্যবহার কই, কবেই বা ব্যবহার হইবে! সময় কি এখনো হয় নাই?

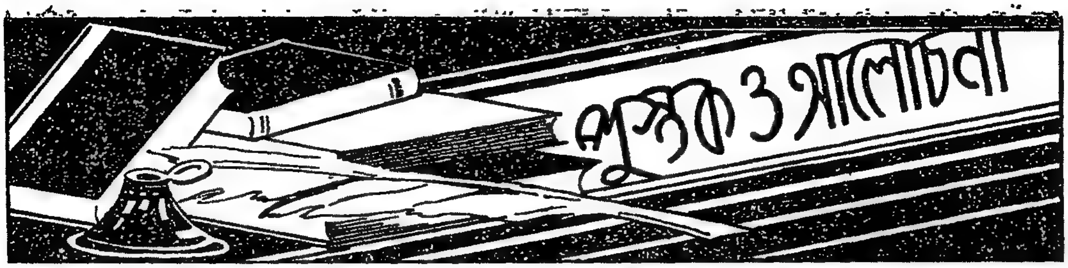

অন্য নগরঃ উপন্যাস। শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় দিগন্ত পাব্লিশার্স, কলিকাতা। মূল্য—৩্ মাত্র।

অন্য নগরঃ ভারতবর্ষ হইতে বাহির হইয়া সাত সমুদ্র তের নদীর পারে একেবারেই স্বতন্ত্র নগর ইংলণ্ড। দূর বিদেশীর কাছে এদেশ তাই বিস্ময়ে আচ্ছন্ন। গ্রন্থের প্রারম্ভেই সেই বিস্ময়ের সৃষ্টি করা হইয়াছেঃ 'পিকাডিলি থেকে লেষ্টার স্কোয়ার মিনিট পাঁচসাতের পথ। লোকে সাধারণত টিউব নেয় না, বাসেও চড়ে না, ওটুকু পথ হেঁটেই চ'লে যায়। আরও নানা আকর্ষণ এখানে জনসাধারণের কৌতূহল জাগায়। এ অংশটুকু হ'লো লণ্ডনের হৃৎপিণ্ড। তাই সবসময় এখানে হাজার বিদেশীর ভিড়। ইংলণ্ডের নানা স্থান থেকে যারা আসে এখানে, দাঁড়িয়ে তাদের মাথা ঘুরে যায়। আমেরিকান টুরিস্টরা হাঁ ক'রে ইরসের মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে। ফরাসী কিম্বা ভারতীয় অথবা কণ্টিনেণ্টের অন্যান্য আগন্তুক এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে রেস্তোঁরায় ঢোকে।' রেস্তোঁরারও সাধারণ আকর্ষণ ভূপাল মল্লিকের ইণ্ডিয়া গ্রীল। লণ্ডন এখন বহু ভারতীয়। তাহারা সকলেই এই ইণ্ডিয়া গ্রীলকে আবিষ্কার করিয়াছে। জমাট পসার ভূপাল মল্লিকের। পরিবেশন-কার্যে নিযুক্ত রতন, মেরী আর আইলীন, রান্না করে মক্বুল, মেহের আলী আর বিপিন; যোগান দেয় মাদ্রাজী খৃষ্টান রিচার্ড; আর বাসন মাজে বুড়ি রোজ্ আর ট্যারা জার্মান মেয়ে ফ্রিডা। সমবেদনাত্মক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ইহারা কেহই কাহারো হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, গ্রন্থের প্রায় সমস্তখানি যায়গা জুড়িয়া ইহাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করিবার মতো। বিদগ্ধ পাঠক স্বভাবতঃই তাই বুঝিতে পারিবেন—নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের নানা চারিত্রিক কাঠামোয় প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে এই গ্রন্থ। কিন্তু শুধুই কি এই জীবিকান্বেষী নিম্নমধ্যবিত্ত জীবন, ইণ্ডিয়া হাউসকে কেন্দ্র করিয়া মধ্যবিত্ত ভারতীয় জীবনের ইতিহাসও এখানে লুপ্ত নয়। চৌধুরী বা আলী সাহেবের মতো চরিত্রগুলি তাহারই নিদর্শন। লণ্ডনের মতো পরিবেশে নিম্নমধ্যবিত্ত লণ্ডন-নাগরিক ও নাগরিকার সঙ্গে ভারতীয় মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের সংযোগে কাহিনীটি আগাগোড়া উপভোগ্য ও চমকপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। চৌধুরী, রতন, ক্ল্যারা, বিষ্টু, এল্সী, দীনবন্ধু, আইলীন প্রভৃতি চরিত্রগুলি মনের উপর রেখাপাত করিয়া যায়। লেখকের অভিজ্ঞতাপ্রসূত এই কাহিনী পাঠকমাত্রকেই বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত করিবে।

সম্ভবামি যুগে যুগেঃ নাটক। শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাব্লিশার্স, কলিকাতা। মূল্য—২৷৷০ মাত্র।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বাণী ও জীবনী আজ ভারতের বিশেষ করিয়া বাংলার শিক্ষিত সমাজে আলোচিত হইতেছে; ইহা আনন্দের কথা, আশার কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালী পাশ্চাত্যের জড়বাদের ভাবসংঘাতে নিজের ধর্ম, সংস্কৃতি, স্বজাতীয়তা—স্বকীয় সব কিছুকে ব্যঙ্গ করিতে শিখিয়াছিল, প্রাণপণে পরানুকরণ করিতেছিল। আবার ঐ সময়ই বাংলার এক বিশেষ নবজাগরণের যুগ। প্রায় একই সময়ে বাংলায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু মনীষী, সাহিত্যিক ও কবি, রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ধর্মাচার্যগণ বাংলায় স্বাজাত্যবোধের নবচেতনার সৃষ্টি করেন। ইঁহাদের সমসময়ে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ীতে এক অশিক্ষিত গ্রাম্য যুবক তাঁহার অসামান্য সাধনার সিদ্ধির সৌরভে বহু জ্ঞানী গুণীকে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছিলেন।—লেখকের ভূমিকা হইতেই একথা উদ্ধৃত করিয়া বলা চলে—বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় মননশীলতার উপর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব (সেদিনের সেই অশিক্ষিত গ্রাম্য যুবক) এক অসামান্য প্রভাব ও আলোক বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই অলৌকিক জীবন-কাহিনী অবলম্বনে আলোচ্য নাটকখানি রচিত। সাধারণ নাটকের ন্যায় ইহাতে নাটকীয় পরিবেশ ও এ্যাক্শনের ধর্ম সর্বথা স্বীকৃত না হইলেও মূল বিষয়বস্তুর প্রাণরস ও অভিনব ঐতিহাসিক তাৎপর্যে আবহ নাটকখানি মাধুর্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। 'সম্ভবামি যুগে যুগে' লেখকের খ্যাতিশীল প্রতিষ্ঠাকে আরও অধিক দূর সম্প্রসারিত করিবে বলিয়াই বিশ্বাস করি।

সম্পাদকীয়

বিজয়ার অভিবাদন

শারদীয়া পূজার অবকাশে আমরা আমাদের শুভানুধ্যায়ী পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-অনুগ্রাহক, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও দেশবাসী সর্বসাধারণকে আমাদের বিজয়ার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করি। শারদ জননীর শুভ আশীর্বাদে আমাদের সকল অশান্তি দূর হউক, সকলের সঙ্গে একত্রে মিলিত হইয়া আমরা যেন কুয়াসাচ্ছন্ন অন্ধকারকে অপসারিত করিয়া সূর্যকরোজ্জ্বল নব-প্রভাতের উদয়তীর্থে আমাদের জীবন-আযুধতে পাঞ্চজন্যে ধ্বনিয়া তুলিতে পারি। তবেই বিজয়ার মূলগত মন্ত্র আমাদের জীবনে সার্থক হইবে, সফল হইবে, উজ্জ্বল হইবে। দেশবাসী সর্বসাধারণের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতাই হউক আমাদের সেই তীর্থ-যাত্রার একমাত্র পাথেয়।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা

ভারতীয় সভ্যতার উৎসকেন্দ্র যে গ্রাম, গ্রামীণ সভ্যতাই যে ভারত-সংস্কৃতির একমাত্র মূলাধার—একথা সব চাইতে অধিক উপলব্ধি করিয়াছিলেন গান্ধীজী। তাই তিনি ভারতবাসীর দৃষ্টিকে গ্রামের দিকে ফিরাইতে চাহিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় সমাজ যে গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া উচ্ছ্রিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই পাঁচ লক্ষ গ্রামকে সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তুলিতে না পারিলে গোটা ভারতীয় সমাজ-দেহই যে অসাড় ও পঙ্গু হইয়া পড়িবে, তাহাতে দ্বিমতের কোনো কারণ নাই। গ্রাম-ভারতের সেই উন্নতি-সাধনের সংকল্প লইয়াই এবারে গান্ধীজীর জন্মদিবসে ভারত সরকার সারা দেশে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করিয়াছেন। পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলিয়াছেন: 'সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই পরিকল্পনায় সমাজ-জীবন ও ব্যক্তিজীবনের গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে ব্যক্তি শুধু যে তাহার গ্রামের সংগঠক হইবে তাহা নহে, সে ভারতেরও সংগঠনকারী হইবে। আজ আমরা যে বীজ বপন করিতেছি, তাহা অনতিবিলম্বে অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষে পরিণত হইবে। শুধু বড় বড় অফিসারগণই বড় বড় কাজ করেন, এরূপ মনে করিলে ভুল করা হইবে। সমাজোন্নয়ন-পরিকল্পনার অর্থ দ্বিবিধ (ক) মানব জাতির উন্নয়ন এবং (খ) ছোটখাটো বিষয়ে তাহার কলাকৌশলের উন্নতিবিধান। এই দুইটি বিষয় সম্পাদিত হইলে বিনা সংঘর্ষে একটা বিরাট পরিবর্তন সম্পাদিত হইবে। উন্নয়ন কমিশনার হউন বা যিনিই হউন, তিনি শুধু অফিসে বসিয়া থাকিয়া হুকুম জারি করিলেই চলিবে না, তাঁহাকে হাতে-কলমে কাজ করিতে হইবে। কায়িক পরিশ্রম করা সম্মানজনক কাজ নয়—উহা নীচ জাতির কাজ—এদেশে লোকের মনে এইরূপ অদ্ভুত ধারণা রহিয়াছে। আমরা সকল লোককে সমান বলিয়া বিবেচনা করি। কোনো প্রয়োজনীয় কাজকে আমরা ছোট বলিয়া মনে করি না। রাশিয়া, চীন, আমেরিকা ও ইংলণ্ড—এই সকল দেশের রাজনৈতিক আদর্শ যাহাই হউক না কেন, শ্রমের মর্যাদা কেহ অস্বীকার করে না। যে ব্যক্তি কায়িক শ্রমকে মর্যাদাজনক কাজ বলিয়া মনে করে না, সে ব্যক্তি অলস।'

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর এই উক্তি অত্যন্ত সারগর্ভ ও আন্তরিক সন্দেহ নাই। সমগ্র ভারতের পাঁচ লক্ষ গ্রামের মধ্যে ১৮,৪৬৪টি গ্রাম সম্প্রতি নির্বাচিত করা হইয়াছে—যেখানে সমাজ-পরিকল্পনা প্রবর্তন করা হইবে। ৫৫টি উন্নয়নক্ষেত্রে ইহা বিভক্ত হইবে। এই উন্নয়নক্ষেত্রের আয়তন হইল ২৬৯৫০ বর্গমাইল। ইহার এক একটি উন্নয়নক্ষেত্রের মধ্যে আবার একাধিক উন্নয়ন ব্লক আছে। আনুমানিক প্রায় দেড় কোটি গ্রামবাসী এই সমাজ-পরিকল্পনার কার্যকরী উদ্যম ও আয়োজনে যোগদান করিবার সুযোগ পাইবেন। এই পরিকল্পনার জন্য সরকারের মোট ব্যয় হইবে ৩৮ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। ভারত-মার্কিন কারিগরী সহযোগিতার চুক্তি অনুসারে এই সমাজ-

উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজের জন্য মার্কিণ সরকার ভারতকে ৪ কোটি টাকা সাহায্যস্বরূপ দান করিবেন। মার্কিনী কৃষিবিদ ও পূর্ত্ত-বিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞবৃন্দেরও ভারতে আসিয়া বিভিন্ন উন্নয়নী-কেন্দ্রে পরামর্শদাতারূপে কাজ করিবার সিদ্ধান্ত স্থির হইয় আছে। পরিকল্পনার কাজ তিন বৎসরের মধ্যেই সম্পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। নীলোখেরি ও এটোয়ার সমবায়িক কার্যপদ্ধতির ভিত্তিতেই উল্লেখিত পরিকল্পনার কার্যসূচী নির্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ দীর্ঘবিলম্বিত কার্যপদ্ধতির দিকে অগ্রসর না হইয়া অল্পকালসাধ্য যে সব পরিকল্পনার দ্বারা কৃষি ও ভূমিসম্পদের উন্নতি করা আশু সম্ভব, সেইদিকেই বিশেষভাবে ভারত সরকার দৃষ্টি রাখিয়াছেন। 'নূতন কূপ ও জলাশয় খনন করিয়া সেচের ব্যবস্থা, পুরাতন কূপ ও জলাশয়ের সংস্কার সাধন, উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহারের প্রবর্তন ও সড়কের সংস্কার ও নূতন সড়ক নির্মাণ, উন্নত শস্যবীজের প্রয়োগ, উন্নততর সার উৎপাদন ও ব্যবহার-পদ্ধতির প্রবর্তন ইত্যাদি যে সকল কর্মপদ্ধতি সমাজ-পরিকল্পনায় স্থান পাইয়াছে, তাহা গ্রাম-ভারতের অনগ্রসরতা, দুর্বলতা ও দুর্গতির মূল কারণগুলিকেই অপসারণ করিবার পরিকল্পনা।' গ্রাম্য কুটীরশিল্পের উন্নয়নের প্রতিও ইহাতে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। গ্রামবাসীদের সাধারণ কর্মহীনতার সমস্যাও ইহাদ্বারা সমাধান হইবার সুযোগ রহিয়াছে।

পল্লীর স্বাস্থ্য ও শিক্ষার বিষয়ও এই পরিকল্পনায় অঙ্গাঙ্গীভাবে রহিয়াছে। মোটামুটিভাবে তবে দেখা যাইতেছে, সমাজ-জীবনের সমস্ত কার্যকরী দিকগুলিকেই ইহাতে গ্রহণ করা হইয়াছে। যে সমবায় পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত ভারতীয় কৃষকসমাজ ভূমিকর্ষণের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে নাই, সেই সমবায় পদ্ধতিকেও এই পরিকল্পনার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ চতুর্দিকেই বিশেষ একটা আশার লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আশঙ্কার কারণও যে একেবারেই তিরোহিত, এ কথা মনে করা ঠিক হইবে না। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলিয়াছেন—'জনসাধারণের উৎসাহ, আন্তরিকতা ও সহযোগিতার উপরেই এই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করিতেছে।' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, জনগণের মধ্যে উৎসাহ, ও উদ্দীপনা উদ্দীপিত করিয়া তুলিবার জন ভারত সরকার এক কর্মচারীমণ্ডলী গঠন করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে সমাজ-পরিকল্পনার নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষাদানও করিয়াছেন। সুতরাং গোটা পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহাদের দায়িত্ব যে কতখানি, তাহা যে-কোন ব্যক্তিই উপলব্ধি করিবেন। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, জনসাধারণকে উদ্দীপ্ত ও উৎসাহী করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহারা কতখানি উপযুক্ত হইবেন। গ্রামের পঙ্কোদ্ধার করিয়া পল্লী-জীবনকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইলে যে অপরিসীম কষ্টসহিষ্ণুতা, নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও কঠোর নিষ্ঠার প্রয়োজন, উক্ত কর্মচারীবৃন্দের সেই কষ্টসহিষ্ণুতা, ত্যাগ ও নিষ্ঠা যথার্থই আছে কি? জনগণের সঙ্গে যাহাদের আদৌ কোনোকালে সংযোগ নাই, এমন ব্যক্তিকে জন-দরদী মন লইয়া জনগণের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠায় কম সময়ের প্রয়োজন নয়। অনুরূপ সময়ের দিকে চাহিয়া অবশেষে পরিকল্পনা পিছাইয়া না যায়, সেইদিকে ভারত সরকারের চিন্তা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন রহিয়াছে।

ছাড়পত্র প্রথা ও নূতন উদ্বাস্তু সমস্যা

পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে ছাড়পত্র ব্যবস্থা প্রবর্তনে আরও কিছুকাল বিলম্ব হইবে বলিয়া পাকিস্থান-প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন গত ৭ই অক্টোবর ঘোষণা করেন। ইতিপূর্বে করাচী হইতে পি টি আই-এর সংবাদদাতা জানান যে, ভারত-পাকিস্থান ছাড়পত্র প্রথা প্রবর্তন স্থগিত রাখিবার জন্য পাকিস্থান সরকার ভারত সরকারকে সরকারীভাবে অনুরোধ জানাইয়াছেন। কিন্তু ভারত সরকার এতদসম্পর্কে উক্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিছুই জানেন নাই।

১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্থান সরকার স্থির করেন যে, ১৯৫০ সালের ভারত-পাক চুক্তিতে ভারত ও পূর্ব পাকিস্থানের মধ্যে অবাধে যাতায়াত এবং বর্তমানে ভারত ও পশ্চিম পাকিস্থানের মধ্যে যাতায়াতের জন্য যে পারমিট ব্যবস্থা আছে, তাহা বন্ধ করিতে হইবে এবং ছাড়পত্র ও ভিসা দ্বারা উভয় দেশে গমনাগমন নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। উভয় দেশের স্বার্থে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে অবাধে গমনাগমনের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা অব্যাহত রাখা উচিত বলিয়া ভারত সরকার যে প্রস্তাব করেন, পাকিস্থান সরকার তাহা গ্রহণ করেন নাই। অতঃপর ভারত ও পাকিস্থান সরকারের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয় এবং গত ২রা আগষ্ট উভয় দেশের সরকার ছাড়পত্র ও ভিসা সম্পর্কিত নিয়মাবলী ঘোষণা করেন।

এতদনুসারেই কার্য অগ্রসর হইয়া চলিতেছিল এবং ভারত সরকার ছাড়পত্র প্রথা চালু করিবার যাবতীয় কাজ

সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। ফলে একদিকে ভবিষ্যতে যাতায়াতের অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া এবং অন্যদিকে ছাড়পত্র প্রবর্তিত হইবার পর পাকিস্থান সরকারের পক্ষ হইতে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিলাভে বঞ্চিত হইয়া ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্থান হইতে দলে দলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পুনরায় পশ্চিমবঙ্গে আসিতে সুরু করেন। বেনাপোল হইতে সুরু করিয়া হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশন পুনরায় সহস্র সহস্র নিরাশ্রিত উদ্বাস্তুতে ভরিয়া ওঠে। যে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান করিয়া ওঠা গোড়া হইতেই পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল, পুনরায় সেই সমস্যা আরও গুরুতর আকারে এবারে দেখা দিল। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের সাম্প্রতিক এই বিলম্বিত লয়ের কারণ এখনও দুর্বোধ্য।

গত ৯ই অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার বৈঠকে এতদ্সম্পর্কিত এক বিস্তৃত আলোচনার পর ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট এই সম্পর্কে একটি নোট প্রেরণ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার উক্ত নোটে ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট পাকিস্থান গভর্ণমেণ্টকে উভয় দেশের মধ্যে প্রস্তাবিত পাসপোর্ট প্রথার প্রবর্তন হয় সম্পূর্ণরূপে বাতিল করিয়া দিবার জন্য, আর না হয় উহা পূর্ব-ঘোষিত ১৫ই অক্টোবর তারিখ হইতেই প্রবর্তন করিতে বলিবার জন্য দৃঢ় অনুরোধ জানান। রাজ্য মন্ত্রীসভা উক্ত নোটে ভারত গভর্ণমেণ্টকে পাসপোর্ট প্রবর্তনের ব্যাপারে আর 'পাকিস্তানী হুকুম' মানিয়া না লইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইবার সিদ্ধান্ত করেন। পাকিস্তানী প্রস্তাব সম্পর্কে রাজ্য-সরকারের দৃঢ় বিমুখতায় যে মনোভাব দেখা দিয়াছে, তৎসম্পর্কে রাজ্য-সরকারের জনৈক মুখপাত্র বিস্তৃত ব্যাখ্যাসহকারে বলেন যে, পাকিস্তানের পাসপোর্ট প্রবর্তনের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমরা আরও একটি সমস্যাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়াছি। পাকিস্তান হইতে প্রতিদিন নূতন নূতন উদ্বাস্তু দল ভারতে আসিতেছে এবং উহাতে ঐ সমস্যা প্রতিদিন বিরাট হইতে বিরাটতর হইয়া উঠিতেছে। এখানকার গভর্ণমেণ্ট যখন নিজেদের শক্তিসামর্থ্য ভালোভাবে সংঘটিত করিয়া ইতি-পূর্বে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন পরিকল্পনাগুলি কার্য-করী করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে পাকিস্তান কর্তৃক উভয় রাজ্যে পাসপোর্ট প্রবর্তনের সিদ্ধান্তের ফলে আবার নূতন করিয়া দলে দলে পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু আসিয়া উপস্থিত হইতেছে; ফলে আমাদের শক্তিসামর্থ্য ও সংগঠনের উপর নূতন করিয়া প্রবল চাপ পড়িয়াছে এবং আমাদের পুনর্বাসন কার্যাদির গতি ব্যাহত হইতে চলিয়াছে। ...যে দুর্যোগ ও দুর্বিপাক আসিতেছে, তাহার ঝামেলা এক-সঙ্গে একবারে মিটিয়া যাওয়াই ভালো। অপর পক্ষের সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী উহা তখন কিস্তিতে কিস্তিতে অল্প অল্প করিয়া আর না আসে। পাসপোর্ট প্রথা প্রবর্ত-নের বিষময় ফল যাহাতে অতি অল্পকালের মধ্যেই শেষ হয়, গভর্ণমেণ্ট সর্বদা সেই কামনাই করেন।...'

সরকারী মুখপাত্রের উপরোক্ত এই উক্তির এক বর্ণও মিথ্যা নয়। নতুন উদ্বাস্তু আগমনের ফলে শুধু যে তাঁহা-দেরই জীবনান্ত অবস্থা হইয়াছে তাহা নয়, সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের র‍্যাশন ব্যবস্থাও ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ফলে গোটা পশ্চিমবঙ্গের সমাজব্যবস্থাই ভাঙিয়া পড়িবার উপ-ক্রম হইয়াছে। এই অবস্থা বেশীদিন চলিতে দিলে কিছু একটা আকস্মিক দুর্ভিক্ষে যে সারা দেশ মহাশ্মশানে পরিণত হইবে, তাহাতে ভুল নাই। এই আসন্ন ভয়ের দিক চিন্তা করিয়াই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহর-লাল নেহেরুকে অবিলম্বে একবার পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া স্বচক্ষে সমস্ত দেখিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। দেখা অর্থে প্রতিকারের পন্থা অবলম্বন করা। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন। আগামী সপ্তাহের যে কোনো তারিখে তিনি কলিকাতায় আসিতে পারেন। আনন্দের বিষয় এই যে, ছাড়পত্র সম্পর্কে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিয়া-ছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার অক্ষরে অক্ষরে তাহা পালন করিয়া তাঁহাদের গৃহীত নীতি সম্পর্কে ঘোষণা করিয়াছেন। অতঃ-পর আরও একটি বড় প্রহসন দেখা আমাদের বাকী রহিল। তাহা হইতেছে পাকিস্তান সরকারের ভবিষ্যৎ ইতিকর্তব্য সম্পর্কে। আগামীবারে আমরা তৎসম্পর্কিত আলোচনার অপেক্ষা রাখি।

সংবাদপত্র-কমিশন নিয়োগে ভারত সরকারের উদ্যোগ

সম্প্রতি ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, সংবাদ-পত্রের অবস্থা এবং বর্তমানে ও ভবিষ্যতে কিভাবে উহার উন্নয়ণ সাধন সম্ভবপর, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট একটি সংবাদপত্র কমিশন (প্রেস কমিশন) নিযুক্ত করিয়াছেন। কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন বিচারপতি শ্রী জি এস্ রাজাধ্যক্ষ। এতদ্ব্যতীত ডাঃ সি পি রামস্বামী আয়ার, শ্রীনরেন্দ্র দেব (আচার্য), ডাঃ জাকির হোসেন, ডাঃ ভি কে আর ভি রাও, শ্রী পি এইচ্ পটবর্ধন, শ্রী টি এন্ সিং, শ্রীজয়পাল সিং, শ্রী জে নটরাজন, শ্রী এ আর

ভাট এবং শ্রী এম্ চলপতি রাও এই কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভারতে সংবাদপত্রের বর্তমান অবস্থা এবং উহার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ণের পন্থা নির্দেশ করিবার জন্য উক্ত কমিশনের উপরে ভার দেওয়া হইয়াছে। কমিশনকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবেঃ

(১) ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান এবং প্রবন্ধ পরিবেশক প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা, মালিকানা এবং আর্থিক কাঠামো; (২) সংবাদপত্র জগতে একচেটিয়া অধিকার এবং একই মালিকের দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি সংবাদপত্র পরিচালনা এবং যথার্থ সংবাদ পরিবেশন ও নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশের উপর উহাদের প্রভাব; (৩) কোম্পানী গঠন, বিজ্ঞাপন বণ্টন এবং অনুরূপ কার্যাদির ফলে নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার হয়; (৪ বেতনভোগী সাংবাদিকদের নিয়োগের পদ্ধতি, শিক্ষা, বেতনের হার, অবসর গ্রহণকালীন সুবিধা এবং চাকুরীর অন্যান্য সর্ত, তাঁহাদের বিরোধ নিস্পত্তি এবং যে সকল কারণে সাংবাদিকবৃত্তির উন্নত মান স্থাপন ও রক্ষা সম্ভবপর; (৫) সংবাদপত্র মুদ্রনের কাগজ প্রচুর পরিমাণে সরবরাহের এবং সকল শ্রেণীর সংবাদপত্রের মধ্যে ঐগুলি বণ্টনের ব্যবস্থা এবং ভারতে (ক) সংবাদপত্র মুদ্রনের কাগজ ও (খ) মুদ্রন যন্ত্রাদি নির্মাণের কারখানা স্থাপনের সম্ভাবনা; (৬) সংবাদপত্রের উন্নত মান অব্যাহত রাখা এবং সংবাদপত্র ও সরকারের মধ্যে যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা, সংবাদপত্র উপদেষ্টা কমিটিগুলি এবং সংবাদপত্র সম্পাদক ও বেতনভোগী সাংবাদিকদের প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য পরিচালনা প্রভৃতি; (৭) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং ইহার প্রতিবন্ধক আইনগুলির সংশোধন ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ।

১৯৫২ সালের অনুসন্ধান কমিশন আইন অনুযায়ী এই কমিশনটি গঠিত হইয়াছে। ১৯৫৩ সালের ১লা মার্চের মধ্যে কমিশনকে ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকটে তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে।

(কমিশনের) কার্যে সংবাদপত্রের সঙ্গে সাময়িকপত্রকেও একত্রীভূত করিয়া লওয়া হইয়াছে। এ দেশের সংবাদপত্রের তুলনায় সাময়িকপত্রের সংখ্যা যে সহস্রগুণ ইহা ভারত সরকারের অজানা থাকিবার কথা নয়। অথচ সাময়িকপত্র এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো সাহায্যই লাভ করে নাই। সাধারণতঃ যে সকল সরকারী বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহা কেবল সংবাদপত্রেই হইয়া আসিয়াছে, সাময়িকপত্র তাহা হইতে আগাগোড়াই বঞ্চিত হইয়া আসিয়াছে। নানা দুর্গতি ও দুঃস্থ অবস্থার মধ্য দিয়া এদেশের সাময়িক পত্র পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও এমন বহু বিষয় রহিয়াছে যাহার উপযুক্ত সাহায্য ভিন্ন এদেশের সংবাদপত্রগুলি আরও উন্নত হইয়া জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলিতে সক্ষম হইতেছে না। তাহার কিছু কিছু সমস্যাসম্পর্কেই মাত্র ভারত সরকার সম্প্রতি সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের এই শুভবুদ্ধির জন্য তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়। সম্প্রতি তাঁহারা কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন, আনন্দের কথা, অনুরূপ নানা ক্ষেত্রেই তো এ পর্যন্ত নানা জাতীয় কমিশন নিযুক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই কর্মপ্রসূতা বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই; এক্ষেত্রেও যদি অনুরূপই কিছু একটা ব্যত্যয় ঘটে, তবে তাহার চাইতে অনুশোচনার বিষয় আর কিছুই থাকিবে না। আশা করি, কমিশনের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইবে এবং তদনুযায়ী ভারতীয় সংবাদ তথা সাময়িকপত্রের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে ভারত সরকার দ্রুত যত্নবান হইবেন। কিন্তু ইহার দ্বারা কোনো প্রতিষ্ঠানের উপরেই তাঁহাদের আইনগত হস্তক্ষেপ গ্রহনীয় হইবে না।

ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠননীতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর হায়দরাবাদে এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন এবং হায়দরাবাদ রাজ্যবিভাগ সম্বন্ধে বলেন যে, তিনি কোনোদিনই এই নীতির সমর্থক নহেন। তথাপি যদি ইহার জন্য প্রবলভাবে দাবী জানানো হয় এবং সন্নিহিত অঞ্চলগুলি সম্পর্কে বিসম্বাদী দাবীগুলির মধ্যে পারস্পরিক বুঝাপড়ার সাহায্যে সামঞ্জস্য সাধিত হয়, তাহা হইলে তিনি এই ব্যবস্থায় সম্মত হইবেন। যদি এই ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট বিশেষ বিশেষ এলাকাগুলি সংক্রান্ত দাবী সম্পর্কে আপোষে মীমাংসা হইয়া যায়, তাহা হইলে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি করিবেন না।

সন্নিহিত অঞ্চলগুলির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সালিশী করিবেন কিনা—এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন—স্পষ্টতঃই আমি এইরূপ করিতে অনিচ্ছুক। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সম্মতিক্রমেই কেন্দ্রীয় সরকার মধ্যস্থতা করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে

তিনি মাদ্রাজ নগরীর বিষয়টি উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সদিচ্ছা ব্যতীত এই প্রশ্নটির মীমাংসা হইতে পারে না। অন্ধ্র ও তামিলনাদবাসীদের মধ্যে সাধারণভাবে মতৈক্য ব্যতীত মাদ্রাজ নগরী সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমীচীন হইবে না এবং করা হইলে মাদ্রাজ নগরীর ক্ষতি হইবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবী পশ্চিমবঙ্গেরই সর্বাগ্রগণ্য। যদিও প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের দাবী সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেন নাই, তথাপি তাঁহার সর্বব্যাপী সাধারণ মতটি অত্যন্ত সংযমের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়া প্রকারান্তরে এই কথাটাই বুঝাইয়া দিতে চাহিলেন যে, তাঁহাদের ভাষাভিত্তিক দাবীটি নিতান্তই অযৌক্তিক। সংশ্লিষ্ট বিশেষ বিশেষ এলাকাগুলি সংক্রান্ত দাবী সম্পর্কে যদি সমস্যাজাত ব্যবস্থার সহিত আপোষে মীমাংসা হইয়া যায়, তাহা হইলেই ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কোনোরূপ বাধাসৃষ্টি করিবেন না। একথা হায়দরাবাদ সম্পর্কেও যেরূপ প্রযোজ্য, মাদ্রাজ এবং পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কেও অনুরূপই প্রযোজ্য। আসলে প্রধানমন্ত্রীর মতে গোটা বিষয়টাই জাতীয় প্রগতির বিরোধী। তিনি নিজে যেখানে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠননীতির আদৌ সমর্থক নহেন, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারই বা এতদ্‌সম্পর্কে কতখানি অনুমোদনপন্থী হইবেন, সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। শ্রীযুক্ত নেহেরু শুধু প্রধানমন্ত্রীই নহেন, তিনি ভারতীয় কংগ্রেস তথা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাণস্বরূপ। অতএব তাঁহার মতই যে কেন্দ্রীয় সরকারের মতে পর্য্যবসিত হইবে, এ সম্পর্কে সন্দেহ কি! কোনোকালে বৃটিশ সরকারের অধীনে পরাধীনতার নিবিড় নিষ্পিষ্টতার দিনে ভাষাভিত্তিক প্রদেশগঠননীতিকে কংগ্রেস কমিটি শুধু স্বীকারই করিয়া নিয়াছিলেন নয়, তাহার জন্য সংগ্রাম করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে, সে-দিনও যেমন আজ আর নাই, তৎকালীন সেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আজ পদাধিকারে রাজ্য শাসনের গদি লাভ করিয়া সেই মানুষও আজ আর নাই। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছুরই পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পরিবর্তন হইলেও আজও প্রয়োজন মেটে নাই। এই প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ও মাদ্রাজই প্রধান; হায়দরাবাদের সমস্যাটিও নিতান্ত গৌণ নয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু স্বাধীন ভারতের গোড়া হইতে বিষয়টি সম্পর্কে যে মত ব্যক্ত করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে বিষয়টি প্রায় নস্যাৎ হইবারই যোগ্য। কিন্তু আইনগত ভাবে দাবী নস্যাৎ হইলেও সমস্যা যে সমস্যাই থাকিয়া যায়, এ কথা প্রধানমন্ত্রী নিজেও জানেন। অতএব তাঁহার কর্তব্য হইবে—হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ ও পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাগুলিকে হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়া তাহার যথাযথ সমাধান করা। তিনি হৃদয়বান লোক, সুতরাং তাঁহার পক্ষে এ কাজ কঠিন কিছু নয়।

ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সম্মেলনের দাবী

সম্প্রতি গত ২১শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েসন হলে ভাষাভিত্তিক রাজ্যপুনর্গঠনের দাবীতে আহূত পশ্চিমবঙ্গ সম্মেলনের দুই-দিবসব্যাপী অধিবেশন সমাপ্ত হয়। অধিবেশনে অবিলম্বে ভাষার ভিত্তিতে দেশের পুনর্গঠন এবং বিহারের বঙ্গভাষাভাষি অঞ্চলসমূহ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবীতে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানাইয়া সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। গৃহীত অপর একটি প্রস্তাবে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবী আদায়ের উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তকে সভাপতি করিয়া ৮৩ জন বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী ও নাগরিক লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির নাম—পশ্চিমবঙ্গ ভাষাভিত্তিক রাজ্য-পুনর্গঠন কমিটি। সম্মেলনের কার্য পরিচালনা করেন শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ হইতে বিশিষ্ট বক্তাগণ ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবীর যৌক্তিকতা সমর্থন করিয়া এবং সরকারকে ভাষার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্প্রসারণের ন্যায্য দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য করিবার জন্য ব্যাপক আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানাইয়া সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, ভারতের সর্বত্র ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন ব্যতীত স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারতীয় ইউনিয়ন গঠনের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। এই কারণেই সম্মেলন বিহারের বঙ্গভাষাভাষি অঞ্চলগুলি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবী জানাইতেছে। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের ফলে যে সব আদিবাসী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইবে, ঐ সব অঞ্চলের অধিবাসিগণের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, আচার, ব্যবহার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অধিকার সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াও সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিহারের যে সব বঙ্গভাষাভাষি অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইবে, ঐ সব অঞ্চল এবং পশ্চিমবঙ্গের অবাঙালী জনসাধারণের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও আচারব্যবহারের প্রতি

পূর্ণ মর্যাদা দানের প্রতিশ্রুতি সম্মেলনে দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁহার ভাষণে বলেন যে, ভাষা-ভিত্তিক রাজ্য গঠনের সমস্যাকে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা বলিয়া দেখিলে ভুল হইবে। ইহা সমগ্র ভারতের সমস্যা। কংগ্রেস অতীতে বহুবার ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের যৌক্তিকতা সমর্থন করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে নানা অজুহাতে কংগ্রেস ঐ দাবীর ভিত্তি নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার বিগত অধিবেশনের শেষভাগে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্প্রসারণের দাবী করিয়া যে প্রস্তাব আনয়ণ করা হয়, উহাতে ভাষাভিত্তিক দাবী অস্বীকার করিয়া বিহারের বঙ্গ-ভাষাভাষি অঞ্চলসমূহ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার যে ন্যায্য দাবী—উহা ক্ষুন্ন করা হইয়াছে। প্রসঙ্গত শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন যে, তাঁহারা ভিখারী হিসাবে যাইতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের দাবী ন্যায্য দাবী। পশ্চিম-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবী মুখে আনিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাজ্য কংগ্রেসের সভা-পতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্প্রসারণের দাবী স্বীকৃত না হইলে পায়ে হাঁটিয়া বিহারের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে যাইবার কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ ঘোষণার ফলে সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুর তিরস্কারে শ্রীঘোষ একে-বারে চুপ করিয়া গেলেন। পরিশেষে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে, কংগ্রেস যাহাই করুক, দেশবাসী আজ তাঁহাদের ঐ ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের জন্য বদ্ধপরিকর। যতদিন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ঐ দাবী স্বীকার করিয়া না লওয়া হইতেছে, ততদিন দেশে শান্তি, শৃংখলা ও উন্নতির কোনো আশা নাই।

এতদসম্পর্কে কোনোরূপ মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এ সম্পর্কেও আমরা প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

পরলোকে বাংলাসাহিত্যের একনিষ্ঠ গবেষক ও কৃতী সাংবাদিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিপন্ন বাংলার বিপর্যস্ত সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে অকস্মাৎ একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকান্তর-প্রাপ্তি বাংলার সংস্কৃতি জগতের একটা বিশেষ অপূরণীয় ক্ষতি হিসাবেই বাঙালী মাত্রের নিকটেই প্রতীয়মান হইবে। মাত্র কিছুকাল পূর্বে আমরা রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মোহিতলাল মজুমদারকে আমাদের মধ্য হইতে হারাইয়াছি। সেই শোক ভুলিতে না ভুলিতে আর একটি বজ্রাঘাত আমাদিগকে সহ্য করিতে হইল। বিগত ৩রা অক্টোবর রাত্রি ১১॥ ঘটিকায় বেলগাছিয়ার নিজস্ব বাস-ভবনে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সাধনলোকে যাত্রা করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার মাত্র ৬২ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি নিঃসন্তান হইলেও নির্বান্ধব ছিলেন না। অদৃষ্টের পরিহাসের বিষয় এই যে, তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা বীণাপাণি দেবীও দীর্ঘকাল হইতে মস্তিষ্ক রোগে ভুগিতেছেন। বৃদ্ধ বয়সে এই নিদারুণ শোক সম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে কতখানি সাধ্যায়ত্ত হইবে, বিধাতাই জানেন। ঈশ্বর তাঁহার এই শোক সম্বরণের শক্তি দান করুন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ২১শে সেপ্টেম্বর, বাংলা ১২৯৮, ৫ই আশ্বিন হুগলীর অন্তর্গত বালীর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ

পরিবারে ব্রজেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতামাতার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। মাত্র এক বৎসর বয়সে ব্রজেন্দ্রনাথ পিতৃহীন হন। তাঁহার এগার বৎসর বয়সে তাঁহার মাতাও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পরলোকে যাত্রা করেন। একে দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবংশে জন্ম, তদুপরি অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীন হইয়া ঘোরতর দারিদ্র্যের মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথের পাঠ্যজীবন অতিবাহিত হয়। এই কারণে তিনি পাঠ্যজীবনে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন না; এনট্রান্স কোর্স অবধি পাঠ সমাপনান্তে মাত্র ১৬ বৎসর বয়সেই ব্রজেন্দ্রনাথকে কঠোর জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হয়। ১৯০৯ সালে ১৮ বৎসর বয়সে ব্রজেন্দ্রনাথের বিবাহ

হয়। কিছুকাল কেরাণী জীবন যাপন করিয়া অতঃপর ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকা-দ্বয়ের অন্যতম সহকারী সম্পাদকরূপে যোগদান করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সাংবাদিক জীবনে ব্রজেন্দ্রনাথ কিছুটা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার সাহিত্য সাধনার ঐকান্তিক আগ্রহ পূরণে অগ্রসর হন এবং বঙ্গভারতীর সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত করেন। বাংলাসাহিত্যের বিভিন্ন দিকে প্রধানতঃ গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। স্বীয় অধ্যবসায়, ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং প্রগাঢ় জ্ঞান-পিপাসা ব্রজেন্দ্রনাথকে সাফল্যের শিখরে অধিরূঢ় করে। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', 'বাঙলা সাময়িক পত্র', 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' প্রভৃতি অপূর্ব গ্রন্থ ব্রজেন্দ্রনাথকে বঙ্গসাহিত্যে অবিস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, দীনবন্ধু, রাজা রামমোহন প্রভৃতি গ্রন্থাবলীর তিনি অন্যতম সম্পাদকও ছিলেন। গত তিন বৎসর যাবৎ তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ছিলেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঘোরতর দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন আরম্ভ করিয়াও নিজ যোগ্যতাবলে তিনি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন এবং বেলগাছিয়ার ইন্দ্র বিশ্বাস রোডে নিজের বাসভবন নির্মাণ করেন।

সাহিত্য গবেষণার কার্যে তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের সহযোগিতা মণিকাঞ্চন যোগের সৃষ্টি করে। মৃত্যুর অব্যবহিত কিছুকাল পূর্বে বঙ্গীয় সরকার রবীন্দ্র-পুরস্কারের দ্বারা ব্রজেন্দ্রনাথকে সম্মানিত করেন। বঙ্গশ্রী প্রকাশের গোড়া হইতেই তিনি ইহার নিয়মিত লেখক ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথের এই আকস্মিক মৃত্যুতে বাংলা-সাহিত্যের বিশেষতঃ বাংলা গবেষণা সাহিত্যের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল, তাহা অচিরে পূরণ হইবার নয়। তাঁহার পরলোকগত আত্মা চির শান্তি লাভ করুক, ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুণ, এই কামনা করি।

পরলোকে স্যার মরিস গয়ার

সম্প্রতি গত ১৩ই অক্টোবর ভারতীয় ফেডারেল কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গয়ার পরলোক গমন করিয়াছেন বলিয়া ইষ্টবোর্ণ সাসেক্স্ হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৪ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত ছিলেন।

১৮৭৮ সালের ২৫শে এপ্রিল তাঁহার জন্ম হয়। ওয়েষ্টমিন্ষ্টার এবং অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করার পর ১৯০২ সালে তিনি ইনার টেম্পলে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৯১২ সাল হইতে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাইভেট ইণ্টার-ন্যাশনাল ল'-এর লেক্চারার ছিলেন। ১৯১২—১৯১৬ সালে তিনি ইন্স্যুরেন্স কমিশনার্সের সলিসিটার্স ছিলেন। ১৯১৭-১৯১৯ সালে বৃটেনের জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত দপ্তরের এবং ১৯১৯-১৯২৬ সালে স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর আইন উপদেষ্টা হিসাবে তিনি কাজ করেন। ১৯৩০ সালে হেগে আন্তর্জাতিক আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য যে সম্মেলন হয়, তাহাতে তিনি বৃটিশ প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৩২ সালে তাঁহাকে ভারতীয় দেশীয় রাজ্য তদন্ত কমিটির সদস্য নিযুক্ত করা হয়। ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত স্যার মরিস গয়ার ভারতের প্রধান বিচারপতি এবং ফেডারেল কোর্টের সভাপতি ছিলেন। ভারতের প্রধান বিচারপতি হিসাবে স্যার মরিস গয়ার বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। ১৯৩৯ সালে রাজকোট রাজ্যের সমস্যা লইয়া মহাত্মা গান্ধী অনশনব্রত অবলম্বন করেন, ঐ সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসার ভার স্যার মরিস গয়ারের উপর অর্পণ করা হয়।

১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে তিনি শান্তিনিকেতনে বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ডি-লিট্ উপাধীতে ভূষিত করেন। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির সংখ্যা একালে খুব বেশী ছিলেন না। ভারতীয় দর্শনের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। পাটনা, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি-লিট্ উপাধীতে ভূষিত করেন। কিন্তু ইহা তাঁহার সম্মান, পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের যথোপযোগী ছিল না। স্যার মরিস গয়ারের মৃত্যুতে শুধু একজন একালের পণ্ডিতই অন্তর্হিত হইলেন না, একজন অতিবড় দরদী ভারত-বন্ধু নীরবে ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ করুণ।

রবীন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড
৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা সংস্কৃত গ্রন্থমালা

গোভিলগৃহ্যসূত্র ১৫৲
সামবেদীয় প্রসিদ্ধ প্রামাণিক সূত্রগ্রন্থ। ভট্ট-নারায়ণ কৃত প্রাচীন ভাষ্য ও সুবিস্তৃত টিপ্পনী সহ।

কৌলজ্ঞাননির্ণয় ৩॥০
মৎস্যেন্দ্রনাথ-সম্প্রদায়ের কৌলজ্ঞান-নির্ণয়, অকুলবীরতন্ত্র, কুলানন্দতন্ত্র ও জ্ঞানকারিকা। নেপাল হইতে সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য হস্তলিপি অবলম্বনে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী, এম-এ, ডি-লিট্ (প্যারিস) কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

বেদান্তসিদ্ধান্তসূক্তিমঞ্জরী ৫৲
গঙ্গাধরেন্দ্র সরস্বতী প্রণীত বেদান্ত-গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বেদান্ত-তীর্থ কর্ত্তৃক ইংরাজী ভূমিকা ও টিপ্পনী সহ সম্পাদিত।

কাব্যপ্রকাশ ১২৲
মম্মট ভট্ট কৃত সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত অলঙ্কার-গ্রন্থ। মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের 'আদর্শ' নামক টীকা, শ্রীযুক্ত এস কে দে, এম্-এ, ডি-লিট্ লিখিত ইংরাজি ভূমিকা ও শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর, এম্-এ, পি-এইচ-ডি লিখিত ইংরাজি 'অ্যানালিসি' সহ।

মাতৃকাভেদতন্ত্র ২॥০
ইংরাজি ভূমিকা সহ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সপ্তপদার্থী ৫৲
শিবাদিত্য কৃত। বৈশেষিক দর্শন-সম্মত পদার্থ নিরূপণের গ্রন্থ। মিতভাষিণী, পদার্থ-চন্দ্রিকা, বলভদ্র-সন্দর্ভ, ইংরাজি ভূমিকা ইত্যাদি সহ।

ন্যায়ামৃত-অদ্বৈতসিদ্ধি ১৫৲
বেদান্ত-গ্রন্থ সাতটী টীকা এবং ইংরাজি ও সংস্কৃত ভূমিকা প্রভৃতি সহ। সাক্ষিবাধ-বিচার পর্য্যন্ত, প্রথম খন্ড।

ডাকার্ণব ৬৷০
বৌদ্ধতন্ত্র। ইংরাজি ভূমিকা সহ। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্-এ, পি-এইচ-ডি সম্পাদিত।

অধ্যাত্মরামায়ণ—২ খণ্ড ১৫৲
নরোত্তম ও গোপাল চক্রবর্ত্তীর টীকা, টিপ্পনী, ইংরাজি ভূমিকাদি সহ।

কুমারসম্ভব ২॥০
মল্লিনাথ কৃত টীকা, ভরত মল্লিক, নাথ ও নারায়ণ কৃত টীকার সারাংশ, অন্বয়, বাচ্যান্তর, বাংলা ও হিন্দি অনুবাদ সহ।

ছন্দোমঞ্জরী ২৲
সংস্কৃত পরীক্ষায় পাঠ্য—ছন্দ-বিষয়ক প্রামাণিক গ্রন্থ। টীকা ও অনুবাদ ইত্যাদি।

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী ২৲
বাচস্পতি মিশ্র কৃত। অপ্রকাশিত 'সাংখ্য-তত্ত্ববিলাস' গ্রন্থের উপোদ্‌ঘাত প্রকরণ সহ।

যুক্তিদীপিকা ৬৷০
অপ্রকাশিতপূর্ব্ব সাংখ্যগ্রন্থ। শ্রীযুক্ত পুলিন-বিহারী চক্রবর্ত্তী, এম-এ, সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

ন্যায়দর্শন—২য় খণ্ড ৮৲
বাৎস্যায়ন ভাষ্য, উদ্দ্যোতকরের বার্ত্তিক, বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্য্য-টীকা, বিশ্বনাথ বৃত্তি ও টিপ্পনী সহ। ৪ ৫ অধ্যায়।

শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি ১৬৷০
পূর্ণানন্দ পরমহংস কৃত অপ্রকাশিত তন্ত্র-গ্রন্থ। ইংরাজি ভূমিকাদি সহ।

চতুরঙ্গদীপিকা ২৬০
শূলপাণি কৃত দ্যূতক্রীড়া-বিষয়ক গ্রন্থ। ইংরাজি ভূমিকা ও অনুবাদ সহ।

নন্দিকেশ্বর-কাশিকা ॥০
(মূলমাত্র)।

প্রাসাদমণ্ডনম্ ১০৲
সূত্রধর-মণ্ডন কৃত প্রাসাদমণ্ডন ও রাজ-বল্লভমণ্ডন নামক বাস্তু ও গৃহনির্ম্মাণ-বিষয়ক শিল্পশাস্ত্রীয় দুইখানি গ্রন্থ একত্র।

রঘুবংশম্ (হিন্দি অনুবাদ) ১৲

কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ

মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস্ লিঃ

৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা-১৪
টেলিফোন: সিটি ১৩০৭

হেড অফিস—৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩
টেলিফোন: সিটি ১৩০১

দামোদর [ফোটো—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বিংশ বর্ষ | অগ্রহায়ণ—১৩৫৯ | ১ম খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা

আধুনিক জার্ম্মান-সাহিত্যের দুই দিক

অধ্যাপক সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে বলতে হয়, আধুনিক জার্ম্মান সাহিত্যের বয়স খুব বেশী হবে না। বিখ্যাত ইতালীয় কবি দান্তের উদ্ভব হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। এর পর আসে ইংলণ্ডের এলিজাবেথের যুগ—যাকে জার্ম্মানীতে বরাবরই "সেক্সপীয়রের যুগ" নামে অভিহিত করা হয়েছে। ফরাসী সাহিত্যের গৌরবময় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কাল হোলো সপ্তদশ শতাব্দী। এর অনেক পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হয় জার্ম্মানীর জাতীয় সাহিত্যের জন্ম। তার ক্রমোন্নতির ইতিহাস পড়তে গেলে অগ্রসর হতে হয় আরোও সামনের দিকে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর সিংদরওয়াজা অতিক্রম করে একেবারে প্রাচীন যুগের সাহিত্যের চৌকাঠ পিছনে ফেলে, আমাদের এসে দাঁড়াতে হয় এমন একটা জায়গায় যেথানে একত্রে মিলিত হয়েছে ১৮শ ও ২০শ শতাব্দীর মধ্য এবং পূর্ব্বভাগের সাহিত্যের দুইটী বিভিন্ন স্রোত-ধারা।

অতি পুরাকাল হতেই জার্ম্মানীতে যাদু, মন্ত্র, প্রার্থনা ও অনুবাদমূলক সাহিত্যের রেওয়াজ ছিল। উক্ত শ্রেণীর সাহিত্যের দুএক টুকরো অবশিষ্ট যে এখনও না মেলে তা নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ Das Hildebrandslied অর্থাৎ 'হিল ডিব্রাণ্ডের গাথা'র নাম করা যেতে পারে। সার্লামাইন (মহামতি চার্লস ফ্রান্সে ও জার্ম্মানীতে Karl der gross নামে পরিচিত)-এর পুত্র সম্রাট ধর্ম্মপরায়ণ লুইএর আদেশে তাঁর রাজত্বকালে এই জাতীয় "অখৃষ্টান পুঁথিপত্র" অগ্নিসহযোগে বিনষ্ট করে ফেলা হয়েছিল বলেই এখন আর এগুলো বড একটা দেখা যায় না। মধ্য যুগের কাব্যের মধ্যে Das Nibelungen_ied (নিবেলুঙ্গেদের গাথা) আজও 'দয়েৎসল্যাণ্ডের মহাকাব্য' বলে পরিগণিত

হয়ে থাকে। রচয়িতার নাম জানা না গেলেও তিনি যে অষ্ট্রিয়ান ছিলেন সে সম্বন্ধে বহু প্রমাণ বর্ত্তমান। Gudrun হচ্ছে আর একটি ছোট খাটো 'এপিক'—উত্তর সমুদ্রের উপকূল অঞ্চলের saga বলা হয়েছে একে।

'কোর্টএপিকের' মধ্যে 'পারৎসিফাল' ও 'ত্রিস্তানের' নাম করা যেতে পারে। ভোলফ্রাম ফন এসেনবাখ প্রথমোক্ত বিখ্যাত কাব্যখানি আনুমানিক ১২০০ খৃঃ অব্দে রচনা করেন। 'ত্রিস্তানের' কবি স্ত্রাসবুর্গের গোৎফ্রিদ ছিলেন ফরাসী প্রেমিক। তাঁর ও বাভেরিয়াবাসী নাইট ফন্ এসেনবাখের রচনায় সম্ভবতঃ একই কারণে ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব এতটা বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

লিরিক কবিতা

'লিরিক' বা গীতিপদকে জার্ম্মান সাহিত্যের মহৈশ্বর্য্য বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। জার্ম্মান ভাষায় 'লিরিককে' 'মিনেজাচর্ত্তে' কবিদের মিনেজেঙ্গের বলা হয়। এই মিনেজেঙ্গেরদের মধ্যে ভালথের ফন দেয়র ফোগেলভাইদেই (১১৭০-১২৩০) কেবল দাবী করতে পারেন সর্ব্বোচ্চ স্থান—অসংশয়িতরূপে। ফোগেলভাইদের সারা যৌবনটাই দারিদ্র্যের কঠোর নিস্পেষণে শুকিয়ে হয়ে গিয়েছিল কাগজ-চাপা বিবর্ণ পত্র-পাতার পাঁপড়ির মত। সুন্দরতিরল (Tyroh) থেকে এসেছিলেন তিনি জীবিকা উপার্জ্জনের আশায় জার্ম্মানীতে। দক্ষিণ জার্ম্মানীর প্রথম রাজসভা হতে আর এক রাজ সভায় গান গেয়ে বেড়ান তিনি বহুদিন। কিন্তু হায়! তাঁর করুণ ক্রন্দনে এতটুকুও মন টলেনি ভাগ্যদেবীর। ফোগেলভাইদের লিরিকের মধ্যে একাধারে মানব মনের 'ইমোসান' হতে সুরু করে প্রণয়-সঙ্গীত, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপপূর্ণ রাজনৈতিমূলক অভিব্যক্তি—কিছুরই অভাব দেখা যায় না। তিনি ছিলেন আজন্ম বিদ্রোহী; মান্ধাতার আমলের পুরাণো সাহিত্যের ধারা বদলে দিয়ে নতুন চাহিদার ছাঁচে ঢেলে তাকে সাজাতে হবে এই ছিল তাঁর 'স্লোগান।' তার শঙ্করের কবি নিতাইএর মতো ফোগেলভাইদের মনেও জেগে উঠেছিল এই প্রশ্ন: "জীবন এত ছোটো কেন?"

শৌর্য্য বা বীরত্বমূলক কবিতার (Chivalrous Poetry) সমাদর জার্ম্মানী বেশীদিন করেনি। উচ্ছ্বাস যেমন দ্রুত জাগে, মিলিয়ে যায়ও তেমনি দ্রুতভাবে। বিশেষ করে সে উচ্ছ্বাস যদি হয় কৃত্রিম। যাহোক উনবিংশ শতকের গোড়ায় রোমান্টিক কবিদের উৎসাহ ও আপ্রাণ চেষ্টার ফলে এই জাতীয় কবিতা ও সাহিত্যের পুনঃ প্রচলন সম্ভব হয়। কিন্তু এই যুগে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কবিরাই হন জয়যুক্ত। সাহিত্যে রথের চালন চক্র অতঃপর এরাই নির্দ্দেশ করতে থাকেন। মিনেজেঙ্গেররা নাম বদলে হন মাইস্তের জেঙ্গের।

ভাগনেয়র ও হান্স স্তাক্স

সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেই রিচার্ড ভাগনেয়রের নাম শুনে থাকবেন। তাঁর রচিত "ন্যুরেমবেয়র্গের মাইস্তেরজেঙ্গেরগণ" ইউরোপীয় গীতিনাট্যের ইতিহাসে এক অমর সৃষ্টি। এই মাইস্তেরজেঙ্গের বা ওস্তাদ গায়কদলের প্রায় অধিকাংশই ছিলেন কারিগর কিংবা শিল্পী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের প্রধান আন্দোলন কেন্দ্র ছিল রাইখের (জার্ম্মান সাম্রাজ্যের) কতগুলি বর্দ্ধমান নগরে। স্থানে স্থানে সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করে এরা সঙ্গীত বিদ্যাচর্চ্চা এবং রুক্ষ আপণিক ভাষায় কবিতা লেখা অভ্যাস করতেন; তাঁরা বলতেন, অন্যান্য বিষয়ের মত কবিতাও শিক্ষা করবার এবং দেবার জিনিষ। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সভ্যবৃন্দকে মেনে চলতে হোতো কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট আইন কানুন যার একটিও অমান্য করলে অপরাধীকে ভোগ করতে হোতো কঠোর সাজা। ন্যুরেমবেয়র্গের মধ্যে সর্ব্বাধিক বিখ্যাত ছিলেন মাইস্তেরজিঙ্গের হান্স স্তাক্স। জুতো তৈয়ারী করে দিনগুজরান হত তাঁর। তাই তাঁর রচিত প্রতিটি কবিতার শেষে দেখতে পাই হান্সের সগর্ব্ব ঘোষণা: 'So schreibt Hans sachs in Schuhmacher und Poet dazu' অর্থাৎ চর্ম্মকার ও কবি হান্স স্তাক্স এই কবিতাটি লিখেছেন।

প্রায় এই সময়েই একাধিক অজ্ঞাত কবি বহু সঙ্গীতমূলক কবিতা রচনা করেন। পল্লী-গীতি বা লোক সঙ্গীত হিসাবে এগুলি বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। এছাড়াও পশুপক্ষীদের নিয়ে fable বা নীতিকথা এবং হাস্যরসাত্মক সাহিত্য রচনা করা হোলো এযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ Till Eulenspiegel ওগোত্রফের Reineke Fuchs-এর নাম করা গেল।

লুথার ও ক্ল্যাসিকাল যুগ

ইউরোপে, সংস্কার যুগের শ্রেষ্ঠতম স্মরণীয় ঘটনা হোলো,—লুথার কর্ত্তৃক বাইবেলের অনুবাদ। মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬) ছিলেন থুরিঙ্গিয়ার এক খনকের পুত্র। গ্রীক এবং হিব্রু ভাষা থেকে সরল, অনাড়ম্বর জার্ম্মানে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম-পুস্তক বাইবেল অনুবাদ করার জন্ত তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে থাকবেন অমর হয়ে। লুথারের পূর্ব্বে অন্যূন বার-তের জন সাহিত্যিক বাইবেলের অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু জার্ম্মান সাহিত্যের ইতিহাসে একমাত্র মার্টিন লুথারের নামই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে চিরদিন।

লুথারের অনূদিত বাইবেল আজও সারা প্রোটেষ্টাণ্ট জার্ম্মানীতে 'আদর্শ সাহিত্য' বলে সম্মানিত হয়ে থাকে। গ্রন্থের মূল অংশ অবশ্য অনেক পরিবর্ত্তিত হয়েছে—নানান যোগ-বিয়োগের ফলে এখন মাঝে মাঝে আসল-নকলের সামান্ত প্রভেদটুকুও অনভিজ্ঞ দৃষ্টির সামনে ধরা পড়ে না।

থুরিঙ্গিয়ার অনতি দূরে আছে আইজেনাক্ শহর। এই আইজেনাকের ভারৎবুর্গ দুর্গে পৃথিবীর অন্যতম প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারক—মার্টিন লুথার বাইবেলের অনুবাদ করেন। ট্যুরিষ্ট ও ঐতিহাসিকের কাছেও এই তীর্থস্থানের মূল্য—অল্প নয়। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নির্ম্মিত এই প্রাচীন দুর্গ একাধারে ধর্ম্ম, দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্যের ভিত্তিভূমি। আনুমানিক ১৫২১ খৃঃ অব্দে লুথার ভারৎবুর্গে আগমন করেন। তাঁর বহু পূর্ব্বে ভলিখের ফন দেয়র ফোগেল ভাইদে এবং এসেনবাখের ভেলিফ্রামও এই দুর্গ পরিদর্শন করেছিলেন।

লুথারের পর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক হচ্ছেন দার্শনিক গোৎফ্রিদ্ ভিলহেল্ম লাইবনিৎজ্ (১৬৪৬—১৭১৬) ইংরাজীতে যাকে 'universal mind' বলা হয় লাইবনিৎজ ছিলেন তাই। বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধে লাইবনিৎজের দর্শনশাস্ত্র ও তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে এক বিশদ সমালোচনা করেছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাবর্গকে সেটী পড়ে দেখতে অনুরোধ জানাচ্ছি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জার্ম্মান হ'লেও লাইবনিৎজের অধিকাংশ প্রবন্ধই ফরাসী ভাষায় লিখিত। শোনা যায় তিনি নাকি চিন্তাও করতেন ফরাসীতে।

জার্ম্মানীর 'ক্লাসিকাল সাহিত্যের যুগ' বলতে বিদেশী প্রভাবের আধিপত্যকেই বোঝায়। ফরাসী ছাড়া ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবও জার্ম্মান জাতীয় সাহিত্যিক জীবনে অল্প অনুভূত হয়নি। জার্ম্মানরা তখন ইংরাজী ভাষাকে এড়িয়েই চলত যতটা সম্ভব। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, কয়েকটি ভ্রাম্যমান নাট্যকে সম্প্রদায় যখন জার্ম্মানীতে এসে সরল ইংরাজী ভাষায় বিস্মিত ও মুগ্ধ জনতাকে দেখালো ব্রিটিশ রঙ্গমঞ্চের অভিনব কলা-কৌশল, তখন জার্ম্মানীর খেয়াল হোলো যে 'কি জিনিষ তাহারা হারাইতেছিল।' (সুধী পাঠক-পাঠিকা লেখককে এই সাময়িক ব্যঙ্গোক্তিটী ব্যবহার করার জন্য অনুগ্রহ করে যেন মার্জ্জনা করেন, এই অনুরোধ।) অতঃপর পেশাদার অভিনেতাদলের উদ্যোগে একাধিক ইংরাজী নাটক ও উপন্যাস জার্ম্মান ভাষায় অনূদিত হোলো, সেক্সপীয়রও বাদ গেলেন না।

জার্ম্মানীতে সেক্সপীয়রের যুগ

অষ্টাদশ শতকের গোড়ায়, ঘুনধরা জার্ম্মান সাহিত্যের বুড়ো বটগাছটার মূলে,জীবনবারি সেচন করলেন উইলিয়ম সেক্সপীয়র। ফ্রিদেনথাল বলেছেন, তাঁর নাম এই সময় জার্ম্মান-সাহিত্যাকাশে হয়ে উঠেছিল উজ্জ্বল নক্ষেত্রেরই মতো। লেসিং (১৭২৯-১৭৮১) সর্ব্বপ্রথম ফরাসী প্রভাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে লিখলেন এক জ্বালাময়ী প্রবন্ধ; দেখালেন অন্ধ অনুকরণের দোষগুণ। জার্ম্মানীর কয়েকজন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক প্রথমে গদ্যে (ভাইলান্দ্) ও পরে মূল ছন্দে (এ, ডবলিউ শ্লেগেল) সেক্সপীয়রের একাধিক নাটকের অনুবাদ করলেন। জার্ম্মান-সাহিত্য ও ভাবধারার সঙ্গে সেক্সপীয়রকে এই উপায়ে পুরোপুরি-ভাবেই খাপ খাইয়ে নিলে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী-ঘেঁষা জার্ম্মান সাহিত্য-সেবীর দল। নদীর স্রোত এবার প্রবাহিত হোলো এক অভিনব খাতে মূলতঃ ক্লাসিকাল জার্ম্মান নাট্যসাহিত্য বলতে জার্ম্মানীতে আজও সেক্সপীয়রের নাটকাবলীর জার্ম্মান অনুবাদকেই বুঝিয়ে থাকে।

তারপর এলেন মিলটন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেক্সপীয়রের বহু পূর্ব্বেই তাঁর প্রভাব অনুভূত হওয়া উচিত

ছিল হল্যাণ্ডে। কিন্তু রেনেশাঁস—যাকে আমরা বাংলা ভাষায় সাহিত্য দর্শন কলাদির নবজীবন বলে থাকি —সব সময় ইতিহাসের পিচঢোড়া বড় রাস্তা ধরে চলে না। সুতরাং ইতিহাসের বীণায় ঘটলো এই অসাময়িক ছন্দপতন। ফ্রিদরীশ গোৎলিব ক্লপস্তক্ কবির বিশ্ববিশ্রুত Paradise Lost অথবা স্বর্গভ্রষ্ট কাব্য দেয়ার মেসিয়াস (ত্রাণকর্ত্তা অর্থাৎ যিশুখৃষ্ট) নাম দিয়ে অনুবাদ করলেন ওজস্বিনী, ছন্দোবদ্ধ জার্ম্মান ভাষায়। লেসিং ছিলেন সমালোচক ও প্রবন্ধকার। এবার তিনিও রঙ্গমঞ্চের দিকে দৃষ্টি দিলেন। পিতৃভূমির ভাগ্যও ভাল ছিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই লেসিং তাঁর রচিত পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রথম মিলনান্ত নাটক 'মিনা ফন বার্ণহেলম' ('বার্ণহেলমের মিনা') দিলেন তাঁর দেশবাসীকে উপহার। লেসিংএর শেষ নাটকখানির নাম হোলো 'জ্ঞানী নাথান' বা 'নাথান দেয়র ভাইসে।' পরধর্ম্ম সম্বন্ধে ঔদার্য্য ও উচ্চ বিশ্বাস এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু। বহুবৎসর যাবৎ সরকারী প্রতিষেধের অধীনে ছিল নাটকখানি। সুখের বিষয় জার্ম্মান সরকার রঙ্গমঞ্চে নাটকখানির পুনঃ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন।

গোএথে ও জার্ম্মান সাহিত্যে যুগান্তর

জোহান ভোলফ্গাংগ গোএথেকে (১৭৪৯-১৮৩২) 'অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্ম্মান ক্লাসিকাল সাহিত্যের শীর্ষ বিন্দু (Climax) বলা হয়। গোএথের বাস ছিল ফ্রাঙ্কফুর্ত্ত শহরে। তিনি প্রথম যে উপন্যাসখানি রচনা করেন তার নাম হোলো 'Wert hers Leiden' (ভেয়রথের্স লাইদেন) অর্থাৎ 'ভেয়রথের এর বেদনা'। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে উপন্যাস খানি প্রকাশিত হয় ও অতি অল্পকালের মধ্যেই সারা ইউরোপে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। শোনা যায়, দিগ্বিজয়ী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট স্বয়ং যুদ্ধযাত্রাকালে উক্ত উপন্যাসের এক খণ্ড তাঁর সঙ্গে সদাসর্ব্বদা রাখতে ভুলতেন না। উপন্যাসখানি মূলতঃ মনস্তত্ত্ববিষয়ক। ব্যর্থ প্রেম, আবেগ প্রবণ, অস্থিরমতি এক তরুণ পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করে ক্ষতবিক্ষত চিত্তে কেমন করে নিজের হাতে তার জীবনের অবসান ঘটালো, অদ্ভুত দক্ষতা ও চাতুর্য্য সহকারে মহাকবি গোএথে সেই কাহিনী বর্ণনা করেছেন তাঁর উপন্যাসের প্রতি পৃষ্ঠায়। গোএথের প্রথম নাটক "Gotz von Berlichingen"এ ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের পূর্ব্বেকার প্রাচীন জার্ম্মানীর চিত্র অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত করা হয়েছে। সর্ব্বপ্রথম ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে এটীর আদর্শগত মূল্যও নিতান্ত অল্প নয়, কারণ এই নাটক-খানি প্রকাশিত হবার অনতিকাল পরেই একাধিক নাট্য-কারের সমবেত প্রচেষ্টায় প্রায় ঐতিহাসিক নাটক বার্লিনের রঙ্গগৃহে মঞ্চস্থ করা হয়েছিল বলে প্রকাশ। নাটকের নায়ক হচ্ছেন ষোড়শ শতাব্দীর এক দস্যু জমীদার। কিন্তু তাঁর চরিত্র যারপরনাই মহৎ ও উদার; অন্যায় অত্যাচার ও দরিদ্রের প্রতি পীড়নের প্রতিবিধান করাই তাঁহার পেশা।

গোএথের গ্রন্থাবলী ও রচনা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা অসম্ভব। স্থানাভাবই তার একমাত্র হেতু। তাঁর নাটকের মধ্যে 'ফাউস্ত', 'ইফিগেনি' ও 'তাসো' উপন্যাসের মধ্যে 'ভিল্ হেলম মাইস্তের' (কার্লাইল কর্ত্তৃক অনূদিত) এবং নানা ছন্দের ছোট বড় অসংখ্য কবিতার (যথা: হাইদেন্স লাইন) মাত্র কয়েকটীর নাম করা যেতে পারে। এমন কোন বিষয় নেই যা নিয়ে গোএথে সাহিত্য রচনা করেননি। দৃষ্টি-বিজ্ঞান, আলোক বিদ্যা ও ভূতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁর বহু গ্রন্থ বর্ত্তমান।

গোএথে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই থুরিঞ্জিয়ার ভাইমার নামক ছোট শহরটীতে অতিবাহিত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর, ভাইমার পাশ্চাত্য সভ্যতার আধ্যাত্মিক কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। ইংলণ্ড, রাশিয়া, ইতালী, স্কান্দিনেভিয়া প্রমুখ ইউরোপের নানান দেশ হতে প্রতি বৎসর ভাইমারে কোটী কোটী নরনারীর সমাগম হয়ে থাকে। ভাইমার হোলো মধ্য-ইউরোপের 'সাগরদাঁড়ি' স্বর্গাদপি গরিয়সী, পুণ্যতোয়া মহাতীর্থ—যার প্রতিটি ধূলিকণার সাথে জড়িয়ে আছে জার্ম্মানীর প্রাতঃস্মরণীয় জোহান ভোলফ্রাম গোএথের অপরূপ জীবনকথা।

শিলেয়র

গোএথের পরই ফ্রিদরীশ শিলেয়রের নাম উল্লেখ করা উচিত। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে তাঁর জন্ম হয় ও ১৮০৫ খৃঃ

অব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। নাট্যকার হিসাবে তাঁর স্থান গোএথেরও বহু উর্দ্ধে। কথিত আছে, ইংরাজ কবি বাইরণের মতো শিলেয়রও রাতারাতি প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন মাত্র তাঁর একখানি গ্রন্থের জন্য। তাঁর "দিরএবের" (Die Ranber) অর্থাৎ "দস্যু" নামক নাটকখানি বাস্তবিকই এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। রাজশক্তির অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে শিলেয়র রচনা করেন এই নাটক, কিন্তু তার ফলে দক্ষিণ জার্ম্মানীর যে রাজকুমারের অধীনে তিনি 'সার্জ্জেনের' চাকুরী করতেন তাঁর রোষে পড়ে সেটী খোয়াতে হয় তাঁকে। তাঁর 'ত্রিখণ্ড শেষ নাটক' (trilogy) 'ভালেনস্তাইন' (কোলরিজ কর্ত্তৃক অনূদিত) জার্ম্মান রঙ্গমঞ্চের সম্পদ ও অধুনাপি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত নাটক বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

শিলেয়রের সর্ব্বশেষ নাটকখানির নাম হচ্ছে 'ভিলহেলম'—বা 'উইলিয়াম টেল।' উইলিয়াম টেলের নেতৃত্বে সুইজারল্যাণ্ডের জনসাধারণ কেমন করে বেলিফ গেসলার ও সম্প্রদায়ের যুগব্যাপী নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারের অবসান ঘটালো, এই নাটকে আছে তারই সুন্দর বর্ণনা। ছেলের মাথায় আপেল রেখে এক তীরে সেটী দু'খণ্ড করে ফেলার গল্প শোনেননি এমন লোক খুব অল্পই দেখা যায় কোন দেশে। রাশিয়ার ঋষি টলষ্টয়ের মতোই শিলেয়রের নাম জার্ম্মানীর আবালবৃদ্ধ বনিতার কাছে শ্রদ্ধা, সম্মান ও গর্ব্বের বস্তু। অত্যাচার ও পীড়নের বিরুদ্ধে কখনও লেখনী নীরব থাকেনি তাঁর।

ফ্রিদ্‌রীশ হেলেদরলিন (১৭৭০-১৮৪৩) ছিলেন শিলেয়রের শিষ্য। ক্লাসিকাল কবি হিসাবে গোএথে ও শিলেয়রের পরই তাকে তৃতীয় স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জীবদ্দশায় তাঁকে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতভাবেই কাল যাপন করতে হয়েছিল। হেলেদরলিনের মৃত্যুর পর সমাজের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে তাঁর 'চিতায় মঠ দেওয়া' হয় এবং তাঁর গ্রন্থাবলীও উপযুক্ত সমাদর লাভ করে। 'খাঁটি জার্ম্মান চিন্তাধারার প্রতিনিধি হতভাগ্য ফ্রিদরীশ হেলেদরলিনের রচনাশৈলীর সঙ্গে স্বাধীন দেশের প্রত্যেক শিক্ষিত নরনারীর পরিচয় করা কর্ত্তব্য।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে জার্ম্মান দর্শন-শাস্ত্রের দান ঃ উনবিংশ শতাব্দী ও সংবাদপত্রের জন্ম ঃ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপে, সাহিত্যের আসন দর্শনশাস্ত্র দখল করে—এবং যে দর্শন হোলো জার্ম্মানীর নিজস্ব ও জাতীয়। সাহিত্যের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করে দেখলে অবশ্য অনেকেই লেখকের সঙ্গে এক মত হতে পারবেন না। কারণ, গ্রন্থ হিসাবে কেবল বিদেশীর কাছে নয়, স্বয়ং জার্ম্মানদের কাছেও এই জাতীয় (অর্থাৎ দর্শন সম্বন্ধীয়) রচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাষা ও চিন্তাধারার দিক দিয়ে কঠিন, নীরস এবং দুর্ব্বোধ্য বলে বোধ হয়। জার্ম্মান দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবলমাত্র আর্থার সোপেনহএর (১৭৮৮-১৮৬০) ও ফ্রিদরীশ নিৎজেকে (১৮৪৪-১৯০০) 'সমধিক জনপ্রিয় দার্শনিক' বলে অভিহিত করা যেতে পারে। সাধারণ শ্রেণীর পাঠক পাঠিকার পক্ষেও এঁদের সাহিত্যলাভ করা সহজ এবং সুখসাধ্য। ইমানুএল কান্ত (১৭২৪-১৮০৩) ও মার্কসবাদের পথপ্রষ্টা এবং ক্রমোন্নতিমূলক ন্যায়শাস্ত্রের' (dialectical progress) জন্মদাতা জি, ডবলিউ, এফ হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১) কথা না হয় বাদই দিলাম।

রোমান্টিক যুগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—'অস্থিরতা'—কি সাহিত্য, কি দর্শন, কি সঙ্গীত সকল ক্ষেত্রেই কেমন একটা ভাঙা-ভাঙা, অসম্পূর্ণ, অপরিণত সম্ভাবনার ছোঁয়াচ—তাই এ যুগের জার্ম্মানীতে লক্ষ্য করা যায়। একমাত্র 'অনুবাদ সাহিত্য' ও গুটিকতক নাম করা শিশুদের উপযোগী উপকথারই যা সৃষ্টি হয়েছিল এই যুগে। 'দেস নাবেন ভুন্দেরহর্ন' (শিশুদের আশ্চর্য্য শিঙা) ও গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্কলিত 'কিন্দের উন্দ হাউসমের্সেন দেয়র ব্রিদের গ্রিম' (সংক্ষেপে ঃ গ্রিমের উপকথা) গ্রন্থ দুখানিই তার মধ্যে প্রসিদ্ধ। প্রথমোক্ত গ্রন্থখানিতে আছে প্রাচীন ডুয়েৎস্‌ল্যাণ্ডের লোক-গীতি বা পল্লী-সঙ্গীত। ব্রেটানো ও চারনিমের সমবেত চেষ্টায় গ্রন্থখানি সম্পাদিত হয়। 'গ্রিমের উপকথার' নাম পৃথিবীর সভ্য দেশের প্রায় সব খোকা খুকুরাই শুনেছে।

'অপেরা' বা গীতিনাট্যের ব্যাপক প্রসার উনবিংশ শতকের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এ ক্ষেত্রে জার্ম্মানীর দান

অপরিমেয়। আইসেনদোর্ফ, উইলান্দ, সাথিসো (জাতে ফরাসী, জার্ম্মান স্বদেশীরূপে গৃহীত), হাইনরিখ্ ফন ক্লাইস্ত (১৭৭৭-১৮১১), রিখের্ত, লেনাউ, মেরিক, জাঁপোল (১৭৬৩-১৮২৫) (পুরো নাম ঝাপোল ফ্রিদরীশ রিখতের), হাইনরিখ্ হাইন (১৭৯৭-১৮৫৬) প্রমুখ কবি, সঙ্গীতকার ও ঔপন্যাসিক তাঁদের স্ব স্ব শ্রেষ্ঠ রচনা এই সময় জার্ম্মানীকে উপহার দেন। ফাঁস্ত্স্ সুবের্ত্ত ও রবের্ত্ত সুমান, ভেবেয়র ও ভাগনেয়র হাইন প্রভৃতি কবির রচনায় সুর সংযোগ করে তাঁদের খ্যাতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করে তোলেন। 'দাস বুক দেয়র লিদের' ও 'রোমানথেরো' হাইনের অদ্ভুত কবি-প্রতিভার নিদর্শন। হাইন হচ্ছেন আধুনিক জার্ম্মানীর বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম। উগ্র স্বদেশানুরাগ ও স্বাধীনতাপ্রেম হোলো হাইনের কবিতার সারবস্তু। সরকারী আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অগ্ন্যুদ্গার করার ফলে তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছিল। অবশেষে ক্রাইলিগ্রাক ও গেয়র্গবিক নেয়রের মতো তাঁকেও আপন জন্মভূমি পরিত্যাগ করে ফাঁসীকাঠের আওতা থেকে মাথা বাঁচাতে হয়। গো-এথের মতো লেনাউ, মেরিক ও হাইনের জীবন কথাও অপূর্ব্ব। মাত্র দু এক কথায় তা বলা অসম্ভব। সুধী পাঠক পাঠিকার তরফ থেকে তাগিদ পেলে স্থানান্তরে তিনটি বিভিন্ন প্রবন্ধে এই "ত্রয়ী"র সমগ্র জীবনের কাহিনী সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

হাইন কেবল কবি ছিলেন না। তাঁকে তরুণ জার্ম্মানীর পথপ্রষ্টা প্রথম সংবাদপত্রসেবীও বলা যেতে পারে। পত্রিকা ক্ষুদ্র পুস্তক ইত্যাদির প্রচলন হাইনের প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হয়। কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) তাঁরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৮৪২ খৃঃ অব্দে তাঁর বিখ্যাত সাময়িক পত্র Reiniche Zeitung প্রকাশ করেন। হাইনের মতো মার্কসও বিদেশে পলায়ন করেছিলেন। ব্রিটিশ মিউ-জিয়ামের পাঠাগারে বসে তিনি রচনা করেন তাঁর বিশ্ব-বিশ্রুত গ্রন্থ Das Kapital; ভিয়েনাবাসী ফ্রানৎস গ্রিল্-পারৎসের ঠিক এই সময়েই রচনা করেন তাঁর একখানি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত নাটক—দেস মেরেস উন্দ্ডেয়র লিবে ভেল্লেন (সমুদ্র ও প্রেমের তরঙ্গ), নায়ক হেরো ও লেয়ান্দের এর অপূর্ব্ব প্রণয় কাহিনী গ্রিল পারৎসের অতি করুণভাবে বর্ণনা করেছেন এই গ্রন্থে। ভাষার অকৃত্রিমতা ও পরের মাধুর্য্য নাট্যকারের স্বভাবসঞ্জাত অদ্ভুত সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকদের নাম হচ্ছে যথাক্রমে ফ্রিদরীশ হেবেল (১৮১৩—১৮৬৩) 'তাগবীকের বা রোজ নামচা নামক আত্মবিশ্লেষণ সমন্বিত অপরূপ গ্রন্থের রচয়িতা আনেতেফন দ্রোস্তে হিলসোফ: জার্ম্মানীর কামিনী রায় বা ব্যারেট ব্রাউনিং বলা যেতে পারে একে অনায়াসে, ইএরেমিয়াস গোৎহেলফ: সুইস গ্রাম্যভাষায় জার্ম্মান পটভূমিকা সহযোগে একাধিক ছোট গল্প রচনা করেছিলেন ইনি; এতদ্ভিন্ন নিম্ন জার্ম্মান ভাষায় ফ্রিৎস রয়তেয়র (১৮১০-৭৪) ক্লাউস গ্রথ থেওদরস্তোর্ণ প্রমুখ ধীশক্তি-সম্পন্ন বহু ব্যক্তি একাধিক প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন এই যুগে। সর্ব্বশেষে আসেন ৎজুরিখের গোৎ ফ্রিদ কেল্লের (১৮১৯-১৮৯০) এবং সি, এফ, মেইএর (১৮২৫-১৮৯৮) কেল্লেরের (দেয়র গ্রীণ হাইনরিখ (বা হরিৎ হেনরী) সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে যে কোনও শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের পার্শ্বে স্থান পাবার যোগ্য।

বিংশ শতাব্দী ও সোশ্যাল রিয়ালিজ্‌ম

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সমাজতন্ত্রবাদ জার্ম্মানীর দৈনন্দিন আর্থিক ও রাজনৈতিক জীবনে তোলে তুমুল আলোড়ন। গুস্তাভ ফ্রেইতাগ গেরহার্ত্ত হাউপ্তমান হের্ম্মান সুদেরমান ও থিওদর ফন্তানে (১৮১৯-১৮৯৮) প্রমুখ সাহিত্যিক ছিলেন উক্ত আন্দোলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁদের রচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল পুঁজীবাদী ধনিক সম্প্রাদায়ের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর চিরন্তন সংগ্রাম। ফ্রেইতাগ ও হাউপ্তমান দুইজনেই সুদূর সাইলেসিয়া হতে এসেছিলেন জার্ম্মানীতে। ফ্রেইতাগ লিখিত 'Soll und Haben'(ঋণের খাতা) নামক উপন্যাস জার্ম্মানীর সমসাময়িক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রুটিনবাঁধা বৈচিত্র্যহীন দৈনন্দিন জীবনের এক নিখুঁত আলেখ্য। হাউপ্তমানের (১৮৬২-১৯৪৬) Die we ber (তাঁতী) ও Biberpelz (উদ্বিড়ালের চর্ম্ম) নামক প্রসিদ্ধ নাটক দুইখানির সম্বন্ধেও ঐ কথা প্রযোজ্য।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, 'রিয়ালিসম' বা 'বাস্তববাদ' জার্ম্মানীর সাহিত্যিক জীবনে বেশীদিন টিঁকে থাকতে পারে নি। জন্মের মতো তার মৃত্যুর ইতিহাসও আকস্মিক। উদাহরণস্বরূপ হাউপ্তমানের কথাই ধরা যাক। স্বয়ং সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ পৃষ্ঠপোষক হয়েও প্রয়োজনমত রোমান্টিক সম্প্রদায়ের হাতে হাত মেলাতে বিন্দুমাত্র বিবেকে বাধে নি তাঁর। অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাঠিকামাত্রেই লেখকের পরবর্ত্তিকালের রচিত 'হানেলের স্বর্গযাত্রা' ও 'জলমগ্ন ঘুন্টুর' নামক পুস্তক দুখানি পাঠ করে স্ব স্ব সন্দেহ ভঞ্জন করতে পারেন।

বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের শতাব্দী। বিশ্লেষণের শতাব্দী।—আন্তর্জ্জাতিকতা ও ভাব-বিনিময়ের যুগ। সব দেশের মতো জার্ম্মানীতেও তাই এই সময় 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে' এমন একটা বোধ জেগে উঠেছিল কিছুদিনের জন্য—সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ করে। রাশিয়া ফ্রান্স, স্কান্দিনেভিয়া প্রভৃতি ইউরোপের বহুদেশের একাধিক শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও কাব্যগ্রন্থ এই সময় জার্ম্মানে অনূদিত হয়। টুর্গেনিভ, ডস্টয়েভস্কী ও বিয়ের্ণসনের যে আজ বিশ্বজোড়া খ্যাতি, তার মূলে ছিল সেদিনকার জার্ম্মানী। পরলোকগত নাট্যকার জর্জ্জ বার্ণাড শ' পর্য্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, জার্ম্মান রঙ্গমঞ্চের কাছে তাঁর ঋণের পরিমান যথেষ্ট। অধুনা-বিখ্যাত সুইদেনবাসী নাট্যকার স্ট্রিন্দবের্গ ও বেলজিয়ামের কবি ই, ফেএর হারেনকেও বিশ্বের দরবারে পরিচিত করে দেবার ভার সেদিন দরেৎস্ল্যাণ্ডকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গ্রহণ করতে হয়েছিল।

আধুনিক জার্ম্মান কবিদের মধ্যে রেণের মারিয়া রিল্কের (১৮৭৫-১৯২৬) নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। রিল্কে ছিলেন প্রসিদ্ধ ফরাসী ভাস্কর রোদ্যাঁ-র সেক্রেটারী বা সচিব। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ ঘোষিত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি প্যারীতেই বাস করছিলেন. কিন্তু পরে বাধ্য হয়ে তাঁকে স্বদেশে ফিরতে হয়। রিল্কে রাশিয়ার নানা অংশে ভ্রমণ করেছিলেন। তাই তাঁর রচনায় ফরাসী উপাদান ও রুশিয় ভাবের বাহুল্য এত বেশী দেখা যায়। সে যাই হোক্, বাক্য বিন্যাসে ভাষার চাতুর্য্যে ও বর্ণ মিশ্রণের দক্ষতায় জার্ম্মান সাহিত্যে রেণের মারিয়া রিল্কের স্থান যে সর্ব্বোচ্চে, একথা পাঠক-পাঠিকা মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করবেন। থোমাস্ মান (১৮৭৫, জন্ম) রুশ ও ফরাসী ঔপন্যাসিকদের বিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। গল্প লেখক হিসাবে জার্ম্মান সাহিত্যে তাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর 'Budden brooks' নামক গ্রন্থ সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। জার্ম্মানীর কোনও ক্ষুদ্র-পল্লীর এক মধ্যবিত্ত পরিবারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক রাজনৈতিক ও আর্থিক ঘটনা স্রোতের জোয়ার ভাঁটার নিখুঁত বিবরণ সম্বলিত একখানি সম্পূর্ণ আলেখ্য মান এই গ্রন্থে অঙ্কিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর 'দেয়র ৎ জাউবেয়র্গ' (মায়া পর্ব্বত) নামক অপর গ্রন্থখানি বাস্তবিকই একখানি 'ক্লাসিক'। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিভিন্নমুখী ভাবধারার চতুস্পথের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ইউরোপীয় সমাজের প্রতি কটাক্ষপাত করে লেখক এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেছিলেন। 'জোসেফ' হোলো থোমাস্ মানের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য 'এপিক উপন্যাস'।

আর্ণোর স্বিৎজলের, স্তেফান জ্ভাইক্ ও ফ্রান্তস্ ভের্ফেল প্রমুখ সাহিত্যিকের দানে জার্ম্মান সাহিত্য এই সময় আশাতীত পরিমাণে সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। স্তেফানৎজভাইকের 'মারী-আঁতোয়ানেৎ'-ও বালজাকের জীবনী এবং ভের্ফেলের 'সং অব বের্ণাদেৎ' প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী। চলচ্চিত্রের দৌলতে শেষোক্ত গ্রন্থখানির নাম আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। বিংশ শতকীয় জার্ম্মান সাহিত্যাকাশে অসংখ্য নক্ষত্র বর্ত্তমান। তাদের প্রত্যেকটীর নাম করাও অসম্ভব। হের্ম্মান হেসি (জন্ম ১৮৭৭) ইয়াকব ভাসেরমান, লেওনাহর্দ ফ্রাঙ্ক (কার্ল ও আনা'-র গ্রন্থকার), ও লিওন ফএক্তভাঙ্গেয়র (সুরস ইহুদি) এই নক্ষত্র মণ্ডলীর অন্তর্গত। আর্নল্ডৎজভাইক্-এর The case of Sergeant Grischa' ও 'এরিখ মারিয়া রিমার্কের জগদ্বিখ্যাত 'ইম ভেস্তেন নিক্‌ৎস্নএস' বা অল কোয়ায়েট অন্ দি ওয়েস্টর্ণ ফ্রন্ট' এই যুগের দুটী আরো অদ্ভুত সৃষ্টি বা Prodigious Creations. রমার্কের 'অল কোয়াএট' পৃথিবীর সব ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে

আলোক-চিত্রে রূপান্তরিত হবার পর গ্রন্থখানির জনপ্রিয়তা বর্দ্ধিত হয়েছে শতগুণ। আমাদের দেশে শিক্ষিত এমন নরনারী অতি অল্পই আছেন যাঁরা বইখানির ইংরাজী কিংবা বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ করেন নি। এই জাতীয় আর একখানি গ্রন্থ হোল এ. দোএবলিনের "বেয়র্লিন অলেক্সান্দেরপ্লাত্জ।" প্রথম মহাযুদ্ধের পর বার্লিনের শোচনীয় অবস্থার একখানি নিখুঁত প্রতিলিপি অপূর্ব্ব দক্ষত সহকারে লেখক এই গ্রন্থে অঙ্কিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। সোমাসমানের সহোদর ভ্রাতা হাইনরিক্ মান্ ও সুলেখিকা রিকর্দা হুক ('ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ) ইতিহাস, জীবনী ও রাজনীতি মূলক একাধিক গ্রন্থ রচনা করে স্ব স্ব পিতৃভাষাকে পুষ্ট করেছিলেন।

আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে ফ্রাঙ্ক ভেদেকিন্দ (দেয়র এর্দ গাইষ্ত) ই. ষ্টের্নহাইম ও গেয়র্গ কাইজেয়রের নাম উল্লেখযোগ্য। এর্ন স্ত তোলের-এর নাম সর্ব্বজনবিদিত। হিট্‌লারের নরমেধ যজ্ঞের প্রধান বলি 'এর্নস্ত তোলের' ছিলেন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের জার্ম্মানীর সমগ্র বিদ্রোহী যুবক সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি। বের্ত্ত ব্রেক্ত ও সিংস্তুকুমাই-এর আধুনিক জার্ম্মান রঙ্গমঞ্চের উন্নতিকল্পে যে বিরাট অপেরা সাহিত্যের সৃষ্টি করেন, তার মধ্যে ব্রেক্ত প্রণীত 'Dreigroschenoper' বা 'তিন পয়সার গীতিনাট্য'ই সমধিক বিখ্যাত।

হিটলারী যুগ ও নাৎসীবাদের অভ্যুত্থান

জার্ম্মানীর সাংস্কৃতিক জীবনের স্বাভাবিক বাড়বৃদ্ধির মূলে নাৎসীবাদই করলে প্রথম কুঠারাঘাত। নির্য্যাতন ও উৎপীড়নের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে বহু বিখ্যাত কবি ও গ্রন্থকারকে স্বদেশ পরিত্যাগ করতে হোলো। অবশিষ্ট যাঁরা জার্ম্মানীতে রইলেন সরকার আইন ও দেশ রক্ষার নামে তাঁদের হয় কারারুদ্ধ না হয় ভয় প্রদর্শন করে কণ্ঠরোধ করলেন। কেউ কেউ আপোষও করলেন নাৎসী শাসন-তন্ত্রের সঙ্গে। ফলে তাঁদের 'শির' বাঁচল বটে, কিন্তু 'সার' পেলনা রক্ষা। গভর্ণমেণ্ট অতঃপর সঙ্গীনের খোঁচায় এক সম্পূর্ণ নূতন ধাঁচের সাহিত্য করলেন জার্ম্মানীতে আমদানী। 'Blood and Soil' হোলো তার নাম—অন্ধ এবং উগ্রদেশাত্মবোধ হোলো তার ভিত্তি। কিন্তু চাপ দিয়ে ধর্ম্ম বা সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। ফলে জার্ম্মানীর সদ্য-গঠিত নাৎসী-সাহিত্যও বেশী দিন টিকল না। নাৎসীরা মাঝে-মাঝে গর্ব্ব করে বলত যে, তাদের মধ্যেও উচ্চ শ্রেণীর চারণ কবি বা সাহিত্যিকের অভাব নেই, কিন্তু কথাটা যে কতদূর মিথ্যা, তা নাৎসী জার্ম্মানীর ভুঁইফোঁড় সাহিত্যই প্রমাণ করে।

এর্নস্ত তোলের, স্তেফান ৎস্বাইক্ প্রভৃতি যে সব সাহিত্যিক বিদেশে পলায়ন করেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশ-কেই সুদীর্ঘ প্রবাস বাস ও দারিদ্র্যের দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। বাহিরের পৃথিবীর কাছেও কোন সাহায্য ও সহানুভূতি না পেয়ে অবশেষে অকালমৃত্যুর ক্রোড়ে তাঁরা অন্বেষণ করে নিয়েছিলেন শান্তির চির-নিভৃত নীড়। যুদ্ধে বিদ্রোহে ও মহামারীতে দেশ, গ্রাম, নগর জনপদ ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু সাহিত্য মরে না তবু। আর আজকার জার্ম্মানী? নিজস্ব জাতীয় সাহিত্য বলে তার কোন কিছুই নেই—কবি বা গ্রন্থকার ত দূরের কথা। জার্ম্মানীর একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আজ অপরিসীম দৈন্য ও হাহাকারের ধ্বনি ভরিয়ে তুলেছে আকাশ-বাতাসকে। পঙ্গু তার সামাজিক জীবন, পক্ষাঘাতগ্রস্ত তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। গৌরবময় অতীতের ভগ্নাবশিষ্ট কঙ্কালের ওপর অস্থি-মাংস আরোপ করবে কোন যাদুকর, রিক্ততার মরুভূমির মাঝে আলাদীনের রাজপ্রসাদ আবার গড়ে তুলবে কোন ময়দানব?

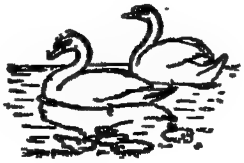

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে মধুসূদনের প্রভাব

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

মধুসূদন বাংলা কাব্য-সাহিত্যে যুগপ্রবর্ত্তক সে বিষয়ে, সন্দেহ নাই। মধুসূদন কাব্যসাহিত্যে অনেক কিছু প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, অনেক কিছু দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্য তাঁহার দেওয়া সব দান গ্রহণ করিতে পারিয়াছে কি? প্রথমে ধরা যাক—অমিত্রাক্ষর ছন্দ। মাইকেলের পর যাঁহারা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিলেন, তাঁহারা মাইকেলের ছন্দের আসল রূপটির অনুসরণ করিতে পারিলেন না। নাটকে ইহার রূপ আরো বিকৃত হইল। ইহা কৌতুকরসের বিষয়বস্তুর বাহন হইল। যাত্রাভিনয়ের নাটকের বীররসের বক্তৃতায় ব্যর্থ অনুকরণ চলিল। সৎ-সাহিত্য রচনায় অনুসৃত হইল না।

মাইকেল মহাকাব্য রচনা করিলেন। দুই তিনজন কবি তাঁহার অনুকরণ করিলেন—তার পর "কল্পনাটি গেল ফাটি' হাজার গীতে।"

মাইকেল পেট্রার্কার ধরণে সনেট রচনা করিলেন। কেহ কেহ এই রূপটি গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ব্যাপকভাবে চলিল না, সনেট শেষ পর্য্যন্ত ১৪ চরণের পয়ারে পরিণত হইল। রবীন্দ্রনাথ সনেটের কঠিন বন্ধন পছন্দ করিলেন না।

মাইকেল পত্রকবিতা লিখিলেন বীরাঙ্গনায়। আর কেহ ঐ শ্রেণীর কবিতা লিখিলেন না।

তাঁহার পদ্মাবতী নাটকের ঢঙে নাটক আর কেহ লিখিল না। তিনি বাংলা ছন্দে ছন্দঃস্পন্দ সৃষ্টির জন্য অজস্র প্রচলিত অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের আমদানী করিলেন। পরে সে সকল শব্দ বাংলা কাব্যে চলিল না।

তিনি কবিতার চরণে যেরূপ ঘনঘন ছেদবিন্যাস করিয়াছেন, সে প্রথাও পরে চলিল না।

কবিতার চরণে ভিন্ন ভিন্ন পদের সংস্থান তিনি যেরূপ করিয়াছিলেন—পরবর্ত্তী কবিরা তাহা করিলেন না।

মাইকেল যে কোন বিশেষ্য-বিশেষণ-পদকে নাম-ধাতুতে ব্যবহার করিলেন, তাহা পরে ব্যঙ্গের বিষয় হইয়াছিল। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে মনে হয় মাইকেল অনেক কিছু নূতন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন—কিন্তু বাংলা কাব্যসাহিত্য সব গ্রহণ করে নাই। সে জন্য মাইকেলের রচনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পরীক্ষার পাঠ্য হইয়াই রহিয়াছে।

উপর উপর দেখিলে ইহাই মনে হইবে। একটু তলাইয়া দেখিলে মাইকেলের দান কতটা বঙ্গকাব্য-সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে।

মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ইহার নিজস্ব রূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বেশি দূর চলে নাই. কিন্তু ইহার অমিত্রাক্ষরতা—কবিরা গ্রহণ করিয়াছে এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দ রূপান্তরিত হইতে হইতে রবীন্দ্রনাথের অসমপর্ব্বীয় মুক্তক ছন্দে পরিণত হইয়াছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের মুক্তক ছন্দে পরিণতির ক্রমোন্মেষ-ধারা আমি 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে' সোদাহরণ বিবৃত করিয়াছি।

মহাকাব্য রচনার প্রথা সব দেশেই বিলোপ পাইয়াছে, ইহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে নাট্য-কাব্য। আমাদের দেশেও নাট্যকাব্য অনেক রচিত হইয়াছে।

পেট্রার্কার সনেটরূপ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু চতুর্দ্দশপদী গ্রহণ করিয়াছেন। গীতিকবিতার

উচ্ছ্বাসকে সংযত কবিতার যে সীমাবন্ধন সনেটের আকারে মাইকেল দিয়াছেন—তাহার প্রয়োজনীয়তা সকল কবিই স্বীকার করিয়াছেন।

সনেটের ১৪ অক্ষরের চরণ ১৮ অক্ষরের চরণে পরিণত হইলেও এবং ১৪ লাইনের স্থলে ১৬ বা ২৮ লাইন হইলেও মাইকেল-প্রবর্ত্তিত সংহত আকৃতিরই রূপান্তর।

ওভিদের ধরণের পত্রকবিতা কেহ লিখে নাই বটে, কিন্তু পৌরাণিক বিষয়বস্তু লইয়া অভিনব ধরণের কবিতা রচনার ধারা বীরাঙ্গনা হইতে সূত্রপাত লাভ করিয়া আজিও চলিতেছে।

পদ্মাবতী নাটকের ভঙ্গী আর চলে নাই বটে, কিন্তু কৃষ্ণকুমারী ঐতিহাসিক নাটকের অগ্রদূত। মাইকেলের প্রহসনের ধারা আজিও চলিতেছে। অন্য রচনায় যতই কৃত্রিমতা থাকুক, তাঁহার প্রহসনে বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা নাই। প্রহসনে মাইকেল দীনবন্ধুর মতই পুরা বাঙ্গালী। প্রহসনের চরিত্রসৃষ্টিতে বাস্তবতার অভাব নাই—ভাষা সম্পূর্ণ চরিত্রগুলির মুখের উপযোগী। বাংলার প্রহসন-রচয়িতাদের গুরু মধুসূদন। মেঘনাদ বধের কবি যে দৃপ্ত আভিজাত্য হারাইয়া একেবারে সাধারণ বাঙ্গালীর মধ্যে কতটা মিশিয়া যাইতে পারেন, তাহা প্রহসন দুইখানিতে দেখা যায়।

মাইকেলের ব্যবহৃত আভিধানিক শব্দগুলি চলে নাই বটে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা হইতে নব নব শব্দগ্রহণের প্রবৃত্তি ও উৎসাহ তিনি দিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ লালিত্যবৃদ্ধির জন্য সংস্কৃত হইতে অনেক নূতন শব্দ আহরণ করিয়াছেন, মাইকেলের ব্যবহৃত পৌরুষব্যঞ্জক শব্দগুলি শ্রুতিকটু বোধ হওয়ায় তিনি বর্জ্জন করিয়াছেন। সংস্কৃত হইতে নব নব শব্দ আহরণের প্রেরণা আমরা মাইকেল হইতেই পাইয়াছি।

মাইকেলের মত ঘনঘন ছেদ-বিন্যাস চলে নাই বটে, কিন্তু কবিতায় যথাযোগ্য ছেদবিন্যাস মাইকেলেরই প্রবর্ত্তন। তাহার আগে ত ছিল এক দাঁড়ি, আর দুই দাঁড়ি। অমিত্রা-ক্ষর ছন্দঃ পাঠে অনভ্যস্ত পাঠককে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ঘনঘন ছেদ বিন্যাস করিতে হইয়াছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দ যখন চলিল না—তখন ঐরূপ ঘনঘন ছেদ-বিন্যাসের কথাই উঠে না। তবু তাঁহার প্রবর্ত্তিত ছেদবিন্যাস প্রয়োজনমত বাংলায় চলিতেছে। তবে পাঠক এখন কোথায় কতটুকু থামিতে হয় শিখিয়া লইয়াছে, এখন আর ঘন ঘন ছেদবিন্যাস করিতে হয় না। মাইকেল তাঁহার রচনায় বহুস্থলে গর্ভবাক্য (Parenthesis) ব্যবহার করিতেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্যই ইহার প্রয়োজন হইয়াছিল। ঐ ছন্দ না লইলে গর্ভবাক্য প্রয়োগেরও প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যগুলিতে ঐ রূপ গর্ভবাক্যের সমাবেশ দেখা যায়।

বাক্যে পদের প্রচলিত ধরণের সংস্থান মাইকেলের পর আবার ফিরিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা মাইকেলের দ্বারা যথেষ্টরূপে প্রভাবিত হইয়াছে।

মাইকেল অজস্র নামধাতুর প্রয়োগ করিয়া ভাষাকে বহুদূর আগাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু বাংলা ভাষার পক্ষে অতটা আগানো অস্বাভাবিক হইয়া উঠিল। মাইকেলের প্রবর্ত্তিত সব নামধাতুর পদগুলি চলে নাই বটে, কিন্তু মাইকেল নামধাতু রচনার পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং এবিষয়ে সাহসেরও সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। কুসুমিয়া, অঞ্জলিয়া, প্রভাতিল, মঞ্জরিল, মুকুলিয়া, আকুলিয়া, ব্যাকুলিছে, উচ্ছলিল, চঞ্চলিয়া, মন্দ্রিল ইত্যাদি নামধাতু রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করিয়াছেন। গদ্যেও ক্ত-প্রত্যয়ান্ত বহু নামধাতু-জাত বিশেষণ পদ চলিতেছে। যেমন—রূপায়িত, সীমায়িত, রসায়িত ইত্যাদি। শানচ্ প্রত্যয়ের নামধাতুর প্রয়োগও দিনদিন বাড়িতেছে—যেমন—শ্যামায়মান, ধূমায়মান, নব নবায়মান, বাষ্পায়মাণ ইত্যাদি।

কাব্য প্রাচীন হইলেই কেবল সুশিক্ষিত সাহিত্যানু-রাগীদেরই উপভোগ্য ও পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য হইয়া উঠে। কিছুকাল পরে রবীন্দ্রনাথেরও সেই দশা হইবে—তবে হয়ত একটু দেরী হইবে। কারণ, রবীন্দ্রনাথের পর বড় কবির আবির্ভাবের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তাহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা বহু বিচিত্র ধারায় বহমান। তাহা ছাড়া, তিনি লিরিক কবি, তাঁহার গানও আছে শত শত।

মাইকেলের প্রভাব বাংলার কাব্য-সাহিত্যে ওতপ্রোত হইয়া আছে। আমাদের দেশ অতিভাষণের দেশ,—সে

জন্ত কাব্যে উচ্ছ্বাসের মাত্রা ছিল বেশী। মাইকেল কাব্য-সাহিত্যে অসামান্য সংযমের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত সনেট সংযমের একটা চূড়ান্ত নিদর্শন। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বিধিবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে তিনি ভাবোচ্ছ্বাসকে সংহত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আজ সনেটের যে রূপই হউক—সংযমের ছকটা তিনিই দিয়া গিয়াছেন। সংযমের প্রয়োজনীয়তা আছে—তাহাও তাঁহারই শিক্ষা।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের সব চেয়ে বড় দান ইহার প্রবাহশীলতা (Flow and dynamic force) ও বেগবত্তা। মিত্রাক্ষরী পয়ারে ও আয়ত পয়ারে ঐ দুটি ধর্ম্ম সঞ্চারিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর ছন্দ মাইকেলের অমিত্রাক্ষরের কাছে ঋণী, ভারতচন্দ্রের কাছে নয়। মাইকেলের "রেখ মা দাসেরে মনে" ও "আশার ছলনে ভুলি' কি ফল লভিনু হায়।" এই দুইটি লিরিক হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের লিরিকের অগ্রদূত।

মাইকেল কাব্যে জাতীয়তাবোধেরও শুরু। এই জাতীয়তাবোধ রাক্ষসদের আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হইলেও ইহার মূল্যের ও মর্য্যাদার তারতম্য হইতেছে না।

মাইকেলের মনুষ্যত্বের আদর্শ রাবণ ও মেঘনাদ হইলেও মনুষত্বের মহিমা যে দেবত্বের চেয়ে ছোট নয় এবং নিয়তির সহিত সংগ্রামে পুরুষকারেই যে আসল মনুষ্যত্বের সার্থকতা, তাহা বঙ্গসাহিত্যে তিনি প্রথম দেখাইয়াছেন।

তামসিক বাঙ্গালীর সম্মুখে তিনি একটা রাজসিক আদর্শ উপস্থাপিত করিয়া জাতীয় জীবনে তেজস্বীতার সঞ্চার করিয়াছেন।

মানুষ যেমনই হউক, তাহার সুখদুঃখ আকাঙ্ক্ষার মূল্য অন্যত্র অস্বীকৃত হইলেও, কাব্যে তাহার মূল্য সমানই। এসত্য তিনিই প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

মাইকেল যে তাঁহার কাব্যে বীর ও রৌদ্ররসের সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন—তাহার প্রভাব বংলার বহু নাটকে সঞ্চারিত হইয়াছে।

সর্ব্বোপরি বাংলা ভাষাকে তিনি একটা পৌরুষ সবলতা দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাধনায় তামসিক ভাষা রাজসিক ভাষায় পরিণত হইয়াছে। জাতি যত তামসিকতার মোহ কাটাইয়া উঠিবে, ততই সে রাজসিকতার মর্য্যাদা উপলব্ধি করিবে।

চির-যৌবনা

অনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী

কলহাস্তে ছড়াইয়া বন্ধহারা আনন্দের গীতি
কূলে কূলে,
চঞ্চল অঞ্চলে তার সঞ্জীবিয়া শুষ্ক বনবীথি
ফুলে ফুলে,
অঙ্গের মুখর রঙ্গে ঝঙ্কারিয়া যাত্রার সঙ্গীত
দিকে দিকে,
হস্তের সঞ্চয় ফেলি উপেক্ষিয়া উত্তীর্ণ অতীত
অনিমিখে
অবাধ চাপল্যে শুধু আত্মভোলা চলা আর বলা
দিশে দিশে
বক্ষে মোর নিত্য দেয় চিন্তাহীন এ কী মুক্তি দোলা
—কুমারী সে!

রোগ ভোগ দুঃখ শোক ধৌত হয় প্রবল প্রবাহে
পদে পদে,
বিজলী বিদ্যুৎ সম দুর্ব্বর সংসার টেনে নিতে চাহে
দ্রুত রথে,
হাস্তের উচ্ছ্বাস বেগে হাল্কা করে প্রস্তর পাষাণ
যাদু-বলে,
চরণে চরণে তার দশদিকে পথের সন্ধান
ছুটে চলে।
বসন্তের ভোগৈশ্বর্য্যে শক্তিমান সে যে মুক্তিসুর
নিত্য গীত,
শুষ্ক-পত্র-রুগ্নবনে ফাল্গুনের ঝড় সে নিষ্ঠুর
উচ্চকিত।

কবি শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টরাজ

শচীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরু কাচের চশমাটা খুলে ফেললেই ছেলেমানুষী-ভরা উজ্জ্বল দুটি শিশু-চোখের সাক্ষাৎ মিলত। কবি চন্দ্রশেখরের এই চোখদুটিই আমার কাছে মনে হ'ত ভয়ানক বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। কিন্তু চশমা-পরা-অবস্থায় আমরা দেখতাম তপঃ-গম্ভীর বিচারশক্তিসম্পন্ন এক তরুণকে, সহজ কবিটি চশমার আড়ালে কোথায় যেন হারিয়ে যেত।

কী করে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হ'য়েছিল, সেটা আগেই বলা দরকার। আজ আমাকে আপনারা বিজ্ঞাপন প্রসাদপুষ্ট-স্ফীতোদর মাসিক পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদকের সুকঠিন আসনে আসীন দেখছেন বটে, কিন্তু একদিন এই আমারই চেহারা ছিল অন্যরূপ। কবি খ্যাতি সামান্য কিছু আমার ভাগ্যেও লাভ হয়েছে, কিন্তু আসল কথা, তখন ছিলাম একেবারে ছেলেমানুষ। সে শোচনীয় ছেলেমানুষীর একটু পরিচয় দেই শুনুন। তখনকার নাম-করা মাসিক 'চিত্রার' সংগে আমি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, এমন কি সম্পাদকমশায় কবিতা-বিভাগের সমস্ত ভারই দিয়েছেন আমার ওপর ছেড়ে। সেই ভার গ্রহণ করেই তরুণ মন হয়ে উঠল চঞ্চল। ঠিক করলাম, অবহেলিত অনাদৃত কবি-প্রতিভাদের খুঁজে বার করব। তাঁরা লেখা পাঠাবেন, আমরা নির্ব্বিচারে বাজে কাগজের ঝুড়িতে তা নিক্ষেপ করব, তা হবে না। আমরা কবিতা আনব চেয়ে।

মেতে উঠলাম ছেলেমানুষী খেলায়। কবির সন্ধানে তখন হাঁটাহাঁটি করছি সহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। লেখার সামান্য একটু শক্তির পরিচয় পেলেই লেখককে উৎসাহ দিচ্ছি প্রচুর, টেনে আনছি 'চিত্রা'র আসরে। এই রকম সময়েই চন্দ্রশেখর চট্টরাজের সংগে আলাপ। পুরাণো চিত্রার পাতা উলটাচ্ছি, তিন চার বছরের পুরাণো পত্রিকা, দেখি প্রায় সংখ্যাতেই ওর কবিতা, এবং কবিতাগুলি অপূর্ব্ব, প্রতিভার স্পর্শ আছে। তৎক্ষণাৎ হাতের কাজ বন্ধ করে চেয়ারটা সশব্দে ঠেলে রেখে উত্তেজিত ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ালাম, এখনি যাব সম্পাদকের কাছে, অমন কবির লেখা আর সংগ্রহ করা হয়নি কেন তার কৈফিয়ৎ দাবী করতে!

কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশ তখনো সম্পূর্ণ হইনি, তাই সম্পাদকের ঘরের দিকে যেতে যেতেও থমকে দাঁড়ালাম। ভাবলাম—কী প্রয়োজন বাক্‌বিতণ্ডায়। এখনি কাজে নেমে পড়া যাক। আমিই না হয় নূতন করে আবিষ্কার করব চন্দ্রশেখরকে। পুরাণো ফাইল ঘেঁটে সৌভাগ্যবশতঃ বার করতে পেরেছিলাম ওর বাসার ঠিকানাটা।

বাসার বর্ণনা এখন আর যথাযথ দিতে পারব না আপনাদের, আর তার প্রয়োজনও নেই। বর্ণনা দিলেও আজ আপনারা হয়ত আর চিনতে পারবেন না, দক্ষিণ কলকাতার ও-অঞ্চল এখন অন্যরূপ ধারণ করেছে। তাছাড়া চন্দ্রশেখরকে নিয়ে আজ আর মাথাব্যথাই বা কার? আমার কাছ থেকে জানলেন তাই! নইলে শুনতে পান আজকাল চন্দ্রশেখর চট্টরাজ বলে কোন কবির নাম?

বড়ো রাস্তা পেরিয়ে গলি, গলির মধ্যে সংকীর্ণ উপগলি, তার মধ্যে ক্ষুদ্র এক একতলা বাড়ী। ইঁটের, কিন্তু বহু পুরাতন, নোনাধরা। এক কোণ ভেঙে অশত্থ-চারা মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছে; আর বিশেষ কিছু মনে করতে পারছি না, অশত্থ-চারার গোড়া বেয়ে দেয়ালে একটা গভীর ফাটল ছিল, সেটার কথা এখনো বেশ মনে আছে।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। গ্যাসের বাতি জ্বালাবার লোকেরা মই হাতে নিয়ে দ্রুত চলাচল শুরু করেছে, আর পাশের বাড়ীর উঠানের ঝাঁকরা-মাথা কোনো গাছের মধ্যে চড়াই জাতীয় পাখীর দল কলরব করছে। বন্ধ

দরজার কড়া নাড়লাম। খুলে গেল। গায়ে গেঞ্জী, চোখে চশমা, ভদ্রলোক বললেন, কাকে চান ?

—চন্দ্রশেখর চট্টরাজ। এই বাড়ী নিশ্চয় ?

বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই, ভিতরে আসুন। বসুন।

ছোট্ট ঘরখানা জুড়ে বেমানান তক্তাপোষ, তার এক-প্রান্তে বসবার অনুরোধ জানিয়ে নিজেও বসলেন তক্তাপোষের ওপরে। খাটের ওপরেই লণ্ঠনটা জ্বলছে, কিছু খাতাপত্র-কালিকলম ইতস্ততঃ ছড়ানো। বললেন, কোথা থেকে আসছেন ?

—'চিত্রা' পত্রিকার অফিস থেকে।

ভদ্রলোক চিত্রার উল্লেখে একটু চমকে উঠলেন মনে হ'ল, বললেন, ও—।

গলার স্বর একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বললাম, আমার আসার উদ্দেশ্য আপনার সংগে পরিচিত হওয়া।

ভদ্রলোক মাথা নীচু করে বসে আছেন, ঐভাবেই বসে থেকে একটু যেন হাসলেন মনে হ'ল।

বললাম, হয়ত লিখছিলেন,এসে বিরক্ত করলাম না ত ?

—না-না, কিছু মাত্র নয়,—তাড়তাড়ি বলে উঠলেন কবি, আমি খুসীই হলাম আপনাকে পেয়ে। আবার মাথা নীচু করলেন কবি। আশ্চর্য্য নির্জন ওঁর বাড়ীটা। একটি শিশুর কলকণ্ঠও কী শোনবার নেই ?

কিন্তু এসব প্রশ্ন শিষ্টাচার-সঙ্গত নয়, তাই বললাম, কোথায় লিখছেন আজকাল ?

মুখ তুললেন কবি, কয়েক মুহূর্ত্ত চেয়ে রইলেন আমার দিকে, একটু হাসলেনও মনে হ'ল যেন, তারপরে চোখ থেকে খুলে ফেললেন চশমাটা, কাপড়ের খুঁটে কাচ মুছতে লাগলেন সযত্নে, বললেন, কোথাও না।

কিন্তু আমি দেখেছি আশ্চর্য্য সরল সেই স্নিগ্ধ দুটি চোখ, বললাম—'চিত্রা'য় আবার লিখতে শুরু করুন, আমি সেইজন্যই এসেছি। কবিতা দিন, না নিয়ে উঠব না কিন্তু।

ওঁর চোখে ততক্ষণে আবার উঠেছে চশমার পুরু কাঁচ, একটু থেমে একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, কবিতা ? আর লিখি না ত।

বলেই উঠে দাঁড়ালেন। সমাপ্তির রেখা টানতে চান এ সাক্ষাৎকারের, এটা তারই ভূমিকা। তাই উঠলাম আমিও। কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি, বললাম, কবিতা লেখেন না আর ?

আবার সেই মৃদু হাসি বললেন, না।

কিন্তু কেন ?

ভদ্রলোক এবারেও হাসলেন; কিছু বললেন না, শুধু ঘর ছেড়ে নেমে এলেন বাইরে। এ ইঙ্গীত আরও স্পষ্ট। ওঁর পিছনে পিছনে আমাকেও পথে নামতে হ'ল। কিন্তু মনটা উত্তেজিত, ব্যথাবিমূঢ় বলা যায়। এত ভাল কবি, কবিতা লিখছেন না; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে কোনো কথাই বলতে পারি নি। নমস্কারও জানিয়েছিলাম কিনা মনে নেই, শুধু পিছন থেকে দরজা বন্ধ হবার একটা শব্দ কানে এসেছিল, আমি ততক্ষণে উপ-গলিটা পেরিয়ে গলির মোড়ে।

পথে আসতে আসতে যতই ঘটনাটার পুনরাবৃত্তি করছিলাম মনে মনে,ততই অন্তরে একটা ক্ষোভ জাগছিল। ক্ষোভ থেকে নিদারুণ উত্তেজনা। কেন লিখছেন না কবিতা ? ফাটল ধরা বাড়ীটা দেখেছি। তবে কী দারিদ্র্য ? কঠিন জীবন-সংগ্রাম ? নিজের মনেই উত্তর প্রত্যুত্তর করতে করতে সোজা এলাম 'চিত্রা'-সম্পাদকের কাছে। সে বিচিত্র ছেলেমানুষীর কথা আজও মনে আছে। টেবিল চাপড়ে হাত নেড়ে সম্পাদককে সেদিন জ্বালাময়ী বক্তৃতায় জানিয়েছিলাম আজকের দিনের দরিদ্র কবির সকরুণ জীবনসংগ্রামের কথা। বলেছিলাম, প্রতিটি কবিকে খুঁজে বার করতে হবে, দূর করতে হবে তাঁদের দারিদ্র্য তাদের প্রতিভার বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। ইত্যাদি।

সম্পাদক সেদিন নিরুত্তরে আমার কথা স্থির মনে শুনে গেছেন, কিছু বলেন নি, হয়ত হেসেছিলেন মনে মনে।

কবির আবাসে আবার গেলাম পরবর্ত্তী অবকাশে। যেতে যেতে রাত হয়ে গিয়েছিল, তবে এমন কিছু বেশী রাত হয়নি যাতে ভদ্রলোক বিব্রতবোধ করতে পারেন। দরজা খুলেই চমকে উঠলেন উনি, বললেন,—আপনি।

সোজা ঘরে ঢুকে গেলাম। সেদিনের মতই তক্তাপোষে হ্যারিকেন জ্বলছে, সেদিনের মতই খাতাপত্র ইতস্ততঃ

ছড়ানো। বললাম, কবি, আজ ফিরব না, কবিতা চাই।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

বললাম,—কেন লিখবেন না কবিতা? কী জন্ম? দারিদ্র্য? জীবনসংগ্রাম? বন্ধু, এদেশ এখনো অকৃতজ্ঞ হয়ে দাঁড়ায় নি, আমরা সবাই মিলে আপনার সাহায্যে লাগব, আপনার প্রতিভা বিনষ্ট হবার নয়, হতে পারে না।

ভদ্রলোক হঠাৎ কেমন সন্ত্রস্ত ভঙ্গীতে বললেন—আপনি একটু আস্তে কথা বলুন দয়া করে। আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা আপনার কথা!

ভদ্রলোকের হাত দুটো আবেগে ধরে ফেললাম, বললাম, কবি, কবিতা লিখতেই হবে আপনাকে।

কবি বললেন—আপনাকে তো বলেছি, কবিতা লিখিনা!

আমি উত্তরে কী যেন বলতে গেলাম, ভদ্রলোক হঠাৎ আমার মুখে হাত চাপা দিলেন, ফিসফিসিয়ে বললেন, কিছু মনে করবেন না, আপনি এখন যান। এখানে থাকবেন না।

সুকঠিন বিস্ময়ে আমি নির্ব্বাক, উনি আবার বললেন, আপনার আমি দুটো হাত ধরছি, আপনি যান।

এ'কথা বলা মানে আমাকে একপ্রকার জোর করেই বার করে দেওয়া বাড়ী থেকে। কিন্তু বিস্ময়ের একটা সীমা আছে। গলিতে পড়েও ভাবতে পারছি না যে সত্যই এ'ভাবে ভদ্রলোক ভদ্রলোককে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে! রাগে-দুঃখে-অপমানে সমস্ত শরীর-মন জ্বলতে লাগল। এই আঘাত সামলাতে আমার লেগেছিল সাত-দিন। সাতদিন কোথাও বেরোই নি, 'চিত্রার' অফিসেও পদার্পণ করি নি।

সাতদিন পরে অবশ্য মনের অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক হ'য়ে এসেছে। ভাবলাম, কবি চন্দ্রশেখর পাগল হ'য়ে যান নি ত? দুঃখে-দারিদ্র্যে-নিষ্পেষণে মাথা ঠিক থাকে না সব সময় মানুষের। কথাটা মনে হ'তেই ধীরে ধীরে অনুকম্পা জাগল কবির প্রতি! ভাবলাম, দোষ আমাদের। আর তা ছাড়া, এত সহজে দমে গেলে আমার চলবে কেন? যে কাজে হাত দিয়েছি, সে কাজে বাধা আসাই ত স্বাভাবিক। না, থেমে পড়লে চলবে না৷ বারে বারে যেতে হবে, নাড়া দিতে হবে, নইলে ঘুম ভাঙবে কেন সুপ্ত প্রতিভার?

অনেক সংকোচ, অনেক দ্বিধার পর আবার চলেছি চন্দ্রশেখরের বাড়ীর দিকে। আজও রাত হয়ে গেছে। তবু, সব কিছুর জন্ম প্রস্তুত করলাম নিজেকে, দরজায় আবার নাড়া দিলাম। যথারীতি দরজা খুলে গেল। আজ কোনো কথা নয়, ভদ্রলোক নীরবে মাথা নেড়ে শুধু জানালেন,—আসুন।

ভিতরে গিয়ে বসেছি সেই তক্তাপোষের ওপরে। ভদ্রলোক আরও অবাক করলেন আমাকে, দরজা বন্ধ করে দিলেন। কী যেন বলতে গিয়েছিলাম ওকে, উনি ইঙ্গিতে বাধা দিয়ে জানালেন,—চুপ।

সেই ভাবেই খাতাপত্র ছড়ানোর ওপরে ধ্যানীর মতো ব'সে আছেন উনি। আমি যে কী করব কী বলব বুঝতে পারছি না,—হতবাক হয়ে চুপচাপ বসেই আছি। উনি একসময় চশমাটা খুলে ফেললেন। সেই অনুপম চোখদুটি যেন আনন্দে জ্যোতির্ম্ময় হ'য়ে উঠেছে, তারপরে কিসের আবেশে বন্ধ করলেন দুটি চোখ, মাথাটা ঈষৎ দুলতে লাগল। এতক্ষণ পরে সত্যই ভয় করতে লাগল আমার,—এ কোন্ মস্তিষ্ক-বিকৃতের কবলে প'ড়েছি এসে। উঠব-উঠব করছি, হঠাৎ মনে হ'লো, একটা ক্ষীণ কান্নার স্বর যেন শুনতে পাচ্ছি। ক্রমে স্বরটা যেন স্পষ্ট হচ্ছে, আর সেই কান্নার সুরে সুরে আবেশে মাথা নাড়ছেন চন্দ্রশেখর চুপচাপ বসে। ক্রমে কণ্ঠস্বর আরও স্পষ্ট হ'লো, কান্না নয়, গান। পরিষ্কার বুঝছি না গানের ভাষা, কিন্তু অস্ফুট একটা সুরের আভাষ। অপূর্ব্ব কোমল এ সুরের লীলা! কবিকে এবার যেন খানিকটা বুঝতে পারছি,—এ অদ্ভুত কণ্ঠস্বর সত্যই ক্বচিৎ শোনা যায়। কিন্তু সুরের প্রবাহে গানের ভাষা জাগবার আগেই সে কণ্ঠস্বর থেমে গেল। চোখ খুললেন কবি। কান পেতে আবার ভালো ক'রে শোনবার চেষ্টা করলেন। এক মুহূর্ত্ত। আবার জাগল সেই সুর, কিন্তু আবার থেমে গেল। কবি চশমাটা হাতে নিয়ে এতক্ষণে কথা বললেন, যা ভেবেছি, আজ আর হ'লো না।

বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম,—কী হ'লো না?

কবি উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু চোখে চশমা নেই, চশমা রাখলেন খাপে। একটু হেসে বললেন,—ওর গান। এমন প্রাণপূর্ণ গান আপনি শুনেছেন কখনো?

কিন্তু আমি উত্তর দেবার পূর্বেই উনি বাধা দিয়ে বলে উঠলেন,—না, এখানে নয়, আসুন আমার সংগে। দরজাটা ভেজানো থাক।

আমার হাত ধরে পথে নিয়ে এলেন কবি, বললেন,—চলুন, একটা নিভৃতি দেখে কোথাও বসা যাক।

আমি নিরুত্তরে চলতে লাগলাম। বড় রাস্তায় এসে উনি বললেন,—নিভৃতি কোথায়? এখানে বাড়ীর পর বাড়ী একটুও ফাঁক নেই। আসুন ঐ শ্মশানের ধারে, ওখানে কোথাও বসি গিয়ে।

শ্মশানের ধারে সত্যই নিভৃতি পাওয়া গেল। কবি একটু থেমে সুরু করলেন,—আমার ওপর আপনি রাগ করেছেন জানি। কিন্তু সব শুনলে এ রাগ আপনার থাকবে না, এটুকু নিশ্চয়ই বলতে পারি।

প্রথমেই প্রশ্ন করি, আপনি কী সত্যই বিশ্বাস করবেন, কোনো কবি থাকতে পারে কবিতা না লিখে?

প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠলাম ওর এ' প্রশ্নে, বললাম,—কখনই পারে না। সেই আশাতেই ত আসছি আপনার কাছে বারবার। একী কখনই সম্ভব, উন্মেষের মুহূর্তে কবি হঠাৎ তার লেখনী থামিয়ে দিলেন চিরতরে!

চন্দ্রশেখর বললেন,—কবিতা লিখে কবি যে আনন্দ পায়, সে কী চায় না সে আনন্দের ভাগ অন্যকে দিতে?

সোৎসাহে উত্তর করলাম,—নিশ্চয়ই চায়। সেটাও কবির কাজ। নইলে লেখার সার্থকতা কোথায়?

কবি চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপরে বললেন,—অথচ, কবিতা বলতে আপনারা যা বোঝেন, আমি সত্যই আর লিখি না তা। আমি লিখি গান, অজস্র গান রচনা ক'রে চলেছি!

উৎসাহিত হ'য়ে বললাম,—গানও ত কবিতা। দিন আমাকে আপনার গান। গানই ছাপবো আমরা।

কবি হাসলেন, বললেন,—গানত পাবেন না আপনারা,—ও অন্য একজনের জন্য। আর তা' ছাড়া, গানের সুষ্ঠু প্রকাশ সুরের মাধ্যমে, গানের কথামাত্র ছাপিয়ে লাভ কী?

বললাম,—লাভের কথাটা আমরা বুঝবো। আপনি দিন আপনার গানগুলো।

না। দেবার অধিকার আমার নেই। আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কার কাছে?

কবি আবার একটু হাসলেন, বললেন,—শুনলেন না তার কণ্ঠস্বর?

বললাম,—বেশ। যদি কোনক্রমে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি পাই?

দৃঢ় কণ্ঠস্বরে কবি বললেন,—না। ওকে বিরক্ত করতে আপনাদের আমি দেবো না। ও আপনাদের সবার এলাকার বাইরে।

তারপরে একটু হেসে বললেন,—আপনি মহানুভব সে কথা স্বীকার করি, নইলে এ ভাবে অপমান সহ্য করেও আপনি মাত্র কবিতার জন্য আমার কাছে বারবার আসতেন না। কিন্তু কী করব, বলুন? আজ আপনাকে সব কথা জানাবো বলেই এই শ্মশানের প্রান্তে ডেকে এনেছি। এ' বিচিত্র কাহিনী বলবার আগে নিছক ব্যক্তিগত বিষয়ের অবতারণাও কিছু করতে হবে, তবে জানি গল্পের খাতিরে আপনি তা' সহ্যও করবেন

—আমরা দুটি ভাই। সম্পত্তির মধ্যে এই বাড়ীটুকু। এই নিয়েই আমার বিধবা মা আমাদের দুটিকে মানুষ করে তুলতে ত্রুটি করেন নি। ছাত্র হিসাবে আমার কিছুটা নাম ছিল, সত্য বলতে কী, পড়াশোনা ছাড়া আর কোন জগতের খবরই আমি রাখতাম না। দাদা ডাক্তারী পাশ করল যেদিন, সেদিনই বিছানা নিলেন মা। রোগটা কি বুঝতে-না-বুঝতেই তিনদিনের জ্বরে মা গেলেন চলে। এবিষয়ে বেশী বলার প্রয়োজন নেই, দাদা ক্রমশঃ চিকিৎসা ক্ষেত্রে অভাবিতরূপে প্রতিষ্ঠালাভ ও অর্থসঞ্চয় করতে লাগলেন। এমনি এক দিনে অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটল আমাদের সংসারে। দাদা কোথায় মফঃস্বলে গিয়েছিলেন জরুরী কলে। তিনদিন পর ফিরে এলেন, সংগে একটি তরুণী মেয়ে। আমাকে শুধু বললেন, এ'এখানে থাকবে।

এর বিধবা মাকেই দেখতে গিয়েছিলাম আমি। আমাদের মায়ের মতো এর মাও একে ছেড়ে চলে গেছে। মেয়েটির আর কেউ কোথাও নেই, একেবারে অসহায়।

মেয়েটীকে দাদা ডাকে আশা বলে। মেয়েরা যা সহজেই পারে, বিশৃঙ্খল সংসারের সমস্ত ভার অবলীলায় নিজের হাতে তুলে নিলো আশা, অবিবাহিতের গুহায় স্নিগ্ধতা এলো। ক্রমে বিয়ের প্রস্তাব এলো দাদার সংগে আশার। পাড়ার গণ্যমান্যদের মনোযোগেই এ প্রস্তাব উত্থাপিত হলো সহজে। আশার মুখের সলজ্জ হাসি আর দাদার প্রফুল্লভাব, এ'প্রস্তাবেরই পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করল। দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল উৎসব আমাদের বাড়ীতে।

কিন্তু তার আগেই ঘটল বিপর্য্যয়। আশা হঠাৎ পড়লে অসুখে। খুব খারাপ ধরণের বসন্ত। সেই সময় দাদাকে দেখেছিলাম। অমন অমানুষিক পরিশ্রম, অক্লান্ত সেবা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। দাদার বন্ধু চিকিৎসকেরা জবাব দিয়ে গেলেন একে একে, তবু দাদার চেষ্টার বিরাম নেই। বলতে গেলে দাদার পুরুষকারই ওর প্রাণ ফিরিয়ে নিয়ে এলো। আশা ধীরে ধীরে সেরে উঠল, কিন্তু ওর চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গেল একেবারে। আশা অন্ধ। ওর সেই সুন্দর চোখ দুটি বিবর্ণ, বীভৎস দেখাতে লাগল। ওঃ! সেদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। যে ঘরে আমাকে দেখেছেন, ওই ছিল বরাবর আমার ঘর। ও ঘরে বসে যথারীতি পড়ায় মগ্ন হয়ে আছি, হঠাৎ কানে গেল উচ্ছ্বসিত কান্নার শব্দ। ছুটে গেলাম। দরজার আড়াল থেকে দেখি, আশা চুপচাপ বসে, ওর কোলে মুখ গুঁজে শিশুর মতো ফোঁপাচ্ছেন আমার দাদা।

এর দিন কয়েক পড়েই ব্যাংকে জমা হল আমার নামে মোটা টাকা। তার পরে পেলাম দাদার এক চিঠি বোম্বাইয়ের পথে ট্রেণে বসে লেখা। তাতে সাংসারিক নির্দেশ। বিশেষ করে আশার কথা, তার দেখাশোনার যেন কোনো ত্রুটি না হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। দাদা চলে গেছেন বিলাত। আজ বছর চারেক হল দাদার আর পত্র নেই। শুধু দাদার এক বন্ধুর পত্রে জেনেছিলাম, দাদা বিলাতে শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে করেছেন, তিনি আর ফিরবেন না দেশে। আশাকে খবরটা দিতে গেলাম, আশা বলল, আমি জানি।

আমি বই বন্ধ করলাম। কিন্তু আস্তে আস্তে একদিন সব সয়ে এলো। আশা আন্দাজে আন্দাজে ঘরকন্নার সব কাজ করতে শিখলো, আমার প্রতিও যত্নের ত্রুটী নেই। ওর চোখ গেছে, কিন্তু ওর কণ্ঠস্বর। বললাম, গান শিখবে বৌদি?

'বৌদি' সম্বোধনটিতে হয় ত কৌতুক মনে করল, আপন মনেই একটু যেন হাসল মনে হল, তার পরে স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলল, শেখাও।

কিন্তু শেখাব কী, আমাদের কোনো যন্ত্র নেই। যন্ত্র কিনতেও দিল না, বলল, কী দরকার? ওত শুধু তোমার আমার জন্য, আর কিছু ত নয়।

খালি গলায় গাইতে লাগল গান। বলল একদিন, তুমি গান লিখে যাও, আমি দেব সুর।

গান রচনায় হাত দিলাম। কটাদিন কী উৎসাহে কী আনন্দে যে কাটল। গানকে কেন্দ্র করেই আবার সহজ হয়ে এলো আশা, ওর বিমর্ষভাব কেটে গিয়ে আবার প্রফুল্লতার স্পর্শ জাগল ওর মনে। একদিন বলল, দেখ, তোমার গান সব আমার, আর কারো নয়, আর কাউকে দিতে পারবে না কিন্তু। কথা দাও?

দিলাম কথা। আমার কথা আমি রেখেছি। ওর কথাও ও রেখেছে নিশ্চয়। আমার গান ওর কণ্ঠে অপরূপ হয়ে ফুটে ওঠে এবং ওর আকর্ষণ আমার কাছে যে কী তা আপনাদের বোঝা উচিত।

একদিন বলল. দেখ, একা একা আর ভালো লাগছে না।

বললাম, সে কী!

উত্তর দিলো, বিয়ে করে একটি বউ এনে দাও দেখি?

একথার কোন উত্তর দিই নি। কিন্তু আমি নিরুত্তর থাকলে কী হবে, পাড়ার হিতৈষীরা আবার তৎপর হয়ে উঠলেন, এমন কি একদিন আশার সামনেই ওরা বললেন, যা হবার হয়ে গেছে, ওকে তুমিই বিয়ে করো।

আমি এঁদেরও কোনো উত্তর দিলাম না

কিন্তু ওঁরা চলে যেতেই আশা আমাকে ডেকে পাঠাল তার ঘরে, কী ধীর, কী গম্ভীর, কী অকম্পিত তার কণ্ঠস্বর! বলল, এবার থেকে আর কোনদিন তুমি আমার সামনে আসবে না। গান দিতে চাও, গান লেখা কাগজগুলো ঝিকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবে, আমি যাকে দিয়ে হোক পড়িয়ে নেবো। বুঝলে? যাও এবার এঘর থেকে?

চলে এলাম আমার ঘরে। সেই থেকে কখনো আমার সামনে আসে না। ঘরকন্নার কাজের মধ্যেও আমার হঠাৎ গিয়ে পড়া নিষেধ। খাবার এনে দেয় আমার ঘরে আমাদের ঝি।

অদ্ভুৎ স্তব্ধ হয়ে গেল বাড়ীটা। কত বছর হয়ে গেল ওকে ভালো করে চোখ চেয়ে দেখি না। দেখব কখন? আমার পায়ের শব্দ ও ভয়ানক চেনে, তা সে যতই মৃদু হোক না কেন! আর আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখা? তাও ও যেন বুঝতে পারে, আমার চোখের দৃষ্টি যেন আগুনের মতো ওর বিপর্যস্ত ভীরু মনটির ওপর গিয়ে পড়ে, তীব্র জ্বালা নিয়ে ও মুহূর্তে সরে যায়। এবং আমার সয়ে গেছে। আমি না থাকি, আমার গান ত রইল ওর কণ্ঠে? কিন্তু বলুন দেখি, ওর কণ্ঠস্বরও যদি একদিন স্তব্ধ হয়ে যায়? তাও যাবে জানি। সেদিন আমার গান লেখার কাজও ফুরিয়ে যাবে। হয়ত আবার ফিরে আসব আপনাদের কবিতার ক্ষেত্রে।

* * *

কিন্তু আপনারা জানেন, কবি চন্দ্রশেখর কবিতার ক্ষেত্রে আর ফিরে আসেন নি, হয় ত গান লেখার কাজ তাঁর আজও ফুরায়নি, কে বলতে পারে?

আমাদের দিন

অনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

আমাদের জীবনের একটানা দিন,
মুমূর্ষু আয়ুরে করে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ,
দিবসের তাপদগ্ধ মধ্যাহ্ন প্রহর,
তার মাঝে পার হওয়া প্রাত্যহিক ঝড়;
বিবর্ণ জীবন শুধু বেদনা মলিন!
কখনও উজ্জ্বল নয় আমাদের দিন!!

দিগন্ত কোথায় বলো? কোথায় আকাশ?
রামধনু রাঙা মেঘ দখিণা বাতাস?
রাতের সোনালী রঙ, কামনার কনা,
অজস্র উচ্ছ্বাস ভরা জীবন-বাসনা,
চেতনায় জাগে নাকো কোন উচ্ছ্বাস;
প্রেতায়িত অন্ধকারে রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস,
ঘুমের আবেশ ভরা শুধু কালো রাত!
অবসন্ন তন্দ্রাঘোর মৃত্যুর বরাত!!

তবু বলি আমাদেরও আছে এই দিন,
দুঃখ ঝড় সংঘর্ষেতে যদিও মলিন,
আশ্চর্য উজ্জ্বল তবু তাহার চেতনা,
তাহারে ঘিরিয়া আছে জীবন-দ্যোতনা;
অকারণ কল্পনার অলীক বাসনা,
সবুজ নরম রাত, অজস্র জোছনা,
দেয় নাকো জীবনেরে মিথ্যা হাতছানি,
দুঃখমাত ধরিত্রীরে মোরা শুধু জানি।
আমরা গ্রহণ করি আমাদের দিন;
মুমূর্ষু আয়ুরে দেয় চেতনা নবীন॥

ভারত-চীন মৈত্রী ও তুন্-হোয়াং গুহার চিত্রকলা

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশ

গত বছর ভারত ও চীনের সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন কালে লাল চীনের প্রধান নেতা জেনারেল্ মাও-সে-তুং তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছেন,—"ভারত ও চীনের মৈত্রী-সম্বন্ধ আজকের নয়। উভয় দেশের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ দু' সহস্র বছরের।" এ মত সর্ব্বৈব ভুল। চীন ও ভারতের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ বহু সহস্র বছরের। কোন কোন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক বলেন,—'ফাহিয়েন্' ও 'হুয়েন্-সাং' ভারতে আসার পর থেকেই চীন ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। মাও-সে-তুং বোধ হয় এই প্রমাদপূর্ণ মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই এই কথা বলেছেন।

ভারতের সঙ্গে চীনের সম্বন্ধ বহু সহস্র বছরের। অতি প্রাচীন কালে ভারত, তিব্বত, পারস্ত ও আরবের সঙ্গে চীন দেশের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। একখানি প্রাচীন রামায়ণের আদি পর্ব্বে দেখা যায়—"অতি প্রাচীনকালে ভারতীয়রা সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী অঞ্চলের অতিকায় উচ্চৈশ্রবা হয়, কুসুম-রেণু প্রভৃতি বিক্রয় করতে যেত শীর্ণা (চীন), সুবর্ণভূমি (সুমাত্রা) ও অন্নমে (য়্যানাম বা শ্যাম দেশে)।" বিশেষজ্ঞদের মতে মহাভারত বিশু-খ্রীষ্টের জন্মের সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বছর পূর্ব্বে লিখিত হয়। তাতে চীন দেশকে 'সিনা' (cina) বলে উল্লেখ করা হয়।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই চীন, জাপান, শ্যাম, সুমাত্রা জাভা, বালি প্রভৃতির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। 'সুসসোদী জাতকে দেখা যায়—"অতি প্রাচীন কালে ভরুকচ্ছ (ব্রাচ্) হতে এসিয়া মহাদেশের পূর্ব্ব উপকূলের ধার দিয়ে একটী অর্ণবযান চলাচলের পথ ছিল। ঐ পথ দিয়ে ব্রহ্মদেশ, মালয়, হাইনাল চীন ও পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপ পুঞ্জের সঙ্গে ভারতীয় বণিকরা সুগন্ধ-দ্রব্য, মসলা, রেশম, পশম, অশ্ব প্রভৃতির ব্যবসা করত। আর একটী বাণিজ্য-পথ ছিল বর্ত্তমান মসলীপত্তমের তিনটী বন্দর থেকে এসিয়ার পূর্ব্ব উপদ্বীপ পর্য্যন্ত। গাবৃনিণী (Gernini) পেলিয়ট (Pelliot), সিল্‌ভা-লেভী (Silva Levi) প্রভৃতির বর্ণনায় এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত পথ দিয়েই ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রভাব চীন, জাপান ও পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বিস্তার লাভ করে। অতি প্রাচীন কালেই ভারতীয় ও চৈনিক নাবিকদের কাছে 'সুবর্ণভূমি'র নাম সুপরিচিত হওয়ার কারণ ও দ্বীপটী তাদের কাছে 'এল ডোরেডো' বিশেষ ছিল।

ইন্দোচীন নামটী দেখেই বোঝা যায় ভারত ও চীনের মধ্যে 'ইন্দোচীন' হাইফেনের মত সংযোগ-সেতু স্থাপন করে। ভৌগোলিক গোগলের বৃত্তান্তে দেখা যায়—অতি প্রাচীন কালে মধ্য-এসিয়া দিয়ে স্থল-পথেও ভারতীয়েরা চীন দেশে যেত। আজ মধ্য-এসিয়া মরুভূমি ও শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে পরিণত হয়েছে। তার অনেকাংশই আজ বালু-স্তূপের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। ঐ সব বালুকাস্তূপের মধ্যে প্রোথিত হয়ে আছে বিরাট বিরাট গুহা মন্দির। অধুনা ঐ সব মন্দিরের মধ্যে যে সব চারু ও কারু-কলার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে, তাতে প্রচুর ভারতীয় প্রভাবের দৃষ্টান্ত দেখা যাচ্ছে।

আলেকজান্ড্রীয় ভৌগলিক টলেমীর বিবরণেও ভারত ও মধ্যভারতের মধ্যে অর্ণবপোত চলাচলের জলপথের উল্লেখ মেলে।

মহাজন জাতকে চম্পা, য়্যানাম্ ও সুবর্ণভূমির (সুমাত্রার) উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের সমুদ্রযাত্রার কথা লেখা আছে। অন্যান্য জাতক ও অপর গ্রন্থেও এ কথার উল্লেখ মেলে। বরবুদুরের একটী মন্দিরগাত্রে একটী উৎকীর্ণ অর্ণব-পোতের চিত্র পাওয়া গেছে। সেটী খ্রীষ্টপূর্ব্ব দু'সহস্র বছর আগের একখানি ভারতীয় বাণিজ্য-পোতের প্রতিকৃতি।

অনেকের ধারণা চীন দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবেশের সঙ্গেই ভারত ও চীনের মধ্যে মৈত্রী সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। এ

ধারণাও ভুল। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত প্রমাণগুলি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় চীন দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবেশ করার বহু পূর্ব্বেই তার ভারতের সঙ্গে গভীর সম্বন্ধ ছিল।

প্রবোধ বাগচী মহাশয়ের 'India and China' নামক গ্রন্থে দেখা যায়—'আসাম ও ব্রহ্মদেশের ভেতর দিয়ে ভারতীয় বণিকরা প্রায় যীশুখ্রীষ্টের জন্মের দু'হাজার বছর আগে বাণিজ্য করতে যেত।

সিল্‌ভাঁ-লেভীর বর্ণনায় দেখা যায় * চীন সম্রাটের এক-জন রাষ্ট্রদূত খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে কুশন রাজ সভায় এসে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশাবলী শুনে মুগ্ধ হন। তিনিই স্বদেশে ফিরে গিয়ে সেই বাণী প্রচার করেন। এই হল চীন দেশে ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রথম উন্মেষ। সম্রাট 'সিং' তাঁর বাণী শুনে মুগ্ধ হন। এর কিছুকাল পরে সম্রাট 'মিং-তি' তাঁর 'সাই-ইন্‌' (Tsai-yin) নামক একজন বিশ্বস্ত দূতকে ভারতবর্ষে এসে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অনুশীলন করে উক্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে চীন দেশে নিয়ে যাবার আদেশ করেন। 'সাই-ইন্‌' পূর্ব্বতুর্কীস্থানের শ্বাপদ-সঙ্কুল দুর্গম অরণ্যের ভেতর দিয়ে বহু পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করে গান্ধারে এসে উপস্থিত হন। তখন ঐ অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হয় নি। পরবর্ত্তীকালে বালুকারাশির ঢেউ এসে ঐ অঞ্চলকে মরুভূমিতে পরিণত করে। গান্ধারে ঐ রাজদূতের 'ধর্ম্মরক্ষ' ও 'মাতঙ্গ' নামে দুই মগধ দেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে আলাপ হয়। 'ধর্ম্মরক্ষ' ও 'মাতঙ্গ' একটী শ্বেত অশ্বের পৃষ্ঠে বহু বৌদ্ধ পুঁথি, নানা রকম বৌদ্ধ ধর্ম্মীয় নিদর্শন ও একটী বুদ্ধের মূর্ত্তি নিয়ে 'সাই-ইনের' সঙ্গে চীন-রাজ-সভায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। কোন বছরে তিনি চীন দেশে পৌছুলেন তা নিয়ে একটু মতভেদ আছে। কারও কারও মতে তিনি ৬৭ অব্দে, কেউ আবার বলেন ৭১ অব্দে চীনে পৌছেন। চৈনিক ভাষায় উক্ত পুঁথিবাহী অশ্বটীর নাম হয় 'পোমাসী' (Pomasi) অর্থাৎ 'অশ্ব-বিহার' (Horse monastery) †

* Les Voyageurs Chinois (Chayannes) PP.

† India and China bp Dr. P. C. Bagchi.

ধর্ম্মনীবুদ্ধ

৪১৪নং তুন-হোয়াং গুহার প্রাচীর-চিত্রের প্রতিলিপি। এ চিত্রের বুদ্ধ-মূর্ত্তিতে অমরা-বতীধারার প্রভাব সুপ্রকট।

'কাশ্যপ মাতঙ্গই' দুরূহ চীনাভাষা শিখে প্রথম চৈনিক ভাষায় বুদ্ধের ধর্ম্ম-সূত্র অনুবাদ করেন। ধর্ম্ম সূত্রের চীনা ভাষায় প্রচার হওয়ার পর থেকে চীন দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রসার হতে লাগল। এর অল্পকাল পরে চীন সম্রাট 'বিনয়-পিটকে' সুপণ্ডিত মধ্য-ভারতবাসী বৌদ্ধ শ্রমণ 'ধর্ম্মরক্ষকে' চীনরাজ্যে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। পরে 'কাশ্যপ' ও 'ধর্ম্মরক্ষ' দু'জনে মিলে ভগবন বুদ্ধের বাণী নিয়ে চীনাভাষায় একখানি ত্রিপিটক লিখতে সুরু করলেন † † ইতিমধ্যে 'কাশ্যপ' মারা গেলেন; তখন ধর্ম্মরক্ষ একাই সুবৃহৎ পুঁথিখানির রচনা সম্পূর্ণ করলেন। এরপর তিনি কয়েকজন চীনা শিক্ষাব্রতীর সাহায্যে (১) 'বুদ্ধ চরিত সূত্র', (২) দশ-ভূমিক্লেশ—ছেনিক সূত্র (৩) 'ধর্ম্ম-সমুদ্রকোষ সূত্র' (৪) 'জাতক' ও (৫) 'শীল' বিষয়ক সূত্রের চৈনিক অনুবাদ করেন।

এর পর দ্বিতীয় শতকের মধ্য ও শেষভাগে ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু 'মহাবল', 'ধর্ম্মকাল', 'বিঘ্ন', 'কল্যানরুক' ও

† † Manji's catalogue Apperdix.

'কল্যাণ' চীন দেশে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থের অনুবাদ করেন।

চীনাভাষা পৃথিবীর মধ্যে কঠিনতম ভাষা। এ ভাষায় যে মোট কত অক্ষর আছে তা আজও কেউ জানে না। ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা শ্বাপদ শঙ্কুল দুর্গম পথ দিয়ে, বহু নদ-নদী, পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করে সুদূর চীন দেশে গিয়ে সুকঠিন চীনা ভাষা শিক্ষা করে অনেক বৌদ্ধ ধর্ম্মমূলক গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করেন। তাঁদের এই অমানুষিক কৃচ্ছ্র-সাধনের মূলে ছিল সুদূর প্রাচ্যে ভগবন বুদ্ধের বাণী প্রচারের অদম্য সংকল্প। তাঁরা সমানে প্রচার করে চলেন —"বুদ্ধের শরণ নাও; সঙ্ঘের শরণ নাও; ধর্ম্মের শরণ নাও—নির্ব্বাণ পাবে।" কিন্তু তাঁদের বাণী বেশিদূর এগোতে পারে নি। 'কনফুসিও' প্রবর্ত্তিত চীন দেশের পূর্ব্ব ধর্ম্ম পদে পদে বৌদ্ধ ধর্ম্মের গতিপথ রোধ করে দাঁড়ায়। দুটী ধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য হলো পর্ব্বত প্রমাণ। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম যেমন উদার ও মুক্ত; কনফুসিও-ধর্ম্ম তেমনি সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ।

চীন দেশের গৃহযুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের পথে আর এক বিরাট অন্তরায়। দীর্ঘ চার শ' বছর ধরে সমানে চীন দেশে গৃহযুদ্ধ চলে। যুদ্ধে দেশের বহু লোক ক্ষয় হয়। অশান্তি, দুর্ভিক্ষ, রোগ, শোক ও আরও হাজার রকম সমস্যা এসে দেশকে উৎসন্নের মুখে তুলে দেয়। দেশের সমস্ত লোক একযোগে সম্রাটকে যুদ্ধ থামাতে বলে। তাদের আবেদনে যুদ্ধ থামে বটে, কিন্তু লোকের মনে আর শান্তি ফিরে আসে না। শোক, দুঃখ ও দীর্ঘকাল স্থায়ী উৎকণ্ঠায় সমস্ত মানুষ বিকল হয়ে গেছল। যারা শোক-দুঃখেও অভিভূত হয় নি, তারাও জীবনের একঘেয়েমীতে হাঁফিয়ে উঠেছিল। সকলেই যেন পুরনো কাষ্ঠশুষ্ক, নিষ্করুণ কনফুসিও-ধর্ম্মের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে। একটু গান গাইলে বা একটু নাচলে যে ধর্ম্মে কঠোর শাস্তির বিধান আছে, সে ধর্ম্মের প্রতি শুধু বিতৃষ্ণাই নয়, তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সামান্য নির্দ্দোশ আমোদ প্রমোদের জন্যে যে ধর্ম্মে প্রায়শ্চিত্ত করে পাপক্ষালন করতে হয়, সে ধর্ম্মকে তারা মানতে চায় না। জীবনে তারা আনন্দ চায়, শান্তি চায়, প্রস্তরীভূত কনফুসিও-ধর্ম্ম তাদের তা দিতে পারে না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে স্ফুলিঙ্গবৎ পরিচয় তারা পেয়েছিল, তাতে যেন তারা কেমন একটা নোতুনত্বের, বৈচিত্র্যের, বিশেষ করে মুক্তি ও শান্তির আভাষ পায়। তাদের আবেদনে সম্রাট ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের চীন দেশে ব্যাপকভাবে তাদের শান্তির বাণী প্রচারের নির্দ্দেশ দিলেন। তখন সেখানে মাত্র কয়েকজন ভারতীয় ভিক্ষু চীন দেশে ছিলেন। তাঁরা তাদের সাধ্যমত বুদ্ধের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। তাঁদের বাণী লোকের বিতৃষ্ণ, দীর্ণ, ক্লান্ত মনে নোতুন এক আশার সঞ্চার করল; তা যেন তাদের ক্ষত-বিক্ষত মনে আরোগ্যের প্রলেপ বুলাতে সুরু করল। প্রজাদের মধ্যে এই নোতুন ধর্ম্মের অদ্ভুত সঞ্জীবনী শক্তির পরিচয় পেয়ে সম্রাট বিশেষভাবে ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি অনুশীলন করার জন্য চৈনিক পরিব্রাজক ও শিক্ষাব্রতী 'ফা-হিয়েন্‌কে' খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রারম্ভে ভারতে পাঠালেন। 'ফা-হিয়েন্' ভারতে এসে দ্বিতীয় মৌর্য্য সম্রাটের রাজ্যের শ্রী, সমৃদ্ধি, সাংস্কৃতিক-মান কলা-সৌকর্য্য ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য দেখে বিশেষ মুগ্ধ হন্। তিনি ভারত সম্বন্ধে তাঁর যে বিবরণ চীন দেশে নিয়ে যান, তার একটী নকল ভারতে রেখে যান। তাতে দেখা যায় তিনি তৎকালীন ভারতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

পরিব্রাজক ফা-হিয়েন যখন ভারত পরিদর্শনে আসেন, তখন নালান্দা বিশ্ব-বিদ্যালয় উন্নতির তুঙ্গে আরোহণ করেছে। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে পুরো দশহাজার শিক্ষাব্রতী তখন নালান্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে থেকে নানা বিষয় অধ্যয়ন করছেন। পাটলীপুত্র (পাটনা) তখন ভারতের রাজধানী। সর্ব্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধিতে তার সঙ্গে সমকক্ষতা করার মত ভারতে অপর কোনও জনপদ তখন ছিল না। বৌদ্ধ ধর্ম্ম তখন ভারতের প্রধান ধর্ম্ম হয়ে উঠেছে। ফা-হিয়েন দীর্ঘ দিন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, বিশেষ করে পাটলীপুত্র, মগধ, মালোয়া, ও উত্তর ভারতে ভ্রমণ করে ভারতের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম অনুশীলন করেন ও উক্ত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বহু পুঁথি-পত্র ও মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে তিনি খ্রীষ্টীয় ৪১৪ অব্দে চীন দেশে ফিরে যান।

'ফা-হিয়েনের' বর্ণনায় দেখা যায় তিনি সম্রাট অশোকের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষের অতুলনীয় স্থাপত্য ও বাস্তু-সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হন; গয়া, কপিলাবস্তু ও কুশীনগরের ধ্বংসাবশেষ ও মরুবৎ জনশূন্যতা দেখে ব্যথা পান, আর বৌদ্ধধর্ম্মের গভীর সার্ব্বজনীন আবেদন দেখে পুলকিত হন। তাঁর মনে হয় তৎকালীন যুদ্ধ বিধ্বস্ত চীন দেশের জন্যে তেমনি সার্ব্বজনীন, পরম শান্তির ধর্ম্মেরই প্রয়োজন। স্বদেশে ফিরে তিনি ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের জনপ্রিয়তা, তার প্রভাব ও তার মূল নীতিগুলির লিখিত বিবরণ পেশ করলেন সম্রাটের সামনে। সম্রাট ভগবন বুদ্ধের অহিংসা মৈত্রী ও চিরন্তন শান্তির বিষয় সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন। ফা-হিয়েনের চারজন সঙ্গী 'হুই কিং (Hui King) তেও কিং (Tao King) হুই-ইং (Hui ying) ও হুই-উই (Hui wie) যে সমস্ত তথ্য ও পুঁথি সংগ্রহ করে নিয়ে যান, সম্রাট পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তার পাঠ শ্রবণ করেন ও উক্ত পুঁথিগুলির বিধান যথসাধ্য অনুশীলন করতে সুরু করেন।

এরপর কতকগুলি বৌদ্ধ ভিক্ষু উত্তর-পশ্চিম ভারত হতে দীর্ঘ তিন বছর হেঁটে, ৪২১ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশে গিয়ে পৌঁছান এঁদের মধ্যে 'বুদ্ধ ভদ্র, 'ভীমোকসাস্নো' ও 'জীন গুপ্তের' নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধ ভদ্রকে অবশ্য 'ফা-হিয়েন' চীনদেশে যাবার জন্যে স্বয়ং আমন্ত্রণ করে যান। যে সব ভারতীয় শিক্ষাব্রতী চীন দেশে যান, তাঁদের মধ্যে 'বুদ্ধ ভদ্রের' পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তাঁর চীনভাষায় লেখা মূল গ্রন্থ ও অনুবাদগুলি আজও চীন-সাহিত্য ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে গণ্য হয়। তিনি চীন দেশে পৌঁছে মাত্র আট বছরের মধ্যে বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করেন ও ৪২৯ অব্দে চীন দেশেই মারা যান।

এই সময় থেকেই উভয় দেশের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুত সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ সুদৃঢ় হতে থাকে। দলে দলে চৈনিক শিক্ষাব্রতীরা ভারতে আসতে থাকে; ভারত থেকেও বহু বৌদ্ধ শিক্ষাব্রতী চীন দেশে যেতে থাকেন। চীনা-শিক্ষাব্রতীদের ভারতে আসার উদ্দেশ্য ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম অনুশীলন ও ভারতীয় শিক্ষাব্রতীদের উদ্দেশ্য হলো চীনে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করা।

ধ্যানীবুদ্ধ

এটী ১৭৭নং হোয়াং গুহার চিত্রের প্রতিলিপি ছবিখানি ৫২০ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত। এতে গান্ধার ও পারসিক প্রভাব সুপ্রকট।

ঐ সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা চীন ছাড়াও তিব্বত, সিংহল ও বৃহত্তর ভারতে যেতে সুরু করেন। বৌদ্ধ শিল্পী 'গুন-বর্ম্মন' এমনি একজন উৎসাহী প্রচারক। তাঁর জন্ম কাশ্মীরের রাজ-পরিবারে তিনি কেবল শিল্পী ও ধর্ম্ম প্রচারকই ছিলেন না, তিনি বিভিন্ন ভাষা, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। কাশ্মীর থেকে তিনি সিংহলে যান ও সেখান থেকে যবদ্বীপে যান বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করতে। যবদ্বীপ হতে চীন সম্রাটের আমন্ত্রণে তিনি ৪৩১ অব্দে চীন দেশে গিয়ে দেখেন চীন দেশে তখন কতকগুলি বৌদ্ধ বিহার নির্ম্মিত হয়েছে। সম্রাট তাঁকে ক্যাণ্টনের এক নব-নির্ম্মিত বৌদ্ধ বিহার দেখালে তিনি বলেন—"এ বিহার অসম্পূর্ণ যেহেতু

বিহারের প্রাচীরগাত্রে ভগবন বুদ্ধের কোন জীবন-চিত্র আঁকা হয় নি। সাধারণ লোকের মন অত্যন্ত চঞ্চল। ভগবন বুদ্ধের ধ্যানে তাদের নিমগ্ন করতে হলে তাঁর প্রতি তাদের মনস্থির করতে হবে। এর জন্তে প্রয়োজন তাঁর চিত্র।" সম্রাট তার কথা শুনে বলেন,—নট, নটী, নাপিত, শিল্পী ও কুকুর যে কনফুসিও-ধর্ম্মে অস্পৃশ্য জীব। এদের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়ালে যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়" গুণ বর্ম্মন নিজে শিল্পী। তিনি সম্রাটের এই উক্তির প্রতিবাদ করে বলেন—"সম্রাট, আপনার এ ধারণা সর্ব্বৈব ভুল। শিল্পী হেয় নয়; অস্পৃশ্য নয। শিল্পী হল সমাজের সব চেয়ে সম্মানার্হ মানুষ। যে তুলি দিয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায় অক্ষর লিখে' মনের ভাব প্রকাশ করে, শিল্পী সেই তুলি দিয়েই ছবি এঁকে তার মনের ভাব প্রকাশ করে। অক্ষর লেখার চেয়ে ছবি আঁকা অনেক বেশি কঠিন। কাজেই যে লিখতে পারে, তার চেয়ে যে আঁকতে পারে তার সম্মান বহু গুণ বেশি।" চীন সম্রাট মুস্কিলে পড়েন।

তখন 'নান্‌কিংয়ের ইম্পিরিয়াল্‌ কোর্টে' বহু গুণী ভারতীয় দার্শনিক ও শিক্ষাব্রতীর সমাবেশ ঘটে। তাঁদের মধ্যে শিল্পামোদীও ছিলেন কয়েকজন। তাঁরা শিল্পী গুণবর্ম্মনের মতের সমর্থন করেন। গুণবর্ম্মন ক্যান্টনের সেই বিরাট বিহারের সমস্ত গাত্রে ভগবান বুদ্ধের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী অবলম্বন করে' অনেক প্রাচীর-চিত্র আঁকলেন। এ ছাড়াও তিনি নান্‌কিংয়ের আরও কতকগুলি বিহারের আভ্যন্তরীণ প্রাচীরের ওপর অনেক প্রাচীর-চিত্র আঁকেন। এই কার্য্যে কয়েকজন ভারতীয় শিল্পীও তাঁর সহায়তা করেন। সম্রাট সেই সব বুদ্ধ-চিত্র দেখে বিশেষ প্রীত হন। এর পর সম্রাট চীনদেশের অপাংক্তেয় শিল্পীদের ডেকে গুণবর্ম্মনের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করতে বলেন। চীনের সমাজ-পরিত্যক্ত, অস্পৃশ্য শিল্পীরা এসে গুণবর্ম্মনের ধারা অনুসরণ করে ছবি আঁকতে সুরু করলেন। এই ভাবে চীনের অপাংক্তেয় শিল্পীগোষ্ঠী ধর্ম্মের তাগিদে সমাজে তথা জাতে উঠল। এর পর সম্রাটের দিক থেকে তাদের ডাক এল হাতে লেখা বৌদ্ধ পুঁথির পাতায় ভগবান বুদ্ধের জীবন-চিত্র আঁকার জন্তে। চৈনিক শিল্পীদের অঙ্কন দেখে সম্রাট ও ভারতীয়েরা বিশেষ আনন্দিত হন।

এর পর থেকে ভারতীয় ও চৈনিক শিল্পীরা পাশাপাশি বৌদ্ধ বিহারের প্রাচীরে ছবি এঁকে চলেন। ভারতীয় শিল্পীরা চৈনিক শিল্পীদের তুলনায় চিত্রবিদ্যায় অনেক বেশি নিপুণ ছিলেন। কাজেই তাদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে চৈনিক শিল্পীদের অত্যন্ত দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। তারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভারতীয় শিল্পাদর্শ অনুসরণ করে চলল।

'তাং' শাসনকালে চীন দেশে শান্তি ফিরে আসে। দীর্ঘ চারশ' বছর ধরে ঐ শান্তি বিরাজ করে। ঐ কালে বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে কেন্দ্র করে 'তাং' সম্রাটদের অনুপ্রেরণা ও পৃষ্ঠ-পোষকতায় ললিত-কলার প্রত্যেক শাখা উন্নতির চরম শিখরে ওঠে।

'উই' বংশের শাসন কালে চীন দেশে নির্ব্বাসিত ললিত-কলার বিশেষ পরিপুষ্টি ঘটে। এই সময় 'লে-ইয়াং' (Lo-yang) ও 'চ' য়্যাংগ্যান্‌ (Ch' angngan) বৌদ্ধ ধর্ম্মের দুটী বিরাট কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরাট পৃষ্ঠপোষক 'উই' শাসনের অবসান ঘটে ৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। এর পরবর্ত্তী কালের শাসকদের আমলে উৎসাহ ও পৃষ্ঠ-পোষকতার অভাবে উভয় দেশেরই শিক্ষাব্রতীরা উভয় দেশে আসা-যাওয়া ছেড়ে দেন। এই সঙ্গে নবজাগরিত চৈনিক চিত্রকলার ধারাও দিনে দিনে কেমন যেন শুদ্ধ হয়ে আসে। অবশ্য বেশি দিন এমন চলে না।

এরপর সুরু হয় 'সুই' বংশের শাসনকাল (৬০৫—৬১৬ খ্রীষ্টাব্দ); এই বংশের প্রথম সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করেই এসিয়া ও ভারত পরিদর্শনের জন্তে এক সাংস্কৃতিক পরিষদকে পাঠান। পঁয়ষট্টি বছর ধরে উভয় দেশের মধ্যে যে সংস্কৃতি বিনিময় বন্ধ হয়ে ছিল, তিনি তা আবার পুনঃ স্থাপিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য বিশেষ সফল হয় নি, তবে এই বংশের সম্রাটরা চীনদেশের খণ্ড-বিখণ্ড রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটা ঐক্যের সম্বন্ধ স্থাপন করতে সমর্থ হন।

এরপর তাং বংশের শাসন কাল (৬১৮—৯০৭ খৃষ্টাব্দ) সুরু হয়। এই কালে চীন দেশে অখণ্ড শান্তি আসে। 'তাং' সম্রাট স্বদেশের শিক্ষাব্রতী ও পরিব্রাজকদের আগের

মত ভারতে এসে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অনুশীলন ও ভারতীয় পুঁথি নকল করতে আসবার জন্যে উৎসাহিত করেন। তিনি এই সব শিক্ষাব্রতীর জন্যে বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। চীন দেশ থেকে যত শিক্ষাব্রতী ভারতে আসেন তার মধ্যে 'হুয়েন্-সাং'ই চীন ও ভারতের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ সবচেয়ে বেশি সুদৃঢ় করে তোলেন।

"Huen-Tsang played the greatest role in the history of Sino-Indian cultural relations, not only during the T'ang period, but in all times."

হুয়েন্-সাংয়ের জন্ম হয় চীন দেশের এক অভিজাত বংশে। সে বংশ গোঁড়া কনফুসিও-ধর্ম্মী ছিল। হঠাৎ হুয়েনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করে। হুয়েন্ ইতঃপূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনিও দাদার দেখাদেখি কুড়ি বছর বয়সে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করলেন। এর পর তিনি ভারতের বিখ্যাত নালান্দা বিশ্ব-বিদ্যালয় দেখবার ও গভীরভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম অনুশীলন করবার উদ্দেশ্যে পদব্রজেই ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন।

'হুয়েন্-সাং' ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন থেকে যাত্রা করে পদব্রজে 'টারফ্যানের' ভেতর দিয়ে পশ্চিম তুর্কীস্থানে ও পরে 'তাইয়েন্-সেন্' পাহাড় অতিক্রম করে তুর্কী-সম্রাটের 'তোক্‌মাকস্থ' শিবিরে এসে পৌছান। সে সময়ে সেখানে 'প্রভাকর মিত্র' বলে নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী বৌদ্ধ ছাত্র অবস্থান করছিলেন। তুর্ক সেনাপতি বৌদ্ধ ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় 'হুয়েন্-সাংয়ের' বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করেন। তিনিই 'হুয়েন্‌কে' ভারতে আসার সংক্ষিপ্ত পথের নির্দ্দেশ দেন। 'হুয়েন্-সাং' 'সগ্‌ডিয়ানা', টোখারেস্তান, 'কুণ্ডুজ', 'বল্ক', 'বামিয়ান', ও 'কপিশের' (কাবুল) ভেতর দিয়ে ভারতে এসে পৌছান।

'হুয়েন্-সাং'—দীর্ঘ ষোলো বছর ভারতে অবস্থান করেন। তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় প্রত্যেকটী রাজধানী প্রদর্শন করেন; সুদূর সিংহল পর্য্যন্ত পদব্রজেই যান; কনৌজের সম্রাট 'হর্ষ' ও কামরূপের (আসাম) সম্রাট 'ভাস্কর বর্ম্মনের' সঙ্গে তার নিবিড় সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। তিনি পাঁচ বছর নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে বহু বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সংস্কৃত পুঁথি চীন ভাষায় অনুবাদ করেন; বহু গ্রন্থের নকলও করেন; নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান কালে তিনি ভারতীয় দর্শন, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, ঔষধ-বিজ্ঞান প্রভৃতি গভীরভাবে অনুশীলন করেন। ইতি-মধ্যে মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে চীনের সাময়িক মতদ্বৈধ ঘটে ও উক্ত কারণে ভারত ও চীনে যাতায়াতের জন্যে 'পাস্‌পোর্টের' নিয়ম করা হয়। 'ছাড়পত্র' পাওয়া যাবে

শঙ্খবাদিনী

৩২২নং তুন-হোয়াং গুহার প্রাচীর চিত্রের প্রতি-লিপি। এ চিত্রখানিতে দেখান হয়েছে একটী নারী শঙ্খ বাজাচ্ছেন। ছবিখানি ৬৬০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত। সুদৃঢ় অল্প কয়েকটি রেখায় ছবিখানিতে এক স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে।

কি না, এই কারণের বশবর্ত্তী হয়ে 'হুয়েন্-সাং' গোপনে ভারত পরিত্যাগ করেন। তাঁর ভারতে আসার সব চেয়ে বড কারণ হচ্ছে, চীনা ভাষায় অনুদিত বৌদ্ধশাস্ত্র পড়ে তিনি তৃপ্ত হতে পারেন নি। ঐ সব অনুবাদের মূল গ্রন্থ পাঠের জন্যেই তিনি ভারতে আসেন। অদম্য অনুসন্ধিৎসা ও অসাধারণ জ্ঞানের তৃষ্ণাই তাঁকে ভারতে আসতে ও দীর্ঘকাল ভারতে থাকতে প্রণোদিত করে।

আসার সময়ও 'হুয়েন-সাং' গোপনে স্বদেশ ত্যাগ করেন; ভারত থেকেও তিনি গোপনেই বিদায় নেন। তিনি মধ্য এসিয়ার দক্ষিণাংশের অরণ্যের ভেতর দিয়ে 'খাস্‌গড়', 'খোটান্', 'চাল্‌মাদানা' (লব্‌নরের নিকটস্থ সেন্-সেন্) দিয়ে ৬৪৫ অব্দে স্বদেশে গিয়ে পৌঁছান। খোটানে পৌঁছে তিনি তৎকালীন ভারত সম্রাটকে যে পত্র দেন,—তার কিয়দংশের ইংরিজি অনুবাদ নিচে প্রদত্ত হল:

"I Hiuen-tsang......pondered on a plan for searching out the true learning, without any thought for personal safety. Accordingly...... braving dangers and obstacles, I secretly found my way to India. I traversed over vast plains of shifting sand, Scaled precipitous mountain-crags clad with snow, found my way......along by the tumultuous waves of the hot-sea...Thus I have accomplished a journey of more than 50,000 li*; yet, notwithstanding the thousand differences of customs and manners I have witnessed, the myriads of dangers. I have encountered, by the goodness of Heaven; I have returned without accident and now offer my homage with a body unimpaired and a mind satisfied with the accomplishment of my vows. I have witnessed spiritual prodigies, exceeding all the wonders of nature, have borne testimony to the high qualities of our august Emperor, and won for him the high esteem and praise of the people."

'হুয়েন্-সাংয়ে'র ৬৬৪ সালে মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত পুঁথি-পত্র লেখায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি ভারতে যে সমস্ত অমূল্য পুঁথির নকল করে নিয়ে যান তার বিরাট এক বোঝা সিন্ধু নদ পার হওয়ার সময় জলে পড়ে যায়, তা সত্ত্বেও তিনি ত্রিশখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন।

'হুয়েন-সাং' স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর ৬৩৪ অব্দে সম্রাট রাষ্ট্রদূত 'লিইপেযো' প্রমুখ ত্রিশজন সুনির্ব্বাচিত শিক্ষাব্রতীকে কনৌজে পাঠান। তাঁরা ন' মাস পরে ভারতের মগধ রাজ্যে পৌঁছান ও রাজগীর, গৃধ্রকূট ও মহাবোধি পরিদর্শন করেন। তাঁরাই বৌদ্ধগয়াতে চৈনিক লিপিতে লেখা কতকগুলি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় খোদিত ফলক রেখে যান। ভারতীয় কৃষ্টি অনুশীলন করে তাঁরা ৬৪৭ অব্দে চীনে ফেরেন। ঐ বছরেই 'ওয়ান্-হুয়েন্-সো' নামক আর একজন রাষ্ট্রদূতের অধীনে সম্রাট আর একদল শিক্ষাব্রতীকে ভারতে পাঠান। 'ওয়ান্-হুয়েন্-সো, মগধ রাজ্যে পৌঁছান মাত্র তাঁর সমস্ত অনুচরদের হত্যা করা হয়। কেবল তিনিই নেপালে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। হুয়েন্-সাং ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার পরই হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হয় ও তাঁর স্থানাধিরূঢ় সম্রাটই নৃশংসভাবে চৈনিক অতিথিদের হত্যা করেন। সে সময়ে তিব্বতের সম্রাট ছিলেন 'স্রং-বৎস্তান্-সগ্যান্-পো'। তাঁর এক স্ত্রী ছিলেন চীন রাজবংশের কন্যা, অপর স্ত্রী ছিলেন নেপালের রাজবংশের কন্যা,—অর্থাৎ 'স্রং' যুগপৎ নেপাল ও চীনের বন্ধু ছিলেন। 'স্রংয়ের' সাহায্যে 'ওয়ান-হুয়েন্-সো' মগধের নিষ্ঠুর সম্রাটকে আক্রমণ করে, যুদ্ধে পরাস্ত করে বন্দী করে তাকে চীনদেশে নিয়ে যান। ওয়ান্-হুয়েন্-সো মোট চারবার ভারতে আসেন। এর পর যে সব চৈনিক পরিব্রাজক ভারতে আসেন তার মধ্যে 'ই-সিংয়ের' নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাণ্ডিত্যের দিক থেকে হুয়েন সাংয়ের পরেই তাঁর স্থান। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে একখানি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। তার নাম,—'নান্-হাই-কি-কুই-নেই-ফা-চুয়ান্' এরপর অষ্টম শতকে সুনির্দ্দিষ্ট জলপথ হলে উভয় দেশের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ঐ সময়ে মহাচীনে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ব্যাপক প্রচার ঘটে।

'তুন্-হোয়াং' গুহার চিত্রাবলীতে ভারত ও চীনের

* এক 'লি' (Li) হলো তিন মাইলের সমান।

সাংস্কৃতিক সম্বন্ধের ক্রমবিকাশের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। কনফুসীও ধর্ম্মে গীত, বাদ্য ও ললিত-কলা 'কামোদ্দীপক-কলা' বলে নিষিদ্ধ ছিল। শিল্পীদের দেখতে পেলে সে কালের চৈনিক ভদ্রলোকেরা 'ঘৃণিত কুকুর' বলে থুথু ফেলত। কিন্তু তাতেও একদল লোকের চিত্রাঙ্কন-বিদ্যার প্রতি এমন গভীর অনুরাগ ছিল যে তারা ধর্ম্মের সমস্ত নিষেধ দেশের লোকের ঘৃণা ও অবজ্ঞা সমস্ত উপেক্ষা করে ছবি আঁকত। ক্রমে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে লোকচক্ষের অন্তরালে এক ছবি আঁকার উপযুক্ত স্থান বেছে বার করল। চীন দেশের পশ্চিম সীমান্তের জঙ্গলাবৃত স্বাভাবিক গুহাগুলি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেখানে তখন কোন লোকই প্রায় যেত না। তাই তাদের মনে হয় উক্ত নিভৃত গুহা-গর্ভের দেয়ালগুলি তাদের কলাচর্চ্চার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। দিনের পর দিন তারা ঐ গুহাগভে চিত্র এঁকে যায়। তারা লোকচক্ষের অন্তরালে ছবি আঁকে নিছক আনন্দের জন্য। কয়েক পুরুষ ধরে তাদের এমনি সাধনা চলে, কিন্তু সমাজে তাদের আর কোন স্থান হয় না। তারপর এক শুভ দিনে ভারতীয় বৌদ্ধ শিল্পী-'গুণবর্ম্মন' এসে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার নাগপাশ হতে তাদের মুক্তি দিলেন।

অচ্ছ্যুৎ শিল্পীরা লোক-চক্ষের অন্তরালে অন্ধকার 'তুন-হোয়াং' গুহার মধ্যে চিত্র এঁকে তাদের শিল্পানুরাগ চরিতার্থ করত। তারা সামাজিক মান লাভ করার পর চীন সম্রাট জানতে পারলেন 'তুন-হোয়াং' গুহার মধ্যে দীর্ঘ তিন শত বছর ধরে সমাজ-পরিত্যক্ত শিল্পীরা অজস্র প্রাচীর-চিত্র এঁকেছে, তখন সম্রাট বল্লেন—'তুন্-হোয়াং' গুহায় এবার তোমরা ভগবন্ বুদ্ধের জীবন অবলম্বনে সমানে চিত্র এঁকে যাও। রাজানুগ্রহ পেয়ে ও সুসংস্কৃত ভারতীয় বৌদ্ধ শিল্পীদের সংস্পর্শে এসে তারা নোতুন উদ্যমে নোতুন নোতুন ধারায় সমানে বৌদ্ধ-ধর্ম্মমূলক ছবি এঁকে চল্লো। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তারা সমানে নানা বিষয় নিয়ে নানা আকারের, ছোট বড় প্রাচীর চিত্র আঁকে। ক্রমে 'তুন-হোয়াং' এক বিখ্যাত বৌদ্ধ-মঠে পরিণত হয়। দেশ বিদেশ থেকে দলে দলে লোক এই বৌদ্ধ তীর্থস্থান পরিদর্শনে আসে। তুন্-হোয়াং গুহার নাম হয়,—"সহস্র বুদ্ধের মন্দির"।

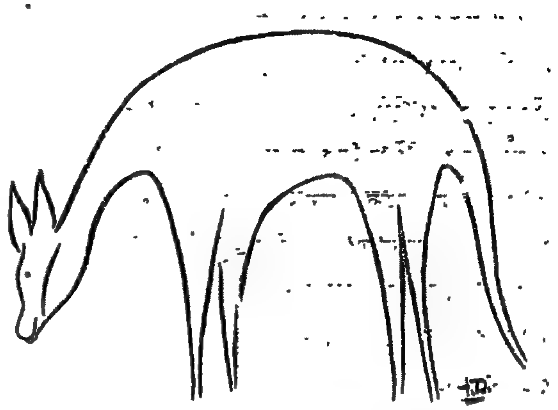

২৩১নং তুনহোয়াং গুহার একটী হরিণের চিত্র। মাত্র কয়েকটা বলিষ্ঠ রেখার ব্যঞ্জনায় শিল্পী প্রাণীটিকে অদ্ভুত জীবন্ত করে তুলেছে। রেখার fluency ও নিটোল perfection ও সহজ প্রকাশ ভঙ্গী ছবিটার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ ছবিখানি খ্রীষ্টের জন্মের আটাশ বছর পূর্ব্বে আঁকা।

তুন্-হোয়াং গুহার খ্যাতিতেই তুন্-হোয়াং ক্রমে এক বিখ্যাত বন্দর হয়ে ওঠে। ভারতীয় শিল্পীর শিল্পধারা ও নানা দেশের লোকের অনুপ্রেরণা চীনা শিল্পীদের নানা দিক দিয়ে অনুপ্রাণিত করে চৈনিক চিত্রকলার ধারাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। 'তাং' বংশের শাসনকালে (৬১৮—৯০৭ খৃষ্টাব্দ) চীন দেশে এক অখণ্ড শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করে, আর সুসংস্কৃত 'তাং' সম্রাটরাও শিল্পকলার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এই কারণেই এ যুগে চীন চিত্রকলা উন্নতির তুঙ্গে আরোহণ করে। চিত্রের রেখার ব্যঞ্জনা হয়ে ওঠে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, বর্ণসম্পাত হয়ে ওঠে নয়নমুগ্ধকর। এই কালের চিত্রগুলির বিষয়বস্তু, অঙ্গসৌষ্ঠব, ভাব-সমৃদ্ধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ধ্যানী-বুদ্ধ', 'অমিতাভ', 'মৈত্রেয়ী' 'বুদ্ধের মার বিজয়' প্রভৃতি হ'ল এই যুগের অঙ্কনের জনপ্রিয় বিষয়বস্তু। তুন্-হোয়াং গুহাগর্ভে গাছ-গাছড়া ও মৃত্তিকালব্ধ রংয়ে আঁকা এইসব প্রাচীর-চিত্রের ওপর

দিয়ে মরুভূমির বালুকা-ঝঞ্ঝা, বৃষ্টির ছাট, উগ্র আলো আর্দ্রতা ও কালের অন্যান্য অজস্র ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়া সত্ত্বেও আজও হাজার হাজার ছবি শুধু সুস্পষ্টই নয়, বেশ ভালো অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। পাঁচশ গুহার মধ্যে এখন পর্য্যন্ত চারশ ছিয়ানব্বইটা গুহা আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে এগারো মাইল দীর্ঘ 'মাকাও' গুহাতেই সব চেয়ে সুন্দর প্রাচীর চিত্র আছে। 'মাকাও' গুহার চিত্রগুলি যেমন সুন্দর তেমনি জীবন্ত। এতে 'বৌদ্ধ-চিত্র' ছাড়াও 'শোভাযাত্রা', 'অভিযান', 'দাতা', 'বাস্তুকার', 'অপ্সরা' প্রভৃতির অজস্র অপরূপ সুন্দর চিত্র আছে। এই সব ছবির অঙ্গসৌষ্ঠব যেমন নয়ন মুগ্ধকর, রংয়ের সৌষ্ঠবও তেমনি চিত্তাকর্ষক। এই সব চিত্রে ভারতের অজন্তা, অমরাবতী ও গান্ধার ধারার প্রভাব সুগভীর।

'তাং' বংশের রাজত্বকালেই 'তুন্-হোয়াং' প্রাচীর-চিত্রের ধারা বিকাশের চরম শীর্ষে ওঠে। এই কালের স্থিতি ৬১৮ হতে ৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ; এরপর 'সুং-বংশের' শাসনকালে (৯২০ হতে ১২৭৭ খ্রীষ্টাব্দ) চৈনিক চিত্রকলার অবনতি ঘটতে থাকে। এর কারণ হ'ল সম্রাটদের শিল্পানুরাগের অভাব। তারপর মঙ্গোল ইউয়ান বংশের (১৩৭৭ হতে ১৩৬৭ খ্রীষ্টাব্দ) শাসনকালে 'তুন্-হোয়াং' গুহা-চিত্রের একেবারে অপমৃত্যু ঘটে। এই সম্রাটরা এক অসংস্কৃত মঙ্গোল রক্তজ। এদের নানারকম অর্বাচীনতার জন্যে 'তুন্-হোয়াংয়ের' পূর্ব্ব সমৃদ্ধি লুপ্ত হয়। 'তুন-হোয়াং' বন্দর উঠে যাওয়ার ফলে দেশ বিদেশের লোক আর 'তুন্-হোয়াংয়ে' আসে না। শিল্পীরা এতে নিরুৎসাহ ত হয়ই, তা ছাড়া সম্রাটরা বলেন সহস্র বাহু, সহস্র চক্ষু 'কালী', 'তারা', প্রভৃতি তান্ত্রিক দেব-দেবীর চিত্র আঁকতে হবে। এই সব অবাস্তব আকারের দেব-দেবীর ছবি কোন ভালো শিল্পীই আঁকতে রাজী হয় না। তারা তুলি ছেড়ে দেয়, এইখান থেকেই দীর্ঘ ষোল শ' বছর ধরে একটী ক্রমবর্দ্ধমান জীবন্ত তরুর মত যে 'তুন-হোয়াং' প্রাচীর-চিত্র ধীরে ধীরে নানা প্রভাবে পরিপুষ্ট হয়ে সুবিকশিত হয়ে উঠেছিল তা চিরতরে লুপ্ত হয়ে পড়ে। আজ তুন-হোয়াংয়ের ক্রোশ ক্রোশ বিস্তৃত বারো শ' বছর ধরে আঁকা অমূল্য চিত্র সম্পদের অধিকাংশই মরুভূমির বালুকার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। অনেক চিত্রই চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে, অনেকের অবস্থা এখনও জানা যায়নি।

চৈনিক সাংস্কৃতিক মিসানের তুন-হোয়াং গুহার প্রাচীর চিত্রের প্রতিলিপির বিভাগটীতে সুন্দর করে দেখান হয়েছে চৈনিক চিত্রকলার আদিম রূপ কি ছিল; ভারতের সংস্কৃতি বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় শিল্পীদের প্রভাবেই বা-তা ধীরে ধীরে কি ভাবে বিকশিত হয়ে উঠে, আর মঙ্গোলিয়ান ইউয়ান সম্রাটদের প্রভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন তিব্বতি তান্ত্রিক চিত্রকলার প্রভাবেই বা তা কি ভাবে ধ্বংস হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভারত ও চীনের সম্বন্ধ কয়েক সহস্র বছরের। চীনের কাছে ভারত কিছু পায় নি, তবে চীন ভারতের কাছে তার ধর্ম্ম, শিল্পকলা ও অন্যান্য নানা বিষয়ের জন্য ঋণী।

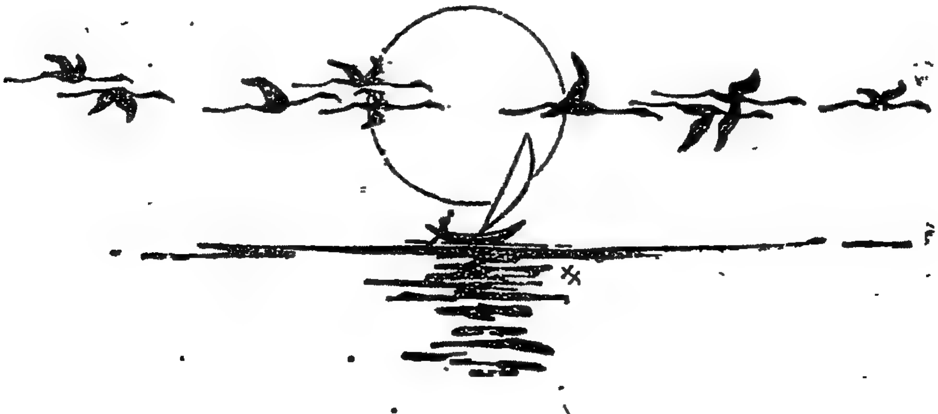

একটি প্রশ্ন

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

মাতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করতে এসে বিমল একটু বসল, বললে—"এই রক্ষে যে, তোমরা আমার মায়ের শোকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করো নি।"

নিত্যানন্দ ঘোড়ার কিস্তীর পাল্টা চাল নিয়ে এতক্ষণ নাস্তানাবুদ হচ্ছিল। বিমল যে এসে বসেছে, সকলকে পায় জানিয়ে নিমন্ত্রণ করছে—সব কিছুই নিত্যানন্দর চোখের সামনে ঘটেছে সত্য, তবু একবারও সে ফিরে তাকায় নি। কিন্তু এবারে সেও মুখ তুলে বললে—"তার মানে?"

বিমল বললে—"ভাই এ কটা দিন যে আমার কি করে কাটছে তা ব'লে বোঝানো যাবে না।"

এ আড্ডার বৈশিষ্ট্যই এই যে, পারতপক্ষে বেশী কথা কেউ বলে না। বিশেষ ক'রে আনন্দ বা বিষণ্ণতার মত সামান্ত ব্যাপারে আতিশয্য প্রকাশ করাটা এ আড্ডার নীতিবিরুদ্ধ। অতএব সবাই চুপ করেই রইল।

বিমলও এই আড্ডার সভ্য। তার মাতৃবিয়োগের পর এখানকার সকলেই শ্মশানে গিয়ে সৎকার করে এসেছে। কিন্তু তারপর বিমলদের বাড়ীর দিকে কেউ হাঁটে নি। সেজন্ত বিমলও কিছু মনে করতে পারে না।

সে বললে—"বাড়ী বয়ে এসে সবাই কেঁদে যাচ্ছে, বুঝলে?"

—"সে যেতে পারে" নিত্যানন্দ বললে—"তোমার মা তো পাড়ার মধ্যে পপুলার ছিলেন।"

—"সে এক ফ্যাসাদ। আমার চোখ খট্‌খটে শুকনো আর বাইরের মানুষ সব—বোঝো একবার অসুবিধেটা। যত সব বাজে থাকি জন্তই তাদের মনে হয় যে আমি বুঝি তাদের কান্নাতে তেমন ইম্প্রেসড্ হই নি—অতএব ডোজ্ বেড়ে যায়।"

নিত্যানন্দ বললে—"সে যাক, এখন শ্রাদ্ধের দিনটা পেরিয়ে গেলেই তুমি নিশ্চিন্ত—আর কেউ কেঁদে ভাসাতে আসবে না।"

হরিপদ চিন্তান্বিতভাবে বললে—"কিন্তু আমি জানি এই শেষের দু' তিনটি দিনের ফিনিশিং টাচ্ সামলানো খুব কঠিন বাবা যখন গেলেন, তখন ভাই যেখানেই নমস্কার করতে যাই সেখানেই ওই ব্যাপার—বয়েস তখন অল্প, সামলাতে পারব কেন, আমিও ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদেছি। আজকাল ব্যাশনিং হয়ে এই একটা ভালো হয়েছে, খাদ্য খাবার কনট্রোলের সঙ্গে তোমার গিয়ে বিয়ের হিড়িকে বরযাত্রীর হল্লোড়, আর শ্রাদ্ধের নেমন্তন্নের চাল ও লুচি সন্দেশ তো আর নেই—সেই অনুতাপে—"

নিত্যানন্দ ধমকে উঠল—"অনুতাপ নয়—অশ্রুপাতে, তুই বাংলাটা আজও শিখতে পারলি নে—।"

বিমল বললে—"আমার ভয় ছিল, তোরা যদি আমায় দেখে সান্ত্বনা দিতে শুরু করিস, তাহলে আর—"

কোন সময়ে যে জগুদা বিমলের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, ওরা কেউ টের পায় নি। সবাই বলে জগুদার পায়ে বিড়ালের থাবা বসানো রয়েছে শুধু পা'ই না কেন, চোখও তার বিড়ালের মত অন্ধকারে জ্বলে।

বিমলের কথা শেষ হওয়ার আগে জগুদা বললে—"তোদের ওই এক বদ অভ্যেস। একবার যদি মানুষের নিন্দে করতে শুরু করলি তো নিন্দেই করবি—প্রশংসার মত কি কিছু নেই? আমি বলি কি, খুব আছে।"

জগুদার দিকে সকলেই ফিরে তাকাল।

বিমল বললে—"জগুদা পরশু দিন—।"

বাধা দিয়ে জগু বললে—"জানি, পরশুদিনের ফর্দটা কে করলে তাই বল দিকিন্। হুঁঃ আমাকে নেমন্তন্ন করতে তোর লজ্জা করে না? ন্যাথ্ বিমলে—তোর মায়ের ছিলেন গ্র্যাণ্ড লেডি আমার মায়ের হার্টো বন্ধু—তিনি আমার—। যাক গে ওসব সেন্টিমেন্ট তোরা

বুঝবি নে।” সকলের দিকে তাকিয়ে জগুদা বললে—“কই সবাই চুপ মেরে গেলি যে, আমি যদি এখন কাঁদতে আরম্ভ করি, তোরা পারিস আমাকে এখান থেকে বার ক’রে দিতে? দেখি তোদের কেমন ধক্ আছে—”

নিত্যানন্দ বিড় বিড় ক’রে কি যেন বললে আপন মনে।

হরিপদ একটা সিগারেট বার করে জগুদার দিকে ছুঁড়ে দিল এবং একটা নিজে ধরিয়ে টান দিয়ে উঁচু দিকে মুখ তুলে বসে রইল। জগুদাকে বাধা দেবার সাহস কারও নেই। ওর কথার ধরতাই থেকে এরা কোনদিনই ওকে বুঝতে পারে না। সেইজন্যই সবাই চুপ করে আছে,—আস্তে আস্তে জগুদা নিজেকে মেলে ধরবেন এই আশাতে। জগুদার ওপর এদের আস্থা আছে। যেহেতু জগুদা ভবঘুরে এবং বেকার—যেহেতু জগুদার জীবনে বিচিত্র রকমের অভিজ্ঞতা রয়েছে, সেহেতু জগুদাকে এরা সবাই মান্য করে। কারণ লোকটা বই পড়া বুকনি ঝাড়ে না। জগুদার সব কথাই জীবনের পাতা থেকে নেওয়া। কাজেই, যাদের নাগরিক জীবনে কোনই বৈচিত্র্য নেই তারা জগমোহনকে খুব তারিফ করে।

—“আড্ডার সবাই চুপ মেরে রইলি যে। তবে আমি যে এই কাঁদুনে রেওয়াজের পক্ষপাতী তা নয়—তবে কি জানিস, মানুষকে দেখতে জানা চাই। মানে, আমার মতে কেউ কাঁদবে, কেউ হয় ত কাঁদতে পারবে না, কেউবা এসব দেখে বিরক্ত হয়ে থাকে, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে, আমি শুধু দেখব। কাঁদার দলে যদি না যাই, তবে না কাঁদাকে মাথায় নিয়ে নাচব, এমন কোনো মানে নেই।...

“বিমলের মায়ের কথা এখন থাক। আমার বাবার মৃত্যুর কথাই বলি, তাহলে তোমরা বুঝবে। ভয় নেই, আমার নিজের দিকে পক্ষপাতিত্ব করব না। ব্যাপারটা ঘটেছিল ঠিক উল্টো। শ্মশানে গেলাম, কিন্তু শ্মশানবন্ধুদের ওপর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস আমার কোনোদিন নেই। ওদের ভাই এইটুকু বেলা থেকে আমি চিনি। ওরা মানে অবিশ্যি পেশাদার শ্মশানবন্ধুদের কথা বলছি—তার মধ্যে আমি নিজেও পড়ি, ওরা আত্মীয় পর কিছু বাছ-বিচার করে না। তুমি যদি ওদের হাতে শ্মশানের দরকারী সামগ্রী কিনতে দাও তাহলে তা থেকে পয়সা চুরি করে দেশী মদ খানিকটা গিলে আসবেই আসবে। ছেলেবেলা থেকে অনেকবার অনেক মড়া পুড়িয়েছি। কাজেই আমার বাবার মৃত্যুতে যে শোক হয়েছিল সেটার সঙ্গে শুচিতার দিকে কড়া নজরও খুব ছিল, ওই একধরণের সেন্টিমেন্ট আর কি। বুঝলে না,—অন্যের বাপ মায়ের মৃত্যুটা পবিত্র নয়, নিজের বাবার মৃত্যুই পবিত্র। আমি শ্মশানে যাবার সময় মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলাম, খুব শক্ত হয়ে থাকব। কাউকে এতটুকু দায়িত্বের অংশ দেবো না—যেমন আমার বাবা কেবল আমারই বাবা, ভাই-বোন কোনো অংশীদার নেই, তেমনি বাবার সম্পর্কে যা কিছু কর্তব্য সব আমিই করব। ব্যস, আমার চোখে জল নেই, হাউমাউ করছি নে দেখে সবাই আমাকে কানে কানে বলতে লাগল—আরে ছুঁচো চোখের জল লোক দেখাবার জন্যেও নয় ফ্যাল।...বুঝলে, তাতে করে আমার আরও চোখ দুটো যেন বোশেখের দুপুরের মত জলতে লাগল। কাঁদতে পারি নি।”

“শ্মশানে গিয়ে একজন বললে, ‘কই হে ডাক্তারের সার্টিফিকেটখানা দাও—আপিসে জমা দিয়ে চিতের কাট-কাটের ব্যবস্থা করে ফেলি—।’ আমি খুব গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলাম, বললাম, ‘আপনারা ঘাটের ধারে নিয়ে যান লাস—আমি এদিকের ব্যবস্থা করছি।’

“ওরা এক আঁচড়ে মানুষ চেনে, কেউ আর ঘাঁটালে না আমাকে—হরিধ্বনি বন্ধ করে আস্তে আস্তে ঘাটে গিয়ে নামল। শ্মশানের টিকেদার আমার দূর থেকে দেখেই সাদরে ডাকলে—‘আরে আজ্ঞে হোক্ জগমোহন ভায়া। তারপর, এদিকে যে আর দেখাই নেই।’ আমি নমস্কার ক’রে—কুশল জিজ্ঞাসা করতেই ভদ্রলোক যেন বাঁচ্‌ করলেন—‘আর ভায়া, বাজার বড় মন্দা। এমন জানলে দেড়শ টাকা মাইনের চাকরী ছেড়ে কোন্ শালা শ্মশানের ইয়ে ইজারা নিত। না-আছে কাঠের সেল, না—কিছু। বসে বসে ডাহা লোসকান গুণতে হচ্ছে মশাই। তারপর ক-মণি লাস এনেছেন, বেশ শাসেজলে ত?’—এই পর্য্যন্ত বলেই জগমোহন থেমে গেল।”

নিত্যানন্দ ফস্ ক'রে বলে বসল—"আমি হ'লে একখানা স্ট্রেট্ লেফট্ ঝেড়ে দিতুম ওইখানেই।"

বিমল বললে—"থাম তুই।" তারপর ব্যগ্রভাবে জগমোহনকে প্রশ্ন করলে—"তুমি কি করলে জগুদা ?"

—"সে সব শুনে কি হবে ? চেপে গেলুম স্রেফ ; বাবাকে মনে মনে দুহাত তুলে প্রণাম ক'রে বললুম, হোলি ফাদার তুমি যেন এই ঠিকাদারের কথায় অপরাধ নিয়ো না।"

বিমল বললে—"খুব কষ্ট হয়েছিল তোমার—না ? আমি বেশ ফিল করছি।" একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল, বিমলের দাড়ি-গোঁফ-কণ্টকিত মুখমণ্ডল কিছুক্ষণ ধরে কেঁপে আস্তে আস্তে থেমে গেল।

জগমোহন হাত বাড়িয়ে হরিপদর দেওয়া সিগারেটটা সতরঞ্চির ওপর থেকে তুলে নিল। এতক্ষণ ধরে সিগারেটটা পড়ে ছিল এমন ভাবে যেন জগুদা সেটা দেখতেই পায়-নি। জগমোহনকে সিগারেট হস্তগত করতে দেখে হরিপদ দেশলাই বার ক'রে দেয়।

নিত্যানন্দ আর রমেশ ততক্ষণে দাবার ছক গুটিয়ে ফেলতে ব্যস্ত। জগমোহনের চেহারা দেখে সবাই বেশ বুঝতে পারে যে, জগমোহনের বক্তব্য এখনই শেষ হবে না। মাসিক পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশ্য শরৎ বাবুর উপন্যাসের মত এক-একটা সিচুয়েশনে ঝুলিয়ে রাখাই জগমোহনের গল্পের বৈশিষ্ট্য।

জগমোহন সিগারেট ধরিয়ে বলে—"বুঝলে বিমল, ফিলিংটা সবসময় আত্মীয়-স্বজন হিসেব করে কমবেশি হয় না। অন্ততঃ আমার নিজের বেলায় তেমনটা খুব কমই ঘটেছে। যদি বললে ক্যানো—তবে বলি শোনো। আমি সেবার সেই যে নিজের বিয়ে ফাঁকি দিয়ে চাকুরিয়া থেকে পালিয়ে গেলুম—সেবারেই হয়েছিল এই ফিলিংটা। ঘুরতে ঘুরতে শেষটায় মাণিকপুরে গিয়ে আটুকে গেলুম। এক চায়ের দোকানে মাইরী চা খেতে ঢুকে—কথায় কথায় দোকানের মালিকের সঙ্গে এ্যায়সা জমে গেল যে, একবেলা জমে গেলুম। তাই থেকে একদিন, দু-দিন, দশ-দিন। এমন অমায়িক ওরা দু'জনে,—"

[illegible]—"দু'জনে মানে ?"

—"তুই বড্ড বাজে বকিস নিতাই। বুড়ো হতে চললি দু'জনে মানে কি তাও বলে দিতে হবে ?" হরিপদ অসহিষ্ণুভাবে ধমকে উঠল।

জগমোহন গল্প বলার মেজাজটি অক্ষুণ্ণ রেখেই বলে,—"আমারও প্রথমটা মনে হয়েছিল দোকানের মালিক ত খুব ইয়ং—মানে পঁচিশ, কিন্তু ওর বৌটিকে দেখে শুনে অন্ততঃ সমান বয়েস বলেই মনে হয়েছিল। সে যাক। ওরা আমাকে কিছুতেই ছাড়ে না। বলে, একসঙ্গে বৈদ্যিনাথ যাওয়া যাবে—সামনে শিবরাত্রির পরব। তখন দেওঘরে বিস্তর যাত্রী যায়—ওরা সেখানে দোকান পাট খুলবে গিয়ে।...আমার চেহারা থেকেই ওরা মালুম করেছিল যে একনম্বরের পেটুক। ভাই বলব কি—সে কী খাওয়ানোর বহর। আর ছোকরার কাঁচা পয়সা—মাণিক-পুরের কারখানার সামনেই দোকান, হরদম বিক্রী। ছোকরার বিস্তর ইয়ারবক্সী।" সকলের দিকে তাকিয়ে জগমোহন একটু হেসে বললে—"ও, তোদের আর ভালো লাগছে না, বুঝেছি। আচ্ছা যাক, আসল ব্যাপারে চলে যাই। দেখতে দেখতে মাণিকপুরে আমার একটি মাস কেটে গেছে—বদ্যিনাথের মেলা ফস্কে গিয়েছে কবে। কিন্তু ওদের আদর যত্নের বহর দিনদিন বেড়েই যাচ্ছিল। হ্যাঁ, বাই দি বাই, মাণিকপুরে শুধু বসে বসে খাইনে, ওখানে ওদের একটা কালীকেত্তনের দল আছে, তাতে আমি কর্ত্তাল বাজাই, দরকার হ'লে মাঝে মাঝে দোকানের তদারকীও করি, বার দু'য়েক পালাবার চেষ্টা করে ধরা পড়েছি ব'লে সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে ভাবছিলাম কারখানার কোনো চাকরীতে ঢুকে পড়ব কি না। আর একদিন এক বস্তীতে কে এক মেয়ে মরে পড়েছিল, বুঝলি, সেই নিয়ে ওদের দোকানে দু'জন খদ্দের বলাবলি করছিল, আমি ভিড়ে গেলুম—কে থায় মড়া ? ক'জন লোক জোগাড় হয়েছে ? শ্মশান এখান থেকে কতখানি পথ ? জানোই ত আমার চিরকালের স্বভাব শ্মশানের দিকে পা বাড়িয়ে দেওয়া। তা খদ্দের দু'জন আমায় বললে—'সে আপনার-আমার কম্মো নয়, নষ্টচরিত্রের মেয়েকে কাঁধে তুলে শেষটা কে ফ্যাসাদে পড়বে মশাই।' আমি নাছোড় বান্দা বলি, মড়ার আবার জাত আছে নাকি ? কিন্তু

আমার ব্রাদার মানে দোকানের মালিক আমায় কাছে ডেকে বললে—'খবরদার-খবরদার, শ্মশানের দিকে যাবার নাম কর না। এখান থেকে পাক্কা আট মাইল পথ। তা ছাড়া তুমি বিদেশী মানুষ, তোমার সবতাতে নাক গলাবার কি দরকার বাপু!"

"আরে বাবা, আমার দরকারের ও কি বুঝবে! যাই হোক, সে যাত্রাটা সুযোগ পালালে হাতের মুঠো থেকে লাফিয়ে পড়া মাগুর মাছের মত—কিন্তু খুব অল্প দিনের মধ্যেই আর একটা সুযোগ এলো। দিস্ টাইম্ হিজ্ ওয়াইফ্।" জগমোহন যখন ইংরেজিতে কথা বল্লে তখন বুঝতে হবে যে সে খুব বিচলিত হয়েছে। বিশেষ ক'রে ওর মন যখন গভীর বিষাদের ভারে রীতিমত কোমল হয়ে পড়ে, তখন সেই মনোভাবটুকু গোপন করবার জন্যই ইংরেজী ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করে।

জগমোহন একটু গলা ঝেড়ে নিয়ে বল্লে, 'আমার ব্রাদার বললে, 'নাও, শ্মশানে যাবার জন্যে তুমি ছটফট করছিলে, এবারে যাও।' সত্যি বলতে কি, ভবে যে আমি ওদের একেবারে আপন হয়ে গিয়েছিলাম, কিছু টের পাইনি। মেয়েটা মরে যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখালে, স্নেহ বড় সর্ব্বনাশা নেশা।"

নিত্যানন্দ বললে—"বেগতিক দেখে ওখান থেকেও পালালে বুঝি?"

"একবার ভাবলাম পালাই। কিন্তু পরক্ষণে কে যেন আমার মধ্যে বলে উঠ্‌ল, চলো যতটা পারা যায় এগিয়ে দিয়ে আসা যাক মেয়েটাকে—। ব্রাদার আমার একদম কান্নাকাটিই করলে না। আর এক ফ্যাসাদ হ'ল ওকে কাঁদতে না দেখে আমি ভয়ানক মুস্কিলে পড়ে গেলাম। মনে হচ্ছিল, ব্রাদারকে সান্ত্বনা দেবার অছিলাতে যদি দু'ফোঁটা সমবেদনার অশ্রু ফেলবার সুযোগ পাই, তাহলে বেঁচে যাই। জমাট কালো মুখ নিয়ে শবযাত্রার আয়োজন করতে করতে বিকেলটা টপকে রাত হয়ে গ্যালো। সে একখানা কালো রাত বটে—ওরকম জমাট কালো ছাতার কাপড়ও নয়, তরল আলকাতরা দেখেছিস্—ঠিক সেইরকম একটা আলকাতরার চৌবাচ্ছা যেন মাঠ, ঘাট পথ—। তার ওপর শীতের শেষের ঘিন্‌ঘিনে বর্ষাও শুরু হয়েছে। ব্রাদার আমাদের রওনা করিয়ে দিল আর বললে,—'আমারও যাওয়া উচিত ছিল, যেতে পারছি নে—আমি গেলে রাতের শিফটের খদ্দেরগুলোকে উপোস পাড়তে হয়।' আমি বললাম—'মুখাগ্নি কে করবে? তার জবাবে একটু হেসেই আবার নিজের কাজে মন দিল। আমি ত অনেক মুলুক ফতে করেছি, কিন্তু ভাই এমন বেদান্তসিদ্ধ মানুষ আর দেখিনি—নিজের বড়াই ছিল খুব যে, আমি একটা শক্ত মানুষ, কিন্তু সেদিন আমার জ্ঞানের বহর কোথাও যেন থই খুঁজে পেল না ওই মানুষটার।"

—"তারপর কি হ'ল?" হরিপদ আর একটা সিগারেট ছুঁড়ে দিয়ে প্রশ্ন করে।

—"হোঁচট্ খেতে খেতে এক সময়ে শ্মশানে পৌঁছলাম। বলব কি, মাণিকপুরের মাইল দুই পর থেকে কোথাও বসতির চিহ্ন দেখতে পাইনি, কোনো ঘর নেই, বুঝলাম কি করে?—আহা পিদিম ত একটাও জলত তাহলে, পথেঘাটে আধখানা মানুষের ডিমও অন্তুতঃ দেখা যেত। ওরা যে এতদূরে কেন শ্মশান বানিয়েছে জানিনে ভাই—যাই হোক, একটা চাতাল আছে, সেখানে লাস নামিয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে বল্‌লাম—'হ্যাঁ মশাই, শ্মশানের লোকজন ত কেউ এখনও এল না—সব ব্যবস্থা কি ক'রে হবে টবে?' আমার সঙ্গীরা বল্‌লে, 'আরে দাদা, এর নাম শ্মশান ঘাট, শ্বশুর বাড়ি ত নয়, নিজেদেরই দেখে শুনে ক'রে কম্মে নিতে হবে। ব্যাটাচ্ছেলে ন্যাংড়াটা কোথায় যে নেশা ক'রে পড়ে আছে কে জানে!' আমি বলি—'ন্যাংড়াটা কে বটে?'—'আরে সে-ই এখানকার সর্ব্বেসর্ব্বা। কাঠের ব্যবস্থার জন্যে তাকে এখুনি দরকার। চলুন ত দাদা একটু, এই মাঠখানা পেরুলেই ন্যাংড়ার ঘর—আমার ঠিক একা-একা যেতে ভরসা হচ্ছে না—এই ত হচ্ছে তেনাদের খাশমহল কিনা। হাতড়াতে হাতড়াতে খোঁড়ার ঘর ত খুঁজে পাওয়া গেল—কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নেই।

আমার মনে হচ্ছিল যেন কুঁড়ে ঘরখানাতে কেউ নেই, কোন দিন কেউ ছিল কি না তাও বোঝা দায়—আগাছার জঙ্গলে আধঢাকা ঘরখানা একদিকে হেলে পড়েছে -কবে হয়ত মাটির ওপর শুয়ে পরবে। আমার সঙ্গীকে

বললাম, 'আপনি ঠিক চেনেন ত ? খোড়ার ঘর এটা !' সে বিরক্ত হয়ে বললে, 'মশাই এখানে কোন জনমনিষ্যি-মরতে আসবে না। দেখছেন না ঘোর শ্মশান !' তা ত বেশ ভাল করেই দেখতে পাচ্ছি। সঙ্গী আবার হাঁকাহাঁকি শুরু করল, 'এই, এই ন্যাংড়া, শীগ্‌গির দরজা খোল, নইলে কিন্তু তোর ঘরের আগর ভেঙে ফেলব।' এবার ঘরের মধ্যে থেকে সাড়া পাওয়া গেল—"কে বাবা তোমরা, দুপুর রাতে !" সঙ্গী এবার রীতিমত গালি গালাজ দিতে লাগল, 'হতভাগা এতক্ষণ কাঠ মেড়ে পড়ে ছিলে যে বড ? বেরিয়ে আয় উল্লুক, ওদিকে লাসকে ভুতে পাচ্ছে, আর তুমি বাঁদর নাক ডাকাচ্ছ—বেরো বলছি।' তখনও দরজা খুলল না, ভেতর থেকে সাড়া এলো, 'আজ্ঞে আপনারা বুঝি ন্যাংড়ার খোঁজে এয়েছ ? তা সে ত আজ বিকেলে মেয়ের বাড়ী যেয়েছে, মেয়েটার ভারি ব্যামো কি না !' এ তরফের অবস্থা সঙ্গীন, 'ন্যাংড়া নেই ? তা তুই সুমুন্দি কে ?' জবাব এলো— 'আজ্ঞে আমি কুটুম বটে। আমি বাবা অন্ধ, চোখে ভাল দেখতে পাই নে, আমার দুই হাত নুলো হয়ে পরেছে, একেবারে নাড়াতে পারি নে—এই এখানে পড়ে আছি, শ্মশানের তীরে কবে মরব এই আশায়, ভাগাড়ে পড়ে মরতে সাধ নাই কি না—টুক্ করে মরব আর ধুপ করে নিয়ে গিয়ে যদি ন্যাংড়া গিড়ে দুটো কাঠ কুড়িয়ে দাহ করে এই আশা'—লোকটার কথায়-বার্ত্তায় আমার মন ভিজে গেল, কিন্তু আমার সঙ্গী এবারে দাওয়ার ওপর উঠে গিয়ে কুঁড়ের দরজায় একটা লাথি মারল। তার সঙ্গে, বলা বাহুল্য, কিছু গালাগালিও ছিল।—'খোল দরজা নইলে এই ভাঙলাম।'

"তার পর দরজা খুলে হাসতে হাসতে বেড়িয়ে এল ন্যাংড়া।

নিত্যানন্দ ব'ল্‌লে, 'বটে, এতক্ষণ ঘরের মধ্যে ব'সে ইয়ার্কি ক'রছিলে বুঝি।'

"ইয়ারকি নয়। ব্যাটা একটু নেশা ভাঙ ক'রে শুয়ে-ছিল কি না! ভেবেছিল ভাগিয়ে দিয়ে ঘুম লাগাবে।"

"এমন লোকের হাতে শ্মশানের ভার না দেওয়াই উচিত।"

"সেখানে গেলে আমি তুমিও ওইরকম লোক হয়ে যেতে পারি।" জগমোহন বল্‌লে।

হরিপদ ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে, 'আঃ বাজে তক্ক করা নিতাইয়ের ভারী বদরোগ। বলো জগুদা তারপর, আসলে তোমার ফিলিংটাই এখনও এলো না।'

জগমোহন বললে,'ব্যাপার কি জানিস, এক নিশ্বাসে ত গল্প বলা হয় না, সাবস্ট্যান্স হয়। যেমনি সেই ফিলিংএর কথা বলতে ইচ্ছে হ'ল অমনি সেদিনের সমস্ত ছবিটা চোখের সামনে ফুটে উঠল। সে যাক, এখন খোড়া আমাদের সঙ্গে তার কুড়ুল নিয়ে টুক্ টুক্ ক'রে চলল; ভারী মজাদার লোক—বলছে যেতে যেতে, আমি মনে করি গাঁয়ের লোক-টোক বুঝি এয়েছো আপনারা। দু'চার বার ডাকাডাকি ক'রে নদীর জলে লাস ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাবা। তা আর হলো না! একটা পায়ের জোরে কেমন কাঠ ফেড়ে ফেলল, সব কিছুই ও নিজে হাতে করল। আমাদের সবাইকে যেন বোকা বানিয়ে দিয়েছে ওই লোকটা এক পায়ের জোরে—আমাদের আর কোন কাজ নেই, বসে বসেই দেখছি ওর কাজ। এক সময়ে খোঁড়া বললে—কই গো বাবুরা, তুমরা কি দত্যির ভয়ে গস্তেন মধ্যে সেঁধিলে। এসো, এবার আয়োজন্যে তৈরী—কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই যেন দম দেওয়া কলের মতই একসঙ্গে উঠলাম আমরা, মুখে কারও হরিধ্বনিও নেই। গভীর রাত্রি, অন্ধকারের মধ্যে টিম্ টিম্ করে দুটো হারিকেন জ্বলছে। নীচে অদূরে নদীর জল বয়ে চলেছে—একঘেয়ে একটানা শব্দ। তার মধ্যে একটা বিকলাঙ্গ মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের ভাগ্য বিধাতার মত আদেশ দিচ্ছে। সে বললে—'পুরুত বামুন এনেছো ?' জবাব দিলাম, 'না!' সে বললে, 'বেশ করেছে। তা মুখাগ্নি করবে কে ? আপনারা সবাই নাকি ?' আমি বললাম—'কেন, বলতো, একথা বলছ কি জন্যে ?' সে একটু হেসে বললে,'আহা রাগ কর ক্যানে বাবা! একটা সোমত্ত মেয়েকে নিয়ে এয়েছ আপনারা, তোমাদের মধ্যে ত সোয়ামী ওনার কেউ নয়, তাই বললাম। ন্যাংড়া হতভাগা যে ঠোঁটকাটা হারামজাদা একথা ত সবাই জানে। আমি রেগে গিয়ে বললাম— 'সোয়ামী যে নেই এখানে তা তুমি কি করে জানলে ?' ও জোরে হেসে উঠল। ওই নিরন্ধ্র রাতের অন্ধকারে ওর হাসিতে যেন আশ-পাশের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে পিশাচগুলো নাচতে লেগে গিয়েছে। ও বললে, 'মুখ

দেখেই খোঁড়া হতভাগা সব বুঝতে পারে। এই যে মরা মুখখানা আমার সুমুখে রয়েছে, এ বলছে কি জানো? না থাক সে সব কথা। তা আপনারা বলো আমাকে কি করতে হবে। তারপর চিতা ধরল, আমরা সবাই চাতালে ফিরে গিয়ে বসলাম।"

হরিপদ বললে—"মুখাগ্নি করল কে?"

জগমোহন যেন এই প্রশ্নে চমকে উঠল। গল্প বলতে বলতে বোধ করি সে বিগতদিনের স্মৃতির মধ্যে ডুবে গিয়েছিল, তাই অমন চমকে উঠে বললে—"ও, মুখাগ্নি? মুখাগ্নি করেছিল সেই ল্যাংড়া। আমাদের যে কী হয়েছিল, বিশেষ করে আমার, তা বলতে পারবো না। আমার জীবনে এ রকম জবুথবু ভাব খুব কমই হয়েছে। সেদিনই প্রথম বুঝলাম ট্রান্স কাকে বলে। আমি যেন ঘরের জানলাতে বসে দেখছি বাইরে কি সব হচ্ছে, কি যে হচ্ছে বুঝেও ঠিক বুঝতে পারছি নে।...এমনি ক'রে একসময়ে চিতা নিভে গেল। ওরা সবাই আমার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল, ফিরে যেতে হবে। কিন্তু তখন কি হয়েছিল আমার, ওদের কথার কি জবাব দিয়েছিলাম সে কথা আজও মনে করতে পারি না। ওরা সবাই চলে যাচ্ছে, অথচ আমি দেখেও দেখছি না—চলে গেল, তখনও বসে আছি। কিন্তু ভাই বলব কি, আমি যে শোকে মুহ্যমান তা নয়, মনে হচ্ছে কোন কিছুর সঙ্গেই আমার কোনো সম্বন্ধ নেই।...হঠাৎ দেখি আমার হাত ধরে টানাটানি করছে খোঁড়া লোকটা, বলছে—আপনি চলো, আমার ঘরে চলো—একটু চা খাওয়া যাক, অনেক ধকল হয়েছে। ছাখো দাদা, আমি শালা এই ল্যাংড়া এক পা দৌড়ঝাঁপ ক'রে দাহটা করব, আর ও শালা যাবার সময় একটা মিষ্টি কথা পর্য্যন্ত বলে গ্যালো না। উল্টে কি বললে জানো, বললে যে মাণিকপুরের কারখানা থেকে যে আমাকে মাস-মাস মাসোহারা দেয়, সেটা রিপোর্ট করে বন্ধ করিয়ে দেবে। যা শালারা, ওপরে সেই মালিকের কাছে আমার রিপোর্ট যাবে—তোদের দেড় পয়সার কারখানার মালিকের হাত তোলার জন্যে যেন ল্যাংড়ার ঘুম হচ্ছে না।" ওর কথাগুলো ক্রমশঃ চড়া গলায় শুরু হ'ল, আমার মনে হচ্ছিল যেন; তখনই ওই অন্ধকার বেয়ে ভগবানের কাছে পৌঁছে দিতে চাচ্ছে ওর মনের সব কথা। তারপর দু'জনে চলে গেলাম সেই বাতাসে হেলান দেওয়া কুঁড়ে ঘরে। রাস্তা থেকেই খোঁড়া চ্যাঁচাতে লাগল—'ওরে পাগলী, পাতা-নাতা দিয়ে টুক্ খান জল গরম কর তো-ও-ও-ও।' আমি জিজ্ঞেস করলাম—'পাগলী কে?' ও বললে—'আমার বিটিটা বটে।' আমি আর কোনো কথাতেই অবাক হতে পারছি না, যেন ও সব পালা চুকে গিয়েছে। তবু খোঁড়া নিজে থেকেই বললে—'ও—তখন যে মেয়ের বাড়ির কথা বললাম—ওসব আমার অভ্যেস। যখন যা মুখে এলো বললাম। আরে দাদা, দুনিয়াটা ত ওই মনের ভাব আর মুখের কথাতেই ওলট পালট হয়ে গেছে, হাঁ কি না, বলো কি না!' সেই ক্লান্তি আর শীতে গুড়গোলা চা যেন অমৃতের মত মধুর লেগেছিল। কিন্তু তার চেয়েও ভালো লেগেছিল সেই মূর্খ, খোঁড়া লোকটাকে। চা খেয়ে আমি যখন তাজা হয়ে উঠেছি, বেশ সামলে গিয়ে নিজেকে খুঁজে পেয়েছি, তখন দেখি, ঘরের এক কোণে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে লোকটা বসে বসে কাঁদছে।"

নিত্যানন্দ বললে—"কাঁদছে কেন?"

—"ঠিক, আমারও তখন সেই কথাই মনে হয়েছিল। আমি ওর কাছে সরে গিয়ে বলি—কি হয়েছে? অমন কাঁদছ কেন? অনেকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিগ্যেস করলাম, কোনো জবাব না দিয়ে ও কেঁদেই চলল। তখন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি, কিন্তু সব ভাসিয়ে দিয়ে খোঁড়া অঝোরে কান্নার ধারা বইয়ে দিচ্ছে। কিছুতেই থামাতে পারি না।...সে একটা অদ্ভুত রাত্রি। কতক্ষণ যে এইভাবে কেটেছিল জানি না—এক সময় ল্যাংড়া চোখের জল মুছে পরিষ্কার গলায় বললে—'আমি একটা পাষাণ, বুঝলে দাদাবাবু।' সে কি কথা? আমি আবার চোখের ক্লান্তি কাটিয়ে সোজা হয়ে বসলাম, ও বললে—'শ্মশানের মরা ঘেঁটে ঘেঁটে আমি যেন কী হয়ে গিয়েছি। নইলে তোমার এই বন্দ বন্দ ভাব দেখে পেরথম চোটে খুব হাসি পেয়ে গেল। এই রকম আজকাল হয়—কেন যে হয় বুঝি না। আজও যতক্ষণ

কাজ করেছি, মনে মনে তোমাকে দেখে হেসেছি খুব। তারপর কি যে হ'ল, আমার কেবলই কাঁদি কাঁদি মন করছে। কেবল কান্না পাচ্ছে। আচ্ছা দাদাবাবু, উই ছুঁড়িটা তুমার কে বটে? আমি জবাব দেবার আগে লোকটা বললে—'জানি তুমার উ কেউ লয়। কিন্তু তুমি উয়ার জন্মে কতখানি কষ্ট পেলা মনে মনে। আমার ত দেখে মনে লাগছে যে, তুমার বুক ভেঙে দিয়েছে উই ডাইনী—।' একটু থামল, দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল, ওর বুকখানার জির্-জিরে হাড়-পাঁজরাগুলো যেন খট্ খট্ ক'রে উঠল সেই নিশ্বাসের ধাক্কায়। ও আস্তে আস্তে বললে—'উ তুমার কেউ না হয়েও কত আপন। কিন্তু আমার বিয়ে করা পরিবার হয়েও কতখানি পর।' চমকে উঠলাম বিয়ে করা পরিবার কথাটা শুনে।"

বিমল, হরিপদ, নিত্যানন্দ সকলেই নড়েচড়ে বসল—'তার মানে?' প্রশ্নটা ওদের সবারই চোখে মুখে, কিন্তু জগমোহনের তন্ময়তায় কেউ ছেদ টানতে সাহস করল না।

জগমোহন বললে—'শুনলাম আসল ব্যাপারটা, ওই স্যাংড়া এককালে মাণিকপুরের কারখানাতে চাকরী করত। একটা এ্যাকসিডেণ্টের ফলে ওর একখানা পা নষ্ট হয়ে যায়—তখন ওকে এই শ্মশান প্রহরীর চাকরী দিয়ে কোম্পানী যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দেয়। অবশ্য ওর স্ত্রী ওই নির্জ্জন শ্মশানে কি করে থাকবে? অতএব এক দিন উধাও হয়ে গিয়েছিল। তারপর এই ব্যাখা হ'ল ওদের দু'জনের।

এতক্ষণে বুঝলাম কেন আমার ব্রাদার শ্মশানে আসতে চায় নি। কিন্তু আমার সব চেয়ে আশ্চর্য্য লেগে ছিল স্যাংড়া ওর স্ত্রীর শোকে না কেঁদে কেন আমার দুঃখের সঙ্গে অশ্রুর বন্যা মিশিয়ে দিয়েছিল।" জগমোহন সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—"তোরা ত সব অনেক কেতাব-টেতাব পড়েছিস, স্যাংড়ার ফিলিংটা কেউ বুঝিয়ে দিতে পারিস আমাকে?"

জগমোহনের প্রশ্নটা নিঃশব্দ ঘরখানার বাতাসে অনেকক্ষণ যেন দাঁড়িয়ে রইল উত্তরের আশায়। কিন্তু কেউ কোনো জবাব দিল না।—থানার ঘড়িতে রাত দশটা বাজার শব্দে বিমল চমকে উঠল—সে-ই প্রথম কথা কইল—"যাই এখনও শ্রাদ্ধের সব নেমন্তন্ন বাকী রয়েছে।"

জগমোহন বললে—"দাঁড়া বিমলে, আমি তোর সঙ্গে যাবো।"

প্রথম যৌবন

শ্রীহরিচরণ মুখোপাধ্যায়

অজানার জড়তায় চোখদুটি ছলছল্
ফুটফুটে জ্যোছনার ছায়া পড়ে বাগানে,
কঙ্কর বুকে বাজে দিনরাতি কলকল্
গোধূলি এনেছে কত ব্যথা দিবাবসানে।

অন্তরে কাতরতা—মুখে সাদা হাসি যে।
বিরহের বাণ ডাকে সারা দেহ উছলি'—
ভ্রমর, কোকিল, ফুল চায় হিয়া শাসিতে
দখিণ-হাওয়ার সাথে ওড়ে মন কেবলই।

মুখর এ-পৃথিবীতে কলরব শুনি ওই
ঝংকারে তার যেন সব গেছে ডুবিয়া,
অভিমানে ভেঙে-পড়া মুখখানি নিয়তই
হরিষে-বিষাদে মরে কারে যেন খুঁজিয়া!

রামধনু ফেটে পড়ে রাঙা দুটি অধরে
যক্ষের ব্যথা জাগে কেশপাশ-গহনে,
স্বপনের জাল বুনে কাঁদি শেষপ্রহরে
হাহাকার করে প্রাণ—নাই সুখ মরণে।

কবির ঋদ্ধি ও মন্ত্র

শ্রীসুরেশ চন্দ্র দেব

কবিমনের আকুতি যখন প্রকাশভঙ্গীর ও গতির উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করে, আত্মপ্রকাশের উর্ম্মিমালার মস্তকে পদার্পণ করে, তখনই কবি ঋষি ও দ্রষ্টার আনন্দ লাভ করেন। এই প্রকাশে মানবের সৌন্দর্য্যানুভূতি, তার ইন্দ্রিয়াবলী, তার মানসিকতা আন্তরিকতার স্তরে উন্নীত হয় এবং সার্থকতা লাভ করে। তখন এই সকল মানসিক উপকরণ গভীর, উচ্চ ও বিস্তৃত আধ্যাত্মিক অ লোকে উদ্ভাসিত হইয়া ইন্দ্রিয় গ্রামের সব রসের, চিত্তবৃত্তির সব রসের, ভাবের রসের জারকে বস্তুকে পাক করিতে পারে। ইহাই বিশ্বাতীতের আবিষ্কার। সব কবিতাই মানব মনের উদগ্র আবিষ্কার স্পৃহার মূল উদ্দেশ্য। নিম্নস্তরের কবিগণের অনুভূতির আকাশে এরূপ আবিষ্কার ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের মতন দেখা দেয়, দেবদূতের আগমন যেমন ক্ষণিকের জন্য চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে এবং জীবনকে আলোকিত করে। সেইরূপ যাঁরা উচ্চ স্তরে অবস্থিত তাঁদের জীবনে এই অনুভূতি আরও ঘন ঘন উপস্থিত হয়। আর উচ্চাঙ্গে যাঁরা উপনীত তাঁদের জীবনে ইহা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। কারণ, কবিমনের দর্শনশক্তি ও তার প্রকাশের উৎস স্রোতের মতন সদা প্রবহমান। কখনও তার গতি প্রবল হয়, কখনও তাহা মন্থর। কিন্তু, তার স্রোত কখনই থামে না।

এই দর্শনশক্তি কবিমনের বিশেষ একটা গুণ, যেমন বিচারশীল ও চিন্তা দার্শনিকের এবং বিশ্লেষণকারী কৌশল বৈজ্ঞানিকের। প্রাচীন ধারণা মতে কবি ছিলেন সত্যের দ্রষ্টা এবং তার প্রকাশযন্ত্র। আজ আমরা সেই আদর্শভঙ্গী হইতে সরিয়া আসিয়াছি, এবং কবিমনের নিকট কেবল মাত্র শ্রবণ শক্তির আনন্দ ও ইন্দ্রিয় শক্তির উত্তেজনা প্রত্যাশা করি। কিন্তু প্রাচীন ধারণার উচ্চতর সংজ্ঞা এখনও কবিতার মধ্যে দেদীপ্যমান দেখা যায়। কবিতা হলো শিল্প, তার ধর্ম্ম হলো আমাদের দৃষ্টি শক্তিকে স্বচ্ছ করা। বাহিরের অনুপ্রেরণা অন্তর্লোকে প্রবেশ লাভ করিলেই তাহা সার্থক হয়। শ্রবণ শক্তিকেও অন্তরের মধ্যে অবস্থিত শ্রবণশক্তির মূলাধারকে জাগ্রত করিতে হয়। কারণ, দুইটি কর্ণ প্রবেশ দ্বার মাত্র এবং এই সব বহির্জ্জগতের লক্ষ্য হয় অন্তর্লোকে প্রবেশ করা; কবিমন যাহা প্রকাশ করিয়াছে তার মধ্যে ডুবাইয়া রাখা। কবি আমাদের অন্তরের দৃষ্টি-শক্তি ফুটাইয়া তুলেন। এই অন্তর্দৃষ্টি তাঁহার মধ্যে জাগ্রত ছিল বলিয়াই তিনি আমাদের মধ্যে তাহা জাগ্রত করিতে সক্ষম হন। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই উচ্চাঙ্গের কবির মধ্যে ব্যাপক ও পরাক্রমশীল দর্শনশক্তি আছে যাহা এক সঙ্গে প্রকৃতির, জীবনের ও মানুষের যথার্থ সার্থকতা ব্যাখ্যা করিতে পারে। তাঁহাদের কবিতা সর্ব্বোচ্চ অনুভূতি-গ্রামের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। হোমার, সেক্সপীয়র, দান্তে, বাল্মীকি, কালিদাস নানাভাবে, নানা বিষয়ে পৃথক। কিন্তু, তাঁহারা সকলেই একটা গুণের অধিকারী; তাঁহাদের কবিত্বশক্তি এইখানে এক। তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব চিন্তাশক্তি, ভাষার ঝঙ্কার বা ভাব ও প্রবৃত্তির মধ্যে নিহিত নয়। সকলেরই অল্পবিস্তর তাহা আছে, কারো বা কোন শক্তি কম বা বেশী। কিন্তু এই সব শক্তি কবিতার বহিঃপ্রকাশমাত্র; তার নির্য্যাস বা উৎস নয়। বেকনের কোন কোন ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে চিন্তা ঠাসাঠাসি করিতেছে, সেক্‌সপীয়রের সমগ্র একটা নাটকের মধ্যে সেই বৈভব নাই। কিন্তু, শত শত গুপ্ত ভাষা (cryptogram) উদ্ধার করিলেও বেকনকে এইসব নাটকের নাট্যকার করা যাইবে না। বেকন যে কবিতা সৃষ্টির চেষ্টা করেন নাই তা নয়। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে তাঁহার চিন্তাশক্তির গঠন এবং দার্শনিকের বিশেষ প্রকাশভঙ্গী কাব্য-সৃষ্টিকে পদে পদে বাধা দিয়াছে।

সেক্‌সপিয়র-এর কবিত্বশক্তির মধ্যে অনেক দুর্ব্বলতা আছে, কিন্তু একটি গুণ তাহা মুছিয়া দিতেছে। ভাবের ও চিন্তার প্রবাহ সেক্‌সপীয়রকে অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সেই চিন্তাস্রোতের মধ্যে সৌন্দর্য্যের ও ভাবের পদ্মফুল ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এই গুণের কল্যাণেই তিনি নাট্য জগতের ভাস্কর। দ্রষ্টার শক্তিই কবির বিশেষ বৈভব। তিনি শাশ্বত আত্মার উচ্চলোক হইতে আপনার অন্তর্লোক দেখিতে পান; এই সৃষ্টি এবং অন্যান্য সৃষ্ট জগতে ভগবানকে ও প্রকৃতিকে দেখিতে পান। এই অনুভূতির উৎসমুখ হইতেই প্রবাহিত হয় সৃষ্টির সঙ্গীত। বাক্যের নানা মূর্ত্তি দর্শন শক্তির সত্য-পেত মূর্ত্তি ফুটাইয়া তোলে। উচ্চ স্তরের সব কবিই এই আদর্শ সৃষ্টির কর্ত্তা। কাব্য স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত। তাঁহারা দ্রষ্টা, সত্যের ও বাক্যের শ্রোতা।

বর্ত্তমান যুগের মন স্বভাবতঃই কবিতার মধ্যে মনন শক্তির প্রাচুর্য্যের উপর জোর দিয়া থাকে দেখিতে পাই। আমরা এমন একটি যুগে বাস করিতেছি যখন মননের ক্ষেত্রে একটা বিক্ষোভ ও উত্তেজনা বর্ত্তমান। জগতের মনন শক্তি নানাভাবে বিকশিত হইতেছে। এই শক্তির ব্যবহার করিয়াই মানব বর্ত্তমানে নানা সমস্যার সমাধানের প্রয়াস পায় এবং তাহাকে আয়ত্বের অধীনে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টা করিতে গিয়া সেই শক্তির অপচয় করিতেছে, যার অনুশীলন আত্মজ্ঞান লাভের পক্ষে প্রয়োজন। আমরা সর্ব্বদাই নানাভাবে বিশ্ব রহস্যের, তার গুপ্ত ভাষার উদ্ধার করিতে চাই; মনন শক্তির সাহায্যে তাহা পাঠ করিতে চাই। ইহা করিতে গিয়া আমরা বাহ্য জীবনকে নিয়া ও কেবল বুদ্ধির সাহায্য নিয়া এতই ব্যস্ত থাকি যে নীরব হইবার কৌশল, দ্রষ্টারূপে থাকিবার কৌশল আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। সেই জন্যই আমরা প্রত্যাশা করি যে, কবি তাঁহার বাক-বিভূতির সাহায্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেন যার জন্য আমরা কবির নিকট কেবল গানের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য চাহি না, দ্রষ্টার বিরাট দর্শন শক্তির বিকাশ চাহি না। তাঁর কাছে আমরা চাই সন্দেহাতুর মনের বর্ত্তমান গোলকধাঁধা হইতে বাহির হইবার পথনির্দ্দেশ।

সেই জন্যই আমাদের সর্ব্বক্ষণ শুনিতে হয় কবির জীবন-বেদের কথা। যে কবি শুধুমাত্র মিলের পশারী, তাঁহার অনুগামিবৃন্দ তাঁহার একটি জীবন-বেদ আবিষ্কার করেন; তাঁহার বিশেষ বাণী প্রচার করিয়া থাকেন, যাহা ঠাকুর ও হুইটম্যানের বাণীর সমান। এইরূপে আমরা কবিকে, দার্শনিককে ভাব প্রবর্ত্তককে (prophet) শিক্ষাদাতা রূপে ও নীতি প্রচারক রূপে রূপান্তরিত করিতেছি। ফলে কবিকে আমরা তাঁহার স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিতেছি। আমর ভুলিয়া যাই যে তিনি মূলতঃ গীতিকার (supreme singer)।

তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের দ্রষ্টা (seer of the world)। সেইজন্যই আমি এই কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি যে, যখন আমি কবি-ধর্ম্মের কথা বলি, তখন আমি তাঁহাকে সত্যের দ্রষ্টা বলিয়া মনে করি। তাঁর কবিতার মধ্যে সৃষ্টির আদি রহস্যের সন্ধান দেখিতে চাই; তাঁর কাছে সৃষ্টি কর্ত্তার দেবাদিদেবের ও প্রকৃতির আদি রহস্যের বর্ণনা চাই। আমি তাঁর কাছে প্রত্যাশা করি একটা জীবন-দর্শনের কাহিনী না, মানবের জন্য কোন বিশেষ বাণী, যুগ ধর্ম্মের নানা সমস্যার সমাধান, মানবজাতির উন্নয়নে কর্ম্ম নির্দ্দেশ অথবা জীবন সায়াহ্নে মানবকে একটু উন্নীত করা। ব্যষ্টিরূপে তাঁর এ সকল গুণ থাকিতে পারে, তিনি ছন্দোময় ভাষায় এই সকলের বর্ণনা করিতে পারেন, কিন্তু যদি এই সব কর্ত্তব্যের আহ্বান তাঁর কবি-ধর্ম্মকে সঙ্কুচিত করে, তবে তাঁর মঙ্গল নাই, মানবের মঙ্গল নাই। এই সব কর্ত্তব্যের আহ্বানের মধ্যে অনেক কবিতার উপকরণ থাকিতে পারে; তাঁর কবিতা তাঁর যুগকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে কিন্তু, কেবল-মাত্র তখনই ইহা সত্যকার কবিতা হইবে যখন ইহা জীবনের অন্তর্লোকে রূপান্তরিত হবে। এবং যতক্ষণ তাহা না হয় ততক্ষণ তাঁর কবি-আত্মা বায়বীয় নিরাকার অবস্থায় ভাসিতে থাকিবে অবাস্তবের আকাশে। তিনি তাঁর ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবেন, তাঁর মধ্যে যে দ্রষ্টার শক্তি নিহিত ছিল তাহা ব্যর্থ হইবে।

মূলতঃ যিনি কবি তিনি দ্রষ্টা, তাঁর চিন্তাশক্তি অন্তরূপে গতিময় হইয়া ওঠে, তিনি আত্মোপলব্ধির বার্ত্তা অন্তভাবে

প্রকাশ করেন। তাঁর ভঙ্গিমা দার্শনিকের অথবা ভাব-প্রবর্ত্তকের ভঙ্গী হইতে পৃথক। যখন ভাব-প্রবর্ত্তকের সত্যোপলব্ধি হয়, তখন তিনি তাহা ঈশ্বরের বাণী (word) বা আদেশ (command) বলিয়া ঘোষণা করেন। কবি সত্যের বৈভব-শক্তিকে দেখান—তার প্রতীকরূপে, মূর্ত্তিরূপে। তিনি আমাদের নিকট প্রকৃতির কর্ম্মপ্রবাহের গুহ্যাতিগুহ্য রহস্য তুলিয়া ধরেন। মানব জীবনের সুখ-দুঃখের হাসি-কান্নার কারণকে দেখাইয়া দিতে পারিলে তাঁর কর্ত্তব্য পালন সম্পূর্ণ হয়। ইহার বেশী স্পষ্ট করিয়া আর কিছু তাব বলিবার প্রয়োজন নাই। দার্শনিকের কর্ত্তব্য হইল সত্যাসত্য বিশ্লেষণ করা, তার বিচার করা, তার নানা অংশের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নির্ণয় করা। কবির কর্ত্তব্য সত্যের নানারূপকে লোকচক্ষে তুলিয়া ধরা, তাদের জীবন্ত সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করা; তারই রূপের বাহানে মুগ্ধ হইয়া এই অনুভূতিকে কোনও মূর্ত্তির মধ্যে ফুটাইযা তোলা। দার্শনিকের ভাষ্য এই প্রকাশ চেষ্টায় ব্যর্থ হইবে।

এমন হইতে পারে যে, ভাব প্রবর্ত্তকের মধ্যেও কবিত্ব শক্তির বিকাশ দেখা যায। তিনি ভাষার সাহায্যে নিজের উপলব্ধিকে জীবনের নানা রংগের সৌন্দর্য্যে ভূষিত করেন। তাঁর বাণীর নগ্ন রূপ আমাদের চোখের সম্মুখে ধারণ করেন। ভাব-প্রবর্ত্তক হযতো বলিবেন, "আগামী কালের জন্য ভাবিও না।" এই বৈরাগ্যের পথ অনুসরণ করিতে গিয়া তিনি যে সত্যকে ত্যাগ করিলেন এই অনুভূতির জন্য তার মাহাত্ম্য আমাদের দৃষ্টিপথে আনীত হইল। ইহা ত্যাগের পথ। প্রকৃতির রূপ রস-গন্ধ বর্জ্জনের পথ। তিনি পদ্মফুলের সৌরভে উদ্ভাসিত পথ ত্যাগ করিলেন এবং এই ত্যাগকে মানবজীবনের সঙ্গে গ্রথিত করিয়া দেখাইতে পারেন। একটি গল্পের বা কিম্বদন্তীর ব্যবহার সাধারণতঃ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। দার্শনিক সেই উপলব্ধিকে প্রকাশ করিবার জন্য বর্ণ ও রূপের সাহায্য নিতে পারেন; নিজের মধুময় পথকে বসসিক্ত করিবার জন্য যুক্তির সুতীব্র আলোককে চক্ষুসহ করিবার জন্য তাহা করিতে পারেন। কবিতার আনন্দদায়িনী কুয়াসা এই পথকে এই ভাবেই বর্ণ-সুষমার আভরণে ঢাকিতে পারে। কিন্তু এ সকলই অলঙ্কার, তার কাজের সত্য ও রুদ্র মূর্ত্তি এই প্রকাশের মধ্যে প্রাণবন্ত হইবে না। আর যদিই বা দার্শনিক তাঁহার অনুভূতির মধ্যে সৌন্দর্য্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তবে তিনি কবিধর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছেন; দ্রষ্টার গুণ লাভ করিয়াছেন। সেইজন্যই কাব্যের ধর্ম্মশাস্ত্রীবৃন্দ নিট্‌শেকে দার্শনিক আখ্যা দিতে নারাজ। তাঁদের এই ভাব অন্যায় নহে। কারণ নিট্‌শে মনন-শক্তির ব্যবহার করেন নাই। তিনি দ্রষ্টা—তাঁর দৃষ্টি ঘোলাটে হউক বা স্বচ্ছই হউক—সোজাই দেখুক বা বাঁকাই দেখুক। কারণ, নিট্‌শে দ্রষ্টার চক্ষে সব দেখেন যদিও তিনি দার্শনিকের বুদ্ধির বা মস্তিষ্কের ব্যবহার করিতে পারেন। অন্যদিকে আমরা মহান কবিতার পরিচয় পাইতে পারি—যার মধ্যে ভবিষ্যতেব উজ্জ্বল বর্ণনা আছে অথবা ভাবে বা উপকরণে দার্শনিক চিন্তাধারায় ভারাক্রান্ত। কিন্তু, এইরূপ দার্শনিক কবিতা কোন সাক্ষাৎ দর্শনের বাণী শুনাইতে পারে না, ইহা উচ্চাঙ্গ ভাবের ও চিত্রের উদ্দীপক মাত্র। এই দার্শনিক কবিতাও সেই রূপ নিয়াই থাকিবে। ইহা কবিতারূপে প্রতিভাত থাকিবে ততদিন যতদিন তাহা দার্শনিকের মননের পথ হইতে দূরে থাকিবে, সেই মননের পদ্ধতি, প্রকাশের ও দৃষ্টির ভঙ্গী বর্জ্জন করিয়া চলিবে। মনন শক্তি, সত্য বিচার ও তার চুলচেরা হিসাব নিয়া যতদিন থাকিবে ততদিন তাহা কবিতা হইবে না। সত্যদ্রষ্টা যখন নিজের সত্তাকে শব্দের মধ্যে চালিয়া দিবেন তখনই তাহা কবিতা-রূপে জলজল করিতে থাকিবে।

প্রাচীন কালে এই পার্থক্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইত না। সেই জন্য আমরা উচ্চাঙ্গের কবিদের হেছয়েদ ও ভার্জ্জিলের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা দার্শনিক মতের রূপ দিয়াছেন সঙ্গীতে তদপেক্ষা শুষ্ক বিষয়বস্তুকে তাঁহারা এইরূপে সুন্দর করিতে চেষ্টা করিযাছেন যে কৃষি সম্বন্ধেও কবিতা লিখিয়াছেন, রোম নগরীর মনন শক্তি সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জগতে ভোঁতা ছিল। তার দুইজন প্রসিদ্ধ কবি এই সহজাত দৌর্ব্বল্যে রোগাক্রান্ত ছিলেন, তাঁদের উদাহরণ উত্তর পুরুষের নিকট শিক্ষার বিষয়। লুক্রেসিয়সের কবিতার পিছনে একটা

রাজসিক শৌর্য্য বিদ্যমান, ইহা যে আজও নূতন হইয়া আছে তাহা তার বিশেষ গুণে, যে গুণ স্বচ্ছ কবিতার মধ্যে পাওয়া যায় ; অন্যত্র নয়। ভার্জিলের জর্জ্জইক্‌স (Georgics) কাব্যে প্রকৃতির সুন্দর সুন্দর বর্ণনা ও চিত্র আছে তাহা ভাষার ও চিত্রের সুষমায় মণ্ডিত। কিন্তু তার মধ্যে প্রাণের সত্তা নাই। প্রাণহীন বস্তুর ন্যায় তাহা কালের স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে এবং প্রকৃতির সুন্দর পরিবেশের কল্যাণেই তাহা বাঁচিয়া আছে। ভারতবর্ষে, শুধু মাত্র ভারতবর্ষেই, মনে হয়, এরূপ প্রচেষ্টা দুই তিন বার সাফল্য লাভ করিয়াছে। গীতা, উপনিষদ ও অন্য দুই একটি স্বল্প-প্রসিদ্ধ, প্রচেষ্টার মধ্যে এই ছাঁচে গড়া কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু এই পার্থক্যের মধ্যে একটা রহস্য আছে। গীতা যে কাব্যরূপে সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তার কারণ ইহা জীবনের একটি মহৎ ও সঙ্কটপূর্ণ পরিবেশ হইতে উৎপন্ন হয় ; গীতার দ্রষ্টা অনুক্ষণ এই অবস্থার কথা মনে রাখিয়াছেন, বারম্বার তার বর্ণনায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। গীতার ঋষি যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি একটি আধ্যাত্মিক অনুভূতির মুহূর্ত্ত বা অবস্থা ধৃত করিয়া তাকে প্রত্যক্ষ দর্শনের পর্য্যায় ও চিন্তার স্তরে উন্নীত করিয়াছেন। আর যদিও এই কৌশল অত্যন্ত কঠিন, তবুও গীতার কবি তাকে সুমধুর বাক্য সমষ্টির মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন এবং যখনই তিনি গীতায় দর্শন শাস্ত্রে বিষয়ধারা তাঁর বর্ণনা ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছেন, যখন দার্শনিক বিচার বিতণ্ডার প্রতি বুদ্ধি নিবদ্ধ করিয়াছেন, তখনই গীতা 'যা ত পন্থ মিলে যা' গোছের হইয়াছে। শেষাংশের দুই তিন অধ্যায়েই এই দোষ লক্ষ্য করা যায়। উপনিষদ কিন্তু দার্শনিক চিন্তার পর্য্যায়ে পড়ে না, সেই গুণ সম-সাময়িক অন্যান্য দর্শনেরও আছে। উহা আত্ম-দর্শন, আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রয়াস তার মধ্যে আছে, এবং তাহা কাব্যের ভাষারূপ গ্রহণ না করিয়া পারে নাই। কিন্তু, উহা যে জীবন্ত অগ্নির পরশে উদ্ভাসিত, ইহা বুদ্ধির ভাষায় তার স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গী প্রকাশিত হইলে তাহা দর্শন শক্তিকে বিপথে লইয়া যাইত।

বর্ত্তমান যুগে আমরা আমাদের সৌন্দর্য্যানুভূতি ও তার প্রকাশভঙ্গী বহু ভাবে সূক্ষ্ম করিয়া তুলিয়াছি। সেই জন্যই রোমীয় কবিবৃন্দের ভুল আমরা করি না। কিন্তু বুদ্ধির প্রাধান্য অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ও বিপজ্জনক ভাবে তার বিধি বহির্ভূত ক্ষেত্রে কাজ করিতেছে। লোকশিক্ষা দিবার প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে প্রবল, সহজেই আমরা জীবনের পর্য্যবেক্ষক ও ব্যাখ্যাতা হইয়া পড়ি। সেজন্যই আরনল্ডের (Arnold) বাণী অত্যন্ত বিপজ্জনক যখন তিনি বলেন যে কবিতা মানব জীবনের ব্যাখ্যা বা টীকা মাত্র। অবশ্য এই চেষ্টা করিয়া তিনি রক্ষা পাইয়াছেন যে তিনি জীবনের বহির্ব্বাসে মাত্র জীবন বেদের বিচার আবৃত রাখিয়াছেন। অবশ্য, সেজন্য, কিছু তিনি আত্মদর্শনের পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছেন। বুদ্ধির কসরতে উপদেশ অবাস্তব, ভাব ও বাস্তব চিত্রের আপাতঃ সহজ সঙ্গম। এই চেষ্টার বা আবেগের মধ্যে আমরা কবিতার স্বরাটের উপর আক্রমণ লক্ষ্য করি। এই মনন শক্তির রোগ আমাদের সকলের মধ্যেই অল্পবিস্তর সংক্রামিত হইয়াছে। এই জন্য বরাবর মনে রাখা উচিত, জোর করিয়া বলা উচিত যে কবিতা নির্ভর করে দ্রষ্টার ঋষির উপর, বুদ্ধি-বৃত্তির উপরে নয়। এবং কবিতাকে বিপদমুক্ত রাখিতে হইলে এই মৌলিক শক্তিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা মঙ্গলজনক, এবং এই ভাবের উৎপত্তি হইতে তার জীবনের সর্ব্বাঙ্গ ভাব ও উচ্ছ্বাস, তার প্রকাশ তার গঠন সবই যেন সেই শক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশের সহায়ক হয়, এবং প্রয়োজন হইলে আত্মশাসন প্রয়োগে সেই সার্থকতা লাভ করিতে হইবে।

দ্রষ্টার জীবন-দর্শন তার্কিকের, বুদ্ধি-জীবীর বা দার্শনিকের কাজ নয়। ইহা আত্মদর্শন, গূঢ়তম শক্তির সম্পূর্ণ শাসনাধিকারে তাহা অবস্থিত। এবং এই বিশ্বাসের আলোকে আমরা বুঝিতে পারি যে, মন্ত্র বাক্যিক বা দার্শনিক অভিব্যক্তি নয়। ইহা আত্মবিকাশ, ইহা ভগবৎ দর্শনের ফল-প্রকৃতির গুহাতীত গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে জ্ঞানের ফল, জীবনের সর্ব্ব অভিজ্ঞতার ফল। সাধারণের দৃষ্টিতে ইহা অতীন্দ্রিয় জগতের কথা আনয়ন করে। সত্যের নানা বিকাশের মধ্যে তাহা দেখা দেয়,

তাহা মানব জীবনের আত্মজ্ঞান ও জীবন্ত অভিজ্ঞতার নির্য্যাস।

কলানুভূতির প্রসঙ্গে বলা যায় যে তার বিষয়ের মধ্যে যে নানা পার্থক্য বিদ্যমান, তৎসম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। অতীন্দ্রিয় বা বাস্তব জ্ঞান থাকা উচিত; বস্তুতান্ত্রিক বা আদর্শতান্ত্রিক ভাব সম্বন্ধেও সেই নির্দ্দেশ প্রযোজ্য। এই দোষ আমাদের আলোকের পথে না নিয়া বিপথে নিয়া যায়। একজন কবি বর্ণনায় শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন, এবং অতীন্দ্রিয় জগতের বর্ণনায় ঠোক্কর খাইতে পারেন। আর একজন তাঁর বিপরীত গুণের অধিকারী হইতে পারেন। উভয়েই উচ্চাঙ্গের কবি হইতে পারেন। কিন্তু, যখন আমরা সূক্ষ্মভাবে বিচার করি, তখন দেখিতে পাই যে, বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টি না থাকিলে কবিতা জীবন্ত হইতে পারে না। আবার, সেরা বস্তুতন্ত্রের পশ্চাতেও একটা ভাবাদর্শ বিরাজ করিতেছে। কারণ, কবি নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ উপকরণ হইতেই সৃষ্টির উপকরণ সংগ্রহ করেন, বহির্জ্জগতের উপকরণ হইতেই তাঁর অন্তদৃষ্টি খুলিয়া দেয়। ইহা না হইলে তাঁর কাব্য প্রতিভা হইয়া পড়ে কলকব্জার; তাহা সৃষ্টির সন্ধান পায় না।

বস্তুতান্ত্রিকতা এইভাবে আমাদের ফটোগ্রাফারে অবনত করে। বিষয়ের বর্ণনায় বিজ্ঞান অতীন্দ্রিয় সত্যকে প্রায় মুছিয়া ফেলে। ইহা কবিতা হইতে পারে না। এই পথে আমরা বিষয় সম্বন্ধে সত্য জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। বরং তদ্বিপরীত বস্তুই প্রাপ্ত হই। তার নিজের এই পদ্ধতি সত্য হইতে পারে; ইহা ইন্দ্রিয় গ্রাম ও বুদ্ধির এলাকা মাত্র। আত্মার রাজ্য ইহা নয়, সমগ্র সত্যের রাজ্য ইহা নয়; (integral truth) সমগ্র জ্ঞান তাহা হইতে লাভ করিতে পারা যায় না। বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ লাভ করে কলকব্জার জ্ঞান। এই কৌশল অবলম্বন করিয়া বিষয়কে ধারণ করিয়া আছে যে সমগ্র সত্য তাহা লাভ করা যায় না। বস্তুতন্ত্রের ভুল এইখানে, শিল্পকলা ব্যবহারিক বিজ্ঞান নয়; বিজ্ঞান জীবনের প্রকৃত মূর্ত্তি দিতে পারে না। খামখেয়ালি ভাবে ইহা কতকগুলি চিত্রকলার আদর্শ, আকার, আকৃতি বর্ণ-সুষমা ফুটাইতে পারে। কখনো তাহা বর্ণহীন কালো বর্ণের,—কখনো ধূসর, কখনো ঈষৎ পাংশু, কখনো তামাটে, কখনো অপরিচ্ছন্ন সাদা, কখনো নোংরা পীত, কখনো নীরেট কালো বা নীরেট লাল এই নানা বর্ণের সমাবেশের মধ্যে কখনো কখনো শক্তির প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, কখনো ভয়ের, স্বপ্নে দেখা মিথ্যা ভয়ঙ্করের। অতীন্দ্রিয় ভাবে পরিচালিত চিত্রকলা হয় সৌন্দর্য্যের বা শক্তির ভাব ফুটাইয়া তোলে, না হয়, মিথ্যা ও বিকৃত দিন জাগরণের একটা মূর্ত্তি। এইসব পার্থক্যের মধ্যে কোন শান্তি পাওয়া যায় না। তার মধ্যে কবি ঋষির জন্য কোন পথ নির্দ্দেশের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। করণ, এমন একটি শক্তি তাঁকে পরিরিচালিত করে যাহা তাঁহার আত্মার উপলব্ধি হইতে উপজাত। তার কর্ত্তব্য হইবে নিজের আত্মকেন্দ্রীক শক্তির উপর নির্ভর করা। যদি তিনি কৃত্রিম আদর্শবাদে পরিচালিত হন, তবে তিনি দ্বীপান্তরিতের মতন জীবন যাপন করিবেন।

আমাদের এই আদর্শ কবি ঋষির স্বকীয়তা সঙ্কুচিত করে না; যদৃচ্ছা তিনি চলিতে পারেন। কিন্তু চিরন্তনীর পরিধির মধ্যে তিনি হাত দিতে পারিবেন না। তাঁর কবিতার মধ্যে চিন্তার প্রাধান্য থাকিতে পারে; জীবনের উপকরণ। তিনি বর্ণনায় উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন, স্বকীয় ব্যাখ্যার আলোকে বিষয়কে উদ্ভাসিত করিতে পারেন। মর জগতে সুখ দুঃখ, হাসি-কান্না তাঁর কাব্যের উপকরণ হইতে পারে; তিনি তার উর্দ্ধলোকসমূহে যাইতে পারেন, তিনি সমস্ত অনন্তের সীমাহীনতার মধ্যে উড়িয়া যাইতে পারেন; একটি গোলাপ ফুলের মধ্যে, একটি মন্ত্র রচনায় প্রেরণা পাইতে পারেন, কোন মহান মানবের চরিত্রের মধ্যে, কোন কীর্ত্তির ঐশ্বর্য্যলোকে। তিনি নিজের আত্মার মধ্যে ডুবিয়া তার নানা গতিবিধির পর্য্যালোচনায় নিজকে হারাইয়া ফেলিতে পারেন। কিন্তু, একটি সূত্র তাঁকে ধরিয়া থাকিতে হইবে, তাঁকে শব্দ বা প্রতীকের অতীতে যাইতে হইবে। শব্দ, প্রতীক বা মূর্ত্তীর সংকীর্ণতার মধ্যে তিনি আটকাইয়া পরিবেন না। এই বাহ্য বস্তু একটা পরম সত্যকে উদ্ভাসিত করিতে সাহায্য করে, বাহ্যের বর্ণসম্ভারে তার উচ্ছ্বসিত রূপ দেখা যায়। এবং যখন এই বাহ্য বস্তু সব আত্মার বিকাশের মধ্যে নিজেদের হারাইয়া ফেলে, তখনই চিত্রকলা সার্থকতা

লাভ করে। উচ্চতম স্তরে কবি ঋষি নিজের উপলব্ধির মধ্যে হারাইয়া যান, তাঁর স্বকীয়তা বা ব্যক্তিত্ব অনন্তের মধ্যে মিশিয়া যায়। এবং যে শক্তি সকলকে বিধৃত করিয়া আছে এবং অদ্বিতীয়রূপে বিরাজ করিতেছে তাহা আপনার স্বকীয় রাজসিকতার গুহ্য তত্ত্ব সব ঘোষণা করেন।

কবি ঋষির উপব্ধিকে মানব মনের বিবর্ত্তনের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, দেশ- কাল-পাত্রের, যুগধর্ম্মের আহ্বান মানিয়া চলিতে হয়। সেইজন্যই তার উত্থান পতন আছে, বহির্গমন ও পুনরাবর্ত্তন আছে। আদিম মানবের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল স্থূল জগতের প্রকাশাবলীর মধ্যে, জীবনের আদিম ভাব ও আবেগের মধ্যে তাহা আবদ্ধ ছিল। কেবল মানুষের জগত সে দেখিত, অন্ত লোকও সে কল্পনা করিত, এবং নিজের জগতের ছাঁচে তার দেবতাবৃন্দকে সৃষ্টি করিত। এই সৃষ্টির মধ্যে একটা মাত্র পার্থক্য ছিল। আদিম মানুষের দেবতা বিরাট আকারে দেখা যায়। তার সমাজের কবির নিকট সে প্রত্যাশা করে শক্তির বর্ণনা যাহা তার মনকে উদ্দীপ্ত করিবে। তার সম্মুখে দেবতা বিরাটের আকারে দেখা দিবেন। সেই দেবতার প্রভাব সে অনুভব করিবে হৃদয়ের মধ্যে। দেবতার গুণাবলী সে দেখিতে চায় নিজের জীবনে প্রতিফলিত হইতে। মনের উৎকর্ষতা যখন একটু বিস্তৃত হয়, তখন সে বস্তুর রাজ্যে তার বুদ্ধি খাটায়। সে তার কবির নিকট চায় একটু উচ্চাঙ্গের, ভাবোদ্বেলিত বুদ্ধির খেলা। সৌন্দর্য্যানুভূতির প্রথম আবিষ্কার, প্রথম খেলা, স্বচ্ছ ও উগ্র আনন্দে সমাজের মনকে দোলা দিবে। এই যুগের কবিতা মানস-লোকের ও ভাবলোকের কল্পনায় পূর্ণ থাকিবে; এই কবিতার ব্যাখ্যা কেবল বুদ্ধির জগতে গ্রাহ্য হইবে। তাহা হইবে জীবন রসে ভরপূর। পরবর্ত্তী যুগের কবিতা অনেক সময় ফিরিয়া যায় এই বুদ্ধি জগতের বাহ্য মূর্ত্তির মধ্যে। মাঝে মাঝে তাহা সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও জীবনের রসাল অভিজ্ঞতার বর্ণনায় আনন্দ পায়।

এই স্তরের কবিতার মধ্যে মহৎ বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় সত্য কিন্তু গূঢ় জগতের দর্শন লাভের চেষ্টার সময় কবি একটা বাধার সম্মুখীন হইবেন। ইহার কারণ তার শক্তির অভাব নয়। বাহ্যিক ভাব ও মূর্ত্তির উপরে তাঁকে নির্ভর করিতে হয় বলিয়াই তিনি বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন না। বাহ্যিক ভাব ও মূর্ত্তির তাঁবেদারী করিতে গিয়া তিনি যে সত্যের দর্শন পান তাকে ব্যবধান করিয়া রাখে একটি আবরণ দ্বারা। মানুষ উচ্চ স্তরের মানসিকতার পৌঁছায় যখন সে জীবনের পশ্চাতে থাকিয়া যে শক্তি নিচয় কাজ করে, তাদের নানা রহস্যের ইঙ্গিত লাভ করে। এই শক্তি আমাদের ভাবের আচ্ছাদনে লুক্কায়িত থাকে। এবং কবি তখনই তাঁর রহস্যাবলী উদ্‌ঘাটন করিতে পারেন যখন তিনি বাহ্য জগতের, অতীন্দ্রিয় জগতের পরিচয়ের আভাস দিবার জন্য ইন্দ্রিয় গ্রামের, কামলোকের প্রতীকারাজির ব্যবহার করেন। উচ্চ স্তরের রাজ্যে পৌঁছা যায় মানসিক এই অবস্থায়ও। বিষয়ের ধারক আত্মা যখন মানবের সান্নিধ্যে আসে তখনই এই গূঢ় দর্শন ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়, এবং বিষয় রাজ্য ছাড়া অন্যান্য লোক মানবচক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। কবি তখনই ঋষি হইয়া পরেন, তখন তার দর্শনের শক্তি মুক্তিলাভ করে, পুরুষগণের মনকে অধিকার করিয়া বসে। আধ্যাত্মিকতা যখন বিরাট কবি-মানস, তখন তার শক্তির পূর্ণতম বিকাশ লাভ করে এবং গূঢ়তম সত্যের দর্শন পায়; মানব-মন গুহ্যতম সত্যের জগতে প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হয়।

সুতরাং দেখিতে পাইতেছি যে, কবিতা উচ্চতম আদর্শ তখনই লাভ করে যখন তাহা দর্শন-শক্তির উচ্চ গ্রামে আরোহণ করে। যতই ভাদের মূর্চ্ছনা ঝংকৃত করুক, লোকমনকে বাক্য ও ছন্দে তাহা লাভ করা যায় না। এই উচ্চতায় আরোহণ কবির ব্যক্তিগত শক্তির উপর নির্ভর করে না। দেশকালের প্রভাবের উচ্চতা, সেই যুগের প্রতীকাদির যাথার্থ্য, সেই যুগের আধ্যাত্মিক উর্দ্ধগতি তাহা নিয়ন্ত্রিত করে। মহাযুগের একজন অপরিণত কবি এমন কবিতা লিখিতে পারেন যাহা অপেক্ষাকৃত নিম্নযুগের অমর (immortal) প্রতিভার অধিকারী কবি দিতে পারেন না, ইহা বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। পর-বর্ত্তী যুগের ভারতীয় ধর্ম্মসঙ্গীত, বাল্মিকি ও কালিদাস যে কবিতার উৎস ছিলেন, মধ্য যুগের এই সব কবিতা তার

সঙ্গে তুলনায় নিস্তরঙ্গ স্রোত বলিলে অন্যায় হইবে না। গ্রীস দেশীয় কবিতার আকার ও সঙ্গতির উৎকর্ষ বর্ত্তমান যুগের ইউরোপীয় কবিতার বহু উর্দ্ধে অবস্থিত। কিন্তু ইউরোপীয় কবি আমাদের এমন আনন্দ দান করেন, যাহা গ্রীক দেশীয় কবিতা পারে না। বর্ত্তমান যুগের একজন নিম্নাঙ্গের কবি বিশ্বদর্শনের এমন বর্ণনা করিতেন যাহা সেক্সপীয়র বা দান্তের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই যুগের লোকের দুয়ারে আসিয়া হাজির হইয়াছে বহু যুগের জগতের বার্ত্তা, সেই বার্ত্তা মানুষের মনকে নাড়া দিয়া সক্রিয় করিয়া তুলিতেছে অন্তরে বাহিরে। মানুষের মন চির সত্যের আবাহনের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। বিজ্ঞানের প্রসাদে সে লাভ হইয়াছে এই প্রস্তুতি। সেই বহু সম্ভাবনার কথা যখন স্মরণ করি, তখন এই সত্য বুঝিতে কষ্ট হয় না যে মানুষ, মানুষের শরীর, মন বিরাটের ও অনন্তের বহিঃপ্রকাশ মাত্র, তার আবরণ মাত্র, তার প্রতীক মাত্র। সাধনা করিলে মানুষ এই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। ইহাই বর্ত্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য।*

---

*১৯৫১ সালের 'ভারতী' (বোম্বাই) বার্ষিক সংখ্যায় 'আর্য্য' পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ, ১৩১৭-১৮ হইতে ভাষান্তরিত শ্রীঅরবিন্দের 'Poetic vision and the Mantra' ভাব ও ভাষানুসরণে।

পাহাড়

সুজিতকুমার নাগ

পাহাড় তোমার অরূপ দেহের বিশাল মরুর কাছে
আদিম কালের অন্তহীন অন্তরালের মাঝে
পাহাড় তোমার অমোঘ দৃষ্টি কাহার সৃষ্টি থেকে
কত মানুষের, কত দানবের পথ গেছে এঁকে বেঁকে।

সূর্য্যের আলো পড়েনি যেখানে, যায়নি যেখানে দেখা
হয়ত সেখানে আছে এক দেশ নবীন প্রভাত পানে
কাদের চরণ জেগে ওঠে আজ দুর্গম গিরি এই দুর্ব্বার
পাহাড় তোমার অরূপ দেহের বিশাল সৃষ্টি মাঝে।

তবুও আজিকে হয়ে গেছে শেষ রামায়ণের কাহিনী
আদিম কালের বন্দিনী সীতা আজও কেঁদে মরে অরণ্যে
রাবণ আজিকে ঘুরিছে কালের চাকার মেসিনে মেসিনে
পাহাড় এখন অটল রয়েছে এখনও রয়েছে সেখানে।

সেই আদিম কালের বন্দিনী সীতা আজও ডাকে সূর্য্যকে
জ্বালাও তোমার নাবারুণ তেজ, জ্বালাও বহ্নি আজিকে
হে অরণ্য তোমার প্রাচীরে কান্না কেঁদে মরে ঘুরে ফিরে
মোহন লালের দুর্জ্জয় হাসি মিরজাফরের সংঘাতে।

ঐকান্তিক

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

আর কোনদিন সাগরে যাবো না, আর আমি কোনদিন :
সেখানে যদি-বা বাধা হয়ে আসে বালিয়াড়ি-বালিপথ,
তাহলে কি হবে সারাটি সকাল শুধু শুধু ঝিনুকের
অনেক মালিকা বেছে আর গেঁথে, কী যে হবে সব মীন
ছোট শিশুদের চোখ ভরে দেখে। আর ঢেউয়ে সাতরঙা
সূর্য্য-শিবিরে ছাউনি-ছায়ায় রাশি রাশি কত ডিঙি
সারাদিনভর কি রোদ পোহাবে!—তারা সব খোঁজহীন
কোথা থেকে এল,কে তা জানে বলো,তাদের এ ঠিকানা কী?

তবু যাব নাক আর ত সেখানে আমাদের নদী ছেড়ে—
এই নদীপাড়ে চুপচাপ বসে একাকার সময়ের
খড়ি দিয়ে দাগ, নাম লিখে যাব অন্তত একদিন—
বলো, তা থাকবে পাথরের মত খাঁজকাটা? আমি ফের
এই নদী ধরে একলা একলা বহু পথ ঘুরে ঘুরে
অবশেষে বুঝি কোথাও ঘুমাব নদীর-নিদালি-সুরে।

হে অরণ্য গভীর পাহাড় এই আকাশ রুক্ষ নীল,
ওপরে হাসিছে শয়তান আজ নীচে কেঁদে মরে ভুখ-মিছিল।

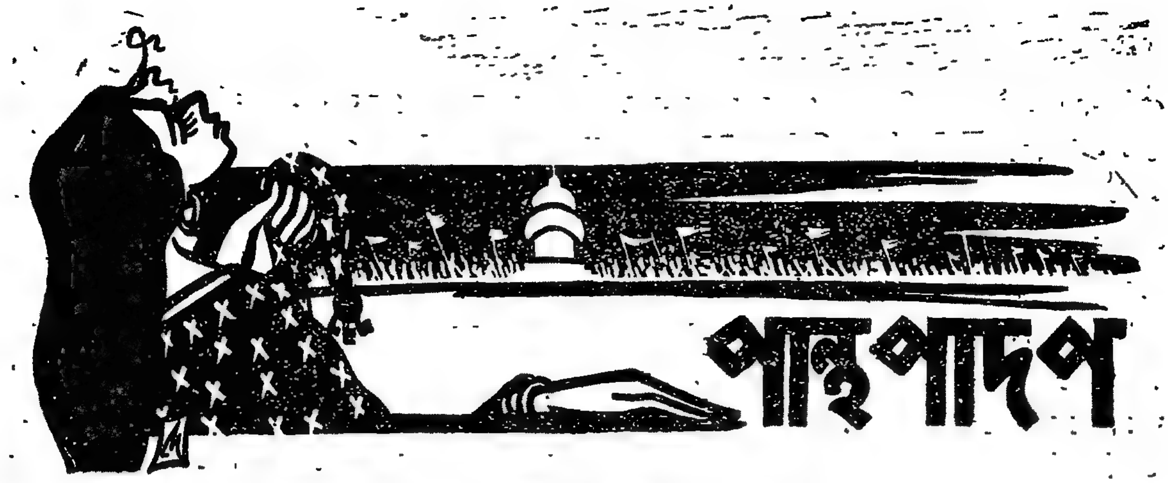

পান্থপাদপ

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

ষোল

রুমাল বাঁধা কতকগুলা কাগজ পত্র কি বার করে জয়ন্ত—

"নিন, আপনার টাকা ফিরিয়ে এনেছি।"

দুই পা পেছিয়ে গিয়ে ভারতী বললে, তার মানে? ডাকাতি করে নিয়ে গেলেন, আবার সাধু সেজে ফেরত দিতে আসছেন!

শান্ত কণ্ঠে জয়ন্ত বললে, "তার মানে—আমাদের দরকার মিটে গেছে, আমরা উপস্থিত হাজার খানেক টাকা পেয়েছি, আরও পাব কথা আছে, আর ডাকাতির কথা যা বলছেন, একটা কথা মনে রাখবেন, ডাকাতি আমাদের পেশা বা জীবিকা নয়,—আমরা জোর করে নেই এই দেশেরই কাজ করবার জন্যে। আমাদের এক লক্ষ্য—কিন্তু না খেয়ে কাজ করা মুস্কিল, সেই জন্যেই এ রকম ভাবে নিতে হয়। একটা কাজ করতে গেলে অর্থের দরকার আগে হয়,—সেই জন্যেই নিয়েছিলুম ভারতী দেবী। আপনার কাছে ভিক্ষা চাইলে আপনি কখনও এ টাকা দিতেন না, কাজেই ভয় দেখিয়ে নিতে হয়েছিল, সে জন্যে আশা করি ক্ষমা করবেন।"

বলতে বলতে সে মুখ টিপে হাসে—আপনার গহনা বিক্রীর কথা শুনেছি, গহনা আপনারা মানে মেয়েরা এত ভালবাসেন যার জন্যে নিজের জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারেন। ছোট বেলায় স্বর্ণলতা নামে একখানা বই পড়েছিলুম, জানিনে আপনি পড়েছেন কি না। আমি কিন্তু সেই বইখানা পড়ে মেয়েদের চিনেছি, জেনেছি কেন তারা গহনা এত ভালবাসে যার কাছে স্বামী পুত্র কন্যা সব তুচ্ছ—

"থামুন থামুন—"

ভারতী অকস্মাৎ চেঁচিয়ে ওঠে; আরক্তিম মুখে বললে, "নাই বা উলটালেন সেই একখানা বইয়ের পাতা, একটা মেয়েকে দেখে নাই বা করলেন সমস্ত মেয়ে জাতির সমালোচন। আপনি কয়টা মেয়েকে দেখেছেন, কয়টা মেয়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে শুনি—?"

তার দুই চোখে আগুন জ্বলছিল,—এই মুহূর্ত্তে জয়ন্তের উপর হতে তার সমস্ত শ্রদ্ধা মুছে গেল।

জয়ন্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, "আহা অতটা চটবেন না, ভেবে দেখুন—আমি আপনাদের মানহানিকর কিছু বলিনি। আপনারই দেশের একজন লেখক যা চরিত্র এঁকেছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে ছোটবেলায় স্কুল পালিয়ে বইখানা নিয়ে লুকিয়ে এক ভাঙ্গা মন্দিরে বসে এক নিঃশ্বাসে শেষ করে ফেলেছিলুম। সেদিন শুধু জেনেছিলুম মেয়েরা গহনা ভয়ানক ভালোবাসে। এগারো বারো বছর বয়সের একটা ছেলের এইরকম ভাবে নভেল পড়ার এতটুকু প্রশংসাও আপনি করবেন না?

গম্ভীর কণ্ঠে ভারতী উত্তর দিলে, "না এ বয়সের ছেলেদের নভেল পড়া অন্যায়—অত্যন্ত অন্যায়। অত

ছোট বেলায় মনটা কতখানি নরম থাকে দেখেছেন তো, তখন যা পড়েছেন সেইটাই জীবন্ত হয়ে জেগে আছে আপনার মনে—আর সেই কথাটাই বলে আজ সমস্ত নারীর মুখে আপনি কালি মাখাচ্ছেন। আপনি আপনার মনের ভাব পরিবর্ত্তন করলে অত্যন্ত সুখী হব জয়ন্তবাবু।"

চিন্তিত মুখে জয়ন্ত বললে, "নিশ্চয়, কিন্তু এমন কোন মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত হওয়া চাই যে এ ধারণা বদলে দিতে পারবে ;—সে মেয়ে তো আজও আসেনি ভারতী দেবী।"

ভারতীর মুখখানা লাল হয়ে ওঠে, সে উষ্ণকণ্ঠে বললে, "আপনি কি বলছেন, আমি বুঝতে পারছিনে।"

জয়ন্ত বললে, "অত্যন্ত সহজ এবং সরল কথাই বলছি; বোঝাটা শক্ত মোটেই নয়—বিশেষ আপনার মত শিক্ষিতা মেয়ের পক্ষে। আমি সেই রকম মেয়েকে দেখতে চাই যে এই ক্লেদ এই গ্লানির অনেক উর্দ্ধে রয়েছে। আমি তাকে বন্ধু ভাবে গ্রহণ করব ভারতী দেবী, জানব সে মেয়ে ইস্পাত, তাকে দিয়ে জগতে অনেক উপকার হবে। দেশ আজ সেই মেয়েকে চাচ্ছে, দেশমাতৃকার পূজারিণী সেই মেয়ে,—বিশ্ববারার মত প্রথম হবি-অর্ঘ্য দেবে সেই মেয়ে, মাতৃবেদের প্রথম সুক্ত রচনা করবে সে।"

এক মুহূর্ত্ত ভারতী নীরব থাকে, তারপর এগিয়ে আসে, "আমি আপনার বন্ধুত্ব প্রার্থনা করি জয়ন্ত বাবু, তবে আপনার ও আদর্শ আমি নিতে পারব না,—সুক্ত রচনাও চলবে না, অর্ঘ দিতেও পারব না। তবু বলছি, আমায় কাজের উপযুক্ত করে নিন,—আমার দ্বারা যতখানি সম্ভব হয়—আমি কাজ করব।"

"পারবেন—।"

জয়ন্ত ভারতীর মুখের উপর দৃষ্টি রাখে—

"মনে করুন ভারতী দেবী, আমাদের কাজ নিতান্ত সহজ নয়, দেশ সেবার ব্রত বড় ভীষণ—বড় শক্ত। এ পথ সহজ সরল নয়, কণ্টকাকীর্ণ—বন্ধুর। অনেক ছেলে এ পথ চলতে চলতে আছাড় খায়, আপনি মেয়ে হয়ে চলতে পারবেন কি ?"

দৃঢ়কণ্ঠে ভারতী বললে, "চেষ্টা করব—নিশ্চয়ই পারব। এই মাত্র আপনি বলেছেন—দেশমাতৃকার পূজারিণী চাই, সে কথা ভুলে যাবেন না। আপনি কেবল অতীতকেই দেখেছেন, বর্ত্তমানের মেয়েদের আপনি দেখতে পান নি, তাদের সম্বন্ধে অতি কুৎসিত ধারণা করে আপনি যে কত বড় অবিচার করেছেন সেটা বুঝবার চেষ্টা করুন, মেয়েদের কাজ করবার সুযোগ দিন, তাদের পেছনে না রেখে পাশে নিন,—তারা কতখানি এগিয়ে যেতে পারে দেখুন। বলুন দেখি, এ পর্য্যন্ত মেয়েদের জন্ম আপনারা কি করেছেন ? মেয়েদের মিথ্যে স্তুতি দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন—যে সব কাজে আপনাদের সেবা বুঝায়—শুধু সেই কাজ নির্দ্দিষ্ট করে রেখেছেন তাদের জন্য—এইগুলো কি আপনাদের স্বার্থপরতাই নয় ? ক্ষুদ্র সংসারে নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছেন মেয়েদের কাজ,—কেবল সংসারের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন,—চান ত্রুটিহীন কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা,—বড় জোর ধর্ম্ম কর্ম্ম বা আত্মিক উন্নতি ছাড়া আর কি অধিকার দিয়েছেন তাদের। বাইরে কত বড় জগৎ—এই জগতের সকলের সঙ্গে মিলে মিশে চলবার অধিকার তাদের দিয়েছেন কি ? দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করে দেশের অন্নজলে পরিপুষ্ট হয়ে এ দেশের মেয়ে দেশের কথা ভাবতে ভুলে গেছে, একি তাদের দুরদৃষ্ট নয় জয়ন্ত বাবু ? এ দিকে কোনদিন তাদের আকৃষ্ট করেছেন কি ? নিজেদের স্বার্থ বাঁচিয়ে রেখে যেটুকু দেওয়ার দরকার সেইটুকুই মাত্র মেয়েদের দিয়েছেন আপনারা, রাজনীতি বুঝবার এতটুকু সুযোগ তো তাদের দেননি।"

জয়ন্তের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

"ঠিক কথাই বলেছেন ভারতী দেবী—আপনি এ সম্বন্ধে অনেক কিছু ভাবেন বোঝা যাচ্ছে। আমরা মানে পুরুষেরা আপনাদের রাজনীতি চর্চ্চার সুযোগ দেইনি এ কথা খুব সত্য। নিজেদের স্বার্থের জন্য যেটুকু শুধু সেইটুকু কাজ আপনাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করে রেখেছি, গণ্ডীর বাইরে পা দেওয়া দূরে থাক—আপনারা তাকাবার স্বাধীনতা পর্য্যন্ত পাননি। বহুকাল হতে যে ভুল করে এসেছি, সেই ভুলের মাশুল আজ দিতে হচ্ছে আমাদেরকেই। পদে পদে ঠকছি আমরা, বিভ্রান্ত হচ্ছি আমরা। আজকের দিনে—এই যুগের মানুষ আমরা, আমরা সে ভুল শুধরাতে চাই, আপনাদের সঙ্কীর্ণ গৃহগণ্ডীর

বাইরে যে বিশাল জগত আছে, তার সঙ্গে পরিচিত করে দিতে চাই। দুনিয়া আজ এগিয়ে চলেছে, প্রদীপ্ত সূর্য্যের কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এই দুনিয়া, কেবল আমরা—গোটা ভারতের অধিবাসী আমরা—আমরাই আজও পেছিয়ে আছি। এই পরাধীনতার নাগপাশ আমরা ছিড়ে ফেলব—আমরা মানুষ হব—এই আমাদের ব্রত। আপনি আসুন ভারতী দেবী, আমাদের সকলকে চিনে নিন,—আমাদের সঙ্কেতবাণী শিখে নিন—আমরা বিনা দ্বিধায় সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকে গ্রহণ করব।"

বলতে বলতে হঠাৎ সে থেমে যায়,—পথটা যেখানে ঠেকে গেছে সেখানে দেখা যায় একটা লোককে।

"নিন নিন, হাত বাড়ান শিগগীর, গন্ধে গন্ধে ঠিক এসে পড়েছে, এখনি দেখতে পাবে আপনাকে—আর সেটা আপনার পক্ষে মোটেই ভালো হবে না।"

দৃঢ়কণ্ঠে ভারতী বললে, "না, যা দিয়েছি তা আমি ফিরে নেব না জয়ন্ত বাবু—"

জয়ন্ত বললে, "কিন্তু এ টাকাও তো আপনার নয় ভারতী দেবী, প্রজাদের টাকা—তাদের আবার ফিরে দিতে হবে।"

গর্ব্বিত কণ্ঠে ভারতী বললে, "আমার সে জ্ঞান আছে জয়ন্ত বাবু, সব গেলেও আজও আমরা ভিখারী হই নি। সুদনদাকে দিয়ে আমার জড়োয়া গহনা কিছু বিক্রি করে টাকা এনে প্রজাদের টাকা দিয়ে পাঠিয়েছি—কাজেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এ টাকা আপনার কাছেই থাক, আজ আপনাদের দরকার মিটলেও কাল তো আবার দরকার হবে। সে দিন আবার তো কোথাও ডাকাতি করতে যেতে হবে। সেই অভাব মিটানোর জন্যই আমার ও টাকা গুলো আপনার কাছেই থাক—ও গুলো আমি দান করলাম।"

জয়ন্ত সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার পানে চাইলে, তারপর মোটবাঁধা রুমালটা আবার পকেটে ফেলে সামনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হ'য়ে গেল; যাওয়ার সময় বলে গেল আর দাড়াবেন না, সোজা এগিয়ে যান।

আগামী সপ্তাহের শুক্রবার দুপুরের ট্রেনে আপনি একবার কলকাতায় যাবেন, ষ্টেশনে লোক থাকবে—আপনাকে সে নিয়ে আসবে আমাদের সমিতিতে। আপনাকে সেই দিনই বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হবে—ভয়ের কোনই কারণ নেই।

মুহূর্ত্তে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভারতী পিছন ফিরে দেখলে—লোকটি তখনও সেই বাঁকের মুখে অপেক্ষা করছে। তার এতটুকু অন্যমনস্কতার ফাকে জয়ন্ত চলে গেছে, সে তা জানতেও পারেনি দেখে ভারতী ভারি খুশি হয়ে উঠলো।

সতের

মুক্তির দিন আসে—

রতনমণি দত্তের মুক্তির দিন জেল হতে বাইরে আসার দিন।

সেদিন সকালবেলায় ঝন ঝন করে দরজা খুলে গেল, বিস্মিত চোখে রতন দত্ত তাকিয়ে দেখলেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিজেই এসেছেন।

অসম্ভব ব্যাপার, রতনমণি দত্ত যেন বিশ্বাস করতে পারেন না।

এই ম্যাজিষ্ট্রেট সেদিন পর্য্যন্ত রতনদত্তের বন্ধু স্থানীয় ছিলেন। রতনমণি দত্তের প্রদত্ত বহু অর্থ তাঁর হাত দিয়ে সরকারের ভাণ্ডারে পৌঁচেছে—কোনদিন তিনি যে ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন সে কথা তিনি নিজেও যেমন ভাবেন নি, তেমনই বৃটীশ সরকারও ভাবে নি।

মিঃ হুইন্‌হো দুঃখপ্রকাশ করেন,—সরকারের প্রকৃত দরদী বন্ধু রতনমণি দত্ত যে কোনদিন সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন, এ কল্পনা কোন দিন তিনি করেন নি, বার বার এই কথাটাই তিনি বলতে থাকেন।

ধীরকণ্ঠে রতন দত্ত বললেন, "আমি যা করেছি সত্য জেনেই করেছি, আর একে বিরুদ্ধে দাঁড়ান বলা চলে না, কতটুকুই বা গরীব প্রজাদের দাবী ছিল, সে দাবীটুকু অনায়াসে মিটানো যেতো মিঃ হুইন্‌হো।

ম্যাজিষ্ট্রেট বললেন, "কিন্তু মনে করুন মিঃ দত্ত, তাদের দাবী সঙ্গত ছিল না,—

রতনদত্ত হাসলেন, বললেন, "মনে আমি যথেষ্ট করেছি, আমার বিবেক যা সত্য বলে নিয়েছে আমি সেই সত্য

পালন করে গেছি। আপনি বলতে পারেন মিঃ সুইন হো—ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে নয়—মানুষ হিসাবে বলতে পারেন এ দাবী করা অন্যায় হয়েছে—

সাহেব বললেন, আমি সে কথা বলতে পারিনে মিঃ দত্ত—আমার বিচারে এরা দোষী বলে প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য আপনি দয়া করে যা করেছিলেন—।"

"দয়া নয়—কর্ত্তব্য পালন—"

রতন দত্তের কণ্ঠস্বর রুক্ষ হয়ে ওঠে।

সাহেব মেনে নিলেন সে কথা, বললেন, "কিন্তু কিইবা লাভ হল দত্ত।" এই যে এতগুলো লোক মরলো, এত লোক জখম হল, এতে কি ফল পেলেন আপনি ?"

রতন দত্ত উত্তর দিলেন, "ফল পেয়েছি কিন্তু সেটা আপনি বুঝতে পারবেন না, বুঝেছি আমি—সে সম্বন্ধে আমি আর কারও সঙ্গে কথা বলতে চাই নে মিঃ সুইন হো—"

সাহেব বিরক্ত হন না, বরং হাসেন :—"শুনুন, মিঃ দত্ত, আপনার উপর সরকারের সতর্ক দৃষ্টি আছে। আপনার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আজও গোপনে থেকে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অনেক কিছু করছেন। আপনার মা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জনতা পরিচালনা করেছিলেন, এ প্রমাণও আছে। কিন্তু সে সব সত্ত্বেও আপনি ছিলেন সরকারের বন্ধু, আপনার বিরুদ্ধে কোন রিপোর্টই আমরা এর আগে পাই নি। হঠাৎ এই যে ব্যাপারটা ঘটলো এটা একটা সাময়িক উত্তেজনা তা আমরা বুঝি, সেই জন্যই আপনার দণ্ডের পরিমাণও হয়েছে অত্যন্ত কম, আশা করছি বন্ধুভাবে আমায় দেখবেন, আমার কথা শুনবেন আর রাখবেন। ভবিষ্যতে আমি আপনাকে আমাদের হিতৈষীরূপে দেখতে পাব, এ আশা করছি।"

রতন দত্ত নিস্তব্ধ থাকেন।

সাহেব বললেন, "আপনার কিছু সম্পত্তি আপনি বন্ধক রেখে টাকা নিয়েছেন, কিছু সম্পত্তি গভর্ণমেণ্ট ক্রোক করেছেন। আপনি একখানা আবেদন পত্র পাঠাবেন গভর্ণমেণ্ট যা ক্রোক করেছেন আমি তার জন্যে বিশেষ করে চেষ্টা করব, আমি এ কথা দিচ্ছি।"

রতন দত্ত একটু হাসলেন—লোভ দেখাতে এসেছেন বৃটীশের একজন পদস্থ ব্যক্তি, লোভকে জয় করে চলেছেন রতন দত্ত, আজ জমিদারী শুধু নয়, রায়বাহাদুর খেতাবও তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর মনে হয়।

জেলের বাইরে আসতে প্রথমে অভিনন্দন জানালেন তাঁর বন্ধুবর্গ, তারপর ভারতী।

রতনমণি দত্ত বাড়ী ফিরলেন—

এক মাস আগে যেমন ছিল, আজও সব তেমনই আছে, কিছুরই পরিবর্ত্তন হয় নাই। বাড়ী ফিরবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ঘিরে ফেললে তাঁর প্রজারা। রাজাবাবু ফিরছেন জেনে তারা সব এসেছিল, তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা অনেকেই হারিয়েছে আত্মীয় পরিজন, কেউ কেউ হয়েছে বিকলাঙ্গ, তারা সবাই এসেছে।

ভারতী পিতাকে লক্ষ্য করে বললে, "এ রকম নির্য্যাতন এমন অত্যাচার আর কোনদেশে কখনও হয় নি বাবা। গরীব লোক সব, এরা তো কোন দোষ করেনি, নিজের দাবী শুধু জানিয়েছে। এর জন্যে এরা যথেষ্ট সয়েছে, এখনও আরও যে কি কপালে আছে তাই বা কে বলতে পারে।

বিমনা রতন দত্ত নিস্তব্ধে কতক্ষণ বসে থাকেন, উদাস চোখে জীর্ণ শীর্ণ লোকগুলির পানে তাকান—তারপর উদাস কণ্ঠে বললেন, "আজ তাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় ভারতী এরা এদের অদৃষ্ট সঙ্গে করে এনেছে, নিজের নিজের কর্ম্মফল তাই ভোগ করছে। শুধু ওরা নয় ভারতী, আমরাও ওদেরই পর্য্যায়ভুক্ত। ওরা স্বাধীন দেশে জন্মালে পারতো, অত্যাচারের প্রতিবাদ মুখ ফুটে করতে পারতো, এ রকম নির্য্যাতন ওদের সইতে হতো না। আমাদের কর্ম্মসূত্র টেনে এনেছে এই পরাধীন জাতির বুকে, আমরা শুধু সইব শুধুই সইব ভারতী।"

একটু থেমে একটা দম নিয়ে তিনি আবার বললেন,—"তাই ভাবি—হ্যাঁ, তাই ভাবি মা, কি দরকার এমন করে বেঁচে থাকবার—এর চেয়ে মৃত্যুও যে মহিমময়—শান্তিপ্রদ। যদি বাঁচতেই হয়—মানুষের মত যেন বাঁচতে পারি—সমগ্র জাতির এই যদি কামনা হয়, জয়যুক্ত হতে আমাদের কতটুকু সময় লাগবে ভারতী ?"

ভারতী উত্তর দিলে, "মোটেই সময় লাগবে না বাবা—দশজনের শক্তি গড়ে তোলে সংঘ, একজন সেখানে নিতান্ত তুচ্ছ। ঠিক কথা বলেছো বাবা, হয় জীবন নয় মৃত্যু—কিন্তু সে মৃত্যু হোক বীরের মত, পিঁপড়ের মত পায়ের তলায় দলে পিষে নয়। দেশের সকলকে ডাকাতে হবে বাবা—সকলকে জাগিয়ে তুলতে হবে—"

রতন দত্ত একটু হাসলেন, বললেন, "জাগবে কজন বল দেখি ভারতী? আজ দেশের পানে তাকিয়ে দেখতে পাই—আমরা আজ কোথায়—কক্ষভ্রষ্ট তারার মত আমরা অসীম শূন্যে দোলই খাচ্ছি শুধু—না আছে উর্দ্ধে উঠবার শক্তি, না আছে নিচে মাটির পৃথিবীতে নামবার ক্ষমতা। আমরা আজ ভাগ্যকেই দোষ দেই—তা ছাড়া আর কিই বা করবার আছে। আমরা জানি চিরদিন অধীনতাপাশে বদ্ধ হয়ে আছি, চিরদিন থাকবও, সইবো অত্যাচার, লাঞ্ছনা, উৎপীড়ন, সইবো পদাঘাত, বেত্রাঘাত, জেলের কষ্ট—"

তিনি চুপ করে যান, নিষ্পলকে অনির্দ্দিষ্টের পানে তাকিয়ে থাকেন।

ভারতীও খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললে—"কিন্তু ফিরতে হবে বাবা, ফিরাতে হবে। যুগ যুগ—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমরা সয়ে আছি লাঞ্ছনা অত্যাচার, এ কথা সত্য। হয় তো তখন বিচার-শক্তি ছিল না, দৈহিক শক্তি থাকলেও মন ছিল দুর্ব্বল; কিন্তু আজ আমরা মনের দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছি বাবা, বিচার আমরা করতে শিখেছি। কেবল বর্ত্তমান নিয়ে খুসি হতে পারছিনে, আমরা দেখছি দূর অতীতকে, আমরা দেখছি সম্মুখাগত ভবিষ্যৎকে। প্রাচুর্য্যের দিনে যা ভাববার প্রয়োজন হয় নি, আজ অভাবের মধ্যে পড়ে তার চেয়ে অনেক বেশী আমরা ভাবতে শিখেছি। আজ দেখেছি আমরা যার ভয়ে ভীত, সে অন্যায় আমাদের চেয়েও ভীরু। আমরা শক্ত হলে সে চলে যাবে আমাদের পথ ছেড়ে—কিন্তু যতক্ষণ আমরা ভয় পাব—ততক্ষণ সে আমাদের পথ রোধ করে ভয় দেখাবে, এ কথা ভুললে তো চলবে না বাবা—"

ক্লান্ত কণ্ঠে রতন দত্ত বললেন, "কিন্তু আজ আর নয় ভারতী, আমার এখন বিশ্রাম চাই সব ভার, সব দায়িত্ব তোর পরে ন্যস্ত করলুম মা,—আমি জানি তুই পারবি, সে শক্তি তোর আছে। তুই ডাক দে ওদের, যে চেতনার অঙ্কুর উদ্গম হয়েছে, তাকে যত্ন করে কেবল বাঁচিয়ে রাখাই নয়,—যাতে সে অঙ্কুর মস্ত বড় বৃক্ষে পরিণত হয়, সে কাজ তুইই করবি ভারতী।"

ভারতী পিতার পায়ের ধুলা মাথায় দিলে, আর্দ্র কণ্ঠে বললে, "আমায় সেই আশীর্ব্বাদ কর বাবা, আমার ঠাকুর মা, তোমার মা তাঁর আরব্ধ যে কাজ ফেলে চলে গেছেন, আমি তোমার আশীর্ব্বাদে সে কাজ করতে পারব।"

রতন দত্ত তার মাথায় হাত রাখেন,—"পারবি, হ্যাঁ, পারবি ভারতী, তুই যে আমার সেই মায়ের প্রতিচ্ছবি, আমার মায়ের তেজদর্প, জ্ঞান বিচারশক্তি আছে তোর মধ্যে, ব্যর্থ তুই হবি নে। তোর জীবনে সফলতা না আসুক, এগিয়ে যাওয়ার যে প্রেরণা দিয়ে যাবি, সেই প্রেরণা জাগবে আরও একশো জনের মধ্যে,—এমনি করে লাখ লাখ, কোটি কোটি নরনারী জাগবে মা ভারতী,—।"

পদ্মদহের ওধারটায় গড়ে উঠছে মস্ত বড় কারখানা অঞ্চল,—পদ্মদহের মাটি ভরাট করে জমিতে উঠছে ঘর বাড়ী, তৈরী হচ্ছে পথ কারখানাগুলি, কোন বৃটীশ কোম্পানীর; ম্যাকিন্টশ সাহেব জেনারেল ম্যানেজার হয়ে এসেছেন, সব দেখাশোনা করছেন।

কণ্ট্রাক্ট নিয়েছে মধুসূদন দাস।

চিরদিন এই জমিদার বাড়ীতে মানুষ হয়েছে সে, মহেশ্বরীর কাছে চিরদিন মাতৃস্নেহ পেয়েছে—তাঁর অনুগ্রহে ম্যাট্রিক পাস করে কণ্ট্রাক্টরী কাজ শিখেছে।

সূদন যখন সাহেব কোম্পানীর পক্ষ হতে কাজ নিয়ে এলো, তখন গ্রামের লোক আশ্চর্য্য হয়ে গেল, কেউ কেউ নিষেধ করেছিল—প্রতিপালকের বিরুদ্ধে কাজ করা তার পক্ষে ধর্ম্ম সঙ্গত নয়—এ কথা স্পষ্ট বলেছে।

হেসে উড়িয়ে দিয়েছে সূদন। অর্থের কাছে বাপ মা পর্য্যন্ত ছোট হন,—প্রতিপালক তো পরের কথা। কিন্তু সে কথা সে বলেনি, সে জানিয়েছে, আজ সে না কাজ করলেও অপরে করবে। সাহেব যখন ঘর বাড়ী পথ

ঘাট তৈরী করাবেই, সে না করলেও অন্য লোক নিয়ে করাবে ; তবে সে কেন পয়সা উপায় ছাড়বে ?

আশ্চর্য্য হন নি রতনমণি দত্ত, ঠেকে ঠেকে তাঁর অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে। তিনি জানেন তাঁর অনেক ত্রুটি মধুসূদনই ব্যক্ত করেছে, প্রতিপালকের সর্ব্বনাশ করে সে নিজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়, মানুষের স্বভাবজ প্রবৃত্তি,—জগতে দেনা তারা রাখতে চায় না, অপকার করে উপকারীর দেনা শোধ করে, আজ যে হাঁটু ধরে দাঁড়াবে, কাল সে বুকে ছুরি বসাবে এ কথা সবাই জানে।

তিনি বেশ জানেন সূদন বিভীষণের কাজ করেছে। তাঁর বিচারের দিনে সূদন যখন সরকারপক্ষে সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেদিন রতন দত্ত কেবল একটু হেসেছিলেন।

সূদন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে মত তার অতি উদার, ইচ্ছামত সে স্বার্থের জন্য যে কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করতে পারে, তাতে সে এতটুকু ইতস্ততঃ করবে না। নগর তৈরী করবার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে মিশনারী সম্প্রদায় —ফাদার রবীন এসেছেন, তাঁর সঙ্গে আছেন আরও জনকত পাদরী, ভারতীয় খৃষ্টানও কতজন আছে।

রতনমণি দত্ত অধর দংশন করেন।

কে কোন রকমে হোক—এরা ধর্ম্ম প্রচার করবে। রাজকীয় ধর্ম্ম—প্রলোভন আছে অত্যন্ত বেশী, নিরক্ষর লোকদের ঠেকিয়ে রাখা মুস্কিল হবে। তারা পাবে আহার্য্য, পাবে বসন, অর্থসাহায্য তারা জানে না—ধর্ম্মান্তর হলেও তাদের অভাব কোনদিন ঘুচবে না, কিন্তু সে সব তাদের বুঝাবে কে ? চাকচিক্যের মোহে পড়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে নবধর্ম্মের স্রোতে, ভেসে যাবে তৃণের মতই।

"এদের বাঁচাতে হবে ভারতী—"

একান্ত অসহায় ভাবে তিনি ভারতীর পানে তাকান "এই স্রোতে পড়ে এরা ভেসে যাবে যে—"

ভারতী গম্ভীর মুখে উত্তর দেয়, "কি করব বাবা, উপায় যে নেই।"

"উপায় নেই—কোন উপায় নেই ?"

রতন দত্ত শূন্য চোখে কন্যার পানে তাকান—ভারতী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, "পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম যারা এক কথায় ত্যাগ করতে পারে, তাদের ফিরিয়ে আনা বড় শক্ত ব্যাপার বাবা।"

মধুসূদন খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে, গ্রামের অশিক্ষিত লোকেরা দেখছে তার উন্নতি, তার পোষাক। সূদন সাহেব হয়ে গেছে, সে স্যুট পরে, মাথায় হ্যাট পরে, মস মস করে বুট জুতা ঠুকে হাঁটে। সূদন পাইপে লাগিয়ে সাহেবী কায়দায় সিগারেট খায়, সাহেবী ধরণে হাসে, কাশে, পথ চলে। সকলে চমৎকৃত হয়।

রতন দত্ত দিব্যচক্ষে দেখতে পান—এরা ভেসে চলেছে, এদের গতি রোধ করবার শক্তি তাঁর নাই।

আকাশ হয়ে গেছে পরিষ্কার—

শীতের ধূমাচ্ছন্ন আকাশ আজ সুনীল রং ফিরে পেয়েছে, সেই নীল আকাশে সূর্য্য ওঠে, চাঁদ ওঠে, লক্ষ তারা ঝিক ঝিক করে। গাছে গাছে সবুজ পাতা বার হয়, ফুল ফুটে ওঠে,—পথ হারিয়ে মধুপদল ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়।

বসন্ত কাল এসেছে, ফাল্গুন চলে গেছে, চৈত্র মাসের উদাস বাতাস বইতে সুরু করেছে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে সামনের শিমূল গাছটার পানে তাকিয়ে ভারতী হঠাৎ চমকিত হয়ে ওঠে। লাল ফুলে ভরে উঠেছে গাছটি—আশ্চর্য্য সে রং, চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। এত দিন আছে ভারতী, আছে শিমুল গাছ, তাতে ফুল ফোটে, ফলও ধরে, ফলগুলি পরিপুষ্ট অবস্থায় ফেটে তুলা ছড়ায় চারিদিকে। কোনদিনই ভারতী এ গাছের দিকে তাকায়নি, কোন দিন দেখতে পায় নি—বসন্তে কি সমারোহ পড়ে যায় এই শিমুল গাছটিতে।

অতি ক্ষুদ্র আকাশের একটী পাখী লাল ফুলের পাঁপড়ির উপর ঘুরে বেড়ায়, হালকা দেহ নিয়ে নানারঙ্গে নৃত্য করে।

কত পাখী আসে, কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া—কত পাখীর নাম জানা, কত আছে অজানা।

ভারতী তাদের খেলা দেখে, তাদের গান শোনে।

আর এই কয়টা দিন পরে সে এই ফুল, পাখীর কলগীতি সব পিছনে ফেলে চলে যাবে পিতাকে নিয়ে কলকাতায়, ভেসে পড়বে স্রোতের মুখে কুটোর

মত। কে জানে আর সে এ বাড়ীতে আসতে পারবে কি না।

নিজের জন্ম রতন দত্ত কোনদিন ভাবেন না, নিজের ভবিষ্যতের চেয়ে অক্ষমতার বেদনাই তাঁকে চিন্তিত করে তোলে—পীড়ন করে বেশী। তিনি আর এখানে একটা দিনও থাকতে চান না, এখান হতে সরে যেতে চান। সরকারের অনুশাসনগুলি প্রত্যেকটা মেনে নিয়ে তাঁর মত লোকের এখানে থাকা অসম্ভব।

গভর্ণমেণ্টের আদেশপত্র পৌঁচেছে,—ব্যাঘ্রকে ভুলে যেতে হবে হিংসা প্রবৃত্তি, তাকে অতি শান্ত হতে হবে। জমীদার নামটা তাঁর থাকবে কিন্তু জমীদারী সংক্রান্ত কোন কাজে তিনি হাত দিতে পারেন না, কোন প্রকার ভালো-মন্দের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক থাকবে না, নিজের বাড়ীতেই তিনি থাকবেন,—তাঁর খরচপত্র বাবদে গভর্ণমেণ্ট মাস গেলে একটা মোটা রকম টাকা দিয়ে দেবেন।

রতন দত্তের মুখে হাসি দেখা যায়—

"শুনলি শুনলি ভারতী, গভর্ণমেণ্ট আমায় অন্তরীণ করছেন নিজের বাড়ীতে, আমার ঘরখানাকেই তিনি জেলখানা করে ফেললেন—"

তাঁর চোখ দুইটা আগুনের মত জলে—।

ভারতী আদেশপত্রখানা পড়ে রেখে দেয়, কোন কথাই সে বলে না।

বলবেই বা কি,—সে জানে এ রকম ব্যবস্থা একটা হবেই, যা সাধারণতঃ হয়ে আসছে। নিত্যকার কাগজ-পত্রে সে পড়ছে, লোকের মুখে গল্প শুনছে। তবু অনেক সৌভাগ্য গভর্ণমেণ্ট তার পিতাকে অন্য কোথাও আটক করতে চান নি, নিজের ঘরে থাকবার অধিকার দিয়েছেন।

কলকাতার বাড়ীতে চলে যেতে চান রতনমণি দত্ত। এখানে হাত পা বদ্ধ অবস্থায় থাকতে তিনি পারবেন না। যেখানে একদিন নিজ ক্ষমতায় দৃপ্ত হয়ে স্বেচ্ছামত তিনি বেড়িয়েছেন, স্বেচ্ছামত কাজ করেছেন, সেখানে তিনি পরের দয়ার উপর নির্ভর করে থাকতে পারবেন না, এ অবস্থায় থাকার চেয়ে মৃত্যু ভালো। তাঁর সকল স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে তাকে সম্পূর্ণ পরের উপর নির্ভর করে, থাকবার আদেশে তিনি দৃপ্ত হয়ে ওঠেন, কিন্তু উপায় কই?

আপনার ঘরে আপনি বন্দী—

তিনি গভর্ণমেণ্টের কাছে জানিয়েছেন—গ্রামে তিনি থাকবেন না, কলকাতায় নিজের বাড়ীতে থাকতে চান।

তবু অনেক ভালো।

এখানে প্রজারা তাঁর অবস্থা বুঝবে না, তারা দুঃখের প্রতীকারের জন্ম হাত যোড় করে এসে দাঁড়াবে আবার তাঁরই কাছে, সে কল্পনাও যেন আসে।

তার চেয়ে জনবহুল কলকাতা লক্ষগুণে ভালো।

পাশের বাড়ীর লোক পাশের বাড়ীর লোককে চিনবে না, আবেদন করতেও কেউ আসবে না।

কলকাতায় মস্ত বড় বাড়ী, কিন্তু সে বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর খুব কম। বাড়ীর আশেপাশে যাঁরা বাস করেন, তাঁদের সঙ্গে পরিচয় তাঁর নাই বললেও চলে।

ঘরের মায়া, ভিটের মায়া কাটানো বড় শক্ত। কাটিয়ে চলে যাওয়ার কল্পনাও অসহ্য।

পিতৃপুরুষের স্মৃতি জড়ানো ভিটে, এই গ্রাম—শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন রতন দত্ত। অন্তর অন্তরের মধ্যে আছাড় খায়, ক্ষুব্ধ সিন্ধু উদ্বেল হয়, কিন্তু কূল ছাপিয়ে বার হতে পারে না। দুটি চোখ থাকে শুষ্ক—সম্পূর্ণ শুষ্ক।

চৈত্র সংক্রান্তি আসছে।

বৎসরের শেষ মাস—আসছে গাজন উৎসব। তাই উৎসবটা শেষ বারের মত শেষ করে দিয়ে রতন দত্ত যেতে চান। একে একে সব পালা তিনি শেষ করেছেন, বৎসরের শেষ পালাটাই বা বাকি থাকে কেন?

এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ উৎসব এই চড়ক। চড়কের জন-শ্রুতি এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। পনেরো কুড়িদিন আগে হতে মেলা বসতে সুরু করে চড়কের পরেও পনেরো কুড়ি দিন এ মেলা থাকে—দেশ বিদেশের পরিচিত অপরিচিত বহু লোককে গ্রামে দেখা যায়।

গোবিন্দজীর মন্দিরের পাশে বুড়ো শিবের মন্দির—সামনে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। এই মাঠে চড়কের কত আগে হতে সারি সারি গড়ে ওঠে হোগলার কুঁড়ে, দোকানিরা স্থায়ীভাবে একমাস দেড় মাসের মত দোকান সাজায়। এবার ওবার দু' পাঁচটা হোটেল দেখতে পাওয়া যায়, আর বেগুনি ফুলুরী পাঁপর ভাজা এবং খাবারের

দোকানের অন্ত থাকে না। যাত্রা, কথকতা, কবির গান, ঝুমুর দল আসে, ম্যাজিক, সার্কাস, সাপের খেলা প্রভৃতি আনন্দ জনক বহু খেলা আসে—এক মাস দেড় মাস এখানে চলে নিত্যোৎসব।

গোবিন্দজীর মন্দিরের পাশে বুড়ো শিবের মন্দির, দোলের সময় যেমন দুইটী মন্দিরই উৎসব সজ্জায় সজ্জিত হয়, চড়কের সময়ও তেমনই হয়।

এবার রতন দত্ত নিজে কিছুতেই হাত দেন নি—ভারতী নিজে এ ভার নিয়ে পিতাকে রেহাই দিয়েছে। পিতা কেবল বলে দিয়েছেন, "খরচপত্র বুঝে কোর মা, তোমার বাবা এবার দেউলের খাতায় নাম লিখিয়েছে মনে কোর—।"

ভারতী হাসতে যায়, কিন্তু হাসতে গিয়ে চোখ ছাপিয়ে জলই ঝরে পড়ে। চোখ মুছে আর্দ্রকণ্ঠে সে বলে, "আমি তা জানি বাবা, সব দিক দিয়েই খরচ কমিয়েছি, কেবল দরিদ্র নারায়ণের সেবাটা অন্তবারের মত এবারেও চালিয়ে দেব বাবা—।"

দলে দলে এসেছে দরিদ্রেরা—যেমন ফি বৎসর তারা আসে। এদের গোষ্ঠির দিকে তাকিয়ে ভারতীর মুখ শুকিয়ে ওঠে, মনে মনে সে হিসাব করে এ কয়দিনে কত খরচ পড়বে।

নবদ্বীপ হতে এসেছে প্রতি বৎসরকার মত কীর্ত্তনীয়া দল, এদের এবার খরচ দেওয়া হয় নি—না দিলেও তারা নিয়মিত ভাবে এসেছে। তারা জানে না রতন দত্ত এবার কি অবস্থায় গাজন উৎসব শেষ করবেন।

এই সব অভ্যাগতদের পানে তাকিয়ে ভারতী ভাবে চালাতে পারবে তো সে ?

মামলা মোকর্দ্দমায় সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন তার পিতা—কোনক্রমে শেষবারের মত তিনি পিতৃপুরুষের আচরিত গাজন উৎসবটা সেরে নিতে চান। কে জানে আগামী বৎসর এদিন তিনি পাবেন কি না—হয় তো এই তাঁর শেষ উৎসব করা।

হাতে টাকা থাকলে তিনি এবার শুধু উৎসব নয়, মহোৎসব লাগিয়ে দিতেন। কিন্তু সব ফাঁক হয়ে গেছে, ব্যাঙ্ক প্রায় শূন্য, সামান্ত কয়েক হাজার টাকা আছে মাত্র, ভারতীর জন্ত এ টাকা থাকবে। মায়ের জড়োয়া গয়না-গুলির মধ্যে দু'তিনখানি আজও আছে, যক্ষের মত এ কয়খানি তিনি আগলে আছেন—ভারতীর এ গহনা থাকবে।

মামলা মোকদ্দমা চালাতে—যারা জেলে গেছে—যারা আহত বা নিহত হয়েছে তাদের পরিবারবর্গকে সাহায্য করতে তিনি নিজের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

ভারতী হিসাবপত্র দেখে।

গত বৎসর এই গাজনের উৎসবে বড় কম টাকা খরচ হয় নি, হাজার পঁচিশেক তো বটেই, বেশী ছাড়া এক পয়সা কম হয় নি।

আর এবৎসর —?

কত কমানো যায়—?

মেলায় আয় নাই, ব্যয় আছে। আগেকার দিনে পূর্ব্ব পুরুষেরা অত্যন্ত উদার ভাবে এই মাঠটি মেলার উদ্দেশ্যে বিনা সেলামিতে ছেড়ে দিয়েছেন। তখন দেওয়া সম্ভব ছিল, প্রাচুর্য্যের মধ্যে উদারতা দেখানো অসম্ভব নয়। কিন্তু এখনকার দিনে এই অপ্রাচুর্য্যের মধ্যে উদারতা দেখানো সম্ভব নয় বলেই মানুষ হয়েছে স্বার্থপর, সঙ্গে সঙ্গে এসেছে তার মধ্যে রুক্ষতা, কাঠিন্ত।

উপায় নাই—উপায় নাই। চিরদিন যা চলে এসেছে আজও তাই চলবে। মেলার স্থানের জন্ত আজও জমীদার সেলামী নিতে পারে না, অতখানি ছোট সে হতে পারেনা। হিসাব দেখতে এবং হিসের করতে ভারতী গলদঘর্ম্ম হয়ে ওঠে।

আস্তে আস্তে খাতাখানা সে বন্ধ করে—নাঃ, এবারেও যেমন করেই হোক আগেকার মত উৎসব করতেই হবে।

বাইরের ফুলভরা শিমুলগাছটার পানে সে তাকিয়ে থাকে।

আঠার

নিতান্ত অসময়ে রতন দত্ত ডেকে পাঠালেন ভারতীকে—এখনি দরকার—বিশেষ দরকার।

হিসাব করা স্থগিত রেখে ভারতী উঠলো।

বৈঠকখানা ঘরে তাকিয়া ঠেস দিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত মুখে রতন দত্ত বসে আছেন, ঘরে আর কেউ নাই। ভারতী পর্দা সরিয়ে প্রবেশ করতে তিনি অন্যমনস্কভাবে তার পানে তাকালেন।

"কি হয়েছে বাবা, এমন কি দরকার পড়েছে?"

ভারতী জিজ্ঞাসুনেত্রে পিতার পানে তাকায়।

রতন দত্ত একটু হাসবার চেষ্টা করলেন; স্মিত কণ্ঠে বললেন, "হাকিমের জবরদস্তী হুকুম এলো ভারতী এবার এখানে মেলা বসতে পারবে না। হুকুম মত আমাকে এ মেলার আয়োজন এখনই বন্ধ করে দিতে হবে।"

"তার মানে, আমি কিছু বুঝতে পারছিনে বাবা—" ভারতী বিস্ময়পূর্ণ চোখে পিতার পানে তাকায়।

রতন দত্ত উত্তর দিলেন, "মানে বোঝা তো বিশেষ কঠিন নয় মা—সরকারী হুকুম—যার নাম ট্রিস্ট্রিক্ট অর্ডার—এই মুহূর্ত্তে মেলার আয়োজন বন্ধ করে দিতে হবে। এই মুহূর্ত্ত হতে এখানে ১৪৪ ধারা জারী হল, পাঁচজন যেন একত্রিত হতে না পারে।"

ভারতী নিস্তব্ধ হয়ে থাকে।

রতন দত্ত আপন মনে বলছিলেন, "আইনের প্যাঁচ কথাটা ওদের কাছে অত্যন্ত সোজা, কিন্তু যারা আদেশ পালন করে—শক্ত হয়ে ওঠে তাদেরই কাছে, এই প্যাঁচ গলায় এমন কষতে থাকে যাতে না মরেও মানুষ মরার অধম হয়ে থাকে। চির পরাধীন যে জাতি, তাদের আবার মান-মর্য্যাদা, তাদের আবার আত্মসম্মান—"

বলতে বলতে তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন—"কিন্তু এমনভাবে পড়ে মার খাওয়ার চেয়ে একেবারে মৃত্যু ভালো,—আমার অস্তিত্ব লোপ হয়ে যাওয়া ভালো। আজ ভাবছি ভারতী, সেই রতনমণি দত্ত আমি—আমি কি বেঁচে আছি—?

ভারতী পিতার মুখের দিকে তাকায়—অত্যন্ত করুণ কাতর দৃষ্টি তার চোখে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন রতন দত্ত, তারপর হাসেন, সে হাসি কান্নারই রূপান্তর মাত্র—

"আমাদের গভর্ণমেণ্ট খবর পেয়েছেন এই মেলা উপলক্ষ করে চলবে বে-আইনি সভা, লেকচার, অনেক চেষ্টায় তাঁরা সাধারণকে শান্ত করেছেন, সেই সাধারণকে আবার ক্ষেপিয়ে তোলা হবে। এই সব বন্ধ করবার জন্যেই তিনি জরুরী আদেশ পাঠিয়েছেন। এই আদেশের পেছনে আছে আর্ম্ম ফোর্স তারা এ দেশের লোক নয়, তারা সাদা চামড়ার মানুষ, দয়া মায়া মমতা তাদের মধ্যে নেই, তারা যা খুসি করে যাবে। এরা মেলা বসতে দেবে না, মেলা ভেঙ্গে দিতে এসেছে।"

"ভেঙ্গে দিতে এসেছে—"

অকস্মাৎ ভারতীর স্তম্ভিত ভাব দূর হয়ে যায়, তার মুখখানা শক্ত হয়ে ওঠে; রুদ্ধ কণ্ঠে সে বললে, "কিন্তু এই বা কোন আইন অনুমোদিত হবে বাবা? যুগ যুগ ধরে—কত শতাব্দীর পর কত শতাব্দী ধরে এখানে এই গাজন উৎসব হয়ে আসছে, এ পর্য্যন্ত কেউ বাধা দিতে পারে নি, বাধা দেয়ও নি। আজ না হয় পৌনে দুশো কি দুশো বছর বৃটিশ এসেছে, কায়েমী ভাবে রাজ্য গড়েছে, কিন্তু তার আগেও মুসলমান রাজত্ব ছিল, তখনও হিন্দুর প্রচলিত পূজা, নানারকম নিয়ম—সবই তো চলতো, আজ ইংরেজ রাজত্বে সেই পূজা বন্ধ হবে, সেই মেলা বন্ধ করতে হবে? বিদেশী শাসক আমাদের চিরাচরিত নিয়ম ভাঙতে এগিয়ে আসে কোন অধিকারে বাবা—?"

"অধিকার—"

রতন দত্ত এবার সত্যই হাসেন, "অধিকারের কোন মাত্রা থাকে না ভারতী, জোর ক'রে দখল করলেই হ'ল, কবি বলেছেন—কেবল আমি[illegible] আমাদের দেহই নয়, আমাদের কণ্ঠ ও শাস[illegible] আমাদের মন পর্য্যন্ত শাসনের ফলে নিয়ন্ত্রি[illegible] সবই রেগুলার, ই-রেগুলার বলে কোন [illegible] অভিধানে নেই। পাছে হয় তাই সদাশ[illegible] এখানে জনসমাবেশ বন্ধ করবার হুকুম দিয়ে[illegible] এসেছে তাদের আবার নিজ নিজ জায়গায় [illegible] হবে।"

উত্তেজিত কণ্ঠে ভারতী বললে, "এ আদে[illegible] আগে দিলেও চলতো বাবা, আমরা এ[illegible] যেতুম না। আজ সব তৈরী, হাজার [illegible] তাদের পণ্য নিয়ে এসেছে কত দূর দূর দেশ[illegible]

তাদের ফিরতে বললেই তারা ফিরতে পারে? আমরা আজ এ হুকুম মানতে পারি নে, শাসনযন্ত্রের তলায় এমনভাবে নিজেদের বলি দিতে পারব না বাবা—"

রতন দত্ত মাথা নাড়েন, "পারবে না ভারতী, কিছুই পারবে না। অস্ত্র হাতে মিলিটারীদের দেখে মেলায় যারা এসেছে তারা রীতিমত ভয় পেয়েছে, তাই নিজের নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে, তারা সব চলে যাবে। এ-দেশের লোকে সরকারী লোকদের শান্তিরক্ষক নাম দিলেও আমরা জানি শান্তিভঙ্গ যদি কেউ করে—এরাই করে, সাধারণ লোকে করে না। এদের কেবল লাঠিই নেই, আছে রিভলভার, ছোড়া, তলোয়ার, তা' ছাড়া আছে লোহার শিকল, আছে শাসন—জেলখানা। ওদের আইন ওদের মুখের কথা ভারতী—।"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তিনি খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকেন, তারপর বললেন, "ওদের কাছে দোষী নির্দ্দোষ নেই, স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা নেই, বয়সের বিচার এরা করবে না। একটু এদিক ওদিক করলে স্পষ্ট ঘোষণা করবে বিপ্লবী, সত্য কথা বলতে গেলে মুখ চেপে ধরবে, চারিদিক ঘেরাও করবে, ছারপোকার মত টিপে টিপে মারবে—এই ওদের আইন, এই রাজার শাসন—বিচার।"

ভারতী মাথা নাড়ে, "কিন্তু ভয় দেখিয়ে জয় করার স্থায়িত্ব কতটুকু সময় বাবা—?"

…তন দত্ত হাসলেন, বললেন, "যতটুকুই হোক না— … ভাবছে কে—সে কাজ করছেই বা কে? এ ভয় … কেবল মুখের কথায় নয়, হাতে কলমে ওরা কাজ …। দশজন মরুক, হাজার জন সামলে চলুক, …য়ে ক'রে থাক, এই তো ওদের উদ্দেশ্য। … এ বিপ্লবের আশঙ্কা কোনদিনই করে নি, এমন … শান্ত জাতি—যারা লাথি খেয়ে মরে, তারা … জীবনপণ ক'রে দাঁড়াতে পারে—তা ওরা …তে পারে নি। আজ ওরা দেখছে মূক আজ …ছে, দুর্ব্বল বাহু অলক্ষ্যে শক্তি সঞ্চয় ক'রেছে। … ঠেকিয়ে রাখা চলবে না, আফিংয়ের নেশায় … চলবে না। গণশক্তি আজ জেগেছে,— …সুরিক বলে এদের পিষে মারবার চেষ্টা ক'রেছে কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। শাসক আজ যা কিছু বে-আইনী ব'লে ঘোষণা ক'রেছে, জনসাধারণ ঠিক সেই বে-আইনীই ক'রে চ'লেছে। ওরা বুকে বাঁশ দিয়ে ডলবে—ডলুক, বেত্রাঘাত করবে, করুক, জেলে পাঠাবে ফাঁসিতে ঝুলাবে, সে সব শাস্তি নেওয়ার জন্যে আজ দেশবাসী প্রস্তুত। করুক ওরা অত্যাচারের পর অত্যাচার, শ্মশান হয়ে যাক সারা দেশ, সেই শ্মশানে জাগবেন নারায়ণ, শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী সকল কলুষ হরণ করতে আসবেন ভারতী, তিনি নিশ্চয়ই আসবেন। যুগে যুগে যখন অধর্ম্মের স্রোত বয়ে যায়, মানুষ যখন তলিয়ে যায় অত্যাচারে অত্যাচারে, জনগণ মূর্চ্ছাহত হয়ে পড়ে, তখন তাদের শক্তি দিতে আসেন তিনি—বরাবর যিনি আসছেন।

গভীর ভাবাতিশয্যে রতন দত্ত চুপ ক'রে যান—তাঁর বড় বড় চোখ দুটী মুদে আসে—

ভারতী পিতার ধ্যানমগ্ন মুর্ত্তির পানে তাকিয়ে থাকে—

খানিক পরে সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়।

রতন দত্ত বুঝতে পারেন, তবু জিজ্ঞাসা করেন, কোথায় যাচ্ছিস ভারতী?"

ভারতী উত্তর দেয়, "একবার মেলার অবস্থাটা স্বচক্ষে দেখে আসি বাবা—"

শঙ্কিত কণ্ঠে রতন দত্ত বললেন, "না, গিয়ে দরকার নেই। মিলিটারী গোরার দল এতক্ষণ এসে প'ড়েছে, তারা সব কিছু দেখে বেড়াচ্ছে,—যদি কিছু বলে—"

ভারতী মুখ তোলে, দৃঢ়কণ্ঠে বললে, "অতখানি সাহস হয়তো তাদের হবে না বাবা—"

"হবে না—"

রতন দত্ত বড় বেদনায় হাসেন—"ভুলে যাচ্ছিস কেন ভারতী, এই তো কালও সংবাদ-পত্রে বার হয়েছে, মেয়েদের ইজ্জত এরা রাখে নি—রাখবে না। বিপ্লবের মধ্যে যে মেয়েরাও যোগ দিয়েছে তা তারা জানে।"

ভারতী বললে, "জানি বাবা,—যদি তারা কিছু বলে—আমি জিজ্ঞাসা করব কেন তারা এলো, কেন এই দশ হাজার লোকের মেলা তারা ভেঙ্গে দিচ্ছে।"

আবার হাসেন রতন দত্ত—

"হুকুমের চাকর তারা, যে হুকুম আমার উপর এসেছে, সেই হুকুম তারাও পেয়েছে, হুকুম তামিল করতে তারা এসেছে মাত্র, আজ তুমি ফিরতে বললেই তারা ফিরবে কেন?"

ভারতীর ভ্রূকুঞ্চিত হয়, সে বললে,"মেলা আমি বসাবই বাবা,—মিটিং কিছু করতে দেব না, কেবল মাত্র মেলার জন্তই মেলা হবে, তা হলে তো আপত্তি তুলবার আর কোন কারণ থাকতে পারবে না।"

রতনদত্ত বললেন, "কিন্তু ওরা কি থাকবে—যারা জিনিষপত্র বিকিকিনি করতে এসেছে?"

ভারতী বললে, "জোর করে তাদের থাকা দরকার। আমি জনে জনে সেই কথাই বলব বাবা—মিলিটারী এসেছে আসুক, নিঃসঙ্কোচে এরা নিজের কাজ করে যাক, মিলীটারীর ভয়ে চিরকালের নিয়মের তারা ব্যতিক্রম করে কেন? ওরা যাও বললেই এরা যাবে,—এদের এতটুকু সাহস নেই?"

বিকৃত মুখে রতন দত্ত মাথা নাড়লেন—না,—এরা নেহাৎ সংসারী মানুষ, কোন রকমে দুটী খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে চায়, বড় হওয়ার নাম করার দুরাকাঙ্ক্ষা এদের নেই।

ভারতী বললে, কিন্তু এরাই যুদ্ধের সৈনিক বাবা—এরাই করবে প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ, সেটা তো অস্বীকার করা চলে না একদিন—যদি বেঁচে থাকো বাবা, দেখতে পাবে,—এরাই চলবে সকলের সামনে এগিয়ে। সেই সাহস আর সেই শক্তি যে এদের মধ্যে আছে, তা এরা নিজেরাও জানে না; ওদের জানাব আমরা—ওদের চেতনা জাগিয়ে দেব—ওরা যে কতখানি শক্তিশালী—সেই শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তুলবার ভার নেব আমরা। আমি যাই বাবা, দেখি ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারি কিনা।

সে দ্রুত বার হয়ে গেল

কন্যার স্বাধীন সত্তা পিতা কোনদিনই খর্ব্ব করতে চাননি, আজ বিপদের আশঙ্কা করেও পারলেন না।

চিন্তিত মুখে বারান্দায় এসে রেলিং ভর দিয়ে দাঁড়ালেন।

অদূরে দেখা যাচ্ছে মেলার স্থান হোগলায় ছাওয়া বহু কুটীর উঠেছে চারিদিকে, ছেলেপুলেদের ঘুরবার জন্য কতকগুলো নাগরদোলা এসেছে। এত দূর হতেও দেখা যায় কয়েকটা গোড়া সেই নাগরদোলায় উঠেছে, দোলার মালিক সজোরে তাদের হুকুম তামিল করছে।

তার খানিক দূরে একটা সার্কাস পার্টির তাঁবু খাটানো হয়েছে, প্রতিদিন এখানে খেলা চলছে, লোকও জমছে বড় কম নয়।

তার একদিকে এসেছে নবদ্বীপের কৃষ্ণদাস বাবাজীর কীর্ত্তনের দল—তারাও কয়েক দিন হতে কীর্ত্তন সুরু করেছে, সেখানেও লোক জমছে বড় কম নয়।

এই মেলা ভেঙ্গে দিতে হবে—ম্যাজিষ্ট্রেটের কড়া হুকুম এসেছে।

রতন দত্তের উপর গভর্ণমেণ্টের সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ। এই মেলায় দেশ বিদেশ হতে হাজার হাজার লোক আসছে, এদের মধ্যে বিপ্লবের বাণী প্রচার করা সহজসাধ্য। একমাস সরকারের অতিথিরূপে জেলে বাস করলেও তিনি একজন বিপ্লবী ছাড়া আর কিছু নন এবং আজও তিনি সেই বিপ্লবীই থেকে গেছেন অর্থা

রতন দত্ত বুকের উপর হাত দুখানা আড়াআড়ি সংস্থ রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ান। হয়েছে।

বয়স আজ তাঁর অনেক, চল্লিশের কিছু পাসের পয়তাল্লিশ হতে চলেছে, বার্দ্ধক্য বা র গভর্ণমেণ্ট তাঁকে আক্রমণ করতে পারে নি, আজও রছেন, যারা শির। ফিরে যেতে

জীবন অথবা মৃত্যু, এস্পার বা ওস্পার, গর্জ্জন করেন।

ণ মাসখানেক
দূরে এগিয়ে
হাজার লোক
হ'তে, আজ

কুতব মিনার

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

নানা দেশে নানা ধরণের অট্টালিকা তৈরী হয়েছে। ও গুলোর গঠন চাতুর্য, সূক্ষ্ম কারুকার্য, অপরূপ ভঙ্গী মানুষের মনকে আকর্ষণ করে, কারণ ঐ সব অট্টালিকা এক-একটা বিস্ময়। কুতব মিনার ঐ ধরণের বিস্ময়কর সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম। মিনার জাতীয় অট্টালিকার মধ্যে একে অদ্বিতীয় বলা চলে। জেমস ফার্গুসন বলেছেন, "কাইরোর হাসেনের মসজিদের মিনারটির সৌন্দর্যখ্যাতি রয়েছে। কিন্তু গঠন সৌকর্য আর পরিপূর্ণতার দিক থেকে ওর সঙ্গে কুতবের কোন তুলনাই হয় না। কুতব অনেক অনেক সুন্দর। শুধু ঐ মিনারটিই নয়, সমস্ত পৃথিবীতে ঐ ধরণের যত অট্টালিকার খবর আমার জানা আছে, তার মধ্যেও কুতব অপ্রতিদ্বন্দ্বী।" ফার্গুসনের এই প্রশস্তি আদৌ অতিশয়োক্তি নয়। কুতবের গঠন, এর বহির্দেওয়ালের কারুকার্য, এবং এর উন্নতশীর্ষ ভঙ্গিমা সত্যি অপূর্ব। এর গঠনে কোন ত্রুটি আছে বলে মনে হয় না। সুগঠিত, সুসজ্জিত এবং সুন্দর এই মিনারটি। কুতব সত্যি জগতের অন্যতম বিস্ময়, ভারতের গর্বের বস্তু।

এই বিস্ময়কর কুতবের উচ্চতা হল ২৩৮ ফিট। এটি পাঁচটি তলায় বিভক্ত। নীচ থেকে একদম উপরে উঠতে গেলে পেরুতে হয় ৩৭৮টি সিঁড়ির ধাপ। মিনারের ভিত্তি-ভূমির ব্যাসরেখা হচ্ছে ৪৭ ফিট ৩ইঞ্চি পরিমাণ। ঐ ব্যাসরেখা কমতে কমতে সর্বোচ্চ তলায় দাঁড়িয়েছে ৯ ফিটে। এই আনুপাতিক ব্যাসরেখা হ্রাসের ফলে বাইরে থেকে মিনারটিকে অপূর্ব দেখায়। তা ছাড়া মিনারটির বহির্গাত্রের গড়ন ও কারুকার্যও মনোহর। বহু-কোণিক -ক্ষেত্রের উপরে মিনারের ভিত্তি স্থাপিত। কোণের সংখ্যা কুড়ি। মিনারের প্রথম তলায় বহির্গাত্রেও রয়েছে কুড়িটি ঢেউ খেলানো অংশ। এই অংশগুলির প্রথমটি কোণবিশিষ্ট কিন্তু তারপরেরটি অর্দ্ধবৃত্ত। ত্রিতলের ভাঁজগুলি সব কোণ-বিশিষ্ট। চতুর্থ ও পঞ্চম তলের বহির্গাত্রে কোন প্রকার ভাঁজ নেই। কিন্তু কারুকার্যহীন সরল বহির্দেশ যাতে দৃষ্টিকটু না হয়, তার জন্যে মার্বেল ও লাল বেলে পাথরের বেষ্টনী দেওয়া হয়েছে গাত্র ঘিরে। ঐ বেষ্টনীগুলি একান্তরী হওয়ায় মিনার গাত্রের যে একঘেয়েমী সৃষ্টি হবার আশঙ্কা ছিল তা হ্রাস পেয়েছে। প্রত্যেক তলায় একটি করে ঝোলান বারান্দা রয়েছে। ভিতরের সরু ও অন্ধকারাচ্ছন্ন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে গেলে ঐ বারান্দার সঙ্গে যুক্ত দ্বারপথ দিয়েই কেবলমাত্র আলো এসে যাত্রীকে উঠতে সাহায্য করে। ঐ ঝোলানো বারান্দাগুলি বড় বড় পাথরের ব্রাকেটের উপর নির্মিত, অতিসূক্ষ্ম কারুকার্যদ্বারা অলঙ্কৃত, যার তুলনা দিল্লীর কোন অট্টালিকার গাত্রেই পাওয়া যায় না।

সমগ্র মিনারের প্রথম তিনটি তলা লাল বেলে পাথর দ্বারা নির্মিত। পরবর্তী দুইটি তলা লাল বেলে পাথর আর শ্বেত মার্বেল দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। সর্বোচ্চ তলাটির রঙ এমন ভাবে করা হয়েছে যাতে আকাশের নীলিমার সঙ্গে তার অঙ্গ মিশে যেতে পারে। প্রথম তিনটি তলার দেওয়াল গাত্রে কোরাণ থেকে বহু বচন ক্ষোদিত করা হয়েছে। যাহোক, বহু যুগ পার হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও কুতব মিনারকে মনে হয় কত নতুন, কত টাটকা।

এখন কথা হচ্ছে এমন অপূর্ব সুন্দর দর্শনীয় বস্তুটি কে তৈরী করেছিলেন এবং কেনই বা করেছিলেন। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা যেমন সহজ, জবাব দেওয়া তত সহজ নয়। এক কথায় তো নয়-ই। পুরাণো খাতাপত্র যাঁরা ঘাঁটতে অভ্যস্ত, দুরূহ শিলালিপি পাঠ করে যাঁরা অপরিসীম আনন্দ পান অর্থাৎ ইতিহাস-বেত্তার দলও ঐ দুইটি প্রশ্নের জবাব সম্বন্ধে একমত হতে পারেন নি। এর বোধ হয় একটা কারণ হচ্ছে প্রামাণিক দলিল পত্রের অভাব। তাই

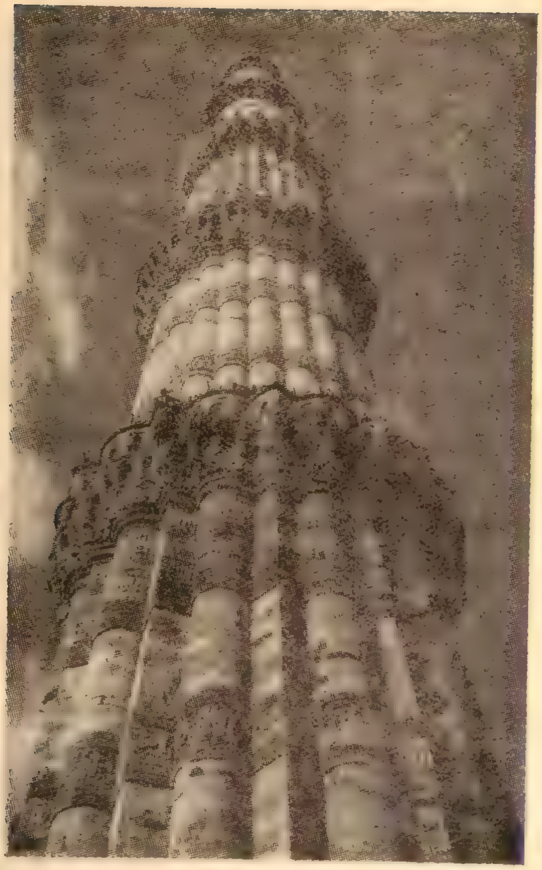

সৌন্দর্য্যমণ্ডিত ও কারুকার্যখচিত কুতব মিনার

কুতব মিনার গাত্রে উৎকীর্ণ শিলা-লিপির উপরই তাঁদের নির্ভর করতে হয়েছে বেশী। ঐ সব শিলা-লিপিতে বিভিন্ন রাজরাজড়ার নাম ক্ষোদিত রয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। অমনি একটির মধ্যে উল্লেখ রয়েছে আমীর শ্রেষ্ঠ কুতবের নাম। অপর দুটির মধ্যে পাওয়া যায় মহম্মদ বিন সামের নাম। আবার অন্য দুটি উৎকীর্ণ লিপি দেখে মনে হয় রাজা ইলতুত্‌মিশের আদেশেই কুতব মিনার নির্ম্মিত হয়েছিল। ফিরোজ শাহ্‌ বিন্‌ রাজব এবং সিকান্দর শাহ্‌ লোদী কুতব মিনারের উপরের দুটি তলা পুনর্নির্ম্মাণ করেছিলেন বলেও লিপি পাওয়া যায় (১৪৮৯—১৫১৭)। উপরের দুটি তলার গঠন ধারা ও মালমশলা অন্য তিনটি তলা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, তাই তুঘলক বংশের শাসনকর্ত্তা ঐ দুটো তলা নির্ম্মাণ করেছিলেন বলে বিশ্বাস করতে পারা যায়। ১৩৭৮ খৃঃ অব্দে বজ্রাঘাতে মিনারের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। তুঘলক বংশীয় রাজা ফিরোজ শাহ্‌ তা পুনর্নির্ম্মাণ করান। এ কাজে তিনি নিয়োগ করেছিলেন জনৈক হিন্দু স্থপতিবিদ্‌কে। সুতরাং হিন্দু শিল্পীর পরিকল্পিত অট্টালিকায় হিন্দু স্থাপত্যের ছাপ যে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি? এবং পড়েছিলও তা। তা ছাড়া ফিরোজ শাহ্‌ মিনার শীর্ষে একটি গুম্বজাকৃতি গোলাকার ছাদও তৈরী করেছিলেন। ১৭৯৪ খৃঃ পর্যন্ত ঐ ছাদটি বর্ত্তমান ছিল। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মেজর স্মিথ নামক জনৈক ইংরেজ পুঙ্গব কিছুটা খোদার উপর খোদকারী করেন। তিনি মিনারের উপর আরও একটি অংশ নির্ম্মিত করান। কিন্তু তা কেমন বেখাপ্পা দেখায়। তবু তা বেশ কিছুদিন বিরাজ পায়। পরে বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তা সরিয়ে ফেলার আদেশ দেন। আজও তা ডাক-বাংলোর সামনে মাটিতে পড়ে আছে দেখা যাবে।

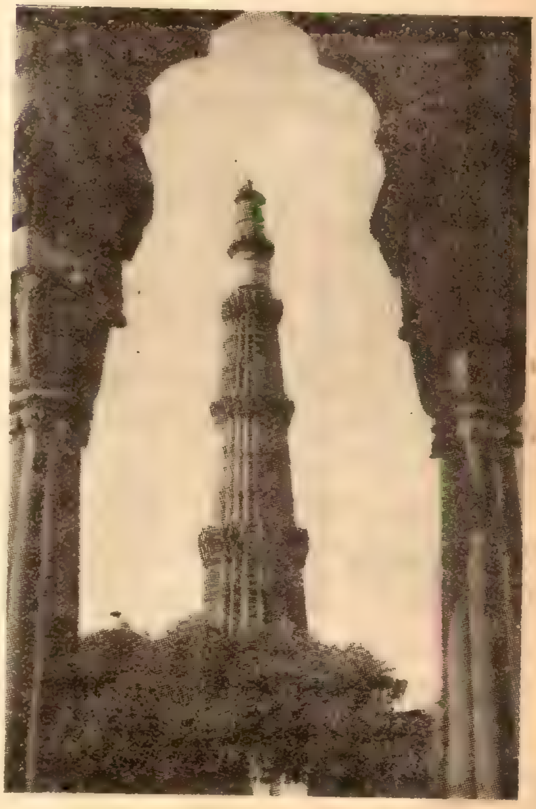

উন্নতশীর্ষ কুতব মিনার

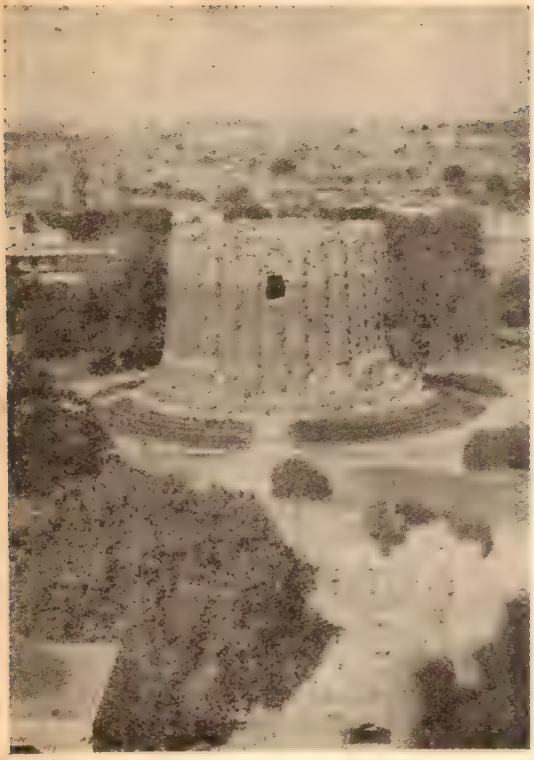

অর্দ্ধসমাপ্ত আলাই মিনার

অনধিকার চর্চ্চার ফল এমনি ভাবেই বোধ হয় ধূলিতে গড়াগড়ি যায়।

যাহোক, কে কুতব তৈরী করেছিলেন তা নিয়েই কথা হোক্। পূর্ব্বেই বলেছি, এ নিয়ে মতান্তর রয়েছে। কারু কারু মতে রাজপুত রাজা পৃথ্বীরাজ এ মিনার তৈরী করান। এই সুউচ্চ মিনার তৈরী করাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর প্রিয়তমা মহিষী যাতে প্রতিদিন প্রভাতে পূতসলিলা যমুনা নদীকে পরিদর্শন করতে পারেন। রাজ্ঞী সংযুক্তা কোথায় স্নান করতেন, কোথায় পূজা করতেন ইত্যাদি কতকগুলি গৃহাদি ও কূপাদির পরিচয় ও লোকপরম্পরায় চলে আসছে। তা ছাড়া, মিনার গাত্রে নাগরী হরফে কিছু লেখা পাঠোদ্ধার হওয়ায় ঐ কাহিনী নাকি সমর্থিত হচ্ছে। "রাজা পৃথ্বীর নামও কোন দরজায় উৎকীর্ণ আছে বলে দেখা গেছে। কিন্তু এত কথা সত্ত্বেও রাজপুত রাজার দাবীটি ঠিক টিকছে না। কারণ, অন্যত্র আলাউদ্দিন খিলিজি, মহম্মদ তুঘলক ও ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের নামও ক্ষোদিত রয়েছে দেখা গেছে। তা ছাড়া, মিনারের আকৃতি ও ধরণ এতটা মুসলিম রীতির সাক্ষ্য বহন করেছে যে একে বিশেষ কোন হিন্দু রাজা নির্ম্মাণ করেছিলেন বলে জোর করে বলা যায় না। তবে একথাও ঠিক যে মুসলমান রাজারা হিন্দুর বহু মন্দির ও স্মৃতিস্তম্ভকে কিছু কিছু রদবদল করে মসজিদ ইত্যাদিতে পরিণত করেছেন। এটাও তাই কি না কে জানে?

এখন কথা হল যে কোন হিন্দু রাজা যখন কুতব নির্ম্মাণ করেনি তখন নিশ্চয় কোন মুসলমান সুলতান তা নির্ম্মাণ করেছেন? কে তিনি? এ সম্পর্কেও জোর করে কিছু বলা যাচ্ছে না। কারণ, নিম্নতলের উৎকীর্ণ লিপিতে পাওয়া যায় কুতবের নাম। আবার এখানেও একটা সন্দেহ আছে। কুতব বলতে কোন সুলতানের নাম বুঝাচ্ছে, না, তাঁর উপাধি? উৎকীর্ণ লিপিতে সুলতানের পুরো নামটা নেই। তা ছাড়া, নিম্নতলের অন্য দু জায়গায় পরিষ্কার ভাবে পাওয়া যায় কুতবের প্রভু মহম্মদ বিন সামের নাম। চতুর্থ তলে প্রাপ্ত উৎকীর্ণ-লিপিতে দেখা যায় যে, এই অট্টালিকা আবুল মুজাফ্ফর ইলতুত্মিশের রাজত্ব কালে নির্ম্মিত হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় তলের অন্য একটি উৎকীর্ণ-লিপি পড়লে ঐ দাবী সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। ত্রিতলে উৎকীর্ণ লিপিতে দেখা যায় মহম্মদ আমীর কোহ নিজ তত্ত্বাবধানে এই মিনারটি সমাপ্ত করেন। এমনি বিভ্রান্তিকর লিপি থেকে মিনারের সত্যিকারের নির্ম্মাতাকে খুঁজে বার করা সহজ-সাধ্য নয়। তবে মনে হয় কুতবুদ্দিন আইবক-ই মিনারটি নির্ম্মাণ করাতে আরম্ভ করান। বোধহয় ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কাজ আরম্ভ হয়। প্রথম তলাটিই তিনি সম্ভবত শেষ করিয়েছিলেন। তাই সেখানেই তাঁর নাম উৎকীর্ণ আছে দেখা যায়, পরের তিনটি তলা নির্ম্মিত হয় সম্রাট ইলতুত্মিশের আমলে। তাই তিনি নিজের নাম লিখে রাখান চতুর্থ তলে। সেখানে উৎকীর্ণ-লিপিতে বোধহয় এই তিনটি তলার কথা বলা হয়েছে—সবটা মিনারের কথা নয়। যাহোক, তিনি নিজেকে কুতবের দাস বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা করেন নি। ইলতুত্মিশ্

নির্ম্মিত চতুর্থ তলটি বজ্রাঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা সমান করান ফিরোজ শাহ্ তুঘলক এবং তিনি সঙ্গে আরও একটি তলা নির্ম্মাণ করান। তারপর এতে হাত দেন সিকন্দর শাহ্ লোদী আর মেজর স্মিথ—মানে, ঐতিহাসিকদের ধারণা অনুসারে ৫।৬ জনের যত্নে মিনারের বর্ত্তমান রূপ হয়েছে।

কুতবুদ্দিন আইবক নির্ম্মাণ আরম্ভ করলেও তাঁর নামানুসারেই যে মিনারটির নাম কুতব মিনার হয়েছে এটা জোর করে কেউ বলেন না। অনেকের ধারণা মুসলিম ধর্ম্মগুরু হজরৎ কুতবুদ্দিনের নামানুসারেই এই মিনারের নাম করা হয়েছে। কুতবুদ্দিন ছিলেন সুলতান ইলতুত্মিসের গুরু। আর ইলতুত্মিশই মিনারের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করেন। নিজের নামের পরিবর্ত্তে তৎকালীন সর্ব্বজন সম্মানিত গুরুর নামেই তিনি সম্ভবত মিনারের নামাকরণ করেন। কুতবুদ্দিন বক্তিয়ার কাকি মধ্য এশিয়ার উশ্ নামক স্থান হতে ভারতে আসেন। তিনি ছিলেন শেখ মৈনুদ্দিন চিস্তির শিষ্য। তিনি অনেক অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। বহু রাজা মহারাজা তাঁর শিষ্য ও আশ্রিত ছিলেন। কুতবের নিকটেই তাঁর ছোট্ট কবরটি আজও সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করছে।

আরও একটি প্রশ্ন বিবেচ্য। সে প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে, এ মিনারটি কি জয়স্তম্ভ না নির্দ্দিষ্ট সময়ে মুয়াজ্জিনের আজান দিবার জন্য নির্ম্মিত হয়েছিল? দু' উদ্দেশ্যেই ওটা নির্ম্মিত হয়ে থাকতে পারে। তবে প্রসিদ্ধ মসজিদ কুওয়াত-উল-ইসলাম অতি কাছে হওয়ায় এবং কুতবের গায়ে কোরাণ থেকে নানা বচন ক্ষোদিত থাকায় বলা যেতে পারে যে নমাজের জন্য মুসলমানের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানাবার জন্যেই মিনারটি রচিত হয়েছিল। কিন্তু মিনারটি এত উচ্চ যে, সেখান থেকে আজান দিলে তা কোন কাজে আসতে পারে কিনা তাতে সন্দেহ আছে।

কুতবের কথা শেষ করার আগে আরেকটি মিনারের কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। তা হচ্ছে আলাই মিনার। কুতব মিনারের দ্বিগুণ বড় একটি মিনার তৈরীর অভিলাষ নিয়ে আলাউদ্দিন খিলিজি কাজ আরম্ভ করেন কিন্তু ৮০ ফিট পর্য্যন্ত মিনারটি প্রস্তুত হবার পর তাঁর মৃত্যু হয়। আজও ঐ অসম্পূর্ণ মিনার গর্ব্বোদ্ধত মানুষের ব্যর্থ অভিলাষের মূক সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার জন্যই আমি লোকগুলোকে রজোগুণ-তৎপর হ'তে উপদেশ দিই। অন্ন-বস্ত্রাভাবে দেশটা চিন্তায় চিন্তায় উৎসন্নে গেছে—আর তোরা কি কচ্ছিস? ফেলে দে তোর শাস্ত্র-ফাস্ত্র গঙ্গাজলে। দেশের লোকগুলোকে অন্নসংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত প'ড়ে শোনাস্। কর্ম্মতৎপরতার দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হ'লে কেউ ধর্ম্ম-কথায় কান দেবে না। আগে আপনার ভিতর অন্তর্নিহিত আত্মশক্তিকে জাগ্রত কর, তারপর দেশের ইতর-সাধারণ সকলের ভিতর যতটা পারিস, ঐ শক্তিতে বিশ্বাস জাগ্রত ক'রে, প্রথমে অন্নসংস্থান—পরে ধর্ম্মলাভ ক'রতে তাদের শেখা।

—স্বামী বিবেকানন্দ

মহারুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

১

রুদ্র শ্মশান! ক্রুদ্ধ ঈশান ধ্বংস-বিষাণ করে
তাতা থৈ থৈ নাচিতেছে ঐ—কাঁপে ধরা পদভরে!
ভয়ে থর-থর কাঁপে রবি-শশী!
পথ-হারা গ্রহ-তারা পড়ে খসি!
কাঁদে দশদিক! একি ঘন মসী ছাইল রে চরাচরে!
রুদ্র শ্মশান! ক্রুদ্ধ ঈশান ধ্বংস-বিষাণ করে
তাতা থৈ থৈ নাচিতেছে ঐ—কাঁপে ধরা পদভরে!

২

'ব্যোম্ হর হর' গরজে সাগর কোটি অজগর রবে!
ভাঙিগ জনপদ ছোটে নদী-নদ, গণিছে বিপদ সবে!
কাঁপে ভিখারিণী পর্ণ-আসনে,
কাঁপে রাজ-রাণী স্বর্ণ-ভূষণে,
কুসুম কাননে কাঁপিছে কামিনী দয়িতের বাহু 'পরে!
রুদ্র শ্মশান! ক্রুদ্ধ ঈশান ধ্বংস-বিষাণ করে
তাতা থৈ থৈ নাচিতেছে ঐ—কাঁপে ধরা পদভরে!

৩

ভস্মভূষিত বিশ্বশ্মশানে দাউ দাউ চিতা জ্বলে!
ব্যাবিলন-ক্রীট-মিশর মহিমা লুকায় তাহার তলে!
কত কার্থেজ ফিনিসিয়া ট্রয়
মরণ সাগরে লভিতেছে লয়,
কত মহাতেজা সম্রাট-রাজা পর্ণের প্রায় ঝরে!
রুদ্র শ্মশান! ক্রুদ্ধ ঈশান ধ্বংস-বিষাণ করে
তাতা থৈ থৈ নাচিতেছে ঐ—কাঁপে ধরা পদভরে!

৪

ক্রুদ্ধ কালের রুদ্র রোষেতে ঝঞ্ঝা বহিছে বেগে!
লক্ষ লক্ষ সুপ্ত রক্ষ উঠিল যেন রে জেগে!
প্রতি পরমাণু পাগলের পারা!
জীবন জুড়িয়া ধ্বংসের ধারা!
দেবতা-দানব স্তম্ভিত সব—মুখে নাহি কথা সরে!
রুদ্র শ্মশান! ক্রুদ্ধ ঈশান ধ্বংস-বিষাণ করে
তাতা থৈ থৈ নাচিতেছে ঐ—কাঁপে ধরা পদভরে!

৫

বিশ্বপ্রকৃতি টল্‌মল্ করে চণ্ড চরণ চাপে!
তল-রসাতল-পাতাল-বিতল ভূলোক-দ্যুলোক কাঁপে!
দেখি রুদ্রের তাণ্ডব নাচ
নাচে কবন্ধ প্রমথ পিশাচ!
ভূকম্প সনে মহামারী নাচে অযুত বজ্রস্বরে!
রুদ্র শ্মশান! ক্রুদ্ধ ঈশান ধ্বংস-বিষাণ করে
তাতা থৈ থৈ নাচিতেছে ঐ—কাঁপে ধরা পদভরে!

৬

দীর্ঘ দিবস ব্যথিত বসুধা যাদের অত্যাচারে
(সেই) দম্ভ-দৃপ্ত দানবের দল কম্পিত বারে বারে!
অরণ্য-হিয়া উঠিছে কাঁপিয়া,
মহা-মহীরুহ পড়ে উপাড়িয়া!
'সম্বর হর দীনে দয়া কর' উঠে ধ্বনি ঘরে ঘরে!
রুদ্র শ্মশান! ক্রুদ্ধ ঈশান ধ্বংস-বিষাণ করে
তাতা থৈ থৈ নাচিতেছে ঐ—কাঁপে ধরা পদভরে!

৭

মহা-আকাশের বক্ষ ব্যাপিয়া কাঁপে হর-জটাজুট!
জড়ায়ে জটায় গরজে ভুজগ উগারিয়া কালকূট!
'বব-বোম্ বোম্' ধ্বনি উঠে গালে!
ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে ক্রোধানল ভালে!
ত্রিলোক দহিতে ত্রিনেত্র হ'তে প্রচণ্ড প্রভা ক্ষরে!
রুদ্র শ্মশান! ক্রুদ্ধ ঈশান ধ্বংস-বিষাণ করে
তাতা থৈ থৈ নাচিতেছে ঐ—কাঁপে ধরা পদভরে!

৮

কে ডাকিল ঐ 'মাভৈঃ মাভৈঃ!' দেখ জ্ঞান-আঁখি খুলে!
জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি-প্রলয় একই তত্ত্ব মূলে!
ধাইছে ধ্বংস এক পদপাতে,
জাগিছে জীবন অন্যের সাথে!
অপূর্ব লীলা! ভাঙি এক হাতে, অপর হস্তে গড়ে!
রুদ্র শ্মশান! ক্রুদ্ধ ঈশান ধ্বংস-বিষাণ করে
তাতা থৈ থৈ নাচিতেছে ঐ—কাঁপে ধরা পদভরে!

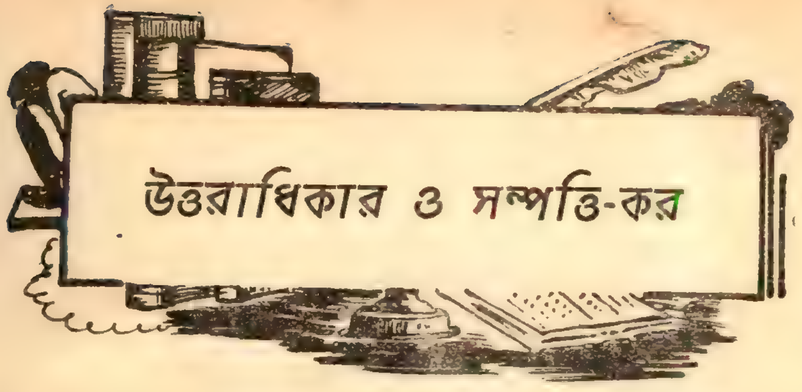

উত্তরাধিকার ও সম্পত্তি-কর

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

সামাজিক প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, রাজস্বের চাইতে উত্তরাধিকার এবং সম্পত্তি কর অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশে এই কর ধার্য্য করা হয়েছে এবং সে সব দেশের রাষ্ট্রীয় আয়খাতে এই কর একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। মানুষের মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টিত হবার আগে যে কর ধার্য্য করা হয় সেটাকে বলা হয় সম্পত্তি কর। আবার অন্যদিকে উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য অংশের উপর যে কর ধার্য্য করা হয়, সেটাকে বলা হয় উত্তরাধিকার-কর। এখানে মনে রাখা দরকার, সম্পত্তি করকেও মাঝে মাঝে উত্তরাধিকার কর বলা হয়ে থাকে, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের জন্য অর্থ খুবই দরকার এবং কর ধার্য করে এই অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। অবশ্যি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অন্যপ্রকার ব্যবস্থা চোখে পড়ে। কিন্তু করপ্রথাই হল ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রধান অবলম্বন। তবে কর ধার্য্যের ব্যাপারে কতকগুলো আইনকানুনের দিকে নজর দেওয়া দরকার। তা না হলে কর ধার্য্যে আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। এই করকে দুভাগে ভাগ করা হয়, যথা প্রত্যক্ষ কর এবং অপ্রত্যক্ষ কর। মৃত্যুকর, মাথাপিছু কর, আয়কর ইত্যাদি হচ্ছে প্রত্যক্ষ কর। করদাতাকে প্রত্যক্ষ করের বোঝা বহন করতে হয়। যে কর করদাতা অন্যের কাছ থেকে আদায় করেন সেটাকে বলা হয় অপ্রত্যক্ষ কর, যেমন বিক্রয়কর, আমদানী শুল্ক ইত্যাদি। প্রত্যক্ষ করের চাপ ধনীর উপর বেশী পড়ে। আবার অন্যদিকে অপ্রত্যক্ষ করের চাপ এসে পড়ে গরীবের উপর। তবে প্রত্যক্ষ কর এবং অপ্রত্যক্ষ করের যৌক্তিকতা যাই থাকুক না কেন, প্রায় সমস্ত অর্থনীতিবিদ্ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজস্বের প্রয়োজনে মৃত্যু-করকে সমর্থন করে থাকেন। সমাজ কল্যাণ এবং সামাজিক উপকারিতার দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মৃত্যু-করের ফলে অসম-ধন-বন্টন অনেকটা কমে যাবে। আমরা প্রায়ই দেখি ধনীর ছেলেরা অনার্জিত অর্থের অধিকারী হয়ে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অর্থের অপচয় করেন। এটা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। তাছাড়া অর্থ উপার্জন করতে গিয়ে আমাদের রাষ্ট্রীয় সহায়তার কথা মনে রাখতে হবে, কারণ রাষ্ট্রে যদি শৃঙ্খলা, শাসন, শিক্ষা ইত্যাদির সুযোগ না থাকে তাহলে অর্থোপার্জন এবং সবলের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। রাষ্ট্রের কাছ থেকে যাতে এই সুবিধা পাওয়া যেতে পারে সেজন্য মৃত্যু-করকে সমর্থন করা দরকার, তাছাড়া মৃত্যুকর আদায় করা সহজ এবং এটা আদায় করবার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। কতটুকু আদায় করতে হবে তাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়ে থাকে। কর প্রদানের উপায়টিও খুব সহজ। বীমাপত্র অথবা অতিরিক্ত সঞ্চয় দ্বারা এই কর পরিশোধ করা যেতে পারে। মৃত্যুকর প্রথার আরেকটা বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কচ্ছে। সে বৈশিষ্ট্যটি হল এই যে, কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন ষ্টেটকে কম এবং কোন কোন ষ্টেটকে বেশী কর দিতে হয়। অর্থাৎ বিশ বছরের মধ্যে যদি মৃত্যুজনিত পাঁচবার উত্তরাধিকার পরিবর্তিত হয় তাহলে পাঁচবার মৃত্যুকর দিতে হবে। কি[illegible] এই বিশ বছরের মধ্যে যদি মৃত্যুজনিত একবার উত্তরাধি[illegible] পরিবর্তিত হয় তাহলে মাত্র একবার মৃত্যুকর দিতে হ[illegible] প্রায়ই দেখা যায়, মৃত্যুকরজনিত আয়ের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই, কারণ প্রতেক বছর মৃত্যুর সংখ্যা সমান হয় না। যাহোক আজ প্রায় সকল ইউরোপীয় দেশ, বৃটিশ উপনিবেশগুলো, জাপান, সিংহল প্রভৃতি এশিয়ার দেশগুলোতে মৃত্যুকর ধার্য্য করা হয়েছে। ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায়, প্রাচীন রোমেও ষষ্ঠ শতাব্দীতে অগাষ্টাস্ মৃত্যুকর ধার্য্য করেছিলেন। যুদ্ধের প্রয়োজনে নেপোলিয়নের সময়ে অতিরিক্ত রাজস্বের জন্য এই কর ধার্য্য করবার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হয়েছিল। বেন্থাম, মিল প্রভৃতি চিন্তাশীল লেখকরাও মৃত্যুকর সমর্থন করেছেন। এই করের সাথে আমাদের দেশও ঠিক অপরিচিত নয়। জার্মানদের সময়ে কালিকটে কতকগুলো বিশেষ ভূম্যধিকারীর সম্পত্তির উপর শতকরা

পাঁচিশ ভাগ কর ধার্য্য করা হয়েছিল। মৃত ব্যক্তির সাথে উত্তরাধিকারীর সম্পর্কের তারতম্য অনুসারে বিকানীরে শতকরা বিশটাকা পর্য্যন্ত কর আদায় করা হত, বিগত ১৮৫৯ সালে আয়কর ধার্য্য করতে গিয়ে ভারত সরকার মৃত্যুকর ধার্য্য করবার কথা বিশেষভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং আজ পর্যন্ত এই কর ধার্য্য করা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়ে গিয়েছে। স্মরণ থাকতে পারে, বিগত ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রচলিত হারে ভারতে প্রবেট শুল্ক ধার্য্য করা হয়েছিল। সে সময় থেকে মৃত্যুকরের বিরুদ্ধে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জোর আপত্তি জানিয়ে আসছেন। অথচ সবদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, এই কর খুবই যুক্তিসঙ্গত। আমাদের দেশে সত্যিই যদি মৃত্যুকর ধার্য করা হয় তাহলে ধনীর উপর করের চাপ বেড়ে যাবে এবং গরীবের উপর কম চাপ পড়বে। তাছাড়া সংগৃহীত কর যদি রাষ্ট্র জনসাধারণের কল্যাণ এবং উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ব্যয় করেন তাহলে দেশ এবং জনসাধারণের প্রকৃত আয়ের পরিমাণ বর্দ্ধিত হবে। আমাদের মনে হচ্ছে, মৃত্যুকরের ফলে মূলধন ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না। মূলধন কেবলমাত্র হস্তান্তরিত হবে। এর কারণ খুবই সুস্পষ্ট, কোন না কোন ব্যক্তি নিজের সঞ্চিত অর্থ থেকে বিক্রীত সম্পত্তি ক্রয় করে থাকেন। তবে এই সঞ্চিত মূলধনের হস্তান্তর নূতন মূলধন সৃষ্টির পথে একটা অন্তরায় বিশেষ। অবশ্যি এ বিষয়ে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ কীন্‌স্‌ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতানুসারে রাষ্ট্র কিভাবে অর্থ ব্যয় করবে তার উপর সংগৃহীত মৃত্যুকরের ভালমন্দ নির্ভর কচ্ছে। যদি জনসাধারণের কল্যাণ এবং উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সংগৃহীত কর ব্যয় করা হয় তাহলে দেশের জাতীয় আয় বেড়ে যাবে। এমন কি শেষ পর্যন্ত দেশের মধ্যে ধনবিনিয়োগও বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং তাঁর মতানুসারে মূলধন সৃষ্টির পথে মৃত্যুকর মোটেই অন্তরায় হিসাবে দেখা দিবে না। এ ছাড়া মৃত্যুকরের বিরুদ্ধে আরেকটা আপত্তি প্রায়ই শোনা যায়। সে আপত্তিটি হল এই যে, সক্ষম ব্যক্তিকে কাজে নিরুৎসাহ করে মৃত্যুকর কর্মপ্রেরণা নষ্ট করে ফেলে। এছাড়া বলা হয়েছে, মৃত্যুকর ধার্য্য করা হলে জাতীয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি আইন ভঙ্গ করা হবে এবং ক্রমশঃ জাতীয় মূলধনের পরিমাণ কমে যাবে। মূলধনের উপর মৃত্যুকরের প্রভাব সম্বন্ধে আমরা আগে আলোচনা করেছি। তবুও এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। কোন কোন অর্থনীতিবিদ মনে করেন, যেহেতু যে সম্পত্তির উপর মৃত্যুকর ধার্য্য করা হবে মৃত্যুকর দেবার সময়ে সে সম্পত্তির কিছুটা অংশ বিক্রী করতে হয় সেহেতু মৃত্যুকর ধার্য্য করা হলে মূলধনের পরিমাণ কমে যায়। তবে মানুষের চরিত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সমাজে সম্মান এবং ক্ষমতা লাভ করবার উদ্দেশ্যে মানুষ অর্থ উপার্জন করবার জন্য খুব উদ্‌গ্রীব। যদি মৃত্যুকর ধার্য্য করা হয় তাহলে একটা জিনিসের উপর আমাদের বিশেষ নজর রাখতে হবে। অর্থাৎ মৃত্যুকর যাতে প্রগতিশীল হতে পারে সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। তা না হলে এর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। সম্পত্তির পরিমাণ অনুসারে করের হার নির্ধারণ করা দরকার। সম্পত্তির পরিমাণ যত বেশী হবে করের হারও তত উচ্চ হতে থাকবে।

করপ্রদানের সক্ষমতা নীতি অনুসারে আয়কর যেরকম সঙ্গত সেরকম মৃত্যুকরকেও এই নীতি অনুসারে সঙ্গত বলে মনে হচ্ছে। যাঁরা কর ফাঁকি দিয়ে বিরাট সম্পত্তির মালিক হন তাঁদের কাছ থেকে ব্যাক ট্যাক্স থিওরী অনুসারে ফাঁকি দেওয়া কর আদায় করা অনেকটা সহজ। তবে এই থিওরী অনুসারে কর আদায় করা যথার্থ কিনা সে সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ আছে। বেনিফিট থিওরী অনুসারে যদি এই করের যৌক্তিকতা বিচার করা হয় তাহলে দেখা যাবে, এই প্রকার কর ধার্য্য করা খুবই সঙ্গত। তাছাড়া এই প্রকার কর আদায় করতে তেমন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না, কারণ সম্পত্তি হস্তান্তরের সময়ে এই কর প্রদান করতে হয়। অনায়াসলব্ধ সম্পত্তি কিম্বা উপহার লাভ করবার সময়ে এই কর ধার্য করা যুক্তিসঙ্গত। মোট কথা হল এই যে, অসম ধনবণ্টন দূর করবার অন্যতম চমৎকার বাস্তব উপায় হল উত্তরাধিকার এবং সম্পত্তি কর ধার্য্য করা। এই কর প্রথার সাহায্যে রাষ্ট্র বংশপরম্পরায় অসমতা সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করে দেয় এবং সমাজে বিলাসী শ্রেণী গড়ে উঠবার পথে বাধা সৃষ্টি করে।

———

প্রতিবিম্ব

[দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ]

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

লাটবাড়ীর বিলাস ঐশ্বর্যের হিমালয় শিখরে দেশী লাটের অধিষ্ঠান বোধ করি বিশ্বের নবম আশ্চর্য বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। প্রতি মুহূর্তে কাবুলের বাচ্চা-ই-শাকোর ইতিবৃত্ত স্মরণ করাইয়া দেয়। মনে হয়, যেন একটা অতীতের মহাসমৃদ্ধির জীবনাবসানে শ্মশানে দাহ বা কবরে সমাধিস্থ না করিয়া ভিষকসম্রাট ধন্বন্তরীর তৈরী তৈল মর্দন করিয়া 'মমী' বানাইবার চেষ্টা হইয়াছে। তফাৎ এই যে মানুষটি 'মমী' নয়, জীবন্ত। গৃহসজ্জা, কুর্সি কেদারা ঝালর পর্দা, এলবাক্ পোষাকগুলাই গৃহস্বামীকে কেষ্ট-বিষ্টুর স্থলাভিষিক্তরূপে পরিচিত করাইবার জন্যই যেন সাড়ম্বরে বিদ্যমান। অশ্ব ওয়েলারের বংশধর, মুখ্যি কুলীন শ্রেণীর সন্দেহ নাই, তবে দেশে আকাল, দানা চানার অভাবে মাঠে মাঠে মুতো ঘাসেই দিনাতিপাত করিতে হইতেছে। হাড়পাঁজরাগুলা নির্ভুল গণনা করা যায়। গল্পে আছে ফাঁসির পূর্বে পেস্তা বাদাম আনার আখরোট পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দেয়; এও বোধ করি সেই রকম একটা কিছু হইবে। জামার ঝুল নাই, টানিয়া টানিয়া ঝুলাইবার কি যত্ন!

লাটসাহেব লোকটি সজ্জন। সুধাকর সাহেবকে সামনে বসাইয়া কহিলেন, "বাতাইয়ে"। লাট স্বদেশী প্রথায় নমস্কার, স্বদেশী ভব্যতানুযায়ী দুই করতল প্রসারিত করিয়া আসন গ্রহণের অনুরোধ করিলেন এবং Yes, what can I do for you না কহিয়া দিশী ভাষায় বক্তব্য বলিতে অনুরোধ করিলেন।

সুধাকর সাহেব প্রমাদ গণিলেন। বাঙ্গালীকে হিন্দীতে, থুড়ি রাষ্ট্রভাষায় কথোপকথন করিতে বলা আর বাসর ঘরের শ্যালিকা সমাজোদ্ভুত ধাঁধার উত্তর নিরকরণ—প্রায় সমান সমান। কথা লজ্জার এবং জাতিয়ত্বে আঘাতও লাগে কিন্তু মিথ্যা নয়। কবে যে বাঙ্গালী রাষ্ট্রভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করিবে অথবা আদৌ করিবে কি না, বলা কঠিন। সমতল, মসৃণ ও দূর্বাকোমল বাঙ্গলা দেশের লোকের এবড়ো খেবড়ো পাথুরে চড়াই উৎরাইয়ে চিরকালই নিদারুণ অরুচি। বাঙ্গালীর দাঁতের গোড় বড় পল্‌কা, মটরকড়াই চর্বণে সহজাত আতঙ্ক।

ভূমিকা পর্যায় অতিক্রান্ত হইবামাত্র লাটসাহেবই ভয় ভাঙ্গিয়া দিলেন, স্বয়ং ইংরাজী ধরিলেন এবং মাত্র পোণে এক আনা রাষ্ট্রভাষার সম্মানার্থ রাখিয়া স'-পনেরো আনা লাটোচিত ভাষাই ভাবাবেগে চালাইয়া দিলেন। কথোপকথনের সারাংশ দীনা দরিদ্রা ভাষাতেই উদ্ধৃত করা হইলঃ

আপনার বোর্ডের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত অভিযোগ আপনি কি অস্বীকার করিতে পারেন?

পরিচালনায় দোষত্রুটী অস্বীকার না করিয়াও বলি যে, পরিচালকগণ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি; জেলার অধিবাসীরাই তাঁহাদের পাঠাইয়াছেন, দোষগুণ বিচারের অধিকার তাঁহাদেরই থাকা উচিত। বোর্ড বাতিল করিবার অধিকার কেবল তাঁহাদেরই। তাঁহারা পরিচালনে অসন্তুষ্ট হইলে নূতন নির্বাচন দাবী করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া গণতন্ত্রবিরোধী কাজ করিতেছেন, অত্যন্ত মনস্তাপের সহিত সে কথা বলিতে আমি বাধ্য।

আইন গবর্ণমেণ্টকে সে ক্ষমতা অর্পণ করে নাই কি?

সে আইন কাহার রচনা? ইংরাজের। ইংরাজ তাঁহার সাম্রাজ্যের স্বার্থে ঐ সকল আইন প্রস্তুত করিয়াছিল এবং আপনারা মহাত্মা গান্ধী, আপনি ও আরও অনেকে দেশের আপামর জনসাধারণকে ইংরাজের আইন অমান্য ও ভঙ্গ করিতে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাহারাও অসাধ্য সাধন করিয়া আপনাদের সহায়তা—ইংরাজকে বিব্রত ও বিতাড়নে—সহায়তা করিয়াছে। অদৃষ্টের কি ভীষণ ও মর্মান্তিক পরিহাস যে, আজ আপনারাই সেই সকল আইনের আশ্রয় লইয়া দেশের লোককে অবহেলা করিতেছেন। ইংরাজের সমস্ত অকার্য কুকার্যগুলিকে স্বদেশী গবর্ণমেণ্ট যেন মাথায় করিয়া—পূজা করিয়া—আদর্শবোধে ধন্য ধন্য করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু ক্রমাগত উপেক্ষার ফলে কংগ্রেস অথবা গবর্ণমেণ্টের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা-সম্মান থাকিবে কি?

মানুষ ত আর সত্যই মেষশাবক নহে।

চুরি করিয়া ধরা পড়িলে বিচারে দণ্ড হয়; হত্যার অপরাধে ফাঁসির ব্যবস্থা আছে। একটা সরকারী প্রতিষ্ঠান লইয়া নকড়া ছকড়া করিলে, তাহার টাকায় ছিনিমিনি খেলিলে, অপদার্থ আত্মীয় নিয়োগের দ্বারা কার্যকারিতা বিনষ্ট করিলে প্রতিকারের প্রচেষ্টা করা কি অন্যায়?

স্বীকার করিলাম অন্যায় না হইতে পারে; কিন্তু বোর্ড দমন করিয়া একজন লোকের হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিলে অনাচার হইবে না তাহার নিশ্চয়তা কি?

নিশ্চয়তা আছে। গবর্ণমেণ্টের পদস্থ কর্মচারীরা সৎ ও দক্ষ, ইহা পরীক্ষিত সত্য।

পরীক্ষা করিল কে? ইংরাজ ত! সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের পরীক্ষার মানদণ্ড কি ছিল তাহা আপনার অবিদিত না থাকাই সম্ভব। আজ যিনি ভারতের প্রধান মন্ত্রী, তাঁহার জীবনালেখ্য ও ভারত-দর্শন গ্রন্থ দুইখানিতে যে মূল্যমান তিনি নির্ধারণ করিয়াছিলেন, আশা করি তাহাও আপনার অজানা নাই। সেদিনের কথা ও এখনকার কাজে সামঞ্জস্য একটুও আছে কি?

মত কি অপরিবর্তনীয়? মানুষমাত্রেই সময়বিশেষে মত পরিবর্তন করেন। সোনা খাঁটি, তম্বারা আপনার গৃহিণীর কণ্ঠহার হইলেও সোনা, আমার হুঁকার মুখনল হইলেও সোনার মূল্য কমে না।

তক্‌মা-পরা ভৃত্য লাটসাহেবের হুঁকাটি রাখিয়া দিয়া গিয়াছে, লাটসাহেব গোটা কয়েক টান দিয়া কহিলেন, এই ধরুন কলিকাতা কর্পোরেশনের মতো সুবৃহৎ প্রথম শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান দুইজন দক্ষ সরকারী কর্মচারীর দ্বারা সুপরিচালিত হইতেছে; কলিকাতার বাসিন্দাদের আপত্তি বা ঘৃণার কোন নিদর্শনই ত প্রকাশ পায় নাই।

আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনি কি মনে করেন কলিকাতার লোক খুশী আছে?

মনে করাই সঙ্গত। অসন্তোষ থাকিলে বাহিরে কি প্রকাশ পাইত না?

প্রকাশ যে পায় না, সে কি গবর্ণমেণ্টের কর্মচারী দুটির জনপ্রিয়তার জন্য? শতকরা নিরানব্বই জন লোক অন্ন বস্ত্র আশ্রয় সমস্যার ভারে বিব্রত, জীবন্মৃত, ঘৃণা প্রকাশ করিবার ফুর্সতও তাহারা পায় না। আবার আমি মার্জনা ভিক্ষা করিয়া বলিতেছি আপনি 'সুপরিচালনা' শব্দটি ব্যবহার না করিলেই ভাল করিতেন। কলিকাতার রাস্তাঘাটের দশা আপনিও বোধ হয় বুঝিতে পারেন; গৃহস্থের জলকষ্ট যে কিরূপ শোচনীয় রহিয়াছে সে খবর কি আপনাকে কেহই দেয় নাই?

লাটসাহেব কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিলেন, কলিকাতার পৌর প্রতিষ্ঠানের আর্থিক দুর্দশা যে ঘুচিয়াছে আপনি কি তাহাও অস্বীকার করেন? প্রতি তিনচার মাস অন্তর ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে গবর্ণমেণ্টের দ্বারস্থ হইতে হইতেছে না, ইহা কি আপনি শুনেন নাই?

সুধাকর সাহেব কহিলেন, শুনিয়াছি। শুনিয়াছি কেন, জানি। সহরের যে কয় সহস্র গৃহাধিকারী আছে, তাহাদিগকে খোঁয়াড়ে বাঁধা গরুর মত গলায় পা দিয়া ভীষণ বর্ধিত হারে কর বৃদ্ধিতে বাধ্য করিয়া যে আর্থিক উন্নতির বাহবা লওয়া হইতেছে, তাহার ফলে দুই চারি বা দশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতা সহর বাঙ্গলার বা বাঙ্গালীর কলিকাতা থাকিবে কি না, দারুণ সন্দেহ। মাত্র কয়েক বৎসরেই দেখিতে পাইবেন ষাট সত্তর ভাগ বাঙ্গালী গৃহস্থ ঘরবাড়ী বেচিয়া নিঃস্ব, নিরাশ্রয় হইবে। দেশের ভূগোল বদলাইবে কি না আমি বলিতে পারিব না; তবে বিদেশাগত পরিব্রাজকগণ কলিকাতাকে জয়পুর যোধপুর বিকানীরের উপনিবেশ হইতে দেখিয়া তাজ্জব বনিলেও বিস্মিত হইবার কারণ থাকিবে না। গবর্ণমেণ্টের সুদক্ষ পরিচালনায় কামধেনু বধের ইহাই অমোঘ পরিণাম। বিচক্ষণতা ও সুপরিচালনা বলিতে পারিতাম যদি ঐ কয়েক সহস্র গৃহাধিকারীকে ক্রমাগত কোতল না করিয়া কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির অন্যান্য পন্থা বাহির হইত! সহরে ঘরবাড়ী করিয়াছে বলিয়া তাহারা কি চোর দায়ে ধরা পড়িয়াছে? যখনই টাকার দরকার হইবে, সেই কুলগাছ কটাকেই নাড়া দিতে হইবে?

কথাবার্তা বাঁকাপথ ধরিতেছে বুঝিয়া মোড় ফিরাইবার উদ্দেশ্যেই লাটসাহেব কহিলেন, বোর্ডের অনাচার দমন ও সংস্কারের অন্য কোন্ উপায় আপনার অভিলষিত, বলুন?

সুধাকর সাহেব বলিলেন, আমাদের উপর ভার প্রদত্ত হইলে অনায়াসে আমরা আপনাদের সন্তোষ বিধানে সক্ষম হইতাম।

আপনি ত দীর্ঘকাল কর্তৃত্ব করিতেছেন, তথাপি—

কর্তৃত্ব কই আর করিলাম। সাঁইত্রিশজন প্রভুর সন্তুষ্টি—

লাটসাহেব হুঁকার নলের আড়ালে মুচকি হাসিয়া কহিলেন, প্রকারান্তরে আপনিও ত বোর্ডের বিলোপ কামনা করিতেছেন। সাঁইত্রিশজন মেম্বারকে তাড়াইয়া সমস্ত ভার আপনি লইতে রাজী আছেন, বলিলেন। তবে আর আপনার সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের বিরোধ কোথায়? আপনি

গ্রাম-তীর্থ

ফোটো—সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

যেমন আছেন, তেমনই থাকিবেন। আপনার সর্বাঙ্গীন সহায়তায় সংস্কার সহজে ও স্বল্পকালমধ্যেই সাধিত হইবে, ইহাই আমরা আশা করিতে থাকিব। আসল কথা—ভাল করা; তা আপনি করুন বা আমিই করি। এ ক্ষেত্রে, আপনার সহযোগিতা বিশেষ ফলপ্রদ হইবে ইহাতে আমার সংশয় নাই।

সুধাকর সাহেব সাহসভরে কহিলেন, আপনার শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ। আমার উপরে যদি আপনার আস্থা থাকে, তাহা হইলে সম্পূর্ণ ভার দিতে বাধা কি? আপনাকে একটি পুরাতন উদাহরণ দিতে পারি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন—সে একদিন আবার ইংরাজ রাজত্বের প্রচণ্ড মধ্যাহ্নের দিন, কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব ঝুনা আই-সি-এস্‌দের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া একজন সাধারণ লোকের হাতে দিয়াছিলেন—আর আপনার গবর্ণমেণ্ট পঞ্চাশ বছর পিছু হাঁটিয়া—

আপনি সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের কথা বলিতেছেন ত! মিঃ মল্লিকের মত বিচক্ষণ লোক বাঙ্গলা দেশে বেশী জন্মিয়াছেন কি?

লোক খুঁজিয়া লইতে হয়। আপনার গবর্ণমেণ্ট সে পথে না হাঁটিয়া লোকসমাজে ঘৃণিত আই-সি-এস্‌দের মাথায় তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন। সাধারণ মানুষের ধৈর্যের উপর ক্রমাগত আঘাত হানিতেছেন। ইহার পরিণাম যে কতদূর ভীষণ তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবকাশও তাঁহাদের হইতেছে না। গবর্ণমেণ্টের আজ দেশের লোকের সহিত কোনই সংযোগ নাই; সমস্ত দেশ একদিকে একমতে আর গবর্ণমেণ্ট অন্যদিকে, অন্যমতে। আমরা, যাহারা জনগণের মনোভাবের খবর রাখি, দিব্যচক্ষুতে দেখিতেছি গবর্ণমেণ্টের নীতিই দেশটিকে বিপ্লবের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। পূর্বে, অনুরূপ কারণেই একদা বঙ্গদেশ শোণিত-প্লাবনে ভাসিয়াছিল, আবার সেই অবস্থাই দ্রুত—অতীব দ্রুতগতিতে আসিতেছে।

বলেন কি!

অচিরে আপনিও বলিবেন, এই বিশ্বাস আমার আছে।

আপনি কি সত্যই সে আশঙ্কা করিতেছেন?

হিটলার তার মেইন কাম্পে দেশের লোককে পাঁচনহস্ত রাখালচালিত পশুপাল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিল। ইংরাজও ভারতবর্ষের শাসন ঐ মানদণ্ডেই চালাইত। স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্টও এ দেশের লোককে কি সেইরূপই ভাবিতেছেন? যেখানে যেটুকু স্বাধীনতা আছে, সেইটুকু কাড়িয়া লওয়াই কি তাঁহারা সুবুদ্ধির কার্য বিবেচনা করিতেছেন? আজ হয়ত নানান্‌ভাবে বিব্রত লোকে মুখ বুজিয়া সমস্ত অপমান সহ্য করিতেছেঃ কিন্তু চিরদিনই

করিবে এ ধারণা গভর্ণমেণ্ট যত শীঘ্র ত্যাগ করেন, ততই মঙ্গল। নহিলে, ইহার বিষময় ফল যে কিরূপ সুদূর-প্রসারী ও সর্বনাশকর হইবে তাহা ভাবিতেও হৃৎকম্প হয়! আপনার গভর্ণমেণ্ট সেই সর্বনাশের মুখে দেশকে ঠেলিয়া দিতেছেন, যে কোনও সুস্থচিত্ত ব্যক্তি তাহা বলিতে বাধ্য। দেশের লোকের সঙ্গে অধুনা গভর্ণমেণ্টের কোনই সংযোগ নাই: থাকিলে জানিতেন। জনচিত্ত বিস্ফোরণো-ন্মুখ হইয়া আছে, যে কোনও মুহূর্তে অগ্ন্যুদ্গীরণ করিবে।

বলেন কি, এমন! এত গুরুতর অবস্থা! আপনি ত রাষ্ট্রের হিতকামী ব্যক্তি, অবশ্যই আপনার আশঙ্কার বিষয় গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাত করিয়াছেন।

সুধাকর কহিলেন, আমার সেই উদ্দেশ্যেই আগমন।

লাট বলিলেন, আপনি 'গোপনে' গবর্ণমেণ্টকে জানাই-লেন না কেন?

কাহাকে বলিব? শুনিবে কে? আমাদের স্বদেশী গভর্ণমেণ্ট—স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকার, শুনিতে বেশ, গালভরা শব্দসমষ্টি। কিন্তু আসলে অবস্থাটা কি? সেই ইংরাজের তৈরী আইন, ইংরাজের গঠিত বিধি ইংরাজের মন্ত্রশিষ্য স্টীল ফ্রেমই কলকাঠি নাড়িতেছে। এই গভর্ণমেণ্টকে সদ্যুক্তি দিতে যাওয়া আর ঘোরারণ্যে রোদন করা একই কথা! হা বিধাতঃ, দুঃখ ত সেইখানেই

লাট সাহেব মৃদু হাস্যে কহিলেন, আপনি যে গণ-তন্ত্রকেই নাকচ করিতে চাহেন দেখি। অনেক সময় তারও দরকার, সেটা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না; সময়ে সময়ে একটু আধটু অটোক্রেসী প্রয়োগ মন্দ নহে। কিন্তু আপনার মত বিজ্ঞ ব্যক্তি এত বড় ভুলটা কি রূপে করি-লেন আমি তাহাই ভাবিতেছি।

ভুল!

তা বৈ কি আর বলিব? আপনার সম্মুখে এই যে গবর্ণরটি বসিয়া রহিয়াছেন, গবর্ণ করা ভিন্ন আর সবই তিনি করিতে পারেন, এ খবর কি আপনার জানা নাই! হা আমার বরাত, শাসনতন্ত্রের ঐটাই যে বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত!—লাটসাহেব উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। ঠিক সেই সময়েই সর্বাঙ্গে অলঙ্কার-ভূষিত অকষ্টবন্ধ পোষাক পরিহিত এক ব্যক্তি আসিয়া পঞ্চাঙ্গে ও সশব্দে অভিবাদন করিয়া একখানা কাগজ লাটের সম্মুখে রক্ষা করিল। লাট সাহেব তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া সুধাকরকে 'নমস্তে' করিলেন। এডিকং প্রস্থান করিলে, লাট সুধাকরের নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে কহি-লেন, আপিস ত আপনার হাতে, বাহির হইতে আসিয়া সে চক্রব্যূহ ভেদ করিতে এক অভিমন্যুই পারে; কিন্তু তাহার পরিণাম কি হইয়াছিল? অভিমন্যু যে অভিমন্যু, তাহাকেও মরিতে হইয়াছিল।

সুধাকর সাহেব অন্ধকারে আলো, অকূলে কূল, হতাশায় আশা দেখিয়া উৎফুল্ল হইতেছিলেন, লাট কানে কানে কহিলেন, কথাটা যেন লোক-জানাজানি না হয়! তাহলে কিন্তু আমার চাকরী নিয়ে টানাটানি! নমস্তে, নমস্তে!

মেমসাহেব বিশ্বের উৎকণ্ঠা বক্ষে পুরিয়া পথের পানে চাহিয়া ছিলেন, সুধাকরের প্রসন্ন আনন দর্শনে উদ্বেগ কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইলেও অকস্মাৎ কোন প্রশ্ন করিতে পারিলেন না। সুধাকর সাহেবও কোন কথা না বলিয়া স্নান করিয়া, ব্রেকফাস্ট খাইয়া, যথারীতি দর্শনপ্রার্থী—কর্মপ্রার্থীদিগকে 'গাড়ায় দর্শন' ডিগ্রী ডিসমিস্ করিয়া আপিসযাত্রার সময়ে গাড়ীতে উঠিতে গিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া সিঁড়ির মুখে অপেক্ষমানা মিসেসকে বলিলেন, নিজে থেকে রেসিগনেশন আমি দিচ্ছি না, বুঝলে? হন্দ-মুন্দ—শেষ পর্যন্ত একবার দেখে তারপর অন্য কথা! কি বল?

মেমসাহেবের বক্ষের ঘাড় হইতে পাহাড় নামিয়া গেল; সহাস্যমুখে ঘাড় নাড়িয়া সমর্থন জ্ঞাপন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

আগামী পৌষ সংখ্যা হইতে খ্যাতিমান কাহিনীকার শ্রীপ্রভাত দেব সরকারের উপন্যাস 'অম্বিষ্ট' ধারাবাহিকভাবে বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত হইবে। —সঃ বঃ

কেরানি-উদ্ধার

শ্রীরমাপতি দাস

কেরানিগিরি করিলে কি হয়? রোমান্সে রুচি যথেষ্ট। অফিসের পর সাজিয়া ভবেশ যখন মেস হইতে বাহির হয় তখন তাহাকে দেখিয়া কে বলিবে সে একজন দেড়শো টাকার কেরানি? চেহারাটিও মন্দ নয়। বেশ একটু মেয়েলিভাব আছে; চমৎকার she-man বলা চলে। দুর্ভিক্ষের মাটিতে গজানো নির্জীব গাছের ডালপালার মত হাত-পায়ে ইণ্ডিয়ান্ আর্টের ভঙ্গি, চোখ-মুখে কিছুটা গদগদ ভাব, কিঞ্চিৎ হেলিয়া দুলিয়া মন্থর গতির মধ্যে একটা ইপ্সিত বৈচিত্র্য। আদ্দির পাঞ্জাবি ঝুলাইয়া এক হাতে পাৎলা কাপড়ের কোঁচা ও অন্য হাতে ছড়ি দুলাইয়া সিগারেট টানিতে টানিতে যখন সে পথ দিয়া চলে, অনেকে তাহাকে মনে করে এমন ঘরের ছেলে যাদের কলিকাতায় অন্ততঃ দু'চারখানা বাড়ি ও কয়েকটা গাড়ি নিশ্চয় আছে। মুখস্থ-করা অভিজাতের চালচলনের অভিনয় করিয়া যে খাতির সে সকলের কাছে আদায় করিয়া লয় তাহা নিজে বেশ উপভোগ করে এবং সেইজন্য চেষ্টা করে অভিনয়টা যতদূর সম্ভব নিখুঁৎ করিবার। যাত্রা বা থিয়েটারে কিছুক্ষণের জন্য রাজা বা উজির সাজায় আনন্দ আছে; পকেটে পয়সা না থাকিলে হাজার বা লাখ টাকার কথা কহিয়া অপরকে ভাঁওতা দেওয়ার মধ্যে সাময়িক সান্ত্বনা আছে; কেরানিগিরি করিয়া আসিয়া দুই এক ঘণ্টার জন্যও অভিজাতের গৌরব পাওয়ার মধ্যে একটা আত্মপ্রবোধের হাস্যকর তৃপ্তি আছে। এ যেন অবিশ্বাসীর চোখে কিছুক্ষণের জন্য ভেল্কি লাগাইয়া দিয়া তাহাকে বিশ্বাস করানো যে সে যা বিশ্বাস করে তা ভুল। ভবেশকে অনেকে ঠাট্টা করে। সে কিন্তু বলে, "আমি যদি কিছুক্ষণ কেরানিগিরি ভুলে থাকতে পারি, তোমাদের গাত্রদাহ কেন?"

অফিসের ছুটির পর এইভাবে সাজিয়া ভবেশ কোনদিন দাঁড়াইয়া থাকে কোন সিনেমা বা থিয়েটারের সামনে, কোনদিন ঘোরে কোন পার্কে, কোনদিন বা কোন বড় দোকানের সামনে যেখানে বহু যুবক-যুবতীর আমদানী হয়। সিনেমা বা থিয়েটারে যুবকযুবতীরা আসে; টিকিট কিনিয়া ভিতরে ঢুকিয়া যায়। যাহারা আগে টিকিট কিনিয়াছে তাহারা সোজা ভিতরে চলিয়া যায়। ভবেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখে। তাহাকে দেখিয়া মনে হয় কাহারও প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। সেও এমনি ভঙ্গি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে যে মনে হয় যাহার জন্য দাঁড়াইয়া আছে সে বুঝি এই আসিল। হাত-ঘড়ি দেখে, অন্যমনস্কভাবে এধার-ওধার চায়, মাঝে মাঝে ভ্রু কুঞ্চিত করে, বাহিরে গিয়া আবার ফিরিয়া আসে, হতাশভাবে পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া দেশলাইয়ের উপর ঠুকিতে থাকে, —ধরায় না। অভিনয় আরম্ভ হইবার কিছু পরে সে চলিয়া আসে। পার্কে ঘুরিতে ঘুরিতে মেয়েদের কাছে আসিয়া পড়িলে থমকিয়া দাঁড়াইয়া চশমাটা খুলিয়া লইয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুছিতে আরম্ভ করে, কিম্বা সিগারেটের বাক্স হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া দেশলাইয়ের জন্য এ পকেট ও পকেট খুঁজিতে থাকে। মেয়েদের সঙ্গে চোখাচোখি হইয়া যায়; তাহাদের কেহ মুচকি হাসিয়া, কেহ ভ্রু কাঁপাইয়া, কেহ আড়চোখে চাহিয়া চলিয়া যায়; কেহ বা অসংলগ্ন কাপড় গুছাইবার অজুহাতে একটু দাঁড়াইয়া যায়। কখনো দাঁড়াইয়া থাকে কোন বড় দোকানের শো কেসের সামনে ভাবী ক্রেতার আগ্রহ মুখে লইয়া। ঝাঁকা-মুটে, রিক্‌শওয়ালা বা ভিখারী সেখানে দাঁড়াইলে দরোয়ান হুংকার দিয়া উঠে, "কাঁহে হিঁয়া ভিড় করতা হ্যায়? লেগা?" বেচারীরা চলিয়া যায়, একটু দাঁড়াইয়া দামী সৌখিন জিনিষগুলি দেখিবার অধিকারটুকুও অদের নাই। তাহাদের চেহারাই বলিয়া দিতেছে তাহারা কখনো এ সবের গ্রাহক হইতে পারে না; কাজেই তাহাদের দাঁড়াইয়া থাকাটা সত্যই বাজে ভিড় করা। ভবেশ নিজে জানে সেও তাহাদের মতই গ্রাহক নয়; তাহার বেশভূষা তাহাকে দিয়াছে সেখানে দাঁড়াইবার ছাড়পত্র। কেরানিগিরির ছাপ গায়ে থাকিলে দরোয়ান বাহাদুর নিশ্চয় তাহাকেও বলিত, "কাঁহে ভিড় করতা হ্যায়? লেগা?" অভিজাতের দামী পোষাকের প্রকৃতই দাম আছে। শো-কেশ

ছাড়িয়া অনেক সময় দুয়ারের একটু দূরে দাঁড়াইয়া যুবক-যুবতীদের যাওয়া-আসা দেখে সে; কেহ কিনিতে ভিতরে ঢুকিতেছে, কেহ কিনিয়া বাহির হইতেছে। তাহাকে দেখিয়া মনে হয় কেহ আসিলে তাহাকে লইয়া ভিতরে ঢুকিবে, কিম্বা কেহ ভিতরে গিয়াছে, বাহিরে আসিলে সঙ্গে লইয়া যাইবে। পকেটে সব সময় একটা দশ টাকার নোট থাকে; সেটা কখনো ভাঙ্গায় না। মিটিং-এও মাঝে মাঝে যায়। মেয়েরা যে দিকে থাকে সম্ভবমত সেদিক ঘেঁসিয়া বসে; সুবিধা পাইলে আড়চোখে চায়; চোখা-চোখি হইলে চোখ ফিরাইয়া লয়, আবার চায়।

ডলির সঙ্গে আলাপ না হওয়া পর্যন্ত এই ভাবেই দিন কাটিতেছিল। একটা আত্মপ্রবোধের তৃপ্তি লইয়া ভবেশ অফিস যায়, ঘুরিয়া বেড়ায়, আপন মনে হাসে, গান করে, নাটক নভেল পড়ে, সিনেমা তারকাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করে, খোসমেজাজে খায়, ঘুমোয়। মনটা প্রজাপতির, আচরণ ফড়িং-এর যে জানে শুধু ফট্‌ফট্ করিয়া লাফাইতে বেড়াইতে, আশ্রয় মুষিকের গর্তস্বরূপ মেসের ছোট ঘর। নিজের দৌড় কতদূর তাহা সে জানে; তাহা লইয়া মাথা ঘামায় না। একটা কৃত্রিম অভিনয়ে নিষ্ঠুর নিয়তিকে কিছুক্ষণের জন্য ফাঁকি দিয়া খানিকটা মেকি আকর্ষণ আদায় করিয়া লয়, তাহাতেই সে সন্তুষ্ট। সব গোলমাল হইয়া গেল সেদিন ডলির সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হইয়া। সে দাঁড়াইয়াছিল এক সিনেমার টিকিট ঘরের সামনে। ডলিও দাঁড়াইয়াছিল। উভয়কেই দেখিয়া মনে হয় কাহারও প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। ছবি আরম্ভ হইয়া গেল। ডলি মাঝে মাঝে আড়চোখে ভবেশের দিকে চায়, ভবেশও অনুরূপ আড়চোখে ডলির দিকে চায়। দু' চারবার চোখে চোখ পড়িতেই উভয়েই ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। ডলি বলিয়া ফেলিল, "আপনি বুঝি কারও জন্য দাঁড়িয়ে আছেন?" ভবেশ মাথা নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ। "আমিও রয়েছি একজনের অপেক্ষায়। আজ আমিও ডিস্‌অ্যাপ-য়েণ্টেড্, আপনিও ডিস্‌অ্যাপয়েণ্টেড।" ভবেশ কোন সাড়া না দিয়া তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। ছবি প্রায় পনেরো মিনিট হইয়া যাওয়ার পর ডলি বলিয়া উঠিল, "এ ডিস্-অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ব্যর্থ করার জন্য আমাদের দু'জনের ছবিটা দেখে আসা উচিত। নয় কি?" ভবেশ না যাইবার অজু-হাত আবিষ্কার করিতে লাগিল; কিন্তু সেন্স্ অব্ সিভ্যাল্‌রি—নারীর প্রতি সম্মান জানাইবার সহজাত প্রবৃত্তি তাহাকে জোর করিয়া বলাইয়া ফেলিল, "নিশ্চয় উচিত।" এতদিনের সুরক্ষিত দশ টাকার নোটখানি ভাঙ্গাইয়া দুটি টিকিট কিনিয়া ভবেশ ডলিকে লইয়া ঢুকিয়া পড়িল সিনেমায়।

ডলির পাশে বসিয়া ভবেশের বড় অস্বস্তি বোধ হইতেছে। হয়ত তাহার অনভ্যস্ত আচরণে কোথাও ত্রুটি হইয়া যাইবে, হয়ত সে ত্রুটির জন্য ভদ্রমহিলা তাহাকে মনে করিবে অসভ্য বর্বর। চাঁদ দূর হইতে বড় সুন্দর; কিন্তু কাছে গেলে না কি দেখা যাইবে সেটা অত্যধিক হিম ও মরুভূমির দেশ। চাঁদ কাছে পাইয়াও সঙ্কোচে ভবেশকে মুসড়িয়া পড়িতে হইল। ডলি খুব ফরওয়ার্ড। তাহার সাহসপূর্ণ অসঙ্কোচ ভবেশকে ক্রমে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল; ফলে অনভিজ্ঞের সামনে যে বাধা আসিয়া গোলমাল পাকাইতেছিল তাহা সরিয়া গিয়া পরিস্থিতি করিয়া তুলিল সহজ ও হৃদ্যতাপূর্ণ। সিনেমা হইতে যখন বাহির হইল, তখন পরস্পরের বেশ আলাপ হইয়া গিয়াছে।

তারপর অনেকবার দেখা হইয়াছে; অনেকবার সিনেমা, গড়ের মাঠ, লাভার্স পার্ক প্রভৃতি স্থানে যাওয়া হইয়াছে। আবহাওয়ার কথা, রাজনীতির আলোচনা, সচলপন্থী ও অচলপন্থীদের তুলনা, মাথামুণ্ডহীন আবোল তাবোল,—অনেক কিছু হইয়াছে। ফলে আলাপটা বেশ ঘনীভূত হইয়াছে। এখন ডলিকে না দেখিলে ভবেশের মন কেমন করে, তাহার মুখের দুটো কথা না শোনা পর্যন্ত প্রাণটা আটুপাটু করে, তাহার স্নিগ্ধ হাসিতে প্রাণটা ঠাণ্ডা না করিতে পারিলে মনে হয় জীবনটাই বৃথা। "অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়।" এতদিনের স্থিতি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল। আগুন লইয়া খেলা করিতে গিয়া আগুন লাগিয়া গেল ভিতরে।

এধারে তিন মাস মেসের চার্জ বাকি পড়িয়াছে; ম্যানেজার শাসাইতেছে খাওয়া বন্ধ করিয়া দিবে বলিয়া। বন্ধুবান্ধবের কাছেও বেশ ধার হইয়া পড়িয়াছে। মাহিনা যা পায় তার বেশীর ভাগ খরচ হয় ডলির জন্য; না কুলাইলে ধার করিতে হয় অপরের কাছে। ধার করা সে বরাবর ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে; এখন দিন দিন ডুবিতেছে ধারে। ডলির মুখখানা মনে পড়িলে সমস্ত সে ভুলিয়া যায়; মনে মনে বলে, "This is Life,—এই ত জীবন। এর জন্য শত দুর্দশা অম্লান বদনে বরণ করে নেওয়া যায়।" মেসের বন্ধুরা তার বাহির হওয়া বন্ধ করিবার চেষ্টা করে; নানারকম উপদেশ দেয়। ভবেশ চুপ করিয়া শোনে, বলে, "দেখা যাক্।" কে যেন কান ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে এক অনির্দিষ্ট পরিণতিতে।

তাহার পিছাইবার উপায় নাই। জীবনের আঁধার মরুতে পথ-হারা বেচারিকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছে আলেয়ার আলো মরীচিকার মরুদ্যানে ; কিন্তু তাহার বিশ্বাস এ মরীচিকা নয়,—ধ্রুব সত্য ও সুন্দর।

ভবেশের কলিকাতায় বাড়ি, গাড়ি ও ব্যাংকে মোটা টাকা জমা থাকা উচিত ছিল। তাহা হইলে জীবনকে সে বেশ করিয়া ভোগ করিতে পারিত। তাহার মত যারা তারা জন্মায় ভোগ করিতে। অন্ততঃ ভবেশের তাই বিশ্বাস। সে ফুল-বিছানো গদির উপর শুইয়া কবিতা পড়িবে, পাশে থাকিবে ডলি ; কত কথা হইবে, কত মান-অভিমানের পালা হইবে, কত কাকুতি-মিনতি করিয়া কত হাতে-পায়ে ধরিয়া মান-ভঞ্জন হইবে, পরে হয়ত দুজনে পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া সারা রাতই কাটাইয়া দিবে!—

আজি মলয়ানিল মৃদুমৃদু বহত, নিরমল চাঁদ পরকাশ।
ঘুমে ঢুলুঢুলু চামর ঢোলায়ত—।

কত মধুর! তাকে পড়িয়া থাকিতে হইয়াছে মেসের ছেঁড়া মাদুরের উপর, খাইতে হইতেছে ছারপোকার কামড় আর পাওনাদারের তাড়া। ম্যানেজার শাসাইতেছে খাওয়া বন্ধ করিয়া দিবে বলিয়া। বাবা একটা জমিদারি রাখিয়া যাইতে পারিতেন ; সে কেরানি না হইয়া লোহা, কাঁসা, পিতল যা হোক একটা কিছুর ব্যবসা করিতে পারিত; তাহা হইলে চোরাবাজারে বেশ দুপয়সা রোজগার হইত। অভাবপক্ষে লটারিতেও একটা মোটা টাকা পাইতে পারিত। সে সব না হইয়া ভাগ্যে জুটিল একটা মাছিমারা কেরানি-গিরি ; যার দাম মাত্র দেড়শো টাকা! এ কি ক্রূর পরিহাস!

ডলি অফিসে ফোন করিয়াছে পাঁচটায় দেখা করিবার জন্য। বড়বাবুর খোসামোদ করিয়া একটু আগেই তাহাকে বাহির হইতে হইল। ডলি কতকগুলি জিনিষ কিনিবে ; তাহাকে সঙ্গে যাইতে হইবে। চোরের মত সে সঙ্গে চলিল। বিল হইল পঁচাত্তর টাকা। ডলি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া দুই একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া টাকাটা নিজেই বাহির করিয়া দিল, অভাগা ভবেশ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। নিজেকে এতদূর অভিশপ্ত সে কখনো মনে করে নাই। পরে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "টাকা নিয়ে আমি অফিসে বেরোই না। ফোনে বললে বাসা হয়ে ব্যাগটা নিয়ে আসতাম।" ডলির মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এবারে রক্তিম হইল। ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তাতে কি হয়েছে?"

"আটটায় বাড়িতে থেকো, আমি আসবো।" ডলি সম্মতি জানাইল এবং মনে মনে বুঝিয়া লইল আটটার সময় ভবেশ তাহাকে টাকাটা দিয়া যাইবে।

ডলিকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়া ভবেশ মনুমেণ্টের সামনে বসিয়া পড়িল। পাশে কিসের একটা সভা হইতেছে ; বক্তা জোর গলায় বক্তৃতা করিতেছে। ভবেশের সে দিকে খেয়াল নাই। পঁচাত্তর টাকা এখনই সে পায় কোথায়? ধার পাইবার উপায় নাই। চুরি করাটাও অচিন্তনীয়। অথচ আটটায় টাকাটা ডলিকে দিতে হইবে। নতুবা আর কখনও তাহাকে মুখ দেখাইতে পারিবে না। কি করা যায়? দুনিয়ায় কত কোটি পঁচাত্তর টাকা আছে। একটা কোনপ্রকারে গলিয়া তাহার পকেটে আসিয়া পড়িতে পারে না! সত্যই পৃথিবীতে ভাগাভাগির বিরাট অসমতা রহিয়াছে। যার আছে তার যথেষ্ট আছে ; যার নাই তার কিছুই নাই। এ সামান্য টাকার জন্য আজ তাহাকে অপদস্থ হইতে হইবে ইহা উৎকট অন্যায়। এ যেন তার হৃদয়টাকে পাঁউরুটির ময়দার মত পা দিয়া দলা। এ কি বিভৎস অত্যাচার!...পাশের সভায় খুব হাততালি পড়িল। ভবেশ সজাগ হইল। বক্তা বলিতেছে, "হাঁ, অর্থ চাই। দুনিয়ায় যত নীতি আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে অর্থনীতি। অর্থ না থাকলে কোন নীতিরই কোন অর্থ হয় না আমি জেল খেটেছি। তখন তার মধ্যে কোন অর্থ ছিল না, এখন অর্থের সম্ভাবনা হয়েছে। এর পর আপনারা যদি আমাকে হঠাৎ কেষ্টবিষ্টুর মত কেউকেটা হয়ে পড়তে দেখেন বিস্মিত হবেন না। আমার কেউকেটা হওয়া উচিত,—না হ'লে অন্যায় হবে। বছরের পর বছর জেলের মধ্যে পড়ে থাকা! —সঙ্গে বাপ নেই, মা নেই, প্রেম করবার মত কোন প্রেয়সী নেই,—কি কষ্টকর বলুন দেখি? খেতে মিললোই বা? জেলের বাইরে আমরা খাই না? শোয়াও না হয় মিললো। কিন্তু ওভাবে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকার চেয়ে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে যাওয়া ভাল। আত্মাকে শুকিয়ে দেয় এই জেলগুলো ; ইক্ষু গাছকে করে দেয় যষ্টিমধু।" হঠাৎ থামিয়া ঘড়ি দেখিয়া বলিল, "আমার মেয়াদ ফুরিয়েছে। কাল এই সময়ে এলে আবার আমার কথা শুনবেন। আসবেন দয়া করে। সবাই মিলে ভিড় করে আমার কথা শুনলে, প্রমাণিত হবে আমি একজন বড় বক্তা। আপনাদের দয়ায় যদি একটা ডাকসাইটে বক্তা হয়ে পড়ি, আখেরে কাজ দেবে। নমস্কার।" সিঁড়ি দিয়া নামিয়া লোকটা হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। অনেকে হাততালি দিতেই থাকিল। ভবেশের ইচ্ছা হইল লোকটার পিছু নেয় ; কিন্তু তেমনিভাবেই বসিয়া রহিল।

সময় চলিয়া যাইতেছে। এক একটি মিনিট যেন এক একটি ঘণ্টা। ভবেশ বেচারী হাবুডুবু খাইতেছে প'চাত্তরটি টাকার জন্য। পকেট মারা অভ্যাস থাকিলে সে আজ যথেষ্ট পকেট মারিত; সামনে কারও টাকা পড়িলে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া তাহা হইতে প'চাত্তর টাকা ডলিকে দিয়া বাকি টাকা ফেরৎ দিয়া প্রয়োজন হইলে জেল খাটিত। কোন উপায় নাই। সেখানে বসিয়াই আটটা বাজিয়া গেল। ডলি তাহাকে কি ভাবিবে? মিথ্যাবাদী? অকর্ম্মণ্য? প্রতারক? প্রথমেই খাঁটি পরিচয়টা দিয়া দিলে হইত! এর পরে মুখ দেখাইবে কি করিয়া? রঙ্গমঞ্চে ক্ষুব্ধ নায়ক কাঁদে, চুল ছি'ড়ে, অট্টহাসে, লাফায়। এই মাঠের মধ্যেই সে এসব আরম্ভ করিয়া দিবে কি? বেচারি ম্রিয়মান অবস্থায় উঠিল সেখান হইতে।

ডলি একদিন বলিয়াই ফেলিয়াছে, সে তাহাকে ভালবাসে। ভবেশের কাছে ইহা হইয়াছে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মত। ইহাতেই ব্যাপারটা হইয়া পড়িয়াছে আরও গোলমেলে। ভবেশের ধারনা, ডলির মত মেয়ে লাখে একটা পাওয়া যায় না। তার ভালবাসার অমর্যাদা হইবে নিজের অযোগ্যতার জন্য ইহা সে কোন প্রকারেই বরদাস্ত করিতে রাজি নয়। নিজের দিক দিয়া সে ভাবিয়া দেখে, ডলির ভালবাসা তাহাকে করিয়া দিতে পারে খাঁটি সোনা। করিয়া দিতে পারে কেন? করিয়া দিয়াছে। তাহার ভিতরে আসিয়াছে একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ, অন্তর হইয়াছে প্রসারিত, হৃদয়ের শুষ্কতার স্থানে আসিয়াছে সজীবতা। এলোমেলোভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে সে অনেক তারা দেখিয়াছে; কিন্তু দেখাই হইয়াছে সার। হঠাৎ ডলি আসিয়া তাহার কাছে হইয়া পড়িয়াছে ধ্রুবতারা। এই ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে পারিলে তাহার আর দিশেহারা হইবার সম্ভাবনা নাই। ডলি যে কত বড় তাহা সে প্রকাশ করিতে পারে না; তৃষাতুরের শীতল পানীয়, বুভুক্ষতের অমৃত, স্তিমিত প্রাণের সঞ্জীবনী;—তারও বেশী। সেই ডলির কাছে আজ কথা রাখিতে পারিল না। তাহার জীবনটাই বৃথা। বেচারি নিজের প্রতি হতশ্রদ্ধ হইয়া কেবলই নিজের মৃত্যু কামনা করে, আর মাঝে মাঝে মনে মনে বলে,

'মরণ রে! তু'হু মম শ্যাম সমান।'

চলিয়াছে মন-মরা অবস্থায় পথ দিয়া। হঠাৎ দেখে মনুমেণ্টের সামনে যে ভদ্রলোক বক্তৃতা দিতেছিলেন তিনি হন হন করিয়া চলিয়াছেন। ভবেশ পিছু নিল এবং খুব তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া কাছে আসিয়া বলিল, "আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।" ভদ্রলোক ফিরিয়া চাহিলেন। "আমার সঙ্গে?" "হাঁ।" "আমি দরকারে ফিরছি। আমার সঙ্গে দরকার! তা, দরকারটা বেশী, না কম?" "বেশী"। ভদ্রলোক ভবেশের আপাদমস্তক খুব ভাল করিয়া দেখিয়া কিঞ্চিৎ মুচকি হাসিয়া হাত-ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, "আধঘণ্টা সময় আছে। চলুন ও পার্কটায়।" পার্কের কোণে একটা জায়গা দেখিয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন, "প্রেমে পড়েছেন। হাতে পয়সা নেই। এই ত?" ভবেশ আকাশ হইতে পড়িল। "আপনি জানলেন কি ক'রে?" "অমন চেহারা,—একেবারে আস্ত লেডিজ্ ম্যান, মুখ বিষণ্ণ,—বিংশ শতাব্দীর এই উনিশ শো বায়ান্ন সাল!—এ ছাড়া আর কি হতে পারে? তা, ব্যাপারটা বলুন দেখি।" "সব বলছি। আপনার নামটা জানতে পারি?" "নাম একটা আছে বটে। তবে আমি পরিচিত ইঙ্গ-কঙ্গ রসরাজ বলে,—অর্থাৎ, আমি ইংরাজ আমলের রসও জানি, আবার কংগ্রেস আমলের রসও জানছি। আমার পোষাক দেখছেন। পছন্দ করি কোট-প্যাণ্ট, মুখে আওড়াই কংগ্রেসি বুলি। আমি একজন আদর্শ পোষ্ট্-গান্ধি কংগ্রেসাইট্। যাক্, বলুন দেখি আপনার কথা।" কি জানি কেন ভবেশ ভদ্রলোককে একান্ত বন্ধু মনে করিয়া ফেলিয়াছে। সব কথা রসরাজকে বলিল। রসরাজ হাসিয়াই খুন। "এ এক রকম রোগ। আমারও হয়েছিল। বিয়ে করবেন না কি?" ভবেশ জানাইল, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা আর কি করিয়া সম্ভব!" "আপনার ধারণা দেখছি ঠিক আমার ঠাকুরদা'র মত। তিনি বলতেন, খবরদার প্রেম করলে বিয়ে করবি না। জেনে রাখবি, যিনি প্রেম করেন তিনি বিয়ের পরও সুবিধা পেলেই প্রেম করবেন। আজ থেকে দেখাশুনা বন্ধ, বুঝলেন? জীবন একটা মেয়ের চেয়ে ঢের বড়,—এ রকম একটা মেয়ের জন্য এ জীবন নষ্ট করা চলবে না। ঐ সামনের দোকানটার সামনে সন্ধ্যার পর আমি অনেক সময় থাকি। এলে দেখা হ'বে। চিয়ার আপ,—লিভ্ দি রেষ্ট্ টু মি।" হাত-ঘড়ি দেখিয়া রসরাজ হন্ হন্ করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রে মেসের ম্যানেজার আসিয়া বলে তাহার তিন মাসের ঘর ভাড়া ও মেসের চার্জ বাকী; সব মেম্বারেরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে,—কাজেই আর উপায় নাই; কাল হইতে তাহার খাওয়া বন্ধ। ভবেশ শান্তভাবে তাঁহার কথা শুনে, বলে, "বেশ। কিন্তু প'চাত্তরটি টাকা চাই যে।" ম্যানেজার অবাক হইয়া তাহার দিকে চায়। বলে কি?

সারা রাত ভবেশ ঘুমায় নাই। ঘুম না হওয়ার আলস্য সকাল বেলায় চাপিয়া ধরিয়াছে। বিছানায় পড়িয়া কত কি ভাবিতেছে। রসরাজকে কিছু না বলাই উচিত ছিল;

সে সব হাসিয়া উড়াইয়া দিল। হয়ত ডলিও সারারাত না ঘুমাইয়া তাহার কথা ভাবিয়াছে। তাহার কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা হইয়াছে এ কথা মনে করাও অসম্ভব নয়। কিম্বা সে মনে করিয়া থাকিতে পারে টাকাটা সে দিতে চায় না বলিয়া যায় নাই,—দেওয়ার সামর্থ্য নাই তাহা ভাবিবে না, কেননা তাহার প্রকৃত স্বরূপ সে জানে না। একটা খেয়ালের আনন্দের জন্য নিজেকে গোপন রাখিয়া বেচারি আজ এত বিভ্রাটে পড়িয়া গিয়াছে যে এখন সামলানো দায়। মিথ্যার এই দোষ। ঝঞ্ঝাটের পর ঝঞ্ঝাট বাড়িয়া যায়। কিন্তু মিথ্যা না বলিলে প্রেম করা চলে কি করিয়া?

পূজার ছুটিতে বাড়ি যাইবার পথে দেশের স্কুলের মাষ্টার মহাশয় আসিয়াছেন। ভবেশের মেসে স্নান আহারাদি সারিয়া পূজার বাজার করিয়া সন্ধ্যায় ট্রেণ ধরিবেন। আসিয়াই পকেট হইতে মণিব্যাগ সযত্নে বাহির করিয়া ভবেশকে বাক্সে রাখিতে বলিয়া স্নান করিতে নামিয়া গেলেন। ভবেশ একবার জিজ্ঞাসা করিল, "কত আছে?" মাষ্টারমহাশয় ঈষৎ হাসিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেলেন, "মাষ্টারের ব্যাগে আর কত থাকবে? যৎকিঞ্চিৎ—।" ভবেশ গুণিল একশো ষাট টাকা। নিজের অজ্ঞাতসারে তাহা হইতে পঁচাত্তর টাকা আলাদা করিয়া দু' তিন বার গুণিল: শেষে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া সমস্ত টাকা ব্যাগে ভাল করিয়া রাখিয়া ব্যাগটা বাক্সে তুলিয়া তালাবন্ধ করিল: তারপর কোনপ্রকারে জামাটা টানিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিয়া জুতায় পা গলাইয়া দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরের দরজা বন্ধ করিল। সিঁড়ির উপর জুতা ভাল করিয়া পরিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া যাইবার সময় মাষ্টার মহাশয়কে ঘরের ও বাক্সের চাবি দিয়া বলিয়া গেল, তাহার ফিরিতে বিলম্ব হইবে। পথ দিয়া যাইতে যাইতে কেবলি তাহার কানে বাজিতেছে রসরাজের সেই কথা,—জীবন একটা মেয়ের চেয়ে ঢের বড়; এ রকম একটা মেয়ের জন্য এ-জীবন নষ্ট করা চলবে না।

রসরাজ ত মুখে বলিয়াই খালাস। মুখে বলিলেই কি মন বুঝে? দুষ্টু ছেলেকে যেমন চোখ বন্ধ করিয়া শুইয়া থাকিতে বলিলে সে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, কিন্তু সুযোগ পাইলেই চায়, কেহ দেখিতেছে দেখিলে আবার চোখ বন্ধ করে, তেমনি ভবেশ মনের চোখ বুজিয়া থাকিলেও, সুবিধা পাইলেই সে চোখ খুলিয়া যাইতেছে ও সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে ডলির ছবি। মাহিনা ও পূজার বোনাস পাইয়া সে মেসের চার্জ মিটাইয়া দিয়াছে: বাকী যাহা আছে তাহাতে ডলির টাকাটা দিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু ডলির কাছে যাইতে সাহসে কুলাইতেছে না। কিরূপ অভ্যর্থনা পাইবে কে জানে? হয়ত দেখাই করিবে না; হয়ত চাকর আসিয়া বলিবে দিদিমনি বলিলেন তিনি বাড়িতে নাই। বেচারির যাইবার উপায় নাই, অথচ না গিয়াও শান্তি নাই। নদীর তীরবর্তী গাছের নীচে আগুন লাগিলে গাছের বাঁদর না পারে জলে ঝাঁপাইতে, না পারে আগুনের উপর লাফাইতে; বেচারিকে জড়সড় হইয়া গাছেই থাকিতে হয়। ভবেশের অবস্থা অনেকটা এইরূপ।

অভ্যাস-দোষে তেমনি সাজিয়া বৈকালে বাহির হইয়াছে। রসরাজ যে দোকানটা দেখাইয়াছিল ঘুরিতে ঘুরিতে সেই দোকানের সামনে আসিয়া শো-কেসে ঝুলানো কাপড় দেখিতে লাগিল। পাশাপাশি দুটো শাড়ি, একটির দাম বত্রিশ টাকা, অন্যটির দাম আড়াই শো। ভবেশ নির্বিষ্টচিত্তে দেখিতেছে। ইত্যবসরে রসরাজ আসিয়া হাজির। গায়ে খদ্দরের একটা ছেঁড়া পাঞ্জাবি, মুখে এক রাশ দাড়ি, মাথার চুলগুলো সজারুর কাঁটার মত খাড়া হইয়া আছে: দেখিলে মনে হয় একটা কাটখোট্টা পালোয়ান সদ্য কুস্তি করিয়া আসিতেছে। ভবেশ নমস্কার জানাইল। রসরাজ বলিয়া উঠিল, "আমার গুড্ মর্ণিং, না নমস্কার, না আদাব—কোন্‌টা চাই কি করে বুঝলেন? তিনটেই বলা উচিত ছিল। আমি তিনটেই বলি। সংক্ষেপ করবার চেষ্টা করেছিলাম,—গুড্ মর্ণিং-এর গু, নমস্কারের ন, আদাবের আ,—গু-আ-ন,—হয় না; আ-ন-গু,—হয় না: অনেকে চটে যায়। আ-গু-ন,—চলতে পারে। আমি অনেককে 'আগুন' বলি; যারা বুঝে না তারা রেগে আগুন হয়। আমাকে আগুন বললে আমি কিন্তু খুব খুসী হই।" হঠাৎ থামিয়া গিয়া রসরাজ আড়াই শো টাকার শাড়ীটা নির্বিষ্টচিত্তে দেখিতে লাগিল। "এটা উপহার দেওয়ার উপযুক্ত জিনিষ বটে। আপনার লোভ হচ্ছে নিশ্চয়। কেরানির অত উঁচু নজর হওয়া ভাল নয়।" "কেরানি" আজকাল আপদ। 'করনিক' বলা উচিত। "আরে মশায়, আমি জেল খেটেছি অপদ কুপদ যা ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারি। আপনারা করবেন না। আপনাদের ডিফিটিষ্ট মেণ্টালিটি থাকাতে আমাদের সুবিধা হয়। এই ডেমোক্র্যাসির যুগে আপনার চাহিদা ও আমার চাহিদা সমান হলে—আমি দাঁড়াই কোথায়? সেইজন্য আপনি ডেমোক্র্যাটিক রুচি নিয়ে ঐ বত্রিশ টাকার সাড়িটা দেখবেন, আমি ডেমোক্র্যাসির জয়গান গাইতে গাইতে অ্যারিস্টো-

ক্র্যাটিক রুচিটা ঝালিয়ে নিয়ে ঐ আড়াইশো টাকার শাড়িটা চাইবো। বুঝেছেন? আপনি কেরানিগিরি করবেন আর আপনার প্রেয়সী রাণীগিরি করবেন তা হ'তে পারে না। ব্রিটিশ আমলে কিছুদিন জেল খেটে নেন্‌নি কেন?"

"ভুল হয়ে গিয়েছে।"

"ভুল যখন হয়েছে তখন ছোট ছেলের মত চুষি-কাঠি চুষুন। এনে দেবো একটা?" ভবেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। "হাসছেন যে?" "আপনার এক ঘুঁষিতে আমার মত দু' চারটে ফুট্‌পাথে গড়াগড়ি খাবে। আপত্তি জানাবার উপায় নাই বলে হাসছি।" "ঘুঁষি আমি মারি না; আমি অহিংসাপন্থী। কিন্তু ঘুঁষি মারতে জানি এবং মারতে পারি। এই মারতে জানা ও মারতে পারার জন্য রোজ দস্তুরমত ডন্‌-বৈঠক করি। এ শরীরটা লোহা,—বুঝেছেন?" হাত আগাইয়া দিল। ভবেশ টিপিয়া দেখিল কথা খুব মিথ্যা নয়। "লোহা,—বুঝেছেন? ইচ্ছা হয় মারি এক এক ঘুঁষি, মাথা ছিটকে গিয়ে পড়ুক পথের ওপারে।" ঘুঁষি বাগাইয়া এমন ভঙ্গি করিয়া দাঁড়াইল রসরাজ যে ভবেশ আতঙ্কে পিছাইয়া গেল। চারিদিকে অনেক লোক জমিয়াছিল; তাহারাও পিছাইয়া গেল। "পিছিয়ে যাচ্ছেন যে? ব্ল্যাকমার্কেটিং করেছেন? পারমিট্‌ বিক্রি? বেনামায় ব্যবসা? ও সব ব্রিটিশ আমলে চলতো; এখন চলবার উপায় নাই। বুঝেছেন?" দুই হাত পকেটে পুরিয়া পা ফাঁক করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভিড়ের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, "আপনাকে দেখে সত্যি ভয় পায়।" "যারা এই অহিংসাপন্থীর ঘুঁষি দেখে ভয় পায় তারা আস্ত কাপুরুষ। আমি কুপুরুষ, কাপুরুষ নই। সুপুরুষকে হিংসা করি, কাপুরুষকে ঘৃণা করি। সেইজন্য এই ভবেশবাবুকে ঘৃণা করি, আবার হিংসাও করি।" চারিদিকে অনেক লোক জমিয়াছে; অনেকের মুখে হাসি। "ভাল চেহারার সুবিধা অনেক। জানেন ত, বঙ্কিমবাবু বলেছেন, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। আমার মত কাঠখোট্টা চেহারা আনে দারুণ বিতৃষ্ণা। তার উপর এই ছেঁড়া খদ্দরের পাঞ্জাবি! আমার নিজেরই কেমন করছে। কিন্তু করি কি বলুন? বাক্স খুলে দেখি সব ভাল জামা, কোনটা রেশমি, কোনটা গরদ, কোনটা সার্জ ইত্যাদি। খদ্দর বলতে ছিল এইটি। অগত্যা গায়ে দিতে হ'লো। আজ সকাল থেকে দেশের কথা কইবার জন্য মনটা আটুপাটু করছিল। বুঝেছেন?" বুঝিয়াছে এইভাবে অনেকে মাথা নাড়িল। হঠাৎ হাতঘড়ি দেখিয়া রসরাজ বলিয়া উঠিল, "না, আজ আর না। ভবেশ বাবু কাল আসুন।" হন্‌ হন্‌ করিয়া চলিয়া গেল রসরাজ। বিস্মিত ভবেশ তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

মেসের বিছানায় চিৎপাত হইয়া শুইয়া ভবেশ আকাশ-পাতাল ভাবে। রসরাজ কাল আবার যাইতে বলিল কেন? ডলির বাড়ির সামনে দিয়া কয়েকবার ঘুরিয়া আসিয়াছে; ভিতরে যাইতে সাহস হয় নাই। একবার দেখা করিয়া সব কথা খুলিয়া বলিলে কেমন হয়? তার ভালবাসা যদি প্রকৃত হয়, তার কেরানিগিরি প্রতিবন্ধক হইবে কি? জীবনের নূতন আলো কি শেষে আলেয়াই হইল? ধ্রুব-তারা মিলাইয়া যাইবে শূন্যে! কেন সে আত্মগোপন করিয়া ডলির সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়াছিল? এত ঝঞ্ঝাট এই মিথ্যার আশ্রয় লওয়ার জন্য। ডলির বিশেষ দোষ নাই; নিজের সম্বন্ধে সে ডলির যে ধারণা জন্মাইয়াছিল তাহাতে মাত্র পঁচাত্তর টাকার একটা বিল দেওয়ার দাবী স্বাভাবিক। তাহার ঘাড়ে দোষ চাপাইলে হইবে কেন? নিজের কাছে নিজের দোষ স্বীকার করায় মন খানিকটা হাল্কা হইল ও অনেকটা শান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন ভবেশ আবার সেই দোকানের সামনে গিয়া হাজির হইল। রসরাজও আগের দিনের বেশে আবির্ভূত হইল। "ভবেশ বাবু, আপনি একজন চমৎকার লেডিজ্‌ ম্যান,—মহিলাদের আদরের বস্তু। এই পূজোর বাজারে একটা মস্ত বড় চান্স মিস করছেন। যাঁরা মোট হাতে ক'রে দোকান থেকে বেরোচ্ছেন তাঁদের হাত থেকে মোট ছিনিয়ে নিয়ে গাড়িতে চাপিয়ে দিয়ে সেলাম ক'রে হাত পাতুন, ভাল বক্‌শিস্‌ মিলবে। চোখমুখ একটু সজাগ ক'রে ইয়োর মোষ্ট ওবিডিয়েন্ট সারভ্যাণ্ট এ্যাটিচিউড্‌ নিয়ে দাঁড়ালে অনেক মহিলা আপনাকে অনেকভাবে ওয়াইজ করবেন। যান না! ওয়ার্থলেস্‌।" ইত্যবসরে লোক জমিতে আরম্ভ করিয়াছে। "আমিও পড়েছি এক মুস্কিলে। ঐ আড়াই শো টাকার শাড়িটা আমার চাই। মনে করছি একটা মহিলা বন্ধু সংগ্রহ ক'রে পূজোর বাজারে তাকে এটা উপহার দেবো। হাসছেন যে? আমার মত একটা খসখসে আবলুস কাঠকে কেউ ভালবাসবে না? পাঁচটি বছর জেল খেটেছি দেশের জন্য। ভাল না বাসলে অব্যাহতি আছে? এতদিন জেল খেটে এসে ব্ল্যাক-মার্কেটিং-এ লাভ করছি না এই যথেষ্ট। একটু লভ্‌ করতে পাবো না? আমি গাছ, না পাথর? মুস্কিল হয়েছে ট্যাঁকে একটা পয়সা নাই, আবার বাবার কাছেও হাত পাতবার উপায় নাই। বাবা ভারি হুঁসিয়ার, এ বিষয়ে এক পয়সা দেবে না। ঠাকুরদা আমাকে বলে গেছেন,

লভ্ করতে হয় ক'রিস্, কিন্তু গ্যাঁটের পয়সা খরচ ক'রে নয়। লভ্ ক'রে যদি ঘরে পয়সা আনতে পারিস্ তবে বুঝবো ঠাকুরদা'র যোগ্য নাতি। বাবা সেই বাপের বেটা ত! জুতসই হবে না। ভারি হুঁসিয়ার! বুঝেছেন? সেকেলে রায় বাহাদুর। রাজনীতিতে মাথা গলাতে আরম্ভ করেছি দেখে আমাকে ডেকে বললেন, "দ্যাখো বাবা, পেন্সন বন্ধ হ'লে বাবাগিরি আপনি বন্ধ হ'য়ে যাবে। তার চেয়ে তোমায় ত্যাজ্যপুত্তুর করি। কেমন?" পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। একটা চাকরকে বাড়ি থেকে বিদায় করে সঙ্গে জুটিয়ে দিলেন। দিনমান টো টো ক'রে ঘুরে বেড়াই দেশের কাজ ক'রে; রাত্রে সেই চাকর বাবাজি লুচি ভেজে খাওয়ায়, হাত-পা টিপে দেয়। টাকা যখন আসবার গোপনে এসে হাজির হয়। জেলে গেলাম, তখনও সঙ্গে সেই চাকর। ঐ শ্রীমানের দৌলতে এখনও সকাল সন্ধ্যায় দিব্যি দলাই মলাই হয় বলে বপুটি এধারে আস্ত আবলুস কাঠ হ'লেও বেশ নাধুস্ নুধুস্ আছে। অনেক বড় বড় পালোয়ানকে কাৎ করেছি আমি। প্যাঁচ ট্যাঁচ্ বুঝি না,—নাকের ডগায় পটাপট্ ঘুঁষি,—বস্ একেবারে ফ্ল্যাট। গরমে ফুটপাথে পড়ে মোষগুলো যেমন হাঁপায়, অবিকল তেমনি করতে থাকে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা মারপিট যাই করুন না কেন, আগে লাগান নাকে ঘুঁষি, না হয় ধরুন গলা টিপে। নাকে ঘুঁষি মারার সুবিধে হচ্ছে, দরকার হ'লে আপনি অনায়াসে পালিয়ে যেতে পারেন বা তার পিছনে আশ্রয় নিতে পারেন। গলা টিপে ধরলে বিপক্ষেরও গলা টিপে ধরার সম্ভাবনা আছে, অবশ্যি যদি সুবিধা পায়। কিন্তু জোরে টিপবেন, যেন সঙ্গে সঙ্গে কোঁ কোঁ শব্দ ছাড়ে। Always take the fort by storm,—ঝড়ের মত এসে দুর্গ অধিকার করুন। সর্বত্র এই নিয়ম খাটে, —এমন কি প্রেমের ব্যাপারেও। মুস্কিল করেছে আমার এই চেহারাটা! কি করা যায়! ভবেশবাবু আমাকে একটু সাহায্য করুন না।" ভবেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি কি করতে পারি?" "তাইত! চেহারাটা তো ধার দিতে পারেন না। আপনার কিন্তু অনেক প্রেয়সী থাকার কথা, সেই একটা ধার দিন না।" "বেশ।" "দিলেন তা হ'লে? ম'শায়'রা, শুনে রাখুন উনি আমাকে ও'র একটা প্রেয়সী ধার দিলেন। কিন্তু টাকা পাই কোথায়? Beg, borrow or steal?" রসরাজ শ্রোতাদের উপর একবার ভাল করিয়া তাকাইয়া লইয়া আবার বলিতে লাগিল, "দেবেন কেউ আমাকে ধার? আমার এক বন্ধু বলেন, 'বিয়ে করা স্ত্রীগুলো অনেকটা চেপে চুপে থাকে; বিয়ে-না-করা মহিলারা একেবারে বেপরওয়া। সত্যি কি না বলুন? এক বুড়ো দাদাম'শায় বলেন, মেয়েজাতের সৃষ্টি পুরুষজাতটা বিয়ে করবে বলে। কি ক'রে বোঝাই তাঁকে তাঁর এই পচা প্রাচীন মত বর্তমানে ডাস্ট-বিনে ফেলে দেওয়া ছাড়া উপায় নাই! বুড়ো কিন্তু নট্ বাজ অ্যান্ ইঞ্চ্। সেকেলে কিনা!"

হঠাৎ শোনা গেল একটি মহিলা-কণ্ঠ, "আপনারা একটু পথ দিন।" জনৈক মহিলা ও একটি যুবক আড়াইশো টাকার শাড়ীটা দোকানের এক কর্ম্মচারীকে দেখাইয়া দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। ভবেশ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। রসরাজ থামিয়া গিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, "কি ব্যাপার, ভবেশ বাবু?" ভবেশ অনুনয়ের সুরে বলিল, 'চুপ করুন। ডলি।' "ডলি? কৈ? এই সাড়িটা দেখিয়ে গেল যে?" ভবেশ মাথা নাড়িয়ে জানাইল, হাঁ। রসরাজ একটু চিন্তা করিয়া মুরব্বির মত মাথা নাড়িয়া বলিল, "বটে! আচ্ছা।" চারিদিকে অনেক লোক দাঁড়াইয়া। সকলকে ইসারায় চুপ করিয়া থাকিতে বলিয়া সামনের মটর গাড়ির পিছনে থামের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অল্প পরে ডলি ও সেই যুবক দোকান হইতে নামিয়া গাড়িতে চাপিল; ডলির হাতে একট প্যাকেট। ড্রাইভার ষ্টার্ট দিল;—গাড়ি চলে না। চারিদিকে যাহারা দাঁড়াইয়া আছে তাহাদের অনেকেই হাসিতেছে। ড্রাইভার আবার ভাল করিয়া ষ্টার্ট দিল, গাড়ি পূর্ববৎ নিশ্চল। চারিদিকে সকলে প্রচণ্ড হাততালি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ড্রাইভার নামিয়া আসিল; সেই যুবকও আসিল। রসরাজ গাড়ির পিছনের লৌহদণ্ড টানিয়া ধরিয়া আছে; গাড়ি সেই জন্য চলিতে পারিতেছে না। যুবক বিরক্তি ও বিস্ময়ের সহিত বলিল, "একি করছেন?" "গাড়িটি আমার।" "মানে?" "এই সব ভদ্রলোকদের জিজ্ঞাসা করুন।" "এই ভবেশবাবু আমাকে একটি প্রেয়সী দান করেছেন; তাঁর জন্য এই গাড়িটা দরকার। আমার টাকা নাই, কাজেই আমাকে ওটা উপহার দিয়ে যেতে হবে।" এবারে ডলিও নামিয়া আসিল। "বারে মজা!" "আজ্ঞে হাঁ, বড় মজা। আবার ষ্টার্ট দিন গাড়ি; এবারে উল্টো টানতে টানতে শ্যামবাজার নিয়ে গিয়ে বাড়িতে রেখে দিয়ে আসবো।" যুবক একটু দমিয়া গেল। "এ রকম বে-আইনি।" "প্রেমে আবার আয়না আয়নি কি? বিশুদ্ধ ইংরাজ আমলের ব্রুট ফোর্স। আপনার আগে যারা লাইন দিয়ে আছে তারা আগে পাবে তো? ডলি দেবী, ভবেশ বাবুর কাছ থেকে আপনাকে ধার নিয়েছি আমি। (যুবককে) আপনার আগে ডলি দেবীর কাছে লাইন দিয়েছিলেন ঐ ভবেশ বাবু।

ভবেশ বাবু এগিয়ে আসুন না।" ভবেশ এতক্ষণ ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিয়াছিল; এবারে সামনে আসিল। ভবেশকে দেখিয়া ডলি ঈষৎ হাসিয়া উঠিল; ভবেশ কিন্তু মুসড়িয়া পড়িল। রসরাজ হুঙ্কার দিয়া উঠিল, "বাগ্ আপ্, ম্যান! যত সব মাদী প্যাটার্ণের ছোকরাগুলো শিখছে ভ্যাকরণ আর ছ্যাকরণ,—সম্বল কেরানিগিরি, ট্যাঁকে নাই পয়সা, তবু হাপুস হাপুস করা চাই। ভবেশ বাবু, কেরানিগিরি করে সামলাতে পারবেন না বলে আমাকে ধার দিয়েছেন না কি?" ডলির মুখ এবারে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বুঝিতে পারিল ভবেশ কেন যায় নাই। "ভবেশ বাবু তবে কেরানিগিরি করেন? বেশ, কি হয়েছে তাতে?" গাড়ির মধ্যে আর এক মহিলা ছিলেন তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই। এবারে তিনি নামিয়া আসিলেন। রসরাজের দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপে বলিলেন, "এ-সব হচ্ছে কি? ও শাড়ি আমি ডলিকে নিয়ে কাল সকালে পছন্দ করে গিয়েছি, ওটা আমার চাই।" সবাই ঘাবড়াইয়া গেল। রসরাজের মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না। "লাইনের কথা বলছিলেন, লাইন আপনার আগে আমি দিয়েছি। গায়ে জোর থাকলেই হয় না। বেশী জোর হয়ে থাকে সার্কাসের দলে যান; বাইরে পাথর ভাঙবার জন্য কুলি দরকার, সেখানে যান; তিনগুণ মজুরি পাবেন। গরিলারও গায়ে জোর আছে। কি হয়েছে তাতে? ভবেশ বাবু, আপনি এত বেকুপ কেন? আসুন আমাদের সঙ্গে। ঐ বেখাপ্পা আবলুস কাঠকে কোন আক্কেলে ধার দিতে যান আপনি? ধার দেওয়া অত সস্তা নয়। আসুন।" ভবেশকে লইয়া তিনজনে গাড়িতে উঠিয়া চলিয়া গেল। রসরাজ নিশ্চল,—যেন কেউ জুজুৎসুর প্যাঁচে তার হাত পা অবশ করিয়া দিয়াছে। আর যাহারা ছিল সকলেই হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে। অনেকক্ষণ পরে রসরাজ বলিয়া উঠিল, "দেখলেন কাণ্ডটা! ভবেশ বাবুটাও এমন বিশ্বাসঘাতক!"

মনুমেণ্টের সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া রসরাজ বক্তৃতা করিয়া চলিয়াছেঃ "মেয়ে জাত সাংঘাতিক জাত। আস্ত মানুষকে করে দেয় গাধা। জনৈক ভদ্রলোককে বাঁচাবার জন্য কয়দিন ভূতের মত খেটে মরলাম; দেবীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁর মটর পর্যন্ত আটকালাম। শেষে আমারি হাত পা প্যারালাইজ্ করে দিয়ে চোখের সামনে দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল ভদ্রলোককে। জিজ্ঞাসা করবেন আমার মত ওস্তাদকে কায়দা করলো কি করে? ম'শায়, দু'দুবার মটর আটকালাম; শেষে মটর থেকে এক শ্রীমতী নেমে বললে আমাকে সার্কাস পার্টিতে যেতে না হয় মজুরদের সঙ্গে গিয়ে পাথর ভাঙতে। শুধু কি তাই? বলে কি না আমার মত আবলুস কাঠের পক্ষে ও ধৃষ্টতা অমার্জনীয়। ঘাবড়ে গেলাম। আপনারা কেউ বললে ঘাবড়াতাম না, আপনারা স্বজাতি, ঘরের লোক। কিন্তু বিভিন্ন জাতীয়া কেহ পুরোদস্তুর সেজে এসে পাকা আপেলের মত মুখে কট্ কট্ করে এরকম কথা যদি শোনায়,—প্যারালাইজড্ হতে হয় কিনা বলুন তো? সর্বনাশ!" রসরাজ হঠাৎ থামিয়া গেল। দেখে দূরে ভবেশ বাবু সেদিনের দল লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। "ভবেশবাবু, ও ভবেশবাবু? কি রকম লোক আপনি বলুন তো? সেদিন একবার বলেও যেতে পারলেন না?" সেদিনের উগ্রবক্তা মহিলা বলিলেন, "বক্তৃতা ছেড়ে এখানে আসুন দেখি।" "এই সেরেছে! সব শুনেছেন বুঝি? আপনাদের বলিনি।" "আসুন শিগ্গির।" রসরাজ সুর সুর করিয়া সিঁড়ি নামিয়া হাজির হইল। "যা ইচ্ছা বলুন। আমাদের কিছুই যায় আসে না। অন্ততঃ কারও আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন চেহারা আপনার হলে কিছু যেতো আসতো। ম'শায় এটা হাড়ে হাড়ে বুঝেন ব'লে এত দাপট্। যাক্, ভবেশ বাবু কেরানি তার কি হয়েছে? অমন চেহারার একটা দাম নাই? বাবা ডলির জন্য যথেষ্ট টাকা রেখে গেছেন যার জন্য ভবেশ বাবুর চাকরি না করলেও চলবে। আগামী রবিবারে ওদের বিয়ে: আপনার যাওয়া চাই। আই-সি-এস্, বি সি এসের মোহ আপনাদের থাকতে পারে, আমাদের আর নাই। বুঝেছেন?"

রসরাজ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে তার সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া বলিয়া উঠিল, "যা ইচ্ছা বলুন। আমার কিছুই যায় আসে না। ভবেশ বাবু, আপনি ডেজার্টার নাম্বার ওয়ান। বলেছিলাম না সেদিন, 'এ রকম' একটা মেয়ের জন্য এ জীবন নষ্ট করা চলবে না।' তা, জীবনটা নষ্টই করবেন দেখছি। এখনও বলছি, সাবধান। মেয়ে জাত সাংঘাতিক জাত। আস্ত মানুষকে করে দেয় গাধা।" বলিয়া হাতঘড়ি দেখিয়া হন্ হন্ করিয়া সে চলিয়া গেল।

রসরাজ এখনও মনুমেণ্টের সিঁড়িতে বক্তৃতা দেয়: সুবিধা পাইলেই জোর গলায় এখনও বলে, "মেয়ে জাত সাংঘাতিক জাত। আস্ত মানুষকে ক'রে দেয় গাধা।" ভবেশের বিবাহে গিয়াও সে নাকি সময়ে অসময়ে অনেকবার অনেককে এই কথা শুনাইয়াছে। ডলি ও তার দিদি সুবিধা খুঁজিতেছে রসরাজকে জব্দ করিবার। হয় তো সত্যই কোন দিন জব্দ করিয়া ফেলিবে।

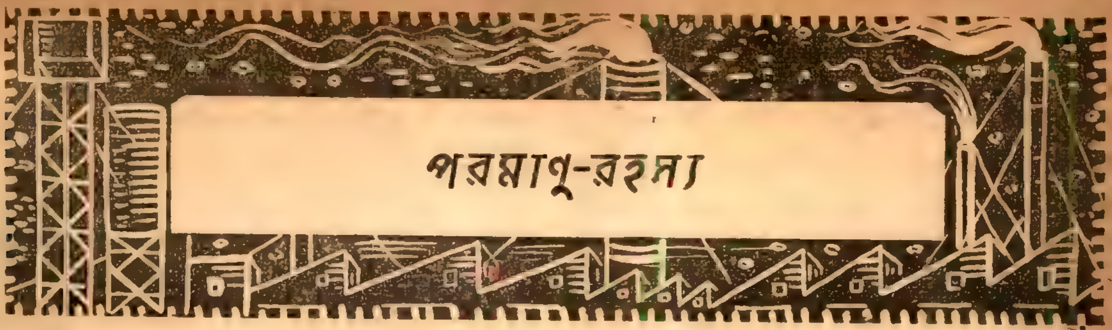

পরমাণু-রহস্য

অমরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আণবিক তত্ত্বের কথা আলোচনা করতে গেলেই প্রথমেই মনে পড়ে তার অপরিমিত প্রচণ্ড শক্তির কথা। ১৯৪৫ সালে ৬ই আগষ্ট হিরোসিমা ও নাগাসাকির বুকে তার প্রলয় ধ্বংসলীলা। সুন্দর সুশ্রী দুটি নগর রেণু রেণু হয়ে গিয়েছিল তার অভিশাপে। কি বিপুল ধ্বংসকর শক্তি লুকিয়েছিল তার মধ্যে। কথাটা ভাবলেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়। এই যে আণবিক শক্তি যা এই ধ্বংসকর কার্যে সাফল্যের রেখাপাত করেছে, তার দ্বারা মানুষের কল্যাণকর গঠনমূলক কাজ হয় কিনা তা জানবার জন্যে বৈজ্ঞানিক মহলে পড়ে গেলো সাড়া। পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকদের মাথায় মাথায় এই আণবিক রহস্যাবলীর কথা খেলতে লাগলো। দিনরাত চিন্তা—কি করে এই অপরিসীম শক্তিকে মানুষের কাজে নিয়োজিত করা যায়। হিরোসিমা ও নাগাসাকির ধ্বংসলীলার কথা জনসাধারণের বুকেও বিস্ময়ের ঢেউ তুলেছিল। কি এমন একটা পদার্থ যার মধ্যে এত বিপুল শক্তি লুকিয়ে থাকতে পারে ;—জনসাধারণের উৎসুক মনে বার বার এ প্রশ্ন আঘাত করেছে। এ প্রশ্নের উত্তর মোটামুটিভাবে পেতে হলে পরমাণুর গঠন প্রণালী সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান থাকা দরকার। পরমাণুর রহস্য কথা সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনার জন্যে এ প্রবন্ধের এই অবতারণা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিখ্যাত রসায়নবিদ জন ডাল্টন (John Dalton) পদার্থের গঠন প্রণালী ও পরমাণু (Atom) সম্বন্ধে গবেষণা সুরু করেন এবং তিনি জানান পদার্থ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য কণিকার দ্বারা গঠিত। ঐ কণিকাগুলির ধ্বংস নাই, উহা অবিভাগযোগ্য এবং অবিভেদ্য। এই সূক্ষ্ম কণিকার তিনি নাম দিলেন পরমাণু বা Atom। তিনি আরও বললেন, পরমাণু স্বাভাবিক মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে এবং সকল রকম রাসায়নিক ক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে। কিছুকাল পরে তাঁর এই যুক্তিকে খণ্ডন করলেন অন্য আর একজন রসায়নবিদ। তাঁর নাম এভোগেডরো। তিনি বললেন, পরমাণু পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, কিন্তু পরমাণু যে মুক্ত স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে একথা সত্য নয়। তিনি বললেন, কয়েকটি পরমাণু একত্রিত হয়ে গোষ্ঠি রচনা করে থাকে এবং সেই গোষ্ঠির নাম 'অনু' (Molicule)। উপাদান হিসাবে তিনি জলের কথা তুললেন। এবং এক অনু জল, দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু দিয়ে গড়া—এও দেখিয়ে দিলেন। এভোগেডরো আরও জানিয়ে দিলেন, পদার্থের এই পরমাণুরা সর্ববিষয়ে একই রকম। এভোগেডরোর যুক্তিগুলি এতদিন চলে আসছিল এবং এই অবিভাজ্য, অবিভেদ্য, অবিনাশী পরমাণু দিয়ে পৃথিবী গড়া—এই কথাই সকলের মনে বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আলোকজ্জ্বল বিজ্ঞানের যুগে পদার্থবিদ্যা সকলের মনের এই ধারণাকে বদলে দিল। বর্তমানে শতাব্দীর পদার্থ বিজ্ঞানই পূর্বের পরমাণুবাদকে রূপান্তরিত করেছে।

অবিভেদ্য, অবিভাজ্য পরমাণুকে ভাঙ্গা যায় কিনা এই নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করলেন পরবর্তী কালে বিজ্ঞানবিদ লেণার্ড ও জে জে টমসন। গবেষণায় তাঁরা সাফল্যলাভ করলেন। পরমাণু ভেঙ্গে তাঁরা দেখালেন, এই পরমাণু বিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা প্রত্যেকেই একই ওজনের এবং ধন তড়িৎবাহী (Negative atomic charge)। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার নাম দেওয়া হল 'ইলেকট্রন' (Electron)। পরমাণু ভেঙ্গেই এইখানে কিন্তু বৈজ্ঞানিকবৃন্দ ক্ষান্ত হলেন না। তাঁরা দেখলেন ইলেকট্রন ধনতড়িৎবাহী—কিন্তু শুধু ইলেকট্রন দিয়েই পরমাণু গড়া হতে পারে না। কেননা, যদি গড়া হ'ত তাহলে পরমাণুটি ধন-তড়িৎবাহী হত। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা হ'ল, পরমাণুটি কোন তড়িৎ বহন করে না। তখন বৈজ্ঞানিক-

দের মাথায় এল, পরমাণুর মধ্যে নিশ্চয়ই এমন একটি পদার্থ-কণা আছে যা ঐ ধন-তাড়িৎবাহীর বিপরীত ধর্ম গ্রহণ করে আছে—অর্থাৎ সম পরিমাণ ধন-তাড়িৎবাহী। এই নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে হৈহৈ পড়ে গেলো। দেখা যক পরমাণুর মধ্যে আরও কি জিনিস লুকিয়ে আছে! গবেষণাগারে চললো বিরামহীন গবেষণা। এই গবেষণার জয়ও একদিন হ'ল। বৈজ্ঞানিকবৃন্দ দেখতে পেলেন ধন-তাড়িৎবাহী কণিকার অবস্থান। এই কণিকা অতি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম। এক ইঞ্চির লক্ষ লক্ষ ভাগের একভাগ। বস্তুতঃ কল্পনায় আনা যায় না। এই ধন-তাড়িৎবাহী কণিকা পরমাণুর এক স্থানে আবদ্ধ হয়ে আছে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে লর্ড রাদারফোর্ড পরমাণুর "কেন্দ্রিক মতবাদ" উত্থাপন করেন। তিনি তাঁর কল্পনায় পরমাণুর একটি চিত্ররূপের কাঠামো গড়েছিলেন। পরমাণুর মধ্যস্থলে অবস্থান করছে ধন-তাড়িৎ কণিকা (Positive atomic charge) যার নাম "প্রোটন"। আর তারই চতুর্দিকে ঘুরছে ঋণ-তাড়িৎবাহী (Negative atomic charge) ইলেকট্রন। মধ্যের ধন-তাড়িৎবাহী কণিকার নাম "কেন্দ্রিক" (Nucleus)। চিত্রটির রূপ মনে মনে কল্পনা করলে আমরা সৌরমণ্ডলের রূপটি তার মধ্যে দেখতে পাই। সূর্য্য যেমন সৌরমণ্ডলের মধ্যমণি আর তার চারিদিকে যেমন নিজ নিজ অক্ষপথে গ্রহগণ ঘুরছে, তেমনি "কেন্দ্রিক"ই পরমাণুর মধ্যমণি, আর ইলেকট্রনগুলি গ্রহের মত তার চারিদিকে ঘুরছে। প্রশ্ন এইখানে উঠে—সকল পদার্থের পরমাণুতে কি ইলেকট্রনের সংখ্যা এক না কমবেশী? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বিখ্যাত রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক ম্যাণ্ডেলিফ তাঁর রচিত "পিরিয়ডিক টেবিলে" (Periodic table)। এই পৃথিবীতে যত কিছু মৌলিক পদার্থ আছে, সেই সব পদার্থগুলোকে বিশেষ স্থানে সাজান হয়েছে তার পরমাণবিক সংখ্যা (Atomic number) হিসাবে। যে পদার্থের পরমাণবিক সংখ্যা যত তার পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের সংখ্যাও তত। পিরিয়ডিক টেবিলে "হাইড্রোজেন" প্রথম স্থান অধিকার করেছে। হাইড্রোজেনের পরমাণবিক সংখ্যা এক, সুতরাং তার পরমাণুর ইলেকট্রনের সংখ্যাও হবে এক। পরের ঘরটি অধিকার করেছে হিলিয়াম। তার পরমাণবিক সংখ্যা দুই, সুতরাং তার পরমাণুর মধ্যস্থিত ইলেকট্রনের সংখ্যাও দুই। এইভাবে পর পর সমস্ত উপাদানগুলিকে সাজান হয়েছে তাদের পরমাণবিক সংখ্যা হিসাবে। পিরিয়ডিক টেবিলের শেষ উপাদান হচ্ছে, 'ইউরেনিয়াম' এবং ইহাই সবচেয়ে ভারী মৌলিক পদার্থ। ইহার পরমাণবিক সংখ্যা বিরানব্বুই। সুতরাং ইহার কেন্দ্রিকের চারিদিকে বিরানব্বুইটি ইলেকট্রন ঘুরছে। এই পদার্থটি আণবিক শক্তি দানে যুগান্তর এনেছে।

পরমাণুর ওজন আছে কিনা তা জানবার জন্যে বৈজ্ঞানিক মহলে সাড়া পড়তে বাকী থাকেনি। শেষে এ্যাস্টনের (Mass Spectrograph) বা "ভর যন্ত্রের" সাহায্যে পরমানুর যে ওজন আছে তাও প্রমাণ হ'ল। দেখা গেল মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওজন ভিন্ন ভিন্ন। এদের বলা হয় "আইসোটোপ" (Isotop)। হাইড্রোজেনের পরমাণবিক সংখ্যা এক। সুতরাং এতে একটিমাত্র ইলেকট্রন তার প্রোটনের চারিদিকে ঘুরছে। এর তাড়িৎ পরিমাণ যতটুকু, কেন্দ্রিকে অবস্থিত একটি প্রোটনের তাড়িতশক্তিও ততটুকু আর হাইড্রোজেনের পরমাণবিক ওজন (Atomic weight)ও এক। কিন্তু গণ্ডগোল বাঁধলো 'পিরিয়ডিক টেবিলের' দ্বিতীয় উপাদান হিলিয়ামকে নিয়ে। হিলিয়াম ঘটিত জটিলতাই কিন্তু বৈজ্ঞানিক মহলকে দেখিয়ে দিল পরমাণুর মধ্যস্থিত এক নূতন আলোক-বর্তিকা। হিলিয়ামের পরমাণবিক সংখ্যা দুই—তার ইলেকট্রনের সংখ্যাও দুই। সুতরাং পরমাণুটি তখন তাড়িৎহীন হবে, যখন হিলিয়ামের কেন্দ্রিকে সমানসংখ্যক অর্থাৎ দুটি প্রোটন থাকবে। কিন্তু হিলিয়ামের পরমাণবিক ওজন চার। সুতরাং এর কেন্দ্রিকে থাকবে চারটি প্রোটন। তাহলে হিলিয়াম পরমাণু তাড়িৎহীন কিরূপে হবে? মহা সংশয় উপস্থিত হ'ল বৈজ্ঞানিক মহলে; কিন্তু বৈজ্ঞানিকবৃন্দ সহজে বিষয়টা ছেড়ে দিলেন না। আবার গভীরভাবে গবেষণা চললো পরমাণুকে নিয়ে। তাঁরা চাইছিলেন তার মধ্যে আরও কিছু আছে কিনা যার ওজন আরও দুটি প্রোটনের ওজনের সমান হবে। তাঁরা পেয়ে গেলেন ঠিক তাইই। দেখলেন হিলিয়াম পরমাণুর মধ্যে দুটি সম ওজন বিশিষ্ট তাড়িৎহীন কণা রয়েছে যার ফলে পরমাণুটি তাড়িৎহীন হয়েছে। এই কণার নাম দেওয়া হল "নিউট্রন"।

পরমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে হেনরী ব্যাকারেল ও কুরী সম্প্রদায় এক নূতন আলোক সম্পাত করেন। কুরী সম্প্রদায় "রেডিয়াম" নামে এক দুষ্প্রাপ্য পদার্থে এই ব্যাপারটি ভালভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। পদার্থের তেজোষ্ক্রিয়া (Radio-activity) বলা হয় এই ব্যাপারটিকে। রাদারফোর্ড পদার্থের তেজোষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে বিশেষভাবে গবেষণা করে দেখলেন তেজোষ্ক্রিয়া পদার্থে (Radio-active elements) কেন্দ্রিক বড় ঠুন্‌কো অর্থাৎ ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী। অতি অল্প সময়েই পরমাণুর কেন্দ্রিক ভেঙ্গে

যায় ও তিনটি রশ্মির আকারে তা হতে প্রচুর শক্তি বেরিয়ে আসে। ঐ তিনটি রশ্মিকে বৈজ্ঞানিক সমাজ নাম দিয়েছেন 'আলফা', 'বিটা' ও 'গামা'। কেন্দ্রিক হতে শক্তি নির্গমের কথা বৈজ্ঞানিকদের মাথায় এই সর্বপ্রথম এল।

ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রিক ক্ষণস্থায়ী ও সহজে ভেঙ্গে যায়। ইহার কেন্দ্রিক মৃদুগতি বিশিষ্ট নিউট্রনের আঘাতে দুভাগে ভেঙে যায়, ফলে তার মধ্যে থেকে প্রচুর শক্তি বেরিয়ে আসে আর বেরিয়ে আসে কতকগুলি নিউট্রন। সেই নিউট্রন পাশের কেন্দ্রিককে আঘাত ঘটায়। ফলে সেই কেন্দ্রিক ভেঙে আরও শক্তির উদ্ভব হয় ও আরও কয়েকটি নিউট্রন বেরিয়ে আসে। তারা আবার অন্য কেন্দ্রিকে আঘাত করে—ফলে আরও শক্তির উদ্ভব হয় অতি অল্প সময়ে এবং এই ভাসমান শক্তি ভীষণভাবে বিস্ফোরিত হয় মাত্র কয়েক সেকেন্ডে। কেন্দ্রিক ইউরেনিয়াম ২৩৮ চেয়ে ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর কেন্দ্রিক ভাঙ্গনে খুব তৎপর। কিন্তু ইউরেনিয়াম ২৩৫ বড় দুষ্প্রাপ্য। এই ব্যাপারটি যত সহজে বলা হ'ল তত সহজে কিন্তু সংঘটিত হয় না। ব্যাপারটি বেশ জটিল ও কঠিন। ইউরেনিয়ম কেন্দ্রিক ভাঙ্গনের ফলে যে শক্তি, তাপ ও চাপের সৃষ্টি হয়, তা শুনলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। যখনই কেন্দ্রিক ভাঙ্গে তখন তার মধ্যে হতে প্রায় দুশ মিলিয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি বাহির হয়। আরো আশ্চর্য এই যে, এই শক্তির সৃষ্টি হতে মাত্র কয়েক মাইক্রো-সেকেন্ড সময় লাগে। আর এই শক্তি কয়েক মিলিয়ন তাপ আর কয়েক মিলিয়ন চাপ দেয়। এই তাপ ও চাপের ফল যে কি ভীষণ তা কল্পনা করা যায় না। হিরোসিমা ও নাগাসাকির ধ্বংসলীলা তারই সাক্ষ্য দেয়। এই অমিত শক্তিকে যাতে মানুষের কল্যাণকর কাজে লাগান যায়, তার জন্যে বৈজ্ঞানিক মহল সচেষ্ট হচ্ছেন। এই শক্তিকে যেদিন মানুষ তার কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত করতে পারবে, সেদিন সত্যিই এই আণবিক শক্তি পৃথিবীতে এক যুগান্তর আনবে।

★

বাংলায় কিশোর-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ

বয়স্ক ব্যক্তিদের বিজ্ঞান-চর্চার ন্যায় দেশের কিশোর সমাজেরও বিজ্ঞান-চর্চার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিশোর-জীবনের গোড়া হইতেই যদি বালক-বালিকাদের বিজ্ঞান-বিষয়ক একটা সাধারণ জ্ঞান জন্মে তবে বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষা তাহাদের পক্ষে অধিকতর সহজ হইয়া ওঠে। আজিকার যুগ বিজ্ঞানের যুগ, বিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই এ যুগের মানুষকে বাড়িয়া উঠিতে হইবে। এক্ষেত্রে শিশুদের সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানবিষয়ক নানা গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা এ দেশে দীর্ঘকাল হইতেই অনুভূত হইয়া আসিতেছিল ; কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তির উদার মনোবৃত্তির অভাবে এ পর্যন্ত এতদ্বিষয়ক কার্যকারিতা আদৌ অগ্রসর হইতে পারে নাই। সুখের বিষয় যে, সম্প্রতি কলিকাতা ঈগল পাব্লিশিং কোম্পানী এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়া দেশের একটা অতিপ্রয়োজনীয় অভাব দূর করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহারা এ পর্যন্ত কিশোর-উপযোগী পাঁচখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, যথাঃ (ক) অ-পদার্থ আর পদার্থের কথা, (খ) পারা থেকে সোনা, (গ) এই দুনিয়ার চিড়িয়াখানা, (ঘ) পায়ের নখ থেকে মাথার চুল এবং (ঙ) যমের সঙ্গে যুদ্ধ। ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি, বায়োলজি, ফিজিওলজি, হাইজিন ও মেডিসিন—প্রধানতঃ এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করিয়াই খণ্ডে খণ্ডে উক্ত গ্রন্থগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। ডিটেক্টিভ্-পড়া ছেলেমেয়েদের মনকে এদিকে ফিরাইয়া দেওয়া যাহাতে সহজেই সম্ভব হয়, তজ্জন্য যথোপযোগী চিত্রের দ্বারা গল্পাকারে বিষয়গুলিকে সহজ আবেদনগ্রাহ্য করিয়া তোলা হইয়াছে। বাংলায় সম্ভবতঃ এই জাতীয় প্রয়াস এই প্রথম। তজ্জন্য ইহার উদ্যোক্তা ও সম্পাদকবৃন্দ অভিনন্দনযোগ্য।

এই মর্ত্যভূমি

শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

রাত্তির প্রায় সাড়ে দশটায় সুকুমারের দরজায় কে যেন খুব জোরে বার বার টোকা মারলো—ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্। এমন ক'রে আজ অবধি কেউ দরজায় শব্দ করে নি। ব্যস্ত হ'য়ে তাড়াতাড়ি ড্রেসিং গাউন ঠিক ক'রে সুকুমার দরজা খুললো।

পামেলা! তুমি—এত রাত্রে? পামেলার মুখ দেখে ভয় পেল সুকুমার। কোথায় গেল ওর হাসি। সুকুমারের বুকে মাথা রেখে দুই হাত দিয়ে শক্ত ক'রে ওকে ধ'রে পামেলা কাঁপছিল।

কি হয়েছে প্যাম? তুমি এমন করছ কেন?

কার সংগে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে সুকুমার—এ কেমন বন্ধু তোমার?

কে আমার বন্ধু পামেলা?

ওই মিঃ বিজন ঘোষ—আমাকে ফোন ক'রে ওর ঘরে দিশি খাওয়াবে ব'লে নেমন্তন্ন করে—আমি ভাবলাম তুমিও আসবে—ওর ঘরে তোমাকে না দেখে জিজ্ঞেস করলাম, সুকুমার কই? ও বললো, ছোট ঘর, দু'জনকে খাওয়াতে অসুবিধা—সুকুমারকে অন্য আর এক দিন বলবো—

তারপর?

তারপর এক সময় খাটে ও আমার পাশে এসে বসলো, ঘাড়ে হাত রাখলো—তারপর—হঠাৎ বললো, আমি তোমাকে ভালবাসি—এ রকম ভারতীয় বন্ধু তোমার আর ক'টি আছে—যারা ভদ্র ব্যবহার জানে না?

লজ্জিত হ'য়ে সুকুমার বললো, ও আমার বন্ধু নয় পামেলা—আমি ওকে একেবারেই চিনি না—মাত্র একদিন দেখেছিলাম—ও রাস্তায় আমাকে দেখেও দেখতো না—সেদিন 'জলি'তে তোমাকে দেখে বোধহয় দেখালো যেন আমার বন্ধু—

ছি ছি নির্লজ্জ!

ওকথা তুমি ভুলে যাও পামেলা, সুকুমার ওকে ধরে খাটে বসালো, তারপর বললো, বল কি কি খেলে তুমি?

খাবো? আমি লোকটাকে ধাক্কা মেরে তোমার কাছে ছুটে এলাম—যা রাগ হ'য়েছিল আমার তোমার ওপর—

বাঃ, আমি কি করলাম?

আমি ভেবেছিলাম ও তোমার বন্ধু—

হেসে সুকুমার বললো, কেমন ক'রে ভাবলে তুমি সেকথা—আমার বন্ধু তোমাকে অসম্মান করতে পারে কখনও—যাক্ রাগ পড়েছে তো?

না—

আমাকে দেখে?

তোমাকে দেখতে চাই না আমি।

তাহ'লে এই রাত্তির সাড়ে দশটায় এত দূরে কাকে দেখতে এলে তুমি? আর কোন বন্ধু আছে নাকি তোমার এ-পাড়ায়?

সুকুমার তুমি একটা পশু।

যাক্ তোমার খাওয়া হয়নি আজ, কি খাবে বল?

কিচ্ছু না, আমাকে বাড়ী যেতে হবে এখুনি, পামেলা উঠে দাঁড়ালো।

না খেয়ে তুমি যেতে পাবে না প্যাম্, উপবাসীকে অন্ন না দেয়া ভারতীয় রীতিবিরুদ্ধ!

এটা ভারতবর্ষ নয়—ইংল্যান্ড।

কিন্তু তুমি উপবাসী আর আমি ভারতীয়—তোমাকে আমি অন্ন দেবোই—

রাত্তির হ'য়ে গেলে আমি ট্রেন পাবো না—বাস মিস্ করবো।

কিন্তু হে আমার রাণী, তুমি তো মাঝ-সমুদ্রে নেই—তুমি আছো তোমার শ্রেষ্ঠ বন্ধুর ঘরে—মিস্ করলে ক্ষতি কি?

তার মানে?

মানে, এখানে আজ তোমাকে থেকে যেতেই হবে।

কখ্খনো না—ডোণ্ট বি সিলি।

আমি তোমাকে যেতে দেবো না। এই রাত্রে—একা একা

—অভিনয়ের সুরে সুকুমার বললো, কোন প্রাণে আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো বল? বল তো সংগে যাই?

না অত দয়ায় আমার কাজ নেই—এক অভদ্র ইণ্ডিয়ানের হাত এড়িয়ে পড়লাম আর এক ইণ্ডিয়ানের খপ্পরে—

কিন্তু বন্ধু, এ ইণ্ডিয়ান হোঁৎ ক'রে তোমার ঘাড়ে পড়ে কোনদিনও বলে নি, আমি তোমাকে ভালবাসি—

কারণ এটি গভীর জলের মাছ—তার চেয়ে মিঃ বিজন ঘোষ অনেক ভালো।

কিন্তু কেন তার দাম তুমি দিলে না, অভিনয়ের সুর বজায় আছে সুকুমারের, সত্যি কথাটা সহজ ভাবে সে প্রকাশ করতে সাহস পেয়েছে, তোমাকে দেখলে কার না ভালবাসতে ইচ্ছে হয়? তুমি যে যুগ-যুগান্তরের ভালো-বাসার ধন পামেলা—

আচ্ছা আমি চললাম—

আমি তোমাকে যেতে দেবো না—দেবো না—আমাকে একা ফেলে তুমি যেও না পামেলা—

তোমার একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই সুকুমার—আমার মান-সম্মানের কথা খুব ভাবো তুমি—এ-ঘরে তোমার সংগে থাকলে কি ভাববে তোমার বাড়ীর লোক?

উঃ কী ছোট মন! আমি কি একবারও বলেছি যে তুমি আমার ঘরে থাকবে?

তবে?

উরসুলার ঘরে—তার ঘর শনি-রবিবার ছাড়া সব সময় খালি—হেসে পামেলা বললো, একথাটা আগে বলোনি কেন?

ইচ্ছে করে। ভেবেছিলাম আমার ঘরে থাকতে রাজী হবে।

বদমাইস—পশু—

কিন্তু সুকুমার তখন ঘর থেকে বেরিয়ে খুব আস্তে হেলেনের দরজায় টোকা মারছে।

নীল ড্রেসিং-গাউন প'রে হেলেন মুখ বাড়ালো. কি ব্যাপার সুকুমার?

আমি ভ—য়া—নক দুঃখিত হেলেন তোমাকে বিরক্ত ক'রে—কিন্তু আমার ভয়ানক বিপদ।

তাড়াতাড়ি নোয়েল এসে বললো, কি বিপদ?

মানে, পামেলা ট্রেন মিস্ করেছে—উরসুলার ঘরে ও আজ থাকতে পারে?

ওরা হেসে বললো, এই বিপদ?

আর এক বিপদ—ওর কিছু খাওয়া হয় নি।

খুব বড় বিপদ বল তোমার—হেলেন বললো, আমি রান্নাঘরে যাই—চীজ্ রুটি অনেক কিছু আছে—

আহা হেলেন তুমি কষ্ট ক'রে নিচে যাবে কেন? সে কিছুতেই হ'তে পারে না—আমি যাচ্ছি—

হেসে হেলেন বললো, না বাপু কাঁচের থালা-বাসন তোমাকে আর ছুঁতে দেয়া হবে না—তুমি ঘরে গিয়ে বসো আমি পামেলার খাবার ওপরে নিয়ে আসছি—কি খাবে ও? চা না কফি—

যা—হয়—শুধু শুধু তোমাকে কষ্ট দিলাম হেলেন।

কিছু না সুকুমার।

একটু পরে হেলেন ওপরে এলো—সুকুমারের জন্যেও এনেছে কফি আর চকলেট-বিস্কুট।

পামেলার ঘরে গ্যাস্ জেবলে দিয়েছি, একটু গরম হোক ঘরটা—পামেলা জানো কোনটা উরসুলার ঘর?

হ্যাঁ।

আচ্ছা খাও তোমরা, তারপর এগুলো আমি নিচে নিয়ে যাবো।

সে কি? পামেলা বললো, আমরা রেখে দেবো—তুমি শুতে যাও হেলেন—অনেক রাত্তির হয়েছে।

কিন্তু সাবধান—সুকুমারের হাতে প্লেট দিও না যেন—ও যদি বৈজ্ঞানিক কায়দায়—হেলেন হেসে পামেলাকে বললো সে-গল্প।

আর একটু থাকো প্যাম্!

আর এক মিনিটও নয়।

ওই দেখ পামেলা, সুকুমার জানলার পর্দা সরিয়ে দিলো, সারা রাত ওরা জবলে।

কবে যাবো আমরা আলেকজান্দ্রা প্যালেস দেখতে?

যাবে আজ?

হেসে পামেলা বললো, এই রাত্রে—বড় শীত যে—ওই যাঃ বাবাকে ফোন করা হ'লো না—তুমি ব'লে দেবে সুকুমার?

কি বলবো?

যে আমি আজ এখানে থাকবো।

তোমার মাথা খারাপ হয়েছে পামেলা? তোমার বাবাকে আমি বলবো যে, মশাই আপনার মেয়ে আজ আমার সংগে রাত্রিবাস করবে—ওরে বাবা—আমি কিছুতেই তা পারবো না—

কী ভাষা তোমার! আমিই যাই তাহ'লে, দরজার কাছে গিয়ে পামেলা বললো, গুড নাইট সুকুমার, আমি আর ওপরে আসবো না— সুকুমার তখনো তাকিয়েছিল সেই আলো-গুলির দিকে। বিদ্যুৎবেগে ফিরে বললো, ফিরে এসো প্যাম্!

গুড নাইট!
কী নিষ্ঠুর তুমি!
গুড নাইট।
শুভ রা—আত্রি!

দিন যেন ভেসে যায়। ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে যায় মাস। শীত চ'লে গেল। ফুল ফুটলো এপ্রিলে। নতুন পাতারা ঝলমল ক'রে উঠলো। সুরু হ'লো কত রবিনের আনা-গোনা। হাল্কা রোদ্দুরের ছোঁয়ায় দিশা হারালো লণ্ডনবাসী।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায় সুকুমারের। চোখ খুলে চুপ ক'রে শুয়ে থাকে সে। একটু পরে জানলার পর্দা সরিয়ে দেয়—উঠোন ভ'রে গেছে ঘাসে ঘাসে আর সবুজ মখমলের ওপর তবুও ঝরেছে মৃদু শিশির। হেমন্তের কথা মনে পড়ে যায়।

এমনি এক নতুন গ্রীষ্মের ভোরে কলিংবেল্ বাজলো। কারুর হয়তো ভাঙেনি ঘুম। বার বার বাজলো বেল্ কিন্তু সাড়া দিলো না কেউ। সুকুমার উঠলো। ড্রেসিং-গাউন গায়ে জড়িয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে নিচে নেমে এসে দরজা খুললো। দুজন পুলিশ—গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তাদের ভ্যান্।

সুকুমারকে দেখে বেশ অবাক হ'লো তারা। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তে মাত্র—সুপ্রভাত জানিয়ে একজন জিজ্ঞেস করলো, তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে আমাদের মাপ ক'রো, এ বাড়ীতে পিটার সিনক্লেয়ার ব'লে কেউ থাকে?

হ্যাঁ।

তাকে দয়া ক'রে একবার নিচে আসতে বলবে?

নিশ্চয়ই, তোমরা ভেতরে এসো, লাউঞ্জের দরজা খুলে সুকুমার তাদের বসতে বললো। তারপর সোজা তেতালায় এসে ধাক্কা মারলো অভ্রি-পিটারের দরজায়।

পিটার যে-অবস্থায় ছিল ঠিক সে-অবস্থায় ভ্যানে চ'ড়ে চলে যেতে হ'লো তাকে। তার নামে বেরিয়েছে বডি-ওয়ারেন্ট। গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল ওরা তাকে।

সুকুমার ছাড়া কারুর মুখ দেখে বোঝা গেল না যে তাদের এ বিষয়ে কোন কৌতূহল আছে। সংসারের কাজ যেমন চলে ঠিক তেমনি চ'লতে লাগলো।

সেদিন ব্রেকফাষ্ট তৈরী করার পালা ছিল অভ্রির। হেলেন বললো, আজ আমি বরং ব্রেক্ফাষ্ট করি অভ্রি?

না, গম্ভীর মুখে বললো অভ্রি, আমার যখন পালা তখন আমিই করবো।

একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেল সুকুমার। এ কেমন মেয়ে! স্বামীকে পুলিশ ধ'রে নিয়ে গেল অথচ অভ্রির মুখ দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই।

ব্যাপারটা জানা গেল দিন কয়েক পর। যুদ্ধের আগে পিটার কিছুদিন ছিল ডেনমার্কে। কোপেনহেগেনে রুথ্ ট্যাক্লারসন ব'লে একটি মেয়েকে সে বিয়ে করে। বিয়ের কিছুদিন পর কি একটা কাজে পিটার চ'লে এলো আবার লণ্ডনে। বাধলো যুদ্ধ। আর ডেনমার্কে ফিরে যাওয়া সম্ভব হ'লো না পিটারের—ইচ্ছেও ছিল না ফিরে যাবার। বিয়ের ব্যাপারটা ও ইচ্ছে ক'রেই ভুলে গেল। যুদ্ধের পর বিয়ে করলো অভ্রিকে। কেউ জানতো না তার ডেনমার্কে বিয়ের খবর। কিন্তু রুথের বাবা খোঁজ আরম্ভ করলো পিটারের—একমাত্র মেয়ে তার আর সে পিটারকে ভালওবাসে খুব। সমস্ত ব্যাপার খোঁজ নিয়ে জানা গেল। রুথের বাবা রেগে আগুন—খুব সহজেই প্রমাণ পাওয়া গেল। মস্ত বড় অপরাধ। পিটার হ'লো গ্রেপ্তার—জেলে হ'লো তার স্থান। বেশ কিছুদিন তাকে থাকতে হবে সেখানে।

খবর পেয়ে অভ্রির মা বাবা মিঃ ও মিসেস ইল্ মেয়েকে তাদের কাছে ফিরিয়ে নিতে এলেন। কিন্তু অভ্রি গেল না কিছুতেই। বললো, বাড়ীর শেয়ার আমার নামে—আমি এখানেই থাকবো। শর্টহ্যাণ্ড জানতো সে। কোন এক আপিসে টাইপিষ্টের চাকরী নিলো অভ্রি।

সুকুমারের সংগে রোজ সকালে একসংগেই বাড়ী থেকে বার হয় অভ্রি। ২১২নং বাস ধরে ফিনস্বেরী পার্কে আসে —একই ট্রেনে চড়ে ওরা দুজন। সুকুমারের পরের ষ্টেশন হর্বোনে নেমে অভ্রি ব্যাগ দুলিয়ে আপিস যায়। কে দেখলে বলবে যে তার স্বামী জেলে পচছে।

সুবিকাশকে একদিন রাত্তিরে খেতে বললো সুকুমার। পামেলাকেও বলেছিল কিন্তু সে আসতে পারলো না—মিঃ স্মাইটের শরীর ভাল নেই—তার জন্যে কিসব আলাদা রান্না করতে হবে। সুকুমারের বাড়ীর হালচাল দেখে সুবিকাশের চক্ষু ছানাবড়া। বললো, বড় সুখে আছেন মশাই, আমাকেও একটা দেখে দিন না এ রকম জায়গা—

কিছুদিন আগে হ'লে আমারই ঘরটা আট মাসের জন্যে আপনাকে দিয়ে যেতে পারতাম!

আপনি কোথায় যাবেন?

আমি যাবো ফ্যাক্টরীতে ট্রেনিং নিতে—বেশ দূর—ল্যাঙ্কেসায়ারের একটা শহর—নাম প্রেষ্টন।

আপনার ঘরে কে আসছে?

এদেরই এক আত্মীয়—আমি ফিরে আসবার দিন পনেরো আগে চ'লে যাবে।

আর একবার বললো সুবিকাশ, খুব সুখে আছেন মশাই।

আপনার খবর বলুন, সুবিকাশ বাবু, কেমন লাগছে এদেশ?

খুব ভালো—তবে আমার দুর্ভাগ্য আমি যেন এদেশে থেকেও নেই।

কেন?

আব বলেন কেন, করুণ চোখে সুকুমারের দিকে তাকিয়ে বললো সুবিকাশ, কি যে ছেলেমানুষী করেন বাপ-মা! আমার জীবন নিয়ে তারা ঠিক ছেলেখেলা করেছেন। বিয়ে দিয়ে কাউকে পাঠাতে হয় এদেশে?

কেন তাতে ক্ষতিটা কি?

ম্লান হেসে সুবিকাশ বললো, সেকথা আপনার পক্ষে বোঝা মুস্কিল হবে সুকুমার বাবু, আপনি বুঝতে পারবেনও না, একটু থেমে আবার আরম্ভ করলো সে, উঃ কি করুণ অবস্থায় ঠেলে ফেলে দিয়েছেন আমাকে আমার বাবা—বিয়ে ক'রে আমি কিছুতেই আসতে চাই নি। আর বিয়ে ক'রে এসে কি লাভ আমার হ'লো? না পারি পড়াশুনোয় মন দিতে—না পারি প্রাণখুলে এদেশের মেয়েদের সংগে মিশতে। অথচ আপনারা সবাই সুখী—চারপাশে আনন্দ—এত যৌবন—অথচ আমার যেন বার্দ্ধক্য এসেছে—কিছুতেই তাল মেলাতে পারি না।

বিয়ে ক'রে এলেও তাল মেলাতে আপনার ক্ষতিটা কি?

সে হয় না সুকুমার বাবু, মনের কোণায় কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধে থাকে—মনে হয় অপরপক্ষ বিরহে কাল কাটাচ্ছে আর আমি এখানে ফুর্তি করছি—কিন্তু এই যে বিয়ে দিয়ে বাপ মা দায় মুক্ত হয়েছেন—অথচ আমি যদি এখন এখানে আর একটা বিয়ে করি—তাহ'লে একটি নিরীহ মেয়ের জীবন নষ্ট ক'রে দেয়ার জন্যে কে দায়ী হবে? আমি না আমার বাপ-মা?

কথাটা ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রে সুকুমার বললো, যাবার আগে ভেবেছিলাম পামেলার সংগে আপনার আলাপ করিয়ে দেব—কিন্তু আজ আসতে পারলো না ও—থাক্‌গে ইংল্যাণ্ডে দিন কত তাড়াতাড়ি কাটে জানেন তো—আট মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে—তখন ভালো ক'রে আলাপ হবে এখন—

ডিনারের ঘণ্টা পড়লো। সুবিকাশকে সংগে নিয়ে নিচে নেমে এলো সুকুমার। আজ ডিনারের ভার মারজোরীর।

সাপারের পর কোন এক সন্ধ্যায় অদ্রি এলো সুকুমারের ঘরে। ও যেন চোরের মতো এসেছে—বারবার পিছন ফিরে দেখলো কেউ ওকে এঘরে আসতে দেখেছে কি-না।

সুকুমার আর একটা কথা ঠিক ক'রে বলবে?

কিছু বুঝতে না পেরে বেশ ঘাবড়ে গিয়ে সুকুমার বললো, কি কথা অদ্রি?

তার প্রায় কানের কাছে মুখ এনে বললো অদ্রি, তুমি ঠিক বলেছিলে, একেবারে ঠিক যে খুব শীগ্‌গির আমার মা বাবার সংগে মিটমাট হ'য়ে যাবে—তাঁরা আমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছিলেন। সুকুমারের সামনে হাত মেলে দিয়ে সে বললো, কাউকে ব'লো না কিন্তু, চুপে চুপে আমার হাত দেখে ব'লো তো পিটার কার কাছে ফিরে আসবে? আমার কাছে না ওর আগের স্ত্রীর কাছে? ওকি সুকুমার—চুপ ক'রে আছো যে—বল—

বিদ্যুৎ-শিহরণ খেলে গেল সুকুমারের শিরায়-শিরায়। অদ্রির হাত ছেড়ে দিয়ে ও দু'পা পিছিয়ে এলো। বলতে যাচ্ছিল, আমি হাত দেখতে জানি না—তোমার সংগে সেদিন ঠাট্টা করেছিলাম, সব বাজে।—কিন্তু অদ্রির মুখের দিকে তাকিয়ে সেকথা বলতে পারলো না সুকুমার। শুধু বললো, পিটার তোমারই কাছে ফিরে আসবে অদ্রি!

[প্রথম বৎসর প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]

শিল্পী-পরিচিতি

[আমরা এই বিভাগে মাঝে মাঝে বাংলার প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের জীবন ও শিল্প-আলোচনা প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছি। ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে সৃষ্টি-জীবনের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। বাঙালী শিল্পীমাত্রকেই আমরা এই বিভাগে সহযোগিতা করিতে সাদর আহ্বান জানাইতেছি। —সম্পাদকঃ 'বঙ্গশ্রী']

আমার শিল্প-সাধনা

শ্রীসুনীলমাধব সেনগুপ্ত

স্বনামধন্য জগদীশনাথ রায় আমার প্রমাতামহ। ইনি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচিত 'বিষবৃক্ষ' গ্রন্থখানি ইঁহাকেই উৎসর্গ

প্রতীক্ষা

করেন। যখন আমি স্কুলের পঞ্চম-শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমার মাতামহী (সেটা বোধহয় ১৯২৩-২৪ সালের কথা) সন্ধ্যার সময় মাঝে মাঝে আমাদের কয়েক ভাইকে ডাকিয়া ৫০ বৎসর পূর্বেকার বহু পুরাতন ঘটনার গল্প করিতেন। বর্তমান কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, হেদুয়া, বিডন স্ট্রীট প্রভৃতি অলগুগুলি সন্ধ্যার সময় জনশূন্য হইয়া যাইত, যাহা বর্ত-

ঘট বিক্রেতা

মানকালে কল্পনার অতীত। মাঝে মাঝে এমন গল্পও বলিতেন যে, রাত ১০টা ১১টার পর নাকি ঐসব অঞ্চলে শিয়ালের ডাকও শুনিতে পাওয়া যাইত।

বৃহৎ বাড়ী, দক্ষিণে প্রকাণ্ড বাগান, বাগানের মাঝখানে ছোট্ট পুকুর, চারিদিকে নানাজাতীয় গাছপালা, পাঁচখানি বড় বড় বেলে পাথর পাশাপাশি বসান ছিল। দিদিমা বলিতেন যে, মাঝে মাঝে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, কখনও মাইকেল মধুসূদন দত্ত পাথরগুলির উপর বসিয়া হাস্যকৌতুকের মধ্যে সাহিত্যালোচনা করিতেন। দিদিমা বলিতেন যে, সেইসব দিনকাল যেন চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে। দিদিমার গল্প শুনিতে শুনিতে কল্পনাচোখে বিগতদিনের সে সব ঘটনাগুলি যেন দেখিতে পাইতাম।

একবার বাড়ীতে যাত্রা হইয়াছিল আমাদের উঠানে, কি একটা পার্টে নাচিয়া বঙ্কিমবাবু সকলকে মোহিত করিয়া দেন। একদিকে জগদীশ যেমন সাহিত্যভক্ত ছিলেন, অপরদিকে তেমনি বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। সন্ধ্যার পর তানপুরাযোগে বড় হলঘরের মোমবাতির ঝাড়ের স্তিমিত আলোকে সুরের লহরী যেন এক অপূর্ব মায়ালোক সৃষ্টি করিত! কি শান্তির পরিবেশ, কি সুখেই না সে সব কালের সে সব দিনগুলি কাটিয়া গিয়াছে। দীনবন্ধু মিত্রও তাঁর সুরধুনী কাব্যে 'গঙ্গার কলিকাতাদর্শন' নামক কবিতাটিতে লিখিয়াছেনঃ

"ওই দেখ জগদীশ পুলিশ রতন বিজ্ঞবর
তান লয়ে গাহিতেছেন গীত মনোহর।"...

আশ্চর্য্যের বিষয়ঃ এরূপ সাহিত্য ও সঙ্গীতের পরিবেশে আমার মাতামহীর বিগতজীবন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও চিত্রশিল্পের প্রতি তাঁহার এত বিরাগ যে কেন ছিল, বুঝিতে পারি না। ছবি আঁকা তিনি মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না, বলিতেন—ছবি আঁকার আমাদের দেশে কোনো মূল্য নাই। ছবি আঁকিয়া মানুষ অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধান করিতে পারে না।

এই ছিল আমাদের পরিবারের প্রাচীন পরিবেশ।

এরপরে আমি প্রসঙ্গান্তরে যাই। ১৯১০ সালে ২৭শে আগস্ট জন্মাষ্টমীর দিন তৎকালীন মানভূম জেলার অন্তর্গত পুরুলিয়া শহরের "নডিহা" পল্লীতে আমার জন্ম হয়। ১৯১৯ সাল, আমার মাতামহ স্বর্গীয় হরিনাথ রায় তখন বাঁকুড়ায় ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার। আমি তখন বাঁকুড়ার জেলা স্কুলে খুব নিম্নশ্রেণীর ছাত্র। আমার মাতা, আমার দাদামহাশয়ের একমাত্র সন্তান ছিলেন।

এই সময় আমাদের মাতৃবিয়োগ হওয়াতে আমার দাদামহাশয়ের সমস্ত স্নেহ আমাদের উপরে বর্ষিত হয়। পাছে আমাদের অসুবিধা ও কষ্ট হয়, ইহা ভাবিয়া আমার দাদামহাশয় বাড়ীর গাড়ী সারাদিন স্কুলের হাতার ভিতর রাখিয়া দিতে আদেশ দেন। তখন আশ্বিন মাস, পূজা আসিয়া পড়িল বলিয়া এই সময় কি একটা উপলক্ষ্যে আমাদের স্কুল দুইটার সময় বন্ধ হইয়া গেল। স্কুলের ছুটির পর আমার একটি ক্লাসের বন্ধুর সঙ্গে সেদিন তাহাদের বাড়ীতে গেলাম। তাহাদের বাড়ীতে বাৎসরিক দুর্গাপূজা হয়। পূজামণ্ডপে তখন পটুয়ারা প্রতিমা গঠনকার্য্যে ব্যস্ত। হরগৌরীর বিরাট মূর্তি। বিরাট হরের কোলে গৌরী আসীনা। মূর্তিটি আমার শিল্পীমনে এক অভূতপূর্ব দোলা দিল।

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া পিছনদিকের বারান্দার এক

সাঁওতাল মেয়ে

দেওয়ালে কাঠকয়লার সাহায্যে হরগৌরীর সেই মূর্তিটি আঁকিতে চেষ্টা করিলাম, ইহাই আমার প্রথম অঙ্কন প্রচেষ্টা। আমার মাতামহী এই সময় তথায় উপস্থিত হইয়া চূণকাম করা ওই ফর্সা দেওয়ালের অবস্থা দেখিয়া যারপরনাই বিরক্ত হইলেন। আমাকে প্রচুর ভর্ৎসনা করিলেন এবং সন্ধ্যার সময় দাদামহাশয় অফিস হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে উহা দেখাইয়া আমাকে শাসন করিতে বলেন। আমার দাদামহাশয় অতিশয় সৌখীন ব্যক্তি ছিলেন। সবসময় তাঁহার সবজিনিষ ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করিত; প্রায় প্রতি দুইমাস অন্তর বাড়ী চূণকাম করা হইত বলিয়া ঘরের ও বারান্দার দেওয়ালগুলি সবসময়ে পরিষ্কার থাকিত। আমি

জানিতাম দাদামহাশয় দেওয়াল অপরিস্কার অত্যন্ত অপছন্দ করেন, এসব ভাবিয়া ভয়ে এতটুকু হইয়া গেলাম। কিন্তু দাদামহাশয় আমাকে তিরস্কার করিলেন না, বরং আমার অঙ্কিত চিত্রখানির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমাকে ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

পরদিন আমার স্কুলের ড্রয়িংমাষ্টার শ্রীযুক্ত অসিত দাশগুপ্ত মহাশয়কে আমাকে যথাযথ চিত্রশিক্ষা দিবার জন্য নিয়োজিত করিলেন। এইরূপে প্রায় তিন বৎসর অসিত দাশগুপ্ত মহাশয়ের নিকটে আমার শিক্ষানবিশী চলে। আমার সবকথা এখন ঠিক স্মরণ নাই, তবে এইটুকু বেশ মনে আছে যে পেন্সিল-ড্রয়িং কিছু কিছু করিতে পারি-

মুখোস

তাম। এই সময় আমার বয়স এগার বৎসর। ১৯২২ সালের শেষাশেষি আমার দাদামহাশয়ের মৃত্যু হয়। ইহার পরে আমরা কলিকাতায় আমাদের ১নং জগদীশনাথ রায় লেনস্থ নিজবাটীতে চলিয়া আসি।

১৯২৮ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিবার পর সিটি কলেজে ভর্তি হইলাম। এই সময় আমি জোড়াসাঁকোয় শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের নিকট যাতায়াত করিতাম, তিনি আমায় বিলাতী ছবিগুলি অনুকরণ করিতে বলিতেন। তিনি বলিতেন, ইহাতে রঙের এবং ড্রয়িংয়ের বিশেষ জ্ঞান হইবে। আমি বহুদিন এই অনুকরণের কাজ করি। প্রায় দশ বৎসর এই কাজ করিবার পর, ড্রয়িং এবং বর্ণবিন্যাস আমার আয়ত্তে আসে। এই সময় আমার অনুকৃতিগুলি এতই ভাল হইত যে দর্শকেরা তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। ইহার পর মডেল করিয়া ছবি আঁকিতে আমি বিশেষ যত্নবান হই। এই মডেল ড্রয়িংগুলির ভিতরে 'প্রতীক্ষা' নামক চিত্রটি একাডেমী অফ ফাইন আর্টসের চিত্রপ্রদর্শনীতে পুরস্কার-প্রাপ্ত হয়। এরপর ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত আমি নানাভাবে মডেল স্টাডি করি, এই সময়ে আমি আমার নিজের ভেতরেই একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। তাহা হইতেছে এই—চিরাচরিত পদ্ধতির আশ্রয়ে এতদিন যে ছবি আঁকিতাম, তাহা যেন আমাকে আর আনন্দ দিতে পারিতেছে না। পিকাসো, মাতিস, ভ্যানগগ্ প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্য চিত্রকরদিগের নতুন আঙ্গিকের ছবিগুলি দেখিয়া আমার মনের মধ্যে বিভিন্ন ভাবের আলোড়ন সুরু হইল। সেই পাশ্চাত্য পদ্ধতি ভারতীয় বিষয়বস্তুর ভিতর প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এইভাবে পুরা দুই বৎসর নূতন পদ্ধতির কাজ চলিতে লাগিল। কত ভাঙ্গা-গড়া করিলাম, নানারকম বাধাবিপত্তি মনের দৃঢ়তায় জয় করিলাম।

এই স্থলে আমি আর একটা প্রসঙ্গের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। একটা ঘর সুন্দরভাবে সাজান হইয়াছে—গৃহস্বামী রুচিমত বহু অর্থব্যয় করিয়া গৃহখানি সাজাইয়াছেন, কিন্তু দেখা যায় দেওয়ালে টেরিটী-বাজার অঞ্চল হইতে সস্তাদামের নিকৃষ্ট Print ছবি ভাল Frame দিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছেন। ঘরের সৌন্দর্য এতে অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। দেওয়ালগুলিতে যদি কোনো শিল্পীর আঁকা কয়েকটি Sketch, যাহা শিল্পীরা অল্পমূল্যেও দিতে পারেন, ছবি বাঁধাইয়া রাখেন তবে গৃহস্বামীর রুচিবোধের প্রশংসা করা যাইবে, ইহাতে তাঁহার বাটীতে যে সব অতিথি ও বন্ধুবর্গ আসিবেন, তাঁহারাও তাহা দেখিয়া ঐ ভাবে নিজেদের ঘরগুলিও সাজাইতে পারিবেন। ইহাতে শিল্পের প্রসারতা বৃদ্ধি হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীরাও উৎসাহিত হইবেন। এখন কলিকাতাতে সম্বৎসর অনেকগুলি প্রদর্শনী হয়—চিত্রামোদীরা সেখানে গিয়া ছবি দেখিবার সুবিধা পান—কেহ কেহ ছবি কিনিয়াও থাকেন। এই রকম প্রদর্শনী যত হয়, ততই ভাল, তাহাতে দর্শকেরা বহু শিল্পীর ছবি দেখিবার

সুযোগ পান। এইভাবে শিল্পীদের ছবির আদর বাড়িবে, আশা করা যায়।

দর্শকেরা অনেক প্রদর্শনীতে উচ্চাঙ্গের ছবিগুলি বুঝিতে পারেন না। দোষ শিল্পীর নহে, দর্শকদিগের চিত্র-জগতের সহিত পরিচয়ের অভাবের জন্যই সাধারণত এইরূপ হয়। শিল্পীর আঁকা ছবিতে ও Photography-তে বহু প্রভেদ ; Photography যাহা ঠিক তাহাই ধরিতে সমর্থ হয়। তাহাতে মনের পরিচয় নাই—শিল্পীর মনের ভাবই ছবিতে পরিলক্ষিত হয়। মন ছবি আঁকে, হাত নহে। শিল্পী যখন যেভাবে প্রভাবান্বিত হন, তখন সেই ভাবের ছবি আঁকেন। ভাব বিকাশ ও প্রকাশ করাই ছবির উদ্দেশ্য। যে ছবি ভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম, সে-ছবি ছবিই নয়। ছবির মধ্যে central idea প্রকাশ শিল্পী তাঁহার ইচ্ছামত করিতে পারেন। সেখানে যদি anatomy, proportion-এর অভাব দেখা যায় তবে বুঝিতে হইবে—শিল্পী ইচ্ছা করিয়াই সে সব বাদ দিয়াছেন, নেহাৎ ভাবের তাড়নাতেই। Modern আর্টে ইহাই পরিলক্ষিত হয়। পিকাসো, মাঁতিস্, প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পীরা যে সব ছবি আঁকেন, সাধারণ দর্শকরা তাহা বুঝিতে পারেন না—কারণ শিল্পীর মনের ভাবের সহিত তাঁহাদের পরিচয় নাই। ঐ সব ছবি কেবল ভাব অবলম্বন করিয়াই শিল্পীরা করিয়াছেন, ভাল দর্শক, যাঁহারা চিত্রজগতের বহুবিধ ছবির সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা উহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন সন্দেহ নাই। সাধারণ দর্শকেরা শিল্পীর ভাবের সহিত যত পরিচিত হইতে থাকিবেন, ততই ঐ সব ছবি ভালভাবে বুঝিতে পারিবেন।

উদাহরণস্বরূপ আমার 'প্রণাম জানাই' ছবিটির কথা ধরা যাউক। ছবিটিতে একটি ১৪।১৫ বৎসর বয়স্কা বালিকা দুই হাত জোড় করিয়া আরাধ্য দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইতেছে। ছবিটিতে মোটামুটি একটি মুখ ও দুইটি হাতের শেষ অংশ দেখান হইয়াছে—চোখটি অস্বাভাবিক রকমের বড় ; প্রশ্ন হইতে পারে—শিল্পী কেন ঠিক Photrography-র অনুকরণে ছবি করিলেন না, কিম্বা মানুষ যেমন দেখিতে হয়, ঠিক সেই রকম হইল না কেন? উত্তরে বলিব, আমার ভাব প্রকাশের জন্য যেটুকু প্রয়োজন হইয়াছে ঠিক ততটুকুই করিয়াছি; যদি ইহাতেই ভাব প্রকাশ করা যায়, তবে নাক, মুখ, চোখ, হাত প্রভৃতি নিখুঁতভাবে আঁকিবার প্রয়োজন নাই। ভাব প্রকাশই আসল উদ্দেশ্য—ভাব প্রকাশ করিতেই আমি যত্নবান হইয়াছি। চোখ দুটিতে ভক্তিপূর্ণ ভাবের প্রকাশ করিতে আশা করি সমর্থ হইয়াছি।

দীর্ঘ বিশ বছরের মধ্যে অনেক ছবিই আঁকিলাম, এটা বরাবরই লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, মনের মধ্যে যে মুহূর্তে একটা ভাবের উদয় হয়, তখনই সেটা রঙে ও রেখায় রূপ দিতে চেষ্টা করি। অথচ মনের ভাবকে প্রকাশ করা এবং রূপ দেওয়া অতীব কঠিন কাজ, সে কাজ যে কত শক্ত, শিল্পী মাত্রেই তাহা জানেন। সেই ভাবকে রূপে দিতে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চেষ্টা করিয়াছি। এমন অনেক ছবি মাসের পর মাস চেষ্টা করিয়াও ভাবের সঙ্গে মিলিল না, বাধ্য হইয়া ছবিটিকে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই আঁতুড়ে হত্যা করা হইল। Imperfect ছবি যেটা আমার নিজেরই ভাল লাগে না তাহাকে রাখিয়া দিবার কোনো মানে হয় না। এবং এটাও ঠিক, শিল্পী যে ছবি প্রাণমন দিয়া আঁকিয়া নিজে সন্তুষ্ট হ'ন, সেটা অবশ্যই অপরকে আনন্দ দিতে সক্ষম হয়। এবং দর্শক যদি সে ছবি দেখিয়া আনন্দ না পান, তাহাতে শিল্পীর কিছু যায় আসে না। শিল্পক্ষেত্রে ভাবের ঘরে চুরি যায় না। শিল্পীর কাছে যাহা অসুন্দর লাগে, দর্শকেরা তাহাকে প্রশংসা করিলেও শিল্পী সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। ১৯৩৫ সালে স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার মঠে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে আমাকে দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের একটী ছবি আঁকান। তিনি আমাকে শ্রীরামকৃষ্ণের বহু আলোকচিত্র দেখাইলেন। সেই সব ছবিগুলির ভাব লইয়া আমি একটী শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি প্রায় তিন মাস যাবৎ খাটিয়া তৈরী করিলাম, প্রতিকৃতিটী দেখিয়া স্বামীজি বিশেষ প্রীত হইলেন এবং আমার অঙ্কনচাতুর্য্যের বিশেষ প্রশংসা করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এই প্রতিকৃতিটী আমার কাছে বহুদিন ছিল। ১৯৪৮ সালে ডাঃ ক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ (প্রিন্সিপ্যাল ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজ) আমার নিকট হইতে চিত্রটি ক্রয় করিয়া লয়েন। এক্ষণে চিত্রটী তাঁহার সংগ্রহশালায় রহিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের ছবিটী স্বামী অভেদানন্দ নিজ মঠ-এ (রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, বটতলা) স্থাপন করিয়াছেন। ১৯৪০ সাল; আমি তখন কলিকাতা পুলিশ কোর্টে আইন প্র্যাক্‌টিস করিতেছি, একবার বিশেষ কি একটী কাজে ২৯নং ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে কুমার বিশ্বনাথ রায়ের বাড়ীতে যাই। "গুইডোরেণী" অঙ্কিত বিখ্যাত চিত্র "ক্লিওপেট্রা" তাঁহার সংগ্রহশালার ভিতর ছিল, ছবিটী দেখিয়া আমি মোহিত হইয়া যাই, বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া ছবিটীর কথা বারে বারে মনে পড়িতে লাগিল, ছবিটী অনুকরণ করিবার আমার প্রবল ইচ্ছা হইল। কুমার বিশ্বনাথ রায় ছবিটী অনুকরণ

করিবার অনুমতি দিয়া আমাকে ধন্য করিলেন। ছবিটী আঁকিতে আমার পনের দিন সময় লাগিয়াছিল, রোজ ৮।৯ ঘণ্টা কাল কার্য করিতে হইয়াছিল। ছবিটী এক্ষণে আমার ষ্টুডিওতে রহিয়াছে।

১৯৪০ সালের শেষাশেষি হইতেই আমার মনে "মডেল" ষ্টাডি করিবার ইচ্ছা জাগে। দীর্ঘ দশ বৎসর আমি মডেল ষ্টাডি করি। কুলি মজুর হইতে আরম্ভ করিয়া পরে বন্ধুবান্ধব এবং শেষপর্যন্ত আমার স্ত্রীকে মডেল করিয়া বহু ছবি আঁকি। ১৯৪৭ সালে আমার "প্রতীক্ষ" নামক মডেল ষ্টাডিখানি "একাডেমি অফ্ ফাইন আর্টস" চিত্র-প্রদর্শনীতে একটী পুরস্কার পায়। চিত্রখানি এক্ষণে মিঃ টি, সি, বড়াল চিত্র-সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে ১৯৪৫ সালে যখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু জয়পুরিয়া কলেজের উদ্বোধন করিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন আমার কয়েকটী উৎসাহী বন্ধু মৎ-অঙ্কিত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর চিত্রটী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর হস্তে অর্পণ করেন, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে। পণ্ডিত নেহরু চিত্রটীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং চিত্রখানি আই, এন, এ ফাণ্ড অফিসে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন, ইহার সহিত একটী চিঠিও তিনি শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিয়া দেন, সে চিঠিতে চিত্রখানি সর্বসাধারণে নিলাম করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ আই, এন, এ ফাণ্ডে জমা করিবার নির্দেশ দেন। আমাকেও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একটী প্রশংসাপত্র দান করেন।

১৯৪৮ সালে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী একাডেমী অফ্ ফাইন আর্টসের চিত্র-প্রদর্শনীতে আমার অঙ্কিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চিত্রটীর বিশেষ প্রশংসা করেন, এবং ওইরূপ একটী চিত্র কলিকাতার রাজভবনে রাখিবার বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেন, একাডেমী অফ্ ফাইন আর্টসের প্রেসিডেণ্ট লেডী রাণু মুখার্জির নিকট। লেডী রাণু মুখার্জির অনুরোধে আমি একটী অনুরূপ চিত্র করিয়া চক্রবর্তী রাজাগোপালের হস্তে অর্পন করি। শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্রটী এক্ষণে রাজভবনের চিত্র-সংগ্রহশালায় রহিয়াছে।

মডেল ষ্টাডি করিবার সাথে সাথেই আধুনিক পদ্ধতিতেও আমি বহু চিত্র আঁকি। শিল্পী কখনও কখনও নিজের মনের অবচেতনা অবস্থায় (Sub-concious mind) ছবি আঁকেন। স্বপ্ন যেমন তার কোনো কায়া নেই, এক একটা বিশিষ্ট ছায়ার রূপ লইয়া ভাসিয়া বেড়ায়, যেন একটু ঘোর ঘোর ভাব, শিল্পীও তাঁহার অবচেতন মনের অবস্থায়, এরকম কিছু অদ্ভুত রকমের সৃষ্টি করেন। বাস্তবের সঙ্গে সে সব রূপের প্রায়ঃশই মিল থাকে না। যেমন, মানুষের মুখটা শিল্পী চৌকো করিয়া আঁকেন, অথবা ত্রিভূজাকৃতি করিয়া আঁকেন, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনও অদ্ভূত রকমের করেন। এইরকম ছবি বুঝিতে হইলে বিশেষ মনন-শক্তির প্রয়োজন হয়। এই সব ছবিগুলিকে "সুর-রিয়ালিষ্টিক্" ছবি বলা হয়। ইয়োরোপে কোনো কোনো বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এইরকম পদ্ধতিতে প্রচুর ছবি আঁকিয়াছেন এবং প্রচুর প্রশংসাও পাইয়াছেন। আমিও কিছু কিছু এই পদ্ধতিতে ছবি আঁকিয়াছি। এই প্রবন্ধে স্থানাভাবে সে-সব চিত্রগুলি ছাপা গেল না। জগত যেমন

প্রণাম জানাই

পরিবর্তনশীল, শিল্পও পরিবর্তনশীল; ইহার গতি এক-ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। যুগে যুগে ইহার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। যে শিল্পধারা এক্ষণে চলিতেছে, আগামী পঞ্চাশ বৎসর পরে সে ধারার পরিবর্তন হইয়া যাইতে পারে। শিল্প তখন আবার কোনো নূতন রূপ গ্রহণ করিবে। অতীতের চিত্রসমূহ অতিশয় আড়ম্বরপূর্ণ ছিল। আধুনিক চিত্রশিল্প অনেকটা আড়ম্বরশূন্য। জাতির বিশেষ বিশেষ পরিবর্তনের সময় শিল্পেরও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। অতীত যেমন বর্তমানের শিল্পধারার কোনো বিশেষ ইঙ্গিত দিতে পারে নাই, তেমনি বর্তমান

পুস্তক ও আলোচনা

মুক্তিদাতা (যীশু খৃষ্টের জীবনী)ঃ অনুবাদক—শ্রীঅমল-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপি ফালোঁ, এস্ জে। বঙ্গীয় কার্থলিক সাহিত্য সমিতি, কলিকাতা। মূল্য—যথাক্রমে ১৵০ ও ১॥০ টাকা মাত্র।

মনুষ্য সমাজকে একদিন জরা, বন্ধন ও মিথ্যাচারের পাপ হইতে মুক্তি দিবার জন্য ভগবান যীশু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পরমাত্মাকে তিনি মর্মে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সেই পরম ঐশী শক্তির প্রতি জগৎবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ভগবান যীশু বলিলেনঃ ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমেই আত্মনির্বাণ, অর্থাৎ ঈশ্বরে লয়। ভগবান তথাগতের বাণীই নতুন করিয়া সেদিন যীশুর কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে শোনা গেল। তিনি শুধু ন্যায় ও ধর্মের প্রবর্তকই ছিলেন না, তিনি উহার প্রচারক ও ব্যাখ্যাতাও ছিলেন। কিন্তু মানুষ অন্ধ, সেই অন্ধ আক্রোশেই একদল ঘৃণ্য চরিত্রের মানুষ একদা এই মহাত্মা মহাপুরুষের জীবন সংহার করিয়া অট্টবিদ্রূপে মূর্খের হাসি হাসিল। ক্রুশবিদ্ধ হইয়াও তিনি ভগবানের নিকট তাহাদেরই কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া গেলেন—যাহারা তাঁহার জীবনের উপর জহ্লাদবৃত্তি প্রতিপাদন করিল। ভুল সংশোধিত হইতে বিলম্ব হইল না। আজ প্রায় দুই হাজার বৎসরব্যাপী সমগ্র পৃথিবী ভগবান যীশুর নামে মস্তক অবনত করিয়া আসিতেছে।

সমাচার-রচয়িতাবৃন্দ মঙ্গল সমাচারের মাধ্যমে যীশু-সম্পর্কিত যে সকল তথ্য প্রচার করিয়া আসিয়াছেন, প্রধানতঃ উহাকে অবলম্বন করিয়াই এই অনূদিত জীবনী-গ্রন্থ গড়িয়া উঠিয়াছে। এ প্রয়াস অভিনব। রেভারেণ্ড ফাদার পি ফালোঁ, এস্ জে এই দিক দিয়া একটি মহৎকার্যই শুধু সাধন করিলেন না, সেই সঙ্গে তাঁহার সাধনপুষ্ট মহান কার্থলিক ধর্মও পালন করিয়া সমগ্র কার্থলিক সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। গ্রন্থের মুদ্রন পারিপাট্য ও মনোরম চিত্র-সংযোজনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অন্যপথঃ কাব্যগ্রন্থ। মনীন্দ্র রায়। ২৬, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা। মূল্য—১॥০ মাত্র।

কাব্যের উদ্দেশ্য যদি সত্য ও সুন্দরের তপস্যা হয়, তবে দেশ ও জাতির দীনতা ও কুশ্রীতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া সৈনিকের মতো সেই সত্য ও সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। দুঃখবাদকে স্বীকার করিয়া নির্বীর্যতার পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া থাকায় মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি নাই, জীবনকে প্রস্ফুটিত কুসুমের মতো বিকশিত ও সুরভিত করিয়া তুলিতে হইবে। সত্য ও সুন্দরের তপস্যায় কবিকে তাই একাধারে সাধক ও সৈনিক হইতে হয়। জগতের শ্রেষ্ঠ কবি মাত্রেই সৈনিক। তাঁহারা জগতের পঙ্কমুখীতার পথে দাঁড়াইয়া মানুষকে আহ্বান জানান নব সুষমামণ্ডিত এক উজ্জ্বল আলোকের পথে। দুঃখবাদ ও নৈরাশ্যবাদের তমসা হইতে তাঁহারা মানুষকে টানিয়া নেন নির্ভরযোগ্য এক বিশ্বাস ও আশাবাদের জগতে। ইঁহারা শুধু যে চারণ, তাহা নয়, মানুষের জীবন-ধর্মের ইঁহারা উদ্গাতা। ইঁহাদের সঙ্গীত জীবনের সঙ্গীত, মৃত্যুর নয়।

'অন্যপথে' সেই জীবন-সঙ্গীতের সুর মূর্ত হইয়া ওঠায় গ্রন্থখানি এ যুগের পরীক্ষামূলক কাব্য-বারিধির বহু জঞ্জালকে উত্তীর্ণ হইয়া একটি শান্ত প্রাণরসে উদ্বুদ্ধ

শিল্পধারাও ভবিষ্যতের শিল্পের পক্ষে কিরূপ হইবে, তাহাও বলিতে পারে না। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ও আবহাওয়া শিল্পকে প্রভাবান্বিত করিবেই।

১৯৪৯ সালের শেষাশেষি আমি প্রথম একক-চিত্র-প্রদর্শনী করিলাম। তাহাতে চিত্রসমালোচকেরা আমার নূতন আঙ্গিকের ছবিগুলির বিশেষ প্রশংসা করিলেন। পর পর আরও কয়েক বৎসর একক প্রদর্শনী দিলাম, এবং সে প্রদর্শনীগুলিও প্রশংসিত হইয়াছিল।

এখনও একাগ্র সাধনায় পূর্ণ উদ্যমেই কাজ করিয়া চলিয়াছি। যতক্ষণ ছবি আঁকি—ততক্ষণই তাহা আমার নিজের অনুভূতির মধ্যে রূপে রসে মিশিয়া থাকে, ছবিখানি সমাপ্ত হইবার পর তাহা জনসাধারণের রুচি-বিচারের মধ্যে যাইয়া পড়ে। সকল শিল্পের ক্ষেত্রেই এই কথা। শিল্পকে জীবনে কখনও আমি ব্যবসাদারী বিষয় হিসাবে গ্রহণ করি নাই। মনের আনন্দে ছবি আঁকিয়া যাই। তাহার পর দেখিয়াছি—তাহার একটা সত্যমূল্য দাঁড়াইয়া যায় এই সত্য-মূল্যই আমার শিল্পসাধনার সবচাইতে বড় মূল্য।

হইয়া উঠিয়াছে। দুঃখ-মৃত্যু-হাহাকার-জর্জরিত যুগের পারে কবি-স্বপ্ন যে মধুর রসে রসায়িত, নিচের পংক্তি কয়টি তাহারই পরিচায়কঃ

'ভাসে চোখে অন্যদিন, অন্য এক জীবনের ভাষা—
যেখানে স্বপ্নের মাঠ, কল্পনার আকাশ, মনের
বিচিত্র বর্ণালী, প্রেম, ভবিষ্যৎ সন্ততির আশা,
জেগে ওঠে সে জগৎ—
ফেটে পড়ে ডালে ডালে বোঁটায় বোঁটায়
মঞ্জরিত পল্লবের মধ্যমণি লাল
ফুলের আশ্চর্য শিশু।'

গ্রন্থে অন্যূন ছোটবড় ২৫টি কবিতা স্থান পাইয়াছে। প্রচ্ছদপটে বৈচিত্র্যের লক্ষণ সুস্পষ্ট। গ্রন্থখানি আশা করি পাঠকমহলে সমাদৃত হইবে।

পালামৌঃ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অধ্যাপক পঞ্চানন চক্রবর্তী-সম্পাদিত। দি বুক এক্সচেঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য—১৷৹ মাত্র।

সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ সম্পর্কিত ছয়টি প্রবন্ধকে কেন্দ্র করিয়া এই আলোচনা-গ্রন্থটি গড়িয়া উঠিয়াছে। অধ্যাপক চক্রবর্তী কেবল অধ্যাপকীয় দৃষ্টি লইয়াই 'পালামৌ'কে বিচার করেন নাই, ইহার পিছনে তাঁহার একটি কাব্যধর্মী সংবেদনশীল মনও কার্যকরী রহিয়াছে। সঞ্জীবচন্দ্রকে নানাদিক হইতেই তিনি বিচার করিয়া তাঁহার রচনাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যে সময়ের পালামৌর কথা সঞ্জীবচন্দ্র লিখিয়াছেন, তখন আজকের মতো পথ এত সুগম ছিল না। ব্যাঘ্র সদৃশ নানা বন্য জন্তুতে তখন হাজারিবাগ হইতে পালামৌ পর্যন্ত দীর্ঘ ভূ-অঞ্চল পরিপ্লাবিত ছিল। কিন্তু এই ভীতিসংকুল পথকে অতিক্রম করিয়া যে কাব্যসুধারসকে সঞ্জীবচন্দ্র লুণ্ঠন করিয়া আনিয়া বাংলাসাহিত্য তথা বাঙালী সমাজকে পরিবেশন করিলেন, তাহা নিতান্ত সেই কালের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া গেল না, যুগোত্তীর্ণ রসগ্রাহীতার আবেদন লইয়া আজও তাহা একইভাবে মানুষকে মুগ্ধ করে। এক কথায় 'পালামৌ' ক্লাসিক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত হইতে সুরু করিয়া গ্রন্থ বিশ্লেষণ ও নানা মন্তব্যের দ্বারা অধ্যাপক চক্রবর্তী তাঁহার আলোচ্য গ্রন্থখানিকে সারগর্ভ করিয়া তুলিয়াছেন। সম্প্রতি সেকেন্ডারী বোর্ড অব এডুকেশন কর্তৃক স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় 'পালামৌ' পাঠ্যরূপে অনুমোদিত হইয়াছে। এ সময়ে আলোচ্য গ্রন্থটির প্রকাশ বিশেষভাবে ছাত্রসমাজের গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। গ্রন্থখানি তাহাদের প্রভূত উপকারে আসিবে; এতদ্ব্যতীত সাধারণ সাহিত্য-পাঠকের নিকটও ইহার কার্যকারিতা ও মূল্য অপরিসীম।

শ্বেত কপোতঃ উপন্যাস। শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড্, কলিকাতা। মূল্য—২৷৹ মাত্র।

যাঁহারা সামান্য লিখিয়া ইতিমধ্যেই অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, আলোচ্য গ্রন্থের লেখক তাঁহাদের অন্যতম। ইতিপূর্বে লেখকের 'একটি রঙ করা মুখ' আলোচনাকালেই তাঁহার সেই শক্তির পরিচয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি কাহিনীর পরিসর ও ঘটনাসংস্থানকে আরও বহুদূর সম্প্রসারিত করিয়াছেন। একটি কারখানা-জীবনকে কেন্দ্র করিয়া আবহ কাহিনীটি গড়িয়া উঠিয়াছে। এমন বিষয় পরিবেশন করা অভিজ্ঞতা ভিন্ন সম্ভব নয়; শ্বেত কপোতের কাহিনী কোথাও সেই অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়া অতিরঞ্জিত হইয়া ওঠে নাই। নাইট্‌ওয়াচার মহম্মদ ইয়ুসুফের জীবন লইয়া প্রধানতঃ গল্পটি গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার চরিত্রে একাধারে দুঃসাহসিক ও কোমল বৃত্তির সংযোগ ঘটাইয়া লেখক যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ঠিকাদার, মুখুজ্জে সাহেব, ডি-সিল্‌ভা, কৈবর্তী, জিতেন মিত্র, সুষমা প্রভৃতি ছোটবড় চরিত্রগুলি স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে দাঁড়াইয়া আছে। পড়িতে পড়িতে চিত্রগুলি চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে। তবে স্থানে স্থানে প্রকাশ ব্যঞ্জনা অতিরিক্ত কাব্যধর্মী হইয়া ওঠায় বাস্তবতা অনেকাংশে বিঘ্নিত হইয়াছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও পঠন-মাধুর্য কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বরং পাঠককে গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত একনিঃশ্বাসে টানিয়া লইয়া যায়।

সম্পাদকীয়

বাংলা ও বাঙালী

বাঙালীর মানের গলায় দড়ি পড়িয়াছে। বহু মানে মানী ছিল বাঙালী, নগর কোটাল হইতে সুরু করিয়া রাজা উজীর বাদ্‌সা এক সময় মানের ডালি আনিয়া সাজাইয়া দিত তাহার দুয়ারে। তখন গাছে গাছে দোয়েল আর ফিঙে নাচিত, পায়রা আর বুলবুলিতে সখিসংসদে আসিয়া মড়াইয়ের ধান খুঁটিয়া খাইত, কোকিলের কুহুতানে বিটপী-কুঞ্জে বসন্ত জাগিয়া উঠিত, দোল-দুর্গোৎসবে অঙ্গন মুখরিত হইয়া উঠিত বাঙালীর; বারো মাসের তের পার্বনে তাহাকে তখন পায় কে? নতুন ধানে নবান্নর মহচ্ছব লাগিয়া যাইত, গাজনের ঢাকের বাদ্যে আর বহুরূপীর নর্তন কুর্দনে গ্রামের পর গ্রাম তখন আনন্দ-সাগরে ডগমগ। মাঠে মাঠে তখন চাষিরা চাষের আনন্দে ভাটিয়ালী ধরিত, পাশ দিয়া উদাসী বাউল আপন মনে একতারা বাজাইয়া চলিয়া যাইত, নদীর তীরে নৌকা লাগাইয়া দল বাধিয়া মাঝিরা দোতারা যন্ত্রে সুর তুলিত, ঢেঁকীসালে ঢেঁকী চলিত, তাঁতের কলে তাঁত, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় লইয়া, মোটা চাউলের মোটা ভাতে উদর পূর্ণ করিয়া কেহ বা গ্রাম-পঞ্চায়েতে যাইয়া যোগ দিত, কেহ বা দাবার ঘুঁটি সাজাইয়া সান্ধ্য-আসর গরম করিয়া তুলিত। নগর আর পল্লী মিলাইয়া বাঙালী-প্রাণের অজস্রতা তখন কূল ছাপাইয়া অকূলে গিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাতার-মগ-হার্ম্মাদ বা তুর্কি আক্রমণকে সে প্রতিহত করিয়াছে এক হাতে, এক হাতে রুখিয়াছে সে পাঠান আর মোঘলকে, অন্য হাতে বিষহরি মনসার পূজা-দিয়া গৃহ-দেবতার আসনে আনিয়া অর্ঘ্যপুষ্প সাজাইয়াছে। সসাগরা পৃথিবীর রাজনৈতিক ঢেউ আজিকার মতো তখন এমন উদ্বেলিত হইয়া ওঠে নাই। বাঙালী তখন হাস্যে লাস্যে দিন কাটাইত, পরের মোট বহিয়া দিয়াও সে তখন মনে করিত—নিজেরই কাজ করিয়াছে। বাঙালীর কাছে তখন আপন-পর জ্ঞান ছিল না, সকলকে মিলাইয়া যে এক অখণ্ড ব্রহ্মসত্তা বিরাজ করিতেছে, এই উপলব্ধিই তখন সদাজাগ্রত প্রহরীর মতো হৃদয়ে জাগ্রত থাকিয়া দূরকে নিকটে টানিত, পরকে আপন করিত।

কিন্তু কালের চক্র বক্রগতিতে কোথায় কখন ঘুরিয়া যায়, কে বলিতে পারে? দিন বদ্‌লায়, সন্দেহ নাই; সেই সাথে মনুষও বদলায়। 'বদলাতি দুনিয়া'—সারা বিশ্বেই এই বদ্‌লানোর ইতিহাস। ইতিহাসের ধারাই এমনি গতিতে প্রবাহিত হইয়া চলে। বাংলার ইতিহাসেও একদা সেই দিন-বদলের পালা আসিল। হিন্দুসাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরবের উপর ইস্‌লামের যে বিজয়ধ্বজা আকাশের গা প্রায় ছুঁই ছুঁই করিতেছিল, বাজপক্ষীর মতো অকস্মাৎ মাথার উপর দিয়া ইংরাজ আসিয়া ছোঁ মারিয়া কখন যে সেই গগন-বিহারী ধ্বজাটি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দিল, তাহা সেদিন ইস্‌লামের অতিবড় কীর্তিধ্বজেরা অবধি বুঝিতে পারে নাই। বাংলায় আসিয়া গাড়িয়া বসিল ইংরাজ। অপরিসীম প্রতাপশালী বুদ্ধিদীপ্ত একটা জাত এই ইংরাজ। তাঁহারা দেখিল—বাঙালীর চিরকালের এই ঐক্য-বন্ধনকে ভাঙিয়া না দিলে এদেশে ব্যবসাদারী চালে বেশীকাল রাজকার্য চালনা করা চলিবে না। একদিন হয়ত এই ঐক্যশক্তির কাছে পরাভব মানিয়া নাকের জলে চোখের জলে তবে তাঁহাদিগকে আবার পিতৃরাজ্যে পলায়ন করিতে হইবে! একদিকে তাই যেমন তাঁহারা এদেশের ভূস্বামীর স্বার্থে অধিকতর সহানুভূতি-শীল হইয়া কৃষক সম্প্রদায়কে ভাড়াটিয়া কামিনের মতো আলাদা করিয়া দিলেন, তেমনি কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ডের ধুয়া তুলিয়া হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে মস্তবড় একটা ব্রীজ বা পুল খাড়া করিয়া তুলিলেন। ইহাই ইংরাজের ইতিহাস-খ্যাত 'ডিভাইড্ এ্যাণ্ড রুল' প্রথা। মানুষে মানুষে দেওয়াল রচনা করিয়া দিয়া এই প্রথাই রাজকার্যে চালু হইয়া গেল। এই প্রথা সম্পর্কেই উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: 'These walls leave their mark deep in the minds of men. They set up a principle of 'Divide and Rule' in our mental outlook which begets in us a habit of securing all our conquests by fortifying them and seperating them from one another. We divide nation and nation, know-

ledge and knowledge, man and nature.

অর্থাৎ এই প্রাচীরই মানুষের মনে ক্ষতচিহ্নের মতো গভীর দাগ রাখিয়া গেল। ইহাই আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া 'ভাগ কর এবং শাসন কর' নীতির ভিত্তিতে পরস্পরকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার ধারণাকে আমাদের মধ্যে অভ্যাসের দ্বারা বদ্ধমূল করিয়া দিল। ফলে আমরা শিখিলাম—জাতি হইতে জাতিকে বিচ্ছিন্ন করিতে, জ্ঞানের দরজাকে ভাঙিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দিতে আর মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে দুর্লঙ্ঘ পাহাড় রচনা করিয়া তুলিতে।

ইহাতে শুধু হিন্দু-মুসলমানেই বিরোধ বাধিল না, হিন্দুসমাজের ঐক্যবন্ধনের মধ্যেও ফাটল ধরিল। দাঁড়াইল 'কাষ্ট্‌ হিন্দু' আর 'সিডিউল্ড্‌ কাষ্ট্‌', বর্ণ হিন্দু আর অনুন্নত সমাজ। স্বার্থে স্বার্থে লাগিল সঙ্ঘাত। পিছনে থাকিয়া সুচতুর ইংরেজ-সরকার ঘোড়ার লাগাম টানিবার মতো রাশ টানিতে লাগিলেন। রোগের ব্যবস্থাও তাঁহার, পথ্যের ব্যবস্থাও তাঁহার। বাংলার গোটা সমাজ-ব্যবস্থাটাকে ওলট-পালট করিয়া দিয়া খাসা চালে ইংরেজ এ দেশের শাসনদণ্ডকে আরও ক্ষুরধার করিয়া তুলিলেন। ইহা শুধু বাংলায় নয়, গোটা ভারত-শাসনেরই নীতি। এদেশের নানা আবেদন-নিবেদনের ফলে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এদেশ-বাসীকে ভবিষ্যৎ কল্যাণের আশা দেওয়া হইল, যুদ্ধান্তে তাহা আবার কোথায় ফাঁসিয়া গেল, টেরও পাওয়া গেল না। ক্রমে এখানকার রাজনৈতিক শক্তি সক্রিয় হইয়া উঠিল। দলে দলে দেশের সন্তান বাহির হইয়া পড়িল পথে। সুরেন্দ্র-নাথ আর দেশবন্ধুর নেতৃত্ব সেদিন দেখিবার মতো। দলে দলে দেশের সন্তানেরা গিয়া কারাগারে আবদ্ধ হইল, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিল, বুলেট-বিদ্ধ হইল। ক্রমে সংগ্রাম আরও চাঙ্গা হইয়া উঠিল। স্বাধীনতা-সংগ্রাম। পূর্ণ স্বরাজ্য-প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা ভারত জুড়িয়া অসহিষ্ণু মনের রোষবহ্নি ছড়াইয়া পড়িল। বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বি নেতা তখন দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র। যে বাঙালী প্রথম উদ্যোগী হইয়া ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে মুখোমুখী লড়িবার জন্য কোমর বাঁধিয়াছিল, সেই বাঙালী-শক্তিকে আবার নতুনভাবে সংহত করিতে লাগিলেন সুভাষচন্দ্র। গান্ধীজীর সঙ্গে ইহা লইয়া তাঁহার মতবৈষম্যের সৃষ্টি হইল বটে, কিন্তু যে বাঙালী একবার মৃত্যু-পণ করিয়াছে, তাহার উদ্বেল প্রাণ-শক্তিকে আর বাধিয়া রাখা গেল না। ইংরেজের প্রতি 'কুইট ইণ্ডিয়ার' আল্টিমেটাম দিয়া গান্ধীজী যখন দেশের জনগণকে প্রত্যক্ষ গণ-আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান করিলেন, সেদিনও বাঙালীই ছিল অগ্রণী। বাঙালীর প্রাণ-প্রতিভূ সুভাষচন্দ্র আপনার আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশত্যাগী হইলেন, হইলেন ইংরেজের রক্তচক্ষুর ভয়ে নয়, বাহির হইতে চাপ দিয়া ইংরেজের ভারতীয় শাসনযন্ত্রকে বানচাল করিয়া দিতে। গড়িয়া তুলিলেন গিয়া আজাদ-হিন্দ দল। শেষ সাফল্য অর্জিত না হইলেও ভারতের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করিবার পক্ষে আজাদ হিন্দ সরকারের কাজ কমখানি ছিল না। এদিকে আসিল দুর্ভিক্ষের করাল বিভীষিকা। কে মরিল সেই দুর্ভিক্ষে? বাঙালী। সমস্ত দিক হইতেই ইংরেজ সরকার যখন বিপর্যয়ের মুখে, তখন তাঁহার শেষ চেষ্টা ছিল বাঙালীর বুদ্ধিজীবী মধ্য-বিত্ত সমাজকে ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দিতে। তবে আর তাঁহাদের কায়েমী শাসনের আসন মারে কে? কিন্তু দুর্ভিক্ষে মধ্যবিত্ত সমাজ মরিল না, মরিল নিরীহ দরিদ্র চাষী ও নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী। টাল সামলাইতে সামলাইতে কোনোক্রমে রক্ষা পাইয়া গেল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এদেশের শাসনক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত আলোচনার ব্যাপার লইয়া ক্রীপ্‌স্‌ সাহেব আসিয়া নাজেহাল হইয়া গেলেন, লর্ড ওয়াভেল বহুবার দিল্লী সিমলা দৌড়াইয়া ঘোল খাইলেন। অবশেষে নানা অভিনয়ের পর লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের মাধ্যমে যথার্থই ক্ষমতা হস্তান্তর। কিন্তু এই ক্ষমতা হস্তান্তরের পিছনেও রাজনৈতিক জিঘাংসার বহ্নি কম প্রধূমিত হইয়া উঠিল না। ১৯৪৬-এর ১৬ই আগষ্টের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' তাহারই জ্বলন্ত প্রমাণ। আসিল মুসলমান সমাজ হইতে পাকিস্তানকে কায়েম করিবার দুর্বার দাবী। দাবী মঞ্জুর হইল। এই দাবী মিটাইতে যাইয়া শুধু বাংলাকেই শেষ বলি দিতে হইল না, দিতে হইল পাঞ্জাবকেও। দশআনি ছয় আনি হইয়া গেল বাংলাদেশ। র‍্যাড্‌ক্লিফ সাহেব বেতারের মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তানের ভিত্তিতে এ দেশের লোককে স্বাধীনতা-স্বপ্নে মজাইয়া রাতারাতি গিয়া এ্যাট্‌লাণ্টিকে পাড়ি জমাইলেন।

দেশ খণ্ড ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। মাত্র ৫ বৎসর পূর্বের ঘটনা। মানুষের মন হইতে এত সত্বরই এত বড় ক্ষতচিহ্ন মুছিয়া যাইবার নয়। যে দেশের হিন্দু মুসলমানের দরগায় গিয়া সিন্নি দিত, মুসলমান হিন্দুর কালিপূজায় আসিয়া অংশ গ্রহণ করিত, সে দেশ উভয় সমাজের রোষ ও বিদ্বেষ-বহ্নিতে রাঙা হইয়া উঠিল। উপরতলার মানুষেরা অলক্ষ্যে থাকিয়া হাত তালি দিয়া 'বাহবা-বাহবা' করিতে লাগিলেন। দেশকে ইংরেজের আনুকূল্যে ক্ষত বিক্ষত না করা অবধি যাঁহাদের ঘুম হইতেছিল না, এবারে তাঁহারা

নাকে তেল দিয়া কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমাইতে পারিলেন। দেশ ভাসিয়া গেল মৃত্যু-স্রোতে। বাংলা দেশ আর বাংলা রহিল না—সোনার বাংলা তো নয়ই, বাংলা হইল একদিকে পশ্চিম-বঙ্গ, অন্যদিকে পূর্ব-পাকিস্তান। পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুরা প্রাণের ভয়ে ইজ্জতের ভয়ে মানের ভয়ে দলে দলে আসিয়া ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল পশ্চিমবঙ্গে। দেশের রাজনীতি বিষাক্ত হইয়া গেল, অর্থনীতির বনিয়াদ ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল, মানুষ শৃগাল-কুকুরের জীবন লইয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল; কোথায় রহিল এতকালের ঐতিহ্য, এতকালের শিক্ষা আর সংস্কৃতি! হিন্দুর 'হোম-ল্যান্ড' পশ্চিমবঙ্গ ঠাঁই দিতে পারিল না সমস্ত হিন্দুকে। সরকারী ব্যবস্থায় তাহাদিগকে ছড়াইয়া দেওয়া হইল সুদূর আন্দামান হইতে সুরু করিয়া উড়িষ্যা, বিহার আর আসামে। বাঙালী ডুবিতে বসিল, বাঙালীয়ানা ডুবিতে বসিল। ভারতের সভ্যতা-সূর্যও কি তাহাতে অস্তমিত হইল না? ভারতের শিক্ষা হইতে সুরু করিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রাম পর্যন্ত বাঙালীই সর্বকার্যে চিরকাল অগ্রণী হইয়া জাতীয় সভ্যতার বনিয়াদকে পাকা করিয়া তুলিয়াছে। সেই বাঙালীকে বাঙাল-খ্যাদা আন্দোলনের ভিত্তিতে বিতাড়ন করার একটা সক্রিয় চেষ্টা মূর্ত হইয়া উঠিল সর্বত্র। কিন্তু তাহার মধ্যেই ধৈর্যে বুক বাঁধিয়া শম্বুকের মতো ধীরে ধীরে জীবন-ধর্মে টিঁকিয়া থাকিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল বাঙালী। বাংলার নিজস্ব ভূমি সিংভুম, মানভুম, ধলভুম, পূর্ণিয়া প্রভৃতি অঞ্চলগুলি তাহাকে পুনরায় ফিরাইয়া দিয়া বাংলার ঐতিহ্য রক্ষার ব্যবস্থাপনাকে স্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করিতে পারেন কিনা এই প্রশ্ন উঠিল।

এই দাবীর ভিত্তিতে যে বাংলা-ভাষাভাষি আন্দোলন দেখা দিল, তাহা ধামাচাপা পড়িলেও তাহার ভিতরের প্রাণ-বেগ নিঃশেষিত হয় নাই। এ আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে আপাতত আঞ্চলিক ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিলেও ইহার পিছনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নটিও বড় আকারে রহিয়াছে। বাঙালীকে বিভিন্ন প্রদেশে ঠেলিয়া দিবার ফলে সেই সেই প্রদেশের সরকারী চাপ তাহাদের উপর ভারী হইয়া নামিবে এবং নামিতেওছে। ফলে এতকালের যে মজ্জাগত শিক্ষা —তাহা তাহার ধীরে ধীরে লোপ পাওয়াই স্বাভাবিক। পরবর্তী দুই এক পুরুষেই দেখা যাইবে—তাহাদের সন্তান-দের নিকট বাংলাভাষা বিদেশী বা স্বতন্ত্র প্রাদেশিক ভাষার ন্যায়ই অপাংক্তেয় বা বিভীষিকাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ওটাই স্বাভাবিক, নতুবা সেই সেই প্রদেশের কোনো সুখ-সুবিধারই তাহারা ভাগিদার হইতে পারিবে না, এমন কি চাকুরী ও ব্যবসার ক্ষেত্রেও তাহারা স্থান পাইবে না।

এই যখন অবস্থা, তখন বাঙালী তথা বাংলা-সরকারের কর্তব্য হইতেছে ইহার প্রতিরোধ করিয়া নিজেদের 'হোম-ল্যান্ড' পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমাকে বাড়াইয়া বাঙালীর শিক্ষা, চাকুরী ও ব্যবসাবাণিজ্যের পথকে প্রশস্ত করিয়া তোলা। এখনও বহু শত একর জমি পশ্চিমবঙ্গে পতিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের সামান্য অংশ-মাত্রই উদ্বাস্তু পরিবারেরা আসিয়া দখল করিয়া বসিয়াছেন। উক্ত পতিত জমিগুলির সংস্কার সাধন করিয়া পূর্ব-পাকিস্তানাগত বাঙালী পরিবারবর্গকে অনায়াসে বসতি স্থাপনের সুযোগ করিয়া দেওয়া সম্ভব ছিল এবং এখনও আছে। পূর্ববঙ্গের পটুয়া, চাষী, মালাকর, ঢকী, মাঝি তাঁতী প্রভৃতি এতকাল ধরিয়া বংশপরম্পরানুক্রমে সমগ্র বাংলার যে সংস্কৃতি রচনা করিয়া আসিয়াছে, বাংলা হইতে আজ তাহাদিগকে নির্বাসন দিলে ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের আর গর্ব করিবার মতো কী থাকিবে? যে যুবশক্তি যুগে যুগে তাতার-মগ-হার্ম্মাদ, তুর্কি, পাঠান, মোঘল আর ইংরেজের সমস্ত রাজকীয় শক্তিকে পরাভূত করিয়া বাংলার প্রাণ-লক্ষ্মীকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকে আজ দেশত্যাগী করিলে বঙ্গ-জননীর লজ্জা ঢাকিবে কে? মুষ্টি-মেয় পুলিশি শক্তিই কি তাহার পক্ষে যথেষ্ট?

দুর্ভিক্ষে, যুদ্ধে, দাঙ্গায় ও দেশ-বিভাগের যূপকাষ্ঠে বাঙালীকেই বার বার বলি হইতে হইয়াছে। ইহা যে তাহাকে ভাবাতিশয্যেই হইতে হইয়াছে, তাহা নয়, জাতীয় কর্তব্য-বোধে জাতিকে রক্ষা করিবার অটল সংকল্প বুকে লইয়াই সে মৃত্যুর মহাশ্মশানে ঝাপ দিয়াছে। ভারতোদ্ধারঃ সমগ্র ভারতের জন্য এমন নিঃস্বার্থ প্রাণ-বলি আর কেহ দিতে পারিয়াছে কি! আজও ভারতের বিপদের দিন কাটে নাই। ভারত মাতার স্বার্থ রক্ষার্থেই প্রয়োজন, এই যুব-শক্তি, এই ভাব-শক্তি এবং এই কৃষ্টি-শক্তি যাহা একাধারে বাঙালী এযাবত দেখাইয়া আসিয়াছে তাহাকে রক্ষা করা—তাহাকে আবার জীবন্ত, প্রাণময়ী করিয়া তোলা। অতএব নব উজ্জীবনের পথে দাঁড়াইয়া বাঙালী আবার যাহাতে মহাভারতের মহৎ সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিতে পারে, যাহাতে তাহার শিক্ষা ও জীবিকার পথ অটুট থাকিয়া আবার তাহারা পূর্ণ মানুষের মতো মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা বাংলা-সরকারকেই গ্রহণ করিতে হইবে। এজন্য যাহাকিছু প্রয়ো-জনীয় ব্যবস্থা, তাহাও বাংলা-সরকারকে অবলম্বন করিতে

হইবে। এ কাজ বেশী কাল সাপেক্ষ থাকা বিধেয় হইবে না। জাগতিক পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। এই মহাসংকট কালে বাঙালী না বাঁচিলে মহাভারতকে নতুন করিয়া গড়িবার প্রশ্নও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার তথা প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুকে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাপরিষদ রচিত খসড়া স্কুলকোডের সংশোধিত ধারা

ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক রচিত খসড়া স্কুল কোডের যে সমস্ত ধারা সম্বন্ধে তীব্র আপত্তি তুলিয়া শিক্ষক ও ছাত্রমহলে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহার পরিপ্রেক্ষিতে পরিষদের সিলেক্ট কমিটি খসড়া স্কুল কোড বিবেচনা করিয়া ঐ সম্বন্ধে পরিষদের গ্রহণার্থ যে চূড়ান্ত সুপারিশ করিয়াছেন, তাহাতে বিতর্কমূলক ও আপত্তিকর অনেকগুলি ধারাই বিদূরিত হইয়াছে। সিলেক্ট কমিটির সংশোধন ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রস্তাবিত স্কুল কোডে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষকগণের সর্বনিম্ন বেতনের হার অন্যূন ২০৲ টাকা বৃদ্ধি করার সুপারিশ করা হইয়াছে। শিক্ষকগণের ট্যুইশনি করিবার ব্যবস্থায় যে বিধিনিষেধ আরোপিত হইয়াছিল, তাহাও বহুলাংশে দূর করা হইয়াছে। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিতে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যাপারে ভোটাধিকার পাইতে ১০৲ টাকা করিয়া চাঁদা দিবার যে ধারা ছিল, তাহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ক্লাব ও সমিতি ইত্যাদিতে ছাত্রদের যোগদানের ক্ষেত্রে যে বিধিনিষেধ আরোপিত হইয়াছিল, তাহাও তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এ বিষয়ে প্রারম্ভিক আলোচনা হিসাবে আমাদের গত ভাদ্র সংখ্যায় মূল ধারাগুলি লইয়া আমরা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি।

সম্প্রতি মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের সিলেক্ট কমিটি পরিষদ কর্তৃক মাধ্যমিক শিক্ষা বিদ্যালয়ে আর্থিক সাহায্য দানের বিধিবিধান চূড়ান্তভাবে রচনা করিয়াছেন। পরিষদের সাহায্য গ্রহণকারী স্কুলগুলির জন্য সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত নিয়মাবলীতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শিক্ষকগণের বেতনের হার সর্বনিম্ন বিভিন্ন স্কেল নির্ধারিত হইয়াছে। উক্ত স্কেলসমূহ এইরূপঃ

(ক) বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকবর্গ এবং যে সকল শিক্ষকের অনার্স অথবা আর্টস কিম্বা বিজ্ঞানে এম-এ, এম-এস-সি ডিগ্রী আছে অথবা যে সব শিক্ষকের ফার্স্ট কিম্বা সেকেন্ড ক্লাশ এম-এ অথবা এম-এস-সি ডিগ্রী আছে —১২৫—১০/২—১৭৫—২২৫৲। (খ) বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকবর্গ এবং যে সকল শিক্ষকের এম-এ অথবা এম-এস-সি ডিগ্রী কিংবা অনার্স ডিগ্রী আছে—১০০—৮/২—১৪০—৪—১৮০৲। (গ) গ্র্যাজুয়েট অথবা বিশেষ শিক্ষা-প্রাপ্ত আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকবর্গ—৮০—৬/২—১১০—৩—১৪০৲। (ঘ) অনুমোদন ও সাহায্য মঞ্জুর কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য শিক্ষক—(১) উচ্চ বিদ্যালয়ে—৭০—৫/২—৯৫—২—১১৫৲। (২) জুনিয়ার উচ্চ বিদ্যালয়ে—৫০—৫/২—৭৫৲।

আরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, বিশেষ কারণে এবং অনুমোদন ও সাহায্য মঞ্জুর কমিটির পূর্ব অনুমতি অনুসারে স্কুলে কোন শিক্ষককে যথাযোগ্য স্কেলে প্রথমেই উচ্চ হারে বেতন দান অথবা কোন শিক্ষককে তাঁহার গ্রেডের বেতন ছাড়াও ব্যক্তিগত বিশেষ ভাতা দান করা যাইবে।

প্রধান শিক্ষক ও প্রধানা শিক্ষয়িত্রীগণের বেতনের সর্বনিম্ন স্কেল এইরূপ—(ক) উচ্চ বিদ্যালয়ে (১) যে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা পাঁচ শতের বেশী কিন্তু সাতশো'র বেশী নহে—২০০—২০/২—৩০০—২০/২—৪০০৲। (২) শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩৫০-এর বেশী, কিন্তু ৫০০-এর অধিক নহে—১৭৫—১৫/২—২৫০—১৫/২—৩২৫৲। (৩) শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০০-র অধিক কিন্তু ৩৫০-র অধিক নহে—১৬০—১২/২—২২০—১২/২—২৮০৲। (৪) শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫০-এর বেশী কিন্তু ২০০-র অধিক নহে—১৫০—১০/২—২০০—১০/২—২৫০৲।

(খ) জুনিয়ার উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণের নিজ নিজ গুণানুযায়ী নির্ধারিত বেতন দেওয়া হইবে এবং স্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যানুসারে প্রধান শিক্ষকের জন্য ২৫৲, ৩০৲ অথবা ৩৫৲ টাকা ভাতা প্রদত্ত হইবে।

যে সকল ম্যাট্রিকুলেট শিক্ষক ৫ বৎসর ধরিয়া বরাবর কার্য করিতেছেন ও যাঁহাদের সংস্কৃত প্রভৃতি বিষয়ে সরকারী উপাধী আছে এবং যে সব ম্যাট্রিকুলেট শিক্ষক ৩ বৎসর ধরিয়া কার্য করিতেছেন এবং যাঁহাদের সংস্কৃত প্রভৃতি বিষয়ে দুইটি সরকারী উপাধি আছে, তাঁহারা ট্রেণিং প্রাপ্ত নহেন—এরূপ গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকগণের জন্য নির্ধারিত বেতনের স্কেল পাইবেন।

নিয়মাবলীতে আরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, শিক্ষকগণকে এবং প্রধান শিক্ষকগণকে সমান হারে সর্বনিম্ন ১০৲

টাকা মাগ্গী ভাতা দেওয়া হইবে। যদি কোন স্কুল ১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিলের পূর্বে উচ্চ হারে মাগ্গী ভাতা দিয়া আসিয়া থাকে তবে সেই স্কুলে মাগ্গী ভাতার ঐ উচ্চ হার বজায় রাখিতে হইবে।

নিয়মাবলীতে আরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, অনুমোদন ও সাহায্য মঞ্জুর কমিটি কোন স্কুলের বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করিয়া নিম্নতর হারে ছাত্র বেতন গ্রহণের অনুমতি না দিলে সকল স্কুলেই বোর্ডের সাহায্য প্রাপ্তির পরে নিম্নোক্তরূপ সর্বনিম্ন ছাত্র বেতনের ব্যবস্থা করিতে হইবেঃ

(১) কলিকাতা ও হাওড়া অঞ্চলে—৪৷৷০ (পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য), ৫৷৷০ (সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য), ৬৷৷০ (নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য), (২) শিল্পাঞ্চলসমূহে এবং জেলা ও মহকুমার হেড কোয়ার্টারে—৪৲ (পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য), ৫৲ (সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য), ৫৷৷০ (নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য), (৩) পল্লী অঞ্চলে—৩৷৷০ (পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য), ৪৲ (সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য) এবং ৪৷৷০ (নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য)।

এতদ্‌সম্পর্কে সম্প্রতি আমরা নতুন করিয়া কিছু টিকা করিবার ইচ্ছা রাখি না।

কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে ভারত

স্মরণ থাকিতে পারে যে, রাষ্ট্রপুঞ্জ সনদের ২৫ নং ধারা অনুযায়ী ৫ বৎসর পূর্বে ভারত নিরাপত্তা পরিষদে এই মর্মে এক দাবী জানাইয়াছিল যে, কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণকারী খণ্ডজাতির লোকজন এবং অন্যান্য হানাদারদিগকে পাকিস্তান কর্তৃক সাহায্য দান বন্ধ করিতে হইবে। কিছুদিন পরে জানা যায় যে, পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী রাজ্যে সংগ্রামে লিপ্ত রহিয়াছে; সুতরাং পররাজ্য আক্রমণে লিপ্ত হইয়াছে। এই অভিযোগ সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ কোনোরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নাই। ইহার পরিবর্তে পরিষদ একটি কমিশন প্রেরণ করেন এবং ইহার পর কাশ্মীর-সমস্যা সমাধানকল্পে অষ্ট্রেলিয়ার বিশিষ্ট আইনজ্ঞ স্যার ওয়েন ডিক্সন এবং তাহার পরে ডাঃ ফ্রাঙ্ক্ গ্রাহামকে প্রেরণ করেন।

কাশ্মীর সম্পর্কে সম্প্রতি যে ইংগ-মার্কিন প্রস্তাবটি প্রচারিত হইয়াছে, ভারত তাহা পুরাপুরি প্রত্যাখ্যান করিবেন বলিয়াই ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রস্তাবটি এইঃ

'নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৫০ সালের ৩০শে মার্চ, ১৯৫১ সালের ৩০শে এপ্রিল এবং ১৯৫১ সালের ১০ই নভেম্বর তারিখের প্রস্তাবগুলি স্মরণ করিতেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের কাশ্মীর কমিশনের ১৯৪৮ সালের ১৩ই আগষ্ট তারিখের এবং ১৯৪৯ সালের ৫ই জানুয়ারী তারিখের প্রস্তাবের ধারাগুলিও স্মরণীয়। ভারত ও পাকিস্তান সরকার উক্ত সর্তাবলী গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ভারত না পাকিস্তানের সহিত যোগদান করিবে তৎসম্পর্কিত প্রশ্নটির মীমাংসা রাষ্ট্রপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ও নিরপেক্ষভাবে অবাধ ভোট গ্রহণের দ্বারাই মীমাংসিত হইবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের কাশ্মীর সম্পর্কিত প্রতিনিধির ১৯৫২ সালের ২২শে এপ্রিলের রিপোর্ট এবং ১৬ই সেপ্টেম্বরের রিপোর্ট পাইবার পর পরিষদ যে সকল মূল নীতির ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন, ঐগুলি অনুমোদন করিতেছে।—রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধি জানাইয়াছেন যে, তাঁহার ১২ দফা প্রস্তাবের মাত্র দুইটি অনুচ্ছেদ ব্যতীত ভারত ও পাকিস্তান সরকার অন্যান্য অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। পরিষদ ইহাতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে ১২ দফা প্রস্তাবের ৭নং অনুচ্ছেদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ মতানৈক্য বর্তমান থাকায় জম্মু ও কাশ্মীর হইতে সৈন্যাপসরণের পরিকল্পনা সম্বন্ধে মীমাসা হয় নাই।—অসামরিকীকরণ সম্পূর্ণ হইবার পর যুদ্ধবিরতি সীমারেখার উভয় পার্শ্বে ঠিক কত সংখ্যক সৈন্য থাকিবে, সে সম্বন্ধে মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য পরিষদ ভারত ও পাকিস্তান সরকারকে অবিলম্বে রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছে। পাকিস্তান কর্তৃক অধিকৃত এলাকায় ৩ হইতে ৬ সহস্র সশস্ত্র সৈন্য থাকিবে এবং ভারতীয় এলাকায় ১২ হইতে ১৮ হাজার সশস্ত্র সৈন্য থাকিবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধি গত ১৬ই জুন উপরোক্তরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধির গত ৪ঠা সেপ্টেম্বরের প্রস্তাবের ৭ম অনুচ্ছেদে বর্ণিত মূল নীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই এই সৈন্যসংখ্যা নির্দিষ্ট করিতে হইবে।—রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধির মীমাংসায় উপনীত হইবার উদ্দেশ্যে এই বিপুল প্রচেষ্টার জন্য পরিষদ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। এই উদ্দেশ্যে ভারত ও পাকিস্তান সরকারের সাহায্যার্থ প্রচেষ্ট চালাইয়া যাইবার জন্য তাঁহাদের প্রতিনিধিকে অনুরোধ জানাইতেছেন।—এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর ৩০ দিনের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তান সরকারকে এ সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদে

রিপোর্ট দিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছে। ইহা ব্যতীত রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধিকে আলোচনার অগ্রগতি সম্বন্ধে রাষ্ট্রপুঞ্জকে অবহিত করিবার জন্যও অনুরোধ জানাইতেছে।'

প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বৃটিশ প্রতিনিধি স্যার গ্ল্যাড্‌উইন জেব বলেনঃ এক্ষণে যদি গভর্ণমেণ্ট দুইটি অ-সামরিকীকরণের পর যত সৈন্য রাখা হইবে, সে সম্বন্ধে প্রস্তাবে নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ সংখ্যা অতিক্রম না করিয়া চূড়ান্তভাবে তাঁহাদের সশস্ত্র সৈন্যসংখ্যা নির্ধারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন যে, যুদ্ধবিরতি সীমারেখার উভয়দিকে সৈন্যসংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস করা হইলেও ইহার ফলে ঐ অঞ্চলের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবে না।'

ভারত সরকারের অভিমত এই যে, উক্ত প্রস্তাবে অসামরিকীকরণের যে পরিকল্পনা দেওয়া হইয়াছে, তাহার ভিত্তিতে পাকিস্তানের সহিত কোনোরূপে আলোচনা চলিতে পারেন। এই পরিকল্পনা ভারতের নিকট আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে।

কোরিয়া সমস্যা

কোরিয়া লইয়া যে সমস্যা আজ বিশ্বব্যাপী বহ্নিমান হইয়া উঠিয়াছে, তাহার দুঃসহ তাপ প্রশমনের জন্য আজ ভারতের মধ্যস্থতার দিকে বৃটিশ পার্লামেণ্টের শ্রমিক সদস্যদের একটা নির্ভরশীল উদগ্র দৃষ্টি শুভবুদ্ধির সূচনারূপে দেখা দিয়াছে। ১৯৫০ সালের ২৫শে জুন কোরিয়ার ভাগ্যাকাশে প্রথম প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ সুরু হয়। তৎপর আজ প্রায় আড়াই বৎসর কাটিয়া গেল, কিন্তু কোরিয়ায় শান্তি স্থাপনের কোনো লক্ষণই এ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। অথচ যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবনা ও চুক্তিতে জাতিপুঞ্জের সদর দপ্তর হইতে সুরু করিয়া ভারতীয় সংসদ পর্যন্ত কম স্বাক্ষর ও স্বীকৃতি জমিয়া ওঠে নাই। যে নরমেধযজ্ঞ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে, তাহার এক পক্ষীয় একটা হিসাব আপাতত উদ্ধার করা গিয়াছে। বীভৎসতার ইতিহাসরূপেই ইহা প্রকাশ করা হইয়াছে। জাতিপুঞ্জের সদর দপ্তর হইতে গত ফেব্রুয়ারী মাসে এক হিসাব প্রকাশ করিয়া জাতিপুঞ্জের পক্ষে যোগদানকারী ১৬টি রাষ্ট্রসহ দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্য দলের যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়, তাহাই ফিরিস্তিসহকারে দেখানো হইয়াছে। এই সংখ্যার বিপুলতাই মনকে বিষণ্ণ করিয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট। তদুপরি রহিয়াছে উত্তর কোরিয়ার পক্ষে অংশগ্রহণকারী সৈনিকের সঙ্গে উভয় কোরিয়ার আক্রান্ত অগনিত জনগণ।

প্রকাশিত হিসাবে দেখা যায়—২৫শে জুন, ১৯৫০ হইতে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৫১ পর্যন্ত—আঠারো মাসে জাতিপুঞ্জ পক্ষের তিন লক্ষের অধিক সৈন্য নিহত, আহত বা নিখোঁজ হইয়াছে। তন্মধ্যে নিহতের সংখ্যা সাতচল্লিশ হাজারেরও বেশী। পূর্ণ তালিকার ভিতর দুইটি ক্ষেত্রের সময়-রেখা উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে পৃথক। থাইল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৫১ ও ফ্রান্সের ক্ষেত্রে ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫১ পর্যন্ত যে হিসাব দাখিল করা হইয়াছে, তাহার বিবরণ এইরূপঃ

দেশ	নিহত	আহত	নিখোঁজ বা শত্রু-অধিকৃত	মোট
অষ্ট্রেলিয়া	১৪৮	৫৪৭	১৪	৭০৯
বেল্‌জিয়াম ও লুক্‌সেমবুর্গ	৩২	১২৫	২	১৫৯
ক্যানাডা	১২৭	৫১৪	৫	৬৪৬
কলম্বিয়া	৩২	৯৯	—	১৩১
ইথিওপিয়া	৩৭	১৩৯	—	১৭৬
ফ্রান্স	১৫৩	৭০০	১৪	৮৬৭
গ্রীস	৮৮	২৬৫	১	৩৫৪
নেদারল্যাণ্ড	৭১	২৬৯	৩	৩৪৩
নিউজিল্যাণ্ড	১৭	৪১	১	৫৯
ফিলিপাইন	৪৯	১৯৭	৫৮	৩০৪
দক্ষিণ আফ্রিকা	৭	২	২১	৩০
থাইল্যাণ্ড	৪০	৩০৪	৪	৩৪৮
তুরস্ক	৪৫৬	১,৩৫২	৪০৪	২,২১২
যুক্তরাজ্য	৪৩৭	১,৪৪০	১,১৫৬	৩,০৩৩
যুক্তরাষ্ট্র	১৭,৭৫৪	৭৩,৩৯২	১২,৫৯৩	১,০৩,৭৩৯
দক্ষিণ কোরিয়া	২৭,৬৯০	১,০৩,৮৮৭	৬১,৩৮৩	১,৯২,৯৬০
মোট	৪৭,১৩৮	১,৮৩,২৭৩	৭৬,৬৫৯	৩,০৬,০৭০

ইহা দ্বারা উত্তর কোরিয়ার ধ্বংসনীতির উপর গুরুত্ব আরোপিত হইলেও উত্তর কোরিয় সংগ্রামী জনগণই যে ইহার জন্য ন্যায়ত দায়ী, তাহা বলা চলে না। উত্তর কোরিয়ার হতাহতের সংখ্যাটি প্রকাশিত হইলেই ইহার উপর তুলনামূলক কিছু বিচার করিয়া মন্তব্য করা চলিত। দায় বিচারের ইতিহাস যেখানে গিয়াই দাঁড়াক না কেন, আসলে শান্তি সংস্থিতি যে এখনও সুদূরপ্রসারী, একথা অনুমান করা শক্ত নয়। সম্প্রতি গত ৫ই নভেম্বর জেনারেল আইসেনহাওয়ার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াই ঘোষণা করেন যে, আগামী জানুয়ারী মাসে কার্যভার গ্রহণের পূর্বেই তিনি কোরিয়া পরিদর্শনে যাইবেন। ইতিপূর্বে তিনি কোরিয়ার যুদ্ধের এই দীর্ঘকালীন বিস্তৃতির জন্য

যেমন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকে দায়ী করিয়াছেন, ট্রুম্যানও তেমনি জেনারেল আইসেনহাওয়ারকে অভিযুক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, ১৯৪৮ সালে কোরিয়া হইতে মার্কিন দখলদার বাহিনী অপসারণের জন্য আইসেনহাওয়ারই স্বয়ং দায়ী। তিনি অবশ্য এই বলিয়া পাশ কাটাইয়া যাইতে চাহিয়াছেন যে, রাষ্ট্রদপ্তর মার্কিন সৈন্য অপসারণের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু বিষয়টা আদৌ তাহা নয়, রাষ্ট্রদপ্তরের উপর দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়ার জন্য আইসেনহাওয়ারের প্রচেষ্টা অত্যন্ত অসাধুতারই পরিচয়।

ইহা অবশ্য আমেরিকার নিজস্ব বাদ-প্রতিবাদ। তাহা লইয়া বৃহত্তর শান্তিকার্যের বিচার করা চলে না। অথচ যেখানেও বা চলিবার মতো বিশেষ কোনো আভাষ আছে, সেখানেও দেশগত মত-বৈষম্যটাই বড় হইয়া দেখা দেয়। গত ১৭ই অক্টোবর কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ কোরিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের নিকট একটি নূতন প্রস্তাব পেশ করেন। মাত্র তিনটি মর্মে উক্ত প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ, যথাঃ (১) যুদ্ধ-বিরতি আলোচনা ভাঙিয়া দেওয়ার অসঙ্গত প্রচেষ্টা অবিলম্বে বন্ধ করিতে হইবে, (২) আন্তর্জাতিক চুক্তি ও কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতির খসড়া চুক্তি অনুযায়ী সমগ্রভাবে যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের কার্য সম্পাদন করিতে হইবে এবং (৩) খসড়া-চুক্তি অনুযায়ী দ্রুত কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি ঘটাইতে হইবে। ইহার জবাব দিতে গিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জ অধিনায়ক জেনারেল ক্লার্ক গত ২০শে অক্টোবর বলেন যে, কোরিয়ায় যুদ্ধ অবসানকল্পে কমিউনিস্টদের সর্বশেষ প্রস্তাবটি নিতান্তই বাজে। —চীনা স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর সহকারী অধিনায়ক জেনারেল তেংহুয়া বলেনঃ রাষ্ট্রপুঞ্জ মর্যাদা ও ন্যায়সঙ্গত ভিত্তিতে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদনে সম্মত না হওয়া পর্যন্ত চীনারা অবিরাম আঘাত হানিতে থাকিবে। এদিকে টাস এজেন্সী কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে পাই-অং-যং বেতারের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, উত্তর কোরিয়া সরকার উহাকে বাদ দিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জ যদি কোরিয়া সমস্যা সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহা মানিয়া লইবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। তদুপরি পাই-অং-যং বেতারে রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদের বর্তমান অধিবেশনের সভাপতির নিকট প্রেরিত উত্তর কোরিয়া পররাষ্ট্র মন্ত্রীর এক বিবৃতির উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে, উহাতে রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে জীবানু যুদ্ধের আলোচনা কালে উত্তর কোরিয়ার প্রতিনিধিদলকে উপস্থিত থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ করিবার অনুরোধ জানানো হইয়াছে। প্যারিসের এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, নয়াচীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সংবাদে প্রকাশ, চীনের শান্তি কমিটি উত্তর কোরিয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি কিম্ ইল্‌সুঙ্‌কে জানাইয়াছেন যে, চীনের ৪৭ কোটি ৫০ লক্ষ অধিবাসী মার্কিন সাম্রাজ্যলীপ্সার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন তীব্রতর করিয়া তুলিতে সাহায্য করিতে থাকিবে।

বিগত ১৪ই অক্টোবর পর্যন্ত এক সপ্তাহে কমিউনিস্টদের হতাহতের সংখ্যা ১০,১৭৬ বলিয়া ধরা হইয়াছে। এক সপ্তাহের এই হতাহতের হার হইতে বিগত আড়াই বৎসরের হতাহতের একটা আনুমানিক হিসাব বাহির করা একেবারেই দুঃসাধ্য নয়।

উভয় পক্ষের এই হতাহতের সংখ্যার দ্বারা রক্তপ্রবাহের চাপটা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহাই কি শান্তির পথ? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান কি গোড়াতেই এই নারকীয় যজ্ঞের অবসান ঘটাইতে পারিতেন না? কেন এতকাল যুদ্ধ টিকিয়া থাকিল, কেন সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে আজও সমগ্র কোরিয়া উত্তর আর দক্ষিণে বিভক্ত না থাকিয়া এক হইতে পারিল না, এইটাই আজ পৃথিবীর বিদগ্ধ সমাজের একমাত্র প্রশ্ন। বর্তমানে ভারতকে মধ্যস্থ মানিয়া ইহার একটা আশু সমাধানের আভাষ চারিদিক হইতেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ভারতের পক্ষে এই মধ্যস্থতা গ্রহণ না করিবার কোনো হেতু নাই। গোড়া হইতেই ভারত ইহার একটা আশু সমাধানের পক্ষপাতি ছিল। কিন্তু মধ্যস্থতার সূত্রে ভারতের অভিমত কি শেষ পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ্য হইবে? যদি গ্রাহ্য না হয়, তবে ভারত মিথ্যা কেন অগ্রসর হইয়া অসম্মানের আঘাত পাইবে! ভারত যে-শান্তির পথের নির্দেশ দিবে, তাহাকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান সসম্মানে স্বীকার করিয়া লইয়া কোরিয়া সমস্যার সমাধানে চেষ্টিত হইবে, এই প্রতিশ্রুতি পাইলেই তবে ভারতের পক্ষে অনুরূপ মধ্যস্থতা গ্রহণ করা কর্তব্য হইবে, অন্যথায় নয়।

ইঙ্গ-ইরাণ সম্পর্ক

তৈল বিরোধ সম্পর্কে বৃটেন ও পারস্যের মধ্যে গত দুই বৎসর ধরিয়া যে সংঘর্ষ চলিতেছিল, সম্প্রতি তাহা এক চরম সংকটমুহূর্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পারস্যের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মোসাদেক সম্প্রতি তাঁহার এক বেতার-ঘোষণায় বলিয়াছেন যে, পারস্য বৃটেনের সহিত কূটনৈতিক কম্পর্ক ছেদ করিয়াছে। ইরাণে অবস্থিত দপ্তর গুটাইয়া লইবার জন্য বৃটিশ কূটনীতিকগণকে তাঁহারা কিছুকালের সময় দিয়াছেন মাত্র। তবে ইহা দ্বারা উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব-

পূর্ণ সম্পর্কের অবসান সূচিত হইতেছে না। ইহার একটা পাল্টা জবাব দিয়া তৈলবিরোধ সম্পর্কে পারস্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বৃটিশ সরকার অভিযোগ করিয়াছেন যে, ইঙ্গ-ইরাণ মৈত্রী সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে ইরাণের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার অভাব রহিয়াছে।

বাদানুবাদে জল ক্রমে ঘোলা হইয়া উঠিতেছে, সন্দেহ নাই। অনুমান করা যাইতেছে যে, বৃটেন হইতে ইরাণী কূটনীতিক প্রতিনিধি সরাইয়া লইবার পর সম্ভবতঃ সুইডেন সেখানে ইরাণী স্বার্থের তদারকী করিবেন।

ডাঃ মোসাদেক তাঁহার বেতার ঘোষণায় বলেনঃ 'ইরাণ বৃটিশ সরকারের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের অবসান হইবে না। এ আশা করা অন্যায় হইবে না যে, বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকার তাঁহাদের নীতি পরিবর্তন করিবেন এবং পরিশেষে উভয় দেশের মধ্যে পুনরায় বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইবে।' তৈল-বিরোধ মীমাংসা সম্পর্কে তিনি বলেনঃ 'তৈল-সমস্যা মীমাংসার জন্য ইরাণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু বৃটিশ সরকার সর্বদাই মীমাংসার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। আন্তর্জাতিক আইনের বিধি লঙ্ঘন করিয়া বৃটেন ইরাণের জনগণের উপর অর্থনৈতিক চাপ দেয় এবং আমাদিগকে নূতন অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণে বাধা দেয়। এইভাবে তাহারা ইরাণকে তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য করিয়াছে।...'

তেহরাণস্থিত ভারপ্রাপ্ত বৃটিশ দূত মিঃ জর্জ মিডল্টন ডাঃ মোসাদেকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার হস্তে তৈলবিরোধ সংক্রান্ত পারস্যের সর্বশেষ প্রস্তাবের উত্তর প্রদান করেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে যুগপৎ এক বিবৃতি প্রচার করা হয়। উহাতে 'বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নতিসাধনের' জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলা হয় যে, বিরোধ মীমাংসার জন্য যে ইরাণ কর্তৃপক্ষ আগ্রহান্বিত, সে-পরিচয় তাঁহাদের কার্যকলাপ হইতে পাওয়া যায় না। বৃটেনের সদিচ্ছা এবং ইঙ্গ-ইরাণ সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী চাপের অভাবের কথা ঘোষণা করিয়া উক্ত বিবৃতিতে আরও বলা হয় যে, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বৃটেন যদি তাহার শক্তি ও প্রভাব লইয়া ইরাণের পক্ষাবলম্বন না করিত, তাহা হইলে ইরাণের ভাগ্য ভিন্নরূপ হইতে। ইরাণী জনসাধারণ ১৯৪৬ সালের ঘটনাবলী নিশ্চয়ই বিস্মৃত হয় নাই।

এতদ্ব্যতীত বৃটেনের নোটে স্পষ্টভাবে জানানো হইয়াছে যে, দেড় বৎসরের পুরাতন তৈলবিরোধ মীমাংসার জন্য ডাঃ মোসাদেক যে সমস্ত প্রস্তাব করিয়াছেন, সেগুলি 'অযৌক্তিক এবং গ্রহণের অনুপযুক্ত।' পারস্য তাহার মো[illegible] দাবী ৪ কোটি ৯০ লক্ষ স্টার্লিং-এর মধ্যে প্রথম কিস্তি হিসাবে অবিলম্বে ২ কোটি স্টার্লিং পরিশোধের দা[illegible] জানাইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তৈল সমস্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সাতদিনের মধ্যে ইঙ্গ-ইরাণ তৈল কোম্পানীর একটি প্রতিনিধি দলকে তেহরাণে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিল। বৃটিশ সরকারের নোটে আরও বলা হইয়াছে যে, বিরোধ মীমাংসার জন্য গত আগষ্ট মাসে যে যুক্ত ইঙ্গ-মার্কিন পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হইয়াছিল, পারস্য এখনও উহা ঠিক বুঝিতে পারে না। পারস্য সরকার তখ[illegible] বলিয়াছিলেন যে, ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে যে সকল দাবী [illegible] পাল্টা দাবী করা হইয়াছে, চারিটি সর্তে তাহারা সেগুলি আন্তর্জাতিক আদালতে পেশ করিতে প্রস্তুত আছেন। তৈলশিল্প জাতীয়করণের নীতি বৃটেন স্বীকার করিয়া লইয়াছে, পরিবর্তে সে ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটি সমগ্রভাবে পৃথিবীর সর্বোচ্চ ন্যায়াধিকরণে পেশ করার জন্য দাবী করিয়াছে। পারস্য যদি বিদেশে তৈল বিক্রয় করিতে সক্ষম না হইয়া থাকে, সে জন্য কোম্পানীর নিকট সে ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারে, ইহা বৃটেন স্বীকার করে না। তাঁহারা মনে করেন যে, তৈলের ব্যাপারে কোম্পানী শুধু তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রয়োগ করিয়াছে।

নোটের উপসংহারে তাঁহারা আপোষ-মীমাংসার ভিত্তি হিসাবে ছয়টি সর্ত ঘোষণা করিয়াছেন, যথাঃ (১) বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও ইঙ্গ-ইরাণ তৈলকোম্পানী জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতেছেন, কিন্তু পরিবর্তে তাঁহা[illegible] কোম্পানীর তরফ হইতে ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ দা[illegible] করিতেছেন ; (২) ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটি হেগস্থিত আন্তর্জাতিক আদালতে নির্ধারিত হইবে ; (৩) ১৯৩৩ সালে[illegible] চুক্তি অনুসারে প্রদত্ত সুবিধা বেআইনীভাবে অবসান করা[illegible] জন্য গভর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী ; (৪) গভর্ণমেণ্ট কিম্বা কোম্পানী—কেহই অন্য কোনোদিক দিয়া এই সুবিধা পুনরায় আদায়ের জন্য চেষ্টা করিবেন না ; (৫) ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে সালিশীর ভিত্তি নির্ধারিত হও[illegible]য়ার পর কোম্পানী আপোষ-আলোচনার জন্য প্রস্তুত থাকিবে ; এবং (৬) সালিশ মীমাংসা না হওয়া পর্য[illegible] গভর্ণমেণ্টের পূর্ণ আইনসঙ্গত অধিকার বজায় থাকিবে।

পারস্য সরকারের পক্ষে এই সর্ত অনুমোদন কর[illegible] কতখানি সম্ভবপর, তৎসম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে

অতঃপর ডাঃ মোসাদেকের তরফ হইতে অনুরূপ একটি ষষ্ঠ দফার পাল্টা সর্ত বৃটিশ সরকারের দরবারে গিয়া পেঁছিলে বিস্ময়ের কোনো কারণ থাকিবে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস্‌প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন

সম্প্রতি গত ৫ই নভেম্বর নানা উদ্দীপনার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন পর্ব সমাপ্ত হইল। সুদীর্ঘ কুড়ি বৎসর পর এবারে নির্বাচন-দ্বন্দ্বে পুনরায় রিপাব্‌লিকান দল বিজয়ী হইলেন। রিপাব্‌লিকান দলের প্রার্থী মিঃ ডুইট্‌ ডেভিড আইসেনহাওয়ার ও সেনেটর রিচার্ড এম্‌ নিক্সন যথাক্রমে প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছেন। কুড়ি বৎসর পর রিপাব্‌লিকান দলের হাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন কর্তৃত্ব আসিল। ডেমক্র্যাটিক্‌ পার্টির প্রার্থী মিঃ ষ্টিভেনসন ও জন জ্যাক্‌সন স্পার্কম্যান যথাক্রমে প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য রিপাব্‌লিকান দলের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। উভয়েই বিপুল ভোটে পরাজিত হইয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে রিপাব্‌লিকান প্রেসিডেণ্টদের মধ্যে মিঃ আইসেনহাওয়ারই সর্বাধিক ভোট পাইয়া নির্বাচনে জয়ের অধিকারী হইলেন। তিনি পান ২,৯৫,৬৯,৭৯৯টি ভোট এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বি মিঃ ষ্টিভেনসন পান ২,৩৭,৮৫,২৮০টি ভোট।

নির্বাচন শেষে মিঃ ষ্টিভেনসন এক বিবৃতি প্রসঙ্গে জানান ঃ জনগণ তাহাদের রায় দিয়াছে, আমি তাহাদের অভিনন্দন জানাইতেছি। জনগণের রায় আমি বরণ করিয়া লইতেছি; জনগণের রায় দানের অধ্যায় শেষ হইবার পর দলগত পার্থক্য ভুলিয়া ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই আমাদের চিরাচরিত প্রথা। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরূপে আমাদের সেই বন্ধন রাজনৈতিক মতবৈষম্য হইতে অনেক বড়। আমাদের সম্মুখে আজ যে সুমহান কর্তব্য আছে, তাহা নির্বাহে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার আপনাদের সহায়তা কামনা করেন, আমি আশা করি আপনারা সর্বান্তঃকরণে এই সাহায্য দিবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের এই নির্বাচনের পিছনে তাহার স্বারাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে ডিমক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান দলের বৈষম্যটাও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। প্রধানতঃ কোরিয়া যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়াই ইহার একটা উদাহরণ টানা যাইতে পারে। কোরিয়া যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করিয়া তুলিবার জন্য ইতিপূর্বে মিঃ আইসেনহাওয়ার বিশেষ করিয়া মিঃ ট্রুম্যানকেই দায়ী করিয়াছিলেন, কিন্তু মিঃ ট্রুম্যানও মিঃ আইসেনহাওয়ারকে ছাড়িয়া কথা বলেন নাই। কোরিয়া রণাঙ্গন হইতে মার্কিন সৈন্যকে সরাইয়া আনিবার জন্য মিঃ আইসেনহাওয়ারকেই তিনি বিশেষভাবে দায়ী করিয়াছিলেন। আভ্যন্তরীণ এই মতবিরোধ যতই উগ্র হইয়া উঠুক না কেন, শেষ পর্যন্ত মার্কিন জনমত যে মিঃ আইসেনহাওয়ারের সপক্ষেই বহিতে সুরু করিল, তাহার প্রমাণই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সদ্য অনুষ্ঠিত নির্বাচন-দ্বন্দ্বে পাওয়া গেল। ট্রুম্যানের শাসনবিভাগ যেভাবে যুদ্ধ-বিরতি আলোচনা চালাইয়াছেন এবং সোভিয়েট ও কমিউনিস্ট-নেতৃবৃন্দ যেরূপ সাফল্যের সহিত তাহাদিগকে 'প্রবঞ্চনা' করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহাতে মিঃ আইসেনহাওয়ার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং এই ব্যাপারে ট্রুম্যান-নীতির তীব্র সমালোচনাও তিনি করেন। নির্বাচনী প্রচারকালে তিনি এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, সামরিক চাপ বৃদ্ধি করিয়া বা অন্য উপায়ে তিনি কোরিয়ায় সম্মানজনক শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিবেন। কোরিয়ার রণাঙ্গনে দক্ষিণ কোরিয়ান সৈন্যরা যাহাতে আমেরিকান সৈন্যদের স্থান লইতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে তাড়াতাড়ি ট্রেনিং দেওয়া ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া তোলা প্রয়োজন বলিয়াও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

নিরস্ত্রীকরণ প্রথার ভিত্তিতে বিশ্বশান্তির পটভূমিকায় এই অস্ত্র-প্রস্তুতির উপর কিছু একটা টিকা করা চলিত, কিন্তু সে ক্ষেত্র ইহা নয়। আমরা নিম্নে মাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস-প্রেসিডেণ্টের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম।

ডুইট্‌ ডেভিড আইসেনহাওয়ার

ইতিপূর্বে আইসেনহাওয়ারের সেনানী জীবনের অধিকাংশ সময় দূর-প্রাচ্য, পানামা এবং ইউরোপে অতিবাহিত হইলেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রতি তিনি নিয়ত সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। 'ক্রুসেড্‌ ইন্‌ ইউরোপ' শীর্ষক দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের ইতিহাসে তিনি বলিয়াছেন ঃ 'রাজনীতি এবং সামরিক কার্যকলাপকে কদাপি সম্পূর্ণ পৃথক করা যায় না।' ইউরোপস্থিত মিত্রশক্তির সর্বাধিনায়কপদে তাঁহাকে একাধারে কূটকৌশলী রাষ্ট্রনীতিক এবং সেনাধ্যক্ষরূপে কাজ করিতে হইয়াছে। যে বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সমরবাদের প্রতি গভীর বিতৃষ্ণা সেই বংশের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য। তাঁহার পিতামহ জ্যাকব আইসেনহাওয়ার ছিলেন অতীব নিষ্ঠাবান ও

প্রত্যয়শীল শান্তিবাদী। ধর্মগত কারণে আইসেনহাওয়ারের পিতামাতাও যুদ্ধের ঘোর বিরোধী ছিলেন। এ হেন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া একুশ বৎসর বয়ক্রমকালে তিনি যখন সামরিক বৃত্তি গ্রহণের সংকল্প ঘোষণা করিলেন, তখন তাঁহার পরিবারের সকলে বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া পড়েন। কিন্তু পুত্রের বিচারবুদ্ধির প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁহার পিতামাতা

তাঁহার ইচ্ছার পথে কাঁটা হইয়া দাঁড়ান নাই। দুইটি মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে আইসেনহাওয়ার কার্যতঃ প্রতিটি সামরিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং অবসর মুহূর্তগুলি পাঠাভ্যাসে অতিবাহিত করেন। অনন্যসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী তিনি। ট্যাংকযুদ্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ হইলেও ৪৭ বৎসর বয়সে তিনি বৈমানিক হন। দ্বিতীয় বিশ্বসমর আরম্ভ হইবার সময় দেখা যায় যে. তিনি নিজেকে সর্বাঙ্গীন কুশলতায় গড়িয়া তুলিয়াছেন। জাপানীরা পার্ল হারবার আক্রমণ করার পাঁচ দিন পর সমর দপ্তর আইসেনহাওয়ারকে ওয়াশিংটনে আহ্বান করেন এবং তাঁহার উপর রণনীতি ও পরিকল্পনা রচনা বিভাগ পরিচালনার গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। তৎকালে তিনি ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। মাত্র ছয় মাস এই পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তৎপরে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় রণাঙ্গনে মার্কিন বাহিনীর অধিনায়করূপে তিনি ইংলণ্ডে প্রেরিত হন। অতঃপর উত্তর আফ্রিকা, সিসিল, ইতালী এবং পরিশেষে নরম্যাণ্ডি অভিযানে জেনারেল আইসেনহাওয়ার মিত্রশক্তি সম্মিলিত বাহিনী চালনা করেন এবং বিজয়-গৌরবদীপ্ত বাহিনী লইয়া জার্মানীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন —১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি জেনারেলের পদমর্যাদা লা করেন এবং পরবৎসরই 'জেনারেল অব দি আর্মি' পদে উন্নীত হন। মার্কিন বাহিনীতে ইহাই সর্বোচ্চ পদ ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ৭ই মে তারিখে পরাক্রান্ত নাৎসী বাহি নীর আত্মসমর্পণের পর মার্কিন দখলকার বাহিনীর অধি নায়করূপে তিনি জার্মানীতে প্রবেশ করেন এবং উক্ত বৎসরে নভেম্বর মাসে সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষপদে নিয়োগে জন্য তাঁহাকে ওয়াশিংটনে আহ্বান করা হয়। ১৯৪৮ সালে তিনি এই পদে ইস্তফা দিয়া আমেরিকান বৃহত্তম শিক্ষায়তন সমূহের অন্যতম কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডে নির্বাচিত হন। দুই বৎসর পর উত্তর আতলান্তিক চু সংস্থার সর্বাধিনায়করূপে পুনরায় সামরিক ক্ষেত্রে প্রত্যা বর্তন করেন।

জেনারেল আইসেনহাওয়ার খৃষ্টীয় ১৮৯০ সালে টেক্সা সের অন্তঃপাতী ডেনিসন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। সা ভাইয়ের মধ্যে আইসেনহাওয়ার তৃতীয়। কানসাস রাজে আবিলেন নগরীতেই তাঁহার কৈশোর ও যৌবনের অধিকাং সময় অতবাহিত হইয়াছে। পঠদ্দশায় ইতিহাসে তাঁহা গভীর অনুরাগ ছিল। বিশ্ববিশ্রুত রথী মহারথীদে জীবনী তাঁহার মনে এত গভীর প্রভাব বিস্তার করে যে তিনি নৌবহরে যোগদানের সংকল্প করেন। কিন্তু বয় বেশী হইয়া যাওয়ায় নৌবাহিনীতে যোগদানের আশা তাঁহা অপূর্ণ রহিয়া যায়। শেষ পর্যন্ত ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তি ওয়েষ্টপয়েণ্টস্থিত মার্কিন সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে খেলা-ধূলাতেও তাঁহার যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল।—দ্বিত লেপ্টেন্যাণ্ট্ হিসাবে সেনাবাহিনীর কমিশন লাভে অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনি সান আন্তোনিওতে (টেক্সা ১৯শ পদাতিক বাহিনীতে নিযুক্ত হন। মামি দাউদ নাম্ন জনৈকা মহিলার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় (১৯১৬—১ জুলাই)। ঐ দিনই তিনি প্রথম লেপ্ন্যাণ্ট্ পদে উন্নী হন। আইসেনহাওয়ারের একমাত্র পুত্র জন মার্কিন সেন বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন। সুমধুর ব্যক্তিত্ব এবং সরস অমায়িক প্রকৃতির জন্য আইসেনহাওয়ার দেশবাসীর প্রী ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন।

সেনেটর রিচার্ড এম্ নিক্সন

রাজনীতিক্ষেত্রে সেনেটর রিচার্ড এম্ নিক্সনের আবিভ

কছুকালের কথা। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে এক অদ্ভুত ও ঘটনাক্রমে প্রড়িয়া তিনি রাজনীতিতে প্রবিষ্ট হন। র্বে তিনি মার্কিন নৌবহরে ছিলেন। ১৯৪৮ সালে কংগ্রেসের এবং ১৯৫০ সালে তিনি সেনেটের সদস্য চিত হন। অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়স্ক হইলেও অল্প-

মধ্যেই তিনি বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতিবিদ হিসাবে খ্যাতি তষ্ঠা অর্জন করেন। কমিউনিস্ট-বিরোধী কার্য-পর জন্য অচিরেই তাঁহার নাম সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্ত হয়। —পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নিক্সন মার্শাল ল্পনা, উত্তর আতলান্তিক চুক্তি সংস্থা এবং সামরিক দানের কার্যক্রম সমর্থন করেন। তিনি এই অভিমত করেন যে, কোরিয়ায় প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ চালাইতে নতুবা তথা হইতে সরিয়া আসাই শ্রেয়ঃ। দেশের তরীণ রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি মধ্যপন্থী রক্ষণশীল নিজের পরিচয় দেন। রাজনীতিক হিসাবে তিনি শ্র সততা ও সন্নীতির জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। নিকট হইতে অন্যায় অনুগ্রহ বা সুবিধা আদায় করা । সম্পূর্ণ স্বাধীনচেতা তিনি। এই জন্য নির্বা-ডলীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার সহিত সব সময় তাঁহার মতা-মতের কোনো মিল থাকে না। কিন্তু দেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি সব কিছু করেন, এই ধ্রুব বিশ্বাস তাঁহার উপর আছে বলিয়াই নির্বাচকমণ্ডলী তাঁহার কাজ নীরব সহিষ্ণুতার সহিত করিয়া লইতে দ্বিধাবোধ করে না।

খৃষ্টীয় ১৯১৩ সালের ৯ই জানুয়ারী তারিখে নিক্সন কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত ফেরবালিণ্ডায় জন্মগ্রহণ করেন। হুইটিয়ার নামক স্থানে তাঁহার পিতার একটি মুদিখানা ছিল। নিক্সনের ভ্রাতা ডন এখন সেই দোকানের পরিচালক। হুইটিয়ারেই তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। তথাকার বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি একটি পেট্রোল ষ্টেশনে কাজ নেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি হুইটিয়ার কলেজ হইতে 'ব্যাচেলার অব আর্টস্' ডিগ্রী এবং ১৯৩৭-এ ডিউক ইউনি-ভারসিটি ল' কলেজ হইতে আইনের ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩৭ হইতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নিক্সন হুইটিয়ারেই আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। তৎপর তিনি মার্কিন নৌ-বহরে কমিশন লাভ করেন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে নৌ-বহর হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া হয়। তখন তিনি লেপ্‌টেন্যান্ট কমাণ্ডার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে নিক্সন প্যাট্রিসিয়া রায়ান নাম্নী এক মহিলার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। নিক্সনের ন্যায় শ্রমশীল ও একনিষ্ঠ কর্মী বিরল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও দূর-দর্শিতার জন্য তাঁহাকে তাঁহার সহকর্মীরা সকলেই পছন্দ করেন।

শোক-সংবাদ

পরলোকে পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায়

গত ২৩শে কার্তিক বাংলার খ্যাতিমান ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ৮৮ বৎসর বয়সে তাঁহার ঝাড়গ্রামস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। দীর্ঘ জীবন পাইয়াছিলেন তিনি সন্দেহ নাই, তথাপি তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা-সাহিত্যের একটা বিশেষ দিকের যে অপরিসীম ক্ষতি হইল, তাহা সহসা পূর্ণ হইবার নয়।

বসন্তরঞ্জন আজীবন সাহিত্যসেবা ও সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সদস্যদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। কয়েক বৎসর তিনি উহার সহকারী সভাপতিত্বও করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বহু বৎসর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্-এ ক্লাশের বাংলা অধ্যাপক ও পুঁথি বিভাগের প্রধান কর্তা ছিলেন। তাঁহার প্রধান কীর্তি চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন পুঁথির আবিষ্কার। বেলিয়াটোড় গ্রামের পাশে এক শিব মন্দিরের

সংলগ্ন বিল্বপত্রের স্তূপের মধ্য হইতে তিনি এই পুঁথিখানি উদ্ধার করেন বলিয়া প্রকাশ। প্রধানতঃ এই গ্রন্থখানি সম্পাদনা করিয়াই তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। বইখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্-এ ক্লাশের পাঠ্য। এতদ্ব্যতীত আরও বহু গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেন এবং রামায়ণের পুঁথির তালিকা প্রস্তুত করেন। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ভূমিকা লিখিতে যাইয়া রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লেখেন ঃ 'বসন্তবাবু চণ্ডীদাসের একখানি নূতন পুস্তক আবিষ্কার করিয়াছেন। এ পর্যন্ত কেহ উহার অস্তিত্ব জানিত না। শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। পরে যখন পুঁথিখানি দেখিলাম, তখন দেখিলাম—একটা নূতন জিনিষ বটে। চণ্ডীদাসের এই অপূর্ব লুপ্ত গ্রন্থ হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে নানা সমস্যার সমাধান হইবে। বাংলা লিপির ইতিহাসে বাংলা উচ্চারণের ইতিহাস, বানানের ইতিহাস, বাংলা ভাষার ইতিহাস, বাংলা ছন্দের ইতিহাস, বাংলা পদ-সাহিত্যের ইতিহাস ইত্যাদি নানা ইতিহাসের নানা প্রশ্নের উত্তর এই পুঁথিতে পাওয়া যাইবে।'

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন সম্বন্ধে ইহার চাইতে বড় কথা বোধ করি আর কিছু হইতে পারে না। বসন্তরঞ্জনের আদি নিবাস বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াটোড় গ্রামে। তাঁহার ন্যায় সরল ও উদার প্রকৃতির মনীষী এ যুগে বিরল ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু বাংলা সাহিত্যেরই অপরিসীম ক্ষতি হইল না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার একটি ম[হা]প্রাণেরও অবসান হইল। ঈশ্বর তাঁহার পরলোক[গত] আত্মার কল্যাণ করুন।